শরৎ রচনা সমগ্র

সম্পূর্ণ উপন্যাস

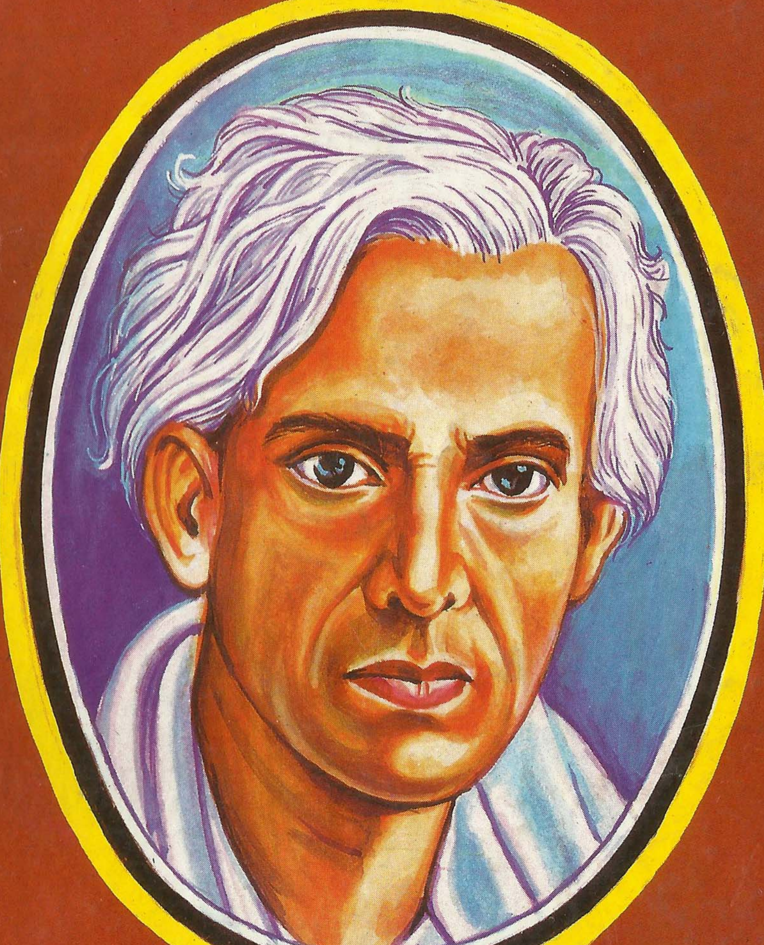

শ্রীশরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎ

রচনা সমগ্র

সম্পূর্ণ উপন্যাস

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঃ পরিবেশক ঃ

মহামায়া বুক এজেন্সী

কলেজ ষ্ট্রীট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার সামনে

ইউনাইটেড পাবলিশার্স

৭৭ এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক ঃ
সুভাষ চন্দ্র বৈদ্য
৭৭/এ, পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
জানুয়ারী ১৯৯৮
দ্বিতীয় প্রকাশ
জানুয়ারী ২০০২

প্রচ্ছদ ঃ তিমির রায়

মুদ্রণে ঃ হিন্দুস্থান আর্ট এনগ্রেভিং কোং প্রাঃ লিঃ
২৪, ডাঃ কার্ত্তিক বোস স্ট্রীট, কলি-৯
দূরাভাষ ঃ- ৩৫০ ৪২৫৮

মূল্য ঃ একশত টাকা।

জীবনপঞ্জি

জন্ম ১৮৭৬, ১৫ সেপ্টেম্বর, ৩১ ভাদ্র, ১২৮৩—হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে। পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়, মাতা ভুবনমোহিনী দেবী। পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যারম্ভ।

১৮৮৬-তে পিতা বিহারের ডিহরিতে চাকুরি লাভের পর পরিবারের সকলের সঙ্গে ভাগলপুরে মাতুলালয়ে বসবাস শুরু হয়। ভাগলপুর জেলা স্কুলে পড়াশুনা আরম্ভ। ১৮৮৯-তে পুনরায় দেবেনন্দপুরে প্রত্যাবর্তন এবং হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়াশুনা শুরু। ফার্স্ট ক্লাস অর্থাৎ এখনকার দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। কাশীনাথ প্রভৃতি গল্প এই সময়ের রচনা।

১৮৯৩-তে পিতা সপরিবারে ভাগলপুরে শ্বশুরালয়ে বসবাস শুরু করলে শরৎচন্দ্র সেখানকাল তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুলে ফার্স্ট ক্লাশে পড়াশুনা করেন। ১৮৯৪-তে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ। এখানেই বিভূতিভূষণ ভট্ট নিরুপমা দেবী প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় এবং ভট্টবাড়িতে ভাগলপুর সাহিত্য সভার সৃষ্টি। এখানকার এক প্রতিবেশী বন্ধু রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার (রাজু)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। শ্রীকান্ত ১ম পর্বের ইন্দ্রনাথ চরিত্র রাজু চরিত্র অবলম্বনে সৃষ্টি। সাহিত্য রচনা, বাঁশী, তবলা বাজনা ও অভিনয় প্রতিভার নিয়মিত অনুশীলন।

১৮৯৮-তে অভিমান উপন্যাস, বোঝা, অনুপমার প্রেম, কোরেল প্রভৃতি গল্প উপন্যাস রচনা।

১৯০০-এ বিহারের গোড্ডায় বনমালী এস্টেটে, কিছুদিন পরে সাঁওতাল পরগণার সেটেলমেন্ট অফিসের কাজে যোগদান। বড়দিদি, চন্দ্রনাথ, দেবদাস প্রভৃতি রচনা।

১৯০১-২—শুভদা, দেবদাস, চরিত্রহীনের কিছু অংশ রচনা। গৃহত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রা। পরে প্রত্যাবর্তন ও জমিদার মহাদেব সাহুর বাড়িতে গায়ক ও বাদকের চাকুরি গ্রহণ।

১৯০৩-৫—কুন্তলীন গল্প প্রতিযোগিতায় 'মন্দির' গল্পের পুরস্কার লাভ। বার্মা গমন ও রেলওয়েতে চাকুরী লাভ ও পরে বিভিন্ন অফিসে অস্থায়ীভাবে চাকুরী। শান্তাদেবীকে বিবাহ। যমুনা কাগজে লেখা।

১৯০৮—প্লেগ রোগে স্ত্রী শান্তাদেবী ও এক বৎসরের শিশু পুত্রের মৃত্যু।

১৯০৮-১৩—দ্বিতীয়বার বিবাহ—স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী। শরৎচন্দ্র তাঁর নাম রাখেন হিরন্ময়ী। কলকাতার যমুনা পত্রিকায় নিয়মিত লেখা। সাহিত্য পত্রিকায় কাশীনাথ প্রকাশ। ভারতবর্ষ পত্রিকায় লেখা শুরু।

১৯১৬—পাকাপাকিভাবে বর্মা ত্যাগ করে সস্ত্রীক হাওড়ায় বসবাস শুরু। পরের বছর রবীন্দ্রনাথ-এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

এই সময় থেকে সাহিত্য সাধনা অবলম্বন করে জীবন শুরু। বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা থেকে পুস্তক প্রকাশ, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় উপন্যাসে অনুবাদ প্রকাশ ও নাট্যরূপ অভিনীত হয়। অতঃপর কংগ্রেসে যোগদান—সাহিত্য জীবনের সঙ্গে রাজনীতি ও সমাজসেবা যুক্ত হয়।

১৯২২-থেকে বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসাবে সম্বর্ধনা লাভ ও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ ও সম্বর্ধনা লাভ।

১৯০৮—পথের দাবী উপন্যাস ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত।

এরপর ক্রমে দেশজোড়া খ্যাতির সঙ্গে বিভিন্ন উপন্যাস নির্বাক ও সবাক চলচ্চিত্রে রূপায়িত।

১৯৩৫-৩৫—কলকাতায় গৃহনির্মাণ, হিরন্ময়ী দেবী ও পরিবারবর্গ সহ বসবাস শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি দান।

পরের বছর সামতাবেড়ের বাড়িতে প্রত্যাবর্তন। এখানেই অসুস্থ হলে পরে কলকাতার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও নার্সিংহোমে চিকিৎসার জন্য ভর্তি।

১৯৩৮—পার্ক নার্সিংহোমে ১৬ জানুয়ারী (২ মাঘ, ১৩৪৪) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

গ্রন্থ-পরিচিতি

দেবদাস—শরৎচন্দ্রের অন্যতম বাল্যরচনা। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকাকালে ভারতবর্ষ পত্রিকার ১৩২৩ সালের চৈত্র এবং ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত। ভারতবর্ষের কর্ণধার শরৎ-সুহৃদ প্রমথনাথ ভট্টাচার্য শরৎচন্দ্রের মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করে পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কাজটি হয়েছিল শরৎচন্দ্রের অসম্মতিতেই। যদিও পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় শরৎচন্দ্র লেখাটি কোনরূপ সংশোধন করেননি।

১৩২৪, আষাঢ় মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত।

নিষ্কৃতি—বই-এর প্রথম দিকের অংশবিশেষ ১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যা যমুনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন রচনাটির নাম ছিল 'ঘর ভাঙ্গা'। পরে প্রকাশিত অংশটি সহ সম্পূর্ণ লেখাটি নিষ্কৃতি নামে ১৩২৩ সালের ভারতবর্ষ পত্রিকায় ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—১৩২৪ সালের আষাঢ় মাসে।

চরিত্রহীন—পুস্তকাকারে প্রকাশের আগে ১৩২০ সালের কার্তিক থেকে চৈত্র এবং ১৩২১ সালেরও কয়েক মাস যমুনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় ১৯০১/২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই উপন্যাসটির অংশবিশেষ লেখা হয়ে পড়েছিল। ১৯১১/১২ খ্রীস্টাব্দে রেঙ্গুনে গিয়ে শরৎচন্দ্র পুনরায় লিখতে শুরু করেন। ৫০০ পাতা পর্যন্ত লেখা হলে ৫-২-১২ তারিখে এক আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে অন্যান্য অনেক জিনিসের সঙ্গে পাণ্ডুলিপিটিও পুড়ে যায়। পরে গোড়া থেকেই চরিত্রহীন আবার লিখতে শুরু করেন এবং ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে দেশে আসার সময় অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি সঙ্গে এনেছিলেন। হাওড়া বাজেশিবপুর অঞ্চলে থাকাকালেও তিনি চরিত্রহীন লিখেছিলেন।

বই আকারে প্রকাশের আগে ১৩২০ সালের কার্তিক-চৈত্র সংখ্যার যমুনা পত্রিকায় আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে।

দত্তা—গ্রন্থাকারে প্রকাশের ১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে বই আকারে প্রকাশিত হয়।

গৃহদাহ—পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে ১৩২৩ সালের মাঘ-চৈত্র, ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র এবং ১৩২৬ সালের আষাঢ়-মাঘ সংখ্যার ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়।

একই সময়ে দত্তা ও শ্রীকান্ত ২য় পর্ব লেখার কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন দীর্ঘ ন'মাস গৃহদাহ রচনায় ছেদ পড়েছিল, ফলে ভারতবর্ষে প্রকাশেও ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। দত্তা এবং শ্রীকান্ত ২য় পর্ব শেষ হলে শরৎচন্দ্র গৃহদাহ রচনা সম্পূর্ণ করেন।

বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৬, ফাল্গুন মাসে।

বামুনের মেয়ে—শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ রচনার ন্যায় এই রচনা বই আকারে প্রকাশের আগে কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। একবারেই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে।

দেনাপাওনা—বই আকারে প্রকাশিত হবার আগে ১৩২৭ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র, ১৩২০ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও চৈত্র এবং ১৩২৯ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক ও মাঘ-চৈত্র এবং ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়—১৩৩০ সালের ভাদ্র মাসে।

নববিধান—ভারতবর্ষ পত্রিকায়—১৩৩০ সালের মাঘ-ফাল্গুন এবং ১৩৩১ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। বই আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩১ সালের কার্তিক মাসে।

স্বামী—গল্প গ্রন্থ। স্বামী ও একাদশী বৈরাগী গল্প দুটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। স্বামী গল্পটি ১৩২৪ সালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সম্পাদিত নারায়ণ পত্রিকায় শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। একাদশী বৈরাগী ১৩২৪ সালের কার্তিক সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্প দুটি একত্র গ্রথিত হয়ে স্বামী নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩২৪ সালের ফাল্গুন মাসে।

ছবি—গল্প গ্রন্থ। ছবি, বিলাসী ও মামালার ফল ও এই তিনটি গল্প একত্র গ্রথিত। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার আগে গল্পগুলো যথাক্রমে ১৩২৪ সালের পূজাবার্ষিকী আগমনী, ১৩২৫ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতী এবং ১৩২৫ সালের পূজা বার্ষিকী পার্বণীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

কোরেল নামে শরৎচন্দ্রের একটি বাল্যরচনা ছিল। সেই গল্পটিকেই অদল-বদল করে ব্রহ্মদেশের পটভূমিকা রেখে শরৎচন্দ্র ছবি গল্পটি লিখেছিলেন।

কলকাতা জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রার আসরে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে শরৎচন্দ্র ছবি গল্পটি পাঠ করেছিলেন।

হরিলক্ষ্মী—গল্প গ্রন্থ। হরিলক্ষ্মী, মহেশ ও অভাগীর স্বর্গ এই গল্প তিনটি একত্র গ্রথিত। গল্পগুলি গ্রন্থবদ্ধ হবার আগে যথাক্রমে ১৩৩২ সালের শারদীয়া বসুমতী, ১৩২৯ সালের আশ্বিন ও মাঘ মাসের বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়েছিল। মহেশ গল্পটি পরে ১৩২৯ সালের আশ্বিন সংখ্যা পল্লীশ্রীতেও প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে।

তরুণের বিদ্রোহ—পূর্ববঙ্গের রংপুর শহরে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ইস্টারের ছুটিতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনের পূর্বে একই মঞ্চে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। সেই যুব সম্মেলনে সভাপতি হিসাবে শরৎচন্দ্রের অভিভাষণটিই পুস্তকাকারে তরুণের বিদ্রোহ নামে প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে।

১৩২৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় নারায়ণ পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের সত্য ও মিথ্যা নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। এই প্রবন্ধটি তরুণের বিদ্রোহ-এর সঙ্গে সংযোজিত করে অন্য একটি প্রকাশন সংস্থা বর্ধিত কলেবরে তরুণের বিদ্রোহ প্রকাশ করেন—১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে।

রমা—পল্লীসমাজ উপন্যাসের নাট্যরূপ। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ মাসে। নাটকটি রচিত হয়েছিল অন্ততঃ বছর আড়াই আগে। রমা ১৩৩৫ সালের শ্রাবণ মাসেই কলকাতার আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের শিল্পীদের দ্বারা স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

সূচীপত্র

উপন্যাস

শুভদা ৩৬৫-৪৬০

শেষের পরিচয় ৪৬১-৫৬২

শেষ প্রশ্ন ৫৬৩-৭৩৪

পথের দাবী ৭৩৫-৯২৯

বিপ্রদাস ৯৩০-১০৫৫

It's a PATHAGAR.NET presentation

পাঠাগার.নেট-এর নিবেদন

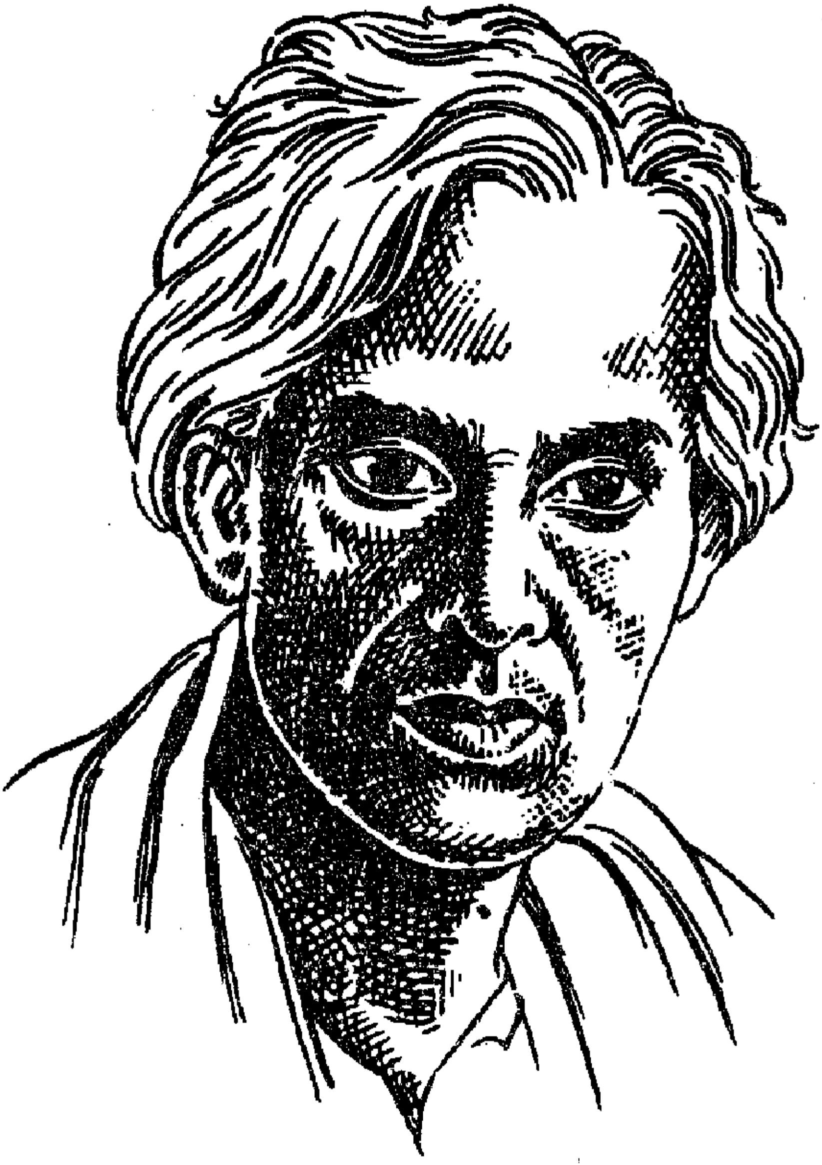

এ প্রশ্নের সে উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে ডাকিলাম, কমললতা? সাড়া আসিল না, চাহিয়া দেখিলাম সে গাড়ির এককোণে মাথা রাখিয়া চোখ বুজিয়াছে। সারাদিনের শ্রান্তিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে ভাবিয়া তুলিতে ইচ্ছা হইল না। তারপরে নিজেও যে কখন ঘুমাইয়া পড়িলাম জানি না। হঠাৎ একসময়ে কানে গেল—নতুনগোঁসাই?

চাহিয়া দেখি সে আমার গায়ে হাত দিয়া ডাকিতেছে। কহিল, ওঠ, তোমার সাঁইথিয়ায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম, পাশের কামরায় কিষণ ছিল, ডাকিয়া তুলিতে সে আসিয়া ব্যাগ নামাইল, বিছানা বাঁধিতে গিয়া দেখা গেল যে দু-একখানায় তাহার শয্যা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম সে তাহা ইতিপূর্বেই ভাঁজ করিয়া আমার বেঞ্চের একধারে রাখিয়াছে। কহিলাম, এটুকুও তুমি ফিরিয়ে দিলে?—নিলে না?

কতবার ওঠানামা করতে হবে, এ বোঝা বইবে কে?

দ্বিতীয় বস্ত্রটিও সঙ্গে আনোনি—সেও কি বোঝা? দেব দু-একটা বা'র করে?

বেশ যা হোক তুমি। তোমার কাপড় ভিখিরীর গায়ে মানাবে কেন?

বলিলাম, কাপড় মানাবে না, কিন্তু ভিখারীকেও খেতে হয়। পৌঁছিতে আরও দু'দিন লাগবে, গাড়িতে খাবে কি? যে খাবারগুলো আমার সঙ্গে আছে তাও কি ফেলে দিয়ে যাব—তুমি ছোঁবে না?

কমললতা এবার হাসিয়া বলিল, ইস্ রাগ দ্যাখো। ওগো, ছোঁব গো ছোঁব, থাক ওসব, তুমি চলে গেলে আমি পেটভরে গিলবো।

সময় শেষ হইতেছে, আমার নামিবার মুখে কহিল, একটু দাঁড়াও ত গোঁসাই; কেউ নেই, আজ লুকিয়ে তোমায় একটা প্রণাম করে নিই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া আজ সে আমার পায়ের ধূলা লইল।

প্ল্যাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইলাম। রাত্রি তখনো পোহায় নাই। নীচে ও উপরে অন্ধকার স্তরে একটা ভাগাভাগি শুরু হইয়াছে, আকাশের একপ্রান্তে কৃষ্ণ ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শীর্ণ শশী, অপর প্রান্তে উষার আগমনী। সেদিনের কথা মনে পড়িল, যেদিন ঠাকুরের ফুল তুলিতে এমনি সময়ে তাহার সাথী হইয়াছিলাম। আর আজ?

বাঁশি বাজাইয়া সবুজ আলোর লণ্ঠন নাড়িয়া গার্ডসাহেব যাত্রার সঙ্কেত করিল। কমললতা জানালা দিয়া হাত বাড়াইয়া এই প্রথম আমার হাত ধরিল, কণ্ঠে কি যে মিনতির সুর তাহা বুঝাইব কি করিয়া, বলিল, তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি—আজ একটি কথা রাখবে?

হাঁ রাখব, বলিয়া চাহিয়া রহিলাম।

বলিতে তাহার একমুহূর্ত বাধিল, তারপর কহিল, আমি জানি, আমি তোমার কত আদরের। আজ বিশ্বাস করে আমাকে তুমি তাঁর পাদপদ্মে সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও—' নির্ভয় হও। আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি মন খারাপ ক'রো না গোঁসাই, এই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। তাহার এই হাতটা হাতের মধ্যে লইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া বলিলাম, তোমাকে তাঁকেই দিলাম কমললতা, তিনিই তোমার ভার নিন। তোমার পথ, তোমার সাধনা নিরাপদ হোক—আমার ব'লে আর তোমাকে আমি অসম্মান করবো না।

হাত ছাড়িয়া দিলাম, গাড়ি দূর হইতে দূরে চলিল, গবাক্ষপথে তাহার আনত মুখের পরে স্টেশনের সারি সারি আলো কয়েকবার আসিয়া পড়িয়া আবার সমস্ত অন্ধকারে মিলাইল। শুধু মনে হইল হাত তুলিয়া সে যেন আমাকে শেষ নমস্কার জানাইল।

Pathagar.net

শুভদা

প্রথম অধ্যায়
প্রথম পরিচ্ছেদ

গঙ্গায় আগ্রীব নিমজ্জিতা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরানী চোখ কান রুদ্ধ করিয়া তিনটি ডুব দিয়া পিত্তল-কলসীতে জলপূর্ণ করিতে করিতে বলিলেন, কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

ঘাটে আরো তিন-চারিজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, তাহারা সকলেই অবাক হইয়া ঠাকুরানীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। পাড়াকুদুঁলি কৃষ্ণঠাকরুণকে সাহস করিয়া কোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করা, কিংবা কোনরূপ প্রতিবাদ করা, যাহার তাহার সাহসে কুলাইত না। বিশেষতঃ যাহারা ঘাটে ছিল তাহারা সকলেই তাঁহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা।

তাই বলচি বিন্দু, মানুষের কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে।

যে ভাগ্যবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল তাহার নাম বিন্দুবাসিনী। বিন্দু বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বৌ, সম্প্রতি বাপের বাটী আসিয়াছিল।

বিন্দু দেখিল কথাটা তাহাকেই বলা হইয়াছে, তাই সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন পিসিমা?

এই হারাণ মুখুজ্যের কথাটা মনে পড়ল। ভগবান যেন ওদের মাথায় পা দিয়া ডুবুচ্চেন।

বিন্দুবাসিনী বুঝল হারাণ মুখুজ্যেদের দুরদৃষ্টের কথা হইতেছে। সেও দুঃখিতা হইল। প্রায় একমাস হইল হারাণের পাঁচ-ছয় বৎসরের একটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছিল। সেই কথা মনে করিয়া বলিল, ভগবান কেড়ে নিলে মানুষের হাত কি? আর জন্ম-মৃত্যু কার ঘরে নেই বল!

প্রথমে কথাটার অর্থ কৃষ্ণঠাকুরাণী ভাল বুঝিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে বলিয়া উঠিলেন, আহা, মাসখানেক হ'ল ছেলে মারা গেছে বটে! সেকথা নয় বিন্দু, সেকথা নয়; মরা-বাঁচা ভগবানের হাতেই বটে, কিন্তু এটা—তুই বুঝি কিছু শুনিস নি মা?

বিন্দুবাসিনী কিছু বলিল না, কেবল তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া পুনশ্চ বলিলেন, হারাণ মুখুজ্যের কথা বুঝি কিছু শুনিস নি?

বিন্দু জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর আবার কিসের কথা?

আহা! তাই ত বলছিলাম মা, ভগবান যখন মারেন তখন এমনি করেই মারেন। কিন্তু পোড়ারমুখো মিন্‌সের জন্য ত কষ্ট হয় না, কষ্ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার কথা মনে হ'লে। হতভাগী ড্যাক্‌রার হাতে পড়ে ত একদিনের তরেও সুখী হ'ল না।

বিন্দু যেমন মুখপানে চাহিয়াছিল তেমনি রহিল, বিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু ঠাকুরানীরও এত কথা নিরর্থক বলা হয় নাই; সেজন্য তিনি মূল কথাটা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া ডালপালা ছড়াইতে ছিলেন তাহা সমাধা হইল। ঘাটে যতগুলি শ্রোতা ছিল কাহারও বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রহিল না। প্রত্যেকেই মনে করিতে লাগিল, হারাণ মুখুজ্যের এমন কি কথা হইতে পারে যাহা তাহারা জানে না, অথচ গ্রামের সকলেই জানে।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিন্দু কহিল, পিসিমা, কথাটা কি শুনতে পাইনে?

পি। কেন পাবে না মা? কিন্তু এ ত আর সুখের কথা নয়—তাই বলতে ইচ্ছে ক'রে না, যখনই মনে পড়ে তখনি যেন বুকের মাঝখানটা টনটন করে ওঠে। আহা, ভগবান অমন মেয়ের কপালেও এত কষ্ট লিখেছিলেন!

বি। কিসের কষ্ট?

পি। কষ্ট কি এক রকমের? কত রকমের কত কষ্ট কত যাতনা তা তোদের কি আর বলব?

বি। তবু শুনিই না পিসিমা?

পি। না এখন থাক। কিছুই চাপা থাকবে না, সকলেই শুনতে পাবে—পেয়েচেও। কিছু আগে আর কিছু পরে—তোরাও সবাই শুনতে পাবি।

বি। তুমিই বল না!

পি। না না, আর বলব না। পরের কথাতে আর থাকব না মনে করেচি।

বিন্দু হাসিয়া বলিল, পিসিমা, আমরা কি তোমার পর? আমি জানি তুমি আমাকে বলবেই।

পি। বিন্দু গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে কি তবে মিথ্যা কথা বলব?

বি। কিসের মিথ্যে কথা? মিথ্যা কথা কি তোমাকে বলতে বলেচি?

পি। তবে কেমন করে বলা হয়? এই যে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে বললাম, পরের কথায় আর থাকব না।

কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী চলিয়া গেলে সকলেই মুখপানে চাহিয়া রহিল। কেহ কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, বিশেষ ঠাকুরানীকে এ পর্যন্ত কেহ কখনো কথা বলিতে গিয়া চাপিয়া যাইতে দেখে নাই। স্নান সমাপ্ত হইলে সকলেই আপন আপন বাটীতে প্রস্থান করিল। বিন্দু বাটীতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া মাতার নিকট আসিয়া বসিল।

তিনি বলিলেন, বিন্দু, এতক্ষণ ধরে কি জলে পড়ে থাকে মা, অসুখ হ'লে কি হবে বল দেখি?

বি। কি আর হবে,—দু'দিন ভুগব।

বিন্দুর মাতা হাসিয়া বলিলেন, সোজা কথা, এর জন্যে আর ভাবনা কি!

বিন্দু বলিল, মা, হারাণ মুখুজ্যেদের আবার কি হয়েছে?

মা। কি আবার হবে?

বি। আজ ঘাটে কৃষ্ণপিসিমার কথার ভাবে বোধ হয় তাদের নূতন কিছু একটা ঘটেচে। তুমি কিছু শোননি?

মা। কিছুই না। কি বললে?

বি। বললে যে হারাণ মুখুজ্যেদের ভগবান মাথায় পা দিয়ে ডুবুচ্চেন, কিন্তু পোড়ামুখো মিন্‌সের জন্যে ত কষ্ট হয় না—কষ্ট হয় সোনার প্রতিমে বৌটার জন্যে। এইটুকু বলে, আর কিছু বললে না। বলে, পরের কথায় আর থাকব না।

মা। ঠাকুরুনের এতদিনের পর ধর্মজ্ঞান জন্মেচে!

বি। মা সত্যি তুমি কিছু জান না?

মা। কিছু না।

বি। তবে আজ আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতে যাব।

মা। কেন? কি দুর্ঘটনা ঘটেচে জানবার জন্যে?

বি। হ্যাঁ—

মা। তুই কি পাগল হয়েছিস? যে কথায় উনি থাকতে চাইলেন না, সেকথাটা তুই জিজ্ঞাসা করতে যাবি?

বি। উনি কে?

বিন্দুর মা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, এই কৃষ্ণঠাকরুন।

বি। কৃষ্ণঠাকরুন কি আদর্শ, যে উনি যা না করবেন তা আর কাউকে করতে নেই?

মা। এসব বিষয়ে তা একরকম আদর্শ বৈ কি।

বি। তা হোক, আমি যাব।

মা। পরের কথায় না হয় নাই থাকলে?

বি। আচ্ছা মা, একজন যদি ডুবতে থাকে, 'পরের কথায় কাজ নেই' বলে তাকে আর তুলতে নেই?

মা। তুই ত আর তুলতে যাচ্ছিসনে বিন্দু?

বি। কে ডুবচে জানলে যাব বৈ কি!

বিন্দুর জননী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, বিন্দু, তোমার ওদের বাড়ি গিয়ে কাজ নেই। হারাণ মুখুজ্যে লোক ভাল নয়, তোমার বাপের সঙ্গে ওর শত্রুতা আছে ; তোমার কি ওদের বাড়ি যাওয়া ভাল দেখায়?

বি। হারাণ মুখুজ্যে লোক ভাল নয় তা আমি জানি, কিন্তু আমি ত আর তার কাছে যাচ্চিনে। তার স্ত্রীর কাছে যেতে দোষ কি? বেশ বুঝতে পাচ্চি ওদের কিছু একটা হয়েছে ; আমরা পাড়া-প্রতিবেশী হয়ে যদি এসময় চোখ বুজে থাকি তা হ'লে শ্বশুরবাড়িতে আমার আর কেউ মুখ দেখবে না।

মা। অঘোরনাথ কি তোকে পাড়ায় পাড়ায় কার কি হ'ল না হ'ল দেখে বেড়াতে বলেচে যে, তুই ওদের বাড়ির সন্ধান না নিলে উনি আর তোর মুখ দেখবেন না? আর আমি তোর মা হয়ে বারণ কচ্চি সেটা কি শোনবার যোগ্য নয়?

বি। মা, আমাকে যেতেই হবে!

মা। গিয়ে কি শুনবে? হারাণ মুখুজ্যের কি হয়েচে তা বাড়ির কেউ জানে না।

বি। তুমি কি করে জানলে?

মা। তোমার বাপের কাছে শুনেছি।

বি। তবে কি হয়েছে বল।

মা। নন্দীদের তহবিল ভেঙ্গেচে বলে তারা হাজতে দিয়েছে।

বি। নন্দীরা কারা?

মা। বামুনপাড়ার জমিদার। তাদের কাছারিতে হারাণ মুখুজ্যে চাকরি করত।

বি। কত টাকা চুরি করেছে?

মা। প্রায় দু শ' টাকা।

বি। কেউ জামিন হয়নি?

মা। কে আর হবে বল? গাঁয়ে তোমার বাবাকেই সকলে জানে এবং তিনিই কেবল জামিন হতে পারেন কিন্তু তাঁকে ত সে পোড়া মিন্‌সে শত্রু করে রেখেচে। এঁকে একবার জামিন হতে বলেছিল, কিন্তু স্বীকার হননি।

বিন্দু অনেকক্ষণ মৌন হইয়া কি চিন্তা করিল, পরে বলিল, দুপুরবেলা একবার ওদের বাড়ি যাব। এসে পর্যন্ত বউকে একদিনও দেখিনি।

বিন্দুর মাতা বিস্মিত হইলেন এবং কুপিত হইয়া বলিলেন, এত কথা শুনেও যাবি?

বিন্দু যেরূপ সহজ ও স্বাভাবিকভাবে ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' বলিল, তাহাতে গৃহিণীর আর কথা কহা হইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিন্দু পুনরায় কহিল, আমি ওদের বাড়ি গেলে কারও কোন ক্ষতি নাই। আমি এই বলি মা, পুরুষমানুষদের ঝগড়া মেয়েমহল পর্যন্ত না পৌঁছুলেই ভাল।

বেলা হইতেছে দেখিয়া গৃহিণী উঠিয়া গেলেন ; যাইবার সময় বলিলেন, ইনি শুনলে বড় রাগ করবেন।

বি। যাতে না শুনতে পান এমনি করে যাব।

মা। নিশ্চয় শুনতে পাবেন।

বি। তুমি শোনালেই পাবেন।

মা। কিন্তু, শুনলে বড় রাগ করবেন।

বিন্দু অন্যমনস্কভাবে কহিল, বাপ-মা সন্তানের উপর রাগ করেন, আবার ভুলে যান, সেজন্য তুমি ভেব না মা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
মুখোপাধ্যায় পরিবার

এ স্থানটার নাম হলুদপুর। গ্রামটি যে জেলায় তাহা আর বলিয়া কাহাকেও ক্লেশ দিতে চাহি

না, কারণ এস্থানে কাহাকেও কখনও যাইতে হইবে না। এখানে দেখিবারও কিছু নাই, শুনিবারও কিছু নাই, তবে যদি নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া থাকেন ত আমার বিবরণ পড়িয়া যতটা পারেন উপলব্ধি করিয়া লউন।

শুনিয়াছি এ গ্রামে পূর্বে অনেক ধনবান ব্যক্তির নিবাস ছিল এবং তাহা সম্ভবও কারণ একে ত ইহা গঙ্গার উপরে স্থাপিত, তাহার উপর বহুকালের দুই-চারিটা জীর্ণ ভগ্ন শিবমন্দির, বেতবন ও শ্যাকুল ঝোপের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িতভাবে মৌনব্রতধারী যোগী মূর্তির মত বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই-একটা ঘাটবাঁধা পুষ্করিণীর মধ্যে গরুবাছুর চরিয়া বেড়াইতেছে তাহাও চোখে পড়ে। এই সকল দেখিয়া গ্রামের চিরদিন যে এমনি অবস্থায় কাটে নাই তাহা অনুমান হয়, কিন্তু এখন কেবল দশ-বিশ ঘর ব্রাহ্মণ-কায়স্থের বাটী, আর পঞ্চাশ-যাট ঘর চাষাভূষার কুটীর আর জঙ্গল আর জঙ্গল, এবং তাহারই মধ্যে দিয়া কদাচিৎ দুই-এক ব্যক্তির যাতায়াতের পায়ে-হাঁটা পথ।

এই গ্রামেই শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী। বাটীটি দ্বিতল—পুরাতন ইষ্টক-নির্মিত। উপর তলায় দুটি এবং নিম্নে চারি-পাঁচটি ঘর। চতুর্দিকে একরাশ বাঁশঝাড়, দুই-চারিটা কদলীবৃক্ষের ঝাড়, গোটা-দুই বেলগাছ, গোটা-দুই আমগাছ—একটা কতবেল গাছ—ইহাই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাস্তুভিটা ও পার্থিব সম্পত্তি।

হলুদপুরের অর্ধক্রোশ দূরে বামুনপাড়ার জমিদার নন্দীদের জমিদার-সরকারে মুখুজ্যে-মহাশয় চাকুরি করিতেন। কুড়িটি টাকা মাহিনা পাইতেন, কিন্তু ইহাতেই তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিত, এখন কিন্তু আর তাহাতে কুলায় না—সর্বদা অনটন, সর্বদা অভাব।

বাটীতে তাঁহার পোষ্যবর্গও অনেকগুলি ; স্ত্রী, দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা, এক বিধবা বড় ভগিনী অর্থাৎ বাঙ্গালীর ঘরে সচরাচর যাহা থাকে তাঁহারও ছিল। যখন তিনি মাসে কুড়িটি মুদ্রা স্ত্রীর হাতে দিতেন, তখন তাঁহার সংসারে আজকালকার মত নিত্য দৈন্য নিত্য অভাব কেহই টের পায় নাই। স্ত্রী এবং বড়ভগিনী উভয়ে মিলিয়া সুশৃঙ্খলায় সংসার চালাইয়া যাইতেন, এখন তাহা করেনও না, সংসারের নিত্য অনটনও কিছুতেই ঘুচে না। আজ চাউল নাই, আজ দাইল নাই, আজ কাষ্ঠ অভাবে রন্ধন হইতেছে না, নিত্য এ-নাই, ও-নাই, তা নাই-এ পড়িয়া মুখুজ্যে মহাশয় অসৎ উপায় উদ্ভাবন করিলেন অর্থাৎ সরকারি তহবিলের কিছু অংশ আপনার ব্যয়ে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিশ্বাসী হারাণবাবুকে প্রথমে কেহ সন্দেহ পর্যন্ত করিল না, কিন্তু এ উপায় অধিক দিন চলে না ; ক্রমশঃ জমিদারের সন্দেহ হইতে লাগিল ; সন্দেহ যখন গাঢ়তর হইয়া উঠিল তখন তিনি একদিন সমস্ত খাতাপত্র দেখিতে চাহিলেন ; খাতায় অনেক ভুল, অনেক গোলমাল প্রকাশ পাইল ও সঙ্গে সঙ্গে চুরিও ধরা পড়িল। হারাণবাবু এযাবৎ বহু অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন ; জমিদার শ্রীভগবান নন্দী দয়ালু এবং ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি হারাণবাবুকে ডাকিয়া বলিলেন, কত টাকা চুরি করিয়াছ?

তাহা জানি না।

জানি না? খাতাপত্র দেখিয়া বোধ হয় তিন হাজারের উপরও চুরি করিয়াছ—এত টাকা কি করিলে?

খরচ করিয়াছি।

খরচ ত করিয়াছ, কিন্তু চুরি করিলে কেন?

কুড়ি টাকায় আমার চলে না, কাজেই চুরি করিতে হয়।

কুড়ি টাকায় তোমার এতদিন চলিয়াছে, এখন না চলিবার কোন কারণ আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না ; যা হোক, তাই বা আমাকে বল নাই কেন যে, তোমার কুড়ি টাকায় সংসার চলে না।

বলিলে কি আমাকে বেশি টাকা দিতেন?

হয়ত দিতাম, কিন্তু সেকথা যাউক ; যা লইয়াছ তাহার অর্ধেক আমাকে ফিরাইয়া দিলে

তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি।

কেমন করিয়া দিব, আমার কিছুই নাই।

তোমার কোন জমিজিরাত থাকে ত বিক্রয় করিয়া দাও।

জমিজিরাতের মধ্যে আমার একমাত্র ভদ্রাসন আছে, তাহাই বিক্রয় করে লউন।

তোমার স্ত্রী-পুত্র থাকিবে কোথায়?

গাছতলায়।

ভগবানবাবু অনেকক্ষণ ধরিয়া হারাণ মুখুজ্যের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, তোমার চক্ষু অত রাঙা কেন?

কেমন করিয়া জানিব?

তখন হারাণ মুখুজ্যেকে বিদায় দিয়া অন্য একজন আমলাকে ডাকিয়া বলিলেন, হারাণ মুখুজ্যের বাটীর সংবাদ লইতে পার?

কি সংবাদ লইব?

এইরকম যে ওদের সাংসারিক অবস্থা কেমন, কেমন সম্পত্তি আছে, কোনরূপ দেনাকর্জ আছে কি না—এই সব।

এই লোকটি হারাণবাবুর অনেক কথা জানিত। সে বলিল, আমি যতদূর জানি, মুখুজ্যেমশায়ের সংসারের অবস্থা ভাল নহে, সম্পত্তিও বোধ হয় কিছুই নাই—তবে দেনাকর্জ আছে কি না বলিতে পারি না।

ভাল করিয়া সংবাদ লইয়া আমাকে জানাইও।

দুইদিন পরে সে বাবুকে জানাইল যে, সাংসারিক অবস্থা যতদূর মন্দ হওয়া সম্ভব মুখুজ্যেমশায়ের তাহা হইয়াছে, অন্যান্য সংবাদ পূর্বে যাহা বিদিত করিয়াছিল, সমস্তই সত্য।

ভগবানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, মুখুজ্যে কোনরূপ নেশাটেশা করে কি?

আজ্ঞা হাঁ, গাঁজা খান।

তাই সেদিন চোখ অত রক্তবর্ণ দেখিয়াছিলাম ; আনুষঙ্গিক আর কোন দোষ আছে কি?

আমলা নতমুখে বলিল, শুনতে পাই আছে।

তবে এক কাজ কর—কাল কোর্টে গিয়া চুরির অপরাধে মুখুজ্যের নামে নালিশ করিয়া দিও—পুলিসকেও সংবাদ পাঠাইয়া দাও।

পরিশেষে ফল এই দাঁড়াইল যে, মুখুজ্যে মহাশয়কে পুলিসের হস্তে গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে যাইতে হইল।

নিকট হইলেও হলুদপুরে একথা প্রায় কেহই জানিতে পারিল না ; তবে বিন্দুর পিতা ভবতারণ গাঙ্গুলী একথা জানিলেন ; বোধ হয় নন্দীরাই তাঁহাকে এ ঘটনা জানাইয়াছিল। তিনি সম্ভ্রান্ত ও বর্ধিষ্ণু লোক, ইচ্ছা করিলে হারাণ মুখুজ্যেকে অনায়াসে হাজতমুক্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু কিছুই করিলেন না। সহায়-সম্বলহীন মুখুজ্যে মহাশয় হাজত গৃহেই পচিতে লাগিলেন। আর এক কথা—কলহপ্রিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী এ ঘটনা যে কেমন করিয়া শুনিয়াছিলেন, তাহা শুধু তিনিই বলিতে পারেন।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর কালমেঘে আচ্ছন্ন হইয়া ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। এইসময় হারাণবাবুর বাটীর রন্ধনশালার বারান্দায় তাঁহার স্ত্রী ও বড়কন্যা ললনা মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছে। দুজনেরই মুখ শুষ্ক, আজ একাদশী—ললনা বালবিধবা ; আর তাহার জননী—তিনিও এখন পর্যন্ত কিছুই আহার করেন নাই।

ললনা বলিল, মা, আজো বোধ হয় বাবা আসবেন না। মেঘ করে আসছে যদি জল হয় তাহলে রান্নাঘরে দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না ; তুমি কেন একটু কিছু খেয়ে নাও না।

ললনার জননী বলিল, আরও একটু দেখি, তিনদিন আসেন নি—আজ যদি আসেন।

মা, বাবা এমনতর ত কখন করেন নি ; তিনদিন আসেন নি—আজ যদি না আসেন?

কি করব বল, ভগবান আছেন!

একাদশীর দিন রাসমণি (হারাণবাবুর বড় ভগিনী) বেলা করিয়া স্নান পূজা করিতেন; এখন নিত্যকর্ম সমাপ্ত করিয়া মালা ফিরাইতে ফিরাইতে নিকটে আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, বৌ, এখন পর্যন্ত খাসনি?

বৌ বিমর্ষভাবে কহিল, আরও একটু দেখচি।

আমার পিণ্ডি—আরও একটু দেখে কি হবে? ড্যাক্‌রা আজ এত বেলায় কি আর আসবে? দেখগে যা—গাঁজা খেয়ে ভোঁ হয়ে কোন মাগীর বাড়ি পড়ে আছে। উপবাস করিলে রাসমণির মেজাজটা একটু খিটখিটে রকমের হইয়া পড়িত ; কেহ কোন কথা কহিল না দেখিয়া আরো একটু কুপিত হইয়া বলিলেন, মুখপোড়া কবে মরবে যে আমাদের হাড় জুড়োবে।

এবার ললনার আর সহিল না। দুঃখিতভাবে বলিল, পিসিমা, একাদশীর দিন গাল দিচ্ছ কেন?

একাদশীর দিন গাল দিচ্ছ কেন? কথাটা রাসমণির ভিতরে গিয়া পৌঁছিল। অন্তরে ব্যথা পাইলেন এবং রীতিমত লজ্জিত হইলেন ; কিন্তু ছোট ললনা যে একথা বলিয়াছে ইহাতেই দ্বিগুণ জ্বলিয়া গেলেন। তুই সেদিনকার মেয়ে, বুড়োমাগীকে একাদশী-দ্বাদশী শেখাতে আসিস নে। তোরই বাপ হয়, আমার কি কেউ হয় না? বলিতে বলিতে রাসমণির নয়ন আর্দ্র হইয়া আসিল—বাছা আমার তিনদিন বাড়ি আসেনি—বুকের ভিতর যে কি কচ্চে তা ইষ্টিদেবতাই জানতে পাচ্চেন। অঞ্চল দিয়া একফোঁটা অশ্রু মুছিয়া, আমি বুড়োমানুষ, যদি একটি কথা বলি তাহলে তোরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে তার ভুল দেখিয়ে পাঁচটা কথা শুনিয়ে দিস।—কাজ নেই মা, আমি তোদের কোন কথায় আর থাকব না। তবে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে বৌটা মরে যায়, তাই দুকথা বলতে হয়।

ললনা অতিশয় দুঃখিত হইল। তাহার একটা কথায় এত গভীর অর্থ এবং আনুষঙ্গিক ক্রন্দনাদির কারণ ঘটিতে পারে সে নিজেই জানিত না।—পিসিমা আমার ঘাট হয়েচে, এমন কথা আমি আর বলব না। বাস্তবিক কথাটা তাহার ভাল হয় নাই। তাহার জননীও বলিলেন, মা, বড় হয়েছ, সব কথা বুঝে বলতে পার না?

তাহার পর সকলের পীড়াপীড়িতে ললনার জননী কিঞ্চিৎ আহার করিলে, বিন্দুবাসিনী আপনার পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া হারাণবাবুর বাটীতে প্রবেশ করিল।

সম্মুখেই রাসমণি দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি দেখিতে পাইয়া বলিলেন, বিন্দু এদিকে আর আসে না।

বিন্দু অপ্রতিভ হইবার লোক নহে ; সেও সহাস্যে বলিল, তুমিই কোন্ আমাদের ওদিকে যাও দিদি?

যাবার কি আর জো আছে বোন, ছোটছেলেটার ব্যারাম নিয়ে এক-পাও কোথাও নড়বার সাধ্যি নেই।

কি হয়েছে তার?

জ্বর, পিলে, পেটের অসুখ—কিছুই আর বাকি নেই।

বৌ কোথায়?

এই এতক্ষণে মুখে দুটো ভাত দিয়ে ওঘরে ছেলেটার কাছে গিয়ে বসেচে।

এত বেলা হ'ল কেন?

হারাণের পথ চেয়ে, সে ত তিনদিন থেকে আর বাড়ি আসেনি। যদি আসে, আরো একটু দেখি—এই রকম করে এতটা বেলা হয়ে গেল।

বিন্দু সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া যে ঘরে বৌ তাহার পীড়িত কনিষ্ঠ পুত্র মাধবের শিয়রে বসিয়া তাহাকে গল্প শুনাইতেছিল সেইখানে প্রবেশ করিল। মাধব হারাণ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র, সে আজ একবৎসর হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর প্লীহায় পীড়িত,

শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে। পীড়া তাহার এমন কিছু কঠিন নহে ; রীতিমত চিকিৎসা হইতে পাইলে এতদিন আরোগ্য হইয়া যাইত, কিন্তু অর্থাভাবে কিছুতেই সুচিকিৎসা হইতে পাইতেছে না। সামান্য টোটকা ঔষধ, পাঁচন ও কুইনাইনের উপর ভর করিয়া সে কিছুতেই উঠিয়া বসিতে পারিতেছে না। শান্ত স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষু দুটি জননীর মুখের পানে নিক্ষেপ করিয়া সে বলিল, মা, বাবা আজ তিন-চারদিন আমাকে দেখতে আসেন নি কেন?

তিনি এখানে নেই।

কোথায় গিয়েচেন মা?

জননী অল্প ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, তোমার ওষুধ আনতে গেছেন।

বালক প্রফুল্ল হইয়া বলিল, মিষ্টি ওষুধ যেন আনেন, তেতো ওষুধ আমি আর খেতে পারিনে। দেখ মা, ভাল হয়ে আমার আগেকার মত আবার বেড়িয়ে বেড়াতে ইচ্ছে করে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আগ্রহে আবার বলিয়া উঠিল, মা, আমি ভাল হব ত?

জননীর চক্ষে জল আসিতেছিল ; তিনি মনে মনে বলিতেছিলেন, জগদীশ্বরের মনে কি আছে তিনিই জানেন, প্রকাশ্যে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বিন্দু তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া কহিল—কেন ভাল হবে না বাবা? আমি কাছে থেকে তোমাকে সারিয়ে দোব।

মাধব কিংবা তাহার জননী কেহই এ পর্যন্ত বিন্দুর আগমন লক্ষ্য করেন নাই, সহসা দুজনেই চমকাইয়া উঠিলেন।

বিন্দু শয্যায় উপবেশন করিয়া বলিল, শুভদা, খেয়েচিস ত?

হারাণবাবুর স্ত্রীর নাম শুভদা ; বিন্দু তাহা অপেক্ষা কিছু ছোট হইলেও সম্মুখে নাম ধরিয়াই ডাকিত। শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তোর বড়মেয়ে কোথা?

বোধ হয় ওপরে আছে।

তবে একবার ডাক, বলিয়া নিজেই ডাকিল, ললনা—ও ললনা!

ললনা উপর হইতে বলিল, কেন?

একবার নেমে আয় ত মা!

ললনা আসিলে তাহার হাতে কন্যাকে দিয়া বলিল, প্রমীলাকে নিয়ে একবার ছোটভাইটির কাছে বস ত মা, অনেকদিন পরে দেখা হ'ল ; তোর মার সঙ্গে ওঘর থেকে দুটো কথা কয়ে আসি।

প্রমীলাকে ললনার হাতে দিয়া শুভদার হাত ধরিয়া বিন্দু একেবারে উপরে আসিয়া বসিল। ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল, বৌ, হারাণদাদা আজ ক'দিন বাড়ি আসেন নি?

তিন দিন।

কেন আসেন নি কিছু জানিস কি?

না, কিছু না।

বিন্দুবাসিনীর কথার ভাবে তাহার ভয় করিতেছিল, পাছে সে কিছু একটা বলিয়া ফেলে। বিন্দুবাসিনী মৌন রহিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, শুভদাও ততক্ষণ ক্রমাগত ঘামিতে লাগিল। অনেকক্ষণের পর বিন্দু বলিল, শুভদা, ইচ্ছে থাকলেও এমন অনেক কথা আছে যা মিষ্টি করে বলা যায় না—জানিস ত?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, জানি—কেন?

হারাণদাদা আজ তিন-চারদিন বাড়ি আসেন নি ;—মনে কর্ যদি তাঁর সম্বন্ধেই কোন অশুভ কথা বলতে হয়।

শুভদার সমস্ত শরীর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ ছুটিয়া গেল ;—তিনি বুঝি বেঁচে নেই?

ও কি, কাঁপচিস কেন? কে বললে তিনি বেঁচে নেই?

বেঁচে আছেন?

বালাই, বেঁচে কেন থাকবেন না? বেঁচে আছেন, সুস্থ শরীরে আছেন।

সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে শুনিতে পাইল, তথাপি শুভদা কথা কহিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে ম্লানমুখে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি?

সেই কথাই বলতে এসেছি, কিন্তু তুই অমন করলে কেমন করে বলি?

শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অমন আর করব না। কি হয়েচে, বল।

চুরি করেছেন বলে নন্দীরা হাজতে দিয়েছে।

হাজতে দিয়েচে? শুভদার সমস্ত মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল,—তবে কি হবে?

বিন্দুবাসিনী স্বাভাবিকস্বরে বলিল, কি আর হবে? খালাস করে আনতে হবে।

তা কি হয়?

হয় না ত কি হাজতে গেলেই লোকে জেলে যায়?

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শুভদা বলিল, বিন্দু, তোমার বাপের কাছে একবার যাব।

বিন্দু ঘাড় নাড়িল। সে জানিত শুভদার মুখ দেখিলে পাষাণ গলিবে, কিন্তু ভবতারণ গাঙ্গুলী গলিবে না। তাই অমত করিয়া বলিল, গিয়ে কি হবে?

আমাদের কেউ নেই ; তিনি যদি দয়া করে কোন উপায় করে দেন।

যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন ; হারাণদাদাতে বাবাতে চিরকাল শত্রুতা, তাই বাবার কাছে গেলে কোন ফল হবে না।

তবে উপায়?

উপায় আমি করে দোব। নাহলে কি শুধু এই খবরটাই দিতে এসেছি? কিন্তু আমি যা বলব তা করতে পারবে?

পারব।

যতই শক্ত হোক?

শুভদা দৃঢ়স্বরে বলিল, হাঁ।

তবে শোন, দু শ না তিন শ টাকা চুরি করেচেন বলে নন্দীরা তাঁর নামে নালিশ করেছে।

দু শ-তিন শ টাকা! শুভদার ভ্রম হইল, এত টাকা কি একসঙ্গে মানুষে চুরি করিতে পারে? আর চুরি করিলেই বা রাখিবে কোথায়?

এত টাকা, বিন্দু, তিনি কখন চুরি করেন নি।

না করে থাকেন ভালই, কিন্তু সেকথায় আমাদের কাজ নেই। এই টাকাটা নন্দীদের দিয়ে খুব অনুনয়-বিনয় করলে বোধ হয় ছেড়ে দিতে পারে।

কিন্তু তা কেমন করে হবে? এত টাকা আমি পাব কোথা?

সেকথা আমি বলচি। বৌ, এখন লজ্জার সময় নয় ; তুমি আমার এই বালা দু গাছা নিয়ে আজ রাত্রে নিজেই ভগবানবাবুর কাছে যাও ; তার পর যা ভাল বোঝ করো।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, তোমার বালা দু গাছা?

হাঁ, আমার বালা দু গাছা। এর দাম তিন শ চার শ টাকা হবে ; এই দিয়ে সাধ্যিসাধনা করলে দয়া করে ছেড়ে দিতেও পারেন।

কিন্তু বিন্দু—

কিন্তু আবার কি? আগে স্বামীকে বাঁচাও, তারপর কিন্তু করো। এখন কি সঙ্কোচ করবার সময় বৌ? আর টাকা শোধ দেবারই বা ভাবনা কি, তোর ছেলে বড় হয়ে শোধ দেবে।

আজই যাব?

হাঁ—আজই।

কার সঙ্গে যাব?

তেমন কেউ বিশ্বাসী লোক আছে কি?

কেউ না।

তবে একলাই যাও। বরং একলা যাওয়াই ভাল ; কেননা পাঁচজনে শুনলে পাঁচটা কথা বলতে পারে।

তবে আজ যাই।

হাঁ—আজই যাও। সন্ধ্যার পর একটা ময়লা কাপড় পরে মুখ ঢেকে যেও। কাল এমনি সময় আর একবার আসব।

যাইবার সময় শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিন্দু সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, ঈশ্বর করুন, সব যেন মঙ্গল হয়। তা নাহলে অন্য উপায়ও আছে—তুই কিছু ভাবিস নে।

তাহার পর অঞ্চল খুলিয়া পাঁচটি টাকা বাহির করিয়া শুভদার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, বৌ, আমি তোর মার পেটের বোন। আমাকে কোন লজ্জা নেই, আপাতক এই টাকা নে—ছেলেটাকে কিছু কিনে দিস।

নীচে আসিয়া বিন্দু কন্যা প্রমীলার হাত ধরিয়া বলিল, বেলা গেল—চল মা, বাড়ি যাই। তাহার পর বিধবা ললনার উপর একটি সস্নেহ করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ভগবানবাবুর দয়া

তখন দ্বিপ্রহরের সময় যেসব মেঘ বাতাসের দৌরাত্মে ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল, তাহারা সন্ধ্যার পরেই একটির পর একটি করিয়া মহাসমারোহে বাজনা-বাদ্য বাজাইয়া আবার আকাশের গায়ে জোট বাঁধিতে লাগিল। সকলেই স্থির করিল আজ রাত্রে বৃষ্টি না হইয়া যায় না। গরম কমিবে—প্রাণ বাঁচিবে। এ বৃষ্টি সকলের মঙ্গলের জন্য, শুধু শুভদা মনে করিল তাহারই কপালদোষে আজ এই দুর্যোগের সূত্রপাত হইয়া আসিল। একে ত হলুদপুরের পথঘাট বনজঙ্গলের মধ্য দিয়া, তাহাতে আবার গাঢ় মেঘ করিয়াছে, তথাপি শুভদা বালা দু গাছি অঞ্চলে বাঁধিয়া, কাপড়খানি বেশ করিয়া গুছাইয়া পরিয়া একটা বিছানার চাদরে সমস্ত অঙ্গ বেশ করিয়া আবৃত করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সে পূর্বে আর কখন বামুনপাড়ায় যায় নাই, শুধু শুনিয়াছিল মাত্র যে, উত্তরমুখ ধরিয়া চলিলে আধক্রোশ দূরে পাকারাস্তা পাওয়া যায় এবং আর একটু অগ্রসর হইলেই বামুনপাড়া। সেখানে পৌঁছুতে পারিলে জমিদারবাড়ি চিনিয়া লইতে বিলম্ব হইবে না। কারণ নন্দীদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় সে শুনিয়াছিল। হলুদপুরের অন্ধকার পথ ছাড়াইয়া পাকারাস্তা পাওয়াই তাহার বিপদের কথা হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া একফোঁটা দুইফোঁটা জল পড়িতে লাগিল ; একফোঁটা দুইফোঁটা পরিশেষে মুষলধারায় পরিণত হইল দেখিয়া শুভদা বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

পথ চলা আর অসম্ভব ; অন্ধকারে একহস্ত দূরের পদার্থও আর দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। প্রবল বৃষ্টি ও তৎসঙ্গে বিদ্যুৎ ও বজ্রের শব্দে শুভদার ভিতর পর্যন্ত কাঁপিতে লাগিল। সে দেখিল, চতুর্দিক হইতে বন্য জীবজন্তু ছুটিয়া আসিয়া সেই বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে আসিতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ মনুষ্যমূর্তি দেখিয়া সভয়ে চীৎকার ছাড়িয়া পলাইয়া যাইতেছে। শুভদার সহসা মনে হইল, যদি চোর ডাকাইত কেহ আশ্রয় লইতে এইখানেই আসিয়া পড়ে? তাহা হইলে? তাহার প্রাণের ভয় হইল না, কিন্তু তদপেক্ষা মূল্যবান বালা দু গাছির জন্য ভয় হইল। স্বামীর নিষ্কৃতির কারণ, নিজের আশা-ভরসা সমস্তই এই বালা দু গাছি। সন্ত্রাসে শুভদা বৃক্ষতল ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সমস্ত শরীর কর্দমসিক্ত হইয়াছে, গাছ-পালার আঁচড়ে ও কণ্টকে সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তথাপি শুভদা পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। এক নিমিষের তরে বৃষ্টির উপশম নাই। এক মুহূর্তের জন্য মেঘের শব্দের বিশ্রাম নাই, কোন্ মুখে কোথায় চলিয়াছে তাহারও স্থিরতা নাই, তথাপি বনবাদাড় সরাইতে সরাইতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে বোধ হইল

যেন অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত পথ সম্মুখে দেখা যাইতেছে। দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁটিয়া আসিয়া শুভদা দেখিল যথার্থই পাকা পথ পাইয়াছে। এখন কিন্তু অন্য কথা। যখন পথ পায় নাই তখন কেবল পথের ভাবনাই ভাবিয়াছিল, এখন কাজের কথা মনে হইতে লাগিল। এত রাত্রে কি করিয়া দেখা হইবে দেখা হইলেই কি কার্যসিদ্ধি হইবে? সিদ্ধ হউক আর না হউক, দুর্যোগে বাটীই বা কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবে? ক্রমে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিল ; কিছুদূর আসিয়াই প্রকাণ্ড অট্টালিকা ও চতুর্দিক-সংলগ্ন রেলিং দেওয়া বাগান দেখিয়া বুঝিতে পারিল ইহাই নন্দীদের বাটী ; কিন্তু কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে? আর প্রবেশ করিলেই বা তাঁহার সহিত এত রাত্রে কি করিয়া সাক্ষাৎ করিবে! শুভদার কান্না আসিল ; এখন কি হইবে? কি করিয়া বাড়ি যাইবে? পরিশ্রমে, অনাহারে, দুর্ভাবনায় সে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল, নন্দীদের বাটীর সম্মুখে যে শিবমন্দির ছিল তাহারই বারান্দার উপর আসিয়া একেবারে শুইয়া পড়িল। তখন বৃষ্টি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই, তবে কমিয়া আসিয়াছিল। বৈশাখের মেঘ যেমন একমুহূর্তে গগন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তেমনিই একমুহূর্তে গগন ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া যায়। এ মেঘও দেখিতে দেখিতে আকাশের প্রান্তদেশে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, আবার চাঁদের আলোকে জগৎ অনেক শুভ্রশ্রী ধারণ করিল। শুভদা মনে করিল এইবার ফিরিয়া যাইবার সময় হইয়াছে। সিক্তবস্ত্র একটু গুছাইয়া লইবার সময় দেখিতে পাইল একজন বৃদ্ধ ভৃত্য হস্তে প্রদীপ লইয়া জমিদারবাটীর ফটক খুলিয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহার নিকট যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায় এইরূপ একটা ক্ষীণ আশায় ভর করিয়া শুভদা প্রস্থান না করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। বৃদ্ধ মন্দিরের দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দেখিল একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ; কিন্তু কোন কথা না কহিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বহুক্ষণ পরে বাহিরে আসিয়া দেখিল স্ত্রীলোকটি এখনও সেইভাবে দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ প্রথমে অবগুণ্ঠন দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল, কোন ভদ্রঘরের স্ত্রী জলের ভয়ে এখানে আশ্রয় লইয়াছিল, এইবার চলিয়া যাইবে, কিন্তু এখনো সেইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে গা?

স্ত্রীলোকটি কোন কথা কহিল না।

কোথায় যাবে বাছা?

শুভদার কথা বলিতে লজ্জা করিতেছিল ; কিন্তু এখন মৃদুকণ্ঠে কহিল, জমিদারবাবুদের বাড়িতে।

জমিদারদের বাড়ি ত এই সামনেই ; তবে সেখানে না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

শুভদা কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারদের বাড়িতে কার কাছে যাবে?

বাবুর কাছে।

কোন্ বাবুর কাছে?

ভগবানবাবুর কাছে।

বৃদ্ধ বিস্মিত হইয়া বলিল, ভগবানবাবুর কাছে?

হাঁ।

তবে আমার সঙ্গে এস। বৃদ্ধ অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। শুভদা জ্যোৎস্নালোকে বৃদ্ধের পলিতকেশ সৌম্যমূর্তি দেখিয়া অসঙ্কোচে পশ্চাতে চলিতে লাগিল। ক্রমে ফটক পার হইয়া, বাগান পার হইয়া, একটা কক্ষের দ্বার খুলিয়া বৃদ্ধ ডাকিল, এই ঘরে এস।

শুভদা কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল চমৎকার সুসজ্জিত কক্ষ, সমস্ত মেঝের উপর মূল্যবান কার্পেট বিছানো ; সম্মুখে মসলন্দ পাতা, তাকিয়া দেওয়া বসিবার স্থান। বৃদ্ধ তাহার উপর উপবেশন করিয়া শুভদার আপাদমস্তক দীপালোকে, অবগুণ্ঠনের ঈষৎ ফাঁক দিয়া যতদূর দেখা যায় নিরীক্ষণ করিল। শুভদা সময়ে রূপবতী ছিল। বয়সে ও দুঃখ-কষ্টে পূর্বের সে জ্যোতি

এখন আর নাই, তথাপি হীনপ্রভ লাবণ্যের যতটুকু অবশিষ্ট আছে, বৃদ্ধ তাহাতেই মোহিত হইল। অনেকক্ষণ দেখিয়া দেখিয়া কহিল, বাছা, তোমার ভুল হইয়াছে, বিনোদবাবুর সঙ্গে বোধ হয় তুমি দেখা করিতে চাও।

বিনোদবাবু কে?

বিনোদবাবু ভগবানবাবুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

শুভদা কহিল, তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহি না।

তবে কি ভগবানবাবুর নিকটই প্রয়োজন আছে?

হাঁ।

ভগবান নন্দী আমারই নাম ; কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখিয়াছি বলে ত মনে হয় না।

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তবে আমার নিকট কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

শুভদা কথা কহিল না।

ভগবানবাবু আবার বলিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম রাত্রে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন বিনোদের নিকটই থাকিতে পারে ; এত রাত্রে আমার নিকট যে তোমার কি প্রয়োজন আছে আমি বুঝিয়া উঠিতে পারছি না।

তথাপি শুভদা কোনও উত্তর দিল না।

তোমার বাড়ি কোথায়?

হলুদপুরে।

হলুদপুরে? আমার নিকট প্রয়োজন? তুমি কি হারাণের স্ত্রী?

শুভদা অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

তবে বল কি প্রয়োজন?

শুভদা অঞ্চল হইতে বালা দু গাছি খুলিয়া ধীরে ধীরে ভগবানবাবুর পায়ের নিকট রাখিয়া গদগদকণ্ঠে বলিল, তাঁকে ছাড়িয়া দিন।

বৃদ্ধ সমস্ত বুঝিতে পারিলেন। বালা দু গাছি হাতে লইয়া বেশ পরীক্ষা করিয়া অবশেষে কহিলেন, তবুও সুখী হইলাম যে সে তোমাকে ইহাও দিয়েছিল। তাহার পর বালা দুটি নীচে রাখিয়া বলিলেন, তুমি ইহা ফিরাইয়া লইয়া যাও। আমি ব্রাহ্মণের মেয়ের হাতের বালা লইতে চাহি না। ছাড়িয়া দিতে হয় অমনিই দেব ; বিশেষ সে আমার যাহা লইয়াছে তাহাতে এ অলঙ্কার লইয়া ছাড়িয়া দেওয়াও যা, না লইয়া ছাড়িয়া দেওয়াও তা।

শুভদা চক্ষু মুছিয়া বলিল, তাঁকে ছাড়িয়া দিবেন ত?

ইচ্ছা ছিল না! সে যেরকম দুশ্চরিত্র তাহাতে তাহার শাস্তি পাওয়াই উচিত ছিল, তবুও তোমার জন্য ছাড়িয়া দিব।

শুভদার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। পলিতকেশ বৃদ্ধকে সে ব্রাহ্মণকন্যা হইলেও মুখ ফুটিয়া আশীর্বাদ করিতে সাহস করিল না ; মনে মনে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া ঈশ্বরের চরণে তাঁহার সহস্র মঙ্গল কামনা করিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। ভগবানবাবু মুখ তুলিয়া বলিলেন, আজই বাড়ি যাবে?

শুভদা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আজই যাইবে।

তোমার সঙ্গে আর কেহ লোক আছে?

কেহ না।

কেহ না? তবে এত রাত্রে একাকী যাইও না। একজন লোক সঙ্গে লইয়া যাও।

শুভদা তাহাও অস্বীকার করিয়া একাকী সেই বনের ভিতর দিয়া বাটী ফিরিল।

যখন বাটীতে প্রবেশ করিল তখন ভোর হইয়াছে। ললনা ইতিপূর্বে উঠিয়া সংসারের কাজকর্ম করিবার চেষ্টা করিতেছিল। সিক্তবস্ত্রে জননীকে দেখিয়া কহিল, মা, এত ভোরে স্নান

করে এলে?

হাঁ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রামমণি ও দুর্গামণি নাম না রাখিয়া যে শুভদা কন্যা দুইটির নাম ললনা ও ছলনা রাখিয়াছিল, তাহাতে ঠাকুরঝি রাসমণির আর মনস্তাপের অবধি ছিল না।

বাজারের তাদের মত ললনা ছলনা নাম দুটা অষ্টপ্রহর তাঁর কর্ণে বিঁধিতে থাকিত। ললনা নামটা তবু কতক মাফিকসই ; কিন্তু ছিঃ—ছলনা আবার কি নাম! ছলনাকে না দেখিতে পাবার কারণ অর্ধেক তার ঐ নামটা। লোকে ঠাকুরদের নামে ছেলেমেয়েদের নাম রাখে ; কেননা, তাদের ডাকিতেও ভগবানের নাম করা হয়, কিন্তু এ দুটো মেয়েকে ডাকলে যেন পাপের ভার একটু একটু করে বাড়ছে মনে হয়।

ললনাময়ী, ছলনাময়ী হারাণবাবুরই দুই কন্যা। একজন বড়, একজন ছোট ; একজন সপ্তদশবর্ষীয়া, একজন একাদশ বর্ষীয়া ; একজন বিধবা, একজন অনূঢ়া।

এই ত গেল পরিচয়ের কথা। এখন রূপ-গুণের কথা, তাহা আমি বলিতে পারিব না। তবে গঙ্গার ঘাটে ললনা স্নান করিতে যাইলে বর্ষীয়সীরা বলাবলি করিতেন, 'ঠাকুর বিধবা করিবেন বলেই ছুঁড়ির এত রূপ দিয়েছিলেন!' ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ডুব দিতে থাকিত। সমবয়স্কারা কানাকানি করিত। কি বলিত তাহারাই জানে তবে ভাবে বোধ হয় বিশেষ প্রশংসা করিত না। ললনার তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সে বেশি কথাও কহিত না, বেশি কথায় থাকিতও না—দুই-চারিটা কথা কহিত, স্নান করিত, জল লইত—উঠিয়া বাটী চলিয়া আসিত। কিন্তু ছলনার স্বতন্ত্র কথা। সে অধিক কথা কহিতে ভালবাসিত, অধিক কথায় থাকিতে ভালবাসিত, আটটার সময় স্নান করিতে গিয়া এগারটার কম বাটী ফিরিয়া আসিত না, গায়ে গহনা নাই বলিয়া মুখ ভারী করিত, মোটা চালের ভাত খাওয়া যায় না বলিয়া কলহ করিত, পাতে মাছ নাই কেন বলিয়া থালসুদ্ধ ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত ; এইরূপে দিনের মধ্যে শতসহস্র কাজ করিত। তাহারও শরীরে রূপ ধরে না। তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ, গোলাপপুষ্পের মত মুখখানি। তাহাতে ভ্রূ'দুটি যেন তুলি দিয়া চিত্রিত করা, পাতলা দুখানি ঠোঁট পান খাইয়া লাল করিয়া দর্পণ লইয়া নির্জনে ছলনাময়ী আপনার রূপ দেখিয়া আপনি গৌরবে ভরিয়া উঠিত। মনে মনে বলিত, এই বয়সে এত রূপ, না জানি বয়সকালে কি হবে! সমস্ত অঙ্কে কত গহনা থাকিবে ; এইখানে বালা, এইখানে অনন্ত, এইখানে বাজু, এইখানে হার, চিক, কণ্ঠমালা, সাতনরি, দশনরি, বিশনরি, আরও কত কি—উঃ, তখন কি হবে! এ আনন্দ ছলনা একা বহিতে পারিত না—ছুটিয়া দিদির কাছে আসিয়া বসিত।

ললনা জিজ্ঞাসা করিত, কি লা? ছুটছিস কেন?

দিদি, আমার রঙটা কি আগেকার চেয়ে কালো হয়ে গেছে?

কালো হবে কেন?

হয় নি? আচ্ছা দিদি, আমাদের গাঁয়ে কেউ গুণতে জানে কি?

কেন?

আমি হাত দেখাব।

কেন?

তারা গুণে বলে দেবে, বড় হলে আমার গয়না হবে কি না।

ললনার চক্ষে জল আসিত।—হবে দিদি হবে, রাজরাণী হবি।

ছলনার লজ্জা করিত। মুখখানি লাল করিয়া ছুটিয়া অন্যত্র পলাইয়া যাইত। গহনা হইবে কি না তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিল ; রাজরাণীর কথা কে বলিয়াছে?

কখন আসিয়া হয়ত জিজ্ঞাসা করিত, দিদি, আমাদের কিছু নেই কেন?

ললনা বলিত আমরা দুঃখী তাই।

কেন দুঃখী দিদি? গাঁয়ে কে আমাদের মত এমন করে থাকে, এমনতর কষ্ট পায়?

ঈশ্বর যাকে যেমন করেছেন তাকে তেমনি করেই থাকতে হয়।

ঈশ্বর কাউকে এমন করলেন না, কেবল আমাদেরই এমন করলেন?

আমাদের পূর্বজন্মের পাপ।

কি পাপ দিদি?

পাপ কি একরকম আছে বোন? হয়ত কত অকর্ম করেছি। বাপ-মাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিনি, লোকের মনে অযথা ক্লেশ দিয়েছি—আরো কত কি হয়ত করেছি।

ছলনার মুখ ম্লান হইল। বলিল, এমনি করেই তবে কি চিরকাল কাটবে? কখন কি সুখ হবে না?

তা কেন ভাই, দুর্দিন কেটে গিয়ে আবার সুদিন হবে। তাহার পর ছলনার হাত দুটি সস্নেহে আপনার হতে লইয়া বলিত, দেখিস দেখি—তোর কত সুখ হবে ; কত ঐশ্বর্য, কত গহনা, কত দাসদাসী—দুই রাজরাণী হবি।

ললনা একথাটা যখন তখন বলিত। ছলনা না ভাবিয়া চিন্তিয়া একটা কথা বলিয়া ফেলিল, দিদি তুমি?—

সে জানিত তাহার দিদি বিধবা, তথাপি বালিকাসুলভ চপলতায় একটা কথা আপনা আপনি মুখ হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে। তাই ছলনা অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, আমিও সুখে থাকব বোন—ঐ আমাকে মা ডাকছেন।

ললনা চলিয়া গেল। যথার্থই মা তখন ডাকিতেছিলেন। কাছে আসিয়া বলিল, কেন মা?

তোমার বাবা এসেচেন, ঐ ঘরে—

কথা শেষ হইবার পূর্বেই ললনা চলিয়া গিয়াছে।

আহার করিতে বসিলে রাসমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন কোথায় ছিলে?

মুখে গ্রাস তুলিয়া হারাণবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, সে অনেক কথা।

রাসমণি মুখব্যাদান করিলেন, অনেক কথা কি রে?

সে গ্রাস গলাধঃকরণ করিয়া হারাণবাবু পূর্বমত গম্ভীরমুখেই বলিলেন, অনেক কথা এই যে, মাথার উপর দিয়ে প্রলয়ের ঝড় বয়ে গিয়েছে।

রাসমণির বিস্ময়ের সীমা নাই, ভাবনার শেষ নাই ; প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, খুলেই বল হারাণ।

হারাণ গম্ভীরমুখে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করিয়া কহিল, নষ্টচন্দ্রের কলঙ্কের কথা জান? আমার তাই হয়েছিল। চুরি করেছি বলে নন্দীরা আমাকে—না, আমার নামে নালিশ করেছিল।

নালিশ করেছিল?

হাঁ, নালিশ করেছিল ; কিন্তু মিছে কথা কতক্ষণ থাকে? কিছুই প্রমাণ হ'ল না—আজ মকদ্দমা জিতে তাই বাড়ি আসচি।

ঘোমটার অন্তরালে শুভদা চক্ষু মুছিল। রাসমণি নন্দীদের বহু মঙ্গল কামনা করিলেন, তাহাদিগকে সগোষ্ঠী মুক্তি দিবার জন্য দুর্গার চরণে অনুযোগ করিলেন ; তাহার পর বলিলেন, কিন্তু ওরা চাকরিতে তোকে আর রাখবে কি?

হারাণবাবু চক্ষু রক্তবর্ণ করিলেন—চাকরিতে রাখবে? আমি করলে তবে ত রাখবে? হারামজাদা ভগবান নন্দীর এজন্মে আমি আর মুখ দেখব? যদি বেঁচে থাকি ত প্রতিশোধ নেব—আমাকে যেমন অপমান করেচে, তার শোধ তুলবই তুলব!

রাসমণি কিছুক্ষণ ভয়বিস্মিত চক্ষে বীর ভ্রাতার পানে চাহিয়া থাকিয়া মৃদু মৃদু বলিলেন, তাহলে কিন্তু খরচপত্রের—

সে ভাবনা ভেব না দিদি—বেটাছেলে, আমার ভাবনা কি? কালই আর এক জায়গায় চাকরি জুটিয়ে নেব।

হারাণবাবুর কথা যে রাসমণি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন, তাহা নহে, তথাপি কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করিয়া এ দারুণ দুর্ভাবনার হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে এসময়ে সকলেরই ইচ্ছা হয়। রাসমণিও তাহাই করিলেন। মনকে প্রবোধ দিলেন, হয়ত সে যাহা বলিতেছে তাহাই করিবে ; এ বিপদের সময়ও অন্ততঃ চক্ষু ফুটিবে। কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, যা ভাল হয় তাই করিস—নাহলে, অসুখ-বিসুখ, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে বিপদের সীমা-পরিসীমা থাকবে না।

একটা লম্বাচওড়া উত্তর দিয়া হারাণচন্দ্র আহার শেষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

এইবার মাধবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সে শুনিয়াছিল পিতা আসিয়াছেন, তাই এতক্ষণ উন্মুখ হইয়া শয্যার উপর বসিয়াছিল। হারাণবাবু নিকটে আসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া বলিলেন, কেমন আছ মাধব?

আজ ভাল আছি বাবা ; তুমি এতদিন আসনি কেন?

হারাণচন্দ্র একটা মনোমত উত্তর খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু মাধব সেজন্য অপেক্ষা করিল না। আবার বলিল, তুমি আমার জন্য ওষুধ আনতে গিয়েছিলে, না? ওষুধ এনেচ?

হারাণচন্দ্র শুষ্কমুখে বলিলেন, এনেছি।

ভাল ওষুধ? খেলেই ভাল হব?

হবে বৈ কি।

বালক প্রফুল্ল হইয়া হাত বাড়াইয়া বলিল, তবে দাও।

হারাণচন্দ্র বিপদে পড়িলেন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, এখন নয়, রাত্রে খেও।

বালক তাহাতেও সন্তুষ্ট। মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তাই খাব। তাহার পর কিছুক্ষণ পিতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাবা, আমাকে একটা ডালিম কিনে দিও—দেবে?

হারাণচন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, দিবেন।

তাহার পর শুভদা আসিলে তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকে আনা দুই পয়সা দিতে পারো?

কেন?

আমার দরকার আছে—একজনের ধার আছে, সে চাইতে এসেছে।

শুভদা বাক্স খুলিয়া দুই আনা পয়সা বাহির করিল। হারাণচন্দ্র উঁকি দিয়া দেখিলেন বাক্সে আরো অনেকগুলি পয়সা আছে। হাত পাতিয়া দু' আনা পয়সা লইয়া বলিলেন, থাকে ত আরো আনা চারেক পয়সা দাও—মাধবকে একটা বেদানা কিনে দেব।

শুভদা কাতরভাবে স্বামীর মুখপানে একবার চাহিল। এতগুলি পয়সা একসঙ্গে বাহির করিয়া দিতে বোধ হয় তাহার ক্লেশ হইতেছিল। তাহার পর বাক্স খুলিয়া বাহির করিয়া দিল।

পয়সাগুলি হাতে বেশ করিয়া গুছাইয়া লইয়া হারাণচন্দ্র একটু জোর করিয়া হাসিয়া বলিলেন, কালই আমি এসব শোধ করে দেব।

শুভদা অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িল। সে বিলক্ষণ জানিত, তাহার স্বামীর অর্ধেক কথার কোন অর্থই থাকে না। এখন চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া শুভদা বলিল, এখন কোথাও যেয়ো না—একটু শুয়ে থাক।

হারাণচন্দ্র মুখ ফিরাইলেন—তা কি হয়? ঘরে বসে থাকলে কি আমার চলে? রাজ্যের কাজ আমার মাথার উপর পড়ে আছে।

তবে যাও—

তিনি চলিয়া যাইলে শুভদা বাক্স খুলিল। আর একটি টাকা মাত্র আছে। বিন্দুবাসিনী সেদিন যাহা দিয়া গিয়াছিল তাহা ফুরাইয়া আসিয়াছে। এই একটি টাকা মাত্র তাহাদের সম্বল। শুভদা বাক্সের একটি নিভৃত কোণে তাহা লুকাইয়া রাখিয়া মাধবের কাছে আসিয়া বসিল।

মা, কখন বাবা বেদানা আনবেন?

সন্ধ্যার সময়।

সন্ধ্যা আসিল, রাত্রি হইল—তথাপি হারাণবাবুর দেখা নাই। মাধব অনেকবার খোঁজ লইল, অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল ; তাহার পর কাঁদিতে লাগিল।

শুভদা আছে আসিয়া বসিল। ললনা অনেক করিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল ; প্রথমে সে কিছুতেই ভুলিতে চাহে না, অবশেষে শ্রান্তমনে অবসন্ন শরীরে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িল। রাত্রি ভোর না হইতেই সে আবার উঠিয়া বসিল—মা, আমার ডালিম এসেচে?

শুভদা চক্ষের জল চাপিয়া বলিল, ডালিম তোমাকে খেতে নেই।

কেন?

খেলে অসুখ হবে।

সে উঠিয়া বসিয়াছিল, আবার শুইয়া পড়িল।

পরদিন দ্বিপ্রহর অতীত হইলে হারাণচন্দ্র বাটী আসিলেন। রাসমণি রাগ করিয়া একটা কথাও কহিলেন না। ললনা পা ধুইবার জল আনিয়া দিল, স্নান করিবার উপকরণ, হুঁকাতে জল ভরিয়া তামাকু সাজিয়া দিল। হারাণচন্দ্র স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া আহার করিলে, শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—মাধবের বেদানা এনেচ?

ঐ যা—আহা-হা—পকেটে পয়সাগুলো রেখেছিলাম, ছেঁড়া পকেট,—সমস্ত পয়সা কোথায় পড়ে গেছে। থাকে ত আজ গণ্ডাচারেক পয়সা দিও, সন্ধ্যার সময় তোমাকে সমস্ত ফিরিয়ে দেব।

শুভদা ম্লানমুখে বলিল, আর কিছু নেই।

হারাণচন্দ্র সহাস্যে বলিলেন, তা কি হয়? তোমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কখনই ফুরোয় না।

শুভদা মনে মনে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা স্মরণ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, সত্যি কিছু নেই।

কেন থাকবে না? কাল যে দেখলাম অনেকগুলো পয়সা আর একটা টাকা আছে।

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণবাবু আবার বলিলেন, ছিঃ! আমাকে দুটো পয়সা দিয়ে তোমার বিশ্বাস হয় না? সমস্ত টাকাটা দিয়ে বিশ্বাস না হয়, আনা চারেক পয়সারও বিশ্বাস রাখতে হয়।

আর আপত্তি করিল না, শুভদা হাত ধুইয়া প্রার্থিত অর্থ বাহির করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অর্থের সদ্ব্যবহার বটে! হারাণচন্দ্র হলুদপুর গ্রাম পার হইয়া বামুনপাড়ায় আসিলেন। তাহার পর একটা গলিপথ ধরিয়া একটা দরমাঘেরা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এখানে অনেকগুলি প্রাণী জড় হইয়া এককোণে বসিয়াছিল। হারাণচন্দ্রকে দেখিবামাত্র তাহারা সাহ্লাদে মহাকলরব করিয়া উঠিল। অনেক প্রীতিসম্ভাষণ হইল ; কেহ বাবা বলিয়া ডাকিল, কেহ দাদা বলিয়া ডাকিল, কেহ খুড়ো, কেহ মামা, কেহ মেসো ইত্যাদি বহুমান্যে বহুসম্ভাষিত হইয়া মুরুব্বির মত হারাণচন্দ্র তন্মধ্যে স্থান গ্রহণ করিলেন।

অনেক কথা চলিতে লাগিল। রাজা-উজিরের মুণ্ডপাত করা হইল, অনেক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করা হইল। এটা গুলির দোকান। সংসারের একপ্রান্তে শ্মশান, আর অপরপ্রান্তে গুলির দোকান। শ্মশানে মহারাজাও ভিক্ষুকের সমান হইয়া যান, এখানেও ভিক্ষুক মহারাজার সমান হইয়া দাঁড়ান। টানে টানে অহিফেন মগজে যত জড়াইয়া জড়াইয়া উঠিতে লাগিল, হৃদয়ের মহত্ত্ব, শৌর্য, বীর্য, গাম্ভীর্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি একে একে তেমনি ফাঁপিয়া ফুলিয়া প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। কত দান, কত প্রতিদান! মণি, মুক্তা, হীরক, কাঞ্চন, কত রাজ্য, কত রাজকন্যা ; টানে টানে অবাধে ভাসিয়া চলিতে লাগিল। একাধারে এত রত্ন, জগতের তাবৎ বাঞ্ছিত বস্তু অর্ধ আলোকে, অর্ধ আঁধারে, দরমার ঘরে, ভূতলে, সে ইন্দ্রসভা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া অনেকগুলি কালিদাস, অনেকগুলি দিল্লীর বাদশাহ, অনেকগুলি নবাব সিরাজদ্দৌলা, অনেকগুলি মিঞা তানসেন একে একে ঝাঁপ খুলিয়া বাহিরে

আসিতে লাগিলেন। জগতের নীচ লোকের সহিত তাঁহারা মিশিতে পারেন না, কথাবার্তা আলাপ-পরিচয় করা শোভা পায় না, কাজেই তাঁহারা রাস্তার একপাশ ধরিয়া নিঃশব্দে স্ব স্ব প্রাসাদ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

হারাণচন্দ্রও তাঁহাদের মত বাহিরে আসিলেন ; কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাঁহার একটু বিভ্রাট ঘটিল। কোথা হইতে সেই হতভাগ্য পীড়িত মাধবের মুখখানা মনে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বেদানার কথাটাও স্মরণ হইল। অপর সকলের মত তিনিও অবশ্য কোন একটা বিশেষ উচ্চপদ লাভ করিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মুখপোড়া ছোঁড়ার মুখখানা সে রাজ্যে বিষম বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া দিল। দিল্লীর বাদশা পকেটে হাত দিয়া দেখিলেন, রাজকোষ প্রায় শূন্য। অতবড় সম্রাটের চারিটি পয়সা ও একটি গাঁজার কলিকা ভিন্ন আর কিছুই নাই। বহুৎ আচ্ছা! তাহাই সহায় করিয়া তিনি নিকটবর্তী একটা গঞ্জিকার দোকানে প্রবেশ করিলেন।

অধিকারীকে মিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া কহিলেন, খুড়ো, চার পয়সার তামাক দাও ত।

অধিকারী সে আজ্ঞা সত্বর সম্পাদন করিল।

হারাণচন্দ্র তখন মনোমত একটা বৃক্ষতল অন্বেষণ করিয়া লইয়া গঞ্জিকা-সাহায্যে বিশৃঙ্খল রাজত্ব পুনরায় শৃঙ্খলিত করিয়া লইলেন। সমস্ত কর্ম সম্পন্ন হইলে রাত্রি অনেক হইতেছে দেখিয়া বৃক্ষতল পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। অনেকদূর গিয়া একটা খোড়ো বাড়ির সম্মুখের দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিলেন, কাত্যায়নী!

কেহ উত্তর দিল না।

আবার ডাকিলেন, বলি কাতু বাড়ি আছে কি?

তথাপি উত্তর নাই।

বিরক্ত হইয়া হারাণচন্দ্র চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, বলি বাড়ি থাক ত দরজাটা একবার খুলে দিয়ে যাও না!

এবার অতি ক্ষীণ রমণীকণ্ঠে জবাব আসিল, কে?

আমি—আমি।

আমার বড় শরীর অসুখ—উঠতে পারব না।

তা হবে না। উঠে খুলে দাও।

এবার একজন পঞ্চবিংশতি-বর্ষীয়া কালোকোলা মোটাসোটা সর্বাঙ্গে উল্কিপরা মানানসই যুবতী যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতে করিতে আসিয়া খট করিয়া দ্বার মোচন করিল।

উঃ মরি—যে পেটে ব্যথা! অত ষাঁড়-চেঁচাচ্চ কেন?

চেঁচাই কি সাধে? দোর না খুললেই চেঁচামেচি করতে হয়।

যুবতী বিরক্ত হইল—না বাবু, অত আমার সইবে না। আসতে হয় একটু সকাল সকাল এসো। রাত্তির নেই, দুপুর নেই, যখন-তখন যে অমনি করে চেঁচাবে—তা হবে না, অত গোলমাল আমার ভাল লাগে না।

হারাণচন্দ্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া অর্গল বন্ধ করিলেন। তাহার পর কাত্যায়নীর পানে চাহিয়া বলিলেন, আহা! পেটে ব্যথা হয়েছে, তা ত আমি জানিনে।

তুমি কেমন করে জানবে? জানে পাড়ার পাঁচজন। কাল থেকে এখন পর্যন্ত পেটে একবিন্দু জলও যায়নি। তা এত রাত্তিরে কেন?

একটু কাজ আছে।

কাজ আবার কি?

বলছি। তুমি একটু তামাক সাজ দেখি।

রমণী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া হাত দিয়া ঘরের একটা কোণ দেখাইয়া বলিল, ঐ কোণে সব আছে। তামাক খেতে হয় নিজে সেজে খাও, আমাকে আর জ্বালাতন ক'রো না—আমি একটু শুই।

হারাণচন্দ্র অপ্রতিভভাবে কহিল, না না, তোমাকে বলিনি—আমার মনে ছিল না, তুমি শুয়ে থাক, আমিই সেজে নিচ্চি।

তখন তামাকু সাজিয়া হুক্কা হস্তে হারাণচন্দ্র কাত্যায়নীর পার্শ্বে শয্যায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। অনেকক্ষণ তামাকু সেবন করিবার পর, ধীরে ধীরে—অতি ধীরে, বড় মৃদু—পাছে গলার স্বর কর্কশ শুনায়, কহিলেন, কাতু, আজ আমাকে গোটা-দুই টাকা দিতে হবে।

কাত্যায়নী কথা কহিল না।

বলি শুনলে? ঘুমুলে কি? আজ আমাকে দুটো টাকা দিতেই হবে।

কাত্যায়নী পার্শ্ব পরিবর্তন করিল, কিন্তু কথা কহিল না।

হারাণচন্দ্র একটু সাহস পাইলেন। হুক্কাটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া তাহার গাত্রে হাত দিয়া বলিলেন, দেবে ত?

কাত্যায়নী কথা কহিল, মিছে ভ্যানভ্যান করচ কেন? কোথা থেকে দেব?

কেন, তোমার নেই কি?

না।

আছে বৈ কি! দরকার ; আজ এ দয়া আমাকে করতেই হবে।

থাকলে ত দয়া করব।

দুটো টাকা তোমার আছেই। আমি জানি আছে! টাকা অভাবে বাড়িতে আমার খেতে পাচ্চে না, আমার রোগা ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েছি; লজ্জায় ঘৃণায় আমার বুক ফেটে যাচ্চে। কাতু, আজ আমাকে বাঁচাও—

থাকলে ত বাঁচাব? আমার একটি পয়সাও নেই।

এইবার হারাণচন্দ্রের ক্রোধ হইল ; বলিলেন, কেন থাকবে না? এত টাকা দিলাম, আর আমার অসময়ে দুটো টাকাও বেরোয় না? চাবিটা দাও দেখি, সিন্দুক খুলে দেখি টাকা আছে কি না।

কাত্যায়নীর আঁতে ঘা লাগিল। একটা অবাচ্য অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিয়া বসিল। ক্রোধদৃপ্তলোচনে হারাণের মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, কেন, তুমি কে যে তোমাকে সিন্দুকের চাবি দেব? সে ছোটলোকের মেয়ে, নীচ কথা তাহার মুখে বাধে না। অনায়াসে চীৎকার করিয়া বলিল, যখন রেখেছিলে তখন টাকা দিয়েছিলে, তা বলে তোমার দুঃসময়ে কি সেসব ফিরিয়ে দেব?

হারাণচন্দ্র একেবারে এতটুকু হইয়া গেলেন। কাত্যায়নীর মুখের সম্মুখে তিনি কখনই দাঁড়াইতে পারেন না, আজও পারিলেন না। নিতান্ত নরম হইয়া বলিলেন, তবু ভালবেসেও ত একটু উপকার করতে হয়?

ছাই ভালবাসা। মুখে আগুন অমন ভালবাসার। আজ তিনমাস থেকে একটি পয়সা দিয়েচ কি যে ভালবাসব?

ছিঃ! অমন কথা বোলো না কাতু, ভালবাসা কি নেই?

এক তিলও না। আমাদের যেখানে পেট ভরে সেইখানে ভালবাসা। এ কি তোমার ঘরের স্ত্রী যে গলায় ছুরি দিলেও ভালবাসতে হবে? তোমা ছাড়া কি আমার গতি নেই? যেখানে টাকা সেইখানে আমার যত্ন, সেইখানে আমার ভালবাসা। যাও, বাড়ি যাও—এত রাত্তিরে বিরক্ত ক'রো না।

কাতু, সব কি ফুরোলো?

অনেকদিন ফুরিয়েচে। এতদিন চক্ষুলজ্জায় কিছু বলিনি। আজ যখন কথা পাড়লে তখন সমস্ত স্পষ্ট করেই বলি ; তোমার স্বভাব-চরিত্র খারাপ—আমার এখানে আর এস না। বাবুদের টাকা চুরি করে জেলে যাচ্ছিলে—চাকরি-বাকরি নেই, কোনদিন আমার কি সর্বনাশ করে ফেলবে—তার চেয়ে আগেভাগে পথ দেখাই ভাল। এখানে আর ঢুকো না।

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ সেইখানে সেই অবস্থায় মৌন হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, তাই হবে। এখানে আর আসব না। তোমার জন্যে আমার সব হ'ল ; তোমার জন্যে আমি চোর, তোমার জন্যে আমি লম্পট, তোমার জন্যে আমি স্ত্রী-পুত্র দেখি না, শেষে তুমিই—

হারাণচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিলেন, আজ আমার চোখ ফুটলো—

এবার কাত্যায়নীও নরম হইল। একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, ঠাকুর করুন তোমার যেন চোখ ফোটে। আমরা ছোটলোকের মেয়ে, ছোটলোক—কিন্তু এটা বুঝি যে, আগে স্ত্রী-পুত্র বাড়িঘর, তারপর আমরা ; আগে পেটের ভাত, পরবার কাপড়, তার পর শখ, নেশা-ভাঙ। তোমার আমি অহিত চাইনে, ভালর জন্যই বলি—এখানে আর এস না, গুলির দোকানে আর ঢুকো না—বাড়ি যাও, ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র দেখ গে, একটা চাকরি-বাকরি কর, ছেলেমেয়ের মুখে দুটো অন্ন দাও, তারপর প্রবৃত্তি হয় এখানে এসো।

কাত্যায়নী শয্যা হইতে উঠিয়া বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া হারাণচন্দ্রের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, এই নিয়ে যাও—

হারাণচন্দ্র বহুক্ষণ অধোবদনে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল, তাহার পর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আমার দরকার নেই।

কাত্যায়নী অল্প হাসিল ; হাত দিয়া হারাণের মুখখানা তুলিয়া বলিল, যে কিছু জানে না তার কাছে অভিমান ক'রো—এ না নিয়ে গেলে কাল তোমাদের সবাইকে উপুস করতে হবে, তা জান?

কেন?

তোমাদের যে কিছু নেই।

কেমন করে, জানলে?

এইমাত্র তুমি যে নিজেই বললে—ছেলের মুখের খাবার কেড়ে খেয়েচ।

ওঃ—

শুধু তাই নয়। তুমি এত কথা না বললেও আমি আগে থেকেই সমস্ত জানি। আমি নিজে তোমাদের বাড়ি গিয়ে সব দেখে এসেছি।

কেন?

প্রথমতঃ মেয়েমানুষের এসব আপনিই দেখতে ইচ্ছে হয়, তার পর সব দেখেশুনে আটঘাট না বেঁধে চললে আমাদের চলে না। তোমরা যত বোকা, মেয়েমানুষ হলেও আমরা তত বোকা নই। তোমাদের স্ত্রী আছে, পুত্র আছে, আত্মীয় আছে, বন্ধু আছে, একবার ঠকলে আর একবার উঠতে পার, কিন্তু আমাদের কেউ নেই—একবার পড়ে গেলে আর উঠতে পারব না, আমরা না খেতে পেয়ে মরে গেলেও কারো দয়া হবে না। লোকে বলে, 'যার কেউ নেই, তার ভগবান আছেন', আমাদের সে ভরসাও নেই। তাই সমস্ত জিনিস খুব সাবধানে নিজে না দেখেশুনে চললে কি আমাদের চলে? বুঝেচ?

কাত্যায়নীরও বোধ হয় ক্লেশ হইতেছিল ; এসব কথা কহিতে কহিতে সে-মুহূর্তের জন্যও হৃদয়ে একটু ব্যথা অনুভব করা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তৎক্ষণাৎই সে সমস্ত ঢাকা দিয়া ফেলিল। হারাণচন্দ্রের মুখখানা একটু নাড়িয়া দিয়া বলিল, যা বললাম সব বুঝেচ? এই টাকাগুলো তোমার স্ত্রীর হাতে দিও—তবুও দুদিন স্বচ্ছন্দে চলবে। নিজের কাছে কিছুতেই রেখো না। শুনচ?

হারাণচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

অনেক রাত্রি হ'ল, আজ আর কোথাও যেও না। এইখানেই শুয়ে থাক।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তীকে গ্রামের অর্ধেক লোক 'সদাদাদা' বলিয়া ডাকিত, অর্ধেক লোক

'সদাপাগলা' বলিয়া ডাকিত। এই হলুদপুর গ্রামেই তাহার বাটী। তাহার পিতা গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। ইংরেজী ম্লেচ্ছ ভাষা, ইংরেজী শিখিলে ধর্ম নষ্ট হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি পুত্রকে লিখিতে পড়িতে শিখান নাই। আর প্রয়োজনই বা কি? যে দু-দশ বিঘা জমিন আছে তাহাতে পরের চাকুরি করিতে হইবে না, তবে মিছামিছি জাতি দিয়া কি হইবে? কেহ বলিত, সে সংস্কৃত ভাষা জানে, কেহ বলিত জানে না; যাহা হউক এ বিষয়ে মতভেদ আছে, কিন্তু সে যে পাগল তাহাতে আর মতভেদ নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বীকার করে তাহার একটু বাতিকের ছিট আছে। জমি দেখে, রামপ্রসাদী গান গাহে, মড়া পোড়ায়, এ বাটী ও বাটী করে, এমনি করিয়া মনের আনন্দে দিন কাটিয়া যায়। দূরসম্পর্কের এক পিসি ভিন্ন সংসারে আপন বলিতে তাহার কেহ নাই; তাই গ্রামসুদ্ধ লোককে সে আপনার করিয়া লইয়াছে। সকলেই তাহার আত্মীয়, সকলের সহিতই তাহার সম্পর্কের ডাক, সকল স্থানেই তাহার অবারিত দ্বার।

পূর্বেই বলিয়াছি, সংসারে তাহার কেহ আপনার লোক নাই। বাল্যকালে সদানন্দর পিতা অনেক টাকা পণ দিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে এক বৎসরের মধ্যেই বধূটির মৃত্যু হয়। সেই অবধি, আজ ছয় বৎসর হইল, সদানন্দ একাকী আছে। টাকা জুটিয়া উঠে নাই বলিয়াই হউক, আর ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই হউক, সে আর বিবাহ করে নাই। তাহাদিগকে অনেক টাকা পণ দিয়া বিবাহ করিতে হইত; কেহ বিবাহের কথা পাড়িলে সে তাহারই উল্লেখ করিয়া বলিত, অত টাকা পাই কোথায় যে বিবাহ করিব?

আজ অপরাহ্নে আকাশে ভারী মেঘ করিয়াছে। সমস্ত নিশ্চল, নিস্তব্ধ। প্রকৃতি এমনি ভাব ধরিয়া আছে যেন সে ইচ্ছা করিলে এখনই প্রবলধারে জল ঢালিতে পারে এবং ইচ্ছা না করিলে হয়ত এখনও তিন-চারি ঘণ্টা স্থগিত রাখিতে পারে।

পিসি রাসমণি ডাকিয়া বলিলেন, ও ললনা, ঘরে যে একফোঁটা খাবার জল নেই। চট করে ঘাট থেকে এক কলসী জল নিয়ে আয় না, মা।

ললনা কলসী কাঁকালে গঙ্গার ঘাটে আসিল। জল লইয়া দুই পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই মেঘ হইতে বড় বড় ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। ললনা হনহন করিয়া পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। আসিবার পথেই সদানন্দর বাটী; পথের ধারের আটচালাঘরের বারান্দায় বসিয়া সে তখন রামপ্রসাদী সুরে কালীনাম গাহিতেছিল। ললনাকে দেখিয়া সে গান থামাইয়া বলিল, ললনা, ভিজচ কেন?

ললনা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তুমি গান থামালে কেন?

সদানন্দও হাসিল; হাসি-গান তাহার মুখে অষ্টপ্রহর লাগিয়াই আছে। সুর করিয়া বলিল, গান থামিয়া গেছে; তাহার পর স্বাভাবিক স্বরে কহিল, সেকথা যাক, মিছামিছি ভিজো না, এইখানে একটু দাঁড়াও।

ললনা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিল, দাঁড়িও না, বাড়ি যাও।

সে কি?

পিসিমা বাড়ি নাই, বেশি জল আসিলে যাইবে কেমন করিয়া?

ললনা ভাবিল, সেকথাও বটে; দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার পিছাইয়া আসিল।

সদানন্দ বলিল, ফিরিলে কেন?

কাল রাত্রে আমার জ্বর হয়েছিল, জলে ভিজলে অসুখ বাড়তে পারে।

তবে যেও না, এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।

সদানন্দ তখন আপন মনে গান ধরিল—

কভু তারে পাব না বুঝি, মিছে হাত বাড়ায়ে দাঁড়ায়ে আছি।
কত জ্বালায় জ্বলে মরি, তুই কি জানবি পাষাণী মা!
আমার সোনার তরি ডুববে এবার—

ললনা কলসী নামাইয়া গান শুনিতেছিল ; মিষ্ট গলায় মিষ্ট গান তাহার বড় ভাল লাগিতেছিল। হঠাৎ মাঝপথে থামিয়া যাওয়ায় বলিল, ওকি থামিলে যে?

আর গাইব না।

কেন?

আর মনে নাই।

ললনা মৃদু হাসিয়া বলিল, তবে গাইলে কেন?

আমি অমন গেয়ে থাকি। তাহার পর কিছুক্ষণ আকাশপানে চাহিয়া বলিল, মেঘের উপর পদ্ম ফোটে, তুমি দেখেচ?

ললনা সহাস্যে বলিল, কই না, তুমি দেখেচ?

হ্যাঁ দেখেচি।

কবে দেখলে?

প্রায়ই দেখি। যখন আকাশে মেঘ হয় তখনই দেখতে পাই।

সদানন্দর গম্ভীর মুখশ্রী দেখিয়া ললনার হাসি আসিল। মুখে কাপড় দিয়া বলিল, তা কি হয়?

কেন হবে না? পদ্ম ত জলেই ফোটে, মেঘেতেও জলের অভাব নেই, তবে সেখানে ফুটবে না কেন?

মাটি না থাকলে শুধু জলেতে কি পদ্ম ফোটে?

সদানন্দ ললনার মুখপানে অনেকক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া বলিল, তাই বটে! সেই জন্যই শুকিয়ে যাচ্ছে।

ললনা আর কিছু কহিল না। সকলেই জানিত সদাপাগলা দিনের মধ্যে অমন অনেক অসম্ভব ও অসংলগ্ন কথা কহিয়া থাকে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া সদানন্দ আবার কহিল, ললনা, শারদা আর তোমাদের বাটীতে যায় না।

ললনা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। বোধ হয় তখনকার মুখ সদানন্দকে দেখাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল না।

সদানন্দ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, যায় না?

না।

কেন?

তা বলতে পারি না।

সদানন্দ গান ধরিল—

গান থামিল, কিন্তু বৃষ্টি কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। বরং আকাশের মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতে লাগিল। ললনা কাঁকে কলসী তুলিয়া লইল। সদানন্দ দেখিয়া বলিল, ওকি, যাও কোথা?

বাড়ি যাই।

এত বৃষ্টিতে যাইলে অসুখ করিবে যে।

কি করব!

ললনা চলিয়া গেলে সদানন্দ আবার গান ধরিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হারাণচন্দ্র যখন স্ত্রীর হস্তে পুরোপুরি দশটি টাকা গুণিয়া দিলেন তখন শুভদার মুখের হাসি ফুটিয়াও ফুটিতে পাইল না, বরং ম্লান হইয়া নতমুখে জিজ্ঞাসা করিল, এ টাকা তুমি কোথায় পেলে?

সেও, সে টাকা হাসিয়া দিতে পারে নাই। কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া বলিল, শুভদা, তোমার কি মনে হয় এ টাকা আমি চুরি করিয়া আনিয়াছি?

শুভদা আরও মলিন হইয়া গেল। তাহার পাপ অন্তঃকরণে একথা হয়ত একবার উদয়

হইয়াছিল, কিন্তু তাহা কি বলা যায়? ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ইহা কি লওয়া উচিত? চুরি করা ধন খাইবার পূর্বে সে অনাহারে মরিতে পারে, কিন্তু আর সকলে? প্রাণাধিক পুত্রকন্যারা? শুভদা বুঝিল, একথা আলোচনা করিবার এখন সময় নহে, তাই টাকা দশটি বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিল।

কতক সুখ-স্বচ্ছন্দে আবার দিন কাটিতে লাগিল। হারাণ মুখুজ্যেকে এখন আর বড় একটা হলুদপুরে দেখিতে পাওয়া যায় না। বাটী আসিলে রাসমণি যদি জিজ্ঞাসা করে, তুই সমস্তদিন কোথায় থাকিস রে?

হারাণ বলে, আমার কত কাজ, চাকরির চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াই।

শুভদাও মনে করে তাহাই সম্ভব, কেন না আর সে পয়সা চাহিতে আসে না, কাল শোধ করিয়া দিব বলিয়া আর দুই আনা, চারি আনা, ধার করিয়া লইয়া যায় না। সে কোথায় থাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারিব কেননা আমি তাহা জানি। সে সমস্তদিন অনাহারে অবিশ্রামে চাকরির উমেদারি করিয়া বেড়ায়। কত লোকের কাছে গিয়া দুঃখের কাহিনী কহে, কত আড়তদারের নিকট এমন কি সামান্য দোকানদারদিগের নিকটও খাতাপত্র লিখিয়া দিবে বলিয়া কর্ম প্রার্থনা করে, কিন্তু কোথাও কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। সে অঞ্চলে অনেকেই তাহাকে চিনিত ; সেইজন্য কেহই বিশ্বাস করিয়া রাখিতে চাহে না। সন্ধ্যার সময় শুষ্কমুখে বাটী ফিরিয়া আইসে ; শুভদা ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করে, আজ কোথায় খেলে?

হারাণচন্দ্র স্ত্রীর কথায় হাসিবার চেষ্টা করে ; বলে, আমার খাইবার অভাব কি? কে আমাকে না জানে?

শুভদা আর কথা কহে না, চুপ করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ তাহার কলসীর জল শুকাইয়া আসিতেছে, টাকা ফুরাইয়া আসিতেছে ; আর দুই-একদিনেই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া শুভদা তাহার স্বামীর নিকটে বলিতে পারে না, কাহাকেও জানাইতে তাহার ইচ্ছা হয় না, শুধু আপন মনে যাহা আছে তাহা লইয়াই নাড়াচাড়া করে।

আজ তিন দিবস পরে অনেক রাত্রে স্বামীর শ্রান্ত পা-দুটি টিপিতে টিপিতে শুভদা মনে মনে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ তর্কবিতর্ক করিয়া মুখ ফুটিয়া কহিল, আর নেই, সব টাকা ফুরিয়ে গেছে।

হারাণচন্দ্র চক্ষু মুদিয়া সাধারণভাবে বলিলেন, দশ টাকা আর কতদিন থাকে।

আর কোন কথা হইল না। দুজনেই সে রাত্রের মত চুপ করিয়া রহিল। শুভদা ভাবিয়াছিল, কাল কি হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে ; কিন্তু পারিল না। বিনা কারণে নিজেই অপরাধী সাজিয়া চুপ করিয়া রহিল। সে ভাবিয়াছিল, খরচ করিতে করিতে টাকা কেন ফুরাইয়া যায়, এজন্য বিশেষ তিরস্কৃত হইবে। সত্য সত্য তিরস্কৃত হইলে বোধ হয় সে দোষ স্খালন করিতে প্রয়াস পাইত, কিন্তু তৎপরিবর্তে সহানুভূতি পাইয়া আর কথা ফুটিল না।

পরদিন ভোর না হইতেই হারাণচন্দ্র চলিয়া গেলেন। ললনা যেরূপ গৃহকর্ম করে, করিতে লাগিল। রাসমণি নিয়মিত স্নান করিয়া আসিয়া মাটির শিব গড়িয়া ঘরে বসিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, শুধু শুভদার হাত-পা চলে না, ম্লানমুখে এখানে একবার, ওখানে একবার করিয়া বসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বেলা আটটা বাজে দেখিয়া ললনা কহিল, মা, তুমি আজ ঘাটে গেলে না? বেলা যে অনেক হ'ল।

এই যাই।

ললনা কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, জননী সেইখানে সেইভাবেই বসিয়া আছেন। বিস্মিত হইয়া বলিল, কি হয়েছে মা?

কিছুই না।

তবে অমন করে বসে আছ যে?

আর কি করব?

সেকি? নাবে না? ভাত চড়াবে না?

শুভদা তাহার চক্ষু দুটি কন্যার মুখের উপর রাখিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আজ কিছু নেই।

কি নেই?

কিছুই নেই। ঘরে একমুঠো চাল পর্যন্ত নেই।

ললনার মুখ শুকাইয়া উঠিল—তবে কি হবে মা? ছেলেরা কি খাবে?

শুভদা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, ভগবান জানেন।

কিছুক্ষণ পরে বলিল, একবার তোর বিন্দুপিসির কাছে গেলে হয় না?

কেন মা?

যদি কিছু দেয়।

ললনা চলিয়া গেলে শুভদার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। এমন কথা সে আর কখন বলে নাই, এমন করিয়া ভিক্ষা করিতে কন্যাকে আর কখন সে পাঠায় নাই। সে কথাই তাহার মনে হইতেছিল। লজ্জা করিতেছিল, বুঝি একটু অভিমানও হইয়াছিল। কাহার উপরে? জিজ্ঞাসা করিলে সে হয়ত স্বামীর মুখ মনে করিয়া উপরপানে হাত দেখাইয়া বলিত—তাঁর উপরে!

কপালে হাত দিয়া অনেকক্ষণ সেইখানে শুভদা বসিয়া রহিল। বেলা প্রায় এগারোটা বাজে; এমন সময় ছলনাময়ী একটা বেনে পুতুলের সর্বাঙ্গে কাপড় জড়াইতে জড়াইতে এবং পুঁতির মালায় তাহার হস্তপদহীন ধড়খানা বিভূষিত করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

মা, ভাত দাও।

শুভদা তাহার মুখপানে চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

ছলনা আবার বলিল, বেলা হয়েচে, ভাত দাও মা।

তথাপি উত্তর নাই।

এ হাতে পুতুল ও হাতে রাখিয়া ছলনা আরো একটু উচ্চকণ্ঠে কহিল, ভাত বুঝি এখনো হয়নি?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কেন হয়নি? তুমি বুঝি বেলা পর্যন্ত শুয়েছিলে! তাহার পর কি মনে করিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল, উনুনে আগুন পর্যন্ত এখনো পড়েনি বুঝি?

শুভদা বাহির হইতে ক্ষুব্ধভাবে কহিল, এইবার দেব।

ছলনা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মার মুখখানা দেখিয়া এইবার যেন একটু অপ্রতিভ হইল। কাছে বসিয়া বলিল, মা, এখন পর্যন্ত কিছু হয়নি কেন?

এইবার সব হবে।

মা, তুমি অমন করে আছ কেন?

এই সময়ে ঘরের ভিতর হইতে পীড়িত মাধব ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল, ও মা!

শুভদা শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

ছলনাময়ীও দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি ব'স, আমি মাধবের কাছে গিয়ে বসি।

তাই যা, মা।

বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ললনা খিড়কির দ্বার দিয়া ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে প্রবেশ করিল। কিন্তু বিন্দুবাসিনী সেখানে নাই। পূর্বরাত্রেই সে শ্বশুরবাটী চলিয়া গিয়াছে। তাহাকে হঠাৎ যাইতে হইয়াছিল, না হইলে শুভদার সহিত নিশ্চয় একবার দেখা করিয়া যাইত।

ম্লানমুখে ললনা ফিরিয়া আসিল। পথে তাহার কিছুতেই পা চলিতে চাহে না গাঙ্গুলীবাড়ি যাইবার সময় লজ্জায় তখনও পা চলিতেছিল না। কিন্তু শুধুহাতে ফিরিয়া আসিবার সময় আরো

লজ্জা করিতে লাগিল। পথের ধারে একটা গাছতলায় অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কি ভাবিয়া অন্য পথে গঙ্গার ঘাটপানে চলিল।

নিকটে চক্রবর্তীদের বাটী। বাহিরে আটচালার পার্শ্বে সদানন্দ একটা গোবৎসকে বহুবিধ সম্বোধন করিয়া আদর করিতেছিল। ললনা সেইখানে প্রবেশ করিয়া নিকটে দাঁড়াইল। সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল, ললনা, তুমি যে!

পিসিমা বাড়ি আছেন?

না। এইমাত্র কোথায় গেলেন।

ললনা ইতস্ততঃ করিয়া একপদ পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সদানন্দ গোবৎসকে ছাড়িয়া দিয়া ললনার মুখপানে চাহিয়া বলিল, পিসিমার কাছে দরকার আছে কি?

হাঁ।

তিনি ত বাড়ি নেই আমাকে বললে হয় না?

ললনাও সেই কথা ভাবিতেছিল, কিন্তু সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিবামাত্র লজ্জায় তাহার সমস্ত বদন লাল হইয়া গেল। বাটীতে কিছু খাইবার নাই সেইজন্য আসিয়াছি—ছি ছি! একথা কি বলা যায়? একদিন না খাইলে কি চলে না? কিন্তু আর সবাই? শুভদাও একদিন ঠিক এই কথাই ভাবিয়াছিল, আজ ললনাও তাহাই ভাবিল—তবু মুখ ফুটে না। যে কখনো এই অবস্থায় পড়িয়াছে, সে-ই জানে ইহা বলা কত কঠিন! সেই কেবল বুঝিবে ভদ্রলোকের একথা বলিতে গিয়া বুকের মাঝে কত আন্দোলন, কত ঘাত-প্রতিঘাত হইয়া যায়। বলিবার পূর্বে কেমন করিয়া জিহ্বার প্রতি শিরা আপনা-আপনি আড়ষ্ট হইয়া ভিতরে ভিতরেই জড়াইয়া যায়!

ললনা মুখ ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিল না ; কিন্তু সদানন্দ যেন বুঝিতে পারিল, তাহার মুখ দিয়া ভিতরের ছায়া বুঝি কতক অনুমান করিয়া লইল, তাই হাসিয়া উঠিয়া ললনার হাত ধরিল। সে পাগল ; সকলেই জানিত সদাপাগলার মতি স্থির নাই। এমন অনেক কাজ সে করিয়া ফেলিত যাহা অন্যে করিতে পারিত না ; অন্যে যাহাতে সঙ্কোচ করিত, সে হয়ত তাহাতে সঙ্কোচ করিত না ; অন্যকে যাহা মানাইত না, তাহাকে হয়ত সেটা মানাইয়া যাইত। তাই স্বচ্ছন্দে আসিয়া সে ললনার হাত ধরিল। হাসিতে হাসিতে বলিল, আজ বুঝি ললনার তার সদাদাদাকে লজ্জা হইতেছে? সদাপাগলাকে বুঝি লজ্জা করিতে হয়? হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিল, কি, কথা বলিবে না?

সদানন্দের গলার স্বর, কথার ভাব—একরকমের। হাসিতে হাসিতেও সে অনেক সময় এমন কথা বলিত, যাহা শুনিলে চোখের জল আপনি উছলিয়া উঠে। তথাপি ললনা কথা কহে না। এবার সদানন্দ মুখ তুলিয়া নিতান্ত গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া বলিল, কি রে ললনা? কিছু হইয়াছে কি?

ললনা মুখ নীচু করিয়া চক্ষু মুছিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, আমাকে একটা টাকা দাও।

সদানন্দ পূর্বের মত, বরং আরো একটু উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া বলিল, এই কথা! এটা বুঝি আর সদাদাদাকে বলা যায় না? কিন্তু টাকা কি হবে?

তখনও লজ্জা! ললনা ইতস্ততঃ করিয়া লজ্জায় আরো একটু রক্তবর্ণ হইয়া বলিল, বাবা বাড়ি নেই।

সদানন্দ ঘরের ভিতর ঢুকিয়া একটার পরিবর্তে পাঁচটা টাকা আনিয়া ললনার হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিল, মানুষের মত মানুষ হলে তাহাকে লজ্জা করিতে হয়। পাগলকে আবার লজ্জা কি? তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যখন কিছু প্রয়োজন হইবে তখন ক্ষ্যাপা পাগলাটাকে আগে আসিয়া বলিও। কেমন বলিবে ত?

ললনা দেখিল তাহার হস্তে অনেকগুলি টাকা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই বলিল, এত টাকা কি হইবে?

রাখিয়া দিলে পচিয়া যাইবে না।

তা হোক, এত টাকায় আমাদিগের প্রয়োজন নাই।

টাকা ফিরাইয়া দিতে আসিতেছে দেখিয়া সদানন্দ আবার আসিয়া তাহার হাত ধরিল। কাতরভাবে বলিল, ছি, ছেলেমানুষি ক'রো না। টাকার প্রয়োজন না থাকে অন্যদিন ফিরাইয়া দিও। আর একথা কাহাকেও বলিও না ; তবে নিতান্ত যদি বলিতে হয়, বলিও যে সদাপাগলা টাকায় চারি পয়সা হিসাবে সুদে টাকা ধার দিয়েছে।

দিনমান এইরূপে অতিবাহিত হইয়া গেল। সকলে আহার করিল, কিন্তু শুভদা সেদিন জলস্পর্শও করিল না। রাসমণি অনেক গালাগালি করিলেন, ললনা অনেক পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু কিছুই সেদিন তাহার মুখে উঠিল না।

সন্ধ্যার পর হারাণচন্দ্র রুক্ষ মাথায় একহাঁটু ধূলা লইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বস্ত্রের কোঁচার একপার্শ্বে সের দুই আন্দাজ চাউল, অপরপার্শ্বে একটু লবণ, দুটো আলু, দুটো পটল, আরো এমনি কি কি বাঁধা ছিল। একটা পাত্র আনিয়া সেগুলি খুলিয়া রাখিবার সময় শুভদা কাঁদিয়া ফেলিল। চাউল একরকমের নহে ; তাহাতে সরু মোটা, আতপ, সিদ্ধ সমস্তই মিশ্রিত ছিল। শুভদা বেশ বুঝিতে পারিল, তাহার স্বামী তাহাদিগের জন্য এইগুলি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার একটু পূর্বে মাধব বলিল, বড়দিদি, আমি বোধ হয় আর ভাল হতে পারব না।

ললনা সস্নেহে ভ্রাতার মস্তকে হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিল, কেন ভাই ভাল হবে না? আর দুদিনেই তুমি সেরে উঠবে।

কত দুদিন কেটে গেল, কই সেরে ত উঠলাম না।

এইবার সারবে।

আচ্ছা, যদি ভাল না হই?

নিশ্চয় হবে।

যদি না হই?

ললনা তাহার দুর্বল ক্ষীণ হাত দুইটি আপনার হাতে লইয়া অল্প গম্ভীর হইয়া বলিল, ছিঃ, ওকথা মুখে আনতে নেই।

মাধব আর কথা কহিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে ললনা কহিল, কিছু খাবি কি?

মাধব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

কিছুক্ষণ পরেই ঔষধ খাওয়াইবার সময় হইল। ললনা একটা ছোট কাঁচের গ্লাসে একটু পাঁচন ঢালিয়া মাধবের মুখের কাছে আনিয়া বলিল, খাও।

মাধব পূর্বের মত শিরশ্চালন করিল। ঔষধ সে কিছুতেই খাইবে না। সে এরূপ প্রায়ই করিত, তিক্ত ঔষধ বলিয়া কিছুতেই খাইতে চাহিত না, কিন্তু একটু জোর করিলেই খাইয়া ফেলিত।

ললনা বলিল, ছিঃ, দুষ্টামি করে না—খাও।

মাধব হস্তে গ্লাসে লইয়া সমস্ত ঔষধটা নীচে ফেলিয়া দিল।

মাধব আর কখনও এরূপ করে নাই। ললনা বিস্মিত হইল, ক্রুদ্ধ হইল। বলিল ও কি মাধু।

আমি ওষুধ আর খাব না।

কেন?

মিছামিছি খাব কেন? যদি ভালই হব না, তবে ওষুধ খেয়ে কি হবে?

কে বলেচে ভাল হবে না?

মাধব চুপ করিয়া রহিল।

ললনা নিকটে আসিয়া উপবেশন করিল। তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিল, মাধু আমার কথা

শুনবে না?

বালক-সুলভ অভিমানে তাহার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল।

আমার কথা কেউ শোনে না, আমিও কারো কথা শুনব না।

কে তোমার কথা শোনে না?

কে শোনে? আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করলে মা রাগ করেন, বাবা রাগ করেন, পিসিমা কথা কন না, তুমিও রাগ কর, তবে আমি কেন কথা শুনব?

মাধবের চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললনা সস্নেহে তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি শুনব।

তবে বল, আমি ভাল না হলে কি রোজ এমনি করেই শুয়ে থাকব?

তা কেন?

তবে কি?

ললনার ওষ্ঠ ঈষৎ কম্পিত হইল। কোন কথা কহিতে পারিল না।

মাধব তাহার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, বড়দিদি, আমাদের ছোটভাই যাদুর অসুখ হয়েছিল, কিন্তু সে ভাল হ'ল না। তার পর মরে গেল। বাবা কাঁদলেন, মা কাঁদলেন, পিসিমা কাঁদলেন, তুমি কাঁদলে—সবাই কাঁদলে—মা আজও কাঁদেন, কিন্তু সে আর এল না, আমিও যদি তার মত মরে যাই?

ললনা দুই হস্তে নিজের মুখ আবৃত করিল। অন্যসময় হইলে সে তিরস্কার করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিত, কিন্তু এখন পারিল না। মাধবও কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর পুনর্বার কহিল, বল না বড়দিদি, মরে গেলে কি হবে?

ললনা মুখ আবৃত করিয়াই কহিল, কিছু না—শুধু আমরা কাঁদব। বুঝি সে তখনই কাঁদিতেছিল।

মাধব বুঝিতে পারিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু সে আজ আর ছাড়িবে না ; অনেকদিন হইতে যে কথার জন্য সে ব্যাকুল হইয়াছিল তাহা আজ সমস্ত জানিয়া লইবে। তাই পুনর্বার বলিল, দিদি, মরে গিয়ে কোথায় যেতে হয়?

ললনা উপর পানে চাহিয়া বলিল,—ঐখানে—আকাশের উপরে।

আকাশের উপরে? বালক বড় বিস্মিত হইল—কিন্তু সেখানে কার কাছে থাকব?

ললনা অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, আমার কাছে।

মাধব অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। হাসিয়া বলিল, তবে ভাল। আচ্ছা, আমাদের সেখানে বাড়ি আছে?

আছে।

তবে আরো ভাল। আমরা দুজনে সেখানে বেশ থাকব, না?

হাঁ। ললনা মনে মনে প্রার্থনা করিল যেন তাহাই হয়।

মাধব হাত দিয়া তাহার মুখ আপনার দিকে ফিরাইয়া বলিল, বড়দিদি, সেখানে যা ইচ্ছে তাই খেতে পাওয়া যায়—না?

যায়।

অনেক ডালিম আছে?

আছে।

বালক একগাল হাসিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিল। যেন এত আনন্দ সে একপার্শ্বে একভাবে থাকিয়া সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিবে না। কিন্তু তখনই আবার ফিরিয়া বলিল, দিদি, কবে যাওয়া হবে?

মাধু।

কি দিদি?

মাকে ছেড়ে তুই কেমন করে যাবি?

কেন, মা-ও ত যাবে!

যদি না যায়?

আমি ডেকে নিয়ে যাব।

তাতেও যদি না যায়?

এইবার মাধব বড় বিষণ্ণ হইল। দিদি, মা কি কখন যাবে না?

যাবে, কিন্তু অনেকদিন পরে।

তা হোক—আমরা আগে যাব ; তার পর না হয় মা যাবে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিল, মাকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না?

না। একথা মাকে বললে তিনিও যাবেন না—আমাকেও যেতে দেবেন না।

মাধব ভয়ে ভয়ে বলিল, তবে বলব না। তুমি আমাকে ওষুধ দিয়ে খাও গে যাও। আমি শুয়ে থাকি।

ঔষধ খাইয়া, বাতাসা খাইয়া, জল খাইয়া, মাধবচন্দ্র মনের সুখে আকাশের কথা ভাবিতে লাগিল। সেখানে কত কি করিবে, কত ঘুরিয়া বেড়াবে, কত ডালিম খাইবে, দুই-চারিটা জননীর নিকটে নীচে ফেলিয়া দিবে, ভাল ভাল পাকা ডালিম নিজে খাইয়া খোসাগুলো ছলনাদিদির গায়ে ছুঁড়িয়া মারিবে, একটি দানাও তাহাতে রাখিবে না, ছলনাদিদি খুব চাহিবে, অনেক চাহিবে—তবে দুটো-একটা ফেলিয়া দিবে,—আরো কত কি শত-সহস্র কর্মের তালিকা মনে মনে প্রস্তুত করিতে করিতে মাধবচন্দ্র সে রাত্রের মত ঘুমাইয়া পড়িল।

আর ললনা? সেও সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইল। পিসিমা রাসমণি, জননী শুভদা, ছলনা হারাণচন্দ্র সকলেই ডাকাডাকি করিল, কিন্তু কিছুতেই সে উপরের দ্বার খুলিল না।

বড় মাথা ধরিয়াছে—আমাকে ডাকিও না—আমি কিছুতেই উঠিতে পারিব না।

পরদিন হইতে মাধবচন্দ্র একটু অন্যরকম হইয়াছে। সে একে শান্ত, তাহার উপর আরো শান্ত হইয়াছে। ঔষধ খাইতে আর আদৌ আপত্তি করে না ; এটা খাব না, ওটা খাব, ও খাব না, তা দাও, এরূপ একবারো বাহানা করে না। আজকাল সর্বদাই প্রফুল্ল। মা যদি কখন জিজ্ঞাসা করেন, মাধু, কিছু খাবি কি? সে বলে, দাও।

কি দেব?

যা হয় দাও।

বড়দিদি কাছে বসিয়া থাকিলে ত আর কথাই নাই। দুজনে চুপি চুপি অনেক কথা কহে, বিস্তর পরামর্শ করে ; কিন্তু কেহ আসিয়া পড়িলে চুপ করিয়া যায়।

এখন হইতে হারাণের সংসারে আর তেমন ক্লেশ নাই। যখন বড় কিছু হয় তখনই ললনা দুটো-একটা টাকা বাহির করিয়া দেয়। শুভদা জানে, কোথা হইতে টাকা আসিতেছে, রাসমণি ভাবে হারাণ কোথা হইতে লইয়া আসে, হারাণ ভাবে, মন্দ কি! যখন কোথা হইতে আসিতেছে, তখন কোথা হইতেই আসুক। আমিই বা কোথা হইতে আনিব? তবে একটা কথা তাঁহার আজকাল প্রায়ই মনে হইতেছে, সে কথাটা আফিমের মৌতাত সম্বন্ধে। মাঝে মাঝে ভয় হয়, অভ্যাসটা বুঝি একেবারেই ছাড়িয়া যাইতেছে। আর ছাড়িলেই বা উপায় কি? বাহাল রাখিবার মত আফিম বা কোথা হইতে যোগাইব? যেমন করিয়াই হউক আর যাহা করিয়াই হউক পেট ভরিয়া যখন চারিটা খাইতে পাইতেছি, তখন ওজন্য আর মন খারাপ করিব না ; সময় ভাল হইলে আবার সবই হইবে, এখন যেমন আছি তেমনিই থাকি।

দিনকতক পরে সদানন্দর পিসিমাতা একদিন তাহাকে ধরিয়া বসিলেন, বাবা, আমাকে একবার কাশী করিয়া লইয়া আইস ; কবে মরিব কিছুই জানি নাই, অন্ততঃ এজন্মে একবার কাশী বিশ্বেশ্বর দেখিয়া লই।

সদানন্দ কোন কিছুতেই আপত্তি করে না, ইহাতেও করিল না। দুই-একদিন পরে কাশী যাইবে

স্থির করিল। যাইবার দিন সন্ধ্যাবেলা 'ললনা, ললনা' ডাকিতে ডাকিতে সে একেবারে উপরে আসিয়া উঠিল। ললনা তখন উপরেই ছিল, সদানন্দকে আসিতে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ কোঁচার কাপড়ে করিয়া গোটা-পঞ্চাশ টাকা বাঁধিয়া আনিয়াছিল সেইগুলি খুলিয়া একটা বালিশের তলায় চাপা দিয়া রাখিয়া বলিল, আমরা আজ কাশী যাইব। কবে ফিরিব বলিতে পারি না। যদি প্রয়োজন হয় এগুলি খরচ করিও।

ললনা বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল—এত টাকা?

সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দও হাসিয়া উঠিল—কত টাকা? পঞ্চাশ টাকা বেশি টাকা নহে! দেখিতে অনেকগুলি বটে, কিন্তু খরচের সময় খরচ করিতে অনেক নহে।

কিন্তু এত—

কথা শেষ করিতে না দিয়াই সদানন্দ কি একরূপ হস্তভঙ্গি করিয়া একেবারে নীচে আসিয়া রন্ধনশালায় শুভদার নিকট আসিয়া বসিল।

খুড়িমা, আজ আমরা কাশী যাব।

শুভদা সে কথা শুনিয়াছিলেন। বলিলেন, কবে আসবে?

তা কেমন করে বলব? তবে পিসীমার কাশী দেখা হলেই ফিরে আসব বোধ হয়। শুভদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই এস বাবা। আশীর্বাদ করি নিরাপদে থেক।

সদানন্দ উচ্চ হাসিয়া প্রস্থান করিল। পরদিন ললনা অর্ধেকগুলি টাকা নিজের নিকট রাখিয়া অপর অর্ধেক মাতৃসকাশে ধরিয়া দিয়া বলিল, মা, যাবার সময় সদাদাদা এই টাকাগুলি দিয়ে গেছেন।

শুভদা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সেগুলি গুণিতে লাগিলেন। গণনা শেষ করিয়া কন্যার পানে চাহিয়া বলিলেন, সদানন্দ আর-জন্মে বোধ হয় আমাদের কেউ ছিল।

ললনা মাথা নাড়িয়া বলিল, বোধ হয়?

এত টাকা কি মানুষে দিতে পারে?

ললনা উত্তর দিল না।

ললনা, সদানন্দ কি পাগল?

কেন?

তবে এমন করে কেন?

দুঃখীর দুঃখে দুঃখী হওয়া কি পাগলের কাজ?

তবে লোকে পাগল বলে কেন?

ললনা সহাস্যে বলিল, লোকে অমন বলে থাকে।

হারাণ মুখুজ্যের সংসারে আজকাল কষ্ট নাই বলিলেই হয়। খাওয়া-পরা বেশ চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু পাড়ার পাঁচজনে পাঁচ কথা বলিতে লাগিল।

কেহ বলিল, হারাণে বেটা নন্দীদের ঢের টাকা মারিয়াছে; কেহ বলিল, বেটা আজকাল একটা বড়লোক। কেহ বলিল, কিছুই নাই—বাড়িতে দুবেলা হাঁড়ি চড়ে না। এমনি অনেক কথা হইত। যাহারা পর তাহারা একটু কম কৌতূহলী হইয়া রহিল, যাহারা একটু আত্মীয় তাহারা অধিক কৌতূহলী হইয়া মুখোপাধ্যায়-পরিবার সম্বন্ধে অল্পবিস্তর ছিদ্র খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণঠাকুরানী সহসা আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, বলি বৌয়ের কি হচ্ছে? খাওয়া-দাওয়া চুকল কি?

শুভদা বলিল, হাঁ, এইমাত্র।

তখন কৃষ্ণঠাকুরানী পানের সহিত তামাকপত্র চর্বণ করিতে এবং পিক্ ফেলিতে ফেলিতে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করতঃ বলিলেন, বৌ, হারাণ আজকাল করছে কি?

কি আর করবেন—চাকরি-বাকরির চেষ্টা করছেন।

সংসার চলচে কেমন করে?

শুভদা উত্তর করিল না।

কৃষ্ণঠাকুরানী আবার বলিলেন, লোকে বলে হারাণ মুখুজ্যে নন্দীদের ঢের টাকা মেরেচে সে আজকাল বড়লোক—তার খাবার ভাবনা কি? কিন্তু আমি ত সব কথা জানি, তাই বলি, সংসার এখন চলে কেমন করে?

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, অমনি একরকম করে।

হারামজাদা মাগী বামুনপাড়ার কাত্তি, সে-ই ত এই দুর্ঘটনা ঘটালে; ইচ্ছা করে মুখপুড়ীকে পাঁশ পেড়ে কাটি।

শুভদা একথা কানে না তুলিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, তোমার খাওয়া হয়েছে?

হাঁ বোন, হয়েছে। সেই হারামজাদীই ত এই সর্বনাশ ঘটালে। হারাণ মুখ্যু কি না, তাই তার ফাঁদে পা দিলে। তিন হাজার টাকা চুরি করলি, না হয় দু শ' এক শ' মাগীর হাতেই এনে দিতিস! তবু ত কিছু থাকত?

শুভদা বলিল, ঠাকুরঝি, আজ কি রাঁধলে?

কি আর রাঁধব বোন? আজ বেলা হয়ে গিয়েছিল, তাই ভাতে-ভাত ছাড়া আর কিছুই করিনি। তা মাগীর কি ছাই একটু পরকালের ভাবনাও আছে? মিন্‌সে দুটো টাকার জন্যে যখন হাতে-পায়ে ধরলে, তখন কিনা ঘর থেকে বের করে দিলে! কিন্তু ভগবান কি নেই? বামুনের যেমন সর্বনাশ করেছে তোর মতন সতীলক্ষ্মীর যখন চোখের জল ফেলিয়েচে, তখন শাস্তি কি হবে না? তুই দেখিস, আমি বললাম—

শুভদা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল ঠাকুরঝি, বিন্দু অমন হঠাৎ শ্বশুরবাড়ি চলে গেল কেন?

ওর শ্বশুরের নাকি রাতারাতি কলেরা হয়েছিল। তা তুই এখন সংসারের কিরকম বন্দোবস্ত করবি?

আমি আর কি করব? ঈশ্বর যা করবেন তাই হবে।

কৃষ্ণঠাকুরাণী একটু দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, তা ত হবেই। কিন্তু ভাবনার উপর ভাবনা হচ্চে এই তোর ছোট মেয়েটা ক্রমে সে বড় হয়ে উঠল—এখন তার বিয়ে না দিলে ভালও দেখাবে না বটে, আর লোকেও পাঁচকথা বলবে। তার কি কিছু উপায় হচ্চে?

শুভদা যখন ম্লানমুখে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল, তখন ললনা সেস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছলনার কথা সে কতক শুনিতে পাইয়াছিল, এবং কতক অনুমান করিয়া লইয়া বেশ বুঝিল যে, সুসময়ই হউক, আর অসময়ই হউক, বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের বিবাহ না দিলে চলিবে না; সম্ভবতঃ জাতি যাইবে।

নবম পরিচ্ছেদ

শুক্লা একাদশীর রজনীর প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। ভাগীরথীতীরের অর্ধবনাবৃত একটা ভগ্ন শিবমন্দিরের চাতালের উপর একজন দ্বাবিংশবর্ষীয় যুবক যেন কাহার জন্য পথ চাহিয়া বহুক্ষণ হইতে বসিয়া আছেন।

যুবকের নাম শারদাচরণ রায়। এই হলুদপুর গ্রামের একজন বর্ধিষ্ণু লোকের একমাত্র সন্তান। লেখাপড়া কতদূর হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান এবং কর্মদক্ষ তাহা বলিতে পারি। বৃদ্ধ পিতার সমস্ত সাংসারিক কর্ম নিজেই নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। শারদাচরণের জননী জীবিত নাই। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন হারাণ মুখুজ্যেদের বাটীর সহিত ইঁহাদের খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। রাসমণি ও শারদার জননী উভয়ের অত্যন্ত প্রণয় ছিল। এখন তিনিও গত হইয়াছেন, আত্মীয়তা বন্ধুত্বও গত হইয়াছে। বিশেষ শারদাচরণের পিতা হরমোহনবাবু দরিদ্রের সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন না।

এইখানে একটু ললনার কথা বলিয়া রাখি; কেননা, তাহার সহিত এ আখ্যায়িকার আমাদিগের অনেক প্রয়োজন আছে। বালিকা-কাল হইতেই শারদার সহিত তাহার ভাব ছিল,

তাহার পর তাহার বিবাহ হয়। হারাণবাবুর অবস্থা তখন মন্দ ছিল না, ক্ষুদ্র আয়তনে যতখানি সম্ভব, ঘটা করিয়া বড়মেয়ের বিবাহ দেন ; কিন্তু দুর্ভাগ্যে ললনা দুই বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইয়া বাটী ফিরিয়া আইসে। তখনও শারদাচরণের সহিত তাহার ভাব ছিল। সে ভাব কমিল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ক্রমে দুইজনেরই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি হইতে লাগিল ; ক্রমে দুইজনেই বুঝিতে লাগিল যে, এ প্রণয় পরিণামে বড় সুখের হইবে না। শারদাচরণ না বুঝুক কিন্তু ললনা একথা বেশ বুঝিতে লাগিল। ক্রমশঃ ললনা ভালবাসার দোকান-পাট একে একে বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল। সে আর কাছে আসে না, আর আসিতে বলে না, আর ভালবাসা জানায় না, আর গোপনে তেমন করিয়া পত্র লিখে না—দেখিয়া শুনিয়া শারদাচরণ বড় বিপদে পড়িল। প্রথমে সে অনেক বুঝাইল, অনেক আপত্তি প্রকাশ করিল, অনেক যুক্তি দেখাইল, কিন্তু ললনা কর্ণযুগল বন্ধ করিয়া রহিল। একদিন সে একরূপ স্পষ্টই কহিল যে তাহার এসব আর ভাল লাগে না।

শারদাচরণও সেদিবস কুপিত হইল, বলিল, যদি ভাল লাগে না তবে এতদিন লাগিল কেন?

এতদিন ছেলেমানুষ ছিলাম, এখন বড় হইয়াছি।

বড় হইলে বুঝি আর ভাল লাগিতে নাই?

না।

কিন্তু বুঝিয়া দেখ—

কথা শেষ না হইতেই ললনা বলিয়া উঠিল, আর বুঝিয়া কাজ নাই। তুমি আমাকে আর কুপরামর্শ দিও না।

শারদাচরণ চটিয়া উঠিয়া বলিল, আমি বুঝি তোমাকে কুপরামর্শ দিই?

দাও না ত কি!

দিই?

দাও।

তবে এস আজ সব শেষ করে দিই।

ভালই ত।

তোমার সঙ্গে এজন্মে আমি আর কথা ক'ব না।

ক'য়ো না।

তখন দুইজনে দুইজনের গন্তব্যপথে চলিয়া গেল। সমস্ত পথটা শারদাচরণ গর্জিতে গর্জিতে গেল, সমস্ত পথটা ললনা চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিল।

সে আজ চারি বৎসরের কথা। চারি বৎসর পরে শারদাচরণ আবার ললনার পথ চাহিয়া ভগ্ন মন্দিরে বসিয়া রহিল। সে পূর্বের কথা একরকম ভুলিয়া গিয়াছিল, অন্ততঃ যাইতেছিল ; কিন্তু ললনাই পুনর্বার অনুরোধ করিয়া তাহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছে। তাই পূর্বের কথা পুনরায় একটির পর একটি করিয়া তাহার মস্তিষ্কে উদয় হইতে লাগিল। কেহ বলে, বাল্যপ্রেমে অভিসম্পাত আছে ; কেহ বলে, বাল্যপ্রেম দৃঢ় হয় না ; কেহ কহে, দৃঢ় হয়। যাহাই হউক এবিষয়ে ঠিকঠাক একটা কোনরূপ বন্দোবস্ত করা নাই। সকল রকমই হইতে পারে ; কিন্তু যাহাই হউক, ইহার একটি স্মৃতি চিরদিনের জন্য ভিতরে রহিয়া যায়। যেমন করিয়া উপড়াইয়া ফেলিয়া দেওয়া হউক না কেন, একটু ক্ষুদ্রতম শিকড় বোধ হয় অনুসন্ধান করিলে অনেক হাত জমির তলে পাওয়া যায়।

শারদাচরণের অনেক কথা মনে হইতে লাগিল। আজ চারি বৎসর, পরে সে আবার আসিবে, কাছে বসিবে, কথা কহিবে! শারদার ভিতরটা যেন একটু শিহরিয়া উঠিল, আনন্দে যেন অল্প রোমাঞ্চ হইল। কিন্তু কেন? কেন আসিবে? কেন আমাকে এসময়ে এস্থানে আসিতে অনুরোধ করিল? আর কি সম্বন্ধ আছে?

রাত্রি প্রায় একটা বাজে। একজন স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সেই পথে আসিতে লাগিল।

শারদাচরণ ভাবিল, একি ললনা? ললনাই ত বটে! কিন্তু বড় হইয়াছে।

ললনা আসিয়া নিকটে দাঁড়াইল। শারদাচরণ সঙ্কোচ ছাড়িয়া বলিল, বসো।

তখন বহুদিন পর দুইজনে মুখোমুখি হইয়া চাঁদের আলোকে ভগ্ন মন্দিরে সেই চাতালের উপর উপবেশন করিল। বহুক্ষণ অবধি কেহ কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর শারদাচরণ সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল আমাকে এখানে ডাকাইয়া আনিলে কেন?

ললনা মুখ তুলিয়া বলিল, আমার প্রয়োজন আছে।

কি প্রয়োজন?

বলিতেছি।

পুনরায় বহুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইলে শারদাচরণ বলিল, কই বলিলে না?

বলিতেছি। পূর্বে তুমি আমাকে ভালবাসিতে, এখন আর বাস কি?

প্রশ্নের ভাবে শারদাচরণ বড় বিস্মিত হইল। কহিল, সে কথা কেন?

কাজ আছে।

যদি বলি এখনও ভালবাসি?

ললনা মৃদু হাসিয়া সলজ্জে বলিল, আমাকে বিবাহ করিবে?

শারদাচরণ একটু পিছাইয়া বসিল। বলিল, না।

কেন করিবে না?

তোমাকে বিবাহ করিলে জাতি যাইবে।

গেলেই বা।

খাইব কি?

খাইবার ভাবনা তোমাকে করিতে হইবে না।

কিন্তু পিতার মত হইবে না।

হইবে। তুমি তাঁহার ত একটিমাত্র সন্তান ; ইচ্ছা করিলে মত করিয়া লইতে পারিবে।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শারদাচরণ বলিল, তবুও হয় না।

কেন?

অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ পিতার মত হইলেও, তোমাকে বিবাহ করিলেই জাতি যাইবে। জাতি খুইয়ে হলুদপুর তিষ্ঠান আমাদিগের সুখের হইবে না। আর আমার এমন অর্থও নাই যে, তোমাকে লইয়া বিদেশে গিয়া থাকিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে তাহা ফুরাইয়াই যাউক, ইহা আমার ইচ্ছাও বটে, মঙ্গলের কারণও বটে।

ললনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, তবে তাহাই হউক। কিন্তু আমার একটি উপকার করিবে?

বল, সাধ্য থাকে ত করিব।

তোমার সাধ্য আছে কিন্তু করিবে কিনা বলিতে পারি না।

বল ; সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া দেখিব।

আমার ভগিনী ছলনাকে বিবাহ কর।

শারদাচরণ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন, তাহার কি পাত্র জুটিতেছে না?

কৈ জুটিতেছে? আমরা দরিদ্র ; দরিদ্রের ঘরে কি সহজে বিবাহ করিবে? শুধু তাই নয়। আমরা কুলীন ; অঘরে বিবাহ দিলে হয়ত বর জুটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলে কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়। তোমরা আমাদের পালটি ঘর ; তুমি বিবাহ করিলে সবদিকই রক্ষা হয়। বিবাহ করিবে?

আমি পিতার সম্পূর্ণ আজ্ঞাধীন। তাঁর মত না লইয়া কোন কথাই বলিতে পারিব না।

তবে মত লইয়া বিবাহ কর।

আমি যতদূর জানি, এ বিবাহে তাঁহার মত হইবে না।

ললনা ম্লানভাবে কহিল, কেন মত হইবে না?

তবে তোমাকে বুঝাইয়া বলি। লুকাইয়া কোন ফল নাই। আমার পিতা কিছু অর্থপিপাসু তাঁহার ইচ্ছা যে আমার বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ লাভ করেন। তোমরা অবশ্য কিছুই দিতে পারিবে না, তখন বিবাহও হইবে না।

ললনা কাতর হইয়া বলিল, আমরা দরিদ্র, কোথায় কি পাইব? আর তোমাদের অর্থের প্রয়োজন কি? যথেষ্ট ত আছে।

শারদাচরণ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, সেকথা আমি বুঝি, কিন্তু তিনি বুঝিবেন না।

তুমি বুঝাইয়া বলিলে নিশ্চয় বুঝিবেন।

আমি একবার মাত্র বলিব ; বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

ললনা নিতান্ত বিষণ্ণ হইয়া বলিল, তবে কেমন করিয়া হইবে?

আমি কি করিব?

তোমার বোধ হয় বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই।

না।

ছলনার মত কন্যা তুমি সহজে পাইবে না। সে সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, কর্মিষ্ঠা—অধিকন্তু একজন দরিদ্রের যথেষ্ট উপকার করা হইবে, একজন ব্রাহ্মণের জাতি-কুল রক্ষা করা হইবে এবং আমি চিরদিন তোমার কেনা হইয়া থাকিব। বল, এ বিবাহ তুমি করিবে?

পিতা যাহা বলিবেন তাহাই করিব।

আজ তোমাকে সকল কথা বলি। হয়ত এজন্মে আর কখন বলিবার অবসর পাইব না, তাহাই বলি—তোমাকে লজ্জা কখন করি নাই, আজও করিব না। সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়া যাই—তোমাকে চিরদিন ভালবাসিয়া আসিয়াছি, এখনো ভালবাসি। একথা পূর্বে একবার বলিয়াছিলাম, আজ বহুদিন পরে আর একবার শেষ বলিলাম। তুমি, আমার একমাত্র অনুরোধ—বোধ হয় এই শেষ অনুরোধ—রাখিলে না। যা হইবার হইল, আর এমন কখন হইবে না। মিথ্যা তোমাকে এত ক্লেশ দিলাম, সেজন্য ক্ষমা করিও।

শারদাচরণ মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিল। ললনা চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া বলিল, পিতাকে এবিষয়ে অনুরোধ করিব।

ললনা না ফিরিয়াই বলিল, করিও।

কিন্তু আমি পিতার আজ্ঞাধীন।

ললনা চলিতে চলিতে বলিল, তাহা ত শুনিলাম।

যদি কিছু করিতে পারি তোমাকে জানাইব।

ভাল।

ললনা, আমাকে ক্ষমা করিও।

করিয়াছি।

দশম পরিচ্ছেদ

আমার নক্সা,—দাও বাবা চার আনা পয়সা। 'গাড্ডিলে'র হাত হইতে চারি আনা তাম্রখণ্ড গুনিয়া লইয়া হারাণচন্দ্র কোঁচার খুঁটে জড়াইয়া রাখিলেন। যা থাকে কপালে—ধরলাম আট আনা। আট আনা পয়সা হারাণচন্দ্র সম্মুখে শতছিন্ন চাটায়ের উপর ঠুকিয়া রাখিয়া তাস হাতে লইলেন। সঙ্গীরা সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে স্ব স্ব তাস দেখিতে লাগিল। অল্পক্ষণ পরেই হাত দুই-তিন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, ফের নক্সা—দাও ত চাঁদ টাকা। 'গাড্ডিল' হারাণচন্দ্রকে টাকা দিয়া তাহার সম্মুখে তাস জোড়া নিক্ষেপ করিল। অপরাপর সকলে একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া স্ব স্ব তহবিল হাতড়াইয়া পয়সা বাহির করিতে লাগিল।

আর চাই—আর চাই—আর চাই?

বস্ কর—আর না।

পনরতে চেপে যাও।

পচে যা—পচে যা বাবা—এই আমার নক্সা।

প্রায় নিশাবসানে হারাণচন্দ্র যখন স্থান পরিত্যাগ করিলেন তখন কোঁচার টিপ টাকায় পয়সায় রীতিমত ভারী। সে রাত্রে তাঁহার আর বাটী যাওয়া হইল না। পরদিনও এ দোকান সে দোকান করিয়া বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। বেলা চারিটার সময় যখন তিনি বাটীতে প্রবেশ করিলেন তখন তাঁহার চক্ষু অসম্ভব রক্তবর্ণ ; মুখ, নাক কাপড়, চাদর, সর্বাঙ্গ হইতে গঞ্জিকার দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে।

হারাণচন্দ্র স্নান করিয়া আহার করিতে বসিলে শুভদা সম্মুখে উপবেশন করিয়া বলিল, আজ বড় বেলা হয়েচে।

কি করি বল, কাজের গতিকে বেলা হয়ে যায়। তুমি এখনো কি খাওনি?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

হারাণচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, খাওনি?

এইবার খাব।

হারাণচন্দ্র দুঃখিত হইয়া বলিলেন, এসব তোমার বড় অন্যায়। আমার কিছুই ঠিক নেই। যদি সমস্ত দিন না আসি, তাহলে কি সমস্ত দিন উপবাসী থাকবে?

দুই-এক গ্রাস অন্ন মুখে তুলিয়া হারাণচন্দ্র শুভদার পানে চাহিয়া বলিলেন, কাল সকালবেলা তুমি আমার কাছে কিছু টাকা চেয়েছিলে, না?

শুভদা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, কই না।

চাওনি? আমি ভেবেছিলাম চেয়েছিলে। পরে একটু হাস্য করিয়া বলিলেন, কাল না চেয়ে থাক, দুদিন পরে ত চাইতেই হবে—সে একই কথা। আমার ঐ চাদরের খুঁটে গোটা আষ্টেক বাঁধা আছে, তা থেকে গোটা পাঁচেক তুমি নিও।

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

সে আজ বড় বিস্মিত হইল ; বহুদিন হইতে এরূপ কখন হয় নাই। বহুদিন হইল তিনি এরূপ স্বইচ্ছায় শুভদার হাতে টাকা দিতে আসেন নাই। আহারাদি শেষ হইলে শুভদা বলিল, টাকা পেলে কোথায়?

আজ হারাণচন্দ্রের মুখ ফুটিয়া হাসি বাহির হইল। বলিলেন, ওগো, আমাদের টাকার জন্য ভাবতে হয় না। পুরুষমানুষের পেটে যদি বুদ্ধি থাকে ত তার কাছে সমস্ত পৃথিবীটার টাকা ছড়ান থাকে। বুঝেছ?

শুভদা কি বুঝিল সে-ই জানে, কিন্তু প্রতিবাদ করিল না।

উপরোক্ত ঘটনার পরে প্রায় দুইমাস কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে।

আজ সন্ধ্যার সময় শুভদা ললনার কাছে বসিয়া নিতান্ত মলিন হইয়া বলিল, ললনা, মা, আজ কি কিছু নেই?

কিছুই নেই মা।

কতদিন ওকথা তুই বলেচিস, কিন্তু তার পরেই দু আনা চার আনা বের করে দিয়েচিস ; দ্যাখ মা, যদি কিছু থাকে, নাহলে আজ রাতে জলবিন্দুও কারো মুখে যাবে না।

জননীর কাতর মুখ ও অশ্রুজড়িত গদগদ স্বর শুনিয়া ললনা কাঁদিয়া ফেলিল—কিছুই নেই মা। তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, কিছু নেই।

তখন দুইজনেই কাঁদিতে লাগিল। কন্যাকে অনেকটা অবিশ্বাসী করার মত হইয়াছে বলিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু ললনার অশ্রু অন্য কারণে বহিতে লাগিল। সে 'কিছু নাই' বলিয়াও ইহার পূর্বে দিতে পারিয়াছিল, কিন্তু আজ বাস্তবিকই কিছু দিতে পারিল না। সদানন্দ-প্রদত্ত পঞ্চাশৎ মুদ্রার শেষ বিন্দুটি আজ প্রাতঃকালে নিঃশেষে ব্যয় হইয়া গিয়াছে। সকলে কি খাইবে, কেমন করিয়া রাত্রি কাটিবে, না খাইতে দিতে পারিয়া জননীর মন কেমন হইবে, প্রাতঃকালে আবার কাহার নিকট ভিক্ষা করিতে যাইতে হইবে, এই সব ভাবিয়া তাহার চক্ষে

জল আসিয়া পড়িল। বিন্দু ছিল, সে এখন নাই ; সদানন্দ ছিল, সেও এখানে নাই। শুধু কি তাই? আজ দুইদিন হইতে হারাণচন্দ্রেরও দেখা নাই। সম্ভবতঃ গুলির দোকানে, নাহয় জুয়ার আড্ডায়।

এখানে একটু হারাণচন্দ্রের কথা বলি, তিনি গাঁজা টিপিতেন, গুলি খাইতেন, ছয় পয়সা চারি পয়সা কর্জ করিতেন, দুই আনা চারি আনা শুভদার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া আদায় করিতেন, নিতান্ত দায়ে পড়িলে ফোঁটা কাটিয়া গাময় ছাইভস্ম মাখিয়া ব্রাহ্মণ সন্তানের শেষ বৃত্তি—ভিক্ষা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন, কিন্তু জুয়ার মর্ম বিশেষ অবগত ছিলেন না। এখন এইটি হইয়াছে। জুয়াখেলার প্রথম অংশে যেরূপ হয়, অর্থাৎ দুই-চারি পয়সা পাওয়া যায়, দুই-চারি টাকা লাভ হয়—তাঁহারও তাহাই হইয়াছিল। প্রথমে কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল, অদৃষ্টও তেমনি গুটাইয়া আসিতে লাগিল। শুভদাকে সেই পাঁচ টাকা দেওয়াই তাঁহার শেষ দেওয়া হইল। তাহার পর যে একেবারে কিছুই পান নাই তাহা নহে। কখন কিছু কিছু পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখন আয় অপেক্ষা ব্যয় ভাগটাই অধিক হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্বে তিনি হলুদপুরে তিষ্ঠিতে পারিতেন না। এখন আবার বামুনপাড়ায় তিষ্ঠানও বিপজ্জনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পথিমধ্যে যে-কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় সে-ই কিছু-না-কিছুর জন্য দাবী করিয়া বসে। দুই পয়সা চারি পয়সা, দুই আনা চারি আনা, এমন প্রত্যেক পরিচিত লোকের নিকটই তাঁহার 'কাল দিব' বলিয়া কর্জ করা আছে ; প্রতি দোকানদারের তাঁহার নিকট চারি আনা, আট আনা পাওনা আছে। এই সকল কারণে বামুনপাড়ায় তাঁহাকে সচরাচর আর দেখিতে পাওয়া যায় না ; তবে সন্ধ্যার সময় গুলির দোকানটা অনুসন্ধান করিলে একপার্শ্বে তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। একটু অধিক রাত্রি হইলে জুয়ার আড্ডাঘরের ঝাঁপ খুলিয়া প্রবেশ করিতে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। আজকাল অধিক রাত্রিই তাঁহার এইখানে অতিবাহিত হয়। পয়সা নাই বলিয়া নিজে খেলিতে পারেন না, কিন্তু পরের খেলায় বাজি মারিয়া মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটি পয়সা লাভ করেন। খেলিতে বসিয়া কেহ উঠিতে চাহে না, হারাণচন্দ্র সে-সময়ে তামাক সাজিয়া সরবরাহ করেন, বিজেতার পক্ষ টানিয়া দুটো কথা কহিয়া, দুটো রসিকতা করিয়া, হাতে পৈতা জড়াইয়া দুবার দুর্গানাম জপ করিয়া জয়ী পক্ষের মন রাখিয়া, মৌতাতের জোগাড়টা করিয়া লন। যে দিবস কিছু অধিক আদায় হয় সেদিন নিজেই দুহাত খেলিতে বসেন। হয় কিছু পান, নাহয় লাভের অংশ পিপীলিকায় ভক্ষণ করিয়া ফেলে। দুই-চারি আনা হাতে হইলে সেদিন আর তাহাকে পায় কে? গুলির দোকানে আসিয়া সাবেকি চালে মুরুব্বির আসন গ্রহণ করেন ; অনেককে রাজা-উজির প্রভৃতির উচ্চ পদাভিষিক্ত করিয়া শুভদার মুখখানা মনে করিতে করিতে বাটী আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে অন্ন আছেই। শুভদার জমিদারি কখন ফুরাইবে না ; তাঁহার মূর্তিমতী অন্নপূর্ণা শুভদা কখনও রিক্তহস্ত হইবে না। কাহারও না থাকুক, তাঁহার একমুঠা অন্ন আছেই। কিন্তু বাটী আসিবার সময় তাঁহার একটু মুশকিল হয় ; যেন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হয়, বাটীর নিকটবর্তী হইয়া পা যেন আর তেমন করিয়া চলিতে চাহে না। অবশেষে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনাকে আরও একটু বিব্রত বোধ করিতে হয়। শুভদা যেরূপভাবে পা ধুইবার জল লইয়া আইসে, যেরূপভাবে পা মুছাইয়া দিতে আইসে, যেরূপ শুষ্কমুখে ভাতের থালাটি সম্মুখে ধরিয়া দিয়া মৌন হইয়া নিতান্ত অবসন্নভাবে বসিয়া থাকে, তাহাতে হারাণচন্দ্রের মনটাও কেমন কেমন করিতে থাকে, ভাতের গ্রাসগুলো তেমন স্বচ্ছন্দে উদরের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। বেলা পাঁচটাই হউক আর রাত্রি তিনটাই হউক—হারাণচন্দ্র দেখিতে পায় শুভদা একইভাবে না খাইয়া না বিশ্রাম করিয়া তাহার ভাতের থালাটি সম্মুখে লইয়া বসিয়া আছে। একবার বলে না কেন এত বেলা হইল ; একবার জিজ্ঞাসা করে না এত রাত্রি করিলে কেন? তাহার বিরস মৌন মুখখানাই তাহাকে অধিক বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে; সে বুঝিতে পারে, সে স্বামী হইলেও এত শ্রদ্ধা এত ভক্তির উপযুক্ত নহে, তা এত যত্ন এত আদর সে নির্বিবাদে

ভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। সে দেখিতে পায়, একজন ক্রমাগত অপরাধ করিয়া আসিতেছে, আর একজন ক্রমাগত ক্ষমা করিয়া যাইতেছে, তাই গুলিখোর গাঁজাখোর হইলেও তাহার চক্ষুলজ্জা করে। শুভদা একবার তিরস্কার করে না, একবার রাগ করে না, একবার ভাবভঙ্গিতেও প্রকাশ করে না যে তুমি অমন করিও না, অমন করিলে আমি আর পারিয়া উঠিতেছি না। হারাণচন্দ্রের বোধ হয়, যেন তাহার নিজের বিচার তাহাকে নিত্য নিত্য নিজেই করিতে হইতেছে। নিত্য নিত্য এমন করিয়া অবিচার করিতে যেন মাঝে মাঝে সঙ্কোচ বোধ হয়। যাহা হউক, এমনি করিয়াই দিন কাটিয়া আসিতেছিল।

অদ্য অনেকরাত্রে হারাণচন্দ্র বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া আজ তাঁহার একটু অন্যরূপ ঠেকিল। আজ শুভদা পদপ্রক্ষালনের জল লইয়া আসিল না, নির্দিষ্ট স্থানে অন্নব্যঞ্জন রক্ষা করিয়া কেহ বসিয়া নাই। এককোণে একটা প্রদীপ অতি ম্লানভাবে টিপটিপ করিতেছে, দীপালোক উজ্জ্বল করিতে গিয়া হারাণচন্দ্র দেখিলেন তাহাতে তৈল পর্যন্ত নাই। তাঁহার ভয় হইল ; আজ দুইদিন তিনি বাটী আইসেন নাই, বুঝি-বা ইহার মধ্যে কিছু হইয়া গিয়াছে। শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া হারাণচন্দ্র নিজের মনে কিসব ভাবিতে লাগিলেন।

ভোর হইয়া আসিতেছে তথাপি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। হারাণচন্দ্র কি ভাবিয়া চোরের ন্যায় শতছিন্ন পাদুকাটি হাতে লইয়া নিঃশব্দে ঘরের বাহিরে আসিয়া পড়িলেন।

অলক্ষিতে প্রস্থান করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাহা হইল না। চাতালের উপর ছলনাময়ী বসিয়াছিল। অত ভোরে সে কখন গাত্রোত্থান করে না, কিন্তু আজ কি জানি কেন উঠিয়া বাহিরে বসিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, বাবা, তুমি কখন এলে?

হারাণচন্দ্র নিতান্ত অপ্রতিভভাবে বলিলেন, কাল রাতে।

আচ্ছা বাবা, তোমার কি আক্কেল বল ত? কাল মা, পিসিমা, বড়দিদি—কেউ একবিন্দু জল পর্যন্ত খেতে পায়নি, আর তুমি চুপি চুপি জুতো হাতে করে পালিয়ে যাচ্চ? আজ আমরা কি খাব বল ত?

হারাণচন্দ্রের বোধ হইল ছলনাময়ী যেন তাহার মাথাটা কাটিয়া লইয়াছে। হাতের জুতা আপনা-আপনি খসিয়া নীচে পড়িয়া গেল ; থতমত খাইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিলেন, সত্যি তাই কি?

ছলনা আরও চীৎকার করিয়া ডাকিল, ও পিসিমা, শুনচ বাবার কথা? আমি যেন মিথ্যে কথা বলচি? কাল সমস্ত রাত মা আর বড়দিদি কেঁদেচে—তুমি তা কেমন করে জানবে বল? শুধু খেতে আসা বৈ ত আমাদের সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই!

হারাণচন্দ্র আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, জুতা জোড়াটি হাতে তুলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

ছলনা আর একবার চীৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, বাবা পালিয়ে গেল।

ছলনা ছেলেমানুষ, বুদ্ধি কম, তাহার উপর বিষম দুর্মুখ। কাহাকে কি বলিতে হয়, কখন কি বলিতে হয় সে কখনও শিখে নাই। ললনা এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়াইয়া সব কথা শুনিতেছিল। পিতা চলিয়া গেলে সে ধীরে ধীরে ছলনার সম্মুখে আসিয়া বলিল, ছলনা, তোমার একটুও কি বুদ্ধি নেই?

কেন?

কাকে কি বলতে হয় এখনো কি শেখনি? বাবাকে অমন করে কি বাক্যযন্ত্রণা দিয়ে তাড়িয়ে দিতে হয়?

ছলনা কুপিত হইয়া কহিল, আমি তাড়িয়ে দিলাম, না আপনি পালিয়ে গেল!

ছিঃ! বাপকে কি ওকথা বলতে আছে?

কেন বলতে নেই? বাপের মত বাপ হলে তাকে কিছু বলতে নেই, কিন্তু অমনধারা বাপকে সব বলতে আছে। কার বাপ অমন করে দৌড়ে পালিয়ে যায়? কার বাপ অমন করে গাঁজা-

গুলি খেয়ে বাইরে পড়ে থাকে? আমি খুব বলব—আরো বলব।

ললনা বিরক্ত হইয়া বলিল, এখান থেকে তুই চলে যা।

আমি কেন চলে যাব, তুই চলে যা। তুই আমার উপর গিন্নিপনা করতে আসিস নে।

হার মানিয়া ললনা মৌনমুখে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেইদিন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, শুভদা রাসমণির কাছে একটা কাংস্যপাত্র রাখিয়া বলিল, ঠাকুরঝি, বেলা অনেক হ'ল, আজ তিনি বোধ হয় আর আসবেন না। এই ঘটিটা বাঁধা দিয়ে দেখ না যদি কিছু পাওয়া যায়।

রাসমণি শুভদার মুখপানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বড় লজ্জা করে বৌ।

ললনা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সে ঘটিটা তুলিয়া লইয়া বলিল, মা, আমি একবার দেখে আসি।

শুভদা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, কোথায়?

ললনা মৃদু হাসিয়া একবার পিসিমাতার মুখপানে চাহিয়া বলিল, এই ঘোষেদের দোকানে।

তুই যাবি মা!

কেন, তাতে আর লজ্জা কি? আমি এখানকার মেয়ে ; ছেলেবেলা থেকে আমাকে সবাই দেখচে, আমার আর লজ্জা কি? সুসময় অসময় কার ঘরে নেই মা?

ললনা চলিয়া যায় দেখিয়া রাসমণি তাহার হস্ত হইতে ঘটিটা টানিয়া লইয়া বলিলেন, তবে আমিই যাই।

সেদিন বেলা তিনটার পর সকলের আহার হইল। সকলে তৃপ্ত হইলে শুভদা ললনাকে একপার্শ্বে টানিয়া লইয়া গিয়া বলিল, ললনা, লুকিয়ে দুটো শজনে শাক ছিঁড়ে আন না মা!

ললনা বিস্মিত হইয়া বলিল, এত বেলায় কি হবে বল?

আমার দরকার আছে।

কি দরকার মা?

শুভদা অল্প হাসিয়া বলিল, তোর শুনে কি হবে?

কথার ভাবে ললনা যেন কতক বুঝিতে পারিল, বলিল, হাঁড়িতে বুঝি ভাত নেই?

ভাত কেন থাকবে না?

তবে কেন?

গৃহস্থঘর ; দুটো সিদ্ধ করে রাখতে দোষ কি?

ললনা কাতর হইয়া বলিল, সত্যি কথা বল না মা, কি হয়েচে?

কি আর হবে?

তোমার পায়ে পড়ি, আমাকে আর লুকিয়ো না, মা। ললনা পায়ে হাত দিতে যাইতেছিল, জননী তাহা ধরিয়া ফেলিল। আরো একটু নিকটে আসিয়া তাহার কপালের উপর চুলগুলি কানের পাশে গুঁজিয়া দিতে দিতে প্রসন্নমুখে বলিল, একজনের বেশি ভাত নেই ; তিনি যদি আসেন, তাই—

তাই বুঝি তুমি শুধু সজনে পাতা চিবিয়ে থাকবে?

শুভদা পূর্বের মত ঈষৎ হাসিয়া বলিল, সজনে পাতা কি অখাদ্য?

অখাদ্য নয় বলে কি শুধু খায়?

তা হোক। তখন তুই ত বললি ললনা, সুসময় অসময় কার ঘরে নেই! তাই অসময়ে সুসময়ের কথা মনে রাখতে নেই। আবার যখন ভগবান মাপবেন, তখন আবার সব হবে। তখন—এবার শুভদার চক্ষেও জল আসিয়া পড়িল।

ললনা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া জননীর পদপ্রান্তে একরাশি শজিনার পাতা ফেলিয়া দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

এখনও সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব আছে। একজন ভিক্ষুক অনেকক্ষণ ধরিয়া বামুন পাড়ার একটি

ক্ষুদ্র মুদির দোকানের একপার্শ্বে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দোকানটি ক্ষুদ্র। দুই-এক পয়সার খরিদ্দার ভিন্ন অন্য কেহ বড় একটা এস্থানে আইসে না। কত লোক আসিতেছে ; এক পয়সার তৈল কিনিতেছে, দুই পয়সার দাল কিনিতেছে, সিকি পয়সার লবণ কিনিতেছে, তাহার পর চলিয়া যাইতেছে। এইরূপে কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ভিক্ষুক কিন্তু কোন কথাই কহে না ; ক্রয়-বিক্রয় দেখিতেছে ও দাঁড়াইয়া আছে। বহুক্ষণ পরে দোকানদারের চক্ষু সেদিকে পড়িল ; তাহার পানে চাহিয়া বলিল, তুমি কি নেবে গা?

ভিক্ষুক মাথা নাড়িয়া বলিল, কিছু না।

দোকানদার বিরক্ত হইয়া বলিল, তবে মিছে এখানে দাঁড়িয়ে ভিড় বাড়িও না।

এইসময় একজন খরিদ্দার বলিয়া উঠিল, ও বুঝি ভিক্ষে করতে এসেছে!

দোকানদার অধিকতর বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, যাও যাও, এখানে কিছু মিলবে না। সন্ধ্যার সময় আবার ভিক্ষে কি?

লোকটা চলিয়া গেল। কিছুদূর গিয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ঠিক পূর্বস্থানে দাঁড়াইল। দোকানদার মুখপানে চাহিয়া বলিল, আবার এলে যে?

চাল কিনবে?

কি চাল? কত ক'রে?

মোটা চাল।

কৈ দেখি?

লোকটা একটা ছোট পুঁটুলি বাহির করিয়া বলিল, এই দেখ।

দোকানদার দ্রব্য দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিল—এ যে ভিক্ষে করা চাল। ক'টা পয়সা নিবি?

চাউল-বিক্রেতা দোকানদারের মুখপানে চাহিয়া বলিল, দু'আনা।

ইস্—চারটে পয়সা দাম হয় না, আবার দু'আনা? আমি নিতে চাইনে।

লোকটাকে বোধ হয় চিনাইয়া দিতে হইবে না। ইনি আমাদের হারাণচন্দ্র!

হারাণচন্দ্র নিকটবর্তী একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দোকানদারের বাপান্ত করিতে করিতে পুঁটুলি খুলিয়া মুঠা মুঠা চাল চর্বণ করিতে লাগিল। এত চাল কি চার পয়সায় দেওয়া যায়? সমস্ত দিনের মেহনতের দাম কি চার পয়সা? আড্ডাধারীর কাছে নিয়ে যাই ত চারদিনের মৌতাত যোগায়, কিন্তু সেখানে কি যাওয়া যায়? ছিঃ—ব্যাটারা ভিক্ষে-করা চাল চিনে ফেলবে। তা হলে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বাড়ি নিয়ে যাব? কিন্তু এ ক'টি চাল কার মুখে দেব? কাজ নেই—

হারাণচন্দ্র পুঁটুলিটি গুছাইয়া বাঁধিয়া আবার সেই দোকানে আসিয়া দাঁড়াইল। দোকানদারকে ডাকিয়া বলিল, চাল নাও।

চার পয়সায় দিবি ত?

হাঁ।

তবে ঐ ধামাতে ঢেলে দে।

হারাণচন্দ্র একটা পাত্রে চালগুলি ঢালিয়া দিয়া হাত পাতিল। দোকানদারের নিকট চারিটি পয়সা গ্রহণ করিয়া কিয়দ্দূরে আসিয়া হারাণচন্দ্র একচোট খুব হাসিয়া লইল।—কেমন ব্যাটাকে ঠকিয়েছি, হারামজাদার যেমন কর্ম তেমন ফল দিয়েছি। অর্ধেক চাল খেয়ে ফেলেছি ব্যাটা ধরতেও পারেনি। দোকানদার যে ধরিবার চেষ্টা পর্যন্ত করে নাই হারাণচন্দ্র তাহা একবারও মনে করিল না। মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে সন্ধ্যার অন্ধকারে গুলিখানার ঝাঁপ খুলিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল।

আর কাজ নাই ; আমরা অন্যত্র যাই।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আর ত পারি নে মা!

তিনদিন উপবাস করিয়া শুভদা কন্যা ললনার গলা ধরিয়া রুদ্ধাবেগে কাঁদিয়া ফেলিল।

ললনা সযত্নে মাতৃ-অশ্রুবিন্দু মুছাইয়া দিয়া বলিল, কেন মা অমন কর, এদিন কিছু চিরকাল থাকবে না—আবার সুদিন হবে।

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়, কিন্তু আর ত সয় না। চোখের উপর তোদের এত দুর্দশা মা হয়ে আর দেখতে পারিনে। আমি মা-গঙ্গার কোলে ডুব দিই, তুই মা যেমন করে পারিস এদের দেখিস। দোরে দোরে ভিক্ষে করিস—উঃ—মা হয়ে আর পারিনে।

শুভদা যেরূপভাবে ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যেরূপভাবে কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিল তাহা দেখিলে পাষাণও গলিয়া যায়। সে আজ অনেকদিনের পর আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে ; অনেক সহ্য করিয়া ধৈর্যচ্যুত হইয়াছে, তাই আজ তাহাকে সামলাইতে পারা যাইতেছে না। যে কখনও ক্রোধ করে না, সে ক্রোধ করিলে বড় বিষম হয় ; যে বড় শান্ত, তাহাতে ঝড় উঠিলে বড় প্রলয়ঙ্করী হইয়া উঠে ; তাই ললনা বড় বিপদে পড়িয়া গিয়াছে। কোনরূপে বুঝাইয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, এমন করিলে সে আর বরদাস্ত করিতে পারিবে না। বুকখানা যদি ফাটিয়া বাহির হইয়া যায় তাহা হইলে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

গভীর রাত্রে মাতাপুত্রী সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

শুভদার স্বামীর জন্য বড় ভয় হইয়াছে। আজ ছয়দিন হইল তিনি বাটী আসেন নাই। তাহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি অপমানে ও লাঞ্ছনার ভয়ে তিনি আত্মঘাতী হইয়াছেন। অপদার্থ বলিয়া কন্যা হইয়াও ছলনা সেদিন যেরূপ অপমানিত করিয়াছিল, যেরূপ গঞ্জনা দিয়াছিল, তাহাতে আত্মঘাতী হওয়া আশ্চর্যের কথা নহে। সেই কথাই অষ্টপ্রহর মনে হইতেছে। আজও নিশাশেষে শুভদা চমকাইয়া উঠিয়া বসিল, ললনাকে তুলিয়া বলিল, ওরে তিনি নাই।

ললনা ঘুমের ঘোরে ভাল বুঝিতে পারিল না, তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, কে মা?

আমি স্বপন দেখছিলাম যে তিনি আর নাই।

কেন মা অমন কর? কথা শেষ করিয়াই ললনা কাঁদিয়া ফেলিল। যতটুকু রাত্রি অবশিষ্ট ছিল তাহা দুজনেই কাঁদিয়া শেষ করিল।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল। বেলা দশটা আন্দাজ সময়ে কৃষ্ণঠাকুরানী স্নান করিয়া গৃহাভিমুখে যাইবার সময় পথিপার্শ্বে মুখুজ্যেবাটীতে একবার প্রবেশ করিয়া অঙ্গন হইতে ডাকিলেন, বৌ।

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কি ঠাকুরঝি? ব'স।

আর বসব না দিদি—বেলা হ'ল নেয়ে যাবার সময় একবার মনে করলাম, বৌকে দেখে যাই।

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

কৃষ্ণঠাকুরানী গলাটা একটু খাট করিয়া বলিলেন, বৌ একবার শুনে যাও ত। শুভদা নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, হারাণের কোন খবর পেলি?

শুভদা বলিল, না।

আজ কতদিন সে বাড়ি আসেনি?

ছ' দিন হল।

ছ' দিন আসেনি? বামুনপাড়ায় কারুকে পাঠাস নি কেন?

কাকে পাঠাব? কে যাবে?

তাও বটে, আমাকে বলিস নি কেন?

শুভদা উত্তর দিল না।

জলের কলসীটি নামিয়া আসিতেছিল ; সেটাকে একটু তুলিয়া ধরিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া বলিলেন,

হাতে কিছু টাকাকড়ি আছে কি?

কিছু না।

তবে সংসার চলচে কেমন করে?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ছেলেটা কেমন আছে?

সেই রকমই।

এখন ললনাকে একবার আমার বাড়ি পাঠিয়ে দিস।

তিনি প্রস্থান করিলে শুভদা ললনাকে ডাকিয়া বলিল, কেষ্টঠাকুরঝি তোকে একবার ডেকে গেছেন, একবার যা।

কেন?

তা জানিনে।

ললনা কৃষ্ণপ্রিয়ার উদ্দেশে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া মাতার হস্তে দুইটি টাকা দিয়া বলিল, পিসিমা দিলেন।

শুভদা মুদ্রা দুইটি অঞ্চলে বাঁধিয়া বলিল, আর কিছু বললেন কি?

হাঁ, বাবা এলে তাঁকে যেন খবর দেওয়া হয়।

শুভদা সেদিন ঠাকুরের উদ্দেশে অনেক প্রণাম করিল, পূজার কক্ষস্থিত কালীপট প্রতি বহুক্ষণাবধি যুক্তকরে চাহিয়া রহিল, তুলসীতলায় অনেক মাথা খুঁড়িল, তাহার পর জিনিসপত্র আনাইতে দিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল।

সেদিন যথাসময়ে মনোমত আহার পাইয়া ছলনাময়ী মনের আনন্দে হাসিতে হাসিতে পুতুলের বিবাহের সম্বন্ধ করিতে ও-পাড়ায় ললিতার নিকট প্রস্থান করিল।

রাত্রে একটু আঁধার হইলে, অন্ধকারে মুখ ঢাকিয়া আজ সমস্ত দিনের পর হারাণ চন্দ্র বাটী প্রবেশ করিলেন। ছয় দিবস পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন, আজো তেমনি আছেন, কিছুই পরিবর্তন হয় নাই। পরিবর্তন হইয়াছে শুধু বস্ত্রখানার। বর্ণটা অঙ্গার অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে এবং গুণিয়া দেখিলে বোধ হয় শতাধিক স্থানে গাঁইট-বাঁধা দেখিতে পাওয়া যাইত। সময়ে যথামত তাঁহাকে আহারাদি করাইয়া শুভদা কন্যা ললনাকে ডাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, মা, রোজ যেন তোর মুখ দেখে উঠি—

ললনাও একটু হাসিল—কেন মা?

আজ যে সুখ পেলাম, জন্মেও এমন পাইনি।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনা কৃষ্ণপিসিমাকে যাইয়া বলিল, কাল রাতে বাবা এসেছেন।

কৃষ্ণর মুখ প্রফুল্ল হইল ; যেন বড় একটা দুর্ভাবনা তিরোহিত হইল। স্মিতমুখে বলিলেন, এসেচে? ভাল আছে?

হাঁ।

এতদিন কোথায় ছিল?

তা জানিনে।

বৌ জিজ্ঞাসা করেনি?

না।

তোর পিসিমা কিছু বলেনি?

না। তিনি ত বাবার সঙ্গে কথা কন না।

কথা কন না? কেন?

তা জানিনে। পিসিমাই জানেন।

বেলা এগারটার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কলাপাতা-চাপা একটা পাথরের বাটি হাতে করিয়া শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, বৌ, একটু তরকারি এনেচি, হারাণকে দিস।

শুভদা বাটিটি হাতে লইয়া পার্শ্ববর্তী একটা ঘর উদ্দেশ করিয়া বলিল, ঐ ঘরে আছেন।

কৃষ্ণপ্রিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল, তা হোক, এখন আর যাব না, ঘরে সমস্ত জিনিস আদুড় পড়ে আছে।

কৃষ্ণপ্রিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু অর্ধ উঠান হইতে ফিরিয়া আসিয়া শুভদাকে বলিলেন, বৌ, হারাণকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারবি?

কি?

এতদিন সে কোথায় ছিল?

শুভদা মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা।

খাওয়াইতে বসাইয়া শুভদা ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, এতদিন কোথায় ছিলে?

হারাণচন্দ্র মলিনমুখে অধোবদন হইয়া বলিলেন, গাছতলায়।

শুভদা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

পরদিন দুপুরবেলা কৃষ্ণপ্রিয়া আবার আসিলেন। নানা কথাবার্তার পর বলিলেন, বৌ, সেকথা জিজ্ঞাসা করেছিলি?

হাঁ।

কি বললে?

বললেন যে, গাছতলায় ছিলাম।

আবার অন্যান্য কথাবার্তা চলিতে লাগিল। উঠিবার সময় কৃষ্ণপ্রিয়া কাপড়ের নীচ হইতে দু'খানা থান কাপড় বাহির করিয়া বলিলেন, ঘরে ছিল তাই নিয়ে এলাম।

হারাণকে পরতে দিস।

শুভদা তাহা হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

কৃষ্ণপ্রিয়া কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ মৃদুস্বরে বলিলেন দেখ বৌ, হারাণ যদি জিজ্ঞাসা করে, কে দিয়েচে, তা হলে আর কারো নাম করিস। আমার নাম করিস নে।

শুভদা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কেন?

কৃষ্ণপ্রিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, না অমনি।

আর যদি নাম করি?

এবার কৃষ্ণপ্রিয়াও সহাস্যে বলিলেন, তা হলে তোর কেষ্টঠাকুরঝির মাথা খাবি।

আবার একদিন-দুইদিন করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। হারাণচন্দ্র এবার আসিয়া অবধি আর বাটির বাহির হন না। শুভদার সে পক্ষে কিছু ভয় দূর হইয়াছে ; কিছু দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে, কিন্তু সংসার চলে কিরূপে? দুর্ভাবনার মূল হইয়াছে এইখানেই! কে একদিন একটাকা দান করিল, কে আর-একদিন দুই টাকা ভিক্ষা দিল, এমন করিয়া কি একটা পরিবার প্রতিপালিত হয়? ভাবনার কথা কি শুধু ইহাই? মাধবের মুখ দেখিলে ত শরীরের অর্ধেক রক্ত জল হইয়া যায় ; তাহার উপর ছলনা। সে দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে; বিবাহের বয়স হইয়াছে, এমন কি দুই-চারি মাসের মধ্যে হয়ত সে-বয়স উত্তীর্ণ হইয়াও যাইতে পারে। এদিকে চাহিলে শুভদা আর কূলকিনারা দেখিতে পায় না। মাধবের নিকট পার আছে, কিন্তু বাঙ্গালীর ঘরে ছলনার নিকট পার নাই। তাহার মুখ দেখিলে রক্ত জল হইয়া যায়, কিন্তু ইহার মুখ দেখিলে শরীরের অস্থিপঞ্জর পর্যন্ত তরল হইয়া পড়িবার উপক্রম করে। দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় শুভদা যে প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে, তাহা আর কেহ না দেখিতে পাইলেও ললনা দেখিতে পাইত। গঙ্গার ঘাট হইতে এক কলসী জল আনিতে জননী যে হাঁপাইতে থাকেন, ললনা তাহা দেখিতে পাইত ; তরকারি কুটিবার সময় আলু-পটলের খোসা ছাড়াইতে গিয়া হাত আটকাইয়া বাধিয়া যায়, ললনা তাহা জানিতে পারিত ; গ্রামে শুভদার মত কেহ সুপারি কাটিতে পারিত না, সেই শুভদার সুপারি কাটা আজকাল সরু-মোটা হইয়া যায়, ললনা তাহা বুঝিতে পারিত ; আহার কমিয়া গিয়াছে, দুইবেলার

পরিবর্তে আজকাল বেলা চারিটার সময় একবার দাঁড়াইয়াছে ; পীড়াপীড়ি করিলে বলে, আদতে ক্ষুধা নাই। ললনা এসব দেখিত আর লুকাইয়া চক্ষু মুছিত ; কখন কখন ঘরে দ্বার দিয়া মাথা কুটিত। ইহাতে ফল হইবার হইলে হইতে পারিত, কিন্তু জগতে তাহা হয় না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আজ একাদশী। ললনা রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, জননী রন্ধন করিতেছেন। চুলার ভিতর দেখিল কি একটা পদার্থ দগ্ধ হইতেছে। চিনিতে না পারিয়া বলিল, ওটা কি মা? পোড়াচ্চ?

চারটি সরষের ফুল।

কি হবে?

ছলনা খাবে। আজ নেয়ে আসবার সময় ক্ষেত থেকে তুলে এনেছিল। ভেজে দিতে বসেছিল ; কিন্তু তেল ত নেই, তাই কলাপাত জড়িয়ে পুড়িয়ে দিচ্চি।

ললনা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

আহারের সময় সাধের সরিষার ফুলের আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া ছলনাময়ী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, এই বুঝি ভাজা হয়েছে? এ ছাই হয়েছে।

শুভদা ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, একটু পুড়ে গেছে।

আমি খেতে চাইনে ; তুমি বুঝি পোড়া জিনিস ভালবাস, তাই নিজের মনের মত করে, পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে রেখেচ! তা তুমি খেয়ো—এই রইল। ছলনা মুখখানা তোলো হাঁড়ির মত করিয়া পাতের নীচে নামাইয়া রাখিল।

ছলনা যাহা বলিল তা নিজের বিশ্বাসমত বলিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু আপনার মনোমত কোন দ্রব্য না হইলে কর্কশ কথা বলিতে তাহার মত কেহই পারে না।

অনেক গজগজ করিয়া ছলনা আহার করিয়া চলিয়া যাইলে ললনা বলিল, মা, দিন দিন ছলনা মন্দ হয়ে যাচ্চে ; ওকে কিছু বল না কেন? আমার ত ওকে কোন কথা বলতে সাহস হয় না। একটা বললে দশটা শুনিয়ে দেয়।

শুভদা একটু ভাবিয়া বলিল, সব মেয়ে কি তোর মত হয় মা? হাতের পাঁচটা আঙ্গুল পাঁচ রকমের হয়। আমি খাওয়াতে পারিনে, পরাতে পারিনে—কাজেই রাগ করে দুটো কথা বললে সয়ে যেতে হয়।

কিন্তু একি ভাল?

ভাল নয় তা জানি। কিন্তু কি করব? আমার সময় ভাল হলে ছলনাও বলত না, আমাকেও শুনতে হত না।

ললনাও বুঝিল জননীর কথা নিতান্ত মিথ্যা নহে।

পরদিন প্রায় এই সময়েই সে অত্যন্ত বিষণ্ণমুখে জননীর নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

শুভদা মুখপানে চাহিয়া বলিল, কি হ'ল?

ললনা একটা টাকা বাহির করিয়া দিয়া বলিল, কৃষ্ণপিসিমা বললেন, আর কাটলেও রক্ত নেই, কুটলেও মাংস নেই। তোমার বাবাকে কিছু উপায় করতে বল, না হলে আমি দুঃখী মানুষ আর টাকাকড়ি কিছুই দিতে পারব না।

সকল কাজকর্ম সেদিনের মত সম্পন্ন হইলে ললনা মাধবের নিকট আসিয়া বসিল।

মাধব বলিল, দিদি, তার কি হ'ল?

কার কি মাধু?

মাধু একটু থামিয়া বলিল, সেখানে যাবার?

ললনাও অল্প থামিল, অল্প চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, সেই কথাই আজ তোকে বলব মাধু।

মাধব আগ্রহে একেবারে উঠিয়া বসিল—কি দিদি? কবে যাওয়া হবে?

আমি কাল যাব।

কাল যাবে? আর আমি?

আমি আগে যাই, তার পরে যেয়ো।

মাধব ব্যস্ততাসহ বলিল, কেন, একসঙ্গেই যাই চল না।

ললনা বলিল, না, তা হলে মা বড় কাঁদবেন।

মাধব ক্ষুণ্ণ হইল—কাঁদুক গে।

ছিঃ, তা কি হয়? আমি যাই।

আবার কবে আসবে?

তুমি যেদিন যাবে, সেইদিন আর একবার আসব।

তার মধ্যে আর আসবে না?

না।

আমি কবে যাব?

আমি যেদিন নিতে আসব।

আসবে?

হাঁ।

তুমি গেলে মা কাঁদবেন?

বোধ হয়।

মাধব কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বলিল, দিদি, তবে কাজ নেই।

কেন ভাই?

মা কাঁদবে মনে হলে আমার ওখানে যেতেই ইচ্ছে হয় না।

তবে তুই যাবিনে?

মাধব আবার কিছুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, হ্যাঁ যাব।

তবে আমি কাল যাব?

যেয়ো।

আমাকে না দেখতে পেলে কাঁদবি নে?

কবে আমাকে নিতে আসবে?

আর কিছুদিন পরে।

তবে যাও, আমি কাঁদব না।

মাধবের অলক্ষিতে ললনা দুই-এক ফোঁটা অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। সস্নেহে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিল, আমি গেলে এসব কথা মাকে বলো না।

না।

মা যখন যা বলবেন, তাই শুনো—কিছুতে যেন মার মনে কষ্ট না হয়। ঠিক সময়ে ওষুধ খেয়ো।

খাব।

কিছু থামিয়া ললনা আবার বলিল, মাধু, সদাদাদাকে তোমার মনে আছে?

আছে।

তিনি যদি আসেন—যদি তোমাকে দেখতে আসেন—

তা হ'লে?

তা হলে ব'লো যে দিদি চলে গেছে। কেউ যখন না থাকবে তখন ব'লো।

আচ্ছা।

এইসময় শুভদা আসিয়া বলিলেন, অনেক রাত হয়েছে, তুই শুগে যা মা।

মাধব সে কথার উত্তরে বলিল, মা, দিদি আজ আমার কাছে শোবে।

দিদিকে ছাড়িতে মাধবের তখন কিছুতেই ইচ্ছা ছিল না। শুভদা বোধ হয় তাহা বুঝিতে পারিয়া ললনাকে বলিলেন, তবে তাই শোও—আমি ওপরে ছলনার কাছে শুই গে।

শুভদা চলিয়া গেলেও ভ্রাতা-ভগিনীর অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা চলিল, তাহার পর মাধবচন্দ্র ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতঃকালে ললনাকে কেহ দেখিতে পাইল না। সকালবেলায় সে যেসকল গৃহকর্ম করে তাহা এখন পর্যন্ত পড়িয়া আছে। বেলা আট-নয়টা বাজে দেখিয়া শুভদা মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর দিদি কোথায়? ছলনাকে বলিলেন, তোর দিদি কোথায় গেল?

সবাই বলিল, বলিতে পারি না।

বেলা অধিক হয় দেখিয়া শুভদা সমস্ত কর্ম নিজেই করিতে লাগিলেন ; ছলনাও সেদিন অনেক সাহায্য করিল। আহার্য প্রস্তুত হইল, সকলে আহার করিল—দ্বিপ্রহরও অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি ললনার দেখা নাই।

রাসমণি খুঁজিতে গেলেন, ছলনাময়ীও আহার করিয়া পাড়া বেড়াইতে গেল, সেখানে যদি ললনা থাকে ত পাঠাইয়া দিবে। সন্ধ্যার পূর্বে রাসমণি আসিয়া বলিলেন, কোথাও ত তাকে পেলাম না—বাড়ি এসেচে কি?

কই না।

সন্ধ্যার পর ছলনাও ফিরিয়া আসিয়া বলিল, দিদি এ গাঁয়ে নেই।

রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল, কিন্তু ললনা আসিল না।

হারাণবাবু ফিরিয়া আসিয়া অবধি বাটীর বাহির হন নাই ; তিনিও, তাই ত মেয়েটা গেল কোথা, বলিয়া একবার খুঁজিতে বাহির হইলেন। রাত্রি বারোটার পর ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তাই ত, তাই ত—কিছুই যে বোঝা যায় না।

সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন ; রাসমণি কাঁদিতে লাগিলেন, ছলনাও কাঁদিল, শুধু মাধবচন্দ্র বড় একটা কিছু বলিল না। সকলের ব্যস্ততা এবং ক্রন্দনাদি দেখিয়া সে একবার কথাটা ভাঙ্গিতে গিয়াছিল, কিন্তু দিদির নিষেধ মনে করিয়া জননীর অশ্রু দেখিয়াও মৌন হইয়া রহিল।

পরদিন আসিল। সূর্য উঠিল, অস্ত গেল—রাত্রি হইল। আবার প্রভাত হইল, সূর্য উঠিল অস্ত গেল, কিন্তু ললনা আসিল না। গ্রামের সকলেই একথা শুনিল। ললনাকে গ্রামের সকলেই ভালবাসিত, তাই তাহার জন্য সকলেই দুঃখিত হইল। কেহ কাঁদিল, কেহ শুভদাকে বুঝাইতে আসিল, কেহ পাঁচরকম অনুমান করিতে লাগিল, এইরূপে চারি-পাঁচদিন অতিবাহিত হইল।

শুভদা প্রথমে মাধবচন্দ্রের সম্মুখেও ললনার জন্য কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, কিন্তু যখন তাহার কথা মনে হইল তখন সমস্ত অশ্রু প্রতিষেধ করিল। জননীর অধিক ক্লেশ দেখিলে বোধ হয় সে ভিতরের কথা বলিয়া ফেলিত, কিন্তু যখন দেখিল সব থামিয়া গিয়াছে তখন আর কোন কথা কহিল না।

কিন্তু শুভদা বড় বিস্মিত হইল। বড়দিদির কথা মাধব কেন জিজ্ঞাসা করে না? একবারও বলে না, দিদি কোথায়? একবারও জিজ্ঞাসা করে না, বড়দিদি আসে না কেন? শুভদার অল্প সন্দেহ হইত—মাধব বোধ হয় কিছু জানে ; কিন্তু সাহস করিয়া সেকথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

আজ ছয় দিবস পরে নন্দ জেলেনী গঙ্গায় মৎস্য ধরিতে ধরিতে আঘাটায় একটা চওড়া লালপেড়ে কাপড় অর্ধ জলে, অর্ধ স্থলে, বালুমাখা পড়িয়া আছে দেখিতে পাইল। হারাণবাবুর বাটীর নিকটেই তাহার বাটী ; সে ললনাকে ঐ কাপড় অনেকদিন পরিতে দেখিয়াছিল। তাহার সন্দেহ হইল বোধ হয় ঐ বস্ত্র ললনার হইতে পারে। সে আসিয়া একথা রাসমণিকে জানাইল। তিনি ছুটিয়া গঙ্গাতীরে আসিলেন, চিনিতে বিলম্ব হইল না—তাহা ললনারই বটে। কাঁদিতে

কাঁদিতে সেখানা বাটীতে তুলিয়া আনিলেন ; শুভদা দেখিলেন, হারাণচন্দ্র দেখিলেন, ছলনা দেখিল, পাড়ার আরো পাঁচজন দেখিল—ঠিক তাহাই বটে! সে কাপড় ললনারই। তাহার হাতের সেলাই করা, তাহার হাতের তালি দেওয়া তাহার হাতের এককোণে লাল সুতা দিয়া নাম লেখা। আর কি ভুল হয়? শুভদা মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল! গ্রামময় প্রচার হইয়া গেল মুখুজ্যেদের ললনা জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর একদিন মনে হইল তাঁহার শরীর খারাপ হইয়াছে, বায়ু-পরিবর্তন না করিলে হয়ত কঠিন পীড়া জন্মাইতে পারে। সুরেন্দ্রবাবুর অনেক আয়। বয়স অধিক নহে ; বোধ হয় পঞ্চবিংশতির অধিক হইবে না ; এই বয়সে অনেক শখ, তাই পাত্রমিত্রের অভাব নাই। দুই-চারিজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, আমার শরীর বড় খারাপ হইয়াছে—তোমরা কি বল? সকলেই তখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিল যে, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নাই। তাহারা অনেক দিন হইতে একথা বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু পাছে তাঁহার ক্লেশ বোধ হয় এই জন্যই সাহস করিয়া বলে নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ডাক্তারি ঔষধ ব্যবহার করিবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না, আমার বিশ্বাস বায়ু-পরিবর্তন করিলেই সব আরোগ্য হইয়া যাইবে।

ইহাতেও কাহারো সন্দেহ ছিল না। বায়ু-পরিবর্তনের মত ঔষধ আর নাই বলিলেও চলে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তোমরা বলিতে পার কোন্ স্থানের বায়ু সর্বাপেক্ষা উত্তম?

তখন অনেকে অনেক স্থানের নাম করিল।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি বলি কিছুদিন জলের উপর বাস করিলে হয় না?

সকলে বলিল, ইহা অতি চমৎকার কথা।

তখন জলযাত্রার ধুম পড়িয়া গেল। প্রকাণ্ড একখানা বজরা নানারূপে সজ্জিত হইতে লাগিল। দুই-তিনমাসের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইতে পারে সমস্ত বোঝাই করা হইল। তাহার পর দিন দেখিয়া পাঁজি খুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু নৌকায় উঠিলেন। সঙ্গে ইয়ারবন্ধু, গায়ক বাদক অনেক চলিল ; তন্মধ্যে একজন গায়িকারও স্থান হইল। মাঝিরা পাল তুলিয়া 'বদর' বলিয়া রূপনারায়ণ নদে বজরা ভাসাইয়া দিল।

অনুকূল বাতাসে পালভরে বৃহৎ বজরা রাজহংসীর ন্যায় ভাসিয়া চলিল। স্থানে স্থানে নোঙ্গর করা হইতে লাগিল ; সুরেন্দ্রবাবু সদলবলে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এইরূপে জলে স্থলে অনেক স্থান পরিভ্রমণ করা হইল, অনেকদিন কাটিয়া গেল ; তাহার পর বজরা কলিকাতায় আসিয়া লাগিল। অপরাপর সকলের ইচ্ছা ছিল এইস্থানে যেন অধিকদিন থাকা হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু তাহাতে অমত করিয়া বলিলেন, কলকাতার বায়ু অপেক্ষাকৃত দূষিত, এখানে থাকিব না। বজরা উত্তরাভিমুখে চালাও। সুতরাং একদিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া বজরা উত্তরমুখে চলিল।

বজরা যখন কলিকাতা ছাড়িয়া চলিল তখন তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা মনে করিতে লাগিল যে, অনেকদিন বজরা বাস করা হইয়াছে, বহুত জলকণা সম্পৃক্ত স্নিগ্ধ বায়ু সেবন করিয়া শরীরে আরাম এবং স্বাস্থ্যের উৎকর্ষতা সাধন করা হইয়াছে, এখন বাটী ফিরিয়া গিয়া স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতির মুখ দেখিতে পারিলে শরীরের কান্তিটা সম্ভবতঃ আরো একটু বৃদ্ধি পাইতে পারিবে। এই হিসাবে আর অধিক দূর যাইতে অনেকেই মনে মনে অনিচ্ছুক হইল ; আর দুই-একদিন পরে মুখ ফুটিয়া দুই-একজন বলিয়াও ফেলিল, অনেকদিন দেশ ছাড়িয়া আসা হইয়াছে—আপনার শরীরও সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে—এখন ফিরিলে হানি কি?

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন হানি কিছুই নাই, কিন্তু এখন ফিরিব না, তোমাদের যদি

বাড়ির জন্য মন খারাপ হয়ে থাকে ত তোমরা যাও।

সামান্য বাড়ির জন্য, তুচ্ছ পুত্রের জন্য মন খারাপ হইয়া যাওয়া কাপুরুষতা মনে করিয়া, যাহারা কথা পাড়িয়াছিল তাহারা চুপ করিয়া গেল। সুরেন্দ্রবাবুও আর অন্য কথা বলিলেন না।

বজরা থামিয়া থামিয়া পুনর্বার চলিতে লাগিল ; ভিতরে কিন্তু আর পূর্বের মত সুখ নাই। সুরেন্দ্রবাবু ভিন্ন অনেকেই প্রায় বিষণ্ণভাবে সময়াতিবাহিত করিতে লাগিল। তখন দুই দিবস পূর্বে কাপুরুষতা মনে করিয়া যাহারা কথা পাড়িয়াও চাপিয়া গিয়াছিল, তাহারা পৌরুষের গর্ব ছাড়িয়া দিয়া আবার সেই কথা পাড়িবার অবসর খুঁজিতে লাগিল। প্রবাসে থাকিয়া বাটী যাইবার কথা—স্ত্রী-পুত্রের মুখ মনে পড়িয়া সেইখানে ফিরিয়া যাইবার একবার বাসনা হইলে তাহা আর কিছুতেই দমন করিয়া রাখা যায় না। একদিবস অতিবাহিত হইতে না হইতেই মনে হয় যেন এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। তাহাদেরও তাহাই হইল। আর তিন-চারি দিনে প্রায় সকলেই লজ্জার মাথা খাইয়া বাটী ফিরিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু আপত্তি করিলেন না ; তখন বজরা চন্দননগর অতিক্রম না করিতেই প্রায় সকলেই প্রস্থান করিল। ভৃত্যবর্গ ভিন্ন বজরা প্রায় শূন্য হইয়া গেল। বাইরের লোকের মধ্যে কেবল একজন পশ্চিমাঞ্চল-নিবাসী বাদক ও একজন অনুগৃহীতা নর্তকী রহিল। বাবু তাহাদের লইয়াই চলিলেন—দেশে ফিরিবার কথা একবারও মনে করিলেন না।

একদিন বৈকালে সূর্য অস্ত যাইবার পূর্বেই পশ্চিমদিকে মেঘ করিয়া আসিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবু একজন মাঝিকে ডাকিয়া বলিলেন, হরিচরণ, মেঘ করিয়া আসিতেছে দেখিয়াছ?

আজ্ঞে হাঁ।

ঝড় হইবে বলিয়া বোধ হয় কি?

বৈশেখ-জোষ্টি মাসে ঝড় হওয়া আশ্চর্য কি বাবু?

তবে বজরা বাঁধ।

এখানে কিন্তু গাঁ আছে বলে মনে হচ্চে না ; আঘাটায় লাগাব কি?

লাগাবে না ত কি ডুবে মরব?

মাঝি একটু হাসিয়া বলিল, আমি থাকতে সে ভয় নেই বাবু। ঝড় আসবার আগেই লঙ্গর করব।

সুরেন্দ্রবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অত সাহস করিয়া কাজ নাই—তুমি কাছি কর।

অগত্যা হরিচরণ একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থান বাছিয়া লইয়া বজরা বাঁধিয়া ফেলিল।

সুরেন্দ্রবাবু বজরার ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। ভৃত্য তামাকু সাজিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। বাবু গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, একবার ওস্তাদজীকে ডেকে দে।

কিয়ৎক্ষণ পরে একজন পশ্চিমবাসী হিন্দুস্থানী, মাথায় একহস্ত উচ্চ পাগড়ি বাঁধিয়া দাড়িটা কর্ণমূলে জড়াইয়া, গোঁফ মুচড়াইতে মুচড়াইতে আসিয়া বলিল, হুজুর।

সুরেন্দ্রবাবু পরপারে তীরের অনতিদূরে জলের উপর কালো মত কি একটা পদার্থ ভাসিয়া আছে, তাহাই দেখিতেছিলেন। পদার্থটা একটা মনুষ্য-মস্তক বলিয়া বোধ হইতেছিল—তাহাই মনোযোগ করিয়া দেখিতেছিলেন। ওস্তাদজীর শব্দ প্রথমে কর্ণে প্রবেশ করিল না।

ওস্তাদজী উত্তর না পাইয়া আবার বলিল, হুজুর!

সুরেন্দ্রবাবু ফিরিয়া চাহিলেন। ওস্তাদজীকে দেখিয়া বলিলেন, ওস্তাদজী, এখন বোধ হয় ঝড় আসিবে না ; একটু গীতবাদ্য হউক।

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, যো হুকুম।

সুরেন্দ্রবাবু আবার সেই পদার্থটা দেখিতে লাগিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই একজন যুবতী আসিয়া নিকটে একখানা গালিচার উপর উপবেশন করিল। পশ্চাতে ওস্তাদজী বাঁয়াতবলা হাতে করিয়া ছাদের উপর উঠিতেছিল ; সুরেন্দ্রনাথ দেখিয়া

বলিলেন, ওস্তাদজী, তুমি নীচে যাও—বাজনার আর কাজ নেই ; আজ শুধুই গান হউক।

ওস্তাদজী একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া নামিয়া গেল।

ইতিপূর্বে যে স্ত্রীলোকটি গালিচার উপর আসিয়া বসিয়াছিল তাহার নাম জয়াবতী ; বয়সে বোধ হয় বিংশতি হইবে। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুডৌল শরীর—দেখিতে মন্দ নহে ; বহুদিবস হইতে সুরেন্দ্রবাবুর অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে। বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে, সাজসজ্জার আড়ম্বর বেশি কিছু ছিল না। একখানা দেশী কালাপেড়ে শাড়ি ও দুই-একখানা গহনা পরিয়া শিষ্টশান্ত ঘরের বধূটির মত স্থির হইয়া বসিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, জয়া, আজ যে তোমাকে সমস্ত দিন দেখি নাই?

মাথার বেদনায় সমস্ত দিন শুয়েছিলাম।

এখন ভাল হয়েছে কি?

জয়াবতী অল্প হাসিয়া বলিল, অল্প।

গান গাইতে পারবে কি?

জয়াবতী আবার হাসিল—হুকুম করুন।

হুকুম আর কি, যা ইচ্ছা হয় গাও।

জয়াবতী গীত গাহিতে আরম্ভ করিল।

সুরেন্দ্রবাবু পরপারস্থিত ভাসমান কৃষ্ণ পদার্থটার পানে চক্ষুরাখিয়া অন্যমনস্কভাবে শুনিতে লাগিলেন। শুনতে শুনিতে কিছুক্ষণ পরে, জয়াবতীর গান শেষ হইবার পূর্বেই বলিয়া উঠিলেন, জয়া, ওটা নড়ে বেড়াচ্চে—না?

জয়াবতী গান ছাড়িয়া সেটা বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিল, বোধ হয়।

তবে আমার দূরবীনটা। ডাকিয়া বলিলেন, ওরে নীচে থেকে আমার দূরবীনের বাক্সটা নিয়ে আয় ত।

দূরবীন আসিলে বাক্স খুলিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া সেই পদার্থটা দেখিয়া দূরবীন বাক্সবন্ধ করিয়া রাখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

জয়াবতী জিজ্ঞাসা করিল, কি ওটা?

একজন মানুষ বলে বোধ হয়।

এতক্ষণ ধ'রে জলে কি কচ্চে?

তা জানি নে। দেখলে হয়।

একজন লোক পাঠিয়ে দিন না।

আমি নিজেই যাব। অনুজ্ঞা মত একজন মাঝি অল্পক্ষণ পরে বজরাসংলগ্ন বোট লইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ওপারে চল।

বোট কাছে আসিলে সুরেন্দ্রবাবু দেখিলেন, পদ্মের মত অনিন্দ্যসুন্দর একজন স্ত্রীলোক গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া, কাল মেঘের মত একরাশি চুল নীল জলের উপর চতুর্দিকে ভাসাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সুরেন্দ্রবাবু আরও নিকটে আসিলেন, তথাপি, স্ত্রীলোকটা উঠিল না বা উঠিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিল না, যেমন স্থিরভাবে দাড়াইয়াছিল সেইরূপভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, নিকটে কোন গ্রাম আছে কি?

স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি বলতে পারি না। বোধ হয় নাই।

তবে তুমি এখানে কোথা হতে এলে?

স্ত্রীলোকটি চুপ করিয়া রহিল।

তোমার বাড়ি কি নিকটেই?

না, অনেক দূর।

তবে এখানে কেন?

আমাদের নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল।

কবে?

কাল রাত্রে।

তোমার সঙ্গীরা কোথায়?

বলিতে পারি না।

তুমি এতক্ষণ ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া আছ কেন? নিকটবর্তী কোন গ্রাম অনুসন্ধান কর নাই কেন?

সে পুনর্বার চুপ করিয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তর না পাইয়া বলিলেন, তোমার বাড়ি এখান হইতে কতদূরে হইবে?

প্রায় দশ-বার ক্রোশ।

কোন্ দিকে?

সুরেন্দ্রবাবুর বজরা যেদিকে যাইতেছিল সেইদিকটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, ঐদিকে।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, আমি ঐদিকেই যাইব। আমার বজরায় স্ত্রীলোক আছে, যদি কোনরূপ আপত্তি না থাকে ত আমার সহিত আইস ; তোমাকে বাটী পৌঁছাইয়া দিব।

আবার সে মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু না বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, যাইবে?

যাইব।

তবে আইস।

পুনর্বার কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, আমার কাপড় ভাসিয়া গিয়াছে।

এইবার সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন, সে কিজন্য এতক্ষণ ধরিয়া জলে দাঁড়াইয়া আছে। নিজে তীরে নামিয়া মাঝিকে পুনরায় বজরায় ফিরিয়া গিয়া বস্ত্র আনিতে বলিয়া দিয়া বলিলেন, বস্ত্র আসিলে আমার সহিত যাইবে ত?

স্ত্রীলোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, যাইবে।

মাঝি বস্ত্র লইয়া প্রত্যাগমন করিল, অল্পক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ সকলকে লইয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন।

বজরায় আসিয়া সুরেন্দ্রবাবু আগন্তুককে জয়াবতীর জিম্মা করিয়া দিলেন ; সে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, যত্ন, আত্মীয়তা করিয়া তাহাকে আপনার কামরায় সেরাত্রের মত লইয়া গেল।

আহার করাইয়া, পান দিয়া, কাছে বসিয়া জয়াবতী কহিল, ভাই, তোমার নামটি?

আমার নাম মালতী। তোমার নাম?

জয়াবতী। তোমাদের বাড়ি?

মহেশপুরে।

এখান থেকে কত দূরে?

প্রায় দশ-বারো ক্রোশ উত্তরে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথা ভাই?

মালতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, কোথাও নয়।

সে কি—বিয়ে হয়নি?

হয়েছিল, কিন্তু সেসব চুকে গেছে।

জয়াবতী একটু দুঃখিতভাবে কহিল, কতদিন?

অনেক দিন। আমার সেসব কথা মনে পড়ে না।

জয়াবতী একথা চাপিয়া দিয়া বলিল, তোমাদের বাড়িতে কে আছে?

কেউ নেই। এক পিসি ছিল, তিনিও বোধ হয় বেঁচে নেই।

জয়াবতী বুঝিল নৌকাডুবির কথা আসিয়া পড়িয়াছে, সুতরাং এ কথারও আন্দোলন করা উচিত মনে করিল না। কহিল, তোমরা কোথায় যাচ্ছিলে ভাই?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, সাগরদ্বীপে।

যারা তোমার সঙ্গে ছিল তাদের কি হ'ল?

জানিনে।

এখন বাড়ি যাবে?

তাই ভাবচি।

জয়াবতী অল্প হাসিয়া, অল্প অপ্রস্তুতভাবে বলিল, আমার সঙ্গে যাবে?

নিয়ে গেলেই যাই। তোমার স্বামী আমার অনেক উপকার করেছেন। আর বাড়িতেও আমার কেউ নেই! বাড়ি গেলেও যে কার কাছে থাকব তা ত জানিনে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়া জয়াবতী জিভ কাটিয়াছিল ; উত্তর শুনিয়া মনে মনে শঙ্কিত হইল। জয়াবতীর মনে হইল—মালতীকে লইয়া যাওয়া বড় সুখের বিষয় হইবে না। সুরেন্দ্রবাবুর নিকট—

মালতী বলিল, তোমাদের বাড়ি কোথায়?

নারায়ণপুরে।

কোথায় যাচ্ছিলে?

বেড়াতে। বাবুর শরীর ভাল নয়। তাই—

আরও দুই-চারিটা কথাবার্তার পর সে রাত্রের মত দুইজনে নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রিটা সুরেন্দ্রবাবুর ভাল নিদ্রা হইল না, সেইজন্য অতি প্রত্যুষেই শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। হাতমুখ ধুইয়া গুড়গুড়ির নল মুখে লইয়া ছাদের উপর আসিয়া বসিলেন। হাওয়ার জোর ছিল, পাল তুলিয়া মাঝিমাল্লারা বজরা খুলিয়া দিল। একটু বেলা হইলে, জয়াবতীকে ডাকিয়া বলিলেন, স্ত্রীলোকটির কিছু জানতে পেরেছ?

সমস্ত

বাড়ি কোথায়?

মহেশপুরে।

মহেশপুরে কোথায়?

তা জানিনে। এখন থেকে দশ-বার ক্রোশ উত্তরে।

বাপের নাম কি?

জিজ্ঞাসা করিনি।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, সব খবরই জেনেছ দেখচি! স্বামীর নাম কি?

স্বামী নেই।

শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

বলেনি।

সুরেন্দ্রবাবু একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, কি জাত জান কি?

না।

নাম জান?

জানি ; মালতী।

মালতীর যদি আপত্তি না থাকে ত একবার আমার কামরায় ডাকতে ব'লো—আমি নিজে সব কথা জিজ্ঞাসা করব।

কিছুক্ষণ পরে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, কামরায় আসুন।

সুরেন্দ্রবাবুও কালবিলম্ব না করিয়া কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীচে গালিচার উপর মালতী অধোবদনে বসিয়াছিল। জয়াবতীও নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রবেশ করিবামাত্র সে প্রস্থান করিল। এ সকল সে জানিত ; হয়ত তাহার সম্মুখে সব কথা না হইতে

পারে, হয়ত কোন অসুবিধা ঘটিতে পারে, সে তাহা বুঝিত—তাই সরিয়া গেল, কিন্তু অন্তরালে দাঁড়াইয়াছিল কি না, সব কথা শুনিবার বাসনা তাহার ছিল কি না, তাহা বলিতে পারি না।

সুরেন্দ্রবাবু একটা কৌচে আসিয়া উপবেশন করিলেন। নীরবে বহুক্ষণ মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন ; মুখখানি বড় ম্লান, বড় বিষণ্ণ,—কিন্তু বড় মনোমুগ্ধকর বোধ হইতেছিল ; বর্ণটা বড় সুন্দর, অঙ্গসৌষ্ঠব অতিশয় প্রীতিপ্রদ। তাঁহার বোধ হইল, এতটা রূপ একসঙ্গে তিনি পূর্বে কখন দেখেন নাই। বিধবা—কি জাতি?

সুরেন্দ্রবাবু মুখ ফুটিয়া বলিলেন, তোমার পিতার নাম কি?

মালতী বলিল, শ্রীহারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

তিনি বাটীতেই আছেন?

মালতী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, না ; তিনি নাই।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন তাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। বলিলেন, বাটীতে আর কে আছে?

এইবার মালতী বহুক্ষণ মৌন হইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, বোধ হয় কেহই নাই।

এতদিন কোথায় ছিলে?

সেইখানেই ছিলাম, কিন্তু আমরা সাগরে যাইতেছিলাম, পথের মাঝে নৌকাডুবি হইয়াছে।

তোমার শ্বশুরবাড়ি কোথায়?

কালিপাড়ায়।

সেখানে তোমার কে আছে?

হয়ত কেউ আছে, কিন্তু আমি তাহাদের চিনি না।

কখন সেখানে যাও নাই?

বিবাহের সময় একবারমাত্র গিয়াছিলাম।

সুরেন্দ্রবাবু কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, তোমার বাপের বাড়িতেও কেহ নাই শ্বশুরবাড়িতেও কেহ নাই, অন্ততঃ তুমি জান না—তবে এখন কোথায় যাইবে?

কলিকাতায়।

কলিকাতায়? সেখানে কে আছেন?

কেহ না।

কেহ না? তবে কোথায় থাকিবে?

কাহারও বাটী অনুসন্ধান করিয়া লইব।

তাহার পর?

মালতী মৌন হইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, তুমি রাঁধিতে জান?

জানি।

কলিকাতায় কোথাও রাঁধিতে পাইলে থাকিবে?

হাঁ।

সুরেন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, মালতী, কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও ঐ কাজ পাইলে করিবে কি?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

বোধ হইল যেন সুরেন্দ্রবাবু কথার উত্তরে কিছু বিমর্ষ হইলেন। আরো কিছুক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, কলিকাতায় যাহা আশা কর, অন্যস্থানে তাহার দ্বিগুণ চতুর্গুণ পাইলেও করিবে না কি?

মালতী পূর্বের মত মাথা নাড়িল—কলিকাতা ভিন্ন আর কোথাও আমি যাইব না।

সুরেন্দ্রবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। ম্লান মুখ দেখিয়া মালতীও বুঝিতে পারিল যে, তাহার

কথা সুরেন্দ্রবাবুর মনোমত হয় নাই, সম্ভবতঃ ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রবাবু অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, যাহারা কলিকাতা চিনে না তাহাদের পক্ষে কলিকাতা অতি মন্দ স্থান ; তোমার যাহা অভিলাষ করিও, কিন্তু খুব সাবধানে থাকিও। আর একটা কথা, আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ; নারায়ণপুরে বাটী, যদি কখন প্রয়োজন মনে কর আমাকে সংবাদ দিও, কিংবা আমার বাটীতে যাইও। আপদবিপদে উপকার করিলেও করিতে পারি।

মালতী অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল।

আমরা একসপ্তাহ পরে কলিকাতা অভিমুখে ফিরিব। এখন এই বজরাতেই থাক ; যখন কলিকাতায় পৌঁছিব তখন নামিয়া যাইও।

সুরেন্দ্রবাবু চলিয়া যাইলে মালতী সেইখানে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রবাবুর কথাতেও বেদনা পাইয়াছিল, কিন্তু কাঁদিবার আরো শত-সহস্র কারণ ছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাহার লজ্জা নিবারণ করিয়াছেন, বজরায় স্থান দিয়াছেন, আরো অধিক উপকার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে করিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু সে কি রাঁধিতে মাত্র কলিকাতায় যাইতেছেন? স্নেহময়ী মাতা, পীড়িত ভ্রাতা, নিঃসহায় সংসার, সে কি শুধু রাঁধিয়া নিজের উদর পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ছাড়িয়া আসিয়াছে? পাচিকার কর্ম ছল মাত্র। সে অর্থ উপার্জন করিতে চাহে এবং কলিকাতা ভিন্ন অর্থ কোথায়? অর্থোপার্জনের পথও সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। মালতী রূপবতী ; শরীরে তাহার রূপ ধরে না একথা সে টের পাইয়াছে ; কলিকাতা বড় শহর। সেখানে এ রূপ লইয়া গেলে বিক্রয় করিবার জন্য ভাবিতে হইবে না, হয়ত আশাতীত মূল্যে ও বিক্রয় হইতে পারে, তাই কলিকাতা যাইতে এত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। সেখানে তাহার আদর হইবে, দরিদ্র ছিল ধনবতী হইবে, ক্লেশে জীবন কাটিতেছিল এইবার সুখে কাটিবে, তথাপি মালতী কাঁদে কেন? আমরা জানি না—তাহার কথা সে-ই জানে।

পরদিন বজরা হলুদপুর গ্রামের নিম্ন দিয়া চলিতে লাগিল, মালতী খড়খড়ি খুলিয়া বাঁধাঘাটের পানে চাহিয়া রহিল। ঘাটে জনপ্রাণী নাই—যে আশায় মালতী চাহিয়া রহিল তাহা হইল না। গ্রাম ছাড়িয়া বজরা দূরে চলিয়া গেল, মালতী জানালা বন্ধ করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। জয়াবতী নিকটে আসিয়া বসিল, চক্ষু মুছাইয়া সস্নেহে বলিল, কেঁদে আর কি হবে বোন। তাঁদের সময় হয়েছিল, তাই মা গঙ্গা কোলে নিয়েচেন। জয়াবতী ভাবিল, নৌকাডুবিতে যাহারা মারা গিয়াছে তাহাদের জন্যই মালতী কাঁদিতেছে। সে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিল। জয়াবতী মালতী অপেক্ষা বয়সে বড় ; তাহাকে স্নেহ করে, ছোট ভগিনীর মত দেখে ; বিশেষ, মালতী কলিকাতায় নামিয়া যাইবে শুনিয়া স্নেহ আরো বর্ধিত হইয়াছিল। মালতী উঠিয়া বসিলে জয়াবতী অন্যান্য কথাবার্তায় তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীধামে মৃত্যু হইলে হিন্দুদিগের বিশ্বাস যে শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই সদানন্দের পিসিমাতা কাশী যাইলেন, কিন্তু আর ফিরিলেন না। সদানন্দ, পুণ্যশরীরা পিসিমাতার দেহ বারাণসী ধামে গঙ্গাবক্ষে দাহ করিয়া চির-শিবলোকবাসের সুব্যবস্থা করিয়া হলুদপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

শূন্য বাটীতে অনেক রাত্রে প্রবেশ করিয়া সদাপাগলা নিজ হস্তে দুটো সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিল। একবার মনে করিল তখনই হারাণবাবুর বাটীতে গিয়া সমস্ত সংবাদ লইয়া আসিবে, কিন্তু অত রাত্রে দেখাশুনার সুবিধা না হইতে পারে মনে ভাবিয়া শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিল। কাশী থাকিয়া সে হারাণবাবুর দুশ্চরিত্রের কথা, শুভদার দুরদৃষ্টের কথা, ললনার হতভাগ্যের কথা মনে করিত ; রোগের সেবা করিতে করিতে নিতান্ত ব্যস্ত থাকিয়াও সে উহাদিগকে ভুলিতে পারিত না। মধ্যে একবার পত্র লিখিয়া সংবাদ অবগত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর কোন পক্ষেই পত্রাদি লিখেন নাই—সদানন্দও তাই প্রায় একমাসকাল কোন সংবাদ জানিতে পারেন নাই। দেশে ফিরিয়া আসিয়া সে সেইসব কথা মনে করিতে লাগিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত বিনিদ্র

থাকিয়া, চালাঘরের বাতার পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া মনে করিতে লাগিল, মেঘের উপর পদ্মফুল ফুটে কি না? ললনা বলিয়াছিল, মাটি ভিন্ন ফুল ফুটে না—সে কথা সঙ্গত কি না? আর একথা যে বলিয়াছিল, সে কেমন করিয়া জানিল মেঘের উপর পদ্ম ফুটিতে পারে না? যাহা হউক, রাত্রিশেষে ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্বে সদানন্দ স্থির করিয়া ফেলিল যে, উপরে পদ্ম ফুটিতে পারে, কিন্তু ফুটিয়া অনেকদিন থাকিতে পারে না, শুকাইয়া যাইবারই অধিক সম্ভাবনা—শুষ্ক হইয়াই যাইতেছে বোধ হয়।

পরদিন শ্রীমান সদানন্দ চক্রবর্তী ফুল, বেলপাতা, বিশ্বেশ্বরের প্রসাদী ইত্যাদি বহু দ্রব্য হস্তে লইয়া একেবারে হারাণবাবুর বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই শুভদাকে দেখিতে পাইল। শুভদা উঠান ঝাঁট দিতেছিল ; খ্যাংরাটা নীচে ফেলিয়া দিয়া, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া শুভদা মৃদুস্বরে বলিল, কবে এলে সদানন্দ?

কাল রাত্রে।

সকলে ভাল আছেন?

সদানন্দ দুঃখিতভাবে অল্প হাসিয়া বলিল, সকলের মধ্যে ত পিসিমা ; তিনি কাশীতেই স্থান পেয়েচেন।

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না, বলিল, কি পেয়েচেন?

পিসিমাতার কাশীতেই মৃত্যু হয়েচে।

শুভদা একথা জানিত না ; তাহার এক শোকে আর এক শোক উথলিয়া উঠিল। শুভদা কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, বাবা, ললনাও নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া কহিল, নাই? কোথায় গিয়াছে?

শুভদা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন; কোথায় আর যাইবে—বাছা সংসারের দুঃখেকষ্টে আত্মঘাতী হয়েচে। পাঁচদিন হ'ল গঙ্গার তীরে তার পরনের কাপড়টি পাওয়া গেছে। শুভদা ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

সদানন্দও চক্ষুর জল মুছিল, কিন্তু একফোঁটা কিংবা দুইফোঁটা মাত্র। তাহার পর শুভদা যতক্ষণ না শান্ত হইলেন ততক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। শুভদা শান্ত হইলে বলিল, কিছু বলে যায়নি?

কিছু না।

হারাণকাকা কোথায় আছেন?

শুভদা চক্ষুর জল মুছিয়া বলিল, বলিতে পারি না। কখন কখন বাটীতে আসেন বটে।

তিনি এখন কি করিতেছেন?

তাও জানি না।

মাধব কেমন আছে?

পূর্বের মত।

আর সকলে?

ভাল আছে।

সদানন্দ উঠিতেছিল। শুভদা বলিল, তোমার ওখানে রাঁধবে কে?

আমি নিজে।

শুভদা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, এখানে খেলে হয় না?

হবে না কেন? কিন্তু তার দরকার কি, রাঁধতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

তা হোক, তুমি এখানে খেয়ো।

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু আজ নয়। আজ পিসিমার তর্পণ করতে হবে।

শুভদা ভাবিল, তা হবেও বা, তাই কোন কথা আর বলিল না।

সদানন্দ বাটী আসিয়া একটা ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মৃত্তিকার উপর শুইয়া পড়িল। তখন

বেলা আটটা বাজিয়াছিল, পরে যখন ভূশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে—জ্যোৎস্না রাত্রি ফুটফুট করিতেছে ; সদানন্দ বাহিরে আসিয়া একটা বাগান পার হইয়া শারদাচরণের বাটীর পশ্চাতে একটা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল ; চাহিয়া চাহিয়া ডাকিল, শারদা!

শারদা গৃহে সদানন্দর ডাক শুনিতে পাইল। জানালার নিকট আসিয়া বলিল, কে?

সদানন্দ বলিল, আমি।

কে—সদানন্দ?

হাঁ।

কবে এলে?

কাল রাত্রে।

এদিকে কেন? চল, বৈঠকখানায় গিয়া বসি।

না, ওদিকে যাব না, তুমি এখানেই এস।

শারদাচরণ নিকটে আসিলে সদানন্দ বলিল, ললনা মরেছে তা জান কি?

শারদাচরণ বিষণ্ণভাবে কহিল, জানি।

কেন মরিল কোন সংবাদ রাখ কি?

না, তবে বোধ হয় সাংসারিক দুঃখকষ্টে আত্মঘাতী হইয়াছে।

সদানন্দ তাঁহার পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, আর কিছু জান না?

কিছু না।

সদানন্দর তীক্ষ্ণদৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করিয়া বলিল, তুমি পাষণ্ড। সাংসারিক দুঃখকষ্টে একজন মরিতে পারে, আর তুমি সম্মুখে থাকিয়া একটু সাহায্য করিতে পার না?

সদানন্দর ভাবভঙ্গি দেখিয়া শারদাচরণ একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তাহার কারণও ছিল ; সে এবং সদানন্দ বাল্যসুহৃৎ, উভয়ে উভয়কে বহুদিন হইতে চিনিত। শারদার ছেলেবেলার কথা সদানন্দ সমস্ত অবগত ছিল এবং সেইজন্যই যে আজ তাহাকে কথা শুনাইতে আসিয়াছিল, সদানন্দর সে প্রকৃতি নহে ; কিন্তু শারদা অন্যরূপ ভাবিয়া লইল। সে মনে করিল, সদানন্দ ছেলেবেলার সেইসব লইয়া দুটো কথা শুনাইয়া দিতেছে ; তাই একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিল, সদানন্দ, সে সকল কথায় এখন আর ফল কি? আরো মনে করে দেখ, আমার পিতা জীবিত রহিয়াছেন, তাঁর বর্তমানে ইচ্ছা হইলেই কি আমি যাকে ইচ্ছা তাকে সাহায্য করিতে পারি? বিশেষ সে আমাকে কিছুই বলে নাই।

সদানন্দ বিস্মিত হইল। কহিল, কিছুই বলে নাই? কিছুই বলিতে আসে নাই?

সম্প্রতি নহে ; তবে অনেকদিন পূর্বে একবার আসিয়াছিল।

কি জন্য? কোথায়?

শারদাচরণ বলিল, বলিতেছি। বলিল, প্রায় মাসখানেক পূর্বে অনেক রাত্রে, আমাকে ঐ শিবমন্দিরে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল ; আমার যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও গিয়াছিলাম—

সদানন্দ রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, যাইবার ইচ্ছা ছিল না?

শারদা ম্লানমুখে বলিল, আর কেন ভাই!

সদানন্দ সেকথা শুনিল না, বলিল, তারপর?

তারপর বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল।

কাহার সহিত?

তাহার নিজের সহিত।

নিজের? ললনার সহিত? তুমি কি বলিলে?

শারদা আপনার বাল্যকথা স্মরণ করিয়া বড় লজ্জিত হইল ; কতকটা অপ্রস্তুত হইয়া বলিল, আমি—আমি—তা কি করিব বল? বাবা এখনো বাঁচিয়া আছেন।

সদানন্দ কতকটা ক্রোধে, দুঃখে, কতকটা মনের আবেগে বলিয়া ফেলিল, তোমার বাবার বাঁচিয়া কি লাভ?

এইবার শারদাচরণ কুপিত হইল। পিতার সম্বন্ধে কোন কথা তাহার সহিত না ; বলিল, লাভালাভের কথা তিনি ভাল জানেন। আমাদের এবিষয়ে বিচার করিবার কোন অধিকার নাই—ভালও দেখায় না। যা হউক, আমি বলিলাম, তোমাকে বিবাহ করিতে পারিব না।

সে চলিয়া গেল?

না, তখনও চলিয়া যায় নাই ; ছলনাকে বিবাহ করিতে বলিল।

তুমি স্বীকার করিলে না?

শারদাচরণ সদানন্দর মুখ দেখিয়া এবং তাহার মনের কথা আনুমান করিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, অস্বীকারও করি নাই ; বলিয়াছিলাম পিতার মত হইলে করিতে পারি।

সদানন্দ বলিল, পিতার মত হইল না?

না।

কেন?

বলিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বলিতেছি শুন ; বাবার ইচ্ছা আমার বিবাহ দিয়া কিছু অর্থ লাভ করেন—হারাণবাবু কি তাহা দিতে পারিতেন?

সদানন্দ সে কথা শুনিয়াও যেন শুনিল না ; বলিল, তোমার পিতা কি আশা করেন?

আমি বলিতে পারি না।

অর্থের আশা পূর্ণিত হইলে আর কোন আপত্তি হইতে পারে কি?

সম্ভবত নহে।

তোমার নিজের কোন আপত্তি নাই?

কিছু না।

তবে দেখা যাউক, বলিয়া সদানন্দ পুনর্বার বনঝাদাড় ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চলিল।

শারদাচরণ বলিল, কোথায় যাও? একটু বসিবে না?

না।

সদানন্দ, আমার কোন দোষ নাই।

বোধ হয় নাই—ভগবান জানেন—আমি বলিতে পারি না।

রাগ করিলে?

না।

সদানন্দ বাটী ফিরিয়া আসিয়া কিছুক্ষণ এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইল, তাহার পর পুনরায় বাহির হইয়া আসিল। পথ বাহিয়া গঙ্গাপানে চলিল। ভাগীরথীর ছোট ছোট ঢেউ বাঁধাঘাটের সোপানে ঝলমল ছলছল করিয়া ঘাত-প্রতিঘাত করিয়া সরিয়া যাইতেছে আবার ফিরিয়া আসিতেছে, সদানন্দ কিছুক্ষণ সেইগুলি দেখিতে লাগিল ; দূরে একখানা বজরা ছপ্‌ছপ্ করিয়া দাঁড় ফেলিয়া প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষে ভাসিয়া আসিতেছে, সদানন্দ অন্যমনে কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে ঘাটের সর্বনিম্ন সোপানের উপর বসিয়া জলে পা ডুবাইয়া আপনার মনে আকাশপানে চাহিয়া গান ধরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেইদিন, রাত্রে জ্যোৎস্নাধৌত প্রশান্ত গঙ্গাবক্ষের উপর দিয়া ভাঁটার স্রোতে গা ভাসাইয়া, ধীরে ধীরে হস্তসঞ্চালনের মত ছপ্‌ছপ্ করিয়া দুটি দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে সুরেন্দ্রবাবুর প্রকাণ্ড বজরা উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে ভাসিয়া আসিতেছিল।

ছাদের উপরে সুরেন্দ্রবাবু ও জয়াবতী বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, নীচে কামরার জানালা খুলিয়া মালতী গঙ্গাবক্ষে ছোট ছোট রজত ঢেউগুলি গুণিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল। মালতী বুঝিতে পারিল এইবার হলুদপুর আসিতেছে। আরো কিছুক্ষণ আসিয়া গঙ্গাতীরের

অশ্বত্থবৃক্ষ দেখিতে পাইল। তাহার পার্শ্বে বাঁধাঘাট চন্দ্রকিরণে ধপ্‌ধপ্‌ করিতেছে তাহাও দেখিল। আর তাহার পশ্চাতে হলুদপুর গ্রাম সুপ্ত নিস্তব্ধ পড়িয়া আছে। মালতী তথাকার প্রত্যেক বাটী, প্রত্যেক নরনারীর নিদ্রিত মুখ মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল, আর ঐ ঘাট—সে যখন ললনা ছিল তখন দুবেলা ঐখানে স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, গাত্র ধৌত করিতে আসিত ; ঐ ঘাট হইতে পিত্তলকলসী পূর্ণ করিয়া জল না লইয়া গেলে পান করা, রন্ধন করা চলিত না। মালতী এখন মালতী—সে আর ললনা নহে, তবুও তাহাকে এখনো ভুলিতে পারে নাই। শুভদাকেও ভুলিতে পারা যায় না, মাধবকেও ভুলিতে পারা যায় না, হারাণ মুখুজ্যেকে ভুলিতে পারা যায় না, তাই ভাবিতেছিল আর কাঁদিতেছিল ; আর সদাপাগলাকেও সে কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না। ইতিপূর্বেই তাহা মালতী ভাবিয়া দেখিয়াছিল। মালতী ভাবিল, ছলনা, বিন্দু, কৃষ্ণপিসিমা, গিরিজা, শৈলজায়া, শৈলবতী, রমা—কেউ না—কেউ না ; সদানন্দ তাহার পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা লইয়া স্মৃতির অর্ধেক জড়াইয়া বসিয়া আছে, কর্ণে তাহারই গান শুনিতে পাইতেছে। মালতীর বোধ হইল যেন সদাপাগলার প্রফুল্ল সুর করুণ হইয়া অস্পষ্টভাবে কোথা হইতে তাহার কর্ণে আসিয়া পশিতেছে। মালতী বিস্মিত হইল ; স্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল ঠিক সদানন্দর মত কে গীত গাহিতেছে। বজরাখানা আরও একটু আগাইয়া আসিলে মালতী দেখিল ঘাটের নীচে জলে পা রাখিয়া একজন বসিয়া আছে, কিন্তু গান তখন বন্ধ হইয়াছে। লোকটি কে তাহা ঠিক চিনিতে না পারিলেও মালতী পরিষ্কার বুঝিল এ সদানন্দ ভিন্ন আর কেহ নহে ; পাগল ক্ষ্যাপা লোক ভিন্ন কে আর অত রাত্রে মা গঙ্গাকে গান শুনাইতে আসিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তখন মালতী পুনর্বার কাঁদিতে বসিল। সদানন্দর কথা যত মনে করিতে লাগিল, তত ললনার কথা মনে পড়িতে লাগিল ; শুভদা, ছলনা, মাধব, পিসিমা আর হতভাগা হারাণ মুখুজ্যে—সকলেই সদানন্দর স্মৃতি মাঝখানে রাখিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে কাঁদিয়া কাঁদিয়া অনেক রাত্রে মালতী ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুম ভাঙ্গিল, প্রভাত হইল, ক্রমে সূর্য উঠিয়া বেলা বাড়িতে লাগিল। মালতী কিন্তু উঠিতে পারিল না। সমস্ত অঙ্গে অত্যন্ত ব্যথা ; গা গরম হইয়াছে, মাথা টন্‌টন্‌ করিতেছে, আরো নানা উপসর্গ আসিয়া জুটিয়াছে। দাসী আসিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিল, তোমার যে দেখছি জ্বর হয়েচে। মালতী চুপ করিয়া রহিল। জয়াবতী আসিয়া গায়ে হাত দিল, জানালা খোলা আছে দেখিয়া একটু অনুযোগ করিল। বলিল, এমনি করে কি জানালায় মাথা দিয়ে শুয়ে থাকে? সমস্ত রাত্রি পুবে হাওয়া লেগে গা গরম হয়েচে।

মালতী মৃদুভাবে বলিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তাই জানালা বন্ধ করা হয়নি।

সুরেন্দ্রবাবু একথা শুনিয়া নিজে দেখিতে আসিলেন। সত্যই জ্বর হইয়াছে। তাঁহার নিকট হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স ছিল। তাহা হইতে ঔষধ লইয়া খাইতে দিলেন আর জয়াবতীকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন যেন খুব সাবধানে রাখা হয়।

জয়াবতী মালতীর কাছে আসিয়া বসিল। কামরার জানালা সার্সী সমস্ত বন্ধ, মালতী কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, এমন কি বজরা চলিতেছে কি দাঁড়াইয়া আছে তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। কামরায় জয়াবতী ভিন্ন আর কেহ নাই দেখিয়া মালতী বলিল, দিদি! জয়াবতীকে সে দিদি বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল—আমরা কতদূর এসেছি জান?

জয়াবতী বলিল, প্রায় আট-দশ ক্রোশ হবে।

মালতী তাহা জানিতে চাহে নাই, বলিল, কলকাতা আর কতদূরে?

এখনো প্রায় দু'দিনের পথ।

মালতী চুপ করিয়া একটু চিন্তা করিয়া লইল। পরে বলিল, দিদি, যদি সে সময়ের মধ্যে ভাল না হই?

জয়াবতী কথার ভাবটা বুঝিতে পারিল। স্ত্রীলোকে এ সময়ে হিংসা রাখে না—তাই একটু হাসিয়া বলিল, তাহলে আমরা তোমাকে জলে ফেলে দোব।

মালতীও একটু হাসিল, কিন্তু সে-হাসিতে এ-হাসিতে একটু প্রভেদ ছিল। বলিল, হ'লে ভালো হ'তো দিদি।

জয়াবতী অপ্রতিভ হইল। কথাটার যে আরো একটু অন্যরূপ মানে হইতে পারে তাহা সে ততটা ভাবিয়া বলে নাই, বলিল, ছিঃ! ওকথা কি বলে?

মালতী চুপ করিয়া রহিল, আর উত্তর করিল না। নিঃশব্দে সে ভাবিয়া দেখিতেছিল যে, জয়াবতীর কথা সত্য হইলে কেমন হয়? ভাল হয় কি? হয় না। মরিতে তাহার সাধ নাই। তাহাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে যে, সে মরণের অধিক ক্লেশ পাইতেছে, তথাপি মরিতে পারিবে না ; মরণে ভয় নাই, তথাপি মরিবার ইচ্ছা নাই। যাহারা সে ইচ্ছা করিতে পারে তাহাদের দুঃখ তত অধিক নয়। একবিন্দু জল তাহার চক্ষু দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

জয়াবতী সস্নেহে তাহা মুছাইয়া বলিল, ভাব কেন বোন? পূবে বাতাস লেগে একটু গা গরম হয়েচে, তাই বলে কি ভাবতে হয়? তাহার পর একটু থামিয়া একটু চিন্তা করিয়া সাবধান হইয়া বলিল, আর যদি তেমন তেমন হয় তা হলেও ত উপায় আছে কাছেই কলকাতা—সেখানে ডাক্তার-বদ্দির অভাব কি?

অভাব কিছুরই ছিল না এবং প্রয়োজনও কিছুই হইল না। বজরা যেদিন কলিকাতা আসিয়া পঁহুছিল সেদিন মালতীর আর জ্বর ছিল না, কিন্তু শরীর বড় দুর্বল, এখনো কিছুই খাইতে পায় নাই। বজরা কলিকাতা ছাড়াইয়া একটু দূরে—পরপারে নোঙ্গর করা হইল। কামরার জানালা খোলা ছিল, মুখ বাড়াইয়া মালতী জাহাজ, মাস্তুল, বড় বড় নৌকা ও প্রাসাদতুল্য প্রকাণ্ড অট্টালিকা-শ্রেণীর চূড়া দেখিতে লাগিল। মালতীর ভয় হইতেছিল ; ভাবিতেছিল এই কি কলিকাতা? তাহা হইলে এত গণ্ডগোলে এত শব্দসাড়ার মধ্যে কে তাহার কথা শুনিতে পাইবে? এত ব্যস্ত শহরে কে তাহাকে দেখিবার অবকাশ পাইবে? কিন্তু তাহা ত হইবে না, তাহাকে যাইতেই হইবে। যেজন্য এ অসম সাহসিক কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, যাহাদের মুখ মনে করিয়া নরকে ডুব দিতে বসিয়াছে—ইহকাল পরকাল কোন কথাই মনে স্থান দেয় নাই, তাহাদের মুখ এত শীঘ্র ভুলিতে পারিবে না। আজ না হয় কাল এ আশ্রয় পরিত্যাগ করিতেই হইবে ; আর যখন হইবেই তখন আর ভয় করিয়া লাভ কি?

সে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রবাবু প্রচার করিলেন যে, বজরা এস্থানে আরও তিন-চারিদিন বাঁধা থাকিবে। মালতীর শরীর রীতিমত সুস্থ হইলে তবে সে যেখানে ইচ্ছা যাইবে ; বজরাও সেইসময়ে খোলা হইবে। মালতী একথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিল। আন্তরিক সে ইহাই প্রার্থনা করিতেছিল ; কেননা, যতই প্রয়োজনীয় এবং কর্তব্য হউক না, আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নিরাশ্রয়ে যাইতে মনকে তেমন সহজে রাজী করিতে পারা যায় না, ইতিপূর্বেই সে এই মর্মে তাহার সহিত কলহ করিতেছিল—এখন যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া সেটাকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া চলনসই গোছ একরকম করিয়া লইবার মত সময় পাইল।

পরদিন মধ্যাহ্নে জয়াবতী কলিকাতা ভ্রমণ করিতে যাইবে স্থির হইয়াছিল। গাড়ি, পান্‌সি ঠিক করিয়া ভৃত্য সংবাদ দিল ; জয়াবতী বাবুকে তাহার সহিত যাইতে অনেক সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না ; মালতী যাইতে চাহিয়াছিল, কিন্তু বাবু নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন—তাহার শরীর ভাল নয়, আবার জ্বর হইতে পরে। তখন অগত্যা জয়াবতী একাই দাসী ভৃত্য সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে গেল।

মালতী কামরার ভিতর শয়ন করিয়াছিল, সুরেন্দ্রবাবু দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মালতী সঙ্কুচিত হইয়া উঠিয়া বসিল, সুরেন্দ্রবাবু একটু দূরে উপবেশন করিলেন—অনেকক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইল। তিনি কিছু বলিবেন মনে করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বলিতে সাহস হইতেছিল না—অনেকক্ষণ পরে একটু থামিয়া একটু ভাবিয়া বলিলেন, তুমি এইখানেই কি নিশ্চয় নামিয়া যাইবে?

মাথা নাড়িয়া মালতী বলিল, হাঁ।

বেশ করিয়া চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি?

মালতী সেইরূপভাবে বলিল, দেখিয়াছি।

কোথায় যাইবে?

তা ত জানি না।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিয়া উঠিলেন ; বলিলেন, তবে আর কি দেখিয়াছ? আজ নয়, কাল একবার কলিকাতার ভিতরটা দেখিয়া আসিও ; তাহার পর যদি নিশ্চিত ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতই ভাল লাগে—যাইও, আমি বারণ করিব না।

মালতী কথা কহিল না।

তিনিও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া পুনরায় পূর্বাপেক্ষা ম্লানভাবে কহিতে লাগিলেন, তুমি যতটা না ভাবিয়াছ, আমি ততটা ভাবিয়া দেখিয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণকন্যা—হীনবৃত্তি করিতে পারিবে না ; ভদ্রলোকের কন্যা ভদ্রসংসারে প্রবেশ করিতে না পারিলে তুমি থাকিতে পারিবে না ; এ অবস্থায় নিঃসহায় কেমন করিয়া যে এত বড় শহরে সমস্ত অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিবে, আমি বুঝিতে পারি না। কিছুক্ষণ থামিয়া আবার কহিলেন, আর ভাবিয়া দেখ, তোমার এ বয়সে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া আপনাকে সামলাইয়া চলিতে পারিবে কি? ভয় হয় পাছে পদে পদে বিপদে পড়।

মালতী নিঃশব্দে কাঁদিতেছিল, এসকল সে সমস্তই ভাবিয়া দেখিয়াছিল, কিন্তু উপায় ছিল না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

সুরেন্দ্রবাবু বুঝিলেন, মালতী কাঁদিতেছে, পূর্বেও তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু এখন অন্যরূপ মনে হইতে লাগিল : বলিলেন, যাওয়াই কি স্থির করিলে?

মালতী চোখ মুছিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

নারায়ণপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রবাবুকে অনেকেই বোকা মনে করিত, কিন্তু বস্তুতঃ তিনি তাহা ছিলেন না। যাহারা তাঁহাকে এ আখ্যা প্রদান করিত তাহাদের অপেক্ষাও তিনি বোধ হয় শতগুণ অধিক বুদ্ধিমান ছিলেন, কিন্তু অনেক সময়ে তিনি দুর্বল প্রকৃতির লোকের মত কর্ম করিতেন, এইজন্য তাঁহাকে সহজে বুঝিতে পারা যাইত না। মালতীর মনের কথা তিনি ধরিয়া ফেলিলেন, মনে মনে একটু হাসিলেন, তাহার পর মালতী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে বলিলেন, মালতী, তোমার বড় টাকার প্রয়োজন, না?

তাহার চক্ষুজল আবার উছলাইয়া উঠিল। এত প্রয়োজন বোধ হয় জগতে আর কাহারো নাই।

বড় প্রয়োজন কি?

মালতী কান্না কতকটা শেষ করিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল, বড় প্রয়োজন।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিলেন, বুঝিতে তাঁহার আর বাকি নাই। পরের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার হাসি আসিল, কারণ, এসব লোকেরও যে কাঁদিবার যথার্থ কারণ থাকিতে পারে, সকলেই যে শুধু মন ভোলাইবার জন্য কাঁদে না তাহা তিনি কুসংসর্গ-দোষে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। অল্প হাসিয়া, অল্প চাপিয়া বলিলেন, তবে আর কাঁদিতেছ কেন? তুমি রূপসী, তুমি যুবতী, কলিকাতায় যাইতেছ—এখন আর তোমাকে অর্থের ভাবনা ভাবিতে হইবে না—কলিকাতায় অর্থ ছড়ান আছে দেখিতে পাইবে।

মালতীর বোধ হইল অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে তাহার মাথাটা খসিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে, এখন জানালা গলিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না। মালতী এইরূপ কিছু একটা করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা বোধ হইল, যেন বাধা পড়িয়াছে, যেন মূর্ছিত হইয়া একজনের কোলের উপর টলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে কোল যেন অগ্নিবিক্ষিপ্ত, বড় কঠিন, বড় উত্তপ্ত, তাহাতে যেন একবিন্দু মাংস নাই—এতটুকু কোমলতা নাই। সমস্ত পাষাণ, সমস্ত অস্থিময়। মূর্ছিত অবস্থায়ও মালতী শিহরিয়া উঠিল। যখন জ্ঞান হইল তখন যে সে কাহারো ক্রোড়ের

উপর শুইয়া আছে তাহা বোধ হইল না ; চক্ষু চাহিয়া দেখিল আপনার শয্যাতে শুইয়া আছে, কিন্তু পার্শ্বে সুরেন্দ্রবাবু তাহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। লজ্জায় তাহার মুখ আরক্তিম হইল, দুই হাতে মুখ চাপিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিয়া শুইল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, মালতী, কাল প্রাতঃকালে আমি বজরা খুলিয়া দিব, কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া দিব না, তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে। নিঃশ্বাস রোধ করিয়া মালতী শুনিতে লাগিল—যেজন্য তুমি কলিকাতা যাইতে চাহিতেছ তাহা তুমি পারিবে, না। এ বৃত্তি বোধ হয় তুমি পূর্বে কখন কর নাই, এখনও পারিবে না। তোমার যত অর্থের প্রয়োজন হয়, যাহা কিছু সুখ-স্বচ্ছন্দতার অভিলাষ হয় আমি দিব।

মালতীর রুদ্ধশ্বাসের সহিত চক্ষুজল বাহির হইয়া পড়িল। সুরেন্দ্রবাবু তাহা বুঝিলেন, সযত্নে আপনার ক্রোড়ের উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন, মালতী, আমার সহিত চল। আমি খুব ধনী না হইলেও দরিদ্র নহি—তোমার ব্যয় স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারিব ; আর বল দেখি, আমি তোমাকে এখানে ফেলিয়া গেলে বাঁচিবে কি? না, আমিই শান্ত মনে বাটী ফিরিতে পারিব? সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে আরো বুকের কাছে টানিয়া লইলেন, সস্নেহে সে অশ্রু মুছাইলেন—আগ্রহে ছিঃ ছিঃ—লজ্জায় সঙ্কুচিত সে ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া বলিলেন, কেমন যাবে ত?

মালতীর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল, সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল ; সে আর সে নয় ; সে ললনা নয়, সে মালতী নয়, সে কেহ নয়, শুধু এখন যাহা আছে তাহাই ; সুরেন্দ্রনাথের চিরসঙ্গিনী আজন্মের প্রণয়িনী ; সে সীতা, সে সাবিত্রী, সে দময়ন্তী ; সীতা-সাবিত্রীর নাম কেন? সে রাধা, চন্দ্রাবলী ; কিন্তু তাহাতেই বা ক্ষতি কী? সুখ, শান্তি, স্বর্গের ক্রোড়ে আবার মান-অপমান কি? ললনা নিস্পন্দ অচেতন স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় সুরেন্দ্রনাথের ক্রোড়ের উপর পড়িয়া রহিল ; সে ক্রোড় আর অস্থিময়, পাষাণ, অঙ্গারবিক্ষিপ্ত নহে ; এখন শান্ত, স্নিগ্ধ, কোমল, মধুময়! ললনার বোধ হইল সে এতদিন শাপগ্রস্ত ছিল, এখন পুনরায় স্বর্গে আসিয়াছে, এতদিন পরে হৃতধন ফিরাইয়া পাইয়াছে। মালতীর—সঙ্কুচিত ওষ্ঠ পুনরায় বিস্ফারিত হইয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ সে ওষ্ঠ পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছেন, আর পাপের প্রথম সোপানে অবতরণ করিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া ললনা দেবী স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। তখন সূর্য অস্তগমন করিতেছিলেন, জানালার ফাঁক দিয়া এ পাপচিত্র দেখিয়া যাইলেন, সে অপরাহ্ণ-সূর্য-রক্ত-করস্পর্শে ললনার মুখমণ্ডল সুরেন্দ্রের চক্ষে সহস্রগুণ অধিক মনোমুগ্ধকর প্রতিভাত হইল ; তিনি সহস্র আবেগে, সহস্র তৃষ্ণায় সে-মুখ পুনরায় চুম্বন করিয়া বলিলেন, মালতী, যাবে ত?

যাব।

সুরেন্দ্রনাথ উন্মত্ত হইলেন—তবে চল এখনি যাই।

কিন্তু দিদি?

কে দিদি?

তোমার স্ত্রী।

সুরেন্দ্রনাথের যেন চমক ভাঙ্গিল। শিহরিয়া উঠিয়া বলিলেন, আমার স্ত্রী! সে ত অনেকদিন মরিয়াছে।

জয়াবতী?

সুরেন্দ্রনাথ শুষ্ক হাস্য করিলেন, বললেন, জয়া আমার স্ত্রী নয়—তাকে কখন বিবাহ করি নাই।

তবে কি?

কিছু নয়—কিছু নয়। তুমি আমার সব সে কেহ নয়—তুমি সব—তুমি সমস্ত।

এবার মালতী তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিল, ক্রোড়ে মুখ লুকাইল,—ছিঃ ছিঃ! মুক্তকণ্ঠে কহিল, আমি তোমার চিরদাসী, আমাকে পরিত্যাগ করিও না।

না, কখন না।

তবে আমাকে নিয়ে চল।

চল।

আজি।

এখনি।

এই সময়ে বাহিরে শত-সহস্র কণ্ঠ নানাকণ্ঠে নানারূপে চীৎকার করিয়া উঠিল, ধর ধর—সরে যাও—তফাৎ—তফাৎ—গেল গেল—ডুবল—হো হো—ঐ যা—সুরেন্দ্রনাথ ছুটিয়া বাহিরে আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মালতীও বাহির হইয়া পড়িল ; সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন, এপারে ওপারে, চতুর্দিকে মাঝিমাল্লা, মুটেমজুর সমস্ত সমবেত হইয়া চীৎকার করিতেছে এবং কিছু দূরে প্রায় মধ্যগঙ্গায় একখানা পান্‌সি স্টিমারে ধাক্কা লাগিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া যাইতেছে।

চক্ষুর নিমিষে সুরেন্দ্রনাথ বুঝিলেন কি ঘটিয়াছে ; চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওতে আমার জয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন, কিন্তু পার্শ্ব হইতে মালতী ধরিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ পাগলের মত ছটফট করিয়া আবার চীৎকার করিলেন, ধরো না, ধরো না—আমার জয়া যায় যে!

ততক্ষণে ক্ষুদ্রপ্রাণ নৌকাখানি প্রকাণ্ড স্টিমারের তলদেশে ধীরে ধীরে তলাইয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথও মাঝিমাল্লা, ভৃত্য প্রভৃতির হস্তে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জয়া! জ্ঞান হইলে, প্রথমে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ আকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, জয়া! পার্শ্বে মালতী বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছিল আর চক্ষু মুছিতেছিল, তাঁহার কথার ভাবে সে আরো অধিক করিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিল। তিনি কিন্তু তাহা দেখিলেন না ; একবারমাত্র চাহিয়া ছিলেন, তাহার পর চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ এইভাবে থাকিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, জয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই?

নিকটে একজন পুরাতন ভৃত্য বসিয়াছিল, সে কাতরভাবে কহিল, না।

পাওয়া যায় নাই? তবে বোধ হয় সে আর বাঁচিয়া নাই।

ভৃত্য ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বোধ হয়।

সুরেন্দ্রবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রি কত হইয়াছে?

প্রায় দশটা।

দশটা? তবু সংবাদ নাই?

ভৃত্য উত্তর দিল, না।

সুরেন্দ্রবাবু অধিকতর হতাশ হইয়া কপালে করাঘাত করিলেন, বলিলেন, তোমরা সবাই যাও—সমস্ত শহরে সমস্ত গঙ্গার ধারে সন্ধান কর গে।

ভৃত্য মনে মনে ভাবিল, মন্দ হুকুম নয়! মুখে বলিল, যে আজ্ঞা...পরে তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া আপনার নির্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিয়া রহিল।

কক্ষে মালতী ভিন্ন আর কেহ নাই, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ কোন কথা কহিলেন না, নিঃশব্দে অজস্র রোদন করিতে লাগিলেন। এইভাবে সময় অতিবাহিত হইয়া চলিতে লাগিল। কামরার দেয়ালে যে ঘড়িটা ছিল সেটা আপনার মনে এগারটার পরে বারটা, তাহার পর একটা, দুইটা, তিনটা, চারিটা—তাহার পুঁজিপাটা সমস্ত বাজাইয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহা লক্ষ্য করিতেছে বলিয়া বোধ হইল না। সুরেন্দ্রনাথ এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন, মালতী পাশে বসিয়া তাঁহার যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল, আর চক্ষু মুছিতে লাগিল ; তাহারও কষ্ট হইয়াছে, লজ্জা হইয়াছে এবং ততোধিক নিজের উপর ঘৃণা হইয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সে ভাবিয়া দেখিতেছিল।

একে ত কলিকাতার গঙ্গা সমস্ত রাত্রিই প্রায় নিদ্রা যান না, এখন আবার চারিটা বাজিয়া গিয়াছে—চতুষ্পার্শ্বে অল্প ঈষৎ বেশ সাড়াশব্দ হইতেছে।

সুরেন্দ্রনাথ হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া মালতীর পানে চাহিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, সমস্ত রাত্রি মিথ্যা জাগিয়া কোন ফল নাই, তুমি শোও গে।

মালতী উঠিয়া যাইতেছিল, তিনি আবার ডাকিয়া বলিলেন, বসো, যেও না, তোমাকে কিছু বলিব।

মালতী দুইপদ অগ্রসর হইয়াছিল, পুনরায় সেইখানেই উপবেশন করিল।

সুরেন্দ্রনাথ একবার চক্ষু রগড়াইলেন, একবার কি বলিবেন তাহা যেন ভাবিয়া লইলেন, তাহার পর গম্ভীরভাবে কহিলেন, মালতী, কার পাপে এই হইল?

মালতীর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল ; একথা সে বহুবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ; উত্তরও একরকম পাইয়াছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহা বলিতে তাহার মুখ বন্ধ হইল, কাজেই অধোবদনে নিরুত্তর রহিল।

সুরেন্দ্রবাবুও যাহা বলিবেন মনে করিয়াছিলেন তাহা না বলিয়া বলিলেন, সে সব কথা পরে হইবে, এখন যাও।

মালতী তথা হইতে আপনার কামরায় আসিয়া শয়ন করিল, কিন্তু ঘুমাইল কি? না ; বাকি রাত্রিটুকু শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল। অনেকবার বসিল, অনেকবার শুইল, অনেক দেবদেবীর নাম করিল, অনেক কথা মনে করিল ; তাহার পর ভোরবেলায় তন্দ্রার ঝোঁকে নানাবিধ স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কখন দেখিল জয়াবতী চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কখন দেখিল সদানন্দ মনের আনন্দে গান ধরিয়াছে, কখন দেখিল জননী শুভদা আকুলভাবে রোদন করিতেছে। সর্বশেষে বোধ হইল যেন মাধব আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছে, কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দেশে যাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিতেছে, মালতীর তথায় যাইবার ইচ্ছা নাই, কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। মালতীর সহসা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই, কেবল প্রাতঃসূর্যকিরণ খোলা জানালার ভিতর দিয়া তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল।

সেদিন সমস্তদিন সে সুরেন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইল না ; কিছু পূর্বেই তিনি বজরা পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। পরদিনও তিনি আসিলেন না ; তাহার পরদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া আপনার কামরায় প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। সেদিনও এমনি কাটিল। পরদিন তিনি মালতীকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মালতী কক্ষে প্রবেশ করিয়া নিম্নমুখে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুরেন্দ্রবাবু একখানা কাগজ লইয়া কি লিখিতেছিলেন, বোধ হয় কোথাও পত্র লিখিতে ছিলেন। মালতী আড়চক্ষে ভয়ে ভয়ে দেখিল তাঁহার সমস্ত মুখ অতিশয় ম্লান, চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া আছে, মাথার চুলগুলা নিতান্ত রুক্ষভাবে দাঁড়াইয়া আছে, বস্ত্রের স্থানে স্থানে এখনো কাদা লাগিয়া আছে, মালতী আপনা-আপনি শিহরিয়া উঠিল, তাহার বোধ হইল যেন নিতান্ত গর্হিত অপরাধে তাহাকে বিচারালয়ে আনয়ন করা হইয়াছে।

সুরেন্দ্রবাবু অর্ধলিখিত কাগজখানা পার্শ্বে রাখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, তোমার শরীর বেশ সুস্থ হইয়াছে কি?

মালতী অধোবদনে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হইয়াছে।

আমি আজি বজরা খুলিয়া দিব। পরপারে কলিকাতা—তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার।

কথা শুনিয়া মালতীর চক্ষে জল আসিল, কোন কথা সে কহিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পার্শ্বের কাগজখানা হাতে লইয়া বলিলেন, এখানে আমার একজন বন্ধু আছেন, এই পত্রখানা লইয়া সন্ধান করিয়া তাঁহার নিকট যাইও, তিনি তোমার কোনরূপ উপায় করিয়া দিবেন।

টপ্ করিয়া একফোঁটা জল মালতীর চক্ষু হইতে পদতলে কার্পেটের উপর পড়িল।

সুরেন্দ্রবাবুও বোধ হয় তাহা দেখিতে পাইলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, তোমার নিকট টাকাকড়ি বোধহয় কিছুই নাই?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তাহা আমি জানিতাম। এই নাও, বলিয়া একটা মনিব্যাগ উপাধানের নিম্ন হইতে বাহির করিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ইহাতে যাহা আছে, কোনরূপ উপায় না হইলেও এক বৎসর ইহা হইতে তোমার স্বচ্ছন্দে চলিবে ; তাহার পর ঈশ্বরের আশীর্বাদে যাহা হয় করিও।

আর এক ফোঁটা জল কার্পেটের উপর আসিয়া পড়িল।

সেদিন উন্মত্ত ছিলাম, তাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কাহার পাপে এমন ঘটিল? কিন্তু এখন জ্ঞান হইয়াছে, এখন দেখিতেছি আমারই পাপের এই ফল—তুমি নির্দোষ! আমার জয়াকে আমিই মারিয়া ফেলিয়াছি।

কপালের উপর কয়েক বিন্দু ঘাম জমা হইতেছিল, তিনি হাত দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ঢের হইয়াছে—আর পাপ করিব না ; কিছুদিন সৎপথে থাকিয়া দেখি যদি সুখ পাই।

মালতী দাঁড়াইয়া রহিল ; সুরেন্দ্রবাবু পত্রখানা শেষ করিতে লাগিলেন। শেষ হইলে, মুড়িয়া খামে পুরিয়া শিরোনামা দিয়া তাহার পায়ের নিকট ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, এই নাও। শ্যামবাজারে সন্ধান করিয়া লইও, বোধ হয় ইহাতে উপকার হইবে।

কম্পিতহস্তে মালতী পত্রখানা তুলিয়া লইল।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, টাকা নাও।

সে তাহাও উঠাইল ; দ্বারের দিকে একপদ অগ্রসর হইল।

সুরেন্দ্রবাবুর ভিতরটা কি একরকম করিয়া উঠিল ; বলিলেন, ধর্মপথে থাকিও—

মালতী আর একপদ অগ্রসর হইল। এবার সুরেন্দ্রনাথের গলা কাঁপিল—মালতী, সেদিনকার কথা বিস্মৃত হইও—

মালতী দ্বারের হাতল ধরিয়া টানিল, দ্বার অর্ধউন্মোচিত হইল, সুরেন্দ্রনাথের গলা আরো কম্পিত হইল—অসময়ে, কষ্টে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও।

মালতী বাহিরে আসিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চক্ষুও জলে ভরিয়া গেল ; ডাকিলেন মালতী!

মালতী সেইখানেই দাঁড়াইল।

আবার ডাকিলেন, মালতী!

সে এবার ভিতরে প্রবেশ করিয়া কপাটে ভর দিয়া দাঁড়াইল।

চক্ষু মুছিয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, জয়ার শোক এখনও ভুলি নাই—

মালতী দ্বার ছাড়িয়া সেইখানে উপবেশন করিল, তাহার পা কাঁপিতেছিল।

মালতী, কি লইয়া সংসারে থাকিব? সুরেন্দ্রনাথ বালকের মত কাঁদিয়া ফেলিলেন—তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলে আর বাঁচিব না। এইবার নীচে গালিচার উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

মালতী কাছে আসিয়া বসিল, আপনার ক্রোড়ের উপর মাথা তুলিয়া লইয়া চক্ষু মুছাইয়া দিয়া বলিল, আমি যাইব না।

তখন দুইজনেই বহুক্ষণ ধরিয়া রোদন করিলেন। মালতী পুনর্বার চক্ষু মুছাইয়া দিল। সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু মুদ্রিতই ছিল ; সেইভাবেই ভগ্নস্বরে বলিলেন, সেদিন তুমি কি বলিয়াছিলে মনে আছে?

কি?

চিরদাসী।

তাই।

সুরেন্দ্রনাথ উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হরিচরণ!

ছাদের উপর হইতে হরিচরণ মাঝি বলিল, আজ্ঞে।

বজরা এখনি খুলিয়া দাও।

এখনি?

এখনি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

যতক্ষণ বজরাখানা দেখা গেল, সদানন্দ গীত বন্ধ করিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বাটীতে আসিয়া শয়ন করিল। আজ তাহার মনটা ভাল ছিল না, নিদ্রাও ভাল হইল না। প্রাতঃকালে শুভদার নিকট আসিয়া বলিল, আমার এখানে খেলে হয় না?

শুভদা শুষ্কমুখে বলিল, কেন হবে না?

আমি তাই মনে করছি; আমার কেউ নেই, দু'বেলা এখানেই দুটি খাব।

শুভদা ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, বেশ ত।

পিসিমার শ্বশুরবাড়িতে তাঁর কতক জমিজমা আছে, সেগুলো আমিই পাইয়াছি, দু-একদিনের মধ্যেই সেখানে যাইয়া আমাকে সব দেখিয়া-শুনিয়া লইতে হইবে।

শুভদা বলিল, তা ত নিশ্চয়, না হলে কে আর দেখিবে?

তাই মনে করিতেছি যে, আমার ধানের গোলাটা এখানেই রাখিব, না হইলে চুরি যাইতে পারে।

শুভদা ভিতরের কথা বুঝিল না। বলিল, এতদিন ত চুরি যায়নি।

না যাউক, কিন্তু এখন ত যাইতে পারে?

শুভদা চুপ করিয়া রহিল।

ইহার দুই-একদিনের মধ্যেই সদানন্দর ধানের গোলা, কলাইয়ের মরাই, আলুর বোঝা, নারিকেলের ডাঁই, গুড়ের জালা সমস্ত একে একে সরিয়া আসিয়া মুখুজ্যে-পরিবারে স্থান গ্রহণ করিল।

দেখিয়া-শুনিয়া শুভদা বলিল, সদানন্দ, লোকে কি বলিবে?

সদানন্দ হাসিয়া উত্তর দিল, জিনিস আমার, লোকের নহে। আমি এইখানে খাই, এইখানে থাকি, আমার জিনিসপত্রও এইখানে থাকিবে।

বাস্তবিক পাড়ার পাঁচজনও পাঁচরকম কথা কহিতে লাগিল; কেহ বলিল, হারাণের বৌ সদাপাগলাকে জাদু করিয়াছে; কেহ কহিল, সদানন্দ একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে; কেহ বা এমন কথাও রটাইল যে, ছলনার সহিত সদার বিবাহ হইতেছে। সদানন্দ একথা শুনিয়া মনে মনে হাসিল; যে সম্মুখে উত্থাপন করিল তাহাকে হাসিমুখে একটা রামপ্রসাদী গান শুনাইয়া দিল, কাহাকে বা রসিকতা করিয়া বলিল, আমি মরিলে তোমার নামে দুবিঘা জমি লিখিয়া দিয়া যাইব, কাহাকে বা ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিল, পাগলা মানুষে পাগলামি করে সেজন্য তোমরা ভাবিও না। ক্রমশঃ লোকে মুখ বন্ধ করিতে লাগিল, তবে যাহারা ঈর্ষাপরতন্ত্র তাহারা মনে মনে জ্বলিতে লাগিল। ভবতারণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় একথা শুনিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বিশেষ করিয়া উপদেশ দিয়া দিলেন।

বিশেষরূপে উপদিষ্ট হইয়া সদানন্দ দুঃখিতভাবে বলিল, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে; এখন পিসিমার শ্বশুরবাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া ধানের গোলাটা আপনার বাটীতে রাখিয়া যাইব।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ওহে সদানন্দ, তোমার পিতাও আমাকে মান্য করিয়া চলিতেন।

আমিও কোনরূপ অমান্য করি না।

তবে এমন কথা বলিলে কেন?

সদানন্দ অপ্রতিভভাবে কহিল, আমার সব সময়ে মতিস্থির থাকে না।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আরো রাগিয়া উঠিলেন; বলিলেন, তুমি উৎসন্ন যাইতেছ।

সদানন্দ মৃদু হাসিল; আপনারা একটু চেষ্টা করিলে না যাইতেও পারিতাম।

তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।

যে আজ্ঞা, বলিয়া সদানন্দ বাহিরে আসিয়া খুব একগাল হাসিয়া লইল, তাহার পর গলা ছাড়িয়া রামপ্রসাদী ধরিল।

নিকটে কাঙ্গালীচরণ মাথায় পটলের বোঝা লইয়া হাটে যাইতেছিল, সে চোখে হাসি, মুখে গান দেখিয়া বলিল, কি দাদাঠাকুর, এত আমোদ কিসের?

সদানন্দ হাসিতে হাসিতে বলিল, গাঙ্গুলিমশায়ের বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ ছিল, খুব খেয়েছি।

সে বলিল, বটে!

তখন সদানন্দ আজকাল পটলের দর জিজ্ঞাসা করিয়া আর একবার হাসিয়া পূর্বত্যক্ত গানটার সুর গলার মধ্যে বেশ করিয়া ভাঁজিয়া লইয়া মনের আনন্দে পথ বাহিয়া চলিল, কাঙ্গালীচরণও যথাস্থানে চলিয়া গেল।

এখন একটা কথা আছে। কবি বলিয়াছেন, মনেই স্বর্গ, মনেই নরক ; সাংসারিক অস্তিত্ব ইহার বড় একটা নাই। একথা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যে আংশিক সত্য, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কারণ, হারাণচন্দ্রের যাহা পার্থিব সুখের শেষ সীমা, শুভদা তাহা তেমন উপভোগ করিয়া উঠিতে পারে না। হারাণচন্দ্রের দুবেলা পরিতোষে আহার করিতে পান, চাহিলেই দুই-চারি আনা পয়সা স্ত্রীর নিকট কর্জ পাইতে পারেন, তাহা পরিশোধ করিবার বালাই মাত্র নাই, বাজারের ভিতর দিয়া এখন উন্নত মস্তকে গমনাগমন করেন, কোন শ্যালকের নিকট একটি পয়সা মাত্র কর্জ নাই, আড্ডাধারী তাঁহার পূর্বপদ সসম্মানে ফিরাইয়া দিয়াছে ; আর চাই কি? তবে যেটুকু বাকি আছে, হারাণচন্দ্র ভাবেন, সদানন্দ আর একটু ক্ষেপিলেই তাহা সমাধান করিয়া ফেলিবেন। গুলির দোকানটা তখন নিজেই কিনিয়া লইবেন, আর কাত্যায়নী ছোটলোক বেটীর গর্ব রীতিমত খর্ব করিবেন। তাহার এক বৎসরের খোরাক ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে আগাম ফেলিয়া দিয়া বলিবেন, ছোটলোক বেটী! আমাকে হেয় করিস? পুরুষের ভাগ্য আর স্ত্রীলোকের চরিত্র দেবতারা জানেন না, তা তুই কোন্ ছার। আর ভগবান নন্দী ; তার বাটীর সম্মুখে যদি আড্ডাঘর না বসাই ত আমার নাম হারাণ নয়। হারাণচন্দ্র এখন গুন্‌গুন্ স্বরে গলায় সুর লইয়া সমস্ত বামুনপাড়াটা ঘুরিয়া বেড়ান।

কিন্তু শুভদা? তাহার কি এক ভাবনা? ভগবান জানেন স্বামীসুখ সে একদিনের জন্যও পায় নাই ; অন্ততঃ তাহার মনে পড়ে না—সে স্বামীর মুখে অন্নব্যঞ্জন তুলিয়া দিতে যে তাহার কত আনন্দ, কত তৃপ্তি, তাহা সে নিজেই অনুধাবন করিয়া উঠিতে পারে না ; আনন্দে চোখের কোণে জল আইসে, কিন্তু কে তাহা দেখিবে? দেখিবার একজন ছিল, বুঝিবার একজন ছিল, কিন্তু সে পূর্বেই গত হইয়াছে। শুধু ইহাই যদি হইত, তাহা হইলে শুভদা এই সুখেই সাংসারিক কাহিনী খতম করিয়া দিতে পারিত; কিন্তু ছলনা দিন দিন বড় হইয়া উঠিতেছে, তাহার উপায় কি করিয়া হইবে? যে মরিয়াছে সে বাঁচিয়াছে, কিন্তু মাধবের মনে যে কি আছে, শুভদা সে তত্ত্ব কিছুতেই নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারে না। আজকাল চিকিৎসার অনেক সুযোগ হইয়াছে, যথাসাধ্য চিকিৎসাও হইতেছে, কিন্তু ফল যে কিছু হইতেছে তাহা কিছুতেই বোধ হয় না। শুভদা একথা ভাবিয়া কপালে করাঘাত করে, ললনার কথা মনে করিয়া আকুলভাবে আপনা-আপনি রোদন করে, আর তাহার নিকট যাইবার কামনা করে ; আবার জল আনে, রন্ধন করে, সকলকে খাওয়ায় পরায়—এমনি করিয়া দিন অতিবাহিত করিয়া চলিতেছে।

একদিন মধ্যাহ্নে আহার করিয়া সদানন্দ শুভদার মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল ছলনা বড় হয়েছে।

শুভদা মলিন মুখে বলিলেন, হাঁ।

আর রাখা যায় না, ভালও দেখায় না।

শুভদা বলিল, মা দুর্গাই জানেন।

সদানন্দ একটু হাসিল ; বলিল, মা দুর্গা ত আর বিবাহ দিয়া যাইবেন না?

শুভদা মৌন হইয়া রহিল।

হরমোহনবাবুর ছেলে শারদার সহিত বিবাহ দিলে হয় না!

শুভদা ভাল বুঝিতে পারিল না ; বলিল, শারদার সঙ্গে?

হাঁ।

তা সম্ভব কি?

অসম্ভবই বা কিসে?

কি জানি! একথাটা শুভদা সম্পূর্ণ হতাশভাবেই বলিল।

পাগলা সদানন্দ তাহা বুঝিতে পারিয়া লুকাইয়া একটু হাসিয়া লইল ; তাহার পর বলিল, এ বিষয় শারদার নিকট একদিন বলিয়াছিলাম ; তাহার অমত নাই।

শুভদার মুখে আগ্রহের চিহ্ন প্রকাশ পাইল, কিন্তু তখনই তাহা মিলাইয়া গেল ; বলিল, কিন্তু তার পিতা? তাঁর কি মত হইবে?

না হইবে কেন?

কেন হইবে না, তাহা শুভদা বুঝিত, ছেলের ইচ্ছাসত্ত্বেও কেন যে বাপের ইচ্ছা হইবে না তাহাও জানিত, কিন্তু খুলিয়া বলিতে পারিত না। তাহার একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, কে তাহার পিতার মত করিতে যাইবে? কিন্তু তাহাও বলিল না, শুধু মৌনমুখে কাতর নয়নে তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

পাগলা সে মৌনভাষাও বুঝিল ; বলিল, তাহার পিতার মত আমাদেরই চেষ্টা করিয়া করিতে হইবে। কারণ বিবাহ ত দিতেই হইবে।

শুভদা ভয়ে ভয়ে, আশায় নিরাশায়, অস্ফুটে বলিল, হইবে কি?

নিশ্চয় হইবে।

কেমন করিয়া জানিলে?

পাগলা আবার একটু হাসিল ; আমি তাহা জানি। আপনি ভাবিবেন না, এ মত আমি নিশ্চয় করিব।

বৃদ্ধ হরমোহনের কিরূপে মত করিতে হইবে সদানন্দ তাহা বিশেষ বিদিত ছিল, মত যে নিশ্চয় হইবে তাহাও জানিত।

শুভদা কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া ঘরের ভিতর হইতে দুধ আনিতে গেল। কিন্তু দুধের বাটি হাতে লইয়া অসাবধানে তাহাতে বড় একফোঁটা চোখের জল মিলাইয়া ফেলিল। অপ্রতিভভাবে আসিয়া কহিল, সদানন্দ, বসো, ওঘর থেকে দুধটা বদলে নিয়ে আসি।

ওঘরে আসিয়া, দুগ্ধের কড়ায় হাত রাখিয়া শুভদা আরো একটু কাঁদিয়া লইল, সাবধান হইয়া আরো দুই-চারিটা বড় বড় ফোঁটা মৃত্তিকার উপরে ফেলিল, তাহার পর চক্ষু মুছিয়া দুগ্ধ ঢালিতে লাগিল। শুভদা কাঁদিল বটে, কিন্তু তাহা অন্তর্ভেদী রক্তবিন্দু নহে ; বরং অসম্ভব আনন্দাশ্রু ; ললনার শোকের একফোঁটা জল ; স্বামীর বেদনার একবিন্দু বারি।

আহার সমাপন করিয়া সদানন্দ মাঠপানে চলিল। সেখানে তাহার ক্ষেত আছে, কৃষাণ কাজ করে, গরুবাছুর চরিয়া বেড়ায়—সেখানে সদানন্দ আলের উপর কিছুক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইল, একটা অশ্বত্থমূলে বসিয়া দুই-চারিটা কালীনাম করিল, দুই-চারি ছিলিম তামাকু পোড়াইল, তাহার পর তথা হইতে উঠিয়া হরমোহনবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

বৃদ্ধ হরমোহন তখন নিদ্রান্তে তাম্বুল চর্বণ করিতেছিলেন, কলিকার তাওয়াটা তখনও তত উত্তপ্ত হয় নাই, একটু একটু ধূম নির্গত হইতেছিল মাত্র।

বৃদ্ধ, সদানন্দকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, কি হে, অনেকদিন যে তোমাকে দেখি নাই?

সদানন্দ বলিল, অনেকদিন কাশীতে ছিলাম।

তাহা শুনিয়াছিলাম। তোমার পিসিমাতার কাশীপ্রাপ্তি হইয়াছে তাহাও শুনিয়াছি। আসিলে

করবে? বসো।

সদানন্দ বিলক্ষণ সপ্রতিভভাবে নিকটেই স্থান গ্রহণ করিয়া উপবেশন করিল। সদানন্দ মুখবন্ধের ধার ধারে না, মিথ্যা আড়ম্বরের ঘটা তাহার ভাল লাগে না ; বসিয়াই বলিল, মহাশয়ের নিকট বিবাহের ঘটক হইয়া আসিয়াছি।

হরমোহন হাসিয়া বলিলেন, কাহার?

আপনার পুত্রের।

বৃদ্ধ এইবার গম্ভীর হইলেন। বিষয়ী লোক সংসারিক কথাবার্তার সময় হাসিতামাসাগুলিকে অনেকদূরে বিদায় দিয়া আইসেন। হরমোহনের নিকট তাঁহার পুত্রের বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্তা একটা গুরুতর বৈষয়িক আলোচনার মধ্যে। এতাবৎ এবিষয়ে তাঁহাকে অনেক মাথা ঘামাইয়া আসিতে হইয়াছে, অনেক ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইয়াছে। তাঁহার মতে এরূপ জটিল দেনা-পাওনার যুক্তিতর্কে রীতিমত বুদ্ধি পরিচালনা না করিতে পারিলে কিছুতেই একটা ন্যায্য মীমাংসায় আসিতে পারা যায় না, এবং পলিতমুণ্ড, মুণ্ডিতশ্মশ্রু ব্যক্তি ভিন্ন যে ঘটকালির কথা অপর কাহারও মুখেও আসিতে পারে তাহা তাঁহার ধারণাই ছিল না। এখন উক্তরূপ গম্ভীর বিষয়ের অবতারণা একজন বালকের মুখে শুনিয়া বৃদ্ধ কিঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিছু দিবস পূর্ব হইতে তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন যে, সদানন্দ আরো একটু অধিক বিকৃতমস্তিষ্ক হইয়াছে, এবং এখন তাহার ক্ষিপ্ততা সম্বন্ধে এরূপ অকাট্য প্রমাণ পাইয়া বিলক্ষণ রুক্ষভাবে এবং যথারীতি গম্ভীর হইয়া বলিলেন, কাহার বিবাহ? শারদার?

আজ্ঞা হাঁ।

বৃদ্ধ অন্যমনস্কভাবে বাটীর ভিতরপানে অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক কহিলেন, ঐদিকে বোধ হয় শারদা আছে, যাও।

তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া একথার অর্থ সদানন্দ বুঝিল। একটু হাসিয়া বলিল, শারদার সহিত আমার প্রয়োজন নাই, আপনার নিকটেই আসিয়াছি।

বৃদ্ধ পূর্বোক্ত প্রকারেই জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার নিকট।

আজ্ঞা হাঁ।

কেন?

এই যে বলিলাম—আপনার পুত্রের সম্বন্ধ করিতে। শারদার কি বিবাহ দিবেন না?

দিব—কিন্তু সে কথা কেন?

প্রয়োজন না থাকিলেই কি আসিয়াছি?

তোমার প্রয়োজন? আমার সহিত?

আজ্ঞা হাঁ।

কিন্তু তোমার সহিত সেসব কথা হইতে পারে না।

সদানন্দ বুঝিল যে, জগতের এ শ্রেণীর লোকের নিকট, মুখে একবিন্দু হাসির চিহ্নমাত্র থাকিলেও সাংসারিক কোনরূপ কথাবার্তা চলিতে পারে না ; মুখখানা তোলোহাঁড়ির মত না করিতে পারিলে, সে যে দেনাপাওনা, টাকাকড়ির কথা একবিন্দুও বুঝিতে পারে তাহা এ সম্প্রদায়ের মনুষ্য ধারণার মধ্যেই আনিতে পারে না। তখন সদানন্দ চেষ্টা করিয়া যতখানি পারিল ততখানি গম্ভীর হইয়া বলিল, খুব হইতে পারে। বাল্যকালে আমার পিতৃদেবের স্বর্গলাভ হইয়াছে ; সেই অবধি আমিই তাঁহার সমস্ত বিষয়-আশয় দেখিয়া আসিতেছি। সাংসারিক কথাবার্তা আমাদিগকেও কহিতে হয় ; বিবাহের সম্বন্ধ করিতে আসিয়া দেনা-পাওনা মীমাংসা করিতে হয় তাহা অবগত আছি এবং আশা করি সে বিষয়ে আপনিও যতটা বুঝিবেন, আমিও প্রায় ততটাই বুঝিব।

বৃদ্ধ হরমোহনের এই প্রথম বোধ হইল যে, ইহা ঠিক পাগলের মত বলা হয় নাই। একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, অবশ্য দেনাপাওনার মীমাংসা ত একটা করাই চাই।

সদানন্দ হাসি চাপিতে পারে না ; তাই আবার একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, পূর্বেই মহাশয়কে নিবেদন করিয়াছি যে, সে সব আমার সহিত হইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না ; তাহার কোনরূপ একটা মীমাংসা করিতে আসিয়াছি।

হরমোহন একটু নরম হইলেন। বলিলেন, কাহার কন্যা? কোথায়?

এই গ্রামেই। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যা।

হারাণের?

আজ্ঞা হাঁ।

সে কি দিবে?

আপনি যাহা চাহিবেন তাহাই।

বৃদ্ধ একটু চিন্তা করিয়া লইলেন ; তাহার পর বলিলেন, মেয়েটি দেখিতে শুনিতে কেমন?

আপনি তাহাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু বোধ হয় আপনার স্মরণ নাই ; যাহা হউক, মেয়েটি দেখিতে শুনিতে আমার বিবেচনায় মন্দ নয়। আপনার পুত্র তাহাকে দেখিয়াছে—বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক নহে।

বৃদ্ধ এবার একটু হাসিল। বলিল, তা হইলেই হইল। আর আমাদের গৃহস্থ পরিবারে মোমের পুতুলেরও বিশেষ প্রয়োজন নাই ; দেখিতে শুনিতে নিতান্ত মন্দ না হয় এবং কাজকর্ম করিতে পারে, এই হইলেই হইল।

সদানন্দ বলিল, তা পারিবে।

কিন্তু হারাণ কি দিতে পারিবে? তার অবস্থা ত এখন ভাল নয়।

না, অবস্থা ভাল নয়। তাই বুঝে আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই দিবেন।

বৃদ্ধ একটু মুস্কিলে পড়িলেন। মনে মনে ভাবিলেন, উপরোক্ত কথাটা না বলিলেই ভাল করিতেন। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিশালী হরমোহন তাহা সহজেই শোধরাইয়া লইয়া বলিলেন, তা কি জানি বাপু মেয়ের বিবাহের কিছু খরচ আছেই।

অবশ্য।

তখন হরমোহন অভ্যাসমত অধরের ক্ষীণহাসিটুকু বিদায় দিয়া পাথরের মানুষটি সাজিয়া বলিলেন, এক সহস্র নগদ মুদ্রার কম শারদার বিবাহ আমি কিছুতেই দিতে পারি না।

সদানন্দ সহাস্যে বলিল, তাহাই হইবে।

সদানন্দর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ত নিজের উপরই চটিয়া গেলেন। আপনাকে একটি অতিশয় বৃহদাকার গর্দভ বলিয়া মনে মনে সম্বোধন করিলেন ; কেন দেড় সহস্রের কথা কহিলেন না, এ আপসোস তাঁহার হৃদয় ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। যখন কথা বাহির হইয়া গিয়াছে তখন আর ফিরাইতে পারা যায় না ; যাহা হউক, মন্দের যতটা ভাল হইতে পারে এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, অবশ্য মেয়েকে গহনা দিতেই হবে।

হবেই।

দান-সামগ্রী রীতিমত আছেই।

আছেই।

তবে আমারও অমত নাই।

তবে একটা দিন স্থির করিয়া ফেলুন।

বৃদ্ধ একটু ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন, অবশ্য এ বিবাহ আপনা-আপনির মধ্যেই, আর হারাণও কিছু আমাদের পর নয়, তবুও নিয়মগুলা সব পালন করিয়া চলিতে হইবে।

সদানন্দ একটু শঙ্কিত হইয়া বলিল, নিয়ম আবার কি?

সহাস্যে—নিয়ম এমন কিছুই নয়, তবে লেখাপড়া একটা প্রয়োজন।

বেশ তাহাই হউক।

কিন্তু কাহার সহিত হইবে?

আমারই সহিত হউক।

কবে?

সদানন্দ একটু ভাবিয়া বলিল, এক মাস পরে।

বৃদ্ধ সম্মত হইলেন।

তখন সদানন্দ বলিল, আমার একটি অনুরোধ আছে।

কি বাপু?

এ দেনাপাওনার কথা যেন তৃতীয় ব্যক্তি না শুনিতে পায়।

কেন?

একটু কারণ আছে।

হরমোহন বৈষয়িক লোক ; সদানন্দর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, নিঃশব্দে দান করিতে চাও?

সদানন্দ চুপ্ করিয়া রহিল। তাহার মুখ দেখিয়া, সে নিঃস্বার্থ দয়া দেখিয়া হরমোহনেরও সেইসময়ের জন্য লজ্জা করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি রীতিমত বৈষয়িক লোক, এভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে দিলেন না। একটা শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, বাপু, আমাদের বয়েস হইয়াছে, এইজন্য চক্ষুলজ্জাও ততটা নাই, না হইলে হারাণের অবস্থা আমি বিশেষরূপেই জানি। যাহা হউক, তুমি যখন নিঃশব্দে দান করিতে পারিতেছ, তখন আমিও নিঃশব্দে গ্রহণ করিতে পারিব। সেজন্য তুমি চিন্তা করিও না।

সদানন্দ প্রফুল্লমুখে নমস্কার করতঃ তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শুভদা শুনিলেন, হারাণবাবু শুনিলেন, ছলনাও শুনিল যে, তাহার সহিত শারদার বিবাহ হইতেছে। এ বিবাহ সদানন্দ ঘটাইয়াছে। শুনিয়া রাসমণি মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, সদানন্দ পূর্বজন্মে শুভদার পুত্র ছিল। সদানন্দর সমক্ষে একথা বলা হইয়াছিল, সে একথা নিরুত্তরে স্বীকার করিয়া লইল, অতঃপর কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না।

নানা গোলযোগে পড়িয়া তাহার এ পর্যন্ত পিসিমার সম্পত্তি দেখিতে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই, এখন সময় পাইয়া একথা সে শুভদাকে জ্ঞাত করিল, শুভদা তাহাতে সম্মত হইল ; তখন পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া কিছু দিবসের জন্য শ্রীমান সদানন্দ বিদেশযাত্রা করিল। শুভদার সংসার এখন তাহার সংসার হইয়াছে ; সুতরাং ইহার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে ভুলিল না এবং আরো, বিবাহের অপরাপর সরঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া রাখিবার জন্য শুভদাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল। সেখানে যাইয়া সদানন্দ মৃত পিসিমাতার সমস্ত জমিজমা বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া লইল, তাহার পর একজন মুরুব্বি স্থির করিয়া এককথায় তাহাকে সমস্ত বিক্রয় করিয়া অর্ধমাস-কালের মধ্যেই হলুদপুরে পুনরায় ফিরিয়া আসিল। হরমোহনের সহিত লেখাপড়া করিল, গহনা গড়াইল, জিনিসপত্র আনাইল, বিবাহের দিন স্থির করিল, তাহার পর সময় করিয়া শারদাচরণের সহিত সাক্ষাৎ করিল। এতদিন পর্যন্ত নিভৃতে তাহার সহিত দুটো কথা কহিবার সময় হইয়া উঠে নাই। আজ অনেকদিনের পরে দুজনেই আপসে দুটো কথা কহিতে চাহিল, তাই হাত ধরাধরি করিয়া গঙ্গাতীরে একস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

উপবিষ্ট হইয়া শারদাচরণ বলিল, সদানন্দ, তোমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে?

স। কতক কতক মনে পড়ে বৈ কি।

শা। মনে পড়ে যখন আমি একজনকে বড় ভালবাসতাম, যখন দিবারাত্রি কেবল ঐ কথাই ভাবিতাম, তোমার কাছে কত আশা, কত কল্পনা, কত কি বলিতাম, অভিমান হইলে কত কাঁদিতাম, আর তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতে—নাহয় বিদ্রূপ করিতে, সেসব কথা তোমার মনে পড়ে সদানন্দ?

স। তা আর পড়ে না? সে ত সেদিনকার কথা ; বোধ হয় সাত-আট বৎসরের অধিক হইবে না—কিন্তু বিদ্রূপ ত কখন করি নাই।

শা। আমার বোধ হইত যেন বিদ্রূপ করিতে। যা হোক, তাহার পর যেদিন সে আমার সব আশা ধূলিসাৎ করিয়া দিল, অভিমানভরে দুজনেই কথা বন্ধ করিয়া চিরবিদায় লইলাম ; সেদিন কত রাত্রি পর্যন্ত তোমার কাছে বসিয়া কাঁদিলাম, সেকথা তোমার মনে আছে ভাই?

স। আছে।

সদানন্দ কিছু অন্যমনস্ক হইল। শারদা কিন্তু তাহা লক্ষ্য না করিয়া অদূরে অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া কহিল, ঐখানে সে মরিয়াছে!

সদানন্দ সেকথা যেন শুনিতে পাইল না, আপনমনে গঙ্গায় একখানা নৌকা সাদা পালভরে উড়িয়া যাইতেছিল, তাহার পানে চাহিয়া রহিল। শারদা আবার বলিল, ঐখানে ললনা ডুবিয়া মরিয়াছে।

এবার সদানন্দ মুখ ফিরাইয়া বলিল, কোন্‌খানে?

শা। ঐখানে।

স। কেমন করে জানিলে?

শা। ঐখানে তার পরিহিত বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল।

সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল তবে, কাপড়খানা একবার দেখিয়া আসি।

শারদা অল্প হাসিল ; কাপড়খানা কি এখনো ঐখানে আছে?

স। চল তবে স্থানটা দেখিয়া আসি।

দুজনে তখন সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। সদানন্দ জল লইয়া চোখমুখ ধুইল, তাহার পর পুনর্বার যথাস্থানে আসিয়া উপবেশন করিল।

শা। সদানন্দ, আমার বড় অনুতাপ হয়।

স। কেন?

শা। সময়ে সময়ে বোধ হয় আমিই তাকে মারিয়া ফেলিয়াছি।

স। কেন?

শা। জগদীশ্বর জানেন তার আয়ু শেষ হইয়াছিল কি না, কিন্তু আমার বোধ হয় আমি বিবাহ করিলে সে হয়ত এখনও বাঁচিয়া থাকিত।

সদানন্দ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। বলিল, যে মরিয়াছে সে নিশ্চয়ই মরিত! তুমি কি করিবে?

শা। তাহা জানি। তবুও যদি তাহার কথা রাখিতাম, যদি বিবাহ করিতাম!

সদানন্দ হাসিল ; জাত যাইত যে।

শারদাচরণ তাহা ভাবিল ; বলিল, তাহা যাইত।

তবে আর তুমি কি করিবে?

শারদার চোখে জল আসিল। আর কি করিব, কিন্তু এত অনুতাপ হইত না!

সদানন্দ অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, ক্রমশঃ চলিয়া যাইবে।

শা। আহা, যদি তাহার শেষ অনুরোধটাও রক্ষা করিতে পারিতাম!

স। কি অনুরোধ?

শা। বলিয়াছিল, একঘর দরিদ্রের জাতি বাঁচাও—ছলনাকে বিবাহ কর।

সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া বলিল, ছলনাকে কি বিবাহ করিবে না?

শা। করিব, কিন্তু তার অনুরোধ রক্ষা করা হইল কি?

স। কেন হইল না?

শা। প্রকারান্তরে হইল বটে, কিন্তু—আচ্ছা সদানন্দ, বাবাকে তুমি কি করিয়া সম্মত করিলে?

সদানন্দ মৃদু হাসিল ; বললাম, যে তোমার বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে।

শা। শুধু এই?

স। আবার কি?

শা। আমি কি বাবাকে চিনি না?

সদানন্দ আবার হাসিল ; বলিল, তবে জিজ্ঞাসা কর কেন?

শা। জিজ্ঞাসা করিতেছি যে কত টাকা দিতে হইবে?

স। সেকথা শুনিয়া তোমার লাভ নাই।

শা। সদানন্দ, এ যে পাপের ধন!

স। আমি আশীর্বাদ করিব যেন তোমার জীবন চিরসুখে কাটে।

শা। সময় হইলে আমি ফিরাইয়া দিব।

স। দিও। বলিয়া সদানন্দ উঠিয়া আসিয়া যেস্থানে ললনার বস্ত্র পড়িয়াছিল সেস্থানের মাটি তুলিতে লাগিল।

শারদা বিস্মিত হইয়া বলিল, ও কি কর! সন্ধ্যাবেলা মাটি তোল কেন?

সদানন্দ খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, পাগলামি করিতেছি।

বাস্তবিক বলিতে কি, শারদাচরণ তাহার কথার সহিত কাজের বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইল না ; তথাপি বলিল, পাগলামি করিতেছ তাহা ত বলি নাই।

স। তুমি বলিবে কেন, আমি বলিতেছি।

শা। না না, সত্য বল মাটি লইয়া কি করিবে?

স। আমি আজকাল শিবপূজা করি ; বাটীতে গঙ্গামাটি নাই তাই লইয়া যাইতেছি।

শারদাচরণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল।

সদানন্দ মাটি লইয়া একটা তাল পাকাইল, তাহার পর গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া শারদার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চল শারদা বাড়ি যাই।

শা। তুমি ওসব কি করিলে?

স। তাহা ত চক্ষেই দেখিলে।

শা। কৈ, শিবপূজার মাটি লইলে না?

স। না। আর শিবপূজা করিব না।

শা। কেন?

স। আর একদিন বলিব।

তখন দুইজনে গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব আবাসাভিমুখে প্রস্থান করিল। বাটী আসিয়া সদানন্দ সেরাত্রের মত দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

রাত্রে আহার করিবার জন্য ছলনা, পিসিমা ক্রমে ক্রমে ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু সে দ্বার খুলিল না। ভিতর হইতে বলিল, আজ তাহার বড় শরীর খারাপ হইয়াছে। শুভদা দেখিতে আসিলেন, কিন্তু তখন সদানন্দ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অনেক ডাকাডাকি করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন সকাল হইলে সে আবার উঠিল, মাঠে গেল, আহার করিতে আসিল, হাসিয়া গান গাহিতে লাগিল, নিত্যকর্ম প্রতিদিন যাহা করে তাহাই করিতে লাগিল ; কেহ বুঝিল না যে সে প্রতিদিন পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে ; কাল যেমন ছিল, আজ ঠিক তেমনটি আর নাই ! ক্রমে ১৬ই আষাঢ় ছলনার বিবাহের দিন আসিল। আজি সকলের মুখেই আনন্দ, সকলের মনেই উৎসাহ ; সদানন্দর বসিবার অবকাশ নাই, হারাণ মুখুজ্যের চীৎকারের শেষ নাই, পিসিমাতার চক্ষুজলের অর্গল নাই—বাটিতে যে আসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিয়া জানাইতেছে যে, এমন সুখের দিনেও ললনার জন্য তাঁহার মনে একতিল সুখ নাই—বোধ হয় অনেকেই তাঁহার সহিত এ ব্যথা বুঝিতেছে ; কেবল শুভদা আজি বড় শ্রান্ত, বড় ধীর।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল, অনেক বাজনা-বাদ্য বাজিল, অনেক লোক জমা হইল—তাহার পর

শুভক্ষণে শুভলগ্নে ছলনাময়ীর বিবাহ হইয়া গেল।

আজ গ্রামময়, কৃপণ হরমোহনের সুখ্যাতির একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে ; শত্রুতেও মনে মনে স্বীকার করিল যে, হাঁ, মনটা দরাজ বটে!

মুখের সম্মুখে কেহ তাঁহার গুণগান করিলে, নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে বৃদ্ধ হরমোহন বলেন, কি আর করি বল, একটি বৈ ছেলে নয়, তার ওখানে বিবাহ করিতে ইচ্ছা—আমি আর তাহাতে অমত কেন করিব? আর গ্রামের মধ্যে আমরাই ওদের পালটি ঘর—প্রতিবাসীকে একটু দেখিতে হয়!

শারদাচরণ একথা শুনিয়া অলক্ষ্যে ভ্রূকুঞ্চিত করিত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনেক কাজ ছিল, অনেক কষ্টে তাহা সমাধা হইয়া গিয়াছে! এখন আরাম করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতে বেশ লাগে, কিন্তু দুই-চারিদিন পরে সে আরামটা আর তেমন করিয়া উপভোগ করিয়া উঠিতে পারা যায় না। নিতান্ত আলস্যভাবে নিষ্কর্মার মত বসিয়া থাকিতেও কেমন ব্যাজার বোধ হয়। ছলনাময়ীর বিবাহ দিয়া, লুকাইয়া লুকাইয়া হরমোহনকে বেশ দুপয়সা ঘুষ দিয়া হত্যাপরাধে ধৃত আসামীর খালাস পাওয়ার মত, বিছানায় পড়িয়া মনের আনন্দে পাশবালিশ জড়াইয়া, এপাশ ওপাশ করিয়া গড়াইয়া গড়াইয়া সদানন্দ দুই-চারিদিন নির্বিবাদে কাটাইয়া দিল, তাহার পর বোধ হইতে লাগিল যে, শয্যাটা একটু গরম, বালিশগুলো একটু শক্ত হইয়াছে, ঘরটার ভিতর একটু অধিকমাত্রায় অন্ধকার ঢুকিয়াছে, সদানন্দ উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি সমস্তদিন ধরিয়া হইতেছিল, তাহা তখনও শেষ হয় নাই ; কালো মেঘগুলা ছোটখাট বাতাসে দুই-চারি পা করিয়া মাঝে মাঝে সরিয়া দাঁড়াইতেছে বটে, কিন্তু জল বর্ষাইতে ছাড়িতেছে না—ছাড়িবেও না, সদানন্দ অন্ততঃ এইরূপ মনে করিয়া লইল ; তাহার পর মাথায় ছাতা দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল। বহুক্ষণ এপথ ওপথ করিয়া, কাপড় ভিজাইয়া, একপা কাদা লইয়া হারাণচন্দ্রের বাটীর ভিতর আসিয়া খাড়া হইল। শুভদা বোধ হয় রন্ধনশালায় ছিলেন, সদানন্দ সেদিকে গেল না ; পিসিমাতা সম্ভবতঃ পাড়া বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সে খোঁজও সে লইল না। পা ধুইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া যে ঘরে মাধবচন্দ্র শয়ন করিত সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

অনেকদিন হইতে মাধবচন্দ্রকে আর দেখা হয় নাই, আজ তাহার কথা একটু কহিব। ললনা চলিয়া যাইবার পর হইতেই সে ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হইয়াছে। নিতান্ত বহুদর্শী বিজ্ঞের মত সকল বিষয়েই সে একটা ভাবিয়া চিন্তিয়া মতামত প্রকাশ করে, যা তা খাইতে চাহে না ; যা তা বিষয়ে বাহানা করে না, অনেক সময় প্রায় কথাই কহে না, নিঃশব্দে দার্শনিকের মত বালিশগুলা এক করিয়া হেলান দিয়া আপনমনে বসিয়া থাকে, কেহ তাহার নিকট আসুক আর না আসুক, সে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করে না। আজও সেইরূপ বসিয়াছিল ; সদানন্দ আসিয়া নিকটে দাঁড়াইলে সে ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, সদাদাদা, তুমি আমার কাছে আস না কেন?

স। আমার কত কাজ ছিল ভাই।

মা। সব হয়ে গেছে?

স। হাঁ।

মা। ছোটদিদি কবে ফিরে আসবে?

স। আর তিন-চারদিন পরে।

মা। দেখ সদাদাদা, অনেকদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলা হয় না—

স। কেন?

মা। তোমাকে কখন একলা পাই না, তাই হয় না।

সদানন্দ নিকটে বসিল ; বলিল, একলা কেন মাধু?

মা। চুপিচুপি তোমাকে বলতে দিদি বলে গিয়েছিল।

স। কে, মাধু?

মা। দিদি ; বড়দিদি যে রাত্তিরে চলে গেল—তুমি তখন এখানে ছিলে না কি না তাই, তুমি

ফিরে এলে তোমাকে বলতে বলে গিয়েছিল যে, দিদি চলে গেছে।

সদানন্দ আরো একটু কাছে আসিয়া, তাহার অঙ্গে হাত দিয়া বলিল, কেন গেল মাধু? কেউ গালাগালি দিয়েছিল?

মা। কেউ না।

স। তবে কেন গেল?

মা। আমিও যাব।

স। ছিঃ—

মাধব একটু হাসিল, তাহার পর বলিল, আর কেউ জানে না। কেবল আমি জানি আর দিদি জানে। সে আমার আগে গেছে—আমার জন্যে সব ঠিক করে আমাকে নিয়ে যাবে, সেখানে দুজনে খুব সুখে থাকব। মাধবচন্দ্র তাহার মুখখানা অতিরিক্ত প্রফুল্ল করিয়া আবার একটু হাসিল; তাহার পর ফিরিয়া বলিল, দিদি এসে নিয়ে যাবে।

সদানন্দ বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল ; তাহার পর বলিল, কবে?

মা। যবে আমার সময় হবে।

স। মাধব, এসব কথা তোমাকে কে শেখালে?

মা। বড়দিদি।

স। সে তোমাকে নিয়ে যাবে বলেছিল?

মা। হাঁ—

স। আর যদি না নিয়ে যায়?

মা। কেন যাবে না? নিশ্চয় যাবে!

স। যদি না নিয়ে যায়, তাহলে তুমি একা যেতে পারবে কি?

মাধব একটু বিমর্ষ হইল, ভাবিয়া দেখিল ; তাহার পর বলিল, কি জানি!

সদানন্দও চুপ করিয়া রহিল। মাধব আবার কহিল, সদাদাদা, সেখানে একলা যাওয়া যায় কি?

স। যায়। না হলে তোমার দিদি গেল কি করে?

মা। আমিও তবে যেতে পারব?

স। পারবে।

মাধব আবার একটু ভাবিল, পরে অধিক দুঃখিতভাবে কহিল, কিন্তু কেমন করে যাব—আমার গায়ে আর একটুও জোর নেই। সদানন্দ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। সে বলিতে লাগিল, দিদি যখন যায় তখন দিদির গায়ে খুব জোর ছিল, আমি কিন্তু কেমন করে যাব? এখন আমি একবার দাঁড়াতেও পারিনে—অত দূর কি যেতে পারব?

সদানন্দর চক্ষে জল আসিল ; অন্ধকারে মাধব তাহা দেখিল না। সদানন্দ দেখিতে লাগিল যে মাধবের দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, আর কিছুদিন—তাহার পর সব ফুরাইয়া যাইবে। সে ভাবিল শুভদার কথা, সে ভাবিল, ললনার কথা, সে দেখিল, সে একটু ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছে, পাঁচজনকে জড়াইয়া লইয়া আর তেমন চিন্তাশূন্য আনন্দে দিনাতিবাহিত হয় না, কালীনামগুলা আর তেমন করিয়া গাওয়া হয় না, তেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে না, তেমন করিয়া আনন্দ করিতে পারে না। সে সুখী ছিল, অসুখী হইয়াছে, বিরাগী ছিল সংসারী হইয়াছে। চক্ষের জল মুছিয়া সদানন্দ আজ প্রথম মনে করিল যে, বাঁচিয়া থাকিয়া তেমন সুখ হয় না ; যে জীবিত আছে তাহারই কষ্ট আছে, যে মরিয়াছে এ জ্বালার সংসারে সে বাঁচিয়াছে। সে রাত্রে সদানন্দ অনেক ভাবিল ; যাইবার সময় ললনা তাহাকে ভুলিয়া যায় নাই, সেকথা মনে পড়িল ; মাধবচন্দ্র মরিতেছে, একথাও স্মরণ হইল ; আর শুভদা—তাহার মনে হইল যে, ললনা মরিয়া তাহার যত দুঃখকষ্ট সমস্তই তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে।

মাধবচন্দ্রের মনেও সে রাত্রে খুব সুখ ছিল না। মধ্য হইতে তাহার একটা দুর্ভাবনা আসিয়া

জুটিয়াছে। এতদিন সে নিশ্চিন্ত ছিল যে, সময় হইলে ললনা আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইবে, কিন্তু সদাদাদা একটু অন্যরূপ বলিয়াছে—তাহার শরীরে আর একটুও সামর্থ্য নাই, সেস্থলে কেমন করিয়া সে অতদূর যাইতে পারিবে? ভাবিয়া ভাবিয়া অনেক রাত্রে সে নিশ্চয় করিল যে, তাহার দিদি কখন মিথ্যা বলিবে না—যথাসময়ে নিশ্চয় আসিবে। মাধবচন্দ্র তখন অনেকটা শান্তমনে নিদ্রা গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

আরো কতদিন কাটিয়া গেল। ছলনা বাপের বাটী ফিরিয়া আসিল, পাড়ার মেয়েরা আর-একবার নূতন করিয়া কন্যা-জামাতা দেখিয়া গেলেন, কত হাসি কত তামাসা গড়াইয়া গেল, হরমোহন নিজে এখানে আসিয়া সকলকে মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া ব্যায়ান-ঠাকুরানীর নমস্কার গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন, হারাণচন্দ্র কোমরে ফর্সা চাদর বাঁধিয়া বামুনপাড়ার প্রত্যেক দোকানে একবার করিয়া বসিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিলেন—এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়া গেল।

আজ মাধবচন্দ্রের পীড়া বড় বৃদ্ধি পাইয়াছে। শয্যার উপর ছটফট করিতেছে এবং পার্শ্বে, শিয়রে, পদতলে পিসিমাতা, কৃষ্ণঠাকুরানী, ছলনা প্রভৃতি বসিয়া আছে। শুভদা এখানে নাই—তিনি রন্ধনশালায় বসিয়া কতক রাঁধিতেছেন, কতক কাঁদিতেছেন, সদানন্দ ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছে, আর হারাণচন্দ্র 'এই আসিতেছি' বলিয়া ঘণ্টাতিন হইল বাহির হইয়াছেন, এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারেন নাই। সকলে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া আছেন ; কৃষ্ণঠাকুরানী মাধবের গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন এবং ডাক্তারের অপেক্ষায় মনে মনে সময় গুনিতেছেন।

ক্রমে সন্ধ্যার একটু পরে ডাক্তার আসিয়া পৌঁছিলেন ; তিনি আজ ছয়-সাত দিবস হইতে নিত্য আসিতেছেন, নিত্য দেখিতেছেন, পীড়া কিছুতেই কমিতেছে না বরং বাড়িতেছে তাহা জানিতেন, বাঁচিবে না তাহাও বুঝিয়াছিলেন। আসিবার ইচ্ছাও ছিল না, কিন্তু সদানন্দর পীড়াপীড়িতে আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঘরে আসিয়া ডাক্তারে যাহা দেখে তাহা তিনি দেখিলেন, তাহার পর বাহিরে আসিয়া সদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, সদানন্দবাবু, আজ বেশ সাবধানে থাকিবেন ; ছেলেটি বোধ হয় আজ রাত্রে বাঁচিবে না।

সদানন্দও তাহা জানিত।

অনেক রাত্রে হারাণচন্দ্র ফিরিয়া আসিলেন, চোরের ন্যায় কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া ভিতরের বৃত্তান্ত যতটা সম্ভব অবগত হইলেন, তাহার পর দ্বার ঈষৎ খুলিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, এখন কেমন আছে?

কেহ কথা কহিল না। শুধু শুভদা বাহির হইয়া আসিল ; খাবার থালা সম্মুখে রক্ষা করিয়া নিকটে বসিল।

হারাণ বলিলেন, মাধু এখন কেমন?

বোধ হয় ভাল নয়।

ভাল নয়?—একটু থামিয়া বলিলেন, আমার শরীরও ভাল নয়।

কি ভাবিয়া তিনি যে একথা বলিলেন, কি মনে করিয়া যে তিনি নিজের অসুস্থতার কথা উল্লেখ করিলেন তাহা বলিতে পারি না এবং ইহাতে সত্যাসত্য কতদূর ছিল তাহাও অবগত নহি—কিন্তু একথা শুভদার কানে প্রবেশ করিল না। হারাণচন্দ্র মনে মনে বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন : স্ত্রীর নিকট শারীরিক অসুস্থতার কথা কহিয়া তাহার একটা স্নেহময় প্রত্যুত্তর না পাওয়া, তাঁহার নিকট এরূপ অস্বাভাবিক বোধ হইল যে হারাণচন্দ্র আপনাকে যথেষ্ট অপমানিত মনে করিলেন। তিনি নেশা করিয়া আসিয়াছিলেন, তাই সেই সামান্য অপমানাঙ্কুর দুই-চারি মুহূর্তের মধ্যেই মস্তিষ্কের ভিতর বেশ ডালপালা ছড়াইয়া দিল। হারাণচন্দ্র বিরক্তভাবে থালা ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, আর খাব না—শেষে কি মরে যাব? হারাণচন্দ্র উঠিয়া আসিয়া আচমন করিয়া নির্দিষ্ট

কক্ষে নির্দিষ্ট শয্যায় যথারীতি শয়ন করিলেন ; মনে মনে বোধ হয় স্থির করিয়া লইলেন যে, তাঁহারও যথেষ্ট অসুখ হইয়াছে।

এদিকে শুভদা হাত ধুইয়া মাধবের নিকটে আসিয়া বসিলেন। দেখিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী বলিলেন, হারাণ কোথায়?

তাঁর শরীর অসুখ হয়েচে—শুয়েছেন।

কৃষ্ণঠাকুরানী একটু মৌন হইয়া রহিলেন ; তাহার পর মৃদু মৃদু বলিলেন, মানুষের মায়াদয়া থাকে না, কিন্তু চক্ষুলজ্জাও ত একটু থাকতে হয়!

রাসমণি একথা শুনিয়া ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিলেন।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। কৃষ্ণঠাকুরানী অনেক মুমূর্ষুর পার্শ্বে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, অনেক মৃত্যু দেখিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ হইল, মাধবের অল্প শ্বাস হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে মাধব কহিয়া উঠিল, বড় মাথা ধরেচে।

কৃষ্ণপিসিমাতা মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলে। একটু থামিয়া আবার কহিল, বড় পেট কামড়াচ্চে, বড় গা বমিবমি করচে।

সকলে সকলের মুখপানে চাহিয়া দেখিল যেন প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মনের কথা মুখের উপর পড়িতে চেষ্টা করিল।

পুনর্বার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে অতিবাহিত হইল—সকলেই মৌন ম্লানমুখে শেষটার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে জড়াইয়া জড়াইয়া বড় কাতরভাবে মাধব বলিল, বড় তেষ্টা।

পিসিমাতা দুগ্ধের পরিবর্তে মুখে একটু গঙ্গাজল দিলেন। আগ্রহে মাধব সেটুকু সম্পূর্ণ পান করিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ পড়িয়া রহিল।

ক্রমে শ্বাস বাড়িয়া উঠিল, সকলেই তাহা লক্ষ্য করিলেন ; কৃষ্ণঠাকুরানী নাড়ি দেখিতে জানিতেন, অনেকক্ষণ ধরিয়া হাত দেখিয়া সদানন্দকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, এবার নীচে শোওয়াইতে হবে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

রাসমণির কর্ণে একথা প্রবেশ করিয়াছিল ; অস্ফুটে কাঁদিয়া উঠিলেন—আর দেখ কি সদানন্দ?

ছলনা কাঁদিয়া উঠিল, কৃষ্ণপিসিমাতা কাঁদিয়া উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মাধবেরও প্রায় অচেতন দেহ নীচে নামিয়া আসিল।

বহুক্ষণ পরে মাধব আর একবার হাঁ করিল—কৃষ্ণপিসিমাতা পূর্বের মত তাহাতে আর একটু জল দিলেন। মাধব যেন একটু বল পাইল—একবার চক্ষু চাহিল, তাহার পর মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল, সদাদাদা,—দিদি—এসেছে।

ছলনাময়ী নিকটে বসিয়াছিল, আজি সমস্ত রাত্রি সে নিদ্রা যায় নাই,—শিহরিয়া সে জননীর আরো নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল ; রাসমণির সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আর কিছুক্ষণ পরে মাধবচন্দ্র অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িল, মাথা নাড়িতে লাগিল—প্রবল শ্বাস হইয়াছে ; দেখিয়া শুনিয়া কৃষ্ণঠাকুরানী কাঁদিয়া বলিলেন, আর কেন? সময় হয়েচে—রাসমণি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—পরকালের কাজ কর—তুলসীতলা—

সকলেই তখন উচ্চরোলে কাঁদিয়া উঠিলেন। চীৎকার-শব্দে হারাণচন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, মাধবকে ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনা হইতেছে—তিনিও চীৎকার করিয়া পুত্রের শরীর তুলসীতলায় ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন—কাঁদিয়া ডাকিলেন, বাবা—মাধু—

সেও বোধ হয় গোঁ-গোঁ করিয়া একবার কহিল, বা—বা।

দশম পরিচ্ছেদ

বিচিত্র হর্ম্যে বিচিত্র কৌচের উপর অপূর্বসুন্দরী মালতী, কক্ষ উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছে। নিকটে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত সাইড্ বোর্ডের উপর রৌপ্য শামাদানে বাতি জ্বলিতেছে। তাহারই আলোকে মালতী একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। যে কক্ষে মালতী বসিয়া আছে তাহা অতিরিক্ত সুসজ্জায় সজ্জিত। সমস্ত হর্ম্যতল বহুমূল্য বিচিত্র কার্পেটে মণ্ডিত ; দেওয়াল নানাবিধ লতাপাতা ফুলেফলে বিচিত্র, তাহার উপর বহুবিধ তসবির, বহুমূল্য অয়েল পেন্টিং, অলিওগ্রাফ, ফটোগ্রাফ প্রভৃতিতে বিশেষ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। আশেপাশে বহুবিধ দেয়ালগিরি গৃহসজ্জা বৃদ্ধি করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের বেলওয়ারি কাঁচের ভিতর দিয়া লাল-নীল-সবুজ নানা বর্ণের আলোকখণ্ড ইতস্ততঃ ঠিকরিয়া পড়িয়াছে, দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড আয়না—আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া গৃহের উজ্জ্বলতা চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে, তৎসংলগ্ন মর্মরপ্রস্তরের মেজ এবং শ্বেতপ্রস্তরের ঝরনা, তদুপরি স্থাপিত রহিয়াছে ; চতুর্দিকে শ্বেত কৃষ্ণ পীত বর্ণের মনুষ্য প্রতিকৃতি, সে আলোকে জীবন্ত বোধ হইতেছে। এই রাজোচিত হর্ম্যে মালতী—জীবন্ত স্বর্ণপ্রতিমা—একাকী বসিয়া আছে। কত রূপে যে এ পার্থিব সৌন্দর্য সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়া সে বসিয়া আছে, আত্মবিস্মৃত হইয়া মুগ্ধনয়নে সে শোভা দেখিবার জন্য সেখানে আর কেহ ছিল না, তাই মালতী আপন মনে পুস্তক পাঠ করিতেছে। পাঠ আর ছাই করিতেছে ; ছত্রের পর ছত্র সরিয়া যাইতেছে, পাতের পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছে, কিন্তু একবর্ণও মনের ভিতর প্রবেশ করিতেছে না। সে ইতিপূর্বেই বোধ হয় কাঁদিতেছিল, কেননা শুষ্ক জলের দাগ এখনও তাহার কপোলের উপর প্রতীয়মান হইতেছে। এ সুখ-ভবনে সে কেন যে কাঁদিতেছিল তাহা জানি না, কিন্তু কাঁদিতেছিল তাহা নিশ্চয় ; এবং সেই কান্নাই থামাইবার জন্য পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিল। মালতী নিরাভরণা, মালতী সামান্য বস্ত্রপরিহিতা, মালতী কাঁদিতেছিল, মালতীর মনে সুখ নাই। পুস্তক বোর্ডের উপর বন্ধ করিয়া ফেলিয়া দিল, নিঃশব্দে কৌচের বাজুতে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বসিয়া রহিল। পুনর্বার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল, এবার তাহা রোধ করিবার প্রয়াস করিল না। কাজেই একটির পর একটি করিয়া অশ্রু কৌচের মখমল চাদরের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; অত পুরু গালিচার উপর পদশব্দ হয় না, কাজেই এ আগমন মালতী জানিতে পারিল না, সে যেমন কাঁদিতেছিল তেমনই কাঁদিতে লাগিল। সুরেন্দ্রনাথ নিস্তব্ধে তাহা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে আরো একটু নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাহার পর ডাকিলেন, মালতী।

মালতী চমকিয়া চাহিয়া দেখিল ; বলিল, এসো।

সুরেন্দ্রনাথ নিকটে উপবেশন করিলেন। তাহার দুটি হাত নিজের হাতে লইয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে কহিলেন, আবার কাঁদছিলে?

মালতী হাতে-হাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, এইজন্য ইচ্ছা থাকিলেও 'না' বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া রহিল।

কেন কাঁদিতেছিলে?

মালতী কথা কহিল না।

তিনিও কিছুক্ষণ কিছুই বলিতে পারিলেন না। পরে তাহার হাত দুটি আরো একটু টিপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃখ এই যে এত চেষ্টাতেও তোমাকে সুখী করিতে পারিলাম না, হৃদয়ের সহস্র কামনাতেও তোমার মন পাইলাম না।

মালতী একটা উত্তর খুঁজিল কিন্তু পাইল না, আরো একটা কাজ তাহার দ্বারা হইল না। ইতিপূর্বেই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যাহাই হউক আর কাঁদিবে না, কিন্তু অশ্রুর উপর প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারিল না। তাহারা যেমন পড়িতেছিল, তেমনিই পড়িতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিতে লাগিলেন, কি করিলে যে একজন সুখী হইতে পারে তাহা মানুষে

বুঝিতে পারে না এবং দেবতারা পারেন কি না তাও বলিতে পারি না। তৃপ্তির জন্য, সুখের জন্য এ ভবন এমন করিয়া সাজাইলাম, এ দেবীপ্রতিমা এ ভবনে এত যত্নে প্রতিষ্ঠিত করিলাম, কিন্তু সুখী হইতে পারিলাম কি? সুখের কথা ছাড়িয়া দিই—বোধ হয় আমার অসুখের মাত্রাই বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহাকে সুখী করিতে এত করিলাম তাহাকে একদিনের জন্যও সুখী দেখিলাম না, তোমাকে পাইয়া অবধি ও অধরে একতিলের জন্যও হাসির রেখা দেখিলাম না,—বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া নিতান্ত অধীরভাবে সে অশ্রুমলিন মুখখানি তুলিয়া ধরিলেন; বলিলেন, মালতী, কতদিন কাটিয়া গেল কিন্তু কিছুতেই কি তুমি প্রফুল্ল হইবে না, কিছুতেই কি একবার হাসিয়া চাহিবে না?

মালতী হাত তুলিয়া চক্ষু মুছিল।

এ সৌন্দর্য যে কি, এ রূপে যে কত মুগ্ধ হইয়াছি তাহা প্রকাশ করিতে পারি না। মনের সাধে সাজাইব বলিয়া কত অলঙ্কার আনিলাম, কত বস্ত্র সংগ্রহ করিলাম, কিন্তু একদণ্ডের তরেও তুমি পরিলে না। মালতী! তুমি কি আমাকে দেখিতে পার না?

মালতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর মস্তক স্থাপিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথের চক্ষুও আর্দ্র হইয়া আসিল। আদর করিয়া তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া গদগদ স্বরে কহিলেন, তুমি যে আমাকে দেখিতে পার না তাহা বলি না, কিন্তু আমার আরও অনেক কথা মনে হয়—তুমি আমার অপরাধ লইও না—আমার যাহা মনে হয়—আজ তাহা বলিয়া যাই—আমার বিশ্বাস তুমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছ, নীচ স্ত্রীলোকে আত্মসুখের জন্যই সে পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকে এবং বস্ত্রালঙ্কার ধনরত্ন ঐশ্বর্য ভিন্ন তাহাদের সুখ যে আর কিসে আছে তাহা জানি না, কিন্তু তোমাকে তাহাদের মত বোধ হয় না, সেইজন্য বুঝিতেও পারি না কি করিলে তুমি সুখ পাইবে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে তুমি এতদিনে সুখী হইতে—বলিতে বলিতে সুরেন্দ্রনাথ অল্পক্ষণ মৌন হইয়া রহিলেন; পরে ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলিলেন, মালতী! তোমার স্বামী জীবিত আছেন কি?

মালতী ক্রোড়ের উপর মাথা নাড়িয়া জানাইল যে তাহার স্বামী জীবিত নাই।

তবে বল, তোমাকে বিবাহ করিলে কি সুখী হও? বল—বল, আমি তাহাতেও কুণ্ঠিত নহি।

এইবার মালতী গড়াইয়া তাঁহার পায়ের উপর পড়িল; হাত দিয়া তাহা জড়াইয়া ধরিল, তাহাতে মুখ লুকাইল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তুলিবার চেষ্টা করিলেন না, বুঝিলেন চক্ষুর জলে তাঁহার পদদ্বয় সিক্ত হইতেছে তথাপি উঠাইলেন না, বরং দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

বহুক্ষণ গত হইল; তাহার পর ম্লানভাবে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন—ভগবান জানেন আমার কি হইয়াছে। তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিয়াছি, কি ও অতুল রূপে উন্মত্ত হইয়াছি তা বলিতে পারি না, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান আমার আর নাই, ভালমন্দ বুঝিয়া দেখিবার ক্ষমতা আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তোমার একটি কথার জন্য প্রাণ পর্যন্তও বুঝি দিতে পারি। ঈশ্বর জানেন, তোমার মন পাইবার জন্য মিথ্যা বলিতেছি না, সত্যই বলিতেছি; আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছি—যাহা হইবার হইবে—তুমি একবার বল, তোমাকে বিবাহ করিলেই যদি সুখী হও, তাহাই করিব। জাতি, কুল, মান, এতবড় বংশ, কিছুই মনে করিব না। তাহার পর সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল; কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল; কিছুক্ষণ থামিয়া অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া অতি ধীরে, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, তাহার পর মালতী, আমাদিগের মত মনুষ্যের পরিষ্কার পথ পড়িয়া আছে—যখন সহ্য করিতে পারিব না, তখন আত্মহত্যা করিয়া নরকের পানে সোজা চলিয়া যাইব।

মালতী আর সহ্য করিতে পারিল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ওকথা তুমি বলিও না। তুমি আমার প্রাণ দিয়াছিলে, লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলে, দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলে—না হইলে এখনও বোধ হয় বাঁচিয়া থাকিতাম না; আমি নীচ, কুৎসিত; কিন্তু অকৃতজ্ঞ হইতে পারিব না। তোমার দয়া, তোমার স্নেহ, এ জীবনে কখন ভুলিব না—এ সকলের প্রতিশোধ কি আমি

এইরূপে দিব?

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, কিসে প্রতিশোধ হয় তাহা ঈশ্বর জানেন, আমি জানি না। তোমাকে বলিব কি, যে যন্ত্রণা, যে অন্তর্দাহ আজ মাসাধিক কালের উপরও ভোগ করিয়া আসিতেছি। মনে দুঃখ করিও না, কিন্তু বলিতে লজ্জা হয় যে, এত অল্পদিনে স্ত্রীলোকের এরূপ দাস হইয়া পড়িয়াছি ; একজন—একজন—তুমি যেই হও—তুমি যেই হও—কিন্তু আমি ত স্বর্গীয় পিতৃপিতামহগণের বংশ-সম্মান লুপ্ত করিতেও সম্মত হইয়াছি।

মালতী সেইরূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে কহিল, আমি তোমার দাসীরও দাসীর যোগ্য নই—আমি কে যে আমার জন্য তুমি এতই সহিবে—তোমার কেশাগ্রও বিসর্জন দিবে? আমি আজন্ম দুঃখী—এত করুণা এ জীবনে কখন পাই নাই। তাহার পর কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, যদি শেষ হয়, ঈশ্বর করুন যেন ইহাই আমার শেষ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ সযত্নে তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন ; তাহার পর পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন, কিন্তু কিছুতেই ত তুমি সুখ পাইতেছ না।

মালতী চক্ষে অঞ্চল দিয়া কহিল, আমরা বড় দরিদ্র।

সু। কিন্তু আমি ত দরিদ্র নহি। আমার যাহা আছে, তোমারও ত তাহা আছে।

মা। আমি নিজের কথা বলিতেছি না।

সু। তবে কাহার কথা? তোমার ত কেহ নাই।

মা। ভগবান জানেন এখন আর কেহ আছে কিনা, কিন্তু যখন চলিয়া আসিয়াছিলাম তখন সব ছিল।

সু। সে কি? নৌকাডুবি হইয়া—

মা। সেসব মিছে কথা, নৌকাডুবি আদতে ঘটে নাই।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বোধ হয় একবার মনে হইয়াছিল যে, এসকল ছলনা, না সত্য কথা? কিন্তু সে-মুখে ছলনা সম্ভবে না—সে-চক্ষু সে-অশ্রুজলের মধ্যেও যে প্রতারণা, মিথ্যাকথা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে তাঁহার তাহা বোধ হইল না। কিছুক্ষণ পরে ডাকিলেন, মালতী।

কি?

সব সত্য?

এবার মালতী মুখপানে চাহিয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইলেন, স্বহস্তে অশ্রু মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, তবে সব কথা খুলিয়া বল।

মালতী ধীরে ধীরে তখন তাঁহার জানুর উপর মাথা রাখিয়া কখন কাঁদিয়া, কখন স্থির হইয়া বলিতে লাগিল, জন্মাবধি দুঃখের ক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছি—কিন্তু আমাদের সব ছিল। পিতা আমার যথাসাধ্য দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগিনী আমি এক বৎসরের মধ্যেই বিধবা হইলাম—যাঁহার সহিত বিবাহ হইল তাঁহাকে বোধ হয় একবারের অধিক দেখিতেও পাই নাই। আমি বাপের বাটীতে ছিলাম, সেই অবধি পাঁচ বৎসর প্রায় সেইখানেই থাকিলাম। পিতা আমাদিগের গ্রাম হলুদপুর হইতে প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরে এক জমিদারের নিকটে কর্ম করিতেন। সামান্যই বেতন পাইতেন, কিন্তু তাহাতেই আমাদের একরূপ দুঃখ-কষ্টে চলিয়া যাইত। এইসময় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, তোমাদের বাড়িতে তখন কে কে ছিলেন?

মা। সবাই ছিলেন—বাবা, মা, পিসিমা, আমরা দুই বোন, আর একটি ছোট ভাই। তাহার পর চুরির অপরাধে বাবার চাকুরি যায়—সেই অবধি নিত্য ভিক্ষা করিয়া কোনদিন আমাদের আহার হইত, কোনদিন হইত না। মা আমার সতীলক্ষ্মী ছিলেন—চাহিয়া চিন্তিয়া যাহা মিলিত তাহাতে অপরাপর সকলকে খাওয়াইয়া মা প্রায় নিত্য উপবাসী থাকিতেন ; এমন কি একসঙ্গে তিনদিনও—এই সময় মালতী ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে আপনাকে কিঞ্চিৎ

সামলাইয়া লইয়া বলিল, বাবা কিন্তু এসব দিকে ফিরিয়াও চাহিতেন না। গাঁজা-গুলি খাইতেন, যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিতেন—হয়ত বা চার-পাঁচদিন ধরিয়া বাড়িতেই আসিতেন না।

আমার ছোটভাই মাধব প্রায় একবৎসর হইতে পীড়ায় ভুগিতেছিল, চিকিৎসা ভিন্ন কিছুতেই আরোগ্য হইতে পারিতেছিল না, বোধ হয় এতদিনে সে আর বাঁচিয়াও নাই—

এ সময়ে সুরেন্দ্রনাথের চক্ষু জলে ভরিয়া গেল।

তাহার পর মালতী কৃষ্ণঠাকুরানীর কথা বলিল, সদানন্দর কথা বলিল, শেষে বলিল ছলনার কথা। মালতী কহিল, ছলনার বিবাহের বয়স হইল, কিন্তু দরিদ্র বলিয়া কেহ বিবাহ করিতে চাহিল না। বিবাহ না হইলে ব্রাহ্মণের ঘরে জাতি যায়—আমাদেরও জাতি যায়-যায় হইল ; মা আমার আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। পিতা ফিরিয়াও চাহিতেন না, শুধু ভরসা ছিল সদানন্দ, কিন্তু তিনিও তখন দেশে ছিলেন না—কাশীতে তাঁহার পিসিমাতাকে লইয়া গিয়াছিলেন।

পিতার চাকুরি যাইবার পর হইতে ক্রমে এইরূপে ছয়মাস কাটিয়া গেল। পাড়া-প্রতিবেশীতে আর কত সহায্য করিবে? সদাদাদা কাশী যাবার সময় যে পঞ্চাশ টাকা দিয়া গিয়াছিলেন তাহাও ফুরাইয়া গেল—এ সময়ের কথা আর বলিতে পারি না—মালতী আবার কাঁদিতে লাগিল সুরেন্দ্রনাথও কাঁদিলেন ; কিছুক্ষণ পরে চক্ষুমুছিয়া বলিলেন, আর কাজ নাই—অন্যদিন বলিও।

মালতী চক্ষু মুছিয়া বলিল, আজই বলি। লোকে আমাকে সুন্দরী বলিত, আমি ভাবিতাম কলিকাতায় গিয়া উপার্জন করিব। একদিন রাত্রে গঙ্গার তীরে আসিলাম, মনে করিলাম তীরে তীরে কলিকাতায় যাইব—তাহা হইলে বড় কেহ দেখিতে পাইবে না, কাহাকেও পথও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে না। ঘাটে আসিয়া দেখিলাম অদূরে একটা প্রকাণ্ড নৌকা পাল ভরে যাইতেছে, আমি সাঁতার জানিতাম, নৌকা দেখিয়া ভাবিলাম নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া নৌকার হাল ধরিয়া থাকিব। শুনিয়াছিলাম আমাদের দেশ হইতে কলিকাতা অধিক দূর নহে—তবে ঠিক জানিতাম না যে কতদূর। ভাবিলাম রাত্রিশেষে নৌকা নিশ্চয় কলিকাতায় পৌঁছিবে, আমিও তখন নামিয়া যাইব। জলে পড়িলাম, সাঁতার দিয়া কিছুদূর আসিলাম—এই সময়ে কাপড়খানা হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে জড়াইয়া গেল, আমিও প্রায় ডুবিবার মত হইলাম, কিন্তু বহু ক্লেশে অবশেষে সেখানা খুলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু হাত হইতে সেটা পিছলাইয়া কোথায় সরিয়া গেল, এইসময় নৌকাখানাও কাছে আসিয়া পড়িল ; আমার হাতপা-ও ধরিয়া গিয়াছিল—ভাবিলাম আর ফিরিয়া যাইতে পারিব না—তাই হালটা ধরিয়া ফেলিলাম। নৌকা চলিতে লাগিল, আমিও সাহস করিয়া তাহা ছাড়িতে পারিলাম না, ভয় হইল, তাহা হইলেই ডুবিয়া যাইব। এইরূপ বহুদূর চলিয়া আসিলাম। তখন আর ফিরিয়া যাইবারও উপায় ছিল না। অবশেষে স্থির করিলাম, প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করিতে অনেক স্ত্রীলোকেই আসিয়া থাকে, তাহাদের নিকট বস্ত্র ও থাকে—ভিক্ষা করিয়া একটা চাহিয়া লইব—বিবস্ত্রা দেখিলে স্ত্রীলোকের দয়া হইবেই—। তারপর সব তুমি জান।

সুরেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, যেজন্য এত করিলে এতদিনে তাহার কোন উপায় করিয়াছ কি?

মালতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

সু। তাহা জানি। আর তাই ভাবিতেছি, যে মুখ ফুটিয়া একটি কথা বলিতে পারে না সে কোন্ সাহসে এতটা করিয়াছে।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

সু। মাসে মাসে কত টাকা হইলে তাঁহাদের চলে?

মা। কুড়ি টাকা।

সু। প্রতি মাসে সেখানে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পাঠাইয়া দিও।

মা। তুমি দেবে?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন ; বলিলেন, দোবো ; আরো চাও আরো দোবো।

মালতী মনে মনে কহিল—এতদিনে তাহার জন্ম সার্থক হইল।

সু। তার পরে একটা কাজ করিও—আমাকে বিবাহ করিও—কেননা নরাধম হইলেও—অত শুভ্র হৃদয়ে আমি কলঙ্কের ছাপ লাগিতে দিব না।

মালতী তাঁহার বুকের ভিতর মাথা রাখিয়া অস্ফুটে কহিল, না—

সু। কেন—না? তুমি ভাবিতেছ আমার জাতি যাইবে; কিন্তু আমি এস্থানের জমিদার, আমার অনেক টাকা—যাহার টাকা আছে তাহার জাতি শীঘ্র যায় না।

মা। গোলমাল হইবে।

সু। হইবে। কিন্তু তাহাও অধিকদিন স্থায়ী হইবে না।

মা। বংশ, কুল, মান, সম্ভ্রম?

সু। মালতী! একদিনের জন্যও সেসকল ভুলতে দাও—জগতে আসিয়া অনেক দ্রব্য পাইয়াছি—কিন্তু সুখ কখন পাই নাই; একদিনের জন্য আমাকে যথার্থ সুখী হইতে দাও।

কথা শুনিয়া মালতীর ভিতর পর্যন্ত কাঁদিয়া উঠিল, কিন্তু তাহা চাপিল। ধীরে ধীরে বলিল, আমি তোমার নিকট চিরদিন থাকিব।

সু। ঈশ্বর করুন তাহাই হউক। তুমি চিরদিন থাকিবে, কিন্তু আমি পারিব কি? তুমি সংসার দেখ নাই, কিন্তু আমি দেখিয়াছি। আমি জানি আমাকে বিশ্বাস নাই। যে প্রেমে তুমি চিরজীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিবে, আমি হয়ত কোনদিন তাহা মাঝখানে ছিন্ন করিয়া পলাইয়া যাইব। মালতী! সময় থাকিতে আমাকে বাঁধিয়া ফেল।

মালতী ভাল করিয়া সমস্ত শুনিল, অনেক দিনের পর আর একবার স্থির হইয়া ভাবিয়া লইল—তাহার পর অকম্পিতকণ্ঠে কহিল, বাঁধিয়াছি, পার ইহাই ছিন্ন করিও। ইহার উপর আর বন্ধনের প্রয়োজন নাই।

সু। তোমার নাই কিন্তু আমার আছে।

মা। থাকুক, কিন্তু বিবাহ হইতে পারে না।

সু। কেন, বিধবাকে কি বিবাহ করিতে নাই?

মা। বিধবাকে বিবাহ করিতে আছে, কিন্তু বেশ্যাকে নাই।—

সুরেন্দ্রনাথের সহসা সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল—তুমি কি তাই?

মা। নয় কি? নিজেই ভাবিয়া দেখ দেখি?

সু। ছি ছি!—ওকথা মুখে আনিও না—তোমাকে কত ভালবাসি।

মা। সেইজন্যই মুখে আনিলাম; না হইলে হয়ত বিবাহ করিতেও সম্মত হইতাম।

সু। মালতী!

মা। কি?

সু। সব কথা খুলিয়া বলিবে?

মা। বলিব। তুমি ভিন্ন আমার দেহ পূর্বে কেহ কখন স্পর্শও করে নাই, কিন্তু এক জনকে মনপ্রাণ সমস্তই মনে মনে দিয়াছিলাম।

সু। তার পর?

মা। আমাকে বিবাহ করিবার জন্য তাহাকে অনেক সাধিয়াছিলাম।

সু। তার পর?

মা। জাতি যাইবার ভয়ে সে বিবাহ করিল না।

সু। সে মনপ্রাণ ফিরাইয়া লইলে কিরূপে?

মা। সে যেরূপে ফিরাইয়া দিল।

সু। পারিলে?

মালতী একটু মৌন থাকিয়া কহিল, পূর্বেই বলিয়াছি, আমি বেশ্যা—বেশ্যায় সব পারে।

সু। উঃ—সে কি সদানন্দ?

মা। না—আর একজন।

সু। তবে তুমি মানুষ চিনিতে পার নাই—তাহাকে বল নাই কেন? সে তোমাকে ভালবাসিত।

সহসা মালতীর সর্বাঙ্গে তড়িৎপ্রবাহ ছুটিয়া গেল। সেই পাগল ক্ষ্যাপা মুখখানা! মালতীর মনে পড়িল, সেই বৃষ্টির দিন ; সে সন্ধ্যার সময় ঘাট হইতে জল আনিতেছিল, পথিমধ্যে বৃষ্টি আসিয়া পড়িল, ভিজিয়া জ্বর হইবার ভয়ে সদানন্দর বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মনে পড়িল, সেই প্রথম তাহার নিকট অর্থসাহায্য পাওয়া ; তাহার পর নিত্য হাতে গুঁজিয়া দেওয়া ; সেই কাশী যাইবার দিন ; সেই বালিশের নীচে একরাশ টাকা দেওয়া ;—সেই আরো কত কি! মনে পড়িল, দুঃখের সময় সেই সহানুভূতি। নিমিষে তাহার চক্ষুর্দ্বয় জলে ভরিয়া গেল, কিন্তু বহিয়া পড়িবার পূর্বে মালতী তাহা মুছিয়া ফেলিল। সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তাহা দেখিতে পাইলেন না। তিনি কৌচের বাহুতে হেলান দিয়া চক্ষু মুদিয়া অন্য অনেক কথা ভাবিতেছিলেন, বলিলেন, তারপর?

মা। কলিকাতায় যাইতেছিলাম।

সু। তারপর?

মা। দয়া করিয়া পায়ে স্থান দিয়াছ।

পূর্বোক্ত প্রশ্ন তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বলিয়াছিলেন, উত্তর শুনিয়া তাহা বুঝিলেন। উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, মালতী, তুমি রত্ন। রত্ন কুস্থানে পাইলেও গলায় পরিতে হয়।

মা। কে বলিল? যে রত্ন একজন গলায় পরে, অন্যে হয়ত তাহা পায়ে রাখিতেও ঘৃণা বোধ করেন। তুমি আমাকে চরণে স্থান দিও,—আমি রত্ন, তাহাতেই পরম সৌভাগ্য মনে করিব।

সুরেন্দ্রনাথ অল্প হাসিলেন ; বলিলেন, মালতী, আমি ভাবিতাম তুমি বোকা, কিন্তু তা তুমি নও—

মালতী অল্প হাসিল। দুঃখে কষ্টে আজ তাহার অধরে প্রথম হাসির রেখা দেখা দিল।

এই সময়ে বাহির হইতে দাসী বলিল, বাবু, অঘোরবাবুর জুড়ি বাহিরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন ; অঘোরবাবুর? কিন্তু এ বাগানবাড়িতে কেন?

তিনি বলে পাঠিয়েছেন বড় দরকার।

সুরেন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, মালতী, এখন তবে আসি।

এস। কিন্তু অঘোরবাবু কে?

পরে শুনিও।

অঘোরবাবুকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি কোথায় বিবাহ করিয়াছেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিয়া ফেলিলেন—কেন, পরিচয় আছে নাকি?

বোধ হয় কতক আছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

জন্মিলে মরিতে হয়, আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহাকে ভূমিতে পড়িতে হয়, খুন করিলে ফাঁসি যাইতে হয়, চুরি করিলে কারাগারে যাইতে হয়, তেমনি ভালবাসিলে কাঁদিতে হয়—অপরাপরের মত ইহাও একটি জগতের নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম কে প্রচলিত করিল জানি না। ঈশ্বর-ইচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চক্ষে জল আপনি ফুটিয়া উঠে, কিংবা মানুষে শখ করিয়া কাঁদে, কিংবা দায়ে পড়িয়া কাঁদে, অথবা চিরপ্রসিদ্ধ মৌলিক আচার বলিয়াই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া কাঁদিতে হয়—তাহা যাঁহারা ভালবাসিয়াছেন এবং তাহার পরে কাঁদিয়াছেন তাঁহারাই বিশেষ বলিতে পারেন। আমরা অধম, এ স্বাদ কখন পাইলাম না, না হইলে ইচ্ছা ছিল ভালবাসিয়া একচোট খুব কাঁদিয়া লইব, ভালবাসার ক্রন্দনটা মিষ্ট বা কটু পরীক্ষা করিব। আবার ইহাতে বড় আশঙ্কার কথাও আছে, শুনিতে পাই ইহাতে নাকি বুক-ফাটাফাটি কাণ্ডও বাধিয়া উঠে, অমনি শিহরিয়া শতহস্ত পিছাইয়া দাঁড়াই—মনে ভাবি এ যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে সহসা গিয়া পড়িব না। অদৃষ্ট ভাল নয়—কি জানি যদি পরীক্ষা করিতে গিয়া শেষে নিজের বুকখানাই ফাটাইয়া লইয়া ফিরিয়া আসিতে হয় ; এ ইচ্ছার আমি ঐখানেই ইস্তফা দিয়াছি। তবে কৌতূহল আছে। যেখানে কেহ ভালবাসিয়া কাঁদে,

আমি উঁকিঝুঁকি মারিয়া তাহা দেখিতে থাকি; বিবর্ণ, শঙ্কিতমুখে ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকি, বুঝি এইবার বা ইহার বুকখানা ফাটিয়া যাইবে দেখিতে পাইব, কিন্তু সে যখন অবশেষে চোখের জল মুছিয়া হৃষ্টপুষ্টভাবে উঠিয়া বসে তখন দুঃখিত হইয়া ফিরিয়া যাই। তবে এমন ইচ্ছা করি না যে, তাহাদের বুকখানা ফাটিয়া যাউক, কিন্তু দেখিবার ইচ্ছাও কি জানি কেন এ পোড়া মন হইতে একেবারে ফেলিয়া দিতে পারি না। আজও সেইজন্য মালতীর এখানে আসিয়াছি। যাহা দেখিয়াছি তাহা পরে বলিতেছি, কিন্তু যাহা শিখিয়াছি তাহা এই যে, মানুষ ভালবাসিয়া ঈশ্বরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়ায়, মালতীর মত ভালবাসার ও অশ্রু-বিসর্জন ভগবান-পদপ্রান্তে পদ্মের মত ফুটিয়া উঠে। আপনাকে ভুলিয়া, যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা না করিয়া, পরের চরণে তাহার মত আত্মবলিদানে অজ্ঞাতে শুধু তাঁহারই সাধনা করা হয়—মানুষ জীবন্মুক্ত হয়। লোকে হয়ত পাগল বলে, আমিও হয়ত পূর্বে কত বলিয়াছি—কিন্তু তখন বুঝি নাই যে, এরূপ পাগল জগতে সচরাচর মিলে না; এরূপ পাগল সাজিতে পারিলেও এ তুচ্ছ জীবনের অনেকটা কাজ হয়।

সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলে, কবাট বন্ধ করিয়া মালতী ভূমে লুটাইয়া পড়িল, কত যে কাঁদিল তাহা বলিব না; বুঝি সে ভাবিয়া দেখিতেছিল, বাল্যকালের সে ভালবাসা আর এ ভালবাসার কত প্রভেদ! মালতী আপনা হারাইয়া ভালবাসিয়াছে, তাহার উপর গভীর কৃতজ্ঞতাও মিশিয়াছে। ছাই নিজের সুখেচ্ছা! তাহার বোধ হইল তাঁহার জন্য হাসিতে হাসিতে সে নিজের প্রাণটাও দিতে পারে।

মালতী বলিল, প্রাণাধিক তুমি—তোমার একগাছি কেশের জন্য মরিতে পারি তুমি আমার জন্য কলঙ্কিত হইবে? শুধু আমার জন্য পাঁচজনে পাঁচকথা বলিবে—তাহা তুমি সহিবে? আমি অজ্ঞাতকুলশীলা, কেহ আমাকে জানে না, কেহ আমাকে চিনে না—আমার লজ্জা নাই, কিন্তু তুমি মহৎ—তোমার কলঙ্ক, তোমার লজ্জার কথা জগৎসুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িবে। লোকে বলিবে, তুমি বেশ্যা বিবাহ করিয়াছ, সমাজে তুমি হীন হইবে, মর্মপীড়া অনুভব করিবে, আমি তাহা হইতে দিব না। ঘাড় নাড়িয়া মালতী কহিল, তাহা হইবে না। এ বিবাহ কিছুতেই ঘটিতে দিব না।

মালতী স্থির হইয়া উঠিয়া বসিল, অশ্রু মুছিয়া যুক্তকরে কহিল, ঠাকুর, তুমি জান, এ জীবনে যত পাপ, যত অপরাধ করিয়াছি, কিন্তু সেদিনে ভুলিও না। জগতে আমার আর স্থান নাই, কিন্তু যদি কখন সেদিন হয়, যদি কখন স্বামিস্নেহ হারাইতে হয়—সেদিন তুমি আমাকে লইও—পতিতা হইলেও চরণে স্থান দিও।

সেরাত্রের মত মালতী সেইখানেই পড়িয়া রহিল। পরদিন হইল, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন না। সমস্তদিন মালতী পথ চাহিয়া বসিয়া রহিল। অনেক রাত্রে সুরেন্দ্রনাথ আসিলেন, তাঁহার মুখ অপেক্ষাকৃত মলিন ও ক্লিষ্ট দেখিয়া মালতী কিছু শঙ্কিতা হইল। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করিয়াই তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, মালতী, সারাদিন বুঝি পথ চেয়ে আছ?

রঞ্জিতমুখে মালতী নিরুত্তর রহিল।

কি করি বল? একদিনের জন্যও মকদ্দমা মেটে না। যার যত আছে, কষ্টও তার ততখানি আছে।

মালতী বলিল, মকদ্দমা কর কেন?

সুরেন্দ্রনাথ হাসিলেন, করি কেন? তা পরে বুঝিবে। আগে আমার হও—সমস্ত বিষয় নিজের মনে করিতে শেখ, তার পর বুঝিবে মকদ্দমা করি কেন?

মালতী মৌন হইয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিল।

সুরেন্দ্রনাথ কহিলেন, মালতী, সেকথা ভাবিয়াছিলে?

মা। কোন কথা?

সু। কোন্ কথা! কালিকার কথা আজই ভুলিয়া গেলে?

মা। ভুলি নাই, মনে আছে।

সু। তা ত থাকিবেই, কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছিলে কি?

মা। দেখিয়াছি। বিবাহ কিছুতেই হয় না।

সু। হয় না? সে আবার কি?

মা। সেকথা ত পূর্বেই বলিয়াছি।

সু। বলিয়াছ আমার মাথা আর মুণ্ড। বিবাহ আমি করিবই।

মা। আমি হইতে দিব না। একমাসের উপর হইল এখানে আসিয়াছি; যদি এতই মনে ছিল তবে পূর্বে করিলে না কেন? এখন সবাই জানিয়াছে তুমি মৃত জয়াবতীর স্থানে আর একজনকে কলিকাতা হইতে আনিয়াছ।

সুরেন্দ্রনাথ একটু অন্যমনস্ক হইলেন—বলিলেন, আমিও তা ভাবিতেছিলাম, হোক গে—আমি—

মা। তাহা হইলে আমি বিষ খাইব।

সুরেন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, সেকথা পরে বোঝা যাইবে। আপাততঃ এখন সাতদিনের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন করিব।

মা। তবে সাতদিনের মধ্যেই আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।

সুরেন্দ্রনাথ বিস্মিতভাবে কিছুক্ষণ তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, কোথায় যাইবে?

মা। যেখানে ইচ্ছা।

সু। মরিবে?

মা। মরিব না—কেন না মরিতে আমি পারিব না। তবে যেপথে ভাবিয়াছিলাম আবার সেই পথেই ভাসিয়া যাব।

সু। তবু বন্ধন পরিবে না?

মা। না।

সেরূপ দৃঢ় স্বর শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ বিলক্ষণ বুঝিলেন যে, মালতী মিথ্যা কহিতেছে না, একটু চিন্তা করিলেন, পরে শুষ্ক হাস্য করিয়া বলিলেন, তুমি কি করিবে? ইহা তোমাদের স্বধর্ম! ভাল, তাই হউক।

মালতী এবার আর কোন উত্তর দিল না। মৌনমুখে এ তিরস্কার সহ্য করিয়া রহিল। বহুক্ষণ ধরিয়া কেহ কোন কথা কহিল না। পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, বাড়িতে টাকা পাঠাইয়াছিলে?

মালতী তখন কাঁদিতেছিল—মাথা নাড়িয়া জানাইল যে পাঠান হয় নাই।

সু। কেন পাঠাও নাই?

মালতী মৌন হইয়া রহিল। এবার তিনি বুঝিলেন যে মালতী কাঁদিতেছে। বলিলেন, হাতে টাকা ছিল না?

মা। না।

সু। কিছুই ছিল না?

মা। না।

সু। এতদিন আসিয়াছ, হাতে কিছুই হয় নাই?

মালতী কাঁদিতে লাগিল—কথা কহিল না। সুরেন্দ্রনাথ এ প্রশ্ন বৃথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি নিজেই বেশ জানিতেন যে তাহার নিকট কিছুই নাই। কিছুক্ষণ পরে হাত ধরিয়া নিকটে আনিলেন, পার্শ্বে বসাইয়া স্নেহার্দ্র-স্বরে ধীরে ধীরে বলিলেন, সাধ করিয়া এমন লক্ষ্মীছাড়া হইয়া থাকিলে আমি কি করিব বল? একখানা কাপড় পরিবে না, একটা অলঙ্কার অঙ্গে তুলিবে না, কি প্রয়োজন, কি ভালবাস, তা কখন মুখ ফুটিয়া বলিবে না—আমি আর কি করিব বল? তাহার পর পকেট হইতে একতাড়া নোট বাহির করিয়া বলিলেন, রাখিয়া দাও। ইহা হইতে যাহা ইচ্ছা পাঠাইয়া দিও—বাকি যাহা রইল, স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিয়ো, আর মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু চাহিয়া লইয়ো; অল্প হাসিয়া বলিলেন, টাকা জমাইতে শিক্ষা কর।

মালতী চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

সু। ভুলিয়ো না—আজ টাকা পাঠাইয়া দিও।

মা। কেমন করিয়া দিব?

সু। রেজেস্ট্রি করিয়া দিও।

মা। আমি পারিব না। তুমি আর কারো নাম করিয়া পাঠাইয়া দাও।

সু। কেন? ধরা পড়িবার ভয় হয়?

মা। হয়।

সু। তবে আমার উকিল অঘোরবাবুকে বলিয়া দিই। তিনি কলিকাতায় থাকেন, সেখান হইতেই পাঠাইয়া দেবেন।

মা। সেই ভাল! কিন্তু যদি কেহ তাঁহার নিকট সন্ধান লইতে আসে—তা হইলে?

সু। যেমন বুঝিবেন সেইরূপ উত্তর দিবেন।

মা। না। তাঁহাকে বারণ করিয়া দিও যেন কোনরূপে তিনি তোমার নাম না প্রকাশ করেন।

সু। আচ্ছা, তাহাই হইবে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

জয়াবতী মরিয়াছে, কিন্তু তাহার মা বাঁচিয়া আছে। নারায়ণপুরের কিছু উত্তরে বাসপুর গ্রামে জয়াবতীদের বাটী। সেইখানে জয়া ও তাহার জননী থাকিত। কেমন করিয়া যে তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিত তাহা তাহারাই জানিত। আর শুনিতে পাই গ্রামের দুই-চারিজন মন্দ লোকও তাহা জানে, কিন্তু আমাদিগের তাহা জানিয়া কোন লাভও নাই, শুনিতে বাসনাও নাই। যাউক সে কথা। এইরূপ কিছু দিবস অতিবাহিত হইল, তাহার পর জানি না কি উপায়ে জয়াবতী নারায়ণপুরের জমিদারবাবুর নিজ ভবনের একাংশে স্থান পাইল। যখন সে পাইল, তখনি তাহার মাতাও আসিল ; তখন দুইজনে ঘরকন্না পাতাইয়া দিল ; কিন্তু জয়ার মার অদৃষ্ট ভাল ছিল না, তাই মাসপাঁচেক যাইতে না যাইতেই মাতা-কন্যার কলহ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে এরূপ হইল যে, দুজনে দু'সন্ধ্যা রীতিমত চীৎকার করত উভয়ে উভয়ের মঙ্গল-কামনা এবং আশু সংসার-বন্ধন মুক্ত হইবার বিশেষ প্রার্থনা না করিয়া জলগ্রহণ করিত না। এরূপেও দিন কাটিতে লাগিল, আরো ছয় মাস কাটিল। তাহার পর জয়ার মা প্রাসাদ-বাস-লালসা পরিত্যাগ করিয়া তাহার পরিত্যক্ত পুরাতন ভবনে চলিয়া গেল। বোধ হয় তাহাকে সেখানে যাইতে নিতান্ত বাধ্য করা হইয়াছিল, কেননা যাইবার কালীন সে যেরূপ নির্মমভাবে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে এবং কন্যা ও তাহার—কল্যাণ-ভিক্ষা করিতে করিতে গিয়াছিল তাহা দেখিলে কিছুতেই বোধ হয় না যে, ইচ্ছাসুখে সে এ আবাস পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। সেই অবধি সুরেন্দ্রবাবুর নিষেধ ছিল যেন সে মাগী কিছুতেই আর এবাড়িতে না ঢুকিতে পায়। কিন্তু তাহা হইত না। সে মাগী আবার আসিত, আবার প্রবেশ করিত। কিন্তু ফল কিছুই হইত না। বহুবিধ গালিগালাজ, শাপশাপান্ত, অশ্রুপাত, বুকে দারুণ চপেটাঘাত, মস্তকের কেশোৎপাটন এবং পরিশেষে ভৃত্যহস্তের 'অর্ধচন্দ্র', এই লইয়া জয়ার মাকে বাসপুরে ফিরিয়া যাইতে হইত। প্রতি দুইমাস-একমাস ব্যবধানে নিশ্চয় ঘটিত। বোধ হয় ইহাতে তাহার ভিতরে ভিতরে কিছু লাভ ছিল, না হইলে শুধু এইগুলির জন্যই সে অত পরিশ্রম করিয়া এতদূরে আসিত না ; সে যেরূপ চরিত্রের লোক ছিল তাহাতে এগুলি আর কোথায় অনেক কম ক্লেশে উপার্জন করিয়া লইতে পারিত। যাক একথা—এমনও হইতে পারে যে, সে কন্যারত্নকে অতিশয় স্নেহ করিত, এইজন্য বিপথগামিনী হইলেও মায়া কাটাইতে পারিত না—দেখিতে আসিত। এইরূপে চলিত। তাহার পর যখন সে শুনিল যে, জয়াবতী গঙ্গায় ডুবিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে তখন চীৎকার শব্দে বাসপুরের অর্ধেক প্রতিবাসীকে আপনার বাটীর সম্মুখে একত্র করিয়া ফেলিল।

বাসপুরে অধিকাংশই ছোটলোকের বাস, সেজন্য অধিকাংশ চাষাভুষা লোকের বাটীস্থ বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, আধবয়সী, যুবতী, প্রভৃতি দর্শকবৃন্দে জয়ার মার দাওয়া দেখিতে দেখিতে ভরিয়া গেল। তখন সকলে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে, বাক্‌শক্তিহীন হইয়া এ কাহিনী শুনিল যে, জয়াবতীর

গ্রামজোড়া জাহাজখানা প্রায় পাঁচশত দাসদাসীর সহিত কলিকাতার অতল জলতলে মগ্ন হইয়া গিয়াছে।

তখন জয়ার মা বলিল, যারা দেখেচে, তারা বলচে যে অত বড় জাহাজ কলকাতা শহরে নেই।

একজন বৃদ্ধা প্রত্যুত্তরে বলিল, তা ত নেই-ই।

একজন আধবয়সী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, কত দাম ছিল?

আর বাছা দামের কি আর লেখা-জোখা আছে?

সে চুপ করিল।

জয়ার মা কহিল, নিজে লাটসাহেব পর্যন্ত দেখতে এসেছিল।

যুবতীরা কান খাড়া করিয়া উঠিয়া বসিল।

নিজে লাটসাহেব পর্যন্ত কেঁদে সারা—বাছাকে সবাই ভালবাসত কিনা!

এইখানে জয়ার মা চোখের কোণে অঞ্চলটা রগড়াইয়া লইল। আর শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই মনে মনে প্রার্থনা করিল যে, কি সুকৃতি-বলে পরজন্মে জয়াবতীরূপে জন্মগ্রহণ করা যায়।

জয়ার রূপের কি আদি-অন্ত ছিল? সাক্ষেৎ দুর্গা-প্রতিমে—আহা ; কিবা নাক, কিবা চক্ষু, কি ভুরুর ছিরি, কি গড়ন-পেটন, কোনখানে একতিল খুঁত ছিল কি?

যুবতীরা চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, এমন কি দুইজন আধবয়সীও স্বীকার করিল যে ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

বাবু কি কম ভালবাসতেন? যখন যা বলেচে তখনই তাই পেয়েচে। অত বড় রাজাতুল্য লোকের নজরে পড়া কি সোজা কথা!

একথা মনে মনে প্রায় সকলেই স্বীকার করিল।

আমিও আর বেশিদিন বাঁচব না—এ শোক কি বরদাস্ত হবে?

ইহাতে কাহারও হয়ত সন্দেহ ছিল, কিন্তু সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কেহ ছাড়িল না।

একজন জিজ্ঞাসা করিল, জমিদারবাবুর কি হ'ল?

তিনি ভাল আছেন ; আলাদা জাহাজে ছিলেন কিনা তাই রক্ষা পেয়েচেন।

দুজনে কি তবে আলাদা জাহাজে ছিল?

তা ছিল বৈ কি, না হলে ডুবুবে কেন? লোকজন ত সঙ্গে কম যায়নি!

তাদের কি হ'ল?

আহা! সবাই ডুবেচে।

সে বেলাটা এমনই কাটিল। 'সন্ধ্যা হয়, ঘরকন্নার কাজ পড়ে আছে' বলিয়া 'কি আর কোরবে বল? তবে এখন আসি', সকলেই একে একে প্রস্থান করিল। জয়ার মাও একটা যা-তা করিয়া সিদ্ধ পাক করিয়া লইয়া সকাল সকাল দ্বার বন্ধ করিল, আর যতক্ষণ নিদ্রা না আসিল ততক্ষণ মধ্যে মধ্যে চিৎকার করিয়া প্রতিবাসিনীগণের অন্তঃকরণে সেই গ্রামজোড়া জাহাজ আর লাটসাহেবের কান্নার কথা জাগাইয়া দিতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকাল হইবামাত্রই জয়ার মা নারায়ণপুর অভিমুখে রওনা হইয়া পড়িল। ক্রমে সে নারায়ণপুরে প্রবেশ করিল। সেই পথ, সেই ঘাট, সেই বৃক্ষের শ্রেণী, সেইসব—সমস্ত পরিচিত। জয়ার মার মনে পড়িল যে, এই পথ দিয়াই সে চলিত, আবার এই পথ দিয়াই বক্ষে আঘাত করিতে করিতে ফিরিয়া আসিত। আর সে নাই, তেমন ঝগড়া আর কখন হইবে না, তেমন করিয়া বুক পিটিতেও আর পাইবে না। শত বেদনায় তাহার হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল, সহস্রগুণ চীৎকারে তাহা শমিত করিতে করিতে জয়ার মা চলিল। যাহার বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতে লাগিল, তাহাকে শতকর্ম ফেলিয়াও অন্ততঃ একবার জানালার নিকট আসিতে হইল। ক্রমে সুরেন্দ্রবাবুর অট্টালিকা ঐ সম্মুখে! জয়ার কত স্মৃতি তাহাতে মাখান আছে ; জয়ার মা আকুলভাবে ক্রন্দনের তোড় আরো সহস্রগুণ বৃদ্ধি করিয়াছিল। সম্মুখের গেট দিয়া পূর্বে সে

ঢুকিতে পাইত না ; কারণ বাবুর নিষেধ ছিল, কিন্তু এখন সে যেরূপ ব্যাঘ্রিনীর ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিয়া পড়িল যে, দ্বারবানদিগের বাধা দিতে কিছুতেই সাহস হইল না। সকলেই প্রায় দশহস্ত পিছাইয়া দাঁড়াইল।

সুরেন্দ্রবাবু তখন আহারান্তে বিশ্রাম করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন, চীৎকার শব্দে বুঝিলেন জয়ার মা ঝড়ের মত আসিয়া পড়িল। আসিয়াই সে জয়াবতীকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য অন্ধভাবে এক আবেদন করিয়া নিকটেই উপবেশন করিল, তাহার পর আর এক আবেদন, আর এক আবেদন, কথা শেষ না হইতেই পুনঃপুনঃ শতসহস্র আবেদন, ভিক্ষা, প্রার্থনা, কৈফিয়ৎ, তলব ইত্যাদি—নানাপ্রকারে সুরেন্দ্রনাথকে একেবারে বিহ্বল করিয়া ফেলিল ; তৎপশ্চাদ্বর্তী মস্তক ঠোকন, দারুণ বক্ষাঘাত ও সমুষ্টি কেশাকর্ষণ প্রভৃতি আর যাহা ঘটিল তাহা সম্যক বিস্তারিত বলিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

সর্বশেষে জয়ার মা এই বলিয়া শেষ করিল যে, তাহার আর একটি পয়সাও খাইতে নাই, এবং দয়া না করিলে হয় সে অনাহারে মরিবে, নাহয় এইখানে গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাহার জয়াবতী যেখানে গিয়াছে সেইখানেই যাইবে।

সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, যা হইবার হইয়াছে, এখন কি হইলে তোমার চলে?

জয়ার মা চক্ষু মুছিয়া বলিল, বাবা, আমার সামান্যতেই চলিবে—আমি বিধবা, কেউ নাই—কত আর আমার লাগিবে?

সু। তবু কত টাকা চাও?

জ-মা। পনের টাকা মাসে পেলেই আমার চলে।

সু। তাই পাইবে। যতদিন বাঁচিবে, মাসে মাসে কাছারি হইতে ঐ টাকা লইয়া যাইয়ো।

তখন জয়ার মা অনেক প্রীতিপ্রদ কথা কহিল, তাহার পর প্রস্থান করিল। যাইবার সময় সে আর তেমন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গেল না, বরং আরো অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে গেল। জয়াবতী মরিয়াছে, মা হইয়া সে অন্তঃকরণে ক্লেশ অনুভব করিয়াছে, কিন্তু কিছু সুবিধাও হইয়াছে, যাইবার সময় জয়ার মা একথা মনে করিতে ভুলিল না।

জয়ার মা সুরেন্দ্রবাবুর নিকট বিদায় লইয়া একেবারে চলিয়া গেল না। যেস্থানে দাসদাসীরা থাকে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় পরিচিত দাসদাসী অনেকেই ছিল, জয়ার মার দুঃখে তাহাদের মধ্যে অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করিল, দুই-একজন কাঁদিয়া ফেলিল। জয়ার মা অনেক গল্প করিল, সুরেন্দ্রবাবুর দয়ার কথাও প্রকাশ করিল ; কিন্তু কথায় কথায় ক্রমশঃ যখন সে শুনিল যে, তাহার জয়াবতীর স্থানে আর একজন সদ্য অভিষিক্ত হইয়া আসিয়াছে, এবং বাবু তাহাকে বহু সমাদরে বাগানবাটীতে স্থান দিয়াছেন, তখন জয়ার মা অন্য আকৃতি ধারণ করিল। চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল; স্থান কাল বিবেচনাহীন হইয়া সেইখানেই বাগানবাটী-অধিকারিণীর উদ্দেশে বহুবিধ হীনবাক্য গালিগালাজ আরম্ভ করিয়া দিল। ক্রন্দনের ধ্বনি ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল; অদম্য উৎসাহে নবীন করিয়া পুনরায় সেই কেশাকর্ষণ, সেই বুক-চাপড়ানি। দাসদাসীরা ভীত হইল, শান্ত হইবার জন্য অনেক বুঝাইল, শেষে বাবুর ভয় পর্যন্ত দেখাইল, রাগ করিয়া বাবু টাকা বন্ধ করিয়া দিবেন তাহাও বলিল, কিন্তু জয়ার মা বহুক্ষণাবধি তাহাতে কর্ণপাতও করিল না। পরিশেষে তাহারা বাধ্য হইয়া অন্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া জয়ার মার হস্ত হইতে বহু ক্লেশে নিষ্কৃতি লাভ করিল।

পথে আসিয়া জয়ার মা বাগানবাটী অভিমুখে চলিল। কন্যাশোক তাহার চতুর্গুণ উথলিয়া উঠিয়াছে, হিংসানল পঞ্জরে পঞ্জরে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার কন্যাকে এ মাগী ডুবাইয়া দিয়া বলপূর্বক সে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। গর্জাইতে গর্জাইতে তখন জয়ার মা বাগানবাটীতে প্রবেশ করিল। যে দাসী সম্মুখে পড়িল তাহার পানে ক্রোধকষায়িত নয়নে চাহিয়া বলিল, সে ডাইনী কোথা?

সে বেচারী নূতন লোক, ভয়ে ভয়ে পিছাইয়া বলিল, ঐ হোথা।

সে যেমন প্রশ্ন করিয়াছিল, তেমনি উত্তর পাইল। সেও প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারে নাই, জয়ার মাও উত্তরের অর্থ বুঝিতে পারিল না। আর একবার তাহার পানে সেইরূপ চাহিয়া বলিল, কোথা?

সে অঙ্গুলি হেলাইয়া যথেচ্ছা একটা দিক দেখাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। জয়ার মা সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। সেখানে কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল—কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু এ কি শোভা! কি আসবাব, কি বহুমূল্য সাজসজ্জা! সে পূর্বে সুরেন্দ্রবাবুর বাটীতে অনেকদিন ছিল, সেখানে বহু দ্রব্য দেখিয়াছে, কিন্তু এমন কখনও দেখে নাই। যত দেখিতে লাগিল, তত ক্রুদ্ধ সর্পের মত ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, এ সকল সমস্তই জয়াবতীর হইত, আর কে জানে—হয়ত কোন সময়ে তাহারই বা হইতে পারিত না? এইরূপে মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতে করিতে সে একটা কক্ষে একজন স্ত্রীলোকের দেখা পাইল। পশ্চাৎ হইতে তাহাকে দেখিয়া জয়ার মা একজন পরিচারিকা স্থির করিল। ডাকিয়া কহিল, ওগো, তোদের গিন্নী কোথায়? অস্বাভাবিক কর্কশবচনে সে ফিরিয়া চাহিল। জয়ার মা দেখিল তাহার সামান্য বস্ত্র, গাত্রে অলঙ্কারের নামমাত্র নাই—কিন্তু মুখ দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, কর্কশ কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আসিল ; বলিল, তুমি কে গা?

আমি এইখানে থাকি। আপনি বসুন।

জয়ার মা। তুমি কতদিন আসিয়াছ?

স্ত্রীলোক। প্রায় একমাসের কিছু অধিক।

জয়ার মা। তোমাদের গিন্নী কোথায়? তুমি বুঝি তারি সঙ্গে এসেচ?

স্ত্রীলোকটা মাথা নাড়িয়া বলিল, তাঁর সঙ্গে কিছু প্রয়োজন আছে কি?

প্রিয়োজন আমার ঢের আছে। সেই ডাইনী হারামজাদীর মুণ্ডুটা আজ চিবিয়ে খাব। বলিতে বলিতে তাহার সেই পূর্বভাব, সেই রুক্ষ মুখশ্রী, সেই অমানুষিক চোখের ভাব সমস্তই ফিরিয়া আসিল—জানিস আমি কে? আমি জয়ার মা, আমাকে দেশসুদ্ধ লোক চেনে। হারামজাদী ডাইনী আমার মেয়েকে খেয়েচে—আজ আমি তাকে খাব—খাব—খাব (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ) খাব, তবে যাব, খাব—খাব—খাব—সব শেষ কোরে তবে যাব।

স্ত্রীলোকটি রুদ্ধশ্বাসে সে অলৌকিক ভঙ্গি দেখিতে লাগিল।

ওরে হারামজাদী তোকে খাব (বক্ষে চপেটাঘাত)—ওরে আবাগী—শতেক খোয়ারি—ছেনাল—ডাইনী (মস্তকের কেশাকর্ষণ) তোকে খাব—তোকে খাব—তোকে খাব—মা-কালীর পায়ে বুক চিরে রক্ত দেব—আর এমনি কোরে মাথা খুঁড়ে হাড় দেব (ভূমিতলে মস্তক ঠোকন)—ওরে আবাগী, এমনি কোরে—এমনি কোরে (দন্তে দন্ত ঘর্ষণ)—কই, কোথা সে?

যাহার উদ্দেশে এত হইতেছিল, সেই সুমুখে বসিয়াছিল ; জয়ার মা কিন্তু তাহা জানিত না, জানিলে বোধহয় সেদিন কিছু একটা ঘটিয়া যাইত।

মালতী নিকটে আসিয়া হাত ধরিল, ধীরে ধীরে বলিল, আপনি চুপ করুন—

আমি চুপ কোরব! তুই হতভাগী সেকথা বলবার কে? আমার মেয়েকে খেয়েচে, আর আমি চুপ কোরে থাকব? (পুনরায় ভূমিতলে মস্তকাঘাত)

মালতী বুঝিল, অত মোটা কার্পেট না থাকিলে জয়ার মা সেদিন আস্ত মাথা লইয়া বাটী ফিরিয়া যাইতে পারিত না। কহিল, তিনি আজ এখানে নাই।

এখানে নাই?

মা। না।

জয়ার মা। আমি কিন্তু এক পাও এখান থেকে নোড়ব না—হারামজাদীকে দেখব, খাব—তবে যাব।

মালতী অল্প হাসিয়া বলিল, যাবেন কেন? স্বচ্ছন্দে এখানে থাকুন। কিন্তু অনেক বেলা হ'ল, খাওয়া-দাওয়া ত এখনও আপনার হয় নাই?

জয়ার মা। খাওয়া-দাওয়া? তা তখন একেবারেই কোরব।

মা। আহা, মেয়ের শোক! মার প্রাণ যে কি কোরচে তা আমিই জানি।

জয়ার মা ঈষৎ নরম হইল, বলিল, তাই বুঝে দেখ বাছা!

মা। তা কি আর বুঝিনে! কিন্তু কি করবেন বলুন—মুখেও ত কিছু দুটো দিতে হয়, পোড়া পেট ত আর মানে না।

জয়ার মা। তা সত্যি কথা।

মা। তাই বলচি, এখানেই দুটো জোগাড় করে দিই—

জয়ার মা। দিবি? তা দে বাছা।

মা। আহা! জয়াদিদি আপনার কথা কত বোলতেন।

জয়ার মা। বোলত? তা বলবে বৈ কি! তুই তাকে দেকেচিস?

মা। আহা—কতদিন একসঙ্গে এলাম—তাঁকে আর দেখিনি?

জয়ার মা। তুই বুঝি তার সঙ্গে ছিলি?

মা। হাঁ, তিনি আমাকে আমার দেশ থেকে তুলে নিয়েছিলেন। কত কথা বোলতেন—তার মধ্যে আপনার কথাই বেশি হোত।

জয়ার মা। তা হবে বৈ কি! সে আমার তেমন মেয়ে ছিল না!

মা। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন।

জয়ার মা। আহা, অমন মেয়েও মরে! কিন্তু তোদের এ ডাইনী কোত্থেকে উঠল?

মা। কলকাতা থেকে।

জয়ার মা। মাগী বুঝি বাবুকে ওষুধ করেচে?

মা। শুনতে ত পাই।

জয়ার মা। কিন্তু আমি তার ওষুধ করা আজ ভেঙ্গে দেব।

মা। দিও—মাগী যেমন—তেমনি শোধ দিয়ে তবে যেয়ো।

জয়ার মা। তা যাব। মাগী মন্তর-তন্তর কিছু জানে?

মা। মন্তর-তন্তর? শুনতে পাই কামিখ্যে থেকে শিখে এসেছিল। মানুষকে ভেড়া কোরে রাখতে পারে। এই বাবুকে এমনি করেচে যে, ইনি উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন।

জয়ার মার মুখখানা কিছু বিবর্ণ হইয়া গেল। শুষ্কমুখে বলিল, তা মন্তর-তন্তর আমিও জানি।

মা। জানবে না কেন? তা আজ দুপুরবেলা যখন আসবে তখন দেখিয়ে দেব।

জয়ার মা। বাণ মারতে জানে?

মা। জানে বৈ কি!

জয়ার মা। কখন আসবে?

মা। দুপুরবেলা।

জয়ার মা জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল। বোধ হইল যেন দুপুর হইতে অধিক বিলম্ব নাই। ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, আজ কিন্তু আমার ঢের বরাতে আছে—আজ তবে এখন যাই, কাল আসব। জয়ার মা উঠিয়া দাঁড়াইল।

মা। না, না, আজ এখানে খেয়ে-দেয়ে যান।

জয়ার মা। বড় দেরি হবে যে।

মা। কিছুই দেরি হবে না!

জয়ার মা। তবে শীগ্‌গির নে মা। তোর নামটি কি বাছা?

মা। আমার নাম মালতী।

জয়ার মা। আহা বেশ নাম।

জয়ার মা তখন নীচে আসিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া কিছু আহার করিয়া লইল। মালতী নিকটে বসিয়া দেখিল যে, জয়ার মার আহারে তেমন সুবিধা হইল না, উঠিয়া বলিল, তবে এখন যাই মা।

মা। একটা কথা আপনাকে এখনো বলা হয়নি—জয়াদিদির কাছে আমি দশ টাকা ধার নিয়েছিলাম—তা তিনি ত নেই, এখন আপনি যদি দয়া করে আমাকে ঋণমুক্ত করেন।

জয়ার মা ভাল বুঝিতে পারিল না। বলিল, কি করি?

মা। সেই দশ টাকা আপনি নিন।

জয়ার মা। আমাকে তুমি দেবে?

মা। হাঁ। মালতী উপর হইতে দশ টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিল।

জয়ার মা অনেকক্ষণ ধরিয়া মালতীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, বাছা, তুই নিশ্চয় ভদ্দরঘরের মেয়ে।

মালতী মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি দুঃখী লোক।

জয়ার মার চোখের কোণে একটু জল আসিল। বলিল, তা হোক—তবুও তুই ভদ্দরের মেয়ে না হলে—এই দেখ্ না কেন—তা সত্যি কথাই বলি, আমার জয়ার হাতে এত টাকা ছিল, কিন্তু মা বলে দশ টাকা কখন একসঙ্গে এমন করে হাতে তুলে দেয় নি। জয়ার মা চোখের কোণ মুছিল।

মা। আমরা দুঃখী লোক, কিন্তু ধর্ম ত আছেন।

জয়ার মা। আছেন ; কিন্তু সবাই কি তা জানে?

মা। তা হোক—কাল তবে আসবে?

জয়ার মা। হাঁ—তা—হ্যাঁ আসব বৈ কি।

মা। আমাদের ঠাকরুনকে তোমার কথা আজ তবে বলে রাখব কি?

জয়ার মা। হ্যাঁ—তা—না তা আর বলে কাজ নেই। কামরূপ হইতে শিক্ষা করা 'বাণ মারা' বিদ্যাটা জয়ার জননীর মনে বড় শান্তি দিতেছিল না, মালতী তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

জয়ার মা শুষ্ক হইয়া বলিল, তবে এখন আসি, মাঝে মাঝে তোর কাছে আসব এখন।

মা। এসো!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

একথা শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ খুব হাসিয়া বলিলেন, তবে তোমার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়ে গেল?

মালতী বলিল, ঝগড়া হবে কেন, বরং বেশ ভাব হয়ে গেল।

সু। তবে ভাব করে নিয়েচ?

মা। নিয়েচি।

সু। কিন্তু ওর নিজের মেয়ের সঙ্গে কখন বনতো না। চিরকাল ঝগড়া ছিল।

মা। তা শুনেচি।

সু। কি করে।

মা। নিজেই মনের দুঃখে আমাকে কিছু কিছু বলেচে। মনদুঃখের কারণটা কিন্তু মালতী খুলিয়া বলিল না।

সু। প্রথমে বাড়িতে ঢুকেই বুঝি তোমাকে খুব গালাগালি দিয়েছিল?

মালতী হাসিয়া বলিল, আমাকে দেয়নি। যে ডাইনীকে তুমি কলিকাতা থেকে এনেচ তাকেই দিয়েছিল।

সু। সে ডাইনী ত তুমিই।

মা। আমি কেন হব? আমি ত কলিকাতা থেকে আসিনি।

সু। তা হোক, তবু ও তুমিই সে।

মা। আমাকে সে চিনতেও পারেনি। একটা দাসী মনে করেছিল।

সুরেন্দ্র ঈষৎ দুঃখিতভাবে বলিলেন, তা ছাড়া অপরে আর কি মনে করতে পারে?

মা। আমিও সেইজন্যে আজ বেঁচেচি—না হলে বোধ হয় আমাকে আস্ত রাখত না।

সু। মেরে ফেলত?

মা। বোধ হয়।

সু। তার পর?

মা। আমি বললাম, সে মাগী এখানে নেই। তাতে বললে যে, সে এলেই তাকে খেয়ে ফেলবে।

সুরেন্দ্রবাবু হাসিতে লাগিলেন।

তার পর জিজ্ঞাসা করলে, তোমাকে ওষুধ করেচে কি না; আমি বললাম, বোধ হয় করেচে, না হলে বাবু উঠতে বললে ওঠেন, বসতে বললে বসেন কেন?

সু। আমি বুঝি তাই করি?

মা। কর না কি?

সু। আচ্ছা তা দেখচি ; তার পর?

তার পর জিজ্ঞাসা করলে যে, সে মন্তর-তন্তর জানে কিনা, আমি 'বললাম, খুব জানে ; কামরূপ থেকে শুনতে পাই শিখে এসেচে। বললে, আমিও জানি, কিন্তু বুঝতে পারলাম মনে মনে ভয় পেয়েচে। জিজ্ঞাসা করলে, বাণ মারতে পারে? আমি বললাম পারে।

সুরেন্দ্রবাবু এবার খুব জোরে হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তখন বুঝি পালিয়ে গেল?

মা। হাঁ।

সু। আর কখন এখানে আসবে না।

মা। আসবে বৈকি। কিন্তু তোমার সে ডাইনীর কাছে আসবে না—আসে ত আমার কাছে আসবে।

সু। যার কাছে ইচ্ছা আসুক, কিন্তু এখন তুমি আমার কাছে এস। কাছে আসিলে হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন, মালতী, আর কতদিন এমন করে কাটাবে? এমনধারা বেশ চোখে আর দেখা যায় না।

মালতী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, গয়না পরিলে কি রূপ বাড়িবে?

সু। তোমার রূপের সীমা নাই—যার সীমা নাই তাকে বাড়ান যায় না। কিন্তু আমার তৃপ্তির জন্যেও অন্ততঃ—

মা। গয়না পরিতে হবে?

সু। হাঁ।

মা। পরিতে পারি, কিন্তু আগে বল আমাকে গহনা পরাতে তোমার এত জেদ কেন?

সু। যদি বলি, তা হলে মনে দুঃখ পাবে না?

মা। কিছু না!

সু। তবে বলি শোন। তোমার এ নিরাভরণা মূর্তি বড় জ্যোতির্ময়ী—স্পর্শ করিতেও সময়ে সময়ে কি যেন একটা সঙ্কোচ আসিয়া পড়ে—দেখিলেই মনে হয় যেন আমার পাপগুলা ঠিক তোমারি মত উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। তোমাকে বলতে কি—তোমার কাছে বসিয়া থাকি, কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত ভয় আমাকে কিছুতেই ছাড়িয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে হয়। আমি তেমন সুখ পাই না—তেমন মিশিতে পারি না; তাই তোমাকে অলঙ্কার পরাইয়া একটু ম্লান করিয়া লইব।

মালতী নিঃশব্দে আপনার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিল, প্রকাণ্ড দর্পণে তাহা পূর্ণ প্রতিফলিত হইয়াছে তাহাও দেখিল। মনে হইল সে বুঝি যথার্থ-ই বড় উজ্জ্বল, বড় জ্যোতির্ময়ী; মনে হইল পুণ্যের অতীত-স্মৃতি এখনও বুঝি সে-দেহ ছাড়িয়া যায় নাই, পবিত্রতার ছায়াখানি এখনও সে-দেহে বুঝি ঈষৎ লাগিয়া আছে। রাত্রে, সহসা নিস্তব্ধ কক্ষে মালতীর ঈষৎ ভ্রম জন্মিল—সে দেখিল, সম্মুখে মুকুরে এক কলঙ্কিত দেবীমূর্তি, আর পার্শ্বে জীবনের আরাধ্য সুরেন্দ্রনাথের অকলঙ্ক দেবমূর্তি।

বিস্ময়ে, আনন্দে মালতী চক্ষু মুদ্রিত করিল।

পরদিন ঠিক সন্ধ্যার পর সুরেন্দ্রনাথ মোহন নটবরবেশে মালতীর মন্দিরে দেখা দিলেন। গলায় মোটা মোটা ফুলের গোড়ে ; জুই, বেল, বকুল, কামিনী প্রভৃতি পুষ্পের একরাশি মালা কণ্ঠ ও বুক ভরিয়া আছে, একহস্তে ফুলের তোড়া, অপর হস্তে মখমল-মণ্ডিত সুন্দর সুগঠন একটা বাক্স, পরিধানে পট্টবস্ত্র, পায়ে জরির জুতা হেলিতে দুলিতে একেবারে মালতীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মালতী হাসিয়া বলিল, আজ আবার এ কি?

সু। কি বল দেখি?

মা। তা জানি না।

সুরেন্দ্রনাথ কৃত্রিম গম্ভীর হইয়া বলিলেন, তুমি পূজা কর?

মা। করি।

সু। তবে তোমার বাড়িতে চন্দন আছে ; চন্দন এনে আমাকে সাজিয়ে দাও—আজ আমার বিবাহ!

মা। কার সঙ্গে?

সু। আগে সাজাও, তার পরে শুনিও।

মালতী নীচে হইতে চন্দন ঘষিয়া আনিয়া বেশ করিয়া সাজাইয়া বলিল, এখন বল!

সু। তা কি এখনো বুঝিতে পারনি!

তাহার পর গলদেশ হইতে পুষ্পমালা খুলিয়া একটির পর একটি করিয়া তাহাকে পরাইলেন, মখমল-বাক্স হইতে নানাবিধ রত্নজড়িত অলঙ্কার বাহির করিয়া যথাস্থানে যথাক্রমে নিবেশ করিলেন—মালতী জন্মে কখন সেইরূপ দেখেন নাই, বিস্মিত হইয়া দেখিতে লাগিল—সব শেষ করিয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, তোমাকে বিবাহ করিলাম, এতদিনে তুমি আমার স্ত্রী হইলে ; আর কোথাও পালাতে পারবে না—যে মালা আজ পরাইলাম, জন্ম-জন্মান্তরে তা আর খুলিতে পারিবে না।

উভয়ের চক্ষেই জল আসিল, উভয়েই কিছুক্ষণ ধরিয়া কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর অশ্রু মুছাইয়া সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, এখন বাড়ি চল—আপনার সংসার আপনি বুঝিয়া লও—আশীর্বাদ করি এজীবনে চিরসুখী হও!

মালতী প্রণাম করিয়া পুনর্বার নিকটে উপবেশন করিল। চক্ষের জল আজ তাহার বড় বাড়িয়া উঠিয়াছে। শতবার মুছিল, শতবার চক্ষু তিতিয়া উঠিল—কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না। সুরেন্দ্রনাথ তাহা বুঝিলেন, বুঝিয়া বলিলেন, মালতী, আজ পিতা-মাতার কথা মনে হইতেছে?

মালতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

যাহা ইচ্ছা ছিল তাহাতে তুমি নিজেই বাদ সাধিলে। মনে করিয়াছিলাম, আর এমন করিয়া থাকিব না, তোমাকে যখন পাইয়াছি তখন প্রকাশ্যভাবে বিবাহ করিব, আর একবার সংসারী হইব। তোমার পিতা-মাতাকে এখানে আনিব—লোকে তখন যাই বলুক না কেন—আমি নিজে সুখী হইব। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সে আশা এখন দুরাশা। এখন বাড়ি যাইবে?

মালতী বলিল, কোথায়?

যে তোমার বাড়ি—যেখানে আমি থাকি।

এটা কি আমার বাড়ি নয়?

তবে কি সেখানে যাইবে না?

না।

আমিও ঠিক তাই ভাবিয়াছিলাম।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

দুঃখের দিন দেরি করিয়া কাটে সত্য, কিন্তু তথাপি কাটে, বসিয়া থাকে না। মাধবের মৃত্যুর পর শুভদার দিনও তেমনি করিয়া অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। তখন বর্ষা ছিল, আকাশে মেঘ ছিল, পথে ঘাটে কাদা-পাঁক, পিছল ছিল—এখন তাহার পরিবর্তে শরৎকাল পড়িয়াছে। সে মেঘ

নাই, সে কাদা-পাঁক, পিছল নাই—পথঘাট খটখট করিতেছে ; কখন দুই-একখণ্ড শুভ্র মেঘ উদ্দেশহীনভাবে আকাশ বহিয়া কোথাও চলিয়া যাইতেছে। তখন প্রকৃতির নিত্য ম্লানমুখ, নিত্য চোখে অশ্রু ছিল—এখন সেসব আর নাই। কখন কখন সেমুখ ঈষৎ মলিন হয়, দুই-একফোঁটা চোখে জলও আসে দেখিতে পাই—কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। তৎক্ষণাৎ মুছিয়া ফেলিয়া আবার হাসে। অতীতের স্মৃতি-জড়িত দুঃখের শেষ ক্রন্দনটুকুর মত, গগনের কোন অনির্দেশ্য কোণ হইতে 'গুড়্‌গুড়্‌' করিয়া কখনো কাঁদিয়া উঠে বটে, কিন্তু তাহাতে আর গভীরতা নাই। একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না, একথা প্রকৃতি সতীও যেন কতক বুঝিয়াছে। পরিবর্তন ভিন্ন সংসার চলে না। একথা সকলেই বুঝেন—বুঝে না কেবল শুভদার সৃষ্টিকর্তা। জন্মিয়া অবধি আজ পর্যন্ত! শুভদা একথা মনে করিয়া দেখে—আর দেখে শ্রীসদানন্দ চক্রবর্তী। পাড়ার পাঁচজন দেখে—শুভদা ঘাট হইতে স্নান করিয়া যাইতেছে, জলের কলসী কাঁকে লইয়া ধীর মন্থর-গমনে চলিয়া যাইতেছে, গৃহকর্ম করিতেছে—কিন্তু নিত্য ক্ষীণ, নিত্য বিষাদময়ী!

বর্ষীয়সীরা বলে, ছুঁড়ী আর বাঁচবে না—আহা!

সমবয়সিনীরা বলে, এমন অদৃষ্ট যেন শত্রুরও না হয়—আহা!

পিছনে 'আহা' 'আহা' সবাই বলে, কিন্তু সম্মুখে একথা বলিতে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। সকলেই যেন বুঝিতে পারে, এ 'আহা'-টা শুভদার সম্বন্ধে খাটে না। আর একটা অন্য কিছু—যাহা জগতে নাই, যাহা এ পর্যন্ত কেহ কখন প্রয়োগ করে নাই—প্রয়োগ করিবার অবকাশও আইসে নাই—এমন একটা শব্দ খুঁজিয়া পাইলে যেন বলিবার মত কতকটা হয়। তাই কেহ কিছু বলে না—শুভদা আসিলে চুপ করিয়া থাকে। স্নান করিবার সময় গঙ্গার ঘাটে ছেলেমেয়েরা জল ছিটায়, গোলমাল করে, হাস্য-কলরবে প্রৌঢ়াদিগের শিবপূজার মন্ত্র ভুলাইয়া দেয়, এমনি অনেক উৎপাত করিতে থাকে, কিন্তু শুভদা যখন নিঃশব্দে ঘাটের সর্বশেষপ্রান্তে কলসী নামাইয়া নিতান্ত অস্পর্শীয়া নীচ জাতীয়ার ন্যায় সসঙ্কোচে জলে নামে, তখন বালক-বালিকারাও বুঝিতে পারে যে, এখন আর গোলমাল করিতে নাই, জল ছিটাইতে নাই—এখন চুপ করিয়া শান্তশিষ্ট হইয়া জননীর বা আর কাহারো আপনার লোকের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইতে হয়। সে চলিয়া যায়, তখনও কিন্তু তাহারা পূর্বভাব শীঘ্র ফিরিয়া পায় না।

শুভদা হাসিতে ভুলিয়া গিয়াছে, দুঃখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কাঁদিতে তাহার বিরক্তি বোধ হয়, সেসব পুরাতন কথা আলোচনা করিতে লজ্জা করে। বাড়িটা আজ সম্পূর্ণ নির্জন হইয়াছে ; ছলনা শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, রাসমণি প্রায় সমস্তদিন বাটী আসেন না। আর হারাণ মুখুজ্যে! তা সে আজকাল ভালছেলে হইয়াছে। নিত্য দুবেলা বাটী আসে, দুই আনা চারি আনা পূর্বের মত কর্জ চাহিয়া লয়—আবার চলিয়া যায়। শুভদা সমস্ত দুপুরবেলাটা রান্নাঘরের মাটির মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া পড়িয়া থাকে। সন্ধ্যা হয়—আবার ওঠে, ঘাটে যায়, প্রদীপ জ্বালে, রন্ধন করে—যত্ন করিয়া একথাল অন্ন বাড়িয়া স্বামীর জন্য রাখিয়া দেয়, সদানন্দকে আহার করায়। আবার সকাল হয়, আবার বিকাল হয়—আবার রাত্রি আইসে।

নিত্য যেমন হয় তেমনি শুভদা আজও দ্বিপ্রহরের পরে রন্ধনশালায় শুইয়াছিল। বাহিরে পুরুষকণ্ঠে একজন ডাকিল, মাঠাকুরুন!

শুভদা শুনিতে পাইল কিন্তু কথা কহিল না। মনে করিল বুঝি আর কাহাকেও কেহ ডাকিতেছে।

সে আবার ডাকিল, বলি মাঠাকুরুন! কেউ বাড়ি আছেন কি?

শুভদা বাহিরে আসিয়া বলিল, কে?

আমি পিয়ন। চিঠি আছে।

শুভদা বড় বিস্মিত হইল—চিঠি কে লিখিবে? কাছে গিয়া বলিল, দাও—

অমনি পাবে না মাঠাকুরুন। এখানা রেজেস্ট্রি চিঠি—শ্রীশুভদা দেবীর নামে, তাঁর সই দিতে হবে।

শুভদা রেজেস্ট্রি অর্থ তেমন বুঝিল না—বলিল, দাও—আমারই নাম শুভদা।

পিয়ন চিঠি বাহির করিল, স্বতন্ত্র একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কহিল,—সই দিন।

শুভদা লিখিতে জানিত—বলিল, কালি-কলম দাও।

পিয়ন মুখপানে চাহিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, কালি-কলম আমি পাব কোথায়?

আপনার বাড়ি, বাড়িতে কালি-কলম নেই!

শুভদা বলিল, দেখি। তাহার পর উপর-নীচে সর্বত্র খুঁজিয়া ললনার একটা অর্ধভিগ্ন দোয়াত পাইল। কালি শুকাইয়া গিয়াছে—জল দিয়া কোনরূপে একরকম করিয়া কালি প্রস্তুত হইল—কিন্তু কলম কোথায়?

হঠাৎ শুভদার মাধবের দপ্তরের কথা মনে পড়িল। উপরের ঘরে এক কোণে একটা ছোট চৌকির উপর বসিয়া মাধব ও ছলনা পাঠ অভ্যাস করিত—ললনা তাহাদের শিক্ষক ছিল। শুভদা উপরে আসিয়া দেখিল—এককোণে সেই চৌকির উপর তেমনিভাবে একটি ছোট কালিলিপ্ত দপ্তর ক্ষুদ্র এক বস্ত্রখণ্ডে জড়িত পড়িয়া আছে। শুভদা এদিকে বহুকাল আইসে নাই, বহুকাল এদিকে চাহে নাই। এটা ললনার ঘর; ললনা মরিয়া পর্যন্ত আজ সে প্রথম এ-ঘরে প্রবেশ করিল। দপ্তরখানি হাতে লইয়া ধীরে ধীরে খুলিল—একখানি ভগ্ন শ্লেট, একখানি অর্ধেক বোধোদয়, একটা ধারাপাত, দুটো কঞ্চির কলম, একটা মুখভাঙ্গা শরের কলম, ছোট ছোট দুটি শ্লেট পেন্সিল, পুরাতন পঞ্জিকা হইতে কর্তিত গোটা-পাঁচেক ছবি—টপ্ করিয়া একটা মস্ত বড় ফোঁটা শ্লেটের উপর আসিয়া পড়িল। একটা কলম লইয়া শুভদা আবার সেগুলি তেমনি সযত্নে বাঁধিয়া রাখিল। কারণ এগুলি মাধবের বড় যত্নের দ্রব্য তাহা সে জানিত।

নীচে আসিয়া শুভদা পত্র গ্রহণ করিল। ঘরে গিয়া খুলিয়া দেখিল, একখানা পঞ্চাশ টাকার নোট। নিশ্চয় ভুল হইয়াছে; পিয়নকে ডাকিতে সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল, কিন্তু পিয়ন ততক্ষণ চলিয়া গিয়াছে। বৌমানুষ, চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না—কাজেই নোট লইয়া ফিরিয়া আসিল। শুভদা মনে করিয়াছিল, আর একটু পরে সে আপনিই আসিবে। কিন্তু তাহা হইল না। সেদিনও আসিল না। কিংবা পরদিনও আসিল না। তখন শুভদা এ কথা সদানন্দকে জানাইল। সদানন্দ দেখিয়া শুনিয়া বলিল, ভুল হয় নাই। এ গ্রামে আপনার নামে আর কেউ নাই—হারাণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী—তখন এ আপনারই বটে, কিন্তু কলিকাতায় কে আপনার আছে?

কলিকাতায় আমার কেহ নাই।

পরদিন সদানন্দ ডাকঘরে সংবাদ লইয়া আসিয়া বলিল, অঘোরনাথ বসু, উকিল—কলিকাতা হইতে এ টাকা পাঠাইয়াছেন।

শুভদা বিস্মিত হইয়া কহিল, ও নামের কাহাকেও আমি চিনি না।

তবে?

শু। তুমি উপায় কর।

সদানন্দ হাসিয়া বলিল, উপায় আর কি করিব? টাকা যদি না লওয়া মত হয়, তাহা হইলে ফিরাইয়া দিন।

শু। বাবা, যখন ছেলেমেয়ে নিয়ে খাইতে পাই নাই, তখনো বোধ হয় এ টাকা নিতাম না। এখন কি দুঃখে টাকা নেব? এ আমার টাকা নয়, তুমি ফিরিয়ে দাও।

ভাবিয়া চিন্তিয়া সদানন্দ কহিল, আমি কলিকাতায় গিয়া সন্ধান লইব। এ টাকা এখন আপনি রাখিয়া দিন—যদি ফিরাইয়া দিবার হয়, ফিরাইয়া দিব।

শু। তুমি টাকা সঙ্গে লইয়া যাও—মত-অমত নাই—একেবারে ফিরাইয়া দিও। সম্ভব, তিনি আর কাহারো বদলে আমাকে পাঠিয়েছেন।

স। যা হয় সেখানে গিয়া স্থির করিব।

শু। তাই করিও।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

আপনার প্রশস্ত কাছারিঘরে উকিলবাবু শ্রীঅঘোরনাথ বসু মহাশয় বসিয়া আছেন। সম্মুখে

টেবিলের অপর পার্শ্বে নারায়ণপুরের সুরেন্দ্রবাবু বসিয়া আছেন। টেবিলের উপর একরাশি মকদ্দমার কাগজপত্র রহিয়াছে ; ব্যস্তভাবে দুইজনে তাহারি তদ্বির করিতেছেন।

কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলিয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, অঘোরবাবু, বোধ হয় এ মকদ্দমা আমি জিতিতে পারিব না।

অ। এখনো কিছুই বলা যায় না।

সু। বলা বেশ যায়। ঠিক বুঝিতেছি মকদ্দমা হারিতেই হইবে।

অ। কিন্তু হাইকোর্টের উপরও ত আছে?

সু। আছে, কিন্তু ততদূর যাইবার ইচ্ছা নাই।

অ। তবে কি মালপুরের বিষয়টা ছাড়িয়া দিবেন?

সু। না দিয়া আর উপায় কি?

অ। বিস্তর আয় কমিয়া যাইবে।

সু। হাঁ, প্রায় অর্ধেক কমিবে।

অঘোরবাবু মৌন হইয়া রহিলেন। মনে মনে বিরক্ত হইয়াছিলেন, কারণ তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে সুরেন্দ্রবাবুর অনুমানই কালে সত্য হইয়া দাঁড়াইবে। এইসময় একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল, বাহিরে একজন আপনার সহিত দেখা করিতে চান।

অঘোরবাবু তাহার পানে চাহিয়া বলিলেন, কে?

চিনি না। দেখে বোধ হয় কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

তবে বল্ গে যা এখন আমার সময় নেই।

কিছুক্ষণ পরে পুনর্বার সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তিনি যেতে চান না—বলেন বড় দরকার আছে।

অঘোরবাবু আরো একটু বিরক্ত হইলেন ; কিন্তু সুরেন্দ্রবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন, এঘরেই ডাকিয়া পাঠাব কি?

ক্ষতি কি?

ভৃত্যকে তিনি সেইরূপ অনুমতি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গলদেশে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে শিখা, কিন্তু কপালে ফোঁটাতিলক প্রভৃতি কিছুই নাই। অর্ধময়লা উত্তরীয় বসন, সাদা থান পরিধানে, পায়ে জুতা নাই—হাঁটু পর্যন্ত ধূলা উঠিয়াছে। দুজনেই চাহিয়া দেখিলেন। অঘোরবাবু বলিলেন, বসুন।

ব্রাহ্মণ অদূরে চৌকির উপর স্থান গ্রহণ করিয়া বলিলেন, উকিলবাবু অঘোরনাথ বসু মহাশয়ের—

আমারই নাম অঘোরনাথ।

ব্রা। তবে আপনার নিকটেই প্রয়োজন আছে। যা বলিবার এইখানেই বলিব কি?

অ। স্বচ্ছন্দে বলুন।

তিনি তখন উত্তরীয়-বস্ত্র হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া বলিলেন, এ টাকা শুভদা দেবীকে কি আপনি পাঠাইয়াছিলেন?

অঘোরবাবু তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, আমিই পাঠাইয়াছিলাম।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, হলুদপুরে হারাণ মুখুজ্যের বাটীতে শুভদা দেবীকে?

অ। হাঁ, তাই বটে।

ব্রা। কেন?

অ। মনিবের হুকুম।

ব্রা। মনিব কে?

অঘোরবাবু সুরেন্দ্রবাবুর পানে ঈষৎ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তাহা বলিতে নিষেধ আছে।

ব্রা। তবে এ টাকা ফিরাইয়া নিন। যাঁহাকে ইহা পাঠাইয়াছিলেন, তিনি গ্রহণ করিবেন না,

আপনাকে তিনি চিনেন না এবং সম্ভবতঃ আপনার মনিবকেও চিনেন না। আমাকে এখানে সমস্ত সংবাদ লইয়া নোটখানা ফিরাইয়া দিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমরা মনে করিয়াছিলাম আপনি বুঝি ভ্রম করিয়া একজনের স্থানে আর একজনের নাম লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

অঘোরবাবু হাসিলেন, বলিলেন, এতটা ভ্রম উকিলের হয় না।

ব্রা। না হোক, কিন্তু এখন প্রতিগ্রহণ করুন।

অ। তাহাও পারি না—মনিবের হুকুম ব্যতীত কিছুই করিব না।

ব্রা। তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া সংবাদ দিবেন, আমি অন্যদিন আসিয়া দিয়া যাব। তিনি উঠিতেছিলেন, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ আপনা হইতেই বলিলেন, মহাশয়ের নাম?

আমার নাম সদানন্দ চক্রবর্তী।

সুরেন্দ্রনাথ চমকিত হইলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, আপনি এখানে কোথায় আছেন?

স। কোথায় থাকিব এখনো স্থির করি নাই ; বরাবর এখানেই চলিয়া আসিয়াছিলাম এবং সম্ভবতঃ আজই ফিরিয়া যাইব।

সুরেন্দ্রনাথ অঘোরবাবুকে বলিলেন, এখন যাই, রাত্রে আবার আসিব। তাহার পর সদানন্দর পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনার সহিত আমার কিছু কথা আছে।

স। বলুন।

সু। এখানে নহে। আমার বাসা নিকটেই, আপত্তি না থাকে ত চলুন সেখানেই যাই—তথায় সমস্ত বলব।

সদানন্দর তাহাতে আপত্তি ছিল না ; তখন দুইজনে গাড়িতে আসিয়া উপবেশন করিলেন। উপবেশনান্তে সদানন্দ কহিলেন, ইহার পূর্বে আপনাকে কখন দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না—কিন্তু—কিন্তু—আপনি আমাকে কখন দেখিয়াছিলেন কি?

সু। না, দেখি নাই। কিন্তু আপনাকে জানি।

স। কিরূপে?

সু। বাসায় চলুন—সেখানেই বলিব।

অল্পক্ষণ পরে গাড়ি বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, আমিও ব্রাহ্মণ, বেলাও অধিক হইয়াছে—আপনি এখানে আহার করিলে ক্ষতি কি?

কিছু না।

তাহার পর আহারাদি শেষ করিয়া উভয়ে উপবেশন করিলে সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, শুভদা দেবী দরিদ্র নয় কি?

স। দরিদ্র বটে ; কিন্তু তাই বলিয়া—

সু। বুঝিয়াছি। তাই বলিয়া দান লইবেন কেন?

স। কতক তাই বটে ; বিশেষ দাতার নাম না জানিতে পারিলে—

সু। কিন্তু তাহাতে ক্ষতি কি? যে দান করিয়াছে, সে-ই বলিতেছে, ভুল-প্রমাদ কিছুই ঘটে নাই। যোগ্য ব্যক্তিকেই দেওয়া হইয়াছে।

স। কে দান করিয়াছে?

সু। ধরুন, এখন অঘোরবাবুই—

স। অঘোরবাবুর কি অধিকার আছে?

সুরেন্দ্রবাবু ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কিন্তু দান করিতে সকলেরি অধিকার আছে।

স। থাকিতে পারে, কিন্তু সকলেই গ্রহণ করে কি?

সু। করে না ; কিন্তু যাহার চলে না সে?

সদানন্দ ঈষৎ বিরক্ত হইল ; বলিল, শুভদা দেবীর এরূপ ভিক্ষা না লইলেও চলে।

সু। আজকাল বোধ হয় চলে, কিন্তু কিছুদিন পূর্বে চলিত কি?

স। সেকথার প্রয়োজন কি? আর আপনি এত জানিলেন কিরূপে?

সু। আমি অনেক কথা জানি। হারাণবাবু উপার্জন করেন না—অধিকন্তু আনুষঙ্গিক নানা দোষ আছে—যে আপনার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার প্রতিপালন করে না, তাহার সংসার পরের সাহায্য ব্যতীত চলে কি?

সদানন্দ কিছু গোলমালে পড়িল, উপস্থিত কোনরূপ উত্তর করিতে পারিল না।

সুরেন্দ্রবাবু পুনরায় কহিলেন, হারাণবাবু এখন কি করেন?

স। কিছু না।

সু। বুঝিয়াছি! আপনার সাহায্যে তবে তাঁহার সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়?

স। ভগবানে সাহায্য করেন—আমি দরিদ্র।

সু। ছলনার বিবাহ হইয়াছে?

স। হইয়াছে।

সু। কোথায়? কাহার সহিত?

স। আমাদের গ্রামেই। শারদাচরণ রায়ের সহিত।

সু। মাধব কেমন আছে?

স। সে বাঁচিয়া নাই—অনেকদিন মরিয়া গিয়াছে।

সু। আহা! তাঁর বড় মেয়েটি এখন কোথায়?

সদানন্দ বিস্মিত হইয়া বলিল, কোথায় কিরূপ? সেও ত বাঁচিয়া নাই।

সু। বাচিয়া নাই? মরিল কিরূপে?

স। গঙ্গাজলে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

সু। কেমন করিয়া জানিলেন? মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল কি?

স। মৃতদেহ ভাসিয়া উঠে নাই ; কিন্তু তাহার পরিধেয় বস্ত্র গঙ্গাতীরে পাওয়া গিয়াছিল—তাহাতেই বোধ হয় আত্মহত্যা করিয়াছে।

সু। সে বিষয়ে আর কাহারো সন্দেহ নাই?

স। কিছু না।

কিছুক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলেন ; তাহার পর সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, আচ্ছা, মনে করুন, যদি এ-টাকা সে-ই পাঠাইয়া থাকে?

স। কে? ললনা?

সু। ললনা কে? তাহার নাম কি ললনা ছিল?

স। হাঁ।

সু। আমি বিস্মৃত হইয়াছিলাম, ললনাই বটে! ললনা, ছলনা দুই বোন,—না?

স। হাঁ।

সু। মনে করুন দেখি, যদি সে-ই এ টাকা পাঠাইয়া থাকে?

স। যে মরিয়াছে, সে?

সু। হাঁ, সে-ই। গঙ্গাতীরে তাহার বস্ত্র পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই যে সে মরিয়াছে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এখন যদি সে-ই পাঠাইয়া থাকে?

সদানন্দ বড় বিহ্বল হইল। কিছুক্ষণ অধোবদনে ভাবিয়া বলিল, সে বাঁচিয়া নাই ; বাঁচিয়া থাকিলে পত্র লিখিত।

সু। পত্র লিখিতে যদি তাহার লজ্জা বোধ হয়?

স। আমি ললনাকে জানি। লজ্জার কাজ কখনো সে করিবে না—জীবিত থাকিয়া কখনো আত্মগোপন করিবে না!

সু। সে মরে নাই—বাঁচিয়া আছে ; সে-ই টাকা পাঠাইয়াছে এবং প্রতি মাসে পাঠাইবে।

সদানন্দ আপনার কপাল টিপিয়া ধরিয়া বলিল, আপনার নাম?

সুরেন্দ্রনাথ রায়।

নিবাস?

নারায়ণপুর।

স। আপনি হারাণবাবুর এত কথা কি করিয়া জানিলেন?

সু। ললনা বলিয়াছে।

স। ললনা বলে কেউ নাই—সে মরিয়াছে।

সু। মরে নাই—সে সুখে আছে।

স। সে স্বর্গে গিয়াছে—

সুরেন্দ্রবাবু চীৎকার করিলেন, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান—

আমি যাই—

দাঁড়ান—আর দুটো কথা—

যদি কখন দেখা হয় বলিবেন, সদাদাদা তাহাকে অনেক অনেক আশীর্বাদ করিয়াছে—

তাঁর মাকে বলিবেন—

হাঁ—স্বর্গে গিয়াছে।

সদানন্দ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আর ফিরিল না—আর বসিল না।

সে চলিয়া গেলে সুরেন্দ্রনাথ বহুক্ষণাবধি নির্বাক নিস্তব্ধ বসিয়া রহিলেন। কিছু দিবস পূর্বে হইলে বোধ হয় এখন হাসিতেন, কিন্তু আজ চক্ষুকোণে জল আসিয়া পড়িল। এইসময় বাহিরে ভৃত্য ডাকিয়া বলিল, বাবু, গাড়ি সাজাবে?

হাঁ, সাজাও।—ছিঃ ছিঃ—এমন বিষও মানুষ ইচ্ছা করিয়া খায়!

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অনেক রাত্রি হইয়াছে, তথাপি মালতী আপনার কক্ষে বসিয়া 'সীতার বনবাস' পড়িতেছে। অনেক কাঁদিয়াছে, অনেক চোখ মুছিয়াছে, তথাপি পড়িতেছে। আহা! বড় ভাল লাগে—কিছুতেই ছাড়া যায় না।

এইসময় বাহিরে দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বড় মোটা গলায় কে ডাকিল, ললনা!

মালতী শিহরিয়া উঠিল—হাতের 'সীতার বনবাস' নীচে পড়িয়া গেল।

ললনা!

মালতীর বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষীণকণ্ঠে কহিল—কে?

এবার হাসিতে হাসিতে সুরেন্দ্রনাথ ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার ডাকিলেন, ললনা।

তুমি?

হাঁ, আমি ; কিন্তু তুমি ধরা পড়িয়াছ। নাম জাল করিয়াছিলে কেন?

কৈ?

আবার মিছে কথা? তাহার শুষ্ক ওষ্ঠাধর চুম্বন করিয়া বলিলেন, সমস্ত শুনিয়া আসিলাম। ললনা ছিলে—মালতী হইয়া বসিয়াছ।

কোথায়?

কলিকাতায়।

কলিকাতায় আমাকে ত কেহ জানে না।

সু। সেখানে কেহ তোমাকে জানে না বটে, কিন্তু যে জানে সে হলুদপুর হইতে আসিয়াছিল।

মা। কে?

সু। তোমার সদাদাদা সেই নোট ফিরাইয়া দিতে অঘোরবাবুর নিকট আসিয়াছিলেন।

মা। নোট ফিরাইয়া দিতে?

সু। হাঁ—

মা। সদাদাদা?

সু। সে-ই।

মালতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, কথা কও না যে?

মা। সদাদাদা কেমন আছেন?

সু। ভাল আছেন। তোমার মা ভাল আছেন—তাঁর অবস্থা এখন আর মন্দ নয়, তাই তোমার দান গ্রহণ করিবেন না। সদানন্দবাবু তাঁহাদের অবস্থা ফিরাইয়া দিয়াছেন।

মা। আমার নাম ললনা—সে কথা কেমন করিয়া জানিলে?

সু। সদানন্দ বলিয়াছেন। তাঁহারা সকলে জানেন তুমি জলে ডুবিয়া আত্মঘাতী হইয়াছ।

মালতী নিশ্বাস ফেলিল।

সু। কিন্তু আমি বলিয়াছি যে তুমি বাঁচিয়া আছ এবং সুখে আছ।

মা। তা কেন বলিলে?

সু। তবে কি মিথ্যা বলিব? তুমি বাঁচিয়াও আছ, আর আমার বোধ হয় সুখেও আছ—সুখে নাই কি?

মা। আছি—কিন্তু সেকথা কি সদানন্দ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

সু। না ; আমি আপনি বলিয়াছি এবং তোমার মাকেও একথা বলিতে বালিয়াছি।

মা। আমি টাকা পাঠাইয়াছিলাম—তাহাও বলিয়াছ কি?

সু। বলিয়াছি।

মা। তুমি আমার মাথা খাইয়া আসিয়াছ। সে পাগল, একথা গ্রামময় বলিয়া বেড়াইবে। যদি তাহাদিগের নিকট মরিয়াই ছিলাম, তবে কেন বাদ সাধিয়া আবার বাঁচাইলে?

সুরেন্দ্রনাথ দুঃখিতভাবে মৃদু হাসিলেন ; তাহার পর বলিলেন, যাহাকে তোমরা পাগল মনে করিতে, সে বাস্তবিক একতিলও পাগল নয়। হয়ত সে কখন পাগল ছিল, কিন্তু সেদিন তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। তাহার দ্বারা হলুদপুরে তুমি কখন বাঁচিবে না। তুমি যখন আত্মগোপন করিয়াছ, সে কখন তাহা প্রকাশ করিবে না।

মা। কেমন করিয়া জানিলে?

সু। জানিয়াছি! যখন, তোমার জীবিত থাকার কথা তোমার মাকে জানাইতে বলিলাম, সে বলিল—ললনা লজ্জার কাজ কখন করিবে না, আত্মগোপন কখন করিবে না—সে বাঁচিয়া নাই, মরিয়াছে। আমি বলিলাম, সে সুখে আছে। সে বলিল, সে স্বর্গে গিয়াছে। আমি বলিলাম, সদানন্দবাবু, আর একটু দাঁড়ান। সে বলিল, আমি যাই—যদি কখন তার দেখা পান, বলিবেন, সদাদাদা তাহাকে অনেক আশীর্বাদ করিয়াছে। মালতী, আমি ঠিক বুঝিয়াছিলাম ; যে বিষ আমি খাইয়াছি—সে বিষ সেও খাইয়াছে। আমার সুধা হইয়াছে—তাহার প্রাণহন্তারক হইয়াছে।

মালতী অধোবদন হইয়া শুনিতেছিল ; বড় কাঁদিবার ইচ্ছা হইতেছিল—কিন্তু লজ্জা করিতেছিল।

আর একটা সুখবর—তোমার ছলনার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

মালতী মুখ তুলিয়া বলিল, হইয়াছে? কোথায়, কার সহিত?

ঐ গ্রামেই। শারদাচরণ না কে—তাহারি সহিত।

মালতী বুঝিতে পারিল। মনে মনে তাহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া বলিল, বিবাহ করিতে সে-ই করিবে, তাহা কতক জানিতাম।

সু। কেমন করিয়া জানিলে? পূর্ব হইতে কি কথাবার্তা ছিল?

মা। না—কথাবার্তা কিছুই ছিল না—তবে আমি এক সময়ে ছলনাকে বিবাহ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তখন পিতার ভয়ে বিবাহ করিতে স্বীকৃত হন নাই, পরে আমি মরিয়াছি—এই ভাবিয়া দয়া করিয়া বোধ হয় বিবাহ করিয়াছেন।

সু। পিতার ভয় কেন?

মা। তিনি অতিশয় অর্থপিপাসু লোক। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পুত্রের বিবাহ দিয়া কিছু অর্থলাভ করিবেন।

সু। তাহা বদলাইল কেন? তোমার পিতা নিশ্চয়ই অর্থ দিতে পারেন নাই।

মা। সম্ভব। মালতী মনে ভাবিল, যে ভালবাসায় তুমি ধরা দিয়াছ শারদাচরণের সেই ভালবাসায় শারদাচরণের পিতাও ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিল না।

মালতী চিন্তা করিবার আজ অনেক দ্রব্য পাইয়াছে, তাই বেশি কথা কহিতে ভাল লাগিতেছিল না ; কিন্তু মনে পড়িল মাধবের কথা। বলিল, মাধব—তার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিল?

সে ভাল আছে।

মালতীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সে রাত্রে অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে জাগিয়া রহিল, অনেক কথা মনে মনে তোলাপাড় করিল। ভাবিল, সদানন্দ আসিয়াছিল—টাকা ফিরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল ; আর তাহাদের প্রয়োজন নাই। আমিও আর পাঠাইব না। তারপর মনে কেরিল—শারদাচরণ! পূর্বে শত ধন্যবাদ দিয়াছিল, এখন সহস্র ধন্যবাদ তাহাকে মনে মনে দিল—মনে মনে বলিল, তুমি আমার অপরাধ লইও না, তখন তোমাকে চিনিতে পারি নাই। আর কখন তোমাকে হয়ত দেখিতে পাইব না, কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন এ দয়া ভুলিব না। অন্তরে চিরদিন তোমাকে ভক্তি করিয়াছি, চিরদিন করিব।

সে খুঁজিয়া দেখিল, শারদার অস্পষ্ট ছায়া এখনও সে হৃদয় হইতে পূর্ণ বিলীন হইয়া যায় নাই। আজ আরো স্পষ্টীকৃত হইল। মনে মনে বলিল, স্বামী বলেন—সে সদানন্দ; কিন্তু সে শারদা!

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

এদিকে সদানন্দ ফিরিয়া আসিল। সমস্ত পথটা সে বড় অন্যমনস্ক হইয়া চলিতেছিল। পথে যে-কেহ ডাকিয়া বলিল, দাদাঠাকুর কোত্থেকে? দাদাঠাকুর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হুঁ'।—কোথায় গেছলে? সদানন্দ দাঁড়াইয়া মুখপানে চাহিয়া বলিল, বাড়ি যাচ্ছি। তাহার হালের গরু ততক্ষণ একজনের বেগুনক্ষেতে ঢুকিয়াছে, সে গালি দিতে দিতে তাহার পশ্চাৎ ছুটিল, সদানন্দও পথ বাহিয়া চলিতে লাগিল। সে গরু ফিরাইয়া আনিয়া আপনা আপনি বলিল, ক্ষেপার মনটা আজ দেখচি বড় ভাল নয়, বেশ লোকটি!

রামুমামা নন্দ ময়রার দোকানঘরের চৌকাঠে ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছিলেন, একপা ধূলা সদানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, ও সদানন্দ, চার-পাঁচদিন তোমাকে যে দেখিনি, ছিলে কোথা?

সদানন্দ না ফিরিয়া পশ্চাৎদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, ওখানে!

কোথায়? বামুনপাড়ায়?

হুঁ।

এতদিন ধরে?

হুঁ। সদানন্দ হনহন্ করিয়া চলিতে লাগিল।

রামুমামা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, দূর, কি যে বলে কিছু বোঝা যায় না।

সদানন্দ সেকথা শুনল না বা শুনিতে পাইল না, একেবারে শুভদার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নোটখানা নিকটে রাখিয়া বলিল, কোন সন্ধান হইল না।

শুভদা বলিলেন, তবে মিথ্যে ক্লেশ পাইলে।

সদানন্দ চুপ করিয়া রহিল।

শুভদা আবার বলিলেন, তবে এ টাকা লইয়া কি করিব?

স। আপনার যাহা ইচ্ছা। টাকা আপনার ইচ্ছা হয় বিলাইয়া দিন, নাহয় রাখিয়া দিন, যদি কখন সন্ধান পাওয়া যায়, ফিরাইয়া দিবেন।

শুভদা অগত্যা তাহা বাক্সবন্ধ করিয়া রাখিল।

সদানন্দ বলিল, হারাণকাকা কোথায়?

শুভদা পার্শ্বের ঘর দেখাইয়া বলিল, শুইয়া আছেন।

কোথাও যান নাই?

গিয়াছিলেন—এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বড় ঝড়বৃষ্টি করিয়া আসিল। শুভদা সকাল সকাল রন্ধনাদি শেষ করিয়া লইলেন। হারাণবাবু আহারাদি করিয়া বলিলেন, কিছু পয়সা দাও।

আজ আর কোথাও যেও না ; আকাশে মেঘ কোরে আছে, রাত্রে যদি জল হয়?

হোলেই বা।

তা হ'লে ফিরে আসতে কষ্ট হবে।

কিছু না। আজ অনেক কাজ আছে। যেতেই হবে।

কাজ যাহা ছিল শুভদা তাহা জানিত। তথাপি কহিল, আজ একাদশী ; ঠাকুরঝির আবার অসুক হয়েচে—অঘোরে পড়ে আছেন।

হারাণ তাহা শুনিল না। ট্যাঁকে পয়সা গুঁজিয়া, ছাতা মাথায় দিয়া, তালি-দেওয়া চটি-জুতা হাতে লইয়া, কোঁচা গুঁজিয়া জল-কাদার মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িলেন। শুভদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, স্বভাব!

সে যথার্থ-ই অনুমান করিয়াছিল ; রাত্রি একপ্রহর না হইতেই আবার বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। আজকাল প্রতি রাত্রে শুভদার অল্প অল্প জ্বর হইত ; কিন্তু একথা কাহাকেও বলা দূরে যাউক, সে একরূপ নিজেকেই জানিতে দিত না। রাত্রে যখন শীত করিয়া জ্বর আসিত, শুধু তখনই মনে পড়িত।

বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শীত বোধ হইতে লাগিল, হাতের নিকট যাহা পাইল তাহাই টানিয়া গায়ে দিতে লাগিল। অনেক রাত্রে শুভদার তন্দ্রাবোধ হইল। তখনও বৃষ্টি পড়িতেছে, কিন্তু অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ক্লান্ত শরীরে তন্দ্রার মোহে শুভদার বোধ হইল, কে যেন দ্বার ঈষৎ ফাঁক করিয়া জীর্ণ অর্গলটা ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে—তাহার পরেই খট্ করিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, সে চক্ষু চাহিয়া সেই আলোকে দেখিল, একজন লোক কক্ষের ভিতর প্রবেশ করিতেছে, তাহার হস্তে বংশযষ্টি, সমস্ত বদন ও অঙ্গ মসীলিপ্ত তাহার উপর শাদা-শাদা চুনের ফোঁটা। শুভদা শিহরিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—ওগো, কে গো!

চুপ! সে বজ্রগম্ভীরস্বরে শুভদা আতঙ্কে চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সে বার-দুই ঠকঠক করিয়া লাঠির আওয়াজ করিয়া শয্যার নিকটে আসিয়া কহিল, তোর বাক্সর চাবি দে। গলাটা বড় মোটা, ভারী। হঠাৎ শুনিলে মনে হয় বুঝি বা সে চেষ্টা করিয়া এরূপ মোটা গলায় কথা কহিতেছে।

শুভদা কথা কহিল না।

সে আবার সেইরূপ স্বরে, লাঠিটা আর একবার সানের উপর ঠুকিয়া বলিল, চাবি দে, না হলে গলা টিপে মেরে ফেলব।

এবার শুভদা উঠিয়া বসিল, বালিসের নীচে হইতে চাবির থোলো লইয়া নিকটে ফেলিয়া দিয়া ধীরে ধীরে শান্তভাবে বলিল, আমার বড় বাক্সের ডান দিকের খোপে পঞ্চাশ টাকার নোট আছে, তাই নিও—বাঁ দিকে বিশ্বেশ্বরের প্রসাদ আছে, তাতে যেন হাত দিও না। যেরূপ শান্তভাবে সে কথাগুলি বলিল, তাহাতে বোধ হয় না যে, আর তাহার তিলমাত্রও ভয় আছে।

চুনকালি-মাখা পুরুষ চাবি লইয়া বড় বাক্স খুলিল, বাম দিকে মোটে হস্তনিক্ষেপ করিল না, ডান দিকের খোপ হইতে নোট লইয়া ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিল। শুভদার কথামত সে যেরূপ স্বচ্ছন্দে বাক্স খুলিল এবং ডান দিকের খোপের সন্ধান করিয়া লইল তাহাতে বোধ হয় যেন এসকল তাহার বিশেষ জানাশুনা আছে।

সে চলিয়া যাইবার সময় শুভদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল ; মৃদু মৃদু কহিল, নোটে বোধ হয় নাম লেখা আছে, নম্বর দেওয়া আছে—একটু সাবধানে ভাঙ্গাইয়ো।

শেষের পরিচয়

এক

রাখাল-রাজের বন্ধু জুটিয়াছে তারকনাথ। পরিচয় মাস-তিনেকের, কিন্তু 'আপনি'র পালা শেষ হইয়া সম্ভাষণ নামিয়াছে 'তুমি'তে। আর এক ধাপ নীচে আসিলেও কোন পক্ষের আপত্তি নাই ভাবটা সম্প্রতি এইরূপ।

বেলা আড়াইটায় তারকের নিশ্চয় পৌঁছিবার কথা, তাহারই কি-একটা অত্যন্ত জরুরী পরামর্শের প্রয়োজন, অথচ তাহারই দেখা নাই, এদিকে ঘড়িতে বাজে তিনটা। রাখাল ছটফট করিতেছে,—পরামর্শের জন্যও নয়,বন্ধুর জন্যও নয়, কিন্তু ঠিক তিনটায় তাহার নিজেরই বাহির না হইলেই নয়। ভবানীপুরে এক সুশিক্ষিত পরিবারে সন্ধ্যার পরেই মহিলা মজলিসের অধিবেশন, বহু তরুণী বিদুষীর পদাপর্ণের নিঃসংশয় সম্ভাবনা জানাইয়া বেগার খাটিবার সনির্বন্ধ আহ্বান পাঠাইয়াছেন গৃহিণী স্বয়ং। অতএব, বেলাবেলি না যাইলে অতিশয় অন্যায় হইবে ; অর্থাৎ কিনা যাওয়াই চাই।

এদিকে যাত্রার আয়োজন তাহার সম্পূর্ণ। দাড়ি-গোঁফ বার-দুই কামাইয়া বার-চারেক হিমানী লাগানো শেষ হইয়াছে, শয্যার পরে সুবিন্যস্ত গিলে-করা পাঞ্জাবি, সিল্কের গেঞ্জি, কোঁচানো দেশী ধুতি-চাদর, খাটের নীচে ক্রিম-মাখানো বার্নিশ-করা পাম্প ? তেপায়ার উপরে রাখা সুবর্ণ-বন্ধনী-সংবদ্ধ সোনার চৌকা রিস্ট ওয়াচ—মেয়েদের চিত্তহারিণী বলিয়াই ছেলেমহলে প্রখ্যাত—সবই প্রস্তুত। টেবিলে টি-পটে চায়ের জল গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া প্রায় অপেয় হইয়া উঠিল, কিন্তু বন্ধুবরের সাক্ষাৎ নাই। সুতরাং দোষ যখন বন্ধুরই, তখন দ্বারে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেই বা দোষ কি! কিন্তু কোথায় যেন বাধিতেছে, অথচ ওদিকের আকর্ষণও দুর্নিবার্য।

প্রবল চঞ্চলতায় রাখাল চটি পায়ে দিয়া বড় রাস্তা পর্যন্ত একবার ঘুরিয়া আসিল। তারপরে চা ঢালিয়া একলাই গিলিতে শুরু করিয়া মনে মনে শেষবারের মত প্রতিজ্ঞা করিল, এ পেয়ালা শেষ হইলেই ব্যস্! আর না। মরুক গে তার পরামর্শ। বাজে—বাজে, সব বাজে। সত্যকার কাজ থাকিলে সে আধ-ঘণ্টা আগেই হাজির হইত, পরে নয়। না হয়, কাল সকালে একবার তার মেসটা ঘুরিয়া আসা যাইবে,—ব্যস্!

তারকের পরিচয় পরে হইবে, কিন্তু রাখালের ইতিহাসটা মোটামুটি এইখানে বলিয়া রাখি।

কিন্তু ওকে জিজ্ঞাসা করিলেই বলে, আমি তো সন্ন্যাসী-মানুষ হে। অর্থাৎ, মাতৃ-পিতৃকুলের সবাই গেছেন লোকান্তরে, সে-ই শুধু বাকী। ইহলোক সমুজ্জ্বল করিয়া একদিন তাঁহারা ছিলেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সে-সব খবর রাখাল ভালো জানে না। যদি বা কিছু জানে, বলিতে চায় না। অধুনা পটলডাঙ্গায় তাহার বাসা। বাড়িওলা বলে দু'খানা ঘর, সে বলে একখানা। ভাড়ার দিক দিয়া শেষ পর্যন্ত দেড়খানার দরে রফা হইয়াছে। একতলা, সুতরাং যথেষ্ট স্যাঁতসেঁতে। তবে, হাওয়া না থাকিলেও আলোটা আছে—দিনে দেশলাই জ্বালিয়া জুতা খুঁজিয়া ফিরিতে হয় না। ঘর যাই হউক, রাখালের আসবাবের অভাব নাই। ভালো খাট, ভালো বিছানা, ভালো টেবিল-চেয়ার, ভালো দুটো আলমারি,—একটা বইয়ের, অন্যটা কাপড়-জামা-পোশাকে পরিপূর্ণ। একটি দামী ইলেকট্রিক ফ্যান, দেওয়ালের ঘড়িটাও নেহাত কম মূল্যের নয়—এমন আরও কত কি শৌখিন ছোটখাটো টুকি-টাকি জিনিস। একজন ঠিকার বুড়ি-ঝি রাখালের কুকার, চায়ের সাজসরঞ্জাম মাজিয়া ঘষিয়া দিয়া যায়, ঘরদ্বার পরিষ্কার করে, ভিজা কাপড় কাচিয়া শুকাইয়া তুলিয়া দিয়া যায়,—সময় পাইলে বাজার করিয়াও আনে। রাখাল পাল-পার্বণের নাম করিয়া টাকাটা সিকাটা যাহা দেয় তাহা বহু সময়ে মাস-মাহিনাকেও অতিক্রম করে। রাখাল মাঝে মাঝে আদর করিয়া ডাকে নানী। রাখালকে সে সত্যই ভালবাসে।

রাখাল সকালে ছেলে পড়ায়, বাকী সমস্তদিন সভা-সমিতি করিয়া বেড়ায়। রাজনীতিক নয়, সামাজিক। সে বলে, সে সাহিত্যিক,—রাজনীতির গণ্ডগোলে তাহাদের সাধনার বিঘ্ন ঘটে।

ছেলে পড়ায়, কিন্তু কলেজের নয়,—স্কুলের। তাও খুব নীচের ক্লাসের। পূর্বে চাকরির চেষ্টা অনেক করিয়াছে, কিন্তু জুটাইতে পারে নাই। এখন সে চেষ্টা ছাড়িয়াছে।

কিন্তু একবেলা ছোট ছেলে পড়াইয়া কি করিয়া যে এতটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভবপর তাহাও বুঝা যায় না। সে সাহিত্যিক, কিন্তু প্রচলিত সাপ্তাহিক বা মাসিকপত্রে তাহার নাম খুঁজিয়া মেলে না। রাত্রে, অনেক রাত্রি জাগিয়া খাতা লেখে, কিন্তু সেগুলা যে কি করে কাহাকেও বলে না। ইস্কুল-কলেজে সে কি পাস করিয়াছে কেহ জানে না, প্রশ্ন করিলে এমন একটা ভাব ধারণ করে যে, সে গুরু-ট্রেনিং হইতে ডক্টরেট পর্যন্ত যা কিছু হইতে পারে। তাহার আলমারিতে সকল জাতীয় পুস্তক। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—মোটা মোটা বাছা বাছা বই, কথাবার্তা শুনিলে হঠাৎ বর্ণচোরা মহামহোপাধ্যায় বলিয়া শঙ্কা হয়। হোমিওপ্যাথি শাস্ত্র হইতে Wireless পর্যন্ত তাহার অধিগত। তাহার মুখে শুনিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-প্রবাহের জ্ঞান মার্কনীর অপেক্ষা নিতান্ত কম বলিয়া সন্দেহ হয় না। কন্টিনেনটাল গ্রন্থকারদের নাম রাখালের কণ্ঠস্থ,—কে কয়টা বই লিখিয়াছেন সে অনর্গল বলিতে পারে। হিউমের সহিত লকের গরমিল কতটুকু এবং স্পিনোজার সঙ্গে দেকার্তের আসল মিল কোন্‌খানে এবং ভারতীয় দর্শনের কাছে তাহা কত অকিঞ্চিৎকর, এ-সকল তত্ত্বকথা সে পণ্ডিতের মতই প্রকাশ করে। বুয়ার-ওয়ারের সেনাপতি কে কে, রুশ-জাপান যুদ্ধে কিসের জন্য রুশের পরাজয় ঘটিল, আমেরিকানরা কি করিয়া এত টাকা করিল, এ-সকল বিবরণ তাহার নখাগ্রে। ভারতীয় মুদ্রা-বিনিময়ে বাট্টার হার কি হওয়া উচিত, রিভার্স কাউন্সিল বেচিয়া ভারতের কত টাকা ক্ষতি হইল, গোল্ড স্টান্ডার্ড রিজার্ভে কত সোনা আছে এবং কারেন্সি আমানতে কত টাকা থাকা উচিত, এ সম্বন্ধে সে একেবারে নিঃসংশয়। এমন কি, নিউটনের সহিত আইনস্টিনের মতবাদ কতদিনে সামঞ্জস্য লাভ করিবে এ ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করিতে তাহার বাধে না। শুনিয়া কেহ কেহ হাসে, কেহ-বা শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে যে, রাখাল পরোপকারী। সাধ্যে কুলাইলে সাহায্য করিতে সে কোথাও পরাঙ্মুখ হয় না।

বহু গৃহেই রাখালের অবাধ গতি, অবারিত দ্বার। খাটাইয়া লইতে তাহাকে কেহ ছাড়ে না। যে-সব মেয়েরা বয়সে বড়, মাঝে মাঝে অনুযোগ করিয়া বলেন, রাখাল, এ তোমার ভারী অন্যায়, এইবার একটা বিয়ে-থা করে সংসারী হও। কতকাল আর এমনভাবে কাটাবে,—বয়স তো হোলো।

রাখাল কানে আঙুল দিয়া বলে, আর যা বলেন বলুন, শুধু এই আদেশটি করবেন না। আমি বেশ আছি।

তথাপি আদেশ-উপদেশের কার্পণ্য ঘটে না। যাঁহারা ততোধিক শুভানুধ্যায়ী তাঁহারা দুঃখ করিয়া বলেন, ও নাকি আবার কথা শুনবে! স্বদেশ ও সাহিত্য নিয়েই পাগল।

কথা সে না শুনিতে পারে, কিন্তু পাগলামি সারে কিনা যাচাই করিয়া আজও কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী দেখে নাই। কেহ বলে নাই, রাখাল তোমার পাত্রী স্থির করিয়াছি, তোমাকে রাজী হইতে হইবে।

এমনি করিয়া রাখালের দিন কাটিতেছিল এবং বয়স বাড়িতেছিল।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। দর্শন-বিজ্ঞানে যাই হোক, সংসারে আপনার বলিতে তাহার যে কোথাও কিছু নাই এবং ভবিষ্যতের পাতেও শূন্য অঙ্ক দাগা এ খবরটা আর যাহার চোখেই চাপা পড়ুক, মেয়েদের চোখে যে চাপা পড়ে নাই এ কথা রাখাল বোঝে। তাই বিবাহের অনুরোধে সে তাঁহাদের সদিচ্ছা ও সহানুভূতিটুকুই গ্রহণ করে ; তাঁহাদের কাজ করে, বেগার খাটে, তার বেশীতে প্রলুব্ধ হয় না। এক ধরনের স্বাভাবিক সংযম ও মিতাচার ঐখানে তাহাকে রক্ষা করে।

চা-খাওয়া শেষ করিয়া রাখাল কোঁচান কাপড়টি পরিপাটি করিয়া পরিয়া সিল্কের গেঞ্জি আর একবার ঝাড়িয়া গায়ে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমনি সময়ে তারক আসিয়া প্রবেশ করিল।

রাখাল কহিল, বাঃ—বেশ তো! এরই নাম জরুরী পরামর্শ? না?

কোথাও বেরুচ্চো নাকি?

না, সমস্ত বিকেলটা ঘরে বসে থাকবো।

না, সে হবে না। বিকেলের এখনো ঢের দেরি—বসো।

না হে না—তার জো নেই। পরামর্শ কাল হবে। এই বলিয়া সে গেঞ্জির উপরে পাঞ্জাবি চড়াইল।

তারক তাহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তা হলে পরামর্শ থাকল। কাল সকালে আমি অনেকদূরে গিয়ে পড়বো। হয়তো আর কখনো—না, তা না হোক—অনেকদিন আর দেখা হবার সম্ভাবনা রইল না।

রাখাল ধপ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল,—তার মানে?

তার মানে আমি একটা চাকরি পেয়েছি। বর্ধমান জেলার একটা গ্রামে। নতুন ইস্কুলের হেডমাস্টারি।

প্রাইমারি?

না, হাই ইস্কুল।

হাই ইস্কুল? ম্যাট্রিক? মাইনে?

লিখচে তো নব্বুই টাকা। আর একটা ছোটখাটো বাড়ি—থাকবার জন্যে অমনি দেবে। রাখাল হাঃ হাঃ করিয়া একচোট হাসিয়া লইল, পরে কহিল, ধাপ্পা—ধাপ্পা—সব ধাপ্পাবাজি। কে তামাশা করেচে। এ তো একশ' টাকার ওপরে গেল হে। কেন, তারা কি আর লোক পেলে না?

তারক কহিল, বোধ হয় পায়নি। পাড়াগাঁয়ে সহজে কি কেউ যেতে চায়?

না, চায় না! একশো টাকায় যমের বাড়ি যেতে চায়, এ তো বর্ধমান! ইঃ—তিনটে দশ। আর দেরি করা চলে না। না না, পাগলামি রাখো,—কাল সকালে সব কথা হবে, দেখা যাবে কে লিখেচে, আর কি লিখেচে। এটা বুঝচো না যে একশো টাকা! অজানা—অচেনা—দ্যুৎ! অ্যাপ্লিকেশনের জবাব তো? ও ঢের জানি, হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে। ধ্যুৎ! চললুম। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারক মিনতি করিয়া কহিল, আর দশ মিনিট ভাই। সত্যি মিছে যাই হোক, রাতের গাড়িতে যেতেই হবে।

রাখাল বলিল, কেন শুনি? কথাটা আমার বিশ্বাস হলো না বুঝি?

তারক ইহার জবাব দিল না, কহিল,—অথচ এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, দিনান্তে একবার দেখা না হলে প্রাণটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

রাখাল কহিল, আমারই তা হয় না বুঝি?

ইহার পরে দুজনেই ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল।

তারক বলিল, বেঁচে যদি থাকি, বড়দিনের ছুটিতে হয়তো আবার দেখা হবে। ততদিন—

রাখালের চোখে সামান্যতেই জল আসিয়া পড়ে, তাহার চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

তারক আঙুল হইতে একটা বহু ব্যবহৃত সোনার শিল-আঙটি খুলিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিল, কহিল, ভাই রাখাল, তোমার কাছে আমি কুড়িটা টাকা ধারি—

কথাটা শেষ হইল না—এ কি আর বন্ধক নাকি? বলিতে বলিতে রাখাল ছোঁ মারিয়া, আঙটিটা তুলিয়া লইয়া ঝোঁকের মাথায় জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতেছিল, তারক হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, আরে না না, বন্ধক নয়—বেচলে এর দাম দশটা টাকাও কেউ দেবে না,—এ আমার স্মরণ-চিহ্ন, যাবার আগে তোমার হাতে নিজের হাতে পরিয়ে যাবো,—এই বলিয়া সে জোর করিয়া বন্ধুর আঙুলে পরাইয়া দিল। বলিল, দশ মিনিট সময় চেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু পনর মিনিট হয়ে গেছে, এবার তোমার ছুটি। নাও, পোশাক-টোশাক পরে নাও,—এই বলিয়া সে হাসিল।

মহিলা-মজলিসের চেহারা তখন রাখালের মনের মধ্যে ম্লান হইয়া গেছে, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ড্রেসিং, টেবিলের আয়নায় পাশাপাশি দুই বন্ধুর ছবি পড়িল। রাখাল বেঁটে, গোলগাল, গৌরবর্ণ, তাহার পরিপুষ্ট মুখের 'পরে একটি সহৃদয় সরলতা যেন অত্যন্ত ব্যক্ত—মানুষটি যে সত্যই ভালোমানুষ তাহাতে সন্দেহ জন্মায় না, কিন্তু তারকের চেহারা সে শ্রেণীরই নয়। সে দীর্ঘাকৃতি, কৃশ, গায়ের রংটা প্রায় কালোর ধার ঘেঁষিয়া আছে। বাহিরে প্রকাশিত নয় বটে, কিন্তু ঠাহর করিলেই সন্দেহ হয়, লোকটি বোধ হয় অতিশয় বলিষ্ঠ। মুখ দেখিয়া হঠাৎ কোন ধারণা করা কঠিন, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আছে। আয়ত বা সুন্দর নয়, কিন্তু মনে হয় যেন নির্ভর করা চলে। সুখে-দুঃখে ভার সহিবার ইহার শক্তি আছে। বয়স সাতাশ-আটাশ, রাখালের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট, কিন্তু কিসে যেন তাহাকেই বড় বলিয়া ভ্রম হয়।

রাখাল হঠাৎ জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু আমি বলচি তোমার যাওয়া উচিত নয়।

কেন?

কেন আবার কি? একটা হাই ইস্কুল চালানো কি সোজা কথা! ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে পড়াতে হবে, তাদের পাস করাতে হবে—সে কোয়ালিফিকেশন কি—

তারক কহিল, কোয়ালিফিকেশন তারা চায়নি, চেয়েছে য়ুনিভারসিটির ছাপছোপের বিবরণ। সে-সব মার্কা কর্তৃপক্ষদের দরবারে পেশ করেছি, আর্জি মঞ্জুর হয়েছে। ছেলে পড়াবার ভার আমার, কিন্তু পাশ করার দায় তাদের।

রাখাল ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, সে বললে হয় না হে, হয় না। পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, কিন্তু আমাকেও তো তুমি সত্যি কথা বলোনি তারক। বলেছিলে পড়াশুনা তেমন কিছু করোনি।

তারক হাসিয়া কহিল, সে এখনও বলচি। ছাপছোপ আছে, কিন্তু পড়াশুনা করিনি। তার সময় পেলাম কৈ? পড়া-মুখস্তর পালা সাঙ্গ হতেই লেগে গেলাম চাকরির উমেদারিতে,—কাটলো বছর দু'তিন—তার পরে দৈবাৎ তোমার দয়া পেয়ে কলকাতায় এসে দুটো খেতে পরতে পাচ্চি।

দ্যাখো তারক, ফের যদি তুমি—

অকস্মাৎ আয়নায় দুই বন্ধুর মাথার উপরে আর একটি ছায়া আসিয়া পড়িল। নারীমূর্তি। উভয়েই ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, একটি অপরিচিতা মহিলা ঘরের প্রায় মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মহিলাই বটে। বয়স হয়তো যৌবনের আর এক প্রান্তে পা দিয়াছে, কিন্তু সে চোখেই পড়ে না। বর্ণ অত্যন্ত গৌর, একটু রোগা, কিন্তু সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া মর্যাদার সীমা নাই। ললাটে আয়তির চিহ্ন। পরনে গরদের শাড়ি, হাতে গলায় প্রচলিত সাধারণ দু-চারখানি গহনা, শুধু যেন সামাজিক রীতি-পালনের জন্যই। দুই বন্ধুই কিছুক্ষণ স্তব্ধবিস্ময়ে চাহিয়া রাখাল চৌকি ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিল,—এ কি! নতুন-মা যে! তাহার পরেই সে উপুড় হইয়া তাঁহার পায়ের উপর গিয়া পড়িল, দুই পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম যেন তাহার আর শেষ হইতেই চাহে না।

উঠিয়া দাঁড়াইলে রমণী হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন। তিনি চৌকিতে বসিলে রাখাল মাটিতে বসিল এবং তারক উঠিয়া গিয়া বন্ধুর পাশে বসিল।

হঠাৎ চিনতে পারিনি মা।

না পারবারই ত কথা রাজু।

মনে মনে ভাবছি, চোখ পড়ে গেল আপনার চুলের ওপর। রাঙ্গা আঁচলের পাড় ডিঙিয়ে পায়ে এসে ঠেকেচে। এমনটি এ-দেশে আর কারু দেখিনি। তখন সবাই বলত এর খানিকটা কেটে নিয়ে এবার প্রতিমা সাজানো হবে। মনে পড়ে মা?

তিনি একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু কথাটা চাপা দিলেন। বললেন, রাজু, ইনিই বুঝি তোমার নতুন বন্ধু? নামটি কি?

রাখাল বলিল, তারক চাটুয্যে। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে?

তিনি এ প্রশ্নও চাপা দিলেন, শুধু বললেন, শুনেচি তোমাদের খুব ভাব।

রখাল বলল, হাঁ, কিন্তু সে বুঝি আর টেঁকে না। ও আজই চলে যেতে চাচ্চে বর্ধমানের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে—ইস্কুলের হেডমাস্টারি জুটেছে ওর, কিন্তু আমি বলি, তুমি এম.এ.পাস করেছো যখন তখন মাস্টারির ভাবনা নেই, এখানেই একটা যোগাড় হয়ে যাবে। ও কিন্তু ভরসা করতে চায় না। বলুন তো কি অন্যায়!

শুনিয়া তিনি মৃদুহাস্যে কহিলেন, তোমার আশ্বাসে বিশ্বাস করতে না পারাকে অন্যায় বলতে পারিনে রাজু। তারকবাবু কি সত্যিই আজ চলে যাচ্চেন?

তারক সবিনয়ে কহিল, এটি কিন্তু তার চেয়েও অন্যায় হ'ল যে রাখাল-রাজের পৈতৃক মুড়োটা স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে করে দিলেন ওকে ছোট একটুখানি রাজু, আর আমারই অদৃষ্টে এসে জুটল এক উটকো বাবু? ভার সইবে না নতুন-মা, ওটা বাতিল করতে হবে।

তিনি ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে তারক।

সম্মতি লাভ করিয়া তারক সকৃতজ্ঞ-চিত্তে কি-একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় পাইল না, তাঁহার সস্মিত মুখের উপর হঠাৎ যেন একটা বিষণ্ণতার ছায়া আসিয়া পড়িল, গলার স্বরটাও গেল বদলাইয়া, বলিলেন, রাজু, আজকাল ও-বাড়িতে কি তুমি বড়-একটা যাও না?

যাই বৈ কি নতুন-মা। তবে নানা ঝঞ্ঝাটে দিন পনের-কুড়ি—

রেণুর কাল বিয়ে,—জান?

কৈ না! কে বললে?

হাঁ, তাই। আজ বেলা দশটায় তার গায়ে-হলুদ হয়ে গেল। এ বিয়ে তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

কেন?

হওয়া অসম্ভব বলে। বরের পিতামহ পাগল হয়ে মারা যায়, এক পিসী পাগল হয়ে আছে, বাপ পাগল নয় বটে, কিন্তু হলে ছিল ভাল। হাতে-পায়ে দড়ি বেঁধে লোকে ফেলে রাখতে পারতো।

কি সর্বনাশ! কর্তা কি এ-সব খোঁজ করেন নি?

রমণী কহিলেন, জানোই তো কর্তাকে। ছেলেটি রূপবান, লেখপড়া করেছে, তা ছাড়া ওদের অনেক টাকা। ঘটক সম্বন্ধ এনেছে, যা বলেচে তিনি বিশ্বাস করেছেন। আর জানলেই বা কি? সমস্ত শুনেও হয়তো শেষ পর্যন্ত তিনি বুঝতেই পারবেন না এতে ভয়ের কি আছে?

রাখাল বিষণ্ণ-মুখে কহিল, তবেই ত!

তারক চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বন্ধুর এই নিরুৎসুক কণ্ঠস্বরে সে সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—তবেই তো মানে? বাধা দেবার চেষ্টা করবে না, আর এই বিয়ে হয়ে যাবে? এ তো বড় ভীষণ অন্যায়?

রাখাল কহিল, সে বুঝি, কিন্তু আমার কথায় বিয়ে বন্ধ হবে কেন ভাই? আর কর্তাই তো শুধু নয়, আর সবাই রাজী হবে কেন?

তারক বলিল, কেন হবে না? বরের বাড়ির মত মেয়ের বাড়িরও কি সবাই পাগল বললেও শুনবে না—বিয়ে দেবেই?

কিন্তু গায়ে-হলুদ হয়ে গেছে যে! এটা ভুলচো কেন?

হলোই বা গায়ে-হলুদ! মেয়েকে তো জ্যান্ত চিতায় তুলে দেওয়া যায় না! বলিয়াই তাহার চোখ পড়িল সেই অপরিচিতা রমণী তাহার প্রতি নীরবে চাহিয়া আছেন। লজ্জিত হইয়া সে কণ্ঠস্বর শান্ত করিয়া বলিল, আমি জানিনে এঁরা কে, হয়তো কথা কওয়া আমার উচিত নয়, কিন্তু মনে হয় রাখাল, তোমার প্রাণপণে বাধা দেওয়া কর্তব্য। কোনমতেই এ ঘটতে দেওয়া চলে না।

রমণী জিজ্ঞাসা করিলেন, এঁরা কারা রাজু? মেয়ের সৎমা তো? তাঁর আপত্তি করার কি

অধিকার?

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। তিনি নিজেও ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া কহিলেন, তোমাকে তা হলে একবার বাগবাজারে যেতে হবে, ছেলের মামার কাছে। শুনেচি, ও-পক্ষে তিনিই কর্তা। তাঁকে মেয়ের মায়ের ইতিহাসটা জানিয়ে বারণ করে দিতে হবে। আমার বিশ্বাস এতে কাজ হবে ; যদি না হয়, তখন সে ভার রইলো আমার। আমি রাত্রি এগারটার পর আবার আসবো বাবা,—এখন উঠি। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রাখাল ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, কিন্তু তার পরে যে রেণুর আর বিয়ে হবে না নতুন-মা। জানাজানি হয়ে গেলে—

না-ই হোক বাবা, সে-ও ভালো।

রাখাল আর তর্ক করিল না, হেঁট হইয়া আগের মতই ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার দেখাদেখি এবার তারকও পায়ের কাছে আসিয়া নমস্কার করিল। তিনি দ্বার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তারক, তোমাকে বলা হয়তো আমার উচিত নয়, কিন্তু তুমি রাজুর বন্ধু, যদি ক্ষতি না হয়, এ দুটো দিন কোথাও যেও না। এই আমার অনুরোধ।

তারক মনে মনে বিস্মিত হইল। কিন্তু সহসা জবাব দিতেও পারিল না। কিন্তু এ জন্য তিনি অপেক্ষাও করিলেন না, বাহির হইয়া গেলেন। রাখাল জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল তিনি পায়ে হাঁটিয়াই গেলেন, শুধু গলির বাঁকের কাছে দারোয়ানের মতো কে-একজন অপেক্ষা করিতেছিল, সে তাঁহাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করিল।

দুই

রাখাল জামা খুলিয়া ফেলিল।

তারক প্রশ্ন করিল, বেরুবে না?

না। কিন্তু তুমি? যাচ্চো আজই বর্ধমানে?

না। তুমি কি করো দেখবো,—স্বেচ্ছায় না করো জোর করে করাবো।

চায়ের কেৎলিটা আর একবার চড়িয়ে দিই,—কি বলো?

দাও।

কিছু জলখাবার কিনে আনি গে—কি বলো?

রাজী।

তাহলে তুমি চড়াও জলটা, আমি যাই দোকানে। এই বলিয়া সে কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া চটি পায়ে বাহির হইয়া গেল। গলির মোড়েই খাবারের দোকান, নগদ পয়সার প্রয়োজন হয় না, ধার মেলে।

খাবার খাওয়া শেষ হইল। সন্ধ্যার পর আলো জ্বালিয়া চায়ের পেয়ালা লইয়া দুই বন্ধু টেবিলে বসিল।

তারক প্রশ্ন করিল, তার পরে?

রাখাল বলিল, আমার বয়স তখন দশ কি এগারো। বাবা চার-পাঁচদিন আগে একবেলার কলেরায় মারা গেছেন ; সবাই বললে, বাবুদের মেজমেয়ে সবিতা বাপের বাড়িতে পূজো দেখতে এসেছে, তুই তাকে গিয়ে ধর। বাবুদের বুড়ো সরকার আমাকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে অন্দরে গিয়ে উপস্থিত হ'লো। তিনি পইঠের একধারে বসে কুলোয় করে তিল বাছছিলেন, সরকার বললে, মেজমা, ইটি বামুনের ছেলে, তোমার নাম শুনে ভিক্ষে চাইতে এসেছে। হঠাৎ বাপ মারা গেছে,—ত্রিসংসারে এমন কেউ নেই যে, এ দায় থেকে ওকে উদ্ধার করে দেয়। শুনে তার চোখ ছলছল করে এলো, বললেন, তোমার কি আপনার কেউ নেই? বললুম, মাসী আছে, কিন্তু কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রাদ্ধ করতে কত টাকা লাগবে? এটা শুনেছিলুম, বললুম, পুরুতমশাই বলেন পঞ্চাশ টাকা লাগবে। তিনি কুলোটা রেখে উঠে গেলেন, আর একটা কথাও জিজ্ঞেসা করলেন না। একটু পরে ফিরে এসে আমার উত্তরীয়ের আঁচলে দশ টাকার পাঁচখানি নোট বেঁধে দিয়ে বললেন, তোমার নাম কি বাবা? বললুম, রাজু, ভালো নাম রাখাল-রাজ। বললেন, তুমি

যাবে বাবা, আমার সঙ্গে আমার শ্বশুরবাড়ির দেশে? সেখানে ভালো ইস্কুল আছে, কলেজ আছে, তোমার কোন কষ্ট হবে না। যাবে? আমাকে জবাব দিতে হ'লো না, সরকারমশাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল, বললে, যাবে মা, যাবে, এক্ষুনি যাবে। এতবড় ভাগ্য ও কোথায় কার কাছে পাবে? ওর চেয়ে অসহায় এ গাঁয়ে আর কেউ নেই মা,—মা-দুর্গা তোমাকে ধনে-পুত্রে চিরসুখী করবেন। এই বলে বুড়ো সরকার হুউহাউ করে কাঁদতে লাগল।

শুনিয়া তারকের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, পিতৃশ্রাদ্ধ ও মহামায়ার পূজো দুই-ই শেষ হ'লো। ত্রয়োদশীর দিন যাত্রা করে চিরদিনের মত দেশ ছেড়ে তাঁর স্বামিগৃহে এসে আশ্রয় নিলুম। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী; তাই সবাই বলে নতুন-মা, আমিও বললুম নতুন-মা। শ্বশুর-শাশুড়ী নেই, কিন্তু বহু পরিজন। অবস্থা সচ্ছল, ধনী বললেও চলে। এ বাড়ির শুধু ত তিনি গৃহিণীই নয়, তিনিই গৃহকর্ত্রী। স্বামীর বয়স হয়েছে, চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে, কিন্তু যেন ছেলে-মানুষের মত সরল। এমন মিষ্টি মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি—দেখবামাত্রই যেন ছেলের আদরে আমাকে তুলে নিলেন। দেশে জমিজমা চাষবাসও ছিল, দু-একখানি ছোটোখাটো তালুকও ছিল, আবার কলকাতায় কি-যেন একটা কারবারও চলছিল। কিন্তু অধিকাংশ সময়ই তিনি থাকতেন বাড়িতে, তখন দিনের অর্ধেকটা কাটত তাঁর পূজোর ঘরে,—দেব-সেবায়, পূজো-আহ্নিকে, জপ-তপে।

আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। বই-খাতা-পেন্সিল-কাগজ-কলম এলো, জামা-কাপড়-জুতো-মোজা অনেক জুটলো, ঘরে মাস্টার নিযুক্ত হ'লো, যেন আমি এ-বাড়িরই ছেলে,—নিরাশ্রয় বলে মা যে সঙ্গে করে এনেছিলেন এ কথা সবাই গেল ভুলে। তারক, এ জীবনে সে-সুখের দিন আর ফিরবে না। আজও কতদিন আমি চুপ করে শুয়ে সেই-সব কথাই ভাবি। এই বলিয়া সে চুপ করিল এবং বহুক্ষণ পর্যন্ত কেমন যেন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

তারক কহিল, রাখাল, কি জানি কেন আমার বুকের ভেতরটা যেন ঢিপঢিপ করচে। তার পরে?

রাখাল বলিল, তার পরে এমন অনেকদিন কেটে গেল। ইস্কুলে ম্যাট্রিক পাস করে কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েছি, এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন সমস্ত উল্টে-পাল্টে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ভাঙতে-চুরতে কোথাও কিছু আর বাকী রহিল না। এই বলিয়া সে নীরব হইল।

কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, কহিল, এতদিন কাউকে কোন কথা বলি নি। আর বলবই বা কাকে? আজও বলা উচিত কিনা জানিনে, কিন্তু বুকের ভেতরটায় যেন ঝড় বয়ে যাচ্ছে—

চাহিয়া দেখিল, তারকের মুখে অপরিসীম কৌতূহল, কিন্তু সে প্রশ্ন করিল না, রাখাল নিজের সঙ্গে ক্ষণকাল লড়াই করিয়া অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তারক, নিজের মাকে দেখিনি, মা বলতে আমার নতুন-মাকেই মনে পড়ে। এই আমার সেই নতুন-মা। এতক্ষণে সত্যই তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। প্রথমে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, তারপরে বড় বড় কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন পরে চোখ মুছিয়া নিজেই শান্ত হইল, কহিল, উনি তোমাকে দিন-দুই থাকতে বলে গেলেন, হয়তো তোমাকে তাঁর কাজ আছে। বারো-তেরো বছর পূর্বের কথা—সেদিন ব্যাপারটা কি ঘটেছিল তোমাকে বলি। তার পরে থাকা না-থাকা তোমার বিবেচনা।

তারক চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

রাখাল বলিতে লাগিল, তখন কে-একজন ওঁদের কলকাতার আত্মীয় প্রায়ই বাড়িতে আসতেন, কখনো দু-একদিন, কখনো বা তাঁর সপ্তাহ কেটে যেতো। সঙ্গে আসত তেল মাখাবার খানসামা, তামাক সাজবার ভৃত্য, ট্রেনে খবরদারি করবার দরোয়ান—আর নানা রকমের কত যে ফল-মূল-মিষ্টান্ন তার ঠিকানা নেই। পাল-পার্বণ উপলক্ষে উপহারের ত পরিমাণ থাকতো

না। তাঁর সঙ্গে ছিল এঁদের ঠাট্টার সুবাদ। শুধু কোন সম্পর্কের হিসেবেই নয়, বোধ করি বা ধনের হিসেব থেকেও এ বাড়িতে তাঁর আদর-আপ্যায়ন ছিল প্রভূত। কিন্তু বাড়ির মেয়েরা যেন ক্রমশঃ কি একপ্রকার সন্দেহ করতে লাগল। কথাটা ব্রজবাবুর কানে গেল, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করা ত দূরের কথা, উলটে করলেন রাগ। দূর-সম্পর্কের এক পিসতুতো বোনকে যেতে হলো তার শ্বশুরবাড়ি। শুনেচি, এমনিই নাকি হয়ে থাকে—এই হ'লো দুনিয়ার সাধারণ নিয়ম। তা ছাড়া, এই মাত্র ত ওঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলে, কর্তার মতো সরলচিত্ত ভালোমানুষ লোক সংসারে বিরল। সত্যিই তাই। কারও কোন কলঙ্ক মনের মধ্যে স্থান দেওয়াই তাঁর কঠিন। আর, সন্দেহ কাকে, না নতুন-মাকে, ছিঃ!

দিন কাটে, কথাটা গেল বাহ্যতঃ চাপা পড়ে, কিন্তু বিদ্বেষ ও বিষের বীজাণু আশ্রয় নিলে পরিজনদের নিভৃত গৃহকোণে। যাদের সবচেয়ে বড় ক'রে আশ্রয় দিয়েছিলেন একদিন নতুন-মাই নিজে,—তাদেরই মধ্যে। কেবল আমাকেই যে একদিন যাবে বাবা আমার কাছে? বলে ঘরে ডেকে এনেছিলেন তাই নয়, এনেছিলেন আরও অনেককেই। এ ছিল তাঁর স্বভাব। তাই পিসতুতো বোন গেল চলে, কিন্তু পিসী রইলেন তার শোধ নিতে।

তারক শুধু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। রাখাল কহিল, ইতিমধ্যে চক্রান্ত যে কত নিবিড় ও হিংস্র হয়ে উঠছিল তারই খবর পেলাম অকস্মাৎ একদিন গভীর রাতে। কি একপ্রকার চাপা গলার কর্কশ কোলাহলে ঘুম ভেঙ্গে ঘরের বাইরে এসে দেখি সুমুখের ঘরের কবাটে বাইরে থেকে শেকল দেওয়া। উঠানের মাঝখানে গোটা পাঁচ-ছয় লণ্ঠন। বারান্দার একধারে বসে স্তব্ধ অধোমুখে ব্রজবাবু এবং সেই ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নবীনবাবু—কর্তার খুড়তুতো ছোটভাই—রুদ্ধদ্বারে অবিরত ধাক্কা দিয়ে কঠিনকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ হাঁকচেন রমণীবাবু, দোর খুলুন। ঘরটা আমরা দেখব। বেরিয়ে আসুন বলচি!

ইনি কলকাতার আড়ত থেকে হাজার কুড়ি-পঁচিশ টাকা উড়িয়ে কিছুকাল হ'ল বাড়িতে এসে বসেছেন।

বাড়ির মেয়েরা বারান্দার আশেপাশে দাঁড়িয়ে, মনে হল চাকররা কাছাকাছি কোথায় যেন আড়ালে অপেক্ষা করে আছে; ব্যাপারটা ঘুম-চোখে প্রথমটা ঠাওর পেলাম না, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত বুঝলাম। এখনি ভীষণ কি-একটা ঘটবে ভেবে ভয়ে সর্বাঙ্গ ঘামে ভেসে গেল, চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো; হয়ত মাথা ঘুরে সেইখানে পড়ে যেতাম কিন্তু তা আর হ'ল না। দোর খুলে রমণীবাবুর হাত ধরে নতুন-মা বেরিয়ে এলেন। বললেন, তোমরা কেউ এঁর গায়ে হাত দিয়ো না, আমি বারণ করে দিচ্ছি। আমরা এখুনি বাড়ি থেকে বার হয়ে যাচ্ছি।

হঠাৎ যেন একটা বজ্রাঘাত হয়ে গেল। এ কি সত্য সত্যই এ-বাড়ির নতুন-মা! কিন্তু তাঁদের অপমান করবে কি, বাড়িসুদ্ধ সকলে যেন লজ্জায় মরে গেল। যে-যেখানে ছিল সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে—তাঁরা সদর দরজা যখন পার হয়ে যান, কর্তা তখন অকস্মাৎ হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বললেন, নতুন-বৌ, তোমার রেণু রইল যে! কাল তাকে আমি কি দিয়ে বোঝাব!

নতুন-মা একটা কথাও বললেন না, নিঃশব্দে ধীরে ধীরে বার হয়ে গেলেন। সেদিন সেই রেণু ছিল তিন বছরের, আজ বয়স হয়েছে তার ষোল। এই তেরো বচ্ছর পরে আজ হঠাৎ দেখা দিলেন মা, মেয়েকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে।

এইবার এতক্ষণ পরে কথা কহিল তারক—নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আর এই তেরোটি বচ্ছর মেয়েকে মা চোখের আড়াল করেন নি। এবং শুধু মেয়েই নয়, খুব সম্ভব, তোমাদের কাউকেই না।

রাখাল কহিল, তাই তো মনে হচ্ছে ভাই। কিন্তু কখনো শুনেছো এমন ব্যাপার?

না শুনিনি, কিন্তু বইয়ে পড়েচি। একখানা ইংরিজী উপন্যাসের আভাস পাচ্চি। কেবল আশা করি উপসংহারটা যেন না আর তার মত হয়ে দাঁড়ায়।

রাখাল কহিল, নতুন-মার ওপর বোধ করি এখন তোমার ঘৃণা জন্মালো তারক?

তারক কহিল, জন্মানোই তো স্বাভাবিক রাখাল।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল। জবাবটা তাহার মনঃপূত হইল না, বরঞ্চ মনের মধ্যে গিয়া কোথায় যেন আঘাত করিল। খানিক পরে বলিল, এর পরে দেশে থাকা চলল না। ব্রজবাবু কলকাতায় এসে এবার বিবাহ করলেন,—সেই অবধি এখানেই আছেন।

আর তুমি?

রাখাল বলিল, আমিও সঙ্গে এলাম। পিসীমা তাড়াবার সুপারিশ করে বললেন, ব্রজ, সেই হতভাগীই এই বালাইটাকে জুটিয়ে এনেছিল। ওটাকে দূর করে দে।

নতুন-মার স্নেহের পাত্র বলে আমার 'পরে পিসীমা সদয় ছিলেন না।

ব্রজবাবু শান্ত মানুষ, কিন্তু কথা শুনে তাঁর চোখের কোণটা একটু রুক্ষ হয়ে উঠলো, তবু শান্তভাবেই বললেন, ওই ত তার রোগ ছিল পিসীমা। আপদ-বালাই ত আর একটি জুটোয় নি কেবল ও বেচারাকে তাড়ালেই কি আমাদের সুবিধে হবে?

পিসীমার নিজেদের কথাটা হয়ে গেছে তখন অনেকদিনের পুরনো—সে বোধ হয় আর মনে নেই। বললেন, তবে কি ওকে ভাত-কাপড় দিয়ে বরাবর পুষতেই হবে নাকি? না না, ও যেখানের মানুষ সেখানে যাক, ওর মুখ থেকে বাপ-মা মেয়ের কীর্তি-কাহিনী শুনুক। নিজেদের বংশ পরিচয়টা একটুখানি পাক।

ব্রজবাবু এবার একটুখানি হাসলেন, বললেন, ও ছেলেমানুষ, গুছিয়ে তেমন বলতে পারবে না পিসীমা, তার বরঞ্চ তুমি অন্য ব্যবস্থা করো।

জবাব শুনে পিসীমা রাগ করে চলে গেলেন, বলে গেলেন, যা ভাল বোঝ করো, আমি আর কিছুর মধ্যেই নেই।

নতুন মা যাবার পরে এ-বাড়িতে পিসীমার প্রভাবটা কিছু বেড়ে উঠেছিল। সবাই জানতো তাঁর বুদ্ধিতেই এতবড় অনাচারটা ধরা পড়েচে। এতকালের লক্ষ্মী-শ্রী ত যেতেই বসেছিল। নবীনবাবুর দরুন যে কারবারের লোকসান, তার মূলেও দাঁড়ালো এই গোপন পাপ। নইলে কৈ এমন মতি-বুদ্ধি ত নবীনের আগে হয়নি! পিসীমা বলতেও আরম্ভ করেছিলেন তাই। বলতেন, ঘরের লক্ষ্মীর সঙ্গে যে এ-সব বাঁধা। তিনি চঞ্চল হলে যে এমন হতেই হবে? হয়েছেও তাই।

তারক অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় এসে ওঁদের বাড়িতেই কি তুমি থাকতে?

হ্যাঁ, প্রায় বছর-দশেক।

চলে এলে কেন?

রাখাল ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, আর সুবিধে হ'ল না।

তার বেশী আর বলতে চাও না?

রাখাল আবার কিছুক্ষণ মৌণ থাকিয়া কহিল, বলে লাভও নেই, লজ্জাও করে।

তারক আর জানিতে চাহিল না, চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে বলিল, তোমার নতুম-মা যে তোমাকে এতবড় একটা ভার দিয়ে গেলেন তার কি? যাবে না একবার ব্রজবাবুর ওখানে?

সেই কথাই ভাবছি। না হয় কাল—

কাল? কিন্তু তিনি যে বলে গেলেন আজ রাত্রেই আবার আসবেন, তখন কি তাঁকে বলবে?

রাখাল হাসিয়া মাথা নাড়িল।

তারক প্রশ্ন করিল, মাথা নাড়ার মানে? বলতে চাও তিনি আসবেন না?

তাই ত মনে হয়। অন্ততঃ অতরাত্রে আসতে পারা সম্ভবপর মনে করিনে।

এবার তারক অধিকতর গম্ভীর হইয়া বলিল, আমি করি। সম্ভব না হলে তিনি কিছুতে বলতেন না। আমার বিশ্বাস তিনি আসবেন, এবং ঠিক এগারোটাতেই আসবেন। কিন্তু তখন তোমার আর কোন জবাব থাকবে না।

কেন?

কেন কি? তাঁর এতবড় দুশ্চিন্তাকে অগ্রাহ্য করে তুমি একটা পা-ও বাড়াও নি এ কথা তুমি উচ্চারণ করবে কোন্ মুখে? সে হবে না রাখাল, তোমাকে যেতে হবে।

রাখাল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, আমি গেলেও কিছু হবে না তারক। আমার কথা ও-বাড়ির কেউ কানেও তুলবে না।

তার কারণ?

কারণ, পাগল-বরের পক্ষেও যেমন এক মামা কর্তা আছেন, কনের দিকেও তেমনি আর এক মামা বিদ্যমান, ব্রজবাবুর এ পক্ষের বড় কুটুম। অতি শক্তিমান পুরুষ। বস্তুতঃ সে মামার কর্তৃত্বের বহর জানিনে, কিন্তু এ মামার পরাক্রম বিলক্ষণ জানি। বাল্যকালে পিসীমার অতবড় সুপারিশেও আমাকে নড়াতে পারেনি, এঁর চোখের একটা ইশারার ধাক্কা সামলানো গেল না, পুঁটুলি হাতে বিদায় নিতে হ'ল। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, ভগবান জুটিয়েছেন ভালো। না ভাই বন্ধু, আমি অতি নিরীহ মানুষ-ছেলে পড়াই, রাঁধি-বাড়ি, খাই, বাসায় এসে শুয়ে পড়ি। ফুরসত পেলে অবলা সবলা নির্বিচারে বড়লোকের ফাই-ফরমাস খাটি—বকশিশের আশা করিনে—সে-সব ভাগ্যবানদের জন্যে। নিজেদের কপালের দৌড় ভাল করেই জেনে রেখেচি—ওতে দুঃখও নেই, একরকম সয়ে গেছে। দিন মন্দ কাটে না, কিন্তু তাই বলে মল্লভূমি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মামায়-মামায় কুস্তি লড়িয়ে তার বেগ সংবরণ করতে পারবো না।

শুনিয়া তারক হাসিয়া ফেলিল। রাখালকে সে যতটা হাবা-বোকা ভাবিত, দেখিল তাহা নয়। জিজ্ঞাসা করিল, দু-পক্ষেই মামা রয়েছে বলে মল্লযুদ্ধ বাধবে কেন?

রাখাল কহিল, তা হলে একটু খুলে বলতে হয়। মামামশায় আমাকে বাড়িটা ছাড়িয়েছেন, কিন্তু তার মায়াটা আজও ঘোচাতে পারেন নি, কাজেই অল্পস্বল্প খবর এসে কানে পৌঁছয়। শোনা গেল, ভগিনীপতির কন্যাদায়ে শ্যালকের আরামেই বেশী বিঘ্ন ঘটাচ্ছে—এ ঘটকালিও তাঁর কীর্তি। সুতরাং, এ-ক্ষেত্রে আমাকে দিয়ে বিশেষ কিছু হবে না, এবং সম্ভবতঃ কাউকে দিয়েই না। পাকা-দেখা, আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্যন্ত হয়ে গেছে, অতএব এ বিবাহ ঘটবেই।

তারক কহিল, অর্থাৎ, ও-পক্ষের মামাকে কন্যার মায়ের কাহিনী শোনাতেই হবে ; এবং তার পরে ঘটনাটা মুখে মুখে বিস্তারিত হতেও বিলম্ব ঘটবে না, এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল ও-মেয়ের ভালো-ঘরে আর বিয়েই হবে না।

রাখাল বলিল, আশঙ্কা হয় শেষ পর্যন্ত এমনিই কিছু-একটা দাঁড়াবে।

কিন্তু মেয়ের বাপ ত আজও বেঁচে আছেন?

না, বাপ বেঁচে নেই, শুধু ব্রজবাবু বেঁচে আছেন।

তারক ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, রাখাল, চলো না একবার যাই, বাপটা একেবারেই মরেচে, না লোকটার মধ্যে এখনো কিছু বাকী আছে, দেখে আসি গে।

তুমি যাবে?

ক্ষতি কি? বলবে ইনি পাত্রের প্রতিবেশী—অনেক কিছুই জানেন।

রাখল হাসিয়া বলিল, ভালো বুদ্ধি। প্রথমতঃ, সে সত্যি নয়, দ্বিতীয়তঃ জেরার দাপটে তোমার গোলমেলে উত্তরে তাঁদের ঘোর সন্দেহ হবে তুমি পাড়ার লোক, ব্যক্তিগত শত্রুতা-বশে ভাংচি দিতে এসেচো। তাতে কার্যসিদ্ধি ত হবেই না বরঞ্চ উলটো ফল দাঁড়াবে।

তাইতো! তারক মনে মনে আর একবার রাখালের সাংসারিক বুদ্ধির প্রশংসা করিল, বলিল, সে ঠিক। আমাদের জেরায় ঠকতে হবে। নতুন-মার কাছে আরও বেশী খবর জেনে নেওয়া উচিত ছিল। বেশ, আমাকে তোমার একজন বন্ধু বলেই পরিচয় দিও।

হ্যাঁ, দিতে হলে তাই দেবো।

তারক বলিল, এ-বিয়ে বন্ধ করার চেষ্টায় তোমার সাহায্য করি এই আমার ইচ্ছে। আর কিছু না পারি, এই মামাটিকে একবার চোখে দেখেও আসতে পারবো। আর অদৃষ্ট প্রসন্ন হলে শুধু

ব্রজবাবুই নয়, তাঁর তৃতীয় পক্ষেরও হয়তো দেখা মিলে যেতে পারে।

রাখাল বলিল, অন্ততঃ অসম্ভব নয়।

তারক প্রশ্ন করিল, এই মহিলাটি কেমন রাখাল?

রাখাল কহিল, বেশ ফরসা মোটা-সোটা পরিপুষ্ট গড়ন, অবস্থাপন্ন বাঙালী-ঘরে একটু বয়স হলেই ওঁরা যেমনটি হয়ে ওঠেন তেমনি।

কিন্তু মানুষটি?

মানুষটি ত বাঙালী-ঘরের মেয়ে। সুতরাং, তাঁদেরই আরও দশজনের মতো। কাপড়-গয়নায় প্রগাঢ় অনুরাগ, উৎকট ও অন্ধ সন্তান-বাৎসল্য, পরদুঃখে সকাতর অশ্রুবর্ষণ, দু-আনা চার-আনা দান এবং পরক্ষণেই সমস্ত বিস্মরণ। স্বভাব মন্দ নয়,—ভালো বললেও অপরাধ হয় না। অল্পসল্প ক্ষুদ্রতা, ছোটখাটো উদারতা, একটু-আধটু—

তারক বাধা দিল—থামো থামো। এ-সব কি তুমি ব্রজবাবুর স্ত্রীর উদ্দেশেই শুধু বলচো, না সমস্ত বাঙালী-মেয়েদের লক্ষ্য করে যা মুখে আসচে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্চো,—কোন্‌টা?

রাখাল বলিল, দুটোই রে ভাই দুটোই। শুধু তাৎপর্য; গ্রহণ শ্রোতার অভিজ্ঞতা ও অভিরুচিসাপেক্ষ।

শুনিয়া তারক সত্যই বিস্মিত হইল, কহিল, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমার মনে মনে যে এতটা উপেক্ষা আমি জানতাম না। বরঞ্চ ভাবতাম যে—

রাখল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, ঠিকই ভাবতে ভাই, ঠিকই ভাবতে। এতটুকু উপেক্ষা করিনে। ওঁরা ডাকলেই ছুটে যাই, না ডাকলেও অভিমান করিনে, শুধু দয়া করে খাটালেই নিজেকে ধন্য মানি। মহিলারা অনুগ্রহও করেন যথেষ্ট, তাঁদের নিন্দে করতে পারবো না।

তারক বলিল, অনুগ্রহ যাঁরা করেন তাঁদের একটু পরিচয় দাও ত শুনি।

রাখাল বলিল, এইবারেই ফেললে মুশকিলে। জেরা করলেই আমি ঘাবড়ে উঠি। এ-বয়সে দেখলাম শুনলাম অনেক, সাক্ষাৎ-পরিচয়ও বড় কম নেই, কিন্তু এমনি বিশ্রী স্মরণ-শক্তি যে কিছুই মনে থাকে না। না তাঁদের বাইরের চেহারা, না তাঁদের অন্তরের। সামনে বেশ কাজ চলে, কিন্তু একটু আড়ালে এসেই সব চেহারা লেপেমুছে একাকার হয়ে যায়। একের সঙ্গে অন্যর প্রভেদ ঠাউরে পাইনে।

তারক কহিল, আমরা পল্লীগ্রামের লোক, পাড়ার আত্মীয়-প্রতিবেশীর ঘরের দু'চারটি মহিলা ছাড়া বাইরের কাউকে চিনিও নে, জানিও নে। মেয়েদের সম্বন্ধে আমাদের এই ত জ্ঞান। কিন্তু এই প্রকাণ্ড শহরের কত নতুন, কত বিচিত্র—

রাখাল হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, কিছু চিন্তা করো না তারক, আমি হদিশ বাত্‌লে দেব। পাড়াগাঁয়ের বলে যাঁদের অবজ্ঞা করচো কিংবা মনে মনে যাঁদের সম্বন্ধে ভয় পাচ্চো, তাঁদেরকেই শহরে এনে পাউডার রুজ প্রভৃতি একটু চেপে মাখিয়ে মাস-দুই খানকয়েক বাছা বাছা নাটক-নভেল এবং সেইসঙ্গে গোটা-পাঁচেক চলতি চালের গান শিখিয়ে নিও—ব্যস্‌! ইংরেজী জানে না? না জানুক, আগাগোড়া বলতে হয় না, গোটা-কুড়ি ভব্য কথা মুখস্ত করতে পারবে তো? তা হলেই হবে। তার পরে—

তারক বিরক্ত হইয়া বাধা দিল—তার পরেতে আর কাজ নেই রাখাল, থাক। এখন বুঝতে পারছি কেন তোমার গা নেই। ঐ মেয়েটির যেখানে যার সঙ্গেই বিয়ে হোক, তোমার কিছুই যায় আসে না। আসলে ওদের প্রতি তোমার দরদ নেই।

রাখাল সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, দরদ হবে কি করে বলে দিতে পারো?

পারি। নির্বিচারে মেলামেশাটা একটু কম করো—যা হারিয়েছো তা হয়তো একদিন ফিরে পেতেও পারো। আর কেবল এইজন্যেই নতুন-মার অনুরোধ তুমি স্বচ্ছন্দে অবহেলা করতে পারলে।

রাখাল মিনিট-খানেক নিঃশব্দে তারকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পরিহাসের

ভঙ্গীটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া আসিল, বলিল, এইবার ভুল হলো। কিন্তু তোমার আগের কথাটায় হয়তো কিছু সত্যি আছে,—ওদের অনেকের অনেক-কিছু জানতে পারায় লাভের চেয়ে বোধ হয় ক্ষতিই হয় বেশী। এখন থেকে তোমার কথা শুনবো। কিন্তু যাঁদের সম্বন্ধে তোমাকে বলছিলাম তাঁরা সাধারণ মেয়ে—হাজারের মধ্যে ন'শ নিরাইব্বই। তাঁর মধ্যে নতুন-মা নেই। কারণ, ঐ যে একটি বাকী রইলেন তিনিই উনি। ওঁকে অবহেলা করা যায় না, ইচ্ছে করলেও না। কিসের জন্যে আজ তুমি বর্ধমান যেতে পারচো না, সে তুমি জানো না, কিন্তু আমি জানি। কিসের তাগাদায় ঠেলেঠুলে আমাকে এখুনি পাঠাতে চাও মামাবাবুর গহ্বরে, তার হেতু তোমার কাছে পরিষ্কার নয়। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি, ওর বিগত ইতিহাস শুনে ঐ যে কি না বলছিলে তারক, অমন স্ত্রীলোককে ঘৃণা করাই স্বাভাবিক—তোমার ঐ মতটি আর একদিন বদলাতে হবে। ওতে চলবে না।

তারক মুখে হাসি আনিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, না চললে জানাবো। কিন্তু ততক্ষণ নিজের কথা অপরের চেয়ে যে বেশী জানি, এটুকু দাবী করলে রাগ করো না রাখাল। কিন্তু এ তর্কে লাভ নেই ভাই—এ থাক। কিন্তু, তোমার কাছে যে আজ পর্যন্ত একটি নারীও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে টিকে আছেন এ মস্ত আশার কথা। কিন্তু আমরা ওঁর নাগাল পাবো না রাখাল, আমরা তোমার ঐ একটিকে বাদ দিয়ে বাকী ন'শ নিরানব্বইয়ের ওপরেই শ্রদ্ধা বাঁচিয়ে যদি চলে যেতে পারি, তাতেই আমাদের মতো সামান্য মানুষে ধন্য হয়ে যাবে।

রাখাল তর্ক করিল না—জবাব দিল না। কেবল মনে হইল সহসা সে যেন একটুখানি বিমনা হইয়া গেছে।

কি হে, যাবে?

চলো।

গিয়ে কি বলবে?

মোটের উপর যা সত্যি তাই। বলবো বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাওয়া গেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সেই ভালো।

দুই বন্ধু উঠিয়া পড়িল। রাখাল দরজায় তালা বন্ধ করিয়া যুক্তপাণি কপালে ঠেকাইয়া বলিল, দুর্গা! দুর্গা! অতঃপর উভয়ে ব্রজবাবুর বাটীর উদ্দেশে যাত্রা করিল।

তারক হাসিয়া কহিল, আজ কোন কাজই হবে না। নামের মাহাত্ম্য টের পাবে।

তিন

পরদিন অপরাহ্নের কাছাকাছি দুই বন্ধু চায়ের সরঞ্জাম সম্মুখে লইয়া টেবিলে আসিয়া বসিল। টি-পটে চায়ের জল তৈরি হইয়া উঠিতে বিলম্ব দেখিয়া রাখাল চামচে ডুবাইয়া ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগিল।

তারক কহিল, নামের মাহাত্ম্য দেখলে তো?

রাখাল বলিল, অবিশ্বাস করে মা-দুর্গাকে তুমি খামকা চটিয়ে দিলে বলেই তো যাত্রাটা নিষ্ফল হল,—নইলে হতো না।

প্রতিবাদে তারক শুধু হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

সত্যই কাল কাজ হয় নাই। ব্রজবাবু বাড়ি ছিলেন না, কোথায় নাকি নিমন্ত্রণ ছিল, এবং মামাবাবু কিঞ্চিৎ অসুস্থ থাকায় একটু সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখাল বাটীর মধ্যে দেখা করিতে গেলে, সে যে এখনো তাঁহাদের মনে রাখিয়াছে এই বলিয়া ব্রজবাবুর স্ত্রী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ফিরিবার সময়ে অন্যর চোখের অন্তরালে রেণুও আসিয়া মৃদুকণ্ঠে ঠিক এই মর্মেই অনুযোগ জানাইয়াছিল।

তোমার বাবাকে বলতে ভুলো না যে, আমি সন্ধ্যার পরে কাল আবার আসবো। আমার বড় দরকার।

আচ্ছা, কিন্তু চাকরদেরও বলে যাও।

সুতরাং ব্রজবাবুর নিজস্ব ভৃত্যটিকেও এ কথা রাখাল বিশেষ করিয়া জানাইয়া আসিয়াছিল কিন্তু যথাসময়ে বাসায় পৌঁছিতে পারে নাই। আসিয়া দেখিল দরজার কড়ায় জড়ানো একটুকরো কাগজ, তাহাতে পেন্সিলে লেখা—আজ দেখা হলো না, কাল বৈকাল পাঁচটায় আসবো। ন-মা।

আজ সেই পাঁচটার আশাতেই দুই বন্ধুতে পথ চাহিয়া আছে। কিন্তু এখনো তার মিনিট-কুড়ি বাকী। তারক তাগাদা দিয়া কহিল, যা হয়েছে ঢালো। তাঁর আসবার আগে এ-সমস্ত পরিষ্কার করে ফেলা চাই।

কেন? মানুষে চা খায় এ কি তিনি জানেন না?

দেখো রাখাল, তর্ক করো না। মানুষে মানুষের অনেক-কিছু জানে, তবু তার কাছেই অনেক-কিছু সে আড়াল করে। গরু-বাছুরের এ প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া এ-গুলোই বা কি? এই বলিয়া অ্যাশ-ট্রে সমেত সিগারেটের টিনটা তুলিয়া ধরিল। বলিল, পৌরুষ করে এ-ও তাঁকে দেখাতে হবে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিল—দেখে ফেললেও তোমার ভয় নেই, তারক, অপরাধী যে কে তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন।

তারক খোঁচাটা অনুভব করিল। বিরক্তি চাপিয়া বলিল, তাই আশা করি। তবু আমাকে ভুল বুঝলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু একদিন যাকে মানুষ করে তুলেছিলেন তাকে বুঝতে না পারলে তাঁর অন্যায় হবে।

রাখাল কিছুমাত্র রাগ করিল না, হাসিমুখে নিঃশব্দে চা ঢালিতে প্রবৃত্ত হইল।

তারক চা খাইতে আরম্ভ করিয়া মিনিট-দুই পরে কহিল, হঠাৎ এমন চুপচাপ যে?

কি করি? তিনি আসবার আগে সেই ন'শ নিরানব্বইয়ের ধাক্কাটা মনে মনে একটু সামলে রাখচি ভাই, বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিল।

শুনিয়া তারকের গা জ্বলিয়া গেল। কিন্তু, এবার সেও চুপ করিয়া রহিল।

চা খাওয়া সমাপ্ত হইলে সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দুজনে প্রস্তুত হইয়া রহিল। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল। ক্রমশঃ পাঁচ দশ, পনেরো মিনিট অতিক্রম করিয়া ঘড়ির কাঁটা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাঁহার দেখা নাই। উন্মুখ অধীরতায় সমস্ত ঘরটা যে ভিতরে ভিতরে কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও পরস্পরের কাছে অবিদিত নাই ; এমনি সময়ে সহসা তারক বলিয়া উঠিল, এ কথা ঠিক যে তোমার নতুন-মা অসাধারণ স্ত্রীলোক।

রাখাল অতি বিস্ময়ে অবাক হইয়া বন্ধুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

তারক বলিল, নারীর এমনি ইতিহাস শুধু বইয়ে পড়েচি, কিন্তু চোখে দেখিনি। যাঁদের চিরদিন দেখে এসেচি তাঁরা ভালো, তাঁরা সতী-সাধ্বী, কিন্তু ইনি যেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইবার আর অবসর পাইল না।

রাজু আসতে পারি বাবা?

উভয়েই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাখাল দ্বারের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল, কহিল, আসুন।

তারক ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু তখনি পায়ের কাছে আসিয়া সে-ও নমস্কার করিল।

সকলে বসিবার পরে রাখাল বলিল, কাল সবদিক দিয়েই যাত্রা হোলো নিষ্ফল ; কাকাবাবু বাড়ি নেই, মামাবাবু গুরুভোজনে অসুস্থ এবং শয্যাগত, আপনাকে নিরর্থক ফিরে যেতে হয়েছিল ; কিন্তু এর জন্যে আসলে দায়ী হচ্ছে তারক। ওকে এইমাত্র তার জন্যে আমি ভর্ৎসনা করছিলাম। খুব সম্ভব অপরাধের গুরুত্ব বুঝে ও অনুতপ্ত হয়েছে। না দেবে ও মা-দুর্গাকে রাগিয়ে, না হবে আমাদের যাত্রা পণ্ড।

তারক ঘটনাটি খুলিয়া বলিল।

নতুন-মা হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, তারক বুঝি এসব বিশ্বাস করো না?

বিশ্বাস করি বলেই তো ভয় পেয়েছিলাম, আজ বোধ হয় কিছু আর হবে না।

তাহার জবাব শুনিয়া নতুন-মা হাসিতে লাগিলেন ; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কারু সঙ্গেই দেখা হলো না?

রাখাল কহিল, তা হয়েছে মা। বাড়ির গিন্নী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পথ ভুলে এসেছি কিনা। ফেরবার মুখে রেণুও ঠিক ঐ নালিশই করলে। অবশ্য আড়ালে। তাকেই বলে এলাম বাবাকে জানাতে আমি আবার কাল সন্ধ্যায় আসবো, আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। জানি, আর যেই বলতে ভুলুক, সে ভুলবে না।

তোমরা আজ আবার যাবে?

হাঁ, সন্ধ্যার পরেই।

ওরা সবাই বেশ ভালো আছে?

তা আছে।

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া মনের অনেক দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটাইয়া বলিলেন, রেণু কেমনটি দেখতে হয়েছে রাজু?

রাখাল বিস্ময়াপন্ন মুখে প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল প্রশ্নটি ত শুধু বাহুল্য নয়, মা,—হলো অন্যায়। নতুন-মার মেয়ে দেখতে কেমন হওয়া উচিত এ কি আপনি জানেন না? তবে রংটা বোধ হয় একটুখানি বাপের ধার ঘেঁষে গেছে—ঠিক স্বর্ণ-চাঁপা বলা চলে না। বলুন, তাই কি নয় নতুন-মা?

মেয়ের কথায় মায়ের দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল ; দেওয়ালের ঘড়ির দিকে একমুহূর্ত মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাদের বার হবার সময় বোধ হয় হয়ে এলো।

না, এখনো ঘণ্টা দুই দেরি।

তারক গোড়ায় দুই-একটা ছাড়া আর কথা কহে নাই, উভয়ের কথোপকথন মন দিয়া শুনিতেছিল। যে অজানা মেয়েটির অশুভ, অমঙ্গলময় বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিবার সঙ্কল্প তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, সে কেমন দেখিতে, জানিতে তাহার আগ্রহ ছিল, কিন্তু ব্যগ্রতা ছিল না ; কিন্তু এই যে রাখাল বর্ণনা করিল না, শুধু অনুযোগের কণ্ঠে মেয়েটির রূপের ঈঙ্গিত করিল, সে যেন তাহার অন্ধকার অবরুদ্ধ মনের দশ দিকের দশখানা জানালা খুলিয়া আলোকে আলোকে চকিত চঞ্চল করিয়া দিল। এতক্ষণ সে যেন দেখিয়াও কিছু দেখে নাই, এখন মায়ের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

নতুন-মার বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। রূপে খুঁত নাই তা নয়, সুমুখের দাঁত-দুটি উঁচু তাহা কথা কহিলেই চোখে পড়ে। বর্ণ সত্যই স্বর্ণ-চাঁপার মতো, কিন্তু হাত-পায়ের গড়ন ননী-মাখনের সহিত কোনমতেই তুলনা করা চলে না। চোখ দীর্ঘায়ত নয়, নাকও বাঁশী বলিয়া ভুল হওয়া অসম্ভব ; কিন্তু একহারা দীর্ঘচ্ছন্দ দেহে সুষমা ধরে না। কোথায় কি আছে না জানিয়া অত্যন্ত সহজে মনে হয় প্রচ্ছন্ন মর্যাদার এই পরিণত নারী-দেহটি যেন কানায়-কানায় পরিপূর্ণ। আর সবচেয়ে চোখে পড়ে নতুন-মার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর। মাধুর্যের যেন অন্ত নাই।

তারকের চমক ভাঙ্গিল নতুন-মার জিজ্ঞাসায়। তিনি হঠাৎ যেন ব্যাকুল হইয়া প্রশ্ন করিলেন, রাজু, তোমার কি মনে হয় বাবা, এ বিয়ে বন্ধ করতে পারবে?

সে-কথা তো বলা যায় না মা।

তোমার কাকাবাবু কি কিছুই দেখবেন না? কোন কথাই কানে তুলবেন না?

রাখাল বলিল, চোখ-কান তো তাঁর আর নেই মা। তিনি দেখেন মামাবাবুর চোখে, শোনেন গিন্নীর কানে। আমি জানি এ বিয়ের সম্বন্ধ তাঁরাই করেছেন।

কর্তা তবে কি করেন?

যা চিরদিন করতেন—সেই গোবিন্দজীর সেবা। এখন শুধু তার উগ্রতা বেড়ে গেছে শতগুণে। দোকানে যাবারও বড় সময় পান না। ঠাকুরঘর থেকে বার হতেই বেলা পড়ে আসে।

তবে বিষয়-আশয়, করবার, ঘর-সংসার দেখে কে?

কারবার দেখেন মামা, আর সংসার দেখেন তাঁর মা—অর্থাৎ শাশুড়ী। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করে লাভ কি বলুন, কিছুই আপনার অজানা নয়। একটু থামিয়া বলিল, আমরা আজও যাবো সত্যি, কিন্তু তাঁর নিশ্চিত পরিণামও আপনার জানা নতুন-মা!

নতুন-মা চুপ করিয়া রহিলেন, শুধু মুখ দিয়া একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল। বোধ হয় নিরুপায়ের শেষ মিনতি।

হঠাৎ শোনা গেল বাহিরে কে যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, ওহে ছেলে, এইটি রাজু বাবুর ঘর?

বালক-কণ্ঠে জবাব হইল, না মশাই, রাখালবাবুর বাসা।

হাঁ হাঁ, তাকেই খুঁজচি। এই বলিয়া এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিলেন, রাজু আছো? বাঃ—এই তো হে! রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই সরল স্নিগ্ধ-হাস্যে গৃহের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, ভেবেছিলাম বুঝি খুঁজেই পাবো না। বাঃ—দিব্যি ঘরটি তো!

হঠাৎ শেল্‌ফের ঈষৎ অন্তরালবর্তিনী মহিলাটির প্রতি দৃষ্টি পড়ায় একটু বিব্রত বোধ করিলেন, পিছু হটিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া কিন্তু স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কয়েক মুহূর্ত নিরীক্ষণ করার পরে বলিলেন, নতুন-বৌ না? বলিয়াই ঘাড় ফিরাইয়া তিনি রাখালের প্রতি চাহিলেন।

একটা কঠিনতম অবমাননার মর্মন্তুদ দৃশ্য বিদ্যুদ্বেগে রাখালের মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া মুখ তাহার মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া গেল। তারক ব্যাপরাটা আন্দাজ করিয়াও করিতে পারিল না, তথাপি অজানা ভয়ে সে-ও হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। ভদ্রলোক পর্যায়ক্রমে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন—তোমরা করছিলে কি? ষড়যন্ত্র? গুলির আড্ডায় কনস্টেবল ঢুকে পড়লেও ত তারা এতো আঁতকে ওঠে না। হয়েচে কি? নতুন-বৌ ত?

মহিলা চৌকি ছাড়িয়া দূর হইতে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, হাঁ, আমি নতুন-বৌ।

বসো, বাসো। ভালো আছো? বলিয়া তিনি নিজেই অগ্রসর হইয়া চৌকি টানিয়া উপবেশন করিলেন; বলিলেন, নতুন-বৌ, আমার রাজুর মুখের পানে একবার চেয়ে দেখো। ও বোধ হয় ভাবলে আমি চিনতে পারামাত্র তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করে এক ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়ে দেবো। ওর ঘরে জিনিসপত্র আর থাকবে না, ভেঙ্গে তচনচ হয়ে যাবে।

তাঁহার বলার ভঙ্গীতে শুধু কেবল তারক ও রাখালই নয়, নতুন-মা পর্যন্ত মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তারক এতক্ষণে নিঃসন্দেহে বুঝিল ইনিই ব্রজবাবু। তাহার আনন্দ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না।

ব্রজবাবু অনুরোধ করিলেন, দাঁড়িয়ে থেকো না নতুন-বৌ, বসো।

তিনি ফিরিয়া আসিয়া বসিলে ব্রজবাবু বলিতে লাগিলেন, পরশু রেণুর বিয়ে। ছেলেটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর, লেখাপড়া করেচে—আমাদের জানা ঘর। বিষয়-সম্পত্তি টাকা-কড়িও মন্দ নেই। এই কলকাতা শহরেই খান-চারেক বাড়ি আছে। এ-পাড়া ও-পাড়া বললেই হয়, যখন ইচ্ছে মেয়ে-জামাইকে দেখতে পাওয়া যাবে। মনে হয় ত সকল দিকেই ভালো হলো।

একটু থামিয়া বলিলেন, আমাকে তো জানোই নতুন-বৌ, সাধ্যি ছিল না নিজে এমন পাত্র খুঁজে বার করি। সবই গোবিন্দর কৃপা। এই বলিয়া তিনি ডান হাতটা কপালে ঠেকাইলেন।

কন্যার সুখ-সৌভাগ্যের সুনিশ্চিত পরিণাম কল্পনায় উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সমস্ত মুখ স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, একটা তিক্ত ও একান্ত অপ্রীতিকর বিরুদ্ধ প্রস্তাবে এই মায়াজাল তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইল না।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমাদের রাখাল-রাজকে ত আর চিঠিতে নিমন্ত্রণ করা যায় না, ওকে নিজে গিয়ে ধরে আনতে হবে। ও ছাড়া আমার করবে কর্মাবেই বা কে। কাল রাত্রে ফিরে গিয়ে রেণুর

মুখে যখন খবর পেলাম রাজু এসেছিলো কিন্তু দেখা হয়নি—তার বিশেষ প্রয়োজন, কাল সন্ধ্যায় আবার আসবে—তখনি স্থির করলাম এ সুযোগ আর নষ্ট হতে দিলে চলবে না—যেমন করে হোক খুঁজে-পেতে তার বাসায় গিয়ে আমাকে ঐ ত্রুটি সংশোধন করতেই হবে। তাই দুপুরবেলায় আজ বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম মনে নেই, আমার এক-কাজে কেবল দু-কাজ নয়, আমার সকল কাজ আজ সম্পূর্ণ হলো।

স্পষ্টই বুঝা গেল তাঁহার ভাগ্য-বিড়ম্বিতা একমাত্র কন্যার বিবাহ ব্যাপারটিকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এ কথা উচ্চারণ করিয়াছেন। মেয়েটা যেন তাহার অপরিজ্ঞাত জীবন-যাত্রার পূর্বক্ষণে জননীর অপ্রত্যাশিত আশীর্বাদ লাভ করিল।

রাখাল অত্যন্ত নিরীহের মত মুখ করিয়া কহিল, বেরোবার সময় মামাবাবু ছিলেন বলে কি মনে পড়ে?

কেন বলো তো?

তিনি ভাগ্যবান লোক, বেরোবার সময়ে তাঁর মুখ দেখে থাকলে হয়তো—

ওঃ—তাই। ব্রজবাবু হাসিয়া উঠিলেন।

নতুন-মা রাখালের মুখের প্রতি অলক্ষ্যে একটুখানি চাহিয়াই মুখ ফিরাইলেন। তাঁহার হাসির ভাবটা ব্রজবাবুর চোখ এড়াইল না, বলিলেন, রাজু, কথাটা তোমার ভালো হয়নি। যাই হোক, সম্পর্কে তিনি নতুন-বৌয়েরও ভাই হন ; ভাইয়ের নিন্দে বোনেরা কখনো সইতে পারে না। উনি বোধ করি, মনে মনে রাগ করলেন।

রাখাল হাসিয়া ফেলিল। ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, অসঙ্গত নয়, রাগ করারই কথা কিনা।

তারকের সহিত এখনো তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই ; লোভটা সে সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল, আজ বার হবার সময়ে আপনি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেন নি নিশ্চয়ই?

ব্রজবাবু প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন, কৈ না! অভ্যাস-মতো আমি গোবিন্দ স্মরণ করি, আজও হয়তো তাঁকেই ডেকে থাকব।

তারক কহিল, তাতেই যাত্রা সফল হয়েছে, ও-নামটা করলে শুধু-হাতে ফিরতে হতো।

ব্রজবাবু তথাপি তাৎপর্য বুঝিতে পারলেন না, চাহিয়া রহিলেন। রাখাল তারকের পরিচয় দিয়া কালকের ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, ওর মতে দুর্গা নামে কার্য পণ্ড হয়। কালকে যে আপনার দেখা না পেয়ে আমাদের বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছিল, তার কারণ বার হবার সময় আমি দুর্গা নাম উচ্চারণ করেছিলাম। হয়তো এ-রকম দুর্ভোগ ওর কপালে পূর্বেও ঘটে থাকবে, তাই ও-নামটার ওপরেই তারক চটে আছে।

শুনিয়া ব্রজবাবু প্রথমটা হাসিলেন, পরে হঠাৎ ছদ্মগাম্ভীর্যে মুখখানা অতিশয় ভারী করিয়া বলিলেন, হয় হে রাখাল-রাজ হয়—ওটা মিথ্যে নয়। সংসারে নাম ও দ্রব্যের মহিমা কেউ আজও সঠিক জানে না। আমিও এখজন রীতিমত ভুক্তভোগী। 'ফুট-কড়াই' নাম করলে আর আমার রক্ষে নেই।

জিজ্ঞাসু-মুখে সকলেই চোখ তুলিয়া চাহিল, রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল, কিসে? ব্রজবাবু বলিলেন, তবে ঘটনাটা বলি শোনো। ব্রজবিহারী ব'লে ছেলেবেলায় আমার ডাক-নাম ছিল বলাই। ভয়ানক ফুট-কড়াই খেতে ভালোবাসতাম। ভুগতামও তেমনি। আমার এক দূর-সম্পর্কের ঠাকুরমা সাবধান করে বলতেন—

বলাই, কলাই খেয়ো না—

জানলা ভেঙ্গে বৌ পালাবে দেখতে পাবে না।

ভেবে দেখ দিকি, ছেলেবেলার ফুট-কড়াই খাওয়ায় বুড়ো-বয়সে আমার কি সর্বনাশ হলো! এ কি দ্রব্যের দোষ-গুণের একটা বড় প্রমাণ নয়? যেমন দ্রব্যের, তেমনি নামেরও আছে বৈ কি।

তারক ও রাখাল লজ্জায় অধোবদন হইল। নতুন-মা ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া চাপা ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, ছেলেদের সামনে এ তুমি করচ কি?

কেন? ওদের সাবধান করে দিচ্ছি। প্রাণ থাকতে যেন কখনো ওরা ফুট-কড়াই না খায়।

তবে তাই করো, আমি উঠে যাই।

ঐ তো তোমার দোষ নতুন-বৌ, চিরকাল কেবল তাড়াই লাগাবে আর রাগ করবে, একটা সত্যি কথা কখনো বলতে দেবে না। ভাবলাম, আসল দোষটা যে সত্যিই কার, এতকাল পরে খবরটা পেলে তুমি খুশী হয়ে উঠবে—তা হলো উল্টো।

নতুন-মা হাতজোড় করিয়া কহিলেন, হয়েছে,—এবার তুমি থামো। রাজু?

রাখাল মুখ তুলিয়া চাহিল।

নতুন-মা বলিলেন, তুমি যে জন্যে কাল গিয়েছিলে ওঁকে বলো।

রাখাল একবার ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু ইঙ্গিতে পুনশ্চ সুস্পষ্ট আদেশ পাইয়া বলিয়া ফেলিল, কাকাবাবু, রেণুর বিবাহ তো ওখানে কোনমতেই হতে পারে না।

শুনিয়া ব্রজবাবু এবার বিস্ময়ে সোজা হইয়া বসিলেন, তাঁহার রহস্য-কৌতুকের ভাবটা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল, বলিলেন কেন পারে না?

রাখাল কারণটা খুলিয়া বলিল।

কে তোমাকে বললে?

রাখাল ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, নতুন-মা।

ওঁকে কে বললে?

আপনি ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন।

ব্রজবাবু স্তব্ধভাবে বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, নতুন-বৌ, কথাটা কি সত্যি?

নতুন-মা ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ, সত্য।

ব্রজবাবুর চিন্তার সীমা রহিল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে বলিলেন, তা হলেও উপায় নেই। রেণুর আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদ পর্যন্ত হয়ে গেছে, পরশু বিয়ে, একদিনের মধ্যে আমি পাত্র পাবো কোথায়?

নতুন-মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, তুমি তো নিজে পাত্র খুঁজে আনোনি মেজকর্তা, যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের হুকুম করো।

ব্রজবাবু বলিলেন, তারা শুনবে কেন? তুমি তো জানো নতুন-বৌ, হুকুম করতে আমি জানিনে—কেউ আমার তাই কথা শোনে না। তারা তো পর, কিন্তু তুমিই কি কখনো আমার কথা শুনেচো আজ সত্যি করে বলো দিকি?

হয়তো বিগত-দিনের কি-একটা কঠিন অভিযোগ এই উল্লেখটুকুর মধ্যে গোপন ছিল, সংসারে এই দুটি মানুষ ছাড়া আর কেহ তাহা জানে না। নতুন-মা উত্তর দিতে পারিলেন না, গভীর লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিল। ব্রজবাবু মাথা নাড়িয়া অনেকটা যেন নিজের মনেই বলিয়া উঠিলেন, অসম্ভব।

রাখাল মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, অসম্ভব কি কারণে কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, অসম্ভব বলেই অসম্ভব রাজু। নতুন-বৌ জানে না, জানবার কথাও নয়, কিন্তু তুমি তো জানো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে চোখের দৃষ্টিতে নিরাশা যেন ফুটিয়া পড়িল। অন্যথার কথা যেন তিনি ভাবিতেই পারিলেন না।

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, নতুন-বৌ তো জানে না, তাকে বুঝিয়েই বলো না মেজকর্তা, অসম্ভব কিসের জন্যে? রেণুর মা নেই, তার বাপ আবার যাকে বিয়ে করেছে তার ভাই চায় পাগলের হাতে মেয়ে দিতে,—তাই অসম্ভব? কিছুতেই ঠেকান যায় না, এই কি তোমার শেষ কথা? তাঁহার মুখের পরে ক্রোধ করুণা, না তাচ্ছিল্য, কিসের ছায়া যে নিঃসংশয়ে দেখা দিল বলা কঠিন।

দেখিয়া ব্রজবাবুর তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইল, যে অবাধ্য নতুন-বৌয়ের বিরুদ্ধে এইমাত্র তিনি

অভিযোগ করিয়াছেন এ সেই। রাখালের মনে পড়িল, যে নতুন-মা বাল্যকালে তাহার হাত ধরিয়া নিজের স্বামীগৃহে আনিয়াছিলেন ইনি সেই।

লজ্জা ও বেদনায় অভিসিঞ্চিত যে-গৃহের আলো-বাতাস স্নিগ্ধ হাস্য-পরিহাসের মুক্ত স্রোতে অভাবনীয় সহৃদয়তায় উজ্জ্বল হইয়া আসিতেছিল, একমুহূর্তেই আবার তাহা শ্রাবণের অমানিশার অন্ধকারের বোঝা হইয়া উঠিল। রাখাল ব্যস্ত হইয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, অনেকক্ষণ তো আপনি পান খাননি? আমার মনে ছিল না মা, অপরাধ হয়ে গেছে।

নতুন-মা কিছু আশ্চর্য হইলেন—পান? পানের দরকার নেই বাবা।

নেই বৈ কি! ঠোঁট দুটি শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেচে। কিন্তু আপনি ভাবছেন এখুনি বুঝি হিন্দুস্থানী পান-আলার দোকানে ছুটবো। না মা, সে বুদ্ধি আমার আছে। এসো ত তারক, এই মোড়টার কাছে আমাকে একটু দাঁড়াবে, এই বলিয়া সে বন্ধুর হাতে একটা প্রচণ্ড টান দিয়া দ্রুতবেগে দুজনে ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

এইবার নিরালা গৃহের মধ্যে মুখোমুখি বসিয়া দুজনেই সঙ্কোচে মরিয়া গেলেন। নিঃসম্পর্কীয় যে-দুটি লোক মেঘখণ্ডের ন্যায় এতক্ষণ আকাশের সূর্যালোক বাধাগ্রস্ত রাখিয়াছিল, তাহাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে-সঙ্গেই বিনির্মুক্ত রবিকরে ঝাপসা কিছুই আর রহিল না। স্বামী-স্ত্রীর গভীর ও নিকটতম সম্বন্ধ যে এমন ভয়ঙ্কর বিকৃত ও লজ্জাকর হইয়া উঠিতে পারে, এই নিভৃত নির্জনতায় তাহা ধরা পড়িল। ইতিপূর্বের হাস্য-পরিহাসের অবতারণা যে কত অশোভন ও অসঙ্গত এ কথা ব্রজবাবুর মনে পড়িল, এবং অপরিচিত পুরুষদের সম্মুখে ঐ লজ্জাবলুণ্ঠিত নিঃশব্দ নারীর উদ্দেশে অবক্ষিপ্ত ফুট-কড়াইয়ের রসিকতা যেন এখন তাঁহার নিজেরই কান মলিয়া দিল। মনে হইল ছি ছি, করিয়াছি কি!

পান আনার ছল করিয়া রাখাল তাঁহাদের একলা রাখিয়া গেছে। কিন্তু সময় কাটিতেছে নীরবে। হয়তো তাহারা ফিরিল বলিয়া। এমন সময় কথা কহিলেন নতুন-বৌ প্রথমে। মুখ তুলিয়া বলিলেন, মেজকর্তা, আমাকে তুমি মার্জনা কর।

ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা করা সম্ভব বলে তুমি মনে করো?

করি কেবল তুমি বলেই। সংসারে আর কেউ হয়তো পারে না, কিন্তু তুমি পারো। তাঁহার চোখ দিয়া এতক্ষণে জল গড়াইয়া পড়িল।

ব্রজবাবু ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ, মার্জনা করতে তুমি পারতে?

নতুন-বৌ আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমরা তো পারিই মেজকর্তা। পৃথিবীতে এমন কোন মেয়ে আছে যাকে স্বামীর এ অপরাধ ক্ষমা করতে হয় না? কিন্তু আমি সে তুলনা দিইনে, আমার ভাগ্যে এমন স্বামী পেয়েছিলাম যিনি দেহে-মনে নিষ্পাপ, যিনি সব সন্দেহের ওপরে। আমি কি করে তোমাকে এর জবাব দেবো?

কিন্তু আমার মার্জনা নিয়ে তুমি করবে কি?

যতদিন বাঁচবো মাথায় তুলে রাখবো। আমাকে কি তুমি ভুলে গেছো মেজোকর্তা?

তোমার মনে কি হয় বলো তো নতুন-বৌ?

এ প্রশ্নের জবাব আসিল না। শুধু স্তব্ধ নত-মুখে উভয়েই বসিয়া রহিলেন।

খানিক পরে ব্রজবাবু বলিলেন, মার্জনা চেয়ো না নতুন-বৌ, সে আমি পারবো না। যতদিন বাঁচবো তোমার ওপরে এ অভিমান আমার যাবে না। তবু পাছে স্বামীর অভিশাপে তোমার কষ্ট বাড়ে এই ভয়ে কোনদিন তোমাকে অভিশাপ দিইনি। কিন্তু এমন অদ্ভুত কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো নুতন-বৌ?

নতুন-বৌ মুখ না তুলিয়াই বলিল, পারি।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হলে আর আমি দুঃখ করবো না। সেদিন আমাকে সবাই বললে অন্ধ, বললে নির্বোধ, বললে দেখিয়ে দিলেও যে দেখতে পায় না, প্রমাণ করে দিলেও যে বিশ্বাস করে না, তার দুর্দশা এমন হবে না তো হবে কার! কিন্তু দুর্দশা হয়েছে বলেই কি নিজেকে অন্ধ বলে

মেনে নিতে হবে নতুন বৌ? বলতে হবে, যা করেছি আমি সব ভুল? জানি, ভাই আমাকে ঠকিয়েছে, আমাকে ঠকিয়েচে বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, কর্মচারী—ঠকিয়েছে অনেকেই। কিন্তু, সব যখন যেতে বসেছিল, সেই দুর্দিনে তোমাকে বিবাহ করে আমিই তো ঘরে আনি। তুমি এসে একে একে সমস্ত বন্ধ করলে, সব লোকসান পূর্ণ হয়ে এলো—সেই-তোমাকে অবিশ্বাস করতে পারিনি বলে আমি হলাম অন্ধ, আর যারা চক্রান্ত করে, বাইরের লোক জড়ো করে, তোমাকে নীচে টেনে নামিয়ে বাড়ির বার করে দিলে তারাই চক্ষুষ্মান? তাদের নালিশ, তাদের নোংরা কথায় কান দিইনি বলেই আজ আমার এই দুর্গতি? আমার দুঃখের এই কি হলো সত্যি ইতিহাস? তুমিই বল তো নতুন-বৌ?

নতুন-বৌ কখন যে মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের প্রতি দুই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল, বোধ হয় তাহা নিজেই জানিত না, এখন হঠাৎ তাঁহার কথা থামিতেই সে যেন চমকিয়া আবার মুখ নীচু করিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি ছিলে শুধুই কি স্ত্রী? ছিলে গৃহের লক্ষ্মী, সমস্ত পরিবারের কর্ত্রী, আমার সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, সকল বন্ধুর বড় বন্ধু—তোমার চেয়ে শ্রদ্ধা ভক্তি আমাকে কে কবে করেচে? এমন করে মঙ্গল কে কবে চেয়েছে? কিন্তু একটা কথা আমি প্রায়ই ভাবি নতুন-বৌ, কিছুতেই জবাব পাইনে। আজ দৈবাৎ যদি কাছে পেয়েচি, বল তো সেদিন কি হয়েছিল? এত আপনার হয়েও কি আমাকে সত্যিই ভালোবাসতে পারোনি? না বুঝে তুমি ত কখনো কিছু করো না,—দেবে এর সত্যি জবাব? যদি দাও, হয়তো আজও মনের মধ্যে আবার শান্তি পেতে পারি। বলবে?

নতুন-বৌ মুখ তুলিয়া চাহিল না, কিন্তু মৃদুকণ্ঠে কহিল, আজ নয় মেজকর্তা।

আজ নয়? তবে, কবে দেবে বল? আর যদি দেখা না হয়, চিঠি লিখে জানাবে?

এবার নতুন-বৌ চোখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, না মেজকর্তা, আমি তোমাকে চিঠিও লিখবো না, মুখেও বলবো না।

তবে জানবো কি করে?

জানবে যেদিন আমি নিজে জানতে পারবো।

কিন্তু, এ যে হেঁয়ালি হলো।

তা হোক। আজ আশীর্বাদ করো, এর মানে যেন একদিন তোমাকে বুঝিয়ে দিতে পারি।

দ্বারের বাহির হইতে সাড়া আসিল, আমার বড্ড দেরি হয়ে গেল। এই বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল, এক ডিবা পান সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিল, সাবধানে তৈরি করিয়ে এনেচি মা, এতে অশুচি স্পর্শদোষ ঘটেনি। নিঃসঙ্কোচে মুখে দিতে পারেন।

নতুন-বৌ ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখাইয়া দিতে রাখাল ঘাড় নাড়িল।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি তেরো বচ্ছর পান খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি নতুন-বৌ, এখন তুমি হাতে করে দিলেও মুখে দিতে পারবো না।

সুতরাং পানের ডিবা তেমনিই পড়িয়া রহিল, কেহ মুখে দিতে পারিলেন না।

তারক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বাসায় যাইবার কথা, অথচ যায় নাই, কাছেই কোথাও অপেক্ষা করিতেছিল। যে কারণেই হোক, সে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকিতে চাহে না। তাহার এই অবাঞ্ছিত কৌতূহল রাখালের চোখে বিসদৃশ ঠেকিল, কিন্তু সে চুপ করিয়াই রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, নতুন-বৌ, তোমার সেই মোটা বিছে-হারটা কি ভটচায্যি-মশায়ের ছোট মেয়েকে বিয়ের সময় দেবে বলেছিলে? বিয়ে অনেকদিন হয়ে গেছে, দুটি ছেলেমেয়েও হয়েছে, এতকাল সঙ্কোচে বোধ করি চাইতে পারেনি, কিন্তু এবার পূজোর সময়ে এসে সে হারটা চেয়েছিল—দেবো?

নতুন-বৌ বলিলেন, হাঁ, ওটা তাকে দিয়ো।

ব্রজবাবু কহিলেন, আর একটা কথা। তোমার যে-টাকাটা কারবারে লাগানো ছিল, সুদে-

আসলে সেটা হাজার-পঞ্চাশ হয়েছে। কি করবে সেটা? তুলে তোমাকে পাঠিয়ে দেব?

তুলবে কেন, আরও বাড়ুক না।

না নতুন-বৌ, সাহস হয় না। বরিশালের চালানি সুপারির কাজে অনেক টাকা লোকসান গেছে—থাকলেই হয়তো টান ধরবে।

নতুন-বৌ একটু ভাবিয়া বলিলেন, এ ভয় আমার বরাবর ছিল। গোকুল সাহাকে সরিয়ে দিয়ে তুমি বীরেনকে পাঠাও। আমার টাকা মারা যাবে না।

ব্রজবাবুর চোখ দুটো হঠাৎ সজল হইয়া উঠিল। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, নিজেও ত বুড়ো হলাম গো, আরও খাটবো কত কাল? ভাবচি সব তুলে দিয়ে এবার—

ঠাকুরঘর থেকে বার হবে না, এই তো? না, সে হবে না।

ব্রজবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, বহুক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও কহিলেন না। মনে মনে কি যে ভাবিতে লাগিলেন বোধহয় একটিমাত্র লোকই তাহার আভাস পাইল।

হঠাৎ এক সময়ে বলিয়া উঠিলেন, দেখ নতুন-বৌ, সোনারপুরের কতকটা অংশ দাদার ছেলেদের ছেড়ে দেওয়া তুমি উচিত মনে কর?

নতুন-বৌ বলিলেন, তাদের তো আর কিছুই নেই। সবটাই ছেড়ে দাও না।

সবটা?

ক্ষতি কি?

বেশ, তাই হবে। তোমার মনে আছে বোধ হয় দাদার বড়মেয়ে জয়দুর্গাকে কিছু দেবার কথা হয়েছিল। জয়দুর্গা বেঁচে নেই, কিন্তু তার একটি মেয়ে আছে, অবস্থা ভাল নয়, এরা ভাগ্নীকে কিছুই দিতে চায় না। তুমি কি বল?

নতুন-বৌ বলিলেন, সোনাপুরের আয় বোধ হয় হাজার টাকার ওপর। জয়দুর্গার মেয়েকে একশো টাকার মত ব্যবস্থা করে দিলে অন্যায় হবে না।

ভালো, তাই হবে।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল।

হাঁ নতুন-বৌ, তোমার গয়নাগুলো কি সব সিন্দুকেই পচবে? কেবল তৈরিই করালে, কখনো পরলে না। দেবো সেগুলো তোমাকে পাঠিয়ে?

নতুন-বৌ হঠাৎ বোধ হয় প্রস্তাবটা বুঝিতে পারেন নাই, তার পরে মাথা হেঁট করিলেন। একটু পরেই দেখা গেল টেবিলের উপরে টপটপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

ব্রজবাবু শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, থাক থাক, নতুন-বৌ, তোমার রেণু পরবে। ও-কথায় আর কাজ নেই।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, সন্ধ্যা হয়ে আসচে, এবার তাহলে আমি উঠি।

তাঁহার সন্ধ্যা-আহ্নিক, গোবিন্দের সেবা—এই সকল নিত্যকর্তব্যের কোন কারণেই সময় লঙ্ঘন করা চলে না তাহা রাখাল জানিত। সে-ও ব্যস্ত হইয়া পড়িল। প্রৌঢ়কালে ব্রজবাবুর ইহাই যে প্রত্যহের প্রধান কাজ, নতুন-বৌ তাহা জানিতেন না। আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, রেণুর বিয়ের কথাটা তো শেষ হলো না মেঝকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, তুমি যখন চাও না তখন ও-বাড়িতে হবে না।

নতুন-বৌ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচলাম।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু বিয়ে তো বন্ধ রাখা চলবে না। সুপাত্র পাওয়া চাই, দুটো খেতে-পরতে পায় তাও দেখা চাই। রাজু, তোমার তো বাবা অনেক বড়ঘরে যাওয়া-আসা আছে, তুমি একটি স্থির করে দিতে পারো না। এমন মেয়ে তো কেউ সহজে পাবে না।

রাখাল অধোমুখে মৌন হইয়া রহিল।

নতুন-বৌ বলিলেন, এত তাড়াতাড়ি দরকার কি মেজকর্তা?

ব্রজবাবু মাথা নাড়িলেন,—সে হয় না নতুন-বৌ। নির্দিষ্ট দিনে দিতেই হবে—দেশাচার অমান্য করতে পারবো না। তা ছাড়া, আরও অমঙ্গলের সম্ভাবনা।

কিন্তু এর মধ্যে সুপাত্র যদি না পাওয়া যায়?

পেতেই হবে।

কিন্তু না পাওয়া গেলে? পাগলের বদলে বাঁদরের হাতে মেয়ে দেবে?

সে মেয়ের কপাল।

তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে ওকে জলে ফেলে দিও। তাই তো দিচ্ছিলে।

আলোচনা পাছে বাদানুবাদে দাঁড়ায় এই ভয়ে রাখাল মাঝখানে কথা কহিল, বলিল, মামাবাবু কি রাগারাগি করবেন মনে হয় কাকাবাবু?

ব্রজবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মনে হয় বৈ কি। হেমন্তর স্বভাব তুমি জানোই ত রাজু। সহজে ছাড়বে না।

রাখাল খুব জানিত—তাই চুপ করিয়া রহিল।

নতুন-বৌ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, তোমার মেয়ে, যেখানে ইচ্ছে বিয়ে দেবে, ইচ্ছে না হলে দেবে না, তাতে হেমন্তবাবু বাধা দেবেন কেন? দিলেই বা তুমি শুনবে কেন?

প্রত্যুত্তরে ব্রজবাবু 'না' বলিলেন, বটে, কিন্তু গলায় জোর নাই, তাহা সকলেই অনুভব করিল। নতুন-বৌ বলিতে লাগিলেন, তোমার ছেলে নেই, শুধু দুটি মেয়ে। এরা যা পাবে তাতে খুঁজলে কলকাতা শহরে সুপাত্রের অভাব হবে না, কিন্তু সে কটা দিন তোমাকে স্থির হয়ে থাকতেই হবে। আশীর্বাদ, গায়ে-হলুদের ওজর তুলে ভূত-প্রেত পাগল-ছাগলের হাতে মেয়ে সম্প্রদান করা চলবে না। এর মধ্যে হেমন্তবাবু বলে কেউ নেই। বুঝলে মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বিষণ্ণমুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।

রাখাল কথা কহিল, বলিল, এ হলো সহজ যুক্তি ও ন্যায়-অন্যায়ের কথা মা, কিন্তু হেমন্তবাবুকে তো আপনি জানেন না। রেণু অনেক কিছু পাবে বলেই তার অদৃষ্টে আজ মামাবাবুর পাগল আত্মীয় জুটেছে, নইলে জুটতো না—ও নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পেতো। মামাবাবু এক কথায় হাল ছাড়বার লোক নয় মা।

কি করবেন তিনি শুনি?

রাখাল জবাব দিতে গিয়া হঠাৎ চাপিয়া গেল। ব্রজবাবু দেখিয়া বলিলেন, লজ্জা নেই রাজু বলো। আমি অনুমতি দিচ্চি।

তথাপি রাখালের সঙ্কোচ কাটে না, ইতস্ততঃ করিয়া শেষে কহিল, ও-লোকটা গায়ে হাত দিতে পর্যন্ত পারে।

কার গায়ে হাত দিতে পারে রাজু? মেজকর্তার?

হাঁ, একবার ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, পনর-ষোল দিন কাকাবাবু উঠতে পারেন নি।

নতুন-মার চোখের দৃষ্টি হঠাৎ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল,—তার পরেও ও-বাড়িতে আছে? খাচ্চে পরচে।

রাখাল বলিল, শুধু নিজে নয়, মাকে পর্যন্ত এনেছেন। কাকাবাবুর শাশুড়ী। পরিবার নেই, মারা গেছেন, নইলে তিনিও বোধ করি এতদিনে নিজে আশ্রয় দিয়ে এনেছিলেন বলে কেউ টলাতে পারেনি, কিন্তু মামাবাবুর একটা ভ্রূকুটির ভার সইলো না, ছুটে পালাতে হলো। সত্যি কথা বলি মা, রেণুর বিয়ে নিয়ে কাকাবাবুর সম্বন্ধে আমার মস্ত ভয় আছে।

নতুন-বৌ বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। নিরুপায় নিষ্ফল আক্রোশে তাঁহার চোখ দিয়া যেন আগুনের স্রোত বহিতে লাগিল।

রাখাল ইঙ্গিতে ব্রজবাবুকে দেখাইয়া বলিল, এখন হেমন্তবাবু বাড়ির কর্তা, তাঁর মা হলেন গিন্নী। এই দাবানলের মধ্যে এই শান্ত, নিরীহ মানুষটিকে একলা ঠেলে দিয়ে আমার কিছুতে ভয় ঘোচে না। অথচ পাগলের হাত থেকে রেণুকে বাঁচাতেই হবে। আজ আপনার মেয়ে, আপনার

স্বামী বিপদে কুল-কিনারা পায় না মা, এ ভাবলেও আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে।

নতুন-মা জবাব দিলেন না, শুধু সম্মুখের টেবিলের উপর ধীরে ধীরে মাথা রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

তারক উত্তেজনায় ছট্‌ফট করিয়া উঠিল। সংসারে এত বড় নালিশ যে আছে ইহার পূর্বে সে কল্পনাও করে নাই। আর নির্বাক, নিস্পন্দ পাষাণ-মূর্তি,—কি কথা সে ভাবিতেছে!

মিনিট দুই-তিন কাটিল, কে জানে আরও কতক্ষণ কাটিত,—বাহির হইতে রুদ্ধদ্বারে ঘা পড়িল। বুড়ি-ঝি মনে করিয়া রাখাল কপাট খুলিতেই একজন ব্যস্ত-ব্যকুল বাঙালী চাকর ঘরে ঢুকিয়া পড়িল—মা?

নতুন-মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন—তুই যে?

সে অত্যন্ত উত্তেজিত, কহিল, ড্রাইভার নিয়ে এলো মা। শিগগির চলুন, বাবু ভয়ানক রাগ করচেন।

কথাটা সামান্যই, কিন্তু কদর্যতার সীমা রহিল না। ব্রজবাবু লজ্জায় আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

চাকরটার বিলম্ব সহে না, তাগাদা দিয়া পুনশ্চ কহিল, উঠে পড়ুন মা, শিগগির চলুন। গাড়ি এনেচি।

কেন?

লোকটা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। স্পষ্টই বুঝা গেল বলিতে তাহার নিষেধ আছে।

বাবু কেন ডাকচেন?

চলুন না মা, পথেই বলবো।

আর তর্ক না করিয়া নতুন-মা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, চললাম মেজকর্তা।

চললে?

হাঁ। এ কি তুমি ডেকে পাঠিয়েচো যে, জোর করে, রাগ করে বলবো, এখন যাবার সময় নেই, তুই যা? আমাকে যেতেই হবে। যাকে কখনো কিছু বলোনি, তোমার সেই নতুন—বৌকে আজ একবার মনে করে দেখো তো মেজকর্তা, দেখো তো তাকে আজ চেনা যায় কিনা।

ব্রজবাবু মুখ তুলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নতুন-বৌ বলিলেন, মার্জনা ভিক্ষে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বীকার করোনি—উপেক্ষা করে বললে, এ নিয়ে তোমার হবে কি! কখনো তোমার কাছে কিছু চাইনি, চাইতে তোমার কাছে আমার লজ্জা করে, অভিমান হয়। কিন্তু আর যে-যাই বলুক মেজকর্তা, এমন কথা তুমি কখনো আমাকে বলো না। বলবে না বলো?

ব্রজবাবুর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হইয়া গেল। বহু দিন পূর্বের একটা ঘটনা মনে পড়িল—তখন রেণুর জন্মের পর নতুন-বৌ পীড়িত। কি—একটা জরুরী কাজে তাঁহার ঢাকা যাইবার প্রয়োজন, সেদিনও এই নতুন-বৌ কণ্ঠস্বরে এমনি আকুলতা ঢালিয়াই মিনতি জানাইয়াছিল—ঘুমিয়ে পড়লে ফেলে রেখে আমাকে পালাবে না বলো? সেদিন বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াই তাঁহাকে ঢাকা যাওয়া বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সেদিনও স্ত্রৈণ বলিয়া তাঁহাকে গঞ্জনা দিতে লোকে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু আজ?

চাকরটা বুঝিল না কিছুই, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া, হঠাৎ কেমন ভয় পাইয়া বলিয়া ফেলিল, মা, তোমার নীচের ভাড়াটে একজন আফিং খেয়ে মর-মর হয়েচে—তাই এসেছি ডাকতে।

নতুন-বৌ সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে আফিং খেলে রে?

জীবনবাবুর স্ত্রী।

জীবনবাবু কোথায়?

চাকরটা বলিল, তাঁর সাত-আট দিন খোঁজ নেই। শুনেচি, আফিসের চাকরি গেছে বলে পালিয়েছে।

কিন্তু তোর বাবু করছেন কি? হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়েছে?

চাকরটা বলিল, কিছুই হয়নি মা, পুলিশের ভয়ে বাবু দোকানে চলে গেছেন। তোমার বাড়ি, তোমার ভাড়াটে, তুমিই তার উপায় করো মা, বৌটা হয়তো বাঁচবে না।

রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, দরকার হতে পারে মা, আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারবে না বাবা, এসো। যাবার পূর্বে এবার তিনি হাত দিয়া স্বামীর পা-দুটি স্পর্শ করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন।

সকলে বাহির হইলে রাখাল ঘরে তালা দিয়া নতুন-মার অনুসরণ করিল।

চার

নতুন-মা ডাকেন নাই, রাখাল নিজে যাচিয়া তাঁহার সাহায্য করিতে চলিয়াছে।

তখনকার দিনে রমণীবাবু রাখাল-রাজকে ভালো করিয়াই চিনিতেন। তাহার পরে দীর্ঘ তের বৎসর গত হইয়াছে এবং উভয় পক্ষেই পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিস্তর, কিন্তু তাহাকে না চিনিবারও হেতু নাই ; অন্ততঃ সেই সম্ভাবনাই সমধিক।

গাড়ির মধ্যে বসিয়া রাখাল ভাবিতে লাগিল, হয়তো তিনি দোকানে যান নাই, হয়তো ফিরিয়া আসিয়াছেন, হয়তো বাড়িতে না থাকার অপরাধে তাহারি সম্মুখে নতুন-মাকে অপমানের একশেষ করিয়া বসিবেন—তখন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না,—এইরূপ নানা চিন্তায় সে নতুন-মার পাশে বসিয়াও অস্থির হইয়া উঠিল। স্পষ্ট দেখিতে লাগিল তাঁহার এই অভাবিত আবির্ভাবে রমণীবাবুর ঘোরতর সন্দেহ জাগিবে এবং রেণুর বিবাহ ব্যাপারটা যদি নতুন-মা গোপনে রাখিবার সঙ্কল্পই করিয়া থাকেন ত তাহা নিঃসন্দেহে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। কারণ, সত্য ও মিথ্যা অভিযোগের নিরসনে আসল কথাটা তাঁহাকে অবশেষে প্রকাশ করিতেই হইবে।

সেই অভদ্র চাকরটা ড্রাইভারের পাশে বসিয়াছিল ; মনিবের ভয়ে তাহার তাগিদের উদ্‌ভ্রান্ত রুক্ষতা ও প্রত্যুত্তরে নতুন-মার বেদনাক্ষুব্ধ লজ্জিত কথাগুলি রাখালের মনে পড়িল, এবং সেই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি স্বয়ং মনিবের মুখ হইতে এখন কি আকার ধারণ করিবে ভাবিয়া অতিষ্ঠ হইয়া কহিল, নতুন-মা, গাড়িটা থামাতে বলুন, আমি নেবে যাই।

নতুন-মা বিস্ময়াপন্ন হইলেন—কেন বাবা, কোথাও কি খুব জরুরী কাজ আছে?

রাখাল বলিল, না, কাজ তেমন নেই,—কিন্তু আমি বলি আজ থাক।

কিন্তু মেয়েটাকে যদি বাঁচানো যায় সে তো আজই দরকার রাজু। অন্য দিনে ত হবে না।

বলা কঠিন। রাখাল সঙ্কোচ ও কুণ্ঠায় বিপন্ন হইয়া উঠিল, শেষে মৃদুকণ্ঠে বলিল, মা আমি ভাবচি পাছে রমণীবাবু কিছু মনে করেন।

শুনিয়া নতুন-মা হাসিলেন—ওঃ তাই বটে। কিন্তু কে-একটা লোক কি-একটা মনে করবে বলে মেয়েটা মারা যাবে বাবা? বড় হয়ে তোমার বুঝি এই বুদ্ধি হয়েছে! তা ছাড়া, শুনলে তো তিনি বাড়ি নেই, পুলিশ-হাঙ্গামার ভয়ে পালিয়েছেন। হয়তো দু-তিনদিন আর এ-মুখো হবেন না।

রাখাল আশ্বস্ত হইল না। ঠিক বিশ্বাস করিতেও পারিল না, প্রতিবাদও করিল না। ইতিমধ্যে গাড়ি আসিয়া দ্বারে পৌঁছিল। দেখিল তাহার অনুমানই সত্য। একজন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোক উপরের বারান্দায় থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, দ্রুত পদে নামিয়া আসিলেন। রাখাল মনে মনে প্রমাদ গণিল।

তাঁহার চোখে-মুখে কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ, কহিলেন, এলে? শুনেচো ত জীবনের স্ত্রী—কি সর্বনাশ—

কথাটা সম্পূর্ণ হইল না, সহসা রাখালের প্রতি চোখ পড়িতেই থামিয়া গেলেন।

নতুন-মা বলিলেন, রাজুকে চিনতে পারলে না?

তিনি একমুহূর্ত ঠাহর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—রাজু। আমাদের রাখাল! বেশ চিনতে পারবো না? নিশ্চয়।

রাখাল পূর্বেকার প্রথা-মতো হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। রমণীবাবু তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এতকাল একবার দেখা দিতে নেই হে! বেশ যা হোক সব। কিন্তু কি সর্বনাশ করলে মেয়েটা! পুলিশে এবার বাড়িসুদ্ধ সবাইকে হয়রান করে মারবে। দুশ্চিন্তার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বার বার তোমাকে বলি নতুন-বৌ, যাকে-তাকে ভাড়াটে রেখো না। লোকে বলে শূন্য গোয়াল ভালো। নাও, এবার সামলাও। একটা কথা যদি কখনো আমার শুনলে!

রাখাল কহিল, একে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন নি কেন?

হাসপাতালে? বেশ! তখন কি আর ছাড়ানো যাবে ভাবো? আত্মহত্যা যে!

রাখাল কহিল, কিন্তু তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করা চাই তো। নইলে, আত্মহত্যা যে তাঁকে বধ করায় গিয়ে দাঁড়াবে।

রমণীবাবু ভয় পাইয়া বলিলেন, সে ত জানি হে, কিন্তু হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে কিছু-একটা করে ফেললেই ত হবে না। একটা পরামর্শ করা দরকার। পুলিশের ব্যাপার কিনা।

নতুন-মা বলিলেন, তাহলে চলো ; কোন ভালো এটর্নির অফিসে গিয়ে আগে পরামর্শ করে আসা যাক।

রমণীবাবু জ্বলিয়া গেলেন—তামাশা করলেই ত হয় না নতুন-বৌ, আমার কথা শুনলে আজ এ বিপদ ঘটতো না।

এ-সকল অনুযোগ অর্থহীন উচ্ছ্বাস ব্যতীত কিছুই নয়, তাহা নূতন লোক রাখালও বুঝিল। নতুন-মা জবাব দিলেন না, হাসিয়া শুধু রাখালকে কহিলেন, চলো ত বাবা, দেখি গে কি করা যায়। রমণীবাবুকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তুমি ওপরে গিয়ে বসো গে সেজোবাবু, ছেলেটাকে নিয়ে আমি যা পারি করি গে, কেবল এইটি ক'রো, ব্যস্ত হয়ে লোকজনকে যেন বিব্রত করে তুলো না।

নীচের তলায় তিন-চারটি পরিবার ভাড়া দিয়া বাস করে। প্রত্যেকের দুখানি করিয়া ঘর, বারান্দায় একটা অংশ তক্তার বেড়া দিয়া এক সার রান্নাঘরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইঁহাদের রন্ধন ও খাবার কাজ চলে। জলের কল, পায়খানা প্রভৃতি সাধারণের অধিকারে। ভাড়াটেরা সকলেই দরিদ্র ভদ্র কেরানী, ভাড়ার হার যথেষ্ট কম বলিয়া মাসের শেষে বাসা বদল করার রীতি এ-বাটীতে নাই—সকলেই প্রায় স্থায়িভাবে বাস করিয়া আছেন। শুধু জীবন চক্রবর্তী ছিল নূতন, এ বাড়িতে বোধ করি বছর-দুয়েকের বেশী নয়। তাহারই স্ত্রী আফিং খাইয়া বিভ্রাট বাধাইয়াছে। বৌটির নিজের ছেলেপুলে ছিল না বলিয়া সমস্ত ভাড়াটেদের ছেলেমেয়ের ভার ছিল তাহার পরে। স্নান করানো, ঘুম পাড়ানো, ছেঁড়া জামা-কাপড় সেলাই করা—এ-সব সেই করিত। গৃহিণীদের 'হাত-জোড়া' থাকিলেই ডাক পড়িত জীবনের বৌকে—কারণ, সে ছিল 'ঝাড়া-হাত-পা'র মানুষ, অতএব তাহার আবার কাজ কিসের? এত অল্প বয়সে কুঁড়েমি ভাল নয়,—বৌটির সম্বন্ধে এই ছিল সকল ভাড়াটের সর্ববাদিসম্মত অভিমত। সে-যাই হোক শান্ত ও নিঃশব্দ প্রকৃতির বলিয়াই সবাই তাহাকে ভালবাসিত, সবাই স্নেহ করিত ; কিন্তু স্বামীর যে তাহার পাঁচ-ছয় মাস ধরিয়া কাজ নাই এবং সে-ও যে আজ সাত-আটদিন নিরুদ্দেশ এ-খবর ইহাদের কানে পৌঁছিল শুধু আজ—সে যখন মরিতে বসিয়াছে ; কিন্তু তবুও কাহারও বিশ্বাস হইতে চাহে না—জীবনের বৌ যে আফিং খাইতে পারে,—এ যেন সকলের স্বপ্নের অগোচর।

রাখালকে লইয়া নতুন-মা যখন তাহার ঘরে ঢুকিলেন তখন সেখানে কেহ ছিল না। বোধ করি পুলিশের হাঙ্গামার ভয়ে সবাই একটুখানি আড়ালে গা-ঢাকা দিয়াছিল। ঘরখানি যেন দৈন্যের প্রতিমূর্তি। দেওয়ালের কাছে দুখানি ছোট জলচৌকি, একটির উপরে দুইখানি পিতল-কাঁসার বাসন ও অন্যটির উপরে একটি টিনের তোরঙ্গ। অল্পমূল্যের একখানি তক্তপোশের উপরে জীর্ণ শয্যায় পড়িয়া বৌটি। তখনও জ্ঞান ছিল, পুরুষ দেখিয়া শিথিল হাতখানি মাথায় তুলিয়া আঁচলটুকু টানিয়া দিবার চেষ্টা করিল। নতুন-মা বিছানার একধারে বসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, কেন এ কাজ করতে গেলে মা, আমাকে সব কথা জানাও নি কেন? হাত দিয়া তাহার চোখের জল মুছাইয়া

দিলেন, বলিলেন, সত্যি করে বলো তো মা, কতটুকু আফিং খেয়েচো? কখন খেয়েচো?

এখন সাহস পাইয়া অনেকেই ভিতরে আসিতেছিল, পাশের ঘরের প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি বলিল, পয়সা তো বেশী ছিল না মা, বোধ হয় সামান্য একটুখানি খেয়েচে,—আর খেয়েচে বোধ হয় বিকেল বেলায়। আমি যখন জানতে পারলুম তখনও কথা কইছিল।

রাখাল নাড়ী দেখিল, হাত দিয়া চোখের পাতা তুলিয়া পরীক্ষা করিল, বলিল, বোধ হয় ভয় নেই নতুন-মা, আমি একখানা গাড়ি ডেকে আনি, হাসপাতালে নিয়ে যাই।

বৌটি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইল।

রাখাল বলিল, এভাবে মরে লাভ কি বলুন তো? আর, আত্মহত্যার মতো পাপ নই তা কি কখনো শোনেন নি? যে স্ত্রীলোকটি বলিতেছিল, বাড়িতে ডাক্তার আনিয়া চিকিৎসার চেষ্টা করা উচিত, রাখাল তাহার জবাবে নতুন-মাকে দেখাইয়া কহিল, ইনি যখন এসেছেন তখন টাকার জন্যে ভাবনা নেই—একজনের জায়গায় দশজন ডাক্তার এনে হাজির করে দিতে পারি কিন্তু তাতে সুবিধে হবে না নতুন-মা। আর, হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণটা যদি ওঁর বাঁচানো যায়, পুলিশের হাত থেকে দেহটাকেও বাঁচানো যাবে, এ ভরসা আপনাদের আমি দিতে পারি।

নতুন-মা সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই করো বাবা, গাড়ি আমার দাঁড়িয়েই আছে, তুমি নিয়ে যাও।

তাঁহার আদেশে একজন দাসী সঙ্গে গিয়া পৌঁছাইয়া দিতে রাজী হইল। নতুন-মা রাখালের হাতে কতগুলা টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

সন্ধ্যা শেষ হইয়াছে, আসন্ন রাত্রির প্রথম অন্ধকারে রাখাল অর্ধ-সচেতন এই অপরিচিতা বধূটিকে জোর করিয়া গাড়িতে তুলিয়া হাসপাতালের উদ্দেশে যাত্রা করিল। পথের মধ্যে উজ্জ্বল গ্যাসের আলোকে এই মরণপথযাত্রী নারীর মুখের চেহারা তাহার মাঝে মাঝে চোখে পড়িয়া মনে হইতে লাগিল যেন ঠিক এমনটি সে আর কখনও দেখে নাই। তাহার জীবনে মেয়েদের সে অনেক দেখিয়াছে। নানা বয়সের, নানা অবস্থার নানা চেহারার। একহারা, দোহারা, তেহারা, চারহারা—খেংরা-কাঠির ন্যায়, ঢ্যাঙা, বেঁটে—কালো, সাদা, হলদে, পাঁশুটে—চুল-বালা, চুল-ওঠা—পাস-করা—ফেল—করা গোল ও লম্বা মুখের—এমন কত। আত্মীয়তার ও পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় অভিজ্ঞতা তাহার পর্যাপ্তেরও অধিক। এদের সম্বন্ধে এই বয়সে তাহার আদেখ্‌লে-পনা ঘুচিয়াছে। ঠিক বিতৃষ্ণা নয়, একটা চাপা অবহেলা কোথায় তাহার মনের এককোণে অত্যন্ত সঙ্গোপনে পুঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল, কাল তাহাতে প্রথমে ধাক্কা লাগিয়াছিল নতুন-মাকে দেখিয়া। তের বৎসর পূর্বেকার কথা সে প্রায় ভুলিয়াই ছিল, কিন্তু সেই নতুন-মা যৌবনের আর একপ্রান্তে পা দিয়া কাল যখন তাহার ঘরের মধ্যে গিয়া দেখা দিলেন, তখন সকৃতজ্ঞ-চিত্তে আপনাকে সংশোধন করিয়া এই কথাটাই মনে মনে বলিয়াছিল যে, নারীর সত্যকার রূপ যে কতবড় দুর্লভ-দর্শন তাহা জগতের অধিকাংশ লোকে জানেই না। আজ গাড়ির মধ্যে আলো ও আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে মরণাপন্ন এই মেয়েটিকে দেখিয়া ঠিক সেই কথাটাই সে আর একবার মনে মনে আবৃত্তি করিল। বয়স উনিশ-কুড়ি, সাজসজ্জা-আভরণহীন দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের মেয়ে, অনশন ও অর্ধাশনে পাণ্ডুর মুখের 'পরে মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছে—কিন্তু রাখালের মুগ্ধ চক্ষে মনে হইল, মরণ যেন এই মেয়েটিকে একেবারে রূপের পারে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কিন্তু ইহা দেহের অক্ষুণ্ণ সুষমায়, না অন্দরের নীরব মহিমায়, রাখাল নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিল না। হাসপাতালে সে তার যথাসাধ্য,—সাধ্যেরও অধিক করিবে সঙ্কল্প করিল, কিন্তু এই দুঃখসাধ্য প্রচেষ্টার বিফলতার চিন্তায় করুণায় তাহার চোখের জল আসিয়া পড়িল। হঠাৎ সঙ্গিনী স্ত্রীলোকটির কাঁধের উপর হইতে মাথাটা টলিয়া পড়িতেছিল, রাখাল শশব্যস্তে হাত বাড়াইয়াই তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল।

এই অপরিচিতার তুলনায় তাহার কত বড়-ঘরের মেয়েদেরই না এখন মনে পড়িতে লাগিল। সেখানে রূপের লোলুপতায় কি উগ্র অনাবৃত ক্ষুধা। দীনতার আচ্ছাদনে কত বিচিত্র আয়োজন,

কত মহার্ঘ প্রসাধন—কি তার অপব্যয়! পরস্পরের ঈর্ষা-কাতর নেপথ্য আলোচনায় কি জ্বালাই না সে বার বার চোখে দেখিয়াছে।

আর, সমাজের আর-একপ্রান্তে এই নিরাভরণ বধূটি? এই কুণ্ঠিতশ্রী, এই অদৃষ্টপূর্ব মাধুর্য ইহাও কি অহঙ্কৃত আত্মম্ভরিতায় তাহারা উপহাসে কলুষিত করিবে?

সে ভাবিতে লাগিল, কি-জানি দায়গ্রস্ত কোন্ ভিখারী মাতা-পিতার কন্যা এ, কোন্ দুর্ভাগা কাপুরুষের হাতে ইহাকে তাহারা বিসর্জন দিয়াছিল। কি জানি, কতদিনের অনাহারে এই নির্বাক্ মেয়েটি আজ ধৈর্য হারাইয়াছে, তথাপি যে সংসার তাহাকে কিছুই দেয় নাই, ভিক্ষাপাত্র হাতে তাহাকে দুঃখ জানাইতে চাহে নাই। যতদিন পারিয়াছে মুখ বুজিয়া তাহারি কাজ, তাহারি সেবা করিয়াছে। হয়তো সে শক্তি আর নাই—সে শক্তি নিঃশেষিত—তাই কি আজ এ ধিক্কারে, বেদনায়, অভিমানে তাঁহারি কাছে নালিশ জানাইতে চলিয়াছে যে-বিধাতা তাঁর রূপের পাত্র উজাড় করিয়া দিয়া একদিন ইহাকে এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন?

কল্পনার জাল ছিঁড়িয়া গেল। রাখাল চকিত হইয়া দেখিল, হাসপাতালের আঙ্গিনায় গাড়ি আসিয়া থামিয়াছে। স্ট্রেচারের জন্য ছুটিতেছিল, কিন্তু মেয়েটি নিষেধ করিল। অবশিষ্ট সমগ্র শক্তি প্রাণপণে সজাগ করিয়া তুলিয়া সে ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হবে না, আমি আপনিই যেতে পারবো, এই বলিয়া সে সঙ্গিণীর দেহের পরে ভর দিয়া কোনমতে টলিতে টলিতে অগ্রসর হইল।

এখানে বৌটি কি করিয়া বাঁচিল, কি করিয়া আইনের উপদ্রব কাটিল, রাখাল কি করিল, কি দিল, কাহাকে কি বলিল, এ-সকল বিস্তারিত বিবরণ অনাবশ্যক। দিন চার-পাঁচ পরে রাখাল কহিল, কপালে দুঃখ যা লেখা ছিল তা ভোগ হলো, এখন বাড়ি চলুন।

মেয়েটি শান্ত কালো চোখদুটি মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না। রাখাল কহিল, এখানকার শিক্ষিত, সুসভ্য সাম্প্রদায়িক বিধি-নিয়মে আপনার নাম হলো মিসেস চকারবুটি, কিন্তু এ অপমান আপনাকে করতে পারবো না। অথচ মুশকিল এই যে, কিছু-একটা বলে ডাকাও ত চাই।

শুনিয়া মেয়েটি একেবারে সোজা সহজ গলায় বলিল, কেন, আমার নাম যে সারদা। কিন্তু আমি কত ছোট, আমাকে আপনি বললে আমার বড় লজ্জা করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, করার কথাই ত। আমি বয়সে কত বড়। তা হলে, যাবার প্রস্তাবটা আমাকে এইভাবে করতে হয়—সারদা, এবার তুমি বাড়ি চলো।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করিল, আমি আপনাকে কি বলে ডাকবো? নাম তো করা চলে না?

রাখাল বলিল, না চললেও উপায় আছে। আমার পৈতৃক নাম রাখাল—রাখাল-রাজ। তাই ছেলেবেলায় নতুন-মা ডাকতেন রাজু বলে। এর সঙ্গে একটা 'বাবু' জুড়ে দিয়ে তো অনায়াসে ডাকা চলে সারদা।

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, ও একই কথা। আর গুরুজনেরা যা বলে ডাকেন তাই হয় নাম। আমাদের দেশে ব্রাহ্মণকে বলে দেবতা। আমিও আপনাকে দেবতা বলে ডাকবো।

ইঃ! বলো কি? কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব আমার যে কানাকড়ির নেই সারদা।

নেই থাক। কিন্তু দেবতাত্ব ষোল আনায় আছে। আর, ব্রাহ্মণের ভালো-মন্দর আমরা বিচার করিনে, করতেও নেই।

জবাব শুনিয়া, বিশেষ করিয়া বলার ধরনটায় রাখাল মনে মনে একটু বিস্মিত হইল।

সারদা পল্লীগ্রামের কোন্ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের মেয়ে, সুতরাং যতটা অশিক্ষিতা ও অমার্জিতা বলিয়া সে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ঠিক ততটা এখন মনে করিতে পারিল না। আর একটা বিষয় তাহার কানে বাজিল। পল্লীগ্রামে শূদ্ররাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে দেবতা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহার নিজের গ্রামেও ইহার প্রচলন আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ-কন্যার মুখে এ যেন তাহার কেমন-কেমন ঠেকিল। তবে এক্ষেত্রে বিশেষ-কোন অর্থ যদি মেয়েটির মনে থাকে ত সে স্বতন্ত্র কথা। কহিল,

বেশ, তাই বলেই ডেকো, কিন্তু এখন বাড়ি চলো। এরা আর তোমাকে এখানে রাখবে না।

মেয়েটি অধোমুখে নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

রাখাল ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া কহিল, কি বলো সারদা, বাড়ি চলো?

এবার সে মুখ তুলিয়া চাহিল। আস্তে আস্তে বলিল, আমি বাড়ি-ভাড়া দেবো কি করে? তিন-চার মাসের বাকী পড়ে আছে, আমরা তাও ত দিতে পারিনি।

রাখাল হাসিয়া কহিল, সেজন্যে ভাবনা নেই।

সারদা সবিস্ময়ে কহিল, নেই কেন?

না থাকবার কারণ, বাড়ি-ভাড়া তোমার স্বামী দেবেন। লজ্জায়, অভাবের জ্বালায় বোধ হয় কোথাও লুকিয়ে আছেন, শীঘ্রই ফিরে আসবেন, কিংবা হয়তো এসেছেন, আমরা গিয়েই দেখতে পাবো।

না, তিনি আসেন নি।

না এসে থাকলেও আসবেন নিশ্চয়ই।

সারদা বলিল, না, তিনি আসবেন না।

আসবেন না? তোমাকে একলা ফেলে রেখে চিরকালের মতো পালিয়ে যাবেন—এ কি কখনো হতে পারে? নিশ্চয় আসবেন।

না।

না? তুমি জানলে কি করে?

আমি জানি।

তাহার কণ্ঠস্বরের প্রগাঢ়তায় তর্ক করিবার কিছু রহিল না। রাখাল স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল, তা হলে হয় তোমার শ্বশুরবাড়ি নয় তোমার বাপের বাড়িতে চলো। আমি পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবো।

মেয়েটি নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া রহিল, উত্তর দিল না।

রাখাল একমুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, কোথায় যাবে, শ্বশুরবাড়ি?

মেয়েটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

তবে কি বাপের বাড়ি যেতে চাও?

সে তেমনি মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

রাখাল অধীর হইয়া উঠিল—এ তো বড় মুশকিল! এখানকার বাসাতেও যাবে না, শ্বশুরবাড়িতেও যাবে না, বাপের ঘরেও যেতে চাও না,—কিন্তু চিরকাল হাসপাতালে থাকবার ত ব্যবস্থা নেই সারদা। কোথাও যেতে হবে ত?

প্রশ্নটা শেষ করিয়াই সে দেখিতে পাইল মেয়েটির হাঁটুর কাছে অনেকখানি কাপড় চোখের জলে ভিজিয়া গেছে এবং এইজন্যই সে কথা না কহিয়া শুধু মাথা নাড়িয়াই এতক্ষণ প্রশ্নের উত্তর দিতেছিল।

ও কি সারদা, কাঁদচো কেন, আমি অন্যায় ত কিছু বলিনি!

শুনিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু তখনি কথা কহিতে পারিল না। রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিতে সময় লাগিল, কহিল, আমি ভাবতে আর পারিনে—আমাকে মরতেও কেউ দিলে না।

রাখাল মনে মনে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু শেষ কথাটায় বিরক্ত হইল—এ অভিযোগটা যেন তাহাকেই। তথাপি কণ্ঠস্বর পূর্বের মতই সংযত রাখিয়া বলিল, মানুষে একবারই বাধা দিতে পারে সারদা, বার বার পারে না। যে মরতেই চায় তাকে কিছুতেই বাঁচিয়ে রাখা যায় না। আর ভাবতেই যদি চাও, তারও অনেক সময় পাবে। এখন বরঞ্চ বাসায় চলো, আমি গাড়ি ডেকে এনে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমার আরো ত অনেক কাজ আছে।

খোঁচাগুলি মেয়েটি অনুভব করিল কিনা বুঝা গেল না, রাখালের মুখের পানে চাহিয়া বলিল,

আমি যে ভাড়া দিতে পারবো না দেব্‌তা।

না পারো দিও না।

আপনি কি মাকে বলে দেবেন?

রাখাল কহিল, না। ছেলেবেলায় বাবা মারা গেলে তোমার মতো নিঃসহায় হয়ে আমিও একদিন তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইতে যাই। ভিক্ষে কি দিলেন জানো? যা প্রয়োজন, যা চাইলাম,—সমস্ত। তারপরে হাত ধরে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে এলেন,—অন্ন দিয়ে বস্ত্র দিয়ে বিদ্যে দান করে আমাকে এত বড় করলেন। আজ তাঁরই কাছে যাবো পরের হয়ে দয়ার আর্জি পেশ করতে? না, তা করব না। যা করা উচিত তিনি আপনি করবেন, কাউকে তোমার সুপারিশ ধরতে হবে না।

মেয়েটা অল্পক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, আপনাকে কখনো ত এ বাড়িতে দেখিনি?

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কতদিন এ বাড়িতে এসেছো?

প্রায় দু'বছর।

রাখাল কহিল, এর মধ্যে আমার আসার সুযোগ হয়নি।

মেয়েটি আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কলকাতায় কত লোকে চাকরি করে, আমার কি কোথাও একটা দাসীর কাজ যোগাড় হতে পারে না?

রাখাল বলিল, পারে। কিন্তু তোমার বয়স কম, তোমার উপর উপদ্রব ঘটতে পারে। তোমাদের ঘরের ভাড়া কত?

সারদা কহিল, আগে ছিল ছ টাকা, কিন্তু এখন দিতে হয় শুধু তিন টাকা।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ কমে গেল কেন? বাড়ি-আলাদের তো এ স্বভাব নয়।

সারদা বলিল, জানিনে। বোধ হয় ইনি কখনো তাঁর দুঃখ জানিয়ে থাকবেন।

রাখাল লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তবেই দেখো। আমি বলচি তোমার ভাবনা নেই, তুমি চল। আচ্ছা তোমার খেতে-পরতে মাসে কত লাগে?

সারদা চিন্তা না করিয়াই কহিল, বোধ হয় আরও তিন-চার টাকা লাগবে।

রাখাল হাসিল, কহিল, তুমি বোধ হয় একবেলা খাবার কথাই ভেবে রেখেচো সারদা, কিন্তু তা-ও কুলোবে না। আচ্ছা, তুমি কি বাংলা লেখাপড়া জানো না?

সারদা কহিল, জানি। আমার হাতের লেখাও বেশ স্পষ্ট।

রাখাল খুশী হইয়া উঠিল, কহিল, তা হলে তো কোন চিন্তাই নেই। তোমাকে আমি লেখা এনে দেবো, যদি নকল করে দাও, তোমাকে দশ-পনেরো-কুড়ি টাকা পর্যন্ত আমি স্বচ্ছন্দে পাইয়ে দিতে পারবো ; কিন্তু যত্ন করে লিখতে হবে, বেশ স্পষ্ট আর নির্ভুল হওয়া চাই। কেমন, পারবে তো?

সারদা প্রত্যুত্তরে শুধু মাথা নাড়িল, কিন্তু আনন্দে তাহার সমস্ত মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দেখিয়া রাখালের আর একবার চমক লাগিল। অন্ধকার গৃহের মধ্যে আকস্মিক বিদ্যুদ্দীপালোকে এই মেয়েটির আশ্চর্য রূপে যেন সে একটা অত্যাশ্চর্য মূর্তির সাক্ষাৎ লাভ করিল।

রাখাল কহিল, যাই এবার গাড়ি ডেকে আনি গে?

মেয়েটি বলিল, হাঁ আনুন। আর আমার ভাবনা নেই। বোধ হয় এইজন্যেই আমি যেতে পেলাম না, ভগবান আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

রাখাল গাড়ি আনিতে গেল, ভাবিতে ভাবিতে গেল, সারদা আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে। একদিকে এই কটি টাকা, আর একদিকে—? তুলনা করিতে পারে এমন কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল নতুন-মার সন্ধানে উপরে গিয়া শুনিল তিনি বাড়ি নাই। কখন এবং কোথায় গিয়াছেন দাসী খবর দিতে পারিল না। কেবল এইটুকু বলিতে পারিল যে, বাড়ির মোটরখানা আস্তাবলেই পড়িয়া আছে, সুতরাং হয় তিনি আর কোন গাড়ি পথের মধ্যে ভাড়া

করিয়া লইয়াছেন, না হয় পায়ে হাঁটিয়াই গেছেন।

রাখাল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, সঙ্গে কে গেছে?

দাসী কহিল, কেউ না। দারোয়ানজীকেও দেখলুম বাইরে বসে আছে।

আর নবীনবাবু?

দাসী কহিল, আমাদের বাবু? তিনি ত রোজ আসেন না। এলেও রাত্রি নটা-দশটা হয়।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রোজ আসেন না তার মানে? না এলে থাকেন কোথায়?

দাসী একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, কেন, তাঁর কি বাড়ি-ঘরদোর নেই নাকি?

রাখাল আর দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না, মনে মনে বুঝিল আসল ব্যাপারটা ইহাদের অজানা নয়। নীচে আসিয়া দেখিল সারদাকে ঘিরিয়া সেখানে মেয়েদের প্রকাণ্ড ভিড়। আর শিশুর দল, যাহারা তখন পর্যন্ত ঘুমায় নাই, তাহাদের আনন্দ-কলরোলে হাট বসিয়া গেছে। তাহাকে দেখিয়া সকলেই সরিয়া গেল,—যে-প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির জিম্মায় সারদার ঘরের চাবি ছিল সে আসিয়া তালা খুলিয়া দিয়া গেল।

রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার স্বামীর কোন খবর পাওয়া যায়নি?

সারদা কহিল, না।

আশ্চর্য!

না, আশ্চর্য এমন আর কি।

বলো কি সারদা এর চেয়ে বড় আশ্চর্য আর কিছু আছে নাকি?

সারদা ইহার জবাব দিল না। কহিল, আমি আলোটা জ্বালি, আপনি আমার ঘরে এসে একটু বসুন। ততক্ষণ মাকে একবার প্রণাম করে আসি গে।

রাখাল কহিল, মা বাড়ি নেই।

সারদা কহিল, নেই?—কোথাও গেছেন বোধ করি। হয় কালীঘাটে, নয় দক্ষিণেশ্বরে—এমন প্রায়ই যান—কিন্তু এখুনি ফিরবেন। আমি আলোটা জ্বালি, হাত-মুখ ধোবার জল এনে দিই,—একটু বসুন, আমার ঘরে আপনার পায়ের ধুলো পড়ুক।

রাখাল সহাস্যে কহিল, পায়ের ধুলো পড়তে বাকী নেই সারদা, সে আগেই পড়ে গেছে।

সারদা বলিল, সে জানি। কিন্তু সে আমার অজ্ঞানে—আজ সজ্ঞানে পড়ুক আমি চোখে দেখি।

রাখাল কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। কথাটা অভাবনীয়ও নয় অবাক হইবার মতোও নয়—সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে বাঁচাইয়াছে, এবং বাঁচিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছে—এই মেয়েটি পল্লীগ্রামের যত অল্প-শিক্ষিতাই হউক, তাহার সকৃতজ্ঞ চিত্ত-তলে এমন একটি সকরুণ প্রার্থনা নিতান্তই স্বাভাবিক ; কিন্তু কথাটির জন্য ত নয়, বলিবার অপরূপ বিশিষ্টতায় রাখাল অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিল, এবং বহু পরিচিত রমণীর মুখ ও বহু পরিচিত কণ্ঠস্বর তাহার চক্ষের পলকে মনে পড়িয়া গেল। একটু পরে বলিল, আচ্ছা আলো জ্বালো ; কিন্তু আজ আমার কাজ আছে—কাল-পরশু আবার আমি আসবো।

আলো জ্বালা হইলে সে ক্ষণকালের জন্য ভিতরে আসিয়া তক্তপোশে বসিল। পকেট হইতে কয়েকটা টাকা বাহির করিয়া পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এটা তোমার পারিশ্রমিকের সামান্য কিছু আগাম সারদা।

কিন্তু আমাকে দিয়ে আপনার কাজ চলে তবেই ত? প্রথমে হয়তো খারাপ হবে কিন্তু আমি নিশ্চয় শিখে নেবো। দেখবেন আমরা হাতের লেখা? আনবো কালি-কলম? বলিয়া সে তখনি উঠিতেছিল, কিন্তু রাখাল ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল,—না না, এখন থাক। আমি জানি তোমার হাতের লেখা ভালো, আমার বেশ কাজ চলে যাবে।

সারদা একটুখানি শুধু হাসিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাড়িতে কে কে আছেন দেব্‌তা?

রাখাল জবাব দিল, এখানে আমার তো বাড়ি নয়, আমার বাসা। আমি একলা থাকি।

তাঁদের আনেন্ না কেন?

রাখাল বিপদে পড়িল। এ প্রশ্ন তাহাকে অনেকেই করিয়াছে, জবাব দিতে সে চিরদিনই কুণ্ঠা বোধ করিয়াছে ; ইহারও উত্তরে বলিল, শহরে আনা কি সহজ?

সহজ যে নয় এ কথা মেয়েটি নিজেই জানে। হয়তো তাহারও কোন পল্লী অঞ্চলের কথা মনে পড়িল, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখানে কে তবে আপনার কাজ করে দেয়?

রাখাল বলিল, ঝি আছে?

রাঁধে কে? বামুনঠাকুর?

রাখাল সহাস্যে কহিল, তবেই হয়েছে। সামান্য একটি প্রাণীর রান্নার জন্যে একটা গোটা বামুনঠাকুর? আমি নিজেই করে নিই। কুকার বলে একটা জিনিসের নাম শুনেচো? তাতে আপনি রান্না হয়। শুধু খাবার সামগ্রীগুলো সাজিয়ে রেখে দিলেই হোল।

সারদা বলিল, আমি জানি। তারপরে খাওয়া হয়ে গেলে ঝি মেজে-ধুয়ে রেখে দিয়ে যায়?

হাঁ, ঠিক তাই।

সে আর কি কি কাজ করে?

রাখাল কহিল, যা দরকার সমস্ত করে দেয়। আমি তাকে বলি নানী—আমাকে কোনকিছু ভাবতে হয় না । আচ্ছা, তোমার আজ কি খাওয়া হবে বলো তো? ঘরে জিনিসপত্র তো কিছু নেই, দোকান থেকে আনিয়ে দিয়ে যাবো?

সারদা বলিল, না আজ আমার সকলের ঘরে নেমতন্ন। কিন্তু আপনাকে গিয়ে ত রান্নার চেষ্টা করতে হবে?

রাখাল কহিল, না, হবে না। যে করবার সে করে রেখেচে।

আচ্ছা, ধরুন যদি তার অসুখ হয়ে থাকে?

না হয়নি। তার বুড়ো-হাড় খুব মজবুত। তোমাদের মতো অল্পে ভেঙ্গে পড়ে না।

কিন্তু দৈবাতের কথা তো বলা যায় না, হতেও তো পারে—তা হলে?

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলেও ভাবনা নেই। আমার বাসার কাছেই ময়রার দোকান, সে আমাকে ভালবাসে, কষ্ট পেতে দেয় না।

সারদা কহিল, আপনাকে সবাই ভালবাসে। তখনি বলিল, আপনি চা খেতে খুব ভালবাসেন— কে তোমাকে বললে?

আপনি নিজেই সেদিন হাসপাতালে বলছিলেন। আপনার মনে নেই। অনেকক্ষণ তো কিছু খাননি, তৈরি করে আনবো? একটুখানি বসবেন?

কিন্তু চায়ের ব্যবস্থা তো তোমার ঘরে নেই, কোথায় পাবে?

সে আমি খুব পাবো, বলিয়া সারদা দ্রুতপদে উঠিয়া যাইতেছিল, রাখাল তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, এমন সময়ে চা আমি খাইনে সারদা, আমার সহ্য হয় না।

তবে কিছু খাবার আনিয়ে দিই—দেবো? অনেকক্ষণ কিছু খাননি, নিশ্চয় আপনার খুব ক্ষিদে পেয়েছে।

কিন্তু কে এনে দেবে? তোমার তো লোক নেই।

আছে। হাবু আমার খুব কথা শোনে, তাকে বললেই ছুটে যাবে। বলিয়াই সে আবার তেমনি ব্যস্ত হইয়া উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু এবারও রাখাল বারণ করিল।

সারদা জিদ করিল না বটে, কিন্তু তাহার বিবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া রাখালের আবার সেই সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের মুখ মনে পড়িল। ইহাদের মধ্যে তাহার অনেক আনাগোনা, অনেক জানাশুনা, অনেক সভ্যতা ভদ্রতার দেনা-পাওনা, কিন্তু ঠিক এই জিনিষটি সে যেন অনেকদিন হইল ভুলিয়া আছে। তাহার নিজের জননীর স্মৃতি অত্যন্ত ক্ষীণ, অতি শৈশবেই তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন,—একখানি খোড়ো-ঘরের দাওয়ায় বেড়া দিয়া ঘেরা একটু ছোট্ট রান্নাঘর, সেখানে রাঙ্গা-পাড়ের কাপড়-পরা কে যেন রন্ধন করিতেন—হয়তো ইহার সবটুকুই তাহার কল্পনা—কিন্তু

সে তাহার মা—সেই মায়ের একান্ত অস্ফুট মুখের ছবিখানি আজ হঠাৎ যেন তাহার চোখে পড়িতে লাগিল। মনের ভিতরটা কেমন ধারা করিয়া উঠিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কিছু মনে করো না সারদা, আজ আমি যাই। আবার যেদিন সময় পাবো আমি নিজে চেয়ে তোমার চা, তোমার জলখাবার খেয়ে যাবো।

সারদা গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া বলিল, আমার লেখার কাজটা কবে এনে দেবেন?

এর মধ্যেই একদিন দিয়ে যাবো।

আচ্ছা।

তথাপি কিসের জন্য সে যেন ইতস্ততঃ করিতেছে অনুমান করিয়া রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আর কিছু বলবে?

সারদা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, প্রথমে হয়তো আমার ঢের ভুল হবে। আপনি কিন্তু রাগ করবেন না। রাগ করে আমাকে ফেলে দিলে আর আমার দাঁড়াবার জায়গা নেই।

তাহার সভয় কণ্ঠের সকাতর প্রার্থনায় করুণায় বিগলিত হইয়া রাখাল বলিল, না সারদা, আমি রাগ করবো না। তুমি কিন্তু শিখে নেবার চেষ্টা কোরো।

প্রত্যুত্তরে এবার সে শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল। তারপরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ফিরিবার পথটা রাখাল হাঁটিয়াই চলিল। ট্রামের গাড়িতে অনেকের মধ্যে গিয়া বসিতে আজ তাহার কিছুতেই ইচ্ছা হইল না।

সে গরীব লোক, উল্লেখ করিবার মতো বিদ্যার পুঁজিও নাই, নাম করিবার মতো আত্মীয়-স্বজনও নাই, তবুও সে যে এই শহরে বহু গৃহে, বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে আপনজন হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল সে কেবল তাহার নিজের গুণে। তাঁহাদের স্নেহ, সহৃদয়তার অভাব ছিল না, অনুকম্পাও প্রচুর ছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত একটা অনির্দিষ্ট উপেক্ষার ব্যবধানে কেহ তাহাকে এর চেয়ে কাছে টানিয়া কোনদিন লয় নাই। কারণ, সে ছিল শুধু রাখাল—তার বেশী নয়। ছেলে-টেলে পড়ায়, মেসে-টেসে থাকে। সেটা কোন্‌খানে না জানিলেও তাহার বাসার ঠিকানায় বরানুগমনের আমন্ত্রণলিপি ডাক-যোগে অনেক আসে। প্রীতিভোজের নিমন্ত্রণে নাম তাহার বাদ যায় না, এবং না গেলে সেদিনে না হউক, দু'দিন পরেও এ কথা তাঁহাদের মনে পড়ে। কাজের বাড়িতে তাহার অনুপস্থিতি বস্তুতঃই বড় বিসদৃশ ; জীবনে অনেক বিবাহের ঘটকালি সে করিয়াছে, অনেক পাত্র-পাত্রী খুঁজিয়া বাছিয়া দিয়াছে—সে পরিশ্রমের সীমা নাই। হর্ষাপ্লুত পিতা-মাতা সাধুবাদে দুই কান পূর্ণ করিয়া তাহাকে বলিয়াছে, রাখাল বড় ভালো লোক, রাখাল বড় পরোপকারী। কৃতজ্ঞতার পারিতোষিক এমনি করিয়া চিরদিন এইখানেই সমাপ্ত হইয়াছে। এজন্য বিশেষ কোন অভিযোগ যে তাহার ছিল তাও নয়। শুধু, কখনো হয়তো চাকরির নিষ্ফল উমেদারির দিনগুলা মাঝে মাঝে মনে পড়িত। কিন্তু সে এমনই বা কি।

ভিড়ের মধ্যে চলিতে চলিতে আজ আবার বার বার সেই-সকল বহু-পরিচিত মেয়েদের কথা মনে পড়িতে লাগিল। তাহাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব, আলাপ-আলোচনা, পড়া-শুনা, হাসি-কান্না—এমন কত কি! ব্যক্ত-অব্যক্ত কত না চঞ্চল প্রণয়কাহিনী, মিলন-বিচ্ছেদের কত না অশ্রুসিক্ত বিবরণ!

কিন্তু রাখাল? বেচারা বড় ভালো লোক, বড় পরোপকারী। ছেলে-টেলে পড়ায়—মেসে-টেসে থাকে।

আর আজ? কি বলিল সারদা? বলিল, দেব্‌তা, আমার অনেক ভুল হবে, কিন্তু তুমি ফেলে দিলে আমার আর দাঁড়াবার স্থান নেই। হয়তো সত্যিই নাই। কিংবা—? হঠাৎ তাহার ভারী হাসি পাইল। নিজের মনেই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, রাখাল বড় ভালো লোক—রাখাল বড় পরোপকারী।

পাশের অপরিচিত পথিক অবাক হইয়া তাহার মুখে পানে চাহিয়া সেও হাসিয়া ফেলিল। লজ্জিত রাখাল আর একটা গলি দিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

পাঁচ

বাসায় পৌঁছিয়া রাখাল দুইখানা পত্র পাইল—দুই-ই বিবাহের ব্যাপার। একখানায় ব্রজবিহারী জানাইয়াছেন, রেণুর বিবাহ এখন স্থগিত রহিল এবং সংবাদটা নতুন-বৌকে যেন জানানো হয়। অন্যান্য কয়েকটা মামুলি কথার পরে তিনি চিঠির শেষের দিকে লিখিয়াছেন, নানা হাঙ্গামায় সম্প্রতি অতিশয় ব্যস্ত, আগামী শনিবারের বিকালের দিকে নিজে তোমার বাসায় গিয়া সমুদয় বিষয় বিস্তারিত মুখে বলিব। দ্বিতীয় পত্র আসিয়াছে কর্তার নিকট হইতে। অর্থাৎ যাঁহার ছেলে-মেয়েকে সে পড়ায়। ভাইপোর বিবাহ হঠাৎ স্থির হইয়াছে দিল্লীতে, কিন্তু অতদূরে যাওয়া তাঁহার নিজের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং তেমন বিশ্বাসী লোকও কেহ নাই। সুতরাং বরকর্তা সাজিয়া রাখালকেই রওনা হইতে হইবে। সামনের রবিবারে যাত্রা না করিলেই নয়, অতএব শীঘ্র আসিয়া দেখা করিবে। এই কয়দিনের কামাইয়ের জন্য যে তিনি ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতির উল্লেখ করেন নাই, ইহাই রাখাল যথেষ্ট মনে করিল। সেই যাই হউক, মোটের উপর দুইটি খবরই ভালো। রেণুর বিবাহব্যাপারে তাহার মনের মধ্যে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। 'এখন স্থগিত' থাকার অর্থ বেশ স্পষ্ট না হইলেও পাগল বরের সহিত বিবাহ হইয়া যে চুকিয়া যায় নাই, ইহাতেই সে পুলকিত হইল। দ্বিতীয়, দিল্লী যাওয়া। ইহাও নিরানন্দের নহে। সেখানে প্রাচীনদিনের বহু স্মৃতি-চিহ্ন বিদ্যমান, এতদিন সে-সকল কথা কেবল পুস্তকে পড়িয়াছে ও লোকের মুখে শুনিয়াছে, এবার এই উপলক্ষে সমস্ত চোখে দেখা ঘটিবে।

পরদিন সকালেই সে চিঠি লইয়া নতুন-মার সঙ্গে দেখা করিল, তিনি হাসিমুখে জানাইলেন শুভ-সংবাদ পূর্বাহ্নেই অবগত হইয়াছেন, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণের অপেক্ষায় অনুক্ষণ অধীর হইয়া আছেন। একটা প্রবল অন্তরায় যে ছিলই তাহা নিঃসন্দেহ, তথাপি কি করিয়া যে ঐ শান্ত দুর্বল প্রকৃতির মানুষটি একাকী এতবড় বাধা কাটাইয়া উঠিল তাহা সত্যিই বিস্ময়কর।

রাখাল কহিল, রেণু নিশ্চয়ই তার বাপের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল নতুন-মা, নইলে কিছুতে এ বিয়ে বন্ধ করা যেতো না।

নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, জানিনে তো তাকে, হতেও পারে বাবা।

রাখাল জোর দিয়া বলিল, কিন্তু আমি তো জানি। তুমি দেখে নিয়ো মা, আমার অনুমানই সত্যি। সে নিজে ছাড়া হেমন্তবাবুকে কেউ থামাতে পারতো না।

নতুন-মা আর তর্ক করিলেন না, বলিলেন, যাই হোক, শনিবার বিকালে আমিও তোমার ওখানে গিয়ে হাজির থাকবো রাজু, সব ঘটনা নিজের কানেই শুনবো। আরও একটা কাজ হবে বাবা, আর একবার তোমার কাকাবাবুর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে আসতে পারবো।

তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া সে নীচে একবার সারদার ঘরটা ঘুরিয়া গেল, দেখিল ইতিমধ্যেই সে ছেলেদের কাছে কাগজ-কলম চাহিয়া লইয়া নিবিষ্ট মনে হাতের লেখা পাকাইতে বসিয়াছে। রাখালকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া এ-সকল সে লুকাইবার চেষ্টা করিল না, বরঞ্চ যথোচিত মর্যাদার সহিত তাহাকে তক্তপোশে বসাইয়া কহিল, দেখুন তো দেব্‌তা, এতে কি আপনার কাজ চলবে?

সারদার হস্তাক্ষর যে এতখানি সুস্পষ্ট হইতে পারে রাখাল ভাবে নাই, খুশী হইয়া বার বার প্রশংসা করিয়া কহিল, এ আমার নিজের লেখার চেয়েও ভাল সারদা, আমাদের খুব কাজ চলে যাবে। তুমি যত্ন করে লেখাপড়া শেখ, তোমার খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না। হয়তো, তুমিই কত লোকের খওয়া-পরার ভার নেবে।

শুনিয়া অকৃত্রিম আনন্দে মেয়েটির মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রাখাল মিনিট-দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিল, টাকাটা তুমি কাছে রাখো সারদা, এ তোমারই। আমি এক বন্ধুর বিয়ে দিতে দিল্লী যাচ্ছি, ফিরতে বোধ হয় দশ-বারো দিন দেরি হবে—এসে তোমার লেখা এনে দেবো—কি বলো? কিচ্ছু ভেবো না—কেমন?

সারদা কহিল, আমার টাকার এখন দরকার ছিল না দেব্‌তা—সে-ই এখনও খরচ হয়নি।

তা হোক, তা হোক—এ টাকাও আপনিই শোধ হয়ে যাবে। যদি হঠাৎ আবশ্যক হয়, কার

কাছে চাইবে বলো? কিন্তু আমার জন্যে চিন্তা কোরো না যেন, আমি যত শীঘ্র পারি চলে আসবো। এসেই তোমাকে লেখা দিয়ে যাবো।

সারদার নিকট বিদায় লইয়া রাখাল তাহার মনিব-বাটীতে উপস্থিত হইল, সেখানে কর্তা-গৃহিণী ও তাহাতে বহু বাদানুবাদের পর স্থির হইল, সমস্ত দলবল লইয়া তাহাকে রবিবার রাত্রির গাড়িতেই যাত্রা করিতে হইবে। গৃহিণী বলিয়া দিলেন, রাখাল, তোমার নিজের বন্ধু-বান্ধব কেউ যেতে চায় তো স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেয়ো,—সব খরচ তাদের। মনে রেখো, এ-পক্ষের তুমিই কর্তা, টাকাকড়ি, গয়নাগাঁটি, জিনিসপত্র, সমস্ত দায়িত্ব তোমার।

রাখালের সর্বাগ্রে মনে পড়িল তারককে। সে হুঁশিয়ার লোক, তাহাকে সঙ্গে লইতে হইবে, বিনা খরচায় এ সুযোগ নষ্ট করা হইবে না। কেবল একটা আশঙ্কা ছিল লোকটার একঝোঁকা নৈতিক বুদ্ধিকে। সেখানে উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন উঠিয়া পড়িলে তাহাকে রাজী করানো কঠিন হইবে; কিন্তু ইতিমধ্যে সে যে মাস্টারি লইয়া বর্ধমানে চলিয়া যাইতে পারে এ কথা তাহার মনেও হইল না। কারণ, তাহার ফিরিয়া আসার অপেক্ষা করিতে না পারুক, একখানা চিঠি লিখিয়াও রাখিয়া যাইবে না এমন হইতেই পারে না। রবিবারের এখনো তিনদিন বাকী ইহার মধ্যে সে আসিয়া দেখা করিবেই, না হয় কাল একবার সময় করিয়া তাহাকে নিজেই তারকের মেসে গিয়া খবরটা দিয়া আসিতে হইবে। বাসায় ফিরিয়া রাখাল নানা কাজে ব্যাপৃত হইয়া পড়িল। সে শৌখিন মানুষ, এ-কয়দিনের অবহেলায় ঘরের বহু বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, যাবার পূর্বে সে-সকল ঠিক করিয়া ফেলা চাই। সাহেববাড়ি হইতে একটা ভালো তোরঙ্গ কেনা প্রয়োজন, বিদেশে চাবি খুলিয়া কেহ কিছু চুরি করিতে না পারে। বরকর্তার উপযুক্ত মর্যাদার জামা-কাপড় আলমারিতে কি-কি আছে দেখা দরকার, না থাকিলে তাড়াতাড়ি তৈরি করাইয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। আর শুধু তারক ত নয়, যোগেশবাবুকেও একবার বলিতে হইবে। তাঁহার পশ্চিমে যাইবার অনেকদিনের শখ, কেবল অর্থাভাবেই মিটাইতে পারেন নাই। অফিসের বড়বাবুকে ধরিয়া যদি দিন-দশেকের ছুটি মঞ্জুর করানো যায় তো যোগেশ আজীবন কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে। মনিবগৃহেও অন্ততঃ একবারও যাওয়া চাই, না হইলে ছোটখাটো ভুলচুক ধরা পড়িবে কেন? আলোচনা দরকার, কারণ বিদেশে সমস্ত দায়িত্বই যে একা তাহার। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে এত কাজ কি করিয়া যে সে সম্পন্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না। শনিবারের বিকালটা তো কেবল নতুন-মা ও ব্রজবাবুর জন্যই রাখিতে হইবে, সেদিন হয়তো কিছুই করা যাইবে না। ইতিমধ্যে মনে করিয়া পোস্টাফিস হইতে কিছু টাকা তুলিতে হইবে, কারণ নিজের সম্বল না লইয়া পথ চলা বিপজ্জনক। কাজের ভিড়ে ও তাগাদায় রাখাল চোখে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু একটা কান তাহার অনুক্ষণ দরজায় পড়িয়াই থাকে—তারকের কড়া নাড়া ও কণ্ঠস্বরের প্রতীক্ষায়, কিন্তু তাহার দেখা নাই। এদিকে বৃহস্পতিবার পার হইয়া শুক্রবার আসিয়া পড়িল। দুপুরবেলা পোস্টাফিসে গেল সে টাকা তুলিতে। কিছু বেশি তুলিতে হইবে। মনে ছিল, যদি তারক বলিয়া বসে তাহার বাহিরে যাইবার মতো জামা-কাপড় নাই, তা হইলে কোনমতে এই বাড়তি টাকাটা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিতে হইবে। এতে মুশকিল আছে। সে না করে ধার, না চায় দান, না লয় উপহার। একটা আশা, রাখালের পীড়াপীড়িতে সে অবশেষে হার মানে। সময় নষ্ট করা চলিবে না। পোস্টাফিস হইতেই একটা ট্যাক্সি লইতে হইবে। তারক একটু রাগ করিবে বটে—তা করুক।

কিন্তু টাকা তুলিতে অযথা বিলম্ব ঘটিল। বিরক্ত-মুখে বাহিরে আসিয়া গাড়ি ভাড়া করিতেছে, পাড়ার পিয়ন হাতে একখানা চিঠি দিল। লেখা তারকের। খুলিয়া দেখিল, সে বর্ধমানের কোন্ এক পল্লীগ্রাম হইতে সেই হেডমাস্টারির খবর দিয়াছে এবং আসিবার পূর্বে দেখা করিয়া আসিতে পারে নাই বলিয়া দুঃখ জানাইয়াছে। নতুন-মা ও ব্রজবাবুকে প্রণাম নিবেদন করিয়াছে, এবং পত্রের উপসংহারে আশা করিয়াছে, অনতিকাল মধ্যেই দিন কয়েকের ছুটি লইয়া না বলিয়া চলিয়া আসার অপরাধে স্বয়ং গিয়া ক্ষমাভিক্ষা করিবে। ইহাও লিখিয়াছে যে রেণুর বিবাহ বন্ধ হওয়ার সংবাদ সে জানিয়াই আসিয়াছে। রাখাল চিঠিটা পকেটে রাখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক

ট্যাক্সিভাড়াটা বাঁচল।

পরদিন বিকালে রাখাল নূতন তোরঙ্গে কাপড়-চোপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল, ফিরিতে দিন দশেক দেরি হইব, নতুন-মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাখাল প্রণাম করিয়া চৌকি অগ্রসর করিয়া দিল, তিনি বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল রাত্রেই তোমাদের যেতে হবে বুঝি বাবা?

হাঁ মা, কালই সবাইকে নিয়ে রওনা হতে হবে।

ফিরতে দিন-আষ্টক দেরি হবে বোধ হয়?

হাঁ মা, আট-দশদিন লাগবে।

নতুন-মা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ক'টা বাজলো রাজু?

রাখাল দেয়ালের ঘড়ির পানে চাহিয়া বলিল, পাঁচটা বেজে গেছে। আমার ভয় ছিল আপনার আসতেই হয়তো বিলম্ব হবে, কিন্তু আজ কাকাবাবুই দেরি করলেন।

দেরি হোক বাবা, তিনি এলে বাঁচি।

রাখাল হাসিয়া বলিল, পাগলের সঙ্গে বিয়েটা যখন বন্ধ হয়ে গেছে তখন ভাবনার ত আর কিছু নেই মা! তিনি না আসতে পারলেও ক্ষতি নেই।

নতুন-মা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, কেবল রেণুই ত নয়, তোমার কাকাবাবুও রয়েছেন যে। আমি কেবলই ভাবি, ঐ নিরীহ শান্ত মানুষটি না জানি একলা কত লাঞ্ছনা, কত উৎপীড়নই সহ্য করেছেন। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

রাখাল মনে মনে মামাবাবু হেমন্তকুমারের চাকার মতো মস্ত মুখখানা স্মরণ করিয়া নীরব হইয়া রহিল। এ কাজ যে সহজে হয় নাই তাহা নিশ্চয়।

নতুন-মা বলিতে লাগিলেন, এ বিয়ে স্থগিত রইলো তিনি এইমাত্র লিখেচেন। কিন্তু কিছুদিনের জন্যে না চিরদিনের জন্যে সে ত এখনো জানতে পারা যায় নি রাজু।

রাখাল বলিয়া উঠিল, চিরদিনের জন্যে মা, চিরদিনের জন্যে। ঐ পাগলদের ঘরে আপনার রেণু কখনো পড়বে না, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

নতুন-মা বলিলেন, ভগবান তাই করুন ; কিন্তু ঐ দুর্বল মানুষটির কথা ভেবে মনের মধ্যে কিছুতে স্বস্তি পাচ্ছিনে রাজু। দিনরাত কত চিন্তা, কত রকমের ভয়ই যে হয় সে আর আমি বলবো কাকে?

রাখাল বলিল, কিন্তু ওঁকে কি আপনার খুব দুর্বল লোক বলে মনে হয় মা?

নতুন-মা একটুখানি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, দুর্বল-প্রকৃতির উনি ত চিরদিনই রাজু। তাতে আর সন্দেহ কি!

রাখাল বলিল, দুর্বল লোকে কি এত আঘাত নিঃশব্দে সইতে পারে মা? জীবনে কত ব্যথাই যে কাকাবাবু সহ্য করেছেন সে আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি। ঐ যে উনি আসচেন।

খোলা জানলার ভিতর দিয়া ব্রজবাবুকে সে দেখিতে পাইয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল এবং তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলে সে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। নতুন-মা কাছে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রজবাবু চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন, বলিলেন, রেণুর বিয়ে ওখানে দিতে দিইনি, শুনেছো নতুন-বৌ?

হাঁ, শুনেচি। বোধ হয় খুব গোলমাল হলো?

সে তো হবেই নতুন-বৌ?

তুমি নির্বিরোধী শান্ত মানুষ, আমার বড় ভাবনা ছিল কি করে তুমি এ-বিয়ে বন্ধ করবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, শান্তিই আমি ভালবাসি, বিরোধ করতে কিছুতে মন চায় না, এ কথা সত্যি। কিন্তু তোমার মেয়ে, অথচ তোমারই বাধা দেবার হাত নেই, কাজেই সব ভার এসে পড়লো আমার ওপর, একাকী আমাকেই তা বইতে হলো। সে দিন আমার বার বার কি কথা মনে হচ্ছিল জানো নতুন-বৌ, মনেহচ্ছিল আজ যদি তুমি বাড়ি থাকতে সমস্ত বোঝা তোমার ঘাড়ে ফেলে

দিয়ে আমি গড়ের মাঠে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে দিতাম। তাদের উদ্দেশে মনে মনে বললাম, আজ সে থাকলে তোমরা বুঝতে জুলুম করার সীমা আছে—সকলের ওপরেই সবকিছু চালানো যায় না।

সবিতা অধোমুখে নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। সেদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিবার সাহস তাঁহার হইল না। রাখালও তেমনি নির্বাক স্তব্ধ হইয়া রহিল। ব্রজবাবু নিজে হইতে ইহার অধিক ভাঙ্গিয়া বলিলেন না।

মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে রাখাল বলিল, কাকাবাবু আজ বড় আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তার হেতুও যথেষ্ট আছে রাজু। এই ছ-সাতদিন কারবারের কাগজপত্র নিয়ে ভারী খাটতে হয়েচে।

রাখাল সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সব ভালো ত কাকাবাবু?

ব্রজবাবু বলিলেন, ভালো একেবারেই নয়। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার সেই টাকাটা আমি বছর-খানেক আগে তুলে নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখেছিলাম, ভেবেছিলাম, আমার নিজের কারবারের চেয়ে বরঞ্চ এদের হাতেই ভয়ের সম্ভাবনা কম। এখন দেখচি ঠিকই ভেবেছিলাম। এখন এর ওপরেই ভরসা নতুন-বৌ, এটা না নিলেই এখন নয়।

সবিতা এবার মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, না নিলে কি নষ্ট হবার ভয় আছে?

আছে বৈ কি নতুন-বৌ—বলা তো যায় না।

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু কহিলেন, কি বলো নতুন-বৌ, চুপ করে রইলে যে?

সবিতা মিনিট-দুই নিরুত্তরে থাকিয়া বলিলেন, আমি আর কি বলবো মেজকর্তা। টাকা তুমিই দিয়েছিলে, তোমার কাজেই যদি যায় ত যাবে। কিন্তু আমারো ত আর কিছু নেই।

শুনিয়া ব্রজবাবু যেন চমকাইয়া গেলেন। খানিক পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, ঠিক কথা নতুন-বৌ এ দুঃসাহস করা আমার চলে না। তোমার টাকা আমি তোমাকেই ফিরিয়ে দেবো। কাল একবার আসবে?

যদি আসতে বলো আসবো।

আর তোমার গয়নাগুলো?

তুমি কি রাগ করে বলচো মেজকর্তা?

ব্রজবাবু সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বেদনায় মলিন হইয়া উঠিল, তারপরে বলিলেন, নতুন-বৌ, যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্চি আমি রাগ করে—এমন কথা আজ তুমিও ভাবতে পারলে?

সবিতা নতমুখে নীরব হইয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি একটুও রাগ করিনি নতুন-বৌ, সরল মনেই ফিরিয়ে দিতে চাইচি। তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক, ও ভার বয়ে বেড়াবার আর আমার সামর্থ্য নেই।

সবিতা এখনও তেমনি নির্বাক হইয়া রহিলেন, কোন জবাবই দিতে পারিলেন না।

সন্ধ্যা হয়, ব্রজবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আজ তা হলে যাই। কাল এমনি সময়ে একবার এসো—আমার অনুরোধ উপেক্ষা করো না নতুন-বৌ।

রাখাল তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, একটি বন্ধুর বিয়ে দিতে কাল রাতের গাড়িতে আমি দিল্লী যাচ্চি কাকাবাবু, ফিরতে বোধ করি আট-দশদিন দেরি হবে।

ব্রজবাবু বলিলেন, তা হোক, কিন্তু বিয়ে কি কেবল দিয়েই বেড়াবে রাজু, নিজে করবে না?

রাখাল সহাস্যে কহিল, আমাকে মেয়ে দেবে এমন দুর্ভাগা সংসারে কে আছে কাকাবাবু?

শুনিয়া ব্রজবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আছে রাজু। যারা আমাকে মেয়ে দিয়েছিল সংসারে তারা আজও লোপ পায়নি। তোমাকে মেয়ে দেবার দুর্ভাগ্য তাদের চেয়ে বেশী নয়। বিশ্বাস না

হয় তোমার নতুন-মাকে বরঞ্চ আড়ালে জিজ্ঞেসা করো, তিনি সায় দেবেন। চললাম নতুন-বৌ, কাল আবার দেখা হবে।

সবিতা কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিলেন; তিনি অস্ফুটে বোধ হয় আশীর্বাদ করিতে করিতেই বাহির হইয়া গেলেন।

পরদিন ঠিক এমনি সময়ে ব্রজবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হাতে তাঁহার শিলমোহর করা একটা টিনের বাক্স। সবিতা পূর্বাহ্ণেই আসিয়াছিলেন। বাক্সটা তাঁহার সামনে টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, এটা এতদিন ব্যাঙ্কেই জমা ছিল, এর ভেতরে তোমার সমস্ত গহনাই মজুত আছে দেখতে পাবে। আর এই নাও তোমার বায়ান্ন হাজার টাকার চেক। আজ আমি খালাস নতুন-বৌ, আমার বোঝা বয়ে বেড়াবার পালা সাঙ্গ হলো।

কিন্তু তুমি যে বলেছিলে এ-সব গয়না তোমার রেণু পরবে?

ব্রজবাবু কহিলেন, গয়না তো আমার নয় নতুন-বৌ, তোমার। যদি সেদিন কখনো আসে তাকে তুমিই দিও।

রাখাল বারে বারে ঘড়ির প্রতি চাহিয়া দেখিতেছিল, ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমার বোধ করি সময় হয়ে এলো রাজু?

রাখাল সলজ্জে স্বীকার করিয়া বলিল, ও-বাড়ি হয়ে সকলকে নিয়ে স্টেশনে যেতে হবে কিনা—

তবে আমি উঠি। কিন্তু ফিরে এসে একবার দেখা করো রাজু। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ায় কহিলেন কিন্তু আজ ত তোমার নতুনমার একলা যাওয়াটা উচিত নয়। কেউ পৌঁছে না দিলে—

রাখাল বলিল, একলা নয় কাকাবাবু। নতুন-মা দারোয়ান, নিজের মোটর, সমস্ত মোড়েই দাঁড়িয়ে আছে।

ওঃ—আছে? বেশ, বেশ। নতুন-বৌ, যাই তাহলে?

সবিতা কাছে আসিয়া কালকের মতো প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইলেন, আস্তে আস্তে বলিলেন, আবার কবে দেখা পাবো মেজকর্তা?

যেদিন বলে পাঠাবে আসবো। কোন কাজ আছে কি নতুন-বৌ?

না, কাজ কিছুই নেই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, শুধু এমনিই দেখতে চাও?

এ প্রশ্নের জবাব কি! সবিতা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, আমি বলি এ-সবের প্রয়োজন নেই নতুন-বৌ। আমার জন্যে মনের মধ্যে আর তুমি অনুশোচনা রেখো না, যা কপালে লেখা ছিল ঘটেছে—গোবিন্দ মীমাংসাও তার একরকম করে দিয়েচেন,—আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও, আমাকে অবিশ্বাস করো না নতুন-বৌ, আমি সত্যি কথাই বলচি।

সবিতা তেমনিই অধোমুখে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

রাখালের মনে পড়িল আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। অবিলম্বে গাড়ি ডাকিয়া তোরঙ্গটা বোঝাই দিতে হইবে। এবং এই কথাটাই বলিতে বলিতে সে ব্যস্তসমস্তে বাহির হইয়া গেল।

সবিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন, তাঁহার দুই চোখে অশ্রুর ধারা বহিতেছিল। ব্রজবাবু একটুখানি সরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, তোমার রেণুকে একবার দেখতে চাও কি নতুন-বৌ?

না মেজকর্তা, সে প্রার্থনা আমি করিনে।

তবে কাঁদচো কেন? কি আমার কাছে তুমি চাও?

যা চাইবো দেবে বলো?

ব্রজবাবু উত্তর দিতে পারিলেন না, শুধু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সবিতা কহিলেন, কতকাল বাঁচবো মেজকর্তা, আমি কি নিয়ে থাকবো?

ব্রজবাবু এ জিজ্ঞাসারও উত্তর দিতে পারিলেন না, ভাবিতে লাগিলেন। এমনি সময়ে বাহিরে রাখালের শব্দ-সাড়া পাওয়া গেল, সবিতা তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিলেন এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া সে ঘরে প্রবেশ করিল। কহিল, নতুন-মা, আপনার ড্রাইভার জিজ্ঞেসা করছিল, আর দেরি কতো চলুন না ভারী বাক্সটা আপনার গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি?

নতুন-মা বলিলেন, রাজু আমাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচে। আমি ওর আপদ-বালাই।

রাখাল হাতজোড় করিয়া জবাব দিল, মায়ের মুখে ও-নালিশ অচল নতুন-মা। এই রইলো আপনার রাজুর দিল্লী যাওয়া—ছেলেবেলার মতো আর একবার আজ মার কোলেই আশ্রয় নিলাম। এখান থেকে আর যেতে দিচ্চিনে মা—যত কষ্টই ছেলের ঘরে হোক।

সবিতা লজ্জায় যেন মরিয়া গেলেন। রাখাল বলিয়া ফেলিয়াই নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়াছিল, কিন্তু ভালোমানুষ ব্রজবাবু তাহা লক্ষ্যও করিলেন না। বরঞ্চ বলিলেন, বেলা গেছে নতুন-বৌ, বাক্সটা তোমার গাড়িতে রাজু তুলে দিয়ে আসুক, আমি ততক্ষণ ওর ঘর আগলাই। এই বলিয়া নিজেই বাক্সটা তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন।

প্রশ্নের উত্তর চাপা পড়িয়া রহিল, রাখালের পিছনে পিছনে নতুন-মা নীরবে বাহির হইয়া গেলেন।

ছয়

বিবাহ দিয়া রাখাল দিন দশ-বার পরে দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিল। বলা বাহুল্য, বরকর্তার কর্তব্যে তাহার ত্রুটি ঘটে নাই এবং কর্তা-গিন্নী অর্থাৎ মনিব ও মনিব-গৃহিণী তাহার কার্যকুশলতায় যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলেন।

কিন্তু তাহার এই কয়টা দিনের দিল্লী প্রবাস কেবল এইটুকুমাত্র ঘটনাই নয়, তথায় সে রীতিমত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আসিয়াছে। তাহার একটা ফল এই হইয়াছে যে, বিবাহযোগ্য আকাঙ্ক্ষিত পাত্র হিসাবে তাহাকে কয়েকটি মেয়ে দেখানো হইয়াছে। সাদামাটা সাধারণ গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে, পশ্চিমে থাকিয়া তাহাদের স্বাস্থ্য ও বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু অভিভাবকগণের নানা অসুবিধায় এখানো পাত্রস্থ করা হয় নাই। পীড়াপীড়ির উত্তরে রাখাল বলিয়া আসিয়াছে যে, কলিকাতায় তাহার কাকাবাবু ও নতুন-মার অভিমত জানিয়া পরে চিঠি লিখিবে। তাহার এ সৌভাগ্যের কারণ বন্ধু যোগেশ। সে বরযাত্রীর দলে ভিড়িয়া নিখরচায় দিল্লী, হস্তিনাপুর, কেল্লা, কুতুব মিনার ইত্যাদি এ-যাবৎ লোকমুখে শুনা দ্রষ্টব্য বস্তুনিচয় দেখিতে পাইয়াছে, অতএব বন্ধুকৃত্য বাকী রাখে নাই, কৃতজ্ঞতার ঋণ ষোল আনায় পরিশোধ করিয়াছে। লোকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, রাখালবাবু আজও বিবাহ করেন নাই কেন? যোগেশ জবাব দিয়াছে, ওর শখ। আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওদের মিলবে এমন আশা করাই যে অন্যায়। কন্যাপক্ষীয় সসঙ্কোচে প্রশ্ন করিয়াছে, উনি কলিকাতায় করেন কি? যোগেশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছে, বিশেষ কিছুই নয়। তার পর মুচকিয়া হাসিয়া কহিয়াছে, করার দরকারই বা কি!

এ কথার নানা অর্থ।

কলিকাতার বিশিষ্ট লোকদের বিবিধ তথ্য রাখালের মুখে-মুখে। বাড়ির মেয়েদের পর্যন্ত নাম জানা। নূতন ব্যারিস্টার, সদ্য পাস-করা আই-সি-এস-দের উল্লেখ সে ডাক-নাম ধরিয়া করে। পচু বোস, ডম্বল সেন, পটল বাঁড়ুয্যে—শুনিয়া অত দূরপ্রবাসের সামান্য চাকরিজীবী বাঙালীরা অবাক হইয়া যায়; কিন্তু এতকাল বিবাহের কথায় রাখাল শুধু যে মুখেই আপত্তি করিয়াছে তাই নয়, মনের মধ্যেও তার ভয় আছে। কারণ, নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সে অচেতন নয়। সে জানে, এই কলিকাতা শহরে তাহার পরিচিত বন্ধু-পরিধি যথেষ্ট সঙ্কুচিত না করিয়া পরিবার প্রতিপালন করা তাহার সাধ্যাতীত। যে-পরিবেষ্টনে এতকাল সে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়াছে, সেখানে ছোট হইয়া থাকার কল্পনা করিতেও সে পরাঙ্মুখ। তথাপি, নিঃসঙ্গ জীবনের নানা অভাব তাহাকে বাজে। বসন্তে বিবাহোৎসবের বাঁশি মাঝে মাঝে তাহাকে উতলা করে, বরানুগমনের সাদর আমন্ত্রণে মনটা হয়তো হঠাৎ বিরূপ হইয়া উঠে, সংবাদ পত্রে কোথায় কোন্

আত্মঘাতিনী অনূঢ়া কন্যার পাণ্ডুর মুখ অনেক সময়ে তাহাকে যেন দেখা দিয়া যায়, হয়তো বা অকারণ অভিমানে কখনো মনে হয়, সংসারে এত প্রাচুর্য এত অভাব, এত সাধারণ, এত নিরন্তরের মধ্যে শুধু সেই কি কাহারো চোখে পড়ে না? শুধু তাহাকেই মালা দিতে কোথাও কোন কুমারীই কি নাই?

কিন্তু এ-সকল তাহার ক্ষণিকের। মোহ কাটিয়া যায়, আবার সে আপনাকে ফিরিয়া পায়—হাসে, আমোদ করে, ছেলে পড়ায়, সাহিত্যালোচনায় যোগ দেয়,—আহ্বান আসিলে বিবাহের আসর সাজাইতে ছোটে, নব বর-বধূকে ফুলের তোড়া দিয়া শুভকামনা জানায়। আবার দিনের পর দিন যেমন কাটিতেছিস তেমনি কাটে। এতদিনের এই মনোভাবের এবার একটু পরিবর্তন ঘটিয়াছে দিল্লী হইতে ফিরিয়া। এবারে সে দেখিয়াছে কলিকাতাই সমস্ত দুনিয়া নয়, ইহারও বাহিরে বাঙালী বাস করে, তাহারাও ভদ্র,—তাহারাও মানুষ। তাহাকেও কন্যা দিতে প্রস্তুত এমন পিতা-মাতা আছে। কলিকাতায় যে-সমাজ ও যে-মেয়েদের সংস্পর্শে সে এতকাল আসিয়াছে, প্রবাসের সাধারণ ঘরের সে মেয়েগুলি হয়তো অনেক বিষয়ে খাটো। স্ত্রী বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিতে হয়তো আজও তাহার লজ্জা করিবে, তথাপি এই নতুন অভিজ্ঞতা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়াছে, বল দিয়াছে, ভরসা দিয়াছে।

সংসারে কাহারো ভার গ্রহণের শক্তি তাহার নাই। পরের মুখে-শেখা এই আত্ম-অবিশ্বাস এতদিন সকল বিষয়েই তাহাকে দুর্বল করিয়াছে। সে ভাবিয়াছে স্ত্রী-পুত্র কন্যা—তাহাদের কতদিকে কতরকমে প্রয়োজন, খাওয়া-পরা বাড়ি-ভাড়া হইতে আরম্ভ করিয়া রোগ শোক বিদ্যা অর্জন—দাবীর অন্ত নাই! এ মিটাইবে সে কোথা হইতে? কিন্তু তাহার এই সংশয়ে প্রথম কুঠার হানিয়াছে সারদা,—অকূল সমুদ্র-মাঝে সে যেদিন তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে—প্রত্যুত্তরে তাহাকেও যেদিন সে অভয় দিয়া বলিয়াছে, তোমার ভয় নেই সারদা, আমি তোমার ভার নিলাম। সারদা তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে,—বাঁচিতে চাহিয়াছে। এই পরের বিশ্বাসই রাখালকে এতদিনে নিজের প্রতি বিশ্বাসবান্ করিয়াছে। আবার এই বস্তুটাই তাহার বহুগুণে বাড়িয়া গেছে, এবার প্রবাস হইতে ফিরিয়া। তাহার কেবলই মনে হইয়াছে সে অক্ষম নয়, দুর্বল নয়, সংসারে অনেকের মতো সেও অনেক-কিছু পারে। এই নবজাগ্রত চেতনার বলিষ্ঠ চিত্ত লইয়া সে প্রথমেই দেখা করিতে গেল সারদার সঙ্গে। ঘরে তালা বন্ধ। একটি ছোট ছেলে খেলা করিতেছিল ; সে বলিল, বৌদি গেছে ওপরে গিন্নীমার ঘরে—রাত্তিরে আমাদের সক্কলের নেমতন্ন।

রাখাল উপরে গিয়া দেখিল সমারোহ ব্যাপার, লোক-খাওয়ানোর বিপুল আয়োজন চলিতেছে। রমণীবাবু অকারণে অতিশয় ব্যস্ত, কাজের চেয়ে অকাজই বেশী করিতেছেন এবং সারদা কোমরে কাপড় জড়াইয়া জিনিসপত্র ভাঁড়ারে গুছাইয়া তুলিতেছে। রমণীবাবু যেন বাঁচিয়া গেলেন—এই যে রাজু এসেছ! নতুন-বৌ?

সবিতা অন্যত্র ছিলেন, চীৎকারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রমণীবাবু হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেছে—রাজু এসে পড়েছে। বাবা, এখন থেকে সব ভার তোমার।

সবিতা বলিলেন, সেই ভালো, তুমি এখন ঘরে গিয়ে একটু জিরোও গে, আমরা নিস্তার পাই।

সারদা অলক্ষ্যে একটু হাসিল ; রাখালকে জিজ্ঞাসা করিল, কবে এলেন?

কাল।

কাল? তবে কালকেই এলেন না যে বড়ো?

অনেক কাজ ছিল, সময় পাইনি।

সবিতা সহাস্যে বলিলেন, ওকে মরা বাঁচিয়েছে বলে রাজুর ওপর মস্ত দাবী।

সারদা সন্দেশের ঝুড়িটা তুলিয়া লইয়া গেল।

রাখাল রমণীবাবুকে নমস্কার করিল এবং সবিতাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এত ধুমধাম কিসের নতুন-মা?

সবিতা স্মিতমুখে কহিলেন, এমনিই।

রমণীবাবু বলিলেন, হুঁ—এমনিই বটে, সেই মেয়ে তুমি। পরে তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন, উনি আধামূল্যে একটা মস্ত সম্পত্তি খরিদ করলেন, এ তারই খাওয়া। আমার সিঙ্গাপুরের পার্টনার এসেছে কলিকাতায়—বি. সি. ঘোষ নাম শুনেছো? শোনোনি—আচ্ছা, আজ রাত্তিরে তাকে দেখতে পাবে, কোটী টাকার মালিক। আরও আছে আমার এখানকার বন্ধু-বান্ধব উকিল-এটর্নী, মায় দু-তিনজন ব্যারিস্টার পর্যন্ত। একটু গান-বাজনাও হবে—খাসা গাইছে আজকাল মালতীমালা—শুনে সুখ পাবে হে। সবিতা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিতেই বলিয়া উঠিলেন, নাও, ছলনা রাখো। কিন্তু কপাল করেছিলে বটে! দেশে থাকতে কোন্ এক শালাকে অনেক টাকা ধার দিয়েছিলেন, সেইটেই হঠাৎ আদায় হয়ে গেল। ডোবা কড়ি বাবাজী, ডোবা কড়ি,—এমন কখনো হয় না। নিতান্তই বরাতের জোর! ব্যাটা ভয়ে পড়ে কেমন দিয়ে ফেললে! কিন্তু তাতেই কি কুলোলো? হাজার-দশেক কম পড়ে যায়, আমাকে আবদার ধরলেন, সেজবাবু, ওটা তুমি দিয়ে দাও। বললুম, শ্রীচরণে অদেয় কি আছে বলো? এ দেহ-মন-প্রাণ সবই তো তোমার! এই বলিয়া তিনি অত্যন্ত অরুচিকর স্থূল রসিকতার আনন্দে নিজেই হিঃ হিঃ হিঃ করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিলেন। রাখাল লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিল।

রমণীবাবু চলিয়া গেলে সবিতা বলিলেন, বেলা হলো, এইখানেই স্নান করে দুটি খেয়ে নাও বাবা, ও-বেলায় তোমাকে আবার অনেক খাটতে হবে। অনেক কাজ।

রাখাল কহিল, কাজে ভয় পাইনে মা, খাটতেও রাজী আছি, কিন্তু এ-বেলাটা নষ্ট করতে পারবো না। আমাকে ও-বাড়িতে একবার যেতে হবে।

কাল গেলে হয় না?

না।

তবে কখন আসবে বলো?

আসবো নিশ্চয়ই, কিন্তু কখন কি করে বলবো মা?

তারক এখানে নেই বুঝি?

না, সে তার বর্ধমানের মাস্টারিতে গিয়ে ভর্তি হয়েছে। থাকলেও হয়তো আসতো না।

তাহার তীব্র ভাবান্তর সবিতা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, একটু প্রসন্ন করিতে কহিলেন, ওঁর ওপর রাগ করো না রাজু, ওঁদের কথাবার্তাই এমনি।

এই ওকালতিতে রাখাল মনে মনে আরও চটিয়া গেল, বলিল, না মা, রাগ নয়, একটা গরুর ওপর রাগ করতে যাবোই বা কিসের জন্যে। বলিয়াই চলিয়া গেল। সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে কহিল, নাঃ—কৃতজ্ঞতার ঋণ মনে রাখা কঠিন।

যদিচ, রাখাল মনে মনে বুঝিয়াছে, যে-লোকটি নতুন-মার অত টাকার দেনা শোধ করিয়াছে তাহার নাম রমণীবাবু জানে না, তথাপি সেই ধর্মপ্রাণ সদাশয় মানুষটির প্রতি এই অশিষ্ট ভাবা সে ক্ষমা করিতে পারিল না। অথচ নতুন-মা আমলই দিলেন না, যেন কথাটা কিছুই নয়। পরিশেষে তাঁহারই প্রতি লোকটার কদর্য রসিকতা। কিন্তু এবার আর তাহার রাগ হইল না ; বরঞ্চ উহাই যেন তাহার মনের জ্বালাটাকে হঠাৎ হালকা করিয়া দিল। সে মনে মনে বলিল, এ ঠিকই হয়েছে। এই ওঁর প্রাপ্য। আমি মিথ্যে জ্বলে মরি।

বৌবাজারে ট্রাম হইতে নামিয়া গলির মধ্যে ঢুকিয়া ব্রজবিহারীবাবুর বাটীর সম্মুখে আসিয়া রাখালের মনে হইল তাহার চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়াছে—সে আর কোথাও আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি! দরজায় তালা দেওয়া, উপরের জানলাগুলো সব বন্ধ—একটা নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া হইবে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে প্রকৃতিস্থ করিয়া গলির মোড়ে মুদির দোকানে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানী অনেকদিনের এ-অঞ্চলের সকল ভদ্রগৃহেই সে মাল যোগায়। গিয়া ডাকিল, নবদ্বীপ, কাকাবাবুর বাড়ি ভাড়া কি-রকম?

নবদ্বীপ তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কিছু জানেন না রাখালবাবু?

না, আমি এখানে ছিলাম না।

নবদ্বীপ কহিল, দেনার জন্য বাবু বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন যে।

বাড়ি বিক্রি করে দিলেন! কিন্তু তারা সব কোথায়?

গিন্নী নিজের মেয়ে নিয়ে গেছেন ভায়ের বাড়ি। ব্রজবাবু রেণুকে নিয়ে বাসা ভাড়া করেছেন।

বাসাটা চেনো নবদ্বীপ?

চিনি, বলিয়া সে হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, এই সোজা গিয়ে বাঁ-হাতি গলিটার দুখানা বাড়ির পরেই সতের নম্বরের বাড়ি।

সতের নম্বরে আসিয়া রাখাল দরজায় কড়া নাড়িল, দাসী খুলিয়া দিয়া তাহাকে দেখিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, ফটিকের মা, কাকাবাবু কোথায়?

ওপরে রান্না করচেন।

বামুন নেই?

না।

চাকর?

মধু আছে, সে গেছে ওযুধ আনতে।

ওযুধ কেন?

দিদিমণির জ্বর, ডাক্তার দেখ্‌চে।

রাখাল কহিল, জ্বরের অপরাধ নেই। কবে এখানে আসা হলো?

দাসী বলিল, চার দিন। চার দিনই জ্বরে পড়ে।

ভিজা স্যাঁতসেঁতে উঠানময় জিনিসপত্র ছড়ানো, সিঁড়িটা ভাঙ্গা, রাখাল উপরে উঠিয়া দেখিল সামনের বারান্দার এককোণে লোহার উনুন জ্বালিয়া ব্রজবাবু গলদঘর্ম। সাগু নামিয়াছে, রান্নাও প্রায় শেষ হইয়াছে, কিন্তু হাত পুড়িয়াছে, তরকারি পুড়িয়াছে, ভাত ধরিয়া চোঁয়া গন্ধ উঠিয়াছে।

রাখালকে দেখিয়া ব্রজবাবু লজ্জা ঢাকিতে বলিয়া উঠিলেন, এই দ্যাখো রাজু, ফটিকের মার কাণ্ড! উনুনে এত কয়লা ঢেলেছে যে আঁচটা আন্দাজ করতে পারলাম না। ফ্যানটা যেন—একটু গন্ধ মনে হচ্ছে না?

রাখাল কহিল, তা হোক। আপনি উঠুন ত কাকাবাবু, বেলা বারোটা বেজে গেছে—গোবিন্দর পুজোটি সেরে নিন, আমি ততক্ষণ নতুন করে ভাতটা চড়িয়ে দিই—ফুটে উঠতে দশ মিনিটের বেশী লাগবে না। রেণু কৈ? বলিয়া সে পাশের ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সে নিজের বিছানায় শুইয়া। রাজুদাকে দেখিয়া তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। রাখাল কোনমতে নিজেরটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, কান্নাটা কিসের? জ্বর কি কারো হয় না? ও দু'দিনে সেরে যাবে, আর আমি ত মরিনি রেণু, ভাবনার কি আছে? উঠে বসো? মুখ-ধোয়া, কাপড়-ছাড়া হয়েছে ত?

রেণু মাথা নাড়িতেই রাখাল চেঁচাইয়া ডাকিল, ফটিকের মা, তোমার দিদিমণিকে সাগু দিয়ে যাও—বড্ড দেরি হয়ে গেছে। সে আসিলে বলিল, ভাতটা ধরে গেছে ফটিকের মা, ওতে চলবে না। তুমি, আমি, মধু আর কাকাবাবু—চারজনের মতো চাল ধুয়ে ফেলো, আমি নীচে থেকে চট করে স্নানটা সেরে আসি। কাঁচা আনাজ কিছু আছে ত?

আছে।

বেশ, তাও দুটো কুটে দাও দিকি, একটা চচ্চড়ি রেঁধে নিই,—আমি আবার এক তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারিনে।

রেলিঙের উপর কাচা-কাপড় শুকাইতেছিল, রাখাল টানিয়া লইয়া নীচে চলিল, বলিতে বলিতে গেল, কাকাবাবু, দেরি করবেন না, শিগগির উঠুন। রেণু নেয়ে এসে যেন দেখতে পাই তোমার খাওয়া হয়ে গেছে! মধু এসে পড়লে যে হয়—

বিষণ্ণ, নীরব গৃহের মাঝে হঠাৎ কোথা হইতে যেন একটা চেঁচামেচির ঝড় বহিয়া গেল।

স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখাল ভিজা মেজেয় পড়িয়া মিনিট দুই-তিন হাউ-

হাউ করিয়া কান্না জুড়িয়া দিল—ছেলেবেলায়, অকস্মাৎ যেদিন বিসূচিকায় তাহার বাপ মরিয়াছিল ঠিক সেদিনের মতো। তার পরে উঠিয়া বসিল ; ঘটি-কয়েক জল মাথায় ঢালিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। একেবারে সহজ মানুষ,—কে বলিবে ঘরে কপাট দিয়া এইমাত্র সে বালকের মতো মাটিতে পড়িয়া কি কাণ্ডই করিতেছিল।

রাঁধা-বাড়ায় রাখাল অপটু নয়। নিজের জন্য এ কাজ তাহাকে নিত্য করিতে হয়। সে অল্পক্ষণেই সমস্ত সারিয়া ফেলিল। তাহার তাড়ায় ঠাকুরের পূজা, ভোগ প্রভৃতি সমাধা হইতেও আজ অযথা বিলম্ব ঘটিল না। রাখাল পরিবেশন করিয়া সকলকে খাওয়াইয়া, নিজে খাইয়া নীচে হইতে গা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আবার যখন উপরে আসিল তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। রেণু অদূরে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিল, শেষ হইতে বলিল, রাজুদা, তুমি আমাদেরও হারিয়েছো। তোমার যে বৌ হবে সে ভাগ্যবতী ; কিন্তু বিয়ে কি তুমি করবে না?

রাখাল হাসিয়া বলিল, কি করে করবো ভাই, অতবড় ভাগ্যবতীর দেখা মিলবে তবে ত?

না, সে হবে না। বাবাকে ধরে এবার আমি নিশ্চয় তোমার একটি বিয়ে দেবো।

তাই দিও, আগে সেরে ওঠো। বিনোদ ডাক্তার আজ কি বললে? জ্বরটা ছাড়চে না কেন?

ফটিকের মা দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, ডাক্তারবাবু আজ ত আসেন নি, এসেছিলেন পরশু। সেই এক ওষুধই চলচে।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার শঙ্কিত মুখের প্রতি চাহিয়া রেণু লজ্জা পাইয়া কহিল, রোজ ওষুধ বদলানো বুঝি ভালো! আর মিছামিছি ডাক্তারকে টাকা দিতে থাকলেই বুঝি অসুখ সেরে যায় ফটিকের মা? আমি এতেই ভালো হয়ে যাবো তোমরা দেখে নিও।

রাখাল কথা কহিল না, বুঝিল দুর্দশায় পড়িয়া সামান্য গুটিকয়েক টাকাও আর সে পিতার খরচ করাইতে চাহে না।

তুমি কি চলে যাচ্ছো রাজুদা?

আজ যাই ভাই, কাল সকালেই আবার আসবো।

নিশ্চয় আসবে ত?

নিশ্চয় আসবো। আমি না আসা পর্যন্ত কাকাবাবুকে উনুনের কাছেও যেতে দিও না রেণু।

শুনিয়া রেণু কত যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, বলিল, কাল যদি আমার জ্বর না থাকে আমি রাঁধবো রাজুদা?

কিছুতেই না। ঝিকে সাবধান করিয়া দিয়া কহিল, আমি না এলে কাউকে কিছু করতে দিও না ফটিকের মা। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বিনোদ ডাক্তার পাড়ার লোক, একটু দূরে বাড়ি—নীচের তলায় ডিস্‌পেনসারি, সেখানে তাঁহার দেখা মিলিল ; রাখাল জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর জ্বরটা কি রকম ডাক্তারবাবু? আজও ছাড়েনি কেন?

বিনোদবাবু বলিলেন, আশা করি সহজ। কিন্তু আজও যখন—তখন দিন-দুই না গেলে ঠিক বলা যায় না রাখাল।

ডাক্তার এই পরিবারের বহুদিনের চিকিৎসক, সকলকেই জানেন। ইহার পর ব্রজবাবুর আকস্মিক দুর্ভাগ্য লইয়া তিনি দুঃখ প্রকাশ করিলেন, বিস্ময় প্রকাশ করিলেন, শেষে বলিলেন, তুমি যখন এসে পড়েচো রাখাল, তখন ভাবনা নেই। আমি সকালেই যাবো।

নিশ্চয় যাবেন ডাক্তারবাবু, আমাদের ডাকবার লোক নেই।

ডাকবার দরকার নেই রাখাল, আমি আপনিই যাবো।

সেখান হইতে ফিরিয়া রাখাল নিজের বাসায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। মন একেবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ব্রজবাবুর দুর্দশা যে কত বৃহৎ ও সর্বনাশের পরিমাণ যে কিরূপ গভীর, নানা কাজের মধ্যে এ কথা এখনো সে ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পায় নাই। নির্জনে ঘরের মধ্যে এইবার তাহার দু'চোখ বাহিয়া হুহু করিয়া জল পড়িতে লাগিল। কোথায় যে ইহার কূল এবং এই দুঃখের

দিনে সে যে কি করিতে পারে ভাবিয়া পাইল না। কি করিয়া যে এত শীঘ্র এমনটি ঘটিল তাহা কল্পনার অগোচর। তার উপর রেণু পীড়িত। পাড়ায় টাইফয়েড জ্বর হইতেছে সে জানিত, ডাক্তারের কথার মধ্যেও এমনি একটা সন্দেহের ইঙ্গিত সে লক্ষ্য করিয়াছে। উপদেশ দিবার লোক নাই, শুশ্রূষা করিতে কেহ নাই, চিকিৎসা করাইবার অর্থও হয়তো হাতে নাই। এই নিরীহ নির্বিরোধী মানুষটির কথা আগাগোড়া চিন্তা করিয়া তাহার সংসারে ধর্মবুদ্ধি, ভগবৎভক্তি, সাধুতা সকলের পরেই যেন ঘৃণা ধরিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল দিল্লী হইতে ফিরিয়া নানাবিধ অপব্যয়ে তাহার নিজের হাতও শূন্য, পোস্টাফিসে সামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে তাহার পরে একটা দিনও নির্ভর করা চলে না, অথচ, এই রেণু তাহার কাছেই একদিন মানুষ হইয়াছে। কিন্তু সে কথা আজ থাক। তাহারই চিকিৎসায় তাহারই কাছে গিয়া হাত পাতিবে সে কি করিয়া? যদি না থাকে সে জানে, যে-বাটীতে সে ছেলে পড়ায় তাঁহারা অত্যন্ত কৃপণ। বন্ধু-বান্ধব অনেক আছে সত্য, কিন্তু সেখানে আবেদন করা তেমনি নিষ্ফল। অনেক 'বড়লোক' গোপনে তাহারই কাছে ঋণী, সে-ঋণ নিজে সে না ভুলিলেও তাঁহারা ভুলিয়াছেন।

সহসা মনে পড়িল নতুন-মাকে। কিন্তু দীপশিখা জ্বলিয়াই স্তিমিত হইয়া আসিল—সেখানে দাও বলিয়া দাঁড়ানোর কল্পনাও তাহাকে কুণ্ঠিত করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবেই বা কি এবং বলিবেই বা কি করিয়া। এ পথ নয়, কিন্তু আর-একটা পথও তাহার চোখে পড়িল না; কিন্তু সে বলিলে ত চলিবে না, পথ তাহার চাই-ই—তাহাকে পাইতেই হইবে।

দাসী আসিয়া খাবার কথা বলিলে সে নিষেধ করিয়া জানাইল তাহার অন্যত্র নিমন্ত্রণ আছে। এমন প্রায়ই থাকে।

ঝি চলিয়া গেলে সে-ও দ্বারে চাবি দিল। রাখাল শৌখিন লোক, বেশভূষার সামান্য অপরিচ্ছন্নতাও তাহার সহ্য হয় না, কিন্তু আজ সে কথা তাহার মনেই পড়িল না, যেমন ছিল তেমনিই বাহির হইয়া গেল।

নতুন-মার বাটীতে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সম্মুখে খান-কয়েক মোটর দাঁড়াইয়া, বৃহৎ অট্টালিকা বহুসংখ্যক বিদ্যুৎ-দীপালোকে সমুজ্জ্বল, দ্বিতলের বড় ঘরে বাদ্যযন্ত্র বাঁধাবাঁধির শব্দ উঠিয়াছে, গৃহস্বামিনী নিরতিশয় ব্যস্ত—ভাগ্যবান আমন্ত্রিতগণের আদর-আপ্যায়নে ত্রুটি না ঘটে—রাখালকে দেখিয়া একমুহূর্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, এতক্ষণে বুঝি আমাদের মনে পড়লো বাবা?

এ-কয়দিন যে নতুন-মাকে সে দেখিয়াছে, এ যেন সে নয়, অভিনব ও বহুমূল্য বেশ-ভূষার পরিপাট্যে তাঁহার বয়সটাকে যেন দশ বৎসর পিছনে ঠেলিয়া দিয়াছে, রাখাল কেমন একপ্রকার হতবুদ্ধির মতো চাহিয়া রহিল, সহসা উত্তর দিতে পারিল না। তিনি তখনই আবার বলিলেন, আজ একটু কাজ করে দিতে বলেছিলুম বলে বুঝি একেবারে রাত্তির করে এলে রাজু?

রাখাল নম্রভাবে বলিল, কাজ সারতে দেরি হয়ে গেল মা। তা ছাড়া আমার না-আসতে পারায় ক্ষতি ত কিছুই হয়নি।

না, ক্ষতি হয়নি সত্যি, কিন্তু তখন বলে গেলেই ভালো হতো। তাঁহার কণ্ঠস্বরে এবার একটু বিরক্তির সুর মিশিল।

রাখাল বলিল, তখন নিজেও জানতাম না নতুন-মা। তারপরে আর সময় পেলাম না।

কে-একজন ডাকিতে সবিতা চলিয়া গেলেন, মিনিট-পাঁচেক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন রাখাল তেমনি দাঁড়াইয়া আছে, বলিলেন, দাঁড়িয়ে কেন রাজু, ঘরে গিয়ে বসো গে।

রাখাল কিছুতেই সঙ্কোচ কাটাইতে পারে না, কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়, শেষে আস্তে আস্তে বলিল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে এসেছি নতুন-মা, আমাকে আজ কিছু টাকা দিতে হবে।

সবিতা সবিস্ময়ে চাহিলেন, বলিতে বোধ হয় তাঁহারও বাধিল, কিন্তু বলিলেন, টাকা? টাকা ত নেই রাজু—যা ছিল ওটা কিনতেই সব খরচ হয়ে গেছে, ও-বেলাই ত শুনে গেলে?

কিছুই নেই মা?

না থাকার মধ্যেই। ঘর করতে সামান্য যদি কিছু থাকেও খুঁজে দেখতে হবে। সে অবসর ত নেই।

সারদা নানা কাজে আনাগোনা করিতেছিল, কথাটা শুনিতে পাইয়া কাছে আসিয়া বলিল, আমার কাছে দশ টাকা আছে, এনে দেবো?

রাখাল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তুমি দেবে? আচ্ছা, দাও।

সারদা বলিল, মিনুর দিদিমার হাতে টাকা আছে, জিনিস রাখলে ধার দেয়।

তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যেতে পারো সারদা?

কেন পারবো না—তিনি ত বুড়োমানুষ। কিন্তু আমার তো জিনিস কিছুই নেই—

তবু চলো না দেখি গে।

আসুন।

তাহাদের যাইবার সময় সবিতা বলিলেন, তা বলে না খেয়ে নীচে থেকেই যেন চলে যেও না রাজু—

রাখাল ফিরিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আজ বড় অ-বেলায় খাওয়া হয়েছে নতুন-মা, ক্ষিদের লেশ নেই। আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে। এই বলিয়া সে সারদার পিছনে নীচে নামিয়া গেল। সবিতা আর তাহাকে অনুরোধ করিলেন না।

রাখাল চলিয়া গেছে। সারদা নিজের ঘরের দুই-একটা বাকী কাজ সারিয়া লইয়া পুনরায় উপরে যাইবার উপক্রম করিতেছে, সবিতা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহার বিছানায় বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, একটা পান দাও ত মা, খাই।

এ ভাগ্য কখনো সারদার হয় নাই, সে বর্তিয়া গেল। তাড়াতাড়ি হাতটা ধুইয়া ফেলিয়া পান সাজিতে বসিতেছে, তিনি বলিলেন, রাজু না খেয়ে রাগ করে চলে গেল?

এত কাজের মধ্যেও ব্যাপারটা ভিতরে ভিতরে তাঁহাকে বিঁধিতেছিল, ঝাড়িয়া ফেলিতে পারেন নাই।

সারদা মুখ তুলিয়া কহিল, না মা, রাগ করে ত নয়।

রাগ করে বৈ কি। ও সকাল থেকেই একটু রেগে ছিল, তাতে আবার টাকা দিতে পারিনি—তুমি বুঝি দশ টাকা তাকে দিলে?

না মা, আমার কাছে নিলেন না, মিনুর দিদিমার কাছ থেকে এক শ' টাকা দিলুম।

এমনি? শুধু-হাতে সে দিল যে বড়ো?

সারদা বলিল, না, এমনি তো নয়। উনি হাতের সোনার ঘড়িটা আমাকে খুলে দিয়ে বললেন, এর দাম তিন শ' টাকা, তিনি যা দেন নিয়ে এসো। ওঁর চা-বাগানের কিছু কাগজ আছে, তাই বিক্রি করে এই মাসেই শোধ দেবেন বললেন।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, হঠাৎ টাকার দরকার ওর হলো কিসে?

সারদা কহিল, কে-একটি মেয়ে বড় পীড়িত, তারই চিকিৎসার জন্যে।

মেয়েটি কে যে তার জন্যে রাতারাতি ওকে ঘড়ি বন্ধক দিতে হয়?

সে ত জানিনে মা! কিন্তু, বোধ হয় তার খুব শক্ত অসুখই হয়েছে। টাকার অভাবে পাছে মারা যায়, এই তাঁর ভয়। মেয়েটির বাপ নাকি ছেলেবেলায় ওঁকে মানুষ করেছিলেন।

সবিতা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, ছেলেবেলায় ওকে মানুষ করেছিল বললে? এ ওর বানানো গল্প। রাজুকে কে মানুষ করেচে আমি জানি। তাঁর মেয়ের চিকিৎসায় পরকে ঘড়ি বাঁধা দিতে হয় না।

সারদা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, বানানো গল্প বলে ত মনে হয় না মা। বলতে গিয়ে চোখে জল এলো—বললেন, এঁদেরও বিত্ত-বিভব অনেক ছিল, কিন্তু হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার জন্যে বাড়ি-ঘর পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে হলো, অথচ দিল্লী যাবার আগেও এমন দেখে যাননি। আজ গিয়ে দেখেন শয্যাগত মেয়েটিকে দেখবার কেউ নেই—বুড়ো বাপ আপনি বসেছে

রাঁধতে—কিন্তু জানে না কিছুই—হাত পুড়েছে, ভাত পুড়েচে, তরকারি পুড়ে গন্ধ উঠেছে—রাখলবাবুকে সমস্ত আবার রাঁধতে হলো, তবে সকলের খাওয়া হয়। তাই এখানে আসতে তাঁর দেরি। আমাকে বলেছিলেন এ দুঃসময়ে তাদের সাহায্য করতে। মেয়েটির ত মা নেই—তাকে একটু দেখতে। আমি রাজী হয়ে বলেচি, যা আপনি আদেশ করবেন তাই আমি করব।

সারদা পান দিল। সেটা তাঁর হাতে ধরাই রহিল ; জিজ্ঞাসা করলেন ; রাজু বললে হঠাৎ ব্যবসা নষ্ট হয়ে দেনার দায়ে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেল? দিল্লী যাবার আগেও তা দেখে যায়নি?

হাঁ, তাই ত বললেন।

অসম্ভব।

সারদা চুপ করিয়া রহিল। সবিতা পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, রাজু বললে মেয়েটির মা নেই—মারা গেছে বুঝি?

সারদা বলিল, মা যখন নেই তখন মরে গেছে নিশ্চয়, আর কি হতে পারে মা?

সবিতা উঠিয়া গেলেন। মিনিট পাঁচ-ছয় পরে সারদা প্রদীপ নিবাইয়া ঘর বন্ধ করিতেছিল, তিনি ফিরিয়া আসিলেন। পরনে সে বস্ত্র নাই, গায়ে সে-সব আভরণ নাই, মুখ উদ্বেগে ম্লান,—বলিলেন, আমার সঙ্গে তোমাকে একবার বাইরে যেতে হবে।

কোথায় মা?

রাজুর বাসায়।

এই রাত্তিরে? আমি নিশ্চয় বলচি মা, তিনি দুঃখ একটু করেছেন, কিন্তু রাগ করে চলে যাননি। তা ছাড়া, বাড়িতে কত কাজ, কত লোক এসেচে, সবাই খুঁজবে যে মা?

কেউ জানতে পারবে না সারদা, আমরা যাবো আর আসবো।

সারদা সন্দিগ্ধ-স্বরে কহিল, ভাল হবে না মা, হয়তো একটা গোলমাল উঠবে। বরঞ্চ কাল দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পরে গেলে কেউ জানতেও পারবে না।

সবিতা কয়েক-মহূর্ত তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, আজ রাত্তির যাবে, কাল সকাল যাবে, তারপরে দুপুরবেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে তবে যাবো? ততক্ষণে যে পাগল হয়ে যাবো সারদা?

এই উৎকণ্ঠার হেতু সারদা বুঝিল না, কিন্তু আপত্তিও করিল না,—নীরব হইয়া রহিল।

যে-দরজায় ভাড়াটেরা যাতায়াত করে সেখানে আসিয়া উভয়ে উপস্থিত হইলেন এবং মিনিট-দুই পরে পথচারী একটা খালি ট্যাক্সি ডাকিয়া তাহাতে উঠিয়া বসিলেন। চোখ পড়িল ঠিক উপরেই—আলোকোজ্জ্বল প্রশস্ত কক্ষটি তখন সঙ্গীতে হাস্যে ও আনন্দ-কলরবে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। একটি রুমালে বাঁধা বাণ্ডিল সারদার হাতে দিয়া সবিতা বলিলেন, আঁচলে বেঁধে রাখো ত মা, রাজু আমার হাতে থেকে হয়তো নেবে না—তুমি তাকে দিও।

দশ মিনিট পরে তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়া রাখালের ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিলেন বাহির হইতে কবাট বন্ধ, ভিতরে কেহ নাই। দুজনে নিঃশব্দে ফিরিয়া গাড়িতে বসিলেন এবং আরো মিনিট-পাঁচেক পরে বৌবাজারের একটা বৃহৎ বাটীর সম্মুখে আসিয়া তাঁহাদের গাড়ি থামিল। নামিতে হইল না, দেখা গেল সে গৃহেরও দ্বার রুদ্ধ। পথের আলো উপরের অবরুদ্ধ জানালায় গিয়া পড়িয়াছে ; সেখানে বড় বড় লাল অক্ষরে নোটিশ ঝুলিতেছে—বাড়ি ভাড়া দেওয়া যাইবে।

নিদারুণ বিপদের মুখে নিজেকে মুহূর্তে সামলাইয়া ফেলিবার শক্তি সবিতার অসাধারণ। তাঁহার মুখ দিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পর্যন্ত পড়িল না, গৃহে ফিরিবার আদেশ দিয়া গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া পাষাণ মূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

ঠিক কি হইয়াছে অনুমান করা সারদার কঠিন কিন্তু সে এটা বুঝিল যে, রাখাল মিথ্যা বলিয়া আসে নাই এবং সত্যই ভয়ানক কি-একটা ঘটিয়াছে।

ফিরিবার পথে সে সবিতার শিথিল হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কার বাড়ি মা? এই বাড়িই বিক্রি হয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

এঁর মেয়ের অসুখের কথাই তিনি বলছিলেন?

জবাব না পাইয়া সে আবার আস্তে আস্তে বলিল, কোথায় তাঁরা আছেন খোঁজ নেওয়া যে দরকার।

কোথায়, কার কাছে খোঁজ নেবো সারদা?

কাল নিশ্চয় রাখালবাবু আমাকে নিতে আসবেন।

কিন্তু যদি না আসে? আমার বাড়িতে আর যদি সে পা দিতে না চায়?

সারদা চুপ করিয়া রহিল। রাখাল টাকা চাহিয়াছে, তিনি দিতে পারেন নাই; এইটুকু মাত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া নতুন-মার এতবড় উৎকণ্ঠা আবেগ ও আত্মগ্লানিতে তাহার মনের মধ্যে অত্যন্ত ধাঁধা লাগিল; তাহার সন্দেহ জন্মিল বিষয়টা বস্তুতঃ এই নয়, ভিতরে কি একটা নিষ্ঠুর রহস্য আছে। সবিতা যে রমণীবাবুর পত্নী নয়—এ কথা না জানার ভান করিলেও বাটীর সকলেই মনে মনে বুঝিত। তাহারা ভান করিত ভয়ে নয়, শ্রদ্ধায়। সবাই জানিত এ কোন বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—আচারে আচরণে বড়, হৃদয়ে বড়, দয়া দাক্ষিণ্যে ও সৌজন্যে আরও বড়, তাই তাঁহার এ দুর্ভাগ্য কাহারও উল্লাসের বস্তু ছিল না, ছিল পরিতাপ ও গভীর লজ্জার। দীর্ঘদিন একত্র বাস করিয়া সকলে তাঁহাকে এতই ভালবাসিত।

গলির মোড় ঘুরিতে কোন-একটা দোকানের তীব্র আলোর রেখা আসিয়া পলকের জন্য সবিতার মুখের 'পরে পড়িল; সারদা দেখিল, তাতে যেন প্রাণ নাই, হাতের তালুটা হঠাৎ মনে হইল, অতিশয় শীতল, সে সভয়ে একটা নাড়া দিয়া ডাকিল, মা?

কেন মা?

বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন সাড়া নাই—অন্ধকারেও সারদার মনে হইল, তাঁহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে, সে সাহস করিয়া হাত বাড়াইয়া দেখিল তাই বটে। সযত্নে আঁচলে মুছাইয়া দিয়া বলিল, মা, আমি আপনার মেয়ে, আমার আপনার বলতে সংসারে কেউ নেই, আমাকে যা করতে বলবেন আমি তাই করবো।

কথাগুলি সামান্যই। সবিতা উত্তরে কিছুই বলিলেন না, শুধু হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের পরে টানিয়া লইলেন। অশ্রুবাষ্পের নিরুদ্ধ আবেগে সমস্ত দেহটা তাঁহার বারকয়েক কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা সারদার মাথার উপরে একটি একটি করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুজনে বাড়ি ফিরিয়া যখন আসিলেন তখনও মালতীমালার গান চলিতেছে—তাঁহাদের স্বল্পকালের অনুপস্থিতি কেহ লক্ষ্য করে নাই। সবিতা নীচে হইতে স্নান করিয়া গিয়া উপরে উঠিতে ঝি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, মা, এখন নেয়ে এলে? মাথা ঘুরছিল বোধ করি?

হাঁ।

তাহলে কাপড় ছেড়ে একটু শুয়ে পড়ো গে মা, সারাদিন যে খাটুনি হয়েছে!

সারদা কহিল, এদিকে আমি আছি মা, কোন ভাবনা নেই। দরকার হলেই আপনাকে ডেকে আনবো।

তাই এনো সারদা, আমি একটু শুই গে।

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কোনমতে চুকিল, অভ্যাগতেরা একে একে বিদায় লইয়া গেলেন, খাটের শিয়রে বসিয়া সারদা ধীরে ধীরে সবিতার মাথায়, কপালে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে রমণীবাবু প্রবেশ করিয়া তিক্তস্বরে কহিলেন, আচ্ছা খেলাই খেললে! বাড়িতে কোন-একটা কাজ হলে তোমারও কোন-একটা ঢং করা চাই। এ তোমার স্বভাব। লোকেরা গেছে—এবার নাও, ছলা-কলা রেখে একটু উঠে বসো,—একখানা ভালো কাপড় অন্ততঃ

পরো—বিমলবাবু দেখা করতে আসচেন।

এরূপ উক্তি অভাবিত নয়, নূতনও নয়। বস্তুতঃ এমনিই কিছু-একটা সবিতা মনে মনে আশঙ্কা করিতেছি, ক্লান্তস্বরে বলিল, দেখা কিসের জন্যে?

কিসের জন্যে! কেন, তারা কি ভিখিরী যে খেতে পায় না? বাড়িতে নেমন্তন্ন অথচ বাড়ির গিন্নীরই দেখা নেই। বেশ বটে!

সবিতা কহিল, নেমন্তন্ন হলেই কি বাড়ির গিন্নীর সঙ্গে দেখা করা প্রথা নাকি?

রমণীবাবু বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, প্রথা নাকি? প্রথা নয় জানি— স্ত্রী হলে আলাপ পরিচয় করতে চায় না—কিন্তু তারা সব জানে।

সারদার সম্মুখে সবিতা লজ্জায় মরিয়া গেল। সারদা নিজেও পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না। এদিকে উত্তেজনা পাছে হাঁকাহাঁকিতে দাঁড়ায় এই ভয় সবিতার সবচেয়ে বেশি, তাই নম্রভাবেই কহিলেন, আজ বড় অসুস্থ, তাঁকে বলো গে আজ দেখা হবে না। কিন্তু ফল হইল উলটা এই সহজ কণ্ঠের অস্বীকারে রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, চেঁচাইয়া উঠিলেন—আলবৎ দেখা হবে। সে কোটিপতি লোক তা জানো? বছরে আমার কত টাকার মাল কাটায় খবর রাখো? আমি বলছি—

দরজার বাইরে জুতার শব্দ শুনা গেল এবং চাকরটা সম্মুখে আসিয়া হাত দিয়া দেখাইয়া দিল।

সবিতা মাথার কাপড়টা কপাল পর্যন্ত টানিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল। বিমলবাবু ঘরে ঢুকিয়া নমস্কার করিয়া নিজেই একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বলিলেন, শুনতে পেলুম আপনি হঠাৎ বড় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, কিন্তু কালই বোধ হয় আমাকে কানপুরে যেতে হবে, হয়তো আর ফিরতে পারবো না, অমনি বোম্বাই হয়ে জাহাজে সোজা কর্মস্থলে রওনা হতে হবে। ভাবলুম, মিনিট-খানেকের জন্যে হলেও একবার সাক্ষাৎ করে জানিয়ে যাই আপনার আতিথ্যে আজ বড় তৃপ্তিলাভ করেচি।

সবিতা আস্তে আস্তে বলিল, আমার সৌভাগ্য।

লোকটির বয়স চল্লিশ, চুলে পাক ধরিতে শুরু করিয়াছে, কিন্তু সযত্ন সতর্কতায় দেহ স্বাস্থ্য ও রূপে পরিপূর্ণ; কহিলেন, খবর পেলুম রমণীবাবু আজকাল প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন, আর আপনার শরীরও যে ভালো থাকে না সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। আপনার আর বছরের ফটোর সঙ্গে আজ মিল খুঁজে পাওয়া দায়—এমনি হয়েছে চেহারা।

শুনিয়া সবিতা মনে মনে লজ্জা পাইল, বলিলেন, আমার ফটো আপনি দেখেছেন নাকি?

দেখেচি বৈ কি! আপনাদের একসঙ্গে তোলা ছবি রমণীবাবু পাঠিয়েছিলেন। তখন থেকেই ভেবে রেখেচি, ছবির মালিককে একবার চোখে দেখবো। সে-সাধ আজ মিটলো। চলুন না একবার আমাদের সিঙ্গাপুরে, দিন-কয়েকে সমুদ্র-যাত্রাও হবে, আর দেহটাও একটু বদলাবে। আমার ক্রস স্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ি আছে, তার উপর তলায় দিনরাত সাগরের হওয়া বয়, সকাল সন্ধ্যায় সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত দেখতে পাওয়া যায়। রমণীবাবু যেতে রাজী হয়েছেন, শুধু আপনার সম্মতি আদায় করে নিয়ে যদি যেতে পারি ত জানবো এবার দেশে আসা আমার সার্থক হলো।

রমণীবাবু উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, আপনাকে ত কথা দিয়েছি বিমলবাবু আমি আসছে সপ্তাহেই রওনা হতে পারবো। সমুদ্রের জল-বাতাসের আমার বিশেষ প্রয়োজন। শরীরের স্বাস্থ্য—আপনি বলেন কি! ও হলো সকলের আগে।

বিমলবাবু কহিলেন, সে সৌভাগ্য হলে হয়তো এক জাহাজেই আমরা যাত্রা করতে পারবো। সবিতার উদ্দেশে স্মিতমুখে বলিলেন, অনুমতি হয় ত উদ্যোগ আয়োজন করি—আমার অফিসেও একটা তার করে দিই—বাড়িটার কোথাও যেন কোন ত্রুটি না থাকে? কি বলেন?

সবিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, না, এখন কোথাও যাবার আমার সুবিধে হবে না।

শুনিয়া রমণীবাবু আর একবার গরম হইয়া উঠিলেন—কেন সুবিধে হবে না, শুনি। লেখা-পড়া কাল-পরশু শেষ হয়ে যাবে, দরোয়ান চাকর বাড়িতে রইলো, ভাড়াটেরা রইলো, যাবার বাধাটা কি? না সে হবে না বিমলবাবু, সঙ্গে নিয়ে আমি যাবোই। না বললেই হবে? আমার শরীর খারাপ—আমার দেখাশোনা করবে কে? আপনি স্বচ্ছন্দে টেলিগ্রাম করে দিন।

বিমলবাবু পুনশ্চ সবিতাকেই লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, দিই একটা তার করে?

জবাব দিতে গিয়া এবার দুজনের চোখাচোখি হইয়া গেল, সবিতা সলজ্জে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি আনত করিয়া কহিল, না। আমি যেতে পারবো না।

রমণীবাবু ভয়ানক রাগিয়া উঠিলেন—না কেন? আমি বলচি তোমাকে যেতে হবে। আমি সঙ্গে নিয়ে যাবোই।

বিমলবাবুর মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলিলেন, কি করে নিয়ে যাবেন রমণীবাবু, বেঁধে?

হাঁ, দরকার হয় ত তাই।

তা হলে আর কোথাও নিয়ে যাবেন, আমি সে অন্যায়ের ভার নিতে পারবো না।

কি জানি, ঠিক প্রবেশমুখেই এই ব্যক্তির উচ্চ কলরব তাঁহার শ্রুতিগোচর হইয়াছিল কিনা। বলিলেন, আচ্ছা, আজ তা হলে উঠি—আপনি বিশ্রাম করুন। অসুস্থ শরীরের ওপর হয়তো অত্যাচার করে গেলুম—তবু, যাবার পূর্বে আমার অনুরোধই রইল—আমি প্রতি মাসে আপনাকে প্রিপেড টেলিগ্রাম করবো—এই প্রার্থনা জানিয়ে—দেখি কতবার না বলে তার জবাব দিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি একটু হাসিলেন, বলিলেন,—নমস্কার—নমস্কার রমণীবাবু, আমি চললুম।

তিনি বাহির হইয়া গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে রমণীবাবুও নীচে নামিয়া গেলেন। রমণীবাবুর বন্ধু বলিয়া এবং অশিক্ষিত ব্যবসায়ী মনে করিয়া এই লোকটির সম্বন্ধে যে ধারণা সবিতার জন্মিয়াছিল, চলিয়া গেলে মনে হইল হয়ত তাহা সত্য নয়।

সাত

সারদা বলিল, মা, খাবেন না কিছু?

না।

এক গেলাস জল আর একটা পান দিয়ে যেতে বলবো?

না, দরকার নেই।

আলোটা নিবিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যাবো?

তাই যাও সারদা, তোমার রাত হয়ে যাচ্চে।

তথাপি উঠি-উঠি করিয়াও তাহার দেরি হইতেছিল, রমণীবাবু ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন, নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যাক বাঁচা গেল, আজকের মতো কোনরকমে মান-রক্ষেটা হলো। ভদ্রলোক খাসা মানুষ, অতবড় দরের লোক তা দেমাক অহঙ্কার নেই, তোমার জন্যে ত ভারী ভাবনা, একশো-বার অনুরোধ করে গেলো, কাল সকালে যেন একটা খবর পাঠিয়ে দিই। কি জানি, নিজেই হয়তো বা একটা মস্ত ডাক্তার নিয়ে সকালে হাজির হয়ে যায়—বলা যায় না কিছু—ওদের ত আর আমাদের মতো টাকার মায়া নেই—দশ-বিশ হাজার থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি! রথমার কোম্পানি—ডিরেক্টারই বলো আর শেয়ার-হোল্ডারই বলো, যা করে ঐ মিস্টার ঘোষাল। বললুম যে তোমাকে, লোকটা কোটি টাকার মালিক! কোটি টাকা! জারমানি, হল্যান্ডের সঙ্গে মস্ত কারবার—বছরে দু-চার বার এমন যুরোপ ঘুরে আসতে হয়—জেনেরাল ম্যানেজার শপ্ সাহেবই ওর মাইনে পায় তিন হাজার টাকা। মস্ত লোক। জাভার চিনি চালানিতেই গেল বছরে—

মুনাফার রোমাঞ্চকর অঙ্কটা আর বলা হইল না,—বাধা পড়িল। সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি যে আবার ফিরে এলে,—বাড়ি গেলে না?

কোন্ প্রসঙ্গে কি কথা! প্রশ্নটা তাঁহার আনন্দবর্ধন করিল না এবং বুঝিলেন যে, তাঁহার 'মস্ত

লোকের' বিবরণে সবিতা বিন্দুমাত্র মনঃসংযোগ করে নাই। একটু থতমত খাইয়া কহিলেন, বাড়ি? নাঃ—আজ আর যাবো না।

কেন?

নাঃ—আজ আর—

সবিতা একমুহূর্ত তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, মদের গন্ধ বেরুচ্চে—তুমি মদ খেয়েচো?

মদ? আমি? (ইশারায়) মাত্র একটি ফোঁটা—বুঝলে না—

কোথায় খেলে, এই বাড়িতে?

শোন কথা! বাড়িতে নয় তো কি শুঁড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে খেয়ে এলুম?

মদ আনতে কে বললে?

কে বললে! এমন কথা কখনও শুনিনি। বাড়িতে দু'দশজন ভদ্রলোককে আহ্বান করলে ও একটু না আনিয়ে রাখলে কি হয়? তাই—

সকলেই খেলে?

খেলে না? ভালো জিনিস অফার করলে কোন্ শালা না খায় শুনি? অবাক করলে যে তুমি?

বিমলবাবু খেলেন?

রমণীবাবু এবার একটু ইতস্ততঃ করিলেন, বলিলেন, না, আজ ও একটু চাল দেখিয়ে গেল। নইলে ওর কীর্তি-কাহিনী জানতে বাকী নেই আমার। জানি সব।

সবিতা একটু মৌন থাকিয়া বলিলেন, জানবে বৈ কি। আচ্ছা, যাও এখন। রাত হয়েছে ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

বলার ধরনটা শুধু কর্কশ নয়, রূঢ়। সারদার কানেও অপমানকর ঠেকিল। আজ সন্ধ্যার পর হইতেই সবিতার নীরস কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছন্ন রুক্ষতা রমণীবাবুকে বিঁধিতেছি, এই কথায় সহসা অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন,—আজ তোমার হয়েছে কি বলো ত?

মেজাজ দেখি যে ভারী গরম। এতটা ভাল নয় নতুন-বৌ!

সারদার ভয় হইল, এইবার বুঝি একটা বিশ্রী কলহ বাধিবে, কিন্তু সবিতা নীরবে চোখ বুজিয়া তেমনিই শুইয়া রহিল, একটা কথারও জবাব দিল না।

রমণীবাবু কহিতে লাগিলেন, ওই যে বলচি, সবাই জানে তুমি স্ত্রী নও—তাতেই লেগেছে যত আগুন। কিন্তু জানে না কে? সারদা জানে না, না বাড়ির লোকের অজানা? একটা মিছে কথা কতদিন চাপা থাকে? এতে অপমানটা তোমার কি করলুম শুনি?

সবিতা উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি বর্শার ফলার মত তীক্ষ্ণ ও কঠিন, কহিলেন, এ কথা তুমি ছাড়া আর কোন পুরুষ মুখে আনতেও লজ্জা পেতো কেবল পুরুষমানুষ বলেই, কিন্তু তোমাকে বলা বৃথা। তোমার কথায় আমার অপমান হয়েচে আমি একবারও বলিনি।

সারদা ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল—কি করচেন মা, থামুন।

রমণীবাবু কহিলেন, মুখে বলোনি সত্যি, কিন্তু মনে ভাবচো ত তাই।

সবিতা উত্তর দিল, না, মুখেও বলিনি, মনেও ভাবিনি। তোমার স্ত্রী-পরিচয়ে আমার মর্যাদা বাড়ে না সেজবাবু। ওতে শুধু চক্ষুলজ্জা বাঁচে, নইলে সত্যিকারের লজ্জায় ভেতরটা আমার পুড়ে কালি হয়ে ওঠে।

কেন? কেন শুনি?

কি হবে শুনে? এ কি বুঝবে যে, আমি যাঁর স্ত্রী তোমরা কেউ তাঁর পায়ের ধুলোর যোগ্য নও।

সারদা পুনরায় ভয়ে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—এত রাত্তিরে কি করচেন মা আপনারা? দোহাই মা, চুপ করুন।

কিন্তু কেহই কান দিল না। রমণীবাবু কড়া গলায় হাঁকিলেন, সত্যি? সত্যি নাকি?

সবিতা কহিল, সত্যি কিনা তুমি নিজে জানো না? সমস্ত ভুলে গেলে? সেদিন তিনি ছাড়া

সংসারে কেউ ছিল আমাদের রক্ষা করতে পারতো? শুধু হাড়-মাস রক্ষে করাই ত নয়, মান-ইজ্জত রক্ষে করেছিলেন। নিজে কত বড় হলে এতখানি ভিক্ষে দিতে পারে কখনো পারো ভাবতে? আমি তাঁর স্ত্রী। আমার সে ক্ষতি সয়েছে, এটুকু সইবে না?

রমণীবাবু উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া যে কথাটা মুখে আসিল তাহাই কহিলেন, তবে বললে তুমি রাগ করতে যাও কিসের জন্যে?

সবিতা বলিল, শুধু আজই ত বলোনি, প্রায়ই বলে থাকো। কথাটা কটু, তাই শুনলে হঠাৎ কানে লাগে, কিন্তু অন্তরটা তখনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলে ওঠে আমার এই ভালো যে, এ লোকটা আমার কেউ নয়, এর সঙ্গে আমার কোন সত্যিকার সম্বন্ধ নেই।

সারদা অবাক হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কিন্তু অশিক্ষিত রমণীবাবুর পক্ষে এ উক্তির গভীর তাৎপর্য বুঝা কঠিন, তিনি শুধু এইটুকু বুঝিলেন যে, ইহা অত্যন্ত রূঢ় এবং অপমানকর। তাই সদম্ভে প্রশ্ন করিলেন, তবে তার কাছে ফিরে না গিয়ে আমার কাছেই পড়ে থাকো কিসের জন্যে?

সবিতা কি-একটা জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু সারদা হঠাৎ মুখে হাত চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া দিল, কার সঙ্গে ঝগড়া করচেন মা, রাগের মাথায় সব ভুলে যাচ্ছেন?

সবিতা সেই হাতটা সরাইয়া দিয়া কহিল, না সারদা, আর আমি ঝগড়া করবো না। ওঁর যা মুখে আসে বলুন আমি চুপ করে রইলুম।

আচ্ছা, কাল এর সমুচিত ব্যবস্থা করবো, বলিয়া রমণীবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মিনিট-দুই পরে সদর রাস্তায় তাঁহার মোটরের শব্দে বুঝা গেল তিনি বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

সারদা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, সমুচিত ব্যবস্থাটা কি মা?

জানিনে সারদা। ও-কথা অনেকবার শুনেচি, কিন্তু আজো মানে বুঝতে পারিনি।

কিন্তু মিছিমিছি কি অনর্থ বাধলো বলুন ত।

সবিতা মৌন হইয়া রহিল।

সারদা নিজেও ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, রাত হলো এবার আমি যাই মা।

যাও মা।

সেই মাত্র ভোর হইয়াছে, সারদার ঘরের দরজায় ঘা পড়িল। সে উঠিয়া দ্বার খুলিতেই সবিতা প্রবেশ করিয়া বলিলেন, রাজু এলেই আমাকে খবর দিতে ভুলো না সারদা।

তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া সারদা শঙ্কিত হইল, বলিল, না মা, ভুলবো কেন, এলেই খবর দেবো।

সবিতা বলিলেন, দরোয়ান খবর নিয়েছে রাত্তিরে রাজু ঘরে ফেরেনি। কিন্তু যেখানেই থাক আজ তোমাকে নিয়ে যেতে সে আসবেই।

তাই ত বলেছিলেন।

আজই আসবে বলেছিল ত?

না, তা বলেন নি, শুধু বলেছিলেন মেয়েটির অসুখে তাঁকে সাহায্য করতে।

তুমি স্বীকার করেছিলে ত?

করেছিলুম বৈ কি।

কোনরকম আপত্তি করোনি ত মা?

না মা, কোন আপত্তি করিনি।

সবিতা বলিলেন, আমি এখন তবে যাই, তুমি ঘরের কাজকর্ম সারো, সে এলেই যেন জানতে পারি সারদা। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

ঘরের কাজ সারদার সামান্যই, তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিয়া সে প্রস্তুত হইয়া রহিল,—রাখাল নিতে আসিলে যেন বিলম্ব না হয়। তোরঙ্গ খুলিয়া যে দুই-একখানি ভালো কাপড় ছিল তাহাও

বাঁধিয়া রাখিল—সঙ্গে লইতে হইবে। অবিনাশবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে তাহার বেশী ভাব, তাহাকে গিয়া জানাইয়া রাখিল ঘরের চাবিটা সে রাখিয়া যাইবে, যেন সন্ধ্যায় প্রদীপ দেওয়া হয়। দূর-সম্পর্কের এক বোনের বড় অসুখ, তাহাকে শুশ্রূষা করিতে হইবে।

বেলা দশটা বাজে, সবিতা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন,—রাজু আসেনি সারদা?

না মা।

তুমি হয়ত যেতে পারবে না এমন সন্দেহ তার ত হয়নি?

হওয়া ত উচিত নয় মা। আমি একটুও অনিচ্ছে দেখাই নি। তখনি রাজী হয়েছিলুম।

তবে আসচে না কেন? সকালেই ত আসার কথা। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, দরোয়ানকে পাঠিয়ে দিই আর একবার দেখে আসুক সে বাসায় ফিরেচে কি না। বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কাল হইতে সারদা নিরন্তর চিন্তা করিয়াছে কে এই পীড়িত মেয়েটি। তাহার কৌতূহলের সীমা নাই, তবুও এই নিরতিশয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত রমণীকে প্রশ্ন করিয়া সে নিঃসংশয় হইতে পারে নাই। কাল রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেই হয়ত উত্তর মিলিত, কিন্তু তখন এ প্রয়োজন তাহার ছিল না, মনেও পড়ে নাই।

এমনি করিয়া সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকাল পার হইয়া রাত্রি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু রাখালের দেখা নাই। আরও পরে সে যে আসিতে পারে এ আশাও যখন গেল তখন সবিতা আসিয়া সারদার বিছানায় শুইয়া পড়িলেন, একটা কথাও বলিলেন না। কেবল চোখ দিয়া অবিরল জল পড়িতে লাগিল। সারদা মুছাইয়া দিতে গেলে তিনি হাতটা তাহার সরাইয়া দিলেন।

ঝি আসিয়া খবর দিল বিমলবাবু আসিয়াছেন দেখা করিতে।

সবিতা কহিলেন, তাঁকে বলো গে বাবু বাড়ি নেই।

ঝি কহিল, তিনি নিজেই জানেন। বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, বাবুর সঙ্গে নয়।

সবিতার চক্ষে বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ পাইল, কিন্তু কি ভাবিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া উঠিয়া গেলেন। পথে ঝি বলিল, মা ঘরে গিয়ে কাপড়খানা ছেড়ে ফেলুন, একটু ময়লা দেখাচ্চে।

আজ এদিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না, দাসীর কথায় হুঁশ হইল, পরিধেয় বস্ত্রটা সত্যিই দেখা করিবার মতো নয়।

মিনিট দশ-পনেরো পরে যখন বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই, সবুজ রঙের অনুজ্জ্বল আলোকে মুখের শুষ্কতাও ঢাকা পড়িল।

বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলেন, বলিলেন, হয়ত ব্যস্ত করলুম, কিন্তু কাল বড় অসুস্থ দেখে গিয়েছিলুম, আজ না এসে পারলুম না।

সবিতা কহিল, আমি ভালো আছি। আপনার কানপুরে যাওয়া হয়নি?

না। এখান থেকে গিয়ে শুনতে পেলুম আমার জ্যাঠামশাই বড় পীড়িত, তাই—

নিজের জ্যাঠামশাই বুঝি?

না, নিজের ঠিক নয়,—বাবার খুড়তুতো ভাই—কিন্তু—

এক বাড়িতে আপনাদের সব একান্নবর্তী পরিবার বুঝি?

না, তা নয়। আগে তাই ছিল বটে, কিন্তু—

এখান থেকে গিয়েই হঠাৎ তাঁর অসুখের খবর পেলেন বুঝি?

না, ঠিক হঠাৎ নয়—ভুগচেন অনেকদিন থেকে, তবে—

তা হলে কালকেও হয়ত যেতে পারবেন না—খুব ক্ষতি হবে ত?

বিমলবাবু বলিলেন, ক্ষতি একটু হতে পারে, কিন্তু মানুষ কি কেবল ব্যবসার লাভ-লোকসান খতিয়েই জীবন কাটাবে? রমণীবাবু নিজেও ত একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু কারবারের বাইরে কি কিছু করেন না?

সবিতা বলিল, করেন, কিন্তু না করলেই তাঁর ছিল ভালো!

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কালকের রাগ আপনার আজও পড়েনি। রমণীবাবু আসবেন কখন?

সবিতা কহিল, জানিনে, না আসাই সম্ভব।

না আসাই সম্ভব? কখন গেলেন আজ?

আজকে নয়, কাল রাত্তিরে আপনাদের যাবার পরেই চলে গেছেন।

বিমলবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আশা করি আর বেশী রাগারাগি করে যাননি। কাল তিনি সামান্য একটু অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলেই বোধ করি ও-রকম অকারণ জোর-জবরদস্তি করেছিলেন, আজ নিশ্চয়ই নিজের অন্যায় টের পেয়েছেন।

সবিতার কাছে কোন জবাব না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, কাল আমার অপরাধও কম হয়নি। সিঙ্গাপুরে যেতে অস্বীকার করার পরেও আপনাকে বারংবার অনুরোধ করা আমার ভারী অনুচিত হয়েচে। নইলে এ-সব কিছুই ঘটতো না। তারই ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে আজ আমার আসা। কাল বড় অসুস্থ ছিলেন, আজ বাস্তবিক সুস্থ হয়েছেন, না একজনের পরে রাগ করে আর একজনকে শাস্তি দিচ্ছেন, বলুন ত সত্যি করে?

উত্তর দিতে গিয়া দুজনার চোখাচোখি হইল, সবিতা চোখ নামাইয়া বলিল, আমি ভালই আছি। না থাকলেই বা আপনি তার কি উপায় করবেন বিমলবাবু?

বিমলবাবু বলিলেন, উপায় করা ত শক্ত নয়, শক্ত হচ্চে অনুমতি পাওয়া। সেইটি পেতে চাই।

না, সে আপনি পাবেন না।

না পাই, অন্ততঃ রমণীবাবুকে ফোন করে জানাবার হুকুম দিন। আপনি নিজে ত জানাবেন না।

না, জানাবো না। কিন্তু আপনিই বা জানাতে এত ব্যস্ত কেন বলুন?

বিমলবাবু কয়েক-মুহূর্ত স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তারপরে ধীরে ধীরে কহিলেন, কালকের চেয়ে আজ আপনি যে ঢের বেশী অসুস্থ তা ঘরে পা দেওয়া মাত্রই চোখে দেখতে পেয়েচি—চেষ্টা করেও লুকোতে পারেন নি। তাই ব্যস্ত।

উত্তর দিতে সবিতারও ক্ষণকাল বিলম্ব হইল, তার পরে কহিল, নিজের চোখকে অতো নির্ভুল ভাবতে নেই বিমলবাবু, ভারী ঠকতে হয়।

বিমলবাবু কহিলেন, হয় না তা বলিনে, কিন্তু পরের চোখই কি নির্ভুল? সংসারে ঠকার ব্যাপার যখন আছেই তখন নিজের চোখের জন্যেই ঠকা ভালো। এতে তবু একটা সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

সবিতার হাসিবার মতো মানসিক অবস্থা নয়—হাসির কথাও নয়,—অনিশ্চিত, অজ্ঞাত আতঙ্কে মন বিপর্যস্ত, তথাপি পরমাশ্চর্য এই যে, মুখে তাঁহার হাসি আসিয়া পড়িল। এ হাসি মানুষের সচরাচর চোখে পড়ে না,—যখন পড়ে রক্তে নেশা লাগে। বিমলবাবু কথা ভুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন,—ইহার ভাষা স্বতন্ত্র—পরিপূর্ণ মদিরাপাত্র তৃষ্ণার্ত মদ্যপের চোখের দৃষ্টির সহজতা যেন এক মুহূর্তে বিকৃত করিয়া দিল এবং সে চাহনির নিগূঢ় অর্থ নারীর চক্ষে গোপন রহিল না। সবিতার অনতিকাল পূর্বের সন্দেহ ও সম্ভাবিত ধারণা এইবার নিঃসংশয় প্রত্যয়ে সর্বাঙ্গ ভরিয়া যেন লজ্জার কালি ঢালিয়া দিল। তাহার মনে পড়িল এই লোকটা জানে সে স্ত্রী নয়, সে গণিকা। তাই অপমানে ভিতরটা যতই জ্বালা করিয়া উঠুক, কড়া গলায় প্রতিবাদ করিয়া ইহারই সম্মুখে মর্যাদাহানির অভিনয় করিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। বিগত রাত্রির ঘটনা স্মরণ হইল। তখন অপমানের প্রত্যুত্তরে সেও অপমান কম করে নাই, কিন্তু এই লোকটি অমার্জিত-রুচি অল্প-শিক্ষিত রমণীবাবু নয়—উভয়ের বিস্তর প্রভেদ—এ হয়ত অপমানের পরিবর্তে একটা কথাও বলিবে না, হয়ত শুধু অবজ্ঞার চাপা হাসি ওষ্ঠাধরে লইয়া বিনয়-নম্র নমস্কারে ক্ষমা-ভিক্ষা চাহিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিবে।

মিনিট দুই-তিন নীরবে কাটিল, বিমলবাবু বলিলেন, কৈ জবাব দিলেন না আমার?

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কি জিজ্ঞেসা করেছিলেন আমার মনে নেই।

এমনি অন্যমনস্ক আজ?

কিন্তু ইহারও উত্তর না পাইয়া বলিলেন, আমি বলছিলাম, আপনি সত্যিই ভালো নেই। কি হয়েছে জানতে পাইনে?

না।

আমাকে না বলুন ডাক্তারকে ত স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন।

না, তাও পারিনে।

এ কিন্তু আপনার বড় অন্যায়। কারণ, যে দোষী সে পাচ্ছে না দণ্ড, পাচ্ছে যে মানুষ সম্পূর্ণ নির্দোষ।

এ অভিযোগেরও উত্তর আসিল না। বিমলবাবু বলিতে লাগিলেন, কাল যা দেখে গেছি, আজ তার চেয়ে আপনি ঢের বেশী খারাপ। হয়ত আবার জবাব দেবেন আমার দেখার ভুল হয়েছে, হয়ত বলবেন নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে কিন্তু একটা কথা আজ বলবো আপনাকে। গ্রহ-চক্র শিশুকাল থেকে অনেক ঘুরিয়েছে আমাকে, এই দুটো চোখ দিয়ে অনেক কিছুই সংসারের দেখতে হয়েছে,—বিশেষ ভুল তাদের হয়নি—হলে মাঝ-নদীতেই অদৃষ্ট-তরী ডুব মারতো, কূলে এসে ভিড়তো না। আমার সেই দুটো চোখ আজ হলফ করে জানাচ্চে আপনি ভালো নেই—তবু কিছুই করতে পাবো না—মুখ বুজে চলে যাবো—এ যে সহ্য করা কঠিন।

আবার দুজনের চোখে-চোখে মিলিল, কিন্তু এবার সবিতা দৃষ্টি আনত করিল না, শুধু চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। সম্মুখে তেমনি নীরবে বসিয়া বিমলবাবু। তাঁহার লালসা-দীপ্ত চোখে উদ্বেগের সীমা নাই—নিষেধ মানিতে চাহে না—ডাক্তার ডাকিতে ছুটিতে চায়। আর সেখানে? অর্থ নাই, লোক নাই, অজানা কোন্ একটা গৃহের মধ্যে পড়িয়া সন্তান তাঁহার রোগশয্যায়। তাহার নিরুপায় মাতৃ-হৃদয় গভীর অন্তরে হাহাকার করিয়া উঠিল—শুধু অব্যক্ত বেদনায় নয়, লজ্জায় ও দুঃসহ অনুশোচনায়। কিছুতেই আর সে বসিয়া থাকিতে পারিল না, উদ্গত অশ্রু কোনমতে সংবরণ করিয়া দ্রুত উঠিয়া পড়িল, কহিল, আর আমাকে কষ্ট দেবেন না বিমলবাবু, আমার কিছুই চাইনে, আমি ভাল আছি। বলিয়াই একটা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। বিমলবাবু বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু রাগ করিলেন না, বুঝিলেন ইহা কঠিন মান-অভিমানের ব্যাপার—দু'দিন সময় লাগিবে।

পরদিন বেলা যখন দশটা, অনেক দূরে গাড়ি রাখিয়া দরোয়ানের পিছনে পিছনে সবিতা সতেরো নম্বর বাটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। ফটিকের মা বাহিরে যাইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে আপনি?

তুমি কে মা?

আমি ফটিকের মা। এ-বাড়ির অনেকদিনের ঝি।

কোথায় যাচ্চো ফটিকের মা?

দাসী হাতের বাটিটা দেখাইয়া কহিল, দোকানে তেল আনতে। কর্তার পা লেগে হঠাৎ সব তেলটুকু পড়ে গেলো, তাই যাচ্চি আবার আনতে।

বামুন আসেনি বুঝি?

না মা, এখনো আসেনি। শুনেচি নাকি কাল আসবে। আজো কর্তাই রাঁধচেন।

রাজু বাড়ি নেই বুঝি?

তাঁকে চেনেন? না মা, তিনি বাড়ি নেই, ছেলে পড়াতে গেছেন। এলেন বলে।

আর রেণু কেমন আছে ফটিকের মা?

তেমনি, কি জানি কেন জ্বরটা ছাড়চে না মা, সকলের বড় ভাবনা হয়েছে।

কে দেখছে?

আমাদের বিনোদ ডাক্তার। এখনি আসবেন তিনি। আপনি কে মা?

আমি এঁদের গাঁয়ের বৌ ফটিকের মা, খুব দূর-সম্পর্কের আত্মীয়। কলকাতায় থাকি, শুনতে পেলুম রেণুর অসুখ, তাই খবর নিতে এলুম। কর্তা আমাকে জানেন।

তাঁকে খবর দিয়ে আসবো কি?

না, দরকার নেই ফটিকের মা, আমি নিজেই যাচ্চি ওপরে। তুমি তেল নিয়ে এসো গে।

দরোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিল, তুমি মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও গে মহাদেব, আমার সময় হলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো, গাড়িটা যেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

বহুৎ আচ্ছা মাইজী, বলিয়া মহাদেব চলিয়া গেল।

সবিতা উপরে উঠিয়া বারান্দায় যে দিকটায় কর্তা রান্নার ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত সেখানে গিয়া দাঁড়াইল। পায়ের শব্দ কর্তার কানে গেল, কিন্তু ফিরিয়া দেখিবার ফুরসত নাই, কহিলেন, তেল আনলে? জলটা ফুটে উঠেচে ফটিকের মা, আলু-পটোল একসঙ্গে চড়াবো, না পটোলটা আগে সেদ্ধ করে নেবো?

সবিতা কহিলেন, একসঙ্গেই দাও মেজকর্তা, যা হোক একটা হবেই।

ব্রজবাবু ফিরিয়া চাহিয়া কহিলেন, নতুন-বৌ! কখন এলে? বসো। না না, মাটিতে না—মাটিতে না, বড় ধুলো। আমি আসন দিচ্চি, বলিয়া হাতের পাত্রটা তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিতেছিলেন, সবিতা হাত বাড়াইয়া বাধা দিল,—করচো কি? তুমি হাতে করে আসন দিলে আমি বসবো কি করে?

তা বটে। কিন্তু এখন আর দোষ নেই—দিই না ও-ঘর থেকে একটা এনে?

না।

সবিতা সেইখানে মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, দোষ সেদিনও ছিল, আজও আছে, মরণের পরেও থাকবে মেজকর্তা। কিন্তু সে-কথা আজ থাক। বামুন কি পাওয়া যাচ্চে না?

পাওয়া অনেক যায় নতুন-বৌ, কিন্তু গলায় একটা পৈতে থাকলেই ত হাতে খাওয়া যায় না। রাখাল কাল একজনকে ধরে এনেছিল, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার কাল একজনকে ধরে আনবে বলে গেছে।

কিন্তু এ লোকটাও যে তোমার জেরায় টিকবে না মেজকর্তা।

ব্রজবাবু হাসিলেন, কহিলেন, আশ্চর্য নয়, অন্ততঃ সেই ভয়ই করি। কিন্তু উপায় কি!

সবিতা কহিল, আমি যদি কাউকে ধরে এনে বলি রাখতে—রাখবে মেজকর্তা?

ব্রজবাবু বলিলেন, নিশ্চয় রাখবো।

জেরা করবে না?

ব্রজবাবু আবার হাসিলেন, বলিলেন, না গো না, করবো না। এটুকু জানি, তোমার জেরায় পাস করে তবে সে আসবে। সে আরও কঠিন। যে যাই করুক, তুমি যে বুড়ো-বামুনের জাত মারবেনা তাতে সন্দেহ নেই।

আমি বুঝি ঠকাতে পারিনে?

না, পারো না। মানুষকে ঠকানো তোমার স্বভাব নয়।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিতেই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল পাছে ঝরিয়া পড়িলে ব্রজবাবু দেখিতে পান।

রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার দুই হাতে দুটো পুঁটুলি, একটায় তরি-তরকারি, অন্যটায় সাগু বার্লি মিছরি ফল-মূল প্রভৃতি রোগীর পথ্য। নতুন-মাকে দেখিয়া প্রথমে সে আশ্চর্য হইল, তার পরে হাতের বোঝা নামাইয়া রাখিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। ব্রজবাবুকে কহিল, আজ বড্ড বেলা হয়ে গেল কাকাবাবু, এবার আপনি ঠাকুরঘরে যান, উদ্যোগ-আয়োজন করে নিন, আমি নেয়ে এসে বাকী রান্নাটুকু সেরে ফেলি। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত রান্নার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কড়ায়, ওটা কি ফুটছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আলু-পটোলের ঝোল।

আর?

আর? আর ভাতটা হবে বৈ ত নয় রাজু।

এতগুলো লোকে কি শুধু ঐ দিয়ে খেতে পারে কাকাবাবু? জল কৈ, কুটনো বাটনা কোথায়, রান্নার কিছুই ত চোখে দেখিনে। বারান্দায় ঝাঁট পর্যন্ত পড়েনি—ধুলো জমে রয়েচে, এত বেলা পর্যন্ত আপনারা করছিলেন কি? ফটিকের মা গেল কোথায়?

ব্রজবাবু অপ্রতিভভাবে কহিলেন, হঠাৎ পা লেগে তেলটা পড়ে গেল কিনা—সে গেছে দোকানে কিনতে—এলো বলে।

মধু?

মধু পেটের ব্যথায় সকাল থেকে পড়ে আছে, উঠতে পর্যন্ত পারেনি। রুগীর কাজ—সংসারের কাজ—একা ফটিকের মা—

খুব ভালো, বলিয়া রাখাল মুখ গম্ভীর করিল। তাহার দৃষ্টি পড়িল এক কড়া ঘোলের প্রতি, জিজ্ঞাস করিল, এত ঘোল কিনলে কে?

ব্রজবাবু বলিলেন, ঘোল নয়, ছানার জল। ভাল কাটলো না কেন বলো ত? রেণু খেতেই চাইলে না।

শুনিয়া রাখাল জ্বলিয়া গেল, কহিল, বুদ্ধির কাজ করেছে যে খায়নি। সংসারের ভার তাহার পরে, রাত্রি জাগিয়া অর্থ-চিন্তা করিয়া, ছুটাছুটি, পরিশ্রম করিয়া সে অত্যন্ত ক্লান্ত, মেজাজ রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে, রাগ করিয়া কহিল, আপনার কাজই এমনি। এটুকু তৈরি করেও যে রুগীকে খাওয়াবেন তাও পারেন না।

সবিতার সম্মুখে নিজের অপটুতার জন্য তিরস্কৃত হইয়া ব্রজবাবু এমন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন যে মুখ দেখিলে দয়া হয়। কোন কৈফিয়ত তাঁহার মুখে আসিল না ; কিন্তু সে দেখিবার রাখালের সময় নাই, কহিল, যান আপনি ঠাকুরঘরে, যা করবার আমিই করচি।

ব্রজবাবু লজ্জিত-মুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ঠাকুরঘরের কোন কাজই এখন পর্যন্ত হয় নাই,—সমস্ত তাঁহাকেই করিতে হইবে। আর একবার স্নানের জন্য নীচে যাইতেছিলেন সবিতা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিলেন, আজ কিন্তু পুজো-আহ্নিক তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে মেজকর্তা, দেরি করলে চলবে না।

কেন?

কেনর উত্তর সবিতা দিল না ; মুখ ফিরাইয়া রাখালকে বলিলেন, তোমার কাকাবাবুর জন্যে আগে একটুখানি মিছরি ভিজিয়ে দাও ত রাজু—কাল গেছে ওঁর একাদশী—এখন পর্যন্ত জলস্পর্শ করেন নি।

রাখাল ও ব্রজবাবু উভয়েই সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিল ; ব্রজবাবু বলিলেন, এ কথাও তোমার মনে আছে নতুন-বৌ? আশ্চর্য!

সবিতা কহিল, আশ্চর্যই ত! কিন্তু দেরি করতে পারবে না বলে দিচ্চি। নইলে গোবিন্দর দোরগোড়ায় গিয়ে এমনি হাঙ্গামা শুরু করবো যে ঠাকুরের মন্ত্র পর্যন্ত তুমি ভুলে যাবে। যাও, শান্ত হয়ে পুজো করো গে, কোন ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না।

ফটিকের মা তেল লইয়া হাজির হইল। রাখাল স্টোভ জ্বালিয়া বার্লি চড়াইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর দুধ নেই ফটিকের মা?

না বাবু, কর্তা সবটা নষ্ট করে ফেলেছেন।

তা হলে উপায় কি হবে? রেণু খাবে কি?

নতুন-মা এবার একটু হাসিলেন, বলিলেন, দুধ না-ই থাকলো বাবা, তাতে ভয় পাবার আছে কি? এ-বেলাটা বার্লিতেই চলে যাবে। কিন্তু তুমি নিজে যেন কর্তার মতো বার্লিটাও নষ্ট করে ফেলো না।

না মা, আমি অতো বেহিসেবী নয়। আমার হাতে কিছু নষ্ট হয় না।

শুনিয়া নতুন-মা আবার একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। খানিক পরে সেখান হইতে উঠিয়া তিনি নীচে নামিয়া আসিলেন। উঠানের একধারে কল-ঘর, জলের শব্দেই চেনা গেল, খুঁজিতে হইল না। কবাট ভেজানো ছিল, ঠেলিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরে ব্রজবাবু স্নান করিতেছিলেন, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, সবিতা ভিতরে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, মেজকর্তা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

বেশ ত, বেশ ত, চলো বাইরে যাই—

সবিতা কহিল, না, বাইরে বাইরের লোকে দেখতে পাবে। এখানে একলা তোমার কাছে আমার লজ্জা নেই।

ব্রজবাবু জড়সড়োভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি কথা নতুন-বৌ?

সবিতা কহিল, আমি এ বাড়ি থেকে যদি না যাই তুমি কি করতে পারো আমার?

ব্রজবাবু তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, তার মানে?

সবিতা বলিল, যদি না যাই তোমার সুমুখে আমার গায়ে হাত দিতে কেউ পারবে না, পুলিশ ডেকে আমাকে ধরিয়ে দিতে তুমি পারবে না, পরের কাছে নালিশ জানানোও অসম্ভব, না গেলে কি করতে পারো আমার?

ব্রজবাবু ভয়ে কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কহিলেন, কি যে ঠাট্টা করো নতুন-বৌ তার মাথামুণ্ড নেই। নাও সরো, দোর খোলো—দেরি হয়ে যাচ্চে।

সবিতা উত্তর দিল, আমি ঠাট্টা করিনি মেজকর্তা, সত্যিই বলচি, কিছুতে দোর খুলবো না যতক্ষণ না জবাব দেবে।

ব্রজবাবু অধিকতর ভীত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ঠাট্টা না হয়তো এ তোমার পাগলামি। পাগলামির কি কোন জবাব আছে?

জবাব না থাকে ত থাকো পাগলের সঙ্গে একঘরে বন্ধ। দোর খুলবো না।

লোকে বলবে কি?

তাদের যা ইচ্ছে বলুক।

ব্রজবাবু কহিলেন, ভালো বিপদ ! জোর করে থাকার কথা কেউ শুনেচে কখনো দুনিয়ায়? তা হলে ত আইন-কানুন বিচার-আচার থাকে না, জোর করে যার যা খুশি তাই করতে পারে সংসারে?

সবিতা কহিল, পারেই ত। তুমি কি করবে বলো না?

এখানে থাকবে, নিজের বাড়িতেও যাবে না?

না। নিজের বাড়ি আমার এই, যেখানে স্বামী আছে, সন্তান আছে। এতদিন পরের বাড়িতে ছিলুম, আর সেখানে যাবো না।

এখানে থাকবে কোথায়?

নীচে এতগুলো ঘর পড়ে আছে তার একটাতে থাকবো। লোকের কাছে দাসী বলে আমার পরিচয় দিও—তোমার মিথ্যে বলাও হবে না।

তুমি ক্ষেপেছো নতুন-বৌ, এ কখনো পারি?

এ পারবে না, কিন্তু ঢের বেশী শক্ত কাজ আমাকে দূর করা। সে পারবে কি করে? আমি কিছুতে যাবো না মেজকর্তা, তোমাকে নিশ্চয় বলে দিলুম।

পাগল! পাগল!

পাগল কিসে? জোর করেছি বলে? তোমার ওপর করবো না ত সংসারে জোর করবো কার ওপর? আর জোরের পরীক্ষাই যদি হয় আমার সঙ্গে তুমি পারবে না।

কেন পারবো না?

কি করে পারবে? তোমার ত আর টাকাকড়ি নেই—গরীব হয়েছো—মামলা করবে কি দিয়ে?

ব্রজবাবু হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা জানু পাতিয়া তাঁহার দুই পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। আজ তিন দিন হইল সে সর্ববিষয়েই উদাসীন, বিভ্রান্তচিত্ত অনির্দেশ্য শূন্য-পথে অনুক্ষণ ক্ষ্যাপার মতো ঘুরিয়া মরিতেছে, নিজের প্রতি লক্ষ্য করিবার মুহূর্ত সময় পায় নাই। তাহার অসংহত রুক্ষ কেশরাশি বর্ষার দিগন্ত প্রসারিত মেঘের মতো স্বামীর পা ঢাকিয়া চারিদিকে ভিজা মাটির পরে নিমেষে ছড়াইয়া পড়িল। হেঁট হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, তোমার মেয়ের জন্যই ত ভাবনা নতুন-বৌ। আচ্ছা, দেখি যদি—

বক্তব্য শেষ করিতে সবিতা দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিল। দু চোখ জলে ভাসিতেছে, কহিল, না মেজকর্তা, মেয়ের জন্যে আর আমি ভাবিনে। তাকে দেখবার লোক আছে, কিন্তু তুমি? এই ভার মাথায় দিয়ে একদিন আমাকে এ-সংসারে তুমি এনেছিলে—

সহসা বাধা পড়িল, তাহার কথাও সম্পূর্ণ হইতে পাইল না, বাহিরে ডাক পড়িল, রাখালবাবু?

রাখাল উপর হইতে সাড়া দিল, আসুন ডাক্তারবাবু।

সবিতা দাঁড়াইয়া উঠিয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া একদিকে সরিয়া দাঁড়াইল। ব্রজবাবু বাহির হইয়া গেলেন।

আট

ঠাকুরঘরের ভিতরে ব্রজবাবু এবং বাহিরে মুক্ত দ্বারের অনতিদূরে বসিয়া সবিতা অপলক-চক্ষে চাহিয়া স্বামীর কাজগুলি নিরীক্ষণ করিতেছিল। একদিন এই ঠাকুরের সকল দায়িত্ব ছিল তাহার নিজের, সে না করিলে স্বামীর পছন্দ হইত না। তখন সময়াভাবে অন্যান্য বহু সাংসারিক কর্তব্য তাহাকে উপেক্ষা করিতে হইত। তাই পিসশাশুড়ী নানা ছলে তাহার নানা ত্রুটি ধরিয়া নিজের গোপন বিদ্বেষের উপশম খুঁজিতেন, আশ্রিত ননদেরা বাঁকা কথায় মনের ক্ষোভ মিটাইত, বলিত, তাহারা কি বামুনের ঘরের মেয়ে নয়? দেব-দেবতার কাজকর্ম কি জানে না? পূজা-অর্চনা, ঠাকুর-দেবতা কি নতুন-বৌয়ের বাপের বাড়ির একচেটে যে সে-ই শুধু শিখে এসেছে? এ-সকল কথার জবাব সবিতা কোনদিন দিত না। কখনো বাধ্য হইয়া এ-ঘরের কাজ যদি অপরকে করিতে দিতে হইত, সারাদিন তাহার মন কেমন করিতে থাকিত, চুপি চুপি আসিয়া ঠাকুরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিয়া বলিত, গোবিন্দ, অযত্ন হচ্চে বাবা জানি, কিন্তু উপায় যে নেই।

সেদিন নিরবচ্ছিন্ন শুচিতা ও নিচ্ছিদ্র অনুষ্ঠানে কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই না তাহার ছিল। আর আজ? সেই গোপাল-মূর্তি তেমনি প্রশান্ত-মুখে আজও চাহিয়া আছেন, অভিমানের কোন চিহ্ন ও-দুটি চোখে নাই।

এই পরিবারে এতবড় যে প্রলয় ঘটিল, ভাঙ্গা-গড়ায় এই গৃহে যুগান্ত বহিয়া গেল, এতবড় পরিবর্তন ঠাকুর কি জানিতেও পারেন নাই! একেবারে নির্বিকার উদাসীন? তাহার অভাবের দাগ কি কোথাও পড়িল না, তাহার এতদিনের এত সেবা শুষ্ক জলরেখার ন্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল!

বিবাহের পরেই তাহার গুরু-মন্ত্রের দীক্ষা হয়, পরিজনগণ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল, এত ছোট বয়সে ওটা হওয়া উচিত নয়, কারণ অবহেলায় অপরাধ স্পর্শিতে পারে। ব্রজবাবু কান দেন নাই, বলিয়াছিলেন, বয়সে ছোট হলেও ও-ই বাড়ির গৃহিণী, আমার গোবিন্দর ভার নেবে বলেই ওকে ঘরে আনা, নইলে প্রয়োজন ছিল না। সে প্রয়োজন শেষ হয় নাই, ইষ্ট-মন্ত্রও সে ভুলে নাই, তথাপি সবই ঘুচিয়াছে; সেই গোবিন্দর ঘরে প্রবেশের অধিকারও আর তাহার নাই, দূরে, বাহিরে বসিতে হইয়াছে।

ডাক্তার বিদায় করিয়া রাখাল হাসিমুখে লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, মায়ের আশীর্বাদের চেয়ে ওষুধ আছে নতুন-মা? বাড়িতে পা দিয়েছেন দেখেই জানি আর ভয় নেই, রেণু সেরে গেছে।

নতুন-মা চাহিয়া রহিলেন, ব্রজবাবু দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, রাখাল কহিল, জ্বর নেই, একদম নরম্যাল! বিনোদবাবু নিজেই ভারী খুশী, বলিলেন, ও-বেলায় যদি বা একটু হয়,

কাল আর জ্বর হবে না। আর ভাবনা নেই, দিন-দুয়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে উঠবে। নতুন-মা, এ শুধু আপনার আশীর্বাদের ফল, নইলে এমন হয় না। আজ রাত্তিরে নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমোনো যাবে, কাকাবাবু, বাঁচা গেল।

খবরটা সত্যিই অভাবিত। রেণুর পীড়া সহজ নহে, ক্রমশঃ বক্রগতি লইতেছে এই ছিল আতঙ্ক। মরণ-বাঁচনের কঠিন পথে দীর্ঘকাল অনিশ্চিত সংগ্রাম করিয়া চলিবার জন্যই সকলে যখন প্রস্তুত হইতেছিলেন তখন আসিল এই আশার অতীত সুসংবাদ। সবিতা গলায় আঁচল দিয়া বহুক্ষণ মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বসিলেন, চোখ মুছিয়া কহিলেন, রাজু চিরজীবী হও বাবা,—সুখে থাকো।

রাখালের আনন্দ ধরে না, মাথা হইতে গুরুভার নামিয়া গেছে, বলিল, মা, আগেকার দিনে রাজা-রানীরা গলার হার খুলে পুরস্কার দিতেন।

শুনিয়া সবিতা হাসিলেন, বলিলেন, হার তো তোমার গলায় মানাবে না বাবা, যদি বেঁচে থাকি বৌমা এলে তাঁর গলাতেই পরিয়ে দেবো।

রাখাল বলিল, এ-জন্মে সে গলা ত খুঁজে পাওয়া যাবে না মা, মাঝে থেকে আমিই বঞ্চিত হলুম। জানেন ত, আমার অদৃষ্টে মুখের অন্ন ধুলোয় পড়ে—ভোগে আসে না।

সবিতা বুঝিলেন, সে সে-দিনের তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণের ব্যাপারটাই ইঙ্গিত করিল। রাখাল বলিতে লাগিল, রেণু সেরে উঠুক, হার না পাই মিষ্টি-মুখ করবার দাবী কিন্তু ছাড়বো না। কিন্তু সেও অন্যদিনের কথা, আজ চলুন একবার রান্নাঘরের দিকে। এ ক'দিন শুধু ভাত খেয়ে আমাদের দিন কেটেছে কেউ গ্রাহ্য করিনি, আজ কিন্তু তাতে চলবে না, ভালো করে খাওয়া চাই। আসুন তার ব্যবস্থা করে দেবেন।

চলো বাবা যাই, বলিয়া সবিতা উঠিয়া গেলেন। সেখানে দূরে বসিয়া রাখালকে দিয়া তিনি সমস্তই করিলেন এবং যথাসময়ে সকলের ভালো করিয়াই আজ আহারাদি সমাধা হইল। সবাই জানিত সবিতা এখনো কিছুই খান নাই, কিন্তু খাবার প্রস্তাব কেহ মুখে আনিতেও ভরসা করিল না; কেবল ফটিকের মা নূতন লোক বলিয়া এবং না-জানার জন্যই কথাটা একবার বলিতে গিয়াছিল, কিন্তু রাখাল চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া দিল।

সকলের মুখেই আজ একটা নিরুদ্বেগ হাসি-খুশী ভাব, যেন হঠাৎ কোন যাদুমন্ত্রে এ-বাটীর উপরে হইতে ভূতের উৎপাত ঘুচিয়া গেছে। রেণুর জ্বর নাই, সে আরামে ঘুমাইতেছে, মেঝেয় একটা মাদুর পাতিয়া ক্লান্ত রাখাল চোখ বুজিয়াছে, মধুর সাড়াশব্দ নাই, সম্ভবতঃ তাহার পেটের ব্যথা থামিয়াছে, নীচে হইতে খনখন ঝনঝন আওয়াজ আসিতেছে, বোধ হয় ফটিকের মা উচ্ছিষ্ট বাসনগুলো আজ বেলাবেলি মাজিয়া লইতেছে। সবিতা আসিয়া কর্তার ঘরের দ্বার ঠেলিয়া চৌকাঠের কাছে বসিল—ওগো, জেগে আছো।

ব্রজবাবু জাগিয়াই ছিলেন, বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

সবিতা কহিল, কৈ আমার জবাব দিলে না।

ব্রজবাবু বলিলেন, তোমাকে রাখাল তখন ডেকে নিয়ে গেল, জবাবটা জেনে নেবার সময় পেলাম না।

কার কাছে জেনে নেবে—আমার কাছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, আশ্চর্য হচ্চো কেন নতুন-বৌ, চিরদিন এই ব্যবস্থাই ত হয়ে এসেছে। সেদিনও ত রাখালের ঘরে অনেকদিনের মুলতুবি সমস্যার সমাধান করে নিলুম তোমার কাছে। খোঁজ নিলে শুনতে পাবে তার একটারও অন্যথা হয়নি।

সবিতা নতমুখে বসিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, প্রশ্ন যেদিক থেকেই আসুক, জবাব দিয়ে এসেছো তুমি—আমি নয়। তার পরে হঠাৎ একদিন, আমার লক্ষ্মী-সরস্বতী, দুই-ই করলে অন্তর্ধান, বুদ্ধির থলিটি গেল আমার হারিয়ে, তখন থেকে জবাব দেবার ভার পড়লো আমার নিজের পরে, দিয়েও এসেছি, কিন্তু তার দুর্গতি যে কি সে ত স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্চো

নতুন-বৌ।

সবিতা মুখ তুলিয়া কহিল, কিন্তু এ যে আমার নিজের প্রশ্ন, মেজকর্তা।

ব্রজবাবু বলিলেন, কিন্তু প্রশ্ন ত সহজ নয়। এর মধ্যে আছে সংসার সমাজ, পরিবার, আছে সামাজিক রীতিনীতি, আছে লৌকিক-পারলৌকিক ধর্ম-সংস্কার, আছে তোমার মেয়ের কল্যাণ-অকল্যাণ, মান-মর্যাদা, তার জীবনের সুখ-দুঃখ। এতবড় ভয়ানক জিজ্ঞাসার জবাব তুমি নিজে ছাড়া কে দেবে বলো ত? আমার বুদ্ধিতে কুলুবে কেন? তুমি বললে, যদি তুমি না যাও, যদি জোর করে এখানে থাকো, কি আমি করতে পারি। কি করা উচিত আমি ত জানিনে নতুন-বৌ, তুমিই বলে দাও।

সবিতা নিরুত্তরে বসিয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত কত-কি ভাবিতে লাগিল, তার পরে জিজ্ঞাসা করিল, মেজকর্তা, তোমার কারবার কি সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে?

হাঁ, সত্যিই সমস্ত নষ্ট হয়ে গেছে।

আমি টাকাটা বার করে না নিলে কি হতো?

তাতেও বাঁচতো না—শুধু ডুবতে হয়তো বছরখানেক দেরি ঘটতো।

তোমার হাতে টাকাকড়ি এখন কি আছে?

কিছুই না। আমার সেই হীরের আংটিটা বিক্রি করে পাঁচ শ টাকা পেয়েচি, তাতেই চলচে।

কোন্ আংটিটা? আমার ব্রত উদযাপনের দক্ষিণে বলে আমি নিজে কিনে যেটা তোমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলুম—সেইটে? তুমি তাকে বিক্রি করেছো?

সে ছাড়া আমার আর কিছু ছিল না, তা তো জানো নতুন-বৌ।

সবিতা আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, যে দুটো তালুক ছিল সেও কি গেছে?

ব্রজবাবু বলিলেন, যায় নি, কিন্তু যাবে। বাঁধা পড়েছে, উদ্ধার করতে পারবো না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিলে সবিতা প্রশ্ন করিল, তোমার এ-পক্ষের স্ত্রীর কি রইলো?

ব্রজবাবু বলিলেন, তাঁর নামে পটলডাঙ্গায় দুখানা বাড়ি খরিদ করা হয়েছিল তা আছে। আর আছে গয়না, আছে পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকার কাগজ। তাঁর এবং তাঁর মেয়ের চলে যাবে,—কষ্ট হবে না।

রেণুর কি আছে মেজকর্তা?

কিছু না। সামান্য খানকয়েক গহনা ছিল, তাও বোধ হয় ভুল করে তাঁরা নিয়ে চলে গেছেন।

শুনিয়া রেণুর মা অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ব্রজবাবু বলিলেন, ভাবচি, রেণু ভালো হলে আমরা দেশে চলে যাবো। সেখানে শুধু দয়া করে মেয়েটিকে কেউ যদি নেয় ওর বিয়ে দেবো, তার পরেও যদি বেঁচে থাকি, গোবিন্দর সেবা করে পাড়াগাঁয়ে কোনরকমে বাকী দিন-কটা আমার কেটে যাবে—এই ভরসা।

কিন্তু সবিতার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, একটা মুশকিল হয়েছে রেণুকে নিয়ে, তাকে রাজী করাতে পারিনি। তাকে তুমি জানো না, কিন্তু সে হয়েছে তোমার মতোই অভিমানী, সহজে কিছু বলে না, কিন্তু যখন বলে তার আর অন্যথা করানো যায় না। যেদিন এই বাসাটায় চলে এলাম, সেদিন রেণু বললে চলো বাবা আমরা দেশে চলে যাই। কিন্তু আমার বিয়ে দেবার তুমি চেষ্টা কোরো না, আমার বাবাকে একলা ফেলে রেখে আমি কোথাও যেতে পারবো না। বললাম, আমি ত বুড়ো হয়েছি মা, ক'টা দিনই বা বাঁচবো, কিন্তু তখন তোর কি হবে বল দিকি? ও বললে, বাবা, তুমি ত আমার অদৃষ্ট বদলাতে পারবে না। ছেলেবেলায় মা যাকে ফেলে দিয়ে যায়, যার বিয়ের দিনে অজানা-বাধায় সমস্ত ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, বাপের রাজ-সম্পদ যার ভোজবাজীর মতো বাতাসে উড়ে যায়, তাকে সুখ-ভোগের জন্যে ভগবান সংসারে পাঠান না, তার দুঃখের জীবন দুঃখেই শেষ হয়। এই আমার কপালের লেখা বাবা, আমার জন্যে ভেবে ভেবে আর তুমি কষ্ট পেয়ো না। বলিতে বলিতে সহসা গলাটা তাঁহার ভারী হইয়া আসিল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া কহিলেন, রেণু কথাগুলো বললে বিরক্ত হয়েও নয়, দুঃখের

ধাক্কায় ব্যাকুল হয়েও নয়। ও জানে ওর ভাগ্যে এ-সব ঘটবেই। ওর মুখের উপর বিষাদের কালো ছায়া নেই, বললেও খুব সহজে—কিন্তু যা মুখে এলো তাই বলা নয়, খুব ভেবেচিন্তেই বলা। তাই ভয় হয়, এ থেকে হয়তো ওকে সহজে টলানো যাবে না। তবু ভাবি নতুন-বৌ, এ দুর্ভাগ্যেও এই আমার মস্ত সান্ত্বনা যে, রেণু আমার শোক করতে বসেনি, আমাকে মনে মনেও একবারো সে তিরস্কার করেনি।

স্বামীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সবিতার দুই চোখে জল ভরিয়া আসিল, কহিল, মেজকর্তা, বেঁচে থেকে সমস্তই চোখে দেখবো, কানে শুনবো, কিন্তু কিছুই করতে পাবো না?

ব্রজবাবু বলিলেন, কি করতে চাও নতুন-বৌ, রেণু তো কিছুতেই তোমার সাহায্য নেবে না! আর আমি—

সবিতার জিহ্বা শাসন মানিল না, অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, রেণু কি জানে আমি আজও বেঁচে আছি মেজকর্তা?

কথা কয়টি সামান্যই, কিন্তু প্রশ্নটি যে তাঁহার কতদিকে কতভাবে তাঁহার রাত্রির স্বপ্ন, দিনের কল্পনা ছাইয়া আছে, এ সংবাদ সে ছাড়া আর কে জানে? পাংশু-মুখে চাহিয়া উত্তরের জন্য তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। ব্রজবাবু চুপ করিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, হাঁ সে জানে।

জানে আমি বেঁচে আছি?

জানে। সে জানে তুমি কলকাতায় আছ—সে জানে তুমি অগাধ ঐশ্বর্যে সুখে আছো।

সবিতা মনে মনে বলিল, ধরণী দ্বিধা হও।

ব্রজবাবু কহিতে লাগিলেন, সে তোমার সাহায্য নেবে না, আর আমি—গোবিন্দর শেষের ডাক আমি কানে শুনতে পেয়েচি নতুন-বৌ, আমার গোনা-দিন ফুরিয়ে এলো, তবু যদি আমাকে কিছু দিয়ে তুমি তৃপ্তি পাও আমি নেবো। প্রয়োজন আছে বলে নয়—আমার ধর্মের অনুশাসন—আমার ঠাকুরের আদেশ বলে নেবো। তোমার দান হাত পেতে নিয়ে আমি পুরুষের শেষ অভিমান নিঃশেষ করে দিয়ে তৃণের চেয়েও হীন হয়ে সংসার থেকে বিদায় হবো। তখন যদি তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাই।

সবিতা স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, কিন্তু স্পষ্ট বুঝিল তাঁহার চোখ দিয়া দু'ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল। সেইখানে স্তব্ধ নতমুখে বসিয়া তাঁহার সকালের কথাগুলা মনে হইতে লাগিল। মনে পড়িল তখন স্বামীর স্নানের ঘরে ঢুকিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া সে তাঁহাকে জোর করিয়া বলিয়াছিল, যদি না যাই কি করতে পারো আমার? পায়ে মাথা রাখিয়া বলিয়াছিল, এই ত আমার গৃহ, এখানে আছে আমার কন্যা, আছে আমার স্বামী। আমাকে বিদায় করে সাধ্য কার?

কিন্তু এখন বুঝিল কথাগুলো তাহার কত অর্থহীন, কত অসম্ভব। কত হাস্যকর তাহার জোর করার দাবী, তাহার ভিত্তিহীন শূন্যগর্ভ আস্ফালন। আজ এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া এক কুলত্যাগিনী নারী ও অপর প্রান্তে দাঁড়াইয়া তাহার স্বামী, তাহার পীড়িত সন্তানই শুধু নয়, মাঝখানে আছে সংসার, আছে ধর্ম, আছে নীতি, আছে সমাজ-বন্ধনের অসংখ্য বিধিবিধান। কেবলমাত্র অশ্রুজলে ধুইয়া, স্বামীর পায়ে মাথা কুটিয়া এতবড় গুরুভার টলাইবে সে কি করিয়া? আর কথা কহিল না, স্বামীর উদ্দেশে আর একবার নীরবে মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাখালের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে, সে আসিয়া কহিল, আমি বলি বুঝি নতুন-মা চলে গেছেন।

না বাবা, এইবার যাবো। রেণু কেমন আছে?

ভালো আছে মা, এখনো ঘুমোচ্চে।

মেজকর্তা, আমি যাই এখন?

এসো।

রাখাল কহিল, মা, চলুন আপনাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি। কাল আবার আসবেন তো?

আসবো বৈ কি বাবা। এই বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন, পিছনে চলিল রাখাল।

পথে আসিতে গাড়ির মধ্যে বসিয়া সবিতা আজিকার সমস্ত কথা, সমস্ত ঘটনা মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। তাহার তের বৎসর পূর্বেকার জীবন যা-কিছুর সঙ্গে গাঁথা ছিল, আজ আবার তাহাদের মাঝখানেই তাহার দিন কাটিল। স্বামী, কন্যা, রাখাল-রাজ এবং কুলদেবতা গোবিন্দ-জীউ। গৃহত্যাগের পরে হইতে অনুক্ষণ আত্মগোপন করিয়াই তাহার এতকাল কাটিয়াছে,. কখনো তীর্থে বাহির হয় নাই, কোন দেব-মন্দিরে প্রবেশ করে নাই, কখনো গঙ্গাস্নানে যায় নাই—কত পর্বদিন, কত শুভক্ষণ, কত স্নানের যোগ বহিয়া গেছে—সাহস করিয়া কোনদিন পথের বারান্দায় পর্যন্ত দাঁড়ায় নাই পাছে পরিচিত কাহারো সে চোখে পড়ে। সেদিন রাখালের ঘরের মধ্যে অকস্মাৎ একটুখানি আবরণ উঠিয়াছে,—আজ সকলের কাছেই তাহার ভয় ভাঙ্গিল, লজ্জা ঘুচিল। রেণু এখনো শুনে নাই, কিন্তু শুনিতে তাহার বাকী থাকিবে না। তখন সেও হয়তো এমনি নীরবেই ক্ষমা করিবে। তাহার 'পরে কাহারো রাগ নাই, অভিমান নাই ; ব্যথা দিতে এতটুকু কটাক্ষ পর্যন্ত কেহ করে নাই। দুঃখের দিনে সে যে দয়া করিয়া তাহাদের খোঁজ লইতে আসিয়াছে ইহাতেই সকলে কৃতজ্ঞ। ব্যস্ত হইয়া ব্রজবাবু স্বহস্তে দিতে আসিয়াছিলেন তাহাকে বসিবার আসন—যেন অতিথির পরিচর্যায় কোথাও না ত্রুটি হয়। অর্থাৎ পরিপূর্ণ বিচ্ছেদের আর বাকী কিছু নাই, চলিয়া আসিবার কালে সবিতা এই কথাটাই নিঃসংশয়ে জানিয়া আসিল।

রেণু জানে তাহার পিতা নিঃস্ব। সে জানে তাহার ভবিষ্যতের সকল সুখ-সৌভাগ্যের আশা নির্মূল হইয়াছে। কিন্তু এই লইয়া শোক করিতে বসে নাই, দুর্দশাকে সে অবিচলিত ধৈর্যে স্বীকার করিয়াছে। সঙ্কল্প করিয়াছে, ভালো হইয়া দরিদ্র পিতাকে সঙ্গে করিয়া সে তাহাদের নিভৃত পল্লীগৃহে ফিরিয়া যাইবে—তাঁহার সেবা করিয়া সেইখানেই জীবন অতিবাহিত করিবে।

ব্রজবাবু বলিয়াছিলেন, রেণু জানে মা তাহার বাঁচিয়া আছে—মা তাহার অগাধ ঐশ্বর্যে সুখে আছে। স্বামীর এই কথাটা তাহার যতবার মনে পড়িল, ততবারই সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া লজ্জায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ইহা মিথ্যা নয়,—কিন্তু ইহাই কি সত্য? মেয়েকে সে দেখে নাই, রাখালের মুখে আভাসে তাহার রূপের বিবরণ শুনিয়াছে,—শুনিয়াছে সে নাকি তাহার মায়ের মতোই দেখিতে। নিজের মুখ মনে করিয়া সে-ছবি আঁকিবার চেষ্টা করিল, স্পষ্ট তেমন হইল না, তবুও রোগ-তপ্ত তাহার আপন মুখই যেন তাহার মানসপটে বারবার ফুটিয়া উঠিতে লাগিল।

পাড়াগাঁয়ের দুঃখ-দুর্দশার কত সম্ভব-অসম্ভব মূর্তিই যে তাহার কল্পনায় আসিতে যাইতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই,—এবং সমস্তই যেন সেই একটিমাত্র পাণ্ডুর, রুগ্ন মুখখানিকেই সর্বদিকে ঘিরিয়া। সংসারে নিরাসক্ত দরিদ্র পিতা ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন, কিছুই তাঁহার চোখে পড়ে না,—সেইখানে রেণু একেবারে একা। দুর্দিনে সান্ত্বনা দিবার বন্ধু নাই, বিপদে ভরসা দিবার আত্মীয় নাই—সেখানে দিনের পরে দিন তাহার কেমন করিয়া কাটিবে? যদি কখনো এমনি অসুখে পড়ে—তখন? হঠাৎ যদি বৃদ্ধ পিতার পরলোকের ডাক আছে—সেদিন? কিন্তু উপায় নাই—উপায় নাই! তাহার মনে হইতে লাগিল পিঞ্জরে বুদ্ধ করিয়া তাহারি চোখের উপর যেন সন্তানকে তাহার কাহারা হত্যা করিতেছে।

সবিতার চৈতন্য হইল যখন গাড়ি আসিয়া তাহার দরজায় দাঁড়াইল। উপরে উঠিতে ঝি আসিয়া চুপি চুপি বলিল, মা, বাবু বড় রাগ করেছেন।

কখন এলেন তিনি?

অনেকক্ষণ। বড় ঘরে বসে বিমলবাবুর সঙ্গে কথা কইচেন।

তিনি কখন এলেন?

একটু আগে। এখন হঠাৎ সে-ঘরে গিয়ে কাজ নেই মা, রাগটা একটু পড়ুক।

সবিতা ভ্রূকুটি করিল, কহিল, তুমি নিজের কাজ করো গে।

সে স্নান করিয়া কাপড় ছাড়িয়া বসিবার ঘরে আসিয়া যখন দাঁড়াইল তখন সন্ধ্যার আলো জ্বালা হইয়াছে, বিমলবাবু দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছেন আজ?

ভালো আছি। বসুন।

তিনি বসিলে সবিতা নিজেও গিয়া একটা চৌকিতে উপবেশন করিল। বিমলবাবু বলিলেন, শুনলুম আপনি দুপুরের পূর্বেই বেরিয়েছিলেন—আজ আপনার খাওয়া পর্যন্ত হয়নি।

সবিতা কহিল, না তার সময় পাইনি।

রমণীবাবু মুখ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া বসিয়াছিলেন, কহিলেন, কোথায় যাওয়া হয়েছিল আজ?

সবিতা কহিল, আমার কাজ ছিল।

কাজ সমস্ত দিন?

নইলে সমস্ত দিন থাকতে যাবো কেন? আগেই ত ফিরতে পারতুম।

রমণীবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, শুনতে পাই আজকাল প্রায়ই তুমি বাড়ি থাকো না—কাজটা কি ছিল একটু শুনতে পাইনে?

সবিতা কহিল, না, সে তোমার শোনবার নয়। বিমলবাবু, আজও আপনার যাওয়া হল না?

বিমলবাবু বলিলেন, না হলো না। জ্যাঠামোশাই একটু না সারলে বোধ করি যেতে পারবো না।

কথাটা তাঁহার শেষ হইবামাত্র রমণীবাবু সরোষে বলিয়া উঠিলেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি তুমি বাইরে গিয়েছিলে?

সবিতা শান্তভাবে উত্তর দিল, তুমি ত তখন ছিলে না।

জবাবটা ক্রোধ উদ্রেক করিবার মতো নয়, কিন্তু তিনি রাগিয়াই ছিলেন, তাই হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন—থাকি না-থাকি সে আমি বুঝবো, কিন্তু আমার হুকুম ছাড়া তুমি এক-পা বার হবে না আজ স্পষ্ট করে বলে দিলুম। শুনতে পেলে?

শুনিতে সকলে পাইলেন ; বিমলবাবু সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, রমণীবাবু আজ আমি উঠি—কাজ আছে।

না না আপনি বসুন। কিন্তু এই সব বেলাল্লাপনা আমি যে বরদাস্ত করিনে তাই শুধু ওকে জানিয়ে দিলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল, বেলাল্লাপনা তুমি কাকে বল?

বলি, তুমি যা করে বেড়াচ্চো তাকে। যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ানোকে।

কাজ থাকলেও যাবো না?

না। আমি যা বলবো সেই তোমার কাজ। অন্য কাজ নেই।

তাই ত এতকাল করে এসেচি সেজবাবু, কিন্তু এখন কি আমাকে তোমার অবিশ্বাস হয়?

অবিশ্বাস তাহার প্রতি কোনদিন হয় না, তবু ক্রোধের উপর রমণীবাবু বলিয়া বসিলেন, হয়, একশোবার হয়। তুমি সীতা না সাবিত্রী যে অবিশ্বাস হতে পারে না? একজনকে ঠকাতে পেরেচো, আমাকে পারো না।

বিমলবাবু লজ্জায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, ইঁহাদের কলহের মাঝখানে কথা বলাও চলে না, কিন্তু সবিতা স্থির হইয়া বহুক্ষণ পর্যন্ত নিঃশব্দে রমণীবাবুর মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, সেজবাবু, তুমি জানো আমি মিছে কথা বলিনে। আমাদের সম্বন্ধ আজ থেকে শেষ হলো। আর তুমি আমার বাড়িতে এসো না।

কলহ-বিবাদ ইতিপূর্বেও হইয়াছে, কিন্তু সমস্তই এক-তরফা। হাঙ্গামা, চেঁচামেচির ভয়ে চিরদিনই সবিতা চুপ করিয়া গেছে, পাছে গোপন কথাটা কাহারো কানে যায়। সেই নতুন-বৌয়ের মুখের এতবড় শক্ত কথায় রমণীবাবু ক্ষেপিয়া গেলেন, বিশেষতঃ তৃতীয় ব্যক্তির সমক্ষে। মুখখানা বিকৃত করিয়া কহিলেন, কার বাড়ি এ? তোমার? বলতে একটু লজ্জা হলো না?

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপরে আস্তে আস্তে বলিল, হাঁ, আমার লজ্জা হওয়া উচিত সেজবাবু, তুমি সত্যি কথাই বলেচো। না, এ-বাড়ি আমার নয়, তোমার—তুমিই দিয়েছিলে। কাল আমি আর কোথাও চলে যাবো, তখন সবই তোমার থাকবে।

তেরো বৎসর পরে চলে যাবার দিনে তোমার একটা কপর্দকও আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না, সমস্ত তোমাকে ফিরিয়ে দিলুম।

এই কণ্ঠস্বরে রমণীবাবুর চমক ভাঙ্গিল, হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, কাল চলে যাবে কি রকম?

হাঁ, আমি কালই চলে যাবো!

চলে যাবো বললেই যেতে দেবো তোমাকে?

আমাকে বাধা দেবার মিথ্যে চেষ্টা করো না সেজবাবু, আমাদের সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। এ আর ফিরবে না।

এতক্ষণে রমণীবাবুর হুঁশ হইল যে ব্যাপারটা সত্যই ভয়ানক হইয়া উঠিল ; ভয় পাইয়া কহিলেন, আমি কি সত্যিই বলেচি নতুন-বৌ এ-বাড়ি তোমার নয়, আমার? রাগের মাথায় কি একটা কথা বার হয়ে যায় না?

সবিতা কহিল, রাগের জন্য নয়। রাগ যখন পড়ে যাবে—হয়তো দেরি হবে—তখন বুঝবে এতবড় বাড়ি দান করার ক্ষতি তোমার সইবে না, চিরকাল কাঁটার মতো তোমার মনে এই কথাটাই ফুটবে যে, আমাদের দুজনের দেনা-পাওনায় একলা তুমিই ঠকেচো। দাঁড়িপাল্লায় একটা দিক যখন শূন্য দেখবে তখন অন্যদিকে বাটখারার ভার তোমার বুকে যাঁতার মতো চেপে বসবে—সে সহ্য করার শিক্ষা তোমার হয়নি। কিন্তু আর তর্ক করার জোর আমার নেই—আমি বড় ক্লান্ত। বিমলবাবু, আর বোধ করি দেখা হবার আমাদের অবকাশ হবে না—আমি কালকেই চলে যাবো।

কোথায় যাবেন?

সে এখনো জানিনে।

কিন্তু যাবার আগে দেখা হবেই। আমি আবার আসবো।

সময় পান আসবেন। আজ কিন্তু আমি চললুম। এই বলিয়া সবিতা আজ উভয়কেই নমস্কার করিয়া উঠিয়া গেল।

বিমলবাবু বলিলেন, রমণীবাবু আমারও নমস্কার নিন—চললুম।

নয়

এতবড় কথাটা জানাজানি হইতে বাকী রহিল না, প্রভাত না হইতেই ভাড়াটেরা সবাই শুনিল কাল রাত্রে কর্তা ও গৃহিণীতে তুমুল কলহ হইয়া গেছে ও নতুন-মা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন কালই এ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। অন্য কেহ হইলে তাহারা শুধু মৃদু হাসিয়া স্বকার্যে মন দিত, কিন্তু ইঁহার সম্বন্ধে তাহা পারিল না। ঠিক যে বিশ্বাস করিতে পারিল তাহাও নয়, কিন্তু বিষয়টা এতই গুরুতর যে, সত্য হইলে ভাবনার সীমা নাই। শহরে এত অল্পমূল্যে এমন বাসস্থান যে কোথাও মিলবে না, ভয় এই শুধু নয়, তাহাদের কতদিনের ভাড়া বাকী পড়িয়া আছে এবং কতভাবেই না এই গৃহস্বামিনীর কাছে তাহারা ঋণী। অনেকে প্রায় ভুলিয়াই গেছে এ-গৃহ তাহাদের নিজের নয়। তাহারা সারদাকে ধরিয়া পড়িল এবং সে আসিয়া ম্লান-মুখে কহিল, এ কি কথা সবাই আজ বলা-বলি করচে মা?

কি কথা সারদা?

ওরা বলচে আজই এ-বাড়ি থেকে আপনি চলে যাবেন।

ওরা সত্যি কথাই বলচে সারদা।

সত্যি কথা! সত্যিই চলে যাবেন আপনি?

সত্যিই চলে যাবো সারদা।

শুনিয়া সারদা স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কোথায় যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, সে এখনো স্থির করিনি, শুধু যেতে যে হবে এইটুকুই স্থির করেচি মা।

সারদার দু'চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, কহিল, ওরা কেউ বিশ্বাস করতে পারচে না মা, ভাবচে এ কেবল আপনার রাগের কথা—রাগ পড়লেই মিটে যাবে। আমিও ভাবতে পারিনে মা, বিনা-মেঘে আমাদের মাথায় এতবড় বজ্রাঘাত হবে—নিরাশ্রয়ে আমরা কে কোথায় ভেসে যাবো।

তবু, ওরা যা জানে না আমি তা জানি। আমি বুঝতে পেরেচি মা, সম্প্রতি এ-বাড়ি আপনার কাছে এত তেতো হয়ে উঠেছে যে, সে আর সইছে না, কিন্তু যাবো বললেই ত যাওয়া হতে পারে না।

নতুন-মা বলিলেন, কেন পারে না সারদা? এ-বাড়ি আমার তেতো হয়ে উঠেছে সম্প্রতি নয়, বারো বছর আগে যেদিন প্রথম এখানে পা দিয়েছি। কিন্তু বারো বৎসর ভুল করেছি বলে আরো বারো বৎসর ভুল করতে হবে, এ আমি আর মানবো না—এ দুর্গতি থেকে মুক্ত হবোই।

সারদা কহিল, মা, আমার ত কেউ নেই, আমাকে কার কাছে ফেলে দিয়ে যাবেন?

নতুন-মা বলিলেন, যার স্বামী আছে তার সব আছে সারদা। তুমি কোন অন্যায়, কোন অপরাধ করোনি। অনুতপ্ত হয়ে জীবনকে একদিন ফিরতেই হবে। দুঃখের জ্বালায় হতবুদ্ধি হয়ে সে যেখানেই পালিয়ে থাক আবার তোমার কাছে তাকে আসতে হবে; কিন্তু আমার সঙ্গে গেলে সে ত তোমাকে সহজে খুঁজে পাবে না মা।

সারদা নতমুখে কহিল, না মা, তিনি আর আসবেন না।

এমন কখনো হয় না সারদা,—সে আসবেই।

না মা, আসবেন না। কিন্তু আজকে নয়, আর একদিন আপনাকে তার কারণ জানাবো।

জানিবার জন্য সবিতা পীড়াপীড়ি করিলেন না, কিন্তু অতি-বিস্ময়ে চুপ করিয়া রহিলেন।

সারদা বলিতে লাগিল, যেখানেই যান আমি সঙ্গে যাবো। আপনি বড়ঘরের মেয়ে, বড়ঘরের বৌ—কোথাও একলা যাওয়া চলে না, সঙ্গে দাসী একজন চাই—আমি আপনার সেই দাসী মা।

কি করে জানলে সারদা আমি বড় ঘরের বৌ? কে তোমাকে বললে এ কথা?

সারদা কহিল, কেউ বলেনি। কিন্তু শুধু কি এ কথা আমিই জানি মা, জানে সবাই। এ কথা লেখা আছে আপনার চোখের তারায়, লেখা আছে আপনার সর্বাঙ্গে, আপনি হেঁটে গেলে লোকে টের পায়। বাবু কি-একটু সন্দেহের আভাস দিয়েছিলেন, কি-একটু অপমানের কথা বলেছিলেন এমন কত ঘরেই ত হয়—কিন্তু সে আপনার সহ্য হলো না, সমস্ত ত্যাগ করে চলে যেতে চাচ্চেন। বড়ঘরের মেয়ে ছাড়া কি এত অভিমান কারো থাকে মা?

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ বলিতে লাগিল, ভেতরের কথা সবাই জানে। তবু যে কেউ কখনো মুখে আনতে পারে না, সে ভয়েও নয়, আপনার অনুগ্রহের লোভেও নয়। সে হ'লে এ ছলনা কোনদিন-না কোনদিন প্রকাশ পেতো। আপনাকে আভাসেও যে কেউ অসম্মান করতে পারে না সে শুধু এইজন্যেই মা।

সবিতা সকৃতজ্ঞ-কণ্ঠে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তোমরা সবাই যে আমাকে ভালোবাসো, সে আমি জানি।

সারদা কহিল, কেবল ভালবাসাই নয়, আমরা আপনাকে বহু সম্মান করি। শুধু আপনি ভালো বলেই করিনে, আপনি বড় বলে করি। তাই জল্পনা করা দূরে থাক, ও-কথা মনে ভাবলেও আমরা লজ্জা পাই। সেই আমাদের বিসর্জন দিয়ে কেমন করে চলে যাবেন?

কিন্তু না গিয়েও যে উপায় নেই।

উপায় যদি না থাকে, আমাদেরও সঙ্গে না গিয়ে উপায় নেই। আর, আমি না থাকলে কাজ করবে কে মা?

সবিতা বলিলেন, কে করবে জানিনে, কিন্তু বড়-ঘর থেকেই যদি এসে থাকি সারদা, তুমিও তেমন ঘর থেকে আসোনি যারা পরের কাজ করে বেড়ায়। তোমাকে দাসীর কাজ করতে আমিই বা দেবো কেন?

সারদা জবাব দিল, তা হলে দাসীর কাজ করবো না, আমি করবো মায়ের সেবা। অপমানের লজ্জায় একলা গিয়ে পথে দাঁড়াবেন, তার দুঃখ যে কত সে আমি জানি। সে আমার সইবে না মা, সঙ্গে আমি যাবোই। বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

সে স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাহে না, কেবল ইঙ্গিতে বুঝাইতে চায় নিরাশ্রয়ের দুঃখ কত! সবিতার নিজেরও মনে পড়িল সেদিনের কথা যেদিন গভীর রাত্রে স্বামীগৃহ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। আজও সে দুঃখের তুলনা করিতে জগতের কোন দুঃখই খুঁজিয়া পান না। তাহার পরে সুদীর্ঘ বারো বৎসর কাটিল এই গৃহে। এই নরক-কুণ্ডেও বাঁচার প্রয়োজনে আবার তাঁহাকে ধীরে ধীরে অনেক-কিছুই সঞ্চয় করিতে হইয়াছে, সে-সকল সত্যই কি আজ ভার-বোঝা? সত্যই কি প্রয়োজন একেবারে ঘুচিয়াছে? আবার কি নিজেকে তিনি ফিরাইয়া পাইয়াছেন? সারদার সতর্ক বাণী তাঁহাকে সচেতন করিল, সন্দেহ জাগিল নির্বিঘ্ন আশ্রয়-ত্যাগের নিদারুণ দুঃসাহস হয়তো আজ আর তাঁহার নাই। পুণ্যময় স্বামিগৃহবাসের বহু স্মৃতি মানস-পটে ফুটিয়া উঠিল, ভয় হইল, সেদিনের সেই দেহ, সেই মন, সেই শান্ত পল্লী-ভবনের সরল সামান্য প্রয়োজন এই বিক্ষুব্ধ নগরীর অশুচি জীবনযাত্রার ঘূর্ণাবর্তে পাক খাইয়া কোথায় ডুবিয়াছে, কোন মতেই আর তাহাদের সন্ধান মিলিবে না। মনে মনে মানিতে হইল সে নতুন-বৌ আর তিনি নাই, তাঁহার বয়স হইয়াছে, অভ্যাসের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে, এ-আশ্রয় যে দিয়াছে তাহার দেওয়া লাঞ্ছনা ও অপমান যত বড় হউক, সে আশ্রয় বিসর্জন দিয়া শূন্যহাতে পথে বাহির হওয়া আজ তাহার চেয়েও কঠিন; কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল, থাকাই বা যায় কিরূপে। এই লোকটার বিরুদ্ধে তাঁহার বিদ্বেষ ও ঘৃণা অহরহ পুঞ্জিত হইয়া যে এতবড় পর্বতাকার হইয়াছে তাহা এতদিন নিজেও এমন করিয়া হিসাব করিয়া দেখেন নাই। মনে হইল সে আসিয়াছে, খাটে বসিয়া পান ও দোক্তায় একটা গাল আবের মত ফুলাইয়া বারংবার উচ্চারিত সেই সকল অত্যন্ত অরুচিকর সম্ভাষণ ও রসিকতায় তাহার মনোরঞ্জনের প্রযত্ন করিতেছে,—তাহার লালসালিপ্ত সেই ঘোলাটে চাহনি, তাহার একান্ত লজ্জাহীন অত্যুগ্র অধীরতা—এই কামার্ত অতি-প্রৌঢ় ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে গিয়া আবার তাঁহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইবে মনে করিয়া ক্ষণকালের জন্য সবিতা যেন হতচেতন হইয়া রহিলেন।

মা?

সবিতা চকিত হইয়া সাড়া দিলেন, কেন সারদা?

সত্যি-সত্যিই আজ চলে যাবেন না ত?

আজ না হলেও একদিন তো যেতে হবে।

কেন যেতে হবে? এ-বাড়ি তো আপনার।

না, আমার নয়, রমণীবাবুর।

এতদিন এই নামটা তিনি মুখে আনিতেন না যেন সত্যই তাঁহার নিষিদ্ধ, আজ ছলনার মুখোশ খুলিয়া ফেলিলেন। সারদা লক্ষ্য করিল, কারণ হিন্দু-নারীর কানে ইহা বাজিবেই, এবং হেতুও বুঝিল। বলিল, আমরা তো সবাই জানি এ-বাড়ি তিনি আপনাকে দিয়েছিলেন, আর ত এতে তাঁর অধিকার নেই মা।

সবিতা বলিলেন, সে আমি জানিনে সারদা, সে আইন-আদালতের কথা। মৌখিক দানের কতটুকু স্বত্ব আমি জানিনে।

সারদা ভীত হইয়া বলিল, শুধু মৌখিক? লেখাপড়া হয়নি? এমন কাঁচা-কাজ কেন করেছিলেন মা?

সবিতা চুপ করিয়া রহিলেন, তাঁহার তৎক্ষণাৎ মনে পড়িল স্বামীর কাছে যে টাকা গচ্ছিত ছিল, সর্বস্বান্ত হইয়াও সুদে-আসলে সেদিন তাহা তিনি প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

সারদা কহিল, রমণীবাবুকে আসতে মানা করেছেন, এখন রাগের উপর যদি তিনি অস্বীকার করেন?

সবিতা অবিচলিত-কণ্ঠে বলিলেন, তিনি তাই করুন সারদা, আমি তাঁকে এতটুকু দোষ দেবো না। কেবল তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা, রাগারাগি হাঁকাহাঁকি করতে আর যেন না তিনি আমার সুমুখে আসেন।

শুনিয়া সারদা নির্বাক হইয়া রহিল। অবশেষে শুষ্ক-মুখে কহিল, একটা কথা বলি মা

আপনাকে। রমণীবাবুকে বিদায় দিলেন, থাকবার বাড়িটাও যেতে বসেছে, সত্যিই কি আপনার কোন ভাবনা হয় না? সেদিন যখন আমাকে ফেলে রেখে তিনি চলে গেলেন, একলা ঘরের মধ্যে আমি যেন ভয়ে পাগল হয়ে গেলুম। জ্ঞান ছিল না বলেই তো বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিলুম মা, নইলে এতবড় পাপের কাজে ত আমার সাহস হতো না, কিন্তু আপনাকে দেখি সম্পূর্ণ নির্ভয়,—কিছুই গ্রাহ্য করেন না—এমনি কি ক'রে সম্ভব হয় মা! বোধ হয় সম্ভব হয় শুধু আমাদের চেয়ে আপনি অনেক বড় বলেই।

সবিতা বলিলেন, বড় নই মা। কিন্তু তোমার আমার অবস্থা এক নয়। তুমি ছিলে সম্পূর্ণ নিরুপায়, কিন্তু আমি তা নয়। সেদিন যে আমার অনেক টাকার সম্পত্তি কেনা হলো সে আমার আছে সারদা।

সারদা আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাতে তো কোন গোলযোগ ঘটবে না মা?

সবিতা সগর্বে বলিয়া উঠিলেন, সে যে আমার স্বামীর দান সারদা,—সে যে আমার নিজের টাকা। তাতে গোলযোগ ঘটায় সাধ্য কার?

বারো বৎসর সবিতা একাকী, আত্মীয়-স্বজনহীন বারোটা বৎসর কাটিয়াছে তাঁহার পরগৃহে। মনের কথা বলিবার একটি লোকও এতদিন ছিল না। টাকার বিবরণ দিতে গিয়া অকস্মাৎ এই মেয়েটির সম্মুখে তাঁহার এতকালের নিরুদ্ধ উৎস-মুখ খুলিয়া গেল। হঠাৎ কি করিয়া স্বামীর সাক্ষাৎ মিলিল, প্রায়ান্ধকার গৃহকোণে কেবলমাত্র ছায়া দেখিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি চিনিয়া ফেলিলেন, তখন কি করিয়া নিজেকে সে সংবরণ করিল, তখন কি তিনি বলিলেন, কি তিনি করিলেন এইসকল অনর্গল বকিতে বকিতে কিছুক্ষণের জন্য সবিতা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিলেন।

সারদার বিস্ময়ের সীমা নাই—নতুন-মার এতখানি আত্ম-বিস্মরণ তাহার কল্পনার অগোচর।

নীচে হইতে ডাক আসিল—মাইজী!

দরোয়ান উপরে আসিয়া জানাইল তাঁহার আদেশ মত শোফার গাড়ি আনিয়াছে।

আধঘণ্টা পরে প্রস্তুত হইয়া নীচে নামিয়া দেখিলেন দ্বারের কাছে সারদা দাঁড়াইয়া, সে বলিল, মা, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। সেখানে রাখাল-রাজবাবু আছেন, তিনি কখনো রাগ করবেন না।

কেহ সঙ্গে যায়, এ ইচ্ছা সবিতার ছিল না, বলিলেন, রাগ হয়তো কেউ করবে না, কিন্তু সেখানে গিয়ে তোমার কি হবে সারদা?

সারদা কহিল, আমি সব জানি মা। রেণু অসুস্থ, আমি তাকে একবার দেখে আসবো। তার চেয়েও বেশী সাধ হয়েছে আমার রেণুর বাপকে দেখার—প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধূলো নেবো। এই বলিয়া সে সম্মতির অপেক্ষা না করিয়াই গাড়িতে উঠিয়া বসিল।

পথে চলিতে সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, রেণুর বাপ কি-রকম দেখতে মা?

সবিতা কৌতুক করিয়া বলিলেন, তোমার কি-রকম মনে হয় সারদা? জমকালো ধরনের মস্ত মানুষ—না?

সারদা বলিল, না মা, তা মনে হয় না। কিন্তু তখন থেকেই ত ভাবচি, কোন চেহারাই যেন পছন্দ হচ্ছে না।

কেন হচ্চে না সারদা?

হচ্চে না বোধ হয় এইজন্যে মা, তিনি ত কেবল রেণুর বাপ নয়, তিনি আপনারও স্বামী যে। মনে মনে কিছুতেই যেন দুজনকে একসঙ্গে মেলাতে পারচি নে।

সবিতা হাসিয়া বলিলেন, ধরো যদি এমন হয়—একজন বৃদ্ধ বৈষ্ণব—আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়—মাথায় শিখা, চুলগুলি প্রায় পেকে এসেছে, গৌর বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, পূজায়, উপবাসে, আচারে, নিয়মে শীর্ণ এমন মানুষকে তোমার পছন্দ হয় সারদা?

না মা, হয় না। আপনার হয়?

না হয়ে উপায় কি সারদা? স্বামী পছন্দ-অপছন্দর জিনিস নয়, তাঁকে নির্বিচারে মেনে নিতে হয়। তুমি বলবে এ হোলো শাস্ত্রের বিধি, মানুষের মনের বিধি নয়। কিন্তু এ তর্ক কারা করে জানো মা, তারাই করে যারা সত্যি ক'রে আজও মানুষের মনের খবর পায়নি, যাদের দুর্গতির আগুন জ্বেলে জীবনের পথ হাতড়ে বেড়াতে হয়নি। সংসার-যাত্রায় স্বামীর রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা মেয়েদের তুচ্ছ কথা মা, দুদিনেই হিসেবের বাইরে পড়ে যায়।

সারদা অশিক্ষিত হইলেও এমনটাকে ঠিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিল না, বুঝিল, এ তাঁর পরিতাপের গ্লানি, প্রতিক্রিয়ার অতল আলোড়িত হৃদয়ের ঐকান্তিক মার্জনা-ভিক্ষা। ইচ্ছা হইল না প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার বেদনা বাড়ায়, কিন্তু চুপ করিয়াও থাকিতে পারিল না, বলিল, একটা কথা ভারী জানতে ইচ্ছে করে মা, কিন্তু—

সবিতা কহিলেন, কিন্তু কি মা? প্রশ্ন করে লজ্জা দিতে আর আমাকে চাও না—এই ত? আর লজ্জা বাড়বে না সারদা, তুমি স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞেসা কর।

তথাপি সারদার কুণ্ঠা ঘুচে না। সে চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি নিজেই বলিলেন, হয়তো জানতে চাও এই যদি সত্যি তবে আমারই বা এতবড় দুর্গতি ঘটলো কেন? এর উত্তর অনেকদিন অনেকরকমে ভেবে দেখেছি, কিন্তু আমার গত-জীবনের কর্মফল ছাড়া এ প্রশ্নের আজও জবাব পাইনি মা।

যদিচ সারদা নিজেও কর্মফল মানে, তথাপি নতুন-মার এ উত্তরে তাহার মন সায় দিতে পারিল না, সে চুপ করিয়াই রহিল। সবিতা তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া ইহা বুঝিলেন, বলিলেন, আর এক-জন্মের অজানা কর্মফলের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে এ-জন্মের ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক খুঁজে বেড়াচ্চি এতবড় অবুঝ আমি নই মা, কিন্তু এ গোলকধাঁধার বাইরের পথই বা কে বার করেচে বলো ত? যে লোকটাকে কাল আমি বিদায় দিলুম, আমার স্বামীর চেয়ে তাকে কখনো বড় মনে করিনি, কখনো শ্রদ্ধা করিনি, কোনদিন ভালোবাসিনি, তবু তারই ঘরে আমার একটা যুগ কেটে গেল কি করে?

এবার সারদা কথা কহিল, সলজ্জে বলিল, আজ না হোক, কিন্তু সেদিনও কি রমণীবাবুকে আপনি ভালোবাসেন নি মা?

না মা, সেদিনও না—কোনদিনই না।

তবু পদস্খলন হলো কেন?

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ম্লান হাসিয়া বলিলেন, পদস্খলনের কি কেন থাকে সারদা? ও ঘটে আচম্‌কা। সম্পূর্ণ অকারণ নিরর্থকতায়। এই বারো-তেরো বছরে কত মেয়েকেই তো দেখলুম, আজ হয়তো সর্বনাশের পাঁকের তলায় কোথায় তারা তলিয়ে গেছে, সেদিন কিন্তু আমার একটা কথারও তারা জবাব দিতে পারেনি, আমার পানে ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে চেয়ে দু'চোখ জলে ভেসে গেছে—ভেবেই পাইনি আপন অদৃষ্ট ছাড়া আর কাকে তারা অভশাপ দেবে। দেখে তিরস্কার করবো কি, নিজেরই মাথা চাপড়ে কেঁদে বলেচি, নিষ্ঠুর দেবতা! তোমার রহস্যময় সংসারে বিনা-দোষে দুঃখের পালা গাইবার ভার দিলে কি শেষে এই সব হতভাগীদের 'পরে! কেন হয় জানিনে সারদা, কিন্তু এমনিই হয়।

সারদা এবারেও সায় দিল না, মাথা নাড়িয়া বাঁধা-রাস্তার পাকা-সিদ্ধান্তের অনুসরণে বলিল, তাদের দোষ ছিল না এমন কথা আপনি কি করে বলচেন মা?

সবিতা উত্তর দিলেন না, আর তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন না, শুধু নিঃশ্বাস ফেলিয়া জানালার বাইরে শূন্য-চোখে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গাড়ি আসিয়া যথাস্থানে থামিল, মহাদেব দরজা খুলিয়া দিতে উভয়ে নামিয়া পড়িলেন, গাড়ি কালকের মত অপেক্ষা করিতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

সতেরো নম্বর বাড়ির সদর দরজা খোলা ছিল, উভয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন নীচে কেহ নাই, সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেই চোখে পড়িল একটি ষোল-সতেরো বছরের মেয়ে বারান্দায়

বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিল, আসুন। রেলিঙের উপরে আসন ছিল, পাতিয়া দিল এবং সবিতার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

সেই মেয়ে আজ এতবড় হইয়াছে। আসনে বসিয়া সবিতা কিছুতেই নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত অশ্রু-বাষ্পে সমস্ত দেহ বারংবার কাঁপিয়া উঠিল এবং পরক্ষণেই দুই চক্ষু প্লাবিত করিয়া অনর্গল জল পড়িতে লাগিল। সবিতা বুঝিলেন ইহা লজ্জাকর, হয়তো এ-অশ্রুর কোন মর্যাদা এই মেয়েটির কাছে নাই, কিন্তু সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেছে, কিছুতেই কিছু হইল না, শুধু জোর করিয়া দুই চোখের উপর আঁচল চাপিয়া মুখ লুকাইয়া বসিয়া রহিলেন।

দশ

সবিতা যতই চাহিলেন কান্না চাপিতে ততই গেল সে শাসনের বাহিরে। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আপ্রান্ত আলোড়িত সাগরজল কিছুতেই যেন শেষ হইতে চাহে না। মেয়েটি কিন্তু সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল না, দুর্বল ক্লান্ত হাতে যেমন ধীরে ধীরে তরকারি কুটিতেছিল তেমনি নীরবে কাজ করিতে লাগিল। অবশেষে ক্রন্দনের উদ্দামতা যদিচ শান্ত হইয়া আসিল, কিন্তু মুখের আবরণ সবিতা কিছুতেই ঘুচাইতে পারেন না, সে যেন আঁটিয়া চাপিয়া রহিল। কিন্তু এমন করিয়া কতক্ষণ চলে, সকলের অস্বস্তিই ভিতরে ভিতরে দুঃসহ হইয়া উঠিতে থাকে তাই বোধ হয় সারদাই প্রথমে কথা কহিয়া উঠিল—বোধ হয় যা' মনে আসিল তাই—বলিল, আজ তুমি কেমন আছো দিদি?

ভাল আছি।

জ্বর আর হয়নি?

না, আমি তো টের পাইনি।

ডাক্তার এখনো আসেন নি?

না তিনি হয়ত ও-বেলা আসবেন।

সারদা একটু ভাবিয়া কহিল, কৈ, রাখালবাবুকে ত দেখচি নে? তিনি কি বাড়ি নেই?

না, তিনি পড়াতে গেছেন।

তোমার বাবা?

তিনি সকালে বেরিয়েচেন, বলে গেছেন ফিরতে দেরি হবে।

সারদার কথা শেষ হইয়া আসিল, এবার সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। শেষে অনেক সঙ্কোচের পরে জিজ্ঞাসা করিল, ইনি কে, তুমি চিনতে পেরেছো রেণু?

চিনবো কি করে, আমার তো মুখ মনে নেই।

বুঝতেও পারোনি?

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, তা পেরেচি। রাজুদা বলে গেছেন। কিন্তু আপনি কে বুঝতে পারচি নে।

সারদা নিজের পরিচয় দিয়া কহিল, নাম আমার সারদা, তোমার মার কাছে থাকি। রাখালবাবু আমাকে জানেন—আমার কথা কি তিনি তোমার কাছে কখ্খনও বলেন নি?

না। এ-সব কথা আমাকে তিনি বলবেন কেন, বলা ত উচিত নয়।

এইবার সারদার মুখ একেবারে বন্ধ হইল। তাহার বুদ্ধি-বিবেচনায় যতটা সম্ভব সে কথা চালাইয়াছে, আর অগ্রসর হইবার মতো সে খুঁজিয়া পাইল না। মিনিট-খানেক নীরবে কাটিলে রেণু উঠিয়া গেল, কিন্তু একটু পরেই একটি ঘটি হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, মা, পা ধোয়ার জল এনেচি—উঠুন।

এই আহ্বানে সবিতা পাগলের মতো অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া মেয়েকে বুকে টানিয়া লইলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই স্খলিত হইয়া তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। মিনিট-কয়েক পরে জ্ঞান ফিরিলে দেখিলেন তাঁহার মাথা সারদার ক্রোড়ে এবং সুমুখে বসিয়া মেয়ে পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে।

রেণু বলিল, মা, আহ্নিকের জায়গা করে রেখেচি, একবার উঠতে হবে যে।

শুনিয়া তাঁহার দুই চোখের কোণ দিয়া শুধু জল গড়াইয়া পড়িল।

রেণু পুনশ্চ কহিল, সারদাদিদি বলছিলেন আপনি চার-পাঁচদিন কিছু খাননি। একটু মিছরি ভিজিয়ে দিয়েচি মা, এইবার উঠে খেতে হবে। কিন্তু চুলগুলি সব ধুলোয়-জলে লুটোপটি করে একাকার হয়েছে, সে কিন্তু আমার দোষ নয় মা, সারদাদিদির। হ্যাঁ মা, আপনার চুলগুলি যেন কালো রেশম, কিন্তু, আমার এ যেরকম শক্ত হোলো কেন মা? ছেলে বেলায় খুব কসে বুঝি মুড়িয়ে দিয়েছিলেন? পাড়াগাঁয়ের ঐ বড়ো দোষ।

সবিতা হাত বাড়াইয়া মেয়ের মাথায় হাত দিলেন, কয়দিনের জ্বরে তাহার এলোমেলো চুলগুলি রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করিলেন, অনেকবার কথা বলিতে গিয়া গলায় বাধিল, শেষে মাথাটি বুকের উপর টানিয়া লইয়া তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, যে-কথা কণ্ঠে বাধিয়াছিল তাহা কণ্ঠেই চাপা রহিল। কথা বাহির না হউক, কিন্তু এই অনুচ্চারিত ভাষা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না ; মেয়ে বুঝিল, সারদা বুঝিল, আর বুঝিলেন তিনি সংসারে কিছুই যাঁহার অজানা নয়।

এইভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া সবিতা উঠিয়া বসিলেন। মেয়ে তাঁহাকে নীচে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া পুনরায় স্নান করাইয়া আনিল, জোর করিয়া আহ্নিকে বসাইয়া দিল এবং তাহা সমাপ্ত হইলে তেমনি জোর করিয়াই তাঁহাকে মিছরির সরবৎ পান করাইল।

রেণু কহিল, মা, এইবার যাই রাঁধি গে? আপনাকে কিন্তু খেতে হবে।

যদি না খাই?

রেণু মৃদু হাসিয়া বলিল, তা হলে আপনার পায়ে মাথা খুঁড়বো, না খেয়ে আপনি নিস্তার পাবেন না।

নিস্তার পেতে চাইনে মা, কিন্তু তুমি নিজে যে বড় দুর্বল, এখনো যে পথ্যিই করোনি।

রেণু বলিল, সকালে একটু মিছরি খেয়ে জল খেয়েচি, আজ আর কিছু খাবো না। একটু দুর্বল সত্যি, কিন্তু না রাঁধলেই বা চলবে কেন মা? রাজুদার আসতে দেরি হবে, বাবাও ফিরবেন অনেক বেলায়, না রাঁধলে এতগুলি লোকে খেতে পাবে না যে। তা ছাড়া আমাকে ঠাকুরের ভোগ রাঁধতেও হবে। এই বলিয়া সে রেলিঙের উপর হইতে গামছাখানা কাঁধে ফেলিতেই সবিতা চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি নাইতে যাচ্চো রেণু?

রেণু হাসিয়া বলিল, মা, ভুলে গেছেন। আপনি কি কখনো না নেয়ে ভোগ রেঁধেছিলেন নাকি?

সবিতার মুখে এ কথার উত্তর আসিল না। সারদা বলিল, কিন্তু আবার জ্বর হতে পারে ত রেণু!

রেণু মাথা নাড়িয়া বলিল, না, বোধ হয় হবে না—আমি ভালো হয়ে গেছি। আর হলেই বা কি করবো সারদাদিদি, যতক্ষণ ভালো আছি করতে হবে ত? আমাদের করবার ত আর কেউ নেই।

উত্তর শুনিয়া উভয়েই নীরব হইয়া রহিলেন।

রান্না সামান্যই, কিন্তু সেটুকু সারিতেও যে রেণুর কতখানি ক্লেশ বোধ হইতেছিল তাহা অতিশয় স্পষ্ট। জ্বরে অবসন্ন, সাত-আটদিনের উপবাসে একান্ত দুর্বল। মেয়েটা মরিয়া মরিয়া চোখের সম্মুখে কাজ করিতে লাগিল, মা চুপ করিয়া বসিয়া দেখিলেন, কিন্তু কিছুই করিবার নাই। এ-জীবনে পারিবারিক বন্ধন যে এমন করিয়া ছিঁড়িয়াছে, ব্যবধান যে এত বৃহৎ, এমন প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করার অবকাশ বোধ করি সবিতার আর কিছুতে মিলিত না যেমন আজ মিলিল।

রান্না শেষ হইল, সারদাকে উদ্দেশ করিয়া রেণু কহিল, বাবার ফিরতে, পুজো আহ্নিক শেষ হতে আজ বেলা পড়ে যাবে, আপনি কেন মিথ্যে কষ্ট পাবেন সারদাদিদি, খেয়ে নিন। বাবা বলেন, এমনতরো অবস্থায় সংসারে একজন উপবাস করে থাকলেই আর দোষ হয় না। সত্যিই নয় মা? এই বলিয়া সে মায়ের দিকে চাহিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সবিতা জানেন তাঁহাদের বৃহৎ পরিবারে বাধ্য হইয়াই একদিন এ-নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল।

ঠাকুরের পূজারী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত থাকিলেও ব্রজবাবু সহজে এ-কাজ কাহারও প্রতি ছাড়িয়া দিতে চাহিতেন না ; অথচ চিরদিন ঢিলা স্বভাবের লোক বলিয়া পূজায় তাঁহার প্রায়ই অযথা বিলম্ব ঘটিয়া যাইত। কিন্তু মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে কি যে তাঁহার বলা উচিত তাহা ভাবিয়া পাইলেন না।

জবাব না পাইয়া রেণু বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার নতুন-মার বেলা সইতো না, খেতে একটু দেরি হলেও তিনি ভয়ানক রেগে যেতেন। বাবা তাই আমাকে একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন যে, দেশের বাড়িতে কতদিন যে আপনার এ-বেলা খাওয়া হতো না, উপোস করে কাটাতে হতো তার সংখ্যা নাই, কিন্তু কোনদিন রাগ করে বলেন নি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে।

সারদা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কি ঠাকুর বিলিয়ে দিতে বলেন নাকি?

হাঁ, কতদিন। বলেন গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে।

তোমার বাবা কি বলেন?

সারদার প্রশ্নের উত্তর সে মাকেই দিল, বলিল, আমার বয়স তখন ন'বচ্ছর। বাবা ডেকে পাঠালেন, তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়চে। আমাকে কাছে বসিয়ে আদর করে বললেন, আমার গোবিন্দর সব ভার ছিল একদিন তোমার মায়ের উপর। আজ থেকে তুমিই তাঁর কাজ করবে—পারবে ত মা? বললুম, পারবো বাবা। তখন থেকে আমিই ঠাকুরের কাজ করি। পূজো না হওয়া পর্যন্ত আমিই বাড়িতে না খেয়ে থাকি ; কিন্তু আজ থাকতুম না মা। জ্বরের ভয় না থাকলে আপনাকে বসিয়ে রেখে আমরা সবাই মিলে আজ খেয়ে নিতুম। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল, ভাবিয়াও দেখিল না ইহা কতদূর অসম্ভব এবং কি মর্মান্তিক আঘাতই তাহার মাকে করিল।

সবিতা আর একদিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিলেন, একটা কথারও উত্তর দিলেন না। মেয়ে যাহাই বলুক, মা জানেন এ গৃহের আর তিনি কেহ নহেন, পারিবারিক নিয়মপালনে আজ তাঁহার খাওয়া-না-খাওয়া সম্পূর্ণ অর্থহীন।

রেণু সারদাকে ঠাকুর দেখাইতে লইয়া গেল। সবিতা সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। মেয়েটা কতটুকু বা বলিয়াছে! তাহার বিমাতার উত্ত্যক্ত-চিত্তের সামান্য একটুখানি বিবরণ, ঠাকুর-দেবতায় হতশ্রদ্ধার তুচ্ছ একটা উদাহরণ। এই ত! এমন কত ঘরেই ত আছে। অভাবিতও নয়, হয়তো বিশেষ দোষেরও নয়, তথাপি এই সামান্য বস্তুটাই তাঁহার কল্পনায় বারো বছরের অজানা ইতিহাস চক্ষের পলকে দাগিয়া দিয়া গেল। এই স্ত্রীলোকটিই হয়তো তাহার স্বামীকে একটা মুহূর্তের জন্যও বুঝে নাই, তাহার কতদিনের কত মুখ ভার, কত চাপা-কলহ, কত ছোট ছোট সংঘর্ষের কাঁটায় অনুবিদ্ধ শান্তিহীন দিন, কত বেদনা-বিক্ষত দুঃখময় স্মৃতি—এমনি করিয়াই এই স্নেহ-শ্রদ্ধা-হীনা, কোপনস্বভাবা নারীর একান্ত সান্নিধ্য ও শাসনে এই দুটি প্রাণীর—তাহার স্বামী ও কন্যার—দিনের পর দিন কাটিয়া আজ দুর্দশার শেষ সীমায় আসিয়া ঠেকিয়াছে।

অথচ কিসের জন্য? এই প্রশ্নটাই এখন সবচেয়ে বড় করিয়া বিঁধিল সবিতাকে। যে-ভার ছিল স্বভাবতঃ তাহারি আপনার, সে-বোঝা যদি অপরে বহিতে না পারে, সে দোষ কি তাহাকে দিবার? তাহার নিজের ছাড়া অপরাধ কার? অধর্মের মার যে এমন নির্দয়, একাকী এত দুঃখও যে সংসারে সৃষ্টি করা যায়, তাহার মূর্তি যে এত কদাকার, ইতিপূর্বে এমন করিয়া আর সে উপলব্ধি করে নাই। গ্লানি ও ব্যথার গুরুভারে তাহার নিশ্বাস পর্যন্ত যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল, তথাপি, প্রাণপণ বলে কেবলি মনে মনে বলিতে লাগিল, ইহার প্রতিকার কি নাই? সংসারে চিরস্থায়ী ত কিছুই নয়, শুধু কি তাহার দুষ্কৃতিই জগতে অবিনশ্বর? কল্যাণের সকল পথ চিররুদ্ধ করিয়া কি শুধু সেই বিদ্যমান রহিবে, কোনদিনই তাহার ক্ষয় হইবে না?

মা, বাবা এসেছেন।

সবিতা মুখ তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া ব্রজবাবু। মুহূর্তের জন্য সে সমস্ত বাধা-ব্যবধান

ভুলিয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, এত দেরি করলে যে? বাইরে বেরুলে কি তুমি ঘর-সংসারের কথা চিরকালই ভুলে যাবে? দেখো ত বেলার দিকে চেয়ে?

ব্রজবাবু মহা অপ্রতিভভাবে বিলম্বের কৈফিয়ত দিতে লাগিলেন ; সবিতা বলিলেন, কিন্তু আর বেলা করতে পাবে না। ঠাকুর-পূজোটি আজ কিন্তু তোমাকে সংক্ষেপে সারতে হবে তা বলে দিচ্চি!

তাই হবে নতুন-বৌ, তাই হবে। রেণু, দে ত মা আমার গামছাটা, জামাটা ছেড়ে চট্ করে নেয়ে আসি।

না বাবা, তুমি একটু জিরোও। দেরি যা হবার হয়েছে, আমি তামাক সেজে দিই।

মা ও পিতা উভয়েই কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন ; ব্রজবাবু কহিলেন, মেয়ে নইলে বাপের উপর এত দরদ আর কারও হয় না নতুন-বৌ। ওর কাছে তুমি ঠকলে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

সবিতা কহিলেন, ঠকতে আপত্তি নেই মেজকর্তা, কিন্তু এ-ই একমাত্র সত্যি নয়। সংসারে আর একজন আছে তার কাছে মেয়েও লাগে না, মা-ও না। এই বলিয়া তিনিও হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া ব্রজবাবু হঠাৎ যেন চমকিয়া গেলেন। কিন্তু আর কোন কথা না বলিয়া জামা-কাপড় ছাড়িতে ঘরে চলিয়া গেলেন।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া চুকিল প্রায় দিনান্ত-বেলায়। ব্রজবাবু বিছানায় বসিয়া তামাক টানিতেছিলেন, সবিতা ঘরে ঢুকিয়া মেঝের উপর একধারে দেয়াল ঠেস দিয়া বসিলেন।

ব্রজবাবু বলিলেন, খেলে?

হাঁ।

মেয়ে অযত্ন অবহেলা করেনি ত?

না।

ব্রজবাবু ক্ষণেক স্থির থাকিয়া বলিলেন, গরীবের ঘর, কিছুই নেই। হয়তো তোমার কষ্ট হলো নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল, সে হবে না মেজকর্তা, তুমি আমাকে কটূ কথা বলতে পাবে না। এইটুকুই আমার শেষ সম্বল। মরণকালে যদি জ্ঞান থাকে ত শুধু এই কথাই তখন ভাববো আমার মতো স্বামী সংসারে কেউ কখনো পায়নি।

ব্রজবাবুর মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, বলিলেন, তোমার নিজের খাবার কষ্টের কথা বলিনি নতুন-বৌ। বলছিলুম আজ এ-ও তোমাকে চোখে দেখতে হলো। কেনই বা এলে!

সবিতা কহিলেন, দেখা দরকার মেজকর্তা, নইলে শাস্তি অসম্পূর্ণ থাকতো। তোমার গোবিন্দর একদিন সেবা করেছিলুম, বোধ হয় তিনিই টেনে এনেছেন। একেবারে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। বলিতে বলিতে দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, একমনে যদি তাঁকে চাই, মনের কোথাও যদি ছলনা না রাখি, তিনি কি আমাকে মার্জনা করেন না মেজকর্তা?

ব্রজবাবু কষ্টে অশ্রুসংবরণ করিয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই করেন।

কিন্তু কি করে জানতে পারবো?

তা জানিনে নতুন-বৌ, সে দৃষ্টি বোধ করি তিনিই দেন।

সবিতা বহুক্ষণ অধোমুখে বসিয়া থাকিয়া মুখ তুলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?

ব্রজবাবু বলিলেন, নন্দ সাহার কাছে কিছু টাকা পেতুম—

দিলেন?

কি জানো—

সে শুনতে চাইনে, দিলে কিনা বলো?

ব্রজবাবু না দিবার কারণটা ব্যক্ত করিতে কতই যেন কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আনন্দপুরের সাহাদের ত জানোই, তারা অতি সজ্জন ধর্মভীরু লোক, কিন্তু দিনকাল এমন পড়েচে যে, মানুষে ইচ্ছে করলেও পেরে ওঠে না। তাছাড়া নন্দ সা এখন অন্ধ, কারবার গিয়ে পড়েচে ভাইপোদের হাতে—কিন্তু দেবে একদিন নিশ্চয়ই।

সে আমি জানি। কেননা ফাঁকি দিতে তাদের আমি দেবো না। নন্দ সাকে আমি ভুলিনি।

কি করবে,—নালিশ?

হাঁ, আর কোন উপায় যদি না পাই।

ব্রজবাবু হাসিয়া বলিলেন, মেজাজটি দেখছি এক তিলও বদলায় নি।

কেন বদলাবে? মেজাজ তোমারই বদলেছে নাকি? দুঃসময় কার বেশী তোমার চেয়ে? কিন্তু কাকে ফাঁকি দিতে পারলে? আমার মতো কৃতঘ্নের ঋণও শেষ কপর্দকও দিয়ে শোধ করে দিলে। তাদেরও তাই করতে হবে, শেষ কড়িটা পর্যন্ত আদায় দিয়ে, তবে তারা অব্যাহতি পাবে।

তাদের ওপর তোমার এত রাগ কিসের?

রাগ তো নয়, আমার জ্বালা। তোমাকে ভাই ঠকালে, বন্ধু ঠকালে, আত্মীয়-স্বজন—কর্মচারী,—স্ত্রী পর্যন্ত তোমাকে ঠকাতে ছাড়লে না। এবার আমার সঙ্গে তাদের বোঝা পড়া। তোমার নতুন কুটুম্বরা আমাকে চেনে না, কিন্তু তারা চেনে।

ব্রজবাবুর বহুদিন পূর্বের কথা মনে পড়িল, তখনও একবার ডুবিতে বসিয়াছিলেন। তখন এই রমণীই হাত ধরিয়া তাঁহাকে ডাঙ্গায় তুলিয়াছিল। বলিলেন, হাঁ, তারা বেশ চেনে। নতুন-বৌ মরেছে জেনে যাঁরা স্বস্তিতে আছে তারা একটু ভয় পাবে। ভাববে ভূতের উপদ্রব ঘটলো। হয়তো গয়ায় পিণ্ডি দিতে ছুটবে।

সবিতা কহিল, তারা যা ইচ্ছে করুক ভয় করিনে। শুধু তুমি পিণ্ডি দিতে না ছুটলেই হলো—ঐখানেই আমার ভাবনা। নিজে করবে না ত সে কাজ?

ব্রজবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

উত্তর দিলে না যে?

ব্রজবাবু আরও কিছুক্ষণ তাঁহার মুখের প্রতি নীরবে চাহিয়া রহিলেন। অপরাহ্ণ-সূর্যের কতকটা আলো জানালা দিয়া মেঝের উপর রাঙ্গা হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহার প্রতি সবিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, এর মতোই আমার বেলা পড়ে এলো নতুন-বৌ, পাওনা বুঝে নেবার আর সময় নেই। কিন্তু তুমি ছাড়া সংসারে বোধ হয় আর কেউ নেই যে বোঝে আমি কত ক্লান্ত। ছুটির দরখাস্ত পেশ করে বসে আছি, মঞ্জুরি এলো বলে। যা নিয়েচি, যা দিয়েছি, তার হিসেব-নিকেশ হয়ে গেছে। হিসেব ভালো হয়নি জানি, গোঁজামিল অনেক রয়ে গেছে, কিন্তু তবু তার জের টানতে আর আমি পারবো না। তোমার এ অনুরোধ ফিরিয়ে নাও।

সবিতা একদৃষ্টে চাহিয়া শুনিতেছিলেন স্বামীর কথাগুলি, শেষ হইলে শুধু জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি আর পারবে না মেজকর্তা? সত্যিই কি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েচো?

সত্যিই বড় ক্লান্ত নতুন-বৌ, সত্যিই আর পারবো না। কত যে ক্লান্ত সে তুমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না ; তারা বলবে আলস্য, বলবে জড়তা, ভাববে আমার নিরাশার হাহুতাশ। তারা তর্ক করবে, যুক্তি দেবে, মেরে মেরে এখনো ছোটাতে চাইবে—তারা এই কথাটাই কেবল জেনে রেখেছে যে, কলে দম দিলেই চলে। কিন্তু তারও যে শেষ আছে এ তারা বিশ্বাস করতে পারে না।

আমি বিশ্বাস করলে তুমি খুশী হবে?

খুশী হবো কিনা জানিনে, কিন্তু শান্তি পাবো।

কি এখন করবে?

রেণুকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাবো। সেখানে সব গিয়েও যা বাকী থাকবে তাতে কোনমতে আমাদের দিনপাত হবে। আর যারা আমাদের ত্যাগ করে কলকাতায় রইলো তাদের ভাবনা নেই,

সে তো তুমি আগেই শুনেচো।

রেণুর ভার কাকে দিয়ে যাবে মেজকর্তা?

দিয়ে যাবো ভগবানকে। তাঁর চেয়ে বড় আশ্রয় আর নেই, সে আমি জেনেচি।

সবিতা স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল। ভগবানে তাঁহার অবিশ্বাস নাই, কিন্তু নিজের মেয়ের সম্বন্ধে অতবড় নির্ভরতায় নিশ্চিন্ত হইতেও পারে না। শঙ্কায় বুকের ভিতরটায় তোলপাড় করিয়া উঠিল, কিন্তু ইহার উত্তর যে কি তাহাও ভাবিয়া পাইল না। শুধু যে কথাটা তাহার মনের মধ্যে অহরহ কাঁটার মতো বিঁধিতেছিল তাহাই মুখে আসিয়া পড়িল, বলিল, মেজকর্তা, আমাকে টাকাটা ফিরিয়ে দিলে কি আমার অপরাধের দণ্ড দিতে? প্রতিশোধের আর কি কোন পথ খুঁজে পেলে না?

ব্রজবাবু বলিলেন, না হয় তুমিই নিজে পথ বলে দাও! আমাদের রতন খুড়ো ও রতন খুড়ীর কথা তোমার মনে আছে? সে অবস্থায় রাজী আছ? এত দুঃখেও সবিতা হাসিয়া ফেলিল, সলজ্জে কহিল, ছি ছি, কি কথা তুমি বলো!

ব্রজবাবু কহিলেন, তবে কি করতে বলো? নতুন-বৌ গয়না চুরি করে পালিয়েছে বলে পুলিশে ধরিয়ে দেবো?

প্রস্তাবটা এত হাস্যকর যে বলামাত্রই দুজনে হাসিয়া ফেলিলেন। সবিতা বলিল, তোমার যত সব উদ্ভট কল্পনা।

বহুদিন পরে উভয়ের রহস্যোজ্জ্বল একটুমাত্র হাসির কিরণে ঘরের গুমট অন্ধকার যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল। ব্রজবাবু বলিলেন, শাস্তির বিধান সকলের এক নয় নতুন-বৌ। দণ্ড দিতেই যদি হয় তোমাকে আর কি দণ্ড দিতে পারি? যেদিন রাত্রে তোমার নিজের সংসার পায়ে ঠেলে চলে গেলে, সেদিনই আমি স্থির করেছিলাম, আবার যদি কখনো দেখা হয়, তোমার যা-কিছু পড়ে রইলো ফিরিয়ে দিয়ে আমি অঋণী হবো।

সবিতার বিদ্যুদ্বেগে মনে পড়িল স্বামীর একটা কথা যাহা তিনি তখন প্রায়ই বলিতেন। বলিতেন, ঋণ রেখে মরতে নেই নতুন-বৌ, সে পরজন্মে এসেও দাবী করে। এই তাঁর ভয়। কোন সূত্রেই আর যেন না উভয়েই দেখা হয়,—সকল সম্বন্ধ যেন এইখানেই চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কহিল, আমি বুঝেচি মেজকর্তা। ইহ-পরকালে আর যেন না তোমার ওপর আমার কোন দাবী থাকে। সমস্তই যেন নিঃশেষ হয়—এই ত?

ব্রজবাবু মৌন হইয়া রহিলেন এবং যে আঁধার এইমাত্র ঈষৎ অপসৃত হইয়াছিল, সে আবার এই মৌনতার মধ্যে দিয়া সহস্রগুণ হইয়া ফিরিয়া আসিল। স্বামীর মুখের প্রতি আর সে চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমরা কবে বাড়ি যাবে মেজকর্তা?

যত শীঘ্র পারি।

এখন যাই তবে?

এসো।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইল, বুঝিল সব শেষ হইয়াছে। সেই ভূমিকম্পের রাতে রসাতলের গর্ভ চিরিয়া যে পাষাণ-স্তূপ উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া উভয়ের মাঝখানে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছিল, আজও সে তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহার তিলার্ধও নষ্ট হয় নাই। এই নিরীহ শান্ত মানুষটি যে এত কঠিন হইতে পারে, আজিকার পূর্বে এ কথা সে কবে ভাবিয়াছিল!

ঘরের বাহিরে পা বাড়াইয়া সে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল, বলিল, মুক্তি পাবে না মেজকর্তা। তুমি বৈষ্ণব, কত মানুষের কত অপরাধই তুমি জীবনে ক্ষমা করেছো, কিন্তু আমাকে পারলে না। এ ঋণ তোমার রইলো। একদিন হয়তো তা জানতে পাবে।

ব্রজবাবু তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন। সন্ধ্যা হয়। যাইবার সময় রেণু তাঁহাকে প্রণাম করিল, কিন্তু কিছু বলিল না। এই নীরবতার মন্ত্র সে-ও হয়তো তাহার পিতার কাছেই শিখিয়াছে।

সারদাকে সঙ্গে লইয়া সবিতা বাহিরে আসিলেন। গাড়িতে উঠিয়াই চোখে পড়িল রাখাল তারককে লইয়া দ্রুতপদে এইদিকেই আসিতেছে। তারক বলিল, নতুন-মা, একবার নেমে দাঁড়াতে

হবে যে, আমি প্রণাম করবো।

কথা কহা কঠিন, সবিতা ইঙ্গিতে উভয়কে গাড়িতে উঠিতে বলিয়া কোনমতে শুধু বলিলেন, এসো বাবা, আমার সঙ্গে তোমরা বাড়ি চলো।

এগার

এক সপ্তাহ পূর্বে রাখাল আসিয়া বলিয়াছিল, নতুন-মা, সতেরো নম্বর বাড়িতে আপনি ত যাবেন না—আজ সন্ধ্যাবেলায় যদি আমার বাসায় একবার পায়ের ধূলো দেন।

কেন রাজু?

কাকাবাবুর জন্যে কিছু ফল-মূল কিনে এনেচি—ইচ্ছে তাঁকে একটু জল খাওয়াই—তিনি রাজী হয়েছেন আসতে।

কিন্তু আমাকে কি তিনি ডেকেছেন?

তিনি না ডাকুন আমি ত ডাকচি মা। কাল তাঁরা চলে যাবেন দেশে, বলেছেন গুছিয়ে-গাছিয়ে তাঁদের ট্রেনে তুলে দিতে।

সবিতা জানিতেন, ব্রজবাবু কোথাও কিছু খান না, তাঁহাকে সম্মত করাইতে রাখালকে অনেক চেষ্টা করিতে হইয়াছে,—বোধ হয় ভাবিয়াছে এ-কৌশলেও যদি আবার দুজনের দেখা হয়। রাখালের আবেদনের উত্তরে সবিতাকে সেদিন অনেক চিন্তা করিতে হইয়াছিল, স্নেহার্দ্র-চক্ষে তাহার প্রতি বহুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিয়াছিলেন, না বাবা আমি যাবো না। আমাকে দেখে তিনি শুধু দুঃখই পান, আর দুঃখ দিতে আমি চাইনে।

আবার এক সপ্তাহ গত হইয়াছে। রাখালের মুখে খবর মিলিয়াছে, ব্রজবাবু মেয়ে লইয়া দেশে চলিয়া গেছেন। তাঁহার এ পক্ষের স্ত্রী-কন্যা রহিল কলিকাতায় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে। রাখাল বলিয়াছে তাঁহাদের কোন শোক নাই, কারণ অর্থ-কষ্ট নাই। বাড়ি-ভাড়ার আয়ে দিন ভালোই কাটিবে। অলঙ্কারের পুঁজি ত রহিলই।

সন্ধ্যার পরে একাকী বসিয়া সবিতা এই কথাগুলাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, বারো বৎসরব্যাপী প্রতিদিনের সম্বন্ধ, অথচ কত শীঘ্র কত সহজেই না ঘুচিয়া যায়। তাহার নিজের কপাল যেদিন ভাঙ্গে সেদিন সকালেও সে জানিত না, রাত্রিটাও কাটিবে না, সমস্ত ছাড়িয়া তাহাকে পথে বাহির হইতে হইবে। একান্ত দুঃস্বপ্নেও সে কি কল্পনা করিতে পারিত এতবড় ক্ষতি কাহারও সহে? তবু সহিল ত! আবার সহিল তাহারই। বারো বছর কাটিয়া গেল আজও সে তেমনি বাঁচিয়া আছে—তেমনিই দিনের পর দিন অবাধে বহিয়া গেল, কোথাও আটক খাইয়া বাধিয়া রহিল না।

এ বিড়ম্বনা কেন যে ঘটিল সে আজও তাহার কারণ জানে না। যতই ভাবিয়াছে, আত্মধিক্কারে জ্বলিয়া পুড়িয়া যতবার নিজের বিচার নিজে করিতে গেছে ততবারই মনে হইয়াছে ইহার অর্থ নাই—হেতু নাই—ইহার মূল অনুসন্ধান করিতে যাওয়া বৃথা। কিংবা, হয়তো এমনিই জগৎ—অঘটন এমনি অকারণে ঘটিয়াই জীবন-স্রোত আর একদিকে প্রবাহিত হইয়া যায়। মানুষের মতি, মানুষের বুদ্ধি কোথায় অন্ধ হইয়া মরে, নালিশ করিতে গিয়া আসামীর তল্লাশ মিলে না।

এদিকে রমণীবাবুও আর আসেন না। তিনি আসুন এ ইচ্ছা সবিতা করে না, কিন্তু বিস্মিত হইয়া ভাবে, নিষেধ করামাত্রই সকল সম্বন্ধ সত্যই শেষ হইয়া গেল। নিরবচ্ছিন্ন একত্র-বাসের বারোটা বৎসর কোন চিহ্নই কোথাও অবশিষ্ট রাখিল না—নিঃশেষে মুছিয়া দিল!

হয়তো, এমনিই জগৎ!

জগৎ এমনিই—কিন্তু এখানে আছে শুধুই কি অপচয়? উপচয় কোথাও নাই? কেবলই ক্ষতি? তবে, কেন কাছে আসিয়া পড়িল সারদা? তাহার মেয়ের মতো, মায়ের মতো। বাড়িতে অনেকগুলি ভাড়াটের মাঝে সেও ছিল একজন। শুধু নাম ছিল জানা, মুখ ছিল চেনা। কখনো দেখা হইয়াছে সিঁড়িতে, কখনো উঠানে, কখনো বা চলন-পথে। সসঙ্কোচে সরিয়া গেছে, চোখে

চোখে চাহিতে সাহস করে নাই। অকস্মাৎ কি ব্যাপার ঘটিল, কে দিল তাহার বাসা বাঁধিয়া সবিতার হৃদয়ের অন্তস্তলে! কিন্তু এ-ই কি চিরস্থায়ী? কে জানে কবে সে আবার ঘর ভাঙ্গিয়া এমনি সহসা অদৃশ্য হইবে।

আরও একজন আসিয়াছেন তিনি বিমলবাবু। মৃদুভাষী ধীর-প্রকৃতির লোক, স্বল্পক্ষণের জন্য আসিয়া প্রত্যহ খবর নিয়া যান কোথায় কি প্রয়োজন। হিতাকাঙ্ক্ষার আতিশয্যে উপদেশ দেওয়ার ঘটা নাই, বন্ধুতার আড়ম্বরে বসিয়া গল্প করার আগ্রহ নাই, কৌতূহলের কটুতায় পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশ্ন করার প্রবৃত্তি নাই—দুই-চারিটা সাধারণ কথাবার্তার পরেই প্রস্থান করেন। সময় যে তাঁহার বাঁধা-ধরা। নিয়ম ও সংযমের শাসন যেন এই মানুষটির সকল কাজে সকল ব্যবহারে বড় মর্যাদা দিয়া রাখিয়াছে। তবু তাঁহার চোখের দৃষ্টিকে সবিতা ভয় করে। ক্ষুধার্ত শ্বাপদের দৃষ্টি সে নয়, সে দৃষ্টি ভদ্র মানুষের—তাই ভয়। সে চোখে আছে আর্তের মিনতি, নাই উন্মাদ ব্যভিচার—শঙ্কা শুধু তার এই কারণে। পাছে অতর্কিতে পরাভব আসে কখন এই পথে।

তিনি আসিলে আলাপ হয় দুজনের এইমতো—

পুবের ঢাকা বারান্দায় একখানা বেতের চৌকি টানিয়া লইয়া বিমলবাবু বসিয়া বলেন, কেমন আছেন আজ?

সবিতা বলে, ভালই ত আছি।

কিন্তু ভালো ত দেখাচ্চে না। যেন শুক্‌নো-শুক্‌নো।

কৈ না।

না বললে শুনবো কেন? খাওয়া-দাওয়ায় কখনো যত্ন নিচ্চেন না। অবহেলা করলে শরীর থাকবে কেন—দুদিনেই ভেঙ্গে পড়বে যে।

না ভাঙ্গবে না, শরীর আমার খুব মজবুত।

বিমলবাবু উত্তরে অল্প হাসিয়া বলেন, শরীরটা মজবুত হয়েই যেন বালাই হয়ে উঠেচে। এটাকে ভেঙ্গে ফেলাই এখন দরকার—না? সত্যি কিনা বলুন ত?

সবিতা কষ্টে অশ্রু-সংবরণ করিয়া চুপ করিয়া থাকে।

বিমলবাবু বলেন, গাড়িটা পড়ে রয়েছে, মিছিমিছি ড্রাইভারের মাইনে দিচ্চেন, বিকেলের দিকে একটু বেড়াতে যান না কেন?

বেড়াতে আমি ত কোনকালেই যাইনে বিমলবাবু।

শুনিয়া বিমলবাবু পুনরায় একটু হাসিয়া বলেন, তা বটে। বিনা কাজে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আমারও নেই। আজ রাখালবাবু এসেছিলেন?

না।

কালও আসেন নি ত?

না, চার-পাঁচদিন তাকে দেখিনি। হয়তো কোনো বাজে কাজে ব্যস্ত আছে।

বাজে কাজে? ঐ তাঁর স্বভাব, না?

হাঁ, ঐ ওর স্বভাব। বিনা স্বার্থে পরের বেগার খাটতে ওর জোড়া নেই।

বিমলবাবু অন্যমনে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকেন। দূরে সারদাকে দেখা যায়, তিনি হাত নাড়িয়া কাছে ডাকেন, বলেন, কৈ, আজ আমাকে জল দিলে না মা? তোমার হাতের জল আর পান না খেলে আমার তৃপ্তি হয় না।

সারদা জল ও পান আনিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া এক গ্লাস জল খাইয়া পান মুখে দিয়া বিমলবাবু উঠিয়া দাঁড়ান, বলেন, আজ তা হলে আসি।

সবিতা নিজেও উঠিয়া দাঁড়ায়, নমস্কার করিয়া বলে, আসুন।

দিন-তিনেক পরে এমনিধারা আলাপের পরে বিমলবাবু উঠিবার উপক্রম করিতেই সবিতা কহিল, আজ আপনার কাজের একটু আমি ক্ষতি করবো। এখুনি যেতে পাবেন না, বসতে হবে।

বিমলবাবু বসিয়া বলিলেন, একটু বসলে আমার কাজের ক্ষতি হয়, এ আপনাকে কে বললে?

সবিতা কহিল, কেউ বলেনি, এ আমার অনুমান। আপনার কত কাজ—মিছে সময় নষ্ট হয় ত?

বিমলবাবু ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তা জানিনে; কিন্তু এইজন্যেই কি কখনো বসতে বলেন না? সত্যি বলুন ত?

এ কথা সত্য নয়, কিন্তু এই লইয়া সবিতা বাদানুবাদ করিল না, বলিল, রমণীবাবুর সঙ্গে আপনার দেখা হয়?

হাঁ, প্রায়ই হয়।

তিনি আর এখানে আসেন না—আপনি জানেন?

জানি বৈ কি।

আর কি তিনি এ-বাড়িতে আসবেন না?

সে-কথা জানিনে। বোধ হয় আপনি ডেকে পাঠালেই আসতে পারেন।

সবিতা ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আজ সকালের ডাকে একটা দলিল, এসে পৌঁছেচে। এই বাড়ি রমণীবাবু আমাকে বিক্রি-কবালায় রেজেস্ট্রি করে দিয়েছেন। আপনি জানেন?

জানি।

কিন্তু দেবার ইচ্ছেই যদি ছিল, সোজা দানপত্র না করে বিক্রি করার ছলনা কেন? দাম ত আমি দিইনি।

কিন্তু দানপত্র জিনিসটা ভালো না।

সবিতা বলিল, সে আমি জানি বিমলবাবু! আমার স্বামী ছিলেন বিষয়ী লোক, তাঁর সকল কাজেই সেদিনে আমার ডাক পড়তো। এ আমার অজানা নয় যে, আমাকে দান করার কারণ দেখাতে দলিলে এমন সব কথা লিখতে হতো, যা কোন নারীর পক্ষেই গৌরবের নয়। তবু বলি, এ মিথ্যের চেয়ে সেই ছিলো ভালো।

ইতিপূর্বে এরূপ হেতুও ঘটে নাই, এমন করিয়া সবিতা কথাও বলে নাই। বিমলবাবু মনেমনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ব্যাপারটা একেবারেই যে মিথ্যে তা-ও নয়, নতুন-বৌ।

নতুন-বৌ সম্বোধনটা নূতন। সবিতার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে খুশী হইল, কিন্তু, কণ্ঠস্বরের সহজতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই বলিল, ঠিক এই জিনিসটিই আমি সন্দেহ করেছিলুম বিমলবাবু। দাম আপনি দিয়েছেন, কিন্তু কেন দিলেন? তাঁর দান নেওয়ায় তবু একটা সান্ত্বনা ছিল, কিন্তু আপনার দেওয়া ত নিছক ভিক্ষে। এ আমি কিসের জন্যে নিতে যাবো বলুন?

বিমলবাবু নীরবে নতমুখে বসিয়া রহিলেন।

সবিতা কহিল, উত্তর না দিলে দলিল ফিরিয়ে দিয়ে আমি চলে যাবো বিমলবাবু।

এবার বিমলবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, এই ভয়েই দাম দিয়েছি, পাছে আপনি কোথাও চলে যান। না দিয়ে থাকতে পারিনি বলেই বাড়িটা আপনার কিনে রেখেচি।

টাকা তিনি নিলেন?

হাঁ, ভেতরে ভেতরে রমণীবাবুর বড় অভাব হয়েছিল। আর যেন পেরে উঠছিলেন না।

সবিতা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আমারও সন্দেহ হতো, কিন্তু এতটা ভাবিনি। আবার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, শুনেচি আপনার অনেক টাকা। এ ক'টা টাকা হয়তো কিছুই নয়, তবু আসল কথাই যে বাকী রয়ে গেল বিমলবাবু। দিতে আপনি পারেন, কিন্তু আমি নেবো কি বলে?—না, সে হবে না—বার বার চুপ করে জবাব এড়িয়ে গেলে আমি শুনবো না। বলুন।

বিমলবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, একজন অকৃত্রিম বন্ধুর উপহার বলেও ত নিতে পারেন।

সবিতা তাঁহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, নিলে কৈফিয়তের অভাব হয় না সে আমি জানি। আপনি যে আমার বন্ধু নয় তাও বলিনে, কিন্তু সে কথা যাক। এখানে আর কেউ নেই, শুধু আপনি আর আমি। আমাকে বলতে সঙ্কোচ হয়, এ অধিকার পুরুষের কাছে আমার আর নেই—বলুন ত এই কি সত্যি? এই কি আপনার মনের কথা?

বিমলবাবু মুখ তুলিয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, মনের কথা আপনাকে জানাবো কেন? জানিয়ে ত লাভ নেই।

লাভ নেই তা-ও জানেন?

হাঁ, তা-ও জানি।

সবিতা নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিল। এই স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটির প্রতিদিনের আচরণ মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল, তাহাও সংবরণ করিয়া কহিল, আমার জীবনের ইতিহাস জানেন বিমলবাবু?

না, জানিনে। শুধু যা ঘটেছে—যা অনেকে জানে—আমিও কেবল সেইটুকুই জানি নতুন-বৌ, তার বেশী নয়।

কথাটা শুনিয়া সবিতা যেন চমকিয়া উঠিল—যা ঘটেছে সে কি তবে আমার জীবনের ইতিহাস নয় বিমলবাবু? ও দুটো কি একেবারে আলাদা? বলুন ত সত্যি করে?

তাঁহার প্রশ্নের আকুলতায় বিমলবাবু দ্বিধায় পড়িলেন, কিন্তু তখনি নিঃসঙ্কোচে বলিলেন, হাঁ, ও দুটো এক নয় নতুন-বৌ। অন্ততঃ নিজের জীবনের মধ্যে দিয়ে এই কথাই আজ অসংশয়ে জানতে পেরেছি ও-দুটো এক নয়।

ইহার অর্থটা যদিচ স্পষ্ট হই না, তথাপি কথাটা সবিতাকে অন্তরে গভীর আঘাত করিল। নীরবে মনে মনে বহুক্ষণ আন্দোলন করিয়া শেষে বলিল, শুনেছেন ত আমি স্বামী ত্যাগ করে রমণীবাবুর কাছে এসেছিলুম,—আবার সেদিন তাঁকেও পরিত্যাগ করেছি। আমি ত ভালো মেয়ে নই—আবার একদিন অন্য পুরুষ গ্রহণ করতে পারি, এ কথা কি আপনার মনে আসে না?

বিমলবাবু বলিলেন, না। যদি-বা আসতে চেয়েছে তখনি সরিয়ে দিয়েছি।

কেন?

শুনিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, এ হলো ছেলেদের প্রশ্ন। ও এই করেছে, এই করেছে, অতএব ওর এ-ই করা চাই, এ জবাব পাবেন আপনি তাদেরি পড়ার বইয়ে। আমি তার চেয়ে বেশী পড়েছি নতুন-বৌ।

পড়ালে কে?

সে ত একজন নয়। ক্লাসে প্রহরে প্রহরে মাস্টার বদল হয়েছে, তাঁদের কাউকে বা মনে আছে, কাউকে নেই, কিন্তু হেডমাস্টার যিনি, আড়ালে থেকে এঁদের যিনি নিযুক্ত করে ছিলেন তাঁকে ত দেখিনি, কি করে আপনার কাছে তাঁর নাম করবো বলুন?

সবিতা ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল,আপনি বোধ হয় খুব ধার্মিক লোক, না বিমলবাবু?

বিমলবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ধার্মিক লোক আপনি কাকে বলেন? আপনার স্বামীর মতো?

সবিতা চকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, তাঁকে কি চেনেন? তাঁর সঙ্গে জানাশোনা আছে নাকি?

বিমলবাবু তাহার উদ্বেগ লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু পূর্বের মতোই শান্তস্বরে বলিলেন, হাঁ চিনি। একদিন কোনমতে কৌতূহল দমন করতে পারলুম না, গেলুম তাঁর কাছে। অনেক চেষ্টায় দেখা মিললো, কথাবার্তাও অনেক হলো—না নতুন-বৌ, ধর্মকে যে-ভাবে তিনি নিয়েছেন আমি তা নিইনি, যে-ভাবে বুঝেছেন আমি তা বুঝিনি, ওখানে আমাদের মিল নেই। ধার্মিক লোক আমি নয়।

আবেগ ও উত্তেজনায় সবিতার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। এ কথা বুঝিতে তাহার বাকী নাই, সমস্ত কৌতূহলের মূল কারণ সে নিজে। থামিতে পরিল না, জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, এখানে মিল না থাক, কোথাও কি আপনাদের মিল নেই? দুজনের স্বভাব কি সম্পূর্ণ আলাদা?

বিমলবাবু বলিলেন, এ উত্তর আপনাকে দেবো না, অন্ততঃ দেবার এখনো সময় আসেনি।

অন্ততঃ বলুন এ কথাও কি তখন মনে আসেনি এ-মানুষটিকে কেউ ছেড়ে চলে গেল কি করে?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেউ মানে আপনি ত? কিন্তু ছেড়ে চলে ত আপনি যাননি। সবাই মিলে বাধ্য করেছিল আপনাকে চলে যেতে।

এ-ও শুনেছেন?

শুনেছি বৈ কি।

সমস্তই?

সমস্তই শুনেচি।

সবিতার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কহিল, তাদের দোষ আমি দিইনে, তারা ভালোই করেছিল। স্বামীর সংসার অপবিত্র না করে আমার আপনিই চলে যাওয়া উচিত ছিল। এই বলিয়া সে আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল। একটু পরে বলিল, কিন্তু এত জেনেও আমাকে ভালোবাসলেন কি ক'রে বলুন তো?

ভালোবাসি এ কথা ত আজো বলিনি নতুন-বৌ।

না, বলেন নি বলেই ত এ কথা এমন সত্যি করে জানতে পেরেচি বিমলবাবু। কিন্তু, মনে ভাবি সংসারে যে-লোক এত দেখেচে, আমার সব কথাই যে শুনেচে, সে আমাকে ভালোবাসলে কি বলে? বয়স হয়েছে, রূপ আর নেই—বাকী যেটুকু আছে তাও দুদিনে শেষ হবে—তাকে ভালোবাসতে পারলে মানুষে কি ভেবে?

বিমলবাবু তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, ভালোবেসেই যদি থাকি নতুন-বৌ, সে হয়তো সংসারে অনেক দেখেচি বলেই সম্ভব হয়েছে। বইয়ে পড়া পরের উপদেশ মেনে চললে হয়তো পারতুম না। কিন্তু সে যে রূপ-যৌবনের লোভে নয়, এ কথা যদি সত্যিই বুঝে থাকেন আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

সবিতা মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, এ কথা আমি সত্যিই বুঝেচি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাকে পেয়ে আপনার লাভ কি হবে? কি করবেন আমাকে নিয়ে?

বিমলবাবু উত্তর দিলেন না, শুধু নীরবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমশঃ সে-দৃষ্টি যেন ব্যথায় ভরিয়া আসিল।

সবিতা অধীর হইয়া উঠিল, এমনি করে কি শুধু চেয়েই থাকবেন বিমলবাবু, জবাব দেবেন না আমার?

জবাব নেই নতুন-বৌ। শুধু জানি আপনাকে আমি পাবো না—পাবার পথ নেই আমার।

কেন নেই? কি করে বুঝলেন সে কথা?

বুঝেচি অনেক দুঃখ পেয়ে। আমিও নিষ্কলঙ্ক নই নতুন-বৌ। একদিন অনেক মেয়েকেই আমি জেনেছিলুম। সেদিন ঐশ্বর্যের জোরে এনেছিলুম তাদের ছোট করে—তারা নিজেরাও হয়ে গেল ছোট, আমাকেও করে দিলে তাই। তারা আর নেই—কোথায় কে-যে ভেসে গেলো আজ খবরও জানিনে।

একটু থামিয়া বলিলেন, তখন এ-খেলায় নামতে আমার বাধেনি, কিন্তু আজ বাধে পদে পদে।

সবিতা শিহরিয়া প্রশ্ন করিল, শুধুই ঐশ্বর্য দিয়ে ভুলিয়েছিলেন তাদের? কাউকে ভালোবাসেন নি?

বিমলবাবু বলিলেন, বেসেছিলুম বৈ কি। একজন আপনার মতোই গৃহ ছেড়ে কাছে এসেছিল, কিন্তু খেলা ভাঙলো—তাকে রাখতে পারলুম না। দোষ তাকে দিইনে, কিন্তু আজ আর আমার বুঝতে বাকী নেই, ভালোবাসার ধনকে ছোট করে ধরে রাখা যায় না—তাকে হারাতেই হয়। সেদিন রমণীবাবুকেও ত এমনি হারাতে দেখলুম।

সবিতা প্রশ্ন করিল,—এই কি আপনার ভয়?

বিমলবাবু বলিলেন, ভয় নয় নতুন-বৌ—এখন এই আমার ব্রত, এর থেকে বিচ্যুত না হই এই আমার সাধনা। আপনার মেয়েকে দেখেচি, আপনার স্বামীকে দেখে এসেচি। কি করে সমস্ত দিয়ে ঋণ শুধে তিনি চলে গেছেন, তাও জেনেছি। শুনতে আমার বাকী কিছু নেই, এর পরে

আপনাকে পাবো আমি কি দিয়ে? দোর যে বন্ধ। জানি, ছোট করে আপনাকে আমি কোনদিন নিতে পারবো না, আবার তার চেয়েও বেশী জানি যে, ছোট না করেও আপনাকে পাবার আমার এতটুকু পথ খোলা নেই। তাই ত বলেছিলুম নতুন-বৌ, নিন আমাকে আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলে। এই বাড়িটা সেই বন্ধুর দেওয়া উপহার। এ আপনাকে ছোট করার কৌশল নয়।

সবিতা নতমুখে নীরবে বসিয়া রহিল, কত কথাই যে তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া গেল তাহার নির্দেশ নাই, শেষে মুখ তুলিয়া কহিল, এ বন্ধুত্ব কতদিন স্থির থাকবে বিমলবাবু? এ মিথ্যের আবরণ টিকবে কেন? নর-নারীর মূল সম্বন্ধে একদিন যে আমাদের টেনে নামাবেই। সে থামাবে কে?

বিমলবাবু বলিলেন, আমি থামাবো নতুন-বৌ। আপনার অপেক্ষা করে থাকবো, কিন্তু মন ভোলাবার আয়োজন করবো না। যদি কখনো নিজের পরিচয় পান, আমার মতো দু'চোখ চেয়ে দৃষ্টি যদি কখনো বদলায়, কাছে আমাকে ডাকবেন—বেঁচে যদি থাকি ছুটে আসবো। ছোট করে নেবার জন্যে নয়—আসবো মাথায় তুলে নিতে।

সবিতার চোখ ছলছল করিতে লাগিল, কহিল, আপন পরিচয় পেতে আর বাকী নেই বিমলবাবু, চোখের এ-দৃষ্টি আর ইহজীবনে বদলাবে না। শুধু আশীর্বাদ করুন, যে-দুঃখ নিজে ডেকে এনেচি তা যেন সইতে পারি।

বিমলবাবুর চোখও সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন, দুঃখ কে দেয়, কোথা দিয়ে সে আসে আমি আজও জানিনে। তাই তোমার অপরাধের বিচার করতে আমি বসবো না, শুধু প্রার্থনা করবো, যেমন করেই এসে থাক এ দুঃখ যেন তোমার চিরস্থায়ী না হয়।

কিন্তু চিরস্থায়ীই ত হয়ে রইলো।

তাও জানিনে নতুন-বৌ। আমার আশা, সংসারে আজো তোমার জানতে কিছু বাকী আছে, আজো তোমার সকল দেখাই এখানে শেষ হয়ে যায়নি। আশীর্বাদ তোমাকে যদি করতেই হয়, এই আশীর্বাদ করি সেদিন যেন তুমি সহজেই এর একটা কূল দেখতে পাও।

সবিতা উত্তর দিল না, আবার দুজনের বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। মুখ যখন সে তুলিল তখন উজ্জ্বল দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের পাতা দুটি ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে; মৃদুকণ্ঠে কহিল, তারক বর্ধমানের কোন একটা গ্রামে মাস্টারি করে, সে আমাকে ডেকেছে। যাবো দিনকতক তার কাছে?

যাও।

তুমি কি এখন কিছুদিন কলকাতাতেই থাকবে?

থাকতেই হবে। এখানে একটা নতুন আপিস খুলেচি, তার অনেক কাজ বাকী।

সবিতা একটুখানি হাসিয়া বলিল, টাকা ত অনেক জমালে—আর কি করবে?

প্রশ্ন শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, জমাই নি, ওগুলো আপনি জমে উঠেছে নতুন-বৌ, ঠেকাতে পারিনি বলে। কি করবো জানিনে, ভেবেচি, সময় হলে একজনের কাছে শিখে নেবো তার প্রয়োজন।

সবিতা উঠিয়া গিয়া পাশের জানালাটা খুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল, বলিল,—এ বাড়িটায় আর আমার দরকার ছিল না—ভেবেছিলুম ভালোই হলো যে গেলো, একটা ঝঞ্ঝাট মিটলো ; কিন্তু তুমি তা হতে দিলে না। ভাড়াটেরা রইলো এদের দেখো।

দেখবো।

আর একটি অনুরোধ করবো, রাখবে?

কি অনুরোধ নতুন-বৌ?

আমার মেয়ে, আমার স্বামী রইলেন বনবাসে। যদি সময় পাও তাঁদের একটু খোঁজ নিও।

বিমলবাবু হাসিমুখে একটুখানি ঘাড় নাড়িলেন, কিছুই বলিলেন না। ইহার কি যে অর্থ সবিতা ঠিক বুঝিল না, কিন্তু বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঝড় বহিয়া গেল। হাত দুটি এক করিয়া নীরবে

কপালে ঠেকাইল, সে স্বামীর উদ্দেশে, না বিমলবাবুকে বোধ করি নিজেও জানিল না। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া, তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা একদিন তোমাকে নিজের মুখে শোনাবো—সে শুধু আমিই জানি, আর কেউ না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, আমি বাপের বাড়িতে যখন ছোট ছিলুম তখন কেন আসোনি বলো ত?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ আমাকে আজকে যিনি পাঠিয়েছেন সেদিন তাঁর খেয়াল ছিল না। সেই ভুলের মাশুল যোগাতে আমাদের প্রাণান্ত হয়, কিন্তু এমনি করেই বোধ করি সে-বুড়োর বিচিত্র খেলার রস জমে ওঠে। কখনো দেখা পেলে দুজনে নালিশ রুজু করে দেবো। কি বলো?

দূরে সারদাকে বার-কয়েক যাতায়াত করিতে দেখিয়া কাছে ডাকিয়া বলিলেন, তোমার মায়ের খাবার দেরি হয়ে গেছে—না মা? উঠতে হবে?

সারদা ভারী অপ্রতিভ হইয়া বার বার প্রতিবাদ করিয়া বলিতে লাগিল, না কখ্‌খনো না! দেরি হয়ে গেছে আপনার—আপনাকে আজ খেয়ে যেতে হবে।

বিমলবাবু হাসিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—তোমার এই কথাটিই কেবল রাখতে পারবো না মা, আমাকে না খেয়েই যেতে হবে। চললুম।

সবিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কিন্তু সারদার অনুরোধে যোগ দিল না।

বিমলবাবু প্রত্যহের মতো আজও প্রতি-নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেলেন।

বার

রমণীবাবু আর আসেন না, হয়তো ছাড়াছাড়ি হইল। দুজনের মাঝখানে অকস্মাৎ কি যে ঘটিল ভাড়াটেরা ভাবিয়া পায় না। আড়াল হইতে চাহিয়া দেখে সবিতার শান্ত বিষণ্ণ মুখ—পূর্বের তুলনায় কত-না প্রভেদ?

জৈষ্ঠের শূন্যময় আকাশ আষাঢ়ের সজল মেঘভারে যেন নত হইয়া তাহাদের কাছে আসিয়াছে। তেমনি লতা-পাতায়, তৃণ-শষ্পে, গাছে গাছে লাগিয়াছে অশ্রু-বাষ্পের সকরুণ স্নিগ্ধতা, তেমনি জলে-স্থলে, গগনে-পবনে সর্বত্র দেখা দিয়াছে তাঁহার গোপন বেদনার স্তব্ধ ইঙ্গিত। কথায়, আচরণে উগ্রতা ছিল না তাঁর কোনদিনই, তথাপি কিসের একটা অজানিত ব্যবধানে এতদিন কেবলি রাখিত তাঁকে দূরে দূরে। এখন সেই দূরত্ব মুছিয়া গিয়া তাঁহাকে টানিয়াছে সকলের বুকের কাছে। বাড়ির মেয়েরা এই কথাটাই বলিতেছিল সেদিন সারদাকে। ভাবিয়াছে, বুঝি বিচ্ছেদের দুঃখই তাঁহাকে এমন করিয়া বদলাইয়াছে।

রমণীবাবু মোটের উপর ছিলেন ভালোমানুষ লোক, থাকিতেন পরের মতো, কাহারো ভালোতেও না, মন্দতেও না। মাঝে মাঝে ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করা ভিন্ন অন্য অসদাচরণ করেন নাই। তাঁহার চলিয়া যাওয়াটা লাগিয়াছে অনেককেই, তবু ভাবে সেই যাওয়ার কলঙ্কিত পথে নতুন-মার সকল কালি যদি এতদিনে ধুইয়া যায় ত শোকের পরিবর্তে তাহারা উল্লাসবোধই করিবে। এ-যেন তাহাদের গ্লানি ঘুচিয়া নিজেরাই নির্মল হইয়া বাঁচিল। কেবল একটা ভয় ছিল তিনি নিজে না থাকিলে তাহারাই বা দাঁড়াইবে কোথায়? আজ সারদা এই বিষয়েই তাহাদের নিশ্চিন্ত করিল। বলিল, পিসীমা, বাড়িটার একটা ব্যবস্থা হলো। তোমরা যেমন আছো তেমনি থাকো—তোমাদের কোথাও বাসা খুঁজতে হবে না, মা বলে দিলেন।

তবে বুঝি মা আর কোথাও যাবেন না সারদা?

যাবেন, কিন্তু আবার ফিরে আসবেন। বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেশীদিন থাকবেন না বললেন।

আনন্দে পিসীমার চোখে জল আসিয়া পড়িল, সারদাকে আশীর্বাদ করিয়া তিনি এই সুসংবাদ অন্য সকলকে দিতে গেলেন।

প্রতিদিন বিমলবাবু বিদায় লইবার পরে সবিতা আসিয়া তাঁহার পূজার ঘরে প্রবেশ করে। পূর্বে তাহার আহ্নিক সারিতে বেশী সময় লাগিত না, কিন্তু এখন লাগে দু-তিন ঘণ্টা করে।

কোনদিন বা রাত্রি দশটা বাজে, কোনদিন বা এগারোটা। এই সময়টায় সারদার ছুটি, সে নীচে নামিয়া নিজের গৃহকর্ম সারে। আজ ঘরে ঢুকিয়া দেখিল রাখাল বিছানায় বসিয়া প্রদীপের আলোকে তাহার খাতাখানা পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন? তার পরে কুণ্ঠিত স্বরে কহিল, না-জানি কত ভুলচুকই হয়েছে! না?

রাখাল মুখ তুলিয়া বলিল, হলেও ভুলচুক শুধরে নিতে পারবো, কিন্তু লেখাটা ত কিছুই এগোয় নি দেখচি।

না। সময় পাইনে যে।

পাও না কেন?

কি করে পাবো বলুন? মায়ের সব কাজ আমাকেই করতে হয় যে।

নতুন-মার দাসী-চাকরের অভাব নেই। তাঁকে বলো না কেন তোমারো সময়ের দরকার—তোমারো কাজ আছে। এ কিন্তু ভারী অন্যায় সারদা।

রাখালের কণ্ঠস্বরে তিরস্কারের আভাস ছিল, কিন্তু সারদার মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইয়াছে। বলিল, আপনারই কি কম অন্যায় দেব্‌তা? ভিক্ষের দান ঢাকতে অকাজের বোঝা চাপিয়েছেন আমার ঘাড়ে। পরকে অকারণ পীড়ন করলে নিজের হয় জ্বর, ঘরের মধ্যে একলা পড়ে ভুগতে হয়, সেবা করার লোক জোটে না। এত রোগা দেখচি কেন বলুন ত?

রাখাল বলিল, রোগা নই, বেশ আছি। কিন্তু লেখাটা হঠাৎ অকাজ হয়ে উঠলো কিসে?

সারদা বলিল, অকাজ নয় ত কি! হলো জ্বর, তাও ঢাকতে হলো হয়নি বলে। এমনি দশা। ভালো, ওটা লিখেই না হয় দিলুম, কিন্তু কি কাজে আপনার লাগবে শুনি?

কাজে লাগবে না? তুমি বলো কি সারদা?

সারদা কহিল, এই বলচি যে, এ-সব কিচ্ছু কাজে লাগবে না। আর যদিই বা লাগে আমার কি? মরতে আমাকে আপনি দেননি, এখন বাঁচিয়ে রাখার গরজ আপনার। একছত্রও আর আমি লিখবো না।

রাখাল হাসিয়া বলিল, লিখবে না ত আমার ধার শোধ দেবে কি করে?

ধার শোধ দেবো না—ঋণী হয়েই থাকবো।

রাখালের ইচ্ছা করিল, তাহার হাতটা নিজের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলে, তাই থেকো, কিন্তু সাহস করিল না। বরঞ্চ, একটুখানি গম্ভীর হইয়াই বলিল, যেটুকু লিখেচো তার থেকে কি বুঝতে পারো না ও-গুলোর সত্যিই দরকার আছে?

সারদা বলিল, দরকার আছে শুধু আমাকে হয়রান করার—আর কিছু না। কেবল কতগুলো রামায়ণ-মহাভারতের কথা—এখান-সেখান থেকে নেওয়া—ঠিক যেন যাত্রা-দলের বক্তৃতা। ও-সব কিসের জন্যে লিখতে যাবো?

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল যতটা হইল বিস্ময়াপন্ন তার ঢের বেশী হইল বিপদাপন্ন। বস্তুত লেখাগুলা তাই বটে। সে যাত্রার পালা রচনা করে, নকল করাইয়া অধিকারীদের দেয়, ইহাই তাহার আসল জীবিকা। কিন্তু উপহাসের ভয়ে বন্ধু-মহলে প্রকাশ করে না, বলে ছেলে পড়ায়। ছেলে পড়ায় না যে তাহা নয়, কিন্তু এ আয়ে তাহার ট্রামের মাশুলের সঙ্কুলান হয় না। তাহার ইচ্ছা নয় যে উপার্জনের এই পন্থাটা কোথাও ধরা পড়ে—যেন এ বড় অগৌরবের, ভারী লজ্জার। তাহার এমন সন্দেহও জন্মিল, নিজেকে সারদা যতটা অশিক্ষিতা বলিয়া প্রচার করিয়াছিল হয়তো তাহা সত্য নয়, হয়তো বা সম্পূর্ণ মিথ্যা, কি জানি হয়তো বা তাহার চেয়েও—রাগে মনের ভিতরটা কেমন জ্বলিয়া উঠিল, কারণ, সে জানে তাহার পল্লবগ্রাহী বিদ্যা—যতটা জানে আইনস্টিনের রিলেটিভিটি ততটাই জানে সে সফোক্লিজের অ্যানটিগন অ্যাজাক্স। অন্ধকারে চলার মতো প্রতি পদক্ষেপেই তাহার ভয় পাছে গর্তে পা পড়ে। যাত্রার পালা লেখার লজ্জাটাও তাহার এই-জাতীয়। সারদার প্রশ্নের উত্তরে কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়া উঠিল,—আগে ত তুমি ঢের

ভালোমানুষ ছিলে সারদা, হঠাৎ এমন দুষ্টু হয়ে উঠলে কি ক'রে?

সারদা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, দুষ্টু হয়ে উঠেচি?

ওঠোনি? ভালো, তোমার মতে দরকারী কাজটা কি শুনি?

বলচি। আগে আপনি বলুন ছ-সাতদিন আসেন নি কেন?

শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল।

মিছে কথা। এই বলিয়া সারদা তাহার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়েছিল জ্বর এবং তা-ও খুব বেশী। এ-কে শরীর খারাপ বলে উড়িয়ে দিলে সে হয় মিথ্যে কথা। আপনার বুড়ো-ঝি, যাকে নানী বলে ডাকেন, সে-ও ছিল শয্যাগত। স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেকে করতে হয়েচে সাগু-বার্লি তৈরি। শুনি আপনার বন্ধুবান্ধব আছে অনেক, তাদের কাউকে খবর দেননি কেন?

প্রশ্নটা রাখালের নতুন নয়—গত বছরেও প্রায় এমনি অবস্থাই ঘটিয়াছিল ; কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল—এ কথা স্বীকার করিতে পারিল না যে, সংসারে বন্ধু-সংখ্যা যাহার অপরিমিত, দুঃখের দিনে ডাক দিবার মতো বন্ধুর তাহারি সবচেয়ে অভাব।

সারদা বলিল, তারা যাক, কিন্তু নতুন-মাকে খবর দিলেন না কেন?

প্রত্যুত্তরে রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, নতুন-মা! নতুন-মা যাবেন আমার সেই পচা এঁদো-পড়া বাসায় সেবা করতে? তুমি কি যে বলো সারদা তার ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার অসুখের সংবাদ তোমাকেই বা দিলে কে?

সারদা কহিল, যে-ই দিক, কিন্তু দুঃখ এই যে সময়ে দিলে না। শুনে নতুন-মা বললেন, রাজু আমার রেণুকে বাঁচালে দিনের বেলায় রেঁধে সকলের মুখে অন্ন যুগিয়েছে, রাত্তিরে সারারাত জেগে সেবা করে, নিজের সমস্ত পুঁজি খুইয়ে ডাক্তার-বদ্যির ঋণ শুধে। আর ও যখন পড়লো অসুখে তখন আপনি গেল জ্বরের তেষ্টার জল কল থেকে আনতে, উনুন জ্বেলে আপনি করলে ক্ষিধের পথ্যি তৈরি, ও ওষুধ পেলে না আনবার লোক নেই বলে। কিন্তু আমাকে খবর দেবে কেন মা—আমাকে তার বিশ্বাস ত নেই। মেয়ের অসুখে পরের নাম করে এসেছিল যখন সাহায্য চাইতে—তাকে দিইনি ত। বলিতে বলিতে সারদার নিজের চোখেই জল উপচিয়া উঠিল, কহিল, কিন্তু সে না হয় নতুন-মা, আমি কি দোষ করেছিলাম দেব্‌তা? কেরানীগিরি করে আজও টাকা শোধ দিইনি, সেই রাগে নাকি?

রাখাল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ চায়ের পেয়ালায় তুফান তুললে সারদা। তুচ্ছ ব্যাপারটাকে কি ঘোরালো করেই তুলেচো। জ্বর কি কারো হয় না? দুদিনেই ত সেরে গেল।

সারদা বলিল, সেরে যে গেলো ভগবানের সে দয়া আমাদের ওপর,—আপনাকে না। আসলে আপনি ভারী খারাপ লোক। বিষ খেয়ে মরতে গেলুম, দিলেন না,—হাসপাতালে দিন-রাত লেগে রইলেন। ফিরে এসে যে না খেয়ে মরবো তাতেও বাদ সাধলেন। একদিকে ত এই, আবার অন্যদিকে অসুখের মধ্যে যে একটুখানি সেবা করবো তাও আপনার সইলো না। চিরকাল কি এমনি শত্রুতাই করবেন, নিষ্কৃতি দেবেন না? কি করেছিলুম আপনার? এ জন্মের ত দোষ দেখিনে, একি গতজন্মের দণ্ড নাকি?

রাখাল জবাব দিতে পারিল না, অবাক হইয়া ভাবিল এই মুখচোরা ঠাণ্ডা মেয়েটাকে হঠাৎ এমন প্রগল্‌ভ করিয়া দিল কিসে!

সারদা থামিল না। দিনের বেলায় কড়া আলোতে এত কথা এমন অজস্র নিঃসঙ্কোচে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না, কিন্তু এ ছিল রাত্রিকাল—নিরালা গৃহের ছায়াচ্ছন্ন অভ্যন্তরে শুধু সে আর অন্য জন—আজ বুদ্ধি ছিল শিথিল তন্দ্রাতুর, তাই অন্তর্গূঢ় ভাবনা তাহার বাক্যের স্রোতঃপথে অবারিত হইয়া আসিল, হিতাহিতের তর্জনী শাসন ভ্রূক্ষেপ করিল না। বলিতে লাগিল, জানেন দেব্‌তা, জানি আমি, কেন আপনি আজো বিয়ে করেন নি। আসলে মেয়েদের ওপর আপনার ভারী ঘৃণা। কিন্তু এ-ও জানবেন যাদের আপনি এতকাল দেখেছেন, ফরমাস

খেটেছেন, পিছু পিছু ঘুরেছেন, তারাই সমস্ত মেয়ে-জাতির নিরিখ নয়। জগতে অন্য মেয়েও আছে।

এবার রাখাল হাসিয়া ফেলিল, জিজ্ঞাসা করিল, আজ তোমার হলো কি বলো ত?

সত্যি আজ আমার ভারী রাগ হয়েচে।

কেন?

কেন! কিসের জন্য আমাকে অসুখের খবর দেননি বলুন?

দিলেই বা কি হতো? সেখানে অন্য কোন মেয়ে নেই,—একলা যেতে কি আমার সেবা করতে?

সারদা দৃপ্তচোখে কহিল, যেতুম না ত কি শুনে চুপ করে ঘরে বসে থাকতুম?

তোমার স্বামী বলতেন কি যখন ফিরে এসে শুনতেন এ কথা?

ফিরে আসবেন না তা আপনাকে অনেকবার বলেচি—আপনি বলবেন তুমি জানলে কি করে? তার জবাব এই যে, আমি জানবো না ত সংসারে জানবে কে? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, এ ছাড়া আরো একটা কথা আছে। একাকী আপনার সেবা করতে যাওয়াটাই হতো আমার দোষের, কিন্তু এ বাড়িতেই বা কার ভরসায় আমাকে তিনি একলা ফেলে গেছেন? এই যে আপনি আমার ঘরে এসে বসেন—যদি যেতে না দিই, ধরে রাখি, কে ঠেকাবে বলুন ত?

এ কি তামাশা! এমন কথা কোন মেয়ের মুখেই রাখাল কখনো শোনে নাই। বিশেষতঃ সারদা। গভীর লজ্জায় মুখ তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ পাইলে সে লজ্জা বাড়িবে বৈ কমিবে না, তাই জোর করিয়া কোনমতে হাসির প্রয়াস করিয়া বলিল, একলা পেয়ে আমাকে ত অনেক কথাই বললে, কিন্তু সে থাকলে কি পারতে বলতে?

সারদা কহিল, বলার তখন ত দরকার হতো না। কিন্তু আজ এলে তাকে অন্য কথা বলতুম। বলতুম, যে সারদা তোমাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসতো,—সে কত যে সয়েচে তার সাক্ষী আছেন শুধু ভগবান—যাকে বিয়ের নাম করে এনে ফাঁকি দিলে, এঁটো-পাতের মতো যাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে গেলে, ফেরবার পথ যার কোথাও খোলা রাখোনি, সে সারদা আর নেই, সে বিষ খেয়ে মরেছে। নিজের নয়—তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। এ সারদা অন্য জন। তার পুনর্জন্মে তার 'পরে আর কারো দাবী নেই।

শুনিয়া রাখাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সারদা বলিতে লাগিল, আপনার কি মনে নেই দেব্‌তা হাসপাতালে বিরক্ত হয়ে আপনি বার বার জিজ্ঞেসা করেচেন, তুমি কোথায় যেতে চাও ; উত্তরে আমি বার বার কেঁদে বলেচি, আমার যাবার জায়গা কোথাও নেই। শুধু একটা স্থান ছিল—সেইখানেই চলেছিলুম—কিন্তু মাঝপথে সেই পথটাই দিলেন আপনি বন্ধ করে।

কিছুক্ষণ উভয়ের নিঃশব্দে কাটিল। রাখাল বলিল, জীবনবাবুকে চোখে দেখিনি, শুধু বাড়ির লোকের মুখে তাঁর নাম শুনেচি। তিনি কি তোমার স্বামী নন? সবই মিথ্যে?

হাঁ, সবই মিথ্যে। তিনি আমার স্বামী নন।

তবে কি তুমি বিধবা?

হাঁ, আমি বিধবা।

আবার কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল। সারদা জিজ্ঞাসা করিল, আমার কাহিনী শুনে কি আমার ওপর আপনার ঘৃণা জন্মালো?

রাখাল কহিল, না সারদা, আমি অতো অবুঝ নই। তোমার চেয়ে ঢের বেশী অপরাধ করেছিলেন নতুন-মা, আমি তাঁকেও ঘৃণা করিনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে চুপ করিল। তখনই বুঝিল, এ উল্লেখ অনধিকার-চর্চা। এ তাহার আপন অপমান। একি বিশ্রী কটু কথা মুখ দিয়া তাহার হঠাৎ বাহির হইয়া গেল!

সারদা বলিল, নতুন-মা আপনাকে মায়ের মতো মানুষ করেছিলেন—

রাখাল কহিল, হ্যাঁ, তিনি আমার মা-ই ত। এই বলিয়া প্রসঙ্গটা সে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, তোমার মা-বাপ আত্মীয় স্বজন আছেন কিনা বলতে চাও না, অন্ততঃ তাঁদের কাছে যে যাবে না এ আমি নিশ্চয় বুঝেচি, কিন্তু কি এখন করবে?

সারদা বলিল, যা করচি তাই। নতুন-মার কাজ করবো।

কিন্তু এ কি তোমার চিরকাল ভালো লাগবে সারদা?

সারদা বলিল, দাসীবৃত্তি ত নয়—মায়ের সেবা। অন্ততঃ, বহুকাল ভালো লাগবে এ আমি জানি।

রাখাল বলিল, কিন্তু বহুকালের পরেও একটা কাল থাকে বাকী, তখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়, তাতে টাকার দরকার। নিছক সেবা করেই সে সমস্যার মীমাংসা হয় না।

সারদা বলিল, যত টাকাই দরকার হোক, আপনার কেরানীগিরি করতে আমি পারবো না। বরঞ্চ ছোট্ট একখানি চিঠি লিখে ফেলে রাখবো বিছানায়, কেউ একজন তা পড়ে টাকা লুকিয়ে রেখে যাবে আমার বালিশের নীচে। তাতেই আমার অভাব মিটবে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, সে ত ভিক্ষে নেওয়া।

সারদাও হাসিল, বলিল, ভিক্ষেই নেবো। কেউ তা জানবে না—ঘুষ দিয়ে লোকে বলে না—আমার লজ্জা কিসের?

রাখালের আবার ইচ্ছা হইল হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া আনে এবং এই ধৃষ্টতার জন্য শাস্তি দেয়। কিন্তু আবার সাহসে বাধিল,—সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

ঝি বাহির হইতে সাড়া দিয়া বলিল, দিদিমণি, মা ডাকচেন তোমাকে।

মার আহ্নিক কি শেষ হয়েচে?

হাঁ হয়েছে; বলিয়া সে চলিয়া গেল।

সারদা কহিল, আপনি যাবেন না মার সঙ্গে দেখা করতে?

রাখাল কহিল, তুমি যাও, আমি পরে যাবো।

পরে কেন? চলুন না দুজনে একসঙ্গে যাই। বলিয়া সে চাপা-হাসির একটা তরঙ্গ তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাখাল চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মনে হইল ঘরখানি যে রসে, মাধুর্যে নিবিড় হইয়া উঠিল সজীব মানুষের হাতের মতো সে তাহাকে সকল অঙ্গে স্পর্শ করিয়াছে, কতদিনের পরিচিত এই সামান্য গৃহখানির আজ যেন আর রহস্যের অন্ত নাই।

তাহার দেহ-মনে আজ এ কিসের আকুলতা, কিসের স্পন্দন? বক্ষের নিগূঢ় অন্তস্তলে এ কে কথা কয়? কি বলে? স্বর অস্ফুটে কানে আসে, ভাষা বুঝা যায় না কেন? কত শত মেয়েকে সে চেনে, কতদিনের কত আনন্দোৎসব তাহাদের সাহচর্যে গল্পে-গানে হাসিতে-কৌতুকে অবসিত হইয়াছে, তাহার স্মৃতি আজো অবলুপ্ত হয় নাই,—মনের কোণে খুঁজিলে আজো দেখা মিলে, কিন্তু সারদার—এই একটিমাত্র মেয়ের মুখের কথায় যে-বিস্ময় আজ মূর্তিতে উদ্ভাসিয়া উঠিল, এ-জীবনের অভিজ্ঞতায় কোথায় তাহার তুলনা? এই কি নারীর প্রণয়ের রূপ? তাহার ত্রিশ বর্ষ বয়সে সে অজানার আজই কি প্রথম দেখা মিলিল? এরই কি জয়গানের অন্ত নাই? এরই কলঙ্ক গাহিয়া আজও কি শেষ করা গেল না?

কিন্তু ভুল নাই, ভুল নাই,—সারদার মুখের কথায় ভুল বুঝিবার অবকাশ নাই। এমন সুনিশ্চিত নিঃসংশয়ে যে আপনি আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, তাহাকে না বলিয়া ফিরাইবে সে কিসের সঙ্কোচে, কোন্ বৃহত্তরের আশায়? কিন্তু তবু দ্বিধা জাগে, মন পিছু হটিতে চায়। সংস্কার কুণ্ঠা জানাইয়া বলে, সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিতা, স্বৈরাচারের কলঙ্ক-প্রলেপে সে মলিন। বন্ধু-সমাজে স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিবে সে কোন্ দুঃসাহসে? আবার তখনি মনে পড়ে প্রথম দিনের কথা—সেই হাসপাতালে যাওয়া। মৃতকল্প নারীর পাংশু পাণ্ডুর মুখ, মরণের নীল ছায়া তাহার ওষ্ঠে, কপোলে,

নিমীলিত চোখের পাতায় পাতায়—গাড়ির বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়া আসে পথের আলো—তার পরে যমে-মানুষে সে কি লড়াই! কি দুঃখে সেই প্রাণ ফিরিয়া পাওয়া! এ-সব কথা ভুলিবে রাখাল কি করিয়া? কি করিয়া ভুলিবে সে তাহারি হাতে সারদার সমস্ত সমর্পণ। সেই দু'চোখের জল মুছিয়া বলা—আর আমি মরবো না দেব্‌তা আপনার হুকুম না নিয়ে। সেদিন জবাবে রাখাল বলিয়াছিল—অঙ্গীকার মনে থাকে যেন চিরদিন।

সেই দাসী আসিয়া বলিল, রাজুবাবু, মা ডাকচেন আপনাকে।

আমাকে? চকিত হইয়া রাখাল উঠিয়া বসিল। হাত দিয়া দেখিল চোখের জল গড়াইয়া বালিশের অনেকখানি ভিজিয়া উঠিয়াছে, তাড়াতাড়ি সেটা উলটাইয়া রাখিয়া সে উপরে গিয়া নতুন-মার পায়ের ধূলা লইয়া অদূরে উপবেশন করিল। এতদিন না আসার কথা, তাহার অসুখের কথা, কিছুই নতুন-মা উল্লেখ করিলেন না, শুধু স্নেহার্দ্র স্নিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, ভালো আছো বাবা?

রাখাল মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া বলিল, একটা মস্ত বড় অপরাধ হয়ে গেছে মা, আমাকে মার্জনা করতে হবে। কয়েকদিন জ্বরে ভুগলুম, আপনাকে খবর দিতে পারিনি।

নতুন-মা কোন উত্তর না দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। রাখাল বলিতে লাগিল, ওটা ইচ্ছে করেও না, আপনাদের আঘাত দিতেও না। মনে পড়ে মা, একদিন যত জ্বালাতন আমি করেছি তত আপনার রেণুও না। তার পরে হঠাৎ একদিন পৃথিবী গেল বদলে—সংসারে এত ঝড়-বাদল যে তোলা ছিল সে তখনি শুধু টের পেলুম। ঠাকুরঘরে গিয়ে কেঁদে বলতুম, গোবিন্দ, আর ত সইতে পারিনে, আমাদের মাকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমার প্রার্থনা এতদিনে ঠাকুর মঞ্জুর করেছেন। আমার সেই মাকেই করবো অসম্মান এমন কথা আপনি কি করে ভাবতে পারলেন মা?

এবার নতুন-মা আস্তে আস্তে বলিলেন, তবে কিসের অভিমানে খবর দাওনি বাবা? দরোয়ানকে পাঠিয়ে যখন খোঁজ নিতে গেলুম তখন কিছু করবারই আর পথ রাখোনি।

রাখাল সহাস্যে কহিল, সেটা শুধু ভুলের জন্যে। অভ্যাস ত নেই। দুঃখের দিনে মনেই পড়ে না মা, ত্রিসংসারে আমার কোথায় কেউ আছে।

নতুন-মা উত্তর দিলেন না—কেবল তাহার একটা হাত ধরিয়া আরো কাছে টানিয়া আনিয়া গভীর স্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিলেন।

সারদা আড়াল হইতে বোধ হয় শুনিতেছিল, সুমুখে আসিয়া বলিল, দেব্‌তাকে খেয়ে যেতে বলুন না মা, সেই ত বাসায় গিয়ে ওঁকে নিজেই রাঁধতে হবে।

নতুন-মা বলিলেন, আমি কেন সারদা, তুমি নিজেই ত বলতে পারো মা। তার পরে স্মিতহাস্যে কহিলেন, এই কথাটি ও প্রায় বলে রাজু। তোমাকে যে আপনি রাঁধতে হয় এ যেন ও সইতে পারে না—ওর বুকে বাজে। ওকে বাঁচিয়েছিলে একদিন এ কথা সারদা একটি দিন ভোলে না।

পলকের জন্য রাখাল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, এমন স্ত্রীকে যে কি করে তার স্বামী ফেলে দিয়ে গেলো আমি তাই শুধু ভাবি। যত অঘটন কি বিধাতা মেয়েদের ভাগ্যেই লিখে দেন! এবং বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মুখ দিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

সারদা কহিল, এইবার ওঁকে একটি বিয়ে করতে বলুন মা। আপনার আদেশকে উনি কখনো না বলতে পারবেন না।

সবিতা কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু রাখাল তাড়তাড়ি বাধা দিল। বলিল, তুমি আমাকে মোটে দু-চারদিন দেখচো, কিন্তু উনি করেচেন আমাকে মানুষ—আমার ধাত চেনেন। বেশ জানেন, ওর না আছে বাড়িঘর, না আছে আত্মীয়-স্বজন, না আছে উপার্জন করার শক্তি-সামর্থ্য। ও বড় অক্ষম, কোনমতে ছেলে পড়িয়ে দু'বেলা দুটো অন্নের উপায় করে। ওকে মেয়ে দেওয়া শুধু মেয়েটাকে জবাই করা। এমন অন্যায় আদেশ মা কখনো দেবেন না।

সারদা বলিল, কিন্তু, দিলে?

রাখাল বলিল, দিলে বুঝবো এ আমার নিয়তি।

ঠাকুর আসিয়া খবর দিলো খাবার তৈরী হইয়াছে। রাখাল বুঝিল, এ আয়োজন সারদা উপরে আসিয়াই করিয়াছে।

বহুকালের পরে সবিতা তাহাকে খাওয়াইতে বসিলেন। বলিলেন, রাজু, তারক যেখানে চাকরি করে সে গ্রামটি নাকি একেবারে দামোদরের তীরে। আমাকে ধরেছে দিন-কয়েক গিয়ে তার ওখানে থাকি। স্থির করেচি যাবো।

প্রস্তাব করে সে চিঠি লিখেচে নাকি?

চিঠিতে নয়, দিন-দুয়েক ছুটি নিয়ে সে নিজে এসেছিল বলতে। বড় ভালো ছেলে। যেমন বিনয়ী তেমনি বিদ্বান। সংসারে ও উন্নতি করবেই।

রাখাল সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তারক এসেছিলো কলকাতায়? কৈ আমি ত জানিনে!

সবিতা বলিলেন, জানো না? তবে বোধ করি দেখা করার সময় করতে পারেনি। শুধু দুটো দিনের ছুটি কিনা!

রাখাল আর কিছু বলিল না। মাথা হেঁট করিয়া অন্নের গ্রাস মাখিতে লাগিল। তাহার মনে পড়িল অসুখের পূর্বের দিনই সে তারককে একখানা পত্র লিখিয়াছে; তাহাতে বলিয়াছে, ইদানীং শরীরটা কিছু মন্দ চলিতেছে, তাহার সাধ হয় দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া পল্লীগ্রামে গিয়া বন্ধুর বাড়িতে কাটাইয়া আসে। সে চিঠির জবাব এখনো আসে নাই।

তের

সেদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পরে বাসায় ফিরিবার সময়ে সারদা সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, ভারী অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিল, আমার বড় ইচ্ছে আপনাকে একদিন নিজে রেঁধে খাওয়াই। খাবেন একদিন দেব্‌তা?

খাবো বৈ কি। যেদিন বলবে।

তবে পরশু। এমনি সময়ে। চুপি চুপি আমার ঘরে আসবেন, চুপি চুপি খেয়ে চলে যাবেন। কেউ জানবে না, কেউ শুনবে না।

রাখাল সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, চুপি চুপি কেন? তুমি আমাকে খাওয়াবে এতে দোষ কি?

সারদাও হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, দোষ ত খাওয়ার মধ্যে নেই দেব্‌তা, দোষ আছে চুপি চুপি খাওয়ানোর মধ্যে। অথচ নিজে ছাড়া আর কাউকে না জানতে দেবার লোভ যে ছাড়তে পারিনি।

সত্যি পারো না, না বলতে হয় তাই বলচো?

অত জেরার জবাব আমি দিতে পারবো না, বলিয়া সারদা হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

রাখলের বুকের কাছটা শিহরিয়া উঠিল, বলিল, বেশ, তাই হবে—পরশুই আসবো। বলিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িল।

সেই পরশু আজ আসিয়াছে। রাত্রি বেশী নয়, বোধ হয় আটটা বাজিয়াছে। সকলেই কাজে ব্যস্ত, রাখালকে বোধ হয় কেহ লক্ষ্য করিল না। রান্নার কাজ শেষ করিয়া সারদা চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, রাখালকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বিছানায় বসিতে দিল, বলিল, আমি ভেবেছিলুম হয়তো আপনার রাত হবে, কিংবা হয়তো ভুলেই যাবেন, আসবেন না।

ভুলে যাবো এ কখনো ভাবোনি সারদা, এ তোমার মিছে কথা।

সারদা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমার মিছে কথা। একবারও ভাবিনি আপনি ভুলে যাবেন। খেতে দিই?

দাও।

হাতের কাছে সমস্ত প্রস্তুত ছিল, আসন পাতিয়া সে খাইতে দিল। পরিমিত আয়োজন, বাহুল্য কিছুতেই নাই। রাখাল খুশী হইয়া বলিল, ঠিক এমনই আমি মনে মনে চেয়েছিলুম সারদা, কিন্তু আশা করিনি। ভেবেছিলুম আরও পাঁচজনের মতো যত্ন দেখানোর আতিশয্যে কত বাড়াবাড়িই না করবে। কত জিনিস হয়তো ফেলা যাবে। কিন্তু সে চেষ্টা তুমি করোনি। সারদা কহিল, জিনিস ত আমার নয় দেব্‌তা, আপনার। নিজের হলে বাড়াবাড়ি করতে ভয় হোতো না, হয়তো করতুমও—নষ্টও হোতো।

ভালো বুদ্ধি তোমার!

ভালোই ত! নইলে আপনি ভাবতেন মেয়েটার অন্যায় ত কম নয়! দেনা শোধ করে না, আবার পরের টাকায় বাবুয়ানি করে।

রাখাল হাসিয়া বলিল, টাকার দাবী আমি ছেড়ে দিলুম সারদা, আর তোমাকে শোধ করতে হবে না, ভাবতেও হবে না। কেবল খাতাটা দাও, আমি ফিরে নিয়ে যাই।

সারদা কৃত্রিম গাম্ভীর্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, তা হলে ছাড়-রফা হয়ে গেল বলুন? এর পরে আপনিও টাকা চাইতে পাবেন না, আমিও না। অভাবে যদি মরি তবুও না কেমন?

রাখাল বলিল, তুমি ভারী দুষ্টু সারদা। ভাবি, জীবন তোমাকে ফেলে গেল কি করে? সে কি চিনতে পারলে না?

সারদা মাথা নাড়িয়া বলিল, না। এ আমার ভাগ্যের লেখা দেব্‌তা। স্বামী না, যিনি ভুলিয়ে আনলেন তিনি না, আর যিনি যমের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে এলেন তিনিও না। কি জানি আমি কি-যে কেউ চিনতেই পারে না।

একটুখানি থামিয়া বলিল, আমার স্বামীর কথা থাক, কিন্তু জীবনবাবুর কথা বলি। সত্যই আমাকে তিনি চিনতে পারেন নি। সে বুদ্ধিই তাঁর ছিল না।

রাখাল কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, বুদ্ধি থাকলে কি করা তাঁর উচিত ছিল?

উচিত ছিল পালিয়ে না যাওয়া। উচিত ছিল বলা, আর আমি পারিনে সারদা, এবার তুমি ভার নাও।

বললে ভার নিতে?

নিতুম বৈ কি। ভেবেচেন ভার নিতে পারে শুধু পুরুষে, মেয়েরা পারে না! পারে। আমি দেখিয়ে দিতুম কি করে সংসারের ভার নিতে হয়।

রাখাল বলিল, এতই যদি জানো ত আত্মহত্যা করতে গেলে কেন?

ভেবেছেন মেয়েরা বুঝি এইজন্যে আত্মহত্যা করে? এমনি বুদ্ধিই পুরুষদের। বলিয়াই সে তৎক্ষণাৎ হাসিয়া কহিল, আমি করেছিলুম আপনাকে দেখতে পাবো বলে। নইলে পেতুম না ত,—আজও থাকতেন আমার কাছে তেমনি অজানা।

রাখালের মুখে একটা কথা আসিয়া পড়িতেছিল, কিন্তু চাপিয়া গেল। তাহার আর কোন শিক্ষা না হোক, মেয়েদের কাছে সাবধানে কথা বলার শিক্ষা হইয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞসা করিল, দেব্‌তা, আপনি বিয়ে করেন নি কেন? সত্যি বলুন না?

রাখাল মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া বলিল, তোমার এ খবর জেনে লাভ কি?

সারদা বলিল, কি জানি কেন আমার ভারী জানতে ইচ্ছে করে। সেদিনও জিজ্ঞাসা করেছিলুম, আপনি যা-তা বলে কাটিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু আজ কিছুতে শুনবো না, আপনাকে বলতেই হবে।

রাখাল বলিল, সারদা, আমাদের সমাজে কারও বা বিয়ে হয়, কেউ বা নিজে বিয়ে করে। আমার হয়নি দেবার লোক ছিল না বলে। আর নিজে সাহস করিনি গরীব বলে। জানো ত, সংসারে আপনার বলতে আমার কিচ্ছু নেই।

সারদা রাগ করিয়া বলিল, এ আপনার অন্যায় কথা দেব্‌তা। গরীব বলে কি মানুষের বিয়ে হবে না? তার সে অধিকার নেই? জগতে তারা এমনি আসবে আর যাবে, কোথাও বাসা বাঁধবে

না? কিন্তু সে ত নয়, আসলে আপনি ভারী ভীতু লোক—কিচ্ছু সাহস নেই।

রাখাল তাহার উত্তাপ দেখিয়া হাসিয়া অভিযোগ স্বীকার করিয়া লইল, বলিল, হয়ত তোমার কথাই সত্যি, হয়ত সত্যিই আমি ভীতু মানুষ—অনিশ্চিত ভাগ্যের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে ভয় পাই।

কিন্তু ভাগ্য তো চিরকালই অনিশ্চিত দেব্‌তা, সে ছোটবড় বিচার করে না, আপন নিয়মে আপনি চলে যায়।

তা-ও জানি, কিন্তু আমি যা,—তাই। নিজেকে ত বদলাতে পারবো না সারদা।

না-ই বা পারলেন? যে স্ত্রী হয়ে আপনার পাশে আসবে বদলাবার ভার নেবে যে সে,—নইলে কিসের স্ত্রী? বিয়ে আপনাকে করতেই হবে।

করতেই হবে নাকি?

সারদা এবার কণ্ঠস্বরে অধিকতর জোর দিয়া বলিল, হাঁ করতেই হবে, নইলে কিছুতে আমি ছাড়বো না। এখুনি বলছিলেন কেউ ছিল না বলেই বিয়ে হয়নি, এতদিন আপনার সেই লোক এসেচি আমি। তাকে শিখিয়ে দিয়ে আসবো কি করে গরীবের ঘর চলে, কি করে সেখানেও যা-কিছু পাবার সব পাওয়া যায়। কাঙালের মতো আকাশে হাত পেতে কেবল হায় হায় করে মরার জন্যেই ভগবান গরীবের সৃষ্টি করেন নি, এ বিদ্যে তাকে দিয়ে আসবো।

তাহার কথা শুনিয়া রাখাল মনে মনে সত্যিই বিস্ময়াপন্ন হইল, কিন্তু মুখে বলিল, এ বিদ্যে শিখতে যদি সে না পারে—শিখতে না যদি চায়, তখন আমার দুঃখের ভার নেবে কে সারদা? কার কাছে গিয়ে নালিশ জানাবো?

সারদা অবাক হইয়া রাখালের মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কারো কাছে না। মেয়েমানুষ হয়ে এ কথা সে বুঝবে না, স্বামীর দুঃখের অংশ নেবে না, বরঞ্চ তাকে বাড়িয়ে তুলবে এমন হতেই পারে না দেব্‌তা। এ আমি কিছুতে বিশ্বাস করবো না।

আর একবার রাখাল জিহ্বাকে শাসন করিল, বলিল না যে, মেয়েদের আমি কম দেখিনি সারদা, কিন্তু তারা তুমি নয়। সারদাকে সবাই পায় না।

জবাব না দিয়া রাখাল নিঃশব্দে আহারে মন দিয়াছে, দেখিয়া সে পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল, কৈ কিছুই ত বললেন না দেব্‌তা।

এবার রাখাল মুখ তুলিয়া হাসিল, বলিল, সব প্রশ্নের উত্তর বুঝি তখনি মেলে? ভাবতে সময় লাগে যে!

সময় ত লাগে, কিন্তু কত লাগে শুনি?

সে কথা আজই বলবো কি করে সারদা? যেদিন নিজে পাবো, উত্তর তোমাকেও জানাবো সেদিন।

সেই ভালো, বলিয়া সারদা চুপ করিল। ঘরের মধ্যে একজন নীরবে ভোজন করিতেছে, আর একজন তেমনি নীরবে চাহিয়া আছে। খাওয়া প্রায় শেষ হয় এমন সময়ে একটা ঘন নিঃশ্বাসের শব্দে চকিত হইয়া রাখাল চোখ তুলিয়া কহিল, ও কি?

সারদা সলজ্জ মৃদু হাসিয়া বলিল, কিছু না ত! একটু পরে বলিল, পরশু বোধ হয় আমরা হরিণপুরে যাচ্ছি। দেব্‌তা।

পরশু? তারকের ওখানে?

হাঁ। কাল শনিবার, তারকবাবু রাতের গাড়িতে আসবেন, পরের দিন রবিবারে আমাদের নিয়ে যাবেন।

যাওয়া স্থির হোলো কি ক'রে?

কাল নিজেই তিনি এসেছিলেন।

তারক এসেছিল কলকাতায়? কৈ, আমার সঙ্গে ত দেখা করেনি!

একদিন বৈ তো ছুটি নয়—দুপুরবেলায় এলেন, আবার সন্ধ্যার গাড়িতেই ফিরে গেলেন।

একটু পরে বলিল, বেশ লোক। উনি খুব বিদ্বান, না?

রাখাল সায় দিয়া কহিল, হাঁ।

ওঁর মতো আপনিও কেন বিদ্বান হননি দেব্‌তা?

রাখাল হাত দিয়া নিজের কপালটা দেখাইয়া বলিল, এখানে লেখা ছিল বলে।

সারদা বলিতে লাগিল, আর শুধু বিদ্যেই নয়, যেমন চেহারা তেমনি গায়ের জোর। বাজার থেকে অনেক জিনিস কাল কিনেছিলেন—মস্ত ভারী বোঝা—যাবার সময় নিজে তুলে গাড়িতে গিয়ে রাখলেন। আপনি কখনো পারতেন না দেব্‌তা।

রাখাল স্বীকার করিল, না, আমি পারতাম না সারদা—আমার গায়ে জোর নেই—আমি বড় দুর্বল।

কিন্তু এ-ও কি কপালের লেখা? তার মানে আপনি কখনো চেষ্টা করেন নি। তারকবাবু বলছিলেন, চেষ্টায় সমস্ত হয়, সব-কিছু সংসারে মেলে।

এ কথায় রাখাল হাসিয়া বলিল, কিন্তু সেই চেষ্টাটাই যে কোন্ চেষ্টায় মেলে তাকে জিজ্ঞেসা করলে না কেন? তার জবাবটা হয়তো আমার কাজে লাগতো।

শুনিয়া সারদাও হাসিল, বলিল, বেশ জিজ্ঞেসা করবো; কিন্তু এ কেবল আপনার কথার ঘোর-ফের,—আসলে সত্যিও নয়, তাঁর জবাবও আপনার কোন কাজে লাগবে না। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁর ওপর আপনি রাগ করে আছেন—না?

রাখাল সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, আমি রাগ করে আছি তারকের ওপর? এ সন্দেহ তোমার হলো কি করে?

কি জানি কি করে হলো, কিন্তু হয়েচে তাই বললুম।

রাখাল চুপ করিয়া রহিল, আর প্রতিবাদ করিল না।

সারদা বলিতে লাগিল, তাঁর ইচ্ছে নয় আর গ্রামে থাকা। একটা ছোট্ট জায়গায় ছোট্ট ইস্কুলে ছেলে পড়িয়ে জীবন ক্ষয় করতে তিনি নারাজ। সেখানে বড় হবার সুযোগ নেই, সেখানে শক্তি হয়েচে সঙ্কুচিত, বুদ্ধি রয়েচে মাথা হেঁট করে, তাই শহরে ফিরে আসতে চান। এখানে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো তাঁর কাছে কিছুই শক্ত নয়।

রাখাল আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কথাগুলো কি তোমার, না তার সারদা?

না আমার নয়, তাঁরই মুখের কথা। মাকে বলছিলেন আমি শুনেচি।

শুনে নতুন-মা কি বললেন?

শুনে মা খুশীই হলেন। বললেন, তার মতো ছেলের গ্রামে পড়ে থাকা অন্যায়। থাকতে যেন না হয় এ তিনি করবেন।

করবেন কি করে?

সারদা বলিল, শক্ত নয় ত দেব্‌তা। মা বিমলবাবুকে বললে না হতে পারে এমন কিছু নেই।

শুনিয়া রাখাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অর্থাৎ, জিজ্ঞাসা করিতে চাহিল ইহার তাৎপর্য কি?

সারদা বুঝিল আজও রাখাল কিছুই জানে না। বলিল, খাওয়া হয়ে গেছে, হাত ধুয়ে এসে বসুন আমি বলচি।

মিনিট-কয়েক পরে হাতমুখ ধুইয়া সে বিছানায় আসিয়া বসিল। সারদা তাহাকে জল দিল, পান দিল, তার পরে অদূরে মেঝের উপরে বসিয়া, রমণীবাবু চলে গেছেন আপনি জানেন?

চলে গেছেন? কৈ না! কোথায় গেছেন?

কোথায় গেছেন সে তিনিই জানেন, কিন্তু এখানে আর আসেন না। যেতে তাঁকে হতোই—এ ভার বইবার আর তাঁর জোর ছিল না—কিন্তু গেলেন মিথ্যে ছল করে। এতখানি ছোট হয়ে বোধ

করি আমার কাছে থেকে জীবনবাবুও যাননি। এই বলিয়া সে সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, এ ঘটতোই কিন্তু উপলক্ষ্য হলেন আপনি। সেই যে রেণুর অসুখে পরের নামে টাকা ভিক্ষে চাইতে এলেন, আর না পেয়ে অভুক্ত চলে গেলেন, এ অন্যায় মাকে ভেঙ্গে গড়লো, এ ব্যথা তিনি আজও ভুলতে পারলেন না। আমাকে ডেকে বললেন, সারদা রাজুকে আজ আমার চাই-ই নইলে বাঁচবো না। এসো তুমি আমার সঙ্গে। যা-কিছু মায়ের ছিল পুঁটুলিতে বেঁধে নিয়ে আমরা লুকিয়ে গেলুম আপনার বাসায় তার পরে গেলুম ব্রজবাবুর বাড়ি, কিন্তু সব খালি সব শূন্য! নোটিশ ঝুলছে বাড়ি ভাড়া দেবার। জানা গেল না কিছুই, বুঝা গেল শুধু কোথায় কোন্ অজানা গৃহে মেয়ে তাঁর পীড়িত, অর্থ নেই ওষুধ দেবার, লোক নেই সেবা করার। হয়তো বেঁচে আছে, হয়তো বা নেই। অথচ উপায় নেই সেখানে যাবার—পথের চিহ্ন গেছে নিঃশেষে মুছে।

মাকে নিয়ে ফিরে এলুম। তখন বাইরের ঘরে চলেছে খাওয়া-দাওয়া নাচ-গান আনন্দ-কলরব। করবার কিছু নেই, কেবল বিছানায় শুয়ে দু'চোখ বেয়ে তাঁর অবিরল জল পড়তে লাগলো। শিয়রে বসে নিঃশব্দে শুধু মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম—এ-ছাড়া সান্ত্বনা দেবার তাঁকে ছিলই বা আমার কি!

সেদিন বিমলবাবু ছিলেন সামান্য-পরিচিত আমন্ত্রিত অতিথি, তাঁরই সম্মাননার উদ্দেশ্যে ছিল আনন্দ-অনুষ্ঠান। রমণীবাবু এলেন ঘরের মধ্যে তেড়ে, বললেন চলো সভায়। মা বললেন, না, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, বিমলবাবু কোটীপতি ধনী, তিনি আমার মনিব, নিজে আসবেন এই ঘরে দেখা করতে। মা বললেন, না, সে হবে না। এতে অতিথির কত যে অসম্মান সে কথা মা না জানতেন তা নয়, কিন্তু অনুশোচনায়, ব্যথায়, অন্তরের গোপন ধিক্কারে তখন মুখ দেখানো ছিল বোধ করি অসম্ভব। কিন্তু দেখাতে হলো। বিমলবাবু নিজে এসে ঢুকলেন ঘরে। প্রশান্ত সৌম্য মূর্তি, কথাগুলি মৃদু, বললেন, অনধিকার-প্রবেশের অন্যায় হলো বুঝি, কিন্তু যাবার আগে না এসেও পারলাম না। কেমন আছেন বলুন? মা বললেন, ভালো আছি। তিনি বললেন, ওটা রাগের কথা, ভালো আপনি নেই। কিছুকাল আগে ছবি আপনার দেখেচি সশরীরে। কত যে প্রভেদ সে আমিই বুঝি। এ চলতে পারে না, শরীর ভালো আপনাকে করতেই হবে। যাবেন একবার সিঙ্গাপুরে? সেখানে আমি থাকি—সমুদ্রের কাছাকাছি একটা বাড়ি আছে আমার। হাওয়ারও শেষ নেই, আলোরও সীমা নেই। পূর্বের দেহ আবার ফিরে আসবে,—চলুন।

মা শুধু জবাব দিলেন, না।

না কেন? প্রার্থনা আমার রাখবেন না?

মা চুপ করে রইলেন। যাবার উপায় ত নেই, মেয়ে যে পীড়িত, স্বামী যে গৃহহীন।

সেদিন রমণীবাবু ছিলেন মদ খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ, জ্বলে উঠে বললেন, যেতেই হবে। আমি হুকুম করচি যেতে হবে তোমাকে।

না, আমি যেতে পারবো না।

তার পরে শুরু হলো, অপমান আর কটু কথার ঝড়। সে যে কত কটু আমি বলতে পারবো না দেব্‌তা। ঘূর্ণি হাওয়ায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জড়ো করে তুললে যেখানে যত ছিল নোংরামির আবর্জনা—প্রকাশ পেতে দেরি হলো না যে, মা ও-লোকটার স্ত্রী নয়—রক্ষিতা। সতীর মুখোশ পরে ছদ্মবেশে রয়েচে শুধু একটা গণিকা। তখন আমি একপাশে দাঁড়িয়ে, নিজের কথা মনে করে ভাবলুম, পৃথিবী দ্বিধা হও। মেয়েদের এ-যে এতবড় দুর্গতি তার আগে কে জানতো দেব্‌তা?

রাখাল নিষ্পলক-চক্ষে এতক্ষণ তাহার প্রতি চাহিয়াছিল, এবার ক্ষণিকের জন্য একবার চোখ ফিরাইল।

সারদা বলিতে লাগিল, মা স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন যেন পাথরের মূর্তি! রমণীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, যাবে কিনা বলো? ভাবচো কি বসে?

মার কণ্ঠস্বর পূর্বের চেয়েও মৃদু হয়ে এলো, বললেন, ভাবচি কি জানো সেজবাবু, ভাবচি শুধু বারো বছর তোমার কাছে আমার কাটলো কি করে? ঘুমিয়ে কি স্বপ্ন দেখছিলুম? কিন্তু আর না, ঘুম আমার ভেঙ্গেচে। আর তুমি এসো না এ-বাড়িতে, আর যেন না আমরা কেউ কারো মুখ দেখতে পাই। বলতে বলতে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন ঘৃণায় বার বার শিউরে উঠলো।

রমণীবাবু এবার পাগল হয়ে গেলেন, বললেন, এ-বাড়ি কার? আমার। তোমাকে দিইনি।

মা বললেন, সেই ভালো যে তুমি দাওনি। এ-বাড়ি আমার নয় তোমারই। কালই ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাবো। কিন্তু এ জবাব রমণীবাবু আশা করেন নি, হঠাৎ মার মুখের পানে চেয়ে তাঁর চৈতন্য হলো—ভয় পেয়ে নানাভাবে তখন বোঝাতে চাইলেন এ শুধু রাগের কথা, এর কোন মানে নেই।

মা বললেন, মানে আছে সেজবাবু। সম্বন্ধ আমাদের শেষ হয়েচে, কিছুতেই সে আর ফিরবে না।

রাত্রি হয়ে এলো, রমণীবাবু চলে গেলেন। যে উৎসব সকালে এত সমারোহে আরম্ভ হয়েছিল সে যে এমনি করে শেষ হবে তা কে ভেবেছিল।

রাখাল কহিল, তারপরে?

সারদা বলিল, এগুলো ছোট, কিন্তু তার পরেরটাই বড় কথা দেব্‌তা। বিমলবাবুর অভ্যর্থনা বাইরের দিক দিয়ে সেদিন পণ্ড হয়ে গেল বটে, কিন্তু অন্তরের দিক দিয়ে আর এক রূপে সে ফিরে এলো। মার অপমান তাঁর কি-যে লাগলো—তিনি ছিলেন পর—হলেন একান্ত আত্মীয়। আজ তাঁর চেয়ে বন্ধু আমাদের নেই। রমণীবাবুকে টাকা দিয়ে তিনি বাড়ি কিনে নিয়ে মাকে ফিরিয়ে দিলেন, নইলে আজ আমাদের কোথায় যেতে হতো কে জানে।

কিন্তু এই খবরটা রাখালকে খুশী করিতে পারিল না, তাহার মন যেন দমিয়া গেল। বলিল, বিমলবাবুর অনেক টাকা, তিনি দিতে পারেন। এ হয়তো তাঁর কাছে কিছুই নয়—কিন্তু নতুন-মা নিলেন কি করে? পরের কাছে দান নেওয়া ত তাঁর প্রকৃতি নয়!

সারদা বলিল, হয়তো তিনি আর পর নয়, হয়তো নেওয়ার চেয়ে না নেওয়ার অন্যায় হতো ঢের বেশী।

রাখাল বলিল, এ ভাবে বুঝতে শিখলে সুবিধে হয় বটে, কিন্তু বোঝা আমার পক্ষে কঠিন। এই বলিয়া এবার সে জোর করিয়া হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, রাত হলো, আমি চললুম। তোমরা ফিরে এলে আবার হয়তো দেখা হবে।

সারদা তড়িৎবেগে উঠিয়া পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল, বলিল, না, এমন করে হঠাৎ চলে যেতে আমি কখনো দেবো না।

তুমি হঠাৎ বলো কাকে? রাত হলো যে—যাবো না?

যাবেন জানি, কিন্তু মার সঙ্গে দেখা করেও যাবেন না?

আমাকে তাঁর কিসের প্রয়োজন? দেখা করার শর্তও ত ছিল না। চুপি চুপি এসে তেমনি চুপি চুপি চলে যাবো এই ত ছিল কথা।

সারদা বলিল না, সে শর্ত আর আমি মানবো না। দেখার প্রয়োজন নেই বলচেন? মার নিজের না থাক আপনারও কি নেই?

রাখাল বলিল, যে প্রয়োজন আমার সে রইলো অন্তরে—সে কখনো ঘুচবে না,—কিন্তু বাইরের প্রয়োজন আর দেখতে পাইনে সারদা।

চাপিবার চেষ্টা করিয়াও গূঢ় বেদনা সে চাপা দিতে পারিল না, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়িল। তাহার মুখের প্রতি চোখ পাতিয়া সারদা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তার পরে ধীরে ধীরে বলিল, আজ একটা প্রার্থনা করি দেব্‌তা, ক্ষুদ্রতা ঈর্ষা আর যেখানেই থাক আপনার মনে যেন না থাকে। দেব্‌তা বলে ডাকি, দেব্‌তা বলেই যেন চিরদিন ভাবতে পারি। চলুন মার কাছে, আপনি না বললে

যে তাঁর যাওয়া হবে না।

আমি না বললে যাওয়া হবে না? তার মানে?

মানে আমিও জিজ্ঞাসা করেছিলুম। মা বললেন, ছেলে বড় হলে তার মত নিতে হয় মা। জানি, রাজু বারণ করবে না, কিন্তু সে হুকুম না দিলেও যেতে পারবো না সারদা।

এ কথা শুনিয়া রাখাল নিরুত্তরে স্তব্ধ হইয়া রহিল। বুকের মধ্যে যে জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল তাহা নিভিতে চাহিল না, তথাপি দু'চোখ অশ্রু-সজল হইয়া আসিল, বলিল, তাঁর কাছে সহজে যেতে পারি এ সাহস আজ মনের মধ্যে খুঁজে পাইনে সারদা, কিন্তু বলো তাঁকে, কাল আসবো পায়ের ধূলো নিতে। বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল, উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিল না।

চোদ্দ

তারক আসিয়াছে লইতে। আজ শনিবারের রাত্রিটা সে এখানে থাকিয়া কাল দুপুরের ট্রেনে নতুন-মাকে লইয়া যাত্রা করিবে। সঙ্গে যাইবে জন-দুই দাসী-চাকর এবং সারদা। তাহার হরিণপুরের বাসাটা তারক সাধ্যমতো সুব্যবস্থিত করিয়া আসিয়াছে। পল্লীগ্রামে নগরের সকল সুবিধা পাইবার নয়, তথাপি আমন্ত্রিত অতিথিদের ক্লেশ না হয়, তাঁহাদের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রায় এখানে আসিয়া বিপর্যয় না ঘটে, এদিকে তাহার খর দৃষ্টি ছিল। আসিয়া পর্যন্ত বারে বারে সেই আলোচনাই হইতেছিল। নতুন-মা যতই বলেন, আমি গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে বাবা, পাড়াগাঁয়েই জন্মেচি, আমার জন্যে তোমার ভাবনা নেই। তারক ততই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলে, বিশ্বাস করতে মন চায় না মা, যে-কষ্ট সাধারণ দশজনের সহ্য হয় আপনারও তা সইবে। ভয় হয়, মুখে কিছুই বলবেন না, কিন্তু ভেতরে ভেতরে শরীর ভেঙ্গে যাবে।

ভাঙ্গবে না তারক, ভাঙ্গবে না। আমি ভালোই থাকবো।

তাই হোক মা। কিন্তু দেহ যদি ভাঙ্গে আপনাকে আমি ক্ষমা করবো না তা বলে রাখচি।

নতুন-মা হাসিয়া বলিলেন, তাই সই। তুমি দেখো, আমি মোটা হয়ে ফিরে আসবো।

তথাপি পল্লীগ্রামের কত ছোট ছোট অসুবিধার কথা তারকের মনে আসে। নানাবিধ খাদ্য-সামগ্রী সে যথাসাধ্য ভালোই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু খাওয়াই ত সব নয়। গোটা-দুই জোর আলো চাই, রাত্রে চলাফেরায় উঠোনের কোথাও না লেশমাত্র ছায়া পড়িতে পারে। একটা ভালো ফিলটারের প্রয়োজন, খাবার বাসনগুলার কিছু কিছু অদল-বদল আবশ্যক। জানালার পর্দাগুলা কাচাইয়া রাখিয়াছে বটে, তবু নতুন গোটা-কয়েক কিনিয়া লওয়া দরকার। নতুন-মা চা খান না সত্য, কিন্তু কোনদিন ইচ্ছা হইতেও পারে। তখন ঐ কষ-লাগা কানা-ভাঙ্গা পাত্রগুলো কি কাজে আসিবে? এক-সেট নূতন চাই। আহ্নিকের সাজসজ্জা ত কিনিতেই হইবে। ভালো ধূপ পাড়াগাঁয়ে মিলে না—সে ভুলিলে চলিবে না। এমনি কত-কি প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ছোট-খাটো জিনিসপত্র সংগ্রহ করিতে সে বাজারে চলিয়া গেছে, এখনো ফিরে নাই।

বাক্স-বিছানা বাঁধাছাঁদা চলিতেছে, কালকের জন্য ফেলিয়া রাখার পক্ষপাতী সারদা নয়। বিমলবাবু আসিলেন দেখা করিতে। প্রত্যহ যেমন আসেন তেমনি। জিজ্ঞাসা করিলেন, নতুন-বৌ, কতদিন থাকবে সেখানে?

সবিতা বলিল, যতদিন থাকতে বলবে তুমি ততদিন। তার একটি মিনিটও বেশী নয়।

কিন্তু এ কথা কেউ শুনলে যে তার অন্য মানে করবে নতুন-বৌ!

অর্থাৎ নতুন-বৌয়ের নতুন কলঙ্ক রটবে, এই তোমার ভয়,—না? এই বলিয়া সবিতা একটুখানি হাসিল।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, ভয় ত আছেই। কিন্তু আমি সে হতে দেবো কেন?

দেবে না বলেই ত জানি, আর সেই ত আমার ভরসা। এতদিন নিজের খেয়াল আর বুদ্ধি দিয়েই চলে দেখলুম, এবার ভেবেচি তাদের ছুটি দেবো। দিয়ে দেখি কি মেলে, আর কোথায়

গিয়ে দাঁড়াই।

বিমলবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। সবিতা বলিতে লাগিল, তুমি হয়ত ভাবচো হঠাৎ এ বুদ্ধি দিলে কে? কেউ দেয়নি। সেদিন তুমি চলে গেলে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলুম পথের বাঁকে তোমার গাড়ি হলো অদৃশ্য, চোখের কাজ শেষ হলো, কিন্তু মন নিলে তোমার পিছু। সঙ্গে সঙ্গে কতদূর যে গেলো তার ঠিকানা নেই। ফিরে এসে ঘরে বসলুম—একলা নিজের মনে ছেলেবেলা থেকে সেই সে-দিন পর্যন্ত কত ভাবনাই এলো গেলো, হঠাৎ এক সময় আমার মন কি বলে উঠলো জানো? বললে, সবিতা, তোমার যৌবন গেছে রূপ ত আর নেই! তবুও যদি উনি ভালোবেসে থাকেন সে তাঁর মোহ নয়, সে সত্যি। সত্য কখনো বঞ্চনা করে না—তাকে তোমার ভয় নেই। যা নিজে মিথ্যে নয়, সে কিছুতে তোমার মাথায় মিথ্যে অকল্যাণ এনে দেবে না,—তাকে বিশ্বাস করো।

বিমলবাবু বলিলেন, তোমাকে সত্যি ভালোবাসতে পারি, এ তুমি বিশ্বাস করো নতুন-বৌ?

হাঁ করি। নইলে ত তোমার কোন দরকার ছিল না। আমার ত আর রূপ নেই।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, এমন ত হতে পারে আমার চোখে তোমার রূপের সীমা নেই। অথচ রূপ আমি সংসারে কম দেখিনি নতুন-বৌ।

শুনিয়া সবিতাও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য মানুষ তুমি! এ-ছাড়া আর কি বলবো তোমাকে?

বিমলবাবু বলিলেন, তুমি নিজেও কম আশ্চর্য নয় নতুন-বৌ! এই ত সেদিন এমন ক'রে ঠকলে, এতবড় আঘাত পেলে, তবু যে কি করে এত শীঘ্র আমাকে বিশ্বাস করলে আমি তাই শুধু ভাবি!

সবিতা কহিল, আঘাত পেয়েচি সত্যি, কিন্তু ঠকিনি। কুয়াশার আড়ালে একটানা দিনগুলো অবাধে বয়ে যাচ্ছিল এই তোমরা দেখেচো। হয়তো এমনিই চিরদিন বয়ে যেতো—যাবজ্জীবন দণ্ডিত কয়েদীর জীবন যেমন করে কেটে যায় জেলের মধ্যে, কিন্তু হঠাৎ উঠলো ঝড়, কুয়াশা গেল কেটে, জেলের প্রাচীর পড়লো ভেঙ্গেচুরে। বেরিয়ে এলুম অজানা পথের পরে, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি অপরিচিত বন্ধু, হাত বাড়িয়ে দিলে। এ-কে কি ঠকা বলে? কিন্তু কি বলে তোমাকে ডাকি বলো ত?

আমার নামটা বুঝি বলতে চাও না?

না, মুখে বাধে।

বিমলবাবু বলিলেন, ছেলেবেলায় আমার আর একটা নাম ছিল দিদিমার দেওয়া। তার ইতিহাস আছে। কিন্তু সে নামটা যে তোমার মুখে আরো বেশী বাধবে নতুন-বৌ!

কি বলো ত, দেখি যদি মনে ধরে।

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, পাড়ায় তারা ডাকতো আমাকে দয়াময় বলে।

সবিতা বলিল, নামের ইতিহাস জানতে চাইনে,—সে আমি বানিয়ে নেবো। ভারী পছন্দ হয়েচে নামটি—এখন থেকে আমিও ডাকবো দয়াময় বলে।

বিমলবাবু বলিলেন, তাই ডেকো। কিন্তু যা জিজ্ঞেসা করেছিলুম সে ত বললে না?

কি জিজ্ঞেসা করেছিলে দয়াময়?

এত শীঘ্র আমাকে ভালোবাসলে কি করে?

সবিতা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, ভালোবাসি এ কথা তো বলিনি। বলেচি, তুমি বন্ধু তোমাকে বিশ্বাস করি। বলেচি, যে ভালোবাসে তার হাত থেকে কখনো অকল্যাণ আসে না।

উভয়েই ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সবিতা কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, কিন্তু, আমার কথা শুনে চুপ করে রইলে যে তুমি? কিছু বললে না ত?

বিমলবাবু প্রত্যুত্তরে একটুখানি শুষ্ক হাসিয়া বলিলেন, বলবার কিছুই নেই নতুন-বৌ,—তুমি

ঠিক কথাই বলেচো। ভালোবাসার ধনকে সত্যিই কেউ আপন হাতে অমঙ্গল এনে দিতে পারে না। তার নিজের দুঃখ যতই হোক না, সইতে তাকে হবেই।

সবিতা কহিল, কেবল সইতে পারাই ত নয়। তুমি দুঃখ পেলে আমিও পাবো যে।

বিমলবাবু আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, পাওয়া উচিত নয় নতুন-বৌ। তবু যদি পাও, তখন এই কথা ভেবো যে, অকল্যাণের দুঃখ এর চেয়েও বেশী।

এ কথা কি তোমার পক্ষেও খাটে দয়াময়?

না, খাটে না। তার কারণ, আমার মনের মধ্যে তুমি কল্যাণের প্রতিমূর্তি, কিন্তু তোমার কাছে আমি তা নয়। হতেও পারিনে। কিন্তু সেজন্যে তোমাকে দোষও দিইনে, অভিমানও করিনে,জানি নানা কারণে এমনিই জগৎ। তুমি এলে আমার বিগত দিনের ত্রুটি যেতো ঘুচে, ভবিষ্যৎ হতো উজ্জ্বল, মধুর শান্ত, তার কল্যাণ ব্যাপ্ত হতো নানাদিকে—আমাকে করে তুলতো অনেক বড়—

কিন্তু আমি নিজে দাঁড়াবো কোন্‌খানে?

তুমি নিজে দাঁড়াবে কোন্‌খানে? বিমলবাবু একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, সে-ও বুঝতে পারি নতুন-বৌ। তুমি হয়ে যাবে অপরের চোখে ছোট, তারা বলবে তোমাকে লোভী, বলবে—আরও যে-সব কথা তা ভাবতেও আমার লজ্জা করে। অথচ, একান্ত বিশ্বাসে জানি একটি কথাও তার সত্য নয় তার থেকে তুমি অনেক দূরে—অনেক উপরে।

সবিতার চোখ সজল হইয়া আসিল। এমন সময়ে যে লোক মিথ্যা বলিতে পারিল না, তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দয়াময়, আমি আনবো তোমার জীবনে পরিপূর্ণ কল্যাণ, আর তুমি এনে দেবে আমাকে তেমনি পরিপূর্ণ অকল্যাণ,—এমন বিপরীত ঘটনা কি ক'রে সত্যি হয়? কি এর উত্তর?

বিমলবাবু বলিলেন, এর উত্তর আমার দেবার নয় নতুন-বৌ, আমার কাছে এই আমার বিশ্বাস। তোমার কাছেও এমনি বিশ্বাস যদি কখনো সত্য হয়ে দেখা দেয়, তখনি কেবল মনের দ্বন্দ্ব ঘুচবে, এর উত্তর পাবে,—তার আগে নয়।

সবিতা কহিল, উত্তর যদি কখনো না পাই সংশয় যদি না ঘোচে, তোমার বিশ্বাস এবং আমার বিশ্বাস যদি চিরদিন এমনি উলটো মুখেই বয়, তবু তোমাকে আমি দোষ দেবো না।

বিমলবাবু বলিলেন, যদি উলটো মুখেই বয়, তবু তোমাকে আমি দোষ দেবো না। তোমার ভার আজ আমার ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য, আমার আনন্দের সেবা। কিন্তু এ ঐশ্বর্য যদি কখনো ক্লান্তির বোঝা হয়ে দেখা দেয়, সেদিন তোমার কাছে আমি ছুটি চাইবো। আবেদন মঞ্জুর করো, বন্ধুর মতোই বিদায় নিয়ে যাবো,—কোথাও মালিন্যের চিহ্নমাত্র রেখে যাবো না তোমার কাছে এই শপথ করলাম নতুন-বৌ।

সবিতা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। মিনিট দুই-তিন পরে বিমলবাবু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, কি ভাবছো বলো ত?

ভাবচি সংসারে এমন ভয়ানক সমস্যার উদ্ভব হয় কেন? একের ভালবাসা যেখানে অপরিসীম অপরে তাকে গ্রহণ করবার পথ খুঁজে পায় না কেন?

বিমলবাবু হাসিয়া বলিলেন, খোঁজা সত্যি হলেই তবে পথ চোখে পড়ে, তার আগে নয়। নইলে অন্ধকারে কেবলি হাতড়ে মরতে হয়। সংসারে এ পরীক্ষা আমাকে বহুবার দিতে হয়েচে।

পথের সন্ধান পেয়েছিলে?

হাঁ। প্রার্থনায় যেখানে কপটতা ছিল না, সেখানেই পেয়েছিলাম।

তার মানে?

মানে এই যে, কামনায় দ্বিধা নেই, দুর্বলতা নেই, তাকে না-মঞ্জুর করার শক্তি কোথাও নেই। এরই আর এক নাম বিশ্বাস। সত্য বিশ্বাস জগতে ব্যর্থ হয় না নতুন-বৌ।

সবিতা কহিল, আমি যাই কেন না করি দয়াময়, তোমার নিজের চাওয়ার মধ্যে ত ছলনা নেই, তবে সে কেন আমার কাছে ব্যর্থ হলো?

বিমলবাবু বলিলেন, ব্যর্থ হয়নি নতুন-বৌ। তোমাকে চেয়েছিলাম বড় করে পেতে—সে আমি পেয়েছি। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাইনি তা মানি, কিন্তু নিজের যে বিশ্বাসকে আমি আজো দৃঢ়ভাবে ধরে আছি, লুব্ধতা-বশে, দুর্বলতা-বশে তাকে যদি ছোট না করি, আমার কামনা পূর্ণ হবেই একদিন। সেদিন তোমাকে পরিপূর্ণ করেই পাবো। আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না কেউ—তুমিও না।

সবিতা নীরবে চাহিয়া রহিল। যা অসম্ভব, কি করিয়া আর একদিন যে তাহা সম্ভব হইবে সে ভাবিয়া পাইল না। দয়াময়ের কাছে নীচু হইয়া বুকে হাঁটিয়া যাওয়ার পথ আছে, কিন্তু স্বচ্ছন্দে সোজা হইয়া চলার পথ কৈ?

সারদা আসিয়া বলিল, রাখালবাবু এসেছেন মা।

রাজু? কৈ সে?

এইত মা আমি, বলিয়া রাখাল প্রবেশ করিল। তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল, পরে বিমলবাবুকে নমস্কার করিয়া, মেঝেয় পাতা-গালিচার উপরে গিয়া বসিল।

সবিতা বলিলেন, তারক এসেছে আমাকে নিতে, কাল যাবো আমরা তার হরিণপুরের বাড়িতে। শুনেচো রাজু?

রাখাল কহিল, সারদার মুখে হঠাৎ শুনতে পেয়েছি মা।

হঠাৎ তো নয় বাবা। ওকে যে তোমার মত নিতে বলেছিলুম।

আমার মত কি আপনাকে জানিয়েছে সারদা?

সবিতা বলিলেন, না। কিন্তু জানি সে তোমার বন্ধু, তার কাছে যেতে তোমার আপত্তি হবে না।

রাখাল প্রথমটা চুপ করিয়া রহিল, তার পরে বলিল, আমার মতামতের প্রয়োজন নেই মা। আমার চেয়েও আপনাদের সে ঢের বড় বন্ধু।

এ কথায় সবিতা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে রাজু?

রাখাল কহিল, সমস্ত কথার মানে খুলে বলতে নেই মা, মুখের ভাষায় তার অর্থ বিকৃত হয়ে ওঠে। সে আমি বলবো না, কিন্তু আমার মতামতের পরেই যদি আপনাদের যাওয়া না যাওয়া নির্ভর করে তাহলে যাওয়া আপনাদের হবে না। আমার মত নেই।

সবিতা অবাক হইয়া বলিলেন, সমস্ত স্থির হয়ে গেছে যে রাজু! আমার কথা পেয়ে তারক জিনিসপত্র দোকানে কিনতে গেছে, আমাদের জন্যেই তার পল্লীগ্রামের বাসায় সকল প্রকারের ব্যবস্থা করে রেখে এসেছে—আমাদের যাতে কষ্ট না হয়—এখন না গিয়ে উপায় কি বাবা?

রাখাল শুষ্ক হাসিয়া বলিল, উপায় যে নেই সে আমি জানি। আমার মত নিয়ে আপনি কর্তব্য স্থির করবেন সে উচিতও নয়, প্রয়োজনও নয়। কাল সারদা বলছিলেন আপনি নাকি তাঁকে বলেছেন ছেলে বড় হলে তার মত নিয়ে তবে কাজ করতে হয়। আপনার মুখের এ কথা আমি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবো, কিন্তু যে ছেলের শুধু পরের বেগার খেটেই চিরকাল কাটলো, তার বয়েস কখনো বাড়ে না। পরের কাছেও না, মায়ের কাছেও না। আমি আপনার সেই ছেলে নতুন-মা।

সবিতা অধোমুখে নীরবে বসিয়া রহিলেন ; রাখাল বলিল, মনে দুঃখ করবেন না নতুন-মা, মানুষের অবজ্ঞার নীচে মানুষের ভার বয়ে বেড়ানোই আমার অদৃষ্ট। আপনারা চলে যাবার পরে আমার যদি কিছু করবার থাকে আদেশ করে যান, মায়ের আজ্ঞা আমি কোন ছলেই অবজ্ঞা করবো না।

সারদা চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সহসা সে যেন সহিতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আপনি

অনেকের অনেক কিছুই করেন, কিন্তু এমন করে মাকে খোঁটা দেওয়াও আপনার উচিত নয়।

সবিতা তাহাকে চোখের ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, সারদা বলে বলুক রাজু এমন কথা আমার মুখ দিয়ে কখনো বার হবে না।

রাখাল কহিল, তার মানে আপনি ত সারদা নয় মা। সারদাদের আমি অনেক দেখেচি, ওরা কড়া কথার সুযোগ পেলে ছাড়তে পারে না, তাতে কৃতজ্ঞতার ভারটা ওদের লঘু হয়। ভাবে দেনা-পাওনা শোধ হলো।

সবিতা মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না বাবা, ওকে তুমি বড্ড অবিচার করলে। সংসারে সারদা একটিই আছে, অনেক নেই রাজু।

সারদা মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল, নিঃশব্দে উঠিয়া চলিয়া গেল।

সবিতা মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেসা করিলেন, তারকের সঙ্গে কি তোমার ঝগড়া হয়েছে রাজু?

না মা, তার সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

আমাদের নিয়ে যাবার কথা তোমাকে জানায় নি সে?

কোনদিন না। সারদা বলে, আমার বাসাতে যাবার সে সময় পায় না। কিন্তু আর নয় মা, আমার যাবার সময় হলো, আমি উঠি। এই বলিয়া রাখাল উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিমলবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলেন নাই, এইবার কথা কহিলেন। সবিতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, তোমার ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেবে না নতুন-বৌ? এমনি অপরিচিত হয়েই দুজনে থাকবো?

সবিতা বলিলেন, ও আমার ছেলে এই ওর পরিচয়। কিন্তু তোমার পরিচয় ওর কাছে কি দেবো দয়াময়, আমিই নিজেই ত এখনো জানিনে।

যখন জানতে পারবে দেবে?

দেবো। ওর কাছে আমার গোপন কিছুই নেই। আমার সব দোষ-গুণ নিয়েই আমি ওর নতুন-মা।

রাখাল কহিল, ছেলেবেলায় যখন কেউ আমার আপনার রইলো না, তখন আমাকে উনি আশ্রয় দিয়েছিলেন, মানুষ করেছিলেন, মা বলে ডাকতে শিখিয়েছিলেন, তখন থেকে মা বলেই জানি। চিরদিনই মা বলেই জানবো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে আর একবার নতুন-মার পায়ের ধুলা লইল।

বিমলবাবু বলিলেন, তারকের ওখানে তোমার নতুন-মা যেতে চান কিছুদিনের জন্যে, এখানে ভালো লাগছে না বলে। আমি বলি যাওয়াই ভালো, তোমার সম্মতি আছে?

রাখাল হাসিয়া কহিল, আছে।

সত্যি বলো রাজু। কারণ তোমার অসম্মতিতে ওঁর যাওয়া হবে না। আমি নিষেধ করবো।

আপনার নিষেধ উনি শুনবেন?

অন্ততঃ নিজের কাছে নতুন-বৌ এই প্রতিজ্ঞাই করেছেন। এই বলিয়া বিমলবাবু একটুখানি হাসিলেন।

সবিতা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া বলিলেন, হাঁ এই প্রতিজ্ঞাই করেছি। তোমার আদেশ আমি লঙ্ঘন করবো না।

শুনিয়া রাখালের চোখের দৃষ্টি মুহূর্তকালের জন্য রুক্ষ হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি নিজেকে শান্ত করিয়া সহজ গলায় বলিল, বেশ, আপনারা যা ভালো বুঝবেন করুন, আমার আপত্তি নেই নতুন-মা। এই বলিয়া সে আর কোন প্রশ্নের পূর্বেই নীচে নামিয়া গেল।

নীচে পথের একধারে দাঁড়াইয়াছিল সারদা। সে সম্মুখে আসিয়া কহিল, একবার আমার ঘরে যেতে হবে দেবতা।

কেন?

সারদাদের অনেক দেখেচেন বললেন। আপনার কাছে তাদের পরিচয় নেবো।

কি হবে নিয়ে?

মেয়েদের প্রতি আপনার ভয়ানক ঘৃণা। কৃতজ্ঞতার ঋণ তারা কি দিয়ে শোধ করে আপনার কাছে বসে তার গল্প শুনবো।

রাখাল বলিল, গল্প করবার সময় নেই, আমার কাজ আছে।

সারদা বলিল, কাজ আমারও আছে। কিন্তু আমার ঘরে যদি আজ না যান, কাল শুনতে পাবেন সারদারা অনেক ছিল না, সংসারে কেবল একটিই ছিল।

তাহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক পরিবর্তনে রাখাল স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল সেই প্রথম দিনটির কথা—যেদিন সারদা মরিতে বসিয়াছিল।

সারদা জিজ্ঞাসা করিল, বলুন কি করবেন?

রাখাল কহিল, থাক কাজ। চলো তোমার ঘরে যাই।

পনর

সারদার ঘরে আসিয়া রাখাল বিছানায় বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, ডেকে আনলে কেন?

সারদা বলিল, যাবার আগে আর একবার আপনার পায়ের ধুলো আমার ঘরে পড়বে বলে।

ধুলো ত পড়লো, এবার উঠি?

এতই তাড়া? দুটো কথা বলবারও সময় দেবেন না?

সে-দুটো কথা ত অনেকবার বলেছো সারদা। তুমি বলবে দেব্‌তা, আপনি আমার প্রাণ রক্ষে করেচেন, কুড়ি-পঁচিশটে টাকা দিয়ে চাল-ডাল কিনে দিয়েছেন, নতুন-মাকে বলে বাকী বাড়িভাড়া মাফ করিয়ে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, যতদিন বাঁচবো আপনার ঋণ পরিশোধ করতে পারবো না। এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। তবু যদি যাবার পূর্বে আর একবার বলতে চাও বলে নাও। কিন্তু একটু চটপট করো, আমার বেশী সময় নেই।

সারদা কহিল, কথাগুলো নতুন না হোক ভারী মিষ্টি। যতবার শোনা যায় পুরোনো হয় না—ঠিক না দেব্‌তা?

হাঁ ঠিক। মিষ্টি কথা তোমার মুখে আরো মিষ্টি শুনোয়, আমি অস্বীকার করিনে। সময় থাকলে বসে বসে শুনতুম। কিন্তু সময় হাতে নেই। এখুনি যেতে হবে।

গিয়ে রাঁধতে হবে?

হাঁ।

তারপরে খেয়ে শুতে হবে?

হাঁ।

তারপরে চোখে ঘুম আসবে না, বিছানায় পড়ে সারা রাত ছটফট করতে হবে,—না দেব্‌তা?

এ তোমাকে কে বললে?

কে বললে জানেন? যে-সারদা সংসারে কেবল একটিই আছে অনেক নেই,—সে-ই।

রাখাল বলিল, তা হলে সে-সারদাও তোমাকে ভুল বলেছে। আমি এমন কোন অপরাধ করিনে যে, দুশ্চিন্তায় বিছানায় পড়ে ছটফট করতে হয়। আমি শুই আর ঘুমোই। আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

সারদা কহিল, বেশ আর ভাববো না। আপনার কথাই শুনবো, কিন্তু আমিই বা কোন্ অপরাধ করেছি যার জন্যে ঘুমোতে পারিনে—সারারাত জেগে কাটাই?

সে তুমিই জানো।

আপনি জানেন না?

না। পৃথিবীতে কোথায় কার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্চে এ জানা সম্ভবও নয়, সময়ও নেই। সময়

নেই—না? এই বলিয়া সারদা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আচ্ছা দেব্‌তা, আপনি এত ভীতু মানুষ কেন? কেন বলচেন, না, সারদা হরিণপুরে তোমার যাওয়া হবে না। নতুন-মার ইচ্ছে হয় তিনি যান, কিন্তু তুমি যাবে না। তোমার নিষেধ রইলো। এইটুকু বলা কি এতই শক্ত?

ইহার উত্তরে কি বলা উচিত রাখাল ভাবিয়া পাইল না, তাই কতকটা হতবুদ্ধির মতোই কহিল, তোমরা স্থির করেচো যাবে, খামকা আমি বারণ করতে যাবো কিসের জন্যে?

সারদা কহিল, কেবল এই জন্যে যে, আপনার ইচ্ছে নয় আমি যাই। এই ত সবচেয়ে বড় কারণ দেব্‌তা।

না, কোন-একজনের খেয়ালটাকেই কারণ বলে না। তোমাকে নিষেধ করার আমার অধিকার নেই।

সারদা কহিল, হোক খেয়াল, সেই আপনার অধিকার। বলুন মুখ ফুটে, সারদা হরিণপুরে তুমি যেতে পাবে না।

রাখাল মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, অন্যায় অধিকার আমি কারো পরেই খাটাই নে।

রাগ করে বলছেন না ত?

না, আমি সত্যিই বলচি।

সারদা তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপরে বলিল, না, এ সত্যি নয়,—কোনমতেই সত্যি নয়। আমাকে বারণ করুন দেব্‌তা, আমি মাকে গিয়ে বলে আসি, আমার হরিণপুরে যাওয়া হবে না, দেব্‌তা নিষেধ করেছেন।

ইহারও প্রত্যুত্তরে রাখাল মূঢ়ের মতো জবাব দিল, না, তোমাকে নিষেধ করতে আমি পারবো না। সে অধিকার আমার নেই।

সারদা বলিল, ছিল অধিকার। কিন্তু এখন এই কথাই বলবো যে, চিরদিন পরের হুকুম মেনে মেনে আজ নিজে হুকুম করার শক্তি হারিয়েছেন। এখন বিশ্বাস গেছে ঘুচে, ভরসা গেছে নিজের পরে। যে লোক দাবী করতে ভয় পায়, পরের দাবী মেটাতেই তার জীবন কাটে। শুভাকাঙ্ক্ষিণী সারদার এই কথাটা মনে রাখবেন।

এ তুমি কাকে বলচো? আমাকে?

হ্যাঁ আপনাকেই।

রাখাল কহিল, পারি মনে রাখবো; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমাকে বারণ করায় আমার লাভ কি? এ যদি বোঝাতে পারো হয়তো এখনও তোমাকে সত্যিই বারণ করতে পারি।

সারদা বলিল, স্বেচ্ছায় আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে একজনও যে সংসারে আছে, এই সত্যিটা জানতেও কি ইচ্ছে করে না?

জেনে কি হবে?

সারদা তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, হয়তো কিছুই হবে না। হয়তো আমারও সময় এসেছে বোঝবার। তবু একটা কথা বলি দেব্‌তা, অকারণে নির্মম হতে পারাটাই পুরুষের পৌরুষ নয়।

রাখাল জবাব দিল, সে আমিও জানি। কিন্তু অকারণে অতি-কোমলতাও আমার প্রকৃতি নয়। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া অধিকতর রুক্ষকণ্ঠে কহিল, দেখো সারদা, হাসপাতালে যেদিন তোমার চৈতন্য ফিরে এলো, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলে, সেদিনের কথা মনে পড়ে কিছু? তুমি ছলনা করে জানালে তুমি অল্পশিক্ষিত সহজ সরল পল্লীগ্রামের মেয়ে, নিঃস্ব ভদ্রঘরের বৌ। বললে, আমি না বাঁচালে তোমার বাঁচার উপায় নেই। তোমাকে অবিশ্বাস করিনি। সেদিন আমার সাধ্যে যেটুকু ছিল অস্বীকারও করিনি। কিন্তু আজ সে-সব তোমার হাসির জিনিস। তাদের অবহেলায় ফেলে দিলে। আজ এসেছেন বিমলবাবু—ঐশ্বর্যের সীমা নেই যাঁর—এসেচে তারক,

এসেচেন নতুন-মা। সেদিনের কিছুই বাকী নেই আর। এ ছলনার কি প্রয়োজন ছিল বল ত?

অভিযোগ শুনিয়া সারদা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। তার পরে আস্তে আস্তে বলিল, আমার কথায় মিথ্যে ছিল, কিন্তু ছলনা ছিল না দেবতা। সে মিথ্যেও শুধু মেয়ে মানুষ বলে। আর লজ্জা ঢাকতে। একেই যখন আমার চরিত্র বলে আপনিও ভুল করলেন তখন আর আমি ভিক্ষে চাইবো না। কাল মা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছেন জিনিসপত্র কিনতে। আমার কিন্তু দরকার নেই। যে টাকাগুলো আপনি দিয়েছিলেন সে কি ফিরিয়ে দেবো?

রাখাল কঠিন হইয়া বলিল, তোমার ইচ্ছে। কিন্তু পেলে আমার সুবিধে হয়। আমি বড়লোক নই সারদা, খুবই গরীব সে তুমি জানো।

সারদা বালিশের তলা হইতে রুমাল বাঁধা টাকা বাহির করিয়া গণিয়া রাখালের হাতে দিয়া বলিল, তা হলে এই নিন। কিন্তু টাকা দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ হয় এত নির্বোধ আমি নই। তবু বিনা দোষে যে দণ্ড আমাকে দিলেন সে অন্যায় আর একদিন আপনাকে বিঁধবে। কিছুতে পরিত্রাণ পাবেন না বলে দিলুম।

রাখাল কহিল, আর কিছু বলবে?

না।

তা হলে যাই। রাত হয়েছে।

প্রণাম করিতে গিয়া সারদা হঠাৎ তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তার পরে নিজেই চোখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

চললুম।

সারদা বলিল, আসুন।

পথে বাহির হইয়া রাখাল ভাবিয়া পাইল না এইমাত্র সে পুরুষের অযোগ্য যে-সকল মান-অভিমানের পালা সাঙ্গ করিয়া আসিল সে কিসের জন্য! কিসের জন্য এই-সব রাগারাগি? কি করিয়াছে সারদা? তাহার অপরাধ নির্দেশ করাও যেমন কঠিন, তাহার নিজের জ্বালা যে কোন্‌খানে, অঙ্গুলি সঙ্কেতও তেমনি শক্ত। রাখালের অন্তর আঘাত করিয়া তাহাকে বারে বারে বলিতে লাগিল, সারদা ভদ্র, সারদা বুদ্ধিমতী, সারদার মতো রূপ সহজে চোখে পড়ে না। সারদা তাহার কাছে কত যে কৃতজ্ঞ তাহা বহুবার বহুপ্রকারে জানাইতে বাকী রাখে নাই। পায়ের 'পরে মাথা পাতিয়া আজও জানাইতে সে ত্রুটি করে নাই। আরও একটা কি যেন সে বারংবার আভাষে জানায় হয়তো, তাহার অর্থ; শুধু কৃতজ্ঞতাই নয়, হয়তো সে আরও গভীর আরও বড়। হয়তো সে ভালোবাসা। রাখালের মনের ভিতরটা সংশয়ে দুলিয়া উঠিল। বহুদিন বহু নারীর সংস্পর্শে সে বহুভাবে আসিয়াছে, কিন্তু কোন মেয়ে কোনদিন তাহাকে ভালোবাসিয়াছে, এ-বস্তু এমনি অভাবিত যে সে আজ প্রায় অসম্ভবের কোঠায় গিয়া উঠিয়াছে। আজ সেই বস্তুই কি সারদা তাহাকে দিতে চায়? কিন্তু গ্রহণ করিবে সে কোন্ লজ্জায়? সারদা বিধবা, সারদা নিন্দিত কুলত্যাগিণী, এ প্রেমে না আছে গৌরব, না আছে সম্মান। নিজেকে সে বুঝাইয়া বলিতে লাগিল, আমি গরীব বলেই তো কাঙালবৃত্তি নিতে পারিনে। অন্নাভাব হয়েছে বলে পথের উচ্ছিষ্ট তুলে মুখে পুরবো কেমন করে? এ হয় না—এ যে অসম্ভব।

তথাপি বুকের ভিতরটায় কেমন যেন করিতে থাকে। তথায় কে যেন বারবার বলে, বাহিরের ঘটনায় এমনিই বটে; কিন্তু যে অন্তরের পরিচয় সেই প্রথম দিন হইতে সে নিরন্তর পাইয়াছে সে-বিচারের ধারা কি ওই আইনের বই খুলিয়া মিলিবে? যে মেয়েদের সংসর্গে তাহার এতকাল কাটিল সেখানে কোথায় সারদার তুলনা? অকপট নারীত্বের এতবড় মহিমা কোথায় খুঁজিয়া মিলিবে? অথচ সেই সারদাকেই আজ সে কেমন করিয়াই না অপমান করিয়া আসিল।

বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল ঝি তখনো আছে। একটু আশ্চর্য হইয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাওনি এখনো?

ঝি কহিল, না দাদা, ও-বেলায় তোমার মোটে খাওয়া হয়নি, এ-বেলায় সমস্ত যোগাড় করে রেখেচি, পোয়াটাক মাংস কিনেও এনেচি—সব গুছিয়ে দিয়ে তবে ঘরে যাবো।

সকালে সত্যই খাওয়া হয় নাই, মাছি পড়িয়া বিঘ্ন ঘটিয়াছিল, কিন্তু রাখালের মনে ছিল না। ইতিপূর্বেও এমন কতদিন হইয়াছে, তখন সকালের স্বল্পাহার রাত্রের ভূরিভোজনের আয়োজনে এই ঝি-ই পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। নূতন নয়, অথচ তাহার কথা শুনিয়া রাখালে চোখ অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। বলিল, তুমি বুড়ো হয়েছো নানী, কিন্তু মরে গেলে আমার কি দুর্দশা হবে বল ত? জগতে আর কেউ নেই যে তোমার দাদাবাবুকে দেখবে।

এই স্নেহের আবেদনে ঝির চোখেও জল আসিল। বলিল, সত্যি কথাই ত। কিন্তু বুড়ো হয়েচি, মরবো না? কতদিন বলেচি তোমাকে, কিন্তু কান দাও না—হেসে উড়িয়ে দাও। এবার আর শুনবো না, বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। দু'দিন বেঁচে থেকে চোখে দেখে যাবো, নইলে মরেও সুখ পাবো না দাদা।

রাখাল হাসিয়া বলিল, তা হলে সে সুখের আশা নেই নানী। আমার ঘরবাড়ি নেই, বাপ-মা, আপনার লোক নেই, মোটা-মাইনের চাকরি নেই, আমাকে মেয়ে দেবে কে?

ইস্! মেয়ের ভাবনা? একবার মুখ ফুটে বললে যে কত গণ্ডা সম্বন্ধ এসে হাজির হবে।

তুমি একটা করে দাও না নানী।

পারিনে বুঝি? আমার হাতে লোক আছে, তাকে কালই লাগিয়ে দিতে পারি।

রাখাল হাসিতে লাগিল। বলিল, তা যেন দিলে ; কিন্তু বৌ এসে খাবে কি বলো তো? খাবি খাবে নাকি!

ঝি রাগ করিয়া জবাব দিল, খাবি খেতে যাবে কিসের দুঃখে দাদা ; গেরস্ত-ঘরে সবাই যা খায় সে-ও তাই খাবে। তোমাকে ভাবতে হবে না,—জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।

সে ব্যবস্থা আগে ছিল নানী, এখন আর নেই। এই বলিয়া রাখাল পুনশ্চ হাসিয়া রান্নার ব্যাপারে মনোনিবেশ করিল। তাহার রান্না হয় কুকারে। শৌখিন মানুষ,—ছোট, বড়, মাঝারি নানা আকারের কুকার। আজ রান্না চাপিল বড়টায়। তিন-চারটা পাত্রে নানাবিধ তরকারি এবং মাংস। অনেকদিন ধরিয়া এ কাজ করিয়া ঝি পাকা হইয়া গেছে—বলিতে কিছুই হয় না।

ঠাঁই করিয়া, খাবার পাত্র সাজাইয়া দিয়া ঘরে ফিরিবার পূর্বে ঝি মাথার দিব্য দিয়া গেল পেট ভরিয়া খাইতে। বলিল, সকালে এসে যদি দেখি সব খাওনি, পড়ে আছে, তাহলে রাগ করবো বলে গেলুম।

রাখাল বলিল, তাই হবে নানী, পেট ভরেই খাবো। আর যা-ই করি তোমাকে দুঃখ দেবো না।

ঝি চলিয়া গেলে রাখাল ইজি-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িল। খাবার তৈরির প্রায় ঘন্টা-দুই দেরি, এই সময়টা কাটাইবার জন্য সে একখানা বই টানিয়া লইল, কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারে না, মনে পড়ে সারদাকে। মনে পড়ে নিজের অকারণ অধীরতা। আপনাকে সংবরণ করিতে পারে নাই, অন্তরের ক্রোধ ও ক্ষোভের জ্বালা কদর্য রূঢ়তায় বারে বারে ফাটিয়া বাহির হইয়াছে,—ছেলেমানুষের মতো। বুদ্ধিমতী সারদার কিছুই বুঝিতে বাকী নাই। এমন করিয়া নিজেকে ধরা দিবার কি আবশ্যক ছিল? কি আবশ্যক ছিল নিজেকে ছোট করার। মনে মনে লজ্জার অবধি রহিল না, ইচ্ছা করিল, আজিকার সমস্ত ঘটনা কোনমতে যদি মুছিয়া ফেলিতে পারে।

নিজের জীবনের যে কাহিনী সারদা আজও কাহাকে বলিতে পারে নাই, বলিয়াছে শুধু তাহাকে। সেই অকপট বিশ্বাসের প্রতিদান কি পাইল সে? পাইল শুধু অশ্রদ্ধা ও অকারণ লাঞ্ছনা। অথচ, ক্ষতি তাহার কি করিয়াছিল সে? একটা কথারও প্রতিবাদ করে নাই সারদা, শুধু নিরুত্তরে সহ্য করিয়াছে। নিরুপায় রমণীর এই নিঃশব্দ অপমান এতক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া যেন তাহাকেই অপমান করিল। উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া রাখাল চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, থাক

আমার রান্না—এই রাত্রেই ফিরে গিয়ে আমি তার ক্ষমা চেয়ে আসবো। তাকে স্পষ্ট করে বলবো কোথায় আমার জ্বালা, কোথায় আমার ব্যথা ঠিক জানিনে। সারদা, কিন্তু যে-সব কথা তোমাকে বলে গেছি সে-সব সত্যি নয়, সে একেবারেই মিথ্যে।

কুকারের খাবার ফুটিতে লাগিল, ঘরের আলো জ্বলিতে লাগিল, গায়ের চাদরটা টানিয়া লইয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

এ বাটীতে পৌঁছিতে বেশী বিলম্ব হইল না। সোজা সারদার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দেখিল তালা ঝুলিতেছে, সে নাই। উপরে উঠিয়া সম্মুখেই চোখে পড়িল দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসিয়া বিমলবাবু ও সবিতা। গল্প চলিতেছে। তাহাকে দেখিয়া, একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি এতক্ষণ এ-বাড়িতেই ছিলে রাজু?

না মা, বাসায় গিয়েছিলাম।

বাসা থেকে আবার ফিরে এলে? কেন?

রাখাল চট্ করিয়া জবাব দিতে পারিল না। পরে বলিল, একটু কাজ আছে মা। ভাবলাম তারকের সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি, একবার দেখা করে আসি। কাল ত আর সময় পাওয়া যাবে না।

না, আমরা সকালেই রওনা হবো।

বিমলবাবু বলিলেন, তারক কি ফিরেচে?

সবিতা কহিলেন, না। ছেলেটা কি যে এত আমাদের জন্য কিনচে আমি ভেবে পাইনে।

বিমলবাবু এ কথার জবাব দিলেন। বলিলেন, সে জানে তার অতিথি সামান্য ব্যক্তি নয়। তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত আয়োজন তার করা চাই।

সবিতা হাসিয়া কহিলেন, তাহলে তার উচিত ছিল তোমার কাছে ফর্দ লিখিয়ে নিয়ে যাওয়া।

শুনিয়া বিমলবাবুও হাসিলেন, বলিলেন, আমার ফর্দ তার সঙ্গে মিলবে কেন নতুন-বৌ? ও যার যা আলাদা। তবেই মন খুশী হয়।

এ আলোচনায় রাখাল যোগ দিতে পারিল না, হঠাৎ মনের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া উঠিল। খানিক পরে নিজেকে একটু শান্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সারদাকে ত তার ঘরে দেখলাম না নতুন-মা?

সবিতা বলিল, আজ কি তার ঘরে থাকবার জো আছে বাবা। তারক খাবে, বামুন-ঠাকুরকে সরিয়ে দিয়ে সে দুপুরবেলা থেকেই এক-রকম রাঁধতে লেগেছে। কত কি যে তৈরি করচে তার ঠিকানা নেই।

বিমলবাবু বলিলেন, সে আমাকেও যে খেতে বলেছে নতুন-বৌ।

তোমারও নেমন্তন্ন নাকি?

হাঁ, তুমি ত কখনো খেতে বললে না, কিন্তু সে আমাকে কিছুতেই যেতে দিলে না।

আজ তাই বুঝি বসে আছো। এতক্ষণ? আমি বলি বুঝি আমার সঙ্গে কথা কইবার লোভে। বলিয়া সবিতা মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

বিমলবাবুও হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে কথা ধরা পড়ে গেলে খোঁটা দিতে নেই নতুন-বৌ। ভারী পাপ হয়।

রাখাল মুখ ফিরাইয়া লইল। এই হাস্য-পরিহাসে আর একবার তাহার মনটা জ্বলিয়া উঠিল।

সবিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, সারদা তোমাকে খেতে বলেনি রাজু?

না, মা।

সবিতা অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, তাহলে বুঝি ভুলে গেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই সারদাকে ডাকিতে লাগিলেন। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার রাজুকে খেতে বলোনি সারদা?

না মা বলিনি।

কেন বলোনি? মনে ছিল না বুঝি?

সারদা চুপ করিয়া রহিল।

সবিতা বলিলেন, মনেই ছিল না রাজু ; কিন্তু এ ভুলও অন্যায়।

রাখাল কহিল, মনে না-থাকা দুর্ভাগ্য হতে পারে নতুন-মা, কিন্তু তাকে অন্যায় বলা চলে না। সারদা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বাসায় ফিরে গিয়ে এখন বুঝি আপনাকে রাঁধতে হবে? বললাম, হাঁ। প্রশ্ন করলেন, তারপর খেতে হবে? বললাম, হাঁ। কিন্তু এর পরেও আমাকে খেতে বলার কথা ওঁর মনেই এলো না। কিন্তু এটা জেনে রাখবেন নতুন-মা, এ মনে না-থাকা ন্যায় অন্যায়ের অন্তর্গত নয়, চিকিৎসার অন্তর্গত। এই বলিয়া রাখাল নীরস হাস্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ মিশাইয়া জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

সবিতা কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। সারদা তেমনি নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া রহিল।

রাখাল মনে মনে বুঝিল অন্যায় হইতেছে, তাহার কথা মিথ্যা না হইয়াও মিথ্যার বেশী দাঁড়াইয়াছে, তবু থামিতে পারিল না। বলিল, তারক এখানে এলেও আমার সঙ্গে দেখা করে না। সারদা বলেন তাঁর সময়াভাব। সত্যি হতেও পারে, তাই সময় করে আমিই দেখা করতে এলাম, খেতে আসিনি নতুন-মা।

একটু থামিয়া বলিল, সারদার হয়তো সন্দেহ আমাকে তারক পছন্দ করে না, আমার সঙ্গে খেতে বসা তার ভালো লাগবে না। দোষ দিতে পারিনে মা, তারক এখানে অতিথি, তার সুখ-সুবিধেই আগে দেখা দরকার।

সারদা তেমনি নির্বাক্‌। সবিতা ব্যকুল হইয়া বলিলেন, তারক অতিথি, কিন্তু তুমি যে আমার ঘরের ছেলে রাজু। আমি অসুবিধে কারো ঘটাতে চাইনে, যার যা ইচ্ছে করুক, কিন্তু আমার কাছে বসে আজ তুমি খাবে।

রাখাল মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, না সে হয় না। কহিল আমার বুড়ো নানী বেঁচে থাক, আমার কুকার অক্ষয় হোক, তার সিদ্ধ রান্নাই আমার অমৃত, বড়ঘরের বড়-রকমের খাওয়ায় আমার লোভ নেই নতুন-মা।

সবিতা বলিলেন, লোভের জন্যে বলিনে রাজু, কিন্তু না খেয়ে আজ যদি তুমি চলে যাও দুঃখের আমার সীমা থাকবে না। এ তোমাকে বললুম।

অপরাধ ঢের বেশী বাড়িয়া গেল, রাখাল নির্মম হইয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না নতুন-মা। মনে হয় এ শুধু কথার কথা, বলতে হয় তাই বলা। কে আমি, যে আমি না খেয়ে গেলে আপনার দুঃখের সীমা থাকবে না? কারো জন্যেই আপনার দুঃখবোধ নেই। এই আপনার প্রকৃতি।

দুঃসহ বিস্ময়ে সবিতার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, বলো কি রাজু?

কেউ বলে না বলেই বললাম নতুন-মা। আপনার সৌজন্য, সহৃদয়তা, আপনার বিচার-বুদ্ধির তুলনা নেই। আর্তের পরম বন্ধু আপনি, কিন্তু দুঃখীর মা আপনি নয়। দুঃখ-বোধ শুধু আপনার বাইরের ঐশ্বর্য, অন্তরের ধন নয়। তাই যেমন সহজে গ্রহণ করেন, তেমনি অবহেলায় ত্যাগ করেন। আপনার বাধে না।

বিমলবাবু বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন।

রাখাল বলিল, আপনি আমার অনেক করেছেন নতুন-মা, সে আমি চিরদিন মনে রাখবো। কেবল মুখের কথা দিয়ে নয়, দেহ-মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে। আপনার সঙ্গে আর বোধ করি আমার দেখা হবে না। হয়ে এ ইচ্ছাও নেই। কিন্তু নিজের যদি কিছু পুণ্য থাকে তার বদলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাই, এবার যেন আপনাকে তিনি দয়া করেন—অজানার মধ্যে থেকে জানার মধ্যে এবার যেন তিনি আপনাকে স্থান দেন। শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলাটা ধরিয়া আসিল।

সবিতা একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়াছিলেন, কথা শুনিয়া রাগ করিলেন না, বরং গভীর স্নেহের

সুরে বলিলেন, তাই হোক রাজু, ভগবান যেন তোমার প্রার্থনাই মঞ্জুর করেন। আমার অদৃষ্টে যেন তাই ঘটতে পায়।

চললাম নতুন-মা।

সবিতা উঠিয়া আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া বলিলেন, রাজু, কিছু কি হয়েছে বাবা?

কি হবে নতুন-মা?

এমন কিছু যা তোমাকে আজ এমন চঞ্চল করেছে। তুমি ত নিষ্ঠুর নও—কটু কথা বলা ত তোমার স্বভাব নয়!

প্রত্যুত্তরে রাখাল হেঁট হইয়া শুধু তাঁহার পায়ের ধুলা লইল, আর কিছু বলিল না। চলিতে উদ্যত হইলে বিমলবাবু বলিলেন, রাজু, বিশেষ পরিচয় নেই দু'জনের, কিন্তু আমাকে বন্ধু বলেই জেনো।

রাখাল ইহারও জবাব দিল না, ধীরে ধীরে নীচে চলিয়া গেল। কালকের মতো আজও সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ছিল সারদা। কাছে আসিতেই মৃদুকণ্ঠে কহিল, দেব্‌তা?

কি চাও তুমি?

বলেছিলেন অনেক সারদার মধ্যে আমিও একজন। হয়তো আপনার কথাই সত্যি।

সে আমি জানি।

সারদা বলিল, নানাভাবে দয়া করে আমাকে বাঁচিয়েছিলেন বলেই আমি বেঁচেছিলুম। আপনি অনেকের অনেক করেন, আমারও করেছিলেন, তাতে ক্ষতি আপনার হয়নি। বেঁচে যদি থাকি এইটুকুই কেবল জেনে রাখতে চাই।

রাখাল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, নীরবে বাহির হইয়া গেল।

Pathagar.Net

শেষ প্রশ্ন

এক

বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন কর্মোপলক্ষে আসিয়া অনেকগুলি বাঙালী পরিবার পশ্চিমের বহুখ্যাত আগ্রা শহরে বসবাস করিয়াছিলেন। কেহ-বা কয়েক পুরুষের বাসিন্দা, কেহ-বা এখনও বাসাড়ে। বসন্তের মহামারী ও প্লেগের তাড়াহুড়া ছাড়া ইঁহাদের অতিশয় নির্বিঘ্ন জীবন। বাদশাহী আমলের কেল্লা ও ইমারত দেখা ইঁহাদের সমাপ্ত হইয়াছে, আমীর-ওমরাহগণের ছোট, বড়, মাঝারি, ভাঙ্গা ও আ-ভাঙ্গা যেখানে যত কবর আছে তাহার নিখুঁত তালিকা কণ্ঠস্থ হইয়া গেছে, এমন যে বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল, তাহাতেও নূতনত্ব আর নাই। সন্ধ্যায় উদাস সজল চক্ষু মেলিয়া, জ্যোৎস্নায় অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া, অন্ধকারে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া যমুনার এপার হইতে, ওপার হইতে সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার যত প্রকারের প্রচলিত প্রবাদ ও ফন্দি আছে তাঁহারা নিঙড়াইয়া শেষ করিয়া ছাড়িয়াছেন। কোন্ বড়লোকে কবে কি বলিয়াছে, কে কে কবিতা লিখিয়াছে, উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যে কে সুমুখে দাঁড়াইয়া গলায় দড়ি দিতে চাহিয়াছে—ইঁহারা সব জানেন। ইতিবৃত্তের দিক দিয়াও লেশমাত্র ত্রুটি নাই। ইঁহাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত শিখিয়াছে কোন্ বেগমের কোথায় আঁতুড়ঘর ছিল, কোন্ জাঠসর্দার কোথায় ভাত রাঁধিয়া খাইয়াছে,—সে কালির দাগ কত প্রাচীন,—কোন্ দস্যু কত হীরা-মাণিক্য লুণ্ঠন করিয়াছে এবং তাহার আনুমানিক মূল্য কত,—কিছুই আর কাহারও অবিদিত নাই।

এই জ্ঞান ও পরম নিশ্চিন্ততার মাঝখানে হঠাৎ একদিন বাঙালী সমাজে চাঞ্চল্য দেখা দিল। প্রত্যহ মুসাফিরের দল যায় আসে, অ্যামেরিকান টুরিস্ট হইতে শ্রীবৃন্দাবন ফেরত বৈষ্ণবদের পর্যন্ত মাঝে মাঝে ভিড় হয়—কাহারও কোন ঔৎসুক্য নাই, দিনের কাজে দিন শেষ হয়, এমনি সময়ে একজন প্রৌঢ়বয়সী ভদ্র বাঙালী সাহেব তাঁহার শিক্ষিতা, সুরূপা ও পূর্ণ-যৌবনা কন্যাকে লইয়া স্বাস্থ্য উদ্ধারের অজুহাতে শহরের এক প্রান্তে মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া বসিলেন। সঙ্গে তাঁহার বেহারা, বাবুর্চি, দরোয়ান আসিল ; ঝি, চাকর, পাচক-ব্রাহ্মণ আসিল ; গাড়ি, ঘোড়া, মোটর, শোফার, সহিস, কোচোয়ানে এতকালের এত বড় ফাঁকা বাড়ির সমস্ত অন্ধ্র রন্ধ্র যেন যাদুবিদ্যায় রাতারাতি ভরিয়া উঠিল। ভদ্রলোকের নাম আশুতোষ গুপ্ত, কন্যার নাম মনোরমা। অত্যন্ত সহজেই বুঝা গেল ইঁহারা বড়লোক। কিন্তু উপরে যে চাঞ্চল্যের উল্লেখ করিয়াছি, সে ইঁহাদের বিত্ত ও সম্পদের পরিমাণ কল্পনা করিয়া নয়, মনোরমার শিক্ষা ও রূপের খ্যাতি-বিস্তারেও তত নয়, যত হইল আশুবাবুর নিরভিমান সহজ ভদ্র আচরণে। তিনি মেয়েকে সঙ্গে করিয়া নিজে খোঁজ করিয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ; বলিলেন, তিনি পীড়িত লোক, তাঁহাদের অতিথি, সুতরাং নিজ গুণে দয়া করিয়া যদি না তাঁহারা এই প্রবাসীদের দলে টানিয়া লয়েন ত এই নির্বাসনে বাস করা একপ্রকার অসম্ভব। মনোরমা বাড়ির ভিতরে গিয়া মেয়েদের সহিত পরিচয় করিয়া আসিল, সেও অসুস্থ পিতার হইয়া সবিনয়ে নিবেদন জানাইল যে, তাঁহারা যেন তাঁহাদের পর করিয়া না রাখেন। এমনি আরও সব রুচিকর মিষ্ট কথা।

শুনিয়া সকলেই খুশী হইলেন। তখন হইতে আশুবাবুর গাড়ি এবং মোটর যখন-তখন, যাহার-তাহার গৃহে আনাগোনা করিয়া মেয়ে এবং পুরুষদের আনিতে লাগিল, পৌঁছাইয়া দিতে লাগিল, আলাপ-আপ্যায়ন, গান-বাজনা এবং দ্রষ্টব্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ পরিদর্শনে হৃদ্যতা এমনি জমাট বাঁধিয়া উঠিল যে, ইঁহারা যে বিদেশী কিংবা অত্যন্ত বড়লোক এ কথা ভুলিতে কাহারও সপ্তাহ-খানেকের অধিক সময় লাগিল না। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় কতকটা সঙ্কোচ এবং কতকটা বাহুল্য বলিয়াই কেহ স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করে নাই। ইঁহারা হিন্দু অথবা ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। বিদেশে প্রয়োজনও বড় হয় না। তবে, আচার-ব্যবহারের মধ্যে দিয়া যতটা বুঝা যায় সকলেই একপ্রকার বুঝিয়া রাখিয়াছিল যে ইঁহারা যে-সমাজভুক্তই হউন, অধিকাংশ উচ্চশিক্ষিত ভদ্র বাঙালী পরিবারের মত খাওয়া-দাওয়ার সম্বন্ধে অন্ততঃ বাচ-বিচার করিয়া

চলেন না। বাড়িতে মুসলমান বাবুর্চি থাকার ব্যাপারটা সকলে না জানিলেও এ কথাটা সবাই জানিত যে, এতখানি বয়স পর্যন্ত মেয়েকে অবিবাহিত রাখিয়া যিনি কলেজে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন তিনি মূলতঃ, যে সমাজেরই অন্তর্গত হউন, বহুবিধ সঙ্কীর্ণতার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

অবিনাশ মুখুয্যে কলেজের প্রফেসর। বহুদিন হইল স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, কিন্তু আর বিবাহ করেন নাই। ঘরে বছর-দশেকের একটি ছেলে ; অবিনাশ কলেজে পড়ায় এবং বন্ধুবান্ধব লইয়া আনন্দ করিয়া বেড়ায়। অবস্থা সচ্ছল,—নিশ্চিত, নিরুপদ্রব জীবন। বছর-দুই পূর্বে বিধবা শ্যালিকা ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্তা হইয়া বায়ুপরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ভগিনীপতির কাছে আসেন। জ্বর ছাড়িল, কিন্তু ভগিনীপতি ছাড়িলেন না। সম্প্রতি গৃহে তিনিই কর্ত্রী। ছেলে মানুষ করেন, ঘর-সংসার দেখেন, বন্ধুরা সম্পর্ক আলোচনা করিয়া পরিহাস করে। অবিনাশ হাসে,—বলে, ভাই, বৃথা লজ্জা দিয়ে আর দগ্ধ করো না,—কপাল! নইলে চেষ্টার ত্রুটি নেই। এখন ভাবি, ধন অপবাদে ডাকাতে মারে, সেও আমার ভাল।

অবিনাশ স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত। বাটীর সর্বত্র তাঁহার ফটোগ্রাফ নানা আকারের, নানা ভঙ্গীর। শোবার ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গানো একখানা বড় ছবি। অয়েল পেন্টিং, মূল্যবান ফ্রেমে বাঁধানো। অবিনাশ প্রতি বুধবারের সকালে তাহাতে মালা ঝুলাইয়া দেয়। এইদিনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

অবিনাশ সদানন্দ গোছের মানুষ। তাস-পাশায় তাহার অত্যধিক আসক্তি। তাই ছুটির দিনে প্রায়ই তাহার গৃহে লোকসমাগম ঘটে। আজ কি-একটা পর্বোপলক্ষে কলেজ কাছারি বন্ধ ছিল। আহারাদির পরে প্রফেসর-মহল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, জন-দুই নীচের ঢালা বিছানার উপরে দাবার ছক পাতিয়া বসিয়া এবং জন-দুই উপুড় হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন, বাকী সকলে ডেপুটি ও মুন্সেফের বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার অনুপাতে মোটামাহিনার বহর মাপিয়া উচ্চ কোলাহলে গভর্নমেন্টের প্রতি রাইচ্যস্ ইন্‌ডিগ্‌নেশন ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে নিযুক্ত। এমন সময় মস্ত একটা ভারী মোটর আসিয়া সদর দরজায় থামিল। পরক্ষণে আশুবাবু তাঁহার কন্যাকে লইয়া প্রবেশ করিতে সকলেই সসম্মানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাইচ্যস্ ইন্‌ডিগ্‌নেশন জল হইয়া গেল, ও-দিকের খেলাটা উপস্থিত-মত স্থগিত রহিল, অবিনাশ সবিনয়ে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য আপনাদের পদধূলি আমার গৃহে পড়লো, কিন্তু হঠাৎ এমন অসময়ে যে? এই বলিয়া তিনি মনোরমাকে একখানি চেয়ার আগাইয়া দিলেন।

আশুবাবু সন্নিকটবর্তী আরাম-কেদারার উপর দেহের সুবিপুল ভার ন্যস্ত করিয়া অকারণ উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিয়া কহিলেন, আশু বদ্যির অসময়? এতবড় দুর্নাম যে আমার ছোটখুড়োও দিতে পারেন না অবিনাশবাবু?

মনোরমা হাসিমুখে নতকণ্ঠে কহিল, কি বলচ বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, তবে থাক ছোটখুড়োর কথা। কন্যার আপত্তি। কিন্তু, এর চেয়ে একটা ভাল উদাহরণ মা-ঠাক্‌রুনের বাপের সাধ্যি নেই যে দেয়। এই বলিয়া নিজের রসিকতার আনন্দোচ্ছ্বাসে পুনরায় ঘর ভাঙ্গিবার উপক্রম করিলেন। হাসি থামিলে কহিলেন, কিন্তু কি বলব মশাই, বাতে পঙ্গু। নইলে, যে পায়ের ধূলোর এত গৌরব বাড়ালেন, আশু গুপ্তর সেই পায়ের ধূলো ঝাঁট দেবার জন্যেই আপনাকে একটা চাকর রাখতে হত অবিনাশবাবু। কিন্তু আজ আর বসবার জো নেই, এখুনি উঠতে হবে।

এই অনবসরের হেতুর জন্য সকলেই তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। আশুবাবু বলিলেন, একটা আবেদন আছে। মঞ্জুরির জন্য মাকে পর্যন্ত টেনে এনেছি। কালও ছুটির দিন, সন্ধ্যার পর বাসায় একটুখানি গান-বাজনার আয়োজন করেছি,—সপরিবারে যেতে হবে। তার পরে একটু মিষ্টি-মুখ।

মেয়েকে কহিলেন, মণি, বাড়ির মধ্যে গিয়ে একবার হুকুমটা নিয়ে এসো মা। দেরি করলে

হবে না।

আরও একটা কথা, মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস, মেয়েদের জন্য না হোক, আমাদের পুরুষদের জন্য দুরকম খাবার ব্যবস্থাই,—অর্থাৎ কিনা,—প্রেজুডিস যদি না থাকে ত—বুঝলেন না?

বুঝিলেন সকলেই এবং একবাক্যে প্রকাশ করিলেন সকলেই যে তাঁহাদের প্রেজুডিস নাই।

আশুবাবু খুশী হইয়া কহিলেন, না থাকবারই কথা! মেয়েকে বলিলেন, মণি, খাবার সম্বন্ধে মা-লক্ষ্মীদেরও একটা মতামত নেওয়া চাই, সে যেন ভুলো না। প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে তাঁদের অভিরুচি এবং আদেশ নিয়ে বাসায় ফিরতে আজ বোধ করি আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে। একটু শীঘ্র করে কাজটা সেরে এস মা।

মনোরমা ভিতরে যাইবার জন্য উঠিতেছিল, অবিনাশ কহিলেন, আমার ত বহুদিন যাবৎ গৃহ শূন্য। শ্যালিকা আছেন, কিন্তু বিধবা। গান শোনবার শখ প্রচুর, অতএব যাবেন নিশ্চিত। কিন্তু খাওয়া—

আশুবাবু তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, তারও অভাব হবে না অবিনাশবাবু, আমার মণি রয়েছে যে! মাছ-মাংস, পিঁয়াজ-রসুন ও ত স্পর্শও করে না।

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উনি মাছ-মাংস, খান না?

আশুবাবু বলিলে, খেতেন সবই, কিন্তু বাবাজীর ভারী অনিচ্ছে, সে হলো আবার সন্ন্যাসী-গোছের মানুষ—

চক্ষের পলকে মনোরমার সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল ; পিতার অসমাপ্ত বাক্যের মাঝখানেই বাধা দিয়া কহিল, তুমি কি-সমস্ত বলে যাচ্ছ বাবা!

পিতা থতমত খাইয়া গেলেন এবং কন্যার কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক মৃদুতা তাহার ভিতরের তিক্ততা আবৃত করিতে পারিল না।

ইহার পরে বাক্যালাপ আর জমিল না এবং আরও দুই-চারি মিনিট যাহা ইঁহারা বসিয়া রহিলেন, আশুবাবু কথা কহিলেও মনোরমা কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল। এবং উভয়ে চলিয়া গেলে কিছুক্ষণের জন্য সকলেরই মনের উপর যেন একটা অনাকাঙ্ক্ষিত বিষণ্ণতার ভার চাপিয়া রহিল।

বন্ধুগণের মধ্যে কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া কিছু কহিল না, কিন্তু সবাই ভাবিতে লাগিল, হঠাৎ এই বাবাজীটি আসিল আবার কোথা হইতে? আশুবাবুর পুত্র নাই, মনোরমাই একমাত্র সন্তান তাহা সকলেই জানিত ; নিজে সে আজও অনূঢ়া—আয়তির কোন চিহ্ন তাহাতে বিদ্যমান নাই। কথাটা সোজাসুজি প্রশ্ন করিয়া কেহ জানিয়া লয় নাই বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সংশয়ের বাষ্পও ত কাহারো মনে উদয় হয় নাই। তবে?

অথচ, এই সন্ন্যাসী-গোছের বাবাজী যেই হউন, অথবা যেখানেই থাকুন, তিনি সহজ ব্যক্তি নহেন। কারণ, তাঁহার নিষেধ নহে, কেবলমাত্র অনিচ্ছার চাপেই এতবড় একটা বিলাসী ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তির একমাত্র শিক্ষিতা কন্যার মাছ-মাংস রসুন-পিঁয়াজের বরাদ্দ একেবারে বন্ধ হইয়া গেছে।

এবং, লজ্জা পাইবার, গোপন করিবারই বা আছে কি? পিতা সঙ্কোচে জড়সড় হইয়া গেলেন, কন্যা আরক্ত-মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল,—সমস্ত ব্যাপারটাই যেন সকলের মনে একটা অবাঞ্ছিত অপ্রীতিকর রহস্যের মত বিঁধিল। এবং এই আগন্তুক পরিবারের সহিত মিলামিশার যে সবুজ ও স্বচ্ছন্দ ধারা প্রথম হইতেই প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, অকস্মাৎ যেন তাহাতে একটা বাধা আসিয়া পড়িল।

দুই

মনে হইয়াছিল আশুবাবু শহরের কাহাকেও বোধ হয় বাদ দিবেন না। কিন্তু দেখা গেল বাঙালীদের মধ্যে বিশিষ্ট যাঁহারা শুধু তাঁহারাই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। প্রফেসর মহল দল বাঁধিয়া উপস্থিত হইলেন ; বাড়ির মেয়েদের মোটর পাঠাইয়া পূর্বেই আনা হইয়াছিল।

একটা বড় ঘরের মেঝের উপর মূল্যবান প্রকাণ্ড কার্পেট পাতিয়া স্থান করা হইয়াছে। তাহাতে জন-দুই দেশীয় ওস্তাদ যন্ত্র বাঁধিতে নিযুক্ত। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাঁহাদের ঘিরিয়া ধরিয়া অবস্থান করিতেছে। গৃহস্বামী অন্য কোথাও ছিলেন, খবর পাইয়া হাঁসফাঁস করিতে করিতে হাজির হইলেন, দুই হাত থিয়েটারি ভঙ্গীতে উঁচু করিয়া ধরিয়া কহিলেন, স্বাগত ভদ্রমণ্ডলী! মোস্ট ওয়েলক্যম্!

ওস্তাদজীদের ইঙ্গিতে দেখাইয়া গলা খাটো করিয়া চোখ টিপিয়া বলিলেন, ভয় পাবেন না যেন! কেবল এঁদের ম্যাও ম্যাও শোনাবার জন্যেই আহ্বান করে আনিনি। শোনাবো, শোনাবো, এমন গান আজ শোনাবো যে আমাকে আশীর্বাদ করে তবে ঘরে ফিরবেন।

শুনিয়া সকলেই খুশী হইলেন। সদা-প্রসন্ন অবিনাশবাবু আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলেন কি আশুবাবু? এ দুর্ভাগা দেশের যে সবাইকে চিনি, হঠাৎ এ রত্ন পেলেন কোথায়?

আবিষ্কার করেছি, মশাই, আবিষ্কার করেছি। আপনারাও যে একেবারে না চেনেন তা নয়,—সম্প্রতি হয়ত ভুলে গেছেন। চলুন দেখাই। এই বলিয়া তিনি সকলকে একপ্রকার ঠেলিতে ঠেলিতে আনিয়া তাঁহার বসিবার ঘরের পর্দা সরাইয়া প্রবেশ করিলেন।

লোকটি ঈষৎ শ্যামবর্ণ, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। যেমন দীর্ঘ ঋজু দেহ, তেমনি সমস্ত অবয়বের নিখুঁত সুন্দর গঠন। নাক, চোখ, ভ্রূ, ললাট, অধরের বাঁকা রেখাটি পর্যন্ত—একটিমাত্র নরদেহে এমন করিয়া সুবিন্যস্ত হইলে—যে কি বিস্ময়ের বস্তু তাহা এই মানুষটিকে না দেখিলে কল্পনা করা যায় না। চাহিয়া হঠাৎ চমক লাগে। বয়স বোধ করি বত্রিশের কাছে গিয়াছে, কিন্তু প্রথমে আরও কম মনে হয়। সুমুখের সোফায় বসিয়া মনোরমার সহিত গল্প করিতেছিলেন, সোজা হইয়া বসিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, আসুন!

মনোরমা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আগন্তুক অতিথিদের নমস্কার করিল। কিন্তু প্রতিনমস্কারের কথা কাহারও মনেও হইল না, সকলে অকস্মাৎ এমনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।

অবিনাশবাবু বয়সেও বড়, কলেজের দিক দিয়া পদগৌরবেও সকলের শ্রেষ্ঠ। তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আগ্রায় কবে ফিরে এলেন শিবনাথবাবু? বেশ যা হোক। কৈ আমরা ত কেউ খবর পাইনি?

শিবনাথ কহিলেন, পাননি বুঝি? আশ্চর্য! তাহার পরে হাসিমুখে বলিলেন, বুঝতে পারিনি অবিনাশবাবু, আমার আসার পথ চেয়ে আপনারা এতখানি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন!

উত্তর শুনিয়া অবিনাশবাবু যদিচ হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সহযোগিগণের মুখ ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল। যে কারণেই হউক, ইঁহারা যে পূর্ব হইতেই এই প্রিয়দর্শন গুণী ব্যক্তিটির প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না তাহা আভাসে জানা থাকিলেও একের এই বক্রোক্তির অন্তরালে ও অন্য সকলের কঠিন মুখচ্ছবির ব্যঞ্জনায় এই বিরুদ্ধতা এমনি কটু রূঢ় এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, কেবলমাত্র মনোরমা ও তাহার পিতাই নয়, সদানন্দ প্রকৃতি অবিনাশ পর্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আর গড়াইতে পাইল না, আপাততঃ এইখানেই বন্ধ হইল।

পাশের ঘর হইতে ওস্তাদজীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল, এবং পরক্ষণেই বাড়ির সরকার আসিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল যে, সমস্ত প্রস্তুত, শুধু আপনাদের অপেক্ষাতেই গানবাজনা শুরু হইতে পারিতেছে না।

পেশাদার ওস্তাদী সঙ্গীত সচরাচর যেমন হইয়া থাকে এ-ক্ষেত্রেও তেমনিই হইল,—বিশেষত্ব-বর্জিত মামুলি ব্যাপার, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে ক্ষুদ্রপরিসর এই সঙ্গীতের আসরে, স্বল্প কয়টি শ্রোতার মাঝখানে শিবনাথের গান সত্য সত্যই একেবারে অপূর্ব শুনাইল। শুধু তাহার অতুলিত, অনবদ্য কণ্ঠস্বর নহে, এই বিদ্যায় সে অসাধারণ সুশিক্ষিত ও তাহাতে পারদর্শী। তাহার গাহিবার অনাড়ম্বর সংযত ভঙ্গী, সুরের স্বচ্ছন্দ সরল গতি, মুখের অদৃষ্টপূর্ব ভাবের ছায়া, চোখের অভিভূত উদাস দৃষ্টি, সমস্ত একই সময়ে কেন্দ্রীভূত হইয়া, সেই

সর্বাঙ্গীন তান-লয়-পরিশুদ্ধ সঙ্গীত যখন শেষ হইল, তখন মনে হইল শ্বেতভুজা যেন তাঁহার দুই হাতের আশীর্বাদ উজাড় করিয়া এই সাধকের মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন।.

কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই বাক্যহীন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, শুধু বৃদ্ধ আমীর খাঁ ধীরে ধীরে কহিলেন, অ্যাসা কভি নহি শুনা।

মনোরমা শিশুকাল হইতেই গান-বাজনার চর্চা করিয়াছে, সঙ্গীতে সে অপটু নহে, তাহার সামান্য জীবনে সে অনেক কিছুই শুনিয়াছে, কিন্তু সংসারে ইহাও যে আছে, এমন করিয়াও যে সমস্ত বুকের মধ্যেটা সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে টনটন করিতে থাকে তাহা সে জানিত না। তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল এবং ইহাই গোপন করিতে সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে উঠিয়া গেল।

অবিনাশ বলিলেন, শিবনাথ সহজে গাইতে চায় না, কিন্তু ওর গান আমরা আগেও শুনেছি। তুলনাই হয় না। এই বছর-খানেকের মধ্যে যেন ও ইনফিনিট্‌লি ইমপ্রুভ করেছে।

হরেন কহিলেন, হাঁ।

অক্ষয় ইতিহাসের অধ্যাপক। কঠিন সাঁচ্চা লোক বলিয়া বন্ধুমহলে খ্যাতি আছে। গানবাজনা ভাল লাগাটা তাঁহার মতে চিত্তের দুর্বলতা। নিষ্কলঙ্ক, সাধু ব্যক্তি। তাই শুধু নিজের নয়, পরের চারিত্রিক পবিত্রতার প্রতিও তাঁহার অত্যন্ত সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। শিবনাথের অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে শহরের আবহাওয়া পুনশ্চ কলুষিত হইবার আশঙ্কায় তাঁহার গভীর শান্তি বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ বাটীর মেয়েরা আসিয়াছে, পর্দার আড়াল হইতে গান শুনিয়া ও চেহারা দেখিয়া ইঁহাদেরও ভাল লাগার সম্ভাবনায় মন তাঁহার অতিশয় খারাপ হইয়া উঠিল ; বলিলেন, গান শুনেছিলুম বটে মধুবাবুর। এ গান আপনাদের যত মিষ্টিই লেগে থাক, এতে প্রাণ নেই।

সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন। কারণ, প্রথমতঃ, অপরিজ্ঞাত মধুবাবুর গান কাহারও শোনা ছিল না, এবং দ্বিতীয়তঃ গানের প্রাণ থাকা-না-থাকার সুনির্দিষ্ট ধারণা অক্ষয়ের ন্যায় আর কাহারও ছিল না। গুণমুগ্ধ আশুবাবু উত্তেজনা-বশে তর্ক করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু অবিনাশ চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন।

সঙ্গীত সম্বন্ধেই আলোচনা চলিতে লাগিল। কবে কে কোথায় কিরূপ শুনিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিতে লাগিলেন। কথায় কথায় রাত্রি বাড়িতে লাগিল। ভিতর হইতে খবর আসিল, মেয়েদের খাওয়া শেষ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের বাড়ি পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। বৃদ্ধ সদর-আলা রাত্রির অজুহাতে বিদায় লইলেন, এবং অজীর্ণ রোগগ্রস্ত মুন্সেফবাবু জল ও পান-মাত্র মুখে দিয়াই তাঁহার সঙ্গী হইলেন। রহিলেন শুধু প্রফেসর-মহল। ক্রমশঃ, তাঁহাদেরও আহারের ডাক পড়িল। উপরের একটা খোলা বারান্দায় আসন পাতিয়া ঠাঁই করা হইয়াছে, আশুবাবু নিজেও সঙ্গে বসিয়া গেলেন। মনোরমা মেয়েদের দিক হইতে ছুটি পাইয়া তত্ত্বাবধানের জন্য আসিয়া হাজির হইল।

শিবনাথের ক্ষুধা যতই থাক আহারের রুচি ছিল না, সে না খাইয়াই বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছিল ; কিন্তু মনোরমা কোনমতেই তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, পীড়াপীড়ি করিয়া সকলের সঙ্গে বসাইয়া দিল। আয়োজন বড়লোকের মতই হইয়াছিল। টুণ্ডলা হইতে আসিবার পথে ট্রেনে কি করিয়া শিবনাথের সহিত আশুবাবুর পরিচয় ঘটিয়াছিল এবং মাত্র দুই-তিনদিনের আলাপেই কি করিয়া সেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় পরিণত হইয়াছে, ইহাই সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তিনি নিজের কৃতিত্ব সপ্রমাণ করিতে কহিলেন, আর, সবচেয়ে বাহাদুরি হচ্ছে আমার কানের। ওঁর গলার অস্ফুট, সামান্য একটু গুঞ্জন-ধ্বনি থেকেই আমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিলাম উনি গুণী, উনি অসাধারণ ব্যক্তি। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে সাক্ষ্যরূপে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কেমন মা, বলিনি তোমাকে শিবনাথবাবু মস্ত লোক? বলিনি যে, মণি, এঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা জীবনে একটা ভাগ্যের কথা?

কন্যা আনন্দে মুখ প্রদীপ্ত করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, তুমি বলেছিলে। তুমি গাড়ি থেকে নেমেই আমাকে জানিয়েছিলে যে—

কিন্তু দেখুন আশুবাবু—

বক্তা অক্ষয়। সকলেই চকিত হইয়া উঠিলেন। অবিনাশ ব্যস্ত হইয়া বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, আহা, থাক না অক্ষয়। থাক না আজ ও-সব আলোচনা—

অক্ষয় চোখ বুজিয়া চক্ষু-লজ্জার দায় এড়াইয়া বার-কয়েক মাথা নাড়িলেন, কহিলেন, না অবিনাশ বাবু, চাপলে চলবে না। শিবনাথবাবুর সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করা আমি কর্তব্য জ্ঞান করি। উনি—

আহা হা,—কর কি অক্ষয়! কর্তব্য-জ্ঞান ত আমাদেরও আছে হে, হবে এখন আর একদিন। এই বলিয়া অবিনাশ তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া থামাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না। ধাক্কায় অক্ষয়ের দেহ টলিল, কিন্তু কর্তব্য-নিষ্ঠা টলিল না। বলিলেন, আপনারা জানেন বৃথা সঙ্কোচ আমার নেই। দুর্নীতির প্রশ্রয় আমি দিতেই পারিনে।

অসহিষ্ণু হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, সে কি আমরাই দিতে চাই নাকি? কিন্তু তার কি স্থান-কাল নেই?

অক্ষয় কহিলেন, না। উনি এ শহরে যদি আর না আসতেন, যদি ভদ্র পরিবারে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা না করতেন, বিশেষতঃ, কুমারী মনোরমা যদি না সংশ্লিষ্ট থাকতেন—

উদ্বেগে আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং অজানা শঙ্কায় মনোরমার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

হরেন্দ্র কহিল, It is too much!

অক্ষয় সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, No it is not.

অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, আহা হা—করচ কি তোমরা?

অক্ষয় কোন কথাই কানে তুলিলেন না, বলিলেন, আগ্রায় উনিও একদিন প্রফেসর ছিলেন। ওঁর বলা উচিত ছিল আশুবাবুকে কি করে সে চাকরি গেল।

হরেন্দ্র কহিল, স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলেন। পাথরের ব্যবসা করবার জন্যে।

অক্ষয় প্রতিবাদ করিলেন,—মিছে কথা।

শিবনাথ নিঃশব্দে আহার করিতেছিল, যেন এই সকল বাদ-বিতণ্ডার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। এখন মুখ তুলিয়া চাহিল এবং অত্যন্ত সহজভাবে বলিল, মিছে কথাই ত কারণ, প্রফেসরি নিজের ইচ্ছেয় না ছাড়লে পরের অর্থাৎ, আপনাদের ইচ্ছেয় ছাড়তে হতো। আর তাই ত হলো।

আশুবাবু সবিস্ময়ে কহিলেন, কেন?

শিবনাথ কহিল, মদ খাবার জন্যে।

অক্ষয় ইহার প্রতিবাদ করিলেন, না, মদ খাবার অপরাধে নয়, মাতাল হবার অপরাধে।

শিবনাথ কহিল, যে মদ খায় সে-ই কখনো-না-কখনো মাতাল হয়। যে হয় না, হয় সে মিছে কথা বলে, না হয় সে মদের বদলে জল খায়। এই বলিয়া হাসিতে লাগিল।

ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, নির্লজ্জের মত আপনি হয়ত হাসতে পারেন, কিন্তু এ অপরাধ আমরা ক্ষমা করতে পারিনে।

শিবনাথ কহিল, পারেন, এ অপবাদ ত আমি দিইনি। আমাকে স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করবার জন্যে আপনারা স্বেচ্ছায় যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন। এ সত্য আমি স্বীকার করি।

অক্ষয় কহিলেন, তা হলে আশা করি আরও একটা সত্য এমনিই স্বীকার করবেন। আপনি হয়ত জানেন না যে, আপনার অনেক খবরই আমি জানি।

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না জানিনে। তবে, এ জানি, অপরের সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল যেমন অপরিসীম, খবর সংগ্রহ করবার অধ্যবসায়ও তেমনি বিপুল। কি স্বীকার করতে হবে আদেশ করুন।

অক্ষয় কহিলেন, আপনার স্ত্রী বিদ্যমান। তাঁকে ত্যাগ করে আপনি আবার বিবাহ করেছেন। সত্য কি না?

আশুবাবু সহসা চটিয়া উঠিলেন,—আপনি কি-সব বলছেন অক্ষয়বাবু? একি কখনো হয়, না হতে পারে?

শিবনাথ নিজেই বাধা দিল, বলিল, কিন্তু তাই হয়েছে আশুবাবু! তাঁকে ত্যাগ করে আমি আবার বিবাহ করেছি।

বলেন কি? কি ঘটেছিল?

শিবনাথ কহিল, বিশেষ কিছুই না। স্ত্রী চিররুগ্ন। বয়সও ত্রিশ হতে চললো,—মেয়েমানুষের পক্ষে এই ত যথেষ্ট! তাতে ক্রমাগত রোগ ভোগ করে করে দাঁত পড়ে চুল পেকে একেবারে যেন বুড়ি হয়ে গেছে। এই জন্যেই ত্যাগ করে আবার একটা বিয়ে করতে হলো।

আশুবাবু বিহ্বল-চক্ষে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,—অ্যাঁ! শুধু এই জন্যে? তাঁর আর কোন অপরাধ নেই?

শিবনাথ কহিল, না, মিথ্যে একটা অপবাদ দিয়ে লাভ কি আশুবাবু?

তাহার এই নির্মল সত্যবাদিতায় অবিনাশ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল—লাভ কি আশুবাবু! পাষণ্ড! তোমার লাভ-লোকসান চুলোয় যাক, একবার মিথ্যে করেই বল যে, সে গভীর অপরাধ করেছিল, তাই তাকে ত্যাগ করেছ। একটা মিথ্যেতে আর তোমার পাপ বাড়বে না।

শিবনাথ রাগ করিল না, শুধু কহিল, কিন্তু এরকম অযথা কথা আমি বলতে পারিনে।

হরেন্দ্র সহসা জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, বিবেক বলে কি আপনার কোথাও কিছু নেই শিবনাথবাবু?

শিবনাথ ইহাতেও রাগ করিল না ; শান্তভাবে কহিল, এ বিবেক অর্থহীন। একটা মিথ্যে বিবেকের শিকল পায়ে জড়িয়ে নিজেকে পঙ্গু করে তোলার আমি পক্ষপাতী নই। চিরদিন দুঃখ ভোগ করে যাওয়াটাই ত জীবন-ধারণের উদ্দেশ্য নয়।

আশুবাবু গভীর ব্যথায় আহত হইয়া কহিলেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীর দুঃখটা একবার ভেবে দেখুন। তাঁর রুগ্ন হয়ে পড়াটা পরিতাপের বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাই বলে, অসুখ ত অপরাধ নয় শিবনাথবাবু? বিনা দোষে—

বিনা দোষে আমিই বা আজীবন দুঃখ সইব কেন? একজনের দুঃখ আর একজনের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই যে সুবিচার হয় সে বিশ্বাস আমার নেই।

আশুবাবু আর তর্ক করিলেন না। শুধু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ বিবাহ হলো কোথায়?

গ্রামেই।

সতীনের উপর মেয়ে দিলে—এর বোধহয় বাপ-মা নেই।

শিবনাথ কহিল, না। আমাদেরই ঝি-র বিধবা মেয়ে।

বাড়ির ঝি-র মেয়ে? চমৎকার! কি জাত?

ঠিক জানিনে। তাঁতি-টাতি হবে বোধ হয়।

অক্ষয় বহুক্ষণ কথা কহে নাই, এখন জিজ্ঞাসা করিল, এটির অক্ষর-পরিচয়টুকুও নেই বোধ হয়?

শিবনাথ কহিল, অক্ষর-পরিচয়ের লোভে ত বিবাহ করিনি, করেছি রূপের জন্যে। এ বস্তুটির বোধ হয় তাতে অভাব নেই।

এই উক্তির পরে মনোরমা আর একবার উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু এবারও তাহার দুই পা পাথরের ন্যায় ভারী হইয়া রহিল। কৌতূহল ও উত্তেজনাবশে কেহই তাহার প্রতি চাহে নাই। চাহিলে হয়ত ভয় পাইত।

হরেন্দ্র কহিল, তা হলে এটা বোধ হয় সিভিল বিবাহই হলো?

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, না—বিবাহ হলো শৈব মতে।

অবিনাশ কহিলেন, অর্থাৎ, ফাঁকির রাস্তাটুকু যেন দশদিক দিয়েই খোলা থাকে, না শিবনাথ?

শিবনাথ সহাস্যে কহিল, এটা ক্রোধের কথা অবিনাশবাবু। নইলে বাবা দাঁড়িয়ে থেকে যে বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যে ত ফাঁকি ছিল না, অথচ ফাঁক যথেষ্টই ছিল। সেটা বার করবার চোখ থাকা চাই।

অবিনাশ উত্তর দিতে পারিলেন না, সমস্ত মুখ তাঁহার ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল।

আশুবাবু নিঃশব্দ নতমুখে বসিয়া কেবলি ভাবিতে লাগিলেন, এ কি হইল! এ কি হইল!

মিনিট দুই-তিন কাহারও মুখে কথা নাই, নিরানন্দ ও কলহের অবরুদ্ধ বাতাসে ঘর ভরিয়া গেছে,—বাহিরের একটা দমকা হাওয়া না পাইলেই নয়, ঠিক এমনি মনোভাব লইয়া অবিনাশবাবু অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, যাক, যাক, যাক,—যাক এ সব কথা। শিবনাথ, তা হলে সেই পাথরের কারবারটা করচ? না?

শিবনাথ বলিল, হাঁ।

তোমার বন্ধুর নাবালক ছেলেমেয়েদের ব্যবস্থা ত তোমাকেই করতে হল? তাদের মা আছেন, না? অবস্থা কেমন? তেমন ভাল নয় বোধ হয়?

না, খুব খারাপ।

অবিনাশ কহিলেন, আহা! হঠাৎ মারা গেলেন, আমরা ভেবেছিলাম টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন। কিন্তু তোমার বন্ধু ছিলেন বটে! অকৃত্রিম সুহৃদ!

শিবনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ, আমরা পাঠশালা থেকে একসঙ্গে পড়েছিলাম।

অবিনাশ বলিলেন, তাই তোমার এতখানি সে-সময়ে তিনি করতে পেরেছিলেন। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, কিন্তু সে যাই হোক, শিবনাথ, এখন একাকী তোমাকেই যখন সমস্ত কারবারটা দেখতে হবে একটা অংশের দাবী করলে না কেন? মাইনের মত—

শিবনাথ কথাটা শেষ করিতে দিল না, কহিল, অংশ কিসের? কারবার ত একলা আমার।

প্রফেসরের দল যেন আকাশ হইতে পড়িল। অক্ষয় কহিলেন, পাথরের কারবারটা হঠাৎ আপনার হয়ে গেল কি-রকম শিবনাথবাবু?

শিবনাথ গম্ভীর হইয়া শুধু জবাব দিল, আমার বৈ কি।

অক্ষয় বলিলেন, কখ্‌খনো না। আমরা সবাই জানি যোগীনবাবুর।

শিবনাথ জবাব দিল, জানেন ত আদালতে গিয়ে সাক্ষী দিয়ে এলেন না কেন? কোন ডকুমেন্ট ছিল? শুনেছিলেন?

অবিনাশ চকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, না শুনিনি কিছুই। কিন্তু এ কি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল নাকি?

শিবনাথ কহিল, হাঁ। যোগীনের সম্বন্ধী নালিশ করেছিলেন। ডিক্রি আমিই পেয়েছি।

অবিনাশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, বেশ হয়েচে। তা হলে শেষ পর্যন্ত বিধবাদের কিছুই দিতে হল না।

শিবনাথ বলিল, না। খালিম, চপটা খাসা রেঁধেচ হে! আর দু-একটা আন ত?

আশুবাবু অভিভূতের ন্যায় বসিয়া ছিলেন, চমকিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, কৈ আপনারা ত কিছুই খাচ্চেন না?

আহারের রুচি ও ক্ষুধা সকলেরই অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। মনোরমা নিঃশব্দে উঠিয়া যাইতেছিল, শিবনাথ ডাকিয়া কহিল, কি রকম! আমাদের খাওয়া শেষ না হতেই যে বড় চলে যাচ্ছেন?

মনোরমা এ কথার উত্তর দিল না, ফিরিয়াও চাহিল না ; ঘৃণায় তাহার সর্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল।

তিন

উপরোক্ত ঘটনার পরে সপ্তাহকাল গত হইয়াছে। দিন-দুই হইতে অসময়ে মেঘ করিয়া বৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, আজও সকাল হইতে মাঝে মাঝে জল পড়িয়া মধ্যাহ্নে খানিকক্ষণ

বন্ধ ছিল, কিন্তু মেঘ কাটে নাই। যে কোন সময়েই পুনরায় শুরু হইয়া যাইতে পারে, এমনি যখন আকাশের অবস্থা, মনোরমা ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়া তাহার পিতার ঘরে দেখা দিল। আশুবাবু মোটা রকমের একটা বালাপোশ গায়ে দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া ছিলেন, তাঁহার হাতে একখানা বই। মেয়ে আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কৈ বাবা, তুমি এখনও তৈরি হয়ে নাও নি, আজ যে আমাদের এতবাবী খাঁর কবর দেখতে যাবার কথা।

কথা ত ছিল মা, কিন্তু আজ আমার সেই কোমরের বাতটা—

তা হলে মোটরটা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে দি। কাল না হয় যাওয়া যাবে, কি বল বাবা?

পিতা বাধা দিয়া বলিলেন, না না, না বেড়ালে তোর আবার মাথা ধরে। তুই না হয় একটুখানি ঘুরে আয় গে মা, আমি ততক্ষণ এই মাসিকপত্রটায় চোখ বুলিয়ে নিই। গল্পটা লিখেচে ভাল।

আচ্ছা, চললাম। কিন্তু ফিরতে আমার দেরি হবে না। এসে তোমার কাছে গল্পটা শুনব তা বলে যাচ্চি, এই বলিয়া সে একাকীই বাহির হইয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই মনোরমা বাড়ি ফিরিয়া পিতার ঘরে ঢুকিতেঢুকিতে প্রশ্ন করিল, কেমন গল্প বাবা? শেষ হল? কি লিখেচে?

কিন্তু, কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে চমকিয়া দেখিল তাহার পিতা একা নহেন, সম্মুখে শিবনাথ বসিয়া।

শিবনাথ উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, কতদূর বেড়িয়ে এলেন?

মনোরমা উত্তর দিল না, শুধু নমস্কারের পরিবর্তে মাথাটা একটুখানি হেলাইয়া তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পিতাকে কহিল, পড়া শেষ হয়ে গেল বাবা? কেমন লাগল?

আশুবাবু শুধু বলিলেন, না।

কন্যা কহিল, তা হলে আমি নিয়ে যাই, পড়ে এখখুনি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব। এই বলিয়া সে কাগজখানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু নিজের শয়নকক্ষে আসিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কাপড়-ছাড়া, হাত-মুখ ধোয়া পড়িয়া রহিল, কাগজখানা একবার খুলিয়াও দেখিল না, কোন গল্প, কে লিখিয়াছে কিংবা কেমন লিখিয়াছে।

এইভাবে বসিয়া সে যে কি ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই ; এই সময়ে চাকরটাকে সমুখ দিয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ওরে, বাবার ঘর থেকে লোকটি চলে গেছে?

বেহারা বলিল, হাঁ।

কখন গেল?

বৃষ্টি পড়বার আগেই।

মনোরমা জানালার পর্দা সরাইয়া দেখিল, কথা ঠিক, পুনরায় বৃষ্টি শুরু হইয়াছে, কিন্তু বেশী নয়। উপরের দিকে চাহিয়া দেখিল পশ্চিম দিগন্তে মেঘ গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, রাত্রে মুষলধারায় বারি-পতনের সূচনা হইয়াছে। কাগজখানা হাতে করিয়া পিতার বসিবার ঘরে আসিয়া দেখিল, তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বইটা তাঁহার কেদারার হাতলের উপর ধীরে ধীরে রাখিয়া দিয়া কহিল, বাবা, তুমি জান এ-সব আমি ভালবাসিনে। এই বলিয়া সে পার্শ্বের চৌকিটায় বসিয়া পড়িল।

আশুবাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি-সব মা?

মনোরমা বলিল, তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ কি আমি বলচি। গুণীর আদর করতে আমিও কম জানিনে বাবা, কিন্তু তাই বলে শিবনাথবাবুর মত একজন দুর্বৃত্ত দুশ্চরিত্র মাতালকে কি বলে আবার প্রশ্রয় দিচ্ছ?

আশুবাবু লজ্জায় ও সঙ্কোচে একেবারে যেন পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের উপর বহুসংখ্যক পুস্তক স্তূপাকার করিয়া রাখা ছিল, মনোরমা সময়াভাববশতঃ এখনো তাহাদের যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে পারে নাই। সেইদিকে চক্ষু নির্দেশ করিয়া শুধু কেবল বলিতে পারিলেন, ওই যে উনি—

মনোরমা সভয়ে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, শিবনাথ টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া একখানা বই খুঁজিতেছে। বেহারা তাহাকে ভুল সংবাদ দিয়াছিল। মনোরমা লজ্জায় মাটির সহিত যেন মিশিয়া গেল।

শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। শিবনাথ কহিল, বইটা খুঁজে পেলাম না, আশুবাবু। এখন তা হলে চললাম।

আশুবাবু আর কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু বলিলেন, বাইরে বৃষ্টি পড়চে যে?

শিবনাথ কহিল, তা হোক। ও বেশী নয়। এই বলিয়া তিনি যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। মনোরমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, আমি দৈবাৎ যা শুনে ফেলেচি সে আমার দুর্ভাগ্যও বটে, সৌভাগ্যও বটে। সেজন্যে আপনি লজ্জিত হবেন না। ও আমাকে প্রায়ই শুনতে হয়। তবু এও আমি নিশ্চয় জানি, কথাগুলো আমার সম্বন্ধে বলা হলেও আমাকে শুনিয়ে বলেন নি। অত নির্দয় আপনি কিছুতে নন।

একটুখানি থামিয়া বলিলেন, কিন্তু আমার অন্য নালিশ আছে। সেদিন অক্ষয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকের দল আমার বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করেছিলেন, আমি যেন একটা মতলব নিয়ে এ-বাড়িতে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছি। সকল মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা এক নয়—এও একটা কথা, এবং বাইরে থেকে কোন একটা ঘটনা যা চোখে পড়ে, সেও তার সবটুকু নয়,—এও আর একটা কথা। কিন্তু কথা যাই হোক, আপনাদের মধ্যে প্রবেশ করার কোন গূঢ় অভিসন্ধি সেদিনও আমার ছিল না, আজও নেই। সহসা আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আমার গান শুনতে আপনি ভালবাসেন, বাসা ত আমার বেশী দূরে নয়, যদি কোনদিন সে খেয়াল হয় পায়ের ধূলো দেবেন, আমি খুশীই হব। এই বলিয়া পুনরায় নমস্কার করিয়া শিবনাথ বাহির হইয়া গেলেন। পিতা বা কন্যা উভয়ের কেহই একটা কথারও জবাব দিতে পারিলেন না। আশুবাবুর বুকের মধ্যে অনেক কথাই একসঙ্গে ঠেলিয়া আসিল, কিন্তু প্রকাশ পাইল না। বাহিরে বৃষ্টি তখন চাপিয়া পড়িতেছিল, এমন কথাও তিনি উচ্চারণ করিতে পারিলেন না, শিবনাথবাবু, ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া যান।

ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম আনিয়া উপস্থিত করিল। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার চা কি এখানেই তৈরি করে দেব বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, চা, আমার জন্যে নয়, শিবনাথ একটুখানি চা খাবেন বলেছিলেন।

মনোরমা ভৃত্যকে চা ফিরাইয়া লইয়া যাইবার ইঙ্গিত করিল। মনের চাঞ্চল্যবশতঃ আশুবাবু কোমরের ব্যথা সত্ত্বেও চৌকি হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, হঠাৎ জানালার কাছে থামিয়া দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ঠাহর করিয়া দেখিয়া কহিলেন, ঐ গাছতলাটায় দাঁড়িয়ে শিবনাথ না? যেতে পারেনি, ভিজচে।

পরক্ষণেই বলিয়া উঠিলেন, সঙ্গে কে একটি স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। বাঙালী মেয়েদের মত কাপড়-পরা,—ও বেচারা বোধ হয় যেন আরও ভিজেচে।

এই বলিয়া তিনি বেহারাকে ডাক দিয়া বলিলেন, যদু, দেখে আয় ত রে, গেটের কাছে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিজচে কে? যে-বাবুটি এইমাত্র গেলেন তিনিই কি না? কিন্তু দাঁড়া—দাঁড়া—

কথা তাঁহার মাঝখানেই থামিয়া গেল, অকস্মাৎ মনের মধ্যে ভয়ানক সন্দেহ জন্মিল, মেয়েটি শিবনাথের সেই স্ত্রী নহে ত?

মনোরমা কহিল, দাঁড়াবে কেন বাবা, গিয়ে শিবনাথবাবুকে ডেকেই আনুক না। এই বলিয়া সে উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার ধারে পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিল, উনি চা খেতে চেয়েছিলেন জানলে আমি কিছুতেই যেতে দিতাম না।

মেয়ের কথার উত্তরে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, তা বটে মণি, কিন্তু, আমার ভয় হচ্চে ঐ স্ত্রীলোকটি বোধ হয় ওঁর সেই স্ত্রী। সাহস করে এ-বাড়িতে সঙ্গে আনতে পারেন নি। এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কোথাও অপেক্ষা করছিলেন।

কথা শুনিয়া মনোরমার নিশ্চয় মনে হইল এ সে-ই। একবার তাহার দ্বিধা জাগিল, এ-বাটীতে উহাকে কোন অজুহাতেই আহ্বান করিয়া আনা চলে কি না, কিন্তু পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া এ সঙ্কোচ সে ত্যাগ করিল। বেহারাকে ডাকিয়া কহিল, যদু, ওঁদের দু'জনকেই তুমি ডেকে নিয়ে এস। শিবনাথবাবু যদি জিজ্ঞাসা করেন কে ডাকচে, আমার নাম করো।

বেহারা চলিয়া গেল। আশুবাবু উৎকণ্ঠায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, মণি কাজটা হয়ত ঠিক হল না।

কেন বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, শিবনাথ যাই হোক, উচ্চশিক্ষিত, ভদ্রলোক,—তাঁর কথা আলাদা। কিন্তু সেই সূত্র ধরে কি এই মেয়েটির সঙ্গেও পরিচয় করা চলে? জাতের উঁচু-নীচু আমরা হয়ত তেমন মানিনে, কিন্তু বিভেদ ত একটা কিছু আছেই। ঝি-চাকরের সঙ্গে ত বন্ধুত্ব করা যায় না মা।

মনোরমা কহিল, বন্ধুত্ব করার ত প্রয়োজন নেই বাবা। বিপদের মুখে পথের পথিককেও ঘণ্টা-কয়েকের জন্য আশ্রয় দেওয়া যায়। আমরা তাই শুধু করব।

আশুবাবুর মন হইতে দ্বিধা ঘুচিল না। বার-কয়েক মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, ঠিক তাই নয়। মেয়েটি এসে পড়লে ওর সঙ্গে যে তুমি কি ব্যবহার করবে, আমি তাই শুধু ভেবে পাচ্ছিনে।

মনোরমা কহিল, আমার ওপর কি তোমার বিশ্বাস নেই বাবা?

আশুবাবু একটুখানি শুষ্ক হাস্য করিলেন, বলিলেন, তা আছে। তবুও জিনিসটা ঠিক ঠাউরে পাচ্চিনে। তোমার যাঁরা সমশ্রেণীর লোক তাঁদের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করতে হয় সে তুমি জান। কম মেয়েই এতখানি জানে। দাসী-চাকরের প্রতি আচরণও তোমার নির্দোষ, কিন্তু এ হল—কি জান মা, শিবনাথ মানুষটিকে আমি স্নেহ করি, আমি তার গুণের অনুরাগী—দৈব-বিড়ম্বনায় আজ অকারণে সে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করে গেছে, আবার ঘরে ডেকে এনে তাঁকে ব্যথা দিতে আমি চাইনে।

মনোরমা বুঝিল, এ তাহারই প্রতি অনুযোগ, কহিল, আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, হওয়াটাই কি সহজ মা? কারণ, কি যে হওয়া উচিত সে ধারণা আমারও বেশ স্পষ্ট নেই, কেবল এই কথাটাই মনে হচ্চে, শিবনাথ যেন না আমাদের গৃহে দুঃখ পায়।

মনোরমা কি একটা বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ চকিত হইয়া কহিল, এই যে এঁরা আসচেন।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বাহিরে আসিলেন—বেশ যা হোক শিবনাথবাবু, ভিজে যে একেবারে—

শিবনাথ কহিলেন, হাঁ, হঠাৎ জলটা একেবারে চেপে এল,—তা আমার চেয়ে ইনিই ভিজেছেন ঢের বেশী। এই বলিয়া সঙ্গের মেয়েটিকে দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু মেয়েটি যে কে এ পরিচয় তিনিও স্পষ্ট করিয়া দিলেন না, ইঁহারাও সে কথা স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন না।

বস্তুতঃ মেয়েটির সমস্ত দেহে শুষ্ক বলিয়া আর কোন কিছু ছিল না। জামা-কাপড় ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে, মাথার নিবিড় কৃষ্ণ কেশের রাশি হইতে জলধারা গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে—পিতা ও কন্যা এই নবাগতা রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া অপরিসীম বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু নিজে কবি নহেন, কিন্তু তাঁহার প্রথমেই মনে হইল এই নারী-রূপকেই বোধ হয় পূর্বকালের কবিরা শিশির-ধোয়া পদ্মের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন এবং জগতে এত বড় সত্য তুলনাও হয়ত আর নাই। সেদিন অক্ষয়ের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তরে শিবনাথ উত্যক্ত হইয়া যে জবাব দিয়াছিলেন, তিনি লেখা-পড়া জানার জন্য বিবাহ করেন নাই, করিয়াছেন রূপের জন্য, কথাটা যে কি পরিমাণে সত্য তখন তাহাতে কেহ কান দেয় নাই, এখন স্তব্ধ হইয়া আশুবাবু শিবনাথের সেই কথাটাই বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, বাস্তবিক, জীবন-যাত্রার প্রণালী ইহাদের ভদ্র ও নীতি-সম্মত না-ই হউক, পতি-পত্নী সম্বন্ধের পবিত্রতা ইহাদের

মধ্যে না-ই থাকুক, কিন্তু এই নশ্বর জগতে তেমনি নশ্বর এই দুটি নরনারীর দেহ আশ্রয় করিয়া সৃষ্টির কি অবিনশ্বর সত্যই না ফুটিয়াছে! আর পরমাশ্চর্য এই, যেদেশে রূপ বাছিয়া লইবার কোন বিশিষ্ট পন্থা নাই, যেদেশে নিজের চক্ষুকে রুদ্ধ রাখিয়া অপরের চক্ষুকেই নির্ভর করিতে হয়, সে অন্ধকারে ইহারা পরস্পরের সংবাদ পাইল কি করিয়া? কিন্তু এই মোহাচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া যাইতে তাঁহার মুহূর্তকালের অধিক সময় লাগিল না। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, শিবনাথবাবু, ভিজে কাপড়-জামাটা ছেড়ে ফেলুন। যদু, আমার বাথরুমে বাবুকে নিয়ে যা।

বেহারার সঙ্গে শিবনাথ চলিয়া গেল, বিপদে পড়িল এইবার মনোরমা। মেয়েটি তাহার প্রায় সমবয়সী এবং সিক্তবস্ত্র পরিবর্তনের ইহারও অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু আভিজাত্যের যে পরিচয় সেদিন শিবনাথের নিজের মুখে শুনিয়াছে তাহাতে কি বলিয়া যে ইহাকে সম্বোধন করিবে ভাবিয়া পাইল না। রূপ ইহার যত বড়ই হউক, শিক্ষাসংস্কারহীন নীচ-জাতীয়া এই দাসী-কন্যাটিকে এস বলিয়া ডাকিতেও পিতার সমক্ষে তাহার বাধ বাধ করিল, আসুন বলিয়া সসম্মানে আহ্বান করিয়া নিজের ঘরে লইয়া যাইতেও তাহার তেমনি ঘৃণা বোধ হইল। কিন্তু সহসা এই সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল মেয়েটি নিজে। মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, আমারও সমস্ত ভিজে গেছে, আমাকেও একখানা কাপড় আনিয়ে দিতে হবে।

দিচ্চি। বলিয়া মনোরমা তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল এবং ঝিকে ডাকিয়া বলিয়া দিল যে ইঁহাকে স্নানের ঘরে লইয়া গিয়া যাহা কিছু আবশ্যক সমস্ত দিতে।

মেয়েটি মনোরমার আপাদমস্তক বার বার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, আমাকে একখানা ফরসা ধোপার বাড়ির কাপড় দিতে বলে দিন।

মনোরমা কহিল, তাই দেবে।

মেয়েটি ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, সে ঘরে সাবান আছে ত?

ঝি কহিল, আছে।

আমি কিন্তু কারও মাখা-সাবান গায়ে মাখিনে, ঝি।

এই অপরিচিত মেয়েটির মন্তব্য শুনিয়া ঝি প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে কহিল, সেখানে একবাক্স নতুন সাবান আছে। কিন্তু, শুনচেন দিদিমণির স্নানের ঘর! তাঁর সাবান ব্যবহার করলে দোষ কি?

মেয়েটি ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, না, সে আমি পারিনে, আমার ভারী ঘেন্না করে। তা ছাড়া যার-তার গায়ের সাবান গায়ে দিলে ব্যামো হয়।

মনোরমার মুখ ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই নির্মল হাসির ছটায় তাহার দুই চক্ষু ঝকঝক করিতে লাগিল। তাহার মনের উপর হইতে যেন একটা মেঘ কাটিয়া গেল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা তুমি শিখলে কার কাছে?

মেয়েটি বলিল, কার কাছে শিখব? আমি নিজেই সব জানি।

মনোরমা কহিল, সত্যি? তা হলে দিয়ো ত আমাদের এই ঝিকে কতকগুলো ভাল কথা শিখিয়ে। ওটা একেবারে নেহাত মুখ্যু। বলিতে বলিতেই সে হাসিয়া ফেলিল।

ঝিও হাসিল, কহিল, চল ঠাকরুন, সাবান-টাবান মেখে তৈরি হয়ে নাও, তার পরে তোমার কাছে বসে অনেক ভাল ভাল কথা শিখে নেব। দিদিমণি, কে ইনি?

মনোরমা হাসি চাপিতে অন্যদিকে মুখ না ফিরাইলে, হয়ত, সে এই অপরিচিত অশিক্ষিত মেয়েটির মুখের পরে কৌতুক ও প্রচ্ছন্ন উপহাসের আভাস লক্ষ্য করিত।

চার

মনোরমা আশুবাবুর শুধু কন্যাই নয়, তাঁহার সঙ্গী, সাথী, মন্ত্রী, বন্ধু,—একাধারে সমস্তই ছিল এই মেয়েটি। তাই পিতার মর্যাদা রক্ষার্থে যে সসঙ্কোচ দূরত্ব সন্তানের অবশ্য পালনীয় বিধি বলিয়া বাঙালী সমাজে চলিয়া আসিতেছে, অধিকাংশ স্থলেই তাহা রক্ষিত হইয়া উঠিত না। মাঝে মাঝে এমন সব আলোচনাও উভয়ের মধ্যে উঠিয়া পড়িত যাহা অনেক পিতার কানেই অত্যন্ত অসঙ্গ

ত ঠেকিবে, কিন্তু ইঁহাদের ঠেকিত না। মেয়েকে আশুবাবু যে কত ভালবাসিতেন তাহার সীমা ছিল না ; স্ত্রী বিয়োগের পরে আর যে বিবাহের প্রস্তাব মনে ঠাঁই দিতেও পারেন নাই, হয়ত তাহারও একটি কারণ এই মেয়েটি। অথচ, বন্ধুমহলে কথা উঠিলে নিজের সাড়ে-তিন মণ ওজনের দেহ ও সেই দেহ বাতে পঙ্গুত্ব-প্রাপ্তির অজুহাত দিয়া সখেদে কহিতেন, আর কেন আবার একটা মেয়ের সর্বনাশ করা ভাই, যে দুঃখ মাথায় নিয়ে মণির মা স্বর্গে গেছেন, সে ত জানি, সে-ই আশু বদ্যির যথেষ্ট।

মনোরমা এ কথা শুনিলে ঘোরতর আপত্তি করিয়া বলিত, বাবা, তোমার এ কথা আমার সয় না। এখানে তাজমহল দেখে কত লোকের কত কি মনে হয়, আমার মনে হয় শুধু তোমাকে আর মাকে। আমার মা গেছেন স্বর্গে দুঃখ সয়ে?

আশুবাবু বলিতেন, তুই ত তখন সবে দশ-বার বছরের মেয়ে, জানিস ত সব। কার গলায় যে কিসের মালা পরার গল্প আছে সে কেবল আমিই জানি রে মণি, আমিই জানি। বলিতে বলিতে তাঁহার দু'চক্ষু ছলছল করিয়া আসিত।

আগ্রায় আসিয়া তিনি অসঙ্কোচে সকলের সহিত মিশিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সর্বাপেক্ষা হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল অবিনাশবাবুর সহিত। অবিনাশ সহিষ্ণু ও সংযত প্রকৃতির মানুষ। তাহার চিত্তের মধ্যে এমন একটি স্বাভাবিক শান্তি ও প্রসন্নতা ছিল যে সে সহজেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। কিন্তু আশুবাবু মুগ্ধ হইয়াছিলেন আরও একটা কারণে। তাঁহারই মত সেও দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করে নাই এবং পত্নী-প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ গৃহের সর্বত্র মৃত স্ত্রীর ছবি রাখিয়াছিল। আশুবাবু তাহাকে বলিতেন, অবিনাশবাবু, লোকে আমাদের প্রশংসা করে, ভাবে আমাদের কি আত্মসংযম, যেন কত বড় কঠিন কাজই না আমরা করেছি। অথচ, আমি ভাবি এ প্রশ্ন ওঠে কি করে? যারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করে তারা পারে বলেই করে। তাদের দোষ দিইনে, ছোটও মনে করিনে। শুধু ভাবি আমি পারিনে। শুধু জানি, মণির মায়ের জায়গায় আর একজনকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করা আমার পক্ষে কেবল কঠিন নয়, অসম্ভব। কিন্তু এ খবর কি তারা জানে? এই না অবিনাশবাবু? নিজের মনটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন দিকি ঠিক কথাটি বলছি কি না?

অবিনাশ হাসিত, বলিত, আমি কিন্তু জোটাতে পারিনি আশুবাবু। মাস্টারি করে খাই, সময়ও পাইনে ও বয়সও হয়েছে, মেয়ে দেবে কে?

আশুবাবু খুশী হইয়া কহিতেন, ঠিক তাই অবিনাশবাবু, ঠিক তাই। আমি সকলকে বলে বেড়িয়েছি, দেহের ওজন সাড়ে-তিন মন, বাতে পঙ্গু, কখন চলতে হার্ট ফেল করে তার ঠিকানা নেই, মেয়ে দেবে কে? কিন্তু জানি, মেয়ে দেবার লোকের অভাব নেই, কেবল নেবার মানুষটাই মরেছে। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—মরেছে অবিনাশ, মরেছে আশু বদ্যি—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—এই বলিয়া সুউচ্চ হাসির শব্দে ঘরের দ্বার জানালা খড়খড়ি সার্সী পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেন।

প্রত্যহ বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইয়া আশুবাবু অবিনাশের বাড়ীর সম্মুখে নামিয়া পড়িতেন, বলিতেন, মণি, সন্ধ্যার সময় ঠাণ্ডা হাওয়াটা আর লাগাবো না, মা, তুমি বরঞ্চ ফেরবার মুখে আমাকে তুলে নিয়ো।

মনোরমা সহাস্যে কহিত, ঠাণ্ডা কোথায় বাবা, হাওয়াটা যে আজ বেশ গরম ঠেকছে!

বাবা বলিতেন, সেও ত ভাল নয় মা, বুড়োদের স্বাস্থ্যের পক্ষে গরম বাতাসটা হানিকর। তুমি একটু ঘুরে এস, আমরা দুই বুড়োতে মিলে ততক্ষণ দুটো কথা কই।

মনোরমা হাসিয়া বলিত, কথা তোমরা দু'টোর জায়গায় দু'শোটা বল আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তোমাদের কেউ এখনো বুড়ো হওনি তা মনে করিয়ে দিয়ে যাচ্চি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইত।

বাতের জন্য যেদিন একটুও আশুবাবু পারিয়া উঠিতেন না সেদিন অবিনাশকে যাইতে হইত। গাড়ি পাঠাইয়া, লোক পাঠাইয়া, চায়ের নিমন্ত্রণ করিয়া, যেমন করিয়াই হউক, আশু বদ্যির নির্বন্ধাতিশয় তাঁহার এড়াইবার জো ছিল না। উভয়ে একত্র হইলে অন্যান্য আলোচনার মধ্যে

শিবনাথের কথাটাও প্রায় উঠিত। সেই যে তাহাকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সবাই মিলিয়া অপমান করিয়া বিদায় করা হইয়াছিল, ইহার বেদনা আশুবাবুর মন হইতে ঘুচে নাই। শিবনাথ পণ্ডিত, শিবনাথ গুণী, তাহার সর্বদেহ যৌবনে, স্বাস্থ্যে ও রূপে পরিপূর্ণ,—এ-সকল কি কিছুই নয়? তবে কিসের জন্য এত সম্পদ ভগবান তাহাকে দুই হাত ভরিয়া দান করিয়াছিলেন? সে কি মানুষের সমাজ হইতে তাহাকে দূর করিবার জন্য? মাতাল হইয়াছে? তা কি হইয়াছে? মদ খাইয়া মাতাল ত এমন কত লোকেই হয়। যৌবনে এ অপরাধ তিনি নিজেও ত করিয়াচেন, তাই বলিয়া কে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে? মানুষের ত্রুটি, মানুষের অপরাধ গ্রহণ করার অপেক্ষা মার্জনা করিবার দিকেই হৃদয়ের অত্যধিক প্রবণতা ছিল বলিয়া তিনি নিজের সঙ্গে এবং অবিনাশের সঙ্গে এই বলিয়া প্রায়ই তর্ক করিতেন। প্রকাশ্যে তাহাকে আর বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস করিতেন না বটে, কিন্তু মন তাঁহার শিবনাথের সঙ্গ নিরন্তর কামনা করিয়া ফিরিত। কেবল একটা কথার তিনি কিছুতেই জবাব দিতে পারিতেন না, অবিনাশ যখন কহিত, এই যে পীড়িত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোক গ্রহণ করা, এটা কি?

আশুবাবু লজ্জিত হইয়া কহিতেন, তাই ত ভাবি শিবনাথের মত লোক এ কাজ পারলে কি করে? কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত, ভিতরে কি একটা রহস্য আছে,—হয়ত—কিন্তু সবাই কি সব কথা সকলের কাছে বলতে পারে, না বলা উচিত?

অবিনাশ কহিত, কিন্তু তার স্ত্রী যে নির্দোষ এ কথা সে ত নিজের মুখেই স্বীকার করেছে?

আশুবাবু পরাস্ত হইয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, তা করেছে বটে।

অবিনাশ বলিত, আর এই যে মৃত বন্ধুর বিধবাকে সমস্ত ফাঁকি দেওয়া, সমস্ত ব্যবসাটাকে নিজের বলে দখল করা এটাই বা কি?

আশুবাবু লজ্জায় মরিয়া যাইতেন। যেন তিনিই নিজে এ দুষ্কার্য করিয়া ফেলিয়াছেন। তাহার পরে অপরাধীর মত ধীরে ধীরে বলিতেন, কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, হয়ত কি একটা রহস্য,—আচ্ছা, আদালতই বা তাঁকে ডিক্রি দিলে কি করে? তারা কি কিছুই বিচার করে দেখেনি?

অবিনাশ কহিত, ইংরাজের আদালতের কথা ছেড়ে দিন আশুবাবু। আপনি নিজেই ত জমিদার,—এখানে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বল কবে জয়ী হয়েছে আমাকে বলতে পারেন?

আশুবাবু কহিতেন, না না, সে কথা ঠিক নয়, সে কথা ঠিক নয়, তবে আপনার কথাও যে অসত্য তাও বলতে পারি নে। কিন্তু কি জানেন—

মনোরমা হঠাৎ আসিয়া পড়িলে হাসিয়া বলিত, জানেন সবাই। বাবা, তুমি নিজেই মনে মনে জান অবিনাশবাবু মিথ্যে তর্ক করছেন না।

ইহার পরে আশুবাবুর মুখে আর কথা যোগাইত না।

শিবনাথের সম্বন্ধে মনোরমার বিমুখতাই ছিল যেন সবচেয়ে বেশী। মুখে সে বিশেষ কিছু বলিত না, কিন্তু পিতা কন্যাকেই ভয় করিতেন সর্বাপেক্ষা অধিক।

যেদিন সন্ধ্যাবেলায় শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী জলে ভিজিয়া এ-বাড়িতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহার দিন-দুই পর্যন্ত আশুবাবু বাতের প্রকোপে একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিজেও নড়িতে পারেন নাই, অবিনাশও কাজের তাড়ায় আসিয়া জুটিতে পারেন নাই। কিন্তু আসিবামাত্রই আশুবাবু বাতের ভীষণ যাতনা ভুলিয়া আরামকেদারায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, ওহে অবিনাশবাবু, শিবনাথের স্ত্রীর সঙ্গে যে আমাদের পরিচয় হয়ে গেল। মেয়েটি যেন একেবারে লক্ষ্মীর প্রতিমা! এমন রূপ কখনো দেখিনি। মনে হল এদের দু'জনকে ভগবান যেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিয়েছেন।

বলেন কি!

হাঁ তাই। দুজনকে পাশাপাশি রাখলে চেয়ে থাকতে হবে। চোখ ফেরাতে পারবেন না, তা বলে রাখলাম অবিনাশবাবু।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, হতে পারে। কিন্তু আপনি যখন প্রশংসা শুরু করেন তখন তার আর মাত্রা থাকে না আশুবাবু।

আশুবাবু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, ও দোষ আমার আছে। মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে পারলে এ-ক্ষেত্রেও যেতাম, কিন্তু শক্তি নেই। যাই কেন না এঁর সম্বন্ধে বলি মাত্রার বাঁ দিকেই থাকবে, ডানদিকে পৌঁছবে না।

অবিনাশ সম্পূর্ণ যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু পূর্বের পরিহাসের ভঙ্গীও আর রহিল না। বলিলেন, সেদিন শিবনাথ তা হলে অকারণ দম্ভ করেনি বলুন? কিন্তু পরিচয় হল কি করে?

আশুবাবু বলিলেন, নিতান্তই দৈবের ঘটনা। শিবনাথের প্রয়োজন ছিল আমার কাছে। স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু বাড়িতে আনতে সাহস করেন নি, বাইরে একটা গাছতলায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বিধি বক্র হলে মানুষের কৌশল খাটে না, অসম্ভব বস্তুও সম্ভব হয়ে পড়ে। হলও তাই। এই বলিয়া তিনি সেদিনের ঝড়-বাদলের ব্যাপার সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিলেন, আমাদের মণি কিন্তু খুশী হতে পারেনি। ওরই সমবয়সী, হয়ত কিছু বড় হতেও পারে, কিন্তু মণি বলে শিবনাথবাবু সেদিন সত্য কথাই বলেছিলেন, মেয়েটি যথার্থই অশিক্ষিত কোন এক দাসী-কন্যা। অন্ততঃ সে যে আমাদের ভদ্রসমাজের নয়, তাতে তার সন্দেহ নেই।

অবিনাশ কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন, কি করে বোঝা গেল?

আশুবাবু বলিলেন, মেয়েটি নাকি ভিজে কাপড়ের পরিবর্তে একখানি ফরসা কাপড় চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তিনি কারও ব্যবহার করা সাবান ব্যবহার করতে পারেন না, ঘৃণা বোধ হয়।

অবিনাশ বুঝিতে পারিলেন না ইহার মধ্যে ভদ্রসমাজের বহির্ভূত প্রার্থনা কি আছে।

আশুবাবুও ঠিক তাহাই কহিলেন, বলিলেন, এর মধ্যে অসঙ্গত যে কি আছে আমি আজও ভেবে পাইনি। কিন্তু মণি বলে, কথার মধ্যে নয় বাবা, সেই বলার ভঙ্গীর মধ্যে যে কি ছিল সে কানে না শুনলে বোঝা যায় না। তা ছাড়া, মেয়েদের চোখ-কানকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। আমাদের ঝিটির পর্যন্ত বুঝতে নাকি বাকি ছিল না যে, মেয়েটি তাদেরই একজন, তার মনিবদের কেউ নয়। খুব নীচু থেকে হঠাৎ উঁচুতে তুলে দিলে যা হয়, এরও হয়েছে ঠিক তাই।

অবিনাশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, দুঃখের কথা! কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হল কি ভাবে? আপনার সঙ্গে কি কথা কইলে নাকি?

আশুবাবু বলিলেন, নিশ্চয়। ভিজে কাপড় ছেড়ে সোজা আমার ঘরে এসে বসলেন। কুণ্ঠার বালাই নেই, আমার স্বাস্থ্য কেমন, কি খাই, কি চিকিৎসা চলচে, জায়গাটা ভাল লাগচে কিনা—প্রশ্ন করার কি সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব। বরঞ্চ, শিবনাথ আড়ষ্ট হয়ে রইলেন, কিন্তু তাঁর ত জড়তার চিহ্নমাত্র দেখলাম না। না কথায়, না আচরণে।

অবিনাশ জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা তখন বুঝি ছিলেন না।

না। তার কি যে অশ্রদ্ধা হয়ে গেছে তা বলবার নয়। তাঁরা চলে গেলে বললাম, মণি, ওঁদের বিদায় দিতেও একবার এলে না? মণি বললে, আর যা বল বাবা পারি, কিন্তু বাড়ির দাসী-চাকরকে বসুন বলে অভ্যর্থনা করতেও পারব না, আসুন বলে বিদায় দিতেও পারব না। নিজের বাড়িতে হলেও না। এর পরে আর বলবার আছে কি!

বলিবার কি আছে অবিনাশ নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না, শুধু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, বলা কঠিন আশুবাবু। কিন্তু মনে হয় যেন মনোরমা ঠিক কথাই বলেছেন। এই সব স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমাদের ঘরের মেয়েদের আলাপ পরিচয় না থাকাই ভাল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

অবিনাশ বলিতে লাগিলেন, শিবনাথের সঙ্কোচের কারণও বোধ করি এই। সে ত জানে সবই,—তার ভয় ছিল পাছে কোন বিশ্রী কদর্য বাক্য তার স্ত্রীর মুখ দিয়ে বার হয়ে যায়।

আশুবাবু হাসিলেন, কহিলেন, হতেও পারে।

অবিনাশ কহিলেন, নিশ্চয় এই।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন না, শুধু কহিলেন, মেয়েটি কিন্তু লক্ষ্মীর প্রতিমা। এই বলিয়া ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে শুইলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া অবিনাশ কহিলেন, আমার কথায় কি আপনি ক্ষুণ্ণ হলেন?

আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন না, তেমনি অর্ধশায়িতভাবে থাকিয়াই ধীরে ধীরে বলিলেন, ক্ষুণ্ণ নয় অবিনাশবাবু, কিন্তু কেমন-একটা ব্যথার মত লেগেছে। তাই ত আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এমন ছটফট করছিলাম। কি মিষ্টি কথা মেয়েটির,—শুধু রূপই নয়।

অবিনাশ সহাস্যে উত্তর দিলেন, কিন্তু আমি ত তাঁর রূপও দেখনি, কথাও শুনিনি আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে সুযোগ যদি কখনো হয় ত তাদের ত্যাগ করার অবিচারটা বুঝবেন। আর কেউ না বুঝুক আপনি বুঝতে পারবেন এ আমি নিশ্চয় জানি। যাবার সময় মেয়েটি আমাকে বললে, আপনি আমার স্বামীর গান শুনতে ভালবাসেন, কেন তাঁকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠান না? আমি যে কেউ আছি এ কথা না-ই বা মনে করলেন। আমি ত আপনাদের মধ্যে আসবার দাবী করিনে।

অবিনাশ কিছু আশ্চর্য হইলেন, বলিলেন, এ ত খুব অশিক্ষিতের মত কথা নয় আশুবাবু? শুনলে মনে হয় তার নিজের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাই আমরা করি, স্বামীটিকে সে ভদ্র-সমাজে চালিয়ে দিতে চায়।

আশুবাবু বলিলেন, বস্তুতঃ তার কথা শুনে মনে হল সে সব জানে। আমরা যে সেদিন তার স্বামীকে অপমান করে বিদায় করেছিলাম, এ ঘটনা শিবনাথ তার কাছে গোপন করেনি। খুব গোপন করে চলবার লোকও শিবনাথ নয়।

অবিনাশ স্বীকার করিয়া কহিলেন, স্বভাবতঃ সে তাই বটে। কিন্তু একটা জিনিস সে নিশ্চয়ই গোপন করেছে। এই মেয়েটি যেই হোক একে ত সে সত্যই বিবাহ করেনি।

আশুবাবু কহিলেন, শিবনাথ বলেন, মেয়েটি তাঁর স্ত্রী, মেয়েটি পরিচয় দিলেন তাঁকে স্বামী বলে।

অবিনাশ কহিলেন, দিন পরিচয়। কিন্তু এ সত্য নয়। এর মধ্যে যে গভীর রহস্য আছে, অক্ষয়বাবু সন্ধান নিয়ে একদিন তা উদ্ঘাটিত করবেনই করবেন।

আশুবাবু বলিলেন, তাতে আমারও সন্দেহ নেই, কারণ অক্ষয়বাবু শক্তিমান্ পুরুষ। কিন্তু এঁদের পরস্পরের স্বীকারোক্তির মধ্যে সত্য নেই,-সত্য আছে যে রহস্য গোপনে আছে, তাকেই বিশ্বের সুমুখে অনাবৃত করায়? অবিনাশবাবু, আপনি ত অক্ষয় নন, এ ত আপনার কাছে আমি প্রত্যাশা করিনে।

অবিনাশবাবু লজ্জা পাইয়াও কহিলেন, কিন্তু সমাজ ত আছে! তার কল্যাণের জন্য ত—

কিন্তু বক্তব্য তাঁহার শেষ হইতে পাইল না, পার্শ্বের দরজা ঠেলিয়া মনোরমা প্রবেশ করিল। অবিনাশকে নমস্কার করিয়া কহিল, বাবা, আমি বেড়াতে যাচ্ছি, তুমি বোধ হয় বার হতে পারবে না?

না, মা, তুমি যাও।

অবিনাশ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কহিলেন, আমারও কাজ আছে। বাজারের কাছে একবার নামিয়ে দিতে পারবে না মনোরমা?

নিশ্চয় পারব,—চলুন।

যাইবার সময় অবিনাশ বলিয়া গেলেন যে, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনে তাঁহাকে কালই দিল্লী যাইতে হইবে এবং বোধ হয় এক সপ্তাহের পূর্বে আর ফিরিতে পারিবেন না।

পাঁচ

দিন-দশেক পরে অবিনাশ দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বছর-দশেকের ছেলে জগৎ আসিয়া হাতে একখানি ছোট পত্র দিল। মাত্র একটি ছত্র লেখা—বৈকালে নিশ্চয়

আসবেন।—আশু বদ্যি।

জগতের বিধবা মাসী দ্বারের পর্দা সরাইয়া ফুটন্ত গোলাপের ন্যায় মুখখানি বাহির করিয়া কহিল, আশু বদ্যিরা কি রাস্তায় চোখ পেতে বসেছিল নাকি—আসতে না আসতেই জরুরী তলব পাঠিয়েচে, যেতে হবে?

অবিনাশ কহিলেন, বোধ হয় কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রয়োজন না ছাই। তারা কি মুখুয্যে-মশাইকে গিলে খেতে চায় নাকি?

অবিনাশ তাঁহার ছোট শালীকে আদর করিয়া কখনো ছোটগিন্নী, কখনো বা তাহার নাম নীলিমা বলিয়া ডাকিতেন। হাসিয়া বলিলেন, ছোটগিন্নী, অমৃত ফল অনাদরে গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখলে বাইরের লোকের একটু লোভ হয় বৈ কি?

নীলিমা হাসিল, কহিল, তা হলে সেটা যে মাকাল ফল, অমৃত ফল নয়, তাদের জানিয়ে দেওয়া দরকার।

অবিনাশ বলিলেন, দিয়ো। কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে না,—লোভ আরও বেড়ে যাবে। হাত বাড়াতে ছাড়বে না।

নীলিমা বলিল, তাতে লাভ হবে না মুখুয্যে-মশাই। নাগালের বাইরে এবার শক্ত করে বেড়া বাঁধিয়ে রাখবো। এই বলিয়া সে হাসি চাপিয়া পর্দার আড়ালে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

অবিনাশ আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন পৌঁছিলেন তখনও বেলা আছে। গৃহস্বামী অত্যন্ত সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কৃত্রিম ক্রোধভরে কহিলেন, আপনি অধার্মিক। বিদেশে বন্ধুকে ফেলে রেখে দশদিন অনুপস্থিত,—ইতিমধ্যে অধীনের দশ-দশা সমুপস্থিত।

অবিনাশ চমকিয়া কহিলেন, একবারে দশ-দশটা দশা? প্রথমটা বলুন?

বলি। প্রথম দশায় ঠ্যাং দুটো শুধু তাজা হয়েচে তাই নয়, অতি দ্রুতবেগে নীচে হতে উপরে এবং উপর হতে নীচে গমনাগমন শুরু করেছে।

অত্যন্ত ভয়ের কথা। দ্বিতীয়টা বর্ণনা করুন।

দ্বিতীয় এই যে, আজ কি একটা পর্বোপলক্ষে হিন্দুস্থানী নারীকুল যমুনা-কূলে সমবেত হয়েচেন এবং হরেন্দ্র-অক্ষয় প্রভৃতি পণ্ডিত-সমাজ নির্লিপ্ত নির্বিকার-চিত্তে তথায় এইমাত্র অভিযান করেছেন।

ভাল কথা। তৃতীয় দশা বিবৃত করুন।

দর্শনেচ্ছু আশু বদ্যি অতি উৎকণ্ঠিত-হৃদয়ে অবিনাশের অপেক্ষা করচেন, প্রার্থনা, তিনি যেন অস্বীকার না করেন।

অবিনাশ সহাস্যে কহিলেন, তিনি প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। এবার চতুর্থ দশার বিবরণ দিন।

আশুবাবু বলিলেন, এইটে একটু গুরুতর। বাবাজী বিলাত থেকে ভারতে পদার্পণ করে প্রথমে কাশী এবং পরে এই আগ্রায় এসে পরশ্ব উপস্থিত হয়েছেন। সম্প্রতি মোটরের কল বিগড়েছে, বাবাজী স্বয়ং মেরামতি-কার্যে নিযুক্ত। মেরামত সমাপ্তপ্রায়, এবং তিনি এলেন বলে। অভিলাষ, প্রথম জ্যোৎস্নায় সবাই একসঙ্গে মিলে আজ তাজমহল নিরীক্ষণ করা।

অবিনাশের হাসিমুখ গম্ভীর হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, এই বাবাজীটি কে আশুবাবু? এঁর কথাই কি একদিন বলতে গিয়েও হঠাৎ চেপে গিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ। কিন্তু আজ আর বলতে, অন্ততঃ, আপনাকে বলতে বাধা নেই। অজিতকুমার আমার ভাবী জামাই, মণির বর। এই দুজনের ভালবাসা পৃথিবীর একটা অপূর্ব বস্তু। ছেলেটি রত্ন।

অবিনাশ স্থির হইয়া শুনিতে লাগিলেন ; আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আমরা ব্রাহ্মসমাজের নই, হিন্দু। সমস্ত ক্রিয়াকর্ম হিন্দুমতেই হয়। যথাসময়ে, অর্থাৎ বছর-চারেক পূর্বেই এদের বিবাহ হয়ে যাবার কথা ছিল, হতোও তাই, কিন্তু হল না। যেমন করে এদের পরিচয় ঘটে, সেও এক বিচিত্র ব্যাপার,—বিধিলিপি বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সে কথা এখন থাক।

অবিনাশ তেমনি স্তব্ধ হইয়াই রহিলেন ; আশুবাবু বলিলেন, মণির গায়েহলুদ হয়ে গেল, রাত্রির গাড়িতে কাশী থেকে ছোটখুড়ো এসে উপস্থিত হলেন। বাবার মৃত্যুর পরে তিনিই বাড়ির কর্তা, ছেলে-পুলে নেই, খুড়ীমাকে নিয়ে বহুদিন যাবৎ কাশীবাসী। জ্যোতিষে অখণ্ড বিশ্বাস, এসে বললেন, এ বিবাহ এখন হতেই পারে না। তিনি নিজে এবং অন্যান্য পণ্ডিতকে দিয়ে নির্ভুল গণনা করিয়ে দেখেছেন যে, এখন বিবাহ হলে তিন বৎসর তিন মাসের মধ্যেই মণি বিধবা হবে।

একটা হুলস্থূল পড়ে গেল, সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন লণ্ডভণ্ড হবার উপক্রম হল, কিন্তু খুড়োকে আমি চিনতাম, বুঝলাম এর আর নড়চড় নেই। অজিত নিজেও মস্ত বড় লোকের ছেলে, তারও এক বিধবা খুড়ী ছাড়া সংসারে কেউ ছিল না, তিনি ভয়ানক রাগ করলেন ; অজিত দুঃখে, অভিমানে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার নাম করে বিলেত চলে গেল, সবাই জানলে এ বিবাহ চিরকালের মতই ভেঙ্গে গেল।

অবিনাশ নিরুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তার পরে?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই হতাশ হলাম, হল না শুধু মণি নিজে। আমাকে এসে বললে বাবা, এমন কি ভয়ানক কাণ্ড ঘটেছে যার জন্যে তুমি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলে? তিন বছর এমনই কি বেশী সময়?

তার যে কি ব্যথা লেগেছিল সে ত জানি। বললাম, মা, তোর কথাই যেন সার্থক হয়, কিন্তু এ-সব ব্যাপারে তিন বছর কেন, তিনটে দিনের বাধাও যে মারাত্মক।

মণি হেসে বললে, তোমার ভয় নেই বাবা, আমি তাঁকে চিনি।

অজিত চিরদিনই একটু সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, ভগবানে তার অচল বিশ্বাস, যাবার সময়ে মণিকে ছোট একখানি চিঠি লিখে চলে গেল। এই চার বৎসরের মধ্যে আর কোনদিন সে দ্বিতীয় পত্র লেখেনি। না লিখুক, কিন্তু মনে মনে মণি সমস্তই জানতো এবং তখন থেকে সেই যে ব্রহ্মচারিণীর জীবন গ্রহণ করলে একটা দিনের জন্যেও তা থেকে সে ভ্রষ্ট হয়নি। অথচ বাইরে থেকে কিছুই বোঝবার জো নেই অবিনাশবাবু।

অবিনাশ শ্রদ্ধায় বিগলিত-চিত্তে কহিলেন, বাস্তবিকই বোঝবার জো নেই। কিন্তু আমি আশীর্বাদ করি, ওরা জীবনে যেন সুখী হয়।

আশুবাবু কন্যার হইয়াই যেন মাথা অবনত করিলেন, কহিলেন, ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ নিষ্ফল হবে না। অজিত সর্বাগ্রেই খুড়োমহাশয়ের কাছে গিয়েছিল। তিনি অনুমতি দিয়েছেন। না হলে এখানে বোধ করি সে আসতো না।

অতঃপর, উভয়েই ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, অজিত বিলেত চলে গেলে, বছর-দুই পর্যন্ত তার কোন সংবাদ না পেয়ে আমি ভিতরে ভিতরে পাত্রের সন্ধান যে করিনি তা নয়। কিন্তু মণি হঠাৎ জানতে পেরে আমাকে নিষেধ করে দিয়ে বললে, বাবা এ চেষ্টা তুমি করো না। আমাকে তুমি প্রকাশ্যেই সম্প্রদান করনি, কিন্তু মনে মনে ত করেছিলে। আমি বললাম, এমন কত ক্ষেত্রেই ত হয় মা। কিন্তু, মেয়ের দু'চক্ষে যেন জল ভরে এলো। বললে, হয় না বাবা। শুধু কথাবার্তাই হয়, কিন্তু তার বেশী—না বাবা, আমার অদৃষ্টে ভগবান যা লিখেছেন তাই যেন সইতে পারি, আমাকে আর কোন আদেশ তুমি করো না। দু'জনের চোখ দিয়েই জল পড়তে লাগল, মুছে ফেলে বললাম, অপরাধ করেছি মা, তোর অবুঝ বুড়ো ছেলেকে তুই ক্ষমা কর।

অকস্মাৎ পূর্বস্মৃতির আবেগে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অবিনাশ নিজেও অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, আশুবাবু, কত ভুলই না আমরা সংসারে করি এবং কত অন্যায় ধারণাই না জীবনে আমরা পোষণ করি।

আশুবাবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না, কহিলেন, কিসের?

এই যেমন আমরা অনেকেই মনে করি, মেয়েরা উচ্চ-শিক্ষিত হয়ে মেম সাহেব বনে যায়, হিন্দুর প্রাচীন মধুর সংস্কার আর তাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কত বড় ভ্রম বলুন ত?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভ্রম অনেক স্থলেই হয় বটে। কিন্তু কি জানেন অবিনাশবাবু, শিক্ষাই বা কি, আর অশিক্ষাই বা কি, আসল বস্তু পাওয়া। এই পাওয়া-না-পাওয়ার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে। নইলে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করলেই গোল বাধে।—এই যে অজিত! মণি কৈ?

বছর-ত্রিশ বয়সের একটি সুশ্রী বলিষ্ঠ যুবা ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার কাপড়ে-জামায় কালির দাগ। কহিল, মণি আমাকেই এতক্ষণ সাহায্য করছিলেন, তাঁর কাপড়েও কালি লেগেচে, তাই বদলে ফেলতে গেছেন। মোটরটা ঠিক হয়ে গেছে, সোফারকে সামনে আনতে বলে দিলাম।

আশুবাবু কহিলেন, অজিত, ইনি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত অবিনাশ মুখোপাধ্যায়। এখানকার কলেজের অধ্যাপক, ব্রাহ্মণ, এঁকে প্রণাম কর।

আগন্তুক যুবক অবিনাশকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মণির আসতে মিনিট-পাঁচেকের বেশী লাগবে না। কিন্তু আপনি একটু তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিন। দেরি হলে সব দেখার সময় পাওয়া যাবে না। লোকে বলে তাজমহল দেখে আর সাধ মেটে না।

আশুবাবু কহিলেন, সাধ না মেটবারই যে জিনিস বাবা। কিন্তু আমরা ত প্রস্তুত হয়েই আছি। বরঞ্চ, তোমারই দেরি, তোমারই এখনো কাপড় ছাড়তে বাকী।

ছেলেটি নিজের পোশাকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, আমার আর বদলাতে হবে না, এতেই চলে যাবে।

এই কালিসুদ্ধ?

ছেলেটি হাসিয়া কহিল, তা হোক। এই আমাদের পেশা। কাপড়ে কালি লাগায় আমাদের অগৌরব হয় না।

কথা শুনিয়া আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অবিনাশও যুবকের বিনম্র সরলতায় মুগ্ধ হইলেন।

মণি আসিয়া উপস্থিত হইল। সহসা তাহার প্রতি চাহিয়া অবিনাশ যেন চমকিয়া গেলেন। কিছুদিন তাহাকে দেখেন নাই, ইতিমধ্যে এই অপ্রত্যাশিত আনন্দের কারণ ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ তাহার পিতার নিকট হইতে এইমাত্র যে-সকল কথা শুনিতেছিলেন, তাহাতে মনে করিয়াছিলেন মনোরমার মুখের উপর আজ হয়ত এমন কিছু একটা দেখিতে পাইবেন যাহা অনির্বচনীয়, যাহা জীবনে কখনও দেখেন নাই। কিন্তু কিছুই ত নয়। নিতান্তই সাদাসিধা পোশাক। গোপন আনন্দের প্রচ্ছন্ন আড়ম্বর কোথাও আত্মপ্রকাশ করে নাই, সুগভীর প্রসন্নতার শান্ত দীপ্তি মুখের কোনখানে বিকশিত হইয়া উঠে নাই, বরঞ্চ, কেমন যেন একটা ক্লান্তির ছায়া চোখের দৃষ্টিকে ম্লান করিয়াছে। অবিনাশের মনে হইল, পিতৃস্নেহবশে হয় তিনি নিজের কন্যাকে ভুল বুঝিয়াছেন, না হয় একদিন যাহা সত্য ছিল, আজ তাহা মিথ্যা হইয়া গেছে।

অনতিকাল পরে প্রকাণ্ড মোটরযানে সকলেই বাহির হইয়া পড়িলেন। নদীর ঘাটে ঘাটে তখন পুণ্যলুব্ধ নারী ও রূপলুব্ধ পুরুষের ভিড় বিরল হইয়া আসিয়াছে, সুন্দর ও সুদীর্ঘ পথের সর্বত্রই তাহাদের সাজসজ্জা ও বিচিত্র পরিধেয় অস্তমান রবিকরে অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে, তাহাই দেখিতে দেখিতে তাঁহারা বিশ্বখ্যাত, অনন্ত সৌন্দর্যময় তাজের সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া যখন উপনীত হইলেন, তখন হেমন্তের নাতিদীর্ঘ দিবাভাগ অবসানের দিকে যাইতেছে।

যমুনা-কূলে যাহা-কিছু দেখিবার দেখা সমাপ্ত করিয়া অক্ষয়ের দলবল ইতিপূর্বেই আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাজ তাঁহারা অনেকবার দেখিয়াছেন, দেখিয়া দেখিয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, তাই উপরে না উঠিয়া নীচে বাগানের একাংশে আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট ছিলেন, ইঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া উচ্চ কোলাহলে সংবর্ধনা করিলেন। বাতব্যাধি-পীড়িত আশুবাবু অতিগুরুভার দেহখানি ঘাসের উপর বিন্যস্ত করিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন, আঃ—বাঁচা গেল। এখন যার যত ইচ্ছে মমতাজ বেগমের কবর দেখে আনন্দলাভ কর গে বাবা, আশু বদ্যি এইখান থেকেই

বেগমসাহেবাকে কুর্নিশ জানাচ্চেন। এর অধিক আর তাকে দিয়ে হবে না।

মনোরমা ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, সে হবে না বাবা। তোমাকে একলা ফেলে রেখে আমরা কেউ যেতে পারব না।

আশুবাবু হাসিয়া বলিলেন, ভয় নেই মা, তোমার বুড়ো বাপকে কেউ চুরি করবে না।

অবিনাশ কহিলেন, না, সে আশঙ্কা নেই। রীতিমত কপিকল লোহার চেন ইত্যাদি সংগ্রহ করে না আনলে তুলতে পারবে কেন?

মনোরমা কহিল, আমার বাবাকে আপনারা খুঁড়বেন না। আপনাদের নজরে নজরে বাবা এখানে এসে অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন।

অবিনাশ বলিলেন, তা যদি হয়ে থাকেন ত আমাদের অন্যায় হয়েছে, এ কথা মানতেই হবে। কারণ, দ্রষ্টব্য হিসাবে সে-বস্তুর মর্যাদা তাজমহলের চেয়ে কম হতো না।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন ; মনোরমা বলিল, সে হবে না বাবা, তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে। তোমার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে এর অর্ধেক সৌন্দর্য ঢাকা পড়েই থাকবে। যিনি যত খবরই দিন, তোমার চেয়ে আসল খবরটি কিন্তু কেউ বেশী জানে না।

ইহার অর্থ যে কি তাহা অবিনাশ ভিন্ন আর কেহ জানিত না, তিনিও এই অনুরোধই করিতে যাইতেছিলেন, সহসা সকলেরই চোখ পড়িয়া গেল এক অপ্রত্যাশিত বস্তুর প্রতি। তাজের পূর্বদিক ঘুরিয়া অকস্মাৎ শিবনাথ ও তাহার স্ত্রী সম্মুখে আসিয়া পড়িল। শিবনাথ না-দেখার ভান করিয়া আর একদিকে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই তাহার স্ত্রী তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া খুশী হইয়া বলিয়া উঠিল, আশুবাবু ও তাঁর মেয়ে এসেছেন যে!

আশুবাবু উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিয়া কহিলেন, আপনারা কখন এলেন শিবনাথবাবু? এদিকে আসুন!

সস্ত্রীক শিবনাথ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু তাঁহার পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইনি শিবনাথের স্ত্রী। আপনার নামটি কিন্তু এখনো জানিনে।

মেয়েটি কহিল, আমার নাম কমল। কিন্তু আমাকে আপনি বলবেন না, আশুবাবু।

আশুবাবু কহিলেন, বলা উচিতও নয়। কমল, এঁরা আমার বন্ধু, তোমার স্বামীরও পরিচিত। বসো।

কমল অজিতকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, কিন্তু এঁর পরিচয় ত দিলেন না।

আশুবাবু বলিলেন, ক্রমশঃ দেব বৈ কি। উনি আমার,—উনি আমার পরমাত্মীয়। নাম অজিতকুমার রায়। দিন-কয়েক হল বিলেত থেকে ফিরে এসে আমাদের দেখতে এসেছেন। কমল, তুমি কি আজ এই প্রথম তাজমহল দেখলে?

মেয়েটি মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

আশুবাবু বলিলেন, তা হলে তুমি ভাগ্যবতী। কিন্তু অজিত তোমার চেয়েও ভাগ্যবান, কেন-না এই পরম বিস্ময়ের জিনিসটি সে এখনো দেখেনি, এইবার দেখবে। কিন্তু আলো কমে আসচে, আর ত দেরি করলে চলবে না অজিত।

মনোরমা বলিল দেরি ত শুধু তোমার জন্যেই বাবা। ওঠো।

ওঠা তো সহজ ব্যাপার নয় মা, তার জন্যে যে আয়োজন করতে হয়।

তা হলে সেই আয়োজন কর বাবা!

করি। আচ্ছা কমল, দেখে কি রকম মনে হল?

কমল কহিল, বিস্ময়ের বস্তু বলেই মনে হল।

মনোরমা ইহার সহিত কথা কহে নাই, এমন কি, পরিচয় আছে এ পরিচয়টুকুও তাহার আচরণে প্রকাশ পাইল না। পিতাকে তাগিদ দিয়া কহিল, সন্ধ্যা হয়ে আসচে বাবা, ওঠো এইবার।

উঠি মা। এই বলিয়া আশুবাবু উঠিবার কিছুমাত্র উদ্যম না করিয়াই বসিয়া রহিলেন। কমল একটুখানি হাসিল, মনোরমার প্রতি চাহিয়া কহিল, ওঁর শরীরও ভাল নয়, ওঠা-নামা করাও সহজ

নয়। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা এইখানে বসে গল্প করি, আপনারা দেখে আসুন।

মনোরমা এ প্রস্তাবের জবাবও দিল না, শুধু পিতাকেই জিদ করিয়া পুনরায় কহিল, না বাবা, সে হবে না। ওঠো তুমি এইবার।

কিন্তু দেখা গেল উঠিবার চেষ্টা প্রায় কাহারও নাই। যে জীবন্ত বিস্ময় এই অপরিচিত রমণীর সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অকস্মাৎ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে, ইহার সম্মুখে ওই অদূরস্থিত মর্মরের অব্যক্ত বিস্ময় যেন একমুহূর্তেই ঝাপসা হইয়া গিয়াছে।

অবিনাশের চমক ভাঙ্গিল। বলিলেন, উনি না গেলে হবে না। মনোরমার বিশ্বাস, ওঁর বাবার চোখ দিয়ে না দেখতে পেলে তাজের অর্ধেক সৌন্দর্যই উপলব্ধি করা যাবে না।

কমল সরল চোখ দুটি তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন? আশুবাবুকে কহিল, আপনি বুঝি এ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ লোক? এবং সমস্ত তত্ত্ব জানেন বুঝি?

মনোরমা মনে মনে বিস্মিত হইল। কথাগুলা ত ঠিক অশিক্ষিত দাসীকন্যার মত নয়।

আশুবাবু পুলকিত হইয়া কহিল, কিছুই জানিনে। বিশেষজ্ঞ ত নয়ই—সৌন্দর্য-তত্ত্বের গোড়ার কথাটুকুও জানিনে। সেদিক দিয়ে আমি একে দেখিও নে কমল। আমি দেখি সম্রাট সাজাহানকে। আমি দেখি তাঁর অপরিসীম ব্যথা যেন পাথরের অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। আমি দেখি তাঁর একনিষ্ঠ পত্নী-প্রেম, যা এই মর্মর কাব্যের সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য তাঁকে বিশ্বের কাছে অমর করেছে।

কমল অত্যন্ত সহজ-কণ্ঠে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কিন্তু তাঁর ত শুনেছি আরও অনেক বেগম ছিল। সম্রাট মমতাজকে যেমন ভালবাসতেন, তেমন আরও দশজনকে বাসতেন। হয়ত কিছু বেশী হতে পারে, কিন্তু একনিষ্ঠ প্রেম তাকে বলা যায় না আশুবাবু। সে তাঁর ছিল না।

এই অপ্রচলিত ভয়ানক মন্তব্যে সকলে চমকিয়া গেলেন। আশুবাবু কিংবা কেহই ইহার হঠাৎ উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না।

কমল কহিল, সম্রাট ভাবুক ছিলেন, কবি ছিলেন, তাঁর শক্তি, সম্পদ এবং ধৈর্য দিয়ে এতবড় একটা বিরাট সৌন্দর্যের বস্তু প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। মমতাজ একটা আকস্মিক উপলক্ষ। নইলে, এমনি সুন্দর সৌধ তিনি যে-কোন ঘটনা নিয়েই রচনা করতে পারতেন। ধর্ম উপলক্ষ হলেও ক্ষতি ছিল না, সহস্র-লক্ষ মানুষ বধ-করা দিগ্বিজয়ের স্মৃতি উপলক্ষ হলেও এমনি চলে যেতো! এ একনিষ্ঠ প্রেমের দান নয়, বাদশার স্বকীয় আনন্দলোকের অক্ষয় দান। এই ত আমাদের কাছে যথেষ্ট।

আশুবাবু মনের মধ্যে যেন আঘাত পাইলেন। বার বার মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন, যথেষ্ট নয় কমল, কিছুতেই যথেষ্ট নয়। তোমার কথাই যদি সত্য হয়, সম্রাটের একনিষ্ঠ ভালবাসা যদি না-ই থেকে থাকে ত এই বিপুল স্মৃতি-সৌধের কোন অর্থই থাকে না। তিনি যত বড় সৌন্দর্যই সৃষ্টি করুন না, মানুষের অন্তরে সে-শ্রদ্ধার আসন আর থাকবে না।

কমল বলিল, যদি না থাকে তা সে মানুষের মূঢ়তা। নিষ্ঠার মূল্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যে মূল্য যুগ যুগ ধরে লোকে তাকে দিয়ে আসচে সেও তার প্রাপ্য নয়। একদিন যাকে ভালবেসেচি কোনদিন কোন কারণেই আর তার পরিবর্তন হবার জো নেই, মনের এই অচল, অনড় জড়ধর্ম সুস্থ নয়, সুন্দরও নয়।

শুনিয়া মনোরমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ইহাকে মূর্খ দাসীকন্যা বলিয়া অবহেলা করা কঠিন, কিন্তু এতগুলি পুরুষের সম্মুখে তাহারই মত একজন নারীর মুখ দিয়া এই লজ্জাহীন উক্তি তাহাকে অত্যন্ত আঘাত করিল। এতক্ষণ পর্যন্ত সে কথা কহে নাই, কিন্তু আর সে নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না, অনুচ্চ কঠিন-কণ্ঠে কহিল, এ মনোবৃত্তি আর কারও না হোক, আপনার কাছে যে স্বাভাবিক সে আমি মানি, কিন্তু অপরের চক্ষে এ সুন্দরও নয়, শোভনও নয়।

আশুবাবু মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, ছি, মা!

কমল রাগ করিল না, বরঞ্চ একটু হাসিল। কহিল, অনেক দিনের দৃঢ়মূল সংস্কারে আঘাত লাগলে মানুষে হঠাৎ সইতে পারে না। আপনি সত্যই বলেছেন আমার কাছে এ বস্তু খুবই স্বাভাবিক। আমার দেহ-মনে যৌবন পরিপূর্ণ, আমার মনে প্রাণ আছে। যেদিন জানব প্রয়োজনেও এর আর পরিবর্তনের শক্তি নেই, সেদিন বুঝব এর শেষ হয়েছে—এ মরেছে। এই বলিয়া মুখ তুলিতেই দেখিতে পাইল অজিতের দুই চক্ষু দিয়া যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে। কি জানি সে দৃষ্টি মনোরমার চোখে পড়িল কি না, কিন্তু সে কথার মাঝখানেই অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, বাবা, বেলা আর নেই, আমি যা পারি অজিতবাবুকে ততক্ষণ একটুখানি দেখিয়ে নিয়ে আসি।

অজিতের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, চল, আমরা দেখে আসে গে।

আশুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, তাই যাও মা, আমরা এইখানেই বসে আছি। কিন্তু একটুখানি শীঘ্র করে ফিরে এসো, না হয় কাল আবার একটু বেলা থাকতে আসা যাবে।

ছয়

অজিত ও মনোরমা তাজ দেখিয়া যখন ফিরিয়া আসিল তখন সূর্য অস্ত গিয়াছে, কিন্তু আলো শেষ হয় নাই। সকলে বেশ তাল পাকাইয়া বসিয়াছেন, তর্ক ঘোরতর হইয়া উঠিয়াছে। তাজের কথা, বাসায় ফিরিবার কথা, এমন কি অজিত-মনোরমার কথা পর্যন্ত তাঁহাদের মনে নাই। অক্ষয় নীরবে ফুলিতেছেন, দেখিয়া সন্দেহ হয়, রব তিনি ইতিপূর্বে যথেষ্টই করিয়াছেন, এখন দম লইতেছেন। আশুবাবু দেহের অধোভাগ চক্রের বাহিরের দিকে প্রসারিত করিয়া ঊর্ধ্বভাগ দুই হাতের উপর ন্যস্ত করিয়া গুরুভার বহন করিবার একটা উপায় করিয়া লইয়া অত্যন্ত মন দিয়া শুনিতেছেন। অবিনাশ সম্মুখের দিকে অনেকখানি ঝুঁকিয়া খরদৃষ্টিতে কমলের প্রতি চাহিয়া আছেন। বুঝা গেল সম্প্রতি সওয়াল-জবাব এই দুজনের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সকলেই আগন্তুকদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কেহ ঘাড়টা একটু নাড়িয়া কেহ সেটুকু করিবারও ফুরসত পাইলেন না। কমল ও শিবনাথ,—ইহারাও মুখ তুলিয়া দেখিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, একজনের চোখের দৃষ্টি যেমন শিখার মত জ্বলিতেছে, অপরের চোখের দৃষ্টি তেমনিই ক্লান্ত ও মলিন ; সে যেন কিছুই দেখিতেছে না, কিছুই শুনিতেছে না। এই দলের মধ্যে থাকিয়াও শিবনাথ কোথায় কত দূরেই যেন চলিয়া গেছে!

আশুবাবু শুধু বলিলেন, বসো। কিন্তু তাহারা কোথায় বসিল, কিংবা বসিল কি না, সে দেখিবার সময় পাইলেন না।

অবিনাশ বোধ করি অক্ষয়ের যুক্তিমালার ছিন্ন সূত্রটাই হাতে জড়াইয়া লইয়াছিলেন; বলিলেন, সম্রাট সাজাহানের প্রসঙ্গ এখন থাক, তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখবার হেতু আছে স্বীকার করি, প্রশ্নটা একটু জটিল। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে ঐ সুমুখের মার্বেলের মত সাদা, জলের ন্যায় তরল, সূর্যের আলোর মত স্বচ্ছ এবং সোজা,—এই যেমন আমাদের আশুবাবুর জীবন—কোনদিকে অভাব কিছু ছিল না, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টার ত্রুটিও ছিল না—জানি ত সব, কিন্তু এ কথা উনি ভাবতেই পারলেন না তাঁর মৃত স্ত্রীর জায়গায় আর কাউকে এনে বসানো যায় কিরূপে। এ বস্তু তাঁর কল্পনারও অতীত। বল ত, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে এ কতবড় আদর্শ! কত উঁচুতে এর স্থান!

কমল কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু পিছনের দিকে একটা মৃদুস্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিল। শিবনাথ কহিলেন, এখন এ আলোচনা থাক।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

শিবনাথ উত্তরে শুধু বলিলেন, এমনিই বলছিলাম। এই বলিয়া চুপ করিলেন। তাঁহার কথায় বিশেষ কেহ মনোযোগ করিল না,—সেই উদাস অন্যমনস্ক চোখের অন্তরালে কি কথা যে চাপা রহিল কেহ তাহা জানিল না, জানিবার চেষ্টাও করিল না।

কমল কহিল, ও—এমনিই। তোমার বাড়ি যাবার তাড়া পড়েছে বুঝি? কিন্তু বাড়িটি ত সঙ্গেই আছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

আশুবাবু লজ্জা পাইলেন, হরেন্দ্র-অক্ষয় মুখ টিপিয়া হাসিল, মনোরমা অন্যদিকে চক্ষু ফিরাইল, কিন্তু যাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইল সেই শিবনাথের আশ্চর্য সুন্দর মুখের উপরে একটি রেখারও পরিবর্তন হইল না,—সে যেন একেবারে পাথরে গড়া, যেন দেখিতেও পায় না, শুনিতেও পায় না।

অবিনাশের দেরি সহিতেছিল না, বলিলেন, আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

কমল কহিল, কিন্তু স্বামীর নিষেধ যে। তার অবাধ্য হওয়া কি উচিত? এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। অবিনাশ নিজেও না হাসিয়া পারিলেন না, কহিলেন, এ ক্ষেত্রে অপরাধ হবে না। আমরা এতগুলি লোকে মিলে তোমাকে অনুরোধ করচি, তুমি বল।

কমল বলিল, আশুবাবুকে আজ নিয়ে শুধু দুটি দিন দেখতে পেয়েচি, কিন্তু এর মধ্যেই মনে মনে ওঁকে আমি ভালবেসেচি। এই বলিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, এখন বুঝতে পারচি উনি কেন আমাকে বলতে নিষেধ করছিলেন।

আশুবাবু নিজেই তাহাতে বাধা দিলেন, কহিলেন, কিন্তু আমার দিক থেকে তোমার কুণ্ঠাবোধ করবার কোন কারণ নেই। বুড়ো আশু বদ্যি বড্ড নিরীহ মানুষ কমল, তাকে মাত্র দুটি দিন দেখেই অনেকটা ঠাওর করেচ, আরও দিন-দুই দেখলেই বুঝবে তাকে ভয় করার মত ভুল আর সংসারে নেই। তুমি স্বচ্ছন্দে বল, এ-সব কথা শুনতে আমার সত্যিই আনন্দ হয়।

কমল কহিল, কিন্তু ঠিক এইজন্যেই ত উনি বারণ করেছিলেন, আর এইজন্যেই অবিনাশবাবুর কথার উত্তরে এখন আমার বলতে বাধচে যে, নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে একে আমি বড় বলেও মনে করিনে, আদর্শ বলেও মানিনে।

অক্ষয় কথা কহিল। তাহার প্রশ্নের ভঙ্গীতে শ্লেষ ছিল, বলিল, খুব সম্ভব আপনারা মানেন না, কিন্তু কি মানেন একটু শুনতে পাই কি?

কমল তাহার প্রতি চাহিল, কিন্তু তাহাকেই যে উত্তর দিল তাহা নয়। বলিল, একদিন স্ত্রীকে আশুবাবু ভালবেসেছিলেন, কিন্তু তিনি আর বেঁচে নেই। তাঁকে দেবারও কিছু নেই, তাঁর কাছে পাবারও কিছু নেই। তাঁকে সুখী করাও যায় না, দুঃখ দেওয়াও যায় না। তিনি নেই। ভালবাসার পাত্র গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে, আছে কেবল একদিন যে তাঁকে ভালবেসেছিলেন সেই ঘটনাটা মনে। মানুষ নেই, আছে স্মৃতি। তাকেই মনের মধ্যে অহরহ পালন করে, বর্তমানের চেয়ে অতীতটাকে ধ্রুব জ্ঞানে জীবন-যাপন করার মধ্যে যে কি বড় আদর্শ আছে আমি ত ভেবে পাইনে।

কমলের মুখের এই কথাটায় আশুবাবু পুনরায় আঘাত পাইলেন। বলিলেন, কমল কিন্তু আমাদের দেশের বিধবাদের হাতে ত শুধু এই জিনিসটিই থাকে চরম সম্বল। স্বামী যায়, কিন্তু তাঁর স্মৃতি নিয়েই ত বিধবা-জীবনের পবিত্রতা অব্যাহত থাকে। এ কি তুমি মানো না?

কমল বলিল, না। একটা বড় নাম দিলেই ত কোন জিনিস সংসারে সত্যিই বড় হয়ে যায় না। বরঞ্চ বলুন এইভাবে এদেশের বৈধব্য-জীবন কাটানোই বিধি, বলুন, একটা মিথ্যেকে সত্যের গৌরব দিয়ে লোকে তাদের ঠকিয়ে আসচে,—আমি অস্বীকার করব না।

অবিনাশ বলিলেন, তাও যদি হয়, মানুষে যদি তাদের ঠকিয়েও এসে থাকে, বিধবার ব্রহ্মচর্যের মধ্যে—না থাক, ব্রহ্মচর্যের কথা আর তুলব না,—কিন্তু তার আমরণ সংযত জীবনযাত্রাকে কি বিরাট পবিত্রতার মর্যাদাটাও দেব না?

কমল হাসিল, কহিল, অবিনাশবাবু, এও আর একটা ঐ শব্দের মোহ। 'সংযম' বাক্যটা বহুদিন ধরে বহু মর্যাদা পেয়ে পেয়ে এমনি স্ফীত হয়ে উঠেছে যে, তার আর স্থান-কাল কারণ-অকারণ নেই। বলার সঙ্গে সঙ্গেই সম্ভ্রমে মানুষের মাথা নত হয়ে আসে। কিন্তু অবস্থা-বিশেষে এও যে একটা ফাঁকা আওয়াজের বেশী নয়, এমন কথাটা উচ্চারণ করতেও সাধারণ লোকের যদি বা ভয় হয়, আমার হয় না। আমি সে দলের নই। অনেকে অনেকদিন ধরে কিছু একটা বলে আসচে বলেই আমি মেনে নিইনে। স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে বিধবার দিন কাটানোর মত এমন স্বতঃসিদ্ধ পবিত্রতার ধারণাও আমাকে পবিত্র বলে প্রমাণ না করে দিলে স্বীকার করতে বাধে।

অবিনাশ উত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া ক্ষণকাল বিমূঢ়ের মত চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, তুমি বল কি?

অক্ষয় কহিল, দুয়ে দুয়ে চার হয় এও বোধ করি আপনাকে প্রমাণ করে না দিলে স্বীকার করেন না?

কমল জবাবও দিল না, রাগও করিল না, শুধু হাসিল।

আর একটি লোক রাগ করিলেন না, তিনি আশুবাবু। অথচ, কমলের কথায় আহত হইয়াছিলেন তিনিই সবচেয়ে বেশী।

অক্ষয় পুনশ্চ কহিল, আপনার এ-সব কদর্য ধারণা আমাদের ভদ্রসমাজের নয়। সেখানে এ অচল।

কমল তেমনি হাসিমুখেই উত্তর দিল, ভদ্রসমাজে অচল হয়েই ত আছে। এ আমি জানি।

ইহার পর কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, আর একটি কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি কমল। পবিত্রতা অপবিত্রতার জন্য বলচিনে, কিন্তু স্বভাবতঃ যে অন্য কিছু পারে না,—এই যেমন আমি। মণির স্বর্গীয়া জননীর স্থানে আর কাউকে বসাবার কথা আমি যে কখনো কল্পনা করতেও পারিনে।

কমল কহিল, আপনি যে বুড়ো হয়ে গেছেন আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, আজ বুড়ো হয়েচি মানি, কিন্তু সে দিন ত বুড়ো ছিলাম না। কিন্তু তখনো ত এ কথা ভাবতে পারিনি।

কমল কহিল, সেদিনও এমনি বুড়োই ছিলেন। দেহে নয়, মনে। এক এক জন থাকে যারা বুড়ো-মন নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। সেই বুড়োর শাসনের নীচে তাদের শীর্ণ, বিকৃত-যৌবন চিরদিন লজ্জায় মাথা হেঁট করে থাকে। বুড়ো-মন খুশী হয়ে বলে, আহা! এই ত বেশ! হাঙ্গামা নেই, মাতামাতি নেই,—এই ত শান্তি, এই ত মানুষের চরম তত্ত্বকথা। তার কত রকমের কত ভাল ভাল বিশেষণ, কত বাহবার ঘটা। দুই কান পূর্ণ করে তার খ্যাতির বাদ্য বাজে, কিন্তু এ যে তার জীবনের জয়বাদ্য নয়, আনন্দলোকের বিসর্জনের বাজনা, এ কথা সে জানতেও পারে না।

সকলেই মনে মনে চাহিলেন, ইহার একটা কড়া রকমের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন—মেয়েমানুষের মুখ দিয়া উন্মাদযৌবনের এই নির্লজ্জ স্তবগানে সকলের কানের মধ্যেই জ্বালা করিতে লাগিল, কিন্তু জবাব দিবার মত কথাও কেহ খুঁজিয়া পাইলেন না।

তখন আশুবাবু মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, বুড়ো-মন তুমি কাকে বল? দেখি নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে এ সত্যিই সেই কি না।

কমল কহিল, মনের বার্ধক্য আমি তাকেই বলি আশুবাবু, যে-মন সুমুখের দিকে চাইতে পারে না, যার অবসন্ন, জরাগ্রস্ত মন ভবিষ্যতের সমস্ত আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল অতীতের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চায়। আর যেন তার কিছু করবার, কিছু পাবারই দাবী নেই,—বর্তমান তার কাছে লুপ্ত, অনাবশ্যক, অনাগত অর্থহীন। অতীতই তার সর্বস্ব। তার আনন্দ, তার বেদনা—সেই তার মূলধন। তাকেই ভাঙ্গিয়ে খেয়ে সে জীবনের বাকী দিন-কটা টিকে থাকতে চায়। দেখুন ত আশুবাবু, নিজের সঙ্গে একবার মিলিয়ে?

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, সময়মত একবার দেখব বৈ কি।

অজিতকুমার এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও বলে নাই, শুধু নিষ্পলক চক্ষে কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া ছিল, সহসা কি যে তাহার হইল, সে আপনাকে আর সামলাইতে পারিল না, বলিয়া উঠিল, আমার একটা প্রশ্ন—দেখুন মিসেস্—

কমল সোজা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, মিসেস কিসের জন্যে? আমাকে আপনি কমল বলেই ডাকুন না?

অজিত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল—না না, সে কি, সে কেমনধারা যেন—

কমল কহিল, কিছুই কেমনধারা নয়। বাপ-মা আমার নাম রেখেছিলেন আমাকে ডাকবার

জন্যেই ত। ওতে আমি রাগ করিনে। অকস্মাৎ মনোরমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আপনার নাম মনোরমা, তাই বলে যদি আমি ডাকি, আপনি রাগ করেন নাকি?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, রাগ করি।

এ উত্তর তাহার কাছে কেহই প্রত্যাশা করে নাই, আশুবাবু ত কুণ্ঠায় ম্লান হইয়া পড়িলেন।

শুধু কুণ্ঠিত হইল না কমল নিজে। কহিল, নাম ত আর কিছুই নয়, কেবল একটা শব্দ। যা দিয়ে বোঝা যায়, বহুর মধ্যে একজন আর একজনকে আহ্বান করচে। তবে অনেক লোকের অভ্যাসে বাধে এ কথাও সত্যি। তারা এই শব্দটাকে নানারূপে অলঙ্কৃত করে শুনতে চায়। দেখেন না, রাজারা তাঁদের নামের আগে-পিছে কতকগুলো নিরর্থক বাক্য দিয়ে, কতকগুলো শ্রী জুড়ে তবে অপরকে উচ্চারণ করতে দেয়? নইলে তাদের মর্যাদা নষ্ট হয়। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া উঠিয়া শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, যেমন ইনি। কখনও কমল বলতে পারেন না, বলেন, শিবানী। অজিতবাবু, আপনি বরঞ্চ আমাকে মিসেস্ শিবনাথ না বলে শিবানী বলেই ডাকুন। কথাও ছোট, বুঝবেও সবাই। অন্ততঃ আমি ত বুঝবই।

কিন্তু কি যে হইল, এমন সুস্পষ্ট আদেশ লাভ করিয়াও অজিত কথা কহিতে পারিল না, প্রশ্ন তাহার মুখে বাধিয়াই রহিল।

তখন বেলা শেষ হইয়া অঘ্রাণের বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশে অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না দেখা দিয়াছে, সেই দিকে পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া মনোরমা বলিল, বাবা, হিম পড়তে শুরু হয়েছে, আর না। এইবার ওঠো।

আশুবাবু বলিলেন, এই যে উঠি মা।

অবিনাশ বলিলেন, শিবানী নামটি বেশ। শিবনাথ গুণী লোক, তাই নামটিও দিয়েচেন মিষ্টি, নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়েছেনও চমৎকার।

আশুবাবু উৎফুল্ল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, শিবনাথ নয় হে অবিনাশ, উপরের—উনি। এই বলিয়া তিনি একবার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আদ্যিকালের ঐ বুড়ো ঘটকটি এদের সব দিক দিয়ে মিল করবার জন্যে যেন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে লেগেছিলেন। বেঁচে থাকো।

অকস্মাৎ অক্ষয় সোজা হইয়া বসিয়া বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া ক্ষুদ্র চক্ষুদ্বয় যথাশক্তি বিস্ফারিত করিয়া কহিল, আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি?

কমল কহিল, কি প্রশ্ন?

অক্ষয় বলিলেন, আপনার সঙ্কোচের বালাই ত নেই, তাই জিজ্ঞেসা করি, শিবানী নামটি ত বেশ, কিন্তু শিবনাথবাবুর সঙ্গে কি আপনার সত্যিই বিবাহ হয়েছিল?

আশুবাবু মুখ কালিবর্ণ করিয়া কহিলেন, বলেন কি অক্ষয়বাবু?

অবিনাশ কহিলেন, তুমি কি ক্ষেপে গেলে?

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট!

অক্ষয় কহিল, জানেন ত আমার মিথ্যে চক্ষুলজ্জা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, মিথ্যে সত্যি কোনটাই নেই। কিন্তু আমাদের ত আছে।

কমল কিন্তু হাসিতে লাগিল। যেন কত তামাশার কথাই না ইহার মধ্যে আছে। কহিল, এতে রাগ করবার কি আছে হরেন্দ্রবাবু? আমি বলচি অক্ষয়বাবু। একেবারে কিছুই হয়নি তা নয়। বিয়ের মত কি একটা হয়েছিল। যাঁরা দেখতে এসেছিলেন তাঁরা কিন্তু হাসতে লাগলেন, বললেন, এ বিবাহ বিবাহই নয়,—ফাঁকি। ওঁকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন, বিবাহ হল শৈব মতে। আমি বললাম, সেই ভাল। শিবের সঙ্গে যদি শৈবমতেই বিয়ে হয়ে থাকে ত ভাববার কি আছে!

অবিনাশ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, বলিলেন, কিন্তু শৈব বিবাহ ত এখন আর আমাদের সমাজে চলে না কিনা, তাই কোনদিন যদি উনি হয়নি বলে উড়িয়ে দিতে চান ত সত্যি বলে প্রমাণ করবার তোমার কিছুই নেই কমল।

কমল শিবনাথের প্রতি চাহিয়া কহিল, হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এইরকম কোনদিন?

শিবনাথ কোন উত্তরই দিল না, তেমনি উদার গম্ভীরমুখে বসিয়া রহিল। তখন কমল হাসির ছলে কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, হা অদৃষ্ট! উনি যাবেন হয়নি বলে অস্বীকার করতে, আর আমি যাব তাই হয়েছে বলে পরের কাছে বিচার চাইতে? তার আগে গলায় দেবার মত একটুখানি দড়িও জুটবে না নাকি?

অবিনাশ বলিলেন, জুটতে পারে, কিন্তু আত্মহত্যা ত পাপ।

কমল বলিল, পাপ না ছাই। কিন্তু সে হবে না। আমি আত্মহত্যা করতে যাব এ কথা আমার বিধাতাপুরুষও ভাবতে পারেন না।

আশুবাবু বলিয়া উঠিলেন, এই ত মানুষের মত কথা কমল।

কমল তাঁহার দিকে চাহিয়া নালিশ করার ভঙ্গীতে বলিল, দেখুন ত অবিনাশবাবুর অন্যায়। শিবনাথকে দেখাইয়া কহিল, উনি করবেন আমাকে অস্বীকার, আর আমি যাব তাই ঘাড়ে ধরে ওঁকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতে? সত্য যাবে ডুবে, আর যে অনুষ্ঠানকে মানিনে তারই দড়ি দিয়ে ওঁকে রাখবো বেঁধে? আমি? আমি করব এই কাজ? বলিতে বলিতে তাহার দুই চক্ষু যেন জ্বলিতে লাগিল।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, শিবানী, সংসারে সত্য যে বড় এ আমরা সবাই মানি, কিন্তু অনুষ্ঠানও মিথ্যে নয়।

কমল বলিল, মিথ্যে ত বলিনে। এই যেমন প্রাণও সত্য, দেহও সত্য, কিন্তু প্রাণ যখন যায়?

মনোরমা পিতার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, বাবা, ভারী হিম পড়বে, এখন না উঠলেই যে নয়।

এই যে মা উঠি।

শিবনাথ হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, শিবানী, আর দেরী করো না, চল।

কমল তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলকে নমস্কার করিল, বলিল, আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হল যেন কেবল তর্ক করার জন্যেই। কিছু মনে করবেন না।

শিবনাথ এতক্ষণ পরে একবার হাসিলেন, বলিলেন, তর্কই শুধু করলে, শিবানী শিখলে না কিছুই।

কমল বিস্ময়ের কণ্ঠে বলিল, না। কিন্তু শেখবার কোথায় কি ছিল আমার মনে পড়চে না ত।

শিবনাথ কহিলেন, পড়বার কথাও নয়, সে এমনি আড়ালেই রইল। পার যদি আশুবাবুর জরাগ্রস্ত বুড়ো মনটাকে একটু শ্রদ্ধা করতে শিখো। তার বড় আর শেখবার কিছু নেই।

কমল সবিস্ময়ে কহিল, এ তুমি বলচ কি আজ?

শিবনাথ জবাব দিল না, পুনরায় সকলকে নমস্কার করিয়া বলিল, চল।

আশুবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, আশ্চর্য!

সাত

আশ্চর্যই বটে। এ ছাড়া মনের কথা ব্যক্ত করিবার আর শব্দ ছিল কি? বস্তুতঃ, উহারা চলিয়া গেল যেন এক অত্যাশ্চর্য নাটকের মধ্য-অঙ্কেই যবনিকা টানিয়া দিয়া—পর্দার ও-পিঠে না-জানি কত বিস্ময়ের ব্যাপারই অগোচরে রহিল! সকলের মনের মধ্যে এই একটা কথাই তোলাপাড়া করিতে লাগিল, এবং সকলেরই মনে হইল, যেন এইজন্যেই এখানে শুধু তাহারা আসিয়াছিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, হেমন্তের শিশির-সিক্ত মন্দ-জ্যোৎস্নায় অদূরে তাজের শ্বেতমর্মর মায়াপুরীর ন্যায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহার প্রতি আর কাহারও চোখ নাই।

মনোরমা বলিল, এবার না উঠলে তোমার সত্যিই অসুখ করবে বাবা?

অবিনাশ কহিলেন, হিম পড়চে, উঠুন।

সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফটকের বাহিরে আশুবাবুর প্রকাণ্ড মোটর গাড়ি দাঁড়াইয়া, কিন্তু

অক্ষয়-হরেন্দ্রর টাঙ্গা-ওয়ালার খোঁজ পাওয়া গেল না। সে বোধ হয় ইতিমধ্যে বেশী ভাড়ার সওয়ারি পাইয়া অদৃশ্য হইয়াছিল। অতএব কোনমতে ঠেসাঠেসি করিয়া সকলকে মোটরেই উঠিতে হইল।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই চুপ করিয়া ছিলেন, কথা কহিলেন প্রথমে অবিনাশ ; কহিলেন, শিবনাথ মিছে কথা বলেছিল। কমল কিছুতেই একজন সামান্য দাসীর মেয়ে হতে পারে না। অসম্ভব! এই বলিয়া তিনি মনোরমার মুখের দিকে চাহিলেন।

মনোরমার মনের মধ্যেও ঠিক এই প্রশ্নই জাগিতেছিল, কিন্তু সে নির্বাক হইয়া রহিল। অক্ষয় কহিল, মিছে কথা বলবার হেতু? নিজের স্ত্রীর সম্বন্ধে এ ত গৌরবের পরিচয় নয় অবিনাশবাবু!

অবিনাশ বলিলেন, সেই কথাই ত ভাবচি।

অক্ষয় বলিলেন, আপনারা আশ্চর্য হয়ে গেছেন, কিন্তু আমি হইনি। এ সমস্তই শিবনাথের প্রতিধ্বনি। তাই কথার মধ্যে bravado আছে প্রচুর, কিন্তু বস্তু নেই। আসল নকল বুঝতে পারি। অত সহজে আমাকে ঠকানো যায় না।

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, বাপ্‌রে! আপনাকেই ঠকানো! একেবারে monopoly-তে হস্তক্ষেপ?

অক্ষয় তাহার প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, আমি জোর করে বলতে পারি, এর ভদ্রঘরের culture সিকি-পয়সার নেই। মেয়েদের মুখ থেকে এ-সমস্ত শুধু immoral নয়, অশ্লীল।

অবিনাশ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, তাঁর সব কথা মেয়েদের মুখ থেকে ঠিক শোভন না হতে পারে, কিন্তু তাকে অশ্লীল বলা যায় না অক্ষয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া বলিলেন, ও দু-ই এক অবিনাশবাবু। দেখলেন না, বিবাহ জিনিসটা এর কাছে তামাশার ব্যাপার। যখন সবাই এসে বললে, এ বিবাহই নয়, ফাঁকি, উনি শুধু হেসে বললেন, তাই নাকি! Absolute indifference নোটিশ করেন নি? এ কি কখনও ভদ্রকন্যার সাজে, না সম্ভবপর?

কথাটা অক্ষয়ের সত্য, তাই সবাই মৌন হইয়া রহিলেন। আশুবাবু এতক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বলেন নাই। সবই তাঁহার কানে যাইতেছিল, কিন্তু নিজের খেয়ালেই ছিলেন। হঠাৎ এই স্তব্ধতায় তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, বিবাহটা নয়, এর form-টার প্রতিই বোধ হয় কমলের তেমন আস্থা নেই। অনুষ্ঠান যা হোক কিছু একটা হলেই ওর হলো। স্বামীকে বললে, ওরা যে বলে বিয়েটা হলো ফাঁকি। স্বামী বললেন, বিবাহ হলো আমাদের শৈবমতে। কমল তাই শুনে খুশী হয়ে বললে, শিবের সঙ্গে বিয়ে যদি হয়ে থাকে আমার শৈবমতে ত সেই ভাল। কথাটি আমার কি যে মিষ্টি লাগলো অবিনাশবাবু!

ভিতরে ভিতরে অবিনাশের মনটিও ছিল ঠিক এই সুরেই বাঁধা, কহিলেন, আর সেই শিবনাথের মুখের পানে চেয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করা—হাঁ গা, করবে নাকি তুমি এইরকম? দেবে নাকি আমাকে ফাঁকি? কত কথাই ত তার পরে হয়ে গেল আশুবাবু, কিন্তু এর রেশটুকু যেন আমার কানের মধ্যে এখনও বাজছে।

প্রত্যুত্তরে আশুবাবু হাসিয়া শুধু একটুখানি মাথা নাড়িলেন।

অবিনাশ বলিলেন, আর ওই শিবানী নামটুকু? এই কি কম মিষ্টি আশুবাবু?

অক্ষয় আর যেন সহিতে পারিল না, বলিল, আপনারা অবাক করলেন অবিনাশবাবু! তাঁদের যা-কিছু সমস্তই মিষ্টি-মধুর। এমন কি শিবনাথের নিজের নামের সঙ্গে একটা 'নী' যোগ করাতেও মধু ঝরে পড়লো?

হরেন্দ্র কহিল, শুধু 'নী' যোগ করাতেই হয় না অক্ষয়বাবু। আপনার স্ত্রীকে অক্ষয়নী বলে ডাকলেই কি মধু ঝরবে?

তাহার কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। এমন কি মনোরমাও পথের একধারে মুখ

ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। গর্জন করিয়া কহিলেন, হরেনবাবু, don't you go too far. কোন ভদ্রমহিলার সঙ্গে এ-সকল স্ত্রীলোকের ইঙ্গিতে তুলনা করাকেও আমি অত্যন্ত অপমানকর মনে করি, আপনাকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম।

হরেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। তর্ক করাও তাহার স্বভাব নয়, নিজের কথা যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করাও তাহার অভ্যাস নয়। মাঝে হইতে হঠাৎ কিছু একটা বলিয়াই এমনি নীরব হইয়া থাকে যে, সহস্র খোঁচাখুঁচিতেও মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির করা যায় না। হইলও তাই। অক্ষয় বাকী পথটা শিবানীকে ছাড়িয়া হরেন্দ্রকে লইয়া পড়িলেন। সে যে ভদ্রমহিলাকে ভদ্রতাহীন কদর্য পরিহাস করিয়াছে, এবং শিবনাথের শৈবমতে বিবাহ-করা স্ত্রীর বাক্যে ও ব্যবহারে যে আভিজাত্যের বাষ্পও নাই, বরঞ্চ, শিক্ষা ও সংস্কার জঘন্য হীনতারই পরিচায়ক, ইহাই অত্যন্ত রূঢ়তার সহিত বারংবার প্রতিপন্ন করিতে করিতে, গাড়ি আশুবাবুর দরজায় আসিয়া থামিল। অবিনাশ ও অন্যান্য সকলে নামিয়া গেলে হরেন্দ্র-অক্ষয়কে পৌঁছাইয়া দিতে গাড়ি চলিয়া গেল।

আশুবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন, গাড়ির মধ্যে এঁরা মারামারি না করেন।

অবিনাশ বলিলেন, না, সে ভয় নেই। এ প্রতিদিনের ব্যাপার, কিন্তু তাতে ওঁদের বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না।

ঘরের মধ্যে চা খাইতে বসিয়া আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, অক্ষয়বাবুর প্রকৃতিটা বড় কঠিন। ইহার চেয়ে কঠিন কথা তাঁহার মুখে আসিত না। সহসা মেয়ের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা মণি, কমলের সম্বন্ধে তোমার পূর্বের ধারণা কি আজ বদলায় নি?

কিসের ধারণা বাবা?

এই যেমন,—এই যেমন—

কিন্তু আমার ধারণা নিয়ে তোমাদের কি হবে বাবা?

পিতা দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি জানিতেন এই মেয়েটির বিরুদ্ধে মনোরমার চিত্ত অতিশয় বিমুখ। ইহা তাঁহাকে পীড়া দিত, কিন্তু এ লইয়া নূতন করিয়া আলোচনা করিতে যাওয়া যেমন অপ্রীতিকর, তেমনি নিষ্ফল।

অকস্মাৎ অবিনাশ বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু একটা বিষয়ে আপনারা বোধ হয় তেমন কান দেননি। সে শিবনাথের শেষ কথাটা। কমলের সবটুকুই যদি অপরের প্রতিধ্বনিমাত্রই হতো ত এ কথা শিবনাথের বলার প্রয়োজন হত না যে, সে যেন আপনাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে। এই বলিয়া সে নিজেও গভীর শ্রদ্ধাভরে আশুবাবুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, বাস্তবিক, বলতে কি, আপনার মত ভক্তির পাত্রই বা সংসারে ক'জন আছে? এতটুকু সামান্য পরিচয়েই যে শিবনাথ এতবড় সত্যটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, কেবল, এরই জন্যে আমি তার বহু অপরাধ ক্ষমা করতে পারি, আশুবাবু।

শুনিয়া আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিপুল কলেবর লজ্জায় যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। মনোরমা কৃতজ্ঞতায় দুই চক্ষু পূর্ণ করিয়া বক্তার মুখের প্রতি মুখ তুলিয়া বলিল, অবিনাশবাবু, এইখানেই তাঁর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর সত্যকার প্রভেদ। আজ জানি, সেদিন কাপড় এবং সাবান চাওয়ার ছলে এই মেয়েটি আমাকে শুধু উপহাস করেই গিয়েছিল,—তার সেদিনকার অভিনয় আমি বুঝতে পারিনি,—কিন্তু সমস্ত ছলাকলা, সমস্ত বিদ্রূপই ব্যর্থ বাবা, তোমাকে যদি না সে আজ সকলের বড় বলে চিনতে পেরে থাকে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন,—কি যে তোরা সব বলিস মা?

অবিনাশ কহিলেন, অতিশয়োক্তি এর মধ্যে কোথাও নেই আশুবাবু। যাবার সময়ে শিবনাথ এই কথাই তার স্ত্রীকে বলবার চেষ্টা করেছিল। আজ কথা সে কয়নি, কিন্তু তার ঐ একটি কথাতেই আমার মনে হয়েছে ওদের পরস্পরের মধ্যে এখানেই মস্ত মতভেদ আছে।

আশুবাবু বলিলেন, সে যদি থাকে ত শিবনাথেরই দোষ, কমলের নয়।

মনোরমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি কি চোখে যে তাকে দেখেচো সে তুমিই জানো বাবা। কিন্তু তোমার মত মানুষকে যে শ্রদ্ধা করতে পারে না, তাকে কি কখনো ক্ষমা করা যায়?

আশুবাবু কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেন মা? আমাকে অশ্রদ্ধা করার ভাব ত তার একটা আচরণেও প্রকাশ পায়নি।

কিন্তু শ্রদ্ধাও ত প্রকাশ পায়নি?

আশুবাবু কহিলেন, পাবার কথাও নয় মণি। বরঞ্চ, পেলেই তার মিথ্যাচার হতো। আমার মধ্যে যে বস্তুটাকে তোমরা শক্তির প্রাচুর্য মনে করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হও, ওর কাছে সেটা নিছক শক্তির অভাব। দুর্বল মানুষকে স্নেহের প্রশ্রয়ে ভালবাসা যায়, এই কথাই আমাকে সে বলেছে, কিন্তু আমার যে মূল্য তার কাছে নেই, জবরদস্তি তাই দিতে গিয়ে সে তোমাকেও খেলো করেনি, নিজেকেও অপমান করেনি। এই ত ঠিক, এতে ব্যথা পাবার ত কিছুই নেই মণি।

এতক্ষণ পর্যন্ত অজিত অন্যমনস্কের ন্যায় ছিল, এই কথায় সে চাহিয়া দেখিল। সে কিছুই জানিত না, জানিয়া লইবার অবকাশও হয় নাই। সমস্ত ব্যাপারটাই তাহার কাছে ঝাপসা,—এখন আশুবাবু যাহা বলিলেন তাহাতেও পরিষ্কার কিছুই হইল না, তবুও মন যেন তাহার জাগিয়া উঠিল।

মনোরমা নীরব হইয়া রহিল, কিন্তু অবিনাশবাবু উত্তেজনার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, তা হলে স্বার্থত্যাগের মূল্য নেই বলুন?

আশুবাবু হাসিলেন, বলিলেন, প্রশ্নটা ঠিক অধ্যাপকের মত হল না। যাই হোক,—না, তার কাছে নেই।

তা হলে আত্মসংযমেরও দাম নেই?

তার কাছে নেই। সংযম যেখানে অর্থহীন, সে শুধু নিষ্ফল আত্মপীড়ন। আর, তাই নিয়ে নিজেকে বড় মনে করা কেবল আপনাকে ঠকানো নয়, পৃথিবীকে ঠকানো। তার মুখ থেকে শুনে মনে হলো, কমল এই কথাটাই কেবল বলতে চায়। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি জানি সে কোথা থেকে এ ধারণা পেলে, কিন্তু হঠাৎ শুনলে ভারী বিস্ময় লাগে।

মনোরমা বলিয়া উঠিল,—বিস্ময় লাগে! সর্বশরীরে জ্বালা ধরে না? বাবা, কখনো কোন কথাই কি তুমি জোর করে বলতে পারবে না? সে যা বলবে তাতেই হাঁ দেবে?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ ত দিইনি মা। কিন্তু বিরাগ-বিদ্বেষ নিয়ে বিচার করতে গেলে কেবল এক পক্ষই ঠকে না, অন্য পক্ষও ঠকে। যে-সব কথা তার মুখে আমরা গুঁজে দিতে চাই, ঠিক সেই কথাই কমল বলেনি। সে যা বললে তার মোট কথাটা বোধ হয় এই যে, সুদীর্ঘ সংস্কারে যে তত্ত্বকে আমরা রক্তের মধ্যে দিয়ে সত্য বলে পেয়েছি, সে শুধু প্রশ্নের একটা দিক। অপর দিকও আছে। কেবল চোখ বুঁজে মাথা নাড়লেই হবে কেন, মণি?

মনোরমা বলিল, বাবা, ভারতবর্ষে এতকাল ধরে কি সে দিকটা দেখাবার লোক ছিল না?

তাহার পিতা একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ অত্যন্ত রাগের কথা মা। নইলে এ তুমি নিজেই ভাল করে জান যে, শুধু কেবল আমাদের দেশেই নয়, কোন দেশেই মানুষের পূর্বগামীরা শেষ প্রশ্নের জবাব দিয়ে গেছেন এমন হতেই পারে না। তা হলে সৃষ্টি থেমে যেত। এর চলার আর কোন অর্থ থাকতো না।

হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল অজিত একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। বলিলেন, তুমি বোধ করি কিছুই বুঝতে পারচো না,—না?

অজিত ঘাড় নাড়িলে আশুবাবু ঘটনাটা আনুপূর্বিক বিবৃত করিয়া কহিলেন, অক্ষয় কি যে পবিত্র হোমকুণ্ডের আগুন জ্বেলে দিলেন, লোকে চেয়ে দেখবে কি, ধুঁয়ার জ্বালায় চোখ খুলতেই পারলে না। অথচ, মজা হল এই যে, আমাদের মামলা হলো শিবনাথের বিরুদ্ধে, আর দণ্ড দিলাম কমলকে। তিনি ছিলেন এখানকার একজন অধ্যাপক, মদ খাবার অপরাধে গেল তাঁর চাকরি, রুগ্না স্ত্রীকে ত্যাগ করে ঘরে আনলেন কমলকে। বললেন, বিবাহ হয়েছে শৈবমতে,—অক্ষয়বাবু ভিতরে ভিতরে সংবাদ আনিয়ে জানলেন, সব ফাঁকি। জিজ্ঞাসা করা

হলো, মেয়েটি কি ভদ্রঘরের? শিবনাথ বললেন, সে তাঁদের বাড়ির দাসীর কন্যা। প্রশ্ন করা হলো, মেয়েটি কি শিক্ষিতা? শিবনাথ জবাব দিলেন, শিক্ষার জন্যে বিবাহ করেন নি, করেছেন রূপের জন্যে। শোন কথা। কমলের অপরাধ আমি কোথাও খুঁজে পাইনে অজিত, অথচ তাকেই দূর করে দিলাম আমরা সকল সংসর্গ থেকে। আমাদের ঘৃণাটা পড়লো গিয়ে তার পরেই সব চেয়ে বেশী। আর এই হলো সমাজের সুবিচার।

মনোরমা কহিল, তাকে কি সমাজের মধ্যে ডেকে আনতে চাও বাবা?

আশুবাবু বলিলেন, আমি চাইলেই হবে কেন মা? সমাজে অক্ষয়বাবুরাও ত আছেন, তাঁরাই ত প্রবল পক্ষ?

মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি একলা হলে ডেকে আনতে বোধ হয়?

পিতা তাহার স্পষ্ট জবাব দিলেন না, কহিলেন, ডাকতে গেলেই কি সবাই আসে মা?

অজিত বলিল, আশ্চর্য এই যে, আপনার মতের সঙ্গেই তাঁর সব চেয়ে বিরোধ, অথচ আপনারই স্নেহ পেয়েছেন তিনি সবচেয়ে বেশী।

অবিনাশ বলিলেন, তার কারণ আছে অজিতবাবু। কমলের আমরা কিছুই জানিনে, জানি শুধু তার বিপ্লবের মতটাকে। আর জানি তার অখণ্ড মন্দ দিকটাকে। তাই তার কথা শুনলে আমাদের ভয়ও হয়, রাগও হয়। ভাবি, এইবার গেল বুঝি সব।

আশুবাবুকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ওঁর নিষ্পাপ দেহ, নিষ্কলুষ মন, সন্দেহের ছায়াও পড়ে না, ভয়েরও দাগ লাগে না। মহাদেবের ভাগ্যে বিষই বা কি, আর অমৃতই বা কি, গলাতেই আটকাবে, উদরস্থ হবে না। দেবতার দলই আসুক, আর দৈত্যদানাতেই ঘিরে ধরুক, নির্লিপ্ত নির্বিকার চিত্ত,—শুধু বাতে কাবু না করলেই উনি খুশী। কিন্তু আমাদের ত—

কথা শেষ হইল না, আশুবাবু অকস্মাৎ দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, আর দ্বিতীয় কথাটি উচ্চারণ করবেন না অবিনাশবাবু, আপনার পায়ে পড়ি। নিরবচ্ছিন্ন একটি যুগ বিলেতে কাটিয়ে এসেছি, সেখানে কি করেছি, না করেছি, নিজেরই মনে নেই, অক্ষয়ের কানে গেলে আর রক্ষে থাকবে না। একেবারে নাড়ী-নক্ষত্র টেনে বার করে আনবে। তখন?

অবিনাশ সবিস্ময়ে কহিলেন, আপনি কি বিলেতে গিয়েছিলেন নাকি?

আশুবাবু বলিলেন, হাঁ, সে দুষ্কার্য হয়ে গেছে।

মনোরমা কহিল, ছেলেবেলা থেকে বাবার সমস্ত এডুকেশনটাই হয়েছে ইয়োরোপে বাবা ব্যারিস্টার। বাবা ডক্টর।

অবিনাশ কহিলেন, বলেন কি?

আশুবাবু তেমনিভাবেই বলিয়া উঠিলেন, ভয় নেই, ভয় নেই প্রফেসর, সমস্ত ভুলে গেছি। দীর্ঘকাল যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করে মেয়ে নিয়ে এখানে সেখানে টোল ফেলে বেড়াই, ঐ যা বললেন সমস্ত চিত্ততলটা একেবারে ধুয়ে মুছে নিষ্পাপ নিষ্কলুষ হয়ে গেছে ছাপছোপ কোথাও কিছু বাকী নেই। সে যাই হোক, দয়া করে ব্যাপারটা যেন আর অক্ষয় বাবুর গোচর করবেন না।

অবিনাশ হাসিয়া বলিলেন, অক্ষয়কে আপনার ভারী ভয়?

আশুবাবু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া কহিলেন, হাঁ। একে বাতের জ্বালায় বাঁচিনে, তাতে ওঁর কৌতূহল জাগ্রত হলে একেবারে মারা যাব।

মনোরমা রাগিয়াও হাসিয়া ফেলিল, বলিল, বাবা, এ তোমার বড় অন্যায়।

বাবা বলিলেন, অন্যায় হোক মা, আত্মরক্ষায় সকলেরই অধিকার আছে।

শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিল ; মনোরমা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা বাবা, মানুষের সমাজে অক্ষয়বাবুর মত লোকের কি প্রয়োজন নেই তুমি মনে কর?

আশুবাবু বলিলেন, তোমার ঐ প্রয়োজন শব্দটাই যে সংসারে সবচেয়ে গোলমেলে বস্তু, মা। আগে ওর নিষ্পত্তি হোক, তবে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া যাবে। কিন্তু সে ত হবার

নয়, তাই চিরকালই এই নিয়ে তর্ক চলেছে মীমাংসা আর হলো না।

মনোরমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি সব কথার জবাবই এমনি এড়িয়ে চলে যাও বাবা, কখনো স্পষ্ট করে কিছু বল না। এ তোমার বড় অন্যায়।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, স্পষ্ট করে বলবার মত বিদ্যে-বুদ্ধি তোর বাপের নেই মণি,—সে তোর কপাল। এখন খামকা আমার ওপর রাগ করলে চলবে কেন বলত?

অজিত হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাথাটা একটু ধরেছে, বাইরে বাইরে খানিক ঘুরে আসি গে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, মাথার অপরাধ নেই বাবা, কিন্তু এই হিমে? এই অন্ধকারে?

দক্ষিণের একটা খোলা জানালা দিয়া অনেকখানি স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না নীচের কার্পেটের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, অজিত সেইদিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া কহিল, হিম হয়ত একটু পড়চে, কিন্তু অন্ধকার নেই। যাই, একটু ঘুরে আসি।

কিন্তু হেঁটে বেড়িয়ো না।

না, গাড়িতেই যাবো।

গাড়ির ঢাকনাটা তুলে দিয়ো অজিত, যেন হিম লাগে না।

অজিত সম্মত হইল। আশুবাবু বলিলেন, তা হলে অবিনাশবাবুকেও অমনি পৌঁছে দিয়ে যেয়ো। কিন্তু, ফিরতে যেন দেরি না হয়।

আচ্ছা, বলিয়া অজিত অবিনাশবাবুকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইয়া গেলে আশুবাবু মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, এ ছেলের মোটরে ঘোরা বাতিক দেখচি এখনো যায়নি। এ ঠাণ্ডায় চললো বেড়াতে।

আট

দিন-পনেরো পরের কথা। সন্ধ্যা হইতে বিলম্ব নাই, অজিত আশুবাবু ও মনোরমাকে অবিনাশবাবুর বাটীতে নামাইয়া দিয়া একাকী ভ্রমণে বাহির হইয়াছিল। এমন সে প্রায়ই করিত। যে পথটা শহরের উত্তর হইতে আসিয়া কলেজের সম্মুখ দিয়া কিছুদূর পর্যন্ত গিয়া সোজা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে তাহারই একটা নিরালা জায়গায় সহসা উচ্চ নারীকণ্ঠে নিজের নাম শুনিয়া অজিত চমকিয়া গাড়ি থামাইয়া দেখিল, শিবনাথের স্ত্রী কমল। পথের ধারে ভাঙ্গাচোরা পুরাতন কালের একটা দ্বিতল বাড়ি, সুমুখে একটুখানি তেমনি শ্রীহীন ফুলের বাগান,—তাহারই একধারে দাঁড়াইয়া কমল হাত তুলিয়া ডাকিতেছে। মোটর থামিতে সে কাছে আসিল, কহিল, আর একদিন আপনি এমনি একলা যাচ্ছিলেন, আমি কত ডাকলাম, কিন্তু শুনতে পেলেন না। পাবেন কি করে? বাপ্‌ রে বাপ্‌! যে জোরে যান,—দেখলে মনে হয় যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার ভয় করে না?

অজিত গাড়ি হইতে নীচে নামিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি একলা যে? শিবনাথবাবু কৈ?

কমল বলিল, তিনি বাড়ি নেই। কিন্তু আপনিই বা একাকী বেরিয়েছেন কেন? সেদিনও দেখেছিলাম সঙ্গে কেউ ছিল না।

অজিত কহিল, না। এ কয়দিন আশুবাবুর শরীর ভাল ছিল না, তাই তাঁরা কেউ বার হননি। আজ তাঁদের অবিনাশবাবুর ওখানে নামিয়ে দিয়ে আমি বেড়াতে বেরিয়েছি। সন্ধ্যাবেলা কিছুতেই আমি ঘরে থাকতে পারিনে।

কমলা কহিল, আমিও না। কিন্তু পারিনে বললেই ত হয় না,—গরীবদের অনেক কিছুই সংসারে পারতে হয়। এই বলিয়া সে অজিতের মুখের পানে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, নেবেন আমাকে সঙ্গে করে? একটুখানি ঘুরে আসবো।

অজিত মুশকিলে পড়িল। সঙ্গে আজ সোফার পর্যন্ত ছিল না, শিবনাথবাবুও গৃহে নাই তাহা পূর্বেই শুনিয়াছে, কিন্তু প্রত্যাখ্যান করিতেও বাধিল। একটুখানি দ্বিধা করিয়া কহিল, এখানে আপনার সঙ্গী-সাথী বুঝি কেউ নেই?

কমল কহিল, শোন কথা! সঙ্গী-সাথী পাব কোথায়? দেখুন না চেয়ে একবার পল্লীর দশা। শহরের বাইরে বললেই হয়,—সাহগঞ্জ না কি নাম, কোথাও কাছাকাছি বোধ করি একটা চামড়ার কারখানা আছে,—আমার প্রতিবেশী ত শুধু মুচিরা। কারখানায় যায় আসে, মদ খায়, সারা রাত হল্লা করে,—এই ত আমার পাড়া।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে ভদ্রলোক বুঝি নেই?

কমল বলিল, বোধ হয় না। আর থাকলেই বা কি—আমাকে তারা বাড়িতে যেতে দেবে কেন? তা হলে ত,—মাঝে মাঝে যখন বড্ড একলা মনে হয়,—তখন আপনাদের ওখানেও যেতে পারতাম। বলিতে বলিতে সে গাড়ির খোলা দরজা দিয়া নিজেই ভিতরে গিয়া বসিল ; কহিল, আসুন, আমি অনেকদিন মোটরে চড়িনি। আজ কিন্তু আমাকে অনেকদূর পর্যন্ত বেড়িয়ে আনতে হবে।

কি করা উচিত অজিত ভাবিয়া পাইল না, সঙ্কোচের সহিত কহিল, বেশী দূরে গেলে রাত্রি হয়ে যেতে পারে। শিবনাথবাবু বাড়ি ফিরে আপনাকে দেখতে না পেলে হয়ত কিছু মনে করবেন।

কমল বলিল, নাঃ,—মনে করবার কিছু নেই।

অজিত কহিল, তা হলে ড্রাইভারের পাশে না বসে ভেতরে বসুন না?

কমল বলিল, ড্রাইভার ত আপনি নিজে। কাছে না বসলে গল্প করব কি করে? অতদূরে পিছনে বসে বুঝি মুখ বুজে যাওয়া যায়? আপনি উঠুন, আর দেরি করবেন না।

অজিত উঠিয়া বসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। পথ সুন্দর এবং নির্জন, কদাচিৎ এক-আধজনের দেখা পাওয়া যায়,—এইমাত্র। গাড়ির দ্রুতবেগ ক্রমশঃ দ্রুততর হইয়া উঠিল, কমল কহিল, আপনি জোরে গাড়ি চালাতেই ভালবাসেন, না?

অজিত বলিল, হাঁ।

ভয় করে না?

না। আমার অভ্যাস আছে।

অভ্যাসই সব। এই বলিয়া কমল একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু আমার ত অভ্যাস নেই, তবু এই আমার ভাল লাগচে। বোধ হয় স্বভাব, না?

অজিত কহিল, তা হতে পারে।

কমল কহিল, নিশ্চয়। অথচ এর বিপদ আছে। যারা চড়ে তাদেরও, আর যারা চাপা পড়ে তাদেরও,—না?

অজিত কহিল, না, চাপা পড়বে কেন?

কমল কহিল, পড়লেই বা অজিতবাবু! দ্রুতবেগের ভারী একটা আনন্দ আছে। গাড়িরই বা কি, আর এই জীবনেরই বা কি! কিন্তু যারা ভীতু লোক তারা পারে না। সাবধানে ধীরে ধীরে চলে। ভাবে পথ হাঁটার দুঃখটা যে বাঁচলো এই তাদের ঢের। পথটাকে ফাঁকি দিয়েই তারা খুশী, নিজেদের ফাঁকিটা টেরও পায় না। ঠিক না অজিতবাবু?

কথাটা অজিত বুঝিতে পারিল না, বলিল, এর মানে?

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিল। ক্ষণেক পরে মাথা নাড়িয়া বলিল, মানে নেই। এমনি।

কথাটা সে যে বুঝাইয়া বলিতে চাহে না, এইটুকুই শুধু বুঝা গেল, আর কিছু না।

অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে। অজিত ফিরিতে চাহিল, কমল কহিল, এরই মধ্যে? চলুন আর একটু যাই।

অজিত কহিল, অনেকদূরে এসে পড়েচি ফিরতে রাত হবে।

কমল বলিল, হলই বা।

কিন্তু শিবনাথবাবু হয়ত বিরক্ত হবেন।

কমল জবাব দিল, হলেনই বা।

অজিত মনে মনে বিস্মিত হইয়া বলিল, কিন্তু আশুবাবুদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, বিলম্ব হলে ভাল হবে না।

কমল প্রত্যুত্তরে কহিল, আগ্রা শহরে ত গাড়ির অভাব নেই, তাঁরা অনায়াসে যেতে পারবেন। চলুন, আরো একটু। এমনি করিয়া কমল যেন তাহাকে জোর করিয়াই নিরন্তর সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমশঃ লোকবিরল পথ একান্ত জনহীন ও রাত্রির অন্ধকার প্রগাঢ় হইয়া উঠিল, চারিদিকের দিগন্ত-বিস্তৃত প্রান্তর নিরতিশয় স্তব্ধ। অজিত হঠাৎ একসময়ে উদ্বিগ্ন-চিত্তে গাড়ির গতিরোধ করিয়া বলিল, আর না, ফিরি চলুন।

কমল কহিল, চলুন।

ফিরিবার পথে সে ধীরে ধীরে বলিল, ভাবছিলাম, মিথ্যের সঙ্গে রফা করতে গিয়ে জীবনের কত অমূল্য সম্পদই না মানুষে নষ্ট করে। আমাকে একলা নিয়ে যেতে আপনার কত সঙ্কোচই না হয়েছিল, আমিও যদি সেই ভয়েই পেছিয়ে যেতাম, এমন আনন্দটি ত অদৃষ্টে ঘটত না।

অজিত কহিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে নিশ্চয় করে ত কিছুই বলা যায় না। ফিরে গিয়ে আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দও ত অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে।

কমল কহিল, এই অন্ধকার নির্জন পথে একলা আপনার পাশে বসে ঊর্ধ্বশ্বাসে কত দূরেই না বেড়িয়ে এলাম। আজ আমার কি ভালই যে লেগেছে তা আর বলতে পারিনে।

অজিত বুঝিল কমল তাহার কথায় কান দেয় নাই,—সে যেন নিজের কথা নিজেকেই বলিয়া চলিতেছে। শুনিয়া লজ্জা পাইবার মত হয়ত সত্যই ইহাতে কিছুই নাই, তবুও প্রথমটা সে যেন সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। ওই মেয়েটির সম্বন্ধে বিরুদ্ধ কল্পনা ও অশুভ জনশ্রুতির অতিরিক্ত বোধ হয় কেহই কিছু জানে না,—যাহা জানে তাহারও হয়ত অনেকখানি মিথ্যা,—এবং সত্য যাহা আছে তাহাতেও হয়ত অসত্যের ছায়া এমনি ঘোরালো হইয়া পড়িয়াছে যে চিনিয়া লইবার পথ নাই। ইচ্ছা করিলে যাচাই করিয়া যাহারা দিতে পারে তাহারা দেয় না, যেন সমস্তটাই তাহাদের কাছে একেবারে নিছক পরিহাস।

অজিত চুপ করিয়া আছে, ইহাতেই কমলের যেন চেতনা হইল। কহিল, ভাল কথা, কি বলছিলেন, ফিরে গিয়ে আনন্দের বদলে নিরানন্দ অদৃষ্টে লেখা থাকতে পারে? পারে বৈ কি!

অজিত কহিল, তা হলে?

কমল বলিল, তা হলেও এ প্রমাণ হয় না, যে আনন্দ আজ পেলাম তা পাইনি!

এবার অজিত হাসিল। বলিল, সে প্রমাণ হয় না, কিন্তু এ প্রমাণ হয় যে আপনি তার্কিক কম নয়। আপনার সঙ্গে কথায় পেরে ওঠা ভার।

অর্থাৎ যাকে বলে কূট-তার্কিক, তাই আমি?

অজিত কহিল, না, তা নয়, কিন্তু শেষ ফল যার দুঃখেই শেষ হয় তার গোড়ার দিকে যত আনন্দই থাক, তাকে সত্যকার আনন্দভোগ বলা চলে না। এ ত আপনি নিশ্চয়ই মানেন?

কমল বলিল, না, আমি মানিনে। আমি মানি, যখন যেটুকু পাই তাকেই যেন সত্যি বলে মেনে নিতে পারি। দুঃখের দাহ যেন আমার বিগত-সুখের শিশিরবিন্দুগুলিকে শুষে ফেলতে না পারে। সে যত অল্পই হোক, পরিমাণ তার যত তুচ্ছই সংসারে গণ্য হোক, তবুও যেন না তাকে অস্বীকার করি। একদিনের আনন্দ যেন না আর একদিনের নিরানন্দের কাছে লজ্জাবোধ করে। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, এ জীবনে সুখ-দুঃখের কোনটাই সত্যি নয় অজিতবাবু, সত্যি শুধু তার চঞ্চল মুহূর্তগুলি, সত্যি শুধু তার চলে যাওয়ার ছন্দটুকু। বুদ্ধি এবং হৃদয় দিয়ে একে পাওয়াই ত সত্যিকার পাওয়া। এই কি ঠিক নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর অজিত দিতে পারিল না, কিন্তু তাহার মনে হইল অন্ধকারেও অপরের দুই চক্ষু একান্ত আগ্রহে তাহার প্রতি চাহিয়া আছে। সে যেন নিশ্চিত কিছু একটা শুনিতে চায়।

কৈ জবাব দিলেন না?

আপনার কথাগুলো বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না।

পারলেন না?

না।

একটা চাপা নিশ্বাস পড়িল। তাহার পরে কমল ধীরে ধীরে বলিল, তার মানে স্পষ্ট বোঝবার এখনো আপনার সময় আসেনি। যদি কখনো আসে আমাকে কিন্তু মনে করবেন। করবেন ত?

অজিত কহিল, করব।

গাড়ি আসিয়া সেই ভাঙ্গা ফুলবাগানের সম্মুখে থামিল। অজিত দ্বার খুলিয়া নিজে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল, বাটীর দিকে চাহিয়া কহিল, কোথাও এতটুকু আলো নেই, সবাই বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েচে।

কমল নামিতে নামিতে কহিল, বোধ হয়।

অজিত কহিল, দেখুন ত আপনার অন্যায়। কাউকে জানিয়ে গেলেন না, শিবনাথবাবু না জানি কত দুর্ভাবনাই ভোগ করেছেন।

কমল কহিল, হাঁ। দুর্ভাবনার ভারে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, এই অন্ধকারে যাবেন কি করে? গাড়িতে একটা হাতলণ্ঠন আছে, সেটা জ্বেলে নিয়ে সঙ্গে যাবো?

কমল অত্যন্ত খুশী হইয়া কহিল, তা হলে ত বাঁচি অজিতবাবু। আসুন, আসুন, আপনাকে একটুখানি চা খাইয়ে দিই।

অজিত অনুনয়ের কণ্ঠে কহিল, আর যা হুকুম করুন পালন করব, কিন্তু এত রাত্রে চা খাবার আদেশ করবেন না। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসচি।

সদর দরজায় হাত দিতেই খুলিয়া গেল। ভিতরের বারান্দায় একজন হিন্দুস্থানী দাসী ঘুমাইতেছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া উঠিয়া বসিল। বাড়িটি দ্বিতল। উপরে ছোট ছোট গুটি-দুই ঘর। অতিশয় সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির নীচে মিটমিট করিয়া একটি হারিকেন লণ্ঠন জ্বলিতেছে, সেইটি হাতে করিয়া কমল তাহাকে উপরে আহ্বান করিতে অজিত সঙ্কোচে ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, এখন যাই। রাত অনেক হলো।

কমল জিদ করিয়া কহিল, সে হবে না, আসুন।

অজিত তথাপি দ্বিধা করিতেছে দেখিয়া সে বলিল, আপনি ভাবচেন এলে শিবনাথবাবুর কাছে ভারী লজ্জার কথা। কিন্তু না এলে যে আমার লজ্জা আরও ঢের বেশী এ ভাবচেন না কেন? আসুন। নীচে থেকে এমন অনাদরে আপনাকে যেতে দিলে রাত্রে আমি ঘুমোতে পারবো না।

অজিত উঠিয়া আসিয়া দেখিল ঘরে আসবাব নাই বলিলেই হয়। একখানি অল্প মূল্যের আরাম-কেদারা, একটি ছোট টেবিল, একটি টুল, গোটা-তিনেক তোরঙ্গ, একধারে একখানি পুরানো লোহার খাটের উপর বিছানা-বালিশ গাদা করিয়া রাখা,—যেন, সাধারণতঃ তাহাদের প্রয়োজন নাই এমনি একটা লক্ষ্মীছাড়া ভাব! ঘর শূন্য,—শিবনাথবাবু নাই।

অজিত বিস্মিত হইল, কিন্তু মনে মনে ভারী একটা স্বস্তি বোধ করিয়া কহিল, কৈ তিনি ত এখনো আসেন নি?

কমল কহিল, না।

অজিত বলিল, আজ বোধ হয় আমাদের ওখানে তাঁর গান-বাজনা খুব জোরেই চলচে।

কি করে জানলেন?

কাল-পরশু দু'দিন যাননি। আজ হাতে পেয়ে আশুবাবু হয়ত সমস্ত ক্ষতিপূরণ করে নিচ্চেন।

কমল প্রশ্ন করিল, রোজ যান, এ দু'দিন যাননি কেন?

অজিত কহিল, সে খবর আমাদের চেয়ে আপনি বেশী জানেন। সম্ভবতঃ, আপনি ছেড়ে দেননি বলেই তিনি যেতে পারেন নি। নইলে স্বেচ্ছায় গরহাজির হয়েছেন এ ত তাঁকে দেখে কিছুতেই মনে হয় না।

কমল কয়েক মুহূর্ত তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া অকস্মাৎ হাসিয়া উঠিল। কহিল, কে জানে তিনি ওখানে যান গান-বাজনা করতে! বাস্তবিক, মানুষকে জবরদস্তি ধরে রাখা বড় অন্যায়, না?

অজিত বলিল, নিশ্চয়।

কমল কহিল, উনি ভাল লোক তাই। আচ্ছা, আপনাকে যদি কেউ ধরে রাখতো, থাকতেন?

অজিত বলিল, না। তা ছাড়া আমাকে ধরে রাখবার ত কেউ নেই।

কমল হাসিমুখে বার দুই-তিন মাথা নাড়িয়া বলিল, ঐ ত মুশকিল। ধরে রাখবার কে যে কোথায় লুকিয়ে থাকে জানবার জো নেই। এই যে আমি সন্ধ্যা থেকে আপনাকে ধরে রেখেচি তা টেরও পাননি। থাক থাক, সব কথার তর্ক করেই বা হবে কি? কিন্তু কথায় কথায় দেরি হয়ে যাচ্চে, যাই, আমি ও-ঘর থেকে চা তৈরি করে আনি।

আর একলাটি আমি চুপ করে বসে থাকবো? সে হবে না।

হবার দরকার কি। এই বলিয়া কমল সঙ্গে করিয়া তাহাকে পাশের ঘরে আনিয়া একখানি নূতন আসন পাতিয়া দিয়া কহিল, বসুন। কিন্তু বিচিত্র এই দুনিয়ার ব্যাপার অজিতবাবু। সেদিন এই আসনখানি পছন্দ করে কেনবার সময়ে ভেবেছিলাম একজনকে বসতে দিয়ে বলবো,—কিন্তু সে ত আর আর-একজনকে বলা যায় না অজিতবাবু,—তবুও আপনাকে বসতে ত দিলাম। অথচ, কতটুকু সময়েরই বা ব্যবধান!

ইহার অর্থ যে কি ভাবিয়া পাওয়া দায়। হয়ত অতিশয় সহজ, হয়ত ততোধিক দুরূহ। তথাপি অজিত লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। বলিতে গিয়া তাহার মুখে বাধিল, তবুও কহিল, তাঁকেই বা বসতে দেননি কেন?

কমল কহিল, এই ত মানুষের মস্ত ভুল। ভাবে সবই বুঝি তাদের নিজের হাতে কিন্তু কোথায় বসে যে কে সমস্ত হিসেব ওলট-পালট করে দেয়, কেউ তার সন্ধান পায় না। আপনার চায়ে কি বেশী চিনি দেব?

অজিত কহিল, দিন। চিনি আর দুধের লোভেই আমি চা খাই, নইলে ওতে আমার কোন স্পৃহা নেই।

কমল কহিল, আমিও ঠিক তাই। কেন যে মানুষে এগুলো খায় আমি ত ভেবেই পাইনে। অথচ এর দেশেই আমার জন্ম।

আপনার জন্মভূমি বুঝি তা হলে আসামে?

শুধু আসাম নয়, একেবারে চা-বাগানের মধ্যে।

তবুও চায়ে আপনার রুচি নেই?

একেবারে না। লোকে দিলে খাই শুধু ভদ্রতার জন্যে।

অজিত চায়ের বাটি হাতে করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, এইটি বুঝি আপনার রান্নাঘর?

কমল বলিল, হাঁ।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি নিজেই রাঁধেন বুঝি? কিন্তু কৈ, আজকে রাঁধবার ত সময় পাননি?

কমল কহিল, না।

অজিত ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিমুখে বলিল, এবার জিজ্ঞাসা করুন—তা হলে আপনি খাবেন কি? তার জবাবে আমি বলব, রাত্রে আমি খাইনে। সমস্তদিনে কেবল একটিবার মাত্র খাই।

কেবল একটিবার মাত্র?

কমল কহিল, হাঁ। কিন্তু এর পরেই আপনার মনে হওয়া উচিত, তাই যদি হলো, তবে শিবনাথবাবু বাড়ি এসে খাবেন কি? তাঁর খাওয়া ত দেখেচি,—সে ত আর এক-আধবারের

ব্যাপার নয়? তবে? এর উত্তরে আমি বলব, তিনি ত আপনাদের বাড়িতেই খেয়ে আসেন,—তাঁর ভাবনা কি? আপনি বলবেন, তা বটে, কিন্তু সে ত প্রত্যহ নয়। শুনে আমি ভাববো এ কথার জবাব পরকে দিয়ে আর লাভ কি? কিন্তু তাতেও আপনাকে নিরস্ত করা যাবে না। তখন বাধ্য হয়ে বলতেই হবে, অজিতবাবু, আপনাদের ভয় নেই, তিনি এখানে আর আসেন না। শৈব-বিবাহের শিবানীর মোহ বোধ হয় তাঁর কেটেছে।

অজিত সত্য সত্যই এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। গভীর বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে? আপনি কি রাগ করে বলছেন?

কমল কহিল, না, রাগ করে নয়। রাগ করবার বোধ হয় আজ আমার জোর নেই। আমি জানতাম পাথর কিনতে তিনি জয়পুরে গেছেন, আপনার কাছেই প্রথম খবর পেলাম আগ্রা ছেড়ে আজও তিনি যাননি। চলুন, ও-ঘরে গিয়ে বসি গে।

এ ঘরে আনিয়া কমল বলিল, এই আমাদের শোবার ঘর। তখনও এর বেশী একটা জিনিসও এখানে ছিল না,—আজও তাই আছে। কিন্তু সেদিন এদের চেহারা দেখে থাকলে আজ আমাকে বলতেও হতো না যে আমি রাগ করিনি। কিন্তু আপনার যে ভয়ানক রাত হয়ে যাচ্ছে অজিতবাবু, আর ত দেরি করা চলে না।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, হাঁ, আজ তাহ'লে আমি যাই।

কমল সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অজিত কহিল, যদি অনুমতি করেন ত কাল আসি।

হাঁ, আসবেন। এই বলিয়া সে পিছনে পিছনে নীচে নামিয়া আসিল।

অজিত বার-কয়েক ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, যদি অপরাধ না নেন ত একটা কথা জিজ্ঞাসা করে যাই। শিবনাথবাবু কতদিন হ'ল আসেন নি?

হ'ল অনেকদিন। এই বলিয়া সে হাসিল। অজিত তাহার লণ্ঠনের আলোকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল এ হাসির জাতই আলাদা। তাহার পূর্বেকার হাসির সহিত কোথাও ইহার কোন অংশেই সাদৃশ্য নাই।

নয়

অজিত যখন বাড়ি ফিরিল তখন গভীর রাত্রি। পথ নীরব, দোকান-পাট বন্ধ,—কোথাও মানুষের চিহ্নমাত্র নাই। ঘড়ি খুলিয়া দেখিল তাহা দমের অভাবে আটটা বাজিয়া বন্ধ হইয়াছে। এখন হয়ত একটা, না-হয় ত দুইটা,—ঠিক যে কত কোন আন্দাজ করিতে পারিল না। আশুবাবুর গৃহে এতক্ষণ যে একটা অত্যন্ত উৎকণ্ঠার ব্যাপার চলিতেছে তাহা নিশ্চিত ; শোওয়ার কথা দূরে থাক, হয়ত খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হইয়া আছে। ফিরিয়া সে যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। সত্য ঘটনা বলা যায় না। কেন যায় না সে তর্ক নিষ্ফল, কিন্তু যায় না। বরঞ্চ, মিথ্যা বলা যায়। কিন্তু, মিথ্যা বলার অভ্যাস তাহার ছিল না, না হইলে মোটরে একাকী বাহির হইয়া বিলম্বের কারণ উদ্ভাবন করিতে ভাবিতে হয় না।

গেট খোলা ছিল। দরোয়ান সেলাম করিয়া জানাইল যে সোফার নাই, সে তাঁহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছে। গাড়ি আস্তাবলে রাখিয়া অজিত আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিতেই দেখিল তিনি তখনও শুইতে যান নাই, অসুস্থ দেহ লইয়াও একাকী অপেক্ষা করিয়া আছেন। উদ্বেগে সোজা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, এই যে! আমি বার বার বলচি কি একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। কতবার তোমাকে বলেচি, পথে-ঘাটে কখনো একলা বার হতে নেই। বুড়োর কথা খাটলো ত? শিক্ষে হ'ল ত?

অজিত সলজ্জে একটুখানি হাসিয়া কহিল, আপনাদের এতখানি ভাবিয়ে তোলবার জন্যে আমি অতিশয় দুঃখিত।

দুঃখ কাল ক'রো। ঘড়ির পানে তাকিয়ে দ্যাখো দুটো বাজে। দুটি খেয়ে এখন শোও গে। কাল শুনবো সব কথা। যদু! যদু!—সে ব্যাটাও কি গেল নাকি তোমাকে খুঁজতে?

অজিত বলিল, দেখুন ত আপনাদের অন্যায়। এত বড় শহরে কোথায় সে আমাকে পথে পথে খুঁজবে?

আশুবাবু বলিলেন, তুমি ত বললে অন্যায়। কিন্তু আমাদের যা হচ্ছিল তা আমরাই জানি। এগারোটার সময় শিবনাথের গান-বাজনা বন্ধ হয়েছে, তখন থেকে,—মণিই বা গেলো কোথায়? তাকেও ত তখন থেকে দেখচি নে।

অজিত কহিল, বোধ হয় শুয়েছেন।

শোবে কি হে। এখনো যে তার খাওয়াও হয়নি। বলিয়াই তাঁহার হঠাৎ একটা কথা মনে হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, আস্তাবলে কোচম্যানকে দেখলে।

অজিত কহিল, কৈ না?

তবেই হয়েছে। এই বলিয়া আশুবাবু দুশ্চিন্তায় আর একবার সোজা হইয়া বসিয়া কহিলেন, যা ভেবেচি তাই। গাড়িটা নিয়ে সেও দেখচি খুঁজতে বেরিয়েছে। দ্যাখো দিকি অন্যায়। পাছে বারণ করি, এই ভয়ে একটা কথাও বলেনি। চুপি চুপি চলে গেছে। কখন ফিরবে কে জানে। আজ রাতটা তাহলে জেগেই কাটলো।

আমি দেখচি গাড়িটা আছে কি না। এই বলিয়া অজিত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আস্তাবলে গিয়া দেখিল গাড়ি মজুত এবং ঘোড়া মাঝে মাঝে পা ঠুকিয়া হৃষ্টচিত্তে ঘাস খাইতেছে। তাহার একটা দুশ্চিন্তা কাটিল। নীচের বারান্দার উত্তর-প্রান্তে কয়েকটা বিলাতী ঝাউ ও পাম গাছ বহু অযত্ন মাথায় করিয়াও কোনমতে টিকিয়াছিল, তাহারই উপরে মনোরমার শয়নকক্ষ। তখনও আলো জ্বলিতেছে কি না জানিবার জন্য অজিত সেই দিক দিয়া ঘুরিয়া আশুবাবুর কাছে যাইতেছিল, ঝোপের মধ্যে হইতে মানুষের গলা কানে গেল। অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠ। কথা হইতেছিল কি একটা গানের সুর লইয়া। দোষের কিছুই নয়,—তাহার জন্য ছায়াচ্ছন্ন বৃক্ষতলের প্রয়োজন ছিল না। ক্ষণকালের জন্য অজিতের দুই পা অসাড় হইয়া রহিল। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যই। আলোচনা চলিতেই লাগিল ; সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে প্রস্থান করিল। উভয়ের কেহ জানিতেও পারিল না তাহাদের এই নিশীথ বিশ্রম্ভালাপের কেহ সাক্ষী রহিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে?

অজিত কহিল, গাড়ি-ঘোড়া আস্তাবলেই আছে। মণি বাইরে যাননি।

বাঁচালে বাবা। এই বলিয়া আশুবাবু নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, রাত অনেক হল, সে বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েচে। আজ আর দেখচি মেয়েটার খাওয়া হল না। যাও বাবা, তুমি দুটি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ো গে।

অজিত বলিল, এত রাত্রে আমি আর খাবো না, আপনি শুতে যান।

যাই। কিন্তু কিছুই খাবে না? একটু কিছু মুখে দিয়ে—

না, কিছুই না। আপনি আর বিলম্ব করবেন না। শুতে যান।

এই বলিয়া সেই রুগ্ন মানুষটিকে ঘরে পাঠাইয়া দিয়া অজিত নিজের ঘরে আসিয়া খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সে নিশ্চয় জানিত সুরের আলোচনা শেষ হইলে পিতার খবর লইতে এদিকে একবার মনোরমা আসিবেই আসিবে।

মণি আসিল, কিন্তু প্রায় আধ-ঘণ্টা পরে। প্রথমে সে পিতার বসিবার ঘরের সম্মুখে গিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। যদু বোধ হয় নিকটেই কোথাও সজাগ ছিল, মনিবের ডাকে সাড়া দেয় নাই বটে, কিন্তু তিনি উঠিয়া গেলে আলো নিবাইয়া দিয়াছিল। মনোরমা ক্ষণকাল ইতস্তত: করিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিতে পাইল অজিত তাহার খোলা জানালার সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহারো ঘরে আলো ছিল না, কিন্তু উপরের গাড়িবারান্দার ক্ষীণ রশ্মিরেখা তাহার জানালায় গিয়া পড়িয়াছিল।

কে?

আমি অজিত।

বাঃ! কখন এলে? বাবা বোধ হয় শুতে গেছেন। এই বলিয়া সে যেন একটু চুপ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অসমাপ্ত কথার বেগ তাহাকে থামিতে দিল না। বলিতে লাগিল, দ্যাখো ত তোমার অন্যায়। বাড়িসুদ্ধ লোক ভেবে সারা,—নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছিল। তাই ত বাবা বার বার বারণ করেন একলা যেতে।

এই-সকল প্রশ্ন ও মন্তব্যের অজিত একটারও জবাব দিল না।

মনোরমা কহিল, কিন্তু তিনি কখনই ঘুমুতে পারেন নি। নিশ্চয় জেগে আছেন। তাঁকে একটা খবর দিই গে।

অজিত কহিল, দরকার নেই। তিনি আমাকে দেখেই তবে শুতে গেছেন।

দেখেই শুতে গেছেন? তবে আমাকে একটা খবর দিলে না কেন?

তিনি মনে করেছিলেন তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।

ঘুমিয়ে পড়ব কি রকম? এখনো ত আমার খাওয়া হয়নি পর্যন্ত।

তা হলে খেয়ে শোও গে। রাত আর নেই।

তুমি খাবে না?

না। এই বলিয়া অজিত জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বাঃ! বেশ ত কথা! ইহার অধিক কথা তাহার মুখে ফুটিল না। কিন্তু ভিতর হইতেও আর জবাব আসিল না। বাহিরে একাকী মনোরমা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পীড়াপীড়ি করিয়া রাগ করিয়া নিজের জিদ বজায় রাখিতে তাহার জোড়া নাই,—এখন কিসে যেন তাহার মুখ আঁটিয়া বন্ধ করিয়া রাখিল। অজিত রাত্রি শেষ করিয়া গৃহে ফিরিয়াছে,—বাড়িসুদ্ধ সকলের দুশ্চিন্তার অন্ত নাই,—এতবড় অপরাধ করিয়াও সে-ই তাহাকে অপমানের একশেষ করিল, কিন্তু এতটুকু প্রতিবাদের ভাষাও তাহার মুখে আসিল না, এবং শুধু কেবল জিহ্বাই নির্বাক নয়, সমস্ত দেহটাই যেন কিছুক্ষণের মত বিবশ হইয়া রহিল, জানালায় কেহ ফিরিয়া আসিল না, সে রহিল কি গেল এটুকু জানারও কেহ প্রয়োজন বোধ করিল না। গভীর নিশীথে এমনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া মনোরমা বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সকালেই বেহারার মুখে আশুবাবু খবর পাইলেন কাল অজিত কিংবা মনোরমা কেহই আহার করে নাই। চা খাইতে বসিয়া তিনি উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল তোমার নিশ্চয়ই ভয়ানক কিছু একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছিল, না?

অজিত বলিল, না।

তবে নিশ্চয় হঠাৎ তেল ফুরিয়ে গিয়েছিল?

না, তেল যথেষ্ট ছিল।

তবে এত দেরি হল যে?

অজিত শুধু কহিল, এমনিই।

মনোরমা নিজে চা খায় না। সে পিতাকে চা তৈরি করিয়া দিয়া একবাটি চা ও খাবারের থালাটা অজিতের দিকে বাড়াইয়া দিল, কিন্তু প্রশ্নও করিল না, মুখ তুলিয়াও চাহিল না। উভয়ের এই ভাবান্তর পিতা লক্ষ করিলেন। আহার শেষ করিয়া অজিত স্নান করিতে গেলে তিনি কন্যাকে নিরালায় পাইয়া উদ্বিগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন, না মা, এটা ভাল নয়। অজিতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ যত ঘনিষ্ঠই হোক, তবুও এ-বাড়িতে তিনি অতিথি। অতিথির যোগ্য মর্যাদা তাঁকে দেওয়া চাই।

মনোরমা কহিল, দেওয়া চাইনে এ কথা ত আমি বলিনি বাবা!

না না, বলনি সত্যি, কিন্তু আমাদের আচরণে কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ পাওয়াও অপরাধ।

মনোরমা বলিল, তা মানি। কিন্তু আমার আচরণে অপরাধ হয়েছে এ তুমি কার কাছে শুনলে?

আশুবাবু, এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিলেন না। তিনি শোনেন নি কিছুই, জানেন না কিছুই, সমস্তই তাঁহার অনুমান মাত্র। তথাপি মন তাঁহার প্রসন্ন হইল না। কারণ, এমন করিয়া তর্ক করা

যায়, কিন্তু উৎকণ্ঠিত পিতৃ-চিত্তকে নিঃশঙ্ক করা যায় না। খানিক পরে তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন, অত রাত্রে অজিত আর খেতে চাইলেন না, আমিও শুতে গেলাম ; তুমি ত আগেই শুয়ে পড়েছিলে—কি জানি, কোথায় হয়ত আমাদের একটা অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে। ওঁর মনটা আজ তেমন ভাল নেই।

মনোরমা বলিল, কেউ যদি সারা রাত পথে কাটাতে চায়, আমাদেরও কি তার জন্যে ঘরের মধ্যে জেগে কাটাতে হবে? এই কি অতিথির প্রতি গৃহস্থের কর্তব্য বাবা?

আশুবাবু হাসিলেন। নিজেকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিলেন, গৃহস্থ মানে যদি এই বেতো রুগীটি হয় মা, তা হলে তাঁর কর্তব্য আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়া। নইলে ঢের বড় সম্মানিত অতিথি বাত-ব্যাধির প্রতি অসম্মান দেখানো হয়। কিন্তু সে অর্থে যদি অন্য কাউকে বোঝায় ত তাঁর কর্তব্য নির্দেশ করবার আমি কেউ নয়। আজ অনেকদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল মণি। তোমার মা তখন বেঁচে। গুপ্তিপাড়ায় মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরতে পারলাম না। শুধু একটা রাত মাত্রই নয়, তবু একজন তাই নিয়ে গোটা তিনটে রাত্রি জানালায় বসে কাটিয়ে দিলেন। তাঁর কর্তব্য কে নির্দেশ করেছিলেন তখন জিজ্ঞেস করা হয়নি, কিন্তু আর একদিন দেখা হলে এ কথা জেনে নিতে ভুলবো না। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকালের জন্য মুখ ফিরাইয়া কন্যার দৃষ্টিপথ হইতে নিজের চোখ-দুটিকে আড়াল করিয়া লইলেন।

এ কাহিনী নূতন নয়। গল্পচ্ছলে এ ঘটনা বহুবার মেয়ের কাছে উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তবু আর পুরাতন হয় না। যখনই মনে পড়ে তখনই নূতন হইয়া দেখা দেয়।

ঝি আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল। মনোরমা উঠিয়া পড়িয়া কহিল, বাবা, তুমি একটু বসো, আমি রান্নার যোগাড়টা করে দিয়ে আসি। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। আলোচনাটা যে আর বেশী দূর গড়াইবার সময় পাইল না, ইহাতে সে স্বস্তি বোধ করিল।

দিনের মধ্যে আশুবাবু কয়েকবার অজিতের খোঁজ করিয়া একবার জানিলেন সে বই পড়িতেছে, একবার খবর পাইলেন সে নিজের ঘরে বসিয়া চিঠিপত্র লিখিতেছে। মধ্যাহ্নভোজনের সময় সে প্রায় কথাই কহিল না এবং খাওয়া শেষ হইতেই উঠিয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য দিনের তুলনায় তাহা যেমন রূঢ়, তেমনি বিস্ময়কর।

আশুবাবুর ক্ষোভের পরিসীমা নাই, কহিলেন, ব্যাপার কি মণি?

মনোরমা আজ বরাবরই পিতার দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতেছিল, এখনও বিশেষ কোনদিকে না চাহিয়াই কহিল, জানিনে ত বাবা?

তিনি ক্ষণকাল নিজের মনে চিন্তা করিয়া যেন নিজেকেই বলিতে লাগিলেন, তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমি ত জেগেই ছিলাম। খেতেও বললাম, কিন্তু অনেক রাত্রি হয়েছে বলে সে নিজেই খেলে না। তোমার শুয়ে পড়াটা হয়ত ঠিক হয়নি, কিন্তু এতে এমন কি অন্যায় হয়েছে আমি ত ভেবে পাইনে। এই তুচ্ছ কারণটাকে সে এত করে মনে নেবে এর চেয়ে আশ্চর্য আর কি আছে?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ভিতরের লজ্জাটা দমন করিয়া বলিলেন, কথাটা তাকে তুমি জিজ্ঞাসা করলে না কেন?

মনোরমা জবাব দিল, জিজ্ঞাসা করবার কি আছে বাবা?

জিজ্ঞাসা করিবার অনেক আছে, কিন্তু করাও কঠিন—বিশেষতঃ মণির পক্ষে। ইহা তিনি জানিতেন। তথাপি কহিলেন, সে যে রাগ করে আছে এ ত খুব স্পষ্ট। বোধ হয় সে ভেবেচে তুমি তাকে উপেক্ষা কর। এ-রকম অন্যায় ধারণা ত তার মনে রাখা যেতে পারে না।

মনোরমা বলিল, আমার সম্বন্ধে ধারণা যদি তিনি অন্যায় করে থাকেন সে তাঁর দোষ। একজনের দোষ সংশোধনের গরজটা কি আর একজনকে গায়ে পড়ে নিতে হবে বাবা?

পিতা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিলেন না। মেয়েকে তিনি যেভাবে মানুষ করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে তাহার আত্মসম্মানে আঘাত পড়ে এমন কোন আদেশই করিতে পারেন

না। সে উঠিয়া গেলে এই কথাটাই নিজের মধ্যে অবিশ্রাম তোলাপাড়া করিয়া তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিলেন। এরূপ কলহ ঘটিয়াই থাকে এবং এ ভ্রম ক্ষণিক মাত্র, এমন একটা কথা তিনি বহুবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়াও জোর পাইলেন না। অজিতকে তিনি জানিতেন। শুধু কেবল সে সকল দিক দিয়া সুশিক্ষিতই নয়, তাহার মধ্যে এমন একটা চরিত্রের সত্যপরতা তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আজিকার এই অহেতুক বিরাগের কোনমতেই সামঞ্জস্য হয় না। সকলের অপরিসীম উদ্বেগের হেতু হইয়াও সে লজ্জাবোধের পরিবর্তে রাগ করিয়া রহিল, এমন অসম্ভব যে কি করিয়া তাহাতে সম্ভবপর হইল মীমাংসা করা কঠিন।

বিকালের দিকে একখানা টাঙ্গা গাড়ি গেটের মধ্যে ঢুকিতে দেখিয়া আশুবাবু খবর লইয়া জানিলেন গাড়ি আসিয়াছে অজিতের জন্য। অজিতকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে আসিলে তিনি কষ্টে একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, টাঙ্গা কি হবে অজিত?

একবার বেড়াতে বার হবো।

কেন, মোটর কি হলো? আবার বিগড়েচে নাকি?

না। কিন্তু আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে ত!

যদি হয়ও, তার জন্যে একটা ঘোড়ার গাড়ি আছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, বাবা অজিত, আমাকে সত্যি বল। মোটর নিয়ে কোন কথা উঠেচে?

অজিত কহিল, কৈ আমি ত জানিনে। তবে, আজও আপনাদের গান-বাজনার আয়োজন আছে। তাঁদের আনতে, বাড়ি পৌঁছে দিতে মোটরের আবশ্যকই বেশী। ঘোড়ার গাড়িতে ঠিক হয়ে উঠবে না।

সকাল হইতে নানারূপ দুশ্চিন্তায় কথাটা আশুবাবু ভুলিয়াই ছিলেন। এখন মনে পড়িল, কাল সভাভঙ্গের পরে আজিকার জন্যও তাঁহাদের আহ্বান করা হইয়াছিল এবং সন্ধ্যার পরেই মজলিস বসিবে। একটা খাওয়ানোর কল্পনাও যে মনোরমার ছিল, এই সঙ্গে এ কথাও তাঁহার স্মরণ হইল। কিন্তু মনে মনে একটু হাসিলেন। কারণ প্রচ্ছন্ন কলহের মানসিক অস্বচ্ছন্দতায় কথাটা তাঁহার নিজেরই মনে নাই, এবং মনে পড়িয়াও ভাল লাগিল না, তখন মেয়ের কাছে যে আজ এ-সকল কতদূর বিরক্তিকর তাহা স্বতঃসিদ্ধের মত অনুমান করিয়া কহিলেন, আজ ও-সব হবে না অজিত।

অজিত কহিল, কেন?

কেন? মণিকেই একবার জিজ্ঞেসা করে দেখ না। এই বলিয়া তিনি বেহারাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকাডাকি করিয়া কন্যাকে ডাকিতে পাঠাইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, তুমি রাগ করে আছ বাবা, গান-বাজনা শুনবে কে? মণি? আচ্ছা, সে-সব আর একদিন হবে, এখন, যাও তুমি মোটর নিয়ে একটু ঘুরে এসো গে। কিন্তু বেশী দেরি করতে পাবে না। আর তোমার একলা যাওয়া চলবে না তা বলে দিচ্চি। ড্রাইভার ব্যাটা যে কুঁড়ে হয়ে গেল। এই বলিয়া তিনি একটা সুকঠিন সমস্যার অভাবনীয় সুমীমাংসা করিয়া উচ্ছল আনন্দে আরাম-কেদারায় চিত হইয়া পড়িয়া ফোঁস করিয়া পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, তুমি যাবে টাঙ্গা ভাড়া করে বেড়াতে! ছিঃ!

মনোরমা ঘরে পা দিয়া অজিতকে দেখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল। সাড়া পাইয়া আশুবাবু আবার সোজা হইয়া বসিলেন, সকৌতুক স্নিগ্ধ-হাস্যে মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, বলি আজকের কথাটা মনে আছে ত মা? না, একদম ভুলে বসে আছ?

কি বাবা?

আজ যে সকলের নেমন্তন্ন? তোমাদের গানের পালা শেষ হলে তাঁদের যে আজ খাওয়াবে,—বলি, মনে আছে ত?

মনোরমা মাথা নাড়িয়া কহিল, আছে বৈ কি! মোটর পাঠিয়ে দিয়েচি তাঁদের আনতে।

মোটর পাঠিয়েছ আনতে? কিন্তু খাওয়া-দাওয়া?

মণি কহিল, সমস্ত ঠিক আছে বাবা, ত্রুটি হবে না।

আচ্ছা, বলিয়া তিনি পুনরায় চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখের পরে কে যেন কালি লেপিয়া দিল।

মনোরমা চলিয়া গেল। অজিতও বাহির হইয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া বহুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, অজিত, মেয়ের হয়ে ক্ষমা চাইতে আমার লজ্জা করে। কিন্তু ওর মা বেঁচে নেই, তিনি থাকলে আমাকে এ কথা বলতে হতো না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু বলিলেন, ওর 'পরে তুমি কেন রাগ করে আছ, এ তিনিই তোমার কাছ থেকে বার করে নিতেন,—কিন্তু তিনি ত নেই,—আমাকে কি তা বলা যায় না?

তাঁহার কণ্ঠস্বর এমনি সকরুণ যে ক্লেশ বোধ হয়। তথাপি অজিত নির্বাক হইয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, ওর সঙ্গে কি তোমার কোন কথাবার্তা হয়নি?

অজিত কহিল, হয়েছিল।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, হয়েছিল? কখন হল? মণি হঠাৎ যে কাল ঘুমিয়ে পড়েছিল এ কি তোমাকে সে বলেছিল?

অজিত কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বোধ হয় কি জবাব দিবে ইহাই ভাবিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, অতরাত্রি পর্যন্ত নিরর্থক জেগে থাকা সহজও নয়, উচিতও নয়। ঘুমুলে অন্যায় হতো না, কিন্তু তিনি ঘুমোন নি। আপনি শুতে যাবার খানিক পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

তারপরে?

তারপরে আর কোন কথা আপনাকে বলব না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। দ্বারের বাহির হইতে বলিয়া গেল, হয়ত কাল-পরশু আমি এখান থেকে যেতে পারি।

আশুবাবু কিছুই বুঝিলেন না, শুধু বুঝিলেন কি একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেছে।

অজিতকে লইয়া টাঙ্গা বাহির হইয়া গেল, সে তিনি শুনিতে পাইলেন। মিনিট-কয়েক পরে প্রচুর কোলাহল করিয়া নিমন্ত্রিতদের লইয়া মোটর ফিরিয়া আসিল, সে-ও তাঁহার কানে গেল। কিন্তু তিনি নড়িলেন না, সেইখানেই মূর্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। বৈঠক বসিলে বেহারা গিয়া সংবাদ দিল, বাবুর শরীর ভাল নয়, তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন।

সেদিন গান জমিল না, খাওয়ার উৎসাহ ম্লান হইয়া গেল,—সকলেরই বার বার করিয়া মনে হইতে লাগিল, বাড়ির একজন ভ্রমণের ছলে বাহির হইয়া গেছেন এবং আর একজন তাঁহার বিপুল দেহ ও প্রসন্ন স্নিগ্ধহাস্য লইয়া সভার যে স্থানটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিতেন আজ সেখানটা শূন্য পড়িয়া আছে।

দশ

এদিকে অজিতের গাড়ি আসিয়া কমলের বাটীর সম্মুখে থামিল। কমল পথের ধারের সঙ্কীর্ণ বারান্দার উপরে দাঁড়াইয়া ছিল, চোখাচোখি হইতেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। গাড়িটাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া চেঁচাইয়া বলিল, ওটা বিদেয় করে দিন। সুমুখে দাঁড়িয়ে কেবল ফেরবার তাড়া দেবে।

সিঁড়ির মুখেই আবার দেখা হইল। অজিত কহিল, বিদেয় করে ত দিলেন, কিন্তু ফেরবার সময় আর একটা পাওয়া যাবে ত?

কমল বলিল, না। কতটুকুই বা পথ, হেঁটে যাবেন।

হেঁটে যাব?

কেন, ভয় করবে নাকি? না হয় আমি নিজে গিয়ে আপনাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব। আসুন। এই বলিয়া সে তাহাকে সঙ্গে করিয়া রান্নাঘরে আনিয়া বসিবার জন্য কল্যকার সেই আসনখানি পাতিয়া দিয়া কহিল, চেয়ে দেখুন সারাদিন ধরে আমি কত রান্না রেঁধেছি। আপনি

না এলে রাগ করে আমি সমস্ত মুচীদের ডেকে দিয়ে দিতাম।

অজিত বলিল, আপনার রাগ ত কম নয়। কিন্তু তাতে এর চেয়ে খাবারগুলোর ঢের বেশী সদ্‌গতি হতো।

এ কথার মানে? বলিয়া কমল ক্ষণকাল অজিতের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিজেই কহিল, অর্থাৎ আপনার অভাব নেই, হয়ত অধিকাংশই ফেলা যাবে,—কিন্তু তাদের অত্যন্ত অভাব। তারা খেয়ে বাঁচবে। সুতরাং, তাদের খাওয়ানোই খাবারের যথার্থ সদ্ব্যবহার, এই না?

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ ছাড়া আর কি!

কমল বলিল, এ হলো সাধু লোকেদের ভাল-মন্দর বিচার, পুণ্যাত্মাদের ধর্মবুদ্ধির যুক্তি। পরলোকের খাতায় তারা একেই সার্থক ব্যয় বলে লিখিয়ে রাখতে চায়, বোঝে না যে আসলে ঐটেই হলো ভুয়ো। আনন্দের সুধাপাত্র যে অপব্যয়ের অন্যায়েই পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এ কথা তারা জানবে কোথা থেকে?

অজিত আশ্চর্য হইয়া কহিল, মানুষের কর্তব্য-বুদ্ধির ভেতরে আনন্দ নেই নাকি?

কমল কহিল, না নেই। কর্তব্যের মধ্যে যে আনন্দের ছলনা সে দুঃখেরই নামান্তর। তাকে বুদ্ধির শাসন দিয়ে জোর করে মানতে হয়। সেই ত বন্ধন। তা না হলে এই যে শিবনাথের আসনে এনে আপনাকে বসিয়েছি, ভালবাসার এই অপব্যয়ের মধ্যে আমি আনন্দ পেতাম কোথায়? এই যে সারাদিন অভুক্ত থেকে কত কি বসে বসে রেঁধেছি—আপনি এসে খাবেন বলে, এত বড় অকর্তব্যের ভেতরে আমি তৃপ্তি পেতাম কোন্‌খানে? অজিতবাবু, আজ আমার সকল কথা আপনি বুঝবেন না, বোঝবার চেষ্টা করেও লাভ নেই, কিন্তু এতখানি উলটো কথার অর্থ যদি কখনো আপনা থেকেই উপলব্ধ হয়, সেদিন কিন্তু আমাকে স্মরণ করবেন। কিন্তু এখন থাক, আপনি খেতে বসুন। এই বলিয়া সে পাত্র ভরিয়া বহুবিধ ভোজ্যবস্তু তাহার সম্মুখে রাখিল।

অজিত বহুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিল, এ ঠিক যে আপনার শেষ কথাগুলোর অর্থ আমি ভেবে পেলাম না, কিন্তু তবুও মনে হচ্চে যেন একেবারে অবোধ্য নয়। বুঝিয়ে দিলে হয়ত বুঝতেও পারি।

কমল কহিল, কে বুঝিয়ে দেবে অজিতবাবু, আমি? আমার দরকার? এই বলিয়া সে হাসিয়া বাকি পাত্রগুলা অগ্রসর করিয়া দিল।

অজিত আহারে মনোনিবেশ করিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় জানেন না যে, কাল আমার খাওয়া হয়নি।

কমল কহিল, জানিনে বটে, কিন্তু আমার ভয় ছিল অত রাত্রে ফিরে গিয়ে হয়ত আপনি খাবেন না। তাই হয়েছে। আমার দোষেই কাল কষ্ট পেলেন।

কিন্তু আজ সুদ-সুদ্ধ আদায় হচ্চে! কথাটা বলিয়াই তাহার স্মরণ হইল কমল এখনও অভুক্ত। মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু, আমি একেবারে জন্তুর মত স্বার্থপর। সারাদিন আপনি খাননি, অথচ সেদিকে আমার হুঁশ নেই, দিব্যি খেতে বসে গেছি।

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, এ যে আমার নিজের খাওয়ার চেয়ে বড়, তাই ত তাড়াতাড়ি আপনাকে বসিয়ে দিয়েছি অজিতবাবু। এই বলিয়া সে একটু থামিয়া কহিল, আর এ-সব মাছ-মাংসের কাণ্ড। আমি ত খাইনে।

কিন্তু কি খাবেন আপনি?

ঐ যে। এই বলিয়া সে দূরে এনামেলের বাটিতে ঢাকা একটা বস্তু হাত দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওর মধ্যে আমার চাল-ডাল আর আলু সেদ্ধ হয়ে আছে। ঐ আমার রাজভোগ।

এ বিষয়ে অজিতের কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না, কিন্তু তাহার সঙ্কোচে বাধিল। পাছে সে দারিদ্র্যের উল্লেখ করে, এই আশঙ্কায় সে অন্য কথা পাড়িল। কহিল, আপনাকে দেখে প্রথম থেকেই আমার কি যে বিস্ময় লেগেছিল তা বলতে পারিনে।

কমল হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, সে ত আমার রূপ। কিন্তু সেও হার মেনেছে অক্ষয়বাবুর

কাছে। তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি।

অজিত লজ্জা পাইয়াও হাসিল, কহিল, বোধ হয় না। তিনি গোলকুণ্ডার মানিক। তাঁর গায়ে আঁচড় পড়ে না। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময় লেগেছিল আপনার কথা শুনে। হঠাৎ যেন ধৈর্য থাকে না,—রাগ হয়। মনে হয় কোন সত্যকেই যেন আপনি আমল দিতে চান না। হাত বাড়িয়ে পথ আগলানোই যেন আপনার স্বভাব।

কমল হয়ত ক্ষুণ্ণ হইল। বলিল, তা হবে। কিন্তু আমার চেয়েও বড় বিস্ময় সেখানে ছিল—সে আর একটা দিক। যেমন বিপুল দেহ, তেমনি বিরাট শান্তি। ধৈর্যের যেন হিমগিরি। উত্তাপের বাষ্পও সেখানে পৌঁছয় না। ইচ্ছে হয়, আমি যদি তাঁর মেয়ে হতাম।

কথাটি অজিতের অত্যন্ত ভাল লাগিল। আশুবাবুকে সে অন্তরের মধ্যে দেবতার ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তথাপি কহিল, আপনাদের উভয়ের এমন বিপরীত প্রকৃতি মিলতো কি করে?

কমল বলিল, তা জানিনে। আমার ইচ্ছের কথাই শুধু বললাম। মণির মত আমিও যদি তাঁর মেয়ে হয়ে জন্মাতাম! এই বলিয়া সে ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, আমার নিজের বাবাও বড় কম লোক ছিলেন না। তিনিও এমনি ধীর এমনি শান্ত মানুষটি ছিলেন।

কমল দাসীর কন্যা, ছোটজাতের মেয়ে, সকলের কাছে অজিত এই কথাই শুনিয়াছিল। এখন কমলের নিজের মুখে তাহার পিতার গুণের উল্লেখে তাহার জন্মরহস্য জানিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা পাছে তাহার ব্যথার স্থানে অতর্কিত আঘাত করে এই ভয়ে প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিন্তু মনটি তাহার ভিতরে ভিতরে স্নেহে ও করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইল। কিন্তু তাহাকে উঠিতে বলায় অজিত অস্বীকার করিয়া বলিল, আগে আপনার খাওয়া শেষ হোক। তার পরে।

কেন কষ্ট পাবেন অজিতবাবু, উঠুন। বরঞ্চ মুখ ধুয়ে এসে বসুন, আমি খাচ্চি।

না, সে হবে না। আপনি না খেলে আমি আসন ছেড়ে এক পা-ও উঠবো না।

বেশ মানুষ ত! এই বলিয়া কমল হাসিয়া আহার্য-দ্রব্যের ঢাকা খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। কমল লেশমাত্র অত্যুক্তি করে নাই। চাল-ডাল ও আলু-সিদ্ধই বটে। শুকাইয়া প্রায় বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য দিন সে কি খায়, না খায়, সে জানে না। কিন্তু আজ এতপ্রকার পর্যাপ্ত আয়োজনের মাঝেও এই স্বেচ্ছাকৃত আত্মপীড়নে তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। কাল শুনিয়াছিল দিনান্তে সে একটিবার মাত্র খায়, এবং আজ দেখিতে পাইল তাহা এই। সুতরাং, যুক্তি ও তর্কের ছলনায় কমল মুখে যাহাই বলুক, বাস্তব ভোগের ক্ষেত্রে তাহার এই কঠোর আত্মসংযম অজিতের অভিভূত মুগ্ধ চক্ষে মাধুর্য ও শ্রদ্ধায় অপরূপ হইয়া উঠিল, এবং বঞ্চনায়, অসম্মানে ও অনাদরে যে কেহ ইহাকে লাঞ্ছিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি তাহার ঘৃণার অবধি রহিল না। কমলের খাওয়ার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া এই ভাবটাকে সে আর চাপিতে পারিল না, উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিল, নিজেদের বড় মনে করে যারা অপমানে আপনাকে দূরে রাখতে চায়, যারা অকারণে গ্লানি করে বেড়ায়, তারা কিন্তু আপনার পাদস্পর্শেরও যোগ্য নয়। সংসারে দেবীর আসন যদি কারও থাকে সে আপনার।

কমল অকৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

কেন তা জানিনে, কিন্তু এ আমি শপথ করে বলতে পারি।

কমলের বিস্ময়ের ভাব কাটিল না, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

অজিত বলিল, যদি ক্ষমা করেন ত একটা প্রশ্ন করি।

কি প্রশ্ন?

পাপিষ্ঠ শিবনাথের কাছে এই অপমান ও বঞ্চনা পাবার পরেই কি এই কৃচ্ছ্র অবলম্বন করেছেন?

কমল কহিল, না। আমার প্রথম স্বামী মরবার পর থেকেই আমি এমনি খাই। এতে আমার

কষ্ট হয় না।

অজিতের মুখের উপর যেন কে কালি ঢালিয়া দিল। সে কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার আর একবার বিবাহ হয়েছিল নাকি?

কমল কহিল, হাঁ। তিনি একজন অসমীয়া ক্রিশ্চান। তাঁর মৃত্যুর পরেই আমার বাবা মারা গেলেন হঠাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে। তখন শিবনাথের এক খুড়ো ছিলেন বাগানের হেড ক্লার্ক। তাঁর স্ত্রী ছিল না, মাকে তিনি আশ্রয় দিলেন। আমিও তাঁর সংসারে এলাম। এইরকম নানা দুঃখে-কষ্টে পড়ে একবেলা খাওয়াই অভ্যাস হয়ে গেল। কৃচ্ছ্রসাধনা আর কি, বরঞ্চ শরীর মন দুই-ই ভাল থাকে।

অজিত নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনারা শুনেছি জাতে তাঁতী।

কমল কহিল, লোকে তাই বলে। কিন্তু মা বলতেন, তাঁর বাবা ছিলেন আপনাদের জাতেরই একজন কবিরাজ। অর্থাৎ আমার সত্যিকার মাতামহ তাঁতী নয়, বৈদ্য। এই বলিয়া সে একটু হাসিয়া কহিল, তা তিনি যে-ই হোন, এখন রাগ করাও বৃথা, আপসোস করাও বৃথা।

অজিত কহিল, সে ঠিক।

কমল বলিল, মার রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। বিয়ের পরে কি একটা দুর্নাম রটায় তাঁর স্বামী তাঁকে নিয়ে আসামের চা-বাগানে পালিয়ে যান। কিন্তু বাঁচলেন না, কয়েক মাসেই জ্বরে মারা গেলেন। বছর-তিনেক পরে আমার জন্ম হ'ল বাগানের বড় সাহেবের ঘরে।

তাহার বংশ ও জন্মগ্রহণের বিররণ শুনিয়া অজিতের মুহূর্তকাল পূর্বের স্নেহ ও শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত হৃদয় বিতৃষ্ণা ও সঙ্কোচে বিন্দুবৎ হইয়া গেল। তাহার সবচেয়ে বাজিল এই কথাটা যে, নিজের ও জননীর এতবড় একটা লজ্জাকর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে ইহার লজ্জার লেশমাত্র নাই। অনায়াসে বলিল, মায়ের রূপ ছিল, কিন্তু রুচি ছিল না। যে অপরাধে একজন মাটির সহিত মিশিয়া যাইত, সে ইহার কাছে রুচির বিকার মাত্র! তার বেশী নয়।

কমল বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার বাপ ছিলেন সাধু লোক। চরিত্রে, পাণ্ডিত্যে, সততায়—এমন মানুষ খুব কম দেখেছি, অজিতবাবু। জীবনের উনিশটা বছর আমি তাঁর কাছেই মানুষ হয়েছিলাম।

অজিতের একবার সন্দেহ হইল, এ হয়ত উপহাস করিতেছে। কিন্তু এ কি উপহাস? কহিল, এ-সব কি আপনি সত্যি বলচেন?

কমল একটু আশ্চর্য হইয়াই জবাব দিল, আমি ত কখনই মিথ্যে বলিনে অজিতবাবু। পিতার স্মৃতি পলকের জন্য তাহার মুখের পরে একটা স্নিগ্ধ দীপ্তি ফেলিয়া গেল। কহিল, এ জীবনে কখনো কোন কারণেই যেন মিথ্যা চিন্তা, মিথ্যা অভিমান, মিথ্যা বাক্যের আশ্রয় না নিই, বাবা এই শিক্ষাই আমাকে বার বার দিয়ে গেছেন।

অজিত তথাপি যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল, আপনি ইংরেজের কাছে যদি মানুষ, আপনার ইংরিজি জানাটাও ত উচিত।

প্রত্যুত্তরে কমল শুধু একটু মুচকিয়া হাসিল। বলিল, আমার খাওয়া হয়ে গেছে, চলুন ও-ঘরে যাই।

না, এখন আমি উঠব।

বসবেন না? আজ এত শীঘ্র চলে যাবেন!

হাঁ, আজ আর আমার সময় হবে না।

এতক্ষণ পরে কমল মুখ তুলিয়া তাহার মুখের অত্যন্ত কঠোরতা লক্ষ্য করিল। হয়ত, কারণটাও অনুমান করিল। কিছুক্ষণ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আচ্ছা যান।

ইহার পরে যে কি বলিবে অজিত খুঁজিয়া পাইল না, শেষে কহিল, আপনি কি এখন আগ্রাতেই থাকবেন?

কেন?

ধরুন শিবনাথবাবু যদি আর না-ই আসেন। তাঁর 'পরে ত আপনার জোর নেই!

কমল কহিল, না। একটু স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের ওখানে ত তিনি রোজ যান, গোপনে একটু জেনে নিয়ে কি আমাকে জানাতে পারবেন না?

তাতে কি হবে?

কমল কহিল, কি আর হবে! বাড়িভাড়াটা এ মাসের দেওয়াই আছে, আমি তা হলে কাল-পরশু চলে যেতে পারি।

কোথায় যাবেন?

কমল এ প্রশ্নের উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

অজিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনার হাতে বোধ করি টাকা নেই?

কমল এ প্রশ্নেরও উত্তর দিল না।

অজিত নিজেও কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, আসবার সময় আপনার জন্যে কিছু টাকা সঙ্গে এনেছিলাম। নেবেন?

না।

না কেন? আমি নিশ্চয়ই জানি আপনার হাতে কিছু নেই। যাও বা ছিল, আজ আমারই জন্য তা নিঃশেষ হয়েছে। কিন্তু উত্তর না পাইয়া সে পুনশ্চ কহিল, প্রয়োজনে বন্ধুর কাছে কি কেউ নেয় না?

কমল কহিল, কিন্তু বন্ধু ত আপনি নয়।

না-ই হলাম। কিন্তু অ-বন্ধুর কাছেও ত লোকে ঋণ নেয়! আবার শোধ দেয়। আপনি তাই কেন নিন না?

কমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আপনাকে বলেচি আমি কখনোই মিথ্যে বলিনে।

কথা মৃদু, কিন্তু তীরের ফলার ন্যায় তীক্ষ্ণ। অজিত বুঝিল ইহার অন্যথা হইবে না। চাহিয়া দেখিল প্রথম দিনে তাহার গায়ে সামান্য অলঙ্কার যাহা কিছু ছিল আজ তাহাও নাই। সম্ভবতঃ বাড়িভাড়া ও এই কয়দিনের খরচ চালাইতে শেষ হইয়াছে। সহসা ব্যথার ভারে তাহার মনের ভিতরটা কাঁদিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যাওয়াই কি স্থির?

কমল কহিল, তা ছাড়া উপায় কি আছে?

উপায় কি আছে সে জানে না এবং জানে না বলিয়াই তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। শেষ চেষ্টা করিয়া কহিল, জগতে কি কেউ নেই যাঁর কাছে এ সময়েও কিছু সাহায্য নিতে পারেন?

কমল একটুখানি ভাবিয়া বলিল, আছেন। মেয়ের মত তাঁর কাছে গিয়েই শুধু হাত পেতে নিতে পারি। কিন্তু আপনার যে রাত হয়ে যাচ্চে। সঙ্গে গিয়ে এগিয়ে দেব কি?

অজিত ব্যস্ত হইয়া বলিল, না না, আমি একাই যেতে পারবো।

তা হলে আসুন, নমস্কার। এই বলিয়া কমল তাহার শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অজিত মিনিট-দুই সেইখানে স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

এগার

বেলা তৃতীয় প্রহর। শীতের অবধি নাই। আশুবাবুর বসিবার ঘরে সার্সীগুলা সারাদিনই বন্ধ আছে, তিনি আরাম-কেদারার দুই হাতলের উপর দুই পা মেলিয়া দিয়া গভীর মনোযোগের সহিত কি একটা পড়িতেছিলেন, সেই কাগজের পাতায় পিছনের দরজার দিকে একটা ছায়া পড়ায় বুঝিলেন এতক্ষণে তাঁহার বেহারায় দিবানিদ্রা সম্পূর্ণ হইয়াছে। কহিলেন, কাঁচা ঘুমে ওঠোনি ত বাবা, তা হলে আবার মাথা ধরবে। বিশেষ কষ্ট বোধ না করো ত গায়ের কাপড়টা দিয়ে গরীবের পা-দুটো একটু ঢেকে দাও।

নীচের কার্পেটে একখানা মোটা বালাপোশ লুটাইতেছিল, আগন্তুক সেইখানা তুলিয়া লইয়া

তাঁহার দুই পা ঢাকিয়া দিয়া পায়ের তলা পর্যন্ত বেশ করিয়া মুড়িয়া দিল।

আশুবাবু কহিলেন, হয়েছে বাবা, আর অতি-যত্নে কাজ নেই। এইবার একটা চুরুট দিয়ে আর একটুখানি গড়িয়ে নাও গে,—এখনো একটু বেলা আছে। কিন্তু বুঝবে বাবা কাল—অর্থাৎ কাল তোমার চাকরি যাইবেই। কোন সাড়া আসিল না, কারণ প্রভুর এবংবিধ মন্তব্যে ভৃত্য অভ্যস্ত। প্রতিবাদ করাও যেমন নিষ্প্রয়োজন, বিচলিত হওয়াও তেমনি বাহুল্য।

আশুবাবু হাত বাড়াইয়া চুরুট গ্রহণ করিলেন এবং দেশলাই জ্বালার শব্দে এতক্ষণে লেখা হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কয়েক মুহূর্ত অভিভূতের মত স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, তাই ত বলি, একি যোদোর হাত। এমন করে পা ঢেকে দিতে ত তার চৌদ্দপুরুষে জানে না।

কমল বলিল, কিন্তু এদিকে যে হাত পুড়ে যাচ্চে।

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া জ্বলন্ত কাঠিটা তাহার হাত হইতে ফেলিয়া দিলেন এবং সেই হাত নিজের হাতের মধ্যে লইয়া তাহাকে জোর করিয়া সম্মুখে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, এতদিন তোমাকে দেখতে পাইনি কেন মা?

এই প্রথম তাহাকে তিনি মাতৃ-সম্বোধন করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রশ্নের যে কোন অর্থ নাই তাহা উচ্চারণ করিবামাত্র তিনি নিজেই টের পাইলেন।

কমল একখানা চৌকি টানিয়া লইয়া দূরে বসিতে যাইতেছিল, তিনি তাহা হইতে দিলেন না, বলিলেন, ওখানে নয় মা, তুমি আমার খুব কাছে এসে বসো। এই বলিয়া তাহাকে একান্ত সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এমন হঠাৎ যে কমল?

কমল কহিল, আজ ভারী ইচ্ছে হল আপনাকে একবার দেখে আসি, তাই চলে এলাম।

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু কহিলেন, বেশ করেছো। কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অন্যান্য সকলের মতো তিনিও জানেন এদেশে কমলের সঙ্গী-সাথী নাই, কেহ তাহাকে চাহে না, কাহারও বাটীতে তাহার যাইবার অধিকার নাই,—নিতান্ত নিঃস্ব জীবনই এই মেয়েটিকে অতিবাহিত করিতে হয়, তথাপি এমন কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না,—কমল, তোমার যখন খুশি স্বচ্ছন্দে আসিও। আর যাহার কাছেই হোক, আমার কাছে তোমার কোন সঙ্কোচ নাই। ইহার পরে বোধ করি কথার অভাবেই তিনি মিনিট দুই-তিন কেমন একপ্রকার অন্যমনস্কের মত মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাতের কাগজগুলা নীচে খসিয়া পড়িতে কমল হেঁট হইয়া তুলিয়া দিয়া কহিল, আপনি পড়ছিলেন, আমি অসময়ে এসে বোধ হয় বিঘ্ন করলাম।

আশুবাবু বলিলেন, না। পড়া আমার হয়ে গেছে। যেটুকু বাকী আছে তা না পড়লেও চলে—পড়বার ইচ্ছেও নেই। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, তা ছাড়া তুমি চলে গেলে আমাকে একলা থাকতেই ত হবে, তার চেয়ে বসে দুটো গল্প করো, আমি শুনি।

কমল কহিল, আমি ত আপনার সঙ্গে সারাদিন গল্প করতে পেলে বেঁচে যাই। কিন্তু আর-সকলে রাগ করবেন যে!

তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও আশুবাবু ব্যথা পাইলেন ; কহিলেন, কথা তোমার মিথ্যে নয় কমল। কিন্তু যাঁরা রাগ করবেন তাঁরা কেউ উপস্থিত নেই। এখানকার নতুন ম্যাজিস্ট্রেট বাঙালী। তাঁর স্ত্রী হচ্চেন মণির বন্ধু, একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলেন। দিন-দুই হল তিনি স্বামীর কাছে এসেছেন, মণি তাঁর ওখানেই বেড়াতে গেছেন, ফিরতে বোধ হয় রাত্রি হবে।

কমল সহাস্যে প্রশ্ন করিল, আপনি বললেন যাঁরা রাগ করবেন। একজন ত মনোরমা, কিন্তু বাকী কারা?

আশুবাবু বলিলেন, সবাই। এখানে তার অভাব নেই। আগে মনে হতো অজিতের হয়ত তোমার প্রতি রাগ নেই, কিন্তু এখন দেখি তার বিদ্বেষই যেন সবচেয়ে বেশী, যেন অক্ষয়বাবুকেও হার মানিয়েছে।

কমল চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, এসেও তাকে এমন দেখিনি, কিন্তু

হঠাৎ দিন দু-তিনের মধ্যে সে যেন বদলে গেল। এখন অবিনাশকেও দেখি তাই। এরা সবাই মিলে যেন তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে।

এবার কমল হাসিল, কহিল, অর্থাৎ কুশাঙ্কুরের উপর বজ্রাঘাত! কিন্তু আমার মত সমাজ ও লোকালয়ের বাইরের তুচ্ছ একজন মেয়েমানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত কিসের জন্যে? আমি ত কারও বাড়িতে যাইনে।

আশুবাবু বলিলেন, তা যাও না সত্যি। শহরের কোথায় তোমাদের বাসা তাও কেউ জানে না, কিন্তু তাই বলে তুমি তুচ্ছ নয় কমল। তাই তোমাকে এরা ভুলতেও পারে না, মাপ করতেও পারে না। তোমার আলোচনা না করে, তোমাকে খোঁটা না দিয়ে এদের স্বস্তিও নেই, শান্তিও নেই। অকস্মাৎ হাতের কাগজগুলা তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এটা কি জানো? অক্ষয়বাবুর রচনা। ইংরিজী না হলে তোমাকে পড়ে শোনাতাম। নাম-ধাম নেই, কিন্তু এর আগাগোড়া শুধু তোমারই কথা, তোমাকেই আক্রমণ। কাল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়িতে নাকি নারী-কল্যাণ-সমিতির উদ্বোধন হবে,—এ তারই মঙ্গল-অনুষ্ঠান। এই বলিয়া তিনি সেগুলো দূরে নিক্ষেপ করিলেন, কহিলেন, এ শুধু প্রবন্ধ নয়, মাঝে মাঝে গল্পচ্ছলে পাত্র-পাত্রীদের মুখ দিয়ে নানা কথা বার করা হয়েছে। এর মূল নীতির সঙ্গে কারও বিরোধ নেই,—বিরোধ থাকতেই পারে না, কিন্তু, এ ত সে নয়। ব্যক্তি-বিশেষকে পদে পদে আঘাত করতে পারাই যেন এর আসল আনন্দ। কিন্তু অক্ষয়ের আনন্দ আর আমার আনন্দ ত এক নয় কমল, একে ত আমি ভাল বলতে পারিনে।

কমল কহিল, কিন্তু আমি ত আর এ লেখা শুনতে যাবো না,—আমাকে আঘাত করার সার্থকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, কোন সার্থকতাই নেই। তাই বোধ হয় ওরা আমাকে পড়তে দিয়েছে। ভেবেচে ভরাডুবির মুষ্টিলাভ। বুড়োকে দুঃখ দিয়ে যতটুকু ক্ষোভ মেটে। এই বলিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া কমলের হাতখানি আর একবার টানিয়া লইলেন। এই স্পর্শটুকুর মধ্যে যে কি কথা ছিল কমল তাহার সবটুকু বুঝিল না, তবু তাহার ভিতরটায় কি একরকম করিয়া উঠিল। একটু থামিয়া কহিল, আপনার দুর্বলতাটুকু তাঁরা ধরেচেন, কিন্তু আসল মানুষটিকে তাঁরা চিনতে পারেন নি।

তুমিই কি পেরেচো মা?

বোধহয় ওঁদের চেয়ে বেশী পেরেচি।

আশুবাবু ইহার উত্তর দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিলেন, সবাই ভাবে এই সদানন্দ বুড়োলোকটির মত সুখী কেউ নেই। অনেক টাকা, অনেক বিষয়-আশয়—

কিন্তু সে ত মিথ্যে নয়।

আশুবাবু বলিলেন, না, মিথ্যে নয়। অর্থ এবং সম্পত্তি আমার যথেষ্ট আছে। কিন্তু ও মানুষের কতটুকু কমল?

কমল সহাস্যে কহিল, অনেকখানি আশুবাবু।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন, পরে কহিলেন, যদি কিছু না মনে করো ত তোমাকে একটা কথা বলি—

বলুন।

আমি বুড়োমানুষ, আর তুমি আমার মণির সমবয়সী। তোমার মুখ থেকে আমার নিজের নামটা আমার নিজের কানেই যেন বাধে কমল। তোমার বাধা না থাকে ত আমাকে বরঞ্চ কাকাবাবু বলে ডেকো।

কমলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, কথায় আছে নেই-মামার চেয়ে কানা-মামাও ভালো। আমি কানা নই বটে, কিন্তু খোঁড়া—বাতে পঙ্গু। বাজারে আশু বদ্যির

কেউ কানাকড়ি দাম দেবে না। এই বলিয়া তিনি সহাস্য কৌতুকে হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আন্দোলিত করিয়ে কহিলেন, না-ই দিলে মা, কিন্তু যার বাবা বেঁচে নেই তার অত খুঁতখুঁতে হলে চলে না। তার খোঁড়া-কাকাই ভালো।

অন্য পক্ষ হইতে জবাব না পাইয়া তিনি পুনশ্চ কহিলেন, কেউ যদি খোঁচাই দেয় কমল তাকে বিনয় করে বলো, এই আমার ঢের। বলো গরীবের রাঙই সোনা।

তাঁহার চেয়ারের পিছন দিকে বসিয়া কমল ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া অশ্রুনিরোধের চেষ্টা করিতে লাগিল, উত্তর দিতে পারিল না। এই দু'জনের কোথাও মিল নাই ; শুধু অনাত্মীয়-অপরিচয়ের সুদূর ব্যবধানই নয়—শিক্ষা, সংস্কার, রীতি-নীতি, সংসার ও সামাজিক ব্যবস্থায় উভয়ের কত বড়ই না প্রভেদ! কোন সম্বন্ধই যেখানে নাই, সেখানে শুধু কেবল একটা সম্বোধনের ছল করিয়া এই বাঁধিয়া রাখিবার কৌশলে কমলের চোখে বহুকাল পরে জল আসিয়া পড়িল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন মা, পারবে ত বলতে?

কমল উচ্ছ্বসিত অশ্রু সামলাইয়া লইয়া শুধু কহিল, না।

না! না কেন?

কমল এ-প্রশ্নের উত্তর দিল না, অন্য কথা পাড়িল। কহিল, অজিতবাবু কোথায়?

আশুবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কি জানি, হয়ত বাড়িতেই আছে! পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ক'দিন থেকে আমার কাছে বড় একটা সে আসে না। হয়ত সে এখান থেকে শীঘ্রই চলে যাবে।

কোথায় যাবেন?

আশুবাবু হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিলেন, বুড়োমানুষকে সবাই কি সব কথা বলে মা? বলে না। হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে না। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, শুনেচো বোধ হয় মণির সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ অনেকদিন থেকেই স্থির ছিল, হঠাৎ মনে হচ্চে যেন ওরা কি নিয়ে একটা ঝগড়া করেছে। কেউ কারো সঙ্গে ভাল করে কথাই কয় না।

কমল নীরব হইয়া রহিল। আশুবাবু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, জগদীশ্বর মালিক, তাঁর ইচ্ছে। একজন গান-বাজনা নিয়ে মেতে উঠেচে, আর একজন তার পুরোনো অভ্যাস সুদে-আসলে ঝালিয়ে তোলবার জোগাড় করচে। এই ত চলচে।

কমল আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, কি তাঁর পুরোনো অভ্যাস?

আশুবাবু বলিলেন, সে অনেক। ও গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী হয়েছে, মণিকে ভালবেসেছে, দেশের কাজে হাজতে গেছে, বিলেত গিয়ে ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, ফিরে এসে সংসারী হবার ইচ্ছে, কিন্তু, সম্প্রতি বোধ হয় সেটা একটু বদলেছে। আগে মাছ-মাংস খেতো না, তার পরে খাচ্ছিলো, আবার দেখচি পরশু থেকে বন্ধ করেছে। যদু বলে, বাবু ঘণ্টাখানেক ধরে ঘরে বসে নাক টিপে নাকি যোগাভ্যাস করেন।

যোগাভ্যাস করেন?

হাঁ। চাকরটাই বলছিল ফেরবার পথে কাশীতে নাকি সমুদ্রযাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে।

কমল অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিল, সমুদ্রযাত্রার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করবেন? অজিতবাবু?

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, পারে ও। ওর হল সর্বতোমুখী প্রতিভা।

কমল হাসিয়া ফেলিল। কি একটা বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে মানুষের ছায়া পড়িল। এবং যে ভৃত্য এত বিভিন্ন প্রকারের সংবাদ মনিবকে সরবরাহ করিয়াছে সে-ই আসিয়া সশরীরে দণ্ডায়মান হইল। এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন সংবাদ এই দিল যে, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন্দ্র, অজিত প্রভৃতি বাবুদের দল আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। শুনিয়া শুধু কমল নয়, বন্ধুবর্গের অভ্যাগমে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে অভ্যর্থনা করাই যাঁহার স্বভাব, সেই আশুবাবুর পর্যন্ত মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে আগন্তুক ভদ্রব্যক্তিরা ঘরে ঢুকিয়া সকলেই আশ্চর্য হইলেন। কারণ এই মেয়েটির

এখানে এভাবে দর্শন মিলিতে পারে তাহা তাঁহাদের কল্পনার অতীত। হরেন্দ্র হাত তুলিয়া কমলকে নমস্কার করিয়া কহিল, ভাল আছেন? অনেকদিন আপনাকে দেখিনি।

অবিনাশ হাসিবার মত মুখভঙ্গী করিয়া একবার দক্ষিণে ও একবার বামে ঘাড় নাড়িলেন—তাহার কোন অর্থ-ই নাই। আর সোজা মানুষ অক্ষয়। সে সোজা পথে সোজা মতলবে কাঠের মত ক্ষণকাল সোজা দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অবজ্ঞা ও বিরক্তি বর্ষণ করিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। আশুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার আর্টিকেলটা পড়লেন? বলিয়াই তাঁহার নজরে পড়িল সেই লেখাটা মাটিতে লুটাইতেছে। নিজেই তুলিতে যাইতেছিল, হরেন্দ্র বাধা দিয়া কহিল, থাক না অক্ষয়বাবু, ঝাঁট দেবার সময় চাকরটা ফেলে দেবে অখন।

তাহার হাতটা ঠেলিয়া দিয়া অক্ষয় কাগজগুলা কুড়াইয়া আনিলেন।

হাঁ, পড়লাম, বলিয়া আশুবাবু উঠিয়া বসিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, অজিত ওধারের সোফায় বসিয়া সেইদিনের খবরের কাগজটায় চোখ বুলাইতে শুরু করিয়াছে। অবিনাশ কিছু একটা বলিতে পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, কহিলেন, আমিও অক্ষয়ের লেখাটা আগাগোড়া মন দিয়ে পড়েচি আশুবাবু। ওর অধিকাংশই সত্য, এবং মূল্যবান। দেশের সামাজিক ব্যবস্থার যদি সংস্কার করতেই হয় ত সুপরিচিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত পথেই তাদের চালনা করা কর্তব্য। ইয়োরোপের সংস্পর্শে আমরা অনেক ভাল জিনিস পেয়েছি, নিজেদের বহু ত্রুটি আমাদের চোখে পড়েচে মানি, কিন্তু আমাদের সংস্কার আমাদের নিজের পথেই হওয়া চাই। পরের অনুকরণের মধ্যে কল্যাণ নেই। ভারতীয় নারীর যা বিশিষ্টতা, যা তাঁদের নিজস্ব, সে থেকে যদি লোভ বা মোহের বশে তাঁদের ভ্রষ্ট করি, আমরা সকল দিক দিয়েই ব্যর্থ হব। এই না অক্ষয়বাবু?

কথাগুলি ভালো এবং সমস্তই অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধের। বিনয়বশে তিনি মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু আত্মপ্রসাদের অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে অর্ধনিমীলিত নেত্রে বার-কয়েক শিরশ্চালন করিলেন।

আশুবাবু অকপটে স্বীকার করিয়া কহিলেন, এ নিয়ে ত তর্ক নেই অবিনাশবাবু। বহু মনীষী বহুদিন থেকে এ কথা বলে আসচেন এবং বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন লোকই এর প্রতিবাদ করে না।

অক্ষয়বাবু বলিলেন, করবার জো নেই এবং এ ছাড়া আরও অনেক বিষয় আছে যা প্রবন্ধে লিখিনি, কিন্তু কাল নারী-কল্যাণ সমিতিতে আমি বক্তৃতায় বলব।

আশুবাবু ঘাড় ফিরাইয়া কমলের প্রতি চাহিলেন, কহিলেন, তোমার ত আর সমিতিতে নিমন্ত্রণ নেই, তুমি সেখানে যাবে না। আমিও বাতে কাবু। আমি না যাই, কিন্তু এ তোমাদেরই ভাল-মন্দর কথা। হাঁ কমল, তোমার ত এ-প্রস্তাবে আপত্তি নেই?

অন্য সময় হইলে আজকের দিনটায় কমল নীরব হইয়াই থাকিত, কিন্তু, একে তার মন খারাপ, তাহাতে এই লোকগুলার এই পৌরুষহীন সঙ্ঘবদ্ধ, সদম্ভ প্রতিকূলতায় মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু আপনাকে যথাসাধ্য সংবরণ করিয়া সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া কহিল, কোন্‌টা আশুবাবু? অনুকরণটা, না ভারতীয় বৈশিষ্ট্যটা?

আশুবাবু বলিলেন, ধরো, যদি বলি দুটোই!

কমল কহিল, অনুকরণ জিনিসটা শুধু যখন বাইরের নকল তখন সে ফাঁকি। তখন আকৃতিতে মিললেও প্রকৃতিতে ফাঁক থাকে। কিন্তু ভেতরে-বাইরে সে যদি এক হয়েই যায় তখন অনুকরণ বলে লজ্জা পাবার ত কিছু নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, আছে বৈ কি কমল, আছে। ও-রকম সর্বাঙ্গীণ অনুকরণে আমরা নিজের বিশেষত্ব হারাই। তার মানে আপনাকে নিঃশেষে হারানো। এর মধ্যে যদি দুঃখ এবং লজ্জা না থাকে ত কিসের মধ্যে আছে বলো ত?

কমল বলিল, গেলোই বা বিশেষত্ব আশুবাবু। ভারতের বৈশিষ্ট্য এবং ইয়োরোপের বৈশিষ্ট্যে প্রভেদ আছে,—কিন্তু কোন দেশের কোন বৈশিষ্ট্যের জন্যেই মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার আদর। আসল কথা, বর্তমানকালে সে বৈশিষ্ট্য তার কল্যাণকর কি না।। এ ছাড়া সমস্তই শুধু

অন্ধ মোহ।

আশুবাবু ব্যথিত হইয়া কহিলেন, শুধুই অন্ধ মোহ কমল, তার বেশী নয়?

কমল বলিল, না, তার বেশী নয়। কোন একটা জাতের কোন একটি বিশেষত্ব বহুদিন চলে আসচে বলেই সেই ছাঁচে ঢেলে চিরদিন দেশের মানুষকে গড়ে তুলতে হবে তার অর্থ কৈ? মানুষের চেয়ে মানুষের বিশেষত্বটাই বড় নয়। আর তাই যখন ভুলি, বিশেষত্বও যায়, মানুষকেও হারাই। সেইখানেই সত্যিকার লজ্জা আশুবাবু!

আশুবাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কহিলেন, তা হলে ত সমস্ত একাকার হয়ে যাবে? ভারতবর্ষীয় বলে ত আমাদের আর চেনাও যাবে না? ইতিহাসে যে এমনতর ঘটনার সাক্ষী আছে।

তাঁহার কুণ্ঠিত, বিক্ষুব্ধ মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া বলিল, তখন মুনি-ঋষিদের বংশধর বলে হয়ত চেনা যাবে না, কিন্তু মানুষ বলে চেনা যাবে। আর আপনারা যাঁকে ভগবান বলেন তিনিও চিনতে পারবেন, তাঁর ভুল হবে না।

অক্ষয় উপহাসে মুখ কঠিন করিয়া বলিল, ভগবান শুধু আমাদের? আপনার নয়?

কমল উত্তর দিল, না।

অক্ষয় বলিল, এ শুধু শিবনাথের প্রতিধ্বনি, শেখানো বুলি!

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট্।

দেখুন হরেন্দ্রবাবু—

দেখেচি। বিস্ট।

আশুবাবু সহসা যেন স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় জাগিয়া উঠিলেন। কহিলেন, দ্যাখো কমল, অপরের কথা বলতে চাইনে, কিন্তু আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য শুধু কথার কথা নয়। এ যাওয়া যে কতবড় ক্ষতি তার পরিমাণ করা দুঃসাধ্য। কত ধর্ম, কত আদর্শ, কত পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য, উপাখ্যান, শিল্প, কত অমূল্য সম্পদ এই বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করেই ত আজও জীবিত আছে। এর কিছুই ত তা হলে থাকবে না?

কমল কহিল, থাকবার জন্যেই বা এত ব্যাকুলতা কেন? যা যাবার নয় তা যাবে না। মানুষের প্রয়োজনে আবার তারা নতুন রূপ, নতুন সৌন্দর্য, নতুন মূল্য নিয়ে দেখা দেবে। সেই হবে তাদের সত্যিকার পরিচয়। নইলে, বহুদিন ধরে কিছু একটা আছে বলেই তাকে আরও বহুদিন আগলে রাখতে হবে এ কেমন কথা?

অক্ষয় বলিলেন, সে বোঝবার শক্তি নেই আপনার।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার অভদ্র ব্যবহারে আমি আপত্তি করি অক্ষয়বাবু।

আশুবাবু বলিলে, কমল, তোমার যুক্তিতে সত্য যে নেই তা আমি বলিনে, কিন্তু যা তুমি অবজ্ঞায় উপেক্ষা করচ, তার ভেতরেও বহু সত্য আছে। নানা কারণে আমাদের সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার পরে তোমার অশ্রদ্ধা জন্মেছে। কিন্তু একটা কথা ভুলো না কমল, বাইরের অনেক উৎপাত আমাদের সইতে হয়েছে, তবু যে আজও সমস্ত বিশিষ্টতা নিয়ে বেঁচে আছি সে কেবল আমাদের সত্য আশ্রয় ছিল বলেই। জগতের অনেক জাতিই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল বলিল, তাতে বা দুঃখ কিসের? চিরকাল ধরেই যে তাদের জায়গা জুড়ে বসে থাকতে হবে তারই বা আবশ্যকতা কি?

আশুবাবু বলিলেন, এ অন্য কথা কমল।

কমল কহিল, তা হোক। বাবার কাছে শুনেছিলাম আর্যদের একটি শাখা ইয়োরোপে গিয়ে বাস করেছিলেন, আজ তাঁরা নেই কিন্তু তাঁদের বদলে যাঁরা আছেন তাঁরা আরও বড়। তেমনি যদি এদেশেও ঘটতো, ওদের মতই আমরা আজ পূর্ব-পিতামহদের জন্যে শোক করতে বসতাম না, নিজেদের সনাতন বিশেষত্ব নিয়ে দম্ভ করেও দিনপাত করতাম না। আপনি বলছিলেন অতীতের উপদ্রবের কথা, কিন্তু তার চেয়েও বড় উপদ্রব যে ভবিষ্যতে অদৃষ্টে নেই, কিংবা সমস্ত ফাঁড়াই আমাদের কেটে নিঃশেষ হয়ে গেছে, তাও ত সত্য না হতে পারে। তখন আমরা বেঁচে

যাবো কিসের জোরে বলুন ত?

আশুবাবু এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, কিন্তু অক্ষয়বাবু উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তখনও বেঁচে যাবো আমাদের আদর্শের নিত্যতার জোরে, যে আদর্শ বহু সহস্র যুগ আমাদের মনের মধ্যে অবিচলিত হয়ে আছে। যে আদর্শ আমাদের নারীজাতির অক্ষয় পুণ্যের মধ্যে, আমাদের তপস্যার মধ্যে আছে। যে আদর্শ আমাদের নারীজাতির অক্ষয় সতীত্বের মধ্যে নিহিত আছে। আমরা তারই জোরে বেঁচে যাব। হিন্দু কখনো মরে না।

অক্ষয় হাতের কাগজ ফেলিয়া তাঁহার দিকে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিল এবং মুহূর্তকালের জন্য কমলও নির্বাক হইয়া গেল। তাহার মনে পড়িল প্রবন্ধ লিখিয়া এই লোকটাই তাহাকে অকারণে আক্রমণ করিয়াছে, এবং ইহাই সে কাল নারীর কল্যাণ-উদ্দেশ্যে বহু নারীর সমক্ষে দম্ভের সহিত পাঠ করিবে, এবং এই শেষোক্ত ইঙ্গিত শুধু তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া। দুর্জয় ক্রোধে মুখ তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু এবারও সে আপনাকে সংবরণ করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে কথা কইতে আমার ইচ্ছে হয় না অক্ষয়বাবু, আমার আত্মসম্মানে বাধে। বলিয়াই সে আশুবাবুর প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া কহিল কোন আদর্শই বহুকাল স্থায়ী হয়েছে বলেই তা নিত্যকাল স্থায়ী হয় না এবং তার পরিবর্তনেও লজ্জা নেই,—এই কথাটাই আপনাকে আমি বলতে চেয়েছিলাম। তাতে জাতের বৈশিষ্ট্য যদি যায়, তবুও। একটা উদাহরণ দিই। আতিথেয়তা আমাদের বড় আদর্শ। কত কাব্য, কত উপাখ্যান, কত ধর্ম-কাহিনী এই নিয়ে কত লোকে কত চোখের জলই যে ফেলেছে তার সংখ্যা নেই। অথচ এ কাহিনী আজ শুধু কুৎসিত নয়, বীভৎস। সতী-স্ত্রী কুষ্ঠগ্রস্ত স্বামীকে কাঁধে নিয়ে গণিকালয়ে পৌঁছে দিয়েছিল,—সতীত্বের এ আদর্শেরও একদিন তুলনা ছিল না, কিন্তু আজ সে কথা মানুষের মনে শুধু ঘৃণার উদ্রেক করে। আপনার নিজের জীবনের যে আদর্শ, যে ত্যাগ লোকের মনে আজ শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের কারণ হয়ে আছে, একদিন সে হয়ত শুধু অনুকম্পার ব্যাপার হবে। এই নিষ্ফল আত্মনিগ্রহের বাড়াবাড়িতে লোকে উপহাস করে চলে যাবে।

এই আঘাতের নির্মমতায় পলকের জন্য আশুবাবুর মুখ বেদনায় পাণ্ডুর হইয়া গেল। বলিলেন, কমল, একে নিগ্রহ বলে নিচ্চো কেন, এ যে আমার আনন্দ! এ যে আমার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বহুযুগের ধন!

কমল বলিল, হোক বহুযুগ। কেবল বৎসর গণনা করেই আদর্শের মূল্য ধার্য হয় না। অচল, অনড়, ভুলে-ভরা সমাজের সহস্র বর্ষও হয়ত অনাগতের দশটা বছরের গতিবেগে ভেসে যায়। সেই দশটা বছরই ঢের বড় আশুবাবু।

অজিত অকস্মাৎ জ্যা-মুক্ত ধনুর ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, কহিল, আপনার বাক্যের উগ্রতায় এঁদের হয়ত বিস্ময়ের অবধি নেই, কিন্তু আমি বিস্মিত হইনি! আমি জানি এই বিজাতীয় মনোভাবের উৎস কোথায়। কিসের জন্যে আমাদের সমস্ত মঙ্গল-আদর্শের প্রতি আপনার এমন নিবিড় ঘৃণা। কিন্তু চলুন, আর আমাদের মিথ্যে দেরি করবার সময় নেই,—পাঁচটা বেজে গেছে।

অজিতের পিছনে পিছনে সকলেই নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। কেহ তাহাকে একটা অভিবাদন করিল না, কেহ তাহার প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহিল না। যুক্তি যখন হার মানিল তখন এইভাবে পুরুষের দল নিজেদের জয় ঘোষণা করিয়া পৌরুষ বজায় রাখিল। তাহারা চলিয়া গেলে আশুবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন, কমল, আমাকেই আজ তুমি সকলের চেয়ে বেশী আঘাত করেচ, কিন্তু আমিই তোমাকে আজ যেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবেসেচি। আমার মণির চেয়ে যেন তুমি কোন অংশেই খাটো নয় মা।

কমল বলিল, তার কারণ আপনি যে সত্যিকার বড়মানুষ কাকাবাবু। আপনি ত এঁদের মত মিথ্যে নয়। কিন্তু আমারও সময় বয়ে যায়, আমি চললাম। এই বলিয়া সে তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

প্রণাম সে সচরাচর কাহাকেও করে না, এই অভাবনীয় আচরণে আশুবাবু ব্যতিব্যস্ত হইয়া

উঠিলেন। আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, আবার কবে আসবে মা?

আর হয়ত আমি আসব না কাকাবাবু। এই বলিয়া সে ঘরের বাহির হইয়া গেল। আশুবাবু সেইদিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

বার

আগ্রার নূতন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের স্ত্রীর নাম মালিনী। তাঁহারই যত্নে এবং তাঁহারই গৃহে নারী-কল্যাণ-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রথম অধিবেশনের উদ্যোগটা একটু ঘটা করিয়াই হইয়াছিল, কিন্তু জিনিসটা সুসম্পন্ন ত হইলই না, বরঞ্চ কেমন যেন বিশৃঙ্খল হইয়া গেল। ব্যাপারটা মুখ্যতঃ মেয়েদের জন্যই বটে, কিন্তু পুরুষদের যোগ দেওয়ার নিষেধ ছিল না। বস্তুতঃ, এ আয়োজনে তাঁহারা একটু বিশেষ করিয়াই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ভার ছিল অবিনাশের উপর। চিন্তাশীল লেখক বলিয়া অক্ষয়ের নাম ছিল, লেখার দায়িত্ব তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহারই পরামর্শ-মত একা শিবনাথ ব্যতীত আর কাহাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। অবিনাশের ছোটশালী নীলিমা ঘরে ঘরে গিয়া ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে শহরের সমস্ত বাঙালী ভদ্রমহিলাদের আহ্বান করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু, যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না আশুবাবুর, কিন্তু বাতের কন্‌কনানি আজ তাঁহাকে রক্ষা করিল না, মালিনী নিজে গিয়া ধরিয়া আনিল। অক্ষয় লেখা-হাতে প্রস্তুত ছিলেন, প্রচলিত দুই-চারটা মামুলি বিনয়-ভাষণের পরে সোজা ও শক্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রবন্ধ-পাঠে নিযুক্ত হইলেন। অল্পক্ষণেই বুঝা গেল তাঁহার বক্তব্য-বিষয় যেমন অরুচিকর তেমনি দীর্ঘ। সচরাচর যেমন হয়, পুরাকালের সীতা-সাবিত্রীর উল্লেখ করিয়া তিনি আধুনিক নারী-জাতির আদর্শ-বিহীনতার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন। একজন আধুনিক ও শিক্ষিতা মহিলার বাটীতে বসিয়া ইঁহাদেরই 'তথাকথিত' শিক্ষার বিরুদ্ধে কটূক্তি করিতে তাঁহার বাধে নাই। কারণ অক্ষয়ের গর্ব ছিল এই যে, তিনি অপ্রিয় সত্য বলিতে ভয় পান না। সুতরাং লেখার মধ্যে সত্য যাহাই থাক, অপ্রিয়-বচনের অভাব ছিল না। এবং এই 'তথাকথিত' শব্দটায় ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট উদাহরণের নজির যাহা ছিল—সে কমল। অনিমন্ত্রিত এই মেয়েটিকে অক্ষয় লেখার মধ্যে অপমানের একশেষ করিয়াছে। শেষের দিকে সে গভীর পরিতাপের সহিত এই কথাটা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, এই শহরেই ঠিক এমনি একজন স্ত্রীলোক রহিয়াছে, যে ভদ্রসমাজে নিরন্তর প্রশ্রয় পাইয়া আসিতেছে। যে স্ত্রীলোক নিজের দাম্পত্য-জীবনকে অবৈধ জানিয়াও লজ্জিত হওয়া দূরে থাক, শুধু উপেক্ষার হাসি হাসিয়াছে, বিবাহ-অনুষ্ঠান যাহার কাছে মাত্র অর্থহীন সংস্কার এবং পতি-পত্নীর একান্ত একনিষ্ঠ প্রেম নিছক মানসিক দুর্বলতা। উপসংহারে অক্ষয় এ কথারও উল্লেখ করিয়াছেন যে, নারী হইয়াও নারীর গভীরতম আদর্শকে যে অস্বীকার করে, তথাকথিত সেই শিক্ষিতা নারীর উপযুক্ত বিশেষণ ও বাসস্থান নির্ণয়ে প্রবন্ধ-লেখকের নিজের কোন সংশয় না থাকিলেও শুধু সঙ্কোচবশতঃই বলিতে পারেন নাই। এই ত্রুটির জন্য তিনি সকলের কাছে মার্জনা ভিক্ষা চাহেন।

মহিলা-সমাজে মনোরমা ব্যতীত কমলকে চোখে কেহ দেখে নাই। কিন্তু তাহার রূপের খ্যাতি ও চরিত্রের অখ্যাতি পুরুষদের মুখে মুখে পরিব্যাপ্ত হইতে অবশিষ্ট ছিল না। এমন কি, এই নব-প্রতিষ্ঠিত নারী-কল্যাণ-সমিতির সভানেত্রী মালিনীর কানেও তাহা পৌঁছিয়াছে, এবং এ লইয়া নারী-মণ্ডলে, পর্দার ভিতরে ও বাহিরে কৌতূহলের অবধি নাই। সুতরাং, রুচি ও নীতির সম্যক বিচারের উৎসাহে উদ্দীপ্ত প্রশ্নমালার প্রখরতায় ব্যক্তিগত আলোচনা সতেজ হইয়া উঠিতে বোধ করি বিলম্ব ঘটিত না, কিন্তু লেখকের পরম বন্ধু হরেন্দ্রই ইহার কঠোর প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল। সে সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, অক্ষয়বাবুর এই লেখার আমি সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করি। কেবল অপ্রাসঙ্গিক বলে নয়, কোন মহিলাকেই তাঁর অসাক্ষাতে আক্রমণ করার রুচি বিস্টলি এবং তাঁর চরিত্রের অকারণ উল্লেখ অভদ্রোচিত ও হেয়। নারী-কল্যাণ-সমিতির পক্ষ থেকে এই প্রবন্ধ-লেখককে ধিক্কার দেওয়া উচিত।

ইহার পরেই একটা মহামারী কাণ্ড বাধিল। অক্ষয় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যা-খুশি তাই

বলিতে লাগিলেন এবং প্রত্যুত্তরে স্বল্পভাষী হরেন্দ্র মাঝে মাঝে কেবল বিস্ট এবং ব্রুট বলিয়া তাহার জবাব দিতে লাগিল।

মালিনী নূতন লোক, সহসা এইপ্রকার বাক-বিতণ্ডার উগ্রতায় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং সেই উত্তেজনার মুখে স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করিতে প্রায় কেহই কার্পণ্য করিলেন না। চুপ করিয়া রহিলেন শুধু আশুবাবু। প্রবন্ধ-পাঠের গোড়া হইতেই সেই যে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিলেন সভা শেষ না হইলে আর তিনি মুখ তুলিলেন না। আরও একটি মানুষ তর্কযুদ্ধে তেমন যোগ দিলেন না, ইনি হরেন্দ্র-অক্ষয়ের আলাপ-আলোচনায় নিত্য-অভ্যস্ত অবিনাশ।

ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্রের ভাল-মন্দ নিরূপণ করা এই সমিতির লক্ষ্য নয় এবং এ প্রকার আলোচনায় নর-নারী কাহারও কল্যাণ হয় না, মালিনী তাহা জানিত। বিশেষতঃ লেখার মধ্যে আশুবাবুকেও কটাক্ষ করা হইয়াছে, এই কথা কেমন করিয়া যেন বুঝিতে পারিয়া তাহার অতিশয় ক্লেশ বোধ হইল। সভা শেষ হইলে সে নিঃশব্দে নিজের আসন ছাড়িয়া আসিয়া এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটির পাশে বসিয়া লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, নিরর্থক আজ আপনার শান্তি নষ্ট করার জন্যে আমি দুঃখিত আশুবাবু।

আশুবাবু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, বাড়িতেও ত আমি একাই বসে থাকতাম তবু সময়টা কাটল।

মালিনী কহিল, সে এর চেয়ে ভাল ছিল। একটু থামিয়া কহিল, আজ উনি নেই, মণি এখান থেকে খেয়ে যাবে।

বেশ, আমি গিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আর সব মেয়েরা?

তাঁরাও আজ এখানেই খাবেন।

অবিনাশ ও অজিতকে সঙ্গে লইয়া আশুবাবু গাড়িতে উঠিতে যাইতেছেন, হরেন্দ্র ও অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদেরও পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। রাজী হইতে হইল, সমস্ত পথটা আশুবাবু নীরবে বসিয়া রহিলেন। কমলকে উপলক্ষ্য করিয়া মেয়েদের মাঝখানে অক্ষয় তাঁহাকে অশিষ্ট কটাক্ষ করিয়াছে এই কথা তাঁহার নিরন্তর মনে পড়িতে লাগিল।

গাড়ি আসিয়া বাসায় পৌঁছিল। নীচের বারান্দায় একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বসিয়াছিল, বোম্বাইওয়ালার মত তাহার পোশাক, কাছে আসিয়া আশুবাবুকে ইংরাজীতে অভিবাদন করিল।

কি?

জবাবে সে একটুকরা কাগজ তাঁহার হাতে দিয়া কহিল, চিঠি।

চিঠিখানি তিনি অজিতের হাতে দিলেন, অজিত মোটরের ল্যাম্পের আলোকে পড়িয়া দেখিয়া কহিল, চিঠি কমলের।

কমলের? কি লিখেচে কমল?

লিখেচেন, পত্রবাহকের মুখেই সমস্ত জানতে পারবেন।

আশুবাবু জিজ্ঞাসু-মুখে তাহার প্রতি চাহিতেই সে কহিল, এ পত্র আর কাহারো হাতে পড়ে তাঁর ইচ্ছা ছিল না। আপনি তাঁর আত্মীয়—আমি কিছু টাকা পাই—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না, আশুবাবু সহসা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমি তার আত্মীয় নই, বস্তুতঃ, সে আমার কেউ নয়। তার হয়ে আমি টাকা দিতে যাব কিসের জন্যে!

গাড়ির উপর হইতে অক্ষয় কহিল, just like her!

কথাটা সকলেরই কানে গেল। পত্রবাহক ভদ্রলোক অপ্রতিভ হইয়া কহিল, টাকা আপনাকে দিতে হবে না, তিনিই দেবেন। আপনি শুধু কিছুদিনের জন্যে জামিন হলে—

আশুবাবুর রাগ চড়িয়া গেল—বলিলেন, জামিন হওয়ার গরজ আমার নয়। তাঁর স্বামী আছে, ধারের কথা তাঁকে জানাবেন।

ভদ্রলোক অতিশয় বিস্মিত হইল, বলিল, তাঁর স্বামীর কথা ত শুনিনি।

খোঁজ করলেই শুনতে পাবেন। Good night, এস অজিত, আর দেরি করো না। এই বলিয়া

তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। উপরের গাড়িবারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া আর একবার ড্রাইভারকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের কুঠিতে গাড়ি পৌঁছিতে যেন বিলম্ব না হয়। অজিত সোজা তাহার ঘরে চলিয়া যাইতেছিল, আশুবাবু তাহাকে বসিবার ঘরে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, বস। মজা দেখলে একবার?

এ কথার অর্থ কি অজিত তাহা বুঝিল। বস্তুতঃ তাঁহার স্বাভাবিক সহৃদয়তা, শান্তি-প্রিয়তা ও চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার এই মুহূর্তকাল পূর্বের অকারণ ও অভাবিত রূঢ়তা একা অক্ষয় ব্যতীত আঘাত করিতে বোধ করি উপস্থিত কাহাকেও অবশিষ্ট রাখে নাই। কিছুই না জানিয়া একদিন এই রহস্যময়ী তরুণীর প্রতি অজিতের অন্তর সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু যেদিন কমল তাহার নির্জন নিশীথ গৃহকক্ষে এই অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আপনার বিগত নারী-জীবনের অসংবৃত ইতিহাস একান্ত অবলীলায় উদঘাটিত করিয়া দিল, সেদিন হইতেই অজিতের পুঞ্জিত বিরাগ ও বিতৃষ্ণার আর যেন অবধি ছিল না। এমনি করিয়া তাহার এই কয়টা দিন কাটিয়াছে। তাই আজ নারী-কল্যাণ-সমিতির উদ্বোধন উপলক্ষে আদর্শপন্থী অক্ষয় নারীত্বের আদর্শ-নির্দেশের ছলনায় যত কটূক্তিই এই মেয়েটিকে করিয়া থাক, অজিত দুঃখবোধ করে নাই। এমনিই যেন সে আশা করিয়াছিল। তথাপি, অক্ষয়ের ক্রোধান্ধ বর্বরতায় যত তীক্ষ্ণ শূলই থাক, আশুবাবু এইমাত্র যাহা করিয়া বসিলেন, তাহাতে কমলের যেন কান মলিয়া দেওয়া হইল। কেবল অভাবিত বলিয়া নয়, পুরুষের অযোগ্য বলিয়া। কমলকে ভাল সে বলে না। তাহার মতামত ও সামাজিক আচরণের সুতীব্র নিন্দায় অজিত অবিচার দেখে নাই। তাহার নিজের মধ্যে এই রমণীর বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃণার ভাবই পরিপুষ্ট হইয়া চলিয়াছে। সে বলে, ভদ্রসমাজে যে অচল তাহাকে পরিত্যাগ করায় অপরাধ স্পর্শে না। কিন্তু তাই বলিয়া এ কি হইল! দুর্দশাপন্ন, ঋণগ্রস্ত রমণীর দুঃসময়ে সামান্য কয়টা টাকার ভিক্ষার প্রত্যাখ্যানে সে যে সমস্ত পুরুষের চরম অসম্মান অনুভব করিয়া অন্তরে মরিয়া গেল। সেই রাত্রের সমস্ত আলোচনা তাহার মনে পড়িল। তাহাকে যত্ন করিয়া খাওয়ানোর মাঝখানে সেই সকল চা-বাগানের অতীত দিনের ঘটনার বিবৃতি—তাহার মায়ের কাহিনী, তাহার নিজের ইতিহাস, ইংরাজ ম্যানেজার-সাহেবের গৃহে তাহার জন্মের বিবরণ। সে যেমন অদ্ভুত তেমনি অরুচিকর। কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল? গোপন করিলেই বা ক্ষতি কি হইত? কিন্তু, দুনিয়ার এই সহজ সুবুদ্ধির জমা-খরচের হিসাব বোধ করি কমলের মনে পড়ে নাই। যদি বা পড়িয়াছে, গ্রাহ্য করে নাই।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য তাহার সুকঠিন ধৈর্য। দৈবক্রমে তাহারই মুখে সে প্রথম সংবাদ পাইল যে শিবনাথ কোথাও যায় নাই, এই শহরেই আত্মগোপন করিয়া আছে। শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। মুখের 'পরে না ফুটিল বেদনার আভাস, না আসিল অভিযোগের ভাষা। এতবড় মিথ্যাচারের সে কিছুমাত্র নালিশ পরের কাছে করিল না। সেদিন সম্রাটমহিষী মমতাজের স্মৃতিসৌধের তীরে বসিয়া যে কথা সে হাসিমুখে হাসিচ্ছলে উচ্চারণ করিয়াছিল তাহাই একেবারে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিল।

আশুবাবু নিজেও বোধ হয় ক্ষণকালের জন্য বিমনা হইয়া পড়িয়াছিলেন, হঠাৎ সচেতন হইয়া পূর্ব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিয়া কহিলেন, মজা দেখলে ত অজিত? আমি নিশ্চয় বলচি এ ঐ শিবনাথ লোকটার কৌশল।

অজিত কহিল, না-ও হতে পারে। না জেনে বলা যায় না।

আশুবাবু বলিলেন, তা বটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এ চাল শিবনাথের। আমাকে সে বড়লোক বলে জানে।

অজিত কহিল, এ খবর ত সবাই জানে। কমল নিজেও না জানে তা নয়।

আশুবাবু বলিলেন, তা হলে ত ঢের বেশী অন্যায়। স্বামীকে লুকোনো ত ভাল কাজ নয়।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, স্বামীর অগোচরে, হয়ত বা তাঁর মতের বিরুদ্ধে পরের কাছে টাকা ধার করতে যাওয়া স্ত্রীলোকের কত বড় অন্যায় বল ত? এ

কিছুতে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না।

অজিত কহিল, তিনি টাকা ত চাননি, শুধু জামিন হতে অনুরোধ করেছিলেন।

আশুবাবু বলিলেন, সে ঐ একই কথা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, আর ঐ আমাকে আত্মীয় পরিচয়ে লোকটাকে ছলনা করাই বা কিসের জন্য। সত্যিই ত আমি তার আত্মীয় নই।

অজিত বলিল, তিনি হয়ত আপনাকে সত্যিই আত্মীয় মনে করেন। বোধ হয় কাউকেই ছলনা করা তাঁর স্বভাব নয়।

না, না, কথাটা ঠিক ওভাবে আমি বলিনি অজিত। এই বলিয়া তিনি নিজের কাছেই যেন জবাবদিহি করিলেন। সেই লোকটাকে হঠাৎ ঝোঁকের উপর বিদায় করা পর্যন্ত মনের মধ্যে তাঁহার ভারী একটা গ্লানি চলিতেছিল ; কহিলেন, সে আমাকে আত্মীয় বলেই যদি জানে, আর দু-পাঁচশো টাকার যদি দরকারই পড়েছিল, সোজা নিজে এসে ত নিয়ে গেলেই হত। খামকা একটা বাইরের লোককে সকলের সামনে পাঠানোর কি আবশ্যকতা ছিল ? আর যাই বল, মেয়েটার বুদ্ধি-বিবেচনা নেই।

বেহারা আসিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে, জানাইয়া গেল। অজিত উঠিতে যাইতেছিল, আশুবাবু কহিলেন, লোকটাকে মার্ক করেছিলে অজিত, বিশ্রী চেহারা—মনি-লেন্ডার কিনা। ফিরে গিয়ে হয়ত নানান্‌খানা করে বানিয়ে বলবে।

অজিত হাসিয়া কহিল, বানানোর দরকার হবে না আশুবাবু, সত্যি বললেই যথেষ্ট হবে। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই তিনি বাস্তবিকই বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, এই অক্ষয় লোকটা একেবারে নুইসেন্স। মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যায়। না হয় একটা কাজ কর না অজিত। যদুকে ডেকে ঐ দেরাজটা খুলে দেখ না কি আছে। অন্ততঃ পাঁচ-সাতশো টাকা,—আপাততঃ যা আছে পাঠিয়ে দাও। আমাদের ড্রাইভার বোধ হয় তাদের বাসাটা চেনে—শিবনাথকে মাঝে মাঝে পৌঁছে দিয়ে এসেছে। এই বলিয়া তিনি নিজেই চীৎকার করিয়া বেহারাকে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন।

অজিত বাধা দিয়া বলিল, যা হবার তা হয়েই গেছে, আজ রাত্রে থাক, কাল সকালে বিবেচনা করে দেখলেই হবে।

আশুবাবু প্রতিবাদ করিলেন, তুমি বোঝ না অজিত, বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে সে রাত্রেই কখনো লোক পাঠাতো না।

অজিত কিছুক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে বলিল, ড্রাইভার বাড়ি নেই, মনোরমাকে নিয়ে কখন ফিরবে তারও ঠিকানা নেই। ইতিমধ্যে কমল সমস্তই শুনতে পাবেন। তার পরে আর টাকা পাঠান উচিত হবে না আশুবাবু। বোধ হয় আপনার হাত থেকে আর তিনি সাহায্য নেবেন না।

কিন্তু এ ত তোমার শুধু অনুমানমাত্র অজিত।

হাঁ, অনুমান বৈ আর কি।

কিন্তু, বিদেশে তার টাকার প্রয়োজন ত এর চেয়েও বড় হতে পারে?

তা পারে, কিন্তু তাঁর আত্মমর্যাদার চেয়েও বড় না হতে পারে।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ-ও ত শুধু তোমার অনুমান।

অজিত সহসা উত্তর দিল না। ক্ষণকাল অধোমুখে নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, না, এ আমার অনুমানের চেয়ে বড়। এ আমার বিশ্বাস। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আশুবাবু আর তাহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন না, কেবল বেদনায় দুই চক্ষু প্রসারিত করিয়া সেইদিকে চাহিয়া রহিলেন। কমলের সম্বন্ধে এ বিশ্বাস অসম্ভবও নয়, অসঙ্গতও নয়। ইহা তিনি নিজেও জানিতেন। নিরুপায় অনুশোচনায় বুকের ভিতরটা যেন তাঁহার আঁচড়াইতে লাগিল।

তের

নারী-কল্যাণ-সমিতি হইতে ফিরিয়া নীলিমা অবিনাশকে ধরিয়া পড়িল, মুখুয্যেমশাই, কমলকে আমি একবার দেখব। আমার ভারী ইচ্ছে করে তাকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াই।

অবিনাশ আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, তোমার সাহস ত কম নয় ছোটগিন্নী ; শুধু আলাপ নয়, একেবারে নেমন্তন্ন করা!

কেন, সে বাঘ না ভালুক? তাকে এত ভয়টা কিসের?

অবিনাশ বলিলেন, বাঘ-ভালুক এদেশে মেলে না, নইলে তোমার হুকুমে তাদেরও নেমন্তন্ন করে আসতে পারি, কিন্তু এঁকে নয়। অক্ষয় খবর পেলে আর রক্ষে থাকবে না। আমাকে দেশছাড়া করে ছাড়বে।

নীলিমা কহিল, অক্ষয়বাবুকে আমি ভয় করিনে।

অবিনাশ বলিলেন, তুমি না করলেও ক্ষতি নেই, আমি একা করলেই তাঁর কাজ চলে যাবে।

নীলিমা জিদ করিয়া বলিল, না, সে হবে না। তুমি না যাও আমি নিজে গিয়ে তাঁকে আহ্বান করে আসব।

কিন্তু আমি ত তাদের বাসাটা চিনিনে।

নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো চেনেন। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তিনি তোমাদের মত ভীতু লোক নন।

একটু ভাবিয়া বলিল, তোমাদের মুখে যা শুনি তাতে শিবনাথবাবুরই দোষ,—তাঁকে ত আমি নেমন্তন্ন করতে চাইনে। আমি চাই কমলকে দেখতে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে। কমল যদি আসতে রাজী হয়, ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের স্ত্রী—তিনিও বলেচেন আসবেন। বুঝলে?

অবিনাশ বুঝিলেন সমস্তই, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া সম্মতি দিতে পারিলেন না। অথচ বাধা দিতেও ভরসা পাইলেন না। নীলিমাকে তিনি শুধু স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন তাই নয়, মনে মনে ভয় করিতেন।

পরদিন সকালে হরেন্দ্রকে ডাকাইয়া আনিয়া নীলিমা কহিল, ঠাকুরপো, তোমাকে আর একটি কাজ করে দিতে হবে। তুমি আইবুড়ো মানুষ, ঘরে বৌ নেই যে সদাচারের নাম করে তোমার কান মলে দেবে। বাসায় ত থাকো শুধু বাপ-মা-মরা একপাল ছাত্র নিয়ে,—তোমার ভয়টা কিসের?

হরেন্দ্র কহিল, ভয়ের কথা হবে পরে,—কিন্তু করতে হবে কি?

নীলিমা কহিল, কমলকে আমি দেখব, আলাপ করব, ঘরে এনে খাওয়াব। তুমি কি ওদের বাসা চেন? আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে তাঁকে নেমন্তন্ন করে আসতে হবে। কখন যেতে পারবে বল ত?

হরেন্দ্র বলিল, যখনই হুকুম করবেন। কিন্তু বাড়িওয়ালা? সেজদা? ওঁর অভিপ্রায়টা কি? এই বলিয়া সে বারান্দার ওধারে অবিনাশকে দেখাইয়া দিল। তিনি ইজিচেয়ারে শুইয়া পাইয়োনিয়ার পড়িতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন সমস্তই, কিন্তু সাড়া দিলেন না।

নীলিমা বলিল, ওঁর অভিপ্রায় নিয়ে উনিই থাকুন, আমার কাজ নেই আমি ওঁর শালী, শালীর বোন নই যে পতি-পরম-গুরুর গদা ঘুরিয়ে শাসন করবেন। আমার যাকে ইচ্ছা খাওয়াব। ম্যাজিস্ট্রেটের বৌ বলেছেন খবর পেলে তিনিও আসবেন। ওঁর ভাল না লাগে তখন আর কোথাও গিয়ে যেন সময়টা কাটিয়ে আসেন।

অবিনাশ কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, কিন্তু কাজটা সমীচীন হবে না হরেন। কালকের ব্যাপারটা মনে আছে ত? আশুবাবুর মত সদাশিব ব্যক্তিকেও সাবধান হতে হয়।

হরেন্দ্র জবাব দিল না। এবং, পাছে সেই লজ্জাকর টাকার কথাটা উঠিয়া পড়ে এবং নীলিমার কানে যায়, সেই ভয়ে সে প্রসঙ্গটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া বলিল, তার চেয়ে বরঞ্চ একটা কাজ করুন না বৌদি, আমার বাসাতে তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আনুন। আপনি হবেন গৃহকর্ত্রী। লক্ষ্মীছাড়ার

গৃহে একদিন লক্ষ্মীর আবির্ভাব হবে। আমার ছেলেগুলোও দুটো ভালোমন্দ জিনিস মুখে দিয়ে বাঁচবে।

নীলিমা অভিমানের সুরে বলিল, বেশ—তাই হোক ঠাকুরপো, আমিও ভবিষ্যতে খোঁটার জ্বালা থেকে নিস্তার পাব।

অবিনাশ উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ কেলেঙ্কারী তা হলে আর অবশিষ্ট থাকবে না। কারণ, শিবনাথকে বাদ দিয়ে শুধু তাকে তোমার বাসায় আহ্বান করে নিয়ে যাবার কোন কৈফিয়তই দেওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, এই ঢের ভাল শোনাবে।

কথাটা সত্যই যুক্তিসঙ্গত। তাই ইহাই স্থির হইল যে, কলেজের ছুটির পরে হরেন্দ্র গাড়ি করিয়া নীলিমাকে লইয়া গিয়া কমলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবে।

বৈকালে হরেন্দ্র আসিয়া জানাইল যে, কষ্ট করিয়া আর যাবার প্রয়োজন নাই। কাল রাত্রে খাবার কথা তাঁকে বলা হইয়াছে—তিনি রাজী হইয়াছেন।

নীলিমা উৎসুক হইয়া উঠিল। হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, ফেরবার পথে হঠাৎ রাস্তার ওপরে দেখা। সঙ্গে মুটের মাথায় একটা মস্ত বাক্স। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ওটা? কোথায় যাচ্চেন? বললেন, যাচ্চি একটু কাজে। তখন আপনার পরিচয় দিয়ে বললাম, বৌদি যে কাল সন্ধ্যার পরে আপনাকে নেমন্তন্ন করেচেন। নিতান্তই মেয়েদের ব্যাপার, যেতে হবে যে। একটুখানি চুপ করে থেকে বললেন, আচ্ছা। বললাম, কথা আছে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বৌদি নিজে গিয়ে আপনাকে যথারীতি বলে আসবেন, কিন্তু তার আর প্রয়োজন আছে কি? একটুখানি হেসে বললেন, না। জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু একলা ত যেতে পারবেন না, কাল কখন এসে আপনাকে নিয়ে যাব? শুনে তেমনি হাসতে লাগলেন। বললেন, একলাই যেতে পারব,—অবিনাশবাবুর বাসা আমি চিনি।

নীলিমা আর্দ্র হইয়া কহিল, মেয়েটি এদিকে কিন্তু খুব ভাল। ভারী নিরহঙ্কার।

পাশের ঘরে অবিনাশ কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সমস্ত কান পাতিয়া শুনিতেছিলেন, অন্তরাল হইতেই প্রশ্ন করিলেন, আর সেই মুটের মাথায় মোটা বাক্সটা? তার ইতিহাস ত প্রকাশ করলে না ভায়া?

হরেন্দ্র বলিল, জিজ্ঞাসা করিনি।

করলে ভাল করতে। বোধ হয় বিক্রি কিংবা বন্ধক দিতে যাচ্ছিলেন।

হরেন্দ্র কহিল, হতেও পারে। আপনার কাছে বন্ধক দিতে এলে ইতিহাসটা জেনে নেবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিয়া কহিল, বৌদি, আপনাদের নারী-কল্যাণ-সমিতিতে অক্ষয়ের প্রবন্ধ শুনেছেন ত? আমরা লোকটাকে ব্রুট্ বলি। কিন্তু, ও বেচারার আর একটুখানি ভণ্ডামি বুদ্ধি থাকলে সমাজে অনায়াসেই সাধু-সজ্জন বলে চলে যেতে পারত—কি বলেন সেজদা? ঠিক না?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে হইতে গর্জন করিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ হে, নিত্যানন্দ-শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু! এ বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। বন্ধুবরকে কৌশলটা শিখিয়ে দাও গে যাও।

চেষ্টা করব। কিন্তু চললাম বৌদি, কাল আবার যথাসময়ে হাজির হব। এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

নীলিমা উদ্যোগ-আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই। মনোরমা গোড়া হইতেই কমলের অত্যন্ত বিরুদ্ধে—সে কোনমতেই আসিবে না জানিয়া আশুবাবুদের কাহাকেও বলা হয় নাই। মালিনীকে খবর পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি আসিলেন না।

ঠিক সময়ে আসিল কমল। যান-বাহনে নয়, একাকী পায়ে হাঁটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহকর্ত্রী তাহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিল। অবিনাশ সুমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কমলকে তিনি অনেকদিন দেখেন নাই, আজ তাহার চেহারা ও জামা-কাপড়ের প্রতি চাহিয়া আশ্চর্য হইলেন।

দৈন্যের ছাপ তাহাতে অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া পড়িয়াছে। বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, রাত্রে একাকী হেঁটে এলে যে কমল?

কমল বলিল, কারণ খুবই সাধারণ অবিনাশবাবু, বোঝা একটুও শক্ত নয়।

অবিনাশ অপ্রতিভ হইলেন এবং তাহাই গোপন করিতে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, না না, কি যে তুমি বল। কাজটা ভাল হয়নি কিন্তু—ছোটগিন্নী, ইনিই কমল। আর একটা নাম শিবানী। এঁকে দেখবার জন্যেই এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে। এসো, বাড়ির ভেতরে গিয়ে বসবে চল। যোগাড় বোধ হয় তোমার সমস্ত হয়ে গেছে? তা হলে অনর্থক দেরি করে লাভ হবে না,—ঠিক সময়ে আবার ওঁর বাসায় ফিরে যাওয়া চাই ত।

এ-সকল উপদেশ ও জিজ্ঞাসাবাদের অনেকটাই বাহুল্য। উত্তরের আবশ্যকও হয় না, প্রত্যাশাও থাকে না।

হরেন্দ্র আসিয়া কমলকে নমস্কার করিল। কহিল, অতিথিকে অভ্যর্থনা করে নেবার সময়ে জুটতে পারিনি বৌদি, ত্রুটি হয়ে গেছে। অক্ষয় এসেছিলেন, তাঁকে যথোচিত মিষ্টবাক্যে পরিতুষ্ট করে বিদায় দিতে বিলম্ব হল। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

ভিতরে আসিয়া কমল আহার্য দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া মুহূর্তকাল নীরবে থাকিয়া কহিল, আমার খাওয়াই হয়েছে, কিন্তু এ-সব আমি খাইনে।

সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলে সে কহিল, আপনারা যাকে হবিষ্যান্ন বলেন—আমি তাই শুধু খাই।

শুনিয়া নীলিমা অবাক হইল, কহিল, সে কি কথা! আপনি হবিষ্যি খেতে যাবেন কিসের দুঃখে?

কমল কহিল, সে ঠিক। দুঃখ নেই তা নয়, কিন্তু এ-সব খাইনে বলেই অভাবটাও আবার কম। আপনি কিছু মনে করবেন না।

কিন্তু মনে না করিলে চলে না। নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, না খেলে এত জিনিস যে আমার নষ্ট হবে?

কমল হাসিল, কহিল, যা হবার তা হয়েছে,—সে আর ফিরবে না। তার ওপর খেয়ে আবার নিজে নষ্ট হই কেন?

নীলিমা কাতর হইয়া শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, শুধু আজকের মত, কেবল একটা দিনের জন্যেও কি নিয়ম ভঙ্গ করতে পারেন না?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

তাহার হাসিমুখের একটিমাত্র শব্দ। শুনিলে হঠাৎ কিছুই মনে হয় না। কিন্তু ইহার দৃঢ়তা যে কত বড়—তাহা পৌঁছিল হরেন্দ্রের কানে। শুধু সে-ই বুঝিল ইহার ব্যতিক্রম নাই। তাই গৃহকর্ত্রীর দিক হইতে অনুরোধের পুনরুক্তির সূত্রপাতেই সে বাধা দিয়া কহিল, থাক বৌদি, আর না। খাবার আপনার নষ্ট হবে না, আমার বাসার ছেলেদের এনে চেঁচে-পুঁছে খেয়ে যাব, কিন্তু ওঁকে আর নয়। বরঞ্চ, যা খাবেন, তার যোগাড় করে দিন।

নীলিমা রাগ করিয়া বলিল, তা দিচ্ছি। কিন্তু আমাকে আর সান্ত্বনা দিতে হবে না ঠাকুরপো, তুমি থাম। এ ঘাস নয় যে তোমার একপাল ভেড়া নিয়ে এসে চরিয়ে দেবে। আমি বরঞ্চ রাস্তায় ফেলে দেব—তবু তাদের খাওয়াব না।

হরেন্দ্র হাসিয়া কহিল, কেন, তাদের ওপর আপনার রাগ কিসের?

নীলিমা বলিল, তাদের জন্যেই ত তোমার মত দুর্গতি। বাপ টাকা রেখে গেছেন, নিজেও উপার্জন কম কর না। এতদিনে বৌ এলে ত ছেলেপুলেয় ঘর ভরে যেত। এ হতভাগা কাণ্ড ত ঘটত না। নিজেও যেমন আইবুড়ো কার্তিক, দলটিও তৈরি হচ্চে তারই উপযুক্ত। তাদের আমি কিছুতেই খাওয়াব না—এই তোমাকে আমি বলে দিলাম। যাক আমার নষ্ট হয়ে।

কমল বুঝিতে কিছুই পারিল না, আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র লজ্জা পাইয়া কহিল,

বৌদির অনেকদিন থেকে আমার ওপরে নালিশ আছে এ তারই শাস্তি। এই বলিয়া সে সংক্ষেপে জিনিসটা বিবৃত করিয়া কহিল, বাপ-মা-মরা নিরাশ্রয় গুটিকয়েক ছাত্র আছে আমার, তারা আমার কাছে থেকে ইস্কুল কলেজে পড়ে। তাদের ওপরেই ওঁর যত আক্রোশ।

কমল অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তাই নাকি? কৈ, এ ত এতদিন শুনিনি?

হরেন্দ্র বলিল, শোনবার মত কিছুই নয়। কিন্তু চরিত্রবান ভাল ছেলে তারা। তাদের আমি ভালোবাসি।

নীলিমা ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, বড় হয়ে তারা দেশোদ্ধার করবে এই তাদের পণ। অর্থাৎ, গুরুর মত ব্রহ্মচারী হয়ে দিগ্বিজয়ী বীর হবে বোধ করি।

হরেন্দ্র বলিল, যাবেন একবার তাদের দেখতে? দেখলে খুশী হবেন।

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই যেতে পারি—যদি নিয়ে যান।

হরেন্দ্র বলিল, না কাল নয়, আর একদিন। আমাদের আশ্রমের রাজেন এবং সতীশ গেছে কাশী বেড়াতে ; তারা ফিরে এলে আপনাকে নিয়ে যাব। আমি নিশ্চয় বলতে পারি—তাদের দেখলে আপনি খুশী হবেন।

অবিনাশ সেইমাত্র আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, শুনিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, কতকগুলো লক্ষ্মীছাড়ার আড্ডা বুঝি এরই মধ্যে আশ্রম হয়ে উঠল? কত ভণ্ডামিই তুই জানিস হরেন!

নীলিমা রাগ করিল। কহিল, এ তোমার অন্যায় মুখুয্যেমশায়। ঠাকুরপো ত তোমার কাছে আশ্রমের চাঁদা চাইতে আসেন নি যে ভণ্ড বলে গাল দিচ্চ? নিজের খরচে পরের ছেলে মানুষ করাকে ভণ্ডামি বলে না। বরঞ্চ, যারা বলে—তাদেরই তাই বলে ডাকা উচিত।

হরেন হাসিয়া বলিল, বৌদি, এইমাত্র যে আপনি নিজেই তাদের ভেড়ার পাল বলে তিরস্কার করছিলেন—এখন আপনারই কথার প্রতিধ্বনি করতে গিয়ে সেজদার ভাগ্যে এই পুরস্কার?

নীলিমা কহিল, আমি বলছিলাম রাগে। কিন্তু উনি বলেন কোন্ লজ্জায়? ভণ্ডামির ধারণা আগে নিজের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠুক, তার পরে যেন পরকে বলতে যান।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ছেলেরা ত সবাই ইস্কুল-কলেজে পড়েন?

হরেন বলিল, হাঁ, প্রকাশ্যে তাই বটে।

অবিনাশ কহিলেন, আর অপ্রকাশ্যে কি-সব প্রাণায়াম, রেচক-কুম্ভকের চর্চা করা হয়, সেটাও অমনি খুলে বল?

শুনিয়া সবাই হাসিল। নীলিমা অনুনয়ের সুরে কমলকে কহিল, মুখুয্যেমশায়ের আজকের মেজাজ দেখে যেন ওঁর বিচার করে নেবেন না। মাঝে মাঝে মাথা ওঁর অনেক ঠাণ্ডা থাকে। নইলে বহু পূর্বেই আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হতো। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কোথায় একটুখানি যেন উত্তাপের বাষ্প জমিয়া উঠিতেছিল, এই স্নিগ্ধ পরিহাসটুকুর পরে যেন তাহা মিলাইয়া গেল। বামুনঠাকুর আসিয়া জানাইল, কমলের খাবার তৈরি হইয়া গেছে। অতএব, এখনকার মত আলোচনা স্থগিত রাখিয়া সকলকে উঠিতে হইল।

ঘণ্টা-দুই পরে আহারাদি সমাধা হইলে পুনরায় সকলে আসিয়া যখন বাহিরের ঘরে বসিলেন,—কমল তখন পূর্ব-প্রসঙ্গের সূত্র ধরিয়া প্রশ্ন করিল, ছেলেরা রেচক-কুম্ভক না করুক, কলেজের পড়া মুখস্থ করা ছাড়াও ত কিছু করে,—সে কি?

হরেন্দ্র বলিল, করে। ভবিষ্যতে যাতে সত্যিই মানুষ হতে পারে সে চেষ্টাতেও তাদের অবহেলা নেই। কিন্তু পায়ের ধুলো যেদিন পড়বে সেদিন সমস্ত বুঝিয়ে বলব, আজ নয়।

এই মেয়েটির প্রতি সম্মানের আতিশয্যে অবিনাশের গা জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু তিনি চুপ করিয়াই রহিলেন।

নীলিমা কহিল, আজ বলতেই বা বাধা কি ঠাকুরপো? তোমার শেখানোর পদ্ধতি না হয় না-ই ভাঙলে কিন্তু পুরাকালের ভারতীয় আদর্শে নিজের মত করে যে তাদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষা দিচ্চ

এ কথা জানাতে দোষ কি? তোমার কাছে ত আমি আভাসে একদিন এই কথাই শুনেছিলাম।

হরেন্দ্র সবিনয়ে বলিল, মিথ্যে শুনেচেন তাও ত বলচি নে বৌদি, বলিয়াই তাহার সেদিনের তর্কের ব্যাপারটা স্মরণ হইল। কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, আপনারও বোধ করি আমার কাজে সহানুভূতি নেই?

কমল কহিল, কাজটা আপনার ঠিক কি, না জানলে ত বলা যায় না হরেনবাবু। কিন্তু পুরাকালের ছাঁচে তৈরি করে তোলাটাই যে সত্যিকারের মানুষের ছাঁচে গড়ে তোলা এও ত যুক্তি নয়।

হরেন্দ্র বলিল, কিন্তু সেই যে আমাদের ভারতের আদর্শ?

কমল জবাব দিল, ভারতের আদর্শই যে চিরযুগের চরম আদর্শ,—এই বা কে স্থির করে দিলে বলুন?

অবিনাশ এতক্ষণ কথা কহেন নাই, রাগ চাপিয়া বলিলেন, চরম আদর্শ না হতে পারে কমল, কিন্তু এ আমাদের পূর্বপিতামহগণের আদর্শ। ভারতবাসীর এই নিত্যকালের লক্ষ্য—এই তাদের একটিমাত্র চলবার পথ। হরেনের আশ্রমের ব্যাপার আমি জানিনে, কিন্তু সে এই লক্ষ্যই যদি গ্রহণ করে থাকে আমি তাকে আশীর্বাদ করি।

কমল কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, জানিনে কেন মানুষের এ ভুল হয়। নিজেদের ছাড়া তারা যেন আর কোন ভারতবাসীকে চোখে দেখতেই পায় না। আরও ত ঢের জাত আছে—তারা এ আদর্শ নেবে কেন?

অবিনাশ কুপিত হইয়া কহিলেন, চুলোয় যাক তারা। আমার কাছে এ আবেদন নিষ্ফল। আমি শুধু নিজেদের আদর্শ-ই স্পষ্ট করে দেখতে পেলে যথেষ্ট মনে করব।

কমল ধীরে ধীরে বলিল, এ আপনার অত্যন্ত রাগের কথা অবিনাশবাবু। নইলে এতবড় অন্ধ ভাবতে আপনাকে আমার প্রবৃত্তি হয় না। একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু কি জানি, পুরুষেরা সবাই বুঝি শুধু এমনি করেই ভাবে। সেদিন অজিতবাবুর সুমুখেও হঠাৎ এই প্রসঙ্গই উঠে পড়েছিল। ভারতের সনাতন বৈশিষ্ট্য, তার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হবার উল্লেখে তাঁর সমস্ত মুখ ব্যথায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতদিন তিনি ছিলেন উৎকট স্বদেশী,—আজও মনে মনে হয়ত তাই আছেন,—এ সম্ভাবনা তাঁর কাছে কেবল প্রলয়ের নামান্তর। এই বলিয়া সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিল। অবিনাশ কি একটা বোধ হয় জবাব দিতেছিলেন, কিন্তু, কমল সেদিকে দৃকপাত না করিয়াই বলিতে লাগিল, কিন্তু আমি ভাবি এতে ভয় কিসের? বিশেষ কোন একটা দেশে জন্মেচি বলে তারই নিজস্ব আচার-আচরণ চিরদিন আঁকড়ে থাকতে হবে কেন? গেলই বা তার বিশেষত্ব নিঃশেষ হয়ে। এতই কি মমতা? বিশ্বের সকল মানব যদি একই চিন্তা, একই ভাব, একই বিধি-নিষেধের ধ্বজা বয়ে দাঁড়ায়—কি তাতে ক্ষতি? ভারতীয় বলে চেনা যাবে না এই ত ভয়? না-ই বা গেল চেনা। বিশ্বের মানব-জাতির একজন বলে পরিচয় দিতে ত কেউ বাধা দেবে না। তার গৌরবই বা কি কম?

অবিনাশ সহসা জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিলেন, কমল, তুমি যা বলচ, নিজে তার অর্থ বোঝ না। এতে মানুষের সর্বনাশ হবে।

কমল উত্তর দিল, মানুষের হবে না অবিনাশবাবু, যারা অন্ধ তাদের অহঙ্কারের সর্বনাশ হবে।

অবিনাশ কহিল, এ-সব নিছক শিবনাথের কথা।

কমল কহিল, তা ত জানিনে—তিনিও এ কথা বলেন।

এবার অবিনাশ আত্মবিস্মৃত হইলেন। বিদ্রূপে মুখ কালো করিয়া বলিলেন, খুব জান। কথাগুলি মুখস্থ করেচ। আর জান না কার?

তাঁহার এই কদর্য দৃঢ়তার জবাব কমল দিল না, দিল নীলিমা। কহিল, কথা যারই হোক মুখুয্যেমশায়, মাস্টারিগিরি কাজে কড়া কথার ধমক দিয়ে ছাত্রের মুখ বন্ধ করা যায়, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হয় না। প্রশ্নের জবাব না দিতে পারলে ত লজ্জা নেই, কিন্তু ভদ্রতা লঙ্ঘন

করায় লজ্জা আছে। কিন্তু ঠাকুরপো, একটা গাড়ি ডাকতে পাঠাও না ভাই। তোমাকে কিন্তু গিয়ে পৌঁছে দিতে হবে। তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, তোমাকে সঙ্গে দিতে ত আর ভয় নেই। এই বলিয়া সে কটাক্ষে অবিনাশের প্রতি চাহিয়া বলিল, মুখুয্যেমশায়ের মুখের চেহারা যে-রকম মিষ্টি হয়ে উঠচে—তাতে বিলম্ব করা আর সঙ্গত হবে না।

অবিনাশ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, বেশ ত, তোমরা বসে গল্প কর না, আমি শুতে চললাম। বলিয়া উঠিয়া গেলেন।

চাকর গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল, হরেন্দ্র কমলকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আমার আশ্রমে কিন্তু একদিন যেতে হবে। সেদিন আনতে গেলে কিন্তু না বলতে পারবেন না।

কমল সহাস্যে কহিল, ব্রহ্মচারীদের আশ্রমে আমাকে কেন হরেনবাবু? না-ই বা গেলাম?

না, সে হবে না। ব্রহ্মচারী বলে আমরা ভয়ানক কিছু নেই। নিতান্তই সাদাসিধে। গেরুয়াও পরিনে, জটা-বল্কলও ধারণ করিনে। সাধারণের মাঝখানে আমরা তাদের সঙ্গেই মিশে আছি।

কিন্তু সেও ত ভাল নয়! অসাধারণ হয়েও সাধারণের মধ্যে আত্মগোপনের চেষ্টা আর একরকমের জোচ্চুরি। বোধ হয় অবিনাশবাবু একেই বলেছিলেন ভণ্ডামি। তার চেয়ে বরঞ্চ জটা-বল্কল-গেরুয়া ঢের ভাল। তাতে মানুষকে চেনবার সুবিধে হয়, ঠকবার সম্ভাবনা কম থাকে।

হরেন্দ্র কহিল, আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার জো নেই—হটতেই হবে। কিন্তু বাস্তবিক, আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে আপনি কি ভাল বলেন না? পারি, আর না পারি, এর আদর্শ কত বড়!

কমল কহিল, তা বলতে পারব না হরেনবাবু। সমস্ত সংযমের মত যৌন-সংযমেও সত্য আছে। কিন্তু সে গৌণ সত্য। ঘটা করে তাকে জীবনের মুখ্য সত্য করে তুললে সে হয় আর এক-ধরনের অসংযম। তার দণ্ড আছে। আত্ম-নিগ্রহের উগ্র দম্ভে আধ্যাত্মিকতা ক্ষীণ হয়ে আসে। বেশ, আমি যাব আপনার আশ্রমে।

হরেন্দ্র বলিল, যেতেই হবে,—না গেলে আমি ছাড়ব না। কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, আমাদের আড়ম্বর নেই—ঘটা করে আমরা কিছুই করিনে। সহসা নীলিমাকে দেখাইয়া কহিল, আমার আদর্শ উনি। ওঁর মতই আমরা সহজের পথিক। বৈধব্যের কোন বাহ্যপ্রকাশ ওঁতে নেই,—বাইরে থেকে মনে হবে যেন বিলাস-বসনে মগ্ন হয়ে আছেন, কিন্তু জানি ওঁর দুঃসাধ্য আচার-নিষ্ঠা, ওঁর কঠোর আত্মশাসন!

কমল মৌন হইয়া রহিল। হরেন্দ্র ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া বলিতে লাগিল, আপনি ভারতের অতীত যুগের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন নন, ভারতের আদর্শ আপনাকে মুগ্ধ করে না ; কিন্তু বলুন ত—নারীদের এতবড় মহিমা, এতবড় আদর্শ আর কোন্ দেশে আছে? এই গৃহের উনি গৃহিণী, সেজদার মা-মরা সন্তানের উনি জননীর ন্যায়। এ-বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব ওঁর উপরে। অথচ, কোন স্বার্থ, কোন বন্ধন নেই। বলুন ত, কোন্ দেশের বিধবারা এমন পরের কাজে আপনাকে বিলিয়ে দিতে পেরেছে?

কমলের মুখ স্মিতহাস্যে বিকশিত হইয়া উঠিল, বলিল, এর মধ্যে ভালটা কি আছে হরেনবাবু? অপরের গৃহের নিঃস্বার্থ গৃহিণী ও অপরের ছেলের নিঃস্বার্থ জননী হবার দৃষ্টান্ত হয়ত জগতের আর কোথাও নেই। নেই বলে অদ্ভুত হতে পারে, কিন্তু ভাল হয়ে উঠবে কিসের জোরে?

শুনিয়া হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল, এবং নীলিমা আশ্চর্য দুই চক্ষু মেলিয়া নির্নিমেষে তাহার মুখের প্রতি তাকাইয়া রহিল। কমল তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিল, বাক্যের ছটায় বিশেষণের চাতুর্যে লোকে একে যত গৌরবান্বিতই করে তুলুক, গৃহিণীপনার এই মিথ্যে অভিনয়ের সম্মান নেই। এ গৌরব ছাড়াই ভাল।

হরেন্দ্র গভীর বেদনার সহিত কহিল, একটা সুশৃঙ্খল সংসার নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবার উপদেশ—এ ত আপনার কাছে কেউ আশা করে না।

কমল বলিল, কিন্তু সংসার ত ওঁর নিজের নয়—হলে এ উপদেশ দিতাম না। অথচ, এমনি

করেই কর্মভোগের নেশায় পুরুষেরা আমাদের মাতাল করে রাখে। তাদের বাহবার কড়া মদ খেয়ে চোখে আমাদের ঘোর লাগে, ভাবি, এই বুঝি নারী-জীবনের সার্থকতা। আমাদের চা-বাগানের হরিশবাবুর কথা মনে পড়ে। যোল বছরের ছোট বোনটির যখন স্বামী মারা গেল—তাকে বাড়িতে এনে নিজের একপাল ছেলে-মেয়ে দেখিয়ে কেঁদে বললেন, লক্ষ্মী দিদি আমার, এখন এরাই তোর ছেলে-মেয়ে। তোর ভাবনা কি বোন, এদের মানুষ করে, এদের মায়ের মত হয়ে, এ বাড়ির সর্বেসর্বা হয়ে আজ থেকে তুই সার্থক হ্—এই আমার আশীর্বাদ। হরিশবাবু ভাল লোক, বাগানময় তাঁর ধন্য ধন্য পড়ে গেল,—সবাই বললে, লক্ষ্মীর কপাল ভাল। ভাল ত বটেই। শুধু মেয়েমানুষেই জানে এতবড় দুর্ভোগ, এতবড় ফাঁকি আর নেই, কিন্তু একদিন এ বিড়ম্বনা যখন ধরা পড়ে, তখন প্রতিকারের সময় বয়ে যায়।

হরেন্দ্র কহিল, তার পরে?

কমল বলিল, পরের খবর জানিনে, হরেনবাবু, লক্ষ্মীর সার্থকতার শেষ দেখে আসতে পারিনি, আগেই চলে আসতে হয়েছিল ; কিন্তু ঐ যে আমার গাড়ি এসে দাঁড়াল। চলুন, পথে যেতে যেতে বলব। নমস্কার। এই বলিয়া সে একমুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

নীলিমা নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার দুই চক্ষের তারকা যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতে লাগিল।

চোদ্দ

'আশ্রম' শব্দটা কমলের সম্মুখে হরেন্দ্রর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গিয়াছিল। শুনিয়া অবিনাশ যে-ঠাট্টা করিয়াছিলেন সে অন্যায় হয় নাই। জনকয়েক দরিদ্র ছাত্র ওখানে থাকিয়া বিনা-খরচায় স্কুলে পড়াশুনা করিতে পায়—ইহাই লোকে জানে। বস্তুতঃ, নিজের এই বাসস্থানটাকে বাহিরের লোকের কাছে অতবড় একটা গৌরবের পদবীতে তুলিয়া ধরার সঙ্কল্প হরেন্দ্রর ছিল না। ও নিতান্তই একটা সাধারণ ব্যাপার এবং প্রথমে আরম্ভও হইয়াছিল সামান্যভাবে। কিন্তু এ-সকল জিনিসের স্বভাবই এই যে, দাতার দুর্বলতায় একবার জন্মগ্রহণ করিলে আর ইহাদের গতির বিরাম থাকে না। কঠিন আগাছার ন্যায় মৃত্তিকার সমস্ত রস নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া ডালে-মূলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে ইহাদের বিলম্ব হয় না। হইলও তাই। এ বিবরণটাই প্রকাশ করিয়া বলি।

হরেন্দ্রর ভাই-বোন ছিল না। পিতা ওকালতি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সংসারে অবশিষ্ট ছিলেন শুধু হরেনের বিধবা মা। তিনিও পরলোকগমন করিলেন। ছেলের তখন লেখাপড়া সাঙ্গ হইল। অতএব, আপনার বলিতে এমন কেহই আর রহিল না যে তাহাকে বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করে, কিংবা উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়া পায়ে শৃঙ্খল পরায়। অতএব, পড়া যখন সমাপ্ত হইল তখন নিতান্ত কাজের অভাবেই হরেন্দ্র দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। সাধুসঙ্গ বিস্তর করিল, ব্যাঙ্কের জমানো সুদ বাহির করিয়া দুর্ভিক্ষ-নিবারণী-সমিতি গঠন করিল, বন্যাপ্লাবনে আচার্যদেবের দলে ভিড়িল, মুক্তি-সঙ্ঘে মিলিয়া কানা-খোঁড়া নুলো-হাবা-বোবা ধরিয়া আনিয়া সেবা করিল,—নাম জাহির হইতেই দলে দলে ভালো লোকেরা আসিয়া তাহাকে বলিতে লাগিল, টাকা দাও, পরোপকার করি। বাড়তি টাকা শেষ হইয়াছে, পুঁজিতে হাত না দিলে আর চলে না,—এমনি যখন অবস্থা, তখন হঠাৎ একদিন অবিনাশের সঙ্গে তাহার পরিচয়। সম্বন্ধ যত দূরের হউক, পৃথিবীতে একটা লোকও যে তখনো বাকী আছে যাহাকে আত্মীয় বলা চলে, এ খবর সেইদিন সে প্রথম পাইল। অবিনাশদের কলেজে তখন মাস্টারি একটা খালি ছিল ; চেষ্টা করিয়া সেই কর্মে তাহাকে নিযুক্ত করাইয়া সঙ্গে করিয়া আগ্রায় আনিলেন। এ দেশে আসিবার ইহাই তাহার ইতিহাস। পশ্চিমের মুসলমানী আমলের প্রাচীন শহরগুলোর সাবেককালের অনেক বড় বড় বাড়ি এখনও অল্প ভাড়ায় পাওয়া যায়, ইহারই একটা হরেন্দ্র যোগাড় করিয়া লইল। এই তাহার আশ্রম।

কিন্তু এখানে আসিয়া যে-কয়দিন সে অবিনাশের গৃহে অতিবাহিত করিল—তাহারই

অবকাশে নীলিমার সহিত তাহার পরিচয়। এই মেয়েটি অচেনা লোক বলিয়া একটা দিনের জন্যও আড়ালে থাকিয়া দাসী-চাকরের হাত দিয়া আত্মীয়তা করিবার চেষ্টা করিল না—একেবারে প্রথম দিনটিতেই সম্মুখে বাহির হইল। কহিল, তোমার কখন কি চাই, ঠাকুরপো, আমাকে জানাতে লজ্জা করো না। আমি বাড়ির গিন্নী নই—অথচ গিন্নীপনার ভার পড়েছে আমার ওপর। তোমার দাদা বলছিলেন, ভায়ার অযত্ন হলে মাইনে কাটা যাবে। গরীব মানুষের লোকসান করে দিয়ো না ভাই। দরকারগুলো যেন জানতে পারি।

হরেন কি যে জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইল না। লজ্জায় সে এমনি জড়সড় হইয়া উঠিল যে, এই মিষ্ট কথাগুলি যিনি অবলীলাক্রমে বলিয়া গেলেন তাঁহার মুখের দিকেও চাহিতে পারিল না। কিন্তু লজ্জা কাটিতেও তাহার দিন-দুয়ের বেশী লাগিল না। ঠিক যেন না কাটিয়া উপায় নাই,—এমনি। এই রমণীর যেমন স্বচ্ছন্দ অনাড়ম্বর প্রীতি, তেমনি সহজ সেবা। তিনি যে বিধবা, সংসারে তাঁহার যে সত্যকার আশ্রয় কোথাও নাই—তিনিও যে এ বাড়িতে পর—এই কথাটাও একদিকে যেমন তাঁহার মুখের চেহারায়, তাঁহার সাজসজ্জায় তাঁহার রহস্য-মধুর আলাপ-আলোচনায় ধরিবার জো নাই, তেমনি এইগুলাই যে তাঁহার সবটুকু নহে এ কথাটাও না বুঝিয়া উপায়ান্তর নাই।

বয়স নিতান্ত কম নহে, বোধ করি বা ত্রিশের কাছাকাছি গিয়া পৌঁছিয়াছে। এই বয়সের সমুচিত গাম্ভীর্য হঠাৎ খুঁজিয়া পাওয়া দায়,—এমনি হালকা তাঁহার হাসি-খুশির মেলা, অথচ একটুখানি মনোনিবেশ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়—এমন একটা অদৃশ্য আবেষ্টন তাঁহাকে অহর্নিশি ঘিরিয়া আছে যাহার ভিতরে প্রবেশের পথ নাই। বাটীর দাসী-চাকরেরও না, বাটীর মনিবেরও না।

এই গৃহে, এই আবহাওয়ার মাঝখানেই হরেন্দ্রর সপ্তাহ-দুই কাটিয়া গেল। হঠাৎ একদিন সে আলাদা বাসা ভাড়া করিয়াছে শুনিয়া নীলিমা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, এত তাড়াতাড়ি করতে গেলে কেন ঠাকুরপো, এখানে কি এমন তোমার আটকাচ্ছিল?

হরেন্দ্র সলজ্জে কহিল, একদিন ত যেতেই হত বৌদি।

নীলিমা জবাব দিল, তা হয়ত হত। কিন্তু দেশসেবার নেশার ঘোর তোমার এখনো চোখ থেকে কাটেনি ঠাকুরপো, আরও দিন-কতক না হয় বৌদির হেপাজতেই থাকতে।

হরেন্দ্র বলিল, তাই থাকব বৌদি। এই ত মিনিট-দশেকের পথ—আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে যাব কোথায়?

অবিনাশ ঘরের মধ্যে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন ; সেইখান হইতেই কহিলেন, যাবে জাহান্নমে। অনেক বারণ করেছিলাম, হরেন, যাসনে আর কোথাও, এইখানে থাক। কিন্তু সে কি হয়? ইজ্জত বড়—না দাদার কথা বড়! যাও, নতুন আড্ডায় গিয়ে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা চড়াও গে। ছোটগিন্নী, ওকে বলা বৃথা। ও হল চড়কের সন্ন্যাসী—পিঠ ফুঁড়ে ঘুরতে না পেলে ওদের বাঁচাই মিথ্যে।

নূতন বাসায় আসিয়া হরেন্দ্র চাকর বামুন রাখিয়া অতিশয় শান্তশিষ্ট নিরীহ মাস্টারের ন্যায় কলেজের কাজে মন দিল। প্রকাণ্ড বাড়িতে অনেক ঘর। গোটা-দুই ঘর ছাড়া বাকী সমস্তই পড়িয়া রহিল। মাস-খানেক পরেই এই শূন্য ঘরগুলা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল। ভাড়া দিতে হয়, অথচ কাজে লাগে না। অতএব পত্র গেল রাজেনের কাছে। সে ছিল তাহার দুর্ভিক্ষ-নিবারণী-সমিতির সেক্রেটারি। দেশোদ্ধারের আগ্রহাতিশয্যে বছর-দুই অন্তরীণ থাকিয়া মাস পাঁচ-ছয় ছাড়া পাইয়া সাবেক বন্ধুবান্ধবগণের সন্ধানে ফিরিতেছিল। হরেনের চিঠি এবং ট্রেনের মাশুল পাইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিল। হরেন্দ্র কহিল, দেখি যদি তোমার একটা চাকরি-বাকরি করে দিতে পারি। রাজেন বলিল, আচ্ছা। তাহার পরম বন্ধু ছিল সতীশ। সে কোনমতে অন্তরীণের দায় এড়াইয়া মেদিনীপুর জেলার কোন একটা গ্রামে বসিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রম খুলিবার চেষ্টায় ছিল ; রাজেনের পত্র পাওয়ার সপ্তাহকাল মধ্যেই তাহার সাধুসঙ্কল্প মুলতবী রাখিয়া আগ্রায় আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং, একাকী আসিল না, অনুগ্রহ করিয়া গ্রাম হইতে একজন ভক্তকে সঙ্গে করিয়া

আনিল। সতীশ এ কথা যুক্তি ও শাস্ত্রবচনের জোরে নির্বিশেষে প্রতিপন্ন করিয়া দিল যে, ভারতবর্ষই ধর্মভূমি। মুনি-ঋষিরাই ইহার দেবতা। আমরা ব্রহ্মচারী হইতে ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়াই আমাদের সব গিয়াছে। এ দেশের সহিত জগতের কোন দেশের তুলনা হয় না, কারণ আমরাই ছিলাম একদিন জগতের শিক্ষক, আমরাই ছিলাম মানুষের গুরু। সুতরাং বর্তমানে ভারতবাসীর একমাত্র করণীয় গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে অসংখ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করা। দেশোদ্ধার যদি কখনো সম্ভব হয় ত এই পথেই হইবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল। সতীশের নাম সে শুনিয়াছিল, কিন্তু পরিচয় ছিল না; সুতরাং এই সৌভাগ্যের জন্য সে মনে মনে রাজেনকে ধন্যবাদ দিল। এবং ইতিপূর্বে যে তাহার বিবাহ হইয়া যায় নাই, এজন্য সে আপনাকে ভাগ্যবান জ্ঞান করিল। সতীশ সর্ববাদিসম্মত ভাল ভাল কথা জানিত; কয়েকদিন ধরিয়া সেই আলোচনাই চলিতে লাগিল। এই পুণ্যভূমির মুনি-ঋষিদের আমরাই বংশধর, আমাদেরই পূর্ব-পিতামহগণ একদিন জগতের গুরু ছিলেন, অতএব আর একদিন গুরুগিরি করিবার আমরাই উত্তরাধিকারী। আর্যরক্ত-সম্ভূত কোন্ পাষণ্ড ইহার প্রতিবাদ করিতে পারে? পারে না, এবং পারিবার মত দুর্মতিপরায়ণ লোকও কেহ সেখানে ছিল না।

হরেন্দ্র মাতিয়া উঠিল। কিন্তু, ইহা তপস্যা এবং সাধনার বস্তু বলিয়া সমস্ত ব্যাপারটাই সাধ্যমত গোপনে রাখা হইতে লাগিল, কেবল রাজেন ও সতীশ মাঝে মাঝে দেশে গিয়া ছেলে সংগ্রহ করিয়া আনিতে লাগিল। যাহারা বয়সে ছোট তাহারা স্কুলে প্রবেশ করিল, যাহারা সে শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে তাহারা হরেন্দ্রের চেষ্টায় কোন একটা কলেজে গিয়া ভর্তি হইল,—এইরূপে অল্পকালেই প্রায় সমস্ত বাড়িটাই নানা বয়সের ছেলের দলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বাহিরের লোকে বিশেষ কিছু জানিতও না, জানিবার চেষ্টাও করিত না। শুধু এইটুকুই সকলে ভাসা-ভাসা রকমের শুনিতে পাইল যে, হরেন্দ্রর বাসায় থাকিয়া কতকগুলি দরিদ্র বাঙালীর ছেলেরা লেখাপড়া করে। ইহার অধিক অবিনাশও জানিত না, নীলিমাও না।

সতীশের কঠোর শাসনে বাসায় মাছ-মাংস আসিবার জো নাই, ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া সকলকে স্তোত্রপাঠ, ধ্যান, প্রাণায়ম প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, পরে লেখাপড়া ও নিত্যকর্ম। কিন্তু কর্তৃপক্ষদের ইহাতেও মন উঠিল না, সাধন-মার্গ ক্রমশঃ কঠোরতর হইয়া উঠিল। বামুন পলাইল, চাকরদের জবাব দেওয়া হইল,—অতএব এ কাজগুলাও পালা করিয়া ছেলেদের ঘাড়ে পড়িল। কোনদিন একটা তরকারি হয়, কোনদিন বা তাহাও হইয়া উঠে না ; ছেলেদের পড়াশুনা গেল—ইস্কুলে তাহারা বকুনি খাইতে লাগিল, কিন্তু কঠিন বাধা-নিয়মের শৈথিল্য ঘটিল না—এমনি কড়াকড়ি। কেবল একটা অনিয়ম ছিল—বাহিরে কোথাও আহারের নিমন্ত্রণ জুটিলে। নীলিমার কি একটা ব্রত-উদ্‌যাপন উপলক্ষে এই ব্যতিক্রম হরেন্দ্র জোর করিয়া বহাল করিয়াছিল। এ-ছাড়া আর কোথাও কোন মার্জনা ছিল না। ছেলেদের খালি পা, রুক্ষ মাথা, পাছে কোথাও কোনও ছিদ্রপথে বিলাসিতা অনধিকার-প্রবেশ করে সেদিকে সতীশের অতি-সতর্ক চক্ষু অনুক্ষণ প্রহরা দিতে লাগিল। মোটামুটি এইভাবেই আশ্রমের দিন কাটিতেছিল। সতীশের ত কথাই নাই, হরেন্দ্রর মনের মধ্যেও শ্লাঘার অবধি রহিল না। বাহিরে কাহারো কাছে তাহারা বিশেষ কিছুই প্রকাশ করিত না, কিন্তু নিজেদের মধ্যে হরেন্দ্র আত্মপ্রসাদ ও পরিতৃপ্তির উচ্ছ্বসিত আবেগে প্রায়ই এই কথাটা বলিত যে, একটা ছেলেকেও যদি সে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে ত এ জীবনে চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে মনে করিবে। সতীশ কথা কহিত না, বিনয়ে মুখখানি শুধু আনত করিত।

শুধু একটা বিষয়ে হরেন্দ্র এবং সতীশ উভয়েই পীড়া বোধ করিতেছিল। কিছুদিন হইতে উভয়েই অনুভব করিতেছিল যে, রাজেনের আচরণ পূর্বের মত আর নাই। আশ্রমের কোন কাজেই সে আর গা দেয় না, সকালের সাধন-ভজনের নিত্যকর্মে এখন সে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, শরীর ভাল নাই। অথচ, শরীর ভাল না থাকার বিশেষ কোন লক্ষণও দেখা যায় না। কি তাহার নালিশ, কেন সে এমন হইতেছে প্রশ্ন করিয়াও জবাব পাওয়া

যায় না। কোনদিন হয়ত প্রভাতেই কোথায় চলিয়া যায়, সারাদিন আসে না, রাত্রে যখন বাড়ি ফিরে তখন এমনি তাহার চেহারা যে, কারণ জিজ্ঞাসা করিতে হরেন্দ্ররও সাহস হয় না। অথচ এ-সকল একান্তই আশ্রমের নিয়মবিরুদ্ধ। একা হরেন্দ্র ব্যতীত সন্ধ্যার পরে কাহারো বাহিরে থাকিবার জো নাই—এ কথা রাজেন ভাল করিয়াই জানে, অথচ গ্রাহ্য করে না। আশ্রমের সেক্রেটারি সতীশ, শৃঙ্খলারক্ষার ভার তাহারই উপরে। এই-সকল অনাচারের বিরুদ্ধে সে হরেন্দ্রর কাছে ঠিক যে অভিযোগ করিত তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে আভাসে-ইঙ্গিতে এমন ভাব প্রকাশ করিত যে, ইহাকে আশ্রমে রাখা ঠিক সঙ্গত হইতেছে না—ছেলেরা বিগড়াইতে পারে। হরেন নিজেও যে না বুঝিত তাহা নহে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাহস তাহার ছিল না। একদিন সমস্ত রাত্রিই তাহার দেখা নাই,—সকালে যখন সে বাড়ি ফিরিল তখন এই লইয়াই একটা রীতিমত আলোচনা চলিতেছিল। হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, ব্যাপার কি রাজেন, কাল ছিলে কোথায়?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, একটা গাছতলায় পড়ে ছিলাম।

গাছতলায়? গাছতলায় কেন?

অনেক রাত হয়ে গেল—আর ডাকাডাকি করে আপনাদের ঘুম ভাঙ্গালাম না।

বেশ। অত রাত্রিই বা হল কেন?

এমনি ঘুরতে ঘুরতে। এই বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সতীশ নিকটে ছিল, হরেন জিজ্ঞাসা করিল, কি কাণ্ড বল ত?

সতীশ বলিল, আপনাকেই কথা কাটিয়ে চলে গেল—গ্রাহ্য করলে না, আর আমি জানব কি করে?

তাই ত হে, এতটা ত ভাল নয়।

সতীশ মুখ ভারী করিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি ত একটা কথা জানেন, পুলিশে ওকে বছর-দুই জেলে রেখেছিল?

হরেন বলিল, জানি, কিন্তু সে ত মিথ্যে সন্দেহের উপর। ওর ত কোন সত্যিকার দোষ ছিল না।

সতীশ কহিল, আমি শুধু ওর বন্ধু বলেই জেলে যেতে যেতে রয়ে গিয়েছিলাম। পুলিশের সুদৃষ্টি ওকে আজও ছাড়েনি।

হরেন কহিল, অসম্ভব নয়।

প্রত্যুত্তরে সতীশ একটুখানি বিষাদের হাসি হাসিয়া কহিল, আমি ভাবি, ওর থেকে আমাদের আশ্রমের উপরে না তাদের মায়া জন্মায়।

শুনিয়া হরেন চিন্তিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। সতীশ নিজেও খানিকক্ষণ নীরবে থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি বোধ হয় জানেন যে রাজেন ভগবান পর্যন্ত বিশ্বাস করে না?

হরেন আশ্চর্য হইয়া বলিল, কৈ না!

সতীশ কহিল, আমি জানি সে করে না। আশ্রমের কাজকর্ম, বিধিনিষেধের প্রতিও তার তিলার্ধ শ্রদ্ধা নেই। আপনি বরঞ্চ কোথাও তার একটা চাকরি-বাকরি করে দিন।

হরেন্দ্র কহিল, চাকরি ত গাছের ফল নয়, সতীশ, যে ইচ্ছে করলেই পেড়ে হাতে দেব। তার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করতে হয়।

সতীশ বলিল, তা হলে তাই করুন। আপনি যখন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রেসিডেন্ট, এবং আমি এর সেক্রেটারি, তখন সকল বিষয় আপনার গোচর করাই আমার কর্তব্য। আপনি ওকে অত্যন্ত স্নেহ করেন এবং আমারও সে বন্ধু। তাই তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে এতদিন আমার প্রবৃত্তি হয়নি, কিন্তু এখন আপনাকে সতর্ক করে দেওয়াও আমি কর্তব্য মনে করি।

হরেন মনে মনে ভীত হইয়া কহিল, কিন্তু আমি জানি তার নির্মল চরিত্র—

সতীশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ। এদিক দিয়ে অতিবড় শত্রুও তার দোষ দিতে পারে না।

রাজেন আজীবন কুমার, কিন্তু সে ব্রহ্মচারীও নয়। আসল কারণ, স্ত্রীলোক বলে সংসারে যে কিছু আছে এ কথা ভাববারও তার সময় নেই। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তার চরিত্রের অভিযোগ আমি করিনি, সে অস্বাভাবিক রকমের নির্মল, কিন্তু—

হরেন প্রশ্ন করিল, তবুও তোমার কিন্তুটা কি?

সতীশ বলিল, কলকাতার বাসায় আমরা দুজনে এক ঘরে থাকতাম। ও তখন ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র এবং বাসায় বি. এস্-সি, পড়ত। সবাই জানত ও-ই ফার্স্ট হবে, কিন্তু একজামিনের আগে হঠাৎ কোথায় চলে গেল—

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ও কি ডাক্তারি পড়ত নাকি? কিন্তু আমাকে যে বলেছিল ও শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি হয়েছিল, কিন্তু পড়াশুনো ভয়ানক শক্ত বলে ওকে পালিয়ে আসতে হয়েছিল—

সতীশ কহিল, কিন্তু খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন কলেজে থার্ড-ইয়ারে সে-ই হয়েছিল প্রথম। অথচ বিনা কারণে চলে আসায় কলেজের সমস্ত মাস্টাররাই অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিল। ওর পিসীমা বড়লোক, তিনিই পড়ার খরচ দিচ্ছিলেন। এই ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে টাকা বন্ধ করলেন, তার পরেই বোধ হয় আপনার সঙ্গে ওর পরিচয়। বছর-দুই ঘুরে ঘুরে যখন ফিরে এলো তখন পিসীমা তারই মত নিয়ে তাকে ডাক্তারি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ক্লাশে প্রত্যেক বিষয়েই ও ফার্স্ট হচ্ছিল, অথচ বছর-তিনেক পরে হঠাৎ একদিন ছেড়ে দিলে। ওই এক ছুতো—ভারী শক্ত, ও আমি পেরে উঠবো না। ছেড়ে দিয়ে আমার বাসায় আমার ঘরে এসে আড্ডা নিলে। বললে, ছেলে পড়িয়ে বি. এস্-সি পাস করে কোথাও কোন গ্রামে গিয়ে মাস্টারি করে কাটাব। আমি বললাম, বেশ তাই কর। তার পরে দিন-পনর নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই, চোখের ঘুম কোথায় গেল তার ঠিকানা নেই,—এমনি পড়াই পড়লে যে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। সবাই বললে, এ না হলে কি আর কেউ প্রত্যেক বিষয়ে প্রথম হতে পারে!

হরেন এ-সব কিছুই জানিত না,—রুদ্ধনিঃশ্বাসে কহিল, তার পরে?

সতীশ কহিল, তার পরে যা আরম্ভ করলে সেও এমনি অদ্ভুত। বই আর ছুঁলে না। কোথায় রইল তার খাতা পেন্সিল, কোথায় রইল তার নোট্ বুক—কোথায় যায়, কোথায় থাকে, পাত্তাই পাওয়া যায় না। যখন ফিরে আসে তার চেহারা দেখলে ভয় হয়। যেন এতদিন ওর স্নানাহার পর্যন্ত ছিল না!

তার পরে?

তার পরে একদিন পুলিশের দলবল এসে সকাল থেকে বাড়িময় যেন দক্ষযজ্ঞ শুরু করলে। এটা ফেলে, সেটা ছড়ায়, ওটা খোলে, একে ধমকায়, তাকে আটকায়,—সে বস্তু চোখে না দেখলে অনুধাবন করবার জো নেই। বাসার সবাই কেরানী, ভয়ে দুজনের সর্দিগর্মি হয়ে গেল—সবাই ভাবলাম আর রক্ষে নেই, পুলিশের লোকে আজ আমাদের সবাইকে ধরে বোধ হয় ফাঁসি দেবে।

তার পরে?

তার পরে বিকেল-নাগাদ রাজেনকে আর রাজেনের বন্ধু বলে আমাকে ধরে নিয়ে তারা বিদায় হল। আমাকে দিলে দিন-চারেক পরেই ছেড়ে, কিন্তু তার উদ্দেশ আর পাওয়া গেল না। ছাড়বার সময় সাহেব দয়া করে বার বার স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, ওয়ান স্টেপ্! ওন্‌লি ওয়ান্ স্টেপ্! তোমার বাসার ঘর আর এই জেলের ঘরের মধ্যে ব্যবধান রইলো শুধু ওয়ান্ স্টেপ্। গো। গঙ্গাস্নান করে কালীঘাটে মা-কালীকে দর্শন করে বাসায় ফিরে এলাম। সবাই বললে, সতীশ, তুমি ভাগ্যবান। অফিসে গেলাম, সাহেব ডেকে পাঠিয়ে দু মাসের মাইনে হাতে দিয়ে বললেন, গো। শুনলাম ইতিমধ্যে আমার অনেক খোঁজ-তল্লাশিই হয়ে গেছে।

হরেন্দ্র স্তব্ধ হইয়া রহিল। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে কহিল, তা হলে কি তোমার নিশ্চয় বোধ হয় যে রাজেন—

সতীশ মিনতির স্বরে বলিল, আমাকে জিজ্ঞেসা করবেন না। সে আমার বন্ধু।

হরেন খুশী হইল না, কহিল, আমারও ত সে ভাইয়ের মত।

সতীশ কহিল, একটা কথা ভেবে দেখবার যে, তারা আমাকে বিনা-দোষে লাঞ্ছনা করেচে সত্যি, কিন্তু ছেড়েও দিয়েছে।

হরেন বলিল, বিনা-দোষে লাঞ্ছনা করাটাও ত আইন নয়। যারা তা পারে, তারা এই বা পারবে না কেন? এই বলিয়া সে তখনকার মত কলেজে চলিয়া গেল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার ভারী অশান্তি লাগিয়া রহিল। শুধু কেবল রাজেনের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়াই নয়, দেশের কাজে দেশের ছেলেদের মানুষের মত মানুষ করিয়া তুলিতে এই যে সে আয়োজন করিয়াছে, পাছে, তাহা অকারণে নষ্ট হইয়া যায়। হরেন স্থির করিল, ব্যাপারটা সত্যই হউক, বা মিথ্যাই হউক, পুলিশের চক্ষু অকারণে আশ্রমের প্রতি আকর্ষণ করিয়া আনা কোনমতেই সমীচীন নয়। বিশেষতঃ সে যখন স্পষ্টই এখানকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চলিতেছে, তখন কোথাও চাকরি করিয়া দিয়া হোক বা যে-কোন অজুহাতে হোক, তাহাকে অন্যত্র সরাইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

ইহার দিন-কয়েক পরেই মুসলমানদের কি একটা পর্বোপলক্ষে দুদিনের ছুটি ছিল। সতীশ কাশী যাইবার অনুমতি চাহিতে আসিল। আগ্রা আশ্রমের অনুরূপ আদর্শে ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার বিরাট কল্পনা হরেন্দ্রর মনের মধ্যে ছিল এবং এই উদ্দেশ্যেই সতীশের কাশী যাওয়া। শুনিয়া রাজেন আসিয়া কহিল হরেনদা, ওর সঙ্গে আমিও দিনকতক বেড়িয়ে আসি গে।

হরেন বলিল, তার কাজ আছে বলে সে যাচ্ছে।

রাজেন বলিল, আমার কাজ নেই বলেই যেতে চাচ্চি। যাবার গাড়িভাড়ার টাকাটা আমার কাছে আছে।

হরেন জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ফিরে আসবার?

রাজেন চুপ করিয়া রহিল।

হরেন বলিল, রাজেন, কিছুদিন থেকে তোমাকে একটা কথা বলি-বলি করেও বলতে পারিনি।

রাজেন একটুখানি হাসিয়া কহিল, বলবার প্রয়োজন নেই হরেনদা, সে আমি জানি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

রাত্রির গাড়িতে তাহাদের যাইবার কথা। বাসা হইতে বাহির হইবার কালে হরেন্দ্র দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হঠাৎ তাহার হাতের মধ্যে একটা কাগজের মোড়ক গুঁজিয়া দিয়া চুপি চুপি বলিল, ফিরে না এলে বড় দুঃখ পাবো রাজেন। এবং বলিয়াই চক্ষের পলকে নিজের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

ইহার দিন-দশেক পরে দুজনেই ফিরিয়া আসিল। হরেনকে নিভৃতে ডাকিয়া সতীশ প্রফুল্ল মুখে কহিল, আপনার সেদিনের ঐটুকু বলাতেই কাজ হয়েছে হরেনবাবু। কাশীতে আশ্রম স্থাপনের জন্যে এ কদিন রাজেন অমানুষিক পরিশ্রম করেচে।

হরেন কহিল, পরিশ্রম করলে ত সে অমানুষিক পরিশ্রমই করে সতীশ।

হাঁ, তাই সে করেছে। কিন্তু এর সিকি ভাগ পরিশ্রমও যদি সে আমাদের এই নিজেদের আশ্রমটুকুর জন্যে করত!

হরেন আশান্বিত হইয়া বলিল, করবে হে সতীশ, করবে। এতদিন বোধ করি ও ঠিক জিনিসটি ধরতে পারেনি। আমি নিশ্চয় বলচি, তুমি দেখতে পাবে এখন থেকে ওর কর্মের আর অবধি থাকবে না।

সতীশ নিজেও সেই ভরসাই করিল।

হরেন বলিল, তোমাদের ফিরে আসার অপেক্ষায় একটা কাজ স্থগিত আছে। আমি মনে মনে কি স্থির করেছি জানো? আমাদের আশ্রমের অস্তিত্ব এবং উদ্দেশ্য গোপন রাখলে আর চলবে না। দেশের এবং দশের সহানুভূতি পাওয়া আমাদের প্রয়োজন। এর বিশিষ্ট কর্মপদ্ধতি সাধারণ্যে প্রচার করা আবশ্যক।

সতীশ সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু তাতে কি কাজে বাধা পাবে না?

হরেন বলিল, না। এই রবিবারে আমি কয়েকজনকে আহ্বান করেচি। তাঁরা দেখতে আসবেন। আশ্রমের শিক্ষা, সাধনা, সংযম ও বিশুদ্ধতার পরিচয়ে সেদিন যেন তাঁদের আমরা মুগ্ধ করে দিতে পারি। তোমার উপরেই সমস্ত দায়িত্ব।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, কে কে আসবেন?

হরেন বলিল, অজিতবাবু, অবিনাশদা, বৌঠাকরুন। শিবনাথবাবু সম্প্রতি এখানে নেই,—শুনলাম জয়পুরে গেছেন কার্যোপলক্ষে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কমলের নাম বোধ করি শুনেছ—তিনিও আসবেন ; এবং শরীর সুস্থ থাকলে হয়ত আশুবাবুকেও ধরে আনতে পারব। জান ত, কেউ এঁরা যে-সে লোক নন। সেদিন এঁদের কাছ থেকে যেন আমরা সত্যিকার শ্রদ্ধা আদায় করে নিতে পারি। সে ভার তোমার।

সতীশ সবিনয়ে মাথা নত করিয়া কহিল, আশীর্বাদ করুন, তাই হবে।

রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে অভ্যাগতেরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—আসিলেন না শুধু আশুবাবু। হরেন্দ্র দ্বার হইতে তাঁহাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলেন। ছেলেরা তখন আশ্রমের নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মে ব্যাপৃত। কেহ আলো জ্বালিতেছে, কেহ ঝাঁট দিতেছে, কেহ উনান ধরাইতেছে, কেহ জল তুলিতেছে, কেহ রান্নার আয়োজন করিতেছে। হরেন্দ্র অবিনাশকে লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে কহিল, সেজদা, এরাই সব আমাদের আশ্রমের ছেলে। আপনি যাঁদের লক্ষ্মীছাড়ার দল বলেন। আমাদের চাকর-বামুন নেই, সমস্ত কাজ এদের নিজেদের করতে হয়। বৌদি, আসুন আমাদের রান্নাশালায়। আজ আমাদের পর্বদিন, সেখানকার আয়োজন একবার দেখে আসবেন চলুন।

নীলিমার পিছনে পিছনে সবাই আসিয়া রান্নাঘরের দ্বারের কাছে দাঁড়াইলেন। একটি বছর দশ-বারোর ছেলে উনান জ্বালিতেছিল এবং সেই বয়সের আর একটি ছেলে বঁটিতে আলু কুটিতেছিল, উভয়েই উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। নীলিমা ছেলেটিকে স্নেহের কণ্ঠে সম্বোধন করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ তোমাদের কি রান্না হবে বাবা?

ছেলেটি প্রফুল্লমুখে কহিল, আজ রবিবারে আমাদের আলুর-দম হয়।

আর কি হয়?

আর কিছু না।

নীলিমা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, শুধু আলুর-দম? ডাল কিংবা ঝোল, কিংবা আর কিছু—

ছেলেটি শুধু কহিল, ডাল আমাদের কাল হয়েছিল।

সতীশ পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, বুঝাইয়া বলিল, আমাদের আশ্রমে একটার বেশী হবার নিয়ম নেই।

হরেন হাসিয়া কহিল, হবার জো নেই বৌদি, হবে কোথা থেকে? ভায়া এই ভাবেই পরের কাছে আশ্রমের গৌরব রক্ষা করেন।

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিল, দাসী-চাকরও নেই বুঝি?

হরেন কহিল, না। তাদের আনলে আলুর-দমকে বিদায় দিতে হবে। ছেলেরা সেটা পছন্দ করবে না।

নীলিমা আর প্রশ্ন করিল না, ছেলে-দুটির মুখের পানে চাহিয়া তাহার দুই চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। কহিল, ঠাকুরপো, আর কোথাও চল।

সকলেই এ কথার অর্থ বুঝিল। হরেন্দ্র মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, চলুন। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানতাম বৌদি, এ আপনি সইতে পারবেন না। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, কিন্তু আপনি নিজেই এতে অভ্যস্ত—শুধু আপনিই বুঝবেন এর সার্থকতা। তাই সেদিন আমার এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আপনাকে সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ করেছিলাম।

হরেন্দ্রর গভীর ও গম্ভীর মুখের প্রতি চাহিয়া কমল হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার নিজের

কথা আলাদা, কিন্তু এই-সব শিশুদের নিয়ে প্রচণ্ড আড়ম্বরে এই নিষ্ফল দারিদ্র্য-চর্চার নাম কি মানুষ-গড়া হরেনবাবু? এরাই বুঝি সব ব্রহ্মচারী? এদের মানুষ করতে চান ত সাধারণ সহজ পথ দিয়ে করুন,—মিথ্যে দুঃখের বোঝা মাথায় চাপিয়ে অসময়ে কুঁজো করে' দেবেন না।

তাহার বাক্যের কঠোরতায় হরেন্দ্র বিব্রত হইয়া উঠিল। অবিনাশ বলিলেন, কমলকে ডেকে আনা তোমার ঠিক হয়নি হরেন।

কমল লজ্জা পাইল, কহিল, আমাকে সত্যিই কারো ডাকা উচিত নয়।

নীলিমা কহিল, কিন্তু সে কারও মধ্যে আমি নয় কমল। আমার ঘরের মধ্যে কখনো তোমার অনাদর হবে না। চল, আমরা ওপরে গিয়ে বসি গে। দেখি, ঠাকুরপোর আশ্রমে আরও কি কি আতসবাজী বা'র হয়। এই বলিয়া সে স্নিগ্ধ হাস্যের আবরণ দিয়া কমলের লজ্জা ঢাকিয়া দিল।

দ্বিতলে আশ্রমের বসিবার ঘরখানি দিব্য প্রশস্ত। সাবেককালের কারুকার্য ছাদের নীচে ও দেওয়ালের গায়ে এখনও বিদ্যমান। বসিবার জন্য একখানা বেঞ্চ ও গোটা-চারেক চৌকি আছে, কিন্তু সাধারণতঃ কেহ তাহাতে বসে না। মেঝের উপর সতরঞ্চি পাতা। আজ বিশেষ উপলক্ষে সাদা চাদর বিছাইয়া প্রতিবেশী লালাজীর গৃহ হইতে কয়েকটা মোটা তাকিয়া চাহিয়া আনা হইয়াছে, মাঝখানে তাঁহারই বাড়ির লতাপাতা-কাটা বারো ডালের শেজ এবং তাঁহারই দেওয়া সবুজ রঙের ফানুসে ঢাকা দেওয়ালগিরি এক কোণে জ্বলিতেছে; নীচের অন্ধকার ও আনন্দহীন আবহাওয়ার মধ্য হইতে এই ঘরটিতে উপস্থিত হইয়া সকলেই খুশী হইলেন।

অবিনাশ একটা তাকিয়া আশ্রয় করিয়া পদদ্বয় সম্মুখে প্রসারিত করিয়া দিয়া তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ! বাঁচা গেল!

হরেন মনে মনে পুলকিত হইয়া কহিল, আমাদের আশ্রমের এ ঘরখানি কেমন সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, এই ত মুশকিলে ফেললি হরেন। কমল উপস্থিত রয়েচেন, ওঁর সুমুখে কোন-কিছুকে ভালো বলতে সাহস হয় না—হয়ত সুতীক্ষ্ণ প্রতিবাদের জোরে এখুনি সপ্রমাণ করে দেবেন যে, এর ছাদের নকশা থেকে মেঝের গালচে পর্যন্ত সবই মন্দ। এই বলিয়া তিনি তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, আমার আর কোন সম্বল না থাক কমল, অন্ততঃ বয়সের পুঁজিটা যে জমিয়ে তুলেচি এ তুমিও মানবে। তারই জোরে তোমাকে একটা কথা আজ বলে রাখি, সত্য বাক্য অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রিয় হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু তাই বলে অপ্রিয় বাক্য-মাত্রই সত্য নয় কমল। তোমাকে অনেক কথাই শিবনাথ শিখিয়েছে, কেবল এইটি দেখচি সে শেখাতে বাকী রেখেচে।

কমলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কিন্তু ইহার জবাব দিল নীলিমা। কহিল, শিবনাথের ত্রুটি হয়েছে মুখুয্যে মশাই, তাঁকে জরিমানা করে আমরা তার শোধ দেব। কিন্তু গুরুগিরিতে কোন পুরুষই ত কম নয়। তাই প্রার্থনা করি, তোমার বয়সের পুঁজি থেকে আরও দু-একটা প্রিয়বাক্য বার কর—আমরা সবাই শুনে ধন্য হই।

অবিনাশ অন্তরে জ্বলিয়া গেলেন। এত লোকের মাঝখানে শুধু কেবল উপহাসের জন্যই নয়, এই বক্রোক্তির অভ্যন্তরে যে তীক্ষ্ণ ফলাটুকু লুকানো ছিল, তাহা বিদ্ধ করিয়াই নিরস্ত হইল না, অপমান করিল। কিছুকাল হইতে কি-একপ্রকার অসন্তোষের তপ্ত বাতাস কোথা হইতে বহিয়া আসিয়া উভয়ের মাঝখানে পড়িতেছিল। ঝড়ের মত ভীষণ কিছুই নয়, কিন্তু খড়কুটা ধুলাবালি উড়াইয়া মাঝে মাঝে চোখে-মুখে আনিয়া ফেলিতেছিল। অল্প একটুখানি নড়া-দাঁতের মত, চিবানোর কাজটা চলিতেছিল, কিন্তু চিবানোর আনন্দে বাজিতেছিল। হরেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, রাগ করতে পারিনে হরেন, তোমার বৌদি নিতান্ত মিথ্যে বলেন নি—আমাকে চিনতে ত তাঁর বাকী নেই—ঠিকই জানেন আমার পুঁজিপাটা সেই সেকেলে সোজা ধরনের, তাতে বস্তু থাকলেও রস-কস নেই।

হরেন জিজ্ঞাসা করিল, এ কথার মানে সেজদা?

অবিনাশ বলিলেন, তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মানেটা ঠিক বুঝবে না। কিন্তু ছোটগিন্নী হঠাৎ যে-

রকম কমলের ভক্ত হয়ে উঠেচেন, তাতে আশা হয় তাঁর অভিজ্ঞতা কাজে লাগালে ধন্য হবার পথ ওঁর আপনি পরিষ্কার হবে।

এই ইঙ্গিতের কদর্যতা তাঁহার নিজের কানেও লাগিয়াছিল, কিন্তু দুর্বিনয়ের স্পর্ধায় আরও কি-একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরেন্দ্র থামাইয়া দিল। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, সেজদা, আপনারা সকলেই আজ অতিথি। কমলকে আমি আশ্রমের পক্ষে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলাম, এ কথা আপনারা ভুলে গেলে আমাদের দুঃখের সীমা থাকবে না।

নীলিমা বলিল, তা হলে আমার সম্বন্ধেও দয়া করে ওঁকে স্মরণ করিয়ে দাও ঠাকুরপো, যে কাউকে ছোটগিন্নী বলে ডাকতে থাকলেই সে সত্যিকার গৃহিণী হয়ে যায় না। তাকে শাসন করার মাত্রা-বোধ থাকা চাই। আমার দিক থেকে মুখুয্যেমশায়ের অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার ঘরে এইটুকু আজ বরঞ্চ জমা হয়ে থাক—ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

হরেন্দ্র হাত জোড় করিয়া বলিল, রক্ষে করুন বৌদি, যত অভিজ্ঞতার লড়াই কি আজ আমার বাসায় এসে? যেটুকু বাকী রইল এখন থাক, বাড়ি ফিরে গিয়ে সমাধা করে নেবেন, নইলে আমরা যে মারা যাই। যে ভয়ে অক্ষয়কে ডাকলাম না, তাই কি শেষে ভাগ্যে ঘটলো?

শুনিয়া অজিত ও কমল উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। হরেন জিজ্ঞাসা করিল, অজিতবাবু, শুনলাম কাল নাকি আপনি বাড়ি যাবেন?

কিন্তু আপনি শুনলেন কার কাছে?

আশুবাবুকে আনতে গিয়েছিলাম, তিনিই বললেন, কাল বোধ হয় আপনি বাড়ি চলে যাচ্চেন।

অজিত কহিল, বোধ হয়। কিন্তু সে কাল নয়, পরশু। এবং বাড়ি কি না তারও নিশ্চয়তা নেই। হয়ত, বিকেল নাগাদ স্টেশনে গিয়ে উপস্থিত হব,—উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম যে-কোন দিকের গাড়ি পাবো তাতেই এ যাত্রা শুরু করে দেব।

হরেন সহাস্যে কহিল, অনেকটা বিবাগী হওয়ার মত। অর্থাৎ গন্তব্য স্থানের নির্দেশ নেই।

অজিত বলিল, না।

কিন্তু ফিরে আসবার?

না, তারও আপাততঃ কোন নির্দেশ নেই।

হরেন কহিল, অজিতবাবু, আপনি ভাগ্যবান লোক। কিন্তু তল্পি বইবার লোকের দরকার হয় ত আমি একজনকে দিতে পারি, বিদেশে এমন বন্ধু আর পাবেন না।

কমল কহিল, আর রাঁধবার লোকের দরকার হয় ত আমিও একজনকে দিতে পারি, রাঁধতে যার জোড়া নেই। আপনিও স্বীকার করবেন, হাঁ, অহঙ্কার করতে পারে বটে।

অবিনাশের কিছুই আর ভাল লাগিতেছিল না ; বলিলেন, হরেন, আর দেরি কিসের, এবার ফেরবার উদ্যোগ করা যাক না, কি বল?

হরেন সবিনয়ে কহিল, ছেলেদের সঙ্গে একটু পরিচয় করবেন না? দুটো উপদেশ তাদের দিয়ে যাবেন না সেজদা?

অবিনাশ কহিলেন, উপদেশ দিতে ত আমি আসিনি, এসেছিলাম শুধু ওঁদের সঙ্গী হিসেবে। তার বোধ হয় আর দরকার নেই।

সতীশ অনেকগুলি ছেলে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। দশ-বারো বছরের বালক হইতে উনিশ-কুড়ি বছরের যুবক পর্যন্ত তাহাতে আছে। শীতের দিন। গায়ে শুধু একটি জামা, কিন্তু কাহারও পায়ে জুতা নাই,—জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় নয় বলিয়াই। আহারের ব্যবস্থা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এ-সকল শিক্ষার অঙ্গ। হরেন্দ্র আজ একটা সুন্দর বক্তৃতা রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, মনে মনে তাহাই আবৃত্তি করিয়া লইয়া যথোচিত গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, এই ছেলেরা স্বদেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করেছে। আশ্রমের এই মহৎ আদর্শ যাতে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে প্রচার করতে পারে, আজ এদের সেই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

সকলে মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করিলেন।

হরেন কহিল, যদি সময় থাকে আমাদের বক্তব্য আমি পরে নিবেদন করব। এই বলিয়া সে কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আপনাকেই আজ আমরা বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করে এনেছি কিছু শুনবো বলে। ছেলেরা আশা করে আছে আপনার মুখ থেকে আজ তারা এমন কিছু পাবে যাতে জীবনের ব্রত তাদের অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কমল সঙ্কোচ ও দ্বিধায় আরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল, আমি ত বক্তৃতা দিতে পারিনে, হরেনবাবু।

উত্তর দিল সতীশ, কহিল, বক্তৃতা নয়, উপদেশ। দেশের কাজে যা তাদের সবচেয়ে বেশী কাজে লাগবে, শুধু তাই।

কমল তাহাকেই প্রশ্ন করিল, দেশের কাজ বলতে আপনারা কি বোঝেন, আগে বলুন।

সতীশ কহিল, যাতে দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় সেই তো দেশের কাজ।

কমল বলিল, কিন্তু কল্যাণের ধারণা ত সকলের এক নয়। আপনার সঙ্গে আমার ধারণা যদি না মেলে আমার উপদেশ ত আপনাদের কাজে লাগবে না।

সতীশ মুশকিলে পড়িল। এ কথার ঠিক উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। তাহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে হরেন কহিল, দেশের মুক্তি যাতে আসে সেই হল দেশের একমাত্র কল্যাণ। দেশে এমন কে আছে যে এ সত্য স্বীকার করবে না?

কমল বলিল, না বলতে ভয় হয় হরেনবাবু, সবাই ক্ষেপে যাবে। নইলে আমিই বলতাম, এই মুক্তি শব্দটার মত ভোলবার এবং ভোলাবার এতবড় ছল আর নেই। কার থেকে মুক্তি, হরেনবাবু? ত্রিবিধ দুঃখ থেকে, না ভাববন্ধন থেকে? কোন্‌টাকে দেশের একমাত্র কল্যাণ স্থির করে আশ্রম-প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত হয়েছেন বলুন ত? এই কি আপনার স্বদেশ-সেবার আদর্শ?

হরেন ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, না না না, এ-সব নয়, এ-সব নয়। এ আমাদের কাম্য নয়।

কমল কহিল, তাই বলুন এ আমাদের কাম্য নয়, বলুন আমাদের আদর্শ স্বতন্ত্র। বলুন, সংসারত্যাগ ও বৈরাগ্য-সাধনা আমাদের নয়, আমাদের সাধনা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত প্রাণ নিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু তার শিক্ষা কি ছেলেদের এই? গায়ে একটা মোটা জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, পরনে জীর্ণবস্ত্র, মাথায় রুক্ষকেশ, একবেলা অর্ধাশনে যারা কেবল অস্বীকারের মধ্যে দিয়েই বড় হয়ে উঠচে, পাওয়ার আনন্দ যার নিজের মধ্যেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেশের লক্ষ্মী কি পাঠিয়ে দেবেন শেষে তাদের হাত দিয়েই তাঁর ভাঁড়ারের চাবি? হরেনবাবু, পৃথিবীর দিকে একবার চেয়ে দেখুন। যারা অনেক পেয়েছে, তারা সহজেই দিয়েছে, এমন অকিঞ্চনতার ইস্কুল খুলে তাদের ত্যাগের গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হয়নি।

সতীশ হতবুদ্ধি হইয়া প্রশ্ন করিল, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে কি ধর্মের সাধনা, ত্যাগের দীক্ষা প্রয়োজনীয় নয় আপনি বলেন?

কমল কহিল, মুক্তি-সংগ্রামের অর্থটা আগে পরিষ্কার হোক।

সতীশ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল ; কমল হাসিয়া বলিল, ভাবে বোধ হয় আপনি বিদেশী রাজশক্তির বন্ধন-মোচনকেই দেশের মুক্তি-সংগ্রাম বলচেন। তা যদি হয় সতীশবাবু, আমি নিজে ত ধর্মের সাধনাও করিনি, ত্যাগের দীক্ষাও নিইনি, তবুও আমাকে ঠিক সামনের দলেই পাবেন এ আপনাকে আমি কথা দিলাম। কিন্তু আপনাদের খুঁজে পাব ত?

সতীশ কথা কহিল না, কেমন একপ্রকার যেন ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং তাহারই চঞ্চল দৃষ্টির অনুসরণ করিতে গিয়া কমল কিছুক্ষণের জন্য চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। এই লোকটিই রাজেন্দ্র। কখন নিঃশব্দে আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল সতীশ ভিন্ন আর কেহ লক্ষ্য করে নাই। সে আচ্ছন্নের ন্যায় নিষ্পলকচক্ষে এতক্ষণ তাহারই প্রতি চাহিয়াছিল, এখনও ঠিক তেমনি করিয়াই চাহিয়া রহিল। ইহার চেহারা একবার দেখিলে ভোলা কঠিন। বয়স বোধ করি পঁচিশ-ছাব্বিশ হইবে, রং অতিশয় ফরসা, হঠাৎ দেখিলে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। প্রকাণ্ড কপাল, সুমুখের দিকটায় এই বয়সেই টাকের মত হইয়া ঢের বড় দেখাইতেছে, চোখ গভীর এবং অতিশয়

ক্ষুদ্র—অন্ধকার গর্ত হইতে ইঁদুরের চোখের মত জ্বলিতেছে, নীচেকার পুরু মোটা ঠোঁট সুমুখে ঝুঁকিয়া যেন অন্তরের সুকঠোর সঙ্কল্প কোনমতে চাপা দিয়া আছে। হঠাৎ দেখিলে ভয় হয়, এই মানুষটাকে এড়াইয়া চলাই ভাল।

হরেন্দ্র কহিল, ইনিই আমার বন্ধু,—শুধু বন্ধু নয়, ছোটভাইয়ের মত, রাজেন্দ্র। এতবড় কর্মী, এতবড় স্বদেশভক্ত, এতবড় ভয়শূন্য সাধু-চিত্ত পুরুষ আমি আর দেখিনি। বৌদি, এঁর গল্পই সেদিন আপনার কাছে করেছিলাম। ও যেমন অবলীলায় পায়, তেমনি অবহেলায় ফেলে দেয়। আশ্চর্য মানুষ! অজিতবাবু একেই আপনার তল্পি বইতে সঙ্গে দিতে চেয়েছিলাম।

অজিত কি একটা বলিতে যাইতেছিল, একটি ছেলে আসিয়া খবর দিল, অক্ষয়বাবু আসিয়াছেন।

হরেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিল, অক্ষয়বাবু?

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, হাঁ হে, হাঁ—তোমার পরমবন্ধু অক্ষয়কুমার। সহসা চমকিয়া বলিল, অ্যাঁ! ব্যাপার কি আজ? সবাই উপস্থিত যে! আশুবাবুর সঙ্গে গাড়িতে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, পথে নাবিয়ে দিলেন। সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল, হরি ঘোষের গোয়ালটা একটু তদারক করেই যাই না! তাই আসা, তা বেশ।

এ-সকল কথার কেহ জবাব দিল না, কারণ, জবাব দিবারও কিছু নাই, বিশ্বাসও কেহ করিল না। অক্ষয়ের এটা পথও নয়, এ বাসায় সে সহজে আসেও না।

অক্ষয় কমলের প্রতি চাহিয়া বলিল, তোমার ওখানে কাল সকালেই যাব ভেবেছিলাম, কিন্তু বাড়িটা ত চিনিনে—ভালই হল যে দেখা হয়ে গেল। একটা সুসংবাদ আছে।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, সুসংবাদটা কি শুনি? খবরটা যখন শুভ তখন গোপনীয় নয় নিশ্চয়ই।

অক্ষয় কহিল, গোপন করবার আর কি আছে। পথের মধ্যে আজ সেই সেলাইয়ের কল বিক্রি-আলা পার্শী বেটার সঙ্গে দেখা। সেই সেদিন যে কমলের হয়ে টাকা ধার চাইতে গিয়েছিল। গাড়ি থামিয়ে ব্যাপারটা শোনা গেল। কমলকে দেখাইয়া কহিল, উনি ধারে একটা কল কিনে ফতুয়া-টতুয়া সেলাই করে খরচ চালাচ্ছিলেন,—শিবনাথ ত দিব্যি গা-ঢাকা দিয়েছেন, কিন্তু কড়ার মত দাম দেওয়া চাই ত! তাই সে কলটা কেড়ে নিয়ে গেছে,—আশুবাবু আজ পুরো দাম দিয়ে সেটা কিনে নিলেন। কমল, কাল সকালেই লোক পাঠিয়ে কলটা আদায় করে নিয়ো। খাওয়া-পরা চলছিল না, আমাদের ত সে কথা জানালেই হত।

তাহার বলার বর্বর নিষ্ঠুরতায় সকলেই মর্মাহত হইল। কমলের লাবণ্যহীন শীর্ণ মুখের একটা হেতু দেখিতে পাইয়া লজ্জায় অবিনাশের পর্যন্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

কমল মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমার কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁকে সেটা ফিরিয়ে দিতে বলবেন। আর আমার প্রয়োজন নেই।

কেন? কেন?

হরেন্দ্র কহিল, অক্ষয়বাবু, আপনি যান এ বাড়ি থেকে। আপনাকে আমি আহ্বান করিনি—ইচ্ছে করিনি যে আপনি আসেন, তবু এসেছেন। মানুষের ব্রুট্যালিটির কি কোথাও কোন সীমা থাকবে না?

কমল হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল অজিতের দুই চক্ষু যেন জলভারে ছলছল করিতেছে। কহিল, অজিতবাবু, আপনার গাড়ি সঙ্গে আছে, দয়া করে আমাকে পৌঁছে দেবেন?

অজিত কথা কহিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

কমল নীলিমাকে নমস্কার করিয়া বলিল, আর বোধ হয় শীঘ্র দেখা হবে না, আমি এখান থেকে যাচ্ছি।

কোথায়, এ কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিল না। নীলিমা শুধু তাহার হাতখানি হাতের মধ্যে লইয়া একটুখানি চাপ দিল এবং পরক্ষণেই সে হরেন্দ্রকে নমস্কার করিয়া অজিতের

পিছনে পিছনে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পনর

মোটরে বসিয়া কমল আকাশের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া ছিল, গাড়ি থামিতে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ কোথায় এলেন অজিতবাবু, আমার বাসার পথ ত নয়?

অজিত উত্তর দিল, না, এ পথ নয়।

নয়? তা হলে ফিরতে হবে বোধ করি?

সে আপনি জানেন। আমাকে হুকুম করলেই ফিরব।

শুনিয়া কমল আশ্চর্য হইল। এই অদ্ভুত উত্তরের জন্য যতটা না হোক, তাহার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিকতা তাহাকে বিচলিত করিল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সে আপনাকে দৃঢ় করিয়া হাসিয়া কহিল, পথ ভোলবার অনুরোধ ত আমি করিনি অজিতবাবু, যে সংশোধনের হুকুম আমাকেই দিতে হবে! ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবার দায়িত্ব আপনার—আমার কর্তব্য শুধু আপনাকে বিশ্বাস করে থাকা।

কিন্তু দায়িত্ববোধের ধারণায় যদি ভুল করে থাকি কমল?

যদির ওপর ত বিচার চলে না অজিতবাবু। ভুলের সম্বন্ধে আগে নিঃসংশয় হই, তার পরে এর বিচার করব।

অজিত অস্ফুট-স্বরে বলিল, তা হলে বিচারই করুন, আমি অপেক্ষা করে রইলাম। এই বলিয়া সে মুহূর্ত-কয়েক স্তব্ধ থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কমল, আর একদিনের কথা মনে আছে তোমার? সেদিন ত ঠিক এমনি অন্ধকারই ছিল।

হাঁ, এমনি অন্ধকারই ছিল। এই বলিয়া সে গাড়ির দরজা খুলিয়া নামিয়া আসিয়া সম্মুখের আসনে অজিতের পাশে গিয়া বসিল। জনপ্রাণীহীন অন্ধকার রাত্রি একান্ত নীরব। কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেহই কথা কহিল না।

অজিতবাবু!

হুঁ।

অজিতের বুকের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল, জবাব দিতে গিয়া কথা তাহার মুখে বাধিয়া রহিল।

কমল পুনরায় প্রশ্ন করিল, কি ভাবচেন বলুন না শুনি?

অজিতের গলা কাঁপিতে লাগিল, বলিল, সেদিন আশুবাবুর বাড়িতে আমার আচরণটা তোমার মনে পড়ে? সেদিন পর্যন্ত ভেবেছিলাম তোমার অতীতটাই বুঝি তোমার বড় অংশ, তার সঙ্গে আপস করব আমি কি করে? পিছনের ছায়াটাকেই সামনে বাড়িয়ে দিয়ে তোমার মুখ ফেলেছিলাম ঢেকে, সূর্যি যে ঘোরে এই কথাটাই গিয়েছিলাম ভুলে। কিন্তু—থাক। কিন্তু, আমি আজ কি ভাবচি তুমি বুঝতে পার না?

কমল বলিল, মেয়েমানুষ হয়ে এর পরেও বুঝতে পারব না আমি কি এতই নির্বোধ? পথ যখনি ভুলেচেন, আমি তখনই বুঝেচি।

অজিত ধীরে ধীরে তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, কমল, মনে হচ্চে আজ বুঝি আর নিজেকে আমি সামলাতে পারবো না।

কমল সরিয়া বসিল না। তাহার আচরণে বিস্ময় বা বিহ্বলতার লেশমাত্র নাই। সহজ শান্তকণ্ঠে কহিল, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই অজিতবাবু, এমনিই হয়। কিন্তু আপনি ত শুধু কেবল পুরুষমানুষই নয়, ন্যায়নিষ্ঠ ভদ্র পুরুষমানুষ। এর পরে ঘাড় থেকে আমাকে নামাবেন কি করে? ততখানি ছোট কাজ ত আপনি পেরে উঠবেন না।

অজিত গাঢ়কণ্ঠে কহিল, পারতেই হবে এ আশঙ্কা তুমি কেন করচ কমল?

কমল হাসিল, কহিল, আশঙ্কা আমার নিজের জন্যে করিনে অজিতবাবু, করি শুধু আপনার জন্যে। পারলে ভয় ছিল না, পারবেন না বলেই ভাবনা! শুধু একটা রাত্রির ভুলের বদলে এতবড় শাস্তি আপনার মাথায় চাপাতে আমার মায়া হয়। আর না, চলুন ফিরে যাই।

কথাগুলো অজিতের কানে গেল, কিন্তু অন্তরে পৌঁছিল না। চক্ষের পলকে তাহার শিরার রক্ত পাগল হইয়া গেল,—বক্ষের সন্নিকটে তাহাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া মত্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, আমাকে বিশ্বাস করতে কি তুমি পার না কমল?

মুহূর্তের তরে কমলের নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল পারি।

তবে কিসের জন্যে ফিরতে চাও কমল, চল আমরা চলে যাই।

চলুন।

গাড়ি চালাইতে গিয়া অজিত হঠাৎ থামিয়া কহিল, বাসা থেকে সঙ্গে নেবার কি তোমার কিছু নেই?

না। কিন্তু আপনার?

অজিত বিস্মিত হইয়া বলিল, গাড়ি বেচবো? কিন্তু এ ত আমার নয়, আশুবাবুর।

কমল কহিল, তাতে কি? আশুবাবু লজ্জায় ঘৃণায় গাড়ির নাম কখনও মুখে আনবেন না। কোন চিন্তা নেই,—চলুন।

শুনিয়া অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার বাঁ হাতখানা তখনও কমলের কাঁধের উপর ছিল, স্খলিত হইয়া নীচে পড়িল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, তুমি কি আমাকে উপহাস করচ?

না, সত্যিই বলচি।

সত্যিই বলচ এবং সত্যিই ভাবচ পরের জিনিস আমি চুরি করতে পারি? এ কাজ তুমি নিজে পার?

কমল বলিল, আমার পারা না-পারার ওপর যদি নির্ভর করতেন অজিতবাবু, তখন এর জবাব দিতাম। পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহস আপনার নেই। চলুন, গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবেন।

ফিরিবার পথে অজিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, পরের জিনিস আত্মসাৎ করার সাহসটা কি খুব বড় জিনিস বলে তোমার ধারণা?

কমল কহিল, বড়-ছোটর কথা বলিনি। এ সাহস আপনার নেই তাই শুধু বলেচি।

না নেই এবং সেজন্যে লজ্জা বোধ করিনে। এই বলিয়া অজিত একটু থামিয়া কহিল, বরঞ্চ থাকলেই লজ্জাবোধ করতাম। আর আমার বিশ্বাস, সমস্ত ভদ্রব্যক্তিই এই কথায় সায় দেবেন।

কমল কহিল, সায় দেওয়া সহজ। তাতে বাহবা পাওয়া যায়।

শুধুই বাহবা? তার বেশী নয়? শিক্ষিত ভদ্র-মন বলে কি কখনো কিছু দেখোনি?

যদি দেখেও থাকি, সে আলোচনা আর একদিন করব যদি সময় আসে, আজ নয়। এই বলিয়া সে একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার তর্কের উত্তরে আর কেউ হলে বিদ্রূপ করে বলত যে, কমলকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় ত ভদ্র-মনের সঙ্কোচে বাধেনি? আমি কিন্তু তা বলতে পারব না, কারণ, কমল কারও সম্পত্তি নয়। সে কেবল তার নিজেরই, আর কারও নয়।

কোনদিন বোধ করি হতেও পার না?

এ ত ভবিষ্যতের কথা অজিতবাবু, আজ কি করে এর জবাব দেব?

জবাব বোধ হয় কোনদিনই দিতে পারবে না। মনে হয়, এই জন্যেই শিবনাথের এতবড় নির্মমতাও তোমাকে বাজেনি। অত্যন্ত সহজেই সে তুমি ঝেড়ে ফেলে দিয়েচ। এই বলিয়া সে নিশ্বাস ফেলিল।

মোটরের আলোকে দেখা গেল কয়েকখানা গরুর গাড়ি। পাশেই বোধ হয় গ্রাম, কৃষকেরা যেমন-তেমনভাবে গাড়িগুলা রাস্তায় ফেলিয়া গরু লইয়া ঘরে গিয়াছে। অজিত সাবধানে এই স্থানটা পার হইয়া কহিল, কমল, তোমাকে বোঝা শক্ত।

কমল হাসিয়া কহিল, শক্ত কিসে? ঠিক ত বুঝেছিলেন পথ ভুললেই আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

হয়ত সে বোঝা আমার ভুল।

কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, পথ ভোলা ভুল, আমাকে ভোলাবার চেষ্টা ভুল, আবার নিজেরও ভুল? এত ভুলের বোঝা আপনার সংশোধন হবে কবে? অজিতবাবু, নিজেকে একটুখানি শ্রদ্ধা করতে শিখুন। অমন করে আপনার কাছে আপনাকে খাটো করবেন না।

কিন্তু নিজের ভুল অস্বীকার করলেই কি নিজেকে শ্রদ্ধা করা হয় কমল?

না, তা হয় না। কিন্তু অস্বীকার করারও রীতি আছে। সংসার ত কেবল আপনাকে নিয়েই নয়,—তা হলে ত সব গোলই চুকে যেত। এখানে আরো দশজনের বাস, তাদেরও ইচ্ছে অনিচ্ছে, তাদেরও কাজের ধারা গায়ে এসে লাগে। তাই, শেষ ফলাফল যদি নিজের মনোমত নাও হয়, তাকে ভুল বলে ধিক্কার দিতে থাকলে আপনাকেই অপমান করা হয়। নিজের প্রতি এর চেয়ে বড় অশ্রদ্ধা-প্রকাশ আর কি আছে বলুন ত?

অজিত ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেখানে সত্যকার ভুল হয়? শিবনাথের সম্পর্কেও কি তোমার আত্মানুশোচনা হয়নি কমল? এই কি আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে বল?

কমল এ প্রশ্নের বোধ হয় ঠিকমত উত্তর দিল না, কহিল, বিশ্বাস করা না-করার গরজ আপনার। কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কারও কাছে কোনদিন ত আমি নালিশ জানাই নি।

নালিশ জানাবার লোক তুমি নও। কিন্তু ভুলের জন্যে নিজের কাছেও কি কখনো নিজেকে ধিক্কার দাওনি?

না।

তা হলে এইটুকু মাত্র বলতে পারি, তুমি অদ্ভুত, তুমি অসাধারণ স্ত্রীলোক।

এ মন্তব্যের কোন জবাব কমল দিল না, নীরব হইয়া রহিল।

মিনিট-দশেক নিঃশব্দে কাটিবার পরে অজিত সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল, কমল, এমনি ভুল যদি আবার কালও করে বসি তখনো কি তোমার দেখা পাব?

কিন্তু, যদির উত্তর ত যদি দিয়েই হয় অজিতবাবু! অনিশ্চিত প্রস্তাবের নিশ্চিত মীমাংসা আশা করতে নেই।

অর্থাৎ এ মোহ আমার কাল পর্যন্ত টিকবে না এই তোমার বিশ্বাস?

অন্ততঃ, অসম্ভব নয় এই আমার মনে হয়।

অজিত মনে মনে আহত হইয়া বলিল, আমি আর যাই হই, কমল, শিবনাথ নই।

কমল উত্তর করিল, সে আমি জানি অজিতবাবু। আর হয়ত আপনার চেয়েও বেশী করে জানি।

অজিত কহিল, জানলে কখনো এ বিশ্বাস করতে না যে, আজ তোমাকে আমি মিথ্যে দিয়ে ভোলাতে চেয়েছিলাম ; এর মধ্যে সত্যি কিছুই ছিল না।

কমল কহিল, মিথ্যের কথা ত হয়নি অজিতবাবু, মোহের কথাই হয়েছিল। ও দুটো এক বস্তু নয়। আর মোহের বশে যদি কাউকে ভোলাতে চেয়ে থাকেন ত নিজেকেই চেয়েছেন। আমাকে বঞ্চনা করতে চাননি তা জানি।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বঞ্চিত ত তুমিই হতে কমল। আমার রাত্রের মোহ দিনের আলোতে কেটে যাবে এ নিশ্চয় বুঝেও ত সঙ্গে যেতে অসম্মত হওনি। একি শুধুই উপহাস?

কমল একটুখানি হাসিল, যাচাই করে দেখলেন না কেন? পথ খোলা ছিল, একবারও ত নিষেধ করিনি।

অজিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যদি না করে থাকো তবে এই কথাই বলব যে তোমাকে বোঝা বাস্তবিকই কঠিন। একটা কথা তোমাকে বলি কমল। নারীর ভালবাসায় যেমন হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে, তার রূপের মোহও বুদ্ধিকে তেমনি অচেতন করে। করুক, কিন্তু একটা যত বড় সত্য, আর একটা তত বড়ই মিথ্যে। তুমি ত জানতে এ আমার ভালবাসা নয়, এ শুধু আমার ক্ষণিকের মোহ। কি করে একে তুমি প্রশ্রয় দিতে উদ্যত হয়েছিলে? কমল, কুহেলিকা যত বড়

ঘটা করেই সূর্যালোক ঢেকে দিক তবু সে-ই মিথ্যে। সূর্যই ধ্রুব।

অন্ধকারে ক্ষণকাল কমল নির্নিমেষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে শান্তকণ্ঠে কহিল, ওটা কবির উপমা অজিতবাবু, যুক্তি নয়। সত্যও নয়। কোন্ আদিম কালে কুহেলিকার সৃষ্টি হয়েছিল, আজও সে তেমনি বিদ্যমান আছে। সূর্যকে সে বার বার আবৃত করেছে এবং বার বার আবৃত করবে। সূর্য ধ্রুব কিনা জানিনে, কিন্তু কুহেলিকাও মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়নি। ও দুটোই নশ্বর, হয়ত, ও দুটোই নিত্যকালের। তেমনি, হোক মোহ ক্ষণিকের, কিন্তু ক্ষণও ত মিথ্যে নয়! ক্ষণকালের আনন্দ নিয়েই সে বার বার ফিরে আসে। মালতীফুলের আয়ু সূর্যমুখীর মত দীর্ঘ নয় বলে তাকে মিথ্যে বলে কে উড়িয়ে দেবে? আজ একটা রাত্রির মোহকে প্রশ্রয় দিতে চেয়েছিলাম এই যদি আপনার অভিযোগ হয় অজিতবাবু, আয়ুষ্কালের দীর্ঘতাই কি জীবনে এতবড় সত্য?

কথাগুলা যে অজিত বুঝিতে পারিল না, তাহা বুঝিয়াই সে বলিতে লাগিল, আমার কথা আজও বোঝবার দিন আপনার আসেনি। তাই শিবনাথের প্রতি আপনাদের ক্রোধের অবধি নেই, কিন্তু আমি তাঁকে ক্ষমা করেছি। যা পেয়েচি তার বেশী কেন পাইনি, এ নিয়ে আমার এতটুকু নালিশ নেই।

অজিত বলিল, অর্থাৎ মনটাকে এমনিই নির্বিকার করে তুলেচ। আচ্ছা, সংসারে কারও বিরুদ্ধে কি তোমার কোন নালিশ নেই?

কমল তাহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, আছে শুধু একজনের বিরুদ্ধে।

কার বিরুদ্ধে শুনি না কমল?

কি হবে আপনার অপরের কথা শুনে?

অপরের কথা? যাই হোক, তবু ত নিশ্চিন্ত হতে পারব, অন্ততঃ, আমার ওপর তোমার রাগ নেই।

কমল কহিল, নিশ্চিন্ত হলেই কি খুশী হবেন? কিন্তু তার এখন আর সময় নেই, আমরা এসে পড়েচি, গাড়ি থামান, আমি নেবে যাই!

গাড়ি থামিল। অন্ধকারে রাস্তার ধারে কে একজন দাঁড়াইয়া ছিল, কাছে আসিতেই উভয়ে চমকিয়া উঠিল। অজিত সভয়ে প্রশ্ন করিল, কে?

আমি রাজেন। আজ হরেনদার আশ্রমে দেখেছেন।

ওঃ—রাজেন? এত রাত্রে এখানে কেন?

আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করে আছি। আপনারা চলে আসার পরেই আশুবাবুর বাড়ি থেকে লোক গিয়েছিল আপনাকে খুঁজতে। এই বলিয়া সে কমলের প্রতি চাহিল।

কমল কহিল, আমাকে খুঁজতে যাবার হেতু?

লোকটি কহিল, আপনি বোধ হয় শুনেচেন চারিদিকে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্চে এবং অনেক ক্ষেত্রেই মারা যাচ্চে। শিবনাথবাবু অতিশয় পীড়িত। হঠাৎ ডুলি করে তাঁকে আশুবাবুর বাড়িতে নিয়ে এসেছে। আশুবাবু ভেবেছিলেন আপনি আশ্রমে আছেন, তাই ডাকতে পাঠিয়েছিলেন।

রাত এখন কত?

বোধ হয় তিনটে বেজে গেছে।

কমল হাত বাড়াইয়া গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, ভিতরে আসুন, পথে আপনাদের আশ্রমে পৌঁছে দিয়ে যাব।

অজিত একটা কথাও কহিল না। কাঠের পুতুলের মত নিঃশব্দে গাড়ি চালাইয়া হরেন্দ্রের বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল। রাজেন অবতরণ করিলে কমল কহিল, আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে খবর দেবার জন্যে আজ আপনি অনেক দুঃখ ভোগ করলেন।

এ আমার কাজ। প্রয়োজন হলেই সংবাদ দেবেন। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। ভূমিকা নাই, আড়ম্বর নাই, সাদা কথায় জানাইয়া গেল—এ তাহার কর্তব্যের অন্তর্গত। আজই সন্ধ্যাকালে

হরেন্দ্রর মুখে এই ছেলেটির সম্বন্ধে যতকিছু সে শুনিয়াছিল সমস্তই মনে পড়িল। একদিকে তাহার একজামিন পাস করিবার অসাধারণ দক্ষতা, আর একদিকে সফলতার মুখে তাহা ত্যাগ করিবার অপরিসীম ঔদাসীন্য। বয়স তাহার অল্প, সবেমাত্র যৌবনে পা দিয়াছে, এই বয়সেই নিজের বলিয়া কিছুই হাতে রাখে নাই, পরের কাজে বিলাইয়া দিয়াছে।

অজিত সেই অবধি নীরব হইয়া ছিল। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেছে শোনার পরে কোনকিছুতে মন দেবার শক্তি আর তাহার ছিল না। শুধু একটা কাল্পনিক, অসংবদ্ধ প্রশ্নোত্তর মালার আঘাত-অভিঘাতের নীচে এই নিশীথ অভিযানের নিরবচ্ছিন্ন কুশ্রীতায় অন্তর তাহার কালো হইয়া রহিল। খুব সম্ভব, কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিবে না, হয়ত জিজ্ঞাসা করিবার ভরসাও কেহ পাইবে না, শুধু আপন আপন ইচ্ছা, অভিরুচি ও বিদ্বেষের তুলি দিয়া অজ্ঞাত ঘটনার আদ্যোপান্ত কাহিনী বর্ণে বর্ণে সৃজন করিয়া লইবে। আর ইহার চেয়েও বেশী ব্যাকুল করিয়াছিল তাহাকে এই লজ্জাহীনা মেয়েটার নির্ভয় সত্যবাদিতা। এ জগতে মিথ্যা বলার ইহার প্রয়োজন নাই। এ যেন পৃথিবীসুদ্ধ সকলকে শুধু অপমান করা।

এদিকে শিবনাথের পীড়ার উপলক্ষে কে এবং কাহারা উপস্থিত হইয়াছে সে জানে না। এই মেয়েটিকে তাঁহারা প্রশ্ন করিতেছেন মনে করিয়াও অজিতের গায়ের রক্ত শীতল হইয়া আসিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, কমলকে সে ঘৃণা করে এবং ইহারই লুব্ধ আশ্বাসে সে যে আত্মবিস্মৃত উন্মাদের ন্যায় মুহূর্তের জন্যও জ্ঞান হারাইয়াছে ইহার কঠিন শাস্তি যেন তাহার হয়, এই বলিয়া সে বার বার করিয়া আপনাকে আপনি অভিশাপ দিল।

গেটের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তাহার চোখে পড়িল সম্মুখের খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া আশুবাবু স্বয়ং। বোধ হয় তাহারই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। গাড়ির শব্দে নীচে চাহিয়া বলিলেন, অজিত এলে? সঙ্গে কে, কমল?

হ্যাঁ।

যদু, কমলকে শিবনাথের ঘরে নিয়ে যাও। শুনেচ বোধ হয় তাঁর অসুখ? বলিতে বলিতে তিনি নিজেই নামিয়া আসিলেন, কহিলেন, এই ঋতু-পরিবর্তনের কালটা এমনই বড় খারাপ, তাতে ব্যারাম-স্যারাম হঠাৎ যা শুরু হয়েছে, লোকে মারা পড়চেও বিস্তর। আমার নিজের দেহটাও সকাল থেকে ভাল নয়, যেন জ্বরভাব করে রেখেচে।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তবে আপনি কেন জেগে রয়েছেন? এখানে দেখবার লোকের ত অভাব নেই।

কে আর আছে বল? ডাক্তার এসে দেখে শুনে গেছেন, আমাকে শুতে পাঠিয়ে মণি নিজেই জেগে বসে আছে। কিন্তু ঘুমোতে পারলাম না। তোমার আসতে দেরি হতে লাগল—কমল, মানুষের রোগের সময়েও কি অভিমান রাখতে আছে? ঝগড়াঝাঁটি যে হয় না তা নয়, কিন্তু তিন-চারদিন কোথায় কোন্ বাসায় গিয়ে সে যে জ্বরে পড়েচে একটা খবর পর্যন্ত ত নাওনি? ছি, এ কাজ ভাল হয়নি, এখন একলা তোমাকেই ত ভুগতে হবে।

শুনিয়া কমল বিস্মিত হইল, কিন্তু বুঝিল, এই সরল-চিত্ত ব্যক্তিটি ভিতরের কোন কথাই জানেন না। সে চুপ করিয়া রহিল। আশুবাবু তাহার অভিমান শান্ত করিবার বাসনায় বলিতে লাগিলেন, হরেনবাবুর মুখে শুনলাম তুমি বাড়ি নেই, তখনই বুঝেচি অজিত তোমাকে ছাড়েনি। নিজে সে ভয়ানক ঘুরতে ভালবাসে, তোমাকেও ধরে নিয়ে গেছে। কিন্তু ভাবো ত অন্ধকারে হঠাৎ একটা দুর্ঘটনা হলে তোমরা কি বিপদেই পড়তে!

অজিতের বুকের উপর হইতে যেন পাষাণ নামিয়া গেল। কোন-কিছুর মন্দ দিকটা যেন এই মানুষটির মধ্যে ঢুকিতেই চায় না, নিষ্কলুষ অন্তর অনুক্ষণ অকলঙ্ক শুভ্রতায় ধপধপ করিতেছে। স্নেহ ও শ্রদ্ধায় সে মনে মনে তাঁহাকে নমস্কার করিল। কিন্তু, কমল তাঁহার সকল কথায় কান দেয় নাই, হয়ত প্রয়োজনও বোধ করে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, উনি হাসপাতালে না গিয়ে এখানে এলেন কেন?

আশুবাবু, আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, হাসপাতাল? তবেই ত তোমার রাগ এখনো পড়েনি।

রাগের জন্যে বলচি নে আশুবাবু, যেটা সঙ্গত এবং স্বাভাবিক তাই শুধু বলচি।

ওটা স্বাভাবিক নয়, সঙ্গত ত নয়ই। তবে, এটা স্বীকার করি, এখানে না এনে তোমার কাছে পাঠানোই মণির উচিত ছিল।

কমল কহিল, না উচিত ছিল না। মণি জানতেন চিকিৎসা করাবার সাধ্য নেই আমার।

এই কথায় তাঁহার আর একটা কথা মনে পড়ায় তিনি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলেন। কমল বলিতে লাগিল কেবল মনোরমাই নয় শিবনাথবাবু নিজেও জানতেন শুধু সেবা দিয়েই রোগ সারে না, ওষুধ পথ্যেরও প্রয়োজন। হয়ত এ ভালই হয়েছে যে খবর আমার কাছে না পৌঁছে মণির কাছে পৌঁচেছে। তাঁর পরমায়ুর জোর আছে।

আশুবাবু লজ্জায় ম্লান হইয়া মাথা নাড়িয়া বার বার করিয়া বলিতে লাগিলেন, এ কথাই নয় কমল,—সেবাই সব। যত্নই সবচেয়ে বড় ওষুধ। নইলে ডাক্তার-বদ্যি উপলক্ষমাত্র। তাঁহার পরলোকগত পত্নীকে মনে পড়ায় বলিলেন, আমি যে ভুক্তভোগী কমল, রোগে ভুগে ভুগে সে শিক্ষা হয়ে গেছে। ঘরে চল, তোমার জিনিস তুমি যা ভাল বুঝবে তাই হবে। আমি থাকতে ওষুধ-পথ্যির ত্রুটি হবে না। এই বলিয়া তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিলেন। অজিত কি করিবে না বুঝিয়াও তাঁহাদের সঙ্গ লইল। রোগীর গৃহ পাছে গোলমালে বিশ্রামের বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কায় পা টিপিয়া নিঃশব্দে সকলে প্রবেশ করিলেন। শয্যার পার্শ্বে চৌকিতে বসিয়া মনোরমা রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে, রোগীর বুকের পরে অবসন্ন মাথাটি রাখিয়া বোধ করি এইমাত্র ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তাহার গ্রীবার পরে পরস্পর সন্নদ্ধ দুই হাত ন্যস্ত রাখিয়া শিবনাথও সুপ্ত। স্বপ্নাতীত এই দৃশ্যের সম্মুখে অকস্মাৎ পিতার দুই চক্ষু ব্যাপিয়া যেন ঘনান্ধকারের জাল নামিয়া আসিল, কিন্তু মুহূর্তকাল মাত্র। মুহূর্ত পরেই তিনি ছুটিয়া পলাইলেন। অজিত ও কমল চোখ তুলিয়া উভয়ে উভয়ের মুখের প্রতি চাহিল, তাহার পরে যেমন আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ষোল

যাতায়াতের পথের পাশেই একটা ঢাকা বারান্দা, রোগীর গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া অজিত ও কমল সেইখানে থামিল। একটা খর্বাকৃতি ঘষা-কাঁচের লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, তাহার অস্পষ্ট আলোকেও স্পষ্ট দেখা গেল অজিতের মুখ ফ্যাকাশে। আচম্বিতে ধাক্কা লাগিয়া সমস্ত রক্ত যেন সরিয়া গেছে। সেখানে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ নাই, তথাপি সে অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলার উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি এখন বাসায় ফিরে যেতে চান? চাইলে আমি তার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। অজিত বলিল, এ বাড়িতে আর ত আপনার এক মুহূর্ত থাকা চলে না।

আপনার থাকা চলে?

না, আমারও না। কাল সকালেই আমি অন্যত্র চলে যাব।

কমল কহিল, সেই ভাল, আমিও তখনই যাব। আপাততঃ, এই চেয়ারটায় বসে বাকী রাতটুকু কাটাই, আপনি বিশ্রাম করুন গে।

সেই ক্ষুদ্রায়তন চৌকিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অজিত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু—

কমল বলিল, কিন্তুতে কাজ নেই অজিতবাবু, ওর অনেক ঝঞ্ঝাট। এখন বাসায় যাওয়াও সম্ভব নয়, আপনার ঘরে গিয়ে ওঠাও সম্ভব নয়। আপনি যান, দেরি করবেন না।

সকালে বেহারা আসিয়া অজিতকে আশুবাবুর শয়নকক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেল। তিনি শয্যা ছাড়িয়া তখনও উঠেন নাই, অদূরে চৌকিতে বসিয়া কমল,—ইতিপূর্বেই তাহাকে ডাকাইয়া আনা হইয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, শরীরটা কাল থেকেই ভাল ছিল না, আজ মনে হচ্ছে যেন,—আচ্ছা, বস অজিত।

সে উপবেশন করিলে কহিলেন, শুনলাম আজ সকালেই তুমি চলে যাবে, তোমাকে থাকতে বলতেও পারিনে, বেশ, গুড্‌বাই। আর কখনো যদি দেখা না হয়, নিশ্চয় জেনো, তোমাকে সর্বান্তঃকরণে আমি আশীর্বাদ করেচি,—যেন, আমাদের ক্ষমা করে তুমি জীবনে সুখী হতে পার।

অজিত তাঁহার মুখের প্রতি তখনও চাহিয়া দেখে নাই, এখন জবাব দিতে গিয়া নির্বাক হইয়া গেল। নির্বাক বলিলে ঠিক বলা হয় না, সে যেন অকস্মাৎ কথা ভুলিয়া গেল। একটা রাত্রির কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময়ে কাহারও এত বড় পরিবর্তন সে কল্পনা করিতেও পারিল না।

আশুবাবু নিজেও মিনিট দুই-তিন মৌন থাকিয়া এবার কমলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তোমাকে ডেকে আনিয়েছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে চোখোচোখি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। সারারাত্রি মনের মধ্যে যে কি করেচে, কত-কি যে ভেবেচি, সে আমি কাকে জানাব?

একটু থামিয়া কহিলেন, অক্ষয় একদিন বলেছিলেন, শিবনাথ নাকি তোমার ওখানে প্রায়ই থাকেন না। কথাটায় কান দিইনি, ভেবেছিলাম, এ তাঁর অত্যুক্তি, তাঁর বিদ্বেষের আতিশয্য। তুমি টাকার অভাবে কষ্টে পড়েছিলে, তখন তার হেতু বুঝিনি, কিন্তু আজ সমস্তই পরিষ্কার হয়ে গেছে,—কোথাও কোন সন্দেহ নেই।

উভয়েই নীরব হইয়া রহিল; তিনি বলিতে লাগিলেন, তোমার প্রতি অনেক ব্যবহারই আমি ভাল করতে পারিনি, কিন্তু সেই প্রথম পরিচয়ের দিনটিতেই তোমাকে ভালবেসেছিলাম, কমল। আজ তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছে, আগ্রায় যদি আমরা না আসতাম। বলিতে বলিতে চোখের কোণে তাঁহার একফোঁটা জল আসিয়া পড়িল, হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া শুধু কহিলেন, জগদীশ্বর!

কমল উঠিয়া আসিয়া তাঁহার শিয়রে বসিল, কপালে হাত দিয়া বলিল, আপনার যে জ্বর হয়েছে আশুবাবু।

আশুবাবু তাহার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, তা হোক। কমল, আমি জানি তুমি অতি বুদ্ধিমতী, আমার কিছু একটা তুমি উপায় করে দাও। আমার বাড়িতে ঐ লোকটার অস্তিত্ব যেন আমার সর্বাঙ্গে আগুন জ্বেলে দিয়েচে।

কমল চাহিয়া দেখিল, অজিত অধোমুখে বসিয়া আছে। তাহার কাছে কোন ইঙ্গিত না পাইয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আমাকে আপনি কি করতে বলেন, বলুন। কিন্তু জবাব না পাইয়া সে নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া রহিল; পরে কহিল, শিবনাথবাবুকে আপনি রাখতে চান না, কিন্তু তিনি পীড়িত। এ অবস্থায় হয় তাঁকে হাসপাতালে পাঠান, নয় তাঁর নিজের বাসাটা যদি জানেন পাঠাতে পারেন। আর যদি মনে করেন আমার ওখানে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়, তাও দিতে পারেন। আমার আপত্তি নেই, কিন্তু জানেন ত, চিকিৎসা করাবার শক্তি নেই আমার; আমি প্রাণপণে শুধু সেবা করিতেই পারি, তার বেশী পারিনে।

আশুবাবু কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, কমল, কেন জানিনে, কিন্তু এমনি উত্তরই ঠিক তোমার কাছে আশা করেছিলাম। পাষণ্ডের জবাব দিতে গিয়ে যে তুমি নিজে পাষাণ হতে পারবে না এ আমি জানতাম। তোমার জিনিস তুমি ঘরে নিয়ে যাও, চিকিৎসার খরচের জন্যে ভয় করো না, সে ভার আমি নিলাম।

কমল কহিল, কিন্তু এই ব্যাপারে একটা কথা সকলের আগে পরিষ্কার হওয়া দরকার।

আশুবাবু তাড়াতাড়ি কহিয়া উঠিলেন, তোমার বলবার দরকার নেই কমল, সে আমি জানি। একদিন সমস্ত আবর্জনা দূর হয়ে যাবে। তোমার কোন চিন্তা নেই, আমি বেঁচে থাকতে এতবড় অন্যায় অত্যাচার তোমার ওপরে ঘটতে দেব না।

কমল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্থির হইয়া রহিল, কথা কহিল না।

কি ভাবচ কমল?

ভাবছিলাম আপনাকে বলবার প্রয়োজন আছে কি না। কিন্তু মনে হচ্চে প্রয়োজন আছে, নইলে পরিষ্কার কিছুই হবে না, বরঞ্চ ময়লা বেড়ে যাবে। আপনার টাকা আছে, হৃদয় আছে, পরের

জন্যে খরচ করা আপনার কঠিন নয়, কিন্তু আমাকে দয়া করবেন এ ভুল যদি আপনার থাকে সেটা দূর হওয়া চাই। কোন ছলেই আপনার ভিক্ষে আমি গ্রহণ করব না।

আশুবাবুর সেই সেলাইয়ের কলের ব্যাপারটা মনে পড়িল, ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ভুল যদি একটা করেই থাকি কমল, তার কি ক্ষমা নেই?

কমল কহিল, ভুল হয়ত তখন তত করেন নি, যেমন এখন করতে যাচ্চেন। ভাবচেন শিবনাথবাবুকে বাঁচানোটা প্রকারান্তরে আমাকেই বাঁচানো,—আমাকেই অনুগ্রহ করা। কিন্তু তা নয়। এর পরে আপনি যেমন ইচ্ছে ব্যবস্থা করুন আমার আপত্তি নেই।

আশুবাবু মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, এমনি রাগই হয় বটে কমল ; এ তোমার অস্বাভাবিকও নয়, অন্যায়ও নয়। বেশ, আমি শিবনাথকেই বাঁচাতে যাচ্চি, তোমাকে অনুগ্রহ করচি নে। এ হলে হবে ত?

কমলের মুখে বিরক্তি প্রকাশ পাইল। কহিল, না, হবে না। আপনাকে যখন আমি বোঝাতে পারব না তখন আমার উপায় নেই। ওঁকে হাসপাতালে পাঠাতে না চান, হরেন্দ্রবাবুর আশ্রমে পাঠিয়ে দিন। তাঁরা অনেকের সেবা করেন, এঁরও করবেন। আপনার যা খরচ করবার তা সেখানেই করবেন। আমি নিজেও বড় ক্লান্ত, এখন উঠি। এই বলিয়া সে যথার্থই উঠিবার উপক্রম করিল।

তাহার কথায় ও আচরণে আশুবাবু মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন, বলিলেন, এ তোমার বাড়াবাড়ি কমল। উভয়ের কল্যাণের জন্যে যা করতে যাচ্চি তাকে তুমি অকারণে বিকৃত করে দেখচ। একদিক দিয়ে যে আমার লজ্জার অবধি নেই এবং ও কদাচার অঙ্কুরে বিনাশ না করলে যে আমার গ্লানির সীমা থাকবে না সে আমি জানি, কিন্তু আমার কন্যা সংশ্লিষ্ট বলেই যে আমি কোনমতে একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্চি তাও সত্য নয়। শিবনাথকে আমি নানামতেই বাঁচাতে পারি, কিন্তু কেবল সেটুকুই আমি চাইনি। যাতে দুঃখের দিনে তোমার অন্তরের সেবা দিয়ে তাঁকে তেমনি করেই আবার ফিরে পাও, সেই কামনা করেই আমি এ প্রস্তাব করেচি, নিছক স্বার্থপরতাবশেই করিনি।

কথাগুলি সত্য, সকরুণ এবং আন্তরিকতায় পূর্ণ। কিন্তু কমলের মনের উপর দাগ পড়িল না। সে প্রত্যুত্তরে কহিল, ঠিক এই কথাই আপনাকে আমি বোঝাতে চাচ্ছিলাম আশুবাবু। সেবা করতে আমি অসম্মত নই, চা-বাগানে থাকতে অনেকের অনেক সেবা করেচি, এ আমার অভ্যাস আছে। কিন্তু ফিরে পেতে ওঁকে আমি চাইনে। সেবা করেও না, সেবা না করেও না। এ আমার অভিমানের জ্বালা নয়, মিথ্যে দর্প করাও নয়,—সম্বন্ধ আমাদের ছিঁড়ে গেছে, তাকে জোড়া দিতে আমি পারব না।

তাহার বলার মধ্যে উষ্মাও নাই, উচ্ছ্বাসও নাই, নিতান্তই সাদাসিধা কথা। ইহাই আশুবাবুকে এখন স্তব্ধ করিয়া দিল। মুহূর্ত পরে কহিলেন একি কথা কমল? এই সামান্য কারণে স্বামী ত্যাগ করতে চাও? এ শিক্ষা তোমাকে কে দিলে?

কমল নীরব হইয়া রহিল। আশুবাবু বলিতে লাগিলেন, ছেলেবেলায় এ শিক্ষা তোমাকে যেই কেননা দিয়ে থাক, সে ভুল শিক্ষা দিয়েছে। এ অন্যায়, এ অসঙ্গত, এ গভীর অপরাধের কথা। যে গৃহেই তুমি জন্মে থাকো তুমি বাঙলাদেশেরই মেয়ে, এ পথ তোমার আমার নয়,—এ তোমাকে ভুলতেই হবে। জান কমল, এক দেশের ধর্ম আর এক দেশের অধর্ম। আর স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চক্ষু দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং, কথা শেষ করিয়া যেন তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইল সে লেশমাত্র বিচলিত হইল না।

আশুবাবু কহিতে লাগিলেন, এই মোহই একদিন আমাদের রসাতলের পানে টেনে নিয়ে চলেছিল। কিন্তু ভ্রান্তি ধরা পড়ে গেল জন-কয়েক মনীষীর চক্ষে। দেশের লোককে ডেকে তাঁরা বার বার শুধু এই কথাই বলতে লাগলেন, তোমরা উন্মাদের মত চলেছ কোথায়? তোমাদের কোন দৈন্য, কোন অভাব নেই, কারও কাছে তোমাদের হাত পাততে হবে না, কেবল ঘরের

পানে একবার ফিরে চাও। পূর্বপিতামহরা সবই রেখে গেছেন, শুধু একবার হাত বাড়িয়ে তুলে নাও। বিলেতের সমস্তই ত স্বচক্ষে দেখে এসেচি, এখন ভাবি, সময়ে সে সতর্কবাণী যদি না তাঁরা উচ্চারণ করে যেতেন, আজ দেশের কি হত! ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে ত—উঃ—শিক্ষিত লোকদের সে কি দশা! এই বলিয়া তিনি স্বর্গগত মনীষিগণের উদ্দেশে যুক্ত করে নমস্কার করিলেন।

কমল মুখ তুলিয়া দেখিল অজিত মুগ্ধচক্ষে তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে। কল্পনার আবেশে যেন তাহার সংজ্ঞা নাই,—এমনি অবস্থা।

আশুবাবুর ভাবাবেগ তখনও প্রশমিত হয় নাই, কহিলেন, কমল, আর কিছুই যদি তাঁরা না করে যেতেন, শুধু কেবল এইজন্যেই দেশের লোকের কাছে তাঁরা চিরদিন প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকতেন।

শুধু কেবল এইজন্যেই তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়?

হাঁ, শুধু কেবল এইজন্যেই। বাইরে থেকে ঘরের পানে তাঁরা চোখ ফেরাতে বলেছিলেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, বাইরে যদি আলো জ্বলে, যদি পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয় হয়, তবুও পিছন ফিরে পশ্চিমের স্বদেশের পানেই চেয়ে থাকতে হবে? সেই হবে দেশপ্রীতি?

কিন্তু এ প্রশ্ন বোধ করি আশুবাবুর কানে গেল না, তিনি নিজের ঝোঁকে বলিতে লাগিলেন, আজ দেশের ধর্ম, দেশের পুরাণ-ইতিহাস, দেশের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি যা বিদেশের চাপে লোপ পেতে বসেছিল, তার প্রতি যে বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ফিরে এসেছে এ ত শুধু তাঁদেরই ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির ফল। জাতি হিসেবে আমরা যে ধ্বংসের রাস্তায় চলেছিলাম কমল, এ বাঁচা কি সোজা বাঁচা? আবার সমস্ত ফিরিয়ে আনতে না পারলে আমরা যে কোনমতেই রক্ষা পাব না, এ বোধশক্তি আমাদের দিলে কে বল ত?

অজিত উত্তেজনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, এ-সব চিন্তাও যে আপনার মনে স্থান পেতে পারে এ কখনো কল্পনাও করিনি। আমার ভারী দুঃখ যে এতকাল আপনাকে চিনতে পারিনি, আপনার পায়ের নীচে বসে উপদেশ গ্রহণ করিনি। সে আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বাধা পড়িল। বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল যে, হরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি দেখা করিতে আসিয়াছেন, এবং পরক্ষণেই তিনি সতীশ ও রাজেন্দ্রকে লইয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, খবর নিয়ে জানলাম শিবনাথবাবু ঘুমোচ্চেন। আসবার সময় ডাক্তারের বাড়িটা অমনি ঘুরে এলাম ; তাঁর বিশ্বাস অসুখ সিরিয়স নয়, শীঘ্রই সেরে উঠবেন। এই বলিয়া তিনি কমলকে একটা নমস্কার করিয়া সঙ্গীদের লইয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

আশুবাবু ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি ছিল অজিতের প্রতি। এবং তাহারই উদ্দেশে বলিলেন, আমার সমস্ত যৌবনকালটা যে বিদেশেই কেটেছে এ তোমরা ভোল কেন? এমন অনেক বস্তু আছে যা কাছে থেকে দেখা যায় না, যায় শুধু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে। আমি যে স্পষ্ট দেখতে পেয়েচি শিক্ষিত মনের পরিবর্তন। এই যে হরেন্দ্রর আশ্রম, এই যে নগরে নগরে এর ডাল-পালা ছড়াবার আয়োজন, এ কি শুধু এইজন্যেই নয়? বিশ্বাস না হয় ওঁকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ। সেই ব্রহ্মচর্য, সেই সংযম-সাধনা, সেই পুরানো রীতি-নীতির প্রবর্তন—এ সবই কি আমাদের সেই অতীত দিনটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যম নয়? তাই যদি ভুলি, তারই প্রতি যদি আস্থা হারাই, আশা করবার আর আমাদের বাকী থাকে কি? তপোবনের যে আদর্শ কেবল আমাদেরই ছিল, পৃথিবী খুঁজলেও কি আর কোথাও এর জোড়া মিলবে অজিত? আমাদের সমাজকে যাঁরা একদিন গড়েছিলেন, আমাদের সেই প্রাচীন শাস্ত্রকর্তারা ব্যবসায়ী ছিলেন না, ছিলেন সন্ন্যাসী ; তাঁদের দান নিঃসংশয়ে, নতশিরে নিতে পারাই হল আমাদের চরম সার্থকতা ; এই আমাদের কল্যাণের পথ, কমল, এ ছাড়া আর পথ নাই।

অজিত স্তব্ধ হইয়া রহিল, সতীশ ও হরেন্দ্রর বিস্ময়ের পরিসীমা নাই,—এই সাহেবী চাল-চলনের মানুষটি আজ বলে কি! এবং রাজেন্দ্র ভাবিয়া পাইল না, অকস্মাৎ কিসের জন্য আজ

এই প্রসঙ্গের অবতারণা। সকলের মুখের পরেই একটি অকপট শ্রদ্ধার ভাব নিবিড় হইয়া উঠিল।

বক্তার নিজের বিস্ময়ও কম ছিল না। শুধু বলিবার শক্তির জন্যই নয়, এমন করিয়া কাহাকেও বলিবার সুযোগও তিনি কখনও পান নাই,—তাঁহার মনের মধ্যে অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তির হিল্লোল বহিতে লাগিল। ক্ষণকালের জন্য ক্ষণকাল পূর্বের দুঃখ যেন ভুলিয়া গেলেন। কহিলেন, বুঝলে কমল, কেন তোমাকে এ অনুরোধ করেছিলাম?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

না? না কেন?

কমল কহিল, বিদেশী শিক্ষার প্রভাব কাটিয়ে আবার সাবেক ব্যবস্থায় ফিরে যাবার চেষ্টা শিক্ষিতদের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছে, এই খবরটাই আপনি পরমানন্দে শোনাচ্ছিলেন। আপনার বিশ্বাস এতে দেশের কল্যাণ হবে, কিন্তু কারণ কিছুই দেখান নি। অনেক প্রাচীন রীতি-নীতি লোপ পেতে বসেছিল, তাদের পুনরুদ্ধারের যত্ন চলেচে। এ হয়ত সত্যি, কিন্তু তাতে ভালই যে হবে তার প্রমাণ কি আশুবাবু? কৈ, সে ত বলেন নি?

বলিনি কি রকম?

না, বলেন নি। যা বলছিলেন তা সংস্কার-বিরোধী পুরাতনের অন্ধ স্তাবকমাত্রেই ঠিক এমনি করে বলে। লুপ্ত বস্তুর পুনরুদ্ধারমাত্রই যে ভাল তার প্রমাণ নেই। মোহের ঘোরে মন্দ বস্তুরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা সংসারে ঘটতে দেখা যায়।

আশুবাবু উত্তর খুঁজিয়া পাইলেন না, কিন্তু অজিত কহিল, মন্দকে উদ্ধার করবার জন্যে কেউ শক্তি ক্ষয় করে না।

কমল কহিল, করে। মন্দ বলে নয়, পুরাতনমাত্রকেই স্বতঃসিদ্ধ ভাল মনে করে করে। একটা কথা আপনাকে প্রথমেই বলতে চেয়েছিলাম আশুবাবু, কিন্তু আপনি কান দেননি। লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানই হোক বা পারলৌকিক ধর্ম-কর্মই হোক, কেবলমাত্র দেশের বলেই আঁকড়ে থাকায় স্বদেশ-প্রীতির বাহবা পাওয়া যায়, কিন্তু স্বদেশের কল্যাণের দেবতাকে খুশী করা যায় না। তিনি ক্ষুণ্ণ হন।

আশুবাবু অবাক হইয়া শুধু কহিলেন, তুমি কি বল কমল? দেশের ধর্ম, দেশের আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করে বাইরে থেকে ভিক্ষে নিতে থাকলে নিজের বলতে আর বাকী থাকবে কি? জগতে মানুষ বলে দাবী জানাতে যাব কোন্ পরিচয়ে?

কমল কহিল, দাবী আপনি এসে ঘরে পৌঁছবে, পরিচয়ের প্রয়োজন হবে না। বিশ্বজগৎ বিনা পরিচয়েই চিনতে পারবে।

আশুবাবু ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, তোমাকে ত বুঝতে পারলাম না কমল!

বোঝবার কথাও নয় আশুবাবু। এমনিই হয়। এই চলমান সংসারে গতিশীল মানবচিত্তে পদে পদে যে সত্য নিত্য-নতুনরূপে দেখা দেয়, সবাই তাকে চিনতে পারে না। ভাবে এ কোন্ আপদ কোথা থেকে এল। সেদিন তাজমহলের ছায়ার নীচে শিবানীকে মনে পড়ে? আজ কমলের মাঝখানে তাকে আর চিনতে পারাও যাবে না। মনে হবে সে যাকে দেখেছিলাম কোথায় গেল সে! কিন্তু এই মানুষের সত্য পরিচয়,—এমনিভাবেই লোকের কাছে যেন চিরদিন পরিচিত হতে পারি আশুবাবু।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু তর্ক-বিতর্কের ঝড়ো হাওয়ায় আমাদের খেই হারিয়ে গেল,—আসল ব্যাপার থেকে সবাই সরে গেছি। আমি কিন্তু অত্যন্ত ক্লান্ত, এখন উঠি।

আশুবাবু নিরুত্তরে বিহ্বলের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। এই মেয়েটিকে কোথাও তিনি অস্পষ্ট বুঝিলেন, কোথাও বা একেবারেই বুঝিলেন না। শুধু ইহাই মনে হইতে লাগিল, এইমাত্র সে যে ঝোড়ো-হাওয়ার উল্লেখ করিয়াছিল, সেই প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা-মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় তাঁহার সর্বপ্রকার আবেদন-নিবেদন ভাসিয়া গেছে।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। অজিতকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিল, সঙ্গে করে এনেছিলেন,

চলুন না পৌঁছে দেবেন।

কিন্তু আজ সে সঙ্কোচে যেন মুখ তুলিতেই পারিল না। কমল মনে মনে একটু হাসিয়া আগাইয়া আসিয়া সহসা রাজেন্দ্রের কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া বলিল, রাজেনবাবু তুমি চল না ভাই আমাকে রেখে আসবে।

এই আকস্মিক আত্মীয় সম্বোধনে রাজেন বিস্মিত হইয়া একবার তাহার প্রতি চাহিল, তাহার পরে কহিল, চলুন।

দ্বারের কাছে আসিয়া কমল হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আশুবাবু, আমার প্রস্তাব কিন্তু প্রত্যাহার করিনি। ঐ শর্তে ইচ্ছা হয় পাঠিয়ে দেবেন, আমি যথাসাধ্য করে দেখব। বাঁচেন ভালই, না বাঁচেন অদৃষ্ট। এই বলিয়া চলিয়া গেল। ঘরের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া সকলে বসিয়া রহিলেন,—অসুস্থ গৃহস্বামীর চোখের সম্মুখে প্রভাতের আলোটা পর্যন্ত বিবর্ণ ও বিস্বাদ হইয়া উঠিল।

অর্ধেক পথে রাজেন্দ্র বিদায় হইল, বলিয়া গেল ঘণ্টা-কয়েকের মধ্যেই সে কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিবে। কমল অন্যমনস্কতাবশতঃই বোধ করি আপত্তি করিল না, কিংবা হয়ত আর কোন কারণ ছিল। দ্রুতপদে বাসায় আসিয়া দেখিল সিঁড়ির দরজায় তখনো তালা বন্ধ, ঘর খোলা হয় নাই। যে নীচ-জাতীয়া দাসীটি তাহার কাজ-কর্ম করিয়া দিত সে আসে নাই। পথের ওধারে মুদীর দোকানে সন্ধান করিয়া জানিল দাসী পীড়িত, তাহার ছোট নাতনী সকালে আসিয়া ঘরের চাবি রাখিয়া গেছে। ঘর খুলিয়া কমল গৃহকর্মে নিযুক্ত হইল। এক রকম কাল হইতেই সে অভুক্ত ; স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাড়াতাড়ি কোনমতে কিছু রাঁধিয়া খাইয়া লইয়া বিশ্রাম করিবে, বিশ্রামের তাহার একান্ত প্রয়োজন ; কিন্তু আজ ঘরের কাজ আর তাহার কিছুতেই সারা হয় না। চারিদিকে এত যে আবর্জনা জমা হইয়াছিল, এতদিন এমনি বিশৃঙ্খলার মাঝে যে তাহার দিন কাটিতেছিল, সে লক্ষ্যও করে নাই। আজ যাহাতে চোখ পড়িল সে-ই যেন তাহাকে তিরস্কার করিল—ছাদের পুরানো চুনবালি আসিয়া খাটের খাঁজে খাঁজে জমিয়াছে—মুক্ত করা চাই ; চড়াই পাখির বাসা তৈরির অতিরিক্ত মাল-মসলা বিছানায় পড়িয়াছে, চাদর বদলানো প্রয়োজন ; বালিশের অড় অত্যন্ত মলিন, খুলিয়া ফেলা দরকার ; চেয়ার টেবিল স্থানভ্রষ্ট দরজার পাপোশটায় কাদা জমাট বাঁধিয়াছে, আয়নাটার এমনি অবস্থা যে পঙ্কোদ্ধার করিতে একটা বেলা লাগিবে ; দোয়াতের কালি শুকাইয়াছে, কলমগুলা খুঁজিয়া পাওয়া দায়, প্যাডের ব্লটিং কাগজগুলার চিহ্নমাত্র নাই—এমনিধারা যেদিকে চাহিয়া দেখিল অপরিচ্ছন্নতার আতিশয্যে তাহার নিজেরই মনে হইল এতকাল এখানে যেন মানুষ বাস করে নাই। নাওয়া-খাওয়া পড়িয়া রহিল, কোথা দিয়া যে বেলা কাটিল ঠাহর রহিল না। সমস্ত শেষ করিয়া গায়ের ধূলামাটি পরিষ্কার করিতে যখন সে নীচে হইতে স্নান করিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। এতদিন সে নিশ্চয় জানিত এখানে সে থাকিবে না। থাকা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। মাসের পর মাস বাসার ভাড়া যোগাইবেই বা কোথা হইতে? যাইতেই হইবে, শুধু যাওয়ার দিনটারই যেন সে কেমন করিয়া নাগাল পাইতেছিল না,—রাত্রির পর প্রভাত ও প্রভাতের পর রাত্রি আসিয়া তাহাকে পা বাড়াইবার সময় দিতেছিল না।

গৃহের প্রতি মমতা নাই, অথচ আজ কিসের জন্য যে এতটা খাটিয়া মরিল, অকস্মাৎ কি ইহার প্রয়োজন হইল, এমনি একটা ঘোলাটে জিজ্ঞাসায় মনের মধ্যে যখনই আবর্ত উঠিতেছিল, কাজ ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া সে শূন্যচক্ষে রাস্তায় চাহিয়া কি যেন ভুলিবার চেষ্টা করিয়া আবার গিয়া কাজে লাগিতেছিল। এমনি করিয়াই আজ তাহার কাজ এবং বেলা দুই-ই শেষ হইয়াছে। কিন্তু বেলা ত রোজই শেষ হয়, শুধু এমনি করিয়াই হইতে পায় না। সন্ধ্যার পর সে আলো জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিল এবং কেবল সময় কাটাইবার জন্যই একখানা বই লইয়া বিছানায় ঠেস দিয়া পাতা উলটাইতে বসিল। কিন্তু শ্রান্তির আজ আর তাহার অবধি ছিল না—কখন বইয়ের এবং চোখের পাতা দুই-ই বুজিয়া আসিল সে টের পাইল না। যখন টের পাইল তখন ঘরে দীপের

আলো নিবিয়াছে এবং খোলা জানালার ভিতর দিয়া বাহিরের অরুণালোকে সমস্ত গৃহ আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বেলা হইল, কিন্তু দাসী আসিল না। অতএব বাসাটা খোঁজ করিয়া তাহার অসুখের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন, এই মনে করিয়া কমল কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া বাহির হইতেছিল, এমনি সময়ে নীচের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পাইয়া তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল।

ডাক আসিল, ঘরে আছেন? আসতে পারি?

আসুন।

যিনি প্রবেশ করিলেন তিনি হরেন্দ্র। চৌকি টানিয়া উপবেশন করিয়া বলিলেন, কোথাও বেরুচ্ছিলেন নাকি?

হাঁ। যে বুড়ো স্ত্রীলোকটি আমার কাজ করে তার অসুখের খবর পেয়েচি। তাকেই দেখতে যাচ্ছিলাম।

বেশ খবর। ও ইনফ্লুয়েঞ্জা ছাড়া কিছু নয়। আগ্রাতেও এপিডেমিক ফর্মেই বোধ করি শুরু হল। বস্তিগুলোতে মরতেও আরম্ভ করেছে। মথুরা-বৃন্দাবনের মত শুরু হলে হয় পালাতে হবে, না হয় মরতে হবে। এ বুড়ী থাকে কোথায়?

ঠিক জানিনে। শুনেচি কাছাকাছি কোথায় থাকে, খোঁজ করে নিতে হবে।

হরেন্দ্র কহিল, বড্ড ছোঁয়াচে, একটু সাবধান হবেন। এদিকের খবর পেয়েছেন বোধ হয়?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভয় পাবেন না, ভয় পাবার মত কিছু নয়। কাল আসতাম, কিন্তু সময় করে উঠতে পারিনি। আমাদের অক্ষয়বাবু কলেজে আসেন নি, শুনলাম তাঁর শরীর খারাপ, আশুবাবু বিছানা নিয়েছেন সে ত কাল দেখেই এসেছেন—ওদিকে অবিনাশদার কাল বিকেল থেকে জ্বর, বৌদির মুখটিও দেখলাম শুকনো-শুকনো। তিনি নিজে না পড়লে বাঁচি।

কমল চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। এ-সকল খবরে সে যেন ভাল করিয়া মন দিতেই পারিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এ-ছাড়া শিবনাথবাবু। ইনফ্লুয়েঞ্জার ব্যাপার—বলা কিছু যায় না। অথচ হাসপাতালে যেতেও চাইলেন না। কাল বিকেলে তাঁর নিজের বাসাতেই তাঁকে রিমুভ করা হল। আজ খবরটা একবার নিতে হবে।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে আছে কে?

একটা চাকর আছে। উপরের ঘরগুলোতে জন-কয়েক পাঞ্জাবী আছে,—ঠিকেদারি করে। শুনলাম তারা লোক ভাল।

কমল নিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, রাজেনবাবুকে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিতে পারেন?

পারি, কিন্তু তাকে পাব কোথায়? আজ ভোর থাকতেই বেরিয়ে পড়েছে। ঐদিকের কোন্ একটা মুচীদের মহল্লায় নাকি জোর ব্যারাম চলেছে, সে গেছে সেবা করতে। আশ্রমে খেতে যদি আসে ত খবর দেব।

তাঁকে রিমুভ করলে কে? আপনি?

না, রাজেন। তার মুখেই জানতে পারলাম পাঞ্জাবীরা যত্ন নিচ্চে। তবে, তারা যাই করুক, ও যখন ঠিকানা পেয়েচে তখন সহজে ত্রুটি হতে দেবে না,—হয়ত নিজেই লেগে যাবে। একটা ভরসা—ওকে রোগে ধরে না। পুলিশে না ধরলে ও একাই এক শ'। ভায়া ওদের কাছেই শুধু জব্দ, নইলে ওকে কাবু করে দুনিয়ায় এমন ত কিছু দেখলাম না।

ধরার আশঙ্কা আছে নাকি?

আশা ত করি। অন্ততঃ আশ্রমটা তা হলে বাঁচে।

ওঁকে চলে যেতে বলে দেন না কেন?

ঐটি শক্ত। বললে এমনি চলে যাবে যে মাথা খুঁড়লেও আর ফিরবে না।

না ফিরলেই বা ক্ষতি কি?

ক্ষতি? ওকে ত জানেন না, না জানলে সে ক্ষতির পরিমাণ বোঝা যায় না। আশ্রম না থাকে, সেও সইবে, কিন্তু ও-ক্ষতি আমার সইবে না। এই বলিয়া হরেন্দ্র মিনিট-খানেক চুপ করিয়া প্রসঙ্গটা হঠাৎ বদলাইয়া দিল। কহিল, একটা মজার কাণ্ড ঘটেছে। কারও সাধ্য নেই সে কল্পনাও করে। কাল সেজদার ওখান থেকে অনেক রাত্রে ফিরে গিয়ে দেখি অজিতবাবু উপস্থিত। ভয় পেয়ে গেলাম, ব্যাপার কি? অসুখ বাড়ল নাকি? না, সে-সব কিছু নয়, বাক্স-বিছানা নিয়ে তিনি এসেছেন আশ্রমবাসী হতে। ইতিমধ্যে সতীশের সঙ্গে কথা পাকা হয়ে গেছে,—আশ্রমের নিয়মে আশ্রমের কাজে জীবন কাটাবেন—এই তাঁর পণ, এর আর নড়চড় নেই। বড়লোক পেলে আমাদের ভালই হয়, কিন্তু শঙ্কা হল ভেতরে কি একটা গোলযোগ আছে। সকালে আশুবাবুর কাছে গেলাম, তিনি শুনে বললেন, সঙ্কল্প অতিশয় সাধু, কিন্তু ভারতে আশ্রমের ত অভাব নেই, সে আগ্রা ছাড়া আর কোথাও গিয়ে এ বৃত্তি অবলম্বন করলে আমি দিন-কতক টিকতে পারতাম। আমাকে দেখচি তল্পি বাঁধতে হল।

কমল কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিল, তাঁর ওখান থেকেই এখানে আসচি। ভাবচি ফিরে গিয়ে অজিতবাবুকে বলব কি?

কমল বুঝিল শিবনাথকে স্থানান্তরিত করার উপলক্ষে অনেক কঠিন বাদ-প্রতিবাদ হইয়া গেছে। হয়ত প্রকাশ্যে এবং স্পষ্ট করিয়া একটা কথাও উচ্চারিত হয় নাই, সমস্তই নিঃশব্দে ঘটিয়াছে, তথাপি কর্কশতায় সে যে সর্বপ্রকার কলহকে ছাপাইয়া গেছে ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। কিন্তু একটা কথারও সে উত্তর করিল না, তেমনিই নীরবে বসিয়া রহিল।

হরেন্দ্র কহিতে লাগিল, মনে হয় আশুবাবু সমস্তই শুনেছেন। শিবনাথের আপনার প্রতি আচরণে তিনি মর্মাহত। একরকম জোর করেই তাকে বাড়ি থেকে বিদায় করেছেন। মনোরমার বোধ হয় এ ইচ্ছা ছিল না, শিবনাথ তাঁর গানের গুরু, কাছে রেখে চিকিৎসা করবার সঙ্কল্পই ছিল, কিন্তু সে হতে পেলে না। অজিতবাবু বোধ হয় এ-পক্ষ অবলম্বন করেই ঝগড়া করে ফেলেছেন।

কমল একটুখানি হাসিল, কহিল, আশ্চর্য নয়। কিন্তু শুনলেন কার কাছে? রাজেন্দ্র বললে?

সে? সে পাত্রই ও নয়। জানলেও বলবে না। এ আমার অনুমান। তাই ভাবচি, মিটমাট ত হবেই, মাঝে থেকে অজিতকে চটিয়ে লাভ কি? চুপচাপ থাকাই ভাল। যতদিন সে আশ্রমে থাকে যত্নের ত্রুটি হবে না।

কমল কহিল, সেই ভাল।

হরেন্দ্র কহিল, কিন্তু এখন উঠি। সেজদার জন্যেই ভাবনা, ভারী অল্পে কাতর হন। সময় পাই ত কাল একবার আসব।

আসবেন। কমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল, কহিল, রাজেন্দ্রকে পাঠাতে ভুলবেন না। বলবেন, বড্ড দায়ে পড়ে তাঁকে ডেকেচি।

দায়ে পড়ে ডাকচেন? হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, দেখা পেলে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে বলা যায় না? আমাকেও আপনার অকৃত্রিম বন্ধু বলেই জানবেন।

তা জানি। কিন্তু তাঁকেই পাঠিয়ে দেবেন।

দেব, নিশ্চয় দেব, এই বলিয়া হরেন্দ্র আর কথা না বাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপরাহ্নবেলায় রাজেন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজেন, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।

তা দেব। কিন্তু কাল নামের সঙ্গে একটুখানি 'বাবু' ছিল, আজ তাও খসল?

বেশ ত হালকা হয়ে গেল। না চাও ত বল জুড়ে দিই।

না, কাজ নেই। কিন্তু আপনাকে আমি কি বলে ডাকবো?

সবাই ডাকে কমল বলে, তাতে আমার সম্মানের হানি হয় না। নামের আগে-পিছে ভার বেঁধে নিজেকে ভারী করে তুলতে আমার লজ্জা করে। আপনি বলবারও দরকার নেই, আমাকে আমার সহজ নাম ধরে ডেকো।

ইহার স্পষ্ট জবাবটা রাজেন এড়াইয়া গিয়া কহিল, কি আমাকে করতে হবে?

আমার বন্ধু হতে হবে। লোকে বলে তুমি বিপ্লবপন্থী, তা যদি সত্যি হয় আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব তোমার অক্ষয় হবে।

এই অক্ষয়-বন্ধুত্ব আমার কি কাজে লাগবে?

কমল বিস্মিত হইল, ব্যথিত হইল। একটা সংশয় ও উপেক্ষার সুস্পষ্ট সুর তাহার কানে বাজিল কহিল, অমন কথা বলতে নেই। বন্ধুত্ব বস্তুটা সংসারে দুর্লভ, আর আমার বন্ধুত্ব তার চেয়েও দুর্লভ। যাকে চেনো না তাকে অশ্রদ্ধা করে নিজেকে খাটো করো না।

কিন্তু এ অনুযোগ লোকটিকে কুণ্ঠিত করিল না, সে স্মিতমুখে সহজভাবেই বলিল, অশ্রদ্ধার জন্যে নয়,—বন্ধুত্বের প্রয়োজন বুঝিনে, তাই শুধু জানিয়েছিলাম। আর যদি মনে করেন এ বস্তু আমার কাজে লাগবে, আমি অস্বীকার করব না। কিন্তু কি কাজে লাগবে তাই ভাবছি।

কমলের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কে যেন তাহাকে চাবুকের বাড়ি মারিয়া অপমান করিল। সে অতি শিক্ষিতা, অতি সুন্দরী, ও প্রখর বুদ্ধিশালিনী। সে পুরুষের কামনার ধন, এই ছিল তাহার ধারণা ; তাহার দৃপ্ত তেজ অপরাজেয়, ইহাই ছিল অকপট বিশ্বাস। সংসারে নারী তাহাকে ঘৃণা করিয়াছে, পুরুষে আতঙ্কে আগুন জ্বালিয়া দগ্ধ করিতে চাহিয়াছে, অবহেলার ভান করে নাই তাহাও নয়, কিন্তু এ সে নয়। আজ এই লোকটির কাছে যেন সে তুচ্ছতায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। শিবনাথ তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া দীনতার চীরবস্ত্র তাহার অঙ্গে জড়াইয়া দেয় নাই।

কমলের একটা সন্দেহ প্রবল হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আমার সম্বন্ধে তুমি বোধ হয় অনেক কথাই শুনেচ?

রাজেন বলিল, ওঁরা প্রায়ই বলেন বটে।

কি বলেন?

সে একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দেখুন, এ-সব ব্যাপারে আমার স্মরণশক্তি বড় খারাপ, কিছুই প্রায় মনে নেই।

সত্যি বলচ?

সত্যিই বলচি।

কমল জেরা করল না, বিশ্বাস করিল। বুঝিল স্ত্রীলোকের জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে এই মানুষটির আজও কোন কৌতূহল জাগে নাই। সে যেমন শুনিয়াছে তেমনি ভুলিয়াছে। আরও একটা জিনিস বুঝিল। 'তুমি' বলিবার অধিকার দেওয়া সত্ত্বেও কেন সে গ্রহণ করে নাই, 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছে। তাহার অকলঙ্ক পুরুষ-চিত্ততলে আজিও নারীমূর্তির ছায়া পড়ে নাই,—'তুমি' বলিয়া ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার লুব্ধতা তাহার অপরিজ্ঞাত। কমল মনে মনে যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে কহিল, শিবনাথবাবু আমাকে পরিত্যাগ করেছেন জান?

জানি।

কমল কহিল, সেদিন আমাদের বিয়ের অনুষ্ঠানে ফাঁকি ছিল, কিন্তু মনের মধ্যে ফাঁক ছিল না। সবাই সন্দেহ করে নানা কথা কইলে, বললে, এ বিবাহ পাকা হল না। আমার কিন্তু ভয় হল না ; বললাম, হোক গে কাঁচা, আমাদের মন যখন মেনে নিয়েছে তখন বাইরের গ্রন্থিতে ক' পাক পড়ল আমার দেখবার দরকার নেই। বরঞ্চ, ভাবলাম এ ভালই হল যে স্বামী বলে যাকে নিলাম তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিনি। তাঁর মুক্তির আগল যদি একটু আলগাই থাকে ত থাক না।

মনই যদি দেউলে হয়, পুরুতের মন্ত্রকে মহাজন খাড়া করে সুদটা আদায় হতে পারে, কিন্তু আসল ত ডুবল। কিন্তু এ-সব তোমাকে বলা বৃথা, তুমি বুঝবে না।

রাজেন চুপ করিয়া রহিল। কমল কহিল, তখন এই কথাটাই শুধু জানিনি যে, তাঁর টাকার লোভটা এত ছিল! জানলে অন্ততঃ লাঞ্ছনার দায় এড়াতে পারতাম।

রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এর মানে?

কমল সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া লইল, বলিল, থাক্ গে মানে। এ তোমার শুনে কাজ নেই।

কিছুক্ষণ সূর্য অস্ত গিয়াছে, ঘরের মধ্যে বাহিরে সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিল। কমল আলো জ্বালিয়া টেবিলের একধারে রাখিয়া দিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, তা হোক, আমাকে ওঁর বাসায় একবার নিয়ে চল।

কি করবেন গিয়ে?

নিজের চোখে একবার দেখতে চাই। যদি প্রয়োজন হয় থাকব। না হয়, তোমার ওপরে তাঁর ভার রেখে আমি নিশ্চিন্ত হব। এইজন্যই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তুমি ছাড়া এ আর কেউ পারবে না। তাঁর প্রতি লোকের বিতৃষ্ণার সীমা নেই। বলিতে বলিতে সে সহসা বাতিটা বাড়াইয়া দিবার জন্য উঠিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

রাজেন কহিল, বেশ, চলুন। আমি একটা গাড়ি ডেকে আনি গে। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া রাজেন্দ্র বলিল, শিবনাথবাবুর সেবার ভার আমাকে অর্পণ করে আপনি নিশ্চিন্ত হতে চান, আমিও নিতে পারতাম। কিন্তু, এখানে আমার থাকা চলবে না শীঘ্রই চলে যেতে হবে। আপনি আর কোন ব্যবস্থার চেষ্টা করুন।

কমল উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে বোধ করি পিছনে লেগে অতিষ্ঠ করেছে?

তাদের আত্মীয়তা আমার অভ্যাস আছে—সেজন্যে নয়।

কমল হরেন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, তবে আশ্রমের এঁরা বুঝি তোমাকে চলে যেতে বলচেন? কিন্তু পুলিশের ভয়ে যারা এমন আতঙ্কিত, ঘটা করে তাঁদের দেশের কাজে না নামাই উচিত। কিন্তু, তাই বলে তোমাকে চলে যেতেই বা হবে কেন? এই আগ্রা শহরেই এমন লোক আছে যে স্থান দিতে এতটুকু ভয় পাবে না।

রাজেন্দ্র কহিল, সে বোধ করি আপনি স্বয়ং। কথাটা শুনে রাখলাম, সহজে ভুলব না। কিন্তু এ দৌরাত্ম্যে ভয় পায় না ভারতবর্ষে তেমন লোকের সংখ্যা বিরল। থাকলে দেশের সমস্যা ঢের সহজ হয়ে যেত।

একটুখানি থামিয়া বলিল, কিন্তু আমার যাওয়া সেজন্যে নয়। আশ্রমকেও দোষ দিতে পারিনে। আর যারই হোক, আমাকে যাও বলা হরেনদার মুখে আসবে না।

তবে যাবে কেন?

যাব নিজেরই জন্যে। দেশের কাজ বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার মতেও মেলে না, কাজের ধারাতেও মেলে না। মেলে শুধু ভালবাসা দিয়ে। হরেনদার আমি সহোদরের চেয়ে প্রিয়, তার চেয়েও আত্মীয়, কোনকালে এর ব্যতিক্রম হবে না।

কমলের দুর্ভাবনা গেল। কহিল, এর চেয়ে আর বড় কি আছে রাজেন? মন যেখানে মিলেচে, থাক না সেখানে মতের অমিল, হোক না কাজের ধারা বিভিন্ন ; কি যায় আসে তাতে? সবাই একই রকম ভাববে, একই রকম কাজ করবে, তবেই একসঙ্গে বাস করা চলবে এ কেন? আর পরের মতকে যদি শ্রদ্ধা করতেই না পারা গেল ত সে কিসের শিক্ষা? মত এবং কর্ম দুই-ই বাইরের জিনিস রাজেন, মনটাই সত্য। অথচ, এদেরই বড় করে যদি তুমি দূরে চলে যাও, তোমাদের যে ভালবাসার ব্যতিক্রম নেই বলছিলে তাকেই অস্বীকার করা হয়। সেই যে কেতাবে লেখে ছায়ার জন্য কায়া ত্যাগ, এ ঠিক তাই হবে।

রাজেন্দ্র কথা কহিল না, শুধু হাসিল।

হাসলে যে?

হাসলাম তখন হাসিনি বলে। আপনার নিজের বিবাহের ব্যাপারে মনের মিলটাকেই একমাত্র সত্য স্থির করে বাহ্যিক অনুষ্ঠানের গরমিলটাকে কিছু না বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেটা সত্য নয় বলেই আজ আপনাদের সমস্ত অসত্য হয়ে গেল।

তার মানে?

রাজেন্দ্র বলিল, মনের মিলনটাকে আমি তুচ্ছ করিনে, কিন্তু ওকেই অদ্বিতীয় বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করাটাও হয়েচে আজকালকার একটা উচ্চাঙ্গের পদ্ধতি। এতে ঔদার্য এবং মহত্ত্ব দুই-ই প্রকাশ পায়, কিন্তু সত্য প্রকাশ পায় না। সংসারে যেন শুধু কেবল মনটাই আছে, আর তার বাইরে সব মায়া, সব ছায়াবাজি! এটা ভুল।

একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনি বিভিন্ন মতবাদকে শ্রদ্ধা করতে পারাটাকেই মস্তবড় শিক্ষা বলছিলেন, কিন্তু সর্বপ্রকার মতকেই শ্রদ্ধা করতে পারে কে জানেন? যার নিজের কোন মতের বালাই নেই। শিক্ষার দ্বারা বিরুদ্ধ-মতকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায়, কিন্তু শ্রদ্ধা করা যায় না।

কমল অতি বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল। রাজেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমাদের সে নীতি নয়, মিথ্যে শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা সংসারের সর্বনাশ করিনে,—বন্ধুর হলেও না—তাকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিই। এই আমাদের কাজ।

কমল কহিল, একেই তোমরা কাজ বল?

রাজেন্দ্র কহিল, বলি। কি হবে আমার মনের মিল নিয়ে মতের অমিলের বাধা যদি আমার কর্মকে প্রতিহত করে? আমরা চাই মতের ঐক্য, কাজের ঐক্য—ও ভাববিলাসের মূল্য আমাদের কাছে নেই। শিবানী—

কমল আশ্চর্য হইয়া কহিল, আমার এ নামটাও তুমি শুনেচ?

শুনেচি। কর্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক, অন্তরের বিচার অন্তর্যামী করুন, আমাদের ব্যবহারিক ঐক্য নইলে চলে না। ওই আমাদের কষ্টিপাথর—ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কৈ, দুজনের মনে মিল দিয়ে ত সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না, বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে। সে শুধু কোলাহল। রাজার যে সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তাদের বাইরের ঐক্যটাই রাজার শক্তি, হৃদয় নিয়ে তাঁর গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম,—এই আমাদের নীতি। একে খাটো করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগানো হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর।

গাড়োয়ান রোকো রোকো,—শিবানী, এই তাঁর বাসা।

সম্মুখে জীর্ণ প্রাচীন গৃহ। উভয়ে নিঃশব্দে নামিয়া আসিয়া নীচের একটা ঘরে প্রবেশ করিল। পদশব্দে শিবনাথ চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু দীপের স্বল্পালোকে বোধ হয় চিনিতে পারিল না। মুহূর্ত পরেই চোখ বুজিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সতের

চারিদিকে চাহিয়া কমল স্তব্ধ হইয়া রহিল। ঘরের একি চেহারা। এখানে যে মানুষের বাস করিয়া আছে সহজে যেন প্রত্যয় হয় না। লোকের সাড়া পাইয়া সতেরো-আঠারো বছরের একটি হিন্দুস্থানী ছোকরা আসিয়া দাঁড়াইল; রাজেন্দ্র তাহার পরিচয় দিয়া কহিল, এইটি শিবনাথবাবুর চাকর। পথ্য তৈরি করা থেকে ওষুধ খাওয়ানো পর্যন্ত এরই ডিউটি। সূর্যাস্ত হতেই বোধ করি ঘুমুতে শুরু করেছিল, এখন উঠে আসচে। রোগীর সম্বন্ধে কোন উপদেশ দেবার থাকে ত একেই দিন, বুঝতে পারবে বলেই মনে হয়। নেহাত বোকা নয়। নামটা কাল জেনে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভুলে গেছি। কি নাম রে?

ফগুয়া।

আজ ওষুধ খাইয়েছিলি?

ছেলেটা বাঁ হাতের দুটা আঙুল দেখাইয়া কহিল, দো খোরাক খিলায়া।

আউর কুছ খিলায়া?

হ,—দুধ ভি পিলায়া।

বহুত আচ্ছা কিয়া। ওপরের পাঞ্জাবীবাবুরা কেউ এসেছিল?

ছেলেটা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, শায়েদ দো পহরমে একঠো বাবু আয়া রহা।

শায়েদ? তখন তুমি কি করছিলে বাবা, ঘুমুচ্ছিলে?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, ফগুয়া, তোর এখানে ঝাড়টাড়ু কিছু আছে?

ফগুয়া ঘাড় নাড়িয়া ঝাঁটা আনিতে গেল, রাজেন্দ্র কহিল, ঝাঁটা কি করবেন? ওকে পিট্‌বেন নাকি?

কমল গম্ভীর হইয়া কহিল, এ কি তামাশার সময়? মায়া-মমতা কি তোমার শরীরে কিছু নেই?

আগে ছিল। ফ্লাড্ আর ফ্যামিন রিলিফে সেগুলো বিসর্জন দিয়ে এসেচি।

ফগুয়া ঝাঁটা আনিয়া হাজির করিল। রাজেন্দ্র বলিল, আমি ক্ষিদের জ্বালায় মরি, কোথাও থেকে দুটো খেয়ে আসি গে। ততক্ষণ ঝাঁটা আর এই ছেলেটাকে নিয়ে যা পারেন করুন, ফিরে এসে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাব। ভয় পাবেন না, আমি ঘণ্টা-দুয়ের মধ্যেই ফিরবো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাহির হইয়া গেল।

শহরের প্রান্তস্থিত এই স্থানটা অল্পকাল মধ্যে নিঃশব্দ ও নির্জন হইয়া উঠিল। যাহারা উপরে বাস করে তাহাদের কলরব ও চলাচলের পায়ের শব্দ থামিল। বুঝা গেল তাহারা শয্যাশ্রয় করিয়াছে। শিবনাথের সংবাদ লইতে কেহ আসিল না। বাহিরে অন্ধকার রাত্রি গভীর হইয়া আসিতেছে, মেঝেয় কম্বল পাতিয়া ফগুয়া ঝিমাইতেছে, সদর দরজা বন্ধ করিবার সময় হইয়া আসিল, এমনি সময়ে রাস্তায় সাইকেলের ঘণ্টা শুনা গেল এবং পরক্ষণেই দ্বার ঠেলিয়া রাজেন্দ্র প্রবেশ করিল। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া এই অল্পকাল মধ্যে গৃহের সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে, হাতের ছোট পুঁটুলিটা পাশের টিপায়ের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, অন্যান্য মেয়েদের মত আপনাকে যা ভেবেছিলাম তা নয়। আপনার পরে নির্ভর করা যায়।

কমল নিঃশব্দে ফিরিয়া চাহিল। রাজেন্দ্র কহিল, ইতিমধ্যে দেখচি, বিছানাটা পর্যন্ত বদলে ফেলেচেন। খুঁজে পেতে না হয় বার করলেন, কিন্তু ওঁকে তুলে শোয়ালেন কি করে?

কমল আস্তে আস্তে বলিল, জানলে শক্ত নয়।

কিন্তু জানলেন কি করে? জানার ত কথা নয়।

কমল বলিল, জানার কথা কি কেবল তোমাদেরই? ছেলেবেলায় চা-বাগানে আমি অনেক রুগীর সেবা করেচি।

তাই ত বলি! এই বলিয়া সে আর একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, আসবার সময় সঙ্গে করে সামান্য কিছু খাবার এনেচি। কুঁজোয় জল আছে দেখে গিয়েছিলাম। খেয়ে নিন, আমি বসচি।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া একটু হাসিল, কহিল, খাবার কথা ত তোমাকে বলিনি, হঠাৎ এ খেয়াল হল কেন?

রাজেন্দ্র বলিল, খেয়াল হঠাৎই হল সত্যি। নিজের যখন পেট ভরে গেল, তখন কি জানি কেন মনে হল আপনারও হয়ত ক্ষিদে পেয়ে থাকবে। আসবার পথে দোকান থেকে কিছু কিনে নিয়ে এলাম। দেরি করবেন না, বসে যান। এই বলিয়া সে নিজে গিয়া জলের কুঁজাটা তুলিয়া আনিল। কাছে কলাই-করা একটা গ্লাস ছিল, কহিল, সবুর করুন, বাইরে থেকে এটা মেজে আনি। এই বলিয়া সেটা হাতে করিয়া চলিয়া গেল। এ বাড়ির কোথায় কি আছে সে কালই জানিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া সন্ধান করিয়া একটুকরা সাবান বাহির করিল, কহিল, অনেক ঘাঁটাঘাঁটি

করেছেন, একটু সাবধান হওয়া ভাল। আমি জল ঢেলে দিচ্চি, খাবার আগে হাতটা ধুয়ে ফেলুন।

কমলের পিতার কথা মনে পড়িল। তাঁহারও এমনি কথার মধ্যে বিশেষ রস-কস ছিল না, কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। কহিল, হাত ধুতে আপত্তি নেই, কিন্তু খেতে পারব না ভাই। তুমি হয়ত জান না যে, আমি নিজে রেঁধে খাই, আর এই-সব দামী, ভাল ভাল খাবারও খাইনে। আমার জন্যে ব্যস্ত হবার আবশ্যক নেই, অন্যান্য দিন যেমন হয়, তেমনি বাসায় ফিরে গিয়েই খাব।

তা হলে আর রাত না করে বাসাতেই ফিরে চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসিগে।

তুমি এখানেই আবার ফিরে আসবে?

আসব।

কতক্ষণ থাকবে?

অন্ততঃ কাল সকাল পর্যন্ত। ওপরের পাঞ্জাবীদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেছি, একটা মোকাবিলা না করে নড়ব না। একটু ক্লান্ত, তা হোক। এতটা অযত্ন হবে ভাবিনি। উঠুন, এদিকে গাড়ি পাওয়া যাবে না, হাঁটতে হবে। ফেরবার পথে মুচীদের বস্তিটা একবার ঘুরে আসা দরকার। দু'ব্যাটার মরবার কথা ছিল, দেখি তারা কি করলে?

কমলের আবার সেই কথাই মনে পড়িল, এ-লোকটার অনুভূতি বলিয়া কোন বালাই নেই। অনেকটা যন্ত্রের মত। কি একটা অজ্ঞাত প্রেরণা ইহাকে বারংবার কর্মে নিযুক্ত করে—কর্ম করিয়া যায়। নিজের জন্য নয়, হয়ত কোন-কিছু আশা করিয়াও নয়। কাজ ইহার রক্তের মধ্যে সমস্ত দেহের মধ্যে জলবায়ুর মতই যেন সহজ হইয়া আছে। অথচ, অন্যের বিস্ময়ের অবধি থাকে না, ভাবে, কেমন করিয়া এমন হয়। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা রাজেন, তুমি নিজেও ত ডাক্তার?

ডাক্তার? না। ওদের ডাক্তারি-স্কুলে সামান্য কিছুদিন শিক্ষানবীশ করেছিলাম।

তা হলে ওদের দেখচে কে?

যম।

তবে তুমি কর কি?

আমি করি তাঁর তদবির। তাঁর গুণমুগ্ধ পরম ভক্ত আমি। এই বলিয়া সে কমলের বিস্ময়-অভিভূত মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া একটু হাসিল, কহিল, যম নয়, তিনি যমরাজ। বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি রাজা বলে এঁকে প্রথমে অভিবাদন করেছিলেন। রাজাই বটে। যেমন দয়া, তেমনি সুবিবেচনা। বিশ্ব-ভুবনে সৃষ্টিকর্তা যদি কেউ থাকে, এ তাঁর সেরা সৃষ্টি আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

কমল আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পরিহাস করচ রাজেন?

একেবারে না। শুনে সতীশদা মুখ গম্ভীর করে, হরেনদা রাগ করে বলেন আমাকে সিনিক্, তাঁদের আশ্রমে সকলে মিলে তাঁরা কৃচ্ছ্রতা, সংযম, ত্যাগ ও নানাবিধ অদ্ভুত কঠোরতর অস্ত্রশস্ত্র শানিয়ে যমরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। অতএব, মনে করেন আমি তাঁদের উপহাস করি। কিন্তু তা করিনে। দুঃখীদের পল্লীতে তাঁরা যান না, গেলে আমার ধারণা—আমারই মত পরম রাজভক্ত হয়ে উঠতেন। শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে মৃত্যুরাজার গুণগান করতেন এবং অকল্যাণ মনে করে তাঁকে গাল দিয়ে আর বেড়াতেন না।

কমল কহিল, এই যদি তোমার সত্যিকার মত হয় তোমাকে সিনিক্ বলাটা কি দোষের?

দোষের বিচার পরে হবে। যাবেন একবার আমার সঙ্গে মুচীদের পাড়ায়? গড়াগড়া পড়ে আছে,—আজকের ইনফ্লুয়েঞ্জা বলেই শুধু নয়—কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যে-কোন একটা উপলক্ষ তাদের জুটলেই হল। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই, শোবার বিছানা নেই, চাপা দেবার কাপড় নেই, মুখে জল দেবার লোক নেই,—দেখে হঠাৎ ঘাবড়ে যেতে হয় এর কিনারা আছে কোথায়? তখনি কূল দেখতে পাই, চিন্তা দূর হয়, মনে মনে বলি ভয় নেই, ওরে ভয় নেই,—সমস্যা যতই গুরুতর হোক, সমাধান করবার ভার যাঁর হাতে তিনি এলেন বলে। অন্যান্য দেশের অন্যান্য ব্যবস্থা, কিন্তু আমাদের এ দেব-ভূমির সমস্ত ভার নিয়েছেন একেবারে রাজার রাজা স্বয়ং। এক হিসেবে আমরা

চের বেশী সৌভাগ্যবান। কিন্তু কোথা থেকে কি-সব কথা এসে পড়ল। চলুন, রাত হয়ে যাচ্ছে। অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।

কিন্তু তোমাকে ত আবার এই পথটা হেঁটেই ফিরতে হবে?

তা হবে।

তোমার মুচীদের পাড়া কত দূরে?

কাছেই। অর্থাৎ এখান থেকে মাইল-খানেকের মধ্যে।

তা হলে তোমার পা-গাড়ি করে ঘুরে এসো গে,—আমি বসচি।

রাজেন বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, সে কি কথা! আপনার যে দুদিন খাওয়া হয়নি।

কে দিলে তোমাকে এ খবর?

ওই যে খেয়ালের কথা হচ্ছিল, তাই। কিন্তু খবরটা আমি নিজেই সংগ্রহ করেচি। আসবার সময়ে আপনার রান্নাঘরটা একবার উঁকি মেরে এসেছিলাম, রান্না ভাত মজুদ, পাত্রটির চেহারা দেখলে সন্দেহ থাকে না যে সে গত রাত্রির ব্যাপার। অর্থাৎ দিন-দুই চলেচে নিছক উপবাস। অতএব, হয় চলুন, না হয় যা এনেচি আহার করুন। আজ স্বপাকের অজুহাত অবৈধ।

অবৈধ? কমল একটু হাসিয়া কহিল,—কিন্তু আমার জন্যে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

তা জানিনে। কারণ নিজেই অনুসন্ধান করচি, সংবাদ পেলে আপনাকে জানাব।

কমল কিছুক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল, তাহার পরে কহিল, জানিয়ো, লজ্জা করো না। পুনরায় কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, রাজেন, তোমার আশ্রমের দাদারা তোমাকে অল্পই চিনেছেন, তাই তাঁরা তোমাকে উপদ্রব মনে করেন। কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। সুতরাং আমাকেও চিনে রাখা তোমার দরকার। অথচ, তার জন্যে সময় চাই, সে পরিচয় কথা-কাটাকাটি করে হবে না। একটুখানি স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল, আমি নিজে রেঁধে খাই, একবেলা খাই, অতিদরিদ্রের যা আহার,—সেই একমুঠো ভাত-ডাল। কিন্তু এ আমার ব্রত নয়, তাই ভঙ্গ করতেও পারি। কিন্তু দিন-দুই খাইনি বলেই নিয়ম লঙ্ঘন আমি করব না। তোমার স্নেহটুকু আমি ভুলব না, কিন্তু কথা রাখতেও তোমার পারব না রাজেন। তাই বলে রাগ করো না যেন।

না।

কি ভাবচ বল ত?

ভাবচি, পরিচয়-পত্রের ভূমিকা অংশটুকু মন্দ হল না। আমি দেখচি, সহজে ভুলতে পারব না।

সহজে ভুলতেই বা আমি তোমাকে দেবো কেন? এই বলিয়া কমল হঠাৎ হাসিয়া ফেলিল। কহিল, কিন্তু আর দেরি করো না, যাও। যত শীঘ্র পার ফিরে এস। ঐ বড় আরাম-চৌকিটায় একটা কম্বল পেতে রাখব—দু'চার ঘণ্টা ঘুমোবার পরে যখন সকাল হবে, তখন আমরা বাসায় চলে যাব, কেমন?

রাজেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। ভেবেছিলাম রাত্রিটা বোধ হয় আমাকে আজও জেগে কাটাতে হবে। কিন্তু ছুটি মঞ্জুর হয়ে গেল, স্বামীর শুশ্রূষার ভার নিজের হাতেই নিলেন। ভালই। ফিরতে বোধ করি আমার দেরি হবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

কমল বলিল, না। কিন্তু, এই লোকটি যে আমার স্বামী এ খবর তোমাকে দিলে কে? এখানকার ভদ্রলোকেরা বোধ করি? যে-ই দিয়ে থাক, সে তামাশা করেছে। বিশ্বাস না হয়, একদিন এঁকে জিজ্ঞেসা করলেই খবর পাবে।

রাজেন্দ্র কোন কথা কহিল না। নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

শিবনাথ ঠিক যেন এই জন্যই অপেক্ষা করিয়া ছিল। পাশ ফিরিয়া চোখ মেলিয়া চাহিল, জিজ্ঞাসা করিল, এই লোকটি কে?

শুনিয়া কমল চমকিত হইল। কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, জড়তার চিহ্নমাত্র নাই। চোখের চাহনিতে তখনো অল্প একটুখানি ঘোর আছে বটে, কিন্তু মুখের চেহারা প্রায় স্বাভাবিক। অসমাপ্ত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া

জাগিয়া উঠিলে যেমন একটু আচ্ছন্ন ভাব থাকে তাহার অধিক নয়। এতবড় রোগের এত সহজে ও এত শীঘ্র যে সমাপ্তি ঘটিয়াছে, কমল হঠাৎ তাহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাই উত্তর দিতে তাহার বিলম্ব হইল। শিবনাথ আবার প্রশ্ন করিল, এ লোকটি কে শিবানী? তোমাকে সঙ্গে করে ইনিই এনেছেন?

হাঁ। আমাকেও এনেছেন এবং তোমাকেও সঙ্গে করে যিনি কাল রেখে গিয়েছেন, তিনি।

নাম?

রাজেন্দ্র।

তোমরা দু'জনে কি এখন এক বাড়িতে থাকো?

সেই চেষ্টাই ত করচি। যদি থাকেন আমার ভাগ্য।

হুঁ। ওকে এখানে এনেছ কেন? আমাকে দেখাতে?

কমল এ প্রশ্নের জবাব দিল না। শিবনাথও আর কোন প্রশ্ন করিল না, চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই এ কথা তুমি কার মুখে শুনলে? আমি বলেচি, এই কি লোকেরা বলে নাকি?

কমল ইহার জবাব দিল না, কিন্তু এবার সে নিজেই প্রশ্ন করিল, আমাকে যে তুমি বিয়ে করনি সে আমি না বিশ্বাস করে থাকি, তুমি ত করতে? চলে আসবার সময় এ কথাটা বলে এলে না কেন? তোমাকে আটকাতে পারি, কেঁদেকেটে মাথা খুঁড়ে অনর্থ ঘটাতে পারি, এই কি তুমি ভেবেছিলে? এ যে আমার স্বভাব নয়, সে ত ভাল করেই জানতে? তবে, কেন করনি তা?

শিবনাথ কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া বলিল, কাজের ঝঞ্ঝাটে, ব্যবসার খাতিরে দিনকতক একটা আলাদা বাসা করলেই কি ত্যাগ করা হয়? আমি ত ভেবেছিলাম—

শিবনাথের মুখের কথা অসমাপ্ত রহিয়া গেল। কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক থাক, ও আমি জানতে চাইনি। কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজের উত্তেজনায় নিজেই লজ্জা পাইল। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া আপনাকে শান্ত করিয়া লইয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি সত্যিই অসুখ করেছিল?

সত্যি না ত কি?

সত্যিই যদি এই, আমার ওখানে না গিয়ে আশুবাবুর বাড়িতে গেলে কিসের জন্যে। তোমার একটা কাজ আমাকে ব্যথা দিয়েছে, কিন্তু অন্যটা আমাকে অপমানের একশেষ করেছে। আমি দুঃখ পেয়েচি শুনে তুমি মনে মনে হাসবে জানি, কিন্তু এই জানাটাই আমার সান্ত্বনা। তুমি এত ছোট বলেই কেবল নিজের দুঃখ আমি সইতে পারলাম, নইলে পারতাম না।

শিবনাথ চুপ করিয়া রহিল ; কমল তাহার মুখের প্রতি নির্নিমেষে চাহিয়া কহিল, জান তুমি, আমার সব সইল, কিন্তু তোমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়াটা আমার সইল না, তাই এসেছিলাম তোমাকে সেবা করতে, তোমার মন ভোলাতে আসিনি।

শিবনাথ ধীরে ধীরে কহিল, তোমার এই দয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ শিবানী।

কমল কহিল, তুমি আমাকে শিবানী বলে ডেকো না, কমল বলে ডেকো।

কেন?

শুনলে আমার ঘৃণা বোধ হয়, তাই।

কিন্তু একদিন ত তুমি এই নামটিই সবচেয়ে ভালবাসতে। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে কমলের হাতখানি লইয়া নিজের হাতের মধ্যে গ্রহণ করিল। কমল চুপ করিয়া রহিল। নিজের হাত লইয়া টানাটানি করিতেও কুণ্ঠা বোধ হইল।

চুপ করে রইলে, উত্তর দিলে না যে বড়?

কমল তেমনিই নির্বাক হইয়া রহিল।

কি ভাবচ বল ত শিবানী?

কি ভাবচি জান? ভাবচি, মানুষ কত বড় পাষণ্ড হলে তবে এ কথা মনে করে দিতে পারে।

শিবনাথের চোখ ছলছল করিতে লাগিল, বলিল, পাষণ্ড আমি নই শিবানী। একদিন তোমার ভুল তুমি নিজেই জানতে পারবে, সেদিন তোমার পরিতাপের সীমা থাকবে না। কেন যে একটা আলাদা বাসা ভাড়া করেছি—

কিন্তু আলাদা বাসা ভাড়া করার কারণ ত আমি একবারও জিজ্ঞেসা করিনি? আমি শুধু এইটুকুই জানতে চেয়েছিলাম, এ কথা আমাকে তুমি জানিয়ে আসনি কেন? তোমাকে একদিনের জন্যেও আমি ধরে রাখতাম না।

শিবনাথের চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল, কহিল, জানাতে আমার সাহস হয়নি শিবানী।

কেন?

শিবনাথ জামার হাতায় চোখ মুছিয়া বলিল, একে টাকার টানাটানি, তাতে প্রত্যহই বাইরে যেতে হলে লাগল—পাথর কিনতে, চালান দিতে, স্টেশনের কাছে একটা কিছু—

কমল বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া দূরে একটা চৌকিতে বসিল, কহিল, আমার নিজের জন্যে আর দুঃখ হয় না, হয় আর একজনের জন্যে। কিন্তু আজ তোমার জন্যেও দুঃখ হচ্চে শিবনাথবাবু—

অনেকদিনের পরে আবার সে এই প্রথম তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিল। কহিল, দ্যাখ, নিছক বঞ্চনাকেই মূলধন করে সংসারে বাণিজ্য করা যায় না। আমার সঙ্গে হয়ত তোমার আর দেখা হবে না, কিন্তু আমাকে তোমার মনে পড়বে। যা হবার তা ত হয়ে গেছে, সে আর ফিরবে না, কিন্তু ভবিষ্যতে জীবনটাকে আর একদিক থেকে দেখবার চেষ্টা করো, হয়ত সুখী হতেও পারবে। লক্ষ্মীটি, ভুলো না। তোমার ভাল হোক, তুমি ভাল থাকো, এ আমি আজও সত্যি সত্যিই চাই।

কমল কষ্টে অশ্রু সংবরণ করিল। আশুবাবু যে কেন তাহাকে সরাইয়া দিলেন, কি যে তাহার যথার্থ হেতু, এত কথার পরেও সে এতবড় আঘাত শিবনাথকে দিতে পারিল না।

বাহিরে পা-গাড়ির ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল। শিবনাথ কোন কথা না কহিয়া পুনর্বার পাশ ফিরিয়া শুইল।

ঘরে ঢুকিয়া রাজেন্দ্র চাপা-গলায় কহিল, এই যে সত্যিই জেগে আছেন দেখচি! রুগী কেমন? ওষুধ-টষুধ আর খাওয়ালেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আর কিছু খাওয়াই নি।

রাজেন্দ্র অঙ্গুলি-সঙ্কেত কহিল, চুপ। ঘুম ভেঙ্গে যাবে, সেটা ভাল না।

না। কিন্তু তোমার মুচীরা করলে কি?

তারা লোক ভাল, কথা রেখেচে। আমার যাবার আগেই যমরাজের মহিষ এসে আত্মা দুটো নিয়ে গেছে, সকালে ধড়-দুটো তাদের মিউনিসিপ্যালিটির মহিষের হাবালা করে দিতে পারলেই খালাস। আরও গোটা-আষ্টেক শুবচে, কাল একবার দেখিয়ে আনব। আশা করি প্রচুর জ্ঞানলাভ করবেন। কিন্তু আরাম-চৌকির ওপর আমার কম্বলের বিছানা কৈ? ভুলে গেছেন?

কমল বিছানা পাতিয়া দিল। আঃ—বাঁচলাম, বলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া হাতলের উপর দুই পা ছড়াইয়া দিয়া রাজেন শুইয়া পড়িল। কহিল, ছুটোছুটিতে ঘেমে গেছি, একটা পাখা-টাখা আছে নাকি?

কমল পাখা হাতে করিয়া চৌকিটা তার শিয়রের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, আমি বাতাস করচি, তুমি ঘুমোও। রুগীর জন্যে দুশ্চিন্তার কারণ নেই, তিনি ভাল আছেন।

বাঃ—সবদিকেই সুখবর। এই বলিয়া সে চোখ বুজিল।

আঠার

ইনফ্লুয়েঞ্জা এদেশে সম্পূর্ণ নূতন ব্যাধি নহে, 'ডেঙ্গু' বলিয়া মানুষে কতকটা অবজ্ঞা ও উপহাসের চক্ষেই দেখিত। দিন দুই-তিন দুঃখ দেওয়া ভিন্ন ইহার আর কোন গভীর উদ্দেশ্য নাই, ইহাই ছিল লোকের ধারণা। কিন্তু সহসা এমন দুর্নিবার মহামারীরূপেও সে যে দেখা দিতে পারে এ কেহ কল্পনাও করিত না। সুতরাং এবার অকস্মাৎ ইহার অপরিমেয় শক্তির সুনিশ্চিত

কঠোরতায় প্রথমটা লোকে হতবুদ্ধি হইল, তাহার পরেই যে যেখানে পারিল পলাইতে শুরু করিল। আত্মীয়-পরে বিশেষ প্রভেদ রহিল না ; রোগে শুশ্রূষা করিবে কি, মৃত্যুকালে মুখে জল দিবার লোকও অনেকের ভাগ্যে জুটিল না। শহর ও পল্লী সর্বত্র একই দশা, আগ্রার অদৃষ্টেও ইহার অন্যথা ঘটিল না,—এই সমৃদ্ধ জনবহুল প্রাচীন নগরীর মূর্তি যেন দিন-কয়েকের মধ্যেই একেবারে বদলাইয়া গেল। স্কুল-কলেজ বন্ধ, হাটে-বাজারে দোকানের কবাট অবরুদ্ধ, নদীতীর শূন্যপ্রায়, শুধু হিন্দু ও মুসলমান শব-বাহকের শঙ্কাকুল ত্রস্ত পদক্ষেপ ব্যতিরেকে রাজপথ নিঃশব্দ জনহীন। যে-কোনদিকে চাহিলেই মনে হয় শুধু কেবল মানুষ-জনই নয়, গাছপালা, বাড়ি-ঘর-দ্বারের চেহারা পর্যন্ত যেন ভয়ে বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। এমনি যখন শহরের অবস্থা, তখন চিন্তা, দুঃখ ও শোকের দাহনে অনেকের সঙ্গেই অনেকের একটা রফা হইয়া গেছে। চেষ্টা করিয়া, আলোচনা করিয়া, মধ্যস্থ মানিয়া নয়—যেন আপনিই হইয়াছে। আজও যাহারা বাঁচিয়া আছে, এখনও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই, তাহারা সকলেই যেন সকলের পরমাত্মীয় ; বহুদিন ধরিয়া যেখানে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল, সহসা পথে দেখা হইতে উভয়ের চোখেই জল ছলছল করিয়া আসিয়াছে—কাহারও ভাই, কাহারও পুত্র-কন্যা, কাহারও বা স্ত্রী ইতিমধ্যেই মরিয়াছে—রাগ করিয়া মুখ ফিরাইবার মত জোর আর মনে নাই,—কখনও কথা হইয়াছে কখনও তাহাও হয় নাই—নিঃশব্দে পরস্পরের কল্যাণ-কামনা করিয়া বিদায় লইয়াছে।

মুচীদের পাড়ায় লোক আর বেশী নাই। যত বা মরিয়াছে, তত বা পলাইয়াছে। অবশিষ্টদের জন্য রাজেন একাই যথেষ্ট। তাহাদের গতি-মুক্তির ভার সে-ই গ্রহণ করিয়াছে। সহকারিণী হিসাবে কমল যোগ দিতে আসিয়াছিল। ছেলেবয়সে চা-বাগানে সে পীড়িতকুলীদের সেবা করিয়াছিল, সেই ছিল তার ভরসা। কিন্তু দিন দুই-তিনেই বুঝিল সে সম্বল এখানে চলে না। মুচীদের সে কি অবস্থা! ভাষায় বর্ণনা করিয়া বিবরণ দিতে যাওয়া বৃথা। কুটীরে পা দেওয়া অবধি সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিত, কোথাও বসিবার দাঁড়াইবার স্থান নাই, এবং আবর্জনা যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া উঠিতে পারে এখানে আসিবার পূর্বে কমল জানিত না। অথচ, এই সকলেরই মাঝখানে অহরহ থাকিয়া আপনাকে সাবধানে রাখিয়া কি করিয়া যে রোগীর সেবা করা সম্ভব এ কল্পনা সে মনে স্থান দিতেও পারিল না। অনেক দর্প করিয়া সে রাজেনের সঙ্গে আসিয়াছিল, দুঃসাহসিকতায় সে কাহারও ন্যূন নয়, জগতে কোন কিছুকেই সে ভয় করে না, মৃত্যুকেও না। নিতান্ত মিথ্যা সে বলে নাই, কিন্তু আসিয়া বুঝিল, ইহারও সীমা আছে। দিন-কয়েকেই ভয়ে তাহার দেহের রক্ত শুকাইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। তথাপি সম্পূর্ণ দেউলিয়া হইয়া ঘরে ফিরিবার প্রাক্কালে রাজেন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দিয়া বার বার বলিতে লাগিল, এমন নির্ভীকতা আমি জন্মে দেখিনি। আসল ঝড়ের মুখটাই আপনি সামলে দিয়ে গেলেন! কিন্তু আর আবশ্যক নেই,—আপনি দিন কতক বাসায় গিয়ে বিশ্রাম করুন গে। এদের যা করে গেলেন সে ঋণ এরা জীবনে শুধতে পারবে না।

আর তুমি?

রাজেন বলিল, এই ক'টাকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে আমিও পালাব। নইলে কি মরব বলতে চান?

কমল জবাব খুঁজিয়া পাইল না, ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল। কিন্তু তাই বলিয়া এমন নয় যে সে এ কয়দিন একেবারে বাসায় আসিতে পারে নাই। রাঁধিয়া সঙ্গে করিয়া খাবার লইয়া যাইতে প্রত্যহ একবার করিয়া তাহাকে বাসায় আসিতেই হইত। কিন্তু আজ আর সেই ভয়ানক জায়গায় ফিরিতে হইবে না মনে করিয়া একদিকে যেমন স্বস্তি অনুভব করিল, আর একদিকে তেমনি অব্যক্ত উদ্বেগে তাহার সমস্ত মন পূর্ণ হইয়া রহিল। কমল রাজেন্দ্রর খাবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতে ভুলিয়াছিল। কিন্তু এই ত্রুটি যতই হোক, যেখানে তাহাকে সে ফেলিয়া রাখিয়া আসিল তাহার সমতুল্য কিছুই তাহার মনে পড়িল না।

স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার সময় হইতে হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্যাশ্রম বন্ধ হইয়াছে।

ব্রহ্মচারী-বালকদিগকে কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার

লইয়া সতীশ সঙ্গে গিয়াছে। হরেন নিজে যাইতে পারে নাই অবিনাশের অসুখের জন্য। আজ সে আসিয়া উপস্থিত হইল। নমস্কার করিয়া কহিল, পাঁচ-ছ দিন রোজ আসচি, আপনাকে ধরতে পারিনে। কোথায় ছিলেন?

কমল মুচীদের পল্লীর নাম করিলে হরেন্দ্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিল, সেখানে? সেখানে ত ভয়ানক লোক মরচে শুনতে পাই। এ মতলব আপনাকে দিলে কে? যে-ই দিয়ে থাক কাজটা ভাল করেনি।

কেন?

কেন কি? সেখানে যাওয়া মানে ত প্রায় আত্মহত্যা করা। বরঞ্চ, আমরা ত ভেবেছিলাম শিবনাথবাবু আগ্রা থেকে চলে যাবার পরে আপনিও নিশ্চয় অন্যত্র গেছেন। অবশ্য দিনকয়েকের জন্যে—নইলে বাসাটা রেখে যেতেন না,—আচ্ছা রাজেনের খবর কিছু জানেন? সে কি শহরে আছে, না আর কোথাও চলে গেছে? হঠাৎ এমন ডুব মেরেছে যে কোন সন্ধান পাবার জো নেই।

তাঁকে কি আপনার বিশেষ প্রয়োজন?

না, প্রয়োজন বলতে সচরাচর লোকে যা বোঝে তা নেই। তবুও প্রয়োজনই বটে। কারণ আমিও যদি তার খোঁজ নেওয়া বন্ধ করি ত একা পুলিশ ছাড়া আর তার আত্মীয় থাকে না। আমার বিশ্বাস আপনি জানেন সে কোথায় আছে।

কমল বলিল, জানি। কিন্তু আপনাকে জানিয়ে লাভ নেই। বাড়ি থেকে যাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, বেরিয়ে গিয়ে সে কোথায় আছে সন্ধান নেওয়া শুধু অন্যায় কৌতূহল।

হরেন্দ্র ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু সে আমার বাড়ি নয়, আমাদের আশ্রম। সেখানে স্থান দিতে তাকে পারিনি, কিন্তু তাই বলে সে নালিশ আর একজনের মুখ থেকেও আমার সয় না। বেশ, আমি চললাম। তাকে পূর্বেও অনেকবার খুঁজে বার করেচি, এবারও বার করতে পারব, আপনি ঢেকে রাখতে পারবেন না।

তাহার কথা শুনিয়া কমল হাসিয়া কহিল, তাঁকে ঢেকে যে রাখব হরেনবাবু, রাখতে পারলে কি আমার দুঃখ ঘুচবে আপনি মনে করেন?

হরেন নিজেও হাসিল, কিন্তু সে হাসির আশেপাশে অনেকখানি ফাঁক রহিল। কহিল, আমি ছাড়া এ প্রশ্নের জবাব দেবার লোক আগ্রায় অনেকে আছেন। তাঁরা কি বলবেন জানেন? বলবেন, কমল, মানুষের দুঃখ ত একটাই নয়, বহুপ্রকারের। তার প্রকৃতিও আলাদা ঘোচাবার পন্থাও বিভিন্ন। সুতরাং তাঁদের সঙ্গে যদি সাক্ষাৎ হয়, আলোচনার দ্বারা একটা মোকাবিলা করে নেবেন। এই বলিয়া সে একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আসলেই আপনার ভুল হচ্চে। আমি সে দলের নই। অযথা উত্যক্ত করতে আমি আসিনি, কারণ, সংসারে যত লোকে আপনাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন।

কমল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে যথার্থ শ্রদ্ধা করেন আপনি কোন্ নীতিতে? আমার মত বা আচরণ কোনটার সঙ্গেই ত আপনাদের মিল নেই।

হরেন্দ্র তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, না, নেই। কিন্তু তবুও গভীর শ্রদ্ধা করি। আর এই আশ্চর্য কথাটাই আমি নিজেকে নিজে বারংবার জিজ্ঞেস করি।

কোন উত্তর পান না?

না। কিন্তু ভরসা হয় একদিন নিশ্চয় পাব। একটুখানি থামিয়া কহিল, আপনার ইতিহাস কতক আপনার নিজের মুখ থেকেও শুনেচি। কতক অজিতবাবুর কাছে শুনেচি,—ভালো কথা, জানেন বোধ হয় তিনি এখন আমাদের আশ্রমে গিয়ে আছেন?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এ সংবাদ ত আগেই দিয়েছেন।

হরেন বলিল, আপনার জীবন-ইতিহাসের বিচিত্র অধ্যায়গুলি এমন অকুণ্ঠ ঋজুতায় সুমুখে এসে দাঁড়াল যে তার বিরুদ্ধে সরাসরি রায় দিতে ভয় হয়। এতকাল যা-কিছু মন্দ বলে বিশ্বাস করতে শিখেচি, আপনার জীবনটা যেন তার প্রতিবাদে মামলা রুজু করেছে। এর বিচারক কোথায়

মিলবে, কবে মিলবে, তার ফলই বা কি হবে কিছুই জানিনে, কিন্তু এমন করে যে নির্ভয়ে এলো, অবগুণ্ঠনের কোন প্রয়োজনই যে অনুভব করলে না, তাকে শ্রদ্ধা না করেই বা পারা যায় কি করে?

কমল বলিল, নির্ভয়ে এসে দাঁড়ানোটাই কি একটা কাজ নাকি? দু-কানকাটার গল্প শোনেন নি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে। আপনি দেখেন নি, কিন্তু আমি চা-বাগানের সাহেবদের দেখেচি। তাদের নির্ভয়, নিঃসঙ্কোচ বেহায়াপনা জগতের কোন লজ্জাকেই আমল দেয় না, যেন গলা ধাক্কায় দূর করে তাড়ায়। তাদের দুঃসাহসের সীমা নেই; কিন্তু সে কি মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু?

হরেন এরূপ প্রত্যুত্তর আর যাহার কাছেই হোক এই স্ত্রীলোকটির কাছে আশা করে নাই। হঠাৎ কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু কহিল, সে আলাদা জিনিস।

কমল কহিল, কি করে জানলেন আলাদা? বাইরে থেকে আমার বাবাকেও লোকে এদেরই একজন বলে ভাবত। অথচ, আমি জানি তা সত্যি নয়। কিন্তু সত্যি ত কেবল আমার জানার পরেই নির্ভর করে না,—জগতের কাছে তার প্রমাণ কৈ?

হরেন্দ্র এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে না পারিয়া নিরুত্তর হইয়া রহিল।

কমল বলিতে লাগিল, আমার ইতিহাস আপনারা সবাই শুনেচেন, খুব সম্ভব সে কাহিনী পরমানন্দে উপভোগ করেছেন। কাজগুলো আমার ভাল কি মন্দ, জীবনটা আমার পবিত্র কি কলুষিত সে-বিষয়ে আপনি নির্বাক, কিন্তু সে যে গোপনে না হয়ে লোকের চোখের সুমুখে সকলকে উপেক্ষা করেই ঘটে চলেছে এই হয়েচে আমার প্রতি আপনার শ্রদ্ধার আকর্ষণ। হরেনবাবু, পৃথিবীতে শ্রদ্ধা আমি এত বেশী পাইনি যে, অবহেলায় না বলে অপমান করতে পারি, কিন্তু আমার সম্বন্ধে যেমন অনেক জেনেছেন, তেমনি এটাও জেনে রাখুন যে, অক্ষয়বাবুদের অশ্রদ্ধার চেয়েও এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। সে আমার সয়, কিন্তু এর বোঝা দুঃসহ।

হরেন্দ্র পূর্বের মতই ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিল। কমলের বাক্য, বিশেষ করিয়া তাহার কণ্ঠস্বরের শান্ত-কঠোরতায় সে অন্তরে অপমান বোধ করিল। খানিক পরে জিজ্ঞাসা করিল, মত এবং আচরণের অনৈক্য সত্ত্বেও যে একজনকে শ্রদ্ধা করা যায়, অন্ততঃ আমি পারি, এ আপনার বিশ্বাস হয় না?

কমল অতিশয় সহজে তখনই জবাব দিল, বিশ্বাস হয় না এ ত আমি বলিনি হরেনবাবু! আমি বলেচি, এ শ্রদ্ধা আমাকে পীড়া দেয়। এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিল, মত এবং নীতির দিক দিয়ে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে আপনাদের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। তাঁর বহু স্থলে অনাবশ্যক ও অত্যধিক রূঢ়তা না থাকলে আপনারা সকলেই এক, অশ্রদ্ধার দিক দিয়েও এক। আমি যে নিজের লজ্জায় সঙ্কোচে লুকিয়ে বেড়াই নে এই সাহসটুকুই আমার আপনাদের সমাদর লাভ করেচে। এর কতটুকু দাম হরেনবাবু? বরঞ্চ, ভেবে দেখলে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণাই আসে যে, এর জন্যেই আমাকে এতদিন বাহবা দিয়ে আসছিলেন।

হরেন্দ্র বলিল বাহবা যদি দিয়েই থাকে সে কি অসঙ্গত? সাহস জিনিসটা কি সংসারে কিছুই নয়?

কমল কহিল, আপনারা সকল প্রশ্নকেই এমন একান্ত করে জিজ্ঞাসা করেন কেন? কিছুই নয় এ কথা ত বলিনি। আমি বলছিলাম, এ-বস্তু সংসারে দুর্লভ এবং দুর্লভ বলেই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। কিন্তু এর চেয়েও বড় বস্তু আছে। বাইরে থেকে হঠাৎ তাকে সাহসের অভাব বলেই দেখতে লাগে।

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া কহিল, বুঝতে পারলাম না। আপনার অনেক কথাই অনেক সময় হেঁয়ালির মত ঠেকে, কিন্তু আজকের কথাগুলো যেন তাদেরও ডিঙ্গিয়ে গেল। মনে হচ্চে যেন আজ আপনি অত্যন্ত বিমনা। কার জবাব কাকে দিয়ে যাচ্চেন খেয়াল নেই।

কমল কহিল, তাই বটে। ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিল, হবেও বা। সত্যকার শ্রদ্ধা পাওয়া

যে কি জিনিস সে হয়ত এতকাল নিজেও জানতাম না। সেদিন হঠাৎ যেন চমকে গেলাম। হরেনবাবু, আপনি দুঃখ করবেন না, কিন্তু তার সঙ্গে তুলনা করলে আর সমস্তই আজ পরিহাস বলে মনে লাগে। বলিতে বলিতে তাহার চোখের প্রখর দৃষ্টি ছায়াচ্ছন্ন হইয়া আসিল, এবং সমস্ত মুখের পরে এমনই একটা স্নিগ্ধ সজলতা ভাসিয়া আসিল যে, কমলের সে মূর্তি হরেন্দ্র কোনদিন দেখে নাই। আর তাহার সংশয়মাত্র রহিল না যে, অনুদ্দিষ্ট আর কাহাকে উদ্দেশ করিয়া কমল এই সকল বলিতেছে। সে শুধু উপলক্ষ ; এবং এইজন্যই আগাগোড়া সমস্তই তাহার হেঁয়ালির মত ঠেকিতেছে।

কমল বলিতে লাগিল, আপনি এইমাত্র আমার দুর্মদ নির্ভীকতার প্রশংসা করছিলেন,—ভাল কথা, শুনেছেন, শিবনাথ আমাকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন?

হরেন্দ্র লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া জবাব দিল, হাঁ।

কমল কহিল, আমাদের মনে মনে একটা শর্ত ছিল, ছাড়বার দিন যদি কখনো আসে যেন আমরা সহজেই ছেড়ে যেতে পারি। না না, চুক্তিপত্র লেখাপড়া করে নয়, এমনিই।

হরেন্দ্র কহিল, ব্রুট।

কমল কহিল, সে ত আপনার বন্ধু অক্ষয়বাবু। শিবনাথ গুণী মানুষ, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কিন্তু নিজের খুব বেশী নালিশ নেই। নালিশ করেই বা লাভ কি? হৃদয়ের আদালতে একতরফা বিচারই একমাত্র বিচার, তার ত আর আপীল-কোর্ট মেলে না।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, তার মানে ভালবাসার অতিরিক্ত আর কোন বাঁধনই আপনি স্বীকার করেন না?

কমল কহিল, একে ত আমাদের ব্যাপারে আর কোন বাঁধন ছিল না, আর থাকলেই বা তাকে স্বীকার করিয়ে ফল কি? দেহের যে অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে যায় তার বাইরের বাঁধনই মস্ত বোঝা। তাকে দিয়ে কাজ করাতে গেলেই সবচেয়ে বেশী বাজে। এই বলিয়া একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিতে লাগিল, আপনি ভাবছেন সত্যিকার বিবাহ হয়নি বলেই এমন কথা মুখে আনতে পারচি, হলে পারতাম না। হলেও পারতাম, শুধু এত সহজে এ সমস্যার সমাধান পেতাম না। বিবশ অঙ্গটা হয়ত এ দেহে সংলগ্ন হয়েই থাকত, এবং অধিকাংশ রমণীর যেমন ঘটে, আমরণ তার দুঃখের বোঝা বয়েই এ জীবন কাটত। আমি বেঁচে গেছি হরেনবাবু, দৈবাৎ নিষ্কৃতির দোর খোলা ছিল বলে আমি মুক্তি পেয়েছি।

হরেন্দ্র কহিল, আপনি হয়ত মুক্তি পেয়েছেন, কিন্তু এমনিধারা মুক্তির দ্বার যদি সবাই খোলা রাখতে চাইত, জগতে সমাজ-ব্যবস্থার বোনেদ পর্যন্ত উপড়ে ফেলতে হত। তার ভয়ঙ্কর মূর্তি কল্পনায় আঁকতে পারে এমন কেউ নেই। এ সম্ভাবনা ভাবাও যায় না।

কমল বলিল, যায় এবং যাবেও একদিন। তার কারণ মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় লেখা শেষ হয়ে যায়নি। একদিনের একটা অনুষ্ঠানের জোরে তার অব্যাহতির পথ যদি সারা জীবনের মত অবরুদ্ধ হয়ে আসে, তাকে শ্রেয়ের ব্যবস্থা বলে মেনে নেওয়া চলে না। পৃথিবীতে সকল ভুলচুকের সংশোধনের বিধি আছে, কেউ তাকে মন্দ বলে না, কিন্তু যেখানে ভ্রান্তির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী, আর তার নিরাকরণের প্রয়োজনও তেমনিই অধিক, সেইখানেই লোকে সমস্ত উপায় যদি স্বেচ্ছায় বন্ধ করে থাকে, তাকে ভাল বলে মানি কি করে বলুন?

এই মেয়েটির নানাবিধ দুর্দশায় হরেন্দ্রর মনের মধ্যে গভীর সমবেদনা ছিল ; বিরুদ্ধ আলোচনায় সহজে যোগ দিত না এবং বিপক্ষ দল যখন নানাবিধ সাক্ষ্যপ্রমাণের বলে তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, সে প্রতিবাদ করিত। তাহারা কমলের প্রকাশ্য আচরণ ও তেমনি নির্লজ্জ উক্তিগুলার নজির দেখাইয়া যখন ধিক্কার দিতে থাকিত, হরেন তর্ক-যুদ্ধে হারিয়াও প্রাণপণে বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, কমলের জীবনে কিছুতেই ইহা সত্য নয়। কোথায় একটা নিগূঢ় রহস্য আছে, একদিন তাহা ব্যক্ত হইবেই হইবে। তাহারা বিদ্রূপ করিয়া কহিত, দয়া করে সেইটে তিনি ব্যক্ত করলে প্রবাসী বাঙালী সমাজে আমরা যে বাঁচি। অক্ষয় উপস্থিত

থাকিলে ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া বলিত, আপনারা সবাই সমান। আমার মত আপনাদের কারও বিশ্বাসের জোর নেই। আপনারা নিতেও পারেন না, ফেলতেও চান না। আধুনিক কালের কতকগুলো বিলিতি চোখা-চোখা বুলি যেন আপনাদের ভূতগ্রস্ত করে রেখেচে।

অবিনাশ বলিতেন, বুলিগুলো কমলের কাছ থেকে নতুন শোনা গেল তা নয় হে অক্ষয়, পূর্বে থেকেই শোনা আছে। আজকালের খান-দুই তিন ইংরাজি তর্জমার বই পড়লেই জানা যায়। বুলির জৌলস নয়।

অক্ষয় কঠিন হইয়া প্রশ্ন করিত, তবে কিসের জৌলস? কমলের রূপের? অবিনাশবাবু, হরেন অবিবাহিত, ছোকরা—ওকে মাপ করা যায়, কিন্তু বুড়োবয়সে আপনাদের চোখেও যে ঘোর লাগিয়েছে এই আশ্চর্য! এই বলিয়া সে কটাক্ষে আশুবাবুর প্রতিও একবার চাহিয়া লইয়া বলিত, কিন্তু এ আলেয়ার আলো অবিনাশবাবু, পচা পাঁকের মধ্যে এর জন্ম। পাঁকের মধ্যেই একদিন অনেককে টেনে নামাবে তা স্পষ্ট দেখতে পাই। শুধু অক্ষয়কে এ-সব ভোলাতে পারে না—সে আসল-নকল চেনে।

আশুবাবু মুখ টিপিয়া হাসিতেন, কিন্তু অবিনাশ ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতেন। হরেন্দ্র বলিত, আপনি মস্ত বাহাদুর অক্ষয়বাবু, আপনার জয়-জয়কার হোক। আমরা সবাই মিলে পাঁকের মধ্যে পড়ে যেদিন হাবুডুবু খাব, আপনি সেদিন তীরে দাঁড়িয়ে বগল বাজিয়ে নৃত্য করবেন, আমরা কেউ নিন্দে করব না।

অক্ষয় জবাব দিত, নিন্দের কাজ আমি করিনে হরেন। গৃহস্থ মানুষ, সহজ সোজা বুদ্ধিতে সমাজকে মেনে চলি। বিবাহের নতুন ব্যাখ্যা দিতেও চাইনে, বিশ্ব-বখাটে একপাল ছেলে জুটিয়ে ব্রহ্মচারী-গিরি করেও বেড়াইনে। আশ্রমে পায়ের ধূলোর পরিমাণটা আর একটু বাড়িয়ে নেবার ব্যবস্থা কর গে ভায়া, সাধন-ভজনের জন্যে ভাবতে হবে না। দেখতে দেখতে সমস্ত আশ্রম বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন হয়ে উঠবে। এবং হয়ত চিরকালের মত তোমার একটা কীর্তি থেকে যাবে।

অবিনাশ ক্রোধ ভুলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিতেন এবং নির্মল চাপা হাসিতে আশুবাবুর মুখখানিও উজ্জ্বল হইয়া উঠত। হরেন্দ্রর আশ্রমের প্রতি কাহারও আস্থা ছিল না, ও একটা ব্যক্তিগত খেয়াল বলিয়াই তাঁহারা ধরিয়া লইয়াছিলেন।

প্রত্যুত্তরে হরেন্দ্র ক্রোধে আরক্ত হইয়া কহিত, জানোয়ারের সঙ্গে ত যুক্তি তর্ক চলে না, তার অন্য বিধি আছে। কিন্তু, সে ব্যবস্থা হয়ে ওঠে না বলেই আপনি যাকে তাকে গুঁতিয়ে বেড়ান। ইতর-ভদ্র মহিলা-পুরুষ কিছুই বাদ যায় না। এই বলিয়া সে অপর দু'জনকে লক্ষ্য করিয়া কহিত, কিন্তু আপনারা প্রশ্রয় দেন কি বলে? এতবড় একটা কুৎসিত ইঙ্গিতও যেন ভারী একটা পরিহাসের ব্যাপারে!

অবিনাশ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, না না, প্রশ্রয় দেব কেন, কিন্তু জানই ত অক্ষয়ের কাণ্ডজ্ঞান নেই।

হরেন কহিত, কাণ্ডজ্ঞান ওর চেয়ে আপনাদের আরও কম। মানুষের মনের চেহারা ত দেখতে পাওয়া যায় না সেজদা, নইলে হাসি-তামাশা কম লোকের মুখেই শোভা পেত। বিবাহের ছলনায় কমলকে শিবনাথ ঠকিয়েছেন, কিন্তু আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সেই ঠকাটাও কমল সত্যের মতই মেনে নিয়েছিলেন, সংসারের দেনা-পাওনায় লাভ-ক্ষতির বিবাদ বাধিয়ে তাঁকে লোকচক্ষে ছোট করতে চাননি। কিন্তু তিনি না চাইলেই বা আপনারা ছাড়বেন কেন? শিবনাথ তাঁর ভালবাসার ধন, কিন্তু আপনাদের সে কে? ক্ষমার অপব্যবহার আপনাদের সইল না। এই ত আপনাদের ঘৃণার মূলধন? একে ভাঙ্গিয়ে যতকাল চালানো যায় চালান, আমি বিদায় নিলাম। এই বলিয়া হরেন্দ্র সেদিন রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে এই প্রত্যয় সুদৃঢ় ছিল যে, কমলের মুখ দিয়াই একদিন এ কথা ব্যক্ত হইবে, যে শৈব-বিবাহকে সত্যকার বিবাহ জানিয়াই সে প্রতারিত হইয়াছে, স্বেচ্ছায়, সমস্ত জানিয়া গণিকার মত শিবনাথকে আশ্রয় করে নাই। কিন্তু আজ তাহার

বিশ্বাসের ভিত্তিটাই ধূলিসাৎ হইল। হরেন্দ্র, অক্ষয় বা অবিনাশ নহে, নর-নারী নির্বিশেষে সকলের পরেই তাহার একটা বিস্তৃত ও গভীর উদারতা ছিল,—এই জন্যই দেশের ও দশের কল্যাণে সর্বপ্রকার মঙ্গল অনুষ্ঠানেই সে ছেলেবেলা হইতে নিজেকে নিযুক্ত রাখিত। এই যে তাহার ব্রহ্মচর্য আশ্রম, এই যে তাহার অকৃপণ দান, এই যে সকলের সাথে তাহার সব-কিছু ভাগ করিয়া লওয়া, এ-সকলের মূলেই ছিল ঐ একটিমাত্র কথা। তাহার এই প্রবৃত্তিই তাহাকে গোড়া হইতে কমলের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিয়াছিল। কিন্তু সে যে আজ তাহারই মুখের পরে, তাহারই প্রশ্নের উত্তরে এমন ভয়ানক জবাব দিবে তাহা ভাবে নাই। ভারতের ধর্ম, নীতি, আচার, ইহার স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট সভ্যতার প্রতি হরেনের অচ্ছেদ্য স্নেহ ও অপরিমেয় ভক্তি ছিল। অথচ, সুদীর্ঘ অধীনতা ও ব্যক্তিগত চারিত্রিক দুর্বলতায় ইহার ব্যতিক্রমগুলাকেও সে অস্বীকার করিত না ; কিন্তু এমন স্পর্ধিত অবজ্ঞায় ইহার মূলসূত্রকেই অস্বীকার করায় তাহার বেদনার সীমা রহিল না। এবং কমলের পিতা ইউরোপীয়, মাতা কুলটা,—তাহার শিরার রক্তে ব্যভিচার প্রবহমান, এ কথা স্মরণ করিয়া তাহার বিতৃষ্ণায় মন কালো হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে ধীরে ধীরে কহিল, এখন তা হলে যাই—

কমল হরেন্দ্রর মনের ভাবটা ঠিক অনুমান করিতে পারিল না, শুধু একটা সুস্পষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু যেজন্যে এসেছিলেন তার ত কিছু করলেন না।

হরেন্দ্র মুখ তুলিয়া কহিল, কি সে?

কমল বলিল, রাজেনের খবর জানতে এসেছিলেন, কিন্তু না জেনেই চলে যাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে তার থাকা নিয়ে আপনাদের মধ্যে কি খুব বিশ্রী আলোচনা হয়? সত্যি বলবেন?

হরেন্দ্র বলিল, যদিও হয় আমি কখনও যোগ দিইনে। সে পুলিশের জিম্মায় না থাকলেই আমার যথেষ্ট। তাকে আমি চিনি।

কিন্তু আমাকে।

কিন্তু আপনি ত সে-সব কিছু মানেন না।

অনেকটা তাই বটে। অর্থাৎ মানতেই হবে এমন কোন কঠিন শপথ নেই আমার। কিন্তু বন্ধুকে শুধু জানলে হয় না হরেনবাবু, আর একজনকেও জানা দরকার।

বাহুল্য মনে করি। বহুদিনের বহু কাজে-কর্মে যাকে নিঃসংশয়ে চিনেছি বলেই জানি, তার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা নেই। তার যেখানে অভিরুচি সে থাক, আমি নিশ্চিন্ত।

কমল তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, মানুষকে অনেক পরীক্ষা দিতে হয় হরেনবাবু। তার একটা দিনের আগের প্রশ্ন হয়ত অন্যদিনের উত্তরের সঙ্গে মেলে না। কারও সম্বন্ধেই বিচার অমন শেষ করে রাখতে নেই, ঠকতে হয়।

কথাগুলো যে শুধু তত্ত্ব হিসাবেই কমল বলে নাই, কি-একটা ইঙ্গিত করিয়াছে হরেন তাহা অনুমান করিল। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা ইহাকে স্পষ্টতর করিতেও তাহার ভরসা হইল না। রাজেন্দ্রর প্রসঙ্গটা বন্ধ করিয়া হঠাৎ অন্য কথার অবতারণা করিল। কহিল, আমরা স্থির করেছি শিবনাথকে যথোচিত শাস্তি দেব।

কমল সত্যই বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আমরা কারা?

হরেন্দ্র বলিল, যারাই হোক, তার আমি একজন। আশুবাবু পীড়িত, ভাল হয়ে তিনি আমাকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তিনি পীড়িত?

হাঁ, সাত-আট দিন অসুস্থ। এর পূর্বেই মনোরমা চলে গেছেন। আশুবাবুর খুড়ো কাশীবাসী, তিনি এসে নিয়ে গেছেন।

শুনিয়া কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, শিবনাথ জানে আইনের দড়ি তার নাগাল পাবে না, এই জোরে সে

তার মৃত-বন্ধুর পত্নীকে বঞ্চিত করেছে, নিজের রুগ্না স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে এবং নির্ভয়ে আপনার সর্বনাশ করেছে। আইন সে খুব ভালই জানে, শুধু জানে না যে দুনিয়ায় এই-ই সব নয়, এর বাইরেও কিছু বিদ্যমান আছে।

কমল সহাস্য কৌতুকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু শাস্তিটা তাঁর কি স্থির করেছেন? ধরে এনে আর একবার আমার সঙ্গে জুড়ে দেবেন? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

প্রস্তাবটা হরেন্দ্রর কাছেও হঠাৎ এমনি হাস্যকর ঠেকিল যে সেও না হাসিয়া পারিল না। কহিল, কিন্তু দায়িত্বটা যে এইভাবে নিজের খেয়াল-মত নির্বিঘ্নে এড়িয়ে যাবে সেও ত হতে পারে না? আর আপনার সঙ্গে জুড়েই যে দিতে হবে তারও ত মানে নেই?

কমল কহিল, তা হলে হবে কি এনে? আমাকে পাহারা দেবার কাজে লাগাবেন, না, ঘাড়ে ধরে খেসারত আদায় করে আমাকে পাইয়ে দেবেন? প্রথমতঃ, টাকা আমি নেবো না, দ্বিতীয়তঃ সে বস্তু তাঁর নেই। শিবনাথ যে কত গরীব সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি।

তবে কি এতবড় অপরাধের কোন দণ্ডই হবে না? আর কিছু না হোক বাজারে যে আজও চাবুক কিনতে পাওয়া যায় এ খবরটা তাঁকে ত জানান দরকার?

কমল ব্যাকুল হইয়া বলিল, না না, সে করবেন না। ওতে আমার এতবড় অপমান যে সে আমি সইতে পারব না। কহিল, এতদিন এই রাগেই শুধু জ্বলে মরছিলাম যে, এমন চোরের মত পালিয়ে বেড়াবার কি প্রয়োজন ছিল? স্পষ্ট করে জানিয়ে গেলে কি বাধা দিতাম? তখন এই লুকোচুরির অসম্মানটাই যেন পর্বতপ্রমাণ হয়ে দেখা দিত। তার পরে হঠাৎ একদিন মৃত্যুর পল্লী থেকে আহ্বান এল। সেখানে কত মরণই চোখে দেখলাম তার সংখ্যা নেই। আজ ভাবনার ধারা আমার আর একপথ দিয়ে নেমে এসেছে। এখন ভাবি, তাঁর বলে যাবার সাহস যে ছিল না সেই ত আমার সম্মান। লুকোচুরি, ছলনা, তাঁর সমস্ত মিথ্যাচার আমাকেই যেন মর্যাদা দিয়ে গেছে। পাবার দিনে আমাকে ফাঁকি দিয়েই পেয়েছিলেন, কিন্তু যাবার দিনে আমাকে সুদে-আসলে পরিশোধ করে যেতে হয়েছে। আর আমার নালিশ নেই, আমার সমস্ত আদায় হয়েছে। আশুবাবুকে নমস্কার জানিয়ে বলবেন, আমার ভাল করবার বাসনায় আর আমার যেন ক্ষতি না করেন।

হরেন্দ্র একটা কথাও বুঝিল না, অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

কমল কহিল, সংসারের সব জিনিস সকলের বোঝবার নয়, হরেনবাবু! আপনি ক্ষুণ্ণ হবেন না। কিন্তু আমার কথা আর না। দুনিয়ায় কেবল শিবনাথ আর কমল আছে তাই নয়। আরও পাঁচজন বাস করে, তাদেরও সুখ-দুঃখ আছে। এই বলিয়া সে নির্মল ও প্রশান্ত হাসি দিয়া যেন দুঃখ ও বেদনার ঘন বাষ্প একমুহূর্তে দূর করিয়া দিল। কহিল, কে কেমন আছে খবর দিন।

হরেন্দ্র কহিল, জিজ্ঞাসা করুন।

বেশ। আগে বলুন অবিনাশবাবুর কথা। তিনি অসুস্থ শুনেছিলাম, ভাল হয়েছেন?

হাঁ। সম্পূর্ণ না হলেও অনেকটা ভাল। তাঁর এক জাট্‌তুতো দাদা থাকেন লাহোরে, আরোগ্যলাভের জন্য ছেলেকে নিয়ে সেইখানে চলে গেছেন। ফিরতে বোধ করি দু-এক মাস দেরি হবে।

আর নীলিমা? তিনিও কি সঙ্গে গেছেন?

না, তিনি এখানেই আছেন।

কমল আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এখানে? একলা ঐ খালি বাসায়?

হরেন্দ্র প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে কহিল, বৌদির সমস্যাটা সত্যিই একটু কঠিন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভগবান রক্ষে করেছেন, আশুবাবুর শুশ্রূষার জন্যে ঐখানে তাঁকে রেখে যাবার সুযোগ হয়েছে।

এই খবরটা এমনি খাপছাড়া যে কমল আর প্রশ্ন করিল না, বিস্তারিত বিবরণের আশায় জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল। হরেন্দ্রর দ্বিধা কাটিয়া গেল, এবং বলিতে গিয়া কণ্ঠস্বরে গূঢ় ক্রোধের

চিহ্ন প্রকাশ পাইল। কারণ, এই ব্যাপারে অবিনাশের সহিত তাহার সামান্য একটু কলহের মতও হইয়াছিল। হরেন্দ্র কহিল, বিদেশে নিজের বাসায় যা ইচ্ছে করা যায়, কিন্তু তাই বলে বয়স্থা বিধবা শালী নিয়ে ত জাঠ্‌তুতো ভায়ের বাড়ি ওঠা যায় না। বললেন, হরেন, তুমিও ত আত্মীয়, তোমার বাসাতে কি,—আমি জবাব দিলাম, প্রথমতঃ, আমি তোমারই আত্মীয়, তাও অত্যন্ত দূরের,—কিন্তু তাঁর কেউ নয়। দ্বিতীয়তঃ, ওটা আমার বাসা নয়, আমাদের আশ্রম ; ওখানে রাখবার বিধি নেই। তৃতীয়তঃ, সম্প্রতি ছেলেরা অন্যত্র গেছে, আমি একাকী আছি। শুনে সেজদার ভাবনার অবধি রইল না। আগ্রাতেও থাকা যায় না, লোক মরছে চারিদিকে, দাদার বাড়ি থেকে চিঠি এবং টেলিগ্রাফে ঘন ঘন তাগিদ আসচে—সেজদার সে কি বিপদ!

কমল জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু নীলিমার বাপের বাড়ি ত আছে শুনেচি?

হরেন্দ্র মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। একটা বড় রকম শ্বশুরবাড়িও আছে শুনেচি, কিন্তু সে-সকলের কোন উল্লেখই হল না। হঠাৎ একদিন অদ্ভুত সমাধান হয়ে গেল। প্রস্তাব কোন্ পক্ষ থেকে উঠেছিল জানিনে, কিন্তু, পীড়িত আশুবাবুর সেবার ভার নিলেন বৌদি।

কমল চুপ করিয়া রহিল।

হরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, তবে আশা আছে বৌদির চাকরিটা যাবে না। তাঁরা ফিরে এলেই আবার গৃহিণীপনার সাবেক কাজে লেগে যেতে পারবেন।

কমল এই শ্লেষেরও কোন উত্তর দিল না, তেমনই মৌন হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, আমি জানি, বৌদি সত্যিই সৎচরিত্রের মেয়ে। সেজদার দারুণ দুর্দিনে ছেড়ে যেতে পারেন নি, এই থাকার জন্যই হয়ত ওদিকের সকল পথ বন্ধ হয়েছে। অথচ এদিকেরও দেখলাম বিপদের দিনে পথ খোলা নেই। তাই ভাবি, বিনা দোষেও এ দেশের মেয়েরা কত বড় নিরুপায়।

কমল তেমনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিল, কিছুই বলিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এই-সব শুনে আপনি হয়ত মনে মনে হাসচেন, না?

কমল শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

হরেন্দ্র বলিল, আমি প্রায়ই যাই আশুবাবুকে দেখতে। ওঁরা দুজনেই আপনার খবর জানতে চাইছিলেন। বৌদির ত আগ্রহের সীমা নেই—একদিন যাবেন ওখানে?

কমল তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল, আজই চলুন না হরেনবাবু, তাঁদের দেখে আসি।

আজই যাবেন? চলুন। আমি একটা গাড়ি নিয়ে আসি। অবশ্য যদি পাই। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, কমল তাহাকে ফিরিয়া ডাকিয়া বলিল, গাড়িতে দুজনে একসঙ্গে গেলে আশ্রমের বন্ধুরা হয়ত রাগ করবেন। হেঁটেই যাই চলুন।

হরেন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, এর মানে?

মানে নেই,—এমনি। চলুন যাই।

উনিশ

হরেন্দ্র ও কমল আশুবাবুর গৃহে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল তখন বেলা অপরাহ্নপ্রায়। শয্যার উপরে অর্ধশায়িতভাবে বসিয়া অসুস্থ গৃহস্বামী সেইদিনের পাইয়োনিয়ার কাগজখানা দেখিতেছিলেন। দিনকয়েক হইতে আর জ্বর ছিল না, অন্যান্য উপসর্গও সারিয়া আসিতেছিল, শুধু শরীরের দুর্বলতা যায় নাই। ইঁহারা ঘরে প্রবেশ করিতে আশুবাবু কাগজ ফেলিয়া উঠিয়া বসিলেন, কি যে খুশী হইলেন সে তাঁহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল। তাঁহার মনের মধ্যে ভয় ছিল কমল হয়ত আর আসিবে না। তাই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, এস, আমার কাছে এসে বস। এই বলিয়া তাহাকে খাটের কাছেই যে চৌকিটা ছিল তাহাতে বসাইয়া দিলেন, বলিলেন, কেমন আছ বল ত কমল?

কমল হাসিমুখে জবাব দিল, ভালই ত আছি।

আশুবাবু কহিলেন, সে কেবল ভগবানের আশীর্বাদ। নইলে যে দুর্দিন পড়েচে তাতে কেউ

যে ভাল আছে তা ভাবতেই পারা যায় না। এতদিন কোথায় ছিলে বল ত? হরেন্দ্রকে রোজই জিজ্ঞাসা করি, সে রোজই এসে একই উত্তর দেয়, বাসায় তালাবন্ধ, তাঁর সন্ধান পাইনে। নীলিমা সন্দেহ করছিলেন হয়ত বা তুমি দিন-কয়েকের তরে কোথাও চলে গেছ।

হরেন্দ্রই ইহার জবাব দিল, কহিল, আর কোথাও না,—এই আগ্রাতেই মুচীদের পাড়ায় সেবার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। আজ দেখা পেয়ে ধরে এনেচি।

আশুবাবু ভয়ব্যাকুলকণ্ঠে কহিলেন, মুচীদের পাড়ায়? কিন্তু কাগজে লিখচে যে পাড়াটা উজোড় হয়ে গেল। এতদিন তাদের মধ্যেই ছিলে? একা?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, একলা নয়, সঙ্গে রাজেন্দ্র ছিলেন।

শুনিয়া হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি চাহিল, কিছু বলিল না। তাহার তাৎপর্য এই যে, তুমি না বলিলেও আমি অনুমান করিয়াছিলাম। যেথায় দৈবের এতবড় নিগ্রহ শুরু হইয়াছে সে দুর্ভাগাদের ত্যাগ করিয়া সে যে কোথাও এক পা নড়িবে না এ আমি জানিব না ত জানিবে কে?

আশুবাবু কহিলেন, অদ্ভুত মানুষ এই ছেলেটি। ওকে দু-তিনদিনের বেশী দেখিনি, কিছুই জানিনে, তবু মনে হয় কি যেন এক সৃষ্টিছাড়া ধাতুতে ও তৈরী। তাকে নিয়ে এলে না কেন, ব্যাপারগুলো জিজ্ঞাসা করতাম। খবরের কাগজ থেকে ত সব বোঝা যায় না।

কমল বলিল, না। কিন্তু তাঁর ফিরতে এখনও দেরি আছে।

কেন?

পাড়াটা এখনো নিঃশেষ হয়নি। যারা অবশিষ্ট আছে তাদের রওনা না করে দিয়ে তিনি ছুটি নেবেন না, এই তার পণ।

আশুবাবু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, তা হলে তোমারই বা কি করে ছুটি হলো? আবার কি সেখানে ফিরতে হবে? নিষেধ করতে পারিনে, কিন্তু সে যে বড় ভাবনার কথা কমল!

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, ভাবনার জন্যে নয় আশুবাবু, ভাবনা আর কোথায় নেই? কিন্তু আমার ঘড়িতে যেটুকু দম ছিল সমস্ত শেষ করে দিয়েই এসেচি। সেখানে ফিরে যাবার সাধ্য আমার নেই। শুধু রয়ে গেলেন রাজেন্দ্র। এক-একজনের দেহ-যন্ত্রে প্রকৃতি এমনি অফুরন্ত দম দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয় যে, সে না হয় কখনো শেষ, না যায় কখনো বিগড়ে। এই লোকটি তাদেরই একজন। প্রথম প্রথম মনে হতো এই ভয়ানক পল্লীর মাঝখানে এ বাঁচবে কি করে? ক'দিনই বা বাঁচবে? সেখান থেকে একলা যখন চলে এলাম কিছুতেই যেন আর ভাবনা ঘোচে না, কিন্তু আর আমার ভয় নেই। কেমন করে যেন নিশ্চয় বুঝতে পেরেচি প্রকৃতি আপনার গরজেই এদের বাঁচিয়ে রাখে। নইলে দুঃখীর কুটীরে বন্যার মত যখন মৃত্যু ঢোকে তখন তার ধ্বংসলীলার সাক্ষী থাকবে কে? আজই হরেন্দ্রবাবুর কাছে আমি এই গল্পই করছিলাম। শিবনাথবাবুর ঘর থেকে রাত্রিশেষে যখন লজ্জায় মাথা হেঁট করে বেরিয়ে এলাম—

আশুবাবু এ বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন, বলিলেন, এতে তোমার লজ্জার কি আছে কমল? শুনেচি তাঁকে সেবা করার জন্যেই তুমি অযাচিত তাঁর বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলে,—

কমল কহিল, লজ্জা সেজন্যে নয় আশুবাবু। যখন দেখতে পেলাম তাঁর কোন অসুখই নেই—সমস্তই ভান, কোন একটা ছলনায় আপনাদের দয়া পাওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য, কিন্তু তাও সফল হতে পায়নি, আপনি বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছেন—তখন কি যে আমার হলো সে আপনাকে বোঝাতে পারব না। যে সঙ্গে ছিল তাকেও এ কথা জানাতে পারিনি,—শুধু কোনমতে রাত্রির অন্ধকারে সেদিন নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। পথের মধ্যে বার বার করে কেবল এই একটা কথাই মনে হতে লাগল, এই অতি ক্ষুদ্র কাঙাল লোকটাকে রাগ করে শাস্তি দিতে যাওয়ায় না আছে ধর্ম, না আছে সম্মান।

আশুবাবু বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, বল কি কমল, শিবনাথের অসুখটা কি শুধু ছলনা? সত্যি নয়?

কিন্তু জবাব দিবার পূর্বেই দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া সবাই চাহিয়া দেখিল নীলিমা প্রবেশ করিয়াছে। তাহার হাতে দুধের বাটি। কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। সে পাত্রটা শয্যার শিয়রে তেপায়ার উপরে রাখিয়া দিয়া প্রতিনমস্কার করিল, এবং অপরের কথার মাঝখানে বাধা দিয়াছে মনে করিয়া নিজে কোন কথা না কহিয়া অদূরে নীরবে উপবেশন করিল।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু এ যে দুর্বলতা কমল! এ জিনিস ত তোমার স্বভাবের সঙ্গে মেলে না। আমি বরাবর ভাবতাম, যা অন্যায়, যা মিথ্যাচার, তাকে তুমি মাপ কর না।

হরেন্দ্র কহিল, ওঁর স্বভাবের খবর জানিনে, কিন্তু মুচীদের পাড়ায় মরণ দেখে ওঁর ধারণা বদলেছে, এ সংবাদ ওঁর কাছেই পেলাম। আগে মনের মধ্যে যে ইচ্ছাই থাক, এখন কারও বিরুদ্ধেই নালিশ করতে উনি নারাজ।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু সে যে তোমার প্রতি এতখানি অত্যাচার করলে তার কি?

কমল মুখ তুলিতেই দেখিল নীলিমা একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। জবাবটা শুনিবার জন্য সে-ই যেন সবচেয়ে উৎসুক। না হইলে হয়ত সে চুপ করিয়াই থাকিত, হরেন্দ্র যতটুকু বলিয়াছে তার বেশী একটা কথাও কহিত না। কহিল, এ প্রশ্ন আমার কাছে এখন অসংলগ্ন ঠেকে: যা নেই তা কেন নেই বলে চোখের জল ফেলতেও আজ আমার লজ্জা বোধ হয়; যেটুকু তিনি পেরেচেন, কেন তার বেশী পারলেন না বলে রাগারাগি করতেও আমার মাথা হেঁট হয়। আপনাদের কাছে প্রার্থনা শুধু এই যে, আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তাঁকে আর টানাটানি করবেন না। এই বলিয়া সে যেন হঠাৎ শ্রান্ত হইয়া চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকাইয়া চোখ বুজিল।

ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করিল নীলিমা, সে চোখের ইঙ্গিতে দুধের বাটিটা নির্দেশ করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ওটা যে একেবারে জুড়িয়ে গেল। দেখুন ত খেতে পারবেন, না আবার গরম করে আনতে বলব?

আশুবাবু বাটিটা মুখে তুলিয়া খানিকটা খাইয়া রাখিয়া দিলেন। নীলিমা মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, পড়ে থাকলে চলবে না—ডাক্তারের ব্যবস্থা ভাঙতে আমি দেবো না।

আশুবাবু অবসন্নের মত মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া কহিলেন, তার চেয়েও বড় ব্যবস্থাপক নিজের দেহ। এ কথা তোমারও ভোলা উচিত নয়।

আমি ভুলিনে, ভুলে যান আপনি নিজে।

ওটা বয়সের দোষ নীলিমা—আমার নয়।

নীলিমা হাসিয়া বলিল, তাই বৈ কি! দোষ চাপাবার মত বয়স পেতে এখনো আপনার অনেক—অনেক বাকী। আচ্ছা, কমলকে নিয়ে আমরা একটু ও-ঘরে গিয়ে গল্প করি গে, আপনি চোখ বুজে একটুখানি বিশ্রাম করুন, কেমন? যাই?

আশুবাবুর এ ইচ্ছা বোধ হয় ছিল না, তথাপি সম্মতি দিতে হইল; কহিলেন, কিন্তু একেবারে তোমরা চলে যেও না, ডাকলে যেন পাই।

আচ্ছা। চল ঠাকুরপো, আমরা পাশের ঘরে গিয়ে বসি গে। এই বলিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া গেল। নীলিমার কথাগুলি স্বভাবতঃই মধুর, বলিবার ভঙ্গীটিতে এমন একটি বিশিষ্টতা আছে যে সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু তাহার আজিকার এই গুটি-কয়েক কথা যেন তাহাদেরও ছাড়াইয়া গেল। হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু লক্ষ্য করিল কমল। পুরুষের চক্ষে যাহা এড়াইল, ধরা পড়িল রমণীর দৃষ্টিতে। নীলিমা শুশ্রূষা করিতে আসিয়াছে, এই পীড়িত লোকটির স্বাস্থ্যের প্রতি সাবধানতায় আশ্চর্যের কিছু নাই, সাধারণের কাছে এ কথা বলা চলে, কিন্তু সেই সাধারণের একজন কমল নয়। নীলিমার এই একান্ত সতর্কতার অপরূপ স্নিগ্ধতায় সে যেন এক অভাবিত বিস্ময়ের সাক্ষাৎ লাভ করিল। বিস্ময় কেবল এক দিক দিয়া নয়, বিস্ময় বহু দিক দিয়া। সম্পদের মোহ এই বিধবা মেয়েটিকে মুগ্ধ করিয়াছে এমন সন্দেহ কমল চিন্তায়ও ঠাঁই দিতে পারিল না। নীলিমার ততটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে। আশুবাবুর যৌবন ও রূপের প্রশ্ন এ-ক্ষেত্রে শুধু অসঙ্গত নয়, হাস্যকর। তবে, কোথায় যে ইহার সন্ধান মিলিবে ইহাই কমল মনের মধ্যে খুঁজিতে

লাগিল। এ ছাড়া আরও একটা দিক আছে যে। সেদিক আশুবাবুর নিজের। এই সরল ও সদাশিব মানুষটির গভীর চিত্ততলে পত্নীপ্রেমের যে আদর্শ অচঞ্চল নিষ্ঠায় নিত্য পূজিত হইতেছে, কোনদিনের কোন প্রলোভনই তাহার গায়ে দাগ ফেলিতে পারে নাই। ইহাই ছিল সকলের একান্ত বিশ্বাস। মনোরমার জননীর মৃত্যুকালে আশুবাবুর বয়স বেশী ছিল না—তখনও যৌবন অতিক্রম করে নাই ; কিন্তু সেইদিন হইতেই সেই লোকান্তরিত পত্নীর স্মৃতি উন্মূলিত করিয়া নূতনের প্রতিষ্ঠা করিতে আত্মীয়-অনাত্মীয়ের দল উদ্যম-আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই। কিন্তু সে দুর্ভেদ্য দুর্গের দুয়ার ভাঙ্গিবার কোন কৌশলই কেহ খুঁজিয়া পায় নাই। এ-সকল কমলের অনেকের মুখে শোনা কাহিনী। এ ঘরে আসিয়া অন্যমনস্কের মত নীরবে বসিয়া সে কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিল, নীলিমার মনোভাবের লেশমাত্র আভাসও এই মানুষটির চোখে পড়িয়াছে কি না। যদি পড়িয়াই থাকে, দাম্পত্যের যে সুকঠোর নীতি অত্যাজ্য ধর্মের ন্যায় একাগ্র সতর্কতায় আজীবন যাহা রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আসক্তির এই নবজাগ্রত চেতনায়, সে ধর্ম লেশমাত্রও বিক্ষুব্ধ হইয়াছে কি না।

চাকর চা, রুটি, ফল প্রভৃতি দিয়া গেল। অতিথিদের সম্মুখে সেই-সমস্ত আগাইয়া দিয়া নীলিমা নানা কথা বলিয়া যাইতে লাগিল। আশুবাবুর অসুখ, তাঁহার স্বাস্থ্য, তাঁহার সহজ ভদ্রতা ও শিশুর ন্যায় সরলতার ছোটোখাটো বিবরণ যাহা এই কয়দিনেই তাহার চোখে পড়িয়াছে,—এমনি অনেক-কিছু। শ্রোতা হিসাবে হরেন্দ্র স্ত্রীলোকের লোভের বস্তু। এবং তাহারই সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে নীলিমার বাক্‌শক্তি উচ্ছ্বসিত আবেগে শতমুখে ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। বলার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হরেন্দ্র লক্ষ্য করিল না যে, যে বৌদিদিকে সে এতদিন অবিনাশের বাসায় দেখিয়া আসিয়াছে সে-ই এই কি না। এই পরিণত যৌবনের স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য, সেই কৌতুক-রসোজ্জ্বল পরিমিত পরিহাস, বৈধব্যের সীমাবদ্ধ সংযত আলাপ-আলোচনা, সেই সুপরিচিত সমস্ত-কিছুই এই কয়দিনে বিসর্জন দিয়া আকস্মিক বাচালতায় বালিকার ন্যায় যে প্রগল্‌ভ হইয়া উঠিয়াছে, সে-ই এই কি না।

বলিতে বলিতে নীলিমার হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল, চায়ের বাটিতে দু-একবার চুমুক দেওয়া ছাড়া কমল কিছুই খায় নাই। ক্ষুণ্ণস্বরে সেই অনুযোগ করিতেই কমল সহাস্যে কহিল, এর মধ্যেই আমাকে ভুলে গেলেন?

ভুলে গেলাম? তার মানে?

তার মানে এই যে, আমার খাওয়ার ব্যাপারটা আপনার মনে নেই। অসময়ে আমি ত কিছু খাইনে।

এবং সহস্র অনুরোধেও এর ব্যতিক্রম হবার জো নেই,—এই কথাটা হরেন্দ্র যোগ করিয়া দিল।

প্রত্যুত্তরে কমল তেমনিই হাসিমুখে বলিল, অর্থাৎ এ একগুঁয়েমির পরিবর্তন নেই। কিন্তু অত দর্প আমি করিনে, হরেনবাবু, তবে সাধারণতঃ এই নিয়মটাই অভ্যাস হয়ে গেছে তা মানি।

পথে বাহির হইয়া কমল জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন কোথায় চলেছেন বলুন ত?

হরেন্দ্র বলিল, ভয় নেই, আপনার বাড়ির মধ্যে ঢুকবো না, কিন্তু যেখান থেকে এনেচি সেখানে পৌঁছে না দিলে অন্যায় হবে।

তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক-চলাচল বিরল হইয়া আসিতেছে, অকস্মাৎ অতি ঘনিষ্ঠের ন্যায় কমল তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল, চলুন আমার সঙ্গে। ন্যায়-অন্যায়ের বিচারবোধ আপনার কত সূক্ষ্ম দাঁড়িয়েছে তার পরীক্ষা দেবেন।

হরেন্দ্র সঙ্কোচে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ইহা যে ভাল হইল না, এমন করিয়া পথ চলায় যে বিপদ আছে এবং পরিচিত কেহ কোথা হইতে সম্মুখে আসিয়া পড়িলে লজ্জার একশেষ হইবে হরেন্দ্র তাহা স্পষ্ট দেখিতে লাগিল, কিন্তু না বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লওয়ার অশোভন রূঢ়তাকেও সে মনে স্থান দিতে পারিল না। ব্যাপারটা বিশ্রী ঠেকিল, এবং এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা মানিয়া লইয়াই

তাহারা বাসার দরজার সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিল। বিদায় লইতে চাহিলে কমল কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের? আশ্রমে অজিতবাবু ছাড়া ত কেউ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। আজ তিনিও নেই, সকালের গাড়িতে দিল্লী গেছেন, সম্ভবতঃ কাল ফিরবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, গিয়ে খাবেন কি? আশ্রমে পাচক রাখবার ত ব্যবস্থা নেই।

হরেন্দ্র বলিল, না, আমরা নিজেরাই রাঁধি।

অর্থাৎ আপনি আর অজিতবাবু?

হাঁ। কিন্তু হাসচেন যে? নিতান্ত মন্দ রাঁধিনে আমরা।

তা জানি, এবং পরক্ষণে সত্যই গম্ভীর হইয়া বলিল, অজিতবাবু নেই সুতরাং ফিরে গিয়ে আপনাকে নিজেই রেঁধে খেতে হবে। আমার হাতে খেতে যদি ঘৃণা বোধ না করেন ত আমার ভারী ইচ্ছে আপনাকে নিমন্ত্রণ করি। খাবেন আমার হাতে?

হরেন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, এ বড় অন্যায়। আপনি কি সত্যিই মনে করেন আমি ঘৃণায় অস্বীকার করতে পারি? এই বলিয়া সে একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আপনাকে জানাতে ত্রুটি করিনি যে যারা আপনাকে বাস্তবিক শ্রদ্ধা করে আমি তাদেরই একজন। আমার আপত্তি শুধু অসময়ে দুঃখ দিতে আপনাকে চাইনে।

কমল বলিল, আমি দুঃখ বিশেষ পাবো না তা নিজেই দেখতে পাবেন। আসুন।

রাঁধিতে বসিয়া কহিল, আমার আয়োজন সামান্য, কিন্তু আশ্রমে আপনাদেরও যা দেখে এসেচি তাকেও প্রচুর বলা চলে না। সুতরাং এখানে খাবার কষ্ট যদি বা হয়, অন্যের মত অসহ্য হবে না এইটুকুই আমার ভরসা।

হরেন্দ্র খুশী হইয়া উত্তর দিল, আমাদের খাবার ব্যবস্থা যা দেখে এসেছেন তাই বটে। সত্যিই আমরা খুব কষ্ট করে থাকি।

কিন্তু থাকেন কেন? অজিতবাবু বড়লোক, আপনার নিজের অবস্থাও অসচ্ছল নয়,—কষ্ট পাওয়ার ত কারণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, কারণ না থাক, প্রয়োজন আছে। আমার বিশ্বাস এ আপনিও বোঝেন বলে নিজের সম্বন্ধেও এমনি ব্যবস্থাই করে রেখেছেন। অথচ বাইরে থেকে কেউ যদি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে বসে, তাকেই কি এর হেতু দিতে পারেন?

কমল বলিল, বাইরের লোককে না পারি, ভিতরের লোককে দিতে পারব। আমি সত্যিই বড় দরিদ্র, নিজেকে ভরণ-পোষণ করবার যতটুকু শক্তি আছে তাতে এর বেশী চলে না। বাবা আমাকে দিয়ে যেতে পারেন নি কিছুই, কিন্তু পরের অনুগ্রহ থেকে মুক্তি পাবার এই বীজমন্ত্রটুকু দান করে গিয়েছিলেন।

হরেন্দ্র তাহার মুখের প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। এই বিদেশে কমল যে কিরূপ নিরুপায় তাহা সে জানিত। শুধু অর্থের জন্যই নয়, সমাজ, সম্মান, সহানুভূতি কোন দিক দিয়াই তাহার তাকাইবার কিছু নাই। কিন্তু, এ সত্যও সে স্মরণ না করিয়া পারিল না যে, এতবড় নিঃসহায়তাও এই রমণীকে লেশমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। আজও সে ভিক্ষা চাহে না—ভিক্ষা দেয়। যে শিবনাথ তাহার এতবড় দুর্গতির মূল তাহাকেও দান করিবার সম্বল তাহার শেষ হয় নাই। এবং বোধ করি সাহস ও সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়েই কহিল, আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করচি নে কমল, কিন্তু এ ছাড়া আর কিছু ভাবতেও পারিনে যে, আমাদের মত আপনার দারিদ্র্যও প্রকৃত নয়, একবার ইচ্ছে করলেই এ দুঃখ মরীচিকার মত মিলিয়ে যাবে। কিন্তু সে ইচ্ছে আপনার নেই, কারণ আপনিও জানেন স্বেচ্ছায় নেওয়া দুঃখকে ঐশ্বর্যের মতই ভোগ করা যায়।

কমল বলিল, যায়। কিন্তু কেন জানেন? ওটা অপ্রয়োজনের দুঃখ,—দুঃখের অভিনয় বলে। সকল অভিনয়ের মধ্যেই খানিকটা কৌতুক থাকে, তাকে উপভোগ করায় বাধা নেই। এই বলিয়া সে নিজেও কৌতুকভরে হাসিল।

সহসা ভারী একটা বেসুরা বাজিল। খোঁচা খাইয়া হরেন্দ্র ক্ষণকাল মৌন থাকিয়ে জবাব দিল, কিন্তু এটা ত মানেন যে, প্রাচুর্যের মাঝেই জীবন তুচ্ছ হয়ে আসে, অথচ, দুঃখ-দৈন্যের মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্র মহৎ ও সত্য হয়ে গড়ে ওঠে?

কমল স্টোভের উপর হইতে কড়াটা নামাইয়া রাখিল, এবং আর একটা কি চড়াইয়া দিয়া বলিল, সত্য হয়ে গড়ে ওঠার জন্যে ওদিকেও খানিকটা সত্য থাকা চাই হরেনবাবু। বড়লোক, বাস্তবিক অভাব নেই, তবু ছদ্ম-অভাবের আয়োজনে ব্যস্ত। আবার যোগ দিয়েছেন অজিতবাবু। আপনার আশ্রমের ফিলজফি আমি বুঝিনে, কিন্তু এটা বুঝি দৈন্য-ভোগের বিড়ম্বনা দিয়ে কখনো বৃহৎকে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় শুধু খানিকটা দম্ভ আর অহমিকা। সংস্কারে অন্ধ না হয়ে একটুখানি চেয়ে থাকলেই এ বস্তু দেখতে পাবেন—দৃষ্টান্তের জন্যে ভারত পর্যটন করে বেড়াতে হবে না। কিন্তু তর্ক থাক, রান্না শেষ হয়ে এল, এবার খেতে বসুন।

হরেন্দ্র হতাশ হইয়া বলিল, মুশকিল এই যে ভারতবর্ষের ফিলজফি বোঝা আপনার সাধ্য নয়। আপনার শিরার মধ্যে ম্লেচ্ছ-রক্তের ঢেউ বয়ে যাচ্ছে—হিন্দুর আদর্শ ও-চোখে তামাশা বলেই ঠেকবে। দিন, কি রান্না হয়েছে খেতে দিন।

এই যে দিই, বলিয়া কমল আসন পাতিয়া ঠাঁই করিয়া দিল। একটুও রাগ করিল না।

হরেন্দ্র সেইদিকে চাহিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা ধরুন কেউ যদি যথার্থ-ই সমস্ত বিলিয়ে দিয়ে সত্যকার অভাব ও দৈন্যের মাঝেই নেমে আসে তখন ত অভিনয় বলে তাকে তামাশা করা চলবে না! তখন ত—

কলম বাধা দিয়া কহিল, না তখন আর তামাশা নয়, তখন সত্যিকার পাগল বলে মাথা চাপড়ে কাঁদবার সময় হবে। হরেনবাবু, কিছুকাল পূর্বে আমিও কতকটা আপনার মত করেই ভেবেচি উপবাসের নেশার মত আমাকেও তা মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন করেচে, কিন্তু এখন সে সংশয় আমার ঘুচেচে। দৈন্য এবং অভাব ইচ্ছাতেই আসুক বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আসুক, ও নিয়ে দর্প করবার কিছু নেই। ওর মাঝে আছে শূন্যতা, ওর মাঝে আছে দুর্বলতা, ওর মাঝে আছে পাপ,—অভাব যে মানুষকে কত হীন, কত ছোট করে আনে, সে আমি দেখে এসেচি মহামারীর মধ্যে,—মুচীদের পাড়ায় গিয়ে। আরও একজন দেখেচেন, তিনি আপনার বন্ধু রাজেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে ত কিছু পাওয়া যাবে না,—আসামের গভীর অরণ্যের মত কি যে সেখানে লুকিয়ে আছে কেউ জানে না। আমি প্রায় ভাবি, আপনারা তাঁকেই দিলেন বিদায় করে। সেই যে কথায় আছে—মণি ফেলে অঞ্চলে কাঁচখণ্ড গেরো দেওয়া,—আপনারা ঠিক কি তাই করলেন! ভেতর থেকে কোথাও নিষেধ পেলেন না? আশ্চর্য!

হরেন্দ্র উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

আয়োজন সামান্য, তথাপি কি যত্ন করিয়াই না কমল অতিথিকে খাওয়াইল। খাইতে বসিয়া হরেন্দ্রর বার বার করিয়া নীলিমাকে স্মরণ হইল ; নারীত্বের শান্ত মাধুর্য ও শুচিতার আদর্শে ইঁহার চেয়ে বড় সে কাহাকেও ভাবিত না। মনে মনে বলিল, শিক্ষা, সংস্কার, রুচি ও প্রবৃত্তিতে বিভেদ ইঁহাদের মধ্যে যত বেশীই থাক, সেবা ও মমতায় ইঁহারা একেবারে এক। ওটা বাহিরের বস্তু বলিয়াই বৈষম্যেরও অবধি নাই, তর্কও শেষ হয় না, কিন্তু নারীর যেটি নিজস্ব আপন, সর্বপ্রকার মতামতের একান্ত বহির্ভূত, সেই গূঢ় অন্তর্দেশের রূপটি দেখিলে একেবারে চোখ জুড়াইয়া যায়। নানা কারণে আজ হরেন্দ্রর ক্ষুধা ছিল না, শুধু একজনকে প্রসন্ন করিতেই সে সাধ্যের অতিরিক্ত ভোজন করিল। কি একটা তরকারী ভাল লাগিয়াছে বলিয়া পাত্র উজাড় করিয়া ভক্ষণ করিল, কহিল, অনেকদিন অসময়ে হাজির হয়ে বৌদিদিকেও ঠিক এমনি করেই জব্দ করেচি, কমল!

কাকে, নীলিমাকে?

হাঁ।

তিনি জব্দ হতেন?

নিশ্চয়। কিন্তু স্বীকার করতেন না।

কমল হাসিয়া বলিল, কেবল আপনি নয়, সমস্ত পুরুষমানুষেরই এমনি মোটা বুদ্ধি।

হরেন্দ্র তর্ক করিয়া বলিল, আমি চোখে দেখেচি যে।

কমল কহিল, সেও জানি। আর ঐ চোখে-দেখার অহঙ্কারেই আপনারা গেলেন।

হরেন্দ্র কহিল, অহঙ্কার আপনাদেরও কম নয়। সে-বেলা বৌদিদির খাওয়া হতো না,—উপবাস করে কাটাতেন, তবু হার মানতে চাইতেন না।

কমল চুপ করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

হরেন্দ্র বলিল, আপনাদের আশীর্বাদে মোটা বুদ্ধিই আমাদের অক্ষয় হয়ে থাক—এতেই লাভ বেশী। আপনাদের সূক্ষ্ম-বুদ্ধির অভিমানে উপোস করে মরতে আমরা নারাজ।

কমল এ কথার জবাব দিল না।

হরেন্দ্র কহিল, এখন থেকে আপনার সূক্ষ্ম-বুদ্ধিটাকেও মধ্যে মধ্যে যাচাই করে দেখব।

কমল বলিল, সে আপনি পারবেন না, গরীব বলে আপনার দয়া হবে।

শুনিয়া হরেন্দ্র প্রথমটায় অপ্রতিভ হইল, তাহার পরে বলিল, দেখুন এ কথার জবাব দিতে বাধে। কেন জানেন? মনে হয় যেন রাজরানী হওয়াই যাকে সাজে, কাঙালপনা তাকে মানায় না। মনে হয় যেন আপনার দারিদ্র্য পৃথিবীর সমস্ত বড়লোকের মেয়েকে উপহাস করচে।

কথাটা তীরের মত গিয়া কমলের বুকে বাজিল।

হরেন্দ্র পুনরায় কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কমল থামাইয়া দিয়া বলিল, আপনার খাওয়া হয়ে গেছে, এবার উঠুন। ও ঘরে গিয়ে সারা রাত গল্প শুনবো, এ ঘরের কাজটা ততক্ষণে সেরে নিই।

খানিক পরে শোবার ঘরে আসিয়া কমল বসিল, কহিল, আজ আপনার বৌদিদির সমস্ত ইতিহাস না শুনে আপনাকে ছাড়বো না, তা যত রাত্রিই হোক। বলুন।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল, কহিল, বৌদিদির সমস্ত কথা ত আমি জানিনে। তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার এই আগ্রায়, অবিনাশদাদার বাসায়। বস্তুতঃ তাঁর সম্বন্ধে কিছুই প্রায় জানিনে। যেটুকু এখানকার অনেকেই জানে আমিও ততটুকুই জানি। কেবল একটা কথা বোধ করি সংসারে সকলের চেয়ে বেশী জানি, সে তাঁর অকলঙ্ক শুভ্রতা। স্বামী যখন মারা যান, তখন বয়স ছিল ওঁর উনিশ-কুড়ি,—তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়েই পেয়েছিলেন। সে মোছেনি, মোছবার নয়,—জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত সে স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে। পুরুষমহলে আশুবাবুর কথা যখন ওঠে,—তাঁর নিষ্ঠাও অনন্যসাধারণ—আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু—

হরেনবাবু, রাত্রি অনেক হ'লো, এখন ত আর বাসায় যাওয়া চলে না,—এই ঘরেই একটা বিছানা করে দিই?

হরেন্দ্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এই ঘরে? কিন্তু আপনি?

কমল কহিল, আমিও এইখানেই শোব। আর ত ঘর নেই।

হরেন্দ্র লজ্জায় পাংশু হইয়া উঠিল।

কমল হাসিয়া বলিল, আপনি ত ব্রহ্মচারী। আপনারও ভয়ের কারণ আছে নাকি?

হরেন্দ্র স্তব্ধ নির্নিমেষ-চক্ষে শুধু চাহিয়া রহিল। এ যে কি প্রস্তাব সে কল্পনা করিতেও পারিল না। স্ত্রীলোক হইয়া এ কথা এ উচ্চারণ করিল কি করিয়া!

তাহার অপরিসীম বিহ্বলতা কমলকেও ধাক্কা দিল। সে কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, আমারই ভুল হয়েচে হরেনবাবু, আপনি বাসায় যান। তাইতেই আপনার অশেষ শ্রদ্ধার পাত্রী নীলিমার আশ্রমে ঠাঁই মেলেনি, মিলেছিল আশুবাবুর বাড়ি। নির্জন গৃহে অনাত্মীয় নরনারীর একটিমাত্র সম্বন্ধই আপনি জানেন—পুরুষের কাছে মেয়েমানুষ যে শুধুই মেয়েমানুষ, এর বেশী খবর আপনার কাছে আজও পৌঁছায় নি। ব্রহ্মচারী হলেও না। যান, আর দেরি করবেন না, আশ্রমে যান। এই বলিয়া সে নিজেই বাহিরের অন্ধকার বারান্দায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরেন্দ্র মূঢ়ের মত মিনিট দুই-তিন দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া আসিল।

কুড়ি

প্রায় মাসাধিক-কাল গত হইয়াছে। আগ্রায় ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী মূর্তিটা শান্ত হইয়াছে, স্থানে স্থানে দুই-একটা নূতন আক্রমণের কথা না শুনা যায় তাহা নয়, তবে, মারাত্মক নয়। কমল ঘরে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেলাই করিতেছিল, হরেন্দ্র প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একটা পুঁটুলি, নিকটে মেঝের উপর রাখিয়া দিয়া কহিল, যে-রকম খাটচেন তাতে তাগাদা করতে লজ্জা হয়। কিন্তু লোকগুলো এমনি বেহায়া যে দেখা হলেই জিজ্ঞেসা করবে, হলো? আমি কিন্তু স্পষ্টই জবাব দিই যে, ঢের দেরি। জরুরী থাকে ত না হয় বলুন, কাপড় ফিরিয়ে নিয়ে যাই। কিন্তু মজা এই যে, আপনার হাতের তৈরী জিনিস যে একবার ব্যবহার করেচে, সে আর কোথাও যেতে চায় না। এই দেখুন না লালাদের বাড়ি থেকে আবার এক থান গরদ, আর নমুনার জামাটা দিয়ে গেল—

কমল সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, নিলেন কেন?

নিই সাধে? বললাম ছ মাসের আগে হবে না,—তাতেই রাজী। বললে, ছ মাসের পর ত হবে তাতেই চলবে। এই দেখুন না মজুরির টাকা পর্যন্ত হাতে গুঁজে দিয়ে গেল। এই বলিয়া সে পকেট হইতে একখানা নোটের মধ্যে মোড়া কয়েকটা টাকা ঠক্‌ করিয়া কমলের সম্মুখে ফেলিয়া দিল।

কমল কহিল, অর্ডার এত বেশী আসতে থাকলে দেখচি আমাকে লোক রাখতে হবে। এই বলিয়া সে পুঁটুলিটা খুলিয়া ফেলিয়া পুরানো পাঞ্জাবি জামাটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া কহিল, কোন বড় দোকানের বড় মিস্ত্রীর তৈরী,—আমাকে দিয়ে এ রকম হবে না। দামী কাপড়টা নষ্ট হয়ে যাবে, তাঁকে ফিরিয়ে দেবেন।

হরেন্দ্র বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, আপনার চেয়ে বড় কারিগর এখানে কেউ আছে নাকি?

এখানে না থাকে কলকাতায় আছে। সেইখানেই পাঠিয়ে দিতে বলবেন।

না না, সে হবে না। আপনি যা পারেন তাই করেদেবেন, তাতেই হবে।

হবে না হরেনবাবু, হলে দিতাম। এই বলিয়া সে হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, অজিতবাবু বড়লোক, শৌখিন মানুষ, যা-তা তৈরি করে দিলে তিনি পরতে পারবেন কেন? কাপড়টা মিথ্যে নষ্ট করে লাভ নেই, আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

হরেন্দ্র অতিশয় আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, কি করে জানলেন এটা অজিতবাবুর?

কমল কহিল, আমি হাত গুণতে পারি। গরদের কাপড়, অগ্রিম মূল্য, অথচ ছ'মাস বিলম্ব হলেও চলে,—হিন্দুস্থানী লালাজিরা অত নির্বোধ নয়, হরেনবাবু। তাঁকে জানাবেন—তাঁর জামা তৈরী করার যোগ্যতা আমার নেই, আমি শুধু গরীবের সস্তা গায়ের কাপড়ই সেলাই করতে পারি। এ পারিনে।

হরেন্দ্র বিপদে পড়িল। শেষে কহিল, এ তার ভারী ইচ্ছে। কিন্তু পাছে আপনি জানতে পরেন, পাছে আপনার মনে হয় আমরা কোনমতে আপনাকে কিছু দেবার চেষ্টা করচি, সেই ভয়ে অনেকদিন আমি স্বীকার করিনি। তাকে বলেছিলাম অল্পমূল্যে সাধারণ একটা কোন কাপড় কিনে দিতে। কিন্তু সে রাজী হ'লো না। বললে, এ ত আমার নিত্যব্যবহারের মেরজাই নয়, এ কমলের হাতের তৈরী জামা, এ শুধু বিশেষ উপলক্ষে পর্বদিনে পরবার। এ আমার তোলা থাকবে। এ জগতে তার চেয়ে শ্রদ্ধা বোধ করি আপনাকে কেউ করে না।

কমল বলিল, কিছুকাল পূর্বে ঠিক এর উলটো কথাই তাঁর মুখ থেকে বোধ করি অনেকেই শুনেছিল। নয় কি? একটু চেষ্টা করলে আপনারও হয়ত স্মরণ হবে। মনে করে দেখুন ত?

এই সেদিনের কথা, হরেন্দ্রর সমস্তই মনে ছিল ; একটু লজ্জা পাইয়া বলিল, মিথ্যে নয়; কিন্তু এ ধারণা ত একদিন অনেকেরই ছিল। বোধ হয় ছিল না শুধু আশুবাবুর, কিন্তু তাঁকেও একদিন বিচলিত হতে দেখেচি। আমার নিজের কথাটাই ধরুন না, আজ ত আর প্রমাণ দিতে

হবে না, কিন্তু সেদিনের কষ্টিপাথরে ঘষে ভক্তি-শ্রদ্ধা যাচাই করতে চাইলে আমিই বা দাঁড়াই কোথায়?

কমল জিজ্ঞাসা করিল, রাজেনের খোঁজ পেলেন?

হরেন্দ্র বুঝিল, এই-সকল হৃদয়-সম্পর্কিত আলোচনা আর একদিনের মত আজও স্থগিত রহিল। বলিল, না এখনো পাইনি। ভরসা আছে এসে উপস্থিত হলেই পাবো।

কমল বলিল, সে আমি জানতে চাইনি, পুলিসের জিম্মায় গিয়ে পড়েচে কিনা এই খোঁজটাই আপনাকে নিতে বলেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল, নিয়েছি। আপাততঃ তাদের আশ্রয়ে নেই।

শুনিয়া কমল নিশ্চিত হইতে পারিল না বটে, কিন্তু স্বস্তিবোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় গেছেন এবং কবে গেছেন, মুচীদের পাড়ায় চেষ্টা করে একটু খোঁজ নিলে কি বার করা যায় না? হরেনবাবু, তাঁর প্রতি আপনার স্নেহের পরিমাণ জানি, এ-সকল প্রশ্ন হয়ত বাহুল্য মনে হবে, কিন্তু ক'দিন থেকে এ-ছাড়া কিছু আর আমি ভাবতেই পারিনে, আমার এমনি দশা হয়েছে। এই বলিয়া সে এমনি ব্যাকুলচক্ষে চাহিল যে, হরেন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে মুখ নামাইয়া পূর্বের মতই সেলাইয়ের কাজে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া দিল।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। এই সময়ে এক-একটা প্রশ্ন তাহার মনে আসে, কৌতূহলের সীমা নাই—মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া পড়িতেও চায়, কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লয়। কিছুতেই স্থির করিতে পারে না, এ জিজ্ঞাসার ফল কি হইবে। এইভাবে পাঁচ-সাত মিনিট কাটার পরে কমল নিজেই কথা কহিল। সেলাইটা পাশে নামাইয়া রাখিয়া একটা সমাপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, থাক আজ আর না। এই বলিয়া মুখ তুলিয়া আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কি, দাঁড়িয়ে আছেন যে! একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসতেও পারেন নি?

বসতে আপনি ত বলেন নি।

বেশ যা হোক। বলিনি বলে বসবেন না?

না। না বললে বসা উচিতও নয়।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতেও ত বলিনি—দাঁড়িয়ে বা আছেন কেন?

এ যদি বলেন ত আমার না দাঁড়নই উচিত ছিল। ত্রুটি স্বীকার করচি।

শুনিয়া কমল হাসিল। বলিল, তা হলে আমিও দোষ স্বীকার করচি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক থাকা আমার অপরাধ। এখন বসুন।

হরেন্দ্র চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিলে কমল হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। একবার কি একটু চিন্তা করিল, তাহার পরে কহিল, দেখুন হরেনবাবু, আসলে এর মধ্যে যে কিছুই নেই এ আমিও জানি, আপনিও জানেন। তবু লাগে। এই যে বসতে বলতে ভুলেচি, যে আদরটুকুও অতিথিকে করা উচিত ছিল, করিনি,—হাজার ঘনিষ্ঠতার মধ্যে দিয়েও সে ত্রুটি আপনার চোখে পড়েচে। না না, রাগ করেছেন বলিনি, তবুও কেমন যেন মনের মধ্যে একটু লাগে। এ সংস্কার মানুষের গিয়েও যেতে চায় না—কোথায় একটুখানি থেকেই যায়। না?

হরেন্দ্র ইহার তাৎপর্য বুঝিল না, একটু আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, এর থেকে সংসারে কত অনর্থপাতই না হয়। অথচ, এইটিই লোকে সবচেয়ে বেশি ভোলে। না?

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব আমাকে বলচেন, না আপনাকে আপনি বলচেন? যদি আমার জন্যে হয়, ত আর একটু খোলসা করে বলুন। এ হেঁয়ালি আমার মাথায় ঢুকচে না।

কমল হাসিয়া বলিল, হেঁয়ালিই বটে। সহজ সরল রাস্তা, মনেই হয় না যে বিপত্তি চোখ রাঙিয়ে আছে। চলতে হোঁচট লেগে আঙুল দিয়ে যখন রক্ত ঝরে পড়ে, তখনি কেবল চৈতন্য জাগে—আর একটুখানি চোখ মেলে চলা উচিত ছিল। না?

হরেন্দ্র কহিল, পথের সম্বন্ধে হাঁ। অন্ততঃ আগ্রার রাস্তায় একটু হুঁশ করে চলা ভাল,—ও

দুর্ঘটনা আশ্রমের ছেলেদের প্রায়ই ঘটে। কিন্তু হেঁয়ালি ত হেঁয়ালিই রয়ে গেল, মর্মার্থ উপলব্ধি হ'ল না।

কমল কহিল, তার উপায় নেই হরেনবাবু। বললেই সকল কথার মর্ম বোঝা যায় না। এই দেখুন, আমাকে ত কেউ বলে দেয়নি, কিন্তু অর্থ বুঝতেও বাধেনি।

হরেন্দ্র বলিল, তার মানে আপনি ভাগ্যবতী, আমি দুর্ভাগা। হয় সাধারণ মানুষের মাথায় ঢোকে এমনি ভাষায় বলুন, না হয় থামুন। চিনে-বাজির মত এ যত চাচ্চি খুলতে, তত যাচ্চে জড়িয়ে। অজ্ঞাত অথবা অজ্ঞেয় বাধা থেকে বক্তব্য আরম্ভ হয়ে যে এ কোথায় এসে দাঁড়াল তার কুল-কিনারা পাচ্চিনে। এ-সমস্ত কি আপনি রাজেনকে স্মরণ করে বলচেন? তাকে আমিও ত চিনি, সহজ করে বললে হয়ত কিছু কিছু বুঝতেও পারবো। নইলে এভাবে ঘুমন্ত মানুষের বক্তৃতা শুনতে থাকলে নিজের বুদ্ধির পরে আস্থা থাকবে না।

কমল হাসিমুখে বলিল, কার বুদ্ধির পরে? আমার না নিজের?

দুজনেরই।

কমল বলিল, শুধু রাজেনকেই নয়, কি জানি কেন, সকাল থেকে আজ আমার সকলকেই মনে পড়চে। আশুবাবু, মনোরমা, অক্ষয়, অবিনাশ, নীলিমা, শিবনাথ,—এমন কি আমার বাবা—

হরেন্দ্র বাধা দিল, ও চলবে না। আপনি আবার গম্ভীর হয়ে উঠচেন। আপনার বাপ-মা স্বর্গে গেছেন, তাঁদের টানাটানি আর সইবে না। বরঞ্চ, যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁদের কথা, আপনি রাজেনের কথা বলতে চাচ্ছিলেন—তাই বলুন আমি শুনি। সে আমার বন্ধু, তাকে চিনি, জানি, ভালবাসি,—আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আশ্রমই করি আর যাই করি, আপনাকে ঠকাবো না, সংসারে আরও পাঁচজনের মত ভালবাসার গল্প শুনতে আমিও ভালবাসি।

কমলের গাম্ভীর্য সহসা হাসিতে ভরিয়া গেল, প্রশ্ন করিল, শুধু পরের কথা শুনতেই ভালবাসেন? তার বেশিতে লোভ নেই?

হরেন্দ্র বলিল, না। আমি ব্রহ্মচারীদের পাণ্ডা—অক্ষয়ের দল শুনতে পেলে আমায় খেয়ে ফেলবে।

শুনিয়া কমল পুনশ্চ হাসিয়া কহিল, না, তারা খাবে না, আমি উপায় করে দেবো।

হরেন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পারবেন না। আশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে পালিয়ে গিয়েও আর আমার নিস্তার নেই। অক্ষয় একবার যখন আমাকে চিনেছে, যেখানেই যাই সৎপথে আমাকে সে রাখবেই। বরঞ্চ, আপনি নিজের কথা বলুন। রাজেনকে যে ভুলে থাকতে পারেন না—আবার সেইখান থেকে আরম্ভ করুন। কি করে সেই লক্ষ্মীছাড়া ছোঁড়াটাকে এতখানি ভালবাসলেন আমার শুনতে সাধ হয়।

কমল কহিল, ঠিক এই প্রশ্নটাই আমি বারে বারে আপনাকে আপনি করি।

সন্ধান পান না?

না।

পাবার কথাও নয়। এবং সত্যি বলে আমার বিশ্বাসও হয় না।

কেন বিশ্বাস হয় না?

সে যাক। মনে হচ্ছে আগে একবার বলেছি। কিন্তু আরও ভাল ক্যানডিডেট আছে। মীমাংসা চূড়ান্ত করবার আগে তাদের কেসগুলো একটুখানি নজর করে দেখবেন। এইটুকু নিবেদন।

কিন্তু কেস ত অনুমানে ভর করে বিচার করা যায় না, হরেনবাবু, রীতিমত সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে হয়। সে করবে কে?

তারা নিজেরাই করবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আছে, হাঁক দিলেই হাজির করতে হয়।

কমল জবাব দিল না, মুখ তুলিয়া চাহিয়া একটুখানি হাসিল। তাহার পরে সমাপ্ত ও অসমাপ্ত

সেলাইয়ের কাজগুলা একে একে পরিপাটি ভাঁজ করিয়া একটা বেতের টুকরিতে তুলিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনার বোধ করি চা খাবার সময় হয়েছে হরেনবাবু, একটুখানি তৈরি করে আনি, আপনি বসুন।

হরেন্দ্র কহিল, বসেই ত আছি। কিন্তু জানেন ত চা খাবার আমার সময় অসময় নেই কারণ পেলেই খাই, না পেলে খাইনে। ওর জন্যে কষ্ট পাবার প্রয়োজন নেই। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

স্বচ্ছন্দে।

অনেকদিন আপনি কোথাও যাননি। ওটা কি ইচ্ছে করেই বন্ধ করেছেন?

কমল আশ্চর্য হইয়া বলিল, না। এ আমার মনেও হয়নি।

তা হলে চলুন না আজ আশুবাবুর বাড়ি থেকে একটু ঘুরে আসি। তিনি সত্যিই খুব খুশী হবেন। সেই অসুখের মধ্যে একবার গিয়েছিলেন; এখন ভাল হয়েছেন। শুধু ডাক্তারের নিষেধ বলে বাইরে আসেন না, নইলে হয়ত একদিন নিজেই এসে উপস্থিত হতেন।

কমল বলিল, তাঁর পক্ষে আশ্চর্য নয়। যাওয়া আমারই উচিত ছিল, কিন্তু কাজের ঝঞ্ঝাটে যেতে পারিনি। অন্যায় হয়ে গেছে।

তা হলে আজই চলুন না?

চলুন। কিন্তু সন্ধ্যেটা হোক। আপনি বসুন, চট করে এক বাটি চা নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে উভয়ে পথে বাহির হইয়া হরেন্দ্র বলিল, একটু বেলা থাকতে গেলেই ভাল হতো।

কমল কহিল, হতো না। চেনা লোক, কেউ হয়ত দেখে ফেলতো।

দেখলেই বা। ও-সব আমি আর গ্রাহ্য করিনে।

কিন্তু আমি এখন গ্রাহ্য করি।

হরেন্দ্র মনে করিল পরিহাস, কহিল, কিন্তু ওই চেনা লোকেরাই যদি শোনে আপনি আমার সঙ্গে একলা বার হতে আজকাল সঙ্কোচবোধ করেন, কি তারা ভাবে?

বোধ হয় ভাবে ঠাট্টা করচি।

কিন্তু আপনাকে যে চেনে সে কি অন্য কিছু ভাবতে পারে? বলুন? এবার কমল চুপ করিয়া রহিল।

জবাব না পাইয়া হরেন্দ্র বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েছে জানিনে, সমস্তই দুর্বোধ্য।

কমল বলিল, যা বোঝবার নয় সে না বোঝাই ভাল। রাজেনকে যে ভুলতে পারিনে—এ সবচেয়ে বেশী টের পাই আপনি এলে। তার আশ্রমে স্থান হ'লো না, কিন্তু গাছতলায় থাকলেও তার চলে যেতো, শুধু আমিই থাকতে দিইনি, আদর করে ডেকে এনেছিলাম। ঘরে এলো, কিন্তু কোথাও মন বাধা পেলে না। হাওয়া-আলোর মত সব দিক খালি পড়ে রইলো, পুরুষের যেন একটা নূতন পরিচয় পেলাম। এ ভাল কি মন্দ, ভেবে দেখবার সময় পাইনি,—হয়ত বুঝতে দেরি হবে।

হরেন্দ্র কহিল, এ মস্ত সান্ত্বনা।

সান্ত্বনা? কেন?

তা জানিনে।

কেহই আর কথা কহিল না—উভয়েই কেমন একপ্রকার বিমনা হইয়া রহিল।

হরেন্দ্র ইচ্ছা করিয়াই, বোধ করি একটু ঘুর-পথ লইয়াছিল, আশুবাবুর বাটীতে আসিয়া যখন তাহারা পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। খবর দিয়া ঘরে ঢুকিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় হরেন্দ্র আসিতে পারে নাই বলিয়া বেয়ারাটাকে সুমুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু ভাল আছেন?

সে প্রণাম করিয়া কহিল, হ্যাঁ, ভালই আছেন।

তাঁর ঘরেই আছেন?

না, উপরে সামনের ঘরে বসে সবাই গল্প করচেন।

সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে কমল জিজ্ঞাসা করিল, সবাইটা কারা?

হরেন্দ্র কহিল, বৌদি—আর বোধ হয় কেউ—কি জানি।

পর্দা সরাইয়া ঘরে ঢুকিয়া দুজনেই একটু আশ্চর্য হইল। এসেন্স ও চুরুটের কড়া গন্ধ একত্রে মিশিয়া ঘরের বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নীলিমা উপস্থিত নাই, আশুবাবু বড় চেয়ারের হাতলে দুই পা ছড়াইয়া দিয়া চুরুট টানিতেছেন, এবং অদূরে সোফার উপরে সোজা হইয়া বসিয়া একজন অপরিচিতা মহিলা। ঘরের কড়া আবহওয়ার মতই কড়া ভাব—বাঙালীর, মেয়ে, কিন্তু বাংলা রুচি নাই। হয়ত, অভ্যাসও নাই। হরেন্দ্র ও কমল ঘরে পা দিয়াই শুনিয়াছিল তিনি অনর্গল ইংরাজি বলিয়া যাইতেছেন।

আশুবাবু মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। কমলের প্রতি চোখ পড়িতেই সমস্ত মুখ তাঁহার আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বোধ করি একবার উঠিয়া বসিবার চেষ্টাও করিলেন, কিন্তু হঠাৎ পারিয়া উঠিলেন না। মুখের চুরুটটা ফেলিয়া দিয়া শুধু বলিলেন, এসো কমল, এসো। অপরিচিতা রমণীকে নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ইনি আমার একজন আত্মীয়া। পরশু এসেছেন, খুব সম্ভব এখানে কিছুদিন ধরে রাখতে পারব।

একটু থামিয়া বলিলেন, বেলা, ইনি কমল। আমার মেয়ের মত।

উভয়েই উভয়কে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

হরেন্দ্র কহিল, আর আমি?

ওহো—তাও ত বটে। ইনি হরেন্দ্র—প্রফেসর অক্ষয়ের পরম বন্ধু। বাকী পরিচয় যথাসময়ে হবে,—চিন্তার হেতু নেই হরেন্দ্র। কমলকে ইঙ্গিতে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কাছে এসো ত কমল, তোমার হাতখানি নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে বসি। এইজন্যে প্রাণটা যেন কিছুদিন থেকে ছটফট করছিল।

কমল হাসিমুখে তাঁহার কাছে গিয়া বসিল এবং দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার মোটা ভারী হাতখানি কোলের উপর টানিয়া লইল।

আশুবাবু সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, খেয়ে এসেচো ত?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আশুবাবু ছোট্ট একটু নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, জেনেই বা লাভ কি? এ বাড়িতে খাওয়াতে পারবো না ত!

কমল চুপ করিয়া রহিল।

একুশ

বেলার মুখের প্রতি চাহিয়া আশুবাবু একটু হাসিলেন, কহিলেন, কেমন, বর্ণনা আমার মিললো তো? বুড়োবয়সে extravagance বলে উপহাস করা যে উচিত হয়নি, মানলে ত?

মহিলাটি নির্বাক হইয়া রহিলেন। আশুবাবু কমলের হাতখানি বার-কয়েক নাড়াচাড়া করিয়া বলিতে লাগিলেন, এই মেয়েটির বাইরেটা দেখেও মানুষের যেমন আশ্চর্য লাগে, ভেতরটা দেখতে পেলেও তেমনি অবাক হতে হয়। কেমন হরেন্দ্র, ঠিক নয়?

হরেন্দ্রও চুপ করিয়া রহিল; কমল হাসিয়া জবাব দিল, এ ঠিক কি না তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু কেউ যদি আপনাকে extravagant বলে তামাশা করে থাকেন, তিনি যে বেঠিক নন তাতে সন্দেহ নেই। মাত্রাজ্ঞানটা আপনার এ সংসারে অচল।

ইস, তাই বৈ কি! বলিয়াই আশুবাবু গভীর স্নেহের সুরে কহিলেন, এ বাড়িতে খাওয়াতে তোমাকে কিছুতেই পারবো না জানি, কিন্তু নিজের বাসাতে আজ কি খেলে বল ত?

রোজ যা খাই, তাই।

তবু কি শুনিই না? বেলা ভাবছিলেন, এও আমি বাড়িয়ে বলেচি।

কমল কহিল, অর্থাৎ আমার সম্বন্ধে আমার অসাক্ষাতে অনেক আলোচনাই হয়ে গেছে?

তা হয়েছে—অস্বীকার করবো না।

রৌপ-পাত্রে একখানা ছোট কার্ড লইয়া বেহারা ঘরে ঢুকিল। লেখাটা সকলেরই চোখে পড়িল, এবং সকলেই আশ্চর্য হইলেন। এ গৃহে অজিত একদিন বাড়ির ছেলের মতই ছিল, কিন্তু আগ্রায় থাকিয়াও আর সে আসে না। হয়ত ইহাই স্বাভাবিক। তথাপি এই না আসার লজ্জা ও সঙ্কোচ উভয় পক্ষেই এমনিই একটা ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে যে তাহার এই অপ্রত্যাশিত আগমনে শুধু আশুবাবুই নয়, উপস্থিত সকলেই একটু চমকিত হইলেন। তাঁহার মুখের পরে ভারী একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কহিলেন, তাঁকে এই ঘরেই নিয়ে আয়।

খানিক পরে অজিত ঘরে ঢুকিল। পরিচিত ও অপরিচিত এতগুলি লোকের উপস্থিতির সম্ভাবনা সে আশঙ্কা করে নাই।

আশুবাবু কহিলেন, ব'সো অজিত। ভাল আছ?

অজিত মাথা নাড়িয়া কহিল, আজ্ঞে, হাঁ। আপনার শরীরটা এখন কেমন আছে? ভাল মনে হচ্চে ত?

আশুবাবু বলিলেন, অসুখটা সেরেচে বলেই ভরসা পাচ্চি।

পরস্পর কুশল প্রশ্নোত্তর এইখানে থামিল। কমল না থাকিলে হয়ত আরও দুই-একটা কথা চলিতে পারিত, কিন্তু চোখাচোখি হইবার ভয়ে অজিত সেদিকে মুখ তুলিতে সাহস করিল না। মিনিট দুই-তিন সকলেই চুপ করিয়া থাকার পরে হরেন্দ্র প্রথমে কথা কহিল। জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি সোজা বাসা থেকেই এখন আসচেন?

কিছু একটা বলিতে পাইয়া অজিত বাঁচিয়া গেল। বলিল, না, ঠিক সোজা আসতে পারিনি, আপনার সন্ধানে একটু ঘুর-পথেই আসতে হয়েছে।

আমার সন্ধানে? প্রয়োজন?

প্রয়োজন আমার নয়, আর একজনের। তিনি রাজেনের খোঁজে দুপুর থেকে বোধ করি বার-চারেক উঁকি মেরে গেলেন। বসতে বলেছিলাম, কিন্তু রাজী হলেন না। স্থির হয়ে অপেক্ষা করাটা হয়ত ধাতে সয় না।

হরেন্দ্র শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, লোকটিকে দেখতে কেমন? বললেন না কেন সে এখানে নেই?

অজিত কহিল, সে সংবাদ তাঁকে দিয়েছি।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, এই রাজেন ছেলেটিকে আমি দু'-তিনবারের বেশী দেখিনি—বিপদে না পড়লে তার সাক্ষাৎ মেলে না, কিন্তু মনে হয় তাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কি যেন একটা মহামূল্য জিনিস সে সঙ্গে নিয়ে বেড়ায়। অথচ, হরেন্দ্রর মুখে শুনি সে ভারী wild,—পুলিসে তাকে সন্দেহের চোখে দেখে, ভয় হয় কোথায় কি একটা বিভ্রাট ঘটিয়ে বসবে, হয়ত খবরও একটা পাবো না,—এই দেখ না হঠাৎ কোথায় যে অদৃশ্য হয়েছে কেউ খুঁজে পাচ্চে না।

কমল প্রশ্ন করিল, হঠাৎ যদি খবর পান সে বিপদে পড়েচে, কি করেন?

আশুবাবু বলিলেন, কি করি সে জবাব শুধু তখনই দেওয়া যায়, এখন নয়। অসুখের সময় নীলিমা আর আমি বহু কাহিনীই তার হরেনের কাছ থেকে শুনেচি। পরার্থে আপনাকে সত্যি করে বিলিয়ে দেওয়ার স্বরূপটা যে কি, শুনতে শুনতে যেন তার ছবি দেখতে পেতাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন না তার কোন বিপদ ঘটে।

প্রকাশ্যে কেহ কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে সকলেই বোধ হয় এ প্রার্থনায় যোগ দিল। কমল জিজ্ঞাসা করিল নীলিমাকে আজ ত দেখতে পেলাম না? বোধ করি কাজে ব্যস্ত আছেন?

আশুবাবু কহিলেন, কাজের লোক, দিনরাত কাজেই ব্যস্ত থাকেন সত্যি, কিন্তু আজ শুনতে

পেলাম মাথা ধরে বিছানা নিয়েছেন। শরীরটা বোধ হয় একটু বেশী রকমই খারাপ হয়েছে, নইলে, এ তাঁর স্বভাব নয়। কোন মানুষই যে অবিশ্রান্ত এত সেবা, এত পরিশ্রম করতে পারে, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, অবিনাশের সঙ্গে আলাপ আগ্রায়। মাঝে মাঝে আসি যাই—কতটুকুই বা পরিচয়, অথচ, আজ ভাবি সংসারে আপন-পর বলে যে একটা কথা আছে সে কত অর্থহীন। দুনিয়ায় আপনার-পর কেউ নেই কমল, স্রোতের টানে কে যে কখন কাছে আসে, আর কে যে ভেসে দূরে যায় তার কোন হিসাব কেউ জানে না।

কথাটা যে কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিসের দুঃখে বলা হইল তাহা শুধু সেই অপরিচিত রমণী বেলা ব্যতীত অপর সকলেই বুঝিল। আশুবাবু কতকটা যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন, এই রোগ থেকে উঠে পর্যন্ত সংসারে অনেক জিনিসই যেন আর একরকম চেহারায় চোখে ঠেকে। মনে হয়, কিসের জন্যই বা এত টানাটানি, এত বাঁধাবাঁধি, এত ভালমন্দর বাদানুবাদ,—মানুষে অনেক ভুল, অনেক ফাঁকি নিজের চারপাশে জমা করে স্বেচ্ছায় কানা হয়ে গেছে। আজও তাকে বহু যুগ ধরে অনেক অজানা সত্য আবিষ্কার করতে হবে, তবে যদি একদিন সে সত্যিকার মানুষ হয়ে উঠতে পারে। আনন্দ ত নয়, নিরানন্দই যেন তার সভ্যতা ও ভদ্রতার চরম লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

কমল বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। তাঁহার বাক্যের তাৎপর্য যে নিঃসংশয়ে বুঝিতেছে তাহা নয়,—যেন কুয়াশার মধ্যে আগন্তুকের মুখ দেখা। কিন্তু পায়ের চলন অত্যন্ত চেনা।

আশুবাবু আপনিই থামিলেন। বোধ হয় কমলের বিস্মিত দৃষ্টি তাঁহাকে নিজের দিকে সচেতন করিল, বলিলেন, তোমার সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা আছে কমল, আর একদিন এসো।

আসবো। আজ যাই।

এসো। গাড়িটা নীচেই আছে, তোমাকে পৌঁছে দেবে বলেই বাসদেওকে এখনো ছুটি দিইনি। অজিত, তুমিও কেন সঙ্গে যাও না, ফেরবার পথে তোমাদের আশ্রমে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে আসবে।

উভয়ে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া আসিল। বেলা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির কাছে আসিয়া কহিল, আপনার সঙ্গে আলাপ করবার আজ সময় হলো না, কিন্তু এবার যেদিন দেখা হবে আমি ছাড়বো না।

কমল হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু ভয় হয় পরিচয় পেয়ে না আপনার মত বদলায়।

গাড়ির মধ্যে দুজনে পাশাপাশি বসিয়া। রাস্তায় মোড় ফিরিলে কমল কহিল, সেদিনের রাতটাও এমনি অন্ধকার ছিল, মনে পড়ে?

পড়ে।

সেদিনের পাগলামি?

তাও মনে পড়ে।

আমি রাজী হয়েছিলাম সে মনে আছে?

অজিত হাসিয়া কহিল, না। কিন্তু আপনি যে বিদ্রূপ করেছিলেন সে মনে আছে।

কমল বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বিদ্রূপ করেছিলাম? কৈ না!

নিশ্চয় করেছিলেন।

কমল বলিল, তা হলে আপনি ভুল বুঝেছিলেন। সে যাক, আজ ত আর তা করচি নে—চলুন না, আজই দুজনে চলে যাই?

দুৎ! আপনি ভারী দুষ্টু।

কমল হাসিয়া ফেলিল, কহিল, দুষ্টু কিসের? আমার মত এমন শান্ত সুবোধ কে আছে বলুন

ত? হঠাৎ হুকুম করলেন, কমল, চল যাই,—তক্ষুণি রাজী হয়ে বললাম, চলুন!

কিন্তু সে ত শুধু পরিহাস।

কমল বলিল, বেশ, না হয় পরিহাসই হলো, কিন্তু হঠাৎ অপরাধটা কি করেছি বলুন ত? ডাকতেন তুমি বলে, আরম্ভ করেছেন আপনি বলতে। কত দুঃখ কষ্টে দিন চলে—আপনাদেরই জামা-কাপড় সেলাই করে কোন মতে হয়ত দুটি খেতে পাই অথচ, আপনার টাকার অবধি নেই,—একটা দিনও কি খবর নিয়েছেন? মনোরমা এ দুঃখে পড়লে কি আপনি সইতেন? দিনরাত খেটে খেটে কত রোগা হয়ে গেছি দেখুন ত? এই বলিয়া সে নিজের বাঁ হাতখানি অজিতের হাতের উপর রাখিতেই আচম্বিতে তাহার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। অস্ফুটে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু সহসা হাত টানিয়া লইয়া চেঁচাইয়া উঠিল, ড্রাইভার, রোকো রোকো,—এ যে পাগলা-গারদের সামনে এসে পড়েচি। গাড়ি ঘুরিয়ে নাও। অন্ধকারে ঠিক ঠাওর করতে পারা যায়নি।

অজিত কহিল, হাঁ, দোষ অন্ধকারের। শুধু সান্ত্বনা এই যে, হাজার অবিচারেও ও-বেচারার প্রতিবাদ করবার জো নেই। সে অধিকারে ও বঞ্চিত। এই বলিয়া সে একটু হাসিল। শুনিয়া কমলও হাসিল, কহিল, তা বটে। কিন্তু বিচার জিনিসটাই ত সংসারে সব নয়; এখানে অবিচারেরও স্থান আছে বলে আজও দুনিয়া চলচে, নইলে কোন্‌কালে সে থেমে যেতো। ড্রাইভার, থামাও।

অজিত কবাট খুলিয়া দিতে কমল রাস্তায় নামিয়া আসিয়া কহিল, অন্ধকারের ওর চেয়েও বড় অপরাধ আছে অজিতবাবু, একলা যেতে ভয় করে।

এই ইঙ্গিতে অজিত নিঃশব্দে পাশে নামিয়া দাঁড়াইতেই কমল ড্রাইভারকে বলিল, এবার তুমি বাড়ি যাও, এঁর ফিরে যেতে দেরি হবে।

সে কি কথা! এত রাত্রে এ-অঞ্চলে আমি গাড়ি পাব কোথায়?

তার উপায় আমি করে দেব।

অজিত কহিল, কোন ব্যবস্থাই হবে না জানি, অন্ধকারে তিন-চার মাইল হাঁটতে হবে। অথচ, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি অনায়াসে ফিরে যেতে পারতাম।

পারতেন না। কারণ, আপনাকে না খাইয়ে ওই আশ্রমের অনিশ্চয়তার মধ্যে আমি যেতে দিতে পারতাম না। আসুন।

বাসায় দাসী আলো জ্বলিয়া আজ অপেক্ষা করিয়া ছিল, ডাকিতেই দ্বার খুলিয়া দিল। উপরে গিয়া কমল সেই সুন্দর আসনখানি পাতিয়া রান্নাঘরে বসিতে দিল। আয়োজন প্রস্তুত ছিল, স্টোভ জ্বালিয়া রান্না চড়াইয়া দিয়া অদূরে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এমনি আর একদিনের কথা মনে পড়ে?

নিশ্চয় পড়ে।

আচ্ছা, তার সঙ্গে আজ কোথায় তফাত বলতে পারেন? বলুন ত দেখি?

অজিত ঘরের মধ্যে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কোন্‌খানে কি ছিল এবং নাই, মনে করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কমল হাসিমুখে কহিল, এদিকে সারারাত খুঁজলেও পাবেন না। আর একদিকে সন্ধান করতে হবে।

কোন্ দিকে বলুন তো?

আমার দিকে।

অজিত হঠাৎ কি একপ্রকার লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আস্তে আস্তে বলিল, কোনদিনই আপনার মুখের পানে আমি খুব বেশী করে চেয়ে দেখিনি। অন্য সবাই পেরেছে, শুধু আমিই কি জানি কেন পেরে উঠিনি।

কমল কহিল, অপরের সঙ্গে আপনার প্রভেদ ওইখানে। তারা যে পারতো তার কারণ, তাদের

দৃষ্টির মধ্যে আমার প্রতি সম্ভ্রম-বোধ ছিল না।

অজিত চুপ করিয়া রহিল। কমল বলিতে লাগিল, আমি স্থির করেছিলাম, যেমন করে হোক আপনাকে খুঁজে বার করবোই। আশুবাবুর বাড়িতে আজই যে দেখা হবে এ আশা ছিল না, কিন্তু দৈবাৎ দেখা হয়ে যখন গেল, তখনই জানি ধরে আনবোই। খাওয়ানো একটা ছোট্ট উপলক্ষ,—তাই ওটা শেষ হলেই ছুটি পাবেন না। আজ রাত্রে আপনাকে আমি কোথাও যেতে দেবো না,—এই বাড়িতেই বন্ধ করে রাখবো।

কিন্তু তাতে আপনার লাভ কি?

কমল কহিল; লাভের কথা পরে বলবো, কিন্তু আমাকে আপনি বললে আমি সত্যিই ব্যথা পাই। একদিন 'তুমি' বলে ডাকতেন, সেদিনও বলতে আমি সাধিনি, নিজে ইচ্ছে করেই ডেকেছিলেন। আজ সেটা বদলে দেবার মত কোন অপরাধও করিনি। অভিমান করে সাড়া যদি না দিই, আপনি নিজেও কষ্ট পাবেন।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা বোধ হয় পাবো।

কমল কহিল, বোধ হয় নায়, নিশ্চয় পাবেন। আপনি আগ্রায় এসেছিলেন মনোরমার জন্যে। কিন্তু সে যখন অমন করে চলে গেল, তখন সবাই ভাবলে আর এক দণ্ডও আপনি এখানে থাকবেন না। কেবল আমি জানতাম আপনি যেতে পারবেন না। আচ্ছা, আমিও যে ভালবাসি এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

না, করিনে।

নিশ্চয় করেন। তাইতো আপনার বিরুদ্ধে আমার অনেক নালিশ আছে।

অজিত কৌতূহলী হইয়া বলিল, অনেক নালিশ? একটা শুনি।

কমল বলিল, শোনাবো বলেই ত যেতে দিইনি। প্রথমে নিজের কথাটা বলি। উপায় নেই বলে দুঃখী-গরীবদের কাপড় সেলাই করে নিজের খাওয়া-পরা চালাই—এ আমার সয়। কিন্তু দায়ে পড়েচি বলে আপনারও জামা সেলাই করার দাম নেবো—এও কি সয়?

কিন্তু তুমি ত কারও দান নাও না!

না, দান আমি কারও নিইনে, এমন কি আপনারও না। কিন্তু দান করা ছাড়া দেবার কি সংসারে আর কোন পথ খোলা নেই? কেন এসে জোর করে বললেন না, কমল, এ কাজ তোমাকে আমি করতে দেবো না। আমি তার কি জবাব দিতাম? আজ যদি কোন দুর্বিপাকে আমার খেটে খাবার শক্তি যায়, আপনি বেঁচে থাকতে কি আমি পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াবো?

কথাটা ব্যথায় তাহাকে ব্যাকুল করিয়া দিল, বলিল, এমন হতেই পারে না কমল, আমি বেঁচে থাকতে এ অসম্ভব। তোমার সম্বন্ধে আমি একটা দিনও এমন করে ভেবে দেখিনি। এখনো যেন বিশ্বাস হতে চায় না যে, যে কমলকে আমরা সবাই জানি সে-ই তুমি।

কমল কহিল, সবাই যা ইচ্ছে জানুক, কিন্তু আপনি কি কেবল তাদেরই একজন? তার বেশি নয়?

এ প্রশ্নের উত্তর আসিল না, বোধ করি অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই ; এবং ইহার পরে উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। হয়ত অপরকে প্রশ্ন করার চেয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন দুজনেই বেশি করিয়া অনুভব করিল।

কি-ই বা রান্না, শেষ হইতে বিলম্ব হইল না। আহারে বসিয়া অজিত গম্ভীর হইয়া বলিল, অথচ মজা এই যে, যার যত টাকাকড়িই থাকুক তোমার উপার্জনের অন্ন হাত পেতে না খেয়ে কারও পরিত্রাণ নেই। অথচ, নিজে তুমি কারও নেবে না, কারও খাবে না। মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও না।

কমল হাসিয়া কহিল, আপনারা খান কেন? তা ছাড়া কবেই বা আপনি মাথা খুঁড়লেন? অজিত বলিল, মাথা খোঁড়বার ইচ্ছে বহুবারই হয়েছে। আর, তোমার খাই শুধু তোমার জবরদস্তির সঙ্গে

পেরে উঠিনে বলে। আজ আমি যদি বলি, কমল, এখন থেকে তোমার সমস্ত ভার নিলাম, এ উঞ্ছবৃত্তি আর করো না, তুমি তখনি হয়ত এমনি কটু কথা বলে উঠবে যে আমার মুখ দিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্য বার হবে না।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কথা কি বলেছিলেন কোনদিন?

মনে হয় যেন বলেছিলাম।

আর আমি শুনিনি সে কথা?

না।

তা হলে শোনবার মত করে বলেন নি। হয়ত, মনের মধ্যে শুধু ইচ্ছে হয়েই ছিল—মুখ দিয়ে তা প্রকাশ পায়নি।

আচ্ছা, ধর আজই যদি বলি?

তা হলে আমিও যদি বলি,—না।

অজিত হাতের গ্রাস নামাইয়া রাখিয়া কহিল, এই ত! তোমাকে একটা দিনও আমরা বুঝতে পারলাম না। যেদিন তাজের সুমুখে প্রথম দেখি সেদিনও যেমন তোমার কথা বুঝিনি, আজও তেমনি আমাদের সকলের কাছে তুমি রহস্যই রয়ে গেলে। এইমাত্র নিজেই বললে আমার ভার নিন—আবার তখনি বললে, না!

কমল হাসিয়া কহিল, এমনি ধারা একটা 'না' আপনি বলুন ত দেখি? বলুন ত যা খেয়েছেন আর কোনদিন খাবেন না,—কেমন আপনার কথা থাকে?

অজিত কহিল, থাকবে কি করে? না খাইয়ে তুমি ত ছেড়ে দেবে না।

কিন্তু এবার কমল আর হাসিল না। শান্তভাবে বলিল, আমার ভার নেবার সময় আজও আপনার আসেনি। যেদিন আসবে, সেদিন আমার মুখ দিয়ে 'না' বেরুবে না। রাত হয়ে যাচ্ছে, আপনি খেয়ে নিন।

নিই। সেদিন কখনো আসবে কিনা বলে দিতে পার?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, সে আমি পারিনে। জবাব আপনাকে নিজেই একদিন খুঁজে নিতে হবে।

সে শক্তি আমার নেই। একদিন অনেক খুঁজেচি কিন্তু পাইনি। জবাব তোমার কাছে পাবো, এই আশা করে আজ থেকে আমি হাত পেতে থাকব।

এই বলিয়া অজিত নিঃশব্দে খাইতে লাগিল। খানিক পরে কমল জিজ্ঞাসা করিল, এত জায়গা থাকতে আপনি হঠাৎ হরেন্দ্রর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন কেন?

অজিত কহিল, কোথাও ত থাকা চাই। তুমি নিজেই ত জানো আগ্রা ছেড়ে আমার যাবার জো ছিল না।

জানি, তা হলে?

হাঁ, জানো বৈ কি।

আর তাই যদি সত্যি, সোজা আমার কাছে চলে এলেন না কেন?

যদি আসতাম, সত্যিই কি স্থান দিতে?

সত্যি ত আর আসেন নি? সে যাক ; কিন্তু হরেন্দ্রর আশ্রমে ত কষ্টের সীমা নেই,—সেই ওদের সাধনা—কিন্তু অত কষ্ট আপনার সইল কি করে?

জানিনে কি করে সইল, কিন্তু আজ আর আমার ও-কথা মনেও হয় না। এখন ওদেরই আমি একজন। হয়ত, এই আমার সমস্ত ভবিষ্যতের জীবন। এতদিন চুপ করেও ছিলাম না। লোক পাঠিয়ে স্থানে স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেচি—তিন-চারটি আশ্রমের আশাও পেয়েচি—ইচ্ছে আছে নিজে একবার বার হব।

এ পরামর্শ আপনাকে দিলে কে? হরেন্দ্র বোধ হয়?

অজিত কহিল, যদি দিয়েও থাকেন নিষ্পাপ হয়েই দিয়েছেন। দেশের সর্বনাশ যারা চোখে

দেখেচে—এর দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর দুঃখ, এর ধর্মহীনতার গভীর গ্লানি, এর দৌর্বল্যের একান্ত ভীরুতা—

কমল বাধা দিয়া বলিল, হরেন্দ্র এ-সব দেখেছেন অস্বীকার করিনে, কিন্তু আপনার ত শুধু শোনা কথা। নিজের চোখে কোন কিছু দেখবার ত আজও সুযোগ পাননি?

কিন্তু এ সবই ত সত্যি?

সত্যি নয় তা বলিনে, কিন্তু তার প্রতিকারের উপায় কি এই আশ্রম-প্রতিষ্ঠা?

নয় কেন? ভারতবর্ষ বলতে ত শুধু উত্তরে হিমালয় এবং অপর তিনদিকে সমুদ্র-ঘেরা কতকটা ভূখণ্ড মাত্র নয়? এর প্রচীন সভ্যতা, এর ধর্মের বিশিষ্টতা, এর নীতির পবিত্রতা, এর ন্যায়-নিষ্ঠার মহিমা,—এই ত ভারত, তাই ত এর নাম দেবভূমি,—একে নিরতিশয় হীনতা থেকে বাঁচাবার তপস্যা ছাড়া আর কি কোন পথ আছে? ব্রহ্মচর্যব্রতধারী নিষ্কলুষ ছেলেদের—জীবনে সার্থক হবার—ধন্য হবার—

কমল বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার খাওয়া হয়েছে, হাত-মুখ ধুয়ে ও-ঘরে চলুন,—আর না।

তুমি খাবে না?

আমি কি দুবেলা খাই যে আজ খাব? উঠুন।

কিন্তু আশ্রমে আমাকে ত ফিরে যেতে হবে।

না হবে না, ও-ঘরে চলুন। অনেক কথা আমার শোনবার আছে।

আচ্ছা চলো। কিন্তু বাইরে থাকবার আমাদের বিধি নেই, যত রাত্রিই হোক আশ্রমে আমাকে ফিরতেই হবে।

কমল বলিল, সে বিধি দীক্ষিত আশ্রমবাসীদের, আপনার জন্যে নয়।

কিন্তু লোকে বলবে কি?

লোকের উল্লেখে কোনদিনই কমলের ধৈর্য থাকে না, কহিল, লোকেরা আপনাকে শুধু নিন্দেই করবে, রক্ষে করতে পারবে না। যে পারবে তার কাছে আপনার ভয় নেই,—তাদের চেয়ে আমি ঢের বেশি আপনার। সেদিন সঙ্গে যেতে আমাকে ডেকেছিলেন—কিন্তু পারিনি, আজ আর না পারলে আমার চলবে না। চলুন ও-ঘরে, আমাকে ভয় নেই। পুরুষের ভোগের বস্তু যারা আমি তাদের জাত নই। উঠুন।

এ ঘরে আনিয়া কমল সম্পূর্ণ নূতন শয্যা-বস্ত্র দিয়া খাটের উপর পরিপাটি করিয়া বিছানা করিয়া দিল এবং নিজের জন্য মেঝের উপর যেমন-তেমন গোছের আর একটা পাতিয়া রাখিয়া কহিল, আসচি। মিনিট-দশেকের বেশী দেরি হবে না, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়বেন না যেন।

না।

তা হলে ঠেলে তুলে দেব।

তার দরকার হবে না কমল, ঘুম আমার চোখ থেকে উবে গেছে।

আচ্ছা, সে পরীক্ষা পরে হবে,—এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রান্নার পাত্রগুলি যথাস্থানে তুলিয়া রাখা, উচ্ছিষ্ট বাসন বারান্দায় বাহির করিয়া দেওয়া, দাসী বহুক্ষণ চলিয়া গেছে,—নীচে সিঁড়ির কবাট বন্ধ করা—গৃহস্থালীর এমনি সব ছোটখাটো কাজ তখনো বাকী, সে-সব সারিয়া তবে তাহার ছুটি।

কমলের সযত্ন-রচিত শুভ্র সুন্দর শয্যাটির পরে বসিয়া একাকী ঘরের মধ্যে হঠাৎ তাহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বিশেষ কোন গভীর হেতু যে ছিল তাহা নয়, শুধু মনের মধ্যে একটা ভালো-লাগার তৃপ্তি। হয়ত একটু কৌতূহল মিশানো, কিন্তু আগ্রহের উত্তাপ নাই—শুধু একটি শান্ত আনন্দের মধুর স্পর্শ যেন নিঃশব্দে সর্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়াছে।

অজিত ধনীর সন্তান, আজন্ম বিলাসের মধ্যেই প্রতিপালিত ; কিন্তু হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ভর্তি হওয়া অবধি দৈন্য ও আত্ম-নিগ্রহের সুদুর্গম পথে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্মোপলব্ধির একাগ্র সাধনা

এদিক হইতে দৃষ্টি তাহার অপসারিত করিয়াছিল। হঠাৎ চোখে পড়িল হলুদ রঙের সূতা দিয়া তৈরী বালিশের অড়ের চারিধারে ছোট্ট গুটি-কয়েক চন্দ্রমল্লিকা ফুল। বিছানার চাদরের যে কোণটি ঝুলিয়া আছে তাহাতে সাদা রেশম দিয়া বোনা কোন একটি অজানা লতার একটুখানি ছবি। এইটুকু শিল্পকর্ম,—সামান্যই ব্যাপার। কত লোকের ঘরেই ত আছে। অবসরকালে কমল নিজের হাতে সেলাই করিয়াছে। দেখিয়া অজিত মুগ্ধ হইয়া গেল। হাতে করিয়া সেইটি নাড়াচাড়া করিতেছিল, কমল বাহিরের কাজ সারিয়া ঘরে আসিয়া দাঁড়াইতে তাহার মুখের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, বাঃ—বেশ ত!

কমল একটু আশ্চর্য হইল—কি বেশ? ঐ লতাটুকু?

হাঁ, আর এই হলদে রঙের ফুলগুলি। তুমি নিজে করেচ, না?

কমল হাসিমুখে বলিল, চমৎকার প্রশ্ন। নিজে নয় ত কি কারিগর ডেকে তৈরি করিয়েছি? আপনার চাই ঐ-রকম?

না না না—আমার চাইনে। আমি কি করব?

তাহার এই ব্যাকুল ও সলজ্জ প্রত্যাখ্যানে কমল হাসিয়া কহিল, আশ্রমে নিয়ে গিয়ে শোবেন। কেউ জিজ্ঞেসা করলে বলবেন, কমল রাত জেগে তৈরি করে দিয়েচে।

দ্যুৎ!

দ্যুৎ কেন? নিজের জন্য এ-সব জিনিস কেউ তৈরি করে না, করে আর-একজনের জন্যে। কষ্ট করে ঐ ফুলগুলি যে সেলাই করেছিলাম সে কি আপনি শোবো বলে? একদিন একজন আসবেই,—শুধু তারই জন্যে এ-সব তোলা ছিল। সকালে যখন চলে যাবেন, সমস্ত আপনার সঙ্গে দেব।

এবার অজিত নিজেও হাসিল, কহিল, আচ্ছা কমল, আমি কি এতই বোকা?

কেন?

তুমি আমাকেই মনে করে এ-সব তৈরি করেছিলে এও বিশ্বাস করব?

কেন করবেন না?

করব না সত্যি নয় বলে।

কিন্তু সত্যি বললে বিশ্বাস করবেন বলুন?

নিশ্চয় করব। তোমার পরিহাসের কোন সীমা নেই—কোথাও বাধে না। সেই মোটরে বেড়াবার কথা মনে হলে আমার লজ্জার অবধি থাকে না। সে আলাদা। কিন্তু যা পরিহাস নয়, সে যে তুমি কোন কিছুর জন্যেই মিথ্যে বলতে পারো না, এ আমি জানি।

তা হলে যদি বলি বাস্তবিক পরিহাস করিনি, সত্যি কথাই বলচি, বিশ্বাস করবেন?

নিশ্চয় করব।

কমল কহিল, তা যদি করেন আজ আপনাকে সত্যি কথাই বলব। তখনো রাজেন আসেনি। অর্থাৎ আশ্রমে স্থান না পেয়ে তখনো সে আমার গৃহে আশ্রয় নেয়নি। আমারো ত সেই দশা। আপনারা সবাই যখন আমাকে ঘৃণায় দূর করে দিলেন, এই বিদেশে কারো কাছে গিয়ে দাঁড়াবার যখন আর পথ রইল না,—সেই গভীর দুঃখের দিনের ঐ শিল্পকাজটুকু। সেদিন ঠিক কাকে স্মরণ করে যে করেছিলাম আমি কোনদিন হয়ত জানতে পারতাম না। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু আজ বিছানা পাততে এসে হঠাৎ মনে হ'লো, না না ওতে নয়। যাতে কেউ কোনদিন শুয়েছে তাতে আপনাকে আমি কোনমতে শুতে দিতে পারিনে।

কেন পারো না?

কি জানি, কে যেন ধাক্কা দিয়ে ঐ কথা বলে দিয়ে গেল। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, হঠাৎ স্মরণ হলো, ঐগুলি বাক্সে তোলা আছে। আপনি তখন বাইরে মুখ ধুচ্ছিলেন, এখনি এসে পড়বেন, তাড়াতাড়ি খুলে এনে পাততে গিয়ে আজ প্রথম টের পেলাম, সেদিন যাকে ভেবে রাত্রি জেগে ফুল-লতা-পাতা এঁকেছিলাম সে আপনি।

অজিত কথা কহিল না। শুধু একটা আরক্ত আভা তাহার মুখের পরে দেখা দিয়া চক্ষের নিমিষে নিবিয়া গেল।

কমল নিজেও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া করিল, চুপ করে কি ভাবচেন বলুন ত?

অজিত কহিল, শুধু চুপ করেই আছি, ভাবতে পারছি নে।

তার কারণ?

কারণ? তোমার কথা শুনে আমার বুকের ভিতর যেন ঝড় বয়ে গেল। শুধুই ঝড়,—না এলো আনন্দ, না এলো আশা।

কমল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। অজিত ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, কমল, একটা গল্প বলি শোনো। আমার মাকে একবার আমাদের গৃহদেবতা রাধাবল্লভজীউ পূজোর ঘরে মূর্তি ধরে দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর হাত থেকে খাবার নিয়ে সুমুখে বসে খেয়েছিলেন,—এ তাঁর নিজের চোখে দেখা। তবুও বাড়ির কেউ আমরা বিশ্বাস করতে পারিনি। সবাই বুঝলে এ তাঁর স্বপ্ন, কিন্তু এই অবিশ্বাসের দুঃখ তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত যায়নি। আজ তোমার কথা শুনে আমার সেই কথা মনে পড়চে। তুমি তামাশা করোনি জানি, কিন্তু আমার মায়ের মতো তোমারো কোথাও মস্ত ভুল হয়েছে। মানুষের জীবনে এমন বহুকাল যায় নিজের সম্বন্ধে সে অন্ধকারেই থাকে। হয়ত হঠাৎ একদিন চোখ খোলে। আমারও তেমনি এতদিন পৃথিবীর কত জায়গাতেই ত ঘুরেচি, শুধু এই আগ্রায় এসে আমি নিজেকে দেখতে পেলাম। আমার থাকার মধ্যে আছে শুধু টাকা, বাবার দেওয়া। এ ছাড়া এমন কিছুই নিজের নেই যে আমারও অজ্ঞাতসারে তুমি আমাকেই ভালবাসতে পার।

কমল কহিল, টাকার জন্যে ভাবনা নেই, আশ্রমবাসীরা একবার যখন সন্ধান পেয়েছে তখন সে ব্যবস্থা তারাই করবে, এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু অন্য সকল দিকেই যে আপনি এমন নিঃস্ব এ খবর কি ছাই আগে পেয়েছি? তা ছাড়া, ভাল-মন্দ বুঝে দেখবার সময় পেলাম কৈ? মনের মধ্যে শুধু একটা সন্দেহের মতই ছিল,—ঠিকানা পেতাম না,—কেবল এই ত মিনিট-দশেক হ'লো একলা ঘরে বিছানার সুমুখে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ ঠিক খবরটি কে এসে আমার কানে কানে দিয়ে গেল।

অজিত গভীর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সত্যি বলচো মাত্র মিনিট-দশেক? কিন্তু সত্যি হলে এ ত পাগলামি।

কমল বলিল, পাগলামিই ত। তাই ত আপনাকে বলেছিলাম, আমাকে আর কোথাও নিয়ে চলুন। বিবাহ করে ঘর-সংসার করুন এ ভিক্ষে ত চাইনি?

অজিত অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইল, কহিল, ভিক্ষে বলচ কেন কমল, এ ভিক্ষে চাওয়া নয়, এ তোমার ভালবাসার অধিকার। কিন্তু অধিকারের দাবী তুমি করলে না, চাইলে শুধু তাই যা বুদবুদের মত স্বল্পায়ু এবং তারই মত মিথ্যে।

কমল কহিল, হতেও পারে এর পরমায়ু কম, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে হবে কেন? আয়ুর দীর্ঘতাকেই যারা সত্য বলে আঁকড়ে ধরতে চায়, আমি তাদের কেউ নয়।

কিন্তু এ আনন্দের যে কোন স্থায়িত্ব নেই কমল!

না-ই থাক। কিন্তু গাছের ফুল শুকোবে বলে সুদীর্ঘস্থায়ী শোলার ফুলের তোড়া বেঁধে যারা ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখে, তাদের সঙ্গে আমার মতে মেলে না। আপনাকে আরও একবার ঠিক এই কথাই বলেছিলাম যে, কোন আনন্দেরই স্থায়িত্ব নেই। আছে শুধু তার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলি। সেই ত মানব-জীবনের চরম সঞ্চয়। তাকে বাঁধতে গেলেই সে মরে। তাই ত বিবাহের স্থায়িত্ব আছে, নেই তার আনন্দ। দুঃসহ স্থায়িত্বের মোটা দড়ি গলায় বেঁধে সে আত্মহত্যা করে মরে।

অজিতের মনে পড়িল ঠিক এই কথাই সে ইহারই কাছ পূর্বে শুনিয়াছে। শুধু মুখের কথা নয়, ইহাই তাহার অন্তরের বিশ্বাস। শিবনাথ তাহাকে বিবাহ করে নাই, ফাঁকি দিয়াছে, কিন্তু এ লইয়া কমল একটা দিনের জন্যও অভিযোগ করে নাই। কেন করে নাই? আজ এই প্রথম দিনের

জন্য অজিত নিঃসংশয়ে বুঝিল, এই ফাঁকির মধ্যে তাহার নিজেরও সায় ছিল। পৃথিবী জুড়িয়া সমস্ত মানব-জাতির এই প্রাচীন ও পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি এতবড় অবজ্ঞায় অজিতের মন ধিক্কারে পূর্ণ হইয়া গেল।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিল, তোমার কাছে গর্ব করা আমার সাজে না। কিন্তু তোমার কাছে আর আমি কিছুই গোপন করব না। এঁরা বলেন, সংসারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করাই পুরুষের সবচেয়ে বড় পুরুষার্থ। বুদ্ধির দিক দিয়ে এ আমি বিশ্বাস করি এবং এ সাধনায় সিদ্ধিলাভের চেয়ে মহত্তর কিছু নেই এ বিষয়েও আমি নিঃসংশয়। কাঞ্চন আমার যথেষ্ট আছে, তাতে লোভ নেই, কিন্তু সমস্ত জীবনে ভালবাসার কেউ নেই, কেউ কখনো থাকবে না, মনে হলে বুক যেন শুকিয়ে ওঠে। ভয় হয়, অন্তরের এ দুর্বলতা হয়ত আমি মরণকাল পর্যন্ত জয় করতে পারবো না। অদৃষ্টে তাই যদি কখনো ঘটে, আশ্রম ত্যাগ করে আমি চলে যাবো। কিন্তু, তোমার আহ্বান তার চেয়েও মিথ্যে। ও ডাকে সাড়া দিতে আমি পারব না।

একে মিথ্যে বলচেন কেন?

মিথ্যেই ত। মনোরমা সত্যই কখনো আমাকে ভালবাসে নি, তার আচরণ বোঝা যায়, কিন্তু শিবনাথের প্রতি শিবানীর ভালবাসা ত আমি নিজের চোখেই দেখেচি। সেদিন তার যেন আর সীমা ছিল না, কিন্তু আজ তার চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

কমল কহিল, আজ যদি তা গিয়েই থাকে, সেদিন কি শুধু আমার ছলনাই আপনার চোখে পড়েছিল?

অজিত বলিল, সে তুমিই জানো, কিন্তু আজ মনে হয় নারী-জীবনে এর চেয়ে মিথ্যে বুঝি আর নেই।

কমলের চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কহিল, নারী-জীবনের সত্যাসত্য নির্দেশের ভার নারীর পরেই থাক। সে বিচারের দায়িত্ব পুরুষের নিয়ে কাজ নেই—মনোরমারও না, কমলেরও না। এমনি করেই সংসারে চিরদিন ন্যায় বিড়ম্বিত, নারী অসম্মানিত এবং পুরুষের চিত্ত সঙ্কীর্ণ, কলুষিত হয়ে গেছে। তাই এই মিথ্যে-মামলার আর নিষ্পত্তি হতে পেলে না। অবিচারে কেবল একপক্ষই ক্ষতিগ্রস্থ হয় না অজিতবাবু, দু'পক্ষেরই সর্বনাশ করে। সেদিন শিবনাথ যা পেয়েছিলেন, দুনিয়ার কম পুরুষের ভাগ্যেই তা জোটে, কিন্তু আজ তা নেই। কেন নেই এই তর্ক তুলে পুরুষের মোটা হাতে মোটা দণ্ড ঘুরিয়ে শাসন করা চলে, কিন্তু ফিরে পাওয়া যায় না। সেদিনের থাকাটা যেমন সত্যি, আজকের না-থাকাটাও ঠিক তত বড়ই সত্যি। শঠতার ছেঁড়া-কাঁথা মুড়ে একে ঢাকা দিতে লজ্জাবোধ করেছি বলে পুরুষের বিচারে এই হলো নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় মিথ্যে? এই সুবিচারের আশাতেই আমরা আপনাদের মুখ চেয়ে থাকি?

অজিত উত্তর দিল, কিন্তু উপায় কি? যা এমন ক্ষণস্থায়ী, এমন ভঙ্গুর, তাকে এর বেশী সম্মান মানুষে দেবে কেন?

কমল বলিল, দেবে না জানি। আমার উঠানের ধারে যে ফুল ফোটে তার জীবন এক বেলার বেশী নয়। তার চেয়ে ওই মসলা-পেশা নোড়াটা ঢের টিকসই, ঢের দীর্ঘস্থায়ী সত্য যাচাই করার এর চেয়ে মজবুত মানদণ্ড আপনারা পাবেন কোথায়?

কমল, এ যুক্তি নয়, এ শুধু তোমার রাগের কথা।

রাগ কিসের অজিতবাবু? কেবল স্থায়িত্ব নিয়েই যাদের কারবার, তারা এমনি করেই মূল্য ধার্য করে। আমার আহ্বানে যে আপনি সাড়া দিতে পারেন নি তার মূলেও এই সংশয়। চিরদিনের দাসখত লিখে যে বন্ধন নেবে না, তাকে বিশ্বাস করবেন আপনি কি দিয়ে? ফুল যে বোঝে না তার কাছে ঐ পাথরের নোড়াটাই ঢের বেশি সত্য। শুকিয়ে ঝরে যাবার শঙ্কা নেই, ওর আয়ু একটা বেলার নয়, ও নিত্যকালের। রান্নাঘরের প্রয়োজনে ও চিরদিন রগড়ে রগড়ে মসলা পিষে দেবে—ভাত গেলবার তরকারির উপকরণ—ওর প্রতি নির্ভর করা চলে। ও না থাকলে সংসার বিস্বাদ হয়ে ওঠে।

অজিত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, এ বিদ্রূপ কিসের কমল?

কমলের কানে বোধ করি এ প্রশ্ন গেল না, সে যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিল মানুষে বোঝে না যে হৃদয়-বস্তুটা লোহার তৈরী নয়। অমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে তাকে ভর দেওয়া চলে না। দুঃখ যে নেই তা নয়, কিন্তু এই তার ধর্ম, এই তার সত্য। অথচ এ কথা বলাও চলে না, স্বীকার করাও যায় না। এর চেয়ে বড় দুর্নীতি সংসারে আর আছে কি? তাই ত কেউ ভেবেই পেলে না শিবনাথকে কি করে আমি নিঃশেষে ক্ষমা করতে পারি। কেঁদে কেঁদে যৌবনে যোগিনী হওয়াটা তাঁরা বুঝতেন, কিন্তু এ তাঁদের সইল না। অরুচি ও অবহেলায় সমস্ত মন তাঁদের তিতো হয়ে গেল। গাছের পাতা শুকিয়ে ঝরে যায়, তার ক্ষত নুতন পাতায় পূর্ণ করে তোলে। এই হলো মিথ্যে, আর বাইরের শুকনো লতা মরে গিয়েও গাছের সর্বাঙ্গ জড়িয়ে কামড়ে এঁটে থাকে, সেই হলো সত্য?

অজিত একমনে শুনিতেছিল, শেষ হইলে সহসা একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল একটা কথা আমরা প্রায় ভুলে যাই যে, আসলে তুমি আমাদের আপনার নয়। তোমার রক্ত তোমার সংস্কার, তোমার সমস্ত শিক্ষা বিদেশের। তার প্রচণ্ড সংঘাত তুমি কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারো না। এবং এইখানেই আমাদের সঙ্গে তোমার অহরহ ধাক্কা লাগে। রাত অনেক হলো কমল, এ নিষ্ফল কলহ বন্ধ করো,—এ আদর্শ তোমার জন্যে নয়।

কোন্ আদর্শ? আপনার ব্রহ্মচর্য-আশ্রমের?

অজিত খোঁচা খাইয়া মনে মনে রাগ করিল, কহিল, বেশ তাই। কিন্তু এ গূঢ়তত্ব বিদেশীদের জন্যে নয়। এ তুমি বুঝবে না?

আপনার শাগরেদি করলেও পারবো না?

না।

এবার কমল হাসিয়া উঠিল। যেন সে-মনুষ আর নয়। কহিল, আচ্ছা বলুন ত, কি হলে ঐ সাধুদের আড্ডা থেকে আপনার নাম কাটিয়ে দিতে পারি? বাস্তবিক, ঐ আশ্রমটা হয়েছে যেন আমার চক্ষুশূল।

অজিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বলিল, রাজেন্দ্রকে ডেকে এনে তুমি অনায়াসে আশ্রয় দিলে—তোমার কিছুই বোধ হয় মনে হলো না,—না?

কি আবার মনে হবে?

এ-সব বোধ করি তুমি গ্রাহ্যই করো না?

কি গ্রাহ্য করিনে, আপনাদের মতামত? না।

নিজের সম্বন্ধেও বোধ করি কখনো ভয় করো না?

কমল বলিল, কখনো করিনে তা বলতে পারিনে, কিন্তু ব্রহ্মচারীদের ভয় কিসের?

হুঁ, বলিয়া অজিত চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ একসময়ে বলিয়া উঠিল, কেঁচো মাটির নীচে অন্ধকারে থাকে, সে জানে বাইরের আলোতে বার হলে তার রক্ষে নেই—তাকে গিলে খাবার অনেক মুখ হাঁ করে আছে। লুকানো ছাড়া আত্মরক্ষার কোন উপায় সে জানে না। কিন্তু তুমি জানো মানুষ কেঁচো নয়। এমন কি মেয়েমানুষ হলেও না। শাস্ত্রে আছে, নিজের স্বরূপটিকে জানতে পারাই পরম শক্তি,—এই জানাটাই তোমার আসল শক্তি, না কমল?

কমল কিছুই না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল।

অজিত কহিল, মেয়েরা যে বস্তুটিকে তাদের ইহজীবনের যথাসর্বস্ব বলে জানে, সেইখানে তোমার এমন একটি সহজ ঔদাসীন্য যে, যত নিন্দেই করি, সে-ই যেন আগুনের বেড়ার মতো তোমাকে অনুক্ষণ আগলে রাখে। গায়ে লাগবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এইমাত্র আমাকে বলছিলে পুরুষের ভোগের বস্তু যারা তাদের জাত তুমি নও। আজ রাত্রে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি বসে এই কথাটার মানে স্পষ্ট হয়ে আসচে। আমাদের নিন্দে-সুখ্যাতিতে অবজ্ঞা করার সাহস

যে তুমি কোথায় পাও, তাও বুঝতে পারচি।

কমল কৃত্রিম বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া কহিল, ব্যাপার কি অজিতবাবু, কথাগুলো যে অনেকটা জ্ঞানবানের মত শোনাচ্চে?

অজিত কহিল, আচ্ছা কমল, সত্যি বলো, আমার মতামতও কি অন্য সকলের মতো তোমার কাছে এমনি তুচ্ছ?

কিন্তু এ কথা জেনে আপনার হবে কি?

কমল, নিজেকে শক্তিমান বলে আমি তোমার কাছে কোনদিন অহঙ্কার করিনি। বাস্তবিক, ভিতরে ভিতরে আমি যেমন দুর্বল, তেমনি অসহায়। কোন কিছুই জোর করে করার সামর্থ্য নেই আমার।

কমল হাসিয়া কহিল, সে আমি আপনার নিজের চেয়েও ঢের বেশি জানি।

অজিত কহিল, আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় তোমাকে পাওয়াও আমার যেমন সহজ, হারানোও আবার তেমনি সহজ।

কমল বলিল, আমি তাও জানি।

অজিত নিজের মনে মাথা নাড়িয়া বলিল, সেই তা। তোমাকে আজ পাওয়াই ত শুধু নয়, একদিন যদি এমনি করে হারাতেই হয় তখন কি হবে?

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, কিছুই হবে না। সেদিন হারানোও ঠিক এমনি সহজ হয়ে যাবে। যতদিন কাছে থাকবো আপনাকে সেই বিদ্যেই দিয়ে যাবো।

অজিত অন্তরে চমকিয়া উঠিল। বলিল, বিলেতে থাকতে দেখেচি, ওরা কত সহজে, কত সামান্য কারণেই না চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মনে ভাবি, কিছুই কি বাজে না? আর এই যদি তাদের ভালবাসার পরিচয়, তারা সভ্যতার গর্ব করে কিসের?

কমল কহিল, অজিতবাবু, বাইরে থেকে খবরের কাগজে যত সহজ দেখেচেন, হয়ত তত সহজ নয়, কিন্তু তবুও কামনা করি নরনারীর এই পরিচয়ই যেন একদিন জগতে আলো-বাতাসের মত সহজ হয়ে যায়।

অজিত নিঃশব্দে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, কথা কহিল না। তারপর ধীরে ধীরে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়া শুইতেই তাহার কি কারণে কোথা দিয়া চোখে জল আসিয়া পড়িল।

হয়ত কমল বুঝিতে পারিল। উঠিয়া আসিয়া শয্যার একপ্রান্তে বসিয়া তাহার মাথার মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু সান্ত্বনার একটা কথাও উচ্চারণ করিল না।

সম্মুখের খোলা জানালা দিয়া দেখা গেল পূবের আকাশ স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে।

অজিতবাবু, ঘুমোবার বোধ করি আর সময় নেই।

না, এইবার উঠি। এই বলিয়া সে চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিল।

বাইশ

সংসারে সাধারণের একজন মাত্র,—এর বেশী দাবী আশুবাবু বোধ করি তাঁর সৃষ্টি-কর্তার কাছে একদিনও করেন নাই। পৈতৃক বিপুল ধন-সম্পদও যেমন শান্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিরাট দেহ-ভার ও আনুষঙ্গিক বাত-ব্যাধিটাও তেমনি সাধারণ দুঃখের মতই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। জগতের সুখ-দুঃখ যে বিধাতা তাঁরাকেই লক্ষ্য করিয়া গড়েন নাই, তাহারা স্ব স্ব নিয়মেই চলে—এ সত্য শুধু বুদ্ধি দিয়া নয়, হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিতেও তাঁহাকে তপস্যা করিতে হয় নাই ; সহজাত সংস্কারের মতই পাইয়াছিলেন। একদিন আকস্মিক স্ত্রী-বিয়োগের দুর্ঘটনায় সমস্ত পৃথিবী যখন চোখের সম্মুখে শুষ্ক হইয়া দেখা দিল, সেদিনও যেমন তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা আগুন ধরাইয়া দিল, সেদিনও ভাগ্য-দেবতাকে অজস্র ধিক্কারে লাঞ্ছিত করেন নাই, একান্ত স্নেহের ধন মনোরমাও যেদিন তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসায় আগুন ধরাইয়া দিল, সেদিনও তেমনি মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে বসেন নাই। ক্ষোভে ও দুঃসহ নৈরাশ্যের মাঝখানেই তাঁহার মনের মধ্যে কে যেন অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠে বার বার করিয়া বলিতে থাকিত

যে, এমনি হয়। এমনি দুঃখ বহু মানবের ভাগ্যে বহুবার ঘটিয়াছে, এবং এমনি করিয়াই সংসার চলে। ইহার কোথাও নূতনত্ব নাই, ইহা সৃষ্টির মতই সুপ্রাচীন। উচ্ছ্বসিত শোকের তরঙ্গ তুলিয়া ইহাকেই নবীন করিয়া সংসারে পরিব্যাপ্ত করায় না আছে পৌরুষ, না আছে প্রয়োজন। তাই সর্ববিধ দুঃখই তাহাতে আপনিই শান্ত হইয়া চারিদিকে এমন একটি স্নিগ্ধ-প্রসন্নতার বেষ্টনী সৃজন করিত যে, ভিতরে আসিলে সকলের সকল বোঝাই যেন আপনা হইতে লঘু ও অকিঞ্চিৎকর হইয়া যাইত।

এইভাবে আশুবাবুর চিরদিন কাটিয়াছে। আগ্রায় আসিয়াও নানা বিপর্যয়ের মধ্যে ইহার ব্যত্যয় ঘটে নাই, অথচ এই ব্যতিক্রমটুকুই চোখে পড়িতে লাগিল আজকাল অনেকেরই। হঠাৎ দেখা যায় তাঁহার আচরণে ধৈর্যের অভাব বহুস্থলেই যেন চাপা পড়িতে চাহে না, মনে হয় আলাপ-আলোচনা অকারণে রূঢ়তার ধার ঘেঁষিয়া আসে, মন্তব্য প্রকাশের অহেতুক তীক্ষ্ণতা চাকর-বাকরদের কানে অদ্ভুত শুনায়,—কিন্তু কেন যে এমন ঘটিতেছে তাহাও ভাবিয়া পাওয়া দুষ্কর। রোগের বাড়াবাড়ির মধ্যেও এ বিকৃতি তাঁহাতে অবিশ্বাস্য মনে হইত, এখন ত সারিয়া আসিতেছে। কিন্তু হেতু যাই হোক, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় তাঁহার নিভৃত চিত্ত-তলে যেন একটা দাহ চলিতেছে ; তাহারই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝে বাহিরে ফাটিয়া পড়ে।

প্রকাশ করিয়া আজও বলেন নাই বটে, কিন্তু আভাস পাওয়া যায় যে, আগ্রাবাসের দিন তাঁহার ফুরাইয়া আসিল। হয়ত আর একটুখানি সুস্থ হওয়ার বিলম্ব। তার পরে হঠাৎ যেমন একদিন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন, তেমনি হঠাৎ আর একদিন নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইয়া যাইবেন।

বিকেলবেলাটায় আজকাল পদস্থ বাঙালীদের অনেকেই দেখা করিয়া খোঁজ লইতে আসেন। সপত্নীক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, রায়বাহাদুর সদরআলা, কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলী— নানা কারণে স্থানত্যাগের সুযোগ যাঁহারা পান নাই তাঁহারা,—হরেন্দ্র, অজিত এবং বাঙালী-পাড়ার যাঁহার আনন্দের দিনে বহু পোলাও-মাংস উদরস্থ করিয়া গেছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ। আসে না শুধু অক্ষয়, এখানে সে নাই বলিয়া। মহামারীর সূচনাতেই সস্ত্রীক বাড়ি গিয়াছে, বোধ হয় দেশ ঠাণ্ডা হওয়ার সংবাদ পৌঁছিবার প্রতীক্ষা করিতেছে। আর আসে না কমল। সেই যে আসিয়াছিল, আর তাহার দেখা নাই।

আশুবাবু মজলিসী লোক, তথাপি তেমন করিয়া মজলিসে আর যোগ দিতে পারেন না, উপস্থিত থাকিলেও প্রায় নীরবে থাকেন,—তাঁহার স্বাস্থ্যহীনতা স্মরণ করিয়া লোকে সানন্দে ক্ষমা করে। একদিন যে-সকল কর্তব্য মনোরমা করিত, আত্মীয় বলিয়া এখন বেলাকে তাহা করিতে হয়। আতিথেয়তার কোথাও ত্রুটি ঘটে না, বাহিরের লোকে বাহির হইতে আসিয়া ইহার রসটুকুই উপভোগ করে, হয়ত বা সভাশেষে পরিতৃপ্তচিত্তে এই নিরভিমান গৃহস্বামীকে মনে মনে ধন্যবাদ জানাইয়া সবিস্ময়ে ভাবে, অভ্যর্থনার এমন নিখুঁত ব্যবস্থা এই পীড়িত মানুষটিকে দিয়া নিত্যই কি করিয়া সম্ভবপর হয়!

সম্ভব কি করিয়া যে হয় এই ইতিহাসটুকুই গোপনে থাকে। নীলিমা সকলের সম্মুখে বাহির হইত না, অভ্যাসও ছিল না, ভালও বাসিত না। কিন্তু, অন্তরাল হইতে তাহার জাগ্রত দৃষ্টি সর্বক্ষণ এই গৃহের সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত থাকে। তাহা যেমন নিগূঢ়, তেমনি নীরব। শিরায় সঞ্চারিত রক্তধারার ন্যায় এই নিঃশব্দ প্রবাহ একাকী আশুবাবু ভিন্ন আর বোধ করি কেহ অনুভবও করে না।

হিম-ঋতুর প্রথমার্ধ প্রায় গত হইতে চলিল, কিন্তু যে-কারণেই হোক, এ বৎসর শীত এখনো তেমন কড়া করিয়া পড়ে নাই। আজ কিন্তু সকাল হইতে টিপিটিপি বৃষ্টি নামিয়াছিল; বিকেলের দিকে সেটা চাপিয়া আসিল। বাহিরের কেহ যে আসিতে পারিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না। ঘরের সার্সীগুলা অসময়েই বন্ধ হইয়াছে। আশুবাবু আরাম-কেদারায় তেমনি পা ছড়াইয়া একটা শাল চাপা দিয়া কি-একখানা বই পড়িতেছেন, বেলা হয়ত কতকটা বিরক্তির জন্যই বলিয়া বসিল, এ পোড়া-দেশের সবই উলটো। কিছুকাল আগে এ অঞ্চলে একবার এসেছিলাম—জুন কিংবা

জুলাই হয়ত হবে, এই জলের জন্যে যে দেশ জুড়ে এতবড় হাহাকার ওঠে, না এলে ও কখনো আমি ভাবতেও পারতুম না। তাই ভাবি, এ কঠিন দেশে লোকে তাজমহল গড়তে গিয়েছিল কোন্ বিবেচনায়?

নীলিমা অদূরে একটা চৌকিতে বসিয়া সেলাই করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই কহিল, এক কারণ কি সকলে টের পায়? পায় না।

বেলা সরল-চিত্তে প্রশ্ন করিল, কেন?

নীলিমা বলিল, সমস্ত বড় জিনিসই যে মানুষের হাহাকারেরর মধ্যেই জন্মলাভ করে, পৃথিবীর আমোদ-আহ্লাদেই যারা মগ্ন, এ তাদের চোখে পড়বে কোথা থেকে?

জবাবটা এমনি অভাবিতরূপে কঠোর যে শুধু বেলা নিজে নয়, আশুবাবু পর্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। বই হইতে মুখ সরাইয়া দেখিলেন, সে তেমনি একমনে সেলাই করিয়া যাইতেছে, যেন, এ কথা তাহার মুখ দিয়া একেবারেই বাহির হয় নাই।

বেলা কলহপ্রিয় রমণী নয়, এবং মোটের উপর সে সুশিক্ষিতা। দেখিয়াছে শুনিয়াছে অনেক এবং বয়সও বোধ করি পঁয়ত্রিশের উপরের দিকেই গেছে, কিন্তু সযত্ন-সতর্কতায় যৌবনের লাবণ্য আজও পশ্চিমে হেলে নাই,—অকস্মাৎ মনে হয় বুঝি বা তেমনিই আছে। রঙ উজ্জ্বল, মুখের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায় স্নিগ্ধ কোমলতার অভাবে তাহাকে যেন রূক্ষ করিয়া রাখিয়াছে। চোখের দৃষ্টি হাস্য-কৌতুকে চপল, চঞ্চল,—নিরন্তর ভাসিয়া বেড়ানোই যেন তাহার কাজ—কোথাও কোন-কিছুতে স্থির হইবার মত তাহাতে ভারও নাই, গভীর তলদেশে কোন মূলও নাই। আনন্দ-উৎসবেই তাহাকে মানায়; দুঃখের মাঝখানে হঠাৎ আসিয়া পড়িলে গৃহস্বামীকে লজ্জায় পড়িতে হয়।

বেলার হতবুদ্ধি ভাবটা কাটিয়া গেলে ক্ষণেকের জন্য মুখ ক্রোধে রক্তিম হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ করিয়া ঝগড়া করিতে তাহার শিক্ষা ও সৌজন্যে বাধে। সে আপনাকে সংবরণ করিয়া কহিল, আমাকে কটাক্ষ করে কোন লাভ নেই। শুধু অনধিকারচর্চা বলেই নয়, হাহাকার করে বেড়ানো যত উচ্চাঙ্গের ব্যাপারই হোক, সে আমি পারিনে এবং তার থেকে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতেও আমি অক্ষম। আমার আত্মসম্মানবোধ বজায় থাক, তার বড় আমি কিছুই চাইনে।

নীলিমা কাজ করিতেই লাগিল, জবাব দিল না।

আশুবাবু অন্তরে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, কিন্তু আর না বাড়ে এই ভয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, না না, তোমাকে কটাক্ষ নয় বেলা, কথাটা নিশ্চয়ই উনি সাধারণভাবেই বলেছেন। নীলিমার স্বভাব জানি, এমন হতেই পারে না—কখনো পারে না তা বলচি।

বেলা সংক্ষেপে শুধু কহিল, না হলেই ভাল। এতদিন একসঙ্গে আছি, এ ত আমি ভাবতেই পারতুম না।

নীলিমা হাঁ-না একটা উত্তরও দিল না, যেন ঘরে কেহ নাই এমনিভাবে নিজের মনে সেলাই করিয়াই যাইতে লাগিল। গৃহ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

বেলার জীবনের একটু ইতিহাস আছে, এইখানে সেটা বলা আবশ্যক। তাহার পিতা ছিলেন আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু ব্যবসায়ে যশঃ বা অর্থ কোনটাই আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। ধর্মমত কি ছিল কেহ জানে না, সমাজের দিক দিয়াও হিন্দু, ব্রাহ্ম বা খ্রীষ্টান কোন সমাজই মানিয়া চলিতেন না। মেয়েকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া শিক্ষা দিবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন। সেই চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। বেলা নামটি শখ করিয়া তাঁহারই দেওয়া। সমাজ না মানিলেও দল একটা ছিল। বেলা সুন্দরী ও শিক্ষিতা বলিয়া দলের মধ্যে নাম রটিয়া গেল, অতএব ধনী পাত্র জুটিতেও বিলম্ব হইল না। তিনিও সম্প্রতি বিলাত হইতে আইন পাস করিয়া আসিয়াছিলেন, দিনকতক দেখাশুনা ও মন-জানাজানির পালা চলিল, তাহার পরে বিবাহ হইল আইন-মতে রেজেস্ট্রী করিয়া। আইনের প্রতি গভীর অনুরাগের এক অঙ্ক সারা হইল। দ্বিতীয় অঙ্কে বিলাস-ব্যসন, একত্রে দেশ-ভ্রমণ, আলাদা বায়ু-পরিবর্তন, এমনি

অনেক কিছু। উভয় পক্ষেই নানাবিধ জনরব শুনা গেল, কিন্তু সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু প্রাসঙ্গিক অংশে যেটুকু, তাহা অচিরে প্রকাশ হইয়া পড়িল। বর-পক্ষ হাতে-হাতে ধরা পড়িলেন এবং কন্যাপক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা রুজু করিতে চহিলেন। বন্ধু-মহলে আপসের চেষ্টা হইল, কিন্তু শিক্ষিতা বেলা নর-নারীর সমানাধিকার-তত্ত্বের বড় পাণ্ডা, এই অসম্মানের প্রস্তাবে সে কর্ণপাত করিল না। স্বামী-বেচারা চরিত্রের দিক দিয়া যাই হোক, মানুষ হিসাবে মন্দ লোক ছিল না, স্ত্রীকে সে শক্তি এবং সাধ্যমত ভালই বাসিত। অপরাধ সলজ্জে স্বীকার করিয়া আদালতের দুর্গতি হইতে নিষ্কৃতি দিতে করজোড়ে প্রার্থনা করিল, কিন্তু স্ত্রী ক্ষমা করিল না। শেষে বহুদুঃখে নিষ্পত্তি একটা হইল। নগদে ও গ্রাসাচ্ছাদনের মাসিক বরাদ্দে অনেক টাকা ঘাড় পাতিয়া লইয়া সে মামলার দায় হইতে রক্ষা পাইল এবং দাম্পত্য-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বেলা ভাঙা-স্বাস্থ্য জোড়া দিতে সিমলা, মুসৌরি, নইনি প্রভৃতি পর্বতাঞ্চলে সদর্পে প্রস্থান করিল। সে আজ প্রায় ছয়-সাত বৎসরের কথা। ইহার অনতিকাল পরেই তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এই ব্যাপরে তাঁহার সম্মতি ত ছিলই না, বরঞ্চ অতিশয় মর্মপীড়া ভোগ করিয়াছিলেন। আশুবাবুর পারলোকগত পত্নীর সহিত তাঁহার কি একটা দূর-সম্পর্ক ছিল ; সেই সম্বন্ধেই বেলা আশুবাবুর আত্মীয়া। তাহার বিবাহ-উপলক্ষেও নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার স্বামীর সহিতও পরিচয় ঘটিবার তাঁহার সুযোগ হইয়াছিল।

এইরূপে নানা আত্মীয়তা-সূত্রে আপনার জন বলিয়াই বেলা আগ্রায় আসিয়া উঠিয়াছিল। নিতান্ত পরের মতও আসে নাই, নিরাশ্রয় হইয়াও বাড়িতে ঢুকে নাই। এ তুলনায় নীলিমার সহিত তাহার যথেষ্ট প্রভেদ।

অথচ, অবস্থাটা দাঁড়াইয়াছিল একেবারে অন্যরূপ। এ গৃহে কাহার স্থান যে কোথায়, এ বিষয়ে বাটীর কাহারও মনে তিলার্ধ সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হেতুও ছিল যেমন অজ্ঞাত, কর্তৃত্বও ছিল তেমনি অবিসম্বাদিত।

বহুক্ষণ মৌন থাকার পরে বেলাই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, স্পষ্ট নয় মানি, কিন্তু আমাকে ধিক্কার দেবার জন্যেই যে ও-কথা নীলিমা বলেছেন, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

আশুবাবুর মনের মধ্যেও হয়ত সন্দেহ ছিল না, তথাপি বিস্ময়ের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, ধিক্কার? ধিক্কার কিসের জন্যে বেলা?

বেলা কহিল, আপনি ত সমস্তই জানেন। নিন্দে করবার লোকের সেদিনও অভাব হয়নি, আজও হবে না। কিন্তু নিজের সম্মান, সমস্ত নারী-জাতির সম্মান রাখতে সেদিনও গ্রাহ্য করিনি, আজও করব না। নিজের মর্যাদা খুইয়ে স্বামীর ঘর করতে চাইনি বলে সেদিন গ্লানি প্রচার করেছিল মেয়েরাই সবচেয়ে বেশি, আজও তাদেরই হাত থেকে আমার নিস্তার পাওয়া সবচেয়ে কঠিন। কিন্তু অন্যায় করিনি বলে সেদিনও যেমন ভয় পাইনি, আজও আমি তেমনি নির্ভয়। নিজের বিবেকবুদ্ধির কাছে আমি সম্পূর্ণ খাঁটী।

নীলিমা সেলাই হইতে মুখ তুলিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে কহিল, একদিন কমল বলছিলেন যে, বিবেকবুদ্ধিটাই সংসারের মস্তবড় বস্তু নয়। বিবেকের দোহাই দিয়েই সমস্ত ন্যায়-অন্যায়ের মীমাংসা হয় না।

আশুবাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে বলে নাকি?

নীলিমা কহিল, হ্যাঁ। বলেন, ওটা শুধু নির্বোধের হাতের অস্ত্র। সামনে পিছনে দুদিকেই কাটে—ওর কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

আশুবাবু কহিলেন, সে বলে বলুক, ও কথা তুমি মুখে এনো না নীলিমা।

বেলা কহিল, এতবড় দুঃসাহসের কথাও ত কখনো শুনিনি!

আশুবাবু মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, দুঃসাহসই বটে। তার সাহসের অন্ত নেই। আপন নিয়মে চলে। তার সব কথা সব সময়ে বোঝাও যায় না, মানাও চলে না।

বেলা কহিল, আপন নিয়মে আমিও চলি আশুবাবু। তাই বাবার নিষেধও মানতে

পারিনি,—স্বামী পরিত্যাগ করলুম, কিন্তু হেঁট হতে পারলুম না।

আশুবাবু বলিলেন, গভীর পরিতাপের ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু তোমার বাবা মত দিতে না পারলেও আমি না দিয়ে পারিনি!

বেলা কহিল, Thanks, সে আমার মনে আছে আশুবাবু।

আশুবাবু বলিলেন, তার কারণ স্ত্রী-পুরুষের সমান দায়িত্ব এবং সমান অধিকার আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আমাদের হিন্দু-সমাজের এটা মস্ত দোষ যে, শত অপরাধেও স্বামীর বিচারের ভয় নেই ; কিন্তু তুচ্ছ দোষেও স্ত্রীকে শাস্তি দেবার তার সহস্র পথ খোলা। এ বিধি আমি কোনদিনও ন্যায্য বলে মেনে নিতে পারিনি। তাই বেলার বাবা যখন আমার মতামত চেয়ে চিঠি লিখেছিলেন, তখন উত্তরে এই কথাই জানিয়েছিলাম যে, জিনিসটা শোভনও নয়, সুখেরও নয়, কিন্তু সে যদি তার অসচ্চরিত্র স্বামীকে সত্যই বর্জন করতে চায়, তাকে অন্যায় বলে আমি নিষেধ করতে পারবো না।

নীলিমা অকৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, আপনি সত্যিই এই অভিমত জবাবে লিখেছিলেন?

সত্যি বৈ কি।

নীলিমা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেই স্তব্ধতার সম্মুখে আশুবাবু কেমন একপ্রকার অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, এতে আশ্চর্য হবার ত কিছু নেই নীলিমা, বরঞ্চ না লিখলেই আমার পক্ষে অন্যায় হ'তো।

একটুখানি থামিয়া কহিলেন, তুমি ত কমলের একজন বড় ভক্ত ; বল ত সে নিজে এ ক্ষেত্রে কি করতো? কি জবাব দিত? তাইত সেদিন যখন ওদের দুজনের আলাপ করিয়ে দিই, তখন এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছিলাম, কমল, তোমার মত করে ভাবতে, তোমার মত সাহসের পরিচয় দিতে কেবল একটি মেয়েকেই দেখেচি, সে এই বেলা।

নীলিমার দুই চক্ষু সহসা ব্যথায় ভরিয়া আসিল, কহিল, সে বেচারা ভদ্র-সমাজের বাইরে, লোকালয়ের বাইরে পড়ে আছে, তাকে আপনাদের টানাটানি করা কেন?

আশুবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, না না, টানাটানি নয় নীলিমা, এ শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া।

নীলিমা কহিল, ওই ত টানাটানি। এইমাত্র বলছিলেন, তার সকল কথা বোঝাও যায় না, মানাও চলে না। চলে না কিছুই, চলে কি শুধু উদাহারণ দেওয়া?

তাঁহার কথার মধ্যে দোষের কি আছে আশুবাবু ভাবিয়া পাইলেন না। ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিলেন, যে জন্যেই হোক, আজ তোমার মন বোধ হয় খুব খারাপ হয়ে আছে। এ সময়ে আলোচনা করা ভাল নয়।

নীলিমা এ কথা কানে তুলিল না, বলিল, সেদিন আপনি ওঁদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মত দিয়েছিলেন এবং আজ অসঙ্কোচে কমলের দৃষ্টান্ত দিলেন। ওঁর অবস্থায় কমল কি করত, তা সে-ই জানে, কিন্তু তার দৃষ্টান্ত সত্যি করে অনুসরণ করতে গেলে আজ ওঁকে কুলীমজুরের জামা সেলাই করে আহার সংগ্রহ করতে হতো,—তাও হয়ত সবদিন জুটতো না। কমল আর যাই করুক, যে-স্বামীকে সে লাঞ্ছনা দিয়ে ঘৃণায় ত্যাগ করেছে, তারই দেওয়া অন্নের গ্রাস মুখে তুলে, তারই দেওয়া বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে বাঁচতে চাইতো না। নিজেকে এতখানি ছোট করার আগে সে আত্মহত্যা করে মরতো।

আশুবাবু জবাব দিবেন কি, অভিভূত হইয়া পড়িলেন, এবং বেলা ঠিক যেন বজ্রাহতের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিল। নীলিমার হাসি-তামাশা করিয়াই দিন কাটে, সকলের মুখ চাহিয়া থাকাই যেন তাহার কাজ ; সে যে সহসা এমন নির্মম হইয়া উঠিতে পারে, দুজনের কেহই তাহা উপলব্ধি করিতেও পারিলেন না।

নীলিমা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিল, আপনাদের মজলিসে আমি বসিনে, কিন্তু যাদের নিয়ে যে-সকল প্রসঙ্গের আলোচনা চলে, সে আমার কানে আসে। নইলে কোন কথা হয়ত আমি

বলতাম না। কমল একটা দিনের জন্যেও শিবনাথের নিন্দে করেনি, একটি লোকের কাছেও তার দুঃখের নালিশ জানায় নি,—কেন জানেন?

আশুবাবু বিমূঢ়ের ন্যায় শুধু প্রশ্ন করিলেন, কেন?

নীলিমা কহিল, কেন তা বলা বৃথা। আপনারা বুঝতে পারবেন না। একটু থামিয়া বলিল, আশুবাবু, স্বামী-স্ত্রীর তুল্য অধিকার—এ একটা অত্যন্ত স্থূল কথা। কিন্তু তাই বলে এমন ভাববেন না যে, মেয়েমানুষ হয়ে আমি মেয়েদের দাবীর প্রতিবাদ করচি। প্রতিবাদ আমি করিনে; আমি জানি এ সত্যি, কিন্তু এ কথাও জানি যে সত্য-বিলাসী একদল অবুঝ নর-নারীর মুখে মুখে, আন্দোলনে আন্দোলনে এ সত্য এমনি ঘুলিয়ে গেছে যে, আজ একে মিথ্যে বলতেই সাধ যায়। আপনার কাছে করজোড়ে প্রার্থনা, সকলের সঙ্গে জুটে কমলকে নিয়ে আর চর্চা করবেন না।

আশুবাবু জবাব দিতে গেলেন, কিন্তু কথা বলিবার পূর্বেই সে সেলাইয়ের জিনিসপত্রগুলা তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল।

তখন ক্ষুব্ধ-বিস্ময়ে নিশ্বাস ফেলিয়া শুধু বলিলেন, ও কবে কি শুনেছে জানিনে, কিন্তু আমার সম্বন্ধে এ অত্যন্ত অযথা দোষারোপ।

বাহিরে ক্ষণিকের জন্য বৃষ্টি থামিয়াছিল, কিন্তু উপরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশ ঘরের মধ্যে অসময়ে অন্ধকার সঞ্চারিত করিল। ভৃত্য আলো দিয়া গেলে তিনি চোখের সম্মুখে বইখানা আর একবার তুলিয়া ধরিলেন। ছাপার অক্ষরে মনঃসংযোগ করা সম্ভবপর নয়, কিন্তু বেলার সঙ্গে মুখোমুখি বসিয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হওয়া আরও অসম্ভব বলিয়া মনে হইল।

ভগবান দয়া করিলেন। একটা ছাতার মধ্যে সমস্ত পথ ঠেলাঠেলি করিয়া কৃচ্ছ্রব্রতধারী হরেন্দ্র-অজিত ঝড়ের বেগে আসিয়া ঘরে ঢুকিল। দুজনেই অর্ধেক-অর্ধেক ভিজিয়াছে,— বৌদি কৈ?

আশুবাবু চাঁদ হাতে পাইলেন। আজিকার দিনে কেহ যে আসিয়া জুটিবে এ ভরসা তাঁহার ছিল না; সাগ্রহে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিলেন,—এসো অজিত, বসো হরেন্দ্র—

বসি। বৌদি কোথায়?

ইস! দুজনেই যে ভারী ভিজে গেছো দেখচি—

আজ্ঞে হাঁ। তিনি কোথায় গেলেন?

ডেকে পাঠাচ্চি, বলিয়া আশুবাবু একটা হুঙ্কার ছাড়িবার উদ্যোগ কতিতেই ভিতরের দিকের পর্দা সরাইয়া নীলিমা আপনিই প্রবেশ করিল। তাহার হাতে দুখানি শুষ্ক বস্ত্র এবং জামা।

অজিত কহিল, একি? আপনি হাত গুণতে জানেন নাকি?

নীলিমা বলিল, গোনা-গাঁথার দরকার হয়নি ঠাকুরপো, জানালা থেকেই দেখতে পেয়েছিলাম। একটি ভাঙ্গা ছাতির মধ্যে যেভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি দরদ দেখিয়ে পথ চলেছিলে, সে শুধু আমি কেন, বোধ করি দেশসুদ্ধ লোকের চোখে পড়েচে।

আশুবাবু বলিলেন, একটা ছাতার মধ্যে দুজনে? তাইতে দজনকেই ভিজতে হয়েছে। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

নীলিমা কহিল, ওঁরা বোধ হয় সমানাধিকার-তত্ত্বে বিশ্বাসী, অন্যায় করেন না, তাই চুলচিরে ছাতি ভাগ করে পথ হাঁটছিলেন। নাও ঠাকুরপো, কাপড় ছাড়ো। এই বলিয়া সে জামাকাপড় হরেন্দ্রর হাতে দিল।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র কহিল, কাপড় দিলেন দুটো, কিন্তু জামা যে একটি।

জামাটা মস্ত বড় ঠাকুরপো, একটাতেই হবে, বলিয়া গম্ভীর হইয়া পাশের চৌকিটায় উপবেশন করিল।

হরেন্দ্র বলিল, জামাটা আশুবাবুর, সুতরাং, দুজনের কেন, আরও জন-চারেকের হতে পারে, কিন্তু সে মশারির মত খাটাতে হবে, গায়ে দেওয়া চলবে না।

বেলা এতক্ষণ শুষ্ক-বিষণ্নমুখে নীরবে বসিয়াছিল, হাসি চাপিতে না পারিয়া উঠিয়া গেল; এবং নীলিমা জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু ছদ্ম-গাম্ভীর্যের সহিত কহিলেন, রোগে ভুগে আধখানি হয়ে গেছি হে হরেন, আর খুঁড়ো না। দেখচো না মেয়েদের কি-রকম ব্যথা লাগলো। একজন সইতে না পেরে উঠে গেলেন, আর একজন রাগে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন।

হরেন্দ্র কহিল, খুঁড়িনি আশুবাবু, বিরাটের মহিমা কীর্তন করেছি। খোঁড়াখুঁড়ির দুষ্প্রভাব শুধু আমাদের মত নর-জাতিকেই বিপন্ন করে, আপনাদের স্পর্শ করতেও পারে না। অতএব চিরস্তুয়মান হিমাচলের ন্যায় ও দেহ অক্ষয় হোক, মেয়েরা নিঃশঙ্ক হোন এবং জল-বৃষ্টির ছুতানাতায় ইতর-জনের ভাগ্যে দৈনন্দিন মিষ্টান্নের বরাদ্দে আজও যেন তাদের বিন্দুমাত্রও ন্যূনতা না ঘটে।

নীলিমা মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, বড়দের স্তুতিবাদ ত আবহমানকাল চলে আসচে ঠাকুরপো, সেইটেই নির্দিষ্ট ধারা এবং তাতে তুমি সিদ্ধহস্ত। কিন্তু আজএকটু নিয়মের ব্যতিক্রম করতে হবে। আজ ছোটর খোশামোদ না করলে ইতর-জনের ভাগ্যে মিষ্টান্নের অঙ্কে একেবারে শূন্য পড়বে।

বেলা বারান্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, কেন বৌদি?

গভীর স্নেহে নীলিমার চোখ সজল হইয়া উঠিল, কহিল, অমন মিষ্টিকথা অনেকদিন শুনিনি ভাই, তাই শুনতে একটু লোভ হয়।

তবে, আরম্ভ করব নাকি?

আচ্ছা এখন থাক। তোমরা ও-ঘরে গিয়ে কাপড় ছাড় গে, আমি জামা পাঠিয়ে দিচ্চি।

কিন্তু কাপড় ছাড়া হলে? তার পরে?

নীলিমা সহাস্যে কহিল, তার পরে চেষ্টা করে দেখি গে ইতর-জনের ভাগ্যে যদি কোথাও কিছু জোটাতে পারি।

হরেন্দ্র বলিল, কষ্ট করে চেষ্টা করতে হবে না বৌদি, শুধু একবার চোখ মেলে চাইবেন। আপনার অন্নপূর্ণার দৃষ্টি যেখানে পড়বে, সেখানেই অন্নের ভাঁড়ার উথলে যাবে। চলো অজিত, আর ভাবনা নেই, আমরা ততক্ষণ ভিজে কাপড় ছেড়ে আসি গে, এই বলিয়া সে অজিতের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে পাশের ঘরে প্রবেশ করিল।

তেইশ

অজিত কহিল, জল থামবার ত কোন লক্ষণ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না। অতএব আবার দুজনে সেই ভাঙ্গা ছাতির মধ্যে মাথা গুঁজে সমানাধিকার-তত্ত্বের সত্যতা সপ্রমাণ করতে করতে অন্ধকারে পথ চলা এবং অবশেষে আশ্রমে পৌঁছানো। অবশ্য, তার পরের ভাবনাটা নেই,—এখানে তা চুকিয়ে নেওয়া গেছে, সুতরাং আর একবার ভিজে কাপড় ছাড়া ও শুয়ে পড়া।

আশুবাবু ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, তা হলে তোমরা দুজনে একেবারে পেট ভরেই খেয়ে নিলে না কেন?

হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, না, না, থাক, তাতে আর কি হয়েছে, আপনি সেজন্য ব্যস্ত হবেন না আশুবাবু।

নীলিমা প্রথমটা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, পরে অনুযোগের কণ্ঠে বলিল, ঠাকুরপো, কেন মিছে রোগা মানুষের উৎকণ্ঠা বাড়াও। আশুবাবুকে কহিল, উনি সন্ন্যাসী মানুষ, বৈরিগীগিরিতে পেকে গেছেন,—এ দিক থেকে ওঁর ত্রুটি কেউ দেখতে পাবে না। ভাবনা শুধু অজিতবাবুর জন্যে। এমন সংসর্গেও যে উনি তাড়াতাড়ি সুপক্ক হয়ে উঠতে পারছেন না, সে ওঁর আজকের খাওয়া দেখলেই ধরা যায়।

হরেন্দ্র বলিল, বোধ হয় মনের মধ্যে পাপ আছে তাই। ধরা পড়বে একদিন।

অজিত লজ্জায় আরক্ত হইয়া কহিল, আপনি কি যে বলেন হরেনবাবু!

নীলিমা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক ঠাকুরপো, তাই যেন হয়। ওঁর মনের মধ্যে একটুখানি পাপই থাক, উনি ধরাই পড়ুন একদিন,—আমি কালীঘাটে গিয়ে ঘটা করে পূজো দেব।

তা হলে আয়োজন করুন।

অজিত অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, আপনি কি বাজে বকচেন হরেনবাবু, ভারী বিশ্রী বোধ হয়।

হরেন্দ্র আর কথা কহিল না। অজিতের মুখের দিকে চাহিয়া নীলিমার কৌতূহল তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু সেও চুপ করিয়া রহিল।

অজিতের কথাটা চাপা পড়িলে কিছুক্ষণ পরে হরেন্দ্র নীলিমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমাদের আশ্রমের ওপর কমলের ভারী রাগ। আপনার বোধ করি মনে আছে বৌদি?

নীলিমা মাথা নাড়িয়া বলিল, আছে। এখনো তার সেই ভাব নাকি?

হরেন্দ্র কহিল, ঠিক সেই ভাব নয়, আর একটুখানি বেড়েছে; এইমাত্র প্রভেদ। পরে কহিল, শুধু আমাদের উপরেই নয়, সর্ববিধ ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের প্রতিই তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ! ব্রহ্মচর্যই বলুন, বৈরাগ্যের কথাই বলুন, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেই আলোচনা হোক, শোনামাত্রই অহেতুক ভক্তি ও প্রীতির প্রাবল্যে অগ্নিবৎ হয়ে উঠেন। মেজাজ ভাল থাকলে মূঢ়-বুড়ো-খোকাদের ছেলেখেলায় আবার কৌতুকবোধ করতেও অপারক হন না। চমৎকার!

বেলা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, কহিল, ঈশ্বরও ওঁর কাছে ছেলেখেলা? আর এঁরই সঙ্গে আমার তুলনা করছিলেন, আশুবাবু? এই বলিয়া সে পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকেই চাহিল, কিন্তু কাহারও কাছে কোন উৎসাহ পাইল না। তাহার রুক্ষস্বর ইঁহাদের কানে গেল কি না ঠিক বুঝা গেল না।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ নিজের মধ্যে এমনি একটি নির্দ্বন্দ্ব সংযম, নীরব মিতাচার ও নির্বিশঙ্ক তিতিক্ষা আছে যে, দেখে বিস্ময় লাগে। আপনার শিবনাথের ব্যাপারটা মনে আছে আশুবাবু? সে আমাদের কে, তবুও এতবড় অন্যায় সহ্য হলো না, দণ্ড দেবার আকাঙ্ক্ষায় বুকের মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল। কিন্তু কমল বললে, না। তার সেদিনের মুখের চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সে 'না'-র মধ্যে বিদ্বেষ নেই, জ্বালা নেই, উপর থেকে হাত বাড়িয়ে দান করবার শ্লাঘা নেই, ক্ষমার দম্ভ নেই—দাক্ষিণ্যে যেন অবিকৃত করুণায় ভরা। শিবনাথ যত অন্যায়ই করে থাক, আমার প্রস্তাবে কমল চমকে উঠে শুধু বললে, ছি ছি—না না, সে হয় না। অর্থাৎ একদিন যাকে সে ভালবেসেছিল তার প্রতি নির্মমতার হীনতা কমল ভাবতেই পারলে না এবং সকলেরচোখের আড়ালে সব দোষ তার নিঃশব্দে নিঃশেষ করে মুছে ফেলে দিলে। চেষ্টা নয়, চঞ্চলতা নয়, শোকাচ্ছান্ন হা-হুতাশ নয়,—যেন পাহাড় থেকে জলের ধারা অবলীলাক্রমে নীচে গড়িয়ে বয়ে গেল।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া কেবল বলিলেন, সত্যি কথা।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, কিন্তু আমার সবচেয়ে রাগ হয় ও যখন শুধু কেবল আমার নিজের আইডিয়ালটাকেই নয়, আমাদের ধর্ম, ঐতিহ্য, রীতি, নৈতিক-অনুশাসন, সবকিছুকেই উপহাস করে উড়িয়ে দিতে চায়। বুঝি, ওর দেহের মধ্যে উৎকট বিদেশী রক্ত, মনের মধ্যে তেমনি উগ্র পরধর্মের ভাব বয়ে যাচ্ছে, তবুও ওর মুখের সামনে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে পারিনে। ওর বলার মধ্যে কি যে একটা সুনিশ্চিত জোরের দীপ্তি ফুটে বার হতে থাকে যে, মনে হয় যেন ও জীবনের মানে খুঁজে পেয়েচে। শিক্ষা দ্বারা নয়, অনুভব-উপলব্ধি দিয়ে নয়, যেন চোখ দিয়ে অর্থটাকে সোজা দেখতে পাচ্চে।

আশুবাবু খুশী হইয়া বলিলেন, ঠিক এই জিনিসটি আমারও অনেকবার মনে হয়েছে। তাই

ওর যেমন কথা, তেমনি কাজ। এ যদি মিথ্যে বুঝেও থাকে, তবু সে মিথ্যের গৌরব আছে। একটু থামিয়া বলিলেন, দেখ হরেন, এ একপ্রকার ভালই হয়েছে যে, পাষণ্ড চলে গেছে। ওকে চিরদিন আচ্ছন্ন করে থাকলে ন্যায়ের মর্যাদা থাকতো না। শূয়োরের গলায় মুক্তোর মালার মত অপরাধ হতো।

হরেন্দ্র বলিল, আবার আর একদিকে এমনি মায়া-মমতা যে, একা বৌদি ছাড়া কোন মেয়েকে তার সমান দেখিনি। সেবায় যেন লক্ষ্মী। হয়ত, পুরুষদের চেয়ে অনেকদিকে অনেক বড় বলেই নিজেকে তাদের কছে এমনি সামান্য করে রাখে যে, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। মন গলে গিয়ে যেন পায়ে পড়তে চায়।

নীলিমা সহাস্যে কহিল, ঠাকুরপো, তুমি বোধ হয় পূর্বজন্মে কোন রাজরানীর স্তুতিপাঠক ছিলে, এ জন্মে তার সংস্কার ঘোচেনি। ছেলে-পড়ানো ছেড়ে এ ব্যবসা ধরলে যে ঢের সুরাহা হতো।

হরেন্দ্র হাসিল, কহিল, কি করব বৌদি, আমি সরল সোজা মনুষ, যা ভাবি তাই বলে ফেলি। কিন্তু জিজ্ঞেসা করুন দিকি অজিতবাবুকে, এক্ষুণি উনি হাতের আস্তিন গুটিয়ে মারতে উদ্যত হবেন। তা হোক, কিন্তু বেঁচে থাকলে দেখতে পাবেন একদিন।

অজিত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আঃ, কি করেন হরেনবাবু! আপনার আশ্রম থেকে দেখচি চলে যেতে হবে একদিন।

হরেন্দ্র বলিল, হবে একদিন সে আমি জানি। কিন্তু ইতিমধ্যের দিন-ক'টা একটু সহ্য করে থাকুন।

তা হলে বলুন আপনার যা ইচ্ছা হয়। আমি উঠে যাই।

নীলিমা বলিল, ঠাকুরপো, তোমার ব্রহ্মচর্য আশ্রমটা ছাই তুলেই দাও না ভাই। তুমিও বাঁচো, ছেলেগুলোও বাঁচে।

হরেন্দ্র বলিল, ছেলেগুলো বাঁচতে পারে বৌদি, কিন্তু আমার বাঁচবার আশা নেই; অন্ততঃ অক্ষয়টা বেঁচে থাকতে নয়। সে আমাকে যমের বাড়ি রওনা করে দিয়ে ছাড়বে।

আশুবাবু কহিলেন, অক্ষয়কে দেখচি তোমরা তা হলে ভয় করো।

আজ্ঞে, করি। বিষ খাওয়া সহজ, কিন্তু তার টিটকিরি হজম করা অসাধ্য। ইনফ্লুয়েঞ্জায় এত লোক মারা গেল, কিন্তু সে ত মরল না। দিব্যি পালালো।

সকলেই হাসিতে লাগিলেন। নীলিমা বলিল, অক্ষয়বাবুর সঙ্গে কথা কইনে বটে, কিন্তু এবার তোমার জন্যে বার হয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে নেবো। ভেতরে ভেতরে জ্বলেপুড়ে যে একেবারে কয়লা হয়ে গেলে!

হরেন্দ্র কহিল, আমরাই ধরা পড়ে গেছি বৌদি, আপনার সব জ্বলা-পোড়ার অতীত। বিধাতা আগুন শুধু আমাদের জন্যেই সৃষ্টি করেছিলেন, আপনারা তার এলাকার বাইরে।

নীলিমা লজ্জায় আরক্ত হইয়া শুধু কহিল, তা নয় ত কি!

বেলা কহিল, সত্যিই ত তাই।

ক্ষণকাল নীরবে কাটিল। অজিত কথা কহিল, বলিল, সেদিন ঠিক এই নিয়ে আমি একটি চমৎকার গল্প পড়েচি। আশুবাবুর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি পড়েন নি?

কৈ, মনে ত হয় না।

যে মাসিক পত্রগুলো আপনার বিলেত থেকে আসে, তারই একটাতে আছে। ফরাসী গল্পের অনুবাদ, স্ত্রীলোকের লেখা। বোধ করি ডাক্তার। একটুখানি নিজের পরিচয়ে বলেছেন যে, তিনি যৌবন পার হয়ে সবে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন। ঐ ত সুমুখের শেল্‌ফেই রয়েছে। এই বলিয়া সে বইখানি পাড়িয়া আনিয়া বসিল।

আশুবাবু প্রশ্ন করিলেন, গল্পের নামটা কি?

অজিত কহিল, নামটা একটু অদ্ভুত,—'একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম'।

বেলা কহিল, তার মানে? লেখিকা কি এখন পুরুষের দলে গেছেন নাকি?

অজিত বলিল, লেখিকা হয়ত নিজের কথাই বলে গেছেন এবং হয়ত নিজে ডাক্তার বলেই নারীদেহের ক্রমশঃ বিবর্তনের যে ছবি দিয়েছেন, তা স্থানে স্থানে রুচিকে আঘাত করে। যথা—

নীলিমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, যথায় কাজ নেই অজিতবাবু, ও থাক।

অজিত কহিল, থাক। কিন্তু অন্তরের, অর্থাৎ নারী-হৃদয়ের যে রূপটি এঁকেছেন তা ঠিক মধুর না হলেও বিস্ময়কর।

আশুবাবু কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন,—বেশ ত অজিত, বাদ-সাদ দিয়ে পড়ো না শুনি। জলও থামেনি, রাতও তেমন হয়নি।

অজিত কহিল, বাদ-সাদ দিয়েই পড়া চলে। গল্পটা বড়, ইচ্ছে হলে সবটা পরে পড়তে পারবেন।

বেলা কহিল, পড়ুন না শুনি। অন্ততঃ সময়টা কাটুক।

নীলিমার ইচ্ছা হইল সে উঠিয়া যায়, কিন্তু উঠিয়া যাইবার কোন হেতু না থাকায় সসঙ্কোচে বসিয়া রহিল।

বাতির সম্মুখে বসিয়া অজিত বই খুলিয়া কহিল, গোড়ায় একটু ভুমিকা আছে, তা সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। এ যাঁর আত্মকাহিনী, তিনি সুশিক্ষিতা, সুন্দরী, এবং বড়ঘরের মেয়ে। চরিত্র নিষ্কলঙ্ক কিনা গল্পে স্পষ্ট উল্লেখ নেই, কিন্তু নিঃসংশয়ে বোঝা যায়, দাগ যদি বা কোনদিন কোন ছলে লেগেও থাকে সে যৌবনের প্রারম্ভে—সে বহুদিন পূর্বে।

সেদিন তাঁকে ভালবেসেছিল অনেকে ; একজন সমস্যার মীমাংসা করলে আত্মহত্যা করে এবং আর একজন চলে গেল সাগর পার হয়ে ক্যানাডায়। গেল বটে, কিন্তু আশা ছাড়তে পারলে না। দূরের থেকে দয়া ভিক্ষে চেয়ে সে এত চিঠি লিখেচে যে, জমিয়ে রাখলে একখানা জাহাজ বোঝাই হতে পারতো। জবাবের আশা করেনি, জবাবা পায়ও নি। তার পরে পনেরো বছর পরে দেখা। দেখা হতে হঠাৎ সে যেন চমকে উঠলো। ইতিমধ্যে যে পনেরো বছর কেটে গেছে,—যাকে পঁচিশ বৎসরের যুবতী দেখে বিদেশে গিয়েছিল তার যে বয়স আজ চল্লিশ হয়েছে, এ ধারণাই যেন তার ছিল না। কুশল প্রশ্ন অনেক হলো, অভিযোগ-অনুযোগও কম হলো না ; কিন্তু সেদিন দেখা হলে যার চোখের কোণ দিয়ে আগুন ঠিক্‌রে বার হতো, উন্মত্ত-কামনার ঝঞ্ঝাবর্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবরুদ্ধ-দ্বার ভেঙ্গে বাইরে আসতে চাইত, আজ তার কোন চিহ্নই কোথাও নেই। এ যেন কবেকার এক স্বপ্ন দেখা। মেয়েদের আর সব ঠকানো যায়, কিন্তু এ যায় না। এইখানে গল্পের আরম্ভ। এই বলিয়া অজিত বইয়ের পাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আশুবাবু বাধা দিলেন, না না, ইংরেজি নয় অজিত, ইংরেজি নয়। তোমার মুখ থেকে বাংলায় গল্পের সহজ ভাবটুকু বড় মিষ্টি লাগল, তুমি এমনি করেই বাকীটুকু বলে যাও।

আমি পারব কেন?

পারবে, পারবে। যেমন করে বলে গেলে তেমনি করেই বল।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রবাবুর মত আমার ভাষায় জ্ঞান নেই ; বলার দোষে যদি সমস্ত কটু হয়ে ওঠে সে আমারই অক্ষমতা। এই বলিয়া সে কখনো বা বইয়ের প্রতি চাহিয়া, কখনো বা না চাহিয়া বলিতে লাগিল—

"মেয়েটি বাড়ি ফিরে এলো। ঐ লোকটিকে যে সে কখনো ভালবেসেছিল বা কোনদিন চেয়েছিল তা নয়, বরঞ্চ একান্তমনে চিরদিন এই প্রার্থনাই করে এসেছে, ঈশ্বর যেন ঐ মানুষটিকে একদিন মোহমুক্ত করেন,—এই নিষ্ফল প্রণয়ের দাহ থেকে অব্যাহতি দান করেন। অসম্ভব বস্তুর লুব্ধ আশ্বাসে আর যেন না সে যন্ত্রণা পায়। দেখা গেল, এতদিনে ভগবান সেই প্রার্থনাই মঞ্জুর করেছেন। কোন কথাই হলো না, তবু নিঃসন্দেহে বুঝা গেল, সে ক্যানাডায় ফিরে যাক বা না যাক, সকাতরে প্রণয়-ভিক্ষা চেয়ে আর সে নিরন্তর নিজেও চিরদিন 'না' বলে মেয়েটি অস্বীকার করেই এসেছে, আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি, কিন্তু সেই শেষ 'না' এলো আজ একেবারে উলটো

দিক থেকে। দুয়ের মধ্যে যে এতবড় বিভেদ ছিল, মেয়েটি স্বপ্নেও ভাবেনি। মানবের লোলুপ-দৃষ্টি চিরদিন তাকে বিব্রত করেছে, লজ্জায় পীড়িত করেছে ; আজ ঠিক সেইদিক থেকেই যদি তার মুক্তি ঘটে থাকে শারীরধর্ম-বশে অবসিতপ্রায় যৌবন যদি তার পুরুষের উদ্দীপ্ত কামনা, উন্মাদ আসক্তির আজ গতিরোধ করে থাকে, অভিযোগের কি আছে? অথচ বাড়ি ফেরার পথে সমস্ত বিশ্ব-সংসার আজ যেন চোখে তার সম্পূর্ণ অপরিচিত মূর্তি নিয়ে দেখা দিলে। ভালবাসা নয়, আত্মার একান্ত মিলনের ব্যাকুলতা নয়—এ-সব অন্য কথা। বড় কথা। কিন্তু যা বড় নয়—যা রূপজ, যা অশুভ, অসুন্দর, যা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী,—সেই কুৎসিতের জন্যেও যে নারীর অবিজ্ঞাত চিত্ত-তলে এতবড় আসন পাতা ছিল, পুরুষের বিমুখতা যে তকে এমন নির্মম অপমানে আহত করতে পারে, আজকের পূর্বে সে তার কি জানত?

হরেন্দ্র কহিল, অজিত বেশ ত বলেন। গল্পটা খুব মন দিয়ে পড়েছেন।

মেয়েরা চুপ করিয়া শুধু চাহিয়া রহিল, কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না।

আশুবাবু বললেন, হাঁ। তার পরে অজিত?

অজিত বলিতে লাগিল,—মহিলাটির অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল যে, কেবল ঐ মানুষটিই ত নয়, বহু লোকে বহুদিন ধরে তাকে ভলবেসেছে, প্রর্থনা করেছে,—সেদিন তার একটুখানি হাসিমুখের একটিমাত্র কথার জন্যে তাদের আকুলতার শেষ ছিল না। প্রতিদিনের প্রতি পদক্ষেপেই যে তারা কোন্ মাটি ফুঁড়ে এসে দেখা দিতো, তার হিসেব মিলতো না। তারাই আজ গেল কোথায়? কোথাও ত যায়নি, এখনো ত মাঝে মাঝে তারা চোখে পড়ে। তবে গেছে কি তার নিজের কণ্ঠের সুর বিগড়ে? তার হাসির রূপ বদলে? এই ত সেদিন—দশ-পনেরো বছর, কতদিনই বা, এরই মাঝখানে কি তার সব হারালো?

আশুবাবু সহসা বলিয়া উঠিলেন, যায়নি কিছুই অজিত, হয়ত শুধু গেছে তার যৌবন—তার মা হবার শক্তিটুকু হারিয়ে।

অজিত তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল, ঠিক তাই। গল্পটা আপনি পড়েছিলেন?

না।

নইলে ঠিক এই কথাটিই জানলেন কি করে?

আশুবাবু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, তুমি তার পরে বল।

অজিত বলিতে লাগিল, তিনি বাড়ি ফিরে শোবার ঘরের মস্ত বড় আরশির সুমুখে আলো জ্বেলে দাঁড়ালেন। বাইরে যাবার পোশাক ছেড়ে রাত্রিবাসের কাপড় পরতে পরতে নিজের ছায়ার পানে চেয়ে আজ এই প্রথম তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন একেবারে বদলে গেল। এমন করে ধাক্কা না খেলে হয়তো এখনো চোখে পড়তো না যে, নারীর যা সবচেয়ে বড় সম্পদ,—আপনি যাকে বলছিলেন তার মা হবার শক্তি,—সে শক্তি আজ নিস্তেজ, ম্লান ; সে আজ সুনিশ্চিত মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছে ; এ জীবনে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না। তার নিশ্চেতন দেহের উপর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন জলধারার ন্যায় সে সম্পদ প্রতিদিন ব্যর্থতায় ক্ষয় হয়ে গেছে। কিন্তু এতবড় ঐশ্বর্য যে এমন স্বল্পায়ু, এ বার্তা পৌঁছল তার কাছে আজ শেষ বেলায়।

আশুবাবু নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, এমনিই হয় অজিত, এমনিই হয়। জীবনের অনেক বড় বস্তুকেই চেনা যায় শুধু তাকে হারিয়ে। তার পরে?

অজিত বলিল, তার পরে সেই আরশির সুমুখে দাঁড়িয়ে যৌবনান্ত দেহের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আছে। একদিন কি ছিল এবং কি হতে বসেছে। কিন্তু সে বিবরণ আমি বলতেও পারবো না, পড়তেও পারবো না।

নীলিমা পূর্বের মতই ব্যস্ত হইয়া বাধা দিল, না না না, অজিতবাবু, ও থাক। ঐ জায়গাটা বাদ দিয়ে আপনি বলুন।

অজিত কহিল, মহিলাটি বিশ্লেষণের শেষের দিকে বলেছেন, নারীর দৈহিক সৌন্দর্যের মত সুন্দর বস্তুও যেমন সংসারে নেই, এর বিকৃতির মত অসুন্দর বস্তুও হয়ত পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়

নেই।

আশুবাবু বলিলেন, এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি অজিত।

নীলিমা মাথা নাড়িয়া প্রতিবাদ করিল, না, একটুও বাড়াবাড়ি নয়। এ সত্যি।

আশুবাবু বলিলেন, কিন্তু মেয়েটির যা বয়েস, তাকে তো বিকৃতির বয়স বলা চলে না নীলিমা।

নীলিমা কহিল, চলে। কারণ ও তো কেবলমাত্র বছর গুণে মেয়েদের বেঁচে থাকবার হিসেব নয়, এর আয়ুষ্কাল যে অত্যন্ত কম, এ কথা আর যেই ভুলুক, মেয়েদের ভুললে ত চলবে না।

অজিত ঘাড় নাড়িয়া খুশী হইয়া বলিল, ঠিক এই উত্তরটি তিনি নিজে দিয়েছেন, বলেছেন—"আজ থেকে সমাপ্তির শেষ প্রতীক্ষা করে থাকাই হবে অবশিষ্ট জীবনের একটি মাত্র সত্য। এতে সান্ত্বনা নেই, আনন্দ নেই, আশা নেই জানি, তবু তো উপহাসের লজ্জা থেকে বাঁচবো। ঐশ্বর্যের ভগ্নস্তূপ হয়ত আজও কোনো দুর্ভাগার মনোহরণ করতে পারে, কিন্তু সে মুগ্ধতা তার পক্ষেও যেমন বিড়ম্বনা, আমার নিজের পক্ষেও হবে তেমনি মিথ্যে। যে রূপের সত্যকার প্রয়োজন শেষ হয়েছে, তাকেই নানাভাবে, নানা সজ্জায় সাজিয়ে 'শেষ হয়নি' বলে ঠকিয়ে বেড়াতে আমি নিজেকেও পারবো না, পরকেও না।"

আর কেহ কিছু কহিল না, শুধু নীলিমা কহিল, সুন্দর। কথাগুলি আমার ভারী সুন্দর লাগলো অজিতবাবু।

সকলের মত হরেন্দ্রও একমনে শুনিতেছিল ; সেই মন্তব্যে খুশী হইল না, কহিল, এ আপনার ভাবাতিশয্যের উচ্ছ্বাস বৌদি, খুব ভেবে বলা নয়। উঁচু ডালে শিমুল ফুলও হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, তবু ফুলের দরবারে তার নিমন্ত্রণ পৌঁছোয় না। রমণীর দেহ কি এমনিই তুচ্ছ জিনিস যে, এ ছাড়া আর তার কোন প্রয়োজনই নেই?

নীলিমা কহিল, নেই এ কথা তো লেখিকা বলেন নি। দুর্ভাগা মানুষগুলোর প্রয়োজন যে সহজে মেটে না, এ আশঙ্কা তাঁর নিজেরও ছিল। একটুখানি হাসিয়া কহিল, উচ্ছ্বাসের কথা বলছিলে ঠাকুরপো, অক্ষয়বাবু উপস্থিত নেই, তিনি থাকলে বুঝতেন ওর আতিশয্যটা আজকাল কোন্ দিকে চেপেছে।

হরেন্দ্র জবাব দিল, আপনি গালাগালি দিতে থাকলেই যে পচে যাবো তাও নয় বৌদি।

শুনিয়া আশুবাবু নিজেও একটু হাসিলেন, কহিলেন, বাস্তবিক হরেন, আমারও মনে হয় গল্পটিতে লেখিকা মেয়েদের রূপের সত্যকার প্রয়োজনকেই ইঙ্গিত করেছেন,—

কিন্তু এই কি ঠিক?

ঠিক নয়, এ কথা জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে মনে করা কঠিন।

হরেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উঠিল, বলিল, জগৎ-সংসারের দিকে চেয়ে যাই কেননা মনে করুন, মানুষের দিকে চেয়ে একে স্বীকার করা আমার পক্ষেও কঠিন। মানুষের প্রয়োজন জীবজগতের সাধারণ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহুদূরে চলে গেছে,—তাই ত সমস্যা তার এমন বিচিত্র, এত দুরূহ। একে চালুনিতে ছেঁকে বেছে ফেলা যায় না বলেই ত তার মর্যাদা আশুবাবু।

তাও বটে, গল্পের বাকীটা শুনি অজিত!

হরেন্দ্র ক্ষুণ্ণ হইল, বাধা দিয়া কহিল, সে হবে না আশুবাবু। তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উত্তরটা এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না, হয় আমাকে সত্যিই স্বীকার করুন, না হয় আমার ভুলটা দেখিয়ে দিন। আপনি অনেক দেখেছেন, অনেক পড়েছেন—প্রকাণ্ড পণ্ডিত মানুষ,—আপনার এই অনির্দিষ্ট ঢিলেঢালা কথার ফাঁক দিয়ে যে বৌদি জিতে যাবেন, সে আমার সইবে না। বলুন।

আশুবাবু হাসিমুখে কহিলেন, তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ,—রূপের বিচারে হারলে ত তোমার লজ্জা নেই হরেন।

না, সে আমি শুনবো না।

আশুবাবু ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তোমার কথা অপ্রমাণ করার জন্যে কোমর বেঁধে তর্ক করতে আমার লজ্জা করে। বস্তুতঃ, নারী-রূপের নিগূঢ় অর্থ অপরিস্ফুট থাকে সেই ভাল হরেন। পুনরায় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, অজিতের গল্প শুনতে শুনতে আমার বকাল পূর্বের একটা দুঃখের কাহিনী মনে পড়ছিল। ছেলেবেলায় আমার এক ইংরেজ বন্ধু ছিলেন ; তিনি একটি পোলিশ রমণীকে ভালোবেসেছিলেন। মেয়েটি ছিল অপরূপ সুন্দরী ; ছাত্রীদের পিয়ানো বাজনা শিখিয়ে জীবিকা-নির্বাহ করতেন। শুধু রূপে নয়, নানা গুণে গুণবতী,—আমরা সবাই তাঁদের শুভকামনা করতাম। নিশ্চিত জানতাম, এঁদের বিবাহে কোথাও কোন বিঘ্ন ঘটবে না।

অজিত প্রশ্ন করিল, বিঘ্ন ঘটলো কিসে?

আশুবাবু বলিলেন, শুধু বয়সের দিক দিয়ে। দেশ থেকে একদিন মেয়েটির মা এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরই মুখে কথায় কথায় হঠাৎ খবর পাওয়া গেল কনের বয়স তখন পঁয়তাল্লিশ পার হয়ে গেছে।

শুনিয়া সকলেই চমকিয়া উঠিল। অজিত জিজ্ঞাসা করিল, মহিলাটি কি আপনাদের কাছে বয়েস লুকিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, না। আমার বিশ্বাস, জিজ্ঞাসা করলে তিনি গোপন করতেন না, সে প্রকৃতিই তাঁর নয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার কথা কারও মনেও উদয় হয়নি। এমনি তাঁর দেহের গঠন, এমনি মুখের সুকুমার শ্রী, এমনি মধুর কণ্ঠস্বর যে কিছুতেই মনে হয়নি বয়স তাঁর ত্রিশের বেশী হতেপারে।

বেলা কহিল, আশ্চর্য! আপনাদের কারও কি চোখ ছিল না?

ছিল বৈ কি। কিন্তু জগতের সকল আশ্চর্যই কেবল চোখ দিয়েই ধরা যায় না, এ তারই একটা দৃষ্টান্ত।

কিন্তু পাত্রের বয়স কত?

তিনি আমরাই সমবয়সী—তখন বোধ করি আটাশ-উনত্রিশের বেশী ছিল না।

তার পরে?

আশুবাবু বলিলেন, তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। ছেলেটির সমস্ত মন এক নিমিষেই যেন এই প্রৌঢ়া রমণীর বিরুদ্ধে পাষাণ হয়ে গেল। কতদিনের কথা, তবু আজও মনে পড়লে ব্যথা পাই। কত চোখের জল, কত হা-হুতাশ, কত আসা-যাওয়া, কত সাধাসাধি, কিন্তু সে বিতৃষ্ণাকে মন থেকে তার বিন্দু পরিমাণও নড়ানো গেল না। এ বিবাহ যে অসম্ভব, এর বাইরে সে আর কিছু ভাবাতেই পারলে না।

ক্ষণকাল সকলেই নীরব হইয়া রহিল। নীলিমা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উলটো হলে বোধ করি অসম্ভব হতো না?

বোধ হয় না?

কিন্তু ও-রকম বিবাহ কি ওদের দেশে একটিও হয় না? তেমন পুরুষ কি সেদেশে নেই?

আশুবাবু হাসিয়া কহিলেন, আছে। অজিতের গল্পের গ্রন্থকার বোধ করি দুর্ভাগা বিশেষণটা বিশেষ করে সেই পুরুষদেরই স্মরণ করে লিখেছেন। কিন্তু রাত্রি ত অনেক হয়েগেল অজিত, এর শেষটা কি?

অজিত চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আমি আপনার গল্পের কথাই ভাবছিলাম। অত ভালবেসেও ছেলেটি কেন যে তাঁকে গ্রহণ করতেপারলে না, এতবড় সত্য বস্তুটাও কোথা দিয়ে যে একনিমিষে মিথ্যের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো, সারাজীবন হয়ত মহিলাটি এই কথাই ভেবেছেন,—একদিন যেদিন আমি নারী ছিলাম! নারীত্বের সত্যকার অবসান যে নারীর অজ্ঞাতসারে কবে ঘটে এর পূর্বে হয়ত সেই বিগত-যৌবনা নারী চিন্তাও করেন নি।

কিন্তু তোমার গল্পের শেষটা?

অজিত শ্রান্তভাবে কহিল, আজ থাক। যৌবনের ঐ শেষটাই যে এখনো নিঃশেষ হয়ে যায়নি—নিজের এবং পরের কাছে মেয়েদের এই প্রতারণার করুণ কাহিনী দিয়েই গল্পের শেষটুকু সমাপ্ত হয়েছে। সে বরঞ্চ অন্যদিন বলব।

নীলিমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না না, তার চেয়ে ওটুকু বরঞ্চ অসমাপ্তই থাক।

আশুবাবু সায় দিলেন, ব্যথার সহিত কহিলেন, বাস্তবিক এই সময়টাই মেয়েদের নিঃসঙ্গ জীবনের সবচেয়ে দুঃসময়। অসহিষ্ণু, কপট, পরছিদ্রান্বেষী, এমন কি নিষ্ঠুর হয়ে,—তাই বোধ হয় সকল দেশেই মানুষে এদের এড়িয়ে চলতে চায় নীলিমা।

নীলিমা হাসিয়া কহিল, মেয়েদের বলা উচিত নয় আশুবাবু, বলা উচিত তোমাদের মত দুর্ভাগা মেয়েদের এড়িয়ে চলতে চায়।

আশুবাবু ইহার জবাব দিলেন না, কিন্তু ইঙ্গিতটুকু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, অথচ, স্বামী-পুত্রে সৌভাগ্যবতী যাঁরা, তাঁরা স্নেহে, প্রেমে, সৌন্দর্যে, মাধুর্যে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন যে, জীবনের এতবড় সঙ্কটকাল যে কবে কোন্ পথে অতিবহিত হয়ে যায়, টেরও পান না।

নীলিমা বলিল, ভাগ্যবতীদের ঈর্ষা করিনে আশুবাবু, সে প্রেরণা মনের মধ্যে আজও এসে পৌঁছোয় নি, কিন্তু ভাগ্যদোষে যাঁরা আমাদের মত ভবিষ্যতের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়েছেন এঁদের পথের নির্দেশ কোন্ দিকে আমাকে বলে দিতে পারেন?

আশুবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন, পরে কহিলেন, এর জবাবে আমি শুধু বড়দের কথার প্রতিধ্বনিমাত্রই করতে পারি নীলিমা, তার বেশী শক্তি নেই। তাঁরা বলেন, পরার্থে আপনাকে উৎসর্গ করে দিতে। সংসারে দুঃখেরও অভাব নেই, আত্ম-নিবেদনের দৃষ্টান্তেরও অসদ্ভাব নেই। এ-সব আমিও জানি, কিন্তু এর মাঝে নারীর অবিরুদ্ধ কল্যাণময় সত্যকার আনন্দ আছে কি না আজও আমি নিঃসংশয়ে জানিনে নীলিমা।

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, এ সন্দেহ কি আপনার বরাবর ছিল?

আশুবাবু মনে মনে যেন কুণ্ঠিত হইলেন, একটু থামিয়া বলিলেন, ঠিক স্মরণ করতে পারিনে হরেন। তখন, দিন দুই-তিন হ'লো মনোরমা চলে গেছেন, মন ভারাতুর, দেহ বিবশ, এই চৌকিটাতেই চুপ করে পড়ে আছি হঠাৎ দেখি কমল এসে উপস্থিত। আদর করে ডেকে কাছে বসালাম। আমার ব্যথার জয়গাটা সে সাবধানে পাশ কাটিয়ে যেতেই চাইলে, কিন্তু পারলে না। কথায় কথায় এই ধরনের কি একটা প্রসঙ্গ উঠে পড়ল, তখন আর তার হুঁশ রইলো না। তোমরা জানোই ত তাকে ; প্রাচীন যা-কিছু তার পরেই তার প্রবল বিতৃষ্ণা। নাড়া দিয়ে ভেঙ্গে ফেলাই যেন তার passion। মন সায় দিতে চায় না, চিরদিনের সংস্কার ভয়ে কাঠ হয়ে ওঠে, তবু কথা খুঁজে মেলে না, পরাভব মানতে হয়। মনে আছে সেদিনও তার কাছে মেয়েদের আত্মোৎসর্গের উল্লেখ করেছিলাম, কিন্তু কমল স্বীকার করলে না, বললে, মেয়েদের কথা আপনার চেয়ে আমি বেশি জানি। ও প্রবৃত্তি ত তাদের পূর্ণতা থেকে আসে না, আসে শুধু শূন্যতা থেকে—ওঠে বুক খালি করে দিয়ে। ওতো স্বভাব না—অভাব। অভাবের আত্মোৎসর্গ আমি কানাকড়ি বিশ্বাস করিনে আশুবাবু। কি যে জবাব দেবো ভেবে পেলাম না, তবু বললাম, কমল, হিন্দু-সভ্যতার মর্মবস্তুটির সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলে আজ হয়ত বুঝিয়ে দিতে পারতাম যে, ত্যাগ ও বিসর্জনের দীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করাই আমাদের সবচেয়ে বড় সফলতা এবং এই পথ ধরেই আমাদের কত বিধবা মেয়েই একদিন জীবনের সর্বোত্তম সার্থকতা উপলব্ধি করে গেছেন।

কমল হেসে বললে, করতে দেখেচেন? একটা নাম করুন তো? সে এ-রকম প্রশ্ন করবে ভাবিনি, বরঞ্চ ভেবেছিলাম কথাটা হয়ত সে মেনে নেবে। কেমনধারা যেন ঘুলিয়ে গেল—

নীলিমা বলিল, বেশ! আপনি আমার নামটা করে দিলেন না কেন? মনে পড়েনি বুঝি?

কি কঠোর পরিহস! হরেন্দ্র ও অজিত মাথা হেঁট করিল এবং বেলা আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

আশুবাবু অপ্রতিভ হইলেন, কিন্তু প্রকাশ পাইতে দিলেন না ; কহিলেন, না, মনেই পড়েনি সত্যি। চোখের সামনের জিনিস যেমন দৃষ্টি এড়িয়ে যায়,—তেমনি। তোমার নামটা করতে পারলে সত্যিই তার মস্ত জবাব হতো, কিন্তু সে যখন মনে এলো না, তখন কমল বললে, আমাকে যে-শিক্ষার খোঁটা দিলেন আশুবাবু, আপনাদের নিজের সম্বন্ধেও কি তাই যোল-আনায় খাটে না? সার্থকতার যে আইডিয়া শিশুকাল থেকে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে এসেছেন, সেই মুখস্থ-বুলিই ত তারা সদর্পে আবৃত্তি করে ভাবে, এই বুঝি সত্যি! আপনারাও ঠকেন, আত্মপ্রসাদের ব্যর্থ অভিমানে তারা নিজেরাও মরে।

বলেই বললে, সহমরণের কথা ত আপনার মনে পড়া উচিত। যারা পুড়ে মরত এবং তাদের যারা প্রবৃত্তি দিত, দুপক্ষের দম্ভই ত সেদিন এই ভেবে আকাশে গিয়ে ঠেকত যে, বৈধব্য-জীবনের এতবড় আদর্শের দৃষ্টান্ত জগতে আর আছে কোথায়?

এর উত্তর যে কি আছে খুঁজে পেলাম না। কিন্তু সে অপেক্ষাও করলে না, নিজেই বললে, উত্তর ত নেই, দেবেন কি? একটু থেমে আমার মুখের পানে চেয়ে বললে, প্রায় সকল দেশেই এই আত্মোৎসর্গ কথাটায় একটু বহুব্যাপ্ত ও বহুপ্রাচীন পারমার্থিক মোহ আছে, তাতে নেশা লাগে, পরলোকের অসামান্য-অবস্তু ইহলোকের সঙ্কীর্ণ সামান্য বস্তুকে সমাচ্ছন্ন করে দেয়, ভাবতেই দেয় না ওর মাঝে নরনারী কারও জীবনেরই শ্রেয়ঃ আছে কি না। সংস্কার-বুদ্ধি যেন স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মত কানে ধরে স্বীকার করিয়ে নেয়,—অনেকটা ঐ সহমরণের মতই, কিন্তু আর না আমি উঠি।

সে সত্যিই চলে যায় দেখে ব্যস্ত হয়ে বললাম, কমল, প্রচলিত নীতি এবং প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সত্যকে অবজ্ঞায় চূর্ণ করে দেওয়াই যেন তোমার ব্রত। এ শিক্ষা তোমাকে যে দিয়েছে জগতের সে কল্যাণ করেনি।

কমল বললে, আমার বাবা দিয়েছেন।

বললাম, তোমার মুখেই শুনেছি তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত লোক ছিলেন। এ কথা কি তিনি কখনো শেখান নি যে, নিঃশেষে দান করেই তবে মানুষে সত্য করে আপনাকে পায়? স্বেচ্ছায় দুঃখ-বরণের মধ্যেই আত্মার যথার্থ প্রতিষ্ঠা?

কমল বললে, তিনি বলতেন, মানুষেকে নিঃশেষে শুষে নেবার দুরভিসন্ধি যাদের তারাই অপরকে নিঃশেষে দান করার দুর্বুদ্ধি যোগায়। দুঃখের উপলব্ধি যাদের নেই, তারাই দুঃখ-বরণের মহিমায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে। জগতের দুর্লঙ্ঘ্য শাসনের দুঃখ ত ও নয়—ওকে যেন স্বেচ্ছায় যেচে ঘরে থেকে আনা। অর্থহীন শৌখিন জিনিসের মত ও শুধু ছেলেখেলা। তার বড় নয়!

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। বললাম, কমল, তোমার বাবা কি তোমাকে কেবল নিছক ভোগের মন্ত্রই দিয়ে গেছেন? এবং জগতের যা-কিছু মহৎ তাকেই অশ্রদ্ধায় তাচ্ছিল্য করতে?

কমল এ অনুযোগ বোধ করি আশা করেনি, ক্ষুণ্ণ হয়ে উত্তর দিলে, এ আপনার অসহিষ্ণুতার কথা আশুবাবু। আপনি নিশ্চয় জানেন, কোন বাপই তার মেয়েকে এমন মন্ত্র দিয়ে যেতে পারেন না। আমার বাবাকে আপনি অবিচার করচেন। তিনি সাধু লোক ছিলেন।

বললুম, তুমি যা বলচো, সত্যিই এ শিক্ষা যদি তিনি দিয়ে গিয়ে থাকেন তাঁকে সুবিচার করাও শক্ত। মনোরমার জননীর মৃত্যুর পরে অন্য কোন স্ত্রীলোককে আমি যে ভালবাসতে পারিনি শুনে তুমি বলেছিলে, এ চিত্তের অক্ষমতা, এবং, অক্ষমতা নিয়ে গৌরব করা চলে না। মৃত-পত্নীর স্মৃতির সম্মানকে তুমি নিষ্ফল আত্ম-নিগ্রহ বলে উপেক্ষার চোখে দেখেছিলে। সংযমের কোন অর্থই সেদিন তুমি দেখতে পাওনি—

কমল বললে, আজও পাইনে আশুবাবু, সংযম যেখানে উদ্ধত আস্ফালনে জীবনের আনন্দকে ম্লান করে আনে। ও ত কোন বস্তু নয়, ও একটা মনের লীলা,—তাকে বাঁধার দরকার। সীমা মেনে চলাই তো সংযম,—শক্তির স্পর্ধায় সংযমের সীমাকেও ডিঙ্গিয়ে যাওয়া সম্ভব। তখন আর তাকে সে মর্যাদা দেওয়া চলে না। অতি-সংযম যে আর-এক ধরনের অসংযম, এ কথা কি

কোনদিন ভেবে দেখেন নি আশুবাবু?

ভেবে দেখিনি সত্যি! তাই, চিরদিনের ভেবে-আসা কথাটা খপ করে মনে পড়ল। বললাম, ও কেবল তোমার কথার ভোজবাজি। সেই ভোগের ওকালতিতেই পরিপূর্ণ। মানুষ যতই আঁকড়ে ধরে গ্রাস করে ভোগ করতে চায় ততই সে হারায়। তার ভোগের ক্ষুধা ত মেটে না,—অতৃপ্তি নিরন্তর বেড়েই চলে। তাই আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলে গেছেন, ও পথে শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই, মুক্তির আশা বৃথা। তাঁরা বলেচেন,—ন জাতুকমঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।। আগুনে ঘি দিলে যেমন বেশী জ্বলে উঠে, তেমনি উপভোগের দ্বারা কামনা বাড়ে বৈ কোনদিন কমে না।

হরেন্দ্র উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, তার কাছে শাস্ত্রবাক্য বলতে গেলেন কেন? তার পথের?

আশুবাবু কহিলেন, ঠিক তাই। শুনে হেসে উঠে বললে, শাস্ত্রে ঐ-রকম আছে নাকি? থাকবেই ত। তাঁরা জানতেন জ্ঞানের চর্চায় জ্ঞানের ইচ্ছে বাড়ে, ধর্মের সাধনায় ধর্মের পিপাসা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে, পুণ্যের অনুশীলনে পুণ্যলোভ ক্রমশঃ উগ্র হয়ে উঠে, মনে হয় যেন এখনো ঢের বাকী,—এও ঠিক তেমনি। শাম্যতি নেই বলে এ-ক্ষেত্রে তাঁরা আক্ষেপ করে যাননি। তাঁদের বিবেচনা ছিল।

হরেন্দ্র, অজিত, বেলা ও নীলিমা চারিজনেই হাসিয়া উঠিল।

আশুবাবু বলিলেন, হাসির কথা নয়। মেয়েটার স্পর্ধায় যেন হতবাক হয়ে গেলাম, নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, না, এ তাঁদের অভিপ্রায় নয়, ভোগের মধ্যে তৃপ্তি নেই কামনার নিবৃত্তি হয় না, এই ইঙ্গিতই তাঁরা করে গেছেন।

কমল একটুখানি থেমে বললে, কি জানি, এমন বাহুল্য ইঙ্গিত তাঁরা কেন করে গেলেন। এ কি হাটের মাঝখানে বসে যাত্রা-শোনা, না প্রতিবেশীর গৃহের গ্রামোফোনের বাজনা যে, মাঝখানেই মনে হবে, থাক, যথেষ্ট তৃপ্তিলাভ করা গেছে,—আর না। এর আসল সত্তা ত বাইরের ভোগের মধ্যে নেই—উৎস ওর জীবনের মূলে, ঐখান থেকে ও নিত্যকাল জীবনের আশা, আনন্দ ও রসের যোগন দেয়। শাস্ত্রের ধিক্কার ব্যর্থ হয়ে দরজায় পড়ে থাকে, তাকে স্পর্শ করতেও পারে না।

বললাম, তা হতে পারে, কিন্তু ও যে রিপু, ওকে ত মানুষের জয় করা চাই!

কমল বললে, কিন্তু, রিপু বলে গাল দিলেই ত সে ছোট হয়ে যাবে না। প্রকৃতির পাকা দলিলে সে দখলদার—তাদের কোন্ সত্ত্বটা কে কবে শুধু বিদ্রোহ করেই সংসারে ওড়াতে পেরেছে? দুঃখের জ্বালায় আত্মহত্যা করাই ত দুঃখকে জয় করা নয়? অথচ, ঐ ধরনের যুক্তির জোরেই মানুষে অকল্যাণের সিংহদ্বারে শান্তির পথ হাতড়ে বেড়ায়? শান্তিও মেলে না, স্বস্তিও ঘোচে।

শুনে মনে হলো, ও বুঝি কেবল আমাকেই খোঁচা দিলে। এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, কি যে হ'লো মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল,—কমল, তোমার নিজের জীবনটা একবার ভেবে দেখ দিকি। কথাটা বলে ফেলে কিন্তু নিজের কানেই বিঁধলো, কারণ কটাক্ষ করার মত কিছুই ত তার নেই,—কমল নিজেও বোধ হয় আশ্চর্য হ'লো, কিন্তু রাগ অভিমান কিছুই করলে না, শান্তমুখে আমার পানে চেয়ে বললে, আমি প্রতিদিনই ভেবে দেখি আশুবাবু, দুঃখ যে পাইনি তা বলিনে, কিন্তু তাকেই জীবনের শেষ সত্য বলে মেনেও নিইনি। শিবনাথের দেবার যা ছিল তিনি দিয়েছেন, আমার পাবার যা ছিল তা পেয়েছি—আনন্দের সেই ছোট ছোট ক্ষণগুলি মনের মধ্যে আমার মণি-মাণিক্যের মত সঞ্চিত হয়ে আছে। নিষ্ফল চিত্তদাহে পুড়িয়ে তাদের ছাই করেও ফেলেনি, শুকনো ঝরনার নীচে গিয়ে ভিক্ষে দাও বলে শূন্য দু'হাত পেতে দাঁড়িয়েও থাকিনি। তাঁর ভালবাসার আয়ু যখন ফুরলো, তাকে শান্তমনেই বিদায় দিলাম, আক্ষেপ ও অভিযোগের ধোঁয়ায় আকাশ কালো করে তুলতে আমার প্রবৃত্তিই হলো না। তাই তাঁর সম্বন্ধে আমার সেদিনের আচরণ আপনাদের কাছে এমন অদ্ভুত ঠেকেছিল। আপনারা ভাবলেন এতবড় অপরাধ কমল মাপ করলে কি করে? কিন্তু অপরাধের কথার চেয়ে মনে এসেছিল সেদিন নিজেরই

দুর্ভাগ্যের কথা।

মনে হলো যেন তার চোখের কোণে জল দেখা দিলে। হয়ত সত্যি, হয়ত আমারই ভুল, বুকের ভেতরটা যেন ব্যথায় মুচড়ে উঠল—এর সঙ্গে আমার প্রভেদ কতটুকু! বললাম, কমল, এমনি মণি-মাণিক্যের সঞ্চয় আমারো আছে—সেই ত সাতরাজার ধন—আর আমরা লোভ করতে যাবো কিসের তরে বলো ত?

কমল চুপ করে চেয়ে রইল। জিজ্ঞাসা করলাম, এ জীবনে তুমিই কি আর কাউকে কখনো ভালবাসতে পারবে কমল? এমনি ধারা সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে?

কমল অবিচলিত-কণ্ঠে জবাব দিলে, অন্ততঃ সেই আশা নিয়েই ত বেঁচে থাকতে হবে আশুবাবু। অসময়ে মেঘের আড়ালে আজ সূর্য অস্ত গেছে বলে সেই অন্ধকারটা হবে সত্যি, আর কাল প্রভাতে আলোয় আকাশ যদি ছেয়ে যায়, দু'চোখ বুজে তাকেই বলব এ আলো নয়, এ মিথ্যে? জীবনটাকে নিয়ে এমনি ছেলেখেলা করেই কি সাঙ্গ করে দেবো?

বললাম, রাত্রি ত কেবল একটি মাত্রই নয় কমল, প্রভাতের আলো শেষ করে সে ত আবার ফিরে আসতে পারে?

সে বললে, আসুক না? তখনও ভোরের বিশ্বাস নিয়েই আবার রাত্রি যাপন করব।

বিস্ময়ে আচ্ছন্ন হয়ে বসে রইলাম,—কমল চলে গেল।

ছেলেখেলা! মনে হয়েছিল শোকের মধ্যে দিয়ে আমাদের উভয়ের ভাবনার ধারা বুঝি গিয়ে একস্রোতে মিশেছে। দেখলাম, না, তা নয়। আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জীবনের অর্থ ওর কাছে স্বতন্ত্র,—আমাদের সঙ্গে তার কোথাও মিল নেই। অদৃষ্ট ও মানে না, অতীতের স্মৃতি ওর সুমুখে পথ রোধ করে না। ওর অনাগত তাই,—যা আজও এসে পৌঁছোয় নি! তাই ওর আশাও যেমন দুর্বার, আনন্দও তেমনি অপরাজেয়। আর একজন কেউ ওর জীবনকে ফাঁকি দিয়েছে বলে সে নিজের জীবনেকেও ফাঁকি দিতে কোনমতেই সম্মত নয়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল।

উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপিয়া লইয়া আশুবাবু পুনশ্চ কহিলেন, আশ্চর্য মেয়ে! সেদিন বিরক্তি ও আক্ষেপের অবধি রইলো না, কিন্তু এ কথাও ত মনে মনে স্বীকার না করে পারলাম না যে, এ ত কেবল বাপের কাছে শেখা মুখস্থ বুলিই নয়। যা শিখেচে, একেবারে নিঃসংশয়ে একান্ত করেই শিখেচে। কতটুকুই বা বয়স, কিন্তু নিজের মনটাকে যেন ও এই বয়েসেই সম্যক্ উপলব্ধি করে নিয়েছে।

একটু থামিয়া বলিলেন, সত্যিই ত। জীবনটা সত্যিই ত আর ছেলেখেলা নয়। ভগবানের এতবড় দান ত সেজন্য আসেনি। আর-একজন কেউ আর-একজনের জীবনে বিফল হলো বলে সেই শূন্যতারই চিরজীবন জয় ঘোষণা করতে হবে, এমন কথাই বা তাকে বলব কি করে।

বেলা আস্তে আস্তে বলিল, সুন্দর কথাটি।

হরেন্দ্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, রাত অনেক হলো, বৃষ্টিও কমেছে—আজ আসি।

অজিত উঠিয়া দাঁড়াইল, কিছুই বলিল না,—উভয়ে নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা শুইতে গেল। ছোটখাটো দুই-একটা কাজ নীলিমার তখনও বাকী ছিল, কিন্তু আজ সে-সকল তেমনই অসম্পূর্ণ পড়িয়া রহিল,—অন্যমনস্কের মত সেও নীরবে প্রস্থান করিল।

ভৃত্যের অপেক্ষায় আশুবাবু চোখের উপর হাত চাপা দিয়া পড়িয়া রহিলেন।

প্রাকাণ্ড অট্টালিকা। বেলা ও নীলিমার শয়নকক্ষ পরস্পরের ঠিক বিপরীত মুখে। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল,—এত কথা ও আলোচানার সমস্তটাই যেন নির্জন নিঃসঙ্গ গৃহের মধ্যে আসিয়া তাহাদের কাছে ঝাপসা হইয়া গেল ; অথচ পরমাশ্চর্য এই যে, কাপড় ছাড়িবার পূর্বে দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এই দুটি নারীর একই সময়ে ঠিক একটি কথাই কেবল মনে পড়িল—একদিন যেদিন নারী ছিলাম।

চব্বিশ

দশ-বারো দিন কমল আগ্রা ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে, অথচ আশুবাবুর তাহাকে অত্যন্ত প্রয়োজন। কম-বেশি সকলেই চিন্তিত, কিন্তু উদ্বেগের কালো মেঘ সবচেয়ে জমাট বাঁধিল হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মাথার উপর। ব্রহ্মচারী হরেন্দ্র-অজিত উৎকণ্ঠার পাল্লা দিয়া এমনিই শুকাইয়া উঠিতে লাগিল যে, তাদের ব্রহ্ম হারাইলেও বোধ করি এতটা হইত না। অবশেষে তাহারই একদিন খুঁজিয়া বাহির করিল। অথচ, ঘটনাটা অতিশয় সামান্য। কমলের চা-বাগানের ঘনিষ্ঠ পরিচিত একজন ফিরিঙ্গী সাহেব বাগানের কাজ ছাড়িয়া রেলের চাকুরি লইয়া সম্প্রতি টুন্ডলায় আসিয়াছে; তাহার স্ত্রী নাই, বছর-দুয়েকের একটি ছোট মেয়ে, অত্যন্ত বিব্রত হইয়া সে কমলকে লইয়া গেছে, তাহারই ঘর-সংসার গুছাইয়া দিতে তাহার এত বিলম্ব। আজ সকালে সে বাসায় ফিরিয়াছে। অপরাহ্ণে মোটর পাঠাইয়া দিয়া আশুবাবু সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন।

বেলার ম্যাজিস্ট্রেটের বাটীতে নিমন্ত্রণ, কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে-ও গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

সেলাই করিতে করিতে নীলিমা হঠাৎ বলিয়া উঠিল, সে লোকটার পরিবার নেই, একটি কচি মেয়ে ছাড়া বাসায় আর কোন স্ত্রীলোক নেই, অথচ তারই ঘরে কমল স্বচ্ছন্দে দশ-বারোদিন কাটিয়ে দিলে।

আশুবাবু অনেক কষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া তাহার প্রতি চাহিলেন, এ কথার তাৎপর্য যে কি ঠাহর করিতে পারিলেন না।

নিলীমা যেন আপন মনেই বলিতে লাগিল, ও যেন ঠিক নদীর মাছ। জলে-ভেজা, না-ভেজার প্রশ্নই ওঠে না ; খাওয়া-পরার চিন্তা নেই, শাসন করার অভিভাবক নেই, চোখ রাঙ্গাবার সমাজ নেই—একেবারে স্বাধীন।

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, অনেকটা তাই বটে।

ওর রূপ-যৌবনের সীমা নেই, বুদ্ধিও যেন তেমনি অফুরন্ত। সেই রাজেন্দ্র ছেলেটির সঙ্গে ক'দিনের বা জানা-শোনা, কিন্তু উৎপাতের ভয়ে কোথাও যখন তার ঠাঁই হলো না, ও তাকে অসঙ্কোচে ঘরে ডেকে নিলে। কারও মতামতের মুখ চেয়ে তাকে নিজের কর্তব্যে বাধা দিলে না। কেউ যা পারলে না, ও তাই অনায়াসে পারলে। শুনে মনে হলো সবাই যেন ওর চেয়ে ছোট হয়ে গেছে,—অথচ মেয়েদের কত কথাই ত ভাবতে হয়!

আশুবাবু বলিলেন, ভাবাই ত উচিত নীলিমা?

বেলা কহিল, ইচ্ছে করলে ও-রকম বেপরোয়া স্বাধীন হয়ে উঠতে ত আমারও পারি!

নীলিমা বলিল, না পারিনে। ইচ্ছে করলে আমিও পারিনে আপনিও না। কারণ জগৎ-সংসার যে-কালি গায়ে ঢেলে দেবে, সে তুলে ফেলবার শক্তি আমাদের নেই।

একটুখানি থামিয়া কহিল, ও ইচ্ছে একদিন আমারও হয়েছিল, তাই অনেকদিন থেকেই এ কথা ভেবে দেখেছি। পুরুষের তৈরী সমাজের অবিচারে জ্বলে জ্বলে মরচি,—কত যে জ্বলেচি সে জানাবার নয়। শুধু জ্বলুনিই সার হয়েছে,—কিন্তু কমলকে দেখবার আগে এর আসল রূপটি কখনো চোখে পড়েনি। মেয়েদের মুক্তি, মেয়েদের স্বাধীনতা ত আজকাল নরনারীর মুখে মুখে, কিন্তু ঐ মুখের বেশী আর এক-পা এগোয় না। কেন জানেন? এখন দেখতে পেয়েচি স্বাধীনতা তত্ত্ব-বিচারে মেলে না, ন্যায়-ধর্ম্মের দোহাই পেড়ে মেলে না, সভায় দাঁড়িয়ে দল বেঁধে পুরুষের সঙ্গে কোঁদল করে মেলে না,—এ কেউ কাউকে দিতে পারে না,—দেনা-পাওনার বস্তুই এ নয়। কমলকে দেখলেই দেখা যায়, এ নিজের পূর্ণতায়, আত্মার আপন বিস্তারে আপনি আসে। বাইরে থেকে ডিমের খোলা ঠুকরে ভিতরের জীবকে মুক্তি দিলে সে মুক্তি পায় না,—মরে। আমাদের সঙ্গে তার তফাত ঐখানে।

বেলাকে কহিল, এই যে সে, দশ-বারোদিন কোথায় চলে গেল, সকলের ভয়ের সীমা রইল না, কিন্তু এ আশঙ্কা কারও স্বপ্নেও উদয় হলো না যে, এমন কিছু কাজ কমল করতে পারে যাতে

তার মর্যাদা হানি হয়। বলুন ত, মানুষের মনে এতখানি বিশ্বাসের জোর আমরা হলে পেতাম কোথায়? এ গৌরব আমাদের দিত কে? পুরুষেও না, মেয়েরাও না।

আশুবাবু সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, বাস্তবিকই সত্যি নীলিমা।

বেলা প্রশ্ন করিল, কিন্তু তার স্বামী থাকলে সে কি করত?

নীলিমা বলিল, তাঁর সেবা করতো, রাঁধতো-বাড়তো, ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতো, ছেলে হলে তাদের মানুষ করতো ; বস্তুতঃ একলা মানুষ, টাকাকড়ি কম, আমার বোধ হয় সময়ের অভাবে তখন আমাদের সঙ্গে হয়ত একবার দেখা করতেও পারতো না।

বেলা কহিল, তবে?

নীলিমা বলিল, তবে কি? বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, কাজকর্ম করব না, শোক-দুঃখ অভাব-অভিযোগ থাকবে না, হরদম ঘুরে বেড়াবে এই কি মেয়েদের স্বাধীনতার মানদণ্ড নাকি? স্বয়ং বিধাতার ত কাজের অবধি নেই, কিন্তু কেউ কি তাঁকে পরাধীন ভাবে নাকি? এই সংসারে আমার নিজের খাটুনিই কি সামান্য?

আশুবাবু গভীর বিস্ময়ে মুগ্ধচক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। বস্তুতঃ এই ধরনের কোন কথা এতদিন তাহার মুখে তিনি শোনেন নাই।

নীলিমা বলিতে লাগিল, কমল বসে থাকতে ত জানে না, তখন স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে সে কর্মের মধ্যে একেবারে তলিয়ে যেতো—আনন্দের ধারার মত সংসার তার ওপর দিয়ে বয়ে যেতে—ও টেরও পেতো না। কিন্তু যেদিন বুঝতো স্বামীর কাজ বোঝা হয়ে তার ঘাড়ে চেপেচে, আমি দিব্যি করে বলতে পারি, কেউ একটা দিনও সে-সংসার তাকে ধরে রাখতে পারত না।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন,—তাই বটে তাই মনে হয়।

অদূরে পরিচিত মোটরের হর্নের আওয়াজ শোনা গেল। বেলা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া কহিল, হাঁ, আমাদেরই গাড়ি।

অনতিকাল পরে ভৃত্য আলো দিতে আসিয়া কমলের আগমন-সংবাদ দিল।

কয়দিন যাবৎ আশুবাবু এই প্রতীক্ষা করিয়াই ছিলেন, অথচ খবর পাওয়া মাত্র তাঁহার মুখ অতিশয় ম্লান ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এইমাত্র আরাম-কেদারায় সোজা হইয়া বসিয়াছিলেন, পুনরায় হেলান দিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঘরে ঢুকিয়া কমল সকলকে নমস্কার করিল, এবং আশুবাবুর পাশের চৌকিতে গিয়া বসিয়া পড়িয়া বলিল, শুনলাম আমার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়েছেন। কে জানতো আমাকে আপনারা এত ভালবাসেন,—তা হলে যাবার আগে নিশ্চয়ই একটা খবর দিয়ে যেতাম। এই বলিয়া সে তাঁহার সুপরিপুষ্ট শিথিল হাতখানি সস্নেহে নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।

আশুবাবুর মুখ অন্যদিকে ছিল, ঠিক তেমনই রহিল, একটি কথারও উত্তর দিতে পারিলেন না।

কমল প্রথমে মনে করিল তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার পূর্বেই সে চলিয়া গিয়াছিল এবং এতদিন কোন খোঁজ লয় নাই—তাই অভিমান। তাঁহার মোটা আঙুলগুলির মধ্যে নিজের চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি কহিল, আমি বলচি আমার দোষ হয়েছে, আমি ঘাট মানচি। কিন্তু ইহারও উত্তরে যখন তিনি কিছুই বলিলেন না, তখন সে সত্যই ভারী আশ্চর্য হইল এবং ভয় পাইল।

বেলা যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-বচনে কহিল, আপনি আসবেন জানলে মালিনীর নিমন্ত্রণটা আজ কিছুতেই নিতাম না, কিন্তু এখন না গেলে তাঁরা ভারী হতাশ হবেন।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, মালিনী কে?

নীলিমা জবাব দিল, বলিল, এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেবের স্ত্রী,—নামটা বোধ হয় তোমার স্মরণ নেই। বেলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, সত্যিই আপনার যাওয়া উচিত। না গেলে তাঁদের গানের আসরটা একেবারে মাটি হয়ে যাবে।

না না, মাটি হবে না,—তবে ভারী ক্ষুণ্ণ হবেন তাঁরা। শুনেচি আরও দু-চারিজনকে আহ্বান করেছেন। আচ্ছা, আজ তাহলে আসি, আর একদিন আলাপ হবে। নমস্কার। এই বলিয়া সে একটু ব্যগ্রপদেই বাহির হইয়া গেল।

নীলিমা কহিল, ভালই হয়েছে যে আজ ওঁর বাইরে নিমন্ত্রণ ছিল, নইলে সব কথা খুলে বলতে বাধত। হাঁ কমল, তোমাকে আমি আপনি বলতাম, না তুমি বলে ডাকতাম?

কমল কহিল, তুমি বলে। কিন্তু এমন নির্বাসনে যাইনি যে এর মধ্যেই তা ভুলে গেলেন।

না ভুলিনি, শুধু একটা খটকা বেধেছিল। বাধবারই কথা। সে যাক। সাত-আটদিন থেকে তোমাকে আমরা খুঁজছিলাম। আমার কিন্তু ঠিক খোঁজা নয়, পাবার জন্য যেন মনে মনে তপস্যা করছিলাম।

কিন্তু তপস্যার শুষ্ক গাম্ভীর্য তাহার মুখে নাই, তাই, অকৃত্রিম স্নেহের মিষ্টি একটুখানি পরিহাস কল্পনা করিয়া কমল হাসিয়া কহিল, এ সৌভাগ্যের হেতু? আমি ত সকলের পরিত্যক্ত দিদি, ভদ্রসামাজের কেউ আমাকে চায় না।

এই সম্ভাষণটি নূতন। নীলিমার দুই চোখ হঠাৎ ছলছল করিয়া আসিল, কিন্তু সে চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু থাকিতে পারিলেন না, মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, ভদ্রসমাজের প্রয়োজন হয়ত এ অনুযোগের জবাব তারাই দেবে, কিন্তু আমি জানি জীবনে কেউ যদি তোমাকে সত্যি করে চেয়ে থাকে ত এই নীলিমা। এতখানি ভালবাসা হয়ত তুমি কারও কখনো পাওনি কমল।

কমল কহিল, সে আমি জানি।

নীলিমা চঞ্চলপদে উঠিয়া দাঁড়াইল। কোথাও যাইবার জন্য নহে, এই ধরনের আলোচনায় ব্যক্তিগত ইঙ্গিতে চিরদিনই সে যেন অস্থির হইয়া পড়িত। বহুক্ষেত্রে প্রিয়জনে তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, তথাপি এমনিই ছিল তাহার স্বভাব। কথাটা তাড়াতাড়ি চাপা দিয়া কহিল, কমল, তোমাকে আমাদের দুটো খবর দেবার আছে।

কমল তাহার মনের ভাব বুঝিল, হাসিয়া কহিল, বেশ ত, দেবার থাকে দিন।

নীলিমা আশুবাবুকে দেখাইয়া বলিল, উনি লজ্জায় তোমার কাছে মুখ লুকিয়ে আছেন, তাই, আমিই ভার নিয়েছি বলবার। মনোরমার সঙ্গে শিবনাথের বিবাহ স্থির হয়ে গেছে,—পিতা ও ভাবী শ্বশুরের অনুজ্ঞা ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করে দুজনেই পত্র দিয়েছেন।

শুনিয়া কমলের মুখ পাংশু হইয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, তাতে ওঁর লজ্জা কিসের?

নীলিমা কহিল, সে ওঁর মেয়ে বলে। এবং চিঠি পাবার পরে এই ক'টা দিন কেবল একটি কথাই বার বার বলেছেন, আগ্রায় এত লোক মারা গেল, ভগবান তাঁকে দয়া করলেন না কেন? জ্ঞানতঃ, কোনদিন কোন অন্যায় করেন নি, তাই একান্ত বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর ওঁর প্রতি সদয়। সেই অভিমানের ব্যথাই যেন ওঁর সকল বেদনার বড় হয়ে উঠেছে। আমি ছাড়া কাউকে কিছু বলতে পারেন নি এবং রাত্রিদিন মনে মনে কেবল তোমাকেই ডেকেছেন। বোধ হয় ধারণা এই যে, তুমিই শুধু এর থেকে পরিত্রাণের পথ বলে দিতে পার।

কমল উঁকি দিয়া দেখিল, আশুবাবুর মুদ্রিত দুই চক্ষুর কোণ বাহিয়া ফোঁটা-কয়েক জল গড়াইয়া পড়িয়াছে, হাত বাড়াইয়া সেই অশ্রু নিঃশব্দে মুছাইয়া দিয়া সে নিজেও স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বহুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, একটা খবর ত এই, আর একটা?

নীলিমা রহস্যচ্ছলে কথাটা বলিতে চাহিলেও ঠিক পারিয়া উঠিল না, কহিল, ব্যাপারটা অভাবিত, নইলে গুরুতর কিছু নয়। আমাদের মুখুয্যে-মশায়ের স্বাস্থ্যের জন্য সকলেরই দুশ্চিন্তা

ছিল, তিনি আরোগ্যলাভ করেছেন, এবং পরে দাদা এবং বৌদি তাঁর একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর-জবরদস্তি একটি বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন! লজ্জার সঙ্গে খবরটি তিনি আশুবাবুকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন,—এইমাত্র। এই বলিয়া এবার সে নিজেই হাসিতে লাগিল।

এ হাসির মধ্যে সুখও নাই, কৌতুকও নাই। কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, এ দুটোই বিয়ের ব্যাপার। একটা হয়ে গেছে, আর একটা হবার জন্যে স্থির হয়ে আছে। কিন্তু আমাকে খুঁজছিলেন কেন? এর কোনটাই ত আমি ঠেকাতে পারিনে।

নীলিমা কহিল, অথচ ঠেকাবার কল্পনা নিয়েই বোধ করি উনি তোমাকে খুঁজছিলেন। কিন্তু আমি ত তোমাকে খুঁজিনি ভাই, কায়মনে ভগবানকে ডাকছিলাম যেন দেখা পেয়ে তোমার প্রসন্ন-দৃষ্টি লাভ করতে পারি। বাঙ্গলাদেশে মেয়ে হয়ে জন্মে অদৃষ্টকে দোষ দিতে গেলে খেই খুঁজে পাবো না; কিন্তু বুদ্ধির দোষে বাপের বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি দুটোই ত খুইয়েছি,—এর ওপর উপরি-লোকসান যা ভাগ্যে ঘটেছে সে বিবরণ দিতে পারবো না,—এখন ভগ্নীপতির আশ্রয়টাও ঘুচল। আশুবাবুকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া বলিল, দয়া-দাক্ষিণ্যের সীমা নেই,—যে-কটা দিন এখানে আছেন মাথা গোঁজবার স্থান পাবো, কিন্তু তার পরে অন্ধকার ছাড়া চোখের সামনে আর কিছুই দেখতে পাইনে। ভেবেচি, এবার তোমাকে ঠাঁই দিতে বলব, না পাই মরব। পুরুষের কৃপা ভিক্ষে চেয়ে স্রোতের আবর্জনার মত আর ঘাটে ঘাটে ঠেকতে ঠেকতে আয়ুর শেষ দিনটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না। বলিতে বলিতে তাহার গলার স্বরটা ভারী হইয়া আসিল, কিন্তু চোখের জল জোর করিয়া দমন করিয়া রাখিল।

কমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল।

হাসলে যে?

হাসাটা জবাব দেওয়ার চেয়ে সহজ বলে।

নীলিমা বলিল, সে জানি। কিন্তু আজকাল মাঝে মাঝে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যাও, সেই ত আমার ভয়।

কমল কহিল, হলাম বা অদৃশ্য। কিন্তু দরকার হলে আমাকে খুঁজতে যেতে হবে না দিদি, আমিই পৃথিবীময় আপনাকে খুঁজে বেড়াতে বার হবো। এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হোন।

আশুবাবু কহিলেন, এবার এমনি করে আমাকেও অভয় দাও কমল, আমিও যেন ওঁর মতই নিঃসংশয় হতে পারি।

আদেশ করুন আমি কি করতে পারি।

তোমাকে কিছুই করতে হবে না কমল, যা করবার আমি নিজেই করব। আমাকে শুধু এইটুকু উপদেশ দাও, পিতার কর্তব্যে অপরাধ না করি। এ বিবাহে কেবল যে মত দিতে পারিনে তাই নয়, ঘটতে দিতেও পারিনে।

কমল বলিল, মত আপনার, না দিতেও পারেন। কিন্তু বিবাহ ঘটতে দেবেন না কি করে? মেয়ে ত আপনার বড় হয়েছে।

আশুবাবু উত্তেজনা চাপিতে পারিলেন না, কারণ, অস্বীকার করার জো নাই বলিয়া এই কথাটাই মনের মধ্যে তাঁহার অহর্নিশ পাক খাইয়াছে। বলিলেন, তা জানি, কিন্তু মেয়েরও জানা চাই যে বাপের চেয়ে বড় হয়ে ওঠা যায় না। শুধু মতামতটাই আমার নিজের নয় কমল, সম্পত্তিটাও নিজের। আশুবদ্যির দুর্বলতার পরিচয়টাই লোকের অভ্যাস হয়ে গেছে, কিন্তু তার আরও একটা দিক আছে,—সেটা লোকে ভুলেছে।

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, আপনার সে দিকটা যেন লোকে ভুলেই থাকে আশুবাবু। কিন্তু তাও যদি না হয়, সে পরিচয়টা কি সর্বাগ্রে দিতে হবে নিজের মেয়ের কাছেই?

হাঁ, অবাধ্য মেয়ের কাছে। এই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিলেন, মা-মরা আমার ঐ একমাত্র সন্তান, কি করে যে মানুষ করেছি সে শুধু তিনিই জানেন যিনি পিতৃহৃদয় সৃষ্টি

করেছেন। এর ব্যথা যে কি তা মুখে ব্যক্ত করতে গেলে তার বিকৃতি কেবল আমাকে নয়, সকল পিতার পিতা যিনি, তাঁকে পর্যন্ত উপহাস করবে। তা ছাড়া তুমি বুঝবেই বা কি করে? কিন্তু পিতার স্নেহই ত শুধু নয়, , কমল, তার কর্তব্যও ত আছে? শিবনাথকে আমি চিনতে পেরেছি। তার সর্বনেশে গ্রাস থেকে মেয়েকে রক্ষে করতে পারি এ-ছাড়া আর কোন পথই আমার চোখে পড়ে না। কাল তাদের চিঠি লিখে জানাবো, এর পরে মণি যেন না আমার কাছে একটি কপর্দকও আশা করে।

কিন্তু এ চিঠি যদি তারা বিশ্বাস করতে না পারে? যদি ভাবে এ রাগ বাবার বেশী দিন থাকবে না,—সেদিন নিজের অবিচার তিনি নিজেই সংশোধন করবেন, তা হলে?

তা হলে তারা তার ফল ভোগ করবে। লেখার দায়িত্ব আমার, কিন্তু বিশ্বাস করার দায়িত্ব তাদের।

এই কি আপনি সত্যিই স্থির করেচেন?

হ্যাঁ।

কমল নীরবে বসিয়া রহিল। উদ্‌গ্রীব-প্রতীক্ষায় আশুবাবু নিজেও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া মনে মনে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, চুপ করে রইলে যে কমল, জবাব দিলে না?

কৈ, প্রশ্ন ত কিছুই করেন নি? সংসারে একের সঙ্গে অপরের মতের মিল না হলে যে শক্তিমান, দুর্বলকে সে দণ্ড দেয়। এ ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসচে। এতে বলবার কি আছে?

আশুবাবুর ক্ষোভের সীমা রহলি না, বলিলেন, এ তোমার কি কথা কমল? সন্তানের সঙ্গে পিতার ত শক্তি-পরিক্ষার সম্বন্ধ নয় যে দুর্বল বলেই তাকে শাস্তি দিতে চাইচি। কঠিন হওয়া যে কত কঠিন, সে কেবল পিতাই জানে, তবু যে এতবড় কঠোর সঙ্কল্প করেছি সে শুধু তাকে ভুল থেকে বাঁচাবো বলেই ত? সত্যিই কি এ তুমি বুঝতে পারোনি?

কমল মাথা নাড়িয়া বলিল, পেরেছি। কিন্তু কথা আপনার না শুনে যদি সে ভুলই করে, তার দুঃখ সে পাবে। কিন্তু দুঃখ নিবারণ করতে পারলেন না বলে কি রাগ করে তার দুঃখের বোঝা সহস্র-গুণে বাড়িয়ে দেবেন?

একটুখানি থামিয়া বলিল, আপনি তার সকল আত্মীয়ের পরমাত্মীয়। যে লোকটাকে অত্যন্ত মন্দ বলে জেনেছেন তারই হাতে নিজের মেয়েকে চিরদিনের মত নিঃস্ব নিরুপায় করে বিসর্জন দেবেন,—ফেরবার পথ তার কোনদিন কোন দিক থেকেই খোলা রাখবেন না?

আশুবাবু বিহ্বল-চক্ষে চাহিয়া রহিলেন, একটা কথাও তাঁর মুখে আসিল না—শুধু দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বড় বড় ফোঁটায় জল গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এমনিভাবে কাটিবার পরে তিনি জামার হাতায় চোখ মুছিয়া রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন,—ফেরবার পথ এখনি আছে কমল, পরে নেই। স্বামী ত্যাগ করে যে-ফেরা, জগদীশ্বর করুন সে যেন না আমাকে চোখে দেখতে হয়।

কমল কহিল, এ অন্যায়। বরঞ্চ, আমি কামনা করি, ভুল যদি কখনো তার নিজের চোখে ধরা পড়ে, সেদিন যেন না সংশোধনের পথ অবরুদ্ধ থাকে। এমনি করেই মানুষে আপনাকে শোধরাতে শোধরাতে আজ মানুষ হতে পেরেছে। ভুলকে ত ভয় নেই আশুবাবু, যতক্ষণ তার অন্যদিকে পথ খোলা থাকে। সেই পথটা চোখের সম্মুখে বন্ধ ঠেকচে বলেই আজ আপনার আশঙ্কার সীমা নেই।

মনোরমা কন্যা না হইয়া আর কেহ হইলে এই সোজা কথাটা তিনি সহজেই বুঝিতেন, কিন্তু একমাত্র সন্তানের নিদারুণ ভবিষ্যতের নিঃসন্দিগ্ধ দুর্গতি কমলের সকল আবেদন বিফল করিয়া দিল, শুধু অসংলগ্ন মিনতির স্বরে কহিলেন, না কমল, এ বিবাহ বন্ধ করা ছাড়া আর কোন রাস্তাই আমার চোখে পড়ে না। কোন উপায়ই কি তুমি বলে দিতে পারো না?

আমি? ইঙ্গিতটা কমল এতক্ষণে বুঝিল। এবং, ইহা স্পষ্ট করিতে গিয়া তাহার স্নিগ্ধকণ্ঠ

মুহূর্তের জন্য গম্ভীর হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ওই মুহূর্তের জন্যই। নীলিমার প্রতি চোখ পড়িতেই আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, না, এ ব্যাপারে কোন সাহায্যই আপনাকে আমি করতে পারবো না। উত্তরাধিকারে বঞ্চিত করার ভয় দেখালে সে ভয় পাবে কি না জানিনে, যদি পায় তখন এই কথাই বলবো যে খাইয়ে পরিয়ে, ইস্কুল-কলেজে বই মুখস্থ করিয়ে মেয়েকে বড়ই করেছেন, কিন্তু মানুষ করতে পারেন নি। সেই অভাব পূর্ণ করার সুযোগটুকু তার যদি আজ দৈবাৎ এসে পড়ে থাকে, আমি হন্তারক হতে যাব কিসের জন্যে?

কথাটা আশুবাবুর ভাল লাগিল না, কহিলেন, তুমি কি তা হলে বলতে চাও বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য নয়?

কমল কহিল, অন্ততঃ ভয় দেখিয়ে নয়—এইটুকুই বলতে পারি। আমি আপনার মেয়ে হলে বাধা হয়ত পেতাম, কিন্তু এ জীবনে আর কখনো আপনাকে শ্রদ্ধা করতে পারতাম না। আমার বাবা আমাকে এইভাবেই গড়ে গিয়েছিলাম।

আশুবাবু বলিলেন, অসম্ভব নয় কমল, তোমার কল্যাণের পথ তিনি এদিকেই দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু আমি পাইনে। তবু, আমিও পিতা। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি শিবনাথকে কেউ যথার্থ ভালবাসা দিতে পারে না,—এ তার মোহ। এ মিথ্যে। এই ক্ষণস্থায়ী নেশার ঘোর যেদিন কেটে যাবে সেদিন মণির দুঃখের অন্ত থাকবে না। কিন্তু তখন তাঁকে বাঁচাবে কিসে?

কমল কহিল, নেশার মধ্যেই বরঞ্চ ভাবনা ছিল, কিন্তু সে ঘোর কেটে গিয়ে যখন সে সুস্থ হয়ে উঠবে তখন তার আর ভয় নেই। তার স্বাস্থ্যই তখন তাকে রক্ষে করবে।

আশুবাবু অস্বীকার করিয়া বলিলেন, এ-সব কথার মারপ্যাঁচ কমল, যুক্তি নয়। সত্য এর থেকে অনেক দূরে। ভুলের দণ্ড তাকে বড় করেই পেতে হবে,—ওকালতির জোরে তার থেকে অব্যাহতি মিলবে না।

কমল কহিল, অব্যাহতির ইঙ্গিত আমি করিনি আশুবাবু। ভুলের দণ্ড পেতে হয়, এ আমি জানি। তার দুঃখ আছে, কিন্তু লজ্জা নেই। মণি কাউকে ঠকাতে যায়নি, ভুল ভেঙ্গে সে যদি ফিরে আসে, তাকে মাথা হেঁট করে আসতে হবে না—এই ভরসাই আপনাকে আমি দিতে চেয়েছিলাম।

তবু ত ভরসা পাইনে কমল। জানি, ভুল তার ভাঙ্গবেই, কিন্তু তার পরেও যে তাকে দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে, তখন সে থাকবে কি নিয়ে? বাঁচবে কোন্ অবলম্বনে?

অমন কথা আপনি বলবেন না। মানুষের দুঃখটাই যদি দুঃখ পাওয়ার শেষ কথা হ'তো, তার মূল্য ছিল না। সে একদিকের ক্ষতি আর একদিকের মস্ত সঞ্চয় দিয়ে পূর্ণ করে তোলে, নইলে, আমিই বা আজ বেঁচে থাকতাম কি করে? বরঞ্চ, আপনি আশীর্বাদ করুন, ভুল যদি ভাঙ্গে তখন যেন সে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারে, তখন যেন কোন লোভ, কোন ভয় না তাকে রাহুগ্রস্ত করে রাখে।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। জবাব দিতে বাধিল, কিন্তু স্বীকার করিতেও ঢের বেশী বাধিল। বহুক্ষণ পরে বলিলেন, পিতার দৃষ্টি দিয়ে আমি মণির ভবিষ্যৎ-জীবন অন্ধকার দেখতে পাই। তুমি কি তবুও সত্যিই বল যে আমার বাধা দেওয়া উচিত নয়, নীরবে মেনে নেওয়াই কর্তব্য?

আমি মা হলে মেনেই নিতাম। তার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় হয়ত আপনারই মত কষ্ট পেতাম, তবু এই উপায়ে বাধা দেবার আয়োজন করতাম না। মনে মনে বলতাম, এ জীবনে যে রহস্যের সামনে এসে আজ সে দাঁড়িয়েছে, সে আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার চেয়েও বৃহৎ। একে স্বীকার করতেই হবে।

আশুবাবু আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, তবু বুঝতে পারলাম না কমল। শিবনাথের চরিত্র, তার সকল দুষ্কৃতির বিবরণ মণি জানে। একদিন এ বাড়িতে আসতে দিতেও তার আপত্তি ছিল, কিন্তু আজ যে সম্মোহনে তার হিতাহিত-বোধ, তার সমস্ত নৈতিক-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে,

সে ত যথার্থ ভালবাসা নয়, সে যাদু, সে মোহ ; এ মিথ্যে যেমন করে হোক নিবারণ করাই পিতার কর্তব্য।

এইবার কমল একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল এবং এতক্ষণ পরে উভয়ের চিন্তার প্রকৃতিগত প্রভেদ তাহার চোখে পড়িল। ইহাদের জাতিই আলাদা এবং প্রমাণের বস্তু নয় বলিয়াই এতক্ষণের এত আলোচনা একেবারে সম্পূর্ণ বিফল হইল। যেদিকে তাঁহার দৃষ্টি আবদ্ধ সেদিকে সহস্র বর্ষ চোখ মেলিয়া থাকিলেও এ সত্যের সাক্ষাৎ মিলিবে না, কমল তাহা বুঝিল। সেই বুদ্ধির যাচাই, সেই হিতাহিতবোধ, সেই ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের অতি-সতর্ক হিসাব, সেই মজবুত বনিয়াদ গড়ার ইঞ্জিনীয়ার ডাকা—অঙ্ক কষিয়া ইহারা ভালবাসার ফল বাহির করিতে চায়। নিজের জীবনে আশুবাবু পত্নীকে একান্তভাবে ভালবাসিয়াছিলেন। বহুদিন তিনি লোকান্তরিক, তথাপি আজিও হয়ত তাহার মূল অন্তরে শিথিল হয় নাই,—সংসারে ইহার তুলনা বিরল, এ সবই সত্য, তবুও ইহারা ভিন্ন-জাতীয়।

ইহার ভাল-মন্দর প্রশ্ন তুলিয়া তর্ক করার মত নিষ্ফলতা আর নাই। দাম্পত্য-জীবনে একটা দিনের জন্যও পত্নীর সহিত আশুবাবুর মতভেদ ঘটে নাই, অন্তরে মালিন্য স্পর্শ করে নাই। নির্বিঘ্ন শান্তি ও অবিচ্ছিন্ন আরামে যাহাদের দীর্ঘ বিবাহিত-জীবন কাটিয়াছে তাহার গৌরব ও মাহাত্ম্যকে খর্ব করিবে কে? সংসার মুগ্ধচিত্তে ইহার স্তবগান করিয়াছে, এমনি দুর্লভ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া কবি অমর হইয়াছে, স্বকীয় জীবনে ইহাকেই লাভ করিবার ব্যাকুলিত বাসনায় মানুষের লোভের অন্ত নাই। যাহার নিঃসন্দিগ্ধ মহিমা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিষ্ঠায় চিরদিন অবিচলিত, তাহাকে তুচ্ছ করিবে কমল কোন্ স্পর্ধায়? কিন্তু মণি? যে দুঃশীল দুর্ভাগার হাতে আপনাকে বিসর্জন দিতে সে উদ্যত, তাহার সব-কিছু জানিয়াও সমস্ত জানার বাহিরে পা বাড়াইতে আজ তাহার ভয় নাই। দুঃখময় পরিণাম-চিন্তায় পিতা শঙ্কিত, বন্ধুগণ বিষণ্ণ, কেবল সে-ই শুধু একাকী শঙ্কাহীন। আশুবাবু জানেন এ-বিবাহে সম্মান নাই, শুভ নাই, বঞ্চনার পরে ইহার ভিত্তি, এই স্বল্পকালব্যাপী মোহ যেদিন টুটিবে তখন আজীবন লজ্জা ও দুঃখ রাখিবার ঠাঁই রহিবে না,—হয়ত এ সবই সত্য, কিন্তু সব গিয়াও এই প্রবঞ্চিত মেয়েটির যে-বস্তু বাকী থাকিবে সে যে পিতার শান্তি-সুখময় দীর্ঘস্থায়ী দাম্পত্য-জীবনের চেয়ে বড়, এ কথা আশুবাবুকে সে কি দিয়া বুঝাইবে? পরিণামটাই যাহার কাছে মূল্য-নিরূপণের একমাত্র মানদণ্ড, তাহার সঙ্গে তর্ক চলিবে কেন? কমলের একবার ইচ্ছা হইল বলে, আশুবাবু, মোহমাত্রই মিথ্যা নয়, কন্যার চিত্তাকাশে মুহূর্ত উদ্ভাসিত তড়িৎ-রেখাও হয়ত পিতার অনির্বাপিত দীপ-শিখাকেও দীপ্তির পরিমাপে অতিক্রম করিতে পারে,—কিন্তু কিছুই না বলিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

পিতার কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করিয়া আশুবাবু উত্তরের অপেক্ষায় অধীর হইয়া ছিলেন, কিন্তু কমল নিরুত্তর নতমুখে তেমনি বসিয়া আছে ; বেশ বুঝা গেল, এ লইয়া সে আর বাদানুবাদ করিতে চাহে না। কথা নাই বলিয়া নয়, প্রয়োজন নাই বলিয়া। কিন্তু এমন করিয়া একজন মৌনাবলম্বন করিলে ত অপরের মন শান্তি মানে না। বস্তুতঃ, এই প্রৌঢ় মানুষটির গভীর অন্তরে সত্যের প্রতি একটি সত্যকার নিষ্ঠা আছে, একমাত্র সন্তানের দুর্দিনের আশঙ্কায় লজ্জিত, উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত তাঁহার, মুখে যাই কেন না বলুক, জোর আছে বলিয়াই উদ্ধত স্পর্ধায় জোর খাটানোর প্রতি তাঁহার গভীর বিতৃষ্ণা। কমলকে তিনি যত দেখিয়াছেন ততই তাঁহার বিস্ময় ও শ্রদ্ধা বাড়িয়াছে। লোকচক্ষে সে হেয়, নিন্দিত ; ভদ্রসমাজে পরিত্যক্ত, সভায় ইহার নিমন্ত্রণ জুটে না, অথচ, এই মেয়েটির নিঃশব্দ অবজ্ঞাকেই তাঁহার সবচেয়ে ভয়, ইহার কাছেই তাঁহার সঙ্কোচ ঘুচে না।

বলিলেন, কমল, তোমার বাবা য়ুরোপিয়ান, তবু তুমি কখনো সে দেশে যাওনি। কিন্তু তাদের মধ্যে আমার বহুদিন কেটেছে, তাদের অনেক-কিছু চোখে দেখেচি। অনেক ভালবাসার বিবাহ-উৎসবে যখন ডাক পড়েচে, আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, আবার সে বিবাহ যখন অনাদরে উপেক্ষায় অনাচারে অত্যাচারে ভেঙ্গেচে তখনও চোখ মুছেচি। তুমি গেলেও ঠিক এমনি দেখতে

পেতে।

কমল মুখ তুলিয়া বলিল, না গিয়েও দেখতে পাই আশুবাবু। ভাঙ্গার নজির সে দেশে প্রত্যহ পুঞ্জিত হয়ে উঠচে, উঠবারই কথা,—এও যেমন সত্যি, ওর থেকে তার স্বরূপ বুঝতে যাওয়াও তেমনি ভুল। ওটা বিচারের পদ্ধতিই নয় আশুবাবু।

আশুবাবু নিজের ভ্রম বুঝিয়া কিছু অপ্রতিভ হইলেন, এমন করিয়া ইহার সহিত তর্ক চলে না ; বলিলেন, সে যাক কিন্তু আমাদের এই দেশটার পানে একবার ভাল করে চেয়ে দেখ দিকি যে প্রথা আবহমানকাল ধরে চলে আসচে তার সৃষ্টিকর্তাদের দূরদর্শিতা! এখানে দায়িত্ব পাত্র-পাত্রীদের পরে নেই, আছে বাপ-মা গুরুজনদের পরে। তাই বিচার-বুদ্ধি এখানে আকুল-অংযমে ঘুলিয়ে ওঠে না, একটা শান্ত অবিচলিত মঙ্গল তাদের চির-জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়।

কমল কহিল, কিন্তু মণি ত মঙ্গলের হিসেব করিতে বসেনি, আশুবাবু, সে চেয়েছে ভালবাসা। একটার হিসেব গুরুজনের সুযুক্তি দিয়ে মেলে, কিন্তু অন্যটার হিসেব হৃদয়ের দেবতা ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু তর্ক করে আপনাকে আমি মিথ্যে উত্ত্যক্ত করছি; যার ঘরে পশ্চিমের জানালা ছাড়া আর সকল দিকই বন্ধ, সে সূর্যের প্রত্যুষের আবির্ভাব দেখতে পায় না, দেখতে পায় শুধু তার প্রদোষের অবসান। কিন্তু সেই চেহারা আর রঙের সাদৃশ্য মিলিয়ে তর্ক করতে থাকলে শুধু কথাই বাড়বে, মীমাংসায় পৌঁছুবে না। আমার কিন্তু রাত হয়ে যাচ্চে, আজ আসি।

নীলিমা বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণের এত কথার মধ্যে একটি কথাও যোগ করে নাই। এখন কহিল, আমিও সব কথা তোমার স্পষ্ট বুঝতে পারিনি কমল, কিন্তু এটুকু অনুভব করচি যে, ঘরের অন্যান্য জানালাগুলোও খুলে দেওয়া চাই। এ ত চোখের দোষ ন, দোষ বন্ধ বাতায়নের। নইলে যে-দিকটা খোলা আছে সেদিকে দাঁড়িয়ে আমরণ চেয়ে থাকলেও এ-ছাড়া কোন-কিছুই কোনদিন চোখে পড়বে না।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইতে আশুবাবু ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, যেয়ো না কমল, আর একটুখানি বসো। মুখে অন্ন নেই, চোখে ঘুম নেই,—অবিশ্রাম বুকের ভেতরটায় যে কি করচে সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারবো না। তবু আর একবার চেষ্টা করে দেখি তোমার কথাগুলো যদি সত্যিই বুঝতে পারি। তুমি কি যথার্থই বলচ আমি চুপ করে থাকি, আর এই কুশ্রী ব্যাপারটা হয়ে যাক?

কমল বলিল, মণি যদি তাঁকে ভালবেসে থাকে আমি তা কুশ্রী বলতে পারিনে।

কিন্তু এইটেই যে তোমাকে একশো বার বোঝাতে চাচ্চি কমল, এ মোহ, এ ভালবাসা নয়, এ ভুল তার ভাঙ্গবেই।

কমল কহিল, শুধু ভুলই যে ভাঙ্গে তা নয়, আশুবাবু, সত্যিকার ভালবাসাও সংসারে এমনি ভেঙ্গে পড়ে। তাই, অধিকাংশ ভালবাসার বিবাহই হয়ে যায় ক্ষণস্থায়ী। এই জন্যেই ও-দেশের এত দুর্নাম, এত বিবাহ ছিন্ন করার মামলা।

শুনিয়া আশুবাবু সহসা যেন একটা আলো দেখিতে পাইলেন, উচ্ছ্বসিত আগ্রহে কহিয়া উঠিলেন, তাই বল কমল, তাই বল। এ যে আমি স্বচক্ষে অনেক দেখে এসেচি। নীলিমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমাদের এ দেশের বিবাহ-প্রথা? তাকে তুমি কি বলো? সে যে সমস্ত জীবনে ভাঙ্গে না কমল?

কমল কহিল, ভাঙ্গবার কথাও নয় আশুবাবু। সে ত অনভিজ্ঞ যৌবনের ক্ষ্যাপামি নয়, বহুদর্শী গুরুজনের হিসেব-করা কারবার। স্বপ্নের মূলধন নয়,—চোখ চেয়ে, পাকা-লোকের যাচাই-বাছাই করা খাঁটি জিনিস। আঁকের মধ্যে মারাত্মক গলদ না থাকলে তাতে সহজে ফাটল ধরে না। এদেশ-ওদেশ সব দেশেই সে ভারী মজবুত, সারাজীবন বজ্রের মত টিকে থাকে।

আশুবাবু নিশ্বাস ফেলিয়া স্থির হইয়া রহিলেন, মুখে তাঁর উত্তর যোগাইল না।

নীলিমা নিঃশব্দে চাহিয়াই ছিল, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিল, কমল, তোমার কথাই যদি সত্যি

হয়, সত্যিকার ভালবাসাও যদি ভুলের মতই সহজে ভেঙ্গে পড়ে, মানুষে তবে দাঁড়াবে কিসে? তার আশা করবার বাকী থাকবে কি?

কমল বলিল, যে স্বর্গবাসের মিয়াদ ফুরুলো, থাকবে তারই একান্ত মধুর স্মৃতি, আর তারই পাশে ব্যথার সমুদ্র। আশুবাবুর শান্তি ও সুখের সীমা ছিল না, কিন্তু তার বেশী ওঁর পুঁজি নেই। ভাগ্য যাঁকে ঐটুকুমাত্র দিয়েই বিদায় করেছে আমরা তাঁকে ক্ষমা করা ছাড়া আর কি করতে পারি দিদি?

একটুখানি থামিয়া বলিল, লোকে বাইরে থেকে হঠাৎ ভাবে—বুঝি সব গেলো। বন্ধুজনের ভয়ের অন্ত থাকে না, দু'হাত দিয়ে পথ আগলাতে চায়, নিশ্চয় জানে তার হিসেবের বাইরে বুঝি সবই শূন্য। শূন্য নয় দিদি। সব গিয়েও যা হাতে থাকে মাণিক্যের মত তা হাতের মুঠের মধ্যেই ধরে। বস্তু-বাহুল্যে পথ-জুড়ে তা দিয়ে শোভাযাত্রা করা যায় না বলেই দর্শকের দল হতাশ হয়ে ধিক্কার দিয়ে ঘরে ফেরে,—বলে ঐ ত সর্বনাশ।

নীলিমা বলিল, বলার হেতু আছে কমল। মণি-মাণিক্য সকলের জন্যে নয়, সাধারণের জন্যেও নয়। আপাদমস্তক সোনা-রূপোর গয়না না পেলে যাদের মন ওঠে না, তারা তোমার ঐ একফোঁটা হীরে-মানিকের কদর বুঝবে না। যাদের অনেক চাই, তারা গেরোর ওপর অনেক গেরো লাগিয়েই তবে নিশ্চিন্ত হতে পারে। অনেক ভার, অনেক আয়োজন, অনেক জায়াগা দিয়েই তবে জিনিসের দামের আন্দাজ তারা পায়। পশ্চিমের দরজা খুলে সূর্যোদয় দেখানোর চেষ্টা বৃথা হবে কমল, এ আলোচনা বন্ধ থাক।

আশুবাবুর মুখ দিয়া আবার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, আস্তে আস্তে বলিলেন, বৃথা হবে কেন নীলিমা, বৃথা নয়। বেশ, চুপ করেই না হয় থাকবো।

নীলিমা কহিল, না, সে আপনি করবেন না। সত্যি কি শুধু কমলের চিন্তাতেই আছে, আর পিতার শুভবুদ্ধিতে নেই? এমন হতেই পারে না। ওর পক্ষে যা সত্যি, মণির পক্ষে তা সত্যি না-ও হতে পারে। দুশ্চরিত্র স্বামীকে পরিত্যাগ করার মধ্যে যত সত্যিই থাক, বেলার স্বামী-ত্যাগের মধ্যে একবিন্দু সত্যি নেই, আমি জোর করে বলতে পারি। সত্য স্বামীকে ত্যাগ করার মধ্যেও নেই, স্বামীর দাসীবৃত্তি করার মধ্যেও নেই, ও-দুটো শুধু ডাইনে-বাঁয়ের পথ, গন্তব্য স্থানটা আপনি খুঁজে নিতে হয়, তর্ক করে তার ঠিকানা মেলে না।

কমল নীরবে চাহিয়া রহিল।

নীলিমা বলিতে লাগিল, সূর্যের আসাটাই তার সবখানি নয়, তার চলে-যাওয়াটাও এমনি বড়। রূপ-যৌবনের আকর্ষণটাই যদি ভালবাসার সবটুকু হতো, মেয়ের সম্বন্ধে বাপের দুশ্চিন্তার কথাই উঠত না—কিন্তু তা নয়। আমি বই পড়িনি, জ্ঞান-বুদ্ধি কম, তর্ক করে তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিসটির সন্ধান তুমি আজও পাওনি তোমাকে বোঝাতে পারব না, কিন্তু মনে হয়, আসল জিনিসটির সন্ধান তুমি আজও পাওনি ভাই। শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, বিশ্বাস,—কাড়াকাড়ি করে এদের পাওয়া যায় না—অনেক দুঃখে, অনেক বিলম্বে এরা দেখা দেয়। যখন দেয়, তখন রূপ-যৌবনের প্রশ্নটা যে কোথায় মুখ লুকিয়ে থাকে, কমল, খোঁজ পাওয়াই দায়।

তীক্ষ্ণ-ধী কমল একনিমিষে বুঝিল উপস্থিত আলোচনায় ইহা অগ্রাহ্য। প্রতিবাদও নয়, সমর্থনও নয়, নীলিমার নিজস্ব আপন কথা। চাহিয়া দেখিল উজ্জ্বল দীবালোকে নীলিমার এলোমেলো ঘন-কৃষ্ণ চুলের শ্যামল ছায়ায় সুন্দর মুখখানি অভাবিত শ্রী ধারণ করিয়াছে, এবং প্রশান্ত চোখের সজল দৃষ্টি সকরুণ স্নিগ্ধতায় কূলে কূলে ভরিয়া গিয়াছে। কমল মনে মনে কহিল, ইহা নবীন সূর্যোদয়, অথবা শ্রান্ত রবির অস্তগমন, এ জিজ্ঞেসা বৃথা,—আরক্ত আভায় আকাশের যে-দিকটা আজ রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে—পূর্ব-পশ্চিম দিক্‌নির্ণয় না করিয়াই সে ইহারই উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাইল।

মিনিট দুই-তিন পরে আশুবাবু সহসা চকিত হইয়া কহিলেন, কমল, তোমার কথাগুলি আমি

আর একবার ভাল করে ভেবে দেখব, কিন্তু আমাদের কথাগুলোকেও তুমি এভাবে অবজ্ঞা করোনা। বহু বহু মানবেই একে সত্য বলে স্বীকার করেছে ; মিথ্যে দিয়ে কখন এত লোককে ভেলানো যায় না।

কমল অন্যমনস্কের মত একটুখানি হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কিন্তু জবাব দিল সে নীলিমাকে। কহিল, যা দিয়ে একটা ছেলেকে ভোলানো যায়, তাই দিয়ে লক্ষ ছেলেকেও ভোলানো যায়। সংখ্যা বাড়াটাই বুদ্ধি বাড়ার প্রমাণ নয় দিদি। একদিন যারা বলেছিল নর-নারীর ভালবাসার ইতিহাসটাই হচ্চে মানব-সভ্যতার সবচেয়ে সত্য ইতিহাস, তারাই সত্যের খোঁজ পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী, কিন্তু যারা ঘোষণা করেছিল, পুত্রের জন্যই ভার্যার প্রয়োজন, তারা মেয়েদের শুধু অপমান করেই ক্ষান্ত হয়নি, নিজেদের বড় হবার পথটাও বন্ধ করেছিল, এবং সেই অসত্যের পরে ভিত পুঁতেছিল বলে আজও এ দুঃখের কিনারা হলো না।

কিন্তু এ কথা আমাকে কেন কমল?

কারণ, আপনাকে জানানোই আজ আমার সবচেয়ে প্রয়োজন যে, চাটুবাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বেই নারীর চরম সার্থকতা, সমস্ত নারী জাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল। জীবনে যে-কোন অবস্থাই অঙ্গীকার করুন দিদি, এই মিথ্যে নীতিটাকে কখনো যেন মেনে নেবেন না। এই আমার শেষ অনুরোধ। কিন্তু আর তর্ক নয়, আমি যাই।

আশুবাবু শ্রান্তকণ্ঠে কহিলেন, এসো। নীচে তোমার জন্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কমল ব্যথার সহিত বলিল, আপনি আমাকে স্নেহ করেন, কিন্তু কোথাও আমাদের মিল নেই।

নীলিমা কহিল, আছে বৈ কি কমল। কিন্তু সে ত মনিবের ফরমাস-মত কাটা-ছাঁটা মানান-করা মিল নয়, বিধাতার সৃষ্টির মিল। চেহারা আলাদা, কিন্তু রক্ত এক, চোখের আড়ালে শিরের মধ্যে দিয়ে বয়। তাই, বাইরের অনৈক্য যতই গণ্ডগোল বাধাক, ভিতরের প্রচণ্ড আকর্ষণ কিছুতেই ঘোচে না।

কমল কাছে আসিয়া আশুবাবুর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া আস্তে আস্তে বলিল, মেয়ের বদলে আমার ওপর কিন্তু রাগ করতে পারবেন না তা বলে দিচ্চি।

আশুবাবু কিছুই বলিলেন না, শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, ইংরাজিতে emancipation বলে একটা কথা আছে ; আপনি ত জানেন, পুরাকালে পিতার কঠোর অধীনতা থেকে সন্তানকে মুক্তি দেওয়াও তার একটা বড় অর্থ ছিল। সেদিনের ছেলে-মেয়েরা মিলে কিন্তু এই শব্দটা তৈরী করেনি, করেছিল আপনাদের মত যাঁরা মস্ত বড় পিতা, নিজেদের বাঁধন-দড়ি আলগা করে যাঁরা সন্তানকে মুক্তি দিয়েছিলেন,—তাঁরাই। আজকের দিনেও ইম্যাম্‌সিপেশনের জন্যে যত কোঁদলই মেয়েরা করিনে কেন, দেবার আসল মালিক যে আপনারা,—আমরা মেয়েরা নই, জগৎ-ব্যবস্থায় এ সত্যটা আমি একটি দিনও ভুলিনে আশুবাবু। আমার নিজের বাবা প্রায়ই বলতেন, পৃথিবীর, ক্রীতদাসদের স্বাধীনতা দিয়েছিল একদিন তাদের মনিবেরাই, তাদের হয়ে লড়াই করেছিল মনিবের জাতেরাই, নইলে দাসের দল কোঁদল করে, যুক্তির জোরে নিজেদের মুক্তি অর্জন করেনি। এমনিই হয়। বিশ্বের এমনিই নিয়ম ; শক্তির বন্ধন থেকে শক্তিমানেরাই দুর্বলকেত্রাণ করে। তেমনি, নারীর মুক্তি থাকে না, থাকে তাঁর অকুণ্ঠ আশীর্বাদের মধ্যে।

আশুবাবু এখনও কথা কহিতে পারিলেন না। এই উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতির মেয়েটি সংসারে অসম্মান, অমর্যাদার মধ্যেই জন্মলাভ করিয়াছে, কিন্তু জন্মের সেই লজ্জাকর দুর্গতিকে অন্তরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করিয়া লোকান্তরিত পিতার প্রতি তাহার ভক্তিও স্নেহের সীমা নাই।

যে লোকটি তাহার পিতা, তাহাকে তিনি দেখেন নাই, নিজের সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে

সেই মানুষটিকে শ্রদ্ধা করাও কঠিন, তথাপি ইহারই উদ্দেশে দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল। নিজের মেয়ের বিচ্ছেদ ও বিরুদ্ধতা তাঁহাকে শূলের মত বিঁধিয়াছে, কিন্তু সকল বন্ধন কাটিয়া দিয়াও যে কি করিয়া মানুষকে সর্বকালের মত বাঁধিয়া রাখা যায়, এই পরের মেয়েটির মুখেরপানে চাহিয়া যেন তাহার একটা আভাস পাইলেন এবং কাঁধের উপর হইতে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন।

কমল কহিল, এবার আমি যাই—

আশুবাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন, বলিলেন, এসো।

ইহার অধিক আর কিছু মুখ দিয়া তাঁহার বাহির হইল না।

পঁচিশ

শীতের সূর্য অস্ত গেল। সায়াহ্ন ছায়ায় ঘরের মধ্যেটা ঝাপসা হইয়াছে, একটা জরুরী সেলাইয়ের বাকীটুকু কমল আলো জ্বালার পূর্বেই সরিয়া ফেলিতে চায়। অদূরে চৌকিতে বসিয়া অজিত। ভাবে বোধ হয় কি-একটা বলিতে বলিতে যেন হঠাৎ থামিয়া গিয়া সে উত্তরের আশায় উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

মনোরমা-শিবনাথের ব্যাপারটা বন্ধু-মহলে জানাজানি হইয়াছে। আজিকার প্রসঙ্গটা শুরু হইয়াছে সেই লইয়া। অজিতের গোড়ার বক্তব্যটা ছিল এই যে, এমনিই একটা-কিছু যে শেষ পর্যন্ত গড়াইবে, তাহা সে আগ্রায় আসিয়াই সন্দেহ করিয়াছিল।

কিন্তু সন্দেহের কারণ সম্বন্ধে কমল কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না।

তাহার পরে হইতে অজিত অনর্গল বকিয়া বকিয়া অবশেষে এমন জায়গায় আসিয়া থামিয়াছে যেখানে অপর পক্ষের সাড়া না পাইলে আর অগ্রসর হওয়া চলে না।

কমল অত্যন্ত মনোযোগে সেলাই করিতেই লাগিল, যেন মাথা তুলিবার সময়টুকুও নাই।

মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিল। আরো কতক্ষণ কাটিবে স্থিরতা নাই, অতএব, অজিতকে পুনরায় চেষ্টা করিতে হইল, বলিল, আশ্চর্য এই যে শিবনাথের আচরণ তোমার কাছে ধরাই পড়ল না।

কমল মুখ তুলিল না, কিন্তু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

অর্থাৎ তুমি এতই সাদাসিধে যে কোন সন্দেহই করনি, এ কি কেউ বিশ্বাস করতে পারে?

কেউ কি পারে-না-পারে জানিনে, কিন্তু আপনিও কি পারবেন না?

অজিত বলিল, হয়ত পারি,—কিন্তু তোমার মুখের পানে চেয়ে, এমনি পারিনে।

এইবার কমল মুখ তুলিয়া হাসিল, কহিল, তা হলে চেয়ে দেখুন, বলুন পারেন কিনা।

অজিতের চোখের দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল ; কহিল, তোমার কথাই সত্যি, তাকে অবিশ্বাস করনি বলেই তার ফল দাঁড়াল এই!

দাঁড়িয়েছে মানি, কিন্তু আপনার তরফে সন্দেহ করার সুফল কি পরিমাণে হাতে পেলেন সেটাও খুলে বলুন? এই বলিয়া সে পুনরায় একটুখানি হাসিয়া কাজে মন দিল।

ইহার পরে অজিত সংলগ্ন-অসংলগ্ন নানা কথা মিনিট দশ-পনের অবিচ্ছেদে বলিয়া শেষে শ্রান্ত হইয়া কহিল, কখনো হাঁ, কখনো না। হেঁয়ালি ছাড়া কি তুমি কথা বলতে জানো না?

কমল হাতের সেলাইটা সোজা করিতে করিতে কহিল, মেয়েরা হেঁয়ালিই ভালবাসে, ওটা স্বভাব।

তা হলে সে স্বভাবের প্রশংসা করতে পারিনে। স্পষ্ট বলতে একটু শেখো, নইলে সংসারে কাজ চলে না।

আপনিও হেঁয়ালি বুঝতে একটু শিখুন, নইলে ও-পক্ষের অসুবিধেও এমনি হয়। এই বলিয়া সে হাতের কাজটা পাট করিয়া টুকরিতে রাখিয়া বলিল, স্পষ্ট করার লোভ যাদের বড্ড বেশী, বক্তা হলে তারা খবরের কাগজে বক্তৃতা ছাপায়, লেখক হলে লেখে নিজের গ্রন্থের ভূমিকা, আর নাট্যকার হলে তারাই সাজে নিজের নাটকের নায়ক। ভাবে, অক্ষরে যা প্রকাশ পেলে না, হাত-

পা নেড়ে তাকে ব্যক্ত করা চাই। তারা ভালবাসলে যে কি করে সেইটে শুধু জানিনে। কিন্তু একটু বসুন, আমি আলোটা জ্বেলে আনি। এই বলিয়া সে দ্রুত উঠিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল।

মিনিট পাঁচ-ছয় পরে ফিরিয়া আলিয়া সে আলোটা টেবিলের উপর রাখিয়া নীচে মেঝেতে বসিল।

অজিত বলিল, বক্তা বা লেখক বা নাট্যকার কোনটাই আমি নই, সুতরাং, তাদের হয়ে কৈফিয়ত দিতে পারব না, কিন্তু তারা ভালবাসলে কি করে জানি। তারা শৈব-বিবাহের ফন্দি আঁটে না,—স্পষ্ট পরিচিত রাস্তায় পা দিয়ে হাঁটে। তাদের অবর্তমানে অন্যের খাওয়াপরার কষ্ট না হয়, আশ্রয়ের জন্যে বাড়িওয়ালার শরণাপন্ন না হতে হয়, অসম্মানের আঘাত যেন না—

কমল মাঝখানে থামাইয়া দিয়া কহিল, হয়েছে, হয়েছে। হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ তারা আগাগোড়া ইমারত এমন ভয়ানক নিরেট মজবুত করে গড়ে তোলে যে মড়ার কবর ছাড়া তাতে জ্যান্ত মানুষের দম ফেলবার ফাঁকটুকু পর্যন্ত রাখে না। তারা সাধু লোক।

হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে অনুরোধ আসিল, আমরা ভেতরে আসতে পারি?

কণ্ঠস্বর হরেন্দ্রর। কিন্তু আমরা কারা?

আসুন, আসুন, বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে কমল দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

হরেন্দ্র এবং সঙ্গে আর একটি যুবক। হরেন্দ্র বলিল, সতীশকে আমাদের আশ্রমে তুমি একটি দিন মাত্র দেখেচ, তবু আশা করি তাকে ভোলনি?

কমল হাসিমুখে কহিল, না। শুধু সেদিন ছিল কাপড়টা সাদা, আজ হয়েছে হলদে।

হরেন্দ্র বলিল, ওটা উচ্চতর ভূমিতে আরোহণের বাহ্যিক ঘোষণামাত্র, আর কিছু না। ও কাশীধাম থেকে সদ্য-প্রত্যাগত,—ঘন্টা-দুয়ের বেশী নয়। ক্লান্ত, তদুপরি ও তোমার প্রতি প্রসন্ন নয়; তথাপি আমি আসছি শুনে ও আবেগ সংবরণ করতে পারলে না। ওটা আমাদের ব্রহ্মচারীদের মনের ঔদার্য, আর কিছু না। এই বলিয়া সে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া কহিল, এই যে! আর একটি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী পূর্বাহ্নেই সমুপস্থিত। যাক, আর আশঙ্কার হেতু নেই, আমার আশ্রমটি ত ভাঙচে, কিন্তু আর একটা গজিয়ে উঠল বলে। এই বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং, দ্বিতীয় চৌকিটা সতীশকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, বসো; এবং নিজে গিয়া খাটের উপর বেশ করিয়া জাঁকিয়া বসিল। কমল দাঁড়াইয়া, গৃহে তৃতীয় আসন নাই দেখিয়া সতীশ বসিতে দ্বিধা করিতেছিল, হরেন্দ্র বুঝে নাই তাহা নয়, তবুও সহাস্যে কহিল, বসো হে সতীশ, জাত যাবে না। কাশী-ফেরৎ যত উঁচুতেই উঠে থাকো, তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে এ কথাটা ভুলো না।

না, সেজন্যে নয়, বলিয়া সতীশ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া পড়িল।

তাহার মুখ দেখিয়া কমল হাসিল, বলিল, খোঁচা দেওয়া আপনার মুখে সাজে না হরেনবাবু। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতাও আপনি, মহন্ত মহারাজও আপনি। ওঁরা বয়সেও ছোট, পাণ্ডাগিরিতেও খাটো। ওঁদের কাজ শুধু আপনার উপদেশ ও আদেশ মেনে চলা, সুতরাং—

হরেন্দ্র কহিল, সুতরাংটা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হয়ত আমিই, কিন্তু মোহান্ত ও মহারাজ হচ্চেন দুই বন্ধু সতীশ ও রাজেন। একজনের কাজ আমাকে উপদেশ দেওয়া এবং অন্যের কাজ ছিল সাধ্যমত আমাকে না-মেনে চলা। একজনের ত পাত্তা নেই, অন্যজন ফিরে এলেন ঢের বেশী তত্ত্ব সঞ্চয় করে। ভয় হচ্চে ওর সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে হয়ত আর পেরে উঠবো না। এখন ভাবনা কেবল ঐ অর্ধ-অভুক্ত ছেলের পাল নিয়ে। কাশী-কাঞ্চী ঘুরিয়ে সেগুলোক ও ফিরিয়ে এনেচে। ইতিমধ্যে আচারনিষ্ঠার যে লেশমত্র ত্রুটি ঘটেনি তা তাদের পানে চেয়েই বুঝেচি; শুধু ক্ষোভ এই যে, আর একটুখানি চেপে তপস্যা করালে ফিরে আসার গাড়ি ভাড়াটা আমার আর লাগতো না।

কমল ব্যথার সহিত প্রশ্ন করিল, ছেলেরা বুঝি খুব রোগা হয়ে গেছে?

হরেন্দ্র কহিল, রোগা! আশ্রম-পরিভাষায় হয়ত তার কি-একটা নাম আছে—সতীশ জানতেও পারে, কিন্তু আধুনিক কালের আঁকা শুক্রাচার্যের তপোবনে কচের ছবি দেখেচ?

দেখনি? তা হলে ঠিকটি উপলব্ধি করতে পারবে না। দোতালায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার ত হঠাৎ মনে হয়েছিল একদল কচ সার বেঁধে বুঝি স্বর্গ থেকে আশ্রমে এসে ঢুকচে। একটা ভরসা পেলাম, আমাদের আশ্রমটা ভেঙ্গে গেলে তারা না খেয়ে মারা যাবে না, দেশের কোন একটা কলা-ভবনে গিয়ে মডেলের কাজ নিতে পারবে।

কমল কহিল, লোকে বলে আপনি আশ্রম তুলে দিচ্চেন, এ কি সত্যি?

সত্যি। তোমার বাক্যবাণ আমার সহ্য হয় না। সতীশের এখানে আসার সেও একটা হেতু। ওর ধারণা তুমি আসলে ভারতীয় রমণী নও, তাই ভারতের নিগূঢ় সত্য-বস্তুটিকে তুমি চিনতেই পারো না। সেইটি তোমাকে ও বুঝিয়ে দিতে চায়। বুঝবে কিনা সে তুমিই জানো ; কিন্তু ওকে আশ্বাস দিয়েছি যে, আমি যাই করি না কেন ওদের ভয় নেই। কারণ, চতুর্বিধ আশ্রমের কোন্ আশ্রমটি অজিতকুমার নিজে গ্রহণ করবেন সঠিক সংবাদ না পেলেও, পরম্পরায় এ খবরটুকু পাওয়া গেছে যে, তিনি বহু অর্থব্যয়ে এমন দশ-বিশটা আশ্রম নানা স্থানে খুলে দেবেন। ওঁর অর্থও আছে, দেবার সামর্থ্যও আছে। তার একটার নায়কত্ব সতীশের জুটবেই।

কমল মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, দানশীলতার মত দুষ্কৃতি চাপা দেবার এমন আচ্ছাদন আর নেই। কিন্তু ভারতের সত্য-বস্তুটি আমাকে বুঝিয়া দিয়ে সতীশবাবুর লাভ কি হবে? আশ্রম তুলে দিতেও আমি হরেনবাবুকে বলিনি, টাকার জোরে ভারতবর্ষময় আশ্রম খুলতেও আমি অজিতবাবুকে নিষেধ করব না। আমার আপত্তি শুধু ঐটিকে সত্য বলে মেনে নেওয়ায়। তাতে কার কি ক্ষতি?

সতীশ বিনীতকণ্ঠে বলিল, ক্ষতির পরিমাণ বাইরে দেখা যাবে না। কিন্তু তর্কের জন্যে নয়, শিক্ষার্থী হিসেবে গোটা কয়েক প্রশ্ন যদি করি তার কি উত্তর পাবো না?

কিন্তু আজ আমি বড় শ্রান্ত সতীশবাবু।

সতীশ এ আপত্তি কানে তুলিল না, বলিল, হরেনদা এইমাত্র তামাশা করে বললেন আমি কাশী-ফেরৎ, যত উঁচুতেই উঠে থাকি, তার চেয়েও উঁচু জায়গা সংসারে আছে। সে এই ঘর। আমি জানি, আপনার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধার অবধি নেই,—আশ্রম ভাঙ্গলে ক্ষতি হবে না। কিন্তু আপনার কথায় ওঁর মন যদি ভাঙ্গে সে লোকসান পূর্ণ হওয়া কঠিন।

কমল চুপ করিয়া রহিল। সতীশ বলিতে লাগিল, রাজেনকে আপনি ভাল করেই জানেন, সে আমার বন্ধু। মূল বিষয়ে মতের মিল না থাকলে আমাদের বন্ধুত্ব হতে পারত না। তার মত ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির মধ্যে দিয়ে স্বজাতির পরম কল্যাণ আমারও কাম্য। এরই আশায় ছেলেদের সঙ্ঘবদ্ধ করে আমরা গড়ে তুলতে চাই। নইলে মৃত্যুর পরে কল্প-কাল বৈকুণ্ঠবাসের লোভ আমাদের নেই। কিন্তু নিয়মের কঠোর বন্ধন ছাড়া ত কখনো সঙ্ঘ সৃষ্টি হয় না। আর শুধু ছেলেরাই ত নয়, সে বন্ধন আমরা নিজেরাও যে গ্রহণ করেচি। কষ্ট ওখানে আছে,—থাকবেই ত। বহু শ্রম করে বৃহৎ বস্তু লাভ করার স্থানকেই ত আশ্রম বলে। তাতে উপহাসের ত কিছু নেই।

জবাব না পাইয়া সতীশ বলিতে লাগিল, হরেনদার আশ্রম যাই হোক না কেন, সে সম্বন্ধে আমি আলোচনা করব না, কারণ, সেটা ব্যক্তিগত হয়ে পড়ার ভয় আছে। কিন্তু ভারতীয় আশ্রমের মধ্যে যে ভারতের অতীতের প্রতিই নিষ্ঠা ও পরম শ্রদ্ধা আছে এ ত অস্বীকার করা যায় না। ত্যাগ, ব্রহ্মচর্য, সংযম এ-সকল শক্তিহীন অক্ষমের ধর্ম নয় ; জাতিগঠনের প্রাণ ও উপাদান সেদিন এর মধ্যেই নিহিত ছিল, আজ এ যুগেও সে উপাদান অবহেলার সামগ্রী নয়। মরণোন্মুখ ভারতকে শুধু কেবল এই পথেই আবার বাঁচিয়ে তোলা যায়। আশ্রমের আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা এই বিশ্বাস, এই শ্রদ্ধাকেই জাগিয়ে রাখতে চাই। একদিন মন্ত্র-মুখরিত, হোমাগ্নি-প্রজ্বলিত, তপস্যা-কঠোর ভারতের এই আশ্রমই জাতি-জীবনের একটা মৌলিক কল্যাণ সফল করবার উদ্দেশ্যেই উদ্ভূত হয়েছিল ; সে প্রয়োজন আজও যে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, এ সত্য কোন্ মূর্খ অস্বীকার করতে পারে?

সতীশের বক্তৃতায় আন্তরিকতার একটা জোর ছিল। কথাগুলি ভাল এবং নিরন্তর বলিয়া

বলিয়া একপ্রকার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। শেষের দিকে তাহার মৃদু-কন্ঠ সতেজ ও উদ্দীপনায় কালো-মুখ বেগুনে হইয়া উঠিল। সেইদিকে নিঃশব্দ ও নিষ্পলক-চক্ষে চাহিয়া সুপবিত্র ভাবাবেগে অজিতের আপাদমস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং হরেন্দ্র তাহার আশ্রমের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে যত মৌখিক আস্ফালনই করিয়া থাক, আশ্রমের বিগত গৌরবের বিবরণে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানে সে ঝড়ের বেগে দোল খাইতে লাগিল। তাহারই মুখের প্রতি সতীশ তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বলিল, হরেনদা, আমরা মরেছি, কিন্তু এই আশ্রমের মধ্যে দিয়েই যে আমাদের নবজন্ম-লাভের বিজ্ঞান আছে, এ সত্য ভুলতে যাচ্ছেন আপনি কোন্ যুক্তিতে? আপনি ভাঙ্গতে চাচ্চেন, কিন্তু ভাঙ্গাটাই কি বড়? গড়ে তোলা কি তার চেয়ে ঢের বেশী বড় নয়? আপনিই বলুন!

কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, জীবনে ক'টা আশ্রম আপনি নিজের চোখে দেখেছেন? ক'টার সঙ্গে আপনার যথার্থ নিগূঢ় পরিচয় আছে?

কঠিন প্রশ্ন। কমল বলিল, বাস্তবিক একটাও দেখিনি এবং আপনাদেরটা ছাড়া কোনটার সঙ্গে কোন পরিচয়ই নেই।

তবে?

কমল হাসিমুখে কহিল, চোখে কি সমস্তই দেখা যায়? আপনাদের আশ্রমের শ্রম করাটাই চোখে দেখে এলাম, কিন্তু বৃহৎ লাভের ব্যাপারটা যে আড়ালেই রয়ে গেল।

সতীশ কহিল, আপনি আবার উপহাস করচেন।

তাহার ক্ষুব্ধ মুখের চেহারাটা দেখিয়া হরেন্দ্র স্নিগ্ধস্বরে বলিল, না না সতীশ, উপহাস নয়, উনি রহস্য করচেন মাত্র। ওটা ওঁর স্বভাব।

সতীশ কহিল, স্বভাব! স্বভাব বললেই ত কৈফিয়ত হয় না হরেনদা। ভারতের অতীত দিনের যা নিত্য-পূজনীয়, নিত্য-আচরণীয় ব্যাপার তাকেই অবমাননা, তাকেই অশ্রদ্ধা দেখান হয়। একে ত উপেক্ষা করা চলে না।

হরেন্দ্র কমলকে দেখাইয়া কহিল, এ বিতর্ক ওঁর সঙ্গে বহুবার হয়ে গেছে। উনি বলেন, অতীতের কোন দায় নেই। বস্তু অতীত হয় কালের ধর্মে, কিন্তু তাকে ভাল হতে হয় নিজের গুণে। শুধু মাত্র প্রাচীন বলেই সে পূজ্য হয়ে ওঠে না। যে বর্বর জাত একদিন তার বুড়ো বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলতো, আজও যদি সেই প্রাচীন অনুষ্ঠানের দোহাই দিয়ে সে কর্তব্য নির্দেশ করতে চায় তাকে ত ঠেকান যায় না সতীশ।

সতীশ ক্রুদ্ধ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, প্রাচীন ভারতীয়ের সঙ্গে ত বর্বরের তুলনা হয় না হরেনদা!

হরেন্দ্র বলিল, সে আমি জানি। কিন্তু ওটা যুক্তি নয় সতীশ, ওটা গলার জোরের ব্যাপার।

সতীশ অধিকতর উত্তেজিত হইয়া কহিল, আপনাকেও যে একদিন নাস্তিকতার ফাঁদে পড়তে হবে এ আমরা ভাবিনি হরেনদা।

হরেন্দ্র কহিল, তুমি জান আমি নাস্তিক নই। কিন্তু গাল দিয়ে শুধু অপমান করাই যায় সতীশ, মতের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শক্ত কথাই সংসারে সবচেয়ে দুর্বল।

সতীশ লজ্জা পাইল। হেঁট হইয়া হাত দিয়া তাহার পা ছুঁইয়া মাথায় ঠেকাইয়া কহিল, অপমান করিনি হরেনদা। আপনি ত জানেন, আপনাকে কত ভক্তি করি আমরা ; কিন্তু কষ্ট পাই যখন শুনি ভারতের শাশ্বত তপস্যাকেও আপনি অবিশ্বাস করেন। একদিন যে উপাদান যে সাধনা দিয়ে তাঁরা এই ভারতের বিরাট জাতি, বিরাট সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন, সে সত্য কখনো বিলুপ্ত হয়নি। আমি সোনার অক্ষরে স্পষ্ট দেখতে পাই, সেই ভারতের মজ্জাগত ধর্ম,—সেই আমাদের আপন জিনিস। সেই ধ্বংসোন্মুখ বিরাট জাতটাকে আবার সেই উপাদান দিয়েই বাঁচিয়ে তোলা যায় হরেনদা, আর কোন পথ নেই।

হরেন্দ্র কহিল, না-ও যেতে পারে সতীশ। ও তোমার বিশ্বাস, এবং তার দাম শুধু তোমার নিজের কাছে। একদিন ঠিক এই-রকম কথার উত্তরেই কমল বলেছিলেন, জগতের আদিম যুগে

একদিন বিরাট অস্থি, বিরাট দেহ, বিরাট ক্ষুধা দিয়ে বিরাট জীব সৃষ্টি হয়েছিল ; তাই নিয়ে সে পৃথিবী জয় করে বেড়িয়েছিল—সেদিন সেই ছিল তার সত্য উপাদান। কিন্তু আর একদিন সেই দেহ, সেই ক্ষুধাই এনে দিলে তাকে মৃত্যু। একদিনের সত্য উপাদান আর একদিনের মিথ্যে উপাদান হয়ে তারে নিশ্চিহ্ন করে সংসারে মুছে দিলে। এতটুকু দ্বিধা করলে না। সেই অস্থি আজ পাথরে রূপান্তরিত, প্রত্নতাত্ত্বিকের গবেষণার বস্তু।

সতীশ হঠাৎ জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া বলিল, তবে কি আমাদের পূর্ব-পিতামহদের আদর্শ ভ্রান্ত? তাঁদের তত্ত্ব-নিরূপণে সত্য ছিল না?

হরেন্দ্র বলিল, সেদিন ছিল হয়ত, কিন্তু আজ না থাকায় বাধা নেই। সেদিনের স্বর্গের পথ আজ যদি যমের দক্ষিণ দোরে এনে দেয়, মুখ ভার করবার হেতু পাইনে সতীশ।

সতীশ গূঢ় ক্রোধ প্রাণপণে দমন করিয়া কহিল, হরেনদা, এ-সব শুধু আপনাদের আধুনিক শিক্ষার ফল ; আর কিছু নয়।

হরেন্দ্র বলিল, অসম্ভব নয়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা যদি আধুনিক কালের কল্যাণের পথ দেখাতে পারে, আমি লজ্জার কারণ দেখিনে সতীশ।

সতীশ বহুক্ষণ নির্বাক স্তব্ধভাবে বসিয়া পরে ধীরে ধীরে কহিল, লজ্জার, সহস্র লজ্জার কারণ কিন্তু আমি দেখি হরেনদা। ভারতের জ্ঞান, ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব এই ভারতেরই বিশেষত্ব এবং প্রাণ। সেই ভাব, সেই তত্ত্ব বিসর্জন দিয়ে দেশকে যদি স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়, তবে সে স্বাধীনতায় ভারতের ত জয় হবে না, জয় হবে শুধু পাশ্চাত্য নীতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতার। সে পরাজয়ের নামান্তর। তার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

তাহার বেদনা আন্তরিক। সেই ব্যথার পরিমাণ অনুভব করিয়া হরেন্দ্র মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু জবাব দিল এবার কমল। মুখে সুপরিচিত পরিহাসের চিহ্নমাত্র নাই, কণ্ঠস্বর সংযত, শান্ত ও মৃদু ; বলিল, সতীশবাবু, নিজের জীবনে যেমন নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন, সংস্কারের দিক দিয়েও যদি তাকে এমনি পরিত্যাগ করতে পারতেন, এ কথা উপলব্ধি করা আজ কঠিন হতো না যে ভাবের জন্যে, বিশেষত্বের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই তার সমাদর, মানুষের জন্যেই তার দাম? মানুষই যদি তলিয়ে যায়, কি হবে তার তত্ত্বের মহিমা প্রতিষ্ঠায়? নাই বা হলো ভারতের মতের জয়, মানুষের জয় ত হবে! তখন মুক্তি পেয়ে এতগুলি নর-নারী ধন্য হয়ে যাবে। চেয়ে দেখুন ত নবীন তুর্কীর দিকে। যতদিন সে তার প্রাচীন রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, পুরুষ-পরম্পরাগত পুরানো পথটাকেই সত্য জেনে আঁকড়ে ধরে ছিল, ততদিনই তার হয়েছে বারংবার পরাজয়। আজ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে সে সত্যকে পেয়েছে,—তার সমস্ত আবর্জনা ভেসে গেছে ; আজ তাকে উপহাস করে সাধ্য কার? অথচ, সেই প্রাচীন মত ও পথই একদিন দিয়েছিল তারে বিজয়, দিয়েছিল ঐশ্বর্য, কল্যাণ, দিয়েছিল মনুষ্যত্ব। ভেবেছিল, সেই বুঝি চিরন্তন সত্য। ভেবেছিল, তাকেই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে বিগত গৌরব আবার ফিরিয়ে আনতে পারবে। মনেও করেনি তারও বিবর্তন আছে। আজ সেই মোহ গেল মরে, কিন্তু ওদের মানুষগুলো উঠলো বেঁচে। এমন দৃষ্টান্ত আরও আছে, আরও হবে। সতীশবাবু, আত্মবিশ্বাস এবং আত্ম-অহঙ্কার এক বস্তু নয়।

সতীশ বলিল, জানি। কিন্তু পশ্চিমের লোকেরাই যে মানুষের প্রশ্নের শেষ জবাব দিয়েছে—এও ত না হতে পারে? তাদের সভ্যতাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, এও ত সম্ভব?

কমল মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ সম্ভব। আমার বিশ্বাস হবেও।

তবে?

কমল বলিল, তাতে ধিক্কার দেবার কিছু নেই। সতীশবাবু, মন্দ ত ভালর শত্রু নয়, ভালর শত্রু তার চেয়ে যে আরও ভাল,—সে। এইখানেই ভারতের ভয়। এবং, সেই আরও ভাল যেদিন উপস্থিত হয়ে প্রশ্নের জবাব চাইবে সেদিন তারই হাতে রাজদণ্ড তুলে দিয়ে ওকে সরে যেতে হবে। একদিন শক, হূন তাতারের দল ভারতবর্ষ গায়ের জোরে জয় করেছিল, কিন্তু এর সভ্যতাকে বাঁধতে পারেনি, তারা আপনি বাঁধা পড়েছিল। এর কারণ কি জানেন? আসল কারণ তারা

নিজেরাই ছিল ছোট। কিন্তু মোগল-পাঠানের পরীক্ষা বাকী রয়ে গেল, ফরাসী-ইংরেজ এসে পড়ল বলে। সে মিয়াদ আজও বাজেয়াপ্ত হয়নি। ভারতের কাছে এর জবাব একদিন তাদের দিতেই হবে। সে প্রশ্ন থাক, কিন্তু পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতার কাছে ভারতবর্ষ আজ যদি ধরা দেয়, দম্ভে আঘাত লাগবে, কিন্তু তার কল্যাণে ঘা পড়বে না, আমি নিশ্চয় বলতে পারি।

সতীশ সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, না। যাদের আস্থা নেই, শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাসের ভিত্তি যাদের বালির ওপর, তাদের কাছে এমনি করে বলতে থাকলেই হবে সর্বনাশ। এই বলিয়া হরেন্দ্রর প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিল, ঠিক এইভাবেই একদিন বাঙলায়—সে বেশীদিন নয়, বিদেশের বিজ্ঞান, বিদেশের দর্শন, বিদেশের সভ্যতাকে মস্ত মনে করে সত্যভ্রষ্ট, আদর্শভ্রষ্ট জন-কয়েক অসম্পূর্ণ শিক্ষার বিজাতীয় স্পর্ধায় স্বদেশের যা-কিছু আপন তাকে তুচ্ছ করে দিয়ে দেশের মনকে বিক্ষিপ্ত, কদাচারী করে তুলেছিল। কিন্তু এতবড় অকল্যাণ বিধাতার সইল না। প্রতিক্রিয়ায় বিবেক ফিরে এলো। ভুল ধরা পড়ল। সেই বিষম দুর্দিনে মনস্বী যাঁরা স্বজাতির কেন্দ্রবিমুখ উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে স্ব-গৃহের পানে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তাঁরা শুধু দেশের নয়, সমস্ত ভারতের নমস্য। এই বলিয়া সে দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইল।

কথাটা যে সত্য তাহা সবাই জানে। সুতরাং হরেন্দ্র অজিত উভয়েই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নমস্যদের উদ্দেশে যখন নমস্কার জানাইল তাহাতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। অজিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, নইলে খুব বেশী লোকে হয়ত সে সময় ক্রীশ্চান হয়ে যেতো। শুধু তাঁদের জন্যেই সেটা হতে পারেনি। কথাটা বলিয়াই সে কমলের মুখেরপানে চাহিয়া দেখিল চোখে তাহার অনুমোদন নাই, আছে শুধু তিরস্কার। অথচ, চুপ করিয়াই আছে। হয়ত, জবাব দিবার ইচ্ছাও ছিল না। অজিতকে সে চিনিত,—কিন্তু হরেন্দ্রও যখন ইহারই অস্ফুট প্রতিধ্বনি করিল তখন তাহার অনতিকালপূর্বের কথাগুলার সহিত এই সসঙ্কোচ জড়িমা এমনি বিসদৃশ শুনাইল যে, সে নীরবে থাকিতে পারিল না। কহিল, হরেনবাবু, এক-ধরনের লোক আছে তারা ভূত মানে না, কিন্তু ভূতের ভয় করে। একেই বলে ভাবের ঘরে চুরি! এমন অন্যায় আর কিছু হতেই পারে না। এদেশে আশ্রমের জন্যে টাকার অভাব হবে না, ছেলের দুর্ভিক্ষও ঘটবে না ; অতএব, সতীশবাবুর চলে যাবে, কিন্তু ওঁকে পরিত্যাগ করার মিথ্যাচার আপনাকে চিরদিন দুঃখ দেবে।

একটু থামিয়া কহিল, আমার বাবা ছিলেন ক্রীশ্চান, কিন্তু আমি যে কি, সে খোঁজ তিনিও করেন নি, আমিও করিনি। তাঁর প্রয়োজন ছিল না, আমার মনে ছিল না। কামনা করি, ধর্মকে যেন আমরণ এমনি ভুলেই থাকতে পারি, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অনাচারী বলে এইমাত্র যাদের গঞ্জনা দিলেন, এবং নমস্য বলে যাঁদের নমস্কার করলেন, সর্বনাশের পাল্লায় কার দান ভারী, এ প্রশ্নের জবাব একদিন লোকে চাইতে ভুলবে না।

সতীশের গায়ে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। তীব্র বেদনায় অকস্মাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি জানেন এঁদের নাম? কখনো শুনেছেন কারো কাছে?

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না।

তা হলে সেইটে আগে জেনে নিন।

কমল হাসিয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু নামের মোহ আমার নেই। নাম জানাটাকেই জানার শেষ হলে আমি ভাবতে পারিনে।

প্রত্যুত্তরে সতীশ দুই চক্ষে শুধু অবজ্ঞা ও ঘৃণা বর্ষণ করিয়া ত্বরিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে যে রাগ করিয়া গেছে তাহা নিঃসন্দেহ। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে কথঞ্চিৎ লঘু করিবার মানসে হরেন্দ্র হাসির ভান করিয়া খানিক পরে বলিল, কমলের আকৃতিটা প্রাচ্যের, কিন্তু প্রকৃতিটা প্রতীচ্যের। একটা পড়ে চোখে, কিন্তু অপরটা থাকে সম্পূর্ণ আড়ালে। এইখানে হয় মানুষের ভুল। ওঁর পরিবেশন করা খাবার গেলা যায়, কিন্তু হজম করতে গোল বাধে। পেটের বত্রিশ নাড়ীতে যেন মোচড় ধরে। আমাদের প্রাচীন কোন-কিছুর প্রতি ওর না আছে বিশ্বাস, না আছে

দরদ। অকেজো বলে বাতিল করে দিতে ওর ব্যথা নেই। কিন্তু সূক্ষ্ম নিক্তি হাতে পেলেই যে সূক্ষ্ম ওজন করা যায় না—এ কথাটা ও বুঝতেই পারে না।

কমল কহিল, পারি, শুধু দাম নেবার বেলাতেই একটার বদলে অন্যটা নিতে পারিনে। আমার আপত্তি ঐখানে।

হরেন্দ্র বলিল, আশ্রমটা তুলে দেবো আমি স্থির করেচি। ও শিক্ষায় মানুষ হয়ে ছেলেরা দেশের মুক্তি—পরম কল্যাণকে ফিরিয়ে আনতে পারবে, আমার সন্দেহ জন্মেচে। কিন্তু, দীন-হীন ঘরের যে-সব ছেলেকে সতীশ ঘরছাড়া করে এনেছে তাদের দিয়ে যে কি করব আমি তাই ভেবে পাইনে। সতীশের হাতে তুলে দিতেও ত তাদের পারব না।

কমল কহিল, পেরেও কাজ নেই। কিন্তু এদের নিয়ে অসাধারণ অলৌকিক কিছু একটা করে তুলতেও চাইবেন না। দীন-দুঃখীর ঘরের ছেলে সকল দেশেই আছে; তারা যেমন করে তাদের বড় করে তোলে, তেমনি করেই এদের মানুষ করে তুলুন।

হরেন্দ্র বলিল ঐখানে এখনো নিঃসংশয় হতে পারিনি কমল। মাস্টার-পণ্ডিত লাগিয়ে তাদের লেখাপড়া শেখাতে হয়ত পারব, কিন্তু যে সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা তাদের আরম্ভ হয়েছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে ওদের মানুষ করা যাবে কিনা, সেই আমার ভয়।

কমল বলিল, হরেনবাবু, সকল জিনিসকেই অমন একান্ত করে আপনারা ভাবেন বলেই কোন প্রশ্নের আর সোজা জবাবটা পান না। সন্দেহ আসে, হয় ওরা দেবতা গড়ে উঠবে, না হয়, একেবারে উচ্ছৃঙ্খল পশু হয়ে দাঁড়াবে। জগতের সহজ, সরল, স্বাভাবিক শ্রী আর চোখের সামনে থাকে না। পরায়ত্ত মনগড়া অন্যায়ের বোধের দ্বারা সমস্ত মনকে শঙ্কায় ত্রস্ত মলিন করে রাখেন। সেদিন আশ্রমে যা দেখে এসেচি সে কি সংযম ও ত্যাগের শিক্ষা? ওরা পেয়েছে কি? পেয়েছে অপরের দেওয়া দুঃখের বোঝা, পেয়েছে অনধিকার, পেয়েছে প্রবঞ্চিতের ক্ষুধা। চীনাদের দেশে জন্ম থেকে মেয়েদের পা ছোট করা হয়। পুরুষেরাও তাকে বলে সুন্দর,—সে আমায় সয়, কিন্তু মেয়েদের সেই নিজেদের পঙ্গু, বিকৃত পায়ের সৌন্দর্যে যখন নিজেরাই মোহিত হয়, তখন আশা করার কিছু থাকে না। আপনাদের নিজেদের কৃতিত্বে মগ্ন হয়ে রইলেন, আমি জিজ্ঞেসা করলাম, বাবারা কেমন আছ বল ত? ছেলেরা একবাক্যে বললে, খুব সুখে আছি। একবার ভাবলেও না। ভাবাটাও তাদের শেষ হয়ে গেছে,—এমনি শাসন। নীলিমাদিদি আমার পানে চেয়ে বোধ করি উত্তর চাইলেন, কিন্তু বুক চাপড়ে কাঁদা ভিন্ন আমি আর এ কথার জবাব খুঁজে পেলাম না। মনে মনে ভাবলাম, ভবিষ্যতে এরাই আনবে দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে।

হরেন্দ্র কহিল, ছেলেদের কথা যাক, কিন্তু রাজেন সতীশ এরা ত যুবক? এরাও ত সর্বত্যাগী?

কমল বলিল, রাজেনকে আপনারা চেনেন না, সুতরাং সেও যাক। কিন্তু বৈরাগ্য যৌবনকেই ত বেশী পেয়ে বসে। ও যেখানে শক্তি, সেখানে বিরুদ্ধ-শক্তি ছাড়া তাকে বশ করবে কে?

হরেন্দ্র বলিল, রাগ করো না কমল, কিন্তু তোমার রক্তে ত বৈরাগ্য নেই। তোমার বাবা য়ুরোপিয়ান, তাঁর হাতেই তোমার শিশু-জীবন গড়ে উঠেছে। মা এদেশের, কিন্তু তাঁর কথা না তোলাই ভাল। দেহের রূপ ছাড়া বোধ হয় সেদিক থেকে কিছুই পাওনি। তাই, পশ্চিমের শিক্ষায় ভোগটাকেই জীবনের সবচেয়ে বড় বলে জেনেচ।

কমল কহিল, রাগ করিনি হরেনবাবু। কিন্তু এমন কথা আপনি বলবেন না। কেবলমাত্র ভোগটাকেই জীবনের বড় করে নিয়ে জাত কখনো বড় উঠতে পারে না। মুসলমানেরা যখন এই ভুল করলে তখন তাদের ত্যাগও গেলো, ভোগও ছুটলো। এই ভুল করলে ওরাও মরবে। পশ্চিম ত আর জগৎ-ছাড়া নয়, সে বিধান উপেক্ষা করে কারও বাঁচবার জো নেই। এই বলিয়া সে একমুহূর্তে মৌন থাকিয়া কহিল, তখন কিন্তু মুচকে হেসে আপনারাও বলবার দিন পাবেন,—কেমন! বলেছিলাম ত! দিন-কয়েকের নাচন-কোঁদন ওদের যে ফুরুবে সে আমরা জানতাম। কিন্তু চেয়ে দেখো, আমরা আগাগোড়া টিকে আছি। বলিতে বলিতে সুবিমলহাস্যে তাহার সমস্ত মুখ বিকশিত হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র কহিল, সেইদিনই যেন আসে।

কমল কহিল, অমন কথা বলতে নেই হরেনবাবু। অতবড় জাত যদি মাথা নীচু করে পড়ে, তার ধূলোয় জগতের অনেক আলোই ম্লান হয়ে যাবে। মানুষের সেটা দুর্দিন।

হরেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, তার এখনো দেরি আছে, কিন্তু নিজের দুর্দিনের আভাস পাচ্চি। অনেক আলোই নিব-নিব হয়ে আসচে। পিতার কাছে নেবানোর কৌশলটাই জেনেছিলে কমল, জ্বালবার বিদ্যে শেখোনি। আচ্ছা, চললাম। অজিতবাবুর কি বিলম্ব আছে?

অজিত উঠি-উঠি করিল, কিন্তু উঠিল না।

কমল বলিল, হরেনবাবু, আলো পথের ওপর না পড়ে চোখের ওপর পড়লে খানায় পড়তে হয়। সে আলো যে নেভায় তাকে বন্ধু বলে জানবেন।

হরেন্দ্র নিশ্বাস ফেলিল, কহিল, অনেক সময়ে মনে হয়, তোমার সঙ্গে পরিচয় কুক্ষণে হয়েছিল, সে প্রত্যয়ের জোর আমার আর নেই, তবু বলতে পারি, যত বিদ্যে, বুদ্ধি, জ্ঞান ও পুরুষকারের জৌলুস ওরা দেখাক, ভারতের কাছে সে-সমস্তই অকিঞ্চিৎকর।

কমল বলিল, এ যেন ক্লাসে প্রমোশন না-পাওয়া ছেলের এম. এ. পাস করাকে ধিক্কার দেওয়া। হরেনবাবু, আত্ম-মর্যাদাবোধ বলে যেমন একটা কথা আছে, বড়াই করা বলেও তেমনি একটা কথা আছে।

হরেন্দ্র ক্রুদ্ধ হইল, কহিল, কথা অনেক আছে। কিন্তু, এই ভারতই একদিন সকল দিক দিয়েই জগতের গুরু ছিল, তখন অনেকের পূর্বপুরুষ হয়ত গাছের ডালে ডালে বেড়াতো। আবার এই ভারতবর্ষই আর একদিন জগতে সেই শিক্ষকের আসনই অধিকার করবে। করবেই করবে।

কমল রাগ করিল না, হাসিল। বলিল, আজ তারা ডাল ছেড়ে মাটিতে নেবেছে। কিন্তু কোন্ মহা-অতীতে একজনের পূর্বপুরুষ পৃথিবীর গুরু ছিল এবং কোন্ মহা-ভবিষ্যতে আবার তার বংশধর পৈতৃক পেশা ফিরে পাবে এ আলোচনায় সুখ পেতে হলে অজিতবাবুকে ধরুন। আমার অনেক কাজ।

হরেন্দ্র বলিল, আচ্ছা, নমস্কার। আজ আসি। বলিয়া বিষণ্ণ-গম্ভীরমুখে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ছাব্বিশ

আট-দশ দিন পরে কমল আশুবাবুর বাটীতে দেখা করিতে আসিল। যাঁহাদের লইয়া এই আখ্যায়িকা তাঁহাদের জীবনে এই কয়দিনে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেছে। অথচ, আকস্মিকও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয়। কিছুকাল হইতে এলোমেলো বাতাসে ভাসিয়া টুকরা মেঘের রাশি আকাশে নিরন্তর জমা হইতেছিল ; ইহার পরিণতি সম্বন্ধে বিশেষ সংশয় ছিল না,—ঘটিলও তাই।

ফটকের দরোয়ান অনুপস্থিত। বাটীর নীচের বারান্দায় সাধারণতঃ কেহ বসিত না, তথাপি খানকয়েক চৌকি, মেজ ও দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা বড়লোকের ছবি টাঙান ছিল, আজ সেগুলো অন্তর্হিত। শুধু, ছাদ হইতে লম্বমান কালি-মাখান লণ্ঠনটা, এখনও ঝুলিতেছে। স্থানে স্থানে আবর্জনা জমিয়াছে, সেগুলা পরিষ্কার করিবার আর বোধ হয় আবশ্যক ছিল না। কেমন একটু শ্রীহীন ভাব ; গৃহস্বামী যে পলায়নোন্মুখ তাহা চাহিলেই বুঝা যায়। কমল উপরে উঠিয়া আশুবাবুর বসিবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেলা অপরাহ্নের কাছাকাছি, তিনি আগেকার মতই চেয়ারে পা ছড়াইয়া শুইয়া ছিলেন, ঘরে আর কেহ ছিল না, পর্দা সরানোর শব্দে তিনি চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন। কমলকে বোধ হয় তিনি আশা করেন নাই ; একটু বেশীমাত্রায় খুশী হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন,—কমল যে!! এসো মা, এসো।

তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কমলের বুকে ঘা লাগিল, এ কি? আপনাকে যে বুড়োর মত দেখাচ্ছে কাকাবাবু?

আশুবাবু হাসিলেন, বুড়ো? সে ত ভগবানের আশীর্বাদ কমল। ভেতরে ভেতরে বয়স যখন বাড়ে, বাইরে তখন বুড়ো না-দেখানোর মত দুর্ভোগ আর নেই। ছেলেবেলায় টাক পড়ার মতই করুণ।

কিন্তু শরীরটাও ত ভাল দেখাচ্চে না!

না।

কিন্তু আর বিস্তারিত প্রশ্নের অবকাশ দিলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কেমন আছ কমল?

ভাল আছি। আমার ত কখনো অসুখ করে না কাকাবাবু।

তা জানি। না দেহের, না মনের। তার কারণ, তোমার লোভ নেই। কিছুই চাও না বলে ভাগবান দু'হাতে ঢেলে দেন।

আমাকে? দিতে কি দেখলেন বলুন ত?

আশুবাবু কহিলেন, এ ত ডেপুটির আদালত নয় মা, যে, ধমক দিয়ে মামলা জিতে নেবে? তা সে যাই হোক, তবু মানি যে দুনিয়ার বিচারে নিজেও বড় কম পাইনি। তাই ত আজই সকালে থলি ঝেড়ে ফর্দ মিলিয়ে দেখছিলাম। দেখলাম, শূন্যের অঙ্কগুলোই এতদিন তহবলি ফাঁপিয়ে রেখেচে—অন্তঃসারহীন থলিটার মোটা চেহারা মানুষের চোখকে কেবল নিছক ঠকিয়েছে,—ভেতরে কোন বস্তু নেই। লোকে শুধু ভুল করেই ভাবে, মা, গণিত-শাস্ত্রের নির্দেশে শূন্যের দাম আছে। আমি ত দেখি কিচ্ছু নেই। একের ডানদিকে ওরা সার বেঁধে দাঁড়ালে একই এককোটী হয়, শূন্যের সংখ্যাগুলো ভিড় করার জোরে শূন্য কোটী হয়ে ওঠে না। পদার্থ যেখানে নেই, ওগুলো সেখানে শুধু মায়া। আমার পাওয়াটাও ঠিক তাই।

কমল তর্ক করিল না, তাঁহার কাছে গিয়া চৌকি টানিয়া বসিল। তিনি ডান হাতটি কমলের হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন, মা, এবার সত্যিই ত যাবার সময় হলো, কাল-পরশু যে চললাম। বুড়ো হয়েছি, আবার যে কখনো দেখা হবে ভাবতে ভরসা পাইনে। কিন্তু এটুকু ভরসা পাই যে আমাকে তুমি ভুলবে না।

কমল কহিল, না, ভুলব না। দেখাও আবার হবে। আপনার থলিটা শূন্য ঠেকচে বলে, আমার থলিটা শূন্য দিয়ে ভরিয়ে রাখিনি কাকাবাবু, তারা সত্যি সত্যিই পদার্থ,—মায়া নয়।

আশুবাবু এ কথার জবাব দিলেন না, কিন্তু মনে মনে বুঝিলেন, এই মেয়েটি একবিন্দুও মিথ্যা বলে নাই।

কমল কহিল, আপনি এখনো আছেন বটে, কিন্তু আপনার মনটা যে এদেশ থেকে বিদেয় নিয়েছে তা বাড়িতে ঢুকেই টের পেয়েছি। এখানে আর আপনাকে ধরে রাখা যাবে না। কোথায় যাবেন? কলকাতায়?

আশুবাবু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, না, ওখানে নয়। এবার একটুখানি দূরে যাবো কল্পনা করেচি। পুরনো বন্ধুদের কথা দিয়েছিলাম, যদি বেঁচে থাকি আর একবার দেখা করে যাবো। এখানে তোমারো ত কোন কাজ নেই কমল, যাবে মা আমার সঙ্গে বিলেতে? আর যদি ফিরতে না পারি, তোমার মুখ থেকে কেউ কেউ খবরটা পেতেও পারবে।

এই অনুদ্দিষ্ট সর্বনামের উদ্দিষ্ট যে কে কমলের বুঝিতে বিলম্ব হইল না, কিন্তু এই অস্পষ্টতাকে সুস্পষ্ট করিয়া বেদনা দেওয়াও নিষ্প্রয়োজন।

আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, বুড়োকে সেবা করতে হবে না। এই অকর্মণ্য দেহটার দাম ত ভারী, এটাকে বয়ে বেড়াবার অজুহাতে আমি মানুষের কাছে ঋণ আর বাড়াবো না। কিন্তু কে জানত কমল, এই মাংস-পিণ্ডটাকে অবলম্বন করেও প্রশ্ন জটিল হয়ে উঠতে পারে। মনে হয় যেন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাই। এতবড় বিস্ময়ের ব্যাপারও যে জগতে ঘটে, এ কে কবে ভাবতে পেরেছে!

কমল সন্দেহে চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, নীলিমাদিদিকে দেখচি নে কেন কাকাবাবু, তিনি কোথায়?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় তাঁর ঘরেই আছেন—কাল সকাল থেকেই আর দেখতে পাইনি। শুনলাম হরেন্দ্র এসে তার বাসায় নিয়ে যাবে।

আশ্রম আর নেই। সতীশ চলে গেছে, কয়েকটি ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে গেছে। শুধু চার-

পাঁচজন ছেলেকে হরেন্দ্র ছেড়ে দেয়নি, তারাই আছে। এদের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই, এদের সে নিজের আইডিয়া দিয়ে নতুন করে গড়ে তুলবে এই তার কল্পনা। তুমি শোননি বুঝি? আর কার কাছেই বা শুনবে।

একটুখানি থামিয়া কহিতে লাগিলেন, পরশু সন্ধ্যা বেলায় ভদ্রলোকেরা চলে গেলে অসমাপ্ত চিঠিখানা শেষ করে নীলিমাকে পড়ে শোনালাম। ক'দিন থেকে সে সদাই যেন অন্যমনস্ক, বড় একটা দেখাও পাইনে। চিঠিটা ছিল আমার কলকাতার কর্মচারীর ওপর, আমার বিলেত যাবার সকল আয়োজন শীঘ্র সম্পূর্ণ করে ফেলবার তাগিদ। একটা নতুন উইলের খসড়া পাঠিয়েছিলাম,—হয়ত এই আমার শেষ উইল,—এটর্নিকে দেখিয়ে নাম সইয়ের জন্যে এটাও ফিরে পাঠাতে বলেছিলাম। অন্যান্য আদেশও ছিল। নীলিমা কি-একটা সেলাই করছিল, ভাল-মন্দ কোন সাড়া পাইনে দেখে মুখ তুলে চেয়ে দেখি তার হাতের সেলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে, মাথাটা চৌকির বাজুতে লুটিয়ে পড়েছে, চোখ বোজা, মুখখানা একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। কি যে হ'লো হঠাৎ ভেবে পেলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে মেঝেতে শোয়ালাম, গ্লাসে জল ছিল—চোখেমুখে ঝাপটা দিলাম, পাখার অভাবে খবরের কাগজটা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম,—চাকরটাকে ডাকতে গেলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। বোধ করি মিনিট দুই-তিনের বেশী নয়, সে চোখ চেয়ে শশব্যস্তে উঠে বসলো, একবার সমস্ত দেহটা তার কেঁপে উঠল, তারপরে উপুড় হয়ে আমার কোলের ওপর মুখ চেপে হুহু করে কেঁদে উঠল। সে কি কান্না! মনে হলো বুঝি তার বুক ফেটে যায় বা! অনেকক্ষণ পরে তুলে বসালাম,—কতদিনের কত কথা, কত ঘটনাই মনে পড়ল,—আমার বুঝতে কিছুই বাকী রইল না।

কমল নিঃশব্দে তাঁহার মুখের পানে চাহিল।

আশুবাবু একমুহূর্ত নিজেকে সংবরণ করিয়া বলিলেন, খুব সম্ভব মিনিট দুই-তিন। এ অবস্থায় তারে কি যে বলব আমি ভেবে পাবার আগেই নীলিমা তীরের মত উঠে দাঁড়াল, একবার চাইলেও না,—ঘর থেকে বার হয়ে গেল। না বললে সে একটা কথা না বললাম আমি। তার পরে আর দেখা হয়নি।

কমল জিজ্ঞাসা করিল, এ কি আপনি আগে বুঝতে পারেন নি?

আশুবাবু বলিলেন, না। স্বপ্নেও ভাবিনি। আর কেউ হলে সন্দেহ হতো এ শুধু ছলনা,—শুধু স্বার্থ। কিন্তু এঁর সম্বন্ধে এমন কথা ভাবাও অপরাধ। এ কি আশ্চর্য মেয়েদের মন! এই রোগাতুর জীর্ণদেহ, এই অক্ষম অবসন্নচিত্ত, এই জীবনের অপরাহ্ণ-বেলায় জীবনের দাম যার কানাকড়িও নয়, তারও প্রতি যে সুন্দরী যুবতীর মন আকৃষ্ট হতে পারে, এতবড় বিস্ময় জগতে কি আছে! অথচ, এ সত্য, এর এতটুকুও মিথ্যে নয়। এই বলিয়া এই সদাচারী প্রৌঢ় মানুষটি ক্ষোভে, বেদনায় ও অকপট লজ্জায় নিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি এই বুদ্ধিমতী নারী আমার কাছে কিছুই প্রত্যাশা করে না। ও শুধু চায় আমাকে যত্ন করতে, শুধু চায় সেবার অভাবে জীবনের নিঃসঙ্গ বাকী দিন-কটা যেন না আমার দুঃখে শেষ হয়। শুধু দয়া আর অকৃত্রিম করুণা!

কমল চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, বেলা বিবাহ-বিচ্ছেদের যখন মামলা আনে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। কথায় কথায় সেদিন এই প্রসঙ্গ উঠে পড়ায় নীলিমা অত্যন্ত রাগ করেছিল। তারপর থেকে বেলাকে ও যেন কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। নিজের স্বামীকে এমনি করে সর্বসাধারণের কাছে লজ্জিত অপদস্থ করে এই প্রতিহিংসার ব্যাপারটা নীলিমা কিছুতেই অন্তরে মেনে নিতে পারলে না। ও বলে, তাঁকে ত্যাগ করাটাই ত বড় নয়, তাঁকে ফিরে পাবার সাধনাই স্ত্রীর পরম সার্থকতা। অপমানের শোধ নেওয়াতেই স্ত্রীর সত্যকার মর্যাদা নষ্ট হয়, নইলে ও ত কষ্টিপাথর, ওতে যাচাই করেই ভালবাসার মূল্য ধার্য হয়। আর এ কেমনতর আত্মসম্মান-জ্ঞান? যাকে অসম্মানে দূর করেছি, তারই কাছে হাত পেতে নেওয়া নিজের খাওয়া-পরার দাম? কেন, গলায় দেবার দড়ি জুটলো না? শুনে আমি ভাবতাম নীলিমার এ অন্যায়,—এ

বাড়াবাড়ি। কিন্তু আজ ভাবি, ভালবাসায় পারে না কি? রূপ, যৌবন, সম্মান, সম্পদ কিছুই নয় মা, ক্ষমাটাই ওর সত্যিকার প্রাণ। ও যেখানে নেই, সেখানে ও শুধু বিড়ম্বনা। সেখানেই ওঠে রূপ-যৌবনের বিচার-বিতর্ক, সেখানেই আসে আত্মমর্যাদা-বোধের টগ্-অফ্-ওয়ার!

কমল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আশুবাবু বলিলেন, কমল, তুমিই ওর আদর্শ,—কিন্তু, চাঁদের আলো যেন সূর্য-কিরণকে ছাপিয়ে গেল। তোমার কাছে ও যা পেয়েছে, অন্তরের রসে ভিজিয়ে স্নিগ্ধমাধুর্যে কতদিকেই না ছড়িয়ে দিলে। এই দুটো দিনে আমি দু'শো বচ্ছরের ভাবনা ভেবেচি, কমল। স্ত্রীর ভালবাসা আমি পেয়েছিলাম, তার স্বাদ চিনি, স্বরূপ জানি, কিন্তু নারীর ভালবাসার সে কেবল একটিমাত্র দিক,—এই নতুন তত্ত্বটি আমাকে যেন হঠাৎ আচ্ছন্ন করেছে। এর কত ব্যাধা, কত ব্যথা, আপনাকে বিসর্জন দেবার কতই না অজানা আয়োজন। হাত পেতে নিতে পারলাম না বটে, কিন্তু কি বলে যে একে আজ নমস্কার জানাবো আমি ভেবেই পাইনে, মা।

কমল বুঝিল, পত্নী-প্রেমের সুদীর্ঘ ছায়া এতদিন যে-সকল দিক আঁধার করিয়া ছিল তাহাই আজ ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

আশুবাবু বলিলেন, ভাল কথা। মণিকে আমি ক্ষমা করেচি। বাপের অভিমানকে আর তাকে চোখ রাঙ্গাতে দেব না। জানি সে দুঃখ পাবেই, জগতের বিধিবদ্ধ শাসন তাকে অব্যাহতি দেবে না। অনুমতি দিতে ত পারব না, কিন্তু যাবার সময় এই আশীর্বাদটুকু রেখে যাবো, দুঃখের মধ্যে দিয়ে সে আপনাকে একদিন যেন আবার খুঁজে পায়। তার ভুল-ভ্রান্তি-ভালবাসা,—ভগবান তাদের যেন সুবিচার করেন। বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া আসিল।

এমনিভাবে অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। তাঁহার মোটা হাতটির উপর কমল ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অনেক পরে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু, নীলিমাদিদির সম্বন্ধে কি স্থির করলেন?

আশুবাবু অকস্মাৎ সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, কিসে যেন তাঁহাকে তুলিয়া দিল; বলিলেন, দেখ মা, তোমাকে আগেও বোঝাতে পারিনি, এখনো পারব না। হয়ত আজ আর সামর্থ্যও নেই। কিন্তু কখনো এ সংশয় আসেনি যে, একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ মানুষের সত্য আদর্শ নয়। নীলিমার ভালোবাসাকে সন্দেহ করিনি, কিন্তু সেও যেমন সত্য, তাকে প্রত্যাখ্যান করাও আমার তেমনি সত্যি। কোনমতেই একে নিষ্ফল আত্ম-বঞ্চনা বলতে পারব না। এ তর্কে মিলবে না, কিন্তু এই নিষ্ফলতার মধ্যে দিয়েই মানুষে এগিয়ে যাবে। কোথায় যাবে জানিনে, কিন্তু যাবেই। সে আমার কল্পনার অতীত, কিন্তু এতবড় ব্যথার দান মানুষে একদিন পাবেই পাবে। নইলে জগৎ মিথ্যে, সৃষ্টি মিথ্যে।

তিনি বলিতে লাগিলেন, এই যে নীলিমা—কোন মানুষেরই যে অমূল্য সম্পদ—কোথাও তার আজ দাঁড়াবার স্থান নেই। তার ব্যর্থতা আমার বাকী দিনগুলোকে শূলের মত বিঁধবে। ভাবি, সে আর যদি কাউকে ভালবাসত। এ তার কি ভুল!

কমল কহিল, ভুল-সংশোধনের দিন ত তার শেষ হয়ে যায়নি কাকাবাবু।

কি রকম? সে কি আবার কাউকে ভালবাসতে পারে তুমি মনে করো?

অন্ততঃ, অসম্ভব ত নয়। আপনার জীবনে যে এমন ঘটতে পারে তাই কি কখনো সম্ভব মনে করেছিলেন?

কিন্তু নীলিমা? তার মত মেয়ে?

কমল কহিল, তা জানিনে। কিন্তু যাকে পেলে না, পাওয়া যাবে না, তাকেই স্মরণ করে সারাজীবন ব্যর্থ নিরাশায় কাটুক এই কি তার জন্যে আপনি প্রর্থনা করেন?

আশুবাবুর মুখের দীপ্তি অনেকখানি মলিন হইয়া গেল। বলিলেন, না, সে প্রর্থনা করিনে। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝবে না, কমল; আমি যা পারি, তুমি তা পার না। সত্যের মূলগত সংস্কার তোমার এবং আমার জীবনের এক নয়, একান্ত বিভিন্ন।

এই জীবনটাকেই যারা মানব-আত্মার চরম প্রাপ্তি বলে জেনেছে তাদের অপেক্ষা করা চলে না,—balance of yarning—তৃষ্ণার শেষবিন্দু জল তাদের নিঃশেষে পান করে না নিলেই নয় ; কিন্তু অমারা জন্মান্তর মানি, প্রতীক্ষা করার সময় আমাদের অনন্ত,—উপুড় হয়ে শুষে খাবার প্রয়োজনই হয় না।

কমল শান্তকণ্ঠে কহিল, এ কথা মানি কাকাবাবু! কিন্তু, তাই বলে ত আপনার সংস্কারকে যুক্তি বলেও মানতে পারবেন না। আকাশকুসুমের আশায় বিধাতার দোরে হাত পেতে জন্মান্তরকাল প্রতীক্ষা করবারও আমার ধৈর্য থাকবে না। যে জীবনকে সবার মাঝখানে সহজ-বুদ্ধিতে পাই, এই আমার সত্য, এই আমার মহৎ। ফুলে-ফলে শোবায়-সম্পদে এই জীবনটাই যেন আমার আমার ভরে ওঠে, পরকালের বৃহত্তর লাভের আশায় ইহকালকে যেন না আমি অবহেলায় অপমান করি। কাকাবাবু, এমনি করেই আপনারা আনন্দ থেকে সৌভাগ্য থেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত। ইহকালকে তুচ্ছ করেছেন বলে ইহকালও আপনাদের সমস্ত জগতের কাছে আজ তুচ্ছ করে দিয়েছে। নীলিমাদিদির দেখা পাবো কিনা জানিনে, যদি পাই তাঁকে এই কথাই বলে যাবো।

কমল উঠিয়া দাঁড়াইল। আশুবাবু সহসা জোর করিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিলেন—যাচ্চো মা? কিন্তু তুমি যাবে মনে হলেই বুকের ভিতরটা যেন হাহাকার করে ওঠে।

কমল বসিয়া পড়িল, বলিল, কিন্তু আপনাকে ত আমি কোন দিক থেকেই ভরসা দিতে পারিনে। দেহে-মনে যখন আপনি অত্যন্ত পীড়িত, সান্ত্বনা দেওয়াই যখন সবচেয়ে প্রয়োজন, তখন সকল দিক দিয়েই আমি যেন কেবলি আঘাত দিতে থাকি। তবুও কারও চেয়ে আপনাকে আমি কম ভালবাসি নে কাকাবাবু।

আশুবাবু নীরবে স্বীকার করিয়া বলিলেন, তা ছাড়া নীলিমা,—এই কি সহজ বিস্ময়! কিন্তু এর কারণ কি জানো কমল?

কমল স্মিত-মুখে কহিল, বোধ হয় আপনার মধ্যে চোরাবালি নেই, তাই। চোরাবালি নিজের দেহেরও ভার বইতে পারে না, পায়ের তলা থেকে আপনাকে সরিয়ে দিয়ে আপনাকেই ডোবায়। কিন্তু নিরেট মাটি লোহা-পাথরেরও বোঝা বয়, ইমারত গড়া তার ওপরেই চলে। নীলিমাদিদিকে সব মেয়েতে বুঝবে না, কিন্তু নিজেকে নিয়ে খেলা করবার যাদের দিন গেছে, মাথার ভার নাবিয়ে দিয়ে যারা এবারের মত সহজ নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে চায়, তারা ওকে বুঝবে।

হুঁ, বলিয়া আশুবাবু নিজেই নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, শিবনাথ?

কমল কহিল, যেদিন থেকে তাঁকে সত্যি করে বুঝেচি, সেদিন থেকে ক্ষোভ-অভিমান আমার মুছে গেছে—জ্বালা নিবেচে। শিবনাথ গুণী, শিল্পী,—শিবনাথ কবি। চিরস্থায়ী প্রেম ওদের পথের বাধা, সৃষ্টির অন্তরায়, স্বভাবের পরম বিঘ্ন। এই কথাই ত তাদের সুমুখে দাঁড়িয়ে সেদিন বলতে চেয়েছিলাম। মেয়েরা শুধু উপলক্ষ্য,—নইলে, ওরা ভালবাসে কেবল নিজেকে। নিজের মনটাকে দুভাগ করে নিয়ে চলে এদের দুদিনের লীলা, তারপরে সেটা ফুরোয় বলেই সুর গলায় ওদের এমন বিচিত্র হয়ে বাজে, নইলে বাজতো না, শুকিয়ে জমাট হয়ে যেতো। আমি ত জানি, শিবনাথ ওকে ঠকায় নি, মণি আপনি ভুলেছে। সূর্যাস্ত-বেলায় মেঘের গায়ে যে রঙ ফোটে কাকাবাবু সে স্থায়ীও নয়, সে তার আপন বর্ণও নয়। কিন্তু তাই বলে তাকে মিথ্যে বলবে কে?

আশুবাবু বলিলেন, সে জানি, কিন্তু রঙ নিয়েও মানুষের দিন চলে না, মা, উপমা নয়, দিয়েও তার ব্যথা ঘোচে না। তার কি বল ত?

কমলের মুখ ক্লান্তিতে মলিন হইয়া আসিল, কহিল, তাই ত ঘুরে ঘুরে একটা প্রশ্নই বারে বারে আসচে কাকাবাবু, শেষ আর হচ্চে না। বরঞ্চ, যাবার সময় আপনার ওই আশীর্বাদটুকুই রেখে যান, মণি যেন দুঃখের মধ্যে দিয়ে আবার নিজেকে খুঁজে পায়। যা ঝরবার তা ঝরে গিয়ে সেদিন যেন ও নিঃসংশয়ে আপনাকে চিনতে পারে। আর আপনাকেও বলি, সংসারে অনেক ঘটনার মধ্যে বিবাহটাও একটা ঘটনা,—তার বেশী নয় ; ওটাকেই নারীর সর্বস্ব বলে যেদিন মেনে নিয়েছেন, সেইদিনই শুরু হয়েছে মেয়েদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি। দেশান্তরে যাবার

পূর্বে নিজের মনের এই মিথ্যের শেকল থেকে নিজের মেয়েকে মুক্তি দিয়ে যান, কাকাবাবু, এই আমার আপনার কাছে শেষ মিনতি।

হঠাৎ দ্বারের কাছে পদশব্দ শুনিয়া উভয়েই চাহিয়া দেখিল। হরেন্দ্র প্রবেশ করিয়া কহিল, বৌঠাকরুনকে আমি নিয়ে যেতে এসেচি, আশুবাবু, উনি প্রস্তুত হয়েছেন, আমি গাড়ি আনতে পাঠিয়েচি।

আশুবাবুর মুখ পাংশু হইয়া গেল, কহিলেন, এখুনি? কিন্তু বেলা ত নেই?

হরেন্দ্র বলিল, দশ-বিশ ক্রোশ দূর নয়, মিনিট-পাঁচেকেই পৌঁছে যাবেন।

তাঁহার মুখ যেমন গম্ভীর, কথাও তেমনি নীরস।

আশুবাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তা বটে। কিন্তু সন্ধ্যা হয়,—আজ কি না গেলেই নয়?

হরেন্দ্র পকেট হইতে একটুকরা কাগজ বাহির করিয়া কহিল, আপনিই বিচার করুন। উনি লিখেছেন, "ঠাকুরপো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে যাবার উপায় যদি না করতে পার আমাকে জানিও। কিন্তু কাল বলো না যে আমাকে জানান নি কেন?—নীলিমা।"

আশুবাবু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

হরেন্দ্র বলিল, নিকট-আত্মীয় বলে আমি দাবি করতে পারিনে, কিন্তু ওঁকে ত আপনি জানেন, এ চিঠির পরে বিলম্ব করতেও আর ভরসা হয় না।

তোমার বাসাতেই ত থাকবেন?

হাঁ,—অন্ততঃ, এর চেয়ে সুব্যবস্থা যতদিন না হয়। ভাবলাম, এ-বাড়িতে এতদিন যদি ওঁর কেটে থাকে ও-বাড়িতেও দোষ হবে না।

আশুবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। এ কথা বলিলেন না যে এতকাল এ সুযুক্তি ছিল কোথায়? বেহারা ঘরে ঢুকিয়া জানাইল, মেমসাহেবের জিনিসপত্রের জন্য ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের কুঠি হইতে লোক আসিয়াছে।

আশুবাবু বলিলেন, তাঁর যা-কিছু আছে দেখিয়ে দাও গে।

কমলের চোখের প্রতি চোখ পড়িতে কহিলেন, কাল সকালে এ বাড়ি থেকে বেলা চলে গেছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী ওঁর বান্ধবী। একটা সুখবর তোমাকে দিতে ভুলেছি কমল। বেলার স্বামী এসেছেন নিতে,—বোধ হয় ওঁদের একটা reconciliation হলো।

কমল কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না ; শুধু কহিল, কিন্তু এখানে এলেন না যে?

আশুবাবু বলিলেন, বোধ হয় আত্মগরিমায় বাধলো। যখন বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করার মামলা ওঠে, তখন বেলার বাবার চিঠির উত্তরে আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। ওর স্বামী সেটা ক্ষমা করতে পারেনি।

আপনি সম্মতি দিয়েছিলেন?

আশুবাবু বলিলেন, এতে আশ্চর্য হচ্চ কেন কমল? চরিত্র-দোষে যে স্বামী অপরাধী, তাকে ত্যাগ করায় আমি অন্যায় দেখিনে। এ অধিকার কেবল স্বামীর আছে, স্ত্রীর নেই এমন কথা আমি মানতে পারিনে।

কমল নির্বাক হইয়া রহিল। তাঁহার চিন্তার মধ্যে যে কাপট্য নাই—অন্তর ও বাহির একই সুরে বাঁধা—এই কথাটাই আর একবার তাহার স্মরণ হইল।

নীলিমা দ্বারের নিকট হইতে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেল। ঘরেও ঢুকিল না, কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখিল না।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কমল তেমনি ভাবেই তাঁহার হাতের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল, কথাবার্তা কিছুই হইল না। যাবার পূর্বে আস্তে আস্তে বলিল, শুধু যদু ছাড়া এ বাড়িতে পুরনো কেউ আর রইল না।

যদু?

হাঁ, আপনার পুরনো চাকর।

কিন্তু সে ত নেই মা। তার ছেলের অসুখ, দিন-পাঁচেক হলো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে। রাজেন ছেলেটির কোন খবর জানো কমল?

না, কাকাবাবু।

যাবার আগে তাকে একবার দেখবার ইচ্ছে হয়। তোমরা দুটিতে যেন ভাই-বোন, যেন একই গাছের দুটি ফুল। এই বলিয়া তিনি চুপ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন কথাটা মনে পড়িল, বলিলেন, তোমাদের যেন মহাদেবের দারিদ্র্য। টাকাকড়ি, ঐশ্বর্য-সম্পদ অপরিমিত, কোথায় যেন অন্যমনস্কে সে-সব ফেলে এয়েচ। খুঁজে দেখবারও গরজ নেই,—এমনি তাচ্ছিল্য।

কমল সহাস্যে কহিল, সে কি কাকাবাবু! রাজেনের কথা জানিনে, কিন্তু আমি দু'পয়সা পাবার জন্যে দিনরাত কত খাটি।

আশুবাবু বলিলেন, সে শুনতে পাই। তাই, বসে বসে ভাবি।

ফিরিতে কমলের বিলম্ব হইল। যাবার সময় আশুবাবু বলিলেন, ভয় নেই মা, যে আমাকে কখনো ছেড়ে থাকবে না নিরুপায়ের উপায় সে করবেই। এই বলিয়া তিনি সুমুখের দেওয়ালে টাঙ্গানো লোকান্তরিতা পত্নীর ছবিটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন।

কমল বাসায় পৌঁছিয়া দেখিল, সহজে উপরে যাইবার জো নাই, রাশিকৃত বাক্স-তোরঙ্গে সিঁড়ির মুখটা রুদ্ধপ্রায়। বুকের ভিতরটায় ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কোনমতে একটু পথ করিয়া উপরে গিয়া শুনিল, পাশের রান্নাঘরে কলরব হইতেছে ; উঁকি মারিয়া দেখিল, অজিত হিন্দুস্থানী মেয়েলোকটির সাহায্যে স্টোভে জল চড়াইয়াছে, এবং চা চিনি প্রভৃতির সন্ধানে ঘরের চতুর্দিকে আতিপাতি করিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

এ কি কাণ্ড?

অজিত চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল,—চা-চিনি কি তুমি লোহার সিন্দুকে বন্ধ করে রাখ না কি? জলটা ফুটে ফুটে যে প্রায় নষ্ট হয়ে এলো।

কিন্তু আমার ঘরের মধ্যে আপনি খুঁজে পাবেন কেন? সরে আসুন, আমি তৈরি করে দিচ্চি।

অজিত সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কমল কহিল, কিন্তু এ কি ব্যাপার? বাক্স-তোরঙ্গ, পোঁটলা-পুঁটলি, এ-সব কার?

আমার। হরেনবাবু নোটিশ দিয়েছেন।

দিলেও যাবারই নোটিশ দিয়েচেন। এখানে আসবার বুদ্ধি দিলে কে?

এটা নিজের। এতদিন পরের বুদ্ধিতেই দিন কেটেছে, এবার নিজের বুদ্ধি খুঁজে বের করেছি।

কমল কহিল, বেশ করেছেন। কিন্তু ওগুলো কি নীচেই পড়ে থাকবে? চুরি যাবে যে।

শুনিয়া অজিত ব্যস্ত হইয়া উঠিল,—যায়নি ত? একটা চামড়ার বাক্সে অনেকগুলো টাকা আছে।

কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল, খুব ভাল। এক জাতের মানুষ আছে তারা আশি বচ্ছরে সাবালক হয় না। তাদের মাথার ওপর অভিভাবক একজন চাই-ই। এ ব্যবস্থা ভাগবান কৃপা করে করেন। চা থাক, নীচে আসুন। ধরাধরি করে তোলবার চেষ্টা করা যাক।

সাতাশ

বাড়িয়ালা এইমাত্র পুরা-মাসের ভাড়া চুকাইয়া লইয়া গেল। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্রের মাঝখানে, বিশৃঙ্খল কক্ষের একধারে ক্যাম্বিশের ইজিচেয়ারে অজিত চোখ বুজিয়া শুইয়া। মুখ শুষ্ক, দেখিলেই বোধ হয় চিন্তাগ্রস্ত মনের মধ্যে সুখের লেশমাত্র নাই। কমল বাঁধা-ছাঁদা জিনিসগুলার ফর্দ মিলাইয়া কাগজে টুকিয়া রাখিতেছিল। স্থানত্যাগের আসন্নতায় কাজের মধ্যে তাহার চঞ্চলতা নাই,—যেন প্রাত্যহিক নিয়মিত ব্যাপার। কেবল একটুখানি যেন বেশী নীরব।

সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ আসিল হরেন্দ্রর নিকট হইতে। লোকের হাতে নয়,—ডাকে। অজিত চিঠিখানি পড়িল। আশুবাবুর বিদায়-উপলক্ষে এই আয়োজন। পরিচিত অনেককেই আহ্বান করা হইয়াছে। নীচের এক কোণে ছোট্ট করিয়া লেখা, কমল, নিশ্চয় এসো ভাই। —নীলিমা।

অজিত সেইটুকু দেখাইয়া প্রশ্ন করিল, যাবে নাকি?

যাবো বৈ কি। নিমন্ত্রণ জিনিসটা তুচ্ছ করতে পারি আমার এত দর নয়। কিন্তু তুমি?

অজিত দ্বিধার স্বরে বলিল, তাই ভাবচি। আজ শরীরটা তেমন—

তবে, কাজ নেই গিয়ে।

অজিতের চোখে তখনো চিঠির পরে ছিল। নইলে কমলের ঠোঁটের কোণে কৌতুক-হাস্যের রেখাটুকু নিশ্চয় দেখিতে পাইত।

যেমন করিয়াই হোক, বাঙালী-মহলে খবরটা জানাজানি হইয়াছে যে উভয়ে আগ্রা ছাড়িয়া যাইতেছে। কিন্তু কিভাবে ও কোথায়, এ সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল এখনো সুনিশ্চিত মীমাংসায় পৌঁছে নাই। অকালের মেঘের মত কেবলি আন্দাজ ও অনুমানে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অথচ জানা কঠিন ছিল না,—কমলকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানা যাইতে পারিত তাহাদের গম্যস্থানটা আপাততঃ অমৃতসর। কিন্তু এটা কেহ ভরসা করে নাই।

অজিতের বাবা ছিলেন গুরুগোবিন্দের পরম ভক্ত। তাই শিখেদের মহাতীর্থ অমৃতসরে তিনি খালসা কলেজের কাছাকাছি মাঠের মধ্যে একটা বাঙলো-বাড়ি তৈরি করাইয়াছিলেন। সময় ও সুবিধা পাইলেই আসিয়া বাস করিয়া যাইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বাড়িটা ভাড়ায় খাটিতেছিল, সম্প্রতি খালি হইয়াছে; এই বাটীতেই দু'জনে কিছুকাল বাস করিবে। মালপত্র যাইবে লরিতে, এবং পরে শেষরাত্রে মোটরে করিয়া উভয়ে রওনা হইবে। সেই প্রথম দিনের স্মৃতি,—এটা কমলের অভিলাষ।

অজিত কহিল, হরেন্দ্রর ওখানে তুমি কি একা যাবে নাকি?

যাই না। আশ্রমের দোর ত তোমার খোলাই রইল, যবে খুশি দেখা করে যেতে পারবে। কিন্তু আমার ত সে আশা নেই,—শেষ দেখা দেখে আসি গে,—কি বল?

অজিত চুপ করিয়া রহিল। স্পষ্টই দেখিতে পাইল, সেথায় নানা ছলে বহু তীক্ষ্ণ ও তিক্ত ইঙ্গিতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইশারায় আজ শুধু একটিমাত্র দিকেই ছুটিতে থাকিবে, ইহারই সম্মুখে এই একাকিনী রমণীকে পরিত্যাগ করার মত কাপুরুষতা আর কিছু হইতেই পারে না। কিন্তু সঙ্গী হইবার সাহস নাই, নিষেধ করাও তেমনি কঠিন।

নূতন গাড়ি কেনা হইয়া আসিয়াছে, সন্ধ্যার কিছু পরে সোফার কমলকে লইয়া চলিয়া গেল।

হরেন্দ্রের বাসায় দ্বিতলের সেই হল-ঘরটায় নূতন দামী কার্পেট বিছাইয়া অতিথিদের স্থান করা হইয়াছে। আলো জ্বলিতেছে অনেকগুলা, কোলাহলও কম হইতেছে না। মাঝখানে আশুবাবু; ও তাঁহাকে ঘিরিয়া জন-কয়েক ভদ্রলোক। বেলা আসিয়াছেন, এবং আরও একটি মহিলা আসিয়াছেন—তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের পত্নী মালিনী। কে-একটি ভদ্রলোক এদিকে পিছন ফিরিয়া তাঁহাদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। নীলিমা নাই, খুব সম্ভব অন্যত্র কাজে নিযুক্ত।

হরেন্দ্র ঘরে ঢুকিল এবং ঘরে ঢুকিয়াই চোখে পড়িল এদিকের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া কমল। সবিস্ময়ে কলস্বরে সংবর্ধনা করিল,—কমল যে? কখন এলে? অজিত কৈ?

সকলের দৃষ্টি একাগ্র হইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। কমল দেখিল, যে ব্যক্তি মহিলাদের সহিত আলাপ করতেছিলেন তিনি আর কেহ নহেন, স্বয়ং অক্ষয়। কিঞ্চিৎ শীর্ণ। ইনফ্লুয়েঞ্জা এড়াইয়াছেন, কিন্তু দেশের ম্যালেরিয়াকে পাশ কাটাইতে পারেন নাই। ভালই হইল যে তিনি ফিরিয়াছেন, নইলে শেষ দেখার হয়ত আর সুযোগ ঘটিত না। দুঃখ থাকিয়া যাইত।

কমল বলিল, অজিতবাবু আসেন নি,—শরীরটা ভাল নয়। আমি এসেছি অনেকক্ষণ।

অনেকক্ষণ? ছিলে কোথায়?

নীচে। ছেলেদের ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। দেখছিলাম, ধর্মকে ত ফাঁকি দিলেন, কর্মকেও ঐ সঙ্গে ফাঁকি দিলেন কি না? এই বলিয়া সে হাসিয়া ঘরে আসিয়া বসিল।

সে যেন বর্ষায় বন্য-লতা। পরের প্রয়োজনে নয়, আপন প্রয়োজনেই আত্মরক্ষার সকল সঞ্চয় লইয়া যেন মাটি ফুঁড়িয়া ঊর্ধ্বে মাথা তুলিয়াছে। পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধতার ভয়ও নাই, ভাবনাও

নাই,—যেন কাঁটার বেড়া দিয়া বাঁচানোর প্রশ্নই বাহুল্য। ঘরে আসিয়া বসিল,—কতটুকুই বা! তথাপি মনে হইল যেন রূপে, রসে, গৌরবে স্বকীয় মহিমার একটি স্বচ্ছন্দ আলো সে সকল জিনিসেই ছড়াইয়া দিল।

ঠিক এই ভাবটিই প্রকাশিত হইল হরেন্দ্রের কথায়। আর দুটি নারীর সম্মুখে শালীনতায় হয়ত কিছু ত্রুটি ঘটিল, কিন্তু আবেগভরে বলিয়া ফেলিল,—এতক্ষণে মিলন-সভাটি আমাদের সম্পূর্ণ হলো। কমল ছাড়া ঠিক এমনি কথাটি আর কেউ বলতে পারতো না।

অক্ষয় কহিল, কেন? দর্শন-শাস্ত্রের কোন্ সূক্ষ্ম তত্ত্বটি এতে পরিস্ফুট হলো শুনি?

কমল সহাস্যে হরেন্দ্রকে কহিল, এবার বলুন? দিন এর জবাব?

হরেন্দ্র এবং অনেকেই মুখ ফিরাইয়া বোধ হয় হাসি গোপন করিল।

অক্ষয় নীরস-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি কমল, আমাকে চিনতে পার ত?

আশুবাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুমি পারলেই হলো। চিনতে তুমি পারচ ত অক্ষয়?

কমল কহিল, প্রশ্নটি অন্যায় আশুবাবু। মানুষ-চেনা ওঁর নিজস্ব বৃত্তি। ওখানে সন্দেহ করা ওঁর পেশায় ঘা দেওয়া।

কথাটি এমন করিয়া বলিল যে, এবার আর কেহ হাসি চাপিতে পারিল না, কিন্তু পাছে এই দুঃশাসন লোকটি প্রত্যুত্তরে কুৎসিত কিছু বলিয়া বসে, এই ভয়ে সবাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। আজিকার দিনে অক্ষয়কে আহ্বান করার ইচ্ছা হরেন্দ্রর ছিল না, কিন্তু সে বহুদিন পরে ফিরিয়াছে, না বলিলে অতিশয় বিশ্রী দেখাইবে ভাবিয়াই নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সভয়ে, সবিনয়ে কহিল, আমাদের এই শহর থেকে, হয়ত বা এদেশ থেকেই আশুবাবু চলে যাচ্চেন; ওঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে-কোন মানুষেরই ভাগ্যের কথা। সেই সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। আজ ওঁর দেহ অসুস্থ, মন অবসন্ন, আজ যেন আমরা সহজ সৌজন্যের মধ্যে ওঁকে বিদায় দিতে পারি।

কথা-কয়টি সামান্য, কিন্তু ওই শান্ত, সহৃদয় প্রৌঢ় ব্যক্তিটির মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিল।

আশুবাবু সঙ্কোচ বোধ করিলেন। বাক্যালাপ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া না প্রবর্তিত হয় এই আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি নিজেই অন্য কথা পাড়িলেন, বলিলেন, অক্ষয় খবর পেয়েছ বোধ হয় হরেন্দ্রর ব্রহ্মচর্য আশ্রমটা আর নেই। রাজেন্দ্র আগেই বিদায় নিয়েছিলেন, সেদিন সতীশও গেছেন। যে-ক'টি ছেলে বর্তমানে আছে, হরেন্দ্রর অভিলাষ জগতের সোজা-পথেই তাদের মানুষ করে তোলেন। তোমরা সকলে অনেকদিন অনেক কথাই বলেছ, কিন্তু ফল হয়নি। তোমাদের কর্তব্য কমলকে ধন্যবাদ দেওয়া।

অক্ষয় অন্তরে জ্বলিয়া গিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, শেষকালে ফল ফলল বুঝি ওর কথায়? কিন্তু যাই বলুন আশুবাবু, আমি আশ্চর্য হয়ে যাইনি। এইটি অনেক পূর্বেই অনুমান করেছিলাম।

হরেন্দ্র কহিল, করবেনই ত। মানুষ চেনাই যে আপনার পেশা।

আশুবাবু বলিলেন, তবুও আমার মনে হয় ভাঙবার প্রয়োজন ছিল না। সকল ধর্ম্মমতই ত মূলতঃ এক, সিদ্ধিলাভের জন্য এ কেবল কতকগুলি প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে চলা। যারা মানে না বা পারে না, তারা না-ই পারল, কিন্তু পারার অধ্যবসায় যাদের আছে তাদের নিরুৎসাহ করেই বা লাভ কি? কি বল অক্ষয়?

অক্ষয় কহিল, নিশ্চয়।

কমলের দিকে চাহিতেই সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, আপনার ত এ দৃঢ় বিশ্বাসের কথা হলো না আশুবাবু, বরঞ্চ, হলো অবিশ্বাস অবহেলার কথা। এমন করে ভাবতে পারলে আমিও আশ্রমের বিরুদ্ধে একটা কথাও কখনো বলতাম না। কিন্তু তা ত নয়—আচার-অনুষ্ঠানই যে মানুষের ধর্মের চেয়েও বড়,—যেমন বড় রাজার চেয়ে রাজার কর্মচারীর দল।

আশুবাবু সহাস্যে কহিলেন, তা যেন হলো, কিন্তু তাই বলে কি তোমার উপমাকেই যুক্তি

বলে মেনে নেবো?

কমল পরিহাস যে করে নাই তাহার মুখ দেখিয়াই বুঝা গেল। কহিল, শুধুই কি এ উপমা আশুবাবু, তার বেশী নয়? সকল ধর্মই যে আসলে এক, এ আমি মানি। সর্বকালে, সর্বদেশে ও-সেই এক অজ্ঞেয় বস্তুর অসাধ্য সাধনা। মুঠোর মধ্যে ওকে ত পাওয়া যায় না। আলো-বাতাস নিয়ে মানুষের বিবাদ নেই, বিবাদ বাধে অন্নের ভাগাভাগি নিয়ে,—যাকে আয়ত্তে পাওয়া যায়, দখল করে বংশধরের জন্যে রেখে যাওয়া চলে। তাই ত জীবনের প্রয়োজনে ও ঢের বড় সত্যি। বিবাহের মূল উদ্দেশ্য যে সকল ক্ষেত্রেই এক, এ ত সবাই জানে, কিন্তু তাই বলে কি মানতে পারে? আপনিই বলুন না অক্ষয়বাবু, ঠিক কি না। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল।

ইহার নিহিত অর্থ সবাই বুঝিল। ক্রুদ্ধ অক্ষয় কঠোর কিছু একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু কথা খুঁজিয়া পাইল না।

আশুবাবু বলিলেন, অথচ তোমারই যে কমল, সকল আচার-অনুষ্ঠানেই ভারী অবজ্ঞা, কিছুই যে মানতে চাও না? তাই ত তোমাকে বোঝা এত শক্ত।

কমল বলিল, কিছুই শক্ত নয়। একটিবার সামনের পর্দাটা সরিয়ে দিন, আর কেউ না বুঝুক, আপনার বুঝতে বিলম্ব হবে না। নইলে, আপনার স্নেহই বা আমি পেতাম কি করে? মাঝখানে কুয়াশার আড়াল যে নেই তা নয়, কিন্তু তবু ত পেলাম। আমি জানি, আপনার ব্যথা লাগে, কিন্তু আচার-অনুষ্ঠানকে মিথ্যে বলে আমি উড়িয়ে দিতে ত চাইনে, চাই শুধু এর পরিবর্তন। কালের ধর্মে আজ যা অচল, আঘাত করে তাকে সচল করতেই চাই। এই যে অবজ্ঞা, মূল্য এর জানি বলেই ত। মিথ্যে বলে জানলে মিথ্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মিথ্যে-শ্রদ্ধায় সকলের সঙ্গে সারাজীবন মেনে মেনেই চলতাম—একটুও বিদ্রোহ করতাম না।

একটু থামিয়া কহিল, ইউরোপের সেই রেনেশাঁসের দিনগুলো একবার মনে করেদেখুন দিকি। তারা সব করতে গেল নতুন সৃষ্টি, শুধু হাত দিলে না আচার-অনুষ্ঠানে। পুরনোর গায়ে টাটকা রঙ মাখিয়ে তলে তলে দিতে লাগল তার পূজো, ভেতরে গেল না শেকড়, শখের ফ্যাশন গেল দু'দিনে মিলিয়ে। ভয় ছিল আমার হরেনবাবুর উচ্চ অভিলাষ যায় বা বুঝি এমনি করেই ফাঁকা হয়ে। কিন্তু আর ভয় নেই, উনি সামলেছেন। এই বলিয়া সে হাসিল।

এ হাসিতে হরেন্দ্র যোগ দিতে পারিল না, গম্ভীর হইয়া রহিল। কাজটা সে করিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্তরে ঠিকমত আজও সায় পায় না, মনের মধ্যেটা রহিয়া রহিয়া ভারী হইয়া উঠে। কহিল, মুশকিল এই যে, তুমি ভগবান মানো না, যুক্তিতেও বিশ্বাস কর না। কিন্তু যারা তোমার ওই অজ্ঞেয় বস্তুর সাধনায় রত, ওর তত্ত্ব-নিরূপণে ব্যগ্র, তাদের কঠিন নিয়ম ও কঠোর আচার-পালনের মধ্যে দিয়ে পা না ফেললেই নয়। আশ্রম তুলে দেওয়ায় আমি অহঙ্কার করিনে। সেদিন যখন ছেলেদের নিয়ে সতীশ চলে গেল আমি নিজের দুর্বলতাই অনুভব করেছি।

তা হলে ভাল করেন নি হরেনবাবু। বাবা বলতেন, যাদের ভগবান যত সূক্ষ্ম, যত জটিল, তারাই মরে তত বেশী জড়িয়ে। যাদের যত স্থূল, যত সহজ, তারাই থাকে কিনারার কাছে। এ যেন লোকসানের কারবার। ব্যবসা হয় যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক, ক্ষতির পরিমাণ ততই চলে বেড়ে। তাকে গুটিয়ে ছোট করে আনলেও লাভ হয় না বটে, কিন্তু লোকসানের মাত্রা কমে। হরেনবাবু, আপনার সতীশের সঙ্গে আমি কথা কয়ে দেখেচি। আশ্রমে বহুবিধ প্রাচীন নিয়মের তিনি প্রবর্তন করেছিলেন, তাঁর সাধ ছিল সে-যুগে ফিরে যাওয়া। ভাবতেন, দুনিয়ার বয়স থেকে হাজার-দুই বছর মুছে ফেললেই আসবে পরম লাভ। এমনি লাভের ফন্দি এঁটেছিল একদিন বিলাতের পিউরিটান একদল। ভেবেছিল, আমেরিকায় পালিয়ে গিয়ে সতেরো শতাব্দী ঘুচিয়ে দিয়ে নির্ঝঞ্ঝাটে গড়ে তুলবে বাইবেলের সত্যযুগ। তাদের লাভের হিসাবের অঙ্ক জানে আজ অনেকে, জানে না শুধু মঠধারীর দল যে, বিগত দিনের দর্শন দিয়ে চলে যখন বর্তমানের বিধি-বিধানের সমর্থন, তখনই আসে সত্যিকারের ভাঙ্গার দিন। হরেনবাবু, আপনার আশ্রমের ক্ষতি হয়ত করেচি কিন্তু ভাঙ্গা আশ্রমে বাকী রইলেন যাঁরা তাদের ক্ষতি করিনি।

পিউরিটানদের কাহিনী জানিত অক্ষয়,—ইতিহাসের অধ্যাপক। সবাই চুপ করিয়া রহিল. এবার সে-ই শুধু ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া সায় দিল।

আশুবাবু বলিতে গেলেন, কিন্তু সে-যুগের ইতিহাসে যে উজ্জ্বল ছবি—

কমল বাধা দিল,—যত উজ্জ্বল হোক, তবু সে ছবি, তার বড় নয়। এমন বই সংসারে আজও লেখা হয়নি আশুবাবু, যার থেকে তার সমাজের যথার্থ প্রাণের সন্ধান মেলে। আলোচনায় গর্ব করা চলে, কিন্তু বই মিলিয়ে সমাজ গড়া চলে না। শ্রীরামচন্দ্রের যুগকেও না, যুধিষ্ঠিরের যুগকেও না। রামায়ণ-মহাভারতে যত কথাই লোক থাক, তার শ্লোক হাতড়ে সাধারণ মানুষের দেখাও মিলবে না, এবং মাতৃ-জঠর যত নিরাপদই হোক, তাতে ফিরে যাওয়াও যাবে না। পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতি নিয়েই ত মানুষ। তারা যে আপনার চারিদিকে। কম্বল মুড়ি দিয়ে কি বায়ুর চাপকে ঠেকানো যায়?

বেলা ও মালিনী নিঃশব্দে শুনিতেছিল। ইহার সম্বন্ধে বহু জনশ্রুতিই তাহাদের কানে গেছে, কিন্তু আজ মুখোমুখি বসিয়া এই পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় মেয়েটির বাক্যের নিঃসংশয় নির্ভরতা দেখিয়া বিস্ময় মানিল।

পরক্ষণে ঠিক এই ভাবটিই আশুবাবু প্রকাশ করিলেন। আস্তে আস্তে বলিলেন, তর্কে যাই কেন বলি না কমল, তোমার অনেক কথাই স্বীকার করি। যা পারিনে, তাকেও অন্তরে অবজ্ঞা করিনে। এই গৃহেই মেয়েদের দ্বার রুদ্ধ ছিল, শুনেচি, একদিন তোমাকে আহ্বান করায় সতীশ স্থানটাকে কলুষিত জ্ঞান করেছিল, কিন্তু আজ আমরা সবাই আমন্ত্রিত, কারও আসায় বাধা নেই—

একটি ছেলে কবাটের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে পরিচ্ছন্ন ভদ্র পোশাক, মুখে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির আভাস ; কহিল, দিদি বললেন, খাবার তৈরি হয়ে গেছে, ঠাঁই হবে?

অক্ষয় বলিল, হবে বৈ কি হে! বল গে, রাতও ত হলো।

ছেলেটি চলিয়া গেলে হরেন্দ্র কহিল, বৌঠাকরুন আসা পর্যন্ত খাবার চিন্তাটা আর কারুকে করতে হয় না। ওঁর ত কোথাও জায়গা ছিল না,—কিন্তু সতীশ রাগ করে চলে গেল।

আশুবাবুর মুখ মুহূর্তের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

হরেন্দ্র বলিতে লাগিল, অথচ সতীশেরও অন্য উপায় ছিল না। সে ত্যাগী, ব্রহ্মচারী,—এ সম্পর্কে তার সাধনার বিঘ্ন। কিন্তু আমারই যে সত্যিই কোন্ কাজটা ভাল হলো সব সময়ে ভেবে পাইনে।

কমল অকুণ্ঠিত-স্বরে বলিল, এই কাজটাই হরেনবাবু, এই কাজটাই। সংযম যখন সহজ না হয়ে অপরকে আঘাত করে তখনই সে হয় দুর্বহ। এই বলিয়া সে পলকের জন্য আশুবাবুর প্রতি চাহিল,—হয়ত কি একটা গোপন ইঙ্গিত ছিল, কিন্তু হরেন্দ্রকেই পুনশ্চ বলিল, ওরা নিজেকেই টেনে টেনে বাড়িয়ে ওদের ভগবানকে সৃষ্টি করে। তাই ওদের ভগবানের পুজো বারে বারেই ঘাড় হেঁট করে আত্মপুজোয় নেমে আসে। এ-ছাড়া ওদের পথ নেই। মানুষ ত শুধু কেবল নরও নয়, নারীও নয়,—এ দুয়ে মিলেই তবে সে এক। এই অর্ধেককে বাদ দিয়ে যখনি দেখি সে নিজেকে বৃহৎ করে পেতে চায়, তখনি দেখি সে আপনাকেও পায় না, ভগবানকেও ক্ষোয়ায়। সতীশবাবুদের জন্যে দুশ্চিন্তা রাখবেন না, হরেনবাবু, ওঁদের সিদ্ধি স্বয়ং ভগবানের জিম্মায়।

সতীশকে প্রায় কেহই দেখিতে পারিত না, তাই শেষ কথাটায় সবাই হাসিল। আশুবাবুও হাসিলেন, কিন্তু বলিলেন, আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রের একটা বড় কথা আছে কমল—আত্মদর্শন। অর্থাৎ আপনাকে নিগূঢ়ভাবে জানা। ঋষিরা বলেন, এই খোঁজার মধ্যেই আছে বিশ্বের সকল জানা, সকল জ্ঞান। ভগবানকে পাবারও এই পথ। এরই তরে ধ্যানের ব্যবস্থা। তুমি মানো না, কিন্তু যারা মানে, বিশ্বাস করে, তাঁকে চায়, জগতের বহু বিষয় থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে না রাখলে তারা একাগ্র চিত্ত-যোজনায় সফল হয় না। সতীশকে আমি ধরিনে, কিন্তু এ যে হিন্দুর অচ্ছিন্ন-পরম্পরায় পাওয়া সংস্কার, কমল। এই ত যোগ। আসমুদ্র-হিমাচল ভারত অবিচলিত শ্রদ্ধায় এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে।

ভক্তি, বিশ্বাস ও ভাবের আবেগে তাঁহার দুই চক্ষু ছলছল করিতে লাগিল। বাহিরের সর্ববিধ সাহেবিয়ানার নিভৃত তলদেশে যে দৃঢ়নিষ্ঠ বিশ্বাসপরায়ণ হিন্দু-চিত্ত নির্বাতদীপশিখার ন্যায় নিঃশব্দে জ্বলিতেছে, কমল চক্ষের পলকে তাহাকে উপলব্ধি করিল। কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু সঙ্কোচে বাধিল। সঙ্কোচ আর কিছুর জন্য নয়, শুধু এই সত্যব্রত সংযতেন্দ্রিয় বৃদ্ধকে ব্যথা দিবার বেদনা। কিন্তু উত্তর না পাইয়া তিনি নিজেই যখন প্রশ্ন করিলেন, কেমন কমল, এই কি সত্যি নয়? তখন সে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না আশুবাবু, সত্যি নয়। শুধু ত হিন্দুর নয়, এ বিশ্বাস সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু কেবলমাত্র বিশ্বাসের জোরেই ত কোন-কিছু কখনো সত্যি হয়ে ওঠে না। ত্যাগের জোরেও নয়; মৃত্যু-বরণ করার জোরেও নয়। অতি তুচ্ছ মতের অনৈক্যে বহু প্রাণ বহুবার সংসারে দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেছে। তাতে জিদের জোরকেই সপ্রমাণ করেচে, চিন্তার সত্যকে প্রমাণিত করেনি। যোগ কাকে বলে আমি জানিনে, কিন্তু এ যদি নির্জনে বসে কেবল আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্মা-চিন্তাই হয় ত এই কথাই জোর করে বলব যে, এই দুটো সিংহদ্বার দিয়ে সংসারে যত মোহ ভিতরে প্রবেশ করেছে, এমন আর কোথাও দিয়ে না। ওরা অজ্ঞানের সহচর।

শুনিয়া শুধু আশুবাবু নয়, হরেন্দ্রও বিস্ময় ও বেদনায় নীরব হইয়া রহিল।

সেই ছেলেটি পুনর্বার আসিয়া জানাইল, খাবার দেওয়া হইয়াছে।

সকলেই নীচে নামিয়া গেল।

আটাশ

আহারান্তে অক্ষয় কমলকে একমুহূর্তে নিরালায় পাইয়া চুপি চুপি বলিল, শুনতে পেলাম আপনারা চলে যাচ্চেন। পরিচিত সকলের বাড়িতেই আপনি এক-আধবার গেছেন, শুধু আমারই ওখানে—

আপনি! কমল অতিমাত্রায় বিস্মিত হইল। শুধু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে নয়, 'তুমি' বলিয়া তাহাকে সবাই ডাকে, সে অভিযোগও করে না, অভিমানও করে না। কিন্তু অক্ষয়ের অন্য কারণ ছিল। এই স্ত্রীলোকটিকে 'আপনি' বলাটা সে বাড়াবাড়ি, এমন কি ভদ্র-আচরণের অপব্যবহার বলিয়াই মনে করিত। কমল ইহা জানিত। কিন্তু এই অতি ক্ষুদ্র ইতরতায় দৃকপাত করিতেও তাহার লজ্জা করিত। পাছে একটা তর্কাতর্কি কলহের বিষয় হইয়া উঠে এই ছিল তার ভয়। হাসিয়া বলিল, আপনি ত কখনো যেতে বলেন নি।

না, সেটা আমার অন্যায় হয়েছে। চলে যাবার আগে কি আর সময় হবে না?

কি করে হবে অক্ষয়বাবু, আমরা যে কাল ভোরেই যাচ্চি।

ভোরেই? একটু থামিয়া বলিল, এ অঞ্চলে যদি কখনো আসেন আমার গৃহে আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

কমল হাসিয়া কহিল, একটা কথা জিজ্ঞেসা করতে পারি অক্ষয়বাবু? হঠাৎ আমার সম্বন্ধে আপনার মত বদলালো কি করে? বরঞ্চ, আরও ত কঠোর হবারই কথা।

অক্ষয় কহিল, সাধারণতঃ তাই হতো বটে। কিন্তু এবার দেশ থেকে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আপনার ঐ পিউরিটানদের দৃষ্টান্ত আমার ভেতরে গিয়ে লেগেছে। আর কেউ বুঝলেন কিনা জানিনে—না বোঝাও আশ্চর্যি নয়—কিন্তু আমি অনেক কথাই জানি। আর একটা কথা। আমাদের গ্রামের প্রায় চোদ্দ-আনা মুসলমান, ওরা ত সেই দেড়-হাজার বছরের পুরনো সত্যেই আজও দৃঢ় হয়ে আছে। সেই বিধি-নিষেধ, আইন-কানুন, আচার-অনুষ্ঠান,—কিছুই ত ব্যত্যয় হয়নি।

কমল কহিল, ওঁদের সম্বন্ধে আমি প্রায় কিছুই জানিনে, জানবার কখনো সুযোগও হয়নি। যদি আপনার কথাই সত্যি হয় ত কেবল এইটুকুই বলতে পারি যে, ওঁদেরও ভেবে দেখবার দিন এসেছে। সত্যের সীমা যে কোন-একটা অতীত দিনেই সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়নি, এ সত্য ওঁদেরও একদিন মানতে হবে। কিন্তু উপরে চলুন।

না, আমি এখান থেকেই বিদায় নেবো। আমার স্ত্রী পীড়িত। এত লোককে দেখেছেন একবার তাঁকে দেখবেন না?

কমল কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কেমন দেখতে?

অক্ষয় কহিল, ঠিক জানিনে। আমাদের পরিবারে ও প্রশ্ন কেউ করে না। বিয়ে দিয়ে ন'বছরের মেয়েকে বাবা ঘরে এনেছিলেন। লেখাপড়া শেখবারও সময় পায়নি, দরকারও হয়নি। রাঁধাবাড়া, বার-ব্রত, পূজো-আহ্নিক নিয়ে আছে; আমাকেই ইহকাল-পরকালের দেবতা বলে জানে, অসুখ হলে ওষুধ খেতে চায় না, বলে, স্বামীর পাদোদকেই সকল ব্যামো সারে। যদি না সারে, বুঝবে স্ত্রীর আয়ু শেষ হয়েছে।

ইহার একটুখানি আভাস কমল হরেন্দ্রের কাছে শুনিয়াছিল, কহিল, আপনি ত ভাগ্যবান, অন্ততঃ স্ত্রী-ভাগ্যে। এতখানি বিশ্বাস এ যুগে দুর্লভ।

অক্ষয় কহিল, বোধ হয় তাই, ঠিক জানিনে। হয়ত, একেই স্ত্রী-ভাগ্য বলে। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আমার কেউ নেই, সংসারে আমি একেবারে নিঃসঙ্গ একা। আচ্ছা, নমস্কার।

কমল হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

অক্ষয় এক পা গিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, একটা অনুরোধ করব?

করুন।

যদি কখনো সময় পান, আর আমাকে মনে থাকে, একখানা চিঠি লিখবেন? আপনি নিজে কেমন আছেন, অজিতবাবু কেমন আছেন,—এই সব। আপনাদের কথা আমি প্রায়ই ভাববো। আচ্ছা, চললাম,—নমস্কার। এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুত প্রস্থান করিল। এবং সেইখানে কমল স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাল-মন্দর বিচার করিয়া নয়, শুধু এই কথাই তাহার মনে হইল যে, এই সেই অক্ষয়! এবং মানুষের জানার বাহিরে এইভাবে এই ভাগ্যবানের দাম্পত্য-জীবন নির্বিঘ্ন শান্তিতে বহিয়া চলিয়াছে! একখানি চিঠির জন্য তাহার কি কৌতূহল, কি সকাতর সত্যকার প্রার্থনা।

উপরে আসিয়া দেখিল নীলিমা ব্যতীত সবাই যথাস্থানে উপবিষ্ট। এ তাহার স্বভাব,—বিশেষ কেহ কিছু মনে করে না। আশুবাবু বলিলেন, হরেন্দ্র একটি চমৎকার কথা বলছিলেন কমল। শুনলে হঠাৎ হেঁয়ালি বলে ঠেকে, কিন্তু বস্তুতঃই সত্য। বলছিলেন, লোকে এইটিই বুঝতে পারে না যে, প্রচলিত সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ শুধু চরিত্র-বল ও বিবেক-বুদ্ধির জোরেই সহা যায়। মানুষে বাইরের অন্যায়টাই দেখে, অন্তরের প্রেরণার খবর রাখে না। এইখানেই যত দ্বন্দ্ব, যত বিরোধের সৃষ্টি।

কমল বুঝিল, ইহার লক্ষ্য সে এবং অজিত। সুতরাং চুপ করিয়া রহিল। এ কথা বলিল না যে, উচ্ছৃঙ্খলতার জোরেও সমাজ-বিধি লঙ্ঘন করা যায়। দুর্বুদ্ধি ও বিবেক-বুদ্ধি এক পদার্থ নয়।

বেলা ও মালিনী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের যাবার সময় হইয়াছে। কমলকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া তাহারা হরেন্দ্র ও আশুবাবুকে নমস্কার করিল। এই মেয়েটির সম্মুখে সর্বক্ষণই তাহারা নিজেদের ছোট মনে করিয়াছে, শেষবেলায় তাহার শোধ দিল উপেক্ষা দেখাইয়া। চলিয়া গেলে আশুবাবু সস্নেহে কহিলেন, কিছু মনে করো না মা, এ ছাড়া ওঁদের আর হাতে কিছু নেই। আমিও তো ওই দলের লোক। সবই জানি।

আশুবাবু হরেন্দ্রের সাক্ষাতে আজ এই প্রথম তাহাকে মা বলিয়া ডাকিলেন। কহিলেন, দৈবাৎ ওঁরা পদস্থ ব্যক্তিদের ভার্যা। হাই-সার্কেলের মানুষ। ইংরিজি বলা-কওয়া, চলা-ফেরা, বেশভূষায় আপ্-টু-ডেট। এটুকু ভুললে যে ওঁদের একেবারে পুঁজিতে ঘা পড়ে, কমল। রাগ করলেও ওঁদের প্রতি অবিচার হয়।

কমল হাসিমুখে কহিল, রাগ ত করিনি।

আশুবাবু বলিলেন, করবে না তা জানি। রাগ আমাদেরি হলো না, শুধু হাসি পেলে। কিন্তু তুমি বাসায় যাবে কি করে মা, আমি কি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাবো?

বাঃ, নইলে যাবো কি করে?

পাছে লোকের চোখে পড়ে এই ভয়ে সে নিজেদের মোটর ফিরাইয়া দিয়াছিল।

বেশ, তাই হবে। কিন্তু, আর দেরি করাও হয়ত উচিত হবে না, কি বলো?

সকলেরই স্মরণ হইল যে, তিনি আজও সম্পূর্ণ সারিয়া ওঠেন নাই।

সিঁড়িতে জুতার শব্দ শুনা গেল, এবং পরক্ষণে সকলে পরম বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিল যে দ্বারের বাহিরে আসিয়া অজিত দাঁড়াইয়াছে।

হরেন্দ্র কলকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিল, হ্যালো! বেটার লেট দ্যান নেভার! একি সৌভাগ্য ব্রহ্মচর্যাশ্রমের!

অজিত অপ্রতিভ হইয়া বলিল, নিতে এলাম। এবং চক্ষের পলকে একটা অভাবিত দুঃসাহসিকতা তাঁহার ভিতরের কথাগুলা সজোরে ঠেলিয়া গলা দিয়া বাহির করিয়া দিল। কহিল, নইলে ত আর দেখা হতো না। আমরা আজ ভোর-রাত্রেই দু'জনে চলে যাচ্চি।

আজই? এই ভোরে?

হাঁ। আমাদের সমস্ত প্রস্তুত। এখান থেকে আমাদের যাত্রা হবে শুরু।

ব্যাপারটা অজানা নয়, তথাপি সকলেই যেন লজ্জায় ম্লান হইয়া উঠিল।

নিঃশব্দ পদক্ষেপে নীলিমা আসিয়া ঘরের একপাশে বসিল। সঙ্কোচ কাটাইয়া আশুবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কথাটা তাঁহার গলায় একবার বাধিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, হয়ত আর কখনো আমাদের দেখা হবে না, তোমরা উভয়েই আমার স্নেহের বস্তু, যদি তোমাদের বিবাহ হতো আমি দেখে যেতে পেতাম।

অজিত সহসা যেন কূল দেখিতে পাইল, ব্যগ্রকণ্ঠে কহিয়া উঠিল, এ জিনিস আমি চাইনি আশুবাবু, এ আমার ভাবনার অতীত। বিবাহের কথা বার বার বলেচি, বার বার মাথা নেড়ে কমল অস্বীকার করেছে। নিজের যাবতীয় সম্পদ, যা-কিছু আমার আছে, সমস্ত লিখে দিয়ে নিজেকে শক্ত করে ধরা দিতে গেছি, কমল কিছুতে সম্মত হয়নি। আজ এঁদের সুমুখে তোমাকে আবার মিনতি করি কমল, তুমি রাজী হও। আমার সর্বস্ব তোমাকে দিয়ে ফেলে বাচি। ফাঁকির কলঙ্ক থেকে নিষ্কৃতি পাই।

নীলিমা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। অজিত স্বভাবতঃ লাজুক প্রকৃতির, সর্বসমক্ষে তাহার এই অপরিমেয় ব্যাকুলতায় সকলের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। আজ সে আপনাকে নিঃস্বত্ব করিয়া দিতে চায়। নিজের বলিয়া হাতে রাখিবার আজ তাহার আর এতটুকু প্রয়োজন নাই।

কমল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, কেন, তোমার এত ভয় কিসের?

ভয় আজ না থাক, কিন্তু—

কিন্তুর দিন আগে ত আসুক।

এলে যে তুমি কিছুই নেবে না জানি।

কমল হাসিয়া বলিল, জানো? তা হলে সেইটেই হবে তোমার সবচেয়ে শক্ত বাঁধন।

একটু থামিয়া বলিল, তোমার মনে নেই একদিন বলেছিলাম, ভয়ানক মজবুত করার লোভে অমন নিরেট নিশ্ছিদ্র করে বাড়ি গাঁথতে চেয়ো না। ওতে মড়ার কবর তৈরি হবে, জ্যান্ত মানুষের শোবার ঘর হবে না।

অজিত বলিল, বলেছিলে জানি। জানি আমাকে বাঁধতে চাও না, কিন্তু আমি যে চাই। তোমাকেই বা কি দিয়ে আমি বেঁধে রাখবো কমল? কৈ সে জোর?

কমল বলিল, জোরে কাজ নেই। বরঞ্চ তোমার দুর্বলতা দিয়েই আমাকে বেঁধে রেখো। তোমার মত মানুষকে সংসারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবো, অত নিষ্ঠুর আমি নই। পলকমাত্র আশুবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, ভগবান ত মানিনে, নইলে প্রার্থনা করতাম দুনিয়ার সকল আঘাত থেকে তোমাকে আড়ালে রেখেই একদিন যেন আমি মরতে পারি।

নীলিমার দুই চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। আশুবাবু নিজেও বাষ্পাকুল চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন,

গাঢ়স্বরে বলিলেন, তোমার ভগবান মেনেও কাজ নেই, কমল। ঐ একই কথা, মা। এই আত্মসমর্পণই একদিন তোমাকে তাঁর কাছে সগৌরবে পৌঁছে দেবে।

কমল হাসিয়া বলিল, সে হবে আমার উপরি পাওনা। ন্যায্য পাওনার চেয়েও তার মান বেশী। সে ঠিক কথা মা। কিন্তু জেনে রেখো, আমার আশীর্বাদ নিষ্ফলে যাবে না।

হরেন্দ্র বলিল, অজিত, খেয়ে ত আসোনি, নীচে চল।

আশুবাবু সাহাস্যে কহিলেন, এমনি তোমার বিদ্যে। ও খেয়ে আসেনি, আর কমল এখানে বসে খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হলো—যা ও কখনো করে না।

অজিত সলজ্জে স্বীকার করিয়া জানাইল, কথাটা তাই বটে। সে অভুক্ত আসে নাই।

এইটি শেষের রাত্রি স্মরণ করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিবার কাহারও ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আশুবাবুর স্বাস্থ্যের দিকে চহিয়া উঠিবার আয়োজন করিতে হইল। হরেন্দ্র কমলের কাছে আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, এতদিনে আসল জিনিসটি পেলে, কমল, তোমাকে অভিনন্দন জানাই।

কমল তেমনি চুপি চুপি জবাব দিল, পেয়েছি? অন্ততঃ সেই আশীর্বাদই করুন।

হরেন্দ্র আর কিছু বলিল না। কিন্তু কমলের কণ্ঠস্বরে সেই দ্বিধাহীন পরম নিঃসংশয় সুরটি যে বাজিল না, তাহাও কানে ঠেকিল। তবু এমনিই হয়। বিশ্বের এমনই বিধান।

দ্বারের আড়ালে ডাকিয়া নীলিমা চোখ মুছিয়া বলিল, কমল, আমাকে ভুলো না যেন। ইহার অধিক সে বলিতে পারিল না।

কমল হেঁট হইয়া নমস্কার করিল। বলিল, দিদি, আমি আবার আসব, কিন্তু যাবার আগে আপনার কাছে একটি মিনতি রেখে যাবো, জীবনের কল্যাণকে কখনো অস্বীকার করবেন না। তার সত্য রূপ আনন্দের রূপ। এইরূপে সে দেখা দেয়, তোকে আর কিছুতে চেনা যায় না। আর যাই কেন না কর দিদি, অবিনাশবাবুর ঘরে আর বেগার খাটতে রাজী হয়ো না।

নীলিমা কহিল, তাই হবে কমল।

আশুবাবু গাড়িতে উঠিলে কমল হিন্দু-রীতিতে পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। তিনি মাথায় হাত রাখিয়া আর একবার আশীর্বাদ করিলেন। বলিলেন, তোমার কাছ থেকে একটি খাঁটি তত্ত্বের সন্ধান পেয়েছি কমল। অনুকরণে মুক্তি আসে না, মুক্তি আসে জ্ঞানে। তাই ভয় হয়, তোমাকে যা মুক্তি এনে দিলে, অজিতকে হয়ত তাই অসম্মানে ডোবাবে। তার থেকে তাকে রক্ষে করো মা। আজ থেকে সে ভার তোমার। ইঙ্গিতটা কমল বুঝিল।

পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, তোমার কথাই তোমাকে মনে করিয়ে দিই। সেদিন থেকে এ আমি বহুবার ভেবেচি যে, ভালবাসার শুচিতার ইতিহাসই মানুষের সভ্যতার ইতিহাস। তার জীবন। তার বড় হবার ধারাবাহিক বিবরণ। তবু, শুচিতার সংজ্ঞা নিয়ে যাবার বেলায় আর আমি তর্ক তুলবো না। আমার ক্ষোভের নিশ্বাসে তোমাদের বিদায়-ক্ষণটিকে মলিন করে দেব না। কিন্তু বুড়োর এই কথাটি মনে রেখো কমল, আদর্শ, আইডিয়াল শুধু দু-চারজনের জন্যেই, তাই তার দাম। তাকে সাধারণ্যে টেনে আনলে সে হয় পাগলামি, তার শুভ যায় ঘুচে, তার ভার হয় দুঃসহ। বৌদ্ধদের যুগ থেকে আরম্ভ করে বৈষ্ণবদের দিন পর্যন্ত এর অনেক দুঃখের নজির পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। সেই দুঃখের বিপ্লবই কি সংসারে তুমি এনে দেবে মা?

কমল মৃদুকণ্ঠে বলিল, এ যে আমার ধর্ম, কাকাবাবু।

ধর্ম? তোমার এ ধর্ম?

কমল কহিল হাঁ। যে দুঃখকে ভয় করচেন কাকাবাবু, তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে; আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, সেই মৃতদেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে। এমনি করেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই ত মানুষের মুক্তির পথ। দেখতে পান না কাকাবাবু, সতীদাহের বাইরের চেহারাটা রাজশাসনে বদলালো, কিন্তু তার ভিতরের দাহ আজও তেমনি জ্বলচে? তেমনি করেই ছাই করে আনচে? এ নিভবে কি দিয়ে?

আশুবাবু কথা কহিতে পারিলেন না, শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই সহসা বলিয়া উঠিলেন, কমল, মণির মায়ের বন্ধন যে আজও কাটাতে পারিনি—তাকে তোমরা বল মোহ, বল দুর্বলতা,—কি জানি সে কি, কিন্তু এ-মোহ যেদিন ঘুচবে, মানুষের অনেকখানিই সেই সঙ্গে ঘুচে যাবে মা। মানুষের এ বহু তপস্যার ধন। আচ্ছা, আসি। বাসদেও, চল।

টেলিগ্রাফ-পিওন সাইকেল থামাইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। জরুরী তার। হরেন্দ্র গাড়ির আলোতে খাম খুলিয়া পড়িল। দীর্ঘ টেলিগ্রাম, আসিয়াছে মথুরা জেলার একটি ছোট সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারের নিকট হইতে। বিবরণটা এইরূপ,—গ্রামের এক ঠাকুরবাড়িতে আগুন লাগে, বহুদিনের বহুলোক-পূজিত বিগ্রহমূর্তি পুড়িয়া ধ্বংস হইবার উপক্রম হয়। বাঁচাইবার কোন উপায় আর যখন নাই, সেই প্রজ্বলিত গৃহ হইতে রাজেন্দ্র মূর্তিটিকে উদ্ধার করে। দেবতা রক্ষা পাইলেন, কিন্তু রক্ষা পাইল না তাহার রক্ষাকর্তা। দুই দিন নীরবে অব্যক্ত যাতনা সহিয়া আজ সকালে সে গোবিন্দজীর বৈকুণ্ঠে গিয়াছে। দশ হাজার লোকে কীর্তনাদি-সহ শোভাযাত্রা করিয়া তাহার নশ্বর দেহ যমুনা-তটে ভস্ম করিয়াছে। মৃত্যুকালে এই সংবাদটা আপনাকে সে দিতে বলিয়াছে।

নীল আকাশ হইতে যেন বজ্রপাত হইয়া গেল।

কান্নায় হরেন্দ্রর কণ্ঠ রুদ্ধ, এবং অনাবিল জ্যোৎস্না-রাত্রি সকলের চক্ষেই একমুহূর্তে অন্ধকারে একাকার হইয়া উঠিল।

আশুবাবু কাঁদিয়া বলিলেন, দু'দিন! আটচল্লিশ ঘণ্টা! এত কাছে? আর একটা খবর সে দিলে না?

হরেন্দ্র চোখ মুছিয়া বলিল, প্রয়োজন মনে করেনি। কিছু করতে পারা ত যেতো না, তাই বোধ হয় কাউকে দুঃখ দিতে সে চায়নি।

আশুবাবু যুক্তহাত মাথায় ঠেকাইয়া বলিলেন, তার মানে দেশ ছাড়া আর কোন মানুষকেই সে আত্মীয় বলে স্বীকার করেনি। শুধুই দেশ,—এই ভারতবর্ষটা। তবু বলি, ভগবান! তোমার পায়েই তাকে স্থান দিয়ো! তুমি আর যাই করো, এই রাজেনের জাতটাকে তোমার সংসারে যেন বিলুপ্ত করো না। বাসদেও, চালাও।

এই শোকে আঘাত কমলের চেয়ে বেশী বোধ করি কাহারও বাজে নাই, কিন্তু বেদনার বাষ্পে কণ্ঠকে সে আচ্ছন্ন করিতে দিল না। চোখ দিয়া তাহার আগুন বাহির হইতে লাগিল, বলিল, দুঃখ কিসের? সে বৈকুণ্ঠে গেছে। হরেন্দ্রকে কহিল, কাঁদবেন না হরেনবাবু অজ্ঞানের বলি চিরদিন এমনি করেই আদায় হয়।

তাহার স্বচ্ছ কঠিন স্বর তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত গিয়া সকলের বুকে বিঁধিল।

আশুবাবু চলিয়া গেলেন। এবং, সেই শোকাচ্ছন্ন স্তব্ধ নীরবতার মধ্যে কমল অজিতকে লইয়া গাড়িতে গিয়া বসিল। কহিল, রামদীন, চলো...

Pathagar.Net

পথের দাবী

এক

অপূর্বর সঙ্গে তাহার বন্ধুদের নিম্নলিখিত প্রথায় প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক হইত।

বন্ধুরা কহিতেন, অপূ, তোমার দাদারা প্রায় কিছুই মানেন না, আর তুমি মানো না শোনো না সংসারে এমন ব্যাপারই নেই।

অপূর্ব কহিত, আছে বৈ কি? এই যেমন দাদাদের দৃষ্টান্ত মানিনে এবং তোমাদের পরামর্শ শুনিনে।

বন্ধুরা পুরানো রসিকতার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতেন, তুমি কলেজে পড়িয়া এম. এস্‌সি. পাস করিলে, কিন্তু তবু এখনও টিকি রাখিতেছ। তোমার টিকির মিডিয়ম দিয়া মগজে বিদ্যুৎ চলাচল হয় নাকি?

অপূর্ব জবাব দিত, এম. এস্‌সি.র পাঠ্যপুস্তকে টিকির বিরুদ্ধে কোথাও কোন আন্দোলন নেই। সুতরাং টিকি রাখা অন্যায় এ ধারণা জন্মাতে পারেনি। আর বিদুৎ চলা-চলের সমস্ত ইতিহাসটা আজিও আবিষ্কৃত হয়নি। বিশ্বাস না হয়, বিদ্যুৎ-বিদ্যা অধ্যাপকদের বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও।

তাঁহারা বিরক্ত হইয়া কহিতেন, তোমার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা।

অপূর্ব হাসিয়া বলিত, তোমাদের এই কথাটি অভ্রান্ত সত্য, কিন্তু তবু ত তোমাদের চৈতন্য হয় না।

আসল কথা, অপূর্বর ডেপুটী-ম্যাজিস্ট্রেট পিতার বাক্যে ও ব্যবহারে উৎসাহ পাইয়া তাহার বড় ও মেজদাদারা যখন প্রকাশ্যেই মুরগি ও হোটেলের রুটি খাইতে লাগিল, এবং স্নানের পূর্বে গলার পৈতাটাকে পেরেকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া প্রায়ই ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এমন কি ধোপার বাড়ি দিয়া কাচাইয়া ইস্ত্রি করিয়া আনিলে সুবিধা হয় কিনা আলোচনা করিয়া হাসি-তামাশা করিতে লাগিল, তখনও অপূর্বর নিজের পৈতা হয় নাই। কিন্তু ছোট হইলেও সে মায়ের গভীর বেদনা ও নিঃশব্দ অশ্রুপাত বহুদিন লক্ষ্য করিয়াছিল। মা কিছুই বলিতেন না। একে ত বলিলেও ছেলেরা শুনিত না, অধিকন্তু স্বামীর সহিত নিরর্থক কলহ হইয়া যাইত। তিনি শ্বশুরকুলের পৌরোহিত্য ব্যবসাকে নিষ্ঠুর ইঙ্গিত করিয়া কহিতেন, ছেলেরা যদি তাদের মামাদের মত না হয়ে বাপের মতই হয়ে উঠে ত কি করা যাবে! মাথায় টিকির বদলে টুপি পরে বলেই যে মাথাটা কেটে নেওয়া উচিত আমার তা মনে হয় না।

সেই অবধি করুণাময়ী ছেলেদের সম্বন্ধে একেবারে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন, কেবল নিজের আচার-বিচার নিজেই নীরবে ও অনাড়ম্বরে পালন করিয়া চলিতেন। তাহার পরে স্বামীর মৃত্যুতে বিধবা হইয়া তিনি গৃহে বাস করিয়াও একপ্রকার গৃহ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছিলেন। উপরের যে ঘরটায় তিনি থাকিতেন তাহারই পার্শ্বের বারান্দায় খানিকটা ঘিরিয়া লইয়া তাঁহার ভাঁড়ার ও স্বহস্তে রান্নার কাজ চলিত। বধূদের হাতেও তিনি খাইতে চাহিতেন না। এমনি ভাবেই দিন চলিতেছিল।

এদিকে অপূর্ব মাথায় টিকি রাখিয়াছিল, কলেজে জলপানি ও মেডেল লইয়া যেমন সে পাসও করিত, ঘরে একাদশী-পূর্ণিমা-সন্ধ্যাহ্নিকও তেমনি বাদ দিত না। মাঠে ফুটবল-ক্রিকেট-হকি খেলাতেও তাহার যত উৎসাহ ছিল, সকালে মায়ের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেও তাহার কোনদিন সময়াভাব ঘটিত না। বাড়াবাড়ি ভাবিয়া বধূরা মাঝে মাঝে তামাশা করিয়া বলিত ঠাকুরপো, পড়াশুনা ত সাঙ্গ হল, এবার ডোর-কোপ্‌নি নিয়ে একটা রীতিমত গোঁসাই-টোঁসাই হয়ে পড়। বয়ে দেখছি বামুনের বিধবাকেও ছাড়িয়ে গেলে!

অপূর্ব সহাস্যে জবাব দিত, ছাড়িয়ে যেতে কি আর সাধে হয় বৌদি? মায়ের একটা মেয়ে-টেয়েও নেই, বয়স হয়েছে, হঠাৎ অসমর্থ হয়ে পড়লে একমুঠো হবিষ্যি রেঁধেও ত দিতে

পারবো? আর ডোর-কোপ্‌নি যাবে কোথা? তোমাদের সংসারে যখন আছি, তখন একদিন ও। সম্বল করতেই হবে।

বড়বধূ মুখখানি ম্লান করিয়া কহিত, কি করবো ঠাকুরপো, সে আমাদের কপাল!

তা বটে! বলিয়া অপূর্ব চলিয়া যাইত, কিন্তু মাকে গিয়া কহিত, মা, এ তোমার বড় অন্যায়। দাদারা যাই কেননা করুন, বৌদিরা কিছু আর মুরগিও খান না, হোটেলেও ডিনার করেন না, চিরকালটা কি তুমি রেঁধেই খাবে?

মা কহিতেন, একবেলা একমুঠো চাল ফুটিয়ে নিতে ত আমার কোন কষ্টই হয় না বাবা। আর নিতান্তই যখন অপারগ হব, ততদিনে তোর বৌও ঘরে এসে পড়বে।

অপূর্ব বলিত, তাই কেন না একটা বামুন-পণ্ডিতের ঘর থেকে আনিয়ে নাও না মা? খেতে দেবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু তোমার কষ্ট দেখলে মনে হয় দাদাদের গলগ্রহ হয়েই না হয় থাকবো।

মা মাতৃগর্বে দুই চক্ষু দীপ্ত করিয়া কহিতেন, অমন কথা তুই মুখেও আনিস নে অপু! তোর সামর্থ্য নেই একটা বৌকে খেতে দেবার? তুই ইচ্ছে করলে যে বাড়ির সবাইকে বসে খাওয়াতে পারিস।

তোমার যেমন কথা মা। তুমি মনে কর ভূ-ভারতে তোমার মত এমন ছেলে আর কারও নেই। এই বলিয়া সে উদ্‌গত অশ্রু গোপন করিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িত।

কিন্তু নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে অপূর্ব যাহাই বলুক, তাই বলিয়া কন্যাভার-গ্রস্তের দল নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহারা দলে দলে আসিয়া বিনোদবাবুকে স্থানে-অস্থানে আক্রমণ করিয়া জীবন তাঁহার দুর্ভর করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিনোদ আসিয়া মাকে ধরিতেন, মা, কোথায় কোন্‌ নিষ্ঠে-কিষ্ঠে জপ-তপের মেয়ে আছে তোমার ছেলের বিয়ে দিয়ে চুকিয়ে ফেল, না হয় আমাকে দেখছি বাড়ি ছেড়ে পালাতে হয়। বাপের বড় ছেলে,—বাইরে থেকে লোকে ভাবে আমিই বুঝি বা বাড়ির কর্তা।

ছেলের কঠিন বাক্যে করুণাময়ী মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতেন, কিন্তু এইখানে তিনি আপনাকে কিছুতেই বিচলিত হইতে দিতেন না। মৃদু অথচ দৃঢ়কণ্ঠে কহিতেন, লোকে ত মিথ্যে ভাবে না বাবা, তাঁর অবর্তমানে তুমিই বাড়ির কর্তা, কিন্তু অপুর সম্বন্ধে তুমি কাউকে কোন কথা দিয়ো না। আমি রূপ চাইনে, টাকাকড়ি চাইনে,—না বিনু, সে আমি আপনি দেখেশুনে তবে দেব।

বেশ ত মা, তাই দিয়ো। কিন্তু যা করবে দয়া করে একটু শীঘ্র করে কর। রাঙ্গা মাকাল-ফল সামনে ঝুলিয়ে রেখে লোকগুলোকে আর দগ্ধে মেরো না। এই বলিয়া বিনোদ রাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন।

করুণাময়ীর মনে মনে একটা সঙ্কল্প ছিল। স্নানের ঘাটে ভারী একটি সুলক্ষণা মেয়ে কিছুদিন হইতে তাঁহার চোখে পড়িয়াছিল। মেয়েটি মায়ের সহিত প্রায়ই গঙ্গাস্নানে আসিত। ইঁহারা যে তাঁহাদের স্ব-ঘর এ সংবাদ তিনি গোপনে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। স্নানান্তে মেয়েটি শিবপূজা করিত, কোথাও কিছু ভুল হয় কি না, করুণাময়ী অলক্ষ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন। তাঁহার আরও কিছু কিছু জানিবার ছিল, এবং সে-পক্ষে তিনি নিশ্চেষ্টও ছিলেন না। তাঁহার বাসনা ছিল সমস্ত তথ্য যদি অনুকূল হয় ত আগামী বৈশাখেই ছেলের বিবাহ দিবেন।

এমন সময় অপূর্ব আসিয়া অকস্মাৎ সংবাদ দিল, মা, আমি বেশ একটি চাকরি পেয়ে গেছি।

মা খুশী হইয়া কহিলেন, বলিস কি রে? এই ত সেদিন পাস করলি, এরই মধ্যে তোকে চাকরি দিলে কে?

অপূর্ব হাসিমুখে কহিল, যার গরজ। এই বলিয়া সে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া কহিল, তাহাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সাহেবই ইহা যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। বোথা কোম্পানি বর্মার রেঙ্গুন শহরে একটা নূতন আপিস খুলিয়াছে, তাহারা বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সচ্চরিত্র কোন বাঙালী যুবককে সমস্ত কর্তৃত্ব-ভার দিয়া পাঠাইতে চায়। বাসাভাড়া ছাড়া মাহিনা আপাতত চারি শত

টাকা, এবং চেষ্টা করিয়াও কোম্পানিকে যদি লালবাতি জ্বালাইতে না পারা যায় ত ছয় মাস পরে আরও দুই শত। এই বলিয়া সে হাসিতে লাগিল।

কিন্তু, বর্মা-মল্লুকের নাম শুনিয়া মায়ের মুখ মলিন হইয়া গেল, তিনি নিরুৎসুক কণ্ঠে কহিলেন তুই কি ক্ষেপেছিস অপূ, সে-দেশে কি মানুষে যায়! যেখানে জাত, জন্ম, আচার-বিচার কিছু নেই শুনেচি, সেখানে তোকে দেব আমি পাঠিয়ে? এমন টাকায় আমার কাজ নেই।

জননীর বিরুদ্ধতায় অপূর্ব ভীত হইয়া কহিল, তোমার কাজ নেই, কিন্তু আমার ত আছে মা। তবে, তোমার হুকুমে আমি ভিখিরী হয়েও থাকতে পারি, কিন্তু সারা জীবনে কি এমন সুযোগ আর জুটবে? তোমার ছেলের মত বিদ্যে-বুদ্ধি আজকাল শহরের ঘরে ঘরে আছে, অতএব, বোথা কোম্পানির আটকাবে না, কিন্তু প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে আমার হয়ে একেবারে কথা দিয়ে দিয়েছেন, তাঁর লজ্জার অবধি থাকবে না। তা ছাড়া বাড়ির সত্যকার অবস্থাও ত তোমার অজানা নয় মা?

মা বলিলেন, কিন্তু সেটা যে শুনেচি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ।

অপূর্ব কহিল, কে তোমাকে বাড়িয়ে বলেচে। কিন্তু এটা ত তোমার ম্লেচ্ছ দেশ নয়, অথচ যারা হতে চায় তাদের ত বাধে না মা।

মা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিলেন, কিন্তু এই বৈশাখে যে তোর বিয়ে দেব আমি স্থির করেচি।

অপূর্ব কহিল, একেবারে স্থির করে বসে আছ মা? বেশ ত, দু-এক মাস পেছিয়ে দিয়ে যেদিন তুমি ডেকে পাঠাবে সেই দিনই ফিরে এসে তোমার আজ্ঞা পালন করবো।

করুণাময়ী বাহিরের চক্ষে সেকেলে হইলেও অতিশয় বুদ্ধিমতী। তিনি অনেকক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া অবশেষে ধীরে ধীরে কহিলেন, যখন যেতেই হবে তখন আর উপায় কি। কিন্তু তোমার দাদাদের মত নিয়ো।

এই বর্মা-যাত্রা সম্পর্কে তাঁহার আর দু'টি সন্তানের উল্লেখ করিতে করুণাময়ীর অতীত ও বর্তমানের সমস্ত প্রচ্ছন্ন বেদনা যেন এককালে আলোড়িত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে দুঃখ আর তিনি প্রকাশ পাইতে দিলেন না। তাঁহার পিতৃকুল গোকুল-দীঘির সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, এবং বংশপরম্পরায় তাঁহারা অতিশয় আচারপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান হিন্দু। শিশুকাল হইতে যে সংস্কার তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল উত্তরকালে তাহা স্বামী ও পুত্রদের হস্তে যতদূর আহত ও লাঞ্ছিত হইবার হইয়াছে, কেবল এই অপূর্বকে লইয়াই তিনি কোনমতে সহ্য করিয়া আজও গৃহে বাস করিতেছিলেন, সে ছেলেও আজ তাঁহার চোখের আড়ালে কোন্ অজানা দেশে চলিয়াছে। এ কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ভয় ও ভাবনার সীমা রহিল না, শুধু মুখে বলিলেন, যে ক'টা দিন বেঁচে আছি অপূ, তুই কিন্তু আর আমাকে দুঃখ দিসনে বাবা। এই বলিয়া তিনি আঁচল দিয়া চোখ-দুটি মুছিয়া ফেলিলেন।

অপূর্বর নিজের চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল, সে প্রত্যুত্তরে কেবল কহিল, মা, আজ তুমি ইহলোকে আছে, কিন্তু, একদিন তোমার স্বর্গবাসের ডাক এসে পৌঁছবে, সেদিন তোমার অপূকে ফেলে যেতে হবে জানি, কিন্তু, একটা দিনের জন্যেও যদি তোমাকে চিনতে পেরে থাকি মা, তাহলে সেখানে বসেও কখনো এ ছেলের জন্যে তোমাকে চোখের জল ফেলতে হবে না। এই বলিয়া সে দ্রুতবেগে অন্যত্র প্রস্থান করিল।

সেদিন সন্ধ্যাকালে করুণাময়ী তাঁহার নিয়মিত আহ্নিক ও মালায় মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না, উদ্বেগ ও বেদনার ভারে তাঁহার দুই চক্ষু পুনঃ পুনঃ অশ্রু-আবিল হইয়া উঠিতে লাগিল, এবং কি করিলে যে কি হয় তাহা কোন মতেই ভাবিয়া না পাইয়া অবশেষে তাঁহার বড় ছেলের ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন। বিনোদকুমার কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগান্তে এইবার সান্ধ্য-পোশাকে ক্লাবের উদ্দেশে যাত্রা করিতেছিলেন, হঠাৎ মাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া গেলেন। বস্তুতঃ, এ ঘটনা এমনি অপ্রত্যাশিত যে সহসা তাঁহার মুখে কথা যোগাইল না।

করুণাময়ী কহিলেন, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি বিনু।

কি মা?

মা তাঁহার চোখের জল এখানে আসিবার পূর্বে ভাল করিয়া মুছিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আর্দ্রকণ্ঠ গোপন রহিল না। তিনি আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া শেষে অপূর্বর মাসিক বেতনের পরিমাণ উল্লেখ করিয়াও যখন নিরানন্দ-মুখে কহিলেন, তাই ভাবছি বাবা, এই ক'টা টাকার লোভে তাকে সেখানে পাঠাব কি না, তখন বিনোদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। সে রুক্ষস্বরে কহিল, মা, তোমার অপূর্বর মত ছেলে ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয় নেই সে আমরা সবাই মানি, কিন্তু পৃথিবীতে বাস করে এ কথাটাও ত না মেনে পারিনে যে, প্রথমে চার শ এবং ছ মাসে ছ শ টাকা সে ছেলের চেয়েও অনেক বড়।

মা ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, কিন্তু, সে যে শুনেছি একেবারে ম্লেচ্ছ দেশ।

বিনোদ কহিল, মা, জগতে তোমার শোনা এবং জানাটাই কেবল অভ্রান্ত না হতে পারে।

ছেলের শেষ কথায় মা অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিয়া কহিলেন, বাবা বিনু, এই একই কথা তোমাদের জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত শুনে শুনেও যখন আমার চৈতন্য হল না, তখন শেষ দশায় আর ও-শিক্ষা দিয়ো না। অপূর্বর দাম কত টাকা সে আমি জানতে আসিনি, আমি শুধু জানতে এসেছিলাম অতদূরে তাকে পাঠানো উচিত কি না।

বিনোদ হেঁট হইয়া ডান হাতে তাড়াতাড়ি মায়ের দুই পা স্পর্শ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, মা, তোমাকে দুঃখ দেবার জন্য একথা আমি বলিনি। বাবার সঙ্গেই আমাদের মিলত সে সত্যি, এবং টাকা জিনিসটা যে সংসারে দামী ও দরকারী এ তাঁর কাছেই শেখা। কিন্তু, এ ক্ষেত্রে সে লোভ তোমাকে আমি দেখাচ্চি নে। তোমার ম্লেচ্ছ বিনুর এই হ্যাট-কোটের ভেতরটা হয়ত আজও ততবড় সাহেব হয়ে উঠেনি যে, ছোটভাইকে খেতে দেবার ভয়ে স্থান-অস্থানের বিচার করে না। কিন্তু তবুও বলি, ও যাক। দেশে আবহাওয়া যা বইতে শুরু করেছে মা, তাতে ও যদি দিন-কতক দেশ ছেড়ে কোথাও গিয়ে কাজে লেগে যেতে পারে ত ওর নিজেরও ভালো হবে, আমরাও সগোষ্ঠী হয়ত বেঁচে যাবো! তুমি ত জানো মা, সেই স্বদেশী আমলে ওর গলা টিপলে দুধ বেরোত, তবু তারই বিক্রমে বাবার চাকরি যাবার জো হয়েছিল।

করুণাময়ী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন, না না, সে-সব অপূ আর করে না। সাত-আট বছর আগে তার কি বা বয়স ছিল, কেবল দলে মিশেই যা—

বিনোদ মাথা নাড়িয়া একটু হাসিয়া কহিল, হয়ত, তোমার কথাই ঠিক, অপূর্ব এখন আর কিছু করে না, কিন্তু সকল দেশেই জন-কতক লোক থাকে মা, যাদের জাতই আলাদা,—তোমার ছোট ছেলেটি সেই জাতের। দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরার রক্ত ; শুধু কি কেবল দেশের হাওয়া-আলো,—এর পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, চন্দ্র-সূর্য, নদী-নালা যেখানে যা কিছু আছে সব যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে এরা শুষে নিতে চায়! বোধ হয় এদেরই কেউ কোন্ সত্যকালে জননী-জন্মভূমি কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। দেশের সম্পর্কে এদের কখনো বিশ্বাস করো না মা, ঠকবে। এদের বেঁচে থাকা আর প্রাণ দেওয়ার মধ্যে এই এতটুকু মাত্র প্রভেদ! এই বলিয়া সে তাহার তর্জনীর প্রান্তভাগটুকু বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেখাইয়া কহিল, বরঞ্চ তোমার এই ম্লেচ্ছাচারী বিনুটিকে তোমার ওই টিকিধারী গীতা-পড়া এম. এস্‌সি. পাস করা অপূর্বকুমারের চেয়ে ঢের বেশী আপনার বলে জেনো।

ছেলের কথাগুলো মা ঠিক যে বিশ্বাস করিলেন তাহা নয়, কিন্তু এক সময়ে নাকি এই লইয়া তাঁহাকে অনেক উদ্বেগ ভোগ করিতে হইয়াছে তাই মনে মনে চিন্তিত হইলেন। দেশের পশ্চিম দিগন্তে যে একটা মেঘের লক্ষণ দেখা দিয়াছে এ সংবাদ তিনি জানিতেন। তাঁহার প্রথমেই মনে হইল তখন অপূর্বর পিতা জীবিত ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি পরলোকগত।

বিনোদ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, কিন্তু তাহার বাহিরে যাইবার ত্বরা ছিল, কহিল, বেশ ত মা, সে ত আর কালই যাচ্চে না, সবাই একসঙ্গে বসে যা হোক একটা স্থির করা যাবে। এই বলিয়া সে একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেল।

দুই

জাহাজের কয়টা দিন অপূর্ব চিঁড়া চিবাইয়া সন্দেস ও ডাবের জল খাইয়া সর্বাঙ্গীণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করিয়া অর্থমৃতবৎ কোনমতে গিয়া রেঙ্গুনের ঘাটে পৌঁছিল। নব-প্রতিষ্ঠিত বোথা কোম্পানির জন-দুই দরোয়ান ও একজন মাদ্রাজী কর্মচারী জেটিতে উপস্থিত ছিলেন, ম্যানেজারকে তাঁহারা সাদর সম্বর্ধনা করিলেন। তিনি ত্রিশ টাকা দিয়া বাসা ভাড়া করিয়া আফিসের খরচায় যথাযোগ্য আসবাবপত্রে ঘর সাজাইয়া রাখিয়াছেন এ সংবাদ দিতেও বিলম্ব করিলেন না।

ফাল্গুন মাস শেষ হইতে চলিয়াছে, গরম মন্দ পড়ে নাই। সমুদ্রপথের এই প্রাণান্ত বিড়ম্বনা ভোগের পর নিরালা গৃহের সজ্জিত শয্যার উপরে হাত-পা ছড়াইয়া একটুখানি শুইতে পাইবে কল্পনা করিয়া সে যথেষ্ট তৃপ্তি অনুভব করিল। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে আসিয়াছিল, হালদার পরিবারে বহুদিনের চাকরিতে তাহার নিখুঁত শুদ্ধাচারিতা করুণাময়ীর কাছে সপ্রমাণ হইয়া গেছে। তাই বাড়ির বহু অসুবিধা সত্ত্বেও এই বিশ্বস্ত লোকটিকে সঙ্গে দিয়া মা অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন। আবার শুধু কেবল পাচকই নয়, পাক করিবার মত কিছু কিছু চাল-ডাল ঘি-তেল গুঁড়া মশলা, মায় আলু পটল পর্যন্ত সঙ্গে দিতে তিনি বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং ঈষদুষ্ণ অন্ন-ব্যঞ্জনে মুখের শুকনা চিঁড়ার স্বাদটাও যে সে অবিলম্বে ফিরাইতে পারিবে এ ভরসাও তাহার মনের মধ্যে বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় চমকিয়া গেল। গাড়ি ভাড়া হইয়া আসিলে কর্মচারী বিদায় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু মোটঘাট জিনিসপত্র লইয়া আফিসের দরোয়ানজী পথ দেখাইয়া সঙ্গে চলিল, এবং একটানা জলযাত্রা ছাড়িয়া শক্ত ডাঙার উপরে গাড়ির মধ্যে বসিতে পাইয়া অপূর্ব আরাম বোধ করিল। কিন্তু মিনিট-দশেকের মধ্যে গাড়ি যখন বাসার সম্মুখে আসিয়া থামিল, এবং দরোয়ানজী হাঁকডাকে প্রায় ডজন-খানেক কলিঙ্গ দেশীয় কুলী জোগাড় করিয়া মোটঘাট উপরে তুলিবার আয়োজন করিল, তখন, সেই তাহার ত্রিশ টাকা ভাড়ার বাটীর চেহারা দেখিয়া অপূর্ব হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। বাড়ির শ্রী নাই, ছাঁদ নাই, সদর নাই, অন্দর নাই, প্রাঙ্গণ বলিতে এই চলাচলের পথটা ছাড়া আর কোথাও কোন স্থান নাই। একটা অপ্রশস্ত কাঠের সিঁড়ি রাস্তা হইতে সোজা তেতলা পর্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে, সেটা যেমন খাড়া তেমনি অন্ধকার। ইহা কাহারও নিজস্ব নহে, অন্ততঃ ছয়জন ভাড়াটিয়ার ইহাই চলাচলের সাধারণ পথ। এই উঠা-নামার কার্যে দৈবাৎ পা ফসকাইলে প্রথমে পাথর-বাঁধানো রাজার রাজপথ, পরে তাঁহারই হাসপাতাল, এবং তৃতীয় গতিটা না ভাবই ভাল। এই দুরারোহ দারুময় সোপানশ্রেণীর সহিত পরিচিত হইয়া উঠিতে কিছু দীর্ঘকাল লাগে। অপূর্ব নূতন লোক, তাই সে প্রতি পদক্ষেপে অত্যন্ত সতর্ক হইয়া দরোয়ানের অনুবর্তী হইয়া উঠিতে লাগিল। দরোয়ান কতকটা উঠিয়া ডান দিকে দোতলার একটা দরজা খুলিয়া দিয়া জানাইল, সাহেব, ইহাই আপনার গৃহ।

ইহারই মুখোমুখি বামদিকের রুদ্ধদ্বারটা দেখাইয়া অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এটাতে কে থাকে?

দরোয়ান কহিল, কোই এক চীনা-সাহেব রহ্‌তেঁহে শুনা।

অপূর্ব ঠিক তাহার মাথার উপরে তেতলায় কে থাকে প্রশ্ন করায় সে কহিল, এক কালা সাহেব ত রহ্‌তেঁহে দেখা। কোই মান্দ্রাজ-বালে হোয়েঙ্গে জরুর!

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। এই একমাত্র আনাগোনার পথে উপরে এবং পার্শ্বে এই দুটি একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশীর পরিচয়ে তাহার মুখ দিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাস পড়িল। নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আরও মন খারাপ হইয়া গেল। কাঠের বেড়া-দেওয়া পাশাপাশি ছোট-বড় তিনটি কুঠরী। একটিতে কল, স্নানের ঘর, রান্নার জায়গা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় যাহা কিছু সমস্তই,—মাঝেরটি এই অন্ধকার সিঁড়ির ঘর, গৌরবে বৈঠকখানা বলা চলে, এবং সর্বশেষে রাস্তার ধারের কক্ষটি, অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার এবং আলোকিত,—এইটি শয়ন-মন্দির। আফিসের খরচায় এই ঘরটিকেই খাট, টেবিল এবং গুটিকয়েক চেয়ার দিয়া সাজানো হইয়াছে। পথের উপর ছোট একটুখানি বারান্দা আছে, সময় কাটানো অসম্ভব হইলে এখানে দাঁড়াইয়া লোক-চলাচল দেখা যায়। ঘরে হাওয়া নাই, আলো নাই, একটার মধ্যে দিয়া

আর একটায় যাইতে হয়,—ইহার সমস্তই কাঠের,—দেয়াল কাঠের, মেঝে কাঠের, ছাত কাঠের, সিঁড়ি কাঠের, আগুনের কথা মনে হইলে সন্দেহ হয় এতবড় সর্বাঙ্গসুন্দর জতুগৃহ বোধ করি রাজা দুর্যোধনও তাঁর পাণ্ডবভায়াদের জন্য তৈরি করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইহারই অভ্যন্তরে এই সুদূর প্রবাসে ঘরবাড়ি, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া, বৌদিদিদের ছাড়িয়া, মাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে স্মরণ করিয়া মুহূর্তের দুর্বলতায় তাহার চোখে জল আসিতে চাহিল। সামলাইয়া সে খানিকক্ষণ এঘর-ওঘর করিয়া একটা জিনিস দেখিয়া কিছু আশ্বস্ত হইল যে কলে তখনও জল আছে, স্নান ও রান্না দুই-ই হইতে পারে। দরোয়ান সাহস দিয়া জানাইল, অপব্যয় না করিলে এ শহরে জলের অভাব হয় না, যেহেতু প্রত্যেক দুই ঘর ভাড়াটিয়ার জন্য এ বাড়িতে একটা করিয়া বড় রকমের জলের চৌবাচ্চা উপরে আছে, তাহা হইতে দিবারাত্রিই জল সরবরাহ হয়। ভরসা পাইয়া অপূর্ব পাচককে কহিল, ঠাকুর, মা ত সমস্তই সঙ্গে দিয়েছেন, তুমি স্নান করে দুটি রাঁধবার উদ্যোগ কর, আমি ততক্ষণ দরোয়ানজীকে নিয়ে জিনিসপত্র কিছু কিছু গুছিয়ে ফেলি।

রসুই ঘরে কয়লা মজুত ছিল, কিন্তু বাঁধানো চুল্লী। নিকানো মুছানো তেমন হয় নাই, পরীক্ষা করিয়া কিছু কিছু কালির দাগ প্রকাশ পাইল। কে জানে এখানে কে ছিল, সে কোন্ জাত, কি রাঁধিয়াছে মনে করিয়া তাহার অত্যন্ত ঘৃণাবোধ হইল, ঠাকুরকে কহিল, এতে ত রাঁধা চল্‌বে না তেওয়ারী, অন্য বন্দোবস্ত করতে হবে। একটা তোলা-উনুন হলে বাইরে ঘরে বসে আজকের মতো দুটো চাল-ডাল ফুটিয়ে নেওয়া যেত, কিন্তু এ পোড়া দেশে কি তা মিলবে?

দরোয়ান জানাইল কোন অভাব নাই, মূল্য পাইলে সে দশ মিনিটের মধ্যে আনিয়া হাজির করিতে পারে। অতএব, সে টাকা লইয়া প্রস্থান করিল। ইতিমধ্যে তেওয়ারী রন্ধনের আয়োজন করিতে লাগিল, এবং অপূর্ব নিজে যথাযোগ্য স্থান মনোনীত করিয়া তোরঙ্গ বাক্স প্রভৃতি টানাটানি করিয়া ঘর সাজাইতে নিযুক্ত হইল। কাঠের আলনায় জামাকাপড় সুট প্রভৃতি গুছাইয়া ফেলিল, বিছানা খুলিয়া খাটের উপর তাহা পরিপাটি করিয়া বিছাইয়া লইল, তোরঙ্গ হইতে একটা নূতন টেবিল-ক্লথ বাহির করিয়া টেবিলে পাতিয়া কিছু কিছু বই ও লিখিবার সরঞ্জাম সাজাইয়া রাখিল, এবং উত্তরে খোলা জানালার পাল্লা-দুটা আপ্রান্ত প্রসারিত করিয়া তাহার দুই কোণে দুটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া শোবার ঘরটাকে অধিকতর আলোকিত এবং নয়নরঞ্জন জ্ঞান করিয়া সদ্যরচিত শয্যায় চিত হইয়া পড়িয়া একটা নিঃশ্বাস মোচন করিল। ক্ষণেক পরেই দরোয়ান লোহার চুল্লী কিনিয়া উপস্থিত করিলে তাহাতে আগুন দিয়া খিচুড়ি এবং যাহা-কিছু একটা ভাজাভুজি যত শীঘ্র সম্ভব প্রস্তুত করিয়া ফেলিতে আদেশ দিয়া অপূর্ব আর একদফা বিছানায় গড়াইয়া লইতে যাইতেছিল, হঠাৎ মনে পড়িল মা মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন নামিয়াই একটা টেলিগ্রাফ করিয়া দিতে। অতএব অবিলম্বে জামাটা গায়ে দিয়া প্রবাসের একমাত্র কর্ণধার দরোয়ানজীকে সঙ্গে করিয়া সে পোস্টঅফিসের উদ্দেশে আর একবার বাহির হইয়া পড়িল, এবং তাহারই কথামত তেওয়ারী ঠাকুরকে আশ্বাস দিয়া গেল, ফিরিয়া আসিতে তাহার একঘণ্টার বেশি লাগিবে না, কিন্তু ইতিমধ্যে সমস্ত যেন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আজ কি একটা খ্রীষ্টান পর্বোপলক্ষে ছুটি ছিল। অপূর্ব পথের দুইধারে চাহিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই বুঝিল এই গলিটা দেশী ও বিদেশী মেমসাহেবদের পাড়া, এবং প্রত্যেক বাটীতেই বিলাতী উৎসবের কিছু কিছু চিহ্ন দেখা দিয়াছে। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দরোয়ানজী, এখানে আমাদের বাঙালী লোকও ত অনেক আছে শুনেচি, তাঁরা সব কোন্ পাড়ায় থাকেন?

প্রত্যুত্তরে সে জানাইল যে এখানে পাড়া বলিয়া কিছু নাই, যে যেখানে খুশি থাকে। তবে 'অপসর লোগ্' এই গলিটাকেই বেশী পছন্দ করে। অপূর্ব নিজেও একজন 'অপসর লোগ্', কারণ, সেও বড় চাকরি করিতেই এ দেশে আসিয়াছে, এবং আপনি গোঁড়া হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও কোন ধর্মের বিরুদ্ধে তাহার বিদ্বেষ ছিল না। তথাপি, এইভাবে আপনাকে উপরে নীচে দক্ষিণে

বামে বাসায় ও বাসার বাহিরে চারিদিকেই খ্রীষ্টান প্রতিবেশী পরিবৃত দেখিয়া তার অত্যন্ত বিতৃষ্ণা বোধ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, আর কি কোথাও বাসা পাওয়া যায় না দরোয়ান?

দরোয়ানজী এ বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল নহে, সে চিন্তা করিয়া যাহা সঙ্গত বোধ করিল, তাহাই জবাব দিল, কহিল, খোঁজ করিলে পাওয়া যাইতেও পারে, কিন্তু এ ভাড়ায় এমন বাড়ি পাওয়া কঠিন।

অপূর্ব আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহারই নির্দেশমত অনেকখানি পথ হাঁটিয়া একটা ব্রাঞ্চ পোস্টআফিসে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন মাদ্রাজী তার-বাবু টিফিন করিতে গিয়াছেন, ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করিয়া যখন তাঁহার দেখা মিলল, তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আজ ছুটির দিন, বেলা দুইটার পরে আফিস বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এখন দুটা বাজিয়া পনর মিনিট হইয়াছে।

অপূর্ব অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, সে দোষ তোমার, আমার নয়। আমি একঘণ্টা অপেক্ষা করিতেছি।

লোকটা অপূর্বর মুখের প্রতি চাহিয়া নিঃসঙ্কোচে কহিল, না, আমি মাত্র মিনিট-দশেক ছিলাম না।

অপূর্ব তাহার সহিত বিস্তর ঝগড়া করিল, মিথ্যাবাদী বলিয়া তিরস্কার করিল, রিপোর্ট করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল, কিন্তু কিছুই হইল না। সে নির্বিকারচিত্তে নিজের খাতাপত্র দুরস্ত করিতে লাগিল, জবাবও দিল না। আর সময় নষ্ট করা নিষ্ফল বুঝিয়া অপূর্ব ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও ক্রোধে জ্বলিতে জ্বলিতে বড় টেলিগ্রাফ আফিসে আসিয়া অনেক ভিড় ঠেলিয়া অনেক বিলম্বে নিজের নির্বিঘ্ন পৌঁছান সংবাদ যখন মাকে পাঠাইতে পারিল তখন বেলা আর বড় নাই।

দুঃখের সাথী দরোয়ানজী সবিনয়ে নিবেদন করিল, সাহেব, হাম্‌কো ভি বহুত দূর যানা হ্যায়।

অপূর্ব একান্ত পরিশ্রান্ত ও অন্যমনস্ক হইয়াছিল, ছুটি দিতে আপত্তি করিল না ; তাহার ভরসা ছিল নম্বর-দেওয়া রাস্তাগুলা সোজা ও সমান্তরাল থাকায় গন্তব্যস্থান খুঁজিয়া লওয়া কঠিন হইবে না। দরোয়ান অন্যত্র চলিয়া গেল, সেও হাঁটিতে হাঁটিতে এবং গলির হিসাব করিতে করিতে অবশেষে বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সিঁড়িতে পা দিয়াই দেখিল, দ্বিতলে তাহার দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেওয়ারী ঠাকুর মস্ত একটা লাঠি ঠুকিতেছে এবং অনর্গল বকিতেছে, এবং প্রতিপক্ষ একব্যক্তি খালি-গায়ে পেন্টুলুন পরিয়া তেতালার কোঠায় নিজের খোলা দরজার সুমুখে দাঁড়াইয়া হিন্দী ও ইংরাজিতে ইহার জবাব দিতেছে, এবং একটা ঘোড়ার চাবুক লইয়া মাঝে মাঝে সাঁই সাঁই শব্দ করিতেছে। তেওয়ারী তাহাকে নীচে ডাকিতেছে, সে তাহাকে উপরে আহ্বান করিতেছে,—এবং এই সৌজন্যের আদান-প্রদান যে ভাষায় চলিতেছে তাহা না বলাই ভাল।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিয়া অপূর্ব তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। এইটুকু সময়ের মধ্যে ব্যাপারটা যে কি ঘটিল, কি উপায়ে তেওয়ারীজী এইটুকু অবসরেই প্রতিবেশী সাহেবের সহিত এতখানি ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইল সে তাহার কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু অকস্মাৎ বোধ হয় দুই পক্ষের দৃষ্টিই তাহার উপর নিপতিত হইল। তেওয়ারী মনিবকে দেখিয়া আর একবার সজোরে লাঠি ঠুকিয়া কি একটা মধুর সম্ভাষণ করিল, সাহেব তাহার জবাব দিয়া প্রচণ্ডশব্দে চাবুক আস্ফালন করিলেন, কিন্তু পুনশ্চ যুদ্ধঘোষণার পূর্বেই অপূর্ব দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া লাঠিসুদ্ধ তেওয়ারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তুই কি ক্ষেপে গেছিস? এই বলিয়া তাহাকে প্রতিবাদের অবসর না দিয়াই জোর করিয়া ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ভিতরে গিয়া সে রাগে দুঃখে ক্ষোভে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এই দেখুন হারামজাদা সাহেব কি কাণ্ড করেছে?

বাস্তবিক, কাণ্ড দেখিয়া অপূর্বর শ্রান্তি এবং ঘুম ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা একই কালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সুসিদ্ধ খেচরান্নের হাঁড়ি হইতে তখন পর্যন্ত উত্তাপ ও মসলার গন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে, কিন্তু তাহার উপরে, নীচে, আশেপাশে চতুর্দিকে জল থৈ থৈ করিতেছে। এ ঘরে আসিয়া দেখিল তাহার

সদ্যরচিত ধপধপে বিছানাটি ময়লা কালো জলে ভাসিতেছে। চেয়ারে জল, টেবিলে জল, বইগুলা জলে ভিজিয়াছে, বাক্স-তোরঙ্গের উপরে জল জমা হইয়া রহিয়াছে এমন কি এককোণে-রাখা কাপড়ের আলনাটি অবধি বাদ যায় নাই। তাহার দামী নূতন সুটটির গায়ে পর্যন্ত ময়লা জলের দাগ লাগিয়াছে।

অপূর্ব নিশ্বাস রোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করে হল?

তেওয়ারী আঙ্গুল দিয়া উপরের ছাদ দেখাইয়া কহিল, ওই শালা সাহেবের কাজ। ঐ দেখুন—

বস্তুতঃ, কাঠের ছাদের ফাঁক দিয়া তখন পর্যন্ত ময়লা জলের ফোঁটা স্থানে স্থানে চুয়াইয়া পড়িতেছিল। তেওয়ারী দুর্ঘটনা যাহা বিবৃত করিল তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

অপূর্ব যাইবার মিনিট-কয়েক পরেই সাহেব বাড়ি আসেন। আজ খ্রীষ্টানের পর্বদিন এবং খুব সম্ভব উৎসব ঘোরালো করিবার উদ্দেশেই তিনি বাহিরে হইতেই একেবারে ঘোর হইয়া আসেন। প্রথমে গীত ও পরে নৃত্য শুরু হয়। এবং অচিরেই উভয় সংযোগে শাস্ত্রোক্ত 'সংগীত' এরূপ দুর্দাম হইয়া উঠে যে, তেওয়ারীর আশঙ্কা হয় কাঠের ছাদ হয়ত বা সাহেবের এত বড় আনন্দ বহন করিতে পারিবে না, সবসুদ্ধ তাহার মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ইহাও সহিয়াছিল, কিন্তু রান্নার অদূরেই যখন উপর হইতে জল পড়িতে লাগিল, তখন সমস্ত নষ্ট হইবার ভয়ে তেওয়ারী বাহির হইয়া প্রতিবাদ করে। কিন্তু সাহেব,—তা কালাই হউন বা ধলাই হউন,—দেশী লোকের এই স্পর্ধা সহ্য করিতে পারেন না, উত্তেজিত হইয়া উঠেন, এবং মুহূর্তকালেই এই উত্তেজনা এরূপ প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত হয় যে, তিনি ঘরের মধ্যে গিয়া বালতি বালতি জল ঢালিয়া দেন। ইহার পরে যাহা ঘটিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য—অপূর্ব নিজেও কিছু কিছু স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

অপূর্ব কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, সাহেবের ঘরে কি আর কেউ নেই?

তেওয়ারী কহিল, কি জানি, আছে হয়ত। কে একজন মাতাল ব্যাটার সঙ্গে ঝুটোপুটি লড়াই করছিল। এই বলিয়া সে খিচুড়ির হাঁড়িটার প্রতি করুণচক্ষে চাহিয়া রহিল। অপূর্ব ইহার অর্থ বুঝিল। অর্থাৎ কে একজন প্রাণপণে বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্য একতিল কমাইতে পারে নাই।

অপূর্ব নীরবে বসিয়া রহিল। যাহা হইবার হইয়াছে, কিন্তু নূতন উপদ্রব আর ছিল না। উৎসব-আনন্দ-বিহ্বল সাহেবের নব উদ্যমের কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। বোধ করি এখন তিনি জমি লইয়াছিলেন,—কেবল নিগার তেওয়ারীকে যে এখনও ক্ষমা করেন নাই, তাহারই অস্ফুট উচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে শোনা যাইতে লাগিল।

অপূর্ব হাসিবার প্রয়াস করিয়া কহিল, তেওয়ারী, ভগবান না মাপালে এমনি মুখের গ্রাস নষ্ট হয়ে যায়। আয়, আমরা মনে করি আজও জাহাজে আছি। চিঁড়ে-মুড়কি-সন্দেশ এখনো ত কিছু আছে,—রাতটা চলে যাবে। কি বলিস?

তেওয়ারী মাথা নাড়িয়া সায় দিল, এবং ওই হাঁড়িটার প্রতি আর একবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া চিঁড়া-মুড়কির উদ্দেশে গাত্রোত্থান করিল। সৌভাগ্য এই যে, খাবারের বাক্সটা সেই যে ঢুকিয়াই রান্নাঘরের কোণে রাখা হইয়াছিল আর স্থানান্তরিত করা হয় নাই,—খ্রীষ্টানের জল অন্ততঃ এই বস্তুটার জাত মারিতে পারে নাই।

ফলারের যোগাড় করিতে করিতে তেওয়ারী রান্নাঘর হইতে কহিল, বাবু এখানে ত থাকা চলবে না!

অপূর্ব অন্যমনস্কভাবে বলিল, বোধ হয় না।

তেওয়ারী হালদার পরিবারের পুরাতন ভৃত্য, আসিবার কালে মা তাহার হাত ধরিয়া যে কথাগুলি বলিয়া দিয়াছিলেন সেই-সকল স্মরণ করিয়া সে উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিল, না বাবু এ ঘরে আর একদিনও না। রাগের মাথায় ভাল কাজ করিনি, সাহেবকে আমি অনেক গাল দিয়েছি।

অপূর্ব কহিল, হাঁ, গাল না দিয়ে তোর মারা উচিত ছিল।

তেওয়ারীর মাথায় ক্রোধের পরিবর্তে সুবুদ্ধির উদয় হইতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, না বাবু, না। ওরা হাজার হোক সাহেব। আমরা বাঙালী।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। তেওয়ারী সাহস পাইয়া প্রশ্ন করিল, আফিসের দরোয়ানজীকে বলে কাল সকালেই উঠে যাওয়া যায় না? আমার ত মনে হয় যাওয়াই ভাল।

অপূর্ব কহিল, বেশ ত, বলে দেখিস। সে মনে মনে বুঝিল সাহেবের প্রতি দেশী লোকের কর্তব্যবুদ্ধি ইতিমধ্যেই তেওয়ারীর সুতীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দুর্জনের প্রতি আর তাহার নালিশ নাই, বরঞ্চ, কালব্যয় না করিয়া নিঃশব্দে স্থানত্যাগই অবশ্যকর্তব্য স্থির করিয়াছে। কহিল, তাই হবে, তুই খাবার যোগাড় কর।

এই যে করি বাবু, বলিয়া সে কতকটা নিশ্চিন্তচিত্তে স্বকার্যে মনোনিবেশ করিল, কিন্তু তাহারই কথার সূত্র ধরিয়া ওই ওপরওয়ালা ফিরিঙ্গিটার দুর্ব্যবহার স্মরণ করিয়া অকস্মাৎ অপূর্বর সমস্ত চিত্ত ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, এ ত কেবল আমি এবং ওই মাতালটাই শুধু নয়। সবাই মিলিয়া লাঞ্ছনা এমন নিত্যনিয়ত সহিয়া যাই বলিয়াই ত ইহাদেরও স্পর্ধা দিনের পর দিন পুষ্ট ও পুঞ্জীভূত হইয়া আজ এমন অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে যে আমাদের প্রতি অন্যায়ের ধিক্কার সে উচ্চ শিখরে আর পৌঁছিতে পর্যন্ত পারে না। নিঃশব্দে ও নির্বিচারে সহ্য করাকেই কেবল নিজেদের কর্তব্য করিয়া তুলিয়াছি বলিয়া অপরের আঘাত করিবার অধিকার এমন স্বতঃই সুদৃঢ় ও উগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তাই আজ আমার চাকরটা পর্যন্ত আমাকে অবিলম্বে পলাইয়া আত্মরক্ষার উপদেশ দিতে পারিল, লজ্জা-শরমের প্রশ্ন পর্যন্ত তাহার মনে উদয় হইল না! কিন্তু সে বেচারা রান্নাঘরে বসিয়া চিঁড়া-মুড়কির ফলাহার প্রভুর জন্য সযত্নে প্রস্তুত করিতে লাগিল, জানিতেই পারিল না তাহারই পরিত্যক্ত মোটা বাঁশের লাঠিটা হাতে করিয়া অপূর্ব নিঃশব্দ-পদে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

দ্বিতলে সাহেবের দরজা বন্ধ ছিল, সেই রুদ্ধদ্বারে গিয়া সে বারংবার আঘাত করিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত পরে ভীত নারীকণ্ঠের ইংরাজিতে সাড়া আসিল, কে?

অপূর্ব কহিল, আমি নীচে থাকি। সেই লোকটাকে একবার চাই।

কেন?

তাকে দেখাতে চাই সে আমার কত ক্ষতি করেচে। তার ভাগ্য ভাল যে আমি ছিলাম না।

তিনি শুয়েছেন।

অপূর্ব অত্যন্ত পরুষকণ্ঠে কহিল, তুলে দিন, এ শোবার সময় নয়। রাত্রে শুলে আমি বিরক্ত করতে আসব না। কিন্তু এখন তার মুখের জবাব না নিয়ে আমি এক পা নড়ব না। এবং ইচ্ছা না করিলেও তাহার হাতের মোটা লাঠিটা কাঠের সিঁড়ির উপর ঠকাস করিয়া একটা মস্ত শব্দ করিয়া বসিল।

কিন্তু দ্বারও খুলিল না, কোন জবাবও আসিল না। মিনিট-দুই অপেক্ষা করিয়া অপূর্ব পুনশ্চ চীৎকার করিল, আমি কিছুতেই যাব না,—বলুন তাকে বাইরে আসতে।

ভিতরে যে কথা কহিতেছিল এবার সে রুদ্ধদ্বারের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া নম্র ও অতিশয় মৃদুকণ্ঠে কহিল, আমি তাঁর মেয়ে। বাবার হয়ে আপনার কাছে আমি ক্ষমা চাইচি। তিনি যা কিছু করেছেন সজ্ঞানে করেন নি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন, আপনার যত ক্ষতি হয়েছে কাল আমরা তার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ করব।

মেয়েটির কোমল স্বরে অপূর্ব নরম হইল, কিন্তু তাহার রাগ পড়িল না। কহিল, তিনি বর্বরের মত আমার যথেষ্ট লোকসান এবং ততোধিক উৎপাত করেছেন। আমি বিদেশী লোক বটে, কিন্তু আশা করি কাল সকালে নিজে দেখা করে আমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার চেষ্টা করবেন।

মেয়েটি কহিল, আচ্ছা। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আপনার মত আমরাও এখানে সম্পূর্ণ নূতন। মাত্র কাল বৈকালে আমরা মৌলমিন থেকে এসেছি।

অপূর্ব আর কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গেল। ঘরে গিয়া দেখিল তখন

পর্যন্ত তেওয়ারী ভোজনের উদ্যোগেই ব্যাপৃত আছে, এত কাণ্ড সে টেরও পায় নাই।

দু'টি খাইয়া লইয়া অপূর্ব তাহার শোবার ঘরে আসিয়া ভিজা তোশক বালিশ প্রভৃতি নীচে ফেলিয়া দিয়া রাত্রিটার মত কোনমতে একটা শয্যা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল।

প্রবাসের মাটিতে পা দিয়া পর্যন্ত তাহার ক্ষতি বিরক্তি ও হয়রানির অবধি নাই; কি জানি এ যাত্রা তাহার কিভাবে কাটিবে, কোথায় গিয়া ইহার কি পরিণাম ঘটিবে,—এই স্বস্তি-শান্তিহীন উদ্বিগ্ন চিন্তার সহিত মিশিয়া আরও একটা কথা তাহার মনে হইতেছিল ওই অপরিচিত খ্রীষ্টান মেয়েটিকে। সে সম্মুখে বাহির হয় নাই,—কেমন দেখিতে, কত বয়স, কিরূপ স্বভাব কিছুই অনুমান করিতে পারে নাই,—শুধু এইটুকু মাত্র জানা গিয়াছে তাহার ইংরাজি উচ্চারণ ইংরাজের মত নয়। হয়ত, মাদ্রাজী হইবে, না হয়ত, গোয়ানিজ কিংবা আর কিছু হইবে,—কিন্তু আর যাহাই হউক, সে যে আপনাকে উদ্ধত খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বী রাজার জাতি মনে করিয়া তাহার পিতার মত অত্যন্ত দর্পিতা নয়, সে যে তাঁহার অত্যাচারের জন্য লজ্জা অনুভব করিয়াছে,—তাহার সেই ভীত, বিনীত কণ্ঠের ক্ষমাভিক্ষা নিজের পরুষতীব্র অভিযোগের সহিত এখন যেন বেসুরা বাজিতে লাগিল। স্বভাবতঃ, সে উগ্রপ্রকৃতির নহে, কাহাকেও কঠিন কথা বলিতে তাহার বাধে, বিশেষতঃ তেওয়ারীর বর্ণনার সহিত মিলাইয়া যখন মনে হইল, হয়ত এই মেয়েটিই তাহার মাতাল ও দুর্বৃত্ত পিতাকে নিবারণ করিতে নীরবে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছে, তখন তাহার অনুতাপের সহিত মনে হইতে লাগিল, আজিকার মত চুপ করিয়া গেলেই ভাল হইত। যাহা ঘটিবার তাহা ত ঘটিয়াই ছিল, ক্রোধের উপর উপরে গিয়া কথাগুলি না বলিয়া আসিলেই চলিত।

ওঘরে তেওয়ারীর ঘষা-মাজার কর্কশ শব্দ অবিশ্রাম শুনা যাইতেছিল, হঠাৎ সেটা থামিল। এবং পরক্ষণেই তাহার গলা শোনা গেল, কে?

অপূর্ব চকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু জবাব শুনিতে পাইল না। কিন্তু তৎপরিবর্তে তেওয়ারীর প্রবল কণ্ঠস্বরই তাহার কানে আসিয়া পৌঁছিল। সে তাহার হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিল, না না, মেমসাহেব, ও-সব তুমি নিয়ে যাও। বাবুর খাওয়া হয়ে গেছে,—ও-সব আমরা ছুঁইনে।

অপূর্ব উঠিয়া বসিয়া কান খাড়া করিয়া সেই খ্রীষ্টান মেয়েটির কণ্ঠস্বর চিনিতে পারিল, কিন্তু কথা বুঝিতে পারিল না, বুঝাইয়া দিল তেওয়ারী। কহিল, কে বললে আমাদের খাওয়া হয়নি, হয়ে গেছে। ও-সব তুমি নিয়ে যাও, বাবু শুনলে ভারী রাগ করবেন বলচি।

অপূর্ব নিঃশব্দে উঠিয়া আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি হয়েছে তেওয়ারী?

মেয়েটি চৌকাটের এদিকে ছিল, তৎক্ষণাৎ সরিয়া গেল। তখন সেইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, আলো জ্বালা হয় নাই, সিঁড়ির দিক হইতে একটা অন্ধকার ছায়া ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে মেয়েটিকে বেশ স্পষ্ট দেখা না গেলেও বুঝা গেল। তাহার রঙ ইংরাজের মত সাদা নয়, কিন্তু খুব ফরসা। বয়স উনিশ-কুড়ি কিংবা কিছু বেশিও হইতে পারে, এবং একটু লম্বা বলিয়াই বোধ হয় কিছু রোগা দেখাইল। উপরের ঠোঁটের নীচে সুমুখের দাঁত-দুটি একটু উঁচু মনে না হইলে মুখখানি বোধ করি ভালই। পায়ে চটি জুতা, পরনে চমৎকার একখানি মাদ্রাজী শাড়ী,—সম্ভবতঃ, উৎসব বলিয়া,—কিন্তু ধরনটা কতক বাঙালী, কতক পার্শীদের মত। একটি জাপানী সাজিতে করিয়া কয়েকটি আপেল, নাশপাতি, গুটি-দুই বেদানা এবং একগোছা আঙুর সুমুখে মেজের উপর রাখা রহিয়াছে।

অপূর্ব কহিল, এ-সব কেন?

মেয়েটি বাহিরে হইতে ইংরাজিতে আস্তে আস্তে জবাব দিল, আজ আমাদের পর্বদিন, মা পাঠিয়ে দিলেন। তাছাড়া, আজ ত আপনাদের খাওয়াও হয়নি।

অপূর্ব কহিল, আপনার মাকে ধন্যবাদ জানাবেন, কিন্তু আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল আমাদের খাওয়া হয়নি তাঁকে কে বললে?

মেয়েটি লজ্জিতস্বরে কহিল, ওই নিয়েই প্রথমে ঝগড়া হয়। তাছাড়া আমরা জানি।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ, কিন্তু সত্যই আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, তা' বটে, কিন্তু সে ভাল হয়নি। আর এ-সব ত বাজারের ফল,—এতে ত কোন দোষ নেই।

অপূর্ব বুঝিল তাহাকে কোনমতে শান্ত করিবার জন্য অপরিচিত দুটি রমণীর উদ্বেগের অবধি নাই। অল্পক্ষণ পূর্বে সে লাঠি ও গলার শব্দে তাহার মেজাজের যে পরিচয় দিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কাল সকালে যে কি হইবে এই ভাবিয়াই তাহাকে প্রসন্ন করিতে ইহারা এই ভেট লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই, সদয়কণ্ঠে কহিল, না, কোন দোষ নেই। তেওয়ারীকে কহিল, বাজারের ফল, এ নিতে আর দোষ কি ঠাকুর?

তেওয়ারী ঠাকুর খুশী হইল না, কহিল, বাজারের ফল ত বাজার থেকে আনলেই চলবে। আজ রাত্রে আমাদের দরকারও নেই, আর মা আমাকে এ-সব করতে বার বার নিষেধ করেছেন। মেমসাহেব, এ-সব তুমি নিয়ে যাও,—আমাদের চাইনে।

মা যে নিষেধ করিয়াছেন বা করিতে পারেন, ইহাতে অসম্ভব কিছু নাই, এবং বহুদিনের পুরাতন ও বিশ্বাসী তেওয়ারী ঠাকুরকে যে এ-সকল ব্যাপারে প্রবাসে তাহার অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া দিতে পারেন তাহাও সম্ভব। এই সেদিন সে জননীর কাছে কি প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছে তাহার স্মরণ করিয়া মনে মনে কহিল, শুধু ত কেবল মাতৃ-আজ্ঞা নয়, আমি সত্য দিয়া আসিয়াছি। কিন্তু তথাপি ওই সঙ্কুচিত, লজ্জিত, অপরিচিত মেয়েটি—যে তাহাকে প্রসন্ন করিতে ভয়ে ভয়ে তাহার দ্বারে আসিয়াছে—তাহার উপহারের সামান্য দ্রব্যগুলিকে অস্পৃশ্য বলিয়া অপমান করাকেও তাহার সত্য বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু এ কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, মৌন হইয়া রহিল। তেওয়ারী বলিল, ও-সব আমরা ছোঁব না মেমসাহেব, তুমি তুলে নিয়ে যাও, আমি জায়গাটা ধুয়ে ফেলি।

মেয়েটি চুপ করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হাত বাড়াইয়া ডালাটি তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

অপূর্ব চাপা রুক্ষস্বরে কহিল, না হয় না-ই খেতিস, নিয়ে চুপি চুপি ফেলে দিতেও ত পারতিস!

তেওয়ারী আশ্চর্য হইয়া বলিল, নিয়ে ফেলে দেব? মিছামিছি নষ্ট করে লাভ কি বাবু!

লাভ কি বাবু! মুখ্যু, গোঁয়ার কোথাকার! এই বলিয়া অপূর্ব শুইতে চলিয়া গেল। বিছানায় শুইয়া প্রথমটা তাহার তেওয়ারীর প্রতি ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু যতই সে ব্যাপারটা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে লাগিল ততই মনে হইতে লাগিল, এ আমি পারিতাম না, কিন্তু হয়ত এ ভালই হইয়াছে সে স্পষ্ট করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। হঠাৎ তাহার বড় মাতুলকে মনে পড়িল। সেই সদাচারী, নিষ্ঠাবান, পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ একদিন তাহাদের বাটীতে অন্নাহার করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। স্বীকার করিবার জো নাই করুণাময়ী তাহা জানিতেন তথাপি স্বামীর সহিত ভ্রাতার মনোমালিন্য বাঁচাইতে কি একটা কৌশল অবলম্বন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাহাতে মৃদু হাসিয়া কহিয়াছিলেন, না দিদি, সে হতে পারে না। হালদার মহাশয় রাগী লোক, এ অপমান তিনি সইবেন না,—হয়ত বা তোমাকেও কিছু ভাগ নিতে হবে;—কিন্তু আমার স্বর্গীয় গুরুদেব বলতেন, মুরারি, সত্যপালনের দুঃখ আছে, তাকে আঘাতের মধ্যে দিয়ে বরঞ্চ একদিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু বঞ্চনা প্রতারণার মিষ্ট পথ দিয়ে সে কোনদিন আনাগোনা করে না। এই ভাল, যে আমি না খেয়েই চলে গেলাম বোন।

এই লইয়া করুণাময়ীর অনেকদিন অনেক দুঃখ গিয়াছে, কিন্তু কোনদিন দাদাকে তিনি দোষ দেন নাই। সেই কথা স্মরণ করিয়া অপূর্ব মনে মনে বার বার কহিতে লাগিল,—এ ভালই হয়েছে,—তেওয়ারী ঠিক কাজই করেছে।

তিন

অপূর্বর ইচ্ছা ছিল সকালে বাজারটা একবার ঘুরিয়া আসে। ইহার ম্লেচ্ছাচারের দুর্নাম ত সমুদ্র পার হইয়া তাহার মায়ের কানে পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিয়াছে, অতএব তাহাকে অস্বীকার করা চলে না,—মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু হিন্দুত্বের ধ্বজা বহিয়া সে-ই ত প্রথম কালাপানি পার হইয়া আসে নাই!—সত্যকার হিন্দু আরও ত থাকিতে পারেন যাঁহারা চাকরির প্রয়োজন ও শাস্ত্রের অনুশাসন দুয়ের মাঝামাঝি একটা পথ ইতিপূর্বেই আবিষ্কার করিয়া ধর্ম ও অর্থের বিরোধ ভঞ্জন করতঃ সুখে বসবাস করিতেছেন! সেই সুগম পথের সন্ধান লইতে ইঁহাদের সহিত পরিচিত হওয়া অত্যাবশ্যক, এবং, বিদেশে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবার এত বড় সুযোগ বাজার ছাড়া আর কোথায় মিলিবে? বস্তুতঃ, নিজের কানে শুনিয়া ও চোখে দেখিয়া এই জিনিসটাই তাহার স্থির করা প্রয়োজন যে, জননীর বিরুদ্ধাচারী না হইয়া এ দেশে বাস্তবিক বাস করা চলে কি না। কিন্তু বাহির হইতে পারিল না, কারণ, উপরের সাহেবটা যে কখন ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিবে তাহার ঠিকানা নাই। সে যে আসিবেই তাহাতে সন্দেহ ছিল না। একে ত, উৎপাত সে সজ্ঞানে করে নাই, এবং আজ যখন তাহার নেশা ছুটিবে, তখন স্ত্রী ও কন্যা তাহাকে কিছুতেই অব্যাহতি দিবে না, তাহাদের মুখের এই অনুচ্চারিত ইঙ্গিত সে গতকল্যই আদায় করিয়া আসিয়াছে। মেয়েটিকে আজ ঘুম ভাঙ্গিয়া পর্যন্ত অনেকবার মনে পড়িয়াছে। ঘুমের মধ্যেও যেন তাহার ভদ্রতা, তাহার সৌজন্য, তাহার বিনয়নম্র কণ্ঠস্বর কানে কানে একটা জানা সুরের রেশের মত আনাগোনা করিয়া গেছে। মাতাল পিতার দুরাচারে ওই মেয়েটিরও যেমন লজ্জার অবধি ছিল না, মূর্খ তেওয়ারীর রূঢ়তায় অপূর্ব নিজেও তেমনি লজ্জা বোধ না করিয়া পারে নাই। পরের অপরাধে অপরাধী হইয়া এই দুটি অপরিচিত মনের মাঝখানে বোধ করি এইখানেই একটি সমবেদনার সূক্ষ্ম সূত্র ছিল, যাহাকে না বলিয়া অস্বীকার করিতে অপূর্বর মন সরিতেছিল না। হঠাৎ মাথার উপরে প্রতিবেশীদের জাগিয়া উঠার সাড়া নীচে আসিয়া পৌঁছিল, এবং প্রত্যেক স-বুট পদক্ষেপেই সে আশা করিতে লাগিল এইবার সাহেব তাহার দরজায় নামিয়া আসিয়া দাঁড়াইবেন। ক্ষমা সে করিবে তাহা স্থির, কিন্তু, বিগত দিনের বীভৎসতা কি করিলে যে সহজ এবং সামান্য হইয়া বিবাদের দাগ মুছাইয়া দিবে ইহাই হইল তাহার চিন্তা। কিন্তু মার্জনা চাহিবার সময় বহিয়া যাইতে লাগিল। উপরে ছোটখাটো পদক্ষেপের সঙ্গে মিশিয়া সাহেবের জুতার শব্দ ক্রমশঃ সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে তাঁহার পায়ের বহর ও দেহের ভারের পরিচয় দিল, কিন্তু দীনতার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। এইরূপে আশায় ও উদ্বেগে প্রতীক্ষা করিয়া ঘড়িতে যখন নয়টা বাজিল, এবং নিজের নূতন আফিসের জন্য প্রস্তুত হইবার সময় তাহার আসন্ন হইয়া উঠিল, তখন শোনা গেল সাহেব নীচে নামিতে শুরু করিয়াছেন। তাঁহার পিছনে আরও দুটি পায়ের শব্দ অপূর্ব কান পাতিয়া শুনিল। অনতিবিলম্বে তাহার কবাটের লোহার কড়ার ভীষণ ঝন্‌ঝনা উঠিল, এবং রান্নাঘর হইতে তেওয়ারী ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, বাবু, কালকের সাহেব ব্যাটা এসে কড়া নাড়চে। তাহার উত্তেজনা কণ্ঠস্বরে গোপন রহিল না।

অপূর্ব কহিল, দোর খুলে দিয়ে তাঁকে আসতে বল্‌।

তেওয়ারী দ্বার খুলিয়া দিতেই অপূর্ব অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইল,—এই, তুম্‌হারা সাব্‌ কিধর্‌?

উত্তরে তেওয়ারী কি কহিল ভাল শুনা গেল না, খুব সম্ভব সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিল কিন্তু প্রত্যুত্তরে সাহেবের আওয়াজ সিঁড়ির কাঠের ছাদে ধাক্কা খাইয়া যেন হুঙ্কার দিয়া উঠিল, বোলাও!

ঘরের মধ্যে অপূর্ব চমকিয়া উঠিল। বাপ্‌ রে! একি অনুতাপের গলা! একবার মনে করিল সাহেব সকালেই মদ খাইয়াছে, অতএব, এ সময়ে যাওয়া উচিত কিনা ভাবিবার পূর্বেই পুনশ্চ হুকুম আসিল, বোলাও জল্‌দি।

অপূর্ব আস্তে আস্তে কাছে গিয়া দাঁড়াইল। সাহেব এক মুহূর্ত তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইংরাজি জান?

জানি।

আমি ঘুমিয়ে পড়ার পরে কাল তুমি আমার উপরে গিয়েছিলে?

হাঁ।

সাহেব কহিলেন, ঠিক। লাঠি ঠুকেছিলে? অনধিকার প্রবেশের জন্য দোর ভাঙতে চেষ্টা করেছিলে?

অপূর্ব বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। সাহেব বলিলেন, দৈবাৎ দোর খোলা থাকলে ঘরে ঢুকে তুমি আমার স্ত্রীকে কিংবা মেয়েকে আক্রমণ করতে। তাই আমি জেগে থাকতে যাওনি?

অপূর্ব ধীরে ধীরে কহিল, তুমি ত ঘুমিয়েছিলে, এ-সব জানলে কি করে?

সাহেব কহিলেন, সমস্ত আমার মেয়ের কাছে শুনেচি। তাকে তুমি গালিগালাজ করে এসেচ। এই বলিয়া সে তাহার পার্শ্ববর্তিনী কন্যাকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করিল। এ সেই মেয়েটি কিন্তু কালও ইহাকে ভাল করিয়া অপূর্ব দেখিতে পায় নাই, আজও সাহেবের বিপুলায়তনের অন্তরালে তাহার কাপড়ের পাড়টুকু ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাইল না। সে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিন্তু এটুকু বুঝা গেল ইহারা সহজ মানুষ নয়। সমস্ত ব্যাপারটাকে ইচ্ছা করিয়া বিকৃত ও উলটা করিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। অতএব, অত্যন্ত সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

সাহেব কহিলেন, আমি জেগে থাকলে তোমাকে লাথি মেরে রাস্তায় ফেলে দিতাম, এবং একটা দাঁতও তোমার মুখে আস্ত রাখতাম না, কিন্তু সে সুযোগ যখন হারিয়েছি, তখন, পুলিশের হাতে যেটুকু বিচার পাওয়া যায় সেইটুকু নিয়েই এখন সন্তুষ্ট হতে হবে। আমার যাচ্ছি তুমি এর জন্যে প্রস্তুত থাক গে।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। কিন্তু তাহার মুখ অত্যন্ত ম্লান হইয়া গেল।

সাহেব মেয়ের হাত ধরিয়া কহিলেন, এস। এবং নামিতে নামিতে বলিলেন, কাওয়ার্ড! অরক্ষিত স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা! আমি তোমাকে এমন শিক্ষা দেব যা তুমি জীবনে ভুলবে না।

তেওয়ারী পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিল, তাঁহারা অন্তর্হিত হইতেই কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, কি হবে ছোটবাবু?

অপূর্ব তাচ্ছিল্যভরে কহিল, হবে আবার কি!

কিন্তু তাহার মুখের চেহারা যে অন্যকথা কহিল তেওয়ারী তাহা বুঝিল। কহিল, তখনি ত বলেছিলুম বাবু, যা হবার হয়ে গেছে আর ওদের ঘেঁটিয়ে কাজ নাই। ওরা হ'ল সাহেব-মেম।

অপূর্ব বলিল, সাহেব-মেম তা কি?

তেওয়ারী কহিল, ওরা যে পুলিশে গেল!

অপূর্ব বলিল, গেল তা কি?

তেওয়ারী ব্যাকুল হইয়া কহিল, বড়বাবুকে একটা তার করে দিই ছোটবাবু, তিনি না হয় এসে পড়ুন।

তুই ক্ষেপ্‌লি তেওয়ারী! যা দেখ্ গে, ওদিকে বুঝি সব পুড়ে-ঝুড়ে গেল। সাড়ে দশটায় আমাকে বেরোতে হবে। এই বলিয়া সে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। তেওয়ারীও রান্নাঘরে গিয়া প্রবেশ করিল কিন্তু রাঁধ-বাড়ার কাজ হইতে বাবুর আফিসে যাওয়া পর্যন্ত যা কিছু সমস্তই তাহার কাছে একেবারে অর্থহীন হইয়া গেল। এবং যতই সে মনে মনে আপনাকে সমস্ত আপদের হেতু বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, ততই তাহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত এদেশের ম্লেচ্ছতার উপরে, গ্রহনক্ষত্রের মন্দ দৃষ্টির উপরে, পুরোহিতের গণনার ভ্রমের উপরে এবং সর্বোপরি করুণাময়ীর অর্থলিপ্সার উপরে দোষ চাপাইয়া কোনমতে একটু সান্ত্বনা খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

এমনিধারা মন লইয়াই তাহাকে রান্নার কাজ শেষ করিতে হইল। করুণাময়ীর হাতেগড়া

মানুষ সে, অতএব মন তাহার যতই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাক হাতের কাজে কোথাও ভুলচুক হইল না। যথাসময়ে আহারে বসিয়া অপূর্ব তাকে সাহস দিবার অভিপ্রায়ে রন্ধনের কিছু বাড়াবাড়ি প্রশংসা করিল। একদফা অন্ন-ব্যঞ্জনের চেহারার যশঃকীর্তন করিল এবং দুই-এক গ্রাস মুখে পুরিয়াই কহিল, আজ রেঁধেছিস্ যেন অমৃত, তেওয়ারী। ক'দিন খাইনি, ভেবেছিলাম বুঝি বা সব পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে ফেলবি। যে ভীতু লোক তুই—আচ্ছা মানুষটিকে মা বেছে বেছে সঙ্গে দিয়েছিলেন।

তেওয়ারী কহিল, হুঁ।

অপূর্ব তাহার প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিল, মুখখানা যে একেবারে তোলো হাঁড়ি করে রেখেছিস রে? এবং শুধু কেবল তেওয়ারীর নয়, নিজের মন হইতেও সমস্ত ব্যাপারটা লঘু করিয়া দিবার চেষ্টায় কৌতুক করিয়া বলিল হারামজাদা ফিরিঙ্গির শাসানোর ঘটাটা একবার দেখলি? পুলিশে যাচ্চেন!—আরে, যা না তাই! গিয়ে করবি কি শুনি? তোর সাক্ষী আছে?

তেওয়ারী শুধু কহিল, সাহেব-মেমদের কি সাক্ষী-সাবুদ লাগে বাবু, ওরা বললেই হয়।

অপূর্ব কহিল, হাঁ বললেই হয়! আইন-কানুন যেন নেই! তাছাড়া ওরা আবার কিসের সাহেব-মেম? রঙ্‌টি ত একেবারে আমার বার্নিশ-করা জুতো! ব্যাটা কচি ছেলেকে যেন জুজুর ভয় দেখিয়ে গেল! নচ্ছার, পাজী, হারামজাদা!

তেওয়ারী চুপ করিয়া রহিল। আড়ালে গালি-গালাজ করিবার মত তেজও আর তাহার ছিল না।

অপূর্ব কিছুক্ষণ নিঃশব্দে আহার করার পরে হঠাৎ মুখ তুলিয়া কহিল, আর ঐ মেয়েটা কি বজ্জাত, তেওয়ারী! কাল এলো যেন ভিজে বেড়ালটি! আর ওপরে গিয়েই যত সব মিছে কথা লাগিয়েচে! চেনা ভার!

তেওয়ারী কহিল, খিষ্টান যে!

তা বটে! অপূর্বর তৎক্ষণাৎ মনে হইল ইহাদের খাদ্যাখাদ্যের জ্ঞান নাই, এঁটো-কাঁটা মানে না, সামাজিক ভাল-মন্দের কোন বোধ নাই,—কহিল, হতভাগা, নচ্ছার ব্যাটারা। জানিস তেওয়ারী, আসল সাহেবেরা এদের কি রকম ঘেন্না করে—এক টেবিলে বসে কখন খায় না পর্যন্ত—যতই হ্যাটকোট পরুন, আর যতই কেননা গীর্জেয় আনাগোনা করুন। যারা জাত দেয়, তারা কি কখখনো ভাল হতে পারে তুই মনে করিস?

তেওয়ারী তাহা কোনো দিনই মনে করে না, কিন্তু নিজেদের এই আসন্ন সর্বনাশের সম্মুখে দাঁড়াইয়া অপরে কে ভাল আর কে মন্দ, এ আলোচনায় তাহার প্রবৃত্তি হইল না। ছোটবাবুর আফিসে যাইবার সময় হইয়া আসিতেছে, তখন একাকী ঘরের মধ্যে যে কি করিয়া তাহার সময় কাটিবে সে জানে না। সাহেব থানায় খবর দিতে গিয়াছে, ফিরিয়া আসিয়া হয়ত দোর ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, হয়ত পুলিশের দল সঙ্গে করিয়া আনিবে,—হয়ত তাহাকে বাঁধিয়া লইয়া যাইবে,—কি যে হইবে, আর কি যে হইবে না সমস্ত অনিশ্চিত। এ অবস্থায় আসল ও নকল সাহেবের প্রভেদ কতখানি, একের টেবিলে অপরে খায় কি না, এবং না খাইলে অন্যপক্ষের লাঞ্ছনা ও মনস্তাপ কতদূর বৃদ্ধি পায় এ-সকল সংবাদের প্রতি সে লেশমাত্র কৌতূহল অনুভব করিল না। আহারাদি শেষ করিয়া অপূর্ব কাপড় পরিতেছিল, তেওয়ারী ঘরের পর্দাটা একটুখানি সরাইয়া মুখ বাহির করিয়া কহিল, একটু দেখে গেলে হোতো না?

কি দেখে গেলে?

ওদের ফিরে আসা পর্যন্ত—

অপূর্ব কহিল, তা কি হয়। আজ আমার চাকরির প্রথম দিন,—কি তারা ভাববে বল ত?

তেওয়ারী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব কহিল, তুই দোর দিয়ে নির্ভয়ে বসে থাক না—আমি

যত শীঘ্র পারি ফিরে আসবো,—দোর ত আর ভাঙ্‌তে পারবে না,—কি করবে সে ব্যাটা!

তেওয়ারী কহিল, আচ্ছা। কিন্তু সে যে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপিবার চেষ্টা করিল অপূর্ব তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। বাহির হইবার সময়ে দ্বারে খিল দিবার পূর্বে তেওয়ারী গলাটা খাটো করিয়া বলিল, আজ আর হেঁটে যাবেন না ছোটবাবু, রাস্তায় একটা গাড়ি ডেকে নেবেন।

আচ্ছা সে দেখা যাবে, এই বলিয়া অপূর্ব সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। তাহার চলার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল না যে তাহার মনের মধ্যে নূতন চাকরির আনন্দ আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে।

বোথা কোম্পানির অংশীদার, পূর্ব অঞ্চলের ম্যানেজার রোজেন সাহেব সম্প্রতি বর্মায় ছিলেন, রেঙ্গুনের আফিস তিনিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অপূর্বকে যথেষ্ট সহৃদয়তার সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার চেহারা কথাবার্তা ও ইউনিভারসিটির ডিগ্রী প্রভৃতি দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন। সমস্ত কর্মচারীদের ডাকিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন, এবং যে মাস দুই-তিন কাল তিনি এখানে আছেন তাহার মধ্যে ব্যবসায়ের সমস্ত রহস্য শিখাইয়া দিবেন আশা দিলেন। কথা-বার্তায়, আলাপে-পরিচয়ে ও নূতন উৎসাহে ভিতরের গ্লানিটা তাহার এক সময়ে কাটিয়া গেল। একটি লোক তাহাকে বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট করিল সে আফিসের এ্যাকাউন্টেন্ট। মারাঠি ব্রাহ্মণ, নাম রামদাস তলওয়ারকর। বয়স বোধ হয় তারই মত,—হয়ত বা কিছু বেশী। দীর্ঘাকৃতি, বলিষ্ঠ, গৌরবর্ণ,—সুপুরুষ বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। পরনে পায়জামা ও লম্বা কোট, মাথায় পাগড়ি, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা;—ইংরাজি কথাবার্তা চমৎকার শুদ্ধ, কিন্তু অপূর্বর সহিত সে প্রথম হইতে হিন্দীতে কথাবার্তা শুরু করিল। অপূর্ব ভাল হিন্দী জানিত না, কিন্তু যখন দেখিল, সে হিন্দী ছাড়া আর কিছুতেই জবাব দেয় না, তখন সেও হিন্দী বলিতে আরম্ভ করিল। অপূর্ব কহিল, এ-ভাষা আমি ভাল জানিনে, অনেক ভুল হবে।

রামদাস কহিল, ভুল আমারও হয়, আমাদের কারও এটা মাতৃভাষা নয়।

অপূর্ব বলিল, যদি পরের ভাষাতেই বলতে হয় ত, ইংরিজি দোষ করলে কি?

রামদাস কহিল, ইংরিজি আমার আরও ঢের বেশী ভুল হয়। একটু হাসিয়া কহিল, আপনি না হয় ইংরাজিতেই বলবেন, কিন্তু আমি হিন্দীতে জবাব দিলে আমাকে মাপ করতে হবে।

অপূর্ব কহিল, আমিও হিন্দী বলতেই চেষ্টা করব, কিন্তু ভুল হলে আমাকেও মাপ করতে হবে।

এই আলাপের মধ্যে রোজেন সাহেব নিজেই ম্যানেজারের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, হল্যাণ্ডের লোক, বেশভূষার পারিপাট্য নাই, মুখে প্রচুর দাড়িগোঁফ, ইংরাজি উচ্চারণ ভাঙ্গ-ভাঙ্গা, পাকা ব্যবসায়ী—ইতিমধ্যেই বর্মার নানাস্থানে ঘুরিয়া, নানা লোকের কাছে তথ্য সংগ্রহ করিয়া কাজকর্মের একটা খসড়া প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, সেই কাগজখানা অপূর্বর টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, এ সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য একটা জানতে চাই। তলওয়ারকরকে কহিলেন, আপনার ঘরেও এক কাপি পাঠিয়ে দিয়েছি। না না, এখন থাক—আজ ম্যানেজারের সম্মানে দুটোর সময় আফিসের ছুটি। দেখুন, আমি ত শীঘ্রই চলে যাবো, তখন, আপনাদের দুজনের পরেই সমস্ত কাজকর্ম নির্ভর করবে। আমি ইংলিশম্যান নই,—যদিচ, এ রাজ্য একদিন আমাদেরই হতে পারত,—তবুও তাদের মত আমরা ইণ্ডিয়ানদের ছোট মনে করিনে, নিজেদের সমকক্ষই ভাবি,—কেবল ফার্মের নয়, আপনাদের নিজেদের উন্নতিও আপনাদের নিজেদের কর্তব্যজ্ঞানের উপরে—আচ্ছা, গুড্ ডে—আফিস দুটোর সময় বন্ধ হওয়া চাই—ইত্যাদি বলিতে বলিতে তিনি যেমন ক্ষিপ্রপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন তেমনি ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন। এবং ইহার অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার মোটরের শব্দ বাহিরের দ্বারের কাছে শুনিতে

পাওয়া গেল।

বেলা দুইটার সময় উভয়ে একত্র পথে বাহির হইল। তলওয়ারকর শহরে থাকে না, প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে ইন্‌সিন্‌ নামক স্থানে তাহার বাসা। বাসায় তাহার স্ত্রী ও একটি ছোট মেয়ে থাকে, সঙ্গে খানিকটা জমি আছে সেখানে তরিতকারি অনায়াসে জন্মাইতে পারা যায়, চমৎকার খোলা জায়গা, শহরের গণ্ডগোল নাই,—যথেষ্ট ট্রেন, যাতায়াতের কোন অসুবিধা হয় না।—হালদার বাবুজী, কাল আফিসের পরে আমার ওখানে আপনার চায়ের নিমন্ত্রণ রইল।

অপূর্ব কহিল, আমি চা খাইনে বাবুজী!

খান না? আমিও পূর্বে খেতাম না, আমার স্ত্রী এখনও রাগ করেন,—আচ্ছা, না হয় ফলমূল—শরবত—কিংবা—আমরা ত আপনার মতই ব্রাহ্মণ—

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, ব্রাহ্মণ ত বটেই। কিন্তু আপনারা যদি আমাদের হাতে খান তবেই আমি শুধু আপনার স্ত্রীর হাতে খেতে পারি।

রামদাস কহিল, আমি ত খেতে পারিই, কিন্তু আমার স্ত্রীর কথা,—আচ্ছা, সে তাঁকে জিজ্ঞেসা করে বলব। আমাদের মেয়েরা বড়,—আচ্ছা, আপনার বাসা ত কাছেই চলুন না আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি, আমার ট্রেন ত সেই পাঁচটায়।

অপূর্ব প্রমাদ গণিল। এতক্ষণ সে সমস্ত ভুলিয়াছিল, বাসার কথায় চক্ষের নিমিষে তাহার সমস্ত হাঙ্গামা, সমস্ত কদর্যতা বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় চমকিয়া মুখের সরস শ্রী যেন মুছিয়া দিয়া গেল। এখানে পা দিয়াই সে এমন একটা কদর্য নোংরা ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এ কথা জানিতে দিতে তাহার মাথা কাটা গেল। এতক্ষণ সেখানে যে কি হইয়াছে সে কিছু জানে না। হয়ত,কত কি হইয়াছে। একাকী তাহারই মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। এমন একজন পরিচিত মানুষকে সঙ্গে পাইলে কত সুবিধা, কত সাহস। কিন্তু সদ্য পরিচয়ের এই আরম্ভকালেই সে যে হঠাৎ কি ভাবিয়া বসিবে এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, কহিল, দেখুন সমস্ত বিশৃঙ্খল—মুখের কথাটা সে শেষ করিতেও পারিল না। তাহার সঙ্কোচ ও লজ্জা অনুভব করিয়া রামদাস সহাস্যে কহিল, এক রাত্রে শৃঙ্খলা আমি ত আশা করিনে বাবুজী। আমাকেও একদিন নূতন বাসা পাততে হয়েছিল, তবু ত আমার স্ত্রী ছিলেন, আপনার তাও সঙ্গে নেই। আপনি আজ লজ্জা পাচ্ছেন, কিন্তু তাঁকে না নিয়ে এলে এক বচ্ছর পরেও এই লজ্জা আপনার ঘুচবে না তা বলে রাখচি। চলুন, দেখি কি করতে পারি—বিশৃঙ্খলার মাঝখানেই ত বন্ধুর দরকার।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। সে স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় লোক, তাহার স্ত্রীর একান্ত অসদ্ভাবের কথাটা সে অন্য সময়ে কৌতুক করিয়া বলিতেও পারিত, কিন্তু এখন হাসি-তামাশার কথা তাহার মনেও আসিল না। এই নির্বান্ধব দেশে আজ তাহার বন্ধুর একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু, সদ্যপরিচিত এই বিদেশী বন্ধুটিকে সেই প্রয়োজনে আহ্বান করিতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার কথায় সে যে ঠিক সায় দিল তাহা নহে, কিন্তু উভয়ে চলিতে চলিতে যখন তাহার বাসার সম্মুখ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তলওয়ারজীকে গৃহে আমন্ত্রণ না করিয়া পারিল না। উপরে উঠিতে গিয়া দেখিতে পাইল সেই ক্রীশ্চান মেয়েটিও ঠিক সেই সময়েই অবতরণ করিতেছে। বাপ তাহার সঙ্গে নাই, সে একা। দুজনে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটি কাহারও প্রতি দৃষ্টিপাত করিল না, ধীরে ধীরে নামিয়া কিছু দূরে রাস্তায় গিয়া যখন পড়িল, রামদাস জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা তেতলায় থাকেন বুঝি?

অপূর্ব কহিল, হাঁ।

আপনাদেরই বাঙালী?

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া কহিল, না দেশী ক্রীশ্চান। খুব সম্ভব, মাদ্রাজী, কিংবা গোয়ানিজ, কিংবা আর কিছু,—কিন্তু বাঙালী নয়।

রামদাস কহিল, কিন্তু কাপড় পরার ধরন ত ঠিক আপনাদের মত?

অপূর্ব কিছু আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, আমাদের খবর আপনি জানলেন কি করে?

রামদাস বলিল, আমি? বোম্বায়ে, পুণায়, সিমলায় অনেক বাঙালী মহিলাকে আমি দেখেছি, এমন সুন্দর কাপড়-পরা ভারতবর্ষের আর কোন জাতের নেই।

তা হবে—এই বলিয়া অন্যমনস্ক অপূর্ব তাহার বাসার রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। খানিক পরে ভিতর হইতে সতর্ক-কণ্ঠের সাড়া আসিল কে?

আমি রে, আমি, দোর খোল্, তোর ভয় নেই, বলিয়া অপূর্ব হাসিল। কারণ, ইতিমধ্যে ভয়ানক কিছু ঘটে নাই, তেওয়ারী নিরাপদে ঘরের মধ্যেই আছে অনুভব করিয়া তাহার মস্ত যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামদাস এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া খুশী হইল, কহিল, আমি যা ভয় করেছিলাম তা নয়! আপনার চাকরটি ভাল, সমস্তই একপ্রকার গুছিয়ে ফেলেছে। আসবাবগুলি আমিই পছন্দ করে কিনেছিলাম। আপনার আরও কি-কি দরকার আমাকে জানালেই কিনে পাঠিয়ে দেব—রোজেন সাহেবের হুকুম আছে।

তেওয়ারী মৃদুস্বরে কহিল, আর আসবাবে কাজ নেই বাবু, ভালয়-ভালয় বেরুতে পারলে বাঁচি।

তাহার মন্তব্যে কেহ মনোযোগ করিল না, কিন্তু, অপূর্বর কানে গেল। সে একসময়ে আড়ালে জিজ্ঞাসা করিল, আর কিছু হয়েছিল রে?

না।

তবে যে ও-কথা বললি?

তেওয়ারী জবাব দিল, বললুম সাধে? সারা দুপুরবেলাটা সাহেব যা ঘোড়দৌড় করে বেড়িয়েচে তাতে মানুষ টিক্‌তে পারে?

অপূর্ব ভাবিল, ব্যাপারটা সত্যই হয়ত গুরুতর নয়, অন্ততঃ একটা ইতরের ছোটখাটো সমস্ত তুচ্ছ উপদ্রবকেই বড় করিয়া তুলিয়া অনুক্ষণ তেওয়ারীর সহিত একযোগে অশান্তির জের টানিয়া চলাও অত্যন্ত দুঃখের, তাই সে কতকটা তাচ্ছিল্যভরে কহিল, তা সে কি চলবে না তুই বলতে চাস? কাঠের ছাদে একটু বেশী শব্দ হয়ই।

তেওয়ারী রাগ করিয়া কহিল, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘোড়ার মত পা ঠোকা কি চলা?

অপূর্ব বলিল, তা হলে হয়ত আবার মদ খেয়েছিল—

তেওয়ারী উত্তর দিল, তা হবে। মুখ শুঁকে তার দেখিনি। এই বলিয়া সে বিরক্তমুখে রান্নাঘরে চলিয়া গেল, এবং বলিতে বলিতে গেল, তা সে যাই হোক, এ ঘরে বাস করা আর পোষাবে না।

তেওয়ারীর অভিযোগ অন্যায়ও নয়, অপ্রত্যাশিতও নয় ; দুর্জনের অসমাপ্ত অত্যাচার যে একটা দিনেই সমাপ্ত হইবে এ ভরসা সে করে নাই। তথাপি অনিশ্চিত আশঙ্কায় মন তাহার অতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। প্রবাসের প্রথম প্রভাতটা তাহার কুয়াশার মধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল, মাঝে কেবল আফিসের সম্পর্কে একটুখানি আলোর আভাস দেখা দিয়াছিল, কিন্তু দিনান্তের কাছাকাছি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আবার তাহার চোখে পড়িল।

ট্রেনের সময় হইতে রামদাস বিদায় গ্রহণ করিল। কি জানি তেওয়ারীর নালিশ ও তাহার মনিবের মুখের চেহারায় সে কিছু অনুমান করিয়াছিল কিনা, যাইবার সময় সহসা প্রশ্ন করিল, বাবুজী, এ বাসায় কি আপনার সুবিধা হচ্ছে না?

অপূর্ব ঈষৎ হাসিয়া কহিল, না। এবং রামদাস জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া আছে দেখিয়া কহিল, উপরে যাঁরা আছেন আমার সঙ্গে বড় সদয় ব্যবহার করচেন না!

রামদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, ওই মহিলাটি?

হাঁ, ওঁর বাপ ত বটেই। এই বলিয়া অপূর্ব কাল বিকালের ও আজ সকালের ঘটনা বিবৃত করিল, রামদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি হলে এর ইতিহাস আর এক রকম

হতো। ক্ষমা প্রর্থনা না করে এই দরজা থেকে সে এক পা নীচে নামতে পারত না।

অপূর্ব কহিল, ক্ষমা না চাইলে কি করতেন?

রামদাস কহিল, এই যে বললুম—নামতে দিতাম না।

অপূর্ব কথাটা যে তাহার বিশ্বাস করিল তাহা নয়, তবুও সাহসের কথায় একটু সাহস পাইল। সহাস্যে কহিল, কিন্তু এখন আমরা ত নামি চলুন, আপনার গাড়ির সময় হয়ে যাচ্ছে। এই বলিয়া সে বন্ধুর হাত ধরিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আসিবার সময় যেমন, যাইবার সময়েও ঠিক তেমনি সিঁড়ির মুখেই সেই মেয়েটির সহিত দেখা হইল। হাতে তাহার ছোট একটি কাগজের মোড়ক, বোধ করি কিছু কিনিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাকে পথ দিবার জন্য অপূর্ব একধারে সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু হঠাৎ হতবুদ্ধি হইয়া দেখিল, রামদাস পথ না ছাড়িয়া একেবারে সেটা সম্পূর্ণ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়ছে। ইংরাজি করিয়া কহিল, আমাকে এক মিনিট মাপ করতে হবে, আমি এই বাবুজীর বন্ধু। এঁদের প্রতি অহেতুক দুর্ব্যবহারের জন্য আপনাদের অনুতপ্ত হওয়া উচিত।

মেয়েটি চোখ তুলিয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, ইচ্ছা হয় এ-সব কথা আমার বাবাকে বলতে পারেন।

আপনার বাবা বাড়ি আছেন?

না।

তাহলে অপেক্ষা করবার আমার সময় নেই। আমার হয়ে তাঁকে বলবেন যে তাঁর উপদ্রবে ইনি থাকতে পারচেন না।

মেয়েটি তেমনি তিক্তকণ্ঠে কহিল, তাঁর হয়ে আমিই জবাব দিচ্চি যে ইচ্ছে করলে ইনি চলে যেতে পারেন।

রামদাস একটু হাসিল, কহিল, ভারতবর্ষীয় ক্রীশ্চান 'বুলি'দের আমি চিনি। এর চেয়ে বড় জবাব তাদের মুখে আমি আশা করিনি। কিন্তু তাতে তাঁর সুবিধে হবে না, কারণ, এঁর জায়গায় আমি আসবো। আমার নাম রামদাস তলওয়ারকর,—আমি মারাঠী ব্রাহ্মণ। তলওয়ার শব্দটার একটা অর্থ আছে, আপনার বাবাকে সেটা জেনে নিতে বলবেন। গুড্ ইভনিং। চলুন বাবুজী,—এই বলিয়া সে অপূর্বর হাত ধরিয়া একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িল।

মেয়েটির মুখের চেহারা অপূর্ব কটাক্ষে দেখিতে পাইয়াছিল, শেষ দিকটায় সে যে কিরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল মনে করিয়া কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে কথা কহিতেই পারিল না, তারপরে আস্তে আস্তে বলিল, এটা কি হল তলওয়ারকর?

তলওয়ারকর উত্তরে কহিল, এই হল যে আপনি উঠে গেলেই আমাকে আসতে হবে। শুধু খবরটা যেন পাই।

অপূর্ব কহিল, অর্থাৎ দুপুরবেলা আপনার স্ত্রী এখানে একাকী থাকবেন?

রামদাস কহিল, না, একাকী নয়, আমার দু'বছরের একটি মেয়ে আছে।

অর্থাৎ, আপনি পরিহাস করচেন?

না, আমি সত্য বলচি। পরিহাস করতে আমি জানিই নে।

অপূর্ব তাহার সঙ্গীর মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, তারপরে ধীরে ধীরে কহিল, তাহলে এ বাসা আমার ছাড়া চলবে না। তাহার মুখের কথা শেষ না হইতেই রামদাস অকস্মাৎ তাহার দুই হাত নিজের বলিষ্ঠ দুই হাতে ধরিয়া ফেলিয়া প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল, এই আমি চাই বাবুজী, এই ত আমি চাই। অত্যাচারের ভয়ে আমরা অনেক পলিয়েচি, কিন্তু,—ব্যস!

একটা হাত সে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু একটা হাত সে শেষ পর্যন্ত ধরিয়াই রহিল। কেবল ট্রেন ছাড়িলে সেই হাতে আর একবার মস্ত নাড়া দিয়া নিজের দুই হাত এক করিয়া নমস্কার করিল।

সন্ধ্যা হইতে তখনও বিলম্ব ছিল, ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ট্রেনেরও আর সময় ছিল না বলিয়া স্টেশনের এই দিকের প্লাটফর্মে যাত্রীর ভিড় ছিল না। এইখানে অপূর্ব পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল কাল হইতে আজ পর্যন্ত এই একটা দিনের ব্যবধানে জীবনটা যেন কোথা দিয়া কেমন করিয়া একেবারে বহু বৎসর দীর্ঘ হইয়া গেছে। খেলাধুলা ও এমনি সব তুচ্ছ কাজের মধ্যে সে কখন যেন ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অকস্মাৎ যেখানে ঘুম ভাঙ্গিল, সেখানে সমস্ত দুনিয়ার কর্মস্রোত কেবলমাত্র কাজের বেগেই যেন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। বিশ্রাম নাই, বিরতি নাই, আনন্দ নাই, অবসর নাই,—মানুষে মানুষে সংঘর্ষের মধ্যাহ্ন সূর্য দুই হাতে কেবল মুঠা মুঠা করিয়া অহরহ আগুন ছাড়াইয়া চলিয়াছে। এখানে মা নাই, দাদারা নাই, বৌদিদিরা নাই,—স্নেহচ্ছায়া কোথাও নাই,—কর্মশালার অসংখ্য চক্র দক্ষিণে, বামে, মাথার উপরে, পায়ের নীচে, সর্বত্র অন্ধবেগে ঘুরিয়া চলিয়াছে, এতটুকু অসতর্ক হইলে রক্ষা পাইবার কোথাও কোন পথ নাই—সমস্ত একেবারে নিষ্ঠুরভাবে অবরুদ্ধ। চোখের দুই কোণ জলে ভরিয়া গেল,—অদূরে একটা কাঠের বেঞ্চ ছিল, সে তাহারই উপরে বসিয়া পড়িয়া চোখ মুছিতেছে, হঠাৎ পিছন হইতে একটা প্রবল ধাক্কায় উপুড় হইয়া একেবারে মাটির উপর পড়িয়া গেল। তাড়াতাড়ি কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইতে দেখিল জন পাঁচ-ছয় ফিরিঙ্গী ছোঁড়া,—কাহারও মুখে সিগারেট, কাহারও মুখে পাইপ,—দাঁত বাহির করিয়া হসিতেছে। সম্ভবতঃ, যে ধাক্কা মারিয়াছিল সে বেঞ্চের গায়ে একটা লেখা দেখাইয়া কহিল, শালা, ইহ্ সাহেব লোগ্‌কাবাস্তে তুমহারা নেহি—

লজ্জায়, ক্রোধে ও অপমানে অপূর্বর সজল চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল, ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, সে প্রত্যুত্তরে কি যে বলিল, বুঝা গেল না। তাহার অবস্থা দেখিয়া ফিরিঙ্গীর দল অত্যন্ত আমোদ অনুভব করিল, একজন কহিল, শালা দুধবালা, আচ্ছি গরম করতা—ফাটকমে জায়েগা? সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল,—একজন তাহার মুখের সামনে একটা অশ্লীল ভঙ্গী করিয়া শিষ দিল।

অপূর্বর হিতাহিতজ্ঞান প্রায় লোপ পাইয়া আসিতেছিল, হয়ত মুহূর্ত পরে সে ইহাদের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িত, কিন্তু কতকগুলি হিন্দুস্থানী কর্মচারী অনতিদূরে বসিয়া বাতি পরিষ্কার করিতেছিল, তাহারা মাঝখানে পড়িয়া তাহাকে টানিয়া প্লাটফর্মের বাহির করিয়া দিল, একটা ফিরিঙ্গী ছোঁড়া ছুটিয়া আসিয়া ভিড়ের মধ্যে পা গলাইয়া অপূর্বর সাদা পিরাণের উপর বুটের পদচিহ্ন আঁকিয়া দিল। এই হিন্দুস্থানী দলের হাত হইতে মুক্তি লাভের জন্য সে টানাটানি করিতেছিল, একজন তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল, বাঙালী বাবু, সাহেব লোককা বদন্ ছুয়েগা ত ইঁহা এক বরস্ জেল খাটেগা—যাও—ভাগো—একজন কহিল, আরে বাবু হ্যায়,—ধাক্কা মাৎ দেও—এই বলিয়া সে তারের গেটটা টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে তাহাকে ঘিরিয়া ভিড় জমিবার উপক্রম করিতেছিল, যাহারা দেখিতে পায় নাই তাহারা কারণ জিজ্ঞাসা করিল, যাহারা দেখিয়াছে তাহারা নানারূপ মন্তব্য প্রকাশ করিল, একজন হিন্দুস্থানী চানা-ভাজা বিক্রি করে, সে কলিকাতায় থাকিয়া বাংলা শিখিয়াছিল, সেই ভাষায় বুঝাইয়া দিল যে, এদেশে চট্টগ্রামের অনেক লোক দুধের ব্যবসা করে, তাহারা পিরাণ গায়ে দেয়, জুতা পরে,—অপূর্ব আফিসের পোশাক ছাড়িয়া সাধারণ বাঙালীর পোশাকে স্টেশনে আসিয়াছিল, সুতরাং,—সাহেবেরা সেই দুধবালা মনে করিয়া মারিয়াছে, কেরানীবাবু বলিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহার কৈফিয়ত, সঙ্গ ও সহানুভূতির দায় এড়াইয়া অপূর্ব স্টেশনে খোঁজ করিয়া সোজা স্টেশন মাস্টারের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। তিনিও সাহেব,—কাজ করিতেছিলেন, মুখ তুলিয়া চাহিলেন। অপূর্ব জুতার দাগ দেখাইয়া ঘটনা বিবৃত করিল। তিনি বিরক্ত ও অবজ্ঞা ভরে মিনিট-খানেক শুনিয়া কহিলেন, ইউরোপীয়ানদের বেঞ্চে তুমি বসিতে গেলে কেন?

অপূর্ব উত্তেজনার সহিত কহিল, আমি জানতাম না—

তোমার জানা উচিত ছিল।

কিন্তু তাই বলে খামকা ভদ্রলোকের গায়ে হাত দেবে?

সাহেব দ্বারের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেন—গো—গো—গো—চাপ্‌রাশি ইস্‌কো বহর্ কর্ দেও—বলিয়া কাজে মন দিলেন।

তাহার পরে অপূর্ব কি করিয়া যে বাসায় ফিরিয়া আসিল সে ঠিক জানে না। ঘণ্টা-দুই পূর্বে রামদাসের সহিত এই পথে একত্রে আসিবার কালে সব চেয়ে যে দুর্ভাবনা তাহার মনে বেশী বাজিতেছিল সে তাহার অকারণ মধ্যস্থতা। একে ত উৎপাত ও অশান্তির মাত্রা তাহাতে কমিবে না, বরঞ্চ বাড়িবে, তা ছাড়া, ক্রীশ্চান মেয়েটির যত আপরাধই কেন না থাক কেবলমাত্র মেয়েমানুষ বলিয়াই ত পুরুষের মুখ হইতে ওরূপ কঠিন কথা বাহির হওয়া সঙ্গত হয় নাই,—তাহতে আবার সে তখন একাকী ছিল। তাহার শিক্ষিত, ভদ্র অন্তঃকরণ রামদাসের কথায় ক্ষুণ্ণই হইয়াছিল,—কিন্তু এখন ফিরিবার পথে তাহার সে ক্ষোভ কোথায় যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল তাহার ঠিকানা ছিল না। তাহাকে মনে যখন হইল, তখন মেয়েমানুষ বলিয়া আর মনে হইল না,—মনে হইল ক্রীশ্চানের মেয়ে, সাহেবের মেয়ে বলিয়া—যে ছোঁড়াগুলো তাহাকে এই মাত্র অকারণে অপমানের একশেষ করিয়াছে—যাহাদের কুশিক্ষা, ইতরতা ও বর্বরতার অবধি নাই—তাহাদেরই ভগিনী বলিয়া,—যে সাহেবটা একান্ত অবিচারে তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল—মানুষের সামান্য অধিকারটুকুও দিল না—তাহারই পরম আত্মীয়া বলিয়া।

তেওয়ারী আসিয়া কহিল, ছোটবাবু আপনার খাবার তৈরি হয়েছে। অপূর্ব কহিল, যাই—

মিনিট দশ-পনেরো পরে সে পুনরায় আসিয়া জানাইল, খাবার যে সব জুড়িয়ে গেল বাবু—

অপূর্ব রাগ করিয়া বলিল, কেন বিরক্ত করিস তেওয়ারী, আমি খাব না,—আমার ক্ষিদে নেই।

চোখে তাহার ঘুম আসিল না। রাত্রি যত বাড়িতে লাগিল, সমস্ত বিছানাটা যেন তাহার কাছে শয্যাকণ্টক হইয়া উঠিল। একটা মর্মান্তিক কণ্টক-বেদনা তাহার সকল অঙ্গে ফুটিতে লাগিল, এবং তাহারই মাঝে মাঝে মনে পড়িতে লাগিল স্টেশনের সেই হিন্দুস্থানী লোকগুলোকে, যাহারা সদলবলে উপস্থিত থাকিয়া তাহার লাঞ্ছনার কোন অংশ লয় নাই, বরঞ্চ, তাহার অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া তুলিতেই সাহায্য করিয়াছে। দেশের লোকের বিরুদ্ধে দেশের লোকের এতবড় লজ্জা, এতবড় গ্লানি জগতের আর কোন্ দেশে আছে? কেন এমন হইল? কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইল?

চার

দুই-তিনদিন নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল, উপরতলা হইতে সাহেবের অত্যাচার আর যখন নব-নবরূপে প্রকাশিত হইল না, তখন অপূর্ব বুঝিল ক্রীশ্চান মেয়েটা সেদিনের কথা তাহার পিতাকে জানায় নাই। এবং তাহার সেই ফলমূল দিতে আসার ঘটনার সঙ্গে মিলাইয়া এই না-বলার ব্যাপারটা শুধু সম্ভব নয়, সত্য বলিয়া মনে হইল। অনেক প্রকার কালো ফরসা সাহেবের দল উপরে যায় আসে, মেয়েটির সহিতও বার-দুই সিঁড়ির পথে সাক্ষাৎ হইয়াছে, সে মুখ ফিরাইয়া নামিয়া যায়, কিন্তু সেই দুঃশাসন গৃহকর্তার সহিত একদিনও মুখোমুখি ঘটে নাই। কেবল, সে যে ঘরে আছে সেটা বুঝা যায় তাহার ভারী বুটের শব্দে। সেদিন সকালে ছোটবাবুকে ভাত বাড়িয়া দিয়া তেওয়ারী হাসিমুখে কহিল, সাহেব দেখছি নালিশ ফরিদ আর কিছু করলে না।

অপূর্ব কহিল, না, যতটা গর্জায় ততটা বর্ষায় না।

তেওয়ারী বলিল, আমাদেরও কিন্তু বেশী দিন এ বাসায় থাকা চলবে না। ব্যাটা মাতাল হলেই আবার কোন্ দিন ফ্যাসাদ বাধাবে।

অপূর্ব কহিল, নাঃ—সে ভয় বড় নেই।

তেওয়ারী কহিল তা হোক, তবু মাথার ওপরে মেলেচ্ছ ক্রীশ্চান,—যা সব খায়-দায়,

মনে হলেই—

আঃ তুই থাম্‌ তেওয়ারী। সে নিজে তখন খাইতেছিল, ক্রীশ্চানের খাদ্যদ্রব্যের ইঙ্গিতে তাহার সর্বাঙ্গে যেন কাঁটা দিয়া উঠিল। কহিল, এ মাসটা গেলে উঠে ত যেতেই হবে। কিন্তু একটা ভাল বাসাও ত খুঁজে পাওয়া চাই!

এ সময়ে ও উল্লেখ ভাল হয় নাই, তেওয়ারী মনে মনে লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেই দিন বৈকালে আফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব তেওয়ারীর প্রতি চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। সে যেন এই একটা বেলার মধ্যে শুকাইয়া অর্ধেক হইয়া গেছে।

কি রে তেওয়ারী?

প্রত্যুত্তরে সে আলপিনে গাঁথা কয়েক খণ্ড ছাপানো হলদে রঙের কাগজ অপূর্বর হাতে দিল। ফৌজদারী আদালতের সমন, বাদী জে.ডি. জোসেফ, প্রতিবাদী তিন নম্বর ঘরের অপূর্ব বাঙালী ও তাহার চাকর। ধারা একটা নয়, গোটা-চারেক। দুপুরবেলা কোর্টের পিয়াদা জারি করিয়া গেছে, এবং কাল সকালে আর একটা জারি করিতে আসিবে। সঙ্গে সেই সাহেব ব্যাটা। হাজির হইবার দিন পরশু। অপূর্ব নিঃশব্দে কাগজগুলো আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিল, তা আর হবে কি। কোর্টে হাজির হলেই হবে।

তেওয়ারী কাঁদ-কাঁদ গলায় কহিল, কখনও যে কাঠগড়ায় উঠিনি বাবু।

অপূর্ব বিরক্ত হইয়া বলিল, আমি কি উঠেছি নাকি? সবতাতেই কাঁদবি ত বিদেশে আসতে গেলি কেন?

আমি যে কিছু জানিনে ছোটবাবু!

জানিস নে ত লাঠি নিয়ে বেরুতে গেলি কেন? ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে থাকলেই ত হতো! এই বলিয়া অপূর্ব কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। পরদিন তাহার নিজের পরওয়ানা আসিয়া পৌঁছিল, এবং তাহার পরদিন তেওয়ারীকে সঙ্গে লইয়া যথাসময়ে আদালতে উপস্থিত হইল। নালিশ মকদ্দমার কোন অভিজ্ঞতাই তাহার ছিল না ; বিদেশ, কোন লোকের সহিত আলাপ-পরিচয় নাই, কাহার সাহায্য লইতে হয় কি করিয়া তদবির করিতে হয় কিছুই জানে না, তবুও কোন ভয়ই হইল না। হঠাৎ কি করিয়া যে তাহার মন এমন শক্ত হইয়া গেল সে নিজেই ভাবিয়া পাইল না। এ বিষয়ে রামদাসকে কোন কথা বলিতে, কোন সাহায্য চাহিতে তাহার লজ্জা বোধ হইল। শুধু কাজের অজুহাতে সাহেবের কাছে সে একটা দিনের ছুটি লইয়া আসিয়াছিল।

যথাসময়ে ডাক পড়িল। ডেপুটী কমিশনর নিজের ফাইলেই মকদ্দমা রাখিয়াছিলেন। বাদী জোসেফ সাহেব সত্য-মিথ্যা যা খুশি এজাহার দিয়া গেল, প্রতিবাদীর উকিল ছিল না, অপূর্ব নিজের জবাবে একটি কথাও গোপন করিল, না, একটা কথাও বাড়াইয়া বলিল না। বাদীর সাক্ষী তার মেয়ে,—আদালতের মাঝখানে এই মেয়েটির নাম এবং তাঁহার বিবরণ শুনিয়া অপূর্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইনি কোন এক স্বর্গীয় রাজকুমার ভট্টাচার্যের কন্যা, বাটী পূর্বে ছিল বরিশাল, এখন বাঙ্গালোর। নিজের নাম মেরি-ভারতী ; ভট্টাচার্য মহাশয় নিজেই স্বেচ্ছায় অন্ধকার হইতে আলোকে আসেন। তাঁহার স্বর্গীয় হওয়ার পরে মা কোন এক মিশনরি-দুহিতার দাসী হইয়া বাঙ্গালোরে আসেন, সেখানে জোসেফ সাহেবের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। ভারতী পৈত্রিক ভট্টাচার্য নামটা কদর্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়া জোসেফ নাম গ্রহণ করিয়াছে, সেই অবধি সে মিস্‌ মেরি-ভারতী জোসেফ নামে পরিচিত। হাকিমের প্রশ্নে সে ফলমূল উপহার দিতে যাওয়া অস্বীকার করিল, কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর হইতে মুখের চেহারায় মিথ্যা বলার বিড়ম্বনা এমনি ফুটিয়া উঠিল যে, শুধু হাকিম নয়, তাঁহার পিয়াদাটার চক্ষুকে পর্যন্ত তাহা ফাঁকি দিতে পারিল না। কোন পক্ষেই উকিল ছিল না, সুতরাং জোর প্যাঁচে প্যাঁচে পাক খাইয়া তুচ্ছ ও ক্ষুদ্র বস্তু সুবৃহৎ হইয়া উঠিবার অবকাশ পাইল না। বিচার একদিনেই শেষ হইল, তেওয়ারী রেহাই পাইল, কিন্তু বিচারক অপূর্বর

কুড়ি টাকা অর্থদণ্ড করিলেন, জীবনের এই প্রভাতকালে রাজদ্বারে বিনা অপরাধে দণ্ডিত হইয়া তাহার মুখ মলিন হইয়া গেল। টাকা-কয়টি গণিয়া দিয়া সে বাহির হইতেছে, দেখিল, দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রামদাস। অপূর্বর মুখ দিয়া প্রথমেই বাহির হইয়া গেল,—কুড়ি টাকা ফাইন হল রামদাস, কি করা যাবে? আপিল?

আবেগ ও উত্তেজনায় তাহার কণ্ঠস্বরে শেষ দিকটা হঠাৎ যেন কাঁপিয়া উঠিল। রামদাস তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, অর্থাৎ কুড়ি টাকার বদলে দুহাজার টাকা আপনি লোকসান করতে চান?

তা হোক,—কিন্তু এ যে ফাইন! শাস্তি! রাজদণ্ড!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিসের দণ্ড? যে মিথ্যে মামলা আনলে, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়ালে,—আর যে তাকে প্রশ্রয় দিলে তাদের দণ্ড ত? কিন্তু এর উপরেও একটা আদালত আছে, যার বিচারক ভুল করেন না,—সেখানে আপনি বেকসুর খালাস পেয়েছেন বলে দিচ্চি।

অপূর্ব বলিল, কিন্তু লোকে ত বুঝবে না, রামদাস। তাদের কাছে দুর্নাম যে আমার চিরকালের সঙ্গী হয়ে রইল।

রামদাস সস্নেহে তাহার হাতের উপর একটা চাপ দিয়া বলিল, চলুন, আমরা নদীর ধারে একটু বেড়িয়ে আসি গে।

পথে চলিতে চলিতে কহিল, অপূর্ববাবু, আমি আফিসের কাজে আপনার ছোট হলেও বয়সে বড়। যদি দুটো কথা বলি কিছু মনে করবেন না। অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। রামদাস বলিতে লাগিল, এ মকদ্দমার কথা আমি আগেই জানতাম, কি হবে তাতেও আমার সন্দেহ ছিল না। লোকের কথা আপনি বলছিলেন, যে লোক, সে জানবে হালদারের সঙ্গে জোসেফের মামলা বাধলে ইংরাজের আদালতে কি হয়! আর কুড়ি টাকার জরিমানার দুর্নাম—

কিন্তু বিনা দোষে যে রামদাস?

রামদাস কহিল, হাঁ হাঁ, বিনা দোষেই বটে। এমনি বিনা দোষেই আমি দু বৎসর জেল খেটেচি।

জেল খেটেচ? দু বৎসর?

হাঁ, দু বৎসর, এবং,—এই বলিয়া সে পুনশ্চ একটু হাসিয়া অপূর্বর হাতখানা তাহার পিঠের নীচে টানিয়া লইয়া কহিল, এই জামাটা যদি সরাতে পারতাম ত দেখতে পেতেন এখানে বেতের দাগে দাগে আর জায়গা নেই।

বেত খেয়েচ রামদাস?

রামদাস সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ, এবং এমনই বিনা দোষে। তবু এত নির্লজ্জ আমি যে আজও লোকের কাছে মুখ দেখাচ্চি। আর আপনি কুড়ি টাকার আঘাত সইতে পারবেন না বাবুজী?

অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। যে ল্যাম্পপোস্ট আশ্রয় করিয়া তাহারা দাঁড়াইয়াছিল তাহাতে আলো জ্বালিতে আসিল। সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিয়া রামদাস চকিত হইয়া কহিল, আর না, চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আমি বাড়ি যাই।

অপূর্ব আবেগের সহিত বলিল, এখনি চলে যাবেন? অনেক কথা যে আমার জানবার রইল বাবুজী?

রামদাস হসিমুখে কহিল, সব আজই জেনে নেবেন? সে হবে না। হয়ত অনেক দিন ধরে আমাকে বলতে হবে। এই অনেকদিন কথাটার উপর সে এমনি কি একটা জোর দিল যে অপূর্ব সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি না চাহিয়া পারিল না। কিন্তু সেই সহাস্য প্রশান্ত মুখে কোন রহস্যই প্রকাশ পাইল না। রামদাস গলির ভিতরে আর প্রবেশ করিল না, বড় রাস্তা হইতেই বিদায় লইয়া সোজা স্টেশনের দিকে চলিয়া গেল।

অপূর্ব তাহার বাসার দরজায় আসিয়া রুদ্ধদ্বারে ঘা দিতেই তেওয়ারী প্রভুর সাড়া পাইয়া দ্বার খুলিয়া দিল। সে পূর্বাহ্নে আসিয়া গৃহকর্মে রত হইয়াছিল, মুখ তাহার যেমন গম্ভীর তেমনি

বিষণ্ণ। কহিল, তখন তাড়াতাড়িতে দু'খানা নোট ফেলে গিয়েছিলেন।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় ফেলে গিয়েছিলাম রে?

এই যে এখানে, বলিয়া সে পা দিয়া দ্বারের কাছে মেঝের উপর একটা জায়গা নির্দেশ করিয়া দেখাইল। কহিল, আপনার বালিশের তলায় রেখে দিয়েছি। পকেট থেকে বাইরে পড়ে যায়নি এই ভাগ্যি।

কি করিয়া যে পড়িয়া গিয়াছিল এই কথা ভাবিতে ভাবিতে অপূর্ব তাহার ঘরে চলিয়া গেল।

পাঁচ

রাত্রে আহারাদির পরে তেওয়ারী করজোড়ে সাশ্রুনয়নে কহিল, আর না ছোটবাবু, এইবার বুড়োমানুষের কথাটা রাখুন। চলুন, কাল সকালেই আমরা যেখানে হোক চলে যাই।

অপূর্ব কহিল, কাল সকালেই, কোথায় শুনি? তুই কি ধর্মশালায় গিয়ে থাকতে বলিস নাকি?

তেওয়ারী বলিল, এর চেয়ে সেও ভাল। মকদ্দমা জিতেছে, এইবার কোন্ দিন ঘরে ঢুকে আমাদের দুজনকে মেরে যাবে।

অপূর্ব আর সহিতে পারিল না, রাগ করিয়া কহিল, তোকে কি আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতেই মা সঙ্গে দিয়েছিলেন? তোকে আর আমার দরকার নেই, কাল জাহাজ আছে তুই বাড়ি চলে যা, আমার কপালে যা আছে তা হবে।

তেওয়ারী আর তর্ক করিল না, আস্তে আস্তে শুইতে চলিয়া গেল। তাহার কথাগুলা অপূর্বকে অপমানের একশেষ করিল বলিয়াই সে এরূপ কঠোর জবাব দিল, না হইলে সে যে বিশেষ অসঙ্গত কিছু কহে নাই অপূর্ব মনে মনে তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। যাহা হউক ; পরদিন সকাল হইতেই একটা নূতন বাসার খোঁজ চলিতে লাগল, এবং শুধু তলওয়ারকর ছাড়া আফিসের প্রায় সকলকেই সে এই মর্মে অনুরোধ করিয়া রাখিল। অতঃপর তেওয়ারীও অনুযোগ করিল না, অপূর্বও মনের কথা প্রকাশ করিল না, কিন্তু প্রভু ও ভৃত্য উভয়েরই একপ্রকার সশঙ্কিতভাবেই দিন কাটিতে লাগিল। আফিস হইতে ফিরিবার পথে অপূর্ব প্রত্যহই ভয় করিত, আজ না জানি কি গিয়া শুনিতে হয়! কিন্তু কোনদিন কিছুই শুনিতে হইল না। মকদ্দমাবিজয়ী জোসেফ পরিবারের নানাবিধ ও বিচিত্র উপদ্রব নব নব রূপে নিত্য প্রকাশ পাইবে ইহাই স্বাভাবিক, কিন্তু উৎপাত ত দূরের কথা, উপরে কেহ আছে কি না অনেক সময়ে তাহাই সন্দেহ হইতে লাগিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কেহই কাহাকে কোন কথা কহিত না। নিরুপদ্রবেই দিন কাটিতেছিল—এই ভাল। সপ্তাহ-খানেক পরে একদিন আফিস হইতে ফিরিবার পথে তেওয়ারী প্রফুল্লমুখে মনের আনন্দ যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিল, আর শুনেছেন ছোটবাবু?

অপূর্ব কহিল, কি?

সাহেব যে ঠ্যাঙ ভেঙ্গে একেবারে হাসপাতালে। বাঁচে কি না বাঁচে! আজ ছ'দিন হল—ঠিক তার পরের দিনই!

অপূর্ব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—তুই কি করি জানলি?

তেওয়ারী বলিল, বাড়িয়ালার সরকার আমাদের জেলার লোক কিনা, তার সঙ্গে আজ পরিচয় হ'ল। ভাড়া আদায় করতে এসেছিল। কে বা ভাড়া দেবে,—মদ খেয়ে মারামারি করে জেটি থেকে নীচে পড়ে সাহেব ত গিয়ে হাসপাতালে শুয়ে আছেন।

তা' হবে, বলিয়া অপূর্ব কাপড় ছাড়িতে নিজের ঘরে চলিয়া গেল। কলিকাতা ত্যাগ করার পরে এই প্রথম তেওয়ারীর মন সত্যকার প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার একান্ত অভিলাষ ছিল এই লইয়া সে আজ বেশ একটুখানি আলোচনা করে, কিন্তু মনিব তাহাতে উৎসাহ দিলেন না। নাই দিন, তবুও সে বাহির হইতে নানা উপায়ে শুনাইয়া দিল যে এরূপ একদিন ঘটিবেই তাহা সে জানিত। তেওয়ারী সন্ধ্যা-আহ্নিক শিখিতে পারে নাই, কিন্তু গায়ত্রীটা তাহার মুখস্থ

হইয়াছিল, সেই গায়ত্রী সে জরিমানার দিন হইতে সকাল-সন্ধ্যা একশত আট করিয়া দুইশত ষোল বার প্রত্যহ জপ করিয়াছে। সাহেবের পা-ভাঙ্গার যথাহেতু কি, ছেলেমানুষ মনিব তাহা অনুধাবন করিল কিনা সন্দেহ, কিন্তু এই মন্ত্রের অসাধারণ শক্তির প্রতি তেওয়ারীর বিশ্বাস সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। ম্লেচ্ছ হইয়া ব্রাহ্মণের মাথার উপরে যে ঘোড়ার মত পা ঠুকিয়াছে পা তাহার ভাঙ্গিবে না ত কি!

পরদিন সকালে তাহার আফিসের আরদালির কাছে খবর পাইয়া অপূর্ব তেওয়ারীকে ডাকিয়া কহিল, একটা বাসার সন্ধান পাওয়া গেছে তেওয়ারী, গিয়ে দেখে আয় দেখি পোষাবে কিনা।

তেওয়ারী একটু হাসিয়া কহিল, আর বোধ হয় দরকার হবে না বাবু, সে-সব আমি ঠিক করে নিয়েছি। আসছে পয়লা তারিখে যারা যাবার তারাই যাবে। বাসা বদলানো ত সোজা ঝঞ্ঝাট নয় ছোটবাবু!

ঝঞ্ঝাট যে সোজা নয় অপূর্ব নিজেও তাহা জানিত, কিন্তু সাহেবের অবর্তমানে যে উৎপাত বন্ধ হইয়াছে, তাঁহার প্রত্যাগমনের পরেও যে তাহা বজায় থাকিবে এ ভরসা তাহার ছিল না। বাসা তাহাকে বদল করিতেই হইবে, কিন্তু আফিসে যাইবার পূর্বে তেওয়ারী যখন ছুটি চাহিয়া জানাইল যে আজ দুপুরবেলা সে বর্মাদের ফয়ার মন্দিরে তামাশা দেখিতে যাইবে, তখন অপূর্ব না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। সকৌতুকে প্রশ্ন করিল, তোর যে আবার তামাশা দেখতে শখ হ'ল তেওয়ারী?

তেওয়ারী কহিল, বিদেশের যা-কিছু সব দেখা ভাল ছোটবাবু।

অপূর্ব বলিল, তা বটে। খোঁড়া সাহেব হাসপাতালে, এখন আর রাস্তায় বেরোতে ভয় নেই। তা যাস, কিন্তু একটু সকাল সকাল ফিরে আসিস। কেউ সঙ্গে থাকবে ত?

তাহার স্বদেশবাসী যে লোকটির সহিত কাল তেওয়ারীর আলাপ হইয়াছে সেই আসিয়া আজ তাহাকে তামাশা দেখাইয়া আনিবে স্থির হইয়াছিল। সাহেবের দুর্ঘটনার সংবাদে এতই সে খুশী হইয়াছিল যে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইতে তাহার মুহূর্ত বিলম্ব ঘটে নাই।

তাহাকে বাহিরে যাইবার হুকুম দিয়া অপূর্ব যথাসময়ে আফিসে চলিয়া গেল, এবং ইহার ঘণ্টা-খানেক মধ্যেই তেওয়ারীর দেশের লোক আসিয়া তাহাকে বর্মা তামাশা দেখাইয়া আনিতে সঙ্গে লইয়া গেল। তালার একটা চাবি অপূর্বর নিজের কাছেই থাকিত, সুতরাং ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব ঘটিলেও ছোটবাবুর যে বিশেষ অসুবিধে হইবে না তেওয়ারীর তাহা জানা ছিল। নিষ্কণ্টক হইয়া আজ আর তাহার স্ফূর্তির অবধি ছিল না।

অপরাহ্নবেলায় ঘরে ফিরিয়া অপূর্ব দেখিল দরজায় তালা বন্ধ, তেওয়ারী তখন পর্যন্ত তামাশা দেখিয়া ফিরে নাই। পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া খুলিতে গিয়া দেখিল চাবি লাগে না, এ কোন্ এক অপরিচিত তালা, এ ত তাহাদের নয়! তেওয়ারী এ কোথায় পাইল, কেনই বা সে তাহাদের পুরাতন ভালো তালার বদলে এই একটা নূতন তালা দিতে গেল, ইহার চাবিই বা কোথায়, কেমন করিয়াই বা সে ঘরে ঢুকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। বোধ হয় মিনিট-দুই সে এইভাবে দাঁড়াইয়া, ত্রিতলের দ্বার খুলিয়া সেই ক্রীশ্চান মেয়েটি মুখ বাহির করিয়া কহিল, দাঁড়ান, আমি খুলে দিচ্চি, এই বলিয়া সে নীচে নামিয়া আসিয়া অসঙ্কোচে অপূর্বর পাশে আসিয়া দাঁড়াইতে সে বিস্ময়ে ও লজ্জায় যেন একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তেওয়ারী নাই, কি তার হইল, এবং কি জন্য কেমন করিয়া ঘরের চাবি সাহেবের মেয়ের হাতে গিয়া পড়িল তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। স্বল্প আলোকিত এই সংকীর্ণ সিঁড়িটায় দুজনের দাঁড়াইবার মত যথেষ্ট স্থান ছিল না, অপূর্ব এক ধাপ নীচে নামিয়া আর এক দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। অনাত্মীয় যুবতী রমণীর সহিত নির্জনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া কথা কহা তাহার অভ্যাসই ছিল না, তাই মেয়েটি যখন তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মা বলছিলেন চাবি বন্ধ করে আমি ভাল কাজ করিনি, হয়ত বিপদে পড়তেও পারি, তখন অপূর্বর মুখ দিয়া সহসা কোন উত্তরই বাহির হইল না। ভারতী

কবাট খুলিয়া ফেলিয়া কহিল, আমার মা ভয়ানক ভীতু মানুষ, তিনি আমাকে তখন থেকে বকছেন যে আপনি বিশ্বাস না করলে আমাকেও চুরির দায়ে জেল খাটতে হবে। আমার কিন্তু সে ভয় একটুও নেই।

অপূর্ব বুঝিতে না পরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে?

ভারতী কহিল, ঘরে গিয়ে দেখুন না কি হয়েছে। এই বলিয়া সে পথ ছাড়িয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব ঘরে ঢুকিয়া যাহা দেখিল তাহাতে দুই চক্ষু তাহার কপালে উঠিল! তোরঙ্গ-দুটার ডালা ভাঙ্গা, বই, কাগজ, বিছানা, বালিশ, কাপড়-চোপড় সমস্ত মেঝের উপর ছড়ানো, তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল, কি করে এমন হ'ল? কে করলে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, আর যেই করুক কিন্তু আমি নয়, তা শত্রু হলেও আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। এই বলিয়া সে ঘটনাটা যাহা বিবৃত করিল তাহা এই—দুপুরবেলা তাহার সদ্য পরিচিত দেশওয়ালী বন্ধুর সহিত তেওয়ারী যখন তামাশা দেখিতে বাহির হইয়া যায়, ভারতীর মা বারান্দায় বসিয়া তাহাদের দেখিতে পান। অল্পক্ষণ পরেই নীচের ঘর হইতে একপ্রকার সন্দেহজনক শব্দ শুনিতে পাইয়া ভারতীকে দেখিতে বলেন। তাহাদের মেঝের একধারে একটা ফুটা আছে, চোখ পাতিয়া দেখিলে অপূর্বর ঘরের সমস্তই দেখা যায়। সেই ফুটা দিয়া দেখিয়াই সে চীৎকার করিতে থাকে। যাহারা বাক্স ভাঙ্গিতেছিল তাহারা সবেগে পলায়ন করে, তখন নীচে নামিয়া সে দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া পাহারা দিতে থাকে পুনরায় না তাহারা ফিরিয়া আসে। এখন অপূর্বকে দেখিতে পাইয়া সে ঘর খুলিয়া দিতে আসিয়াছে।

বিবর্ণ, পাংশুমুখে অপূর্ব তাহার খাটের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভারতী দরজা হইতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, এ ঘরে আপনার কোন খাবার জিনিস আছে কি? আমি ঘরে এসে একবার দেখতে পারি?

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, আসুন।

সে ঘরে আসিলে তাহার মুখপানে চাহিয়া অপূর্ব বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করিল, এখন কি করা যায়?

ভারতী কহিল, করা ত অনেক কিছু যায়, কিন্তু সকলের আগে দেখতে হবে কি কি চুরি গেছে।

অপূর্ব বলিল, বেশ ত, তাই দেখুন না কি-কি চুরি গেল।

ভারতী হাসিল, কহিল, আসবার সময় আপনার তোরঙ্গ গুছিয়েও আমি দিইনি, চুরিও করিনি,—সুতরাং, কি ছিল আর কি নেই আমি জানব কি করে?

অপূর্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সে ত ঠিক কথা। তাহলে তেওয়ারী আসুক, সে হয়ত সমস্ত জানে। এই বলিয়া সে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলার প্রতি করুণচক্ষে চাহিল।

তাহার নিরুপায়ের মত মুখের চেহারায় ভারতী আমোদ বোধ করিল। হাসিমুখে কহিল, সে জানতে পারে আর আপনি পারেন না? আচ্ছা, কি করে জানতে হয় আপনাকে আমি শিখিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে তৎক্ষাণআৎ মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া সুমুখের ভাঙ্গা তোরঙ্গটা হাতের কাছে টানিয়া লইয়া কহিল, আচ্ছা, জামা-কাপড়গুলো আগে সব গুছিয়ে তুলি। এ-সব নিয়ে যাবার বোধ হয় তারা সময় পায়নি। এই বলিয়া সে এলোমেলো ধুতি, চাদর, পিরান, কোট প্রভৃতি একটির পরে একটি ভাঁজ করিয়া সাজাইয়া তুলিতে লাগিল। তাহার শিক্ষিত হস্তের নিপুণতা কয়েক মুহূর্তেই অপূর্বর চোখে পড়িল। এটা কি? মুর্শিদাবাদ সিল্কের সুট বুঝি? এরকম ক' জোড়া আছে বলুন ত?

অপূর্ব কহিল, দু'জোড়া।

ঠিক মিলেছে। এই এখানে আর এক জোড়া, এই বলিয়া সে সুট দু'টি সাজাইয়া বাক্সে তুলিল। ঢাকাই ধুতি—একটা, দুটো, তিনটে ;—চাদর—এক, দুই, তিন,—ঠিক মিলেছে। বোধ হয় তিন-জোড়াই ছিল, না?

অপূর্ব কহিল, হাঁ; আমার মনে আছে, তিন জোড়াই বটে।

এটা কি, আলপাকার-কোট? কৈ ওয়েস্ট কোট, প্যান্ট দেখছি না যে? ও—না, এ যে গলাবন্ধ দেখছি। এর সুট ছিল না, না?

অপূর্ব বলিল, না, ওটা আলাদাই বটে। ওর সুট ছিল না।

তাহাদের গুছাইয়া তুলিয়া ভারতী আর একটা হাতে তুলিয়া কহিল, এটা দেখছি ফ্লানেল সুট,—আপনি সেখানে টেনিস খেলতেন বুঝি? তা হলে একটা, দুটো, তিনটে, ওই আলনায় একটা, আপনার গায়ে একটা,—সুট তা হলে পাঁচ-জোড়া, না?

অপূর্ব খুশী হইয়া কহিল, ঠিক তাই। পাঁচ-জোড়াই বটে।

কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে উজ্জ্বল কি একটা পদার্থ চোখে পড়িতে টানিয়া বাহির করিয়া কহিল, এ যে সোনার চেন, ঘড়ি গেল কোথায়?

অপূর্ব খুশী হইয়া বলিল, যাক বাঁচা গেছে—চেনটা তারা দেখতে পায়নি। এটি আমার পিতৃদত্ত, তাঁরই স্মৃতিচিহ্ন—

কিন্তু ঘড়িটা?

এই যে, বলিয়া অপূর্ব তাহার কোটের পকেট হইতে সোনার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখাইল।

ভারতী কহিল, চেন, ঘড়ি পাওয়া গেল, বলুন ত আংটি আপনার কটা? হাতে ত একটিও নেই দেখছি।

অপূর্ব বলিল, হাতেও নেই, বাক্সেও ছিল না। আংটিই আমার কখনো হয়নি।

তা ভাল। সোনার বোতাম? সে বোধ হয় আপনার গায়ে সার্টে লাগানো আছে?

অপূর্ব ব্যস্ত হইয়া বলিল, কৈ না। সে যে একটা গরদের পাঞ্জাবীর সঙ্গে তোরঙ্গের মধ্যে সুমুখেই ছিল।

ভারতী আলনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল, যে-সকল বস্ত্র তখনও তোলা হয় নাই, একপাশে ছিল, তাহার মধ্যে অনুসন্ধান করিল, তার পরে একটু হাসিয়া কহিল, জামাসুদ্ধ এটা গেছে দেখছি। অন্য বোতাম ছিল না ত?

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া জানাইল, ছিল না। ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, ট্রাঙ্কে টাকা ছিল ত? অপূর্ব 'ছিল' বলিয়া সায় দিলে ভারতী উদ্বিগ্নমুখে কহিল, তা হলে তাও গেছে। কত ছিল জানেন না? তা আমি আগেই বুঝেচি। আপনার মানিব্যাগ আছে জানি। বার করে আমাকে দিন ত দেখি—

অপূর্ব পকেট হইতে তাহার ছোট চামড়ার থলেটি বাহির করিয়া ভারতীর হাতে দিতে সে মেঝের উপর ঢালিয়া ফেলিয়া সমস্ত গণনা করিয়া বলিল, দু'শ পঞ্চাশ টাকা আট আনা। বাড়ি থেকে কত টাকা নিয়ে বার হয়েছিলেন মনে আছে?

অপূর্ব কহিল, আছে বৈ কি। ছ'শ টাকা।

ভারতী টেবিলের উপর হইতে এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিল লইয়া লিখিতে লাগিল, জাহাজ ভাড়া, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া, কুলি ভাড়া,—পৌঁছে বাড়িতে টেলিগ্রাম করিছিলেন ত? আচ্ছা, তারও এক টাকা, তারপরে এই দশ দিনের বাসাখরচ—

অপূর্ব বাধা দিয়া কহিল, সে ত তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা না করলে জানা যাবে না।

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, তা যাবে, দু'এক টাকার তফাত হতে পারে, বেশী হবে না। যে ফুটা দিয়া আজ সে চুরি করা দেখিয়াছিল, সেই ছিদ্রপথে চোখ পাতিয়া সে যে এই ঘরের যাবতীয় ব্যাপার নিরীক্ষণ করিত, তেওয়ারীর বাজার করা হইতে আরম্ভ করিয়া খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন পর্যন্ত কিছুই বাদ যাইত না, এ কথা বলিল না, কাগজে ইচ্ছামত একটা অঙ্ক লিখিয়া সহসা মুখ তুলিয়া কহিল, এ ছাড়া আর বাজে খরচ নেই ত?

না।

ভারতী কাগজের উপর হিসাব করিয়া কহিল, তা'হলে দু'শ আশি টাকা চুরি গেছে।

অপূর্ব চমকিয়া কহিল, এত টাকা? রোস রোস, আরো কুড়ি টাকা বাদ দাও—জরিমানার টাকাটা ধরা হয়নি।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না সে ত অন্যায়, মিথ্যে জরিমানা—এ টাকা আমি বাদ দেব না।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, কি বিপদ! জরিমানা করাটা মিথ্যে হতে পরে, কিন্তু আমার টাকা দেওয়াটা ত মিথ্যে নয়?

ভারতী কহিল, দিলেন কেন? ও টাকা আমি বাদ দেব না। দু'শ আশি টাকা চুরি গেছে।

অপূর্ব বলিল, না, দু'শ ষাট টাকা।

ভারতী বলিল, না, দু'শ আশি টাকা।

অপূর্ব আর তর্ক করিল না। এই মেয়েটির প্রখর বুদ্ধি ও সকল দিকে অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সে আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল ; অথচ, এই সোজা বিষয়টা না বুঝিবার দিকে তাহার জিদ দেখিয়া তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না। বিচারের ন্যায়-অন্যায় যাহাই হউক, টাকা ব্যয় হইলে সে যে হাতে থাকে না এ কথা যে বুঝিতে চাহে না, তাহাকে সে আর কি বলিবে?

ভারতী অবশিষ্ট কাপড়গুলি গোছ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, পুলিশে খবর দেওয়া কি আপনি উচিত মনে করেন?

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, তা বটে। উচিত শুধু এই দিক থেকে হতে পারে যে তাতে আমার-টানাটানির আর অন্ত থাকবে না। নইলে, তারা এসে আপনার টাকার কিনারা করে দিয়ে যাবে এ আশা বোধ হয় করেন না?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। ভারতী বলিল, ক্ষতি যা হবার হয়েছে, এর পরে আবার তারা এলে অপমান শুরু হবে।

কিন্তু, আইন আছে—

অপূর্বর কথা শেষ হইল না, ভারতী অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল ; বলিল, আইন থাকে থাক; এ আপনাকে আমি কিছুতে করতে দিতে পারবো না। আইন সেদিনও ছিল আপনি যেদিন জরিমানা দিয়ে এসেছিলেন। এর মধ্যেই বুঝি তা ভুলে গেছেন?

অপূর্ব কহিল, লোকে যদি মিথ্যে বলে, মিথ্যে মামলা সাজায়, সে কি আইনের দোষ?

ভারতীর মুখ দেখিয়া মনে হইল না সে কিছুমাত্র লজ্জা পাইল। বলিল, লোকে মিথ্যে বলবে না, মিথ্যে মামলা সাজাবে না, তবেই আইন নির্দোষ হয়ে উঠবে, এই আপনার মত নাকি? এ হলে ত ভালই হয়, কিন্তু সংসারে তা হয় না, এবং হবার বোধ করি বিস্তর বিলম্ব আছে। এই বলিয়া সে একটু হাসিল, কিন্তু অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল, তর্কে যোগ দিল না। সেই প্রথম দিনে এই মেয়েটির কণ্ঠস্বরে, তাহার সুমিষ্ট সলজ্জ ব্যবহারে, বিশেষ করিয়া তাহার এই সকরুণ সহানুভূতিতে অপূর্ব মনের মধ্যে যে একটুখানি মোহের মত জন্মিয়াছিল, তাহার পরবর্তী আচরণে সে ভাব আর তাহার ছিল না। ভারতীর এই চুরি গোপন করিবার আগ্রহ এখন হঠাৎ কেমন তাহার ভারী খারাপ লাগিল। এই-সকল অযাচিত সাহায্যকেও আর যেন সে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না এবং কি একপ্রকার অজানা শঠতার সংশয়ে সমস্ত অন্তঃকরণ তাহার দেখিতে দেখতে কালো হইয়া উঠিল। সেদিনের সেই সভয়ে, সঙ্কোচে, গোপনে ফলমূল দিতে আসা, পরক্ষণেই আবার ঘরে গিয়া সমস্ত ঘটনা বিকৃত করিয়া মিথ্যা করিয়া বলা, তারপরে সেই আদালতে সাক্ষ্য দেওয়া,—নিমেষে সমস্ত ইতিহাস মনের মধ্যে তড়িৎরেখায় খেলিয়া গেল এবং মুখ তাহার গম্ভীর ও কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। এ সমস্তই অভিনয়, সমস্তই ছলনা! তাহার মুখের এই আকস্মিক পরিবর্তন ভারতী লক্ষ্য করিল, কিন্তু কারণ বুঝিতে পারিল না, বলিল, আমার কথার জবাব দিলেন না যে বড়?

অপূর্ব কহিল, এর আর জবাব কি? চোরকে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না,—পুলিশে একটা খবর দিতেই হবে।

ভারতী ভয় পাইয়া কহিল সে কি কথা! চোরও ধরা পড়বে না, টাকাও আদায় হবে

না,—মাঝে থেকে আমাকে নিয়ে যে টানাটানি করবে। আমি দেখেচি, তালাবন্ধ করেচি, সমস্ত গুছিয়ে তুলে রেখেছি,—আমি যে বিপদে পড়ে যাবো।

অপূর্ব কহিল, যা ঘটেছে তাই বলবেন।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া জবাব দিল, বললে কি হবে! এই সেদিন আপনার সঙ্গে তুমুল কাণ্ড হয়ে গেল, মুখ দেখাদেখি নেই, কথাবার্তা বন্ধ, হঠাৎ আপনার জন্যে আমার এত মাথাব্যথা পুলিশে বিশ্বাস করবে কেন?

অপূর্বর মন সন্দেহে অধিকতর কঠোর হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার আগাগোড়া মিছে কথা তারা বিশ্বাস করতে পারলে আর সত্য কথা পারবে না? টাকা সামান্যই গেছে, কিন্তু চোরকে আমি শাস্তি না দিয়ে ছাড়বো না।

তাহার মুখের পানে ভারতী হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া রহিল ; কহিল, আপনি বলেন কি অপূর্ববাবু! বাবা ভাল লোক নন, তিনি অকারণে আপনার প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করেছেন, আমি যে সাহায্য করেছি তাও আমি জানি, কিন্তু তাই বলে, ঘর ভেঙ্গে বাক্স ভেঙ্গে আপনার টাকা চুরি করব আমি? এ কথা আপনি ভাবতে পারলেন, কিন্তু আমি ত পারিনি! এ দুর্নাম রটলে আমি বাঁচব কি করে! বলিতে বলিতে তাহার ওষ্ঠাধর ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং দাঁত দিয়া জোর করিয়া ঠোঁট চাপিতে চাপিতে সে যেন ঝড়ের বেগে বাহির হইয়া গেল।

ছয়

পরদিন সকালে কি ভাবিয়া যে অপূর্ব পুলিশ-থানার দিকে পা বাড়াইয়া দিল তাহা বলা শক্ত। চুরির ব্যাপার পুলিশের গোচর করিয়া যে কোন ফল নাই তাহা সে জানিত। টাকা আদায় হইবে না, সম্ভবতঃ, চোর ধরা পড়িবে না,—এ বিশ্বাসটুকু পুলিশের উপরে তাহার ছিল। কিন্তু ও ক্রীশ্চান ম্লেচ্ছ মেয়েটার প্রতি তাহার ক্রোধ ও বিদ্বেষের আর সীমা ছিল না। ভারতী নিজে চুরি করিয়াছে, কিংবা চুরি করিতে সাহায্য করিয়াছে এ বিষয়ে তেওয়ারীর মত নিঃসংশয় হইতে সে এখনও পারে নাই, কিন্তু তাহার শঠতা ও ছলনা তাহাকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। জোসেফ সাহেবকে আর যে-কোন দোষই দেওয়া যাক, আপনাকে সুস্পষ্ট করিবার পক্ষে শুরু হইতে কোন ত্রুটি তাঁহার ঘটিয়াছে এ অপবাদ দেওয়া চলে না। তাঁহার শয়তানী নিরতিশয় ব্যক্ত, তাঁহার চাবুকের আস্ফালন দ্বিধাহীন, জড়িমাবর্জিত, প্রতিবেশীর প্রতি তাঁহার মনোভাবে কোথাও কোন হেঁয়ালি নাই, তাঁহার কণ্ঠ নিঃসঙ্কোচ বক্তব্য সরল ও প্রাঞ্জল, তাঁহার মদমত্ত পদক্ষেপ অনুভব করিতে কান খাড়া করিয়া রাখিতে হয় না,—এক কথায়, তাঁহাকে বুঝা যায়। কিন্তু এই মেয়েটির কথা ও কাজের যেন কোন উদ্দেশ খুঁজিয়া মিলে না। ক্ষতি সে যত করিয়াছে সেজন্যও তত নয়, কিন্তু গোড়া হইতে তাহার বিচিত্র আচরণ যেন অনুক্ষণ কেবল অপূর্বর বুদ্ধিকেই উপহাস করিয়া আসিয়াছে। রাগের মাথায় থানায় ঢুকিয়া সে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী পুলিশের কাছে বিবৃত করিতে পারিত কি না সন্দেহ, কিন্তু ততদুর গড়াইল না। পিছন হইতে ডাক শুনিল এ কি অপূর্ব নাকি? এখানে যে!

অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোশাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাংলা দেশের একজন বড় পুলিশ-কর্মচারী। অপূর্বর পিতা ইঁহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইঁহার মুরব্বি। নিমাইবুবু তাঁহাকে দাদা বলিতেন, এবং সেই সূত্রে অপূর্বরা সকলেই ইঁহাকে নিমাইকাকা বলিয়া ডাকিত। স্বদেশীযুগে অপূর্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইঁহারই প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে?

নিমাইবাবু আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কচিছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘরদোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েচে আর আমাকে হতে পারে না? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার ত আফিসে যাবার এখনও ঢের দেরি আছে। চল না বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারিনি

তার ঠিক নেই। মা ভাল আছেন? দাদারা?

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

জাহাজ ঘাটে। চল না আমার সঙ্গে।

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এতদূর আসতে হয়েছে, তাঁর মর্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করচে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিশের বাবার সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কিনা তাই ভাবচি।

অপূর্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কৌতূহলী হইয়া কহিল, মহাপুরুষটি কে কাকাবাবু? যখন আপনি এসেছেন, তখন বাঙালী সন্দেহ নেই,—খুনী আসামী, না?

নিমাইবাবু কহিলেন, ঐটি বলতে পারব না বাবা। তিনি যে কি, এবং কি নয়—এ কথা ঠিক কেউ জানে না। এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই, অথচ যে চার্জ আছে তা আমাদের পিনাল কোডের কোহিনূর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে এতবড় গবর্নমেন্ট যেন হিমসিম খেয়ে গেল।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী ত লোকে তোদেরও একসময় বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝায় না। ইনি হচ্চেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ, শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ-ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্যে পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না,—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বর্মা মুলুকে পদার্পণ করেছেন। এখন ম্যাণ্ডেলে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিংবা, রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করছেন সঠিক সংবাদ নেই,—তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সে কথা ঠিক। তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সন্দেহ, কোন তর্ক নেই,—শত্রুমিত্র সকলের মনেই তার স্থিরসিদ্ধান্ত হয়ে আছে, এবং নশ্বর দেহটি তাঁর পঞ্চভূতের জিম্মায় না দিতে পারা পর্যন্ত এ জন্মে যে এর আর পরিবর্তন নেই তাও সকলে জানি, শুধু এদেশে এসে কোন্ পথে যে তিনি পা বাড়াবেন সেইটি কেবল আমরা জানিনে। কিন্তু দেখো বাবা, এ-সব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না। তা হলে এই বৃদ্ধবয়সে সাতাশ বছরের পেন্সনটি ত মারা যাবেই, হয়ত বা কিছু উপরি পাওনাও ভাগ্যে ঘটতে পারে।

অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কি করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম ত কখনো শুনেছি মনে হচ্চে না!

নিমাইবাবু সহাস্যে কহিলেন, ওরে বাবা, এই-সব বড় লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জুনের মত দেশে দেশে কত নামই হয়ত এঁর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়ত শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারচো না। আর কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক ওয়াকিবহাল নই। রাজশত্রুরা ত তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম ঢাকপিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুনায় একদফা তিন মাস, এবং সিঙ্গাপুরে আর একদফা তিন বচ্ছর জেল খেটেছেন জানি। ছেলেটি দশ-বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাস করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারী পাস করেচে, বিলেতে আইন পাস করেচে, আমেরিকায় কি পাশ করেচে জানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে,—এ-সব বোধ করি এর তাস-পাশা খেলার সামিল,—রিক্রিয়েশান, কিন্তু, কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা, এর সর্বাঙ্গের শির দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েছেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও,—ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি-স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া-মায়া না

আছে ধর্ম-কর্ম, না আছে কোন ঘরদোর,—বাপ রে বাপ! আমারও ত এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

অপূর্ব সহসা কথা কহিতে পারিল না,—শিরার মধ্যে দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কহিল, এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেস্ট করবেন?

নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে ত পাই!

অপূর্ব কহিল, ধরুন পেলেন।

না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষমুহূর্তে আর কোন পথ দিয়ে আর কোথাও সরে গেছে।

আর যদি তিনি এসেই পড়েন তা হলে?

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, তাঁকে চোখে চোখে রাখবারই হুকুম আছে। দুদিন দেখি। ধারার চেয়ে ওয়াচ্ করার মূল্য বেশী,—এই ত সম্প্রতি গভর্নমেন্টের ধারণা।

কথাটা অপূর্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ তিনি যাই হোন তবুও পুলিশ। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। কহিল, এঁর বয়স কত?

নিমাইবাবু কহিলেন, বেশি নয়। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যেই।

কি রকম দেখতে?

এইটিই ভারী আশ্চর্য বাবা। এতবড় একটা ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই,নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।

অপূর্ব কহিল, কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই ত এঁর হাঁটা-পথে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আসা?

নিমাইবাবু বলিলেন, নাও হতে পারে। হয়ত কি একটা মতলব আছে, হয়ত পথটা একবার চিনে রাখতে চায়—কিছুই বলা যায় না অপূর্ব। এরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এদের হিসেব মেলে না,—আজ এরই ভুল কি আমাদেরই ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হতে পারে সমস্ত ছুটোছুটিই আমাদের বৃথা।

অপূর্ব এবার হাসিয়া কহিল, তাই যেন হয় আমি ভগবানের কাছে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি কাকাবাবু!

নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, বোকা ছেলে, পুলিশের কাছে এ কথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা কত বললে? তিরিশ? কাল সকালে পারি ত একবার গিয়ে দেখে আসবো। এই সামনের জেটিতেই বোধ হয় এদের স্টিমার লাগে,—আচ্ছা, তোমার আবার আফিসের সময় হয়ে এল,—নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভাল নয়। এই বলিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব কহিল, শুধু দেরি কেন, আজ আফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়চি নে। আমি চাইনে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও ত একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।

ইচ্ছা না থাকিলেও নিমাইবাবু বিশেষ আপত্তি করিলেন না, শুধু একটু সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, দেখবার লোভ যে হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু এ-সকল লোকের সঙ্গে কোন রকম আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছে করাও বিপজ্জনক তা তোমাকে বলে রাখি অপূর্ব! এখন আর তুমি ছেলেমানুষ নও, বাবাও বেঁচে নেই,—ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করার দায়িত্ব এখন একা তোমারই।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, আলাপ-পরিচয়ের সুযোগই কি আপনারা কাউকে কখনো দেন কাকাবাবু? দোষ করেন নি, কোন অভিযোগও নেই, তবুও ত তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় এতদূরে ছুটে এসেছেন।

ইহার উত্তরে নিমাইবাবু শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন। তাহার অর্থ অতীব গভীর। মুখে কহিলেন, কর্তব্য।

কর্তব্য! এই ছোট্ট একটি কথার আড়ালে পৃথিবীর কত ভাল, এবং কত মন্দই না সঞ্চিত হইয়া আছে। এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না। উভয়ে জেটিতে যখন প্রবেশ করিলেন তখন সেইমাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টিমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ-সাতজন পুলিশ-কর্মচারী সাদা পোশাকে পূর্বে হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল। ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়,—ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্মায় বিদ্রোহী-শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লজ্জায় ও দুঃখে সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই অকস্মাৎ একমুহূর্তে তাহার সমস্ত ব্যথিত চিত্ত গিয়া যেন কোন এক অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত দুর্ভাগার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিং ধরিয়া তাহাই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে,—ডেকের উপরে ব্যগ্রতা, কলরব ও ছুটাছুটির অবধি নাই,—হয়ত, ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুকচক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপসা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে, স্থলে এত নরনারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে! জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া একান্তমনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না। তাহাদের জন্য তুমি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং যাহাকে সে কোন দিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি ত আমাদের মত সোজা মানুষ নও,—তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয় ; তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয় ;—কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল,—সেই ত তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন! মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটী নমস্কার! এত লোকের ভিড়, এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না,—নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

কি করে পালালো?

নিমাইবাবু কহিলেন, তাই যদি জানবো ত সে কি পালায়? প্রায় শ'-তিনেক যাত্রী, বিশ-

পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ'-দেড়েক হবে, বাকী বর্মা—সে যে কার পোশাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা দেবা ন জানন্তি—বুঝলে না বাবাজী—আমরা ত পুলিশ! চেনবার জো নেই তিনি বিলেতের কি বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে জন-ছয়েক বাঙালীকে থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্তই,—সে নয়। যাবে না কি বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?

অপূর্বর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল, কহিল, তাদের যদি মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে।

নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার করব? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে যত মন্দ মনে করিস, সবাই তা নয়। ভাল-মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে ত তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারতে না অপূর্ব!

অপূর্ব লজ্জিত হইয়া কহিল, আপনি কর্তব্য করতে এসেছেন, তাই বলে আপনাকে ঘৃণা কেন করব কাকাবাবু! এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া কপালে ঠেকাইল। নিমাইবাবু খুশী হইয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, হয়েছে, হয়েছে। চল একটু শীঘ্র যাওয়া যাক, লোকগুলো ক্ষুধায় তৃষ্ণায় সারা হচ্চে, একটু পরীক্ষা করে ছেড়ে দেওয়া যাক। এই বলিয়া তিনি হাত ধরিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

পুলিশ-স্টেশনে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল, সুমুখের হলঘরে জন-ছয়েক বাঙালী মোটঘাট লইয়া বসিয়া আছে, জগদীশবাবু ইতিমধ্যেই তাহাদের টিনের তোরঙ্গ ও ছোট-বড় পুঁটুলি খুলিয়া তদারক শুরু করিয়া দিয়াছেন। শুধু যে-লোকটির প্রতি তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ হইয়াছে তাহাকে আর একটা ঘরে আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। ইহারা সকলেই উত্তরব্রহ্মে বর্মা-অয়েল-কোম্পানির তেলের খনির কারখানায় মিস্ত্রীর কাজ করিতেছিল, সেখানের জলহাওয়া সহ্য না হওয়ায় চাকরির উদ্দেশে রেঙ্গুনে চলিয়া আসিয়াছে। ইহাদের নাম ধাম ও বিবরণ লইয়া ও সঙ্গের জিনিসপত্রের পরীক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইলে, পোলিটিক্যাল সাসপেক্ট সব্যসাচী মল্লিককে নিমাইবাবুর সম্মুখে হাজির করা হইল। লোকটি কাশিতে কাশিতে আসিল। অত্যন্ত ফরসা রং রৌদ্রে পুড়িয়া যেন তামাটে হইয়াছে। বয়স ত্রিশ বত্রিশের অধিক নয়, কিন্তু ভারী রোগা দেখাইল। এইটুকু কাশির পরিশ্রমেই সে হাঁপাইতে লাগিল। সহসা আশঙ্কা হয়, সংসারের মিয়াদ বোধ করি বেশী দিন নাই ; ভিতরের কি একটা দুরারোগ্য রোগে সমস্ত দেহটা যেন দ্রুতবেগে ক্ষয়ের দিকে ছুটিয়াছে। কেবল আশ্চর্য সেই রোগা মুখের অদ্ভুত দুটি চোখের দৃষ্টি। সে চোখ ছোট কি বড়, টানা কি গোল, দীপ্ত কি প্রভাহীন এ-সকল বিবরণ দিতে যাওয়াই বৃথা—অত্যন্ত গভীর জলাশয়ের মত কি যে তাহাতে আছে, ভয় হয় এখানে খেলা চলিবে না, সাবধানে দূরে দাঁড়ানোই প্রয়োজন। ইহারই কোন্ অতল তলে তাহার ক্ষীণ প্রাণশক্তিটুকু লুকানো আছে, মৃত্যুও সেখানে প্রবেশ করিতে সাহস করে না।—কেবল এই জন্যই যেন সে আজও বাঁচিয়া আছে। অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া সেইদিকে চাহিয়া ছিল, সহসা নিমাইবাবু তাহার বেশভূষার বাহার ও পারিপাট্যের প্রতি অপূর্বর দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বাবুটির স্বাস্থ্য গেছে, কিন্তু শখ ষোলআনাই বজায় আছে তা স্বীকার করতে হবে। কি বল অপূর্ব?

এতক্ষণে অপূর্ব তাহার পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিল। তাহার মাথার সম্মুখদিকে বড় বড় চুল, কিন্তু ঘাড় ও কানের দিকে নাই বলিলেই চলে,—এমনি ছোট করিয়া ছাঁটা। মাথায় চেরা সিঁথি,—অপর্যাপ্ত তৈলনিষিক্ত, কঠিন, রুক্ষ, কেশ হইতে নিদারুণ নেবুর তেলের গন্ধে ঘর ভরিয়া উঠিয়াছে। গায়ে জাপানী সিল্কের রামধনু রঙের চুড়িদার পাঞ্জাবী, তাহার বুক-পকেট হইতে বাঘ-আঁকা একটা রুমালের কিয়দংশ দেখা

যাইতেছে, উত্তরীয়ের কোন বালাই নাই। পরনে বিলাতী মিলের কালো মকমল পাড়ের সূক্ষ্ম শাড়ী, পায়ে সবুজ রঙের ফুল মোজা—হাঁটুর উপরে লাল ফিতা দিয়া বাঁধা, বার্নিশ-করা পাম্প শু; তলাটা মজবুত ও টিকসই করিতে আগাগোড়া লোহার নাল বাঁধানো, হাতে একগাছি হরিণের শিঙের হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি—কয়দিনের জাহাজের ধকলে সমস্তই নোংরা হইয়া উঠিয়াছে,—ইহার আপাদমস্তক অপূর্ব বারবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, কাকাবাবু, এ লোকটিকে আপনি কোন কথা জিজ্ঞেসা না করেই ছেড়ে দিন, যাকে খুঁজছেন সে যে এ নয়, তার আমি জামিন হতে পারি।

নিমাইবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্ব কহিল, আর যাই হোক, যাঁকে খুঁজছেন তাঁর কাল্‌চরের কথাটা একবার ভেবে দেখুন।

নিমাইবাবু হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন, কহিলেন, তোমার নাম কি হে?

আজ্ঞে গিরীশ মহাপাত্র।

একদম মহাপাত্র! তুমিও তেলের খনিতেই কাজ করছিলে, না? এখন রেঙ্গুনেই থাকবে? তোমার বাক্স বিছানা ত খানাতল্লাশী হয়ে গেছে, দেখি তোমার ট্যাঁকে এবং পকেটে কি আছে?

তাহার ট্যাঁক হইতে একটি টাকা ও গণ্ডা-ছয়েক পয়সা বাহির হইল, পকেট হইতে একটা লোহার কম্পাস, মাপ করিবার কাঠের একটা ফুটরুল, কয়েকটা বিড়ি, একটা দেশলাই ও একটা গাঁজার কলিকা বাহির হইয়া পড়িল।

নিমাইবাবু কহিলেন, তুমি গাঁজা খাও?

লোকটি অসঙ্কোচে জবাব দিল, আজ্ঞে না।

তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন?

আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম, যদি কারও কাজে লাগে তাই তুলে রেখেচি।

জগদীশবাবু এই সময়ে ঘরে ঢুকিতে নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, দেখ জগদীশ, কিরূপ সদাশয় ব্যক্তি ইনি। যদি কারও কাজে লাগে তাই গাঁজার কল্‌কেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেচেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, গাঁজা খাবার সমস্ত লক্ষণই তোমাতে বিদ্যমান বাবা, বললেই পারতে, খাই। কিন্তু ক'দিনই বা বাঁচবে—এই ত তোমার দেহ,—আর খেয়ো না। বুড়োমানুষের কথাটা শুনো।

মহাপাত্র মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল, আজ্ঞে না মাইরি খাইনে। তবে ইয়ার বন্ধু কেউ তৈরি করে দিতে বললে দিই,—এই মাত্র! নইলে নিজে খাইনে।

জগদীশবাবু চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, দয়ার সাগর! পরকে সেজে দি, নিজে খাইনে! মিথ্যেবাদী কোথাকার!

অপূর্ব কহিল, বেলা হয়ে গেল, আমি এখন তবে চললুম কাকাবাবু।

নিমাইবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো মহাপাত্র। কি বল জগদীশ, পারে ত? জগদীশ সম্মতি জানাইলে কহিলেন, কিন্তু নিশ্চয় কিছুই বলা যায় না ভায়া, আমার মনে হয় এ শহরে আরও কিছুদিন নজর রাখা দরকার। রাত্রের মেল ট্রেনটার প্রতি একটু দৃষ্টি রেখো, সে যে বর্মায় এসেছে এ খবর সত্য।

জগদীশ কহিলেন, তা হতে পারে, কিন্তু এই জানোয়ারটাকে ওয়াচ্‌ করবার দরকার নেই বড়বাবু। নেবুর তেলের গন্ধে ব্যাটা থানাসুদ্ধ লোকের মাথা ধরিয়া দিলে! বড়বাবু হাসিতে লাগিলেন। অপূর্ব পুলিশ-স্টেশন হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং প্রায় তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মহাপাত্র তাঁহার ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গ ও চাটাই-জড়ানো ময়লা বিছানার বাণ্ডিল বগলে চাপিয়া ধীরে মন্থরপদে উত্তর দিকের রাস্তা ধরিয়া সোজা প্রস্থান করিল।

সাত

আশ্চর্য এই যে, এত বড় সব্যসাচী ধরা পড়িল না, কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না এমন সৌভাগ্যকেও অপূর্বর মন যেন গ্রাহ্যই করিল না। বাসায় ফিরিয়া দাড়ি-গোঁফ কামানো হইতে

শুরু করিয়া সন্ধ্যাহ্নিক, স্নানাহার, পোশাক-পরা, আফিস যাওয়া প্রভৃতি নিত্য কাজগুলায় বাধা পাইল না সত্য, কিন্তু ঠিক কি যে সে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই, অথচ, চোখ-কান ও বুদ্ধি তাহার সাংসারিক সকল ব্যাপার হইতেই একেবারে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন্ এক অদৃষ্ট অপরিজ্ঞাত রাজবিদ্রোহীর চিন্তাতেই ধ্যানস্থ হইয়া রহিল। এই অত্যন্ত অন্যমনস্কতা তলওয়ারকর লক্ষ্য করিয়া চিন্তিতমুখে জিজ্ঞসা করিল, আজ বাড়ি থেকে কোন চিঠি পেয়েছেন নাকি?

কৈ না।

বাড়ির খবর সব ভাল ত?

অপূর্ব কিছু আশ্চর্য হইয়া কহিল, যতদূর জানি সবাই ভালই ত আছেন।

রামদাস আর কোন প্রশ্ন করিল না। টিফিনের সময় উভয়ে একত্র বসিয়া জলযোগ করিত। রামদাসের স্ত্রী অপূর্বকে একদিন সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন, যতদিন তাঁহার মা কিংবা বাটীর আর কোন আত্মীয়া নারী এদেশে আসিয়া বাসার উপযুক্ত ব্যবস্থাদি না করেন ততদিন এই ছোট বহিনের হাতের তৈরি যৎসামান্য মিষ্টান্ন প্রত্যহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অপূর্ব রাজী হইয়াছিল। আফিসের একজন ব্রাহ্মণ পিয়াদা এই-সকল বহিয়া আনিত। আজও সে নিরালা পাশের ঘরটায় ভোজ্যবস্তুগুলি যখন সাজাইয়া দিয়া গেল, তখন আহারে বসিয়া অপূর্ব নিজেই কথা পাড়িল। কাল তাহার ঘরে চুরি হইয়া গেছে; সমস্তই যাইতে পারিত, কেবল উপরের সেই ক্রীশ্চান মেয়েটির কৃপায় টাকাকড়ি ছাড়া আর সমস্ত বাঁচিয়াছে। সে চোর তাড়াইয়া দরজায় নিজের তালা বন্ধ করিয়াছে, আমি বাসায় পৌঁছিলে চাবি খুলিয়া দিয়া অনাহূত আমার ঘরে ঢুকিয়া ছড়ানো জিনিসপত্র গুছাইয়া দিয়াছে, সমস্ত ফর্দ করিয়া কি আছে আর কি গেছে তার এমন নিখুঁত হিসাব করিয়া দিয়াছে যে বোধ হয় তোমার মত পাশ-করা এ্যাকাউন্টেন্টের পক্ষেও বিস্ময়কর। বাস্তবিক, এমন তৎপর, এতবড় কার্যকুশলা মেয়ে আর যে কেহ আছে মনে হয় না হে তলওয়ারকর! তা ছাড়া এত বড় বন্ধু!

রামদাস কহিল, তার পর?

অপূর্ব বলিল, তেওয়ারী ঘরে ছিল না, বর্মা নাচ দেখতে ফয়ায় গিয়েছিল, ইত্যবসরে এই ব্যাপার। তার বিশ্বাস এ কাজ ও ছাড়া আর কেউ করেনি। আমারও অনুমান কতকটা তাই। চুরি না করুক, সাহায্য করেচে।

তার পর?

তার পর সকালে গেলাম পুলিশে খবর দিতে। কিন্তু পুলিশের দল এমন কাণ্ড করলে, এমন তামাশা দেখালে যে ও-কথা আর মনেই হল না। এখন ভাবচি, যা গেছে তা যাক, তাদের চোর ধরে দিয়ে আর কাজ নেই, তারা বরঞ্চ এমনিধারা বিদ্রোহী ধরে ধরেই বেড়াক। এই বলিয়া তাহার গিরীশ মহাপাত্র ও তাহার পোশাক-পরিচ্ছদের বাহার মনে পড়িয়া হঠাৎ হাসির ছটায় যেন দম আটকাইবার উপক্রম হইল। হাসি থামিলে সে বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী বিলাতের ডাক্তার উপাধিধারী রাজশত্রু মহাপাত্রের স্বাস্থ্য, তাহার শিক্ষা ও রুচি, তাহার বল-বীর্য, তাহার রামধনু রঙের জামা, সবুজ রঙের মোজা ও লোহার নাল ঠোকা পাম্প শু, তাহার নেবুর তেলের গন্ধবিলাস, সর্বোপরি তাহার পরহিতায় গাঁজার কলিকাটির আবিষ্কারের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা করিতে করিতে তাহার উৎকট হাসির বেগ কোনমতে আর একবার সংবরণ করিয়া শেষে কহিল, তলওয়ারকর, মহা হুঁশিয়ার পুলিশের দলকে আজকের মত নির্বোধ আহম্মক হতে বোধ করি কেউ কখনো দেখেনি। অথচ, গভর্নমেন্টের কত টাকাই না এরা বুনো হাঁসের পিছনে ছুটোছুটি করে অপব্যয় করলে!

রামদাস হাসিয়া কহিল, কিন্তু বুনো হাঁস ধরাই যে এদের কাজ; আপনার চোর ধরে দেবার জন্যে এরা নেই। আচ্ছা, এরা কি আপনাদের বাঙলা দেশের পুলিশ?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। তা ছাড়া আমার বড় লজ্জা এই যে এদের যিনি কর্তা তিনি আমার আত্মীয়, আমার পিতার বন্ধু। বাবাই একদিন এঁর চাকরি করে দিয়েছিলেন।

রামদাস কহিল, তাহলে আপনাকেই হয়ত আর একদিন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে-ই একটু অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিল,—আত্মীয়ের সম্বন্ধে এরূপ একটা মন্তব্য প্রকাশ করা হয়ত শোভন হয় নাই। অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অর্থ বুঝিল, কিন্তু এই ধারণা যে সত্য নয়, ইহাই সতেজে ব্যক্ত করিতে সে জোর করিয়া বলিল, আমি তাঁকে কাকা বলি, আমাদের তিনি আত্মীয়, শুভাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু তাই বলে আমার দেশের চেয়ে ত তিনি আপনার নন। বরঞ্চ, যাঁকে তিনি দেশের টাকায়, দেশের লোক দিয়ে শিকারের মত তাড়া করে বেড়াচ্চেন তিনি ঢের বেশী আমার আপনার।

রামদাস মুচকিয়া একটু হাসিয়া কহিল, বাবুজী, এ-সব কথা বলার দুঃখ আছে।

অপূর্ব কহিল, তাকে, তাই নেব। কিন্তু তাই বলে তলওয়ারকর,—শুধু কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর যে-কোন দেশে, যে-কোন যুগে যে-কেউ জন্মভূমিকে তার স্বাধীন করবার চেষ্টা করেচে, তাকে আপনার নয় বলবার সাধ্য আর যার থাক আমার নেই। বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার তীক্ষ্ণ এবং চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল ; মনে মনে বুঝিল কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সামলাইতে পারিল না, বলিল, তোমার মত সাহস আমার নেই, আমি ভীরু, কিন্তু তাই বলে অবিচারে দণ্ডভোগ করার অপমান আমাকে কম বাজে না রামদাস। বিনা দোষে ফিরিঙ্গী ছোঁড়ারা আমাকে যখন লাথি মেরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বার করে দিলে, এবং এই অন্যায়ের প্রতিবাদ যখন করতে গেলাম, তখন সাহেব স্টেশনমাস্টার কেবলমাত্র আমাকে দেশী লোক বলেই দেশের স্টেশন থেকে কুকুরের মত দূর করে দিলে,—তার লাঞ্ছনা এই কালো চামড়ার নীচে কম জ্বলে না তলওয়ারকর! এমন ত নিত্য-নিয়তই ঘটচে,—আমার মা, আমার ভাই-বোনকে যারা এই-সব সহস্র কোটি অত্যাচার থেকে উদ্ধার করতে চায় তাদের আপনার বলে ডাকবার যে দুঃখই থাক আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম।

রামদাসের সুশ্রী গৌরবর্ণ মুখ ক্ষণকালের জন্য আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, কৈ এ ঘটনা ত আমাকে বলেন নি!

অপূর্ব কহিল, বলা কি সহজ রামদাস? হিন্দুস্থানের লোক সেখানে কম ছিল না, কিন্তু আমার অপমান কারও গায়েই ঠেকল না এমনি তাদের অভ্যাস হয়ে গেছে। লাথির চোটে আমার যে হাড়-পাঁজরা ভেঙ্গে যায়নি এই সুখবরে তারা সব খুশী হয়ে গেল। তোমাকে জানাবো কি—মনে হলে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় নিজেই যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাই।

রামদাস চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল। সুমুখের ঘড়িতে তিনটা বাজিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু কিছুই না বলিয়া হঠাৎ হাত বাড়াইয়া অপূর্বর ডান হাতটা টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সেই দিন বিকালে আফিসের ছুটি হইবার পূর্বে বড়সাহেব একখানা লম্বা টেলিগ্রাম হাতে অপূর্বর ঘরে ঢুকিয়া কহিলেন, আমাদের ভামোর আফিসে কোন শৃঙ্খলাই হচ্চে না। ম্যানডালে, শোএবো, মিক্‌থিলা এবং এদিকে প্রোম সব-কটা আফিসেই গোলযোগ ঘটচে। আমার ইচ্ছা তুমি একবার সবগুলো দেখে আস। আমার অবর্তমানে সমস্ত ভারই ত তোমার,—একটা পরিচয় থাকা চাই,—সুতরাং বেশী দেরি না কোরে কাল-পরশু যদি একবার—

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিল, আমি কালই বার হয়ে যেতে পারি। বস্তুতঃ নানা কারণে রেঙ্গুনে তাহার আর একমুহূর্তে মন টিকিতে ছিল না। উপরন্তু, এই সূত্রে দেশটাও একবার দেখা হইবে। অতএব যাওয়াই স্থির হইল, এবং পরদিনই অপরাহ্নবেলায় সুদূর ভামো নগরের উদ্দেশে যাত্রা করিয়া সে ট্রেনে চাপিয়া বসিল। সঙ্গে রহিল আরদালি এবং আফিসের একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ পিয়াদা। তেওয়ারী খবরদারির জন্য বাসাতেই রহিল। পা-ভাঙ্গা সাহেব হাসপাতালে পড়িয়া, সুতরাং তেমন আর ভয় নাই। বিশেষতঃ এই ম্লেচ্ছদেশের রেঙ্গুন শহরটা

বরং সহিয়াছিল, কিন্তু আরও অজানা স্থানে পা বাড়াইবার তাহার প্রবৃত্তিই ছিল না। তলওয়ারকর তেওয়ারীর পিঠ ঠুকিয়া দিয়া সাহস দিয়া কহিল, তোমার চিন্তা নেই ঠাকুর, কোন কিছু হলেই আফিসে গিয়ে আমাকে সংবাদ দিয়ো।

গাড়ি ছাড়িতে বোধ করি তখনও মিনিট-পাঁচেক বিলম্ব ছিল, অপূর্ব হঠাৎ চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, ওই যে!

তলওয়ারকর ঘাড় ফিরাইতেই বুঝিল, এই সেই গিরীশ মহাপাত্র। সেই বাহারে জামা, সেই সবুজ রঙের ফুল মোজা, সেই পাম্প শু এবং ছড়ি, প্রভেদের মধ্যে এখন কেবল সেই বাঘ-আঁকা রুমালখানি বুকপকেট ছাড়িয়া তাঁহার কণ্ঠে জড়ানো। মহাপাত্র এই দিকেই আসিতেছিল, সুমুখে আসিতেই অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, কি হে গিরীশ, আমাকে চিনতে পারো? কোথায় চলেচ?

গিরীশ শশব্যস্তে একটা মস্ত নমস্কার করিয়া কহিল, আজ্ঞে, চিনতে পারি বৈ কি বাবুমশায়। কোথায় আগমন হচ্ছেন?

অপূর্ব সহাস্যে কহিল, আপাততঃ ভামো যাচ্চি। তুমি কোথায়?

গিরীশ কহিল, আজ্ঞে, এনাঞ্জাং থেকে দু'জন বন্ধু লোক আসার কথা ছিল,—আমাকে কিন্তু বাবু ঝুটমুট হয়রান করা। হাঁ, আনে বটে কেউ কেউ আপিং সিদ্ধি লুকিয়ে, কিন্তু, আমি বাবু ভারী ধর্মভীরু মনুষ। বলি কাজ কি বাপু জুচ্চুরিতে—কথায় বলে পরোধর্ম ভয়াবয়। লল্লাটের লেখা ত খণ্ডাবে না!

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, আমারও ত তাই বিশ্বাস। কিন্তু তোমার বাপু একটু ভুল হয়েছে, আমি পুলিশের লোক নই, আফিম সিদ্ধির কোন ধার ধারিনে,—সেদিন কেবল তামাশা দেখতেই গিয়েছিলাম।

তলওয়ারকর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছিল, কহিল, বাবুজী, ম্যয় নে আপকো ত জরুর কঁহা দেখা—

গিরীশ কহিল, আশ্চয্যি নেহি হ্যায় বাবু সাহেব, নোকরির বাস্তে কেত্তা যায়গায় ত ঘুমতা হ্যায়,—

অপূর্বকে বলিল, কিন্তু আমার ওপর মিথ্যে সন্দেহ রাখবেন না বাবুমশায়, আপনাদের নজর পড়লে চাকরিও একটা জুটবে না। বামুনের ছেলে, বাংলা লেখাপড়া, শাস্তর-টাস্তর সবই কিছু কিছু শিখেছিলাম, কিন্তু এমন অদেষ্ট যে—বাবুমশায় আপনারা—

অপূর্ব কহিল, আমি ব্রাহ্মণ।

আজ্ঞে, তা হলে নমস্কার। এখন তবে আসি,—বাবুসাহেব, রাম রাম—বলিতে বলিতে গিরীশ মহাপাত্র একটা উদ্গত কাশির বেগ সামলাইয়া লইয়া ব্যগ্রপদে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল।

অপূর্ব কহিল, এই সব্যসাচীটির পিছনেই কাকাবাবু সদলবলে এদেশ ওদেশ করে বেড়াচ্ছেন তলওয়ারকর! বলিয়া সে হাসিল। কিন্তু এই হাসিতে তলওয়ারকর যোগ দিল না। পরক্ষণে বাঁশী বাজাইয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিলে সে হাত বাড়াইয়া বন্ধুর করমর্দন করিল, কিন্তু তখনও মুখ দিয়া তাহার কথাই বাহির হইল না। নানা কারণে অপূর্ব লক্ষ্য করিল না, কিন্তু করিলে দেখিতে পাইত এই মুহূর্তকালের মধ্যে রামদাসের প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাটের উপরে যেন কোন এক অদৃশ্য মেঘের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, এবং সেই সুদূর দুর্নিরীক্ষ্য লোকেই তাহার সমস্ত মনশ্চক্ষু একেবারে উধাও হইয়া গিয়াছে।

অপূর্ব প্রথমশ্রেণীর যাত্রী, তাহার কামরায় আর কেহ লোক ছিল না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে সে পিরানের মধ্যে হইতে পৈতা বাহির করিয়া বিনা জলেই সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিল, এবং যে-সকল ভোজ্যবস্তু শাস্ত্রমতে স্পর্শদুষ্ট হয় না জানিয়া সে সঙ্গে আনিয়াছিল, পিতলের পাত্র হইতে বাহির করিয়া আহার করিল, জল ও পান তাহার ব্রাহ্মণ আরদালী পূর্বাহ্ণেই রাখিয়া গিয়াছিল, এবং শয্যাও সে প্রস্তুত করিয়া দিয়া গিয়াছিল, এতএব রাত্রির মত অপূর্ব ভোজনাদি

শেষ করিয়া হাতমুখ ধুইয়া পরিতৃপ্ত সুস্থচিত্তে শয্যা আশ্রয় করিল। তাহার ভরসা ছিল প্রভাতকাল পর্যন্ত আর তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিবে না। কিন্তু ইহা যে কতবড় ভ্রম তাহা কয়েকটা স্টেশন পরেই সে অনুভব করিল। সেই রাত্রির মধ্যে বার-তিনেক তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া পুলিশের লোক তাহার নাম ও ধাম ঠিকানা লিখিয়া লইয়াছে। একবার সে বিরক্ত হইয়া প্রতিবাদ করায় বর্মা সব-ইনস্পেক্টর সাহেব কটুকণ্ঠে জবাব দেয়, তুমি ত ইউরোপিয়ান নও!

অপূর্ব কহে, না। কিন্তু আমি ত ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার,—রাত্রে ত আমার তুমি ঘুমের বিঘ্ন করিতে পারো না।

সে হাসিয়া বলে, ও নিয়ম রেলওয়েকর্মচারীর জন্য,—আমি পুলিশ ; ইচ্ছা করিলে আমি তোমাকে টানিয়া নীচে নামাইতে পারি।

ইহার পরে আর অপূর্ব প্রত্যুত্তর করে নাই। কিন্তু শেষের দিকে ঘণ্টা তিন-চারেক নিরুপদ্রবে কাটার পরে সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বিগত রাত্রির গ্লানির কথা আর তাহার মনে ছিল না। একটা বড় পাহাড়ের অনতিদূর দিয়া গাড়ি মন্থর গতিতে চলিয়াছিল, খুব সম্ভব এটা চড়াইয়ের পথ। এইখানে জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া সে অকস্মাৎ বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। চক্ষের পলকে বুঝিল, পৃথিবীর এতবড় সৌন্দর্য-সম্পদ সে আর কখনও দেখে নাই। গিরিশ্রেণী অর্ধবৃত্তাকারে বিস্তৃত হইয়া যেন পিছন ও সুমুখের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার বিরাট দেহ ব্যাপিয়া কি গভীর বন, এবং গগনস্পর্শী কি বিপুলকায় বৃক্ষেরাজিই না তাহার সুবিস্তীর্ণ পাদমূল ঘেরিয়া সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে! বোধ হয় সবেমাত্র সূর্যোদয় হইয়াছে, বামদিকের শিখর ডিঙাইয়া রথ তাঁহার আকাশে এখনও দেখা দেয় নাই, কিন্তু অগ্রবর্তী কিরণচ্ছটায় উপরের নীল অরণ্যে সোনা মাখাইয়া সেই তাঁহার আসার সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইতে আর বাকী নাই। খাদের মধ্যে শিখর-নিঃসৃত জলের ধারা বহিয়াছে, বনের ছায়ার নীচে তাহার শান্ত প্রবাহ অশ্রুরেখার মতই সকরুণ হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ব মুগ্ধ হইয়া গেল। একি আশ্চর্য সুন্দর দেশ! এখানে যাহারা যুগ-যুগান্ত ধরিয়া বাসা বাঁধিতে পাইয়াছে তাহাদের সৌভাগ্যের কি সীমা আছে? কিন্তু কেবলমাত্র সীমা নাই বলিয়া, শুধু একটা অনির্দিষ্ট আনন্দের আভাসমাত্র লইয়াই মানবের হৃদয় পূর্ণ-তৃপ্তি মানিতে চাহে না, তাই সে ইহাকে মূর্তি দিয়া, রূপ দিয়া মনে মনে সহস্রবিধ রসে ও রঙে পল্লবিত করিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল। এমনি করিয়া তাহার ভাবুক চিত্ত যখন অন্তরে-বাহিরে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া আসিতেছিল, তখন হঠাৎ যেন কঠিন ধাক্কায় চমকিয়া দেখিল তাহার কল্পনার রথচক্র মেদিনী গ্রাস করিতেছে। রামদাস তলওয়ারকরের কথাগুলা মনে পড়িল। আসিয়া পর্যন্ত এই ব্রহ্মদেশের অনেক গুপ্ত ও ব্যক্ত কাহিনী সে সংগ্রহ করিতেছিল। সেই প্রসঙ্গে একদিন সে বলিয়াছিল, বাবুজী, শুধু কেবল শোভা-সৌন্দর্যই নয়, প্রকৃতি-মাতার দেওয়া এতবড় সম্পদও কম দেশে আছে। ইহার বন ও অরণ্য অপরিমেয়, মাটির মধ্যে ইহার অফুরন্ত তেলের প্রস্রবণ, ইহার মহামূল্য রত্নখনির মূল্য নিরূপিত হয় না, আর ওই যে আকাশচুম্বী মহাদ্রুমের সারি, জগতে ইহার তুলনা কোথায়? সে বেশী দিনের কথা নয়, সংবাদ পাইয়া একদিন ইংরাজ বণিকের লুব্ধদৃষ্টি ইহারই প্রতি একেবারে একান্ত হইয়া পড়িল। তাহার অনিবার্য পরিণাম অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং সোজা। বিবাদ বাধিল, মানোয়ারি জাহাজ আসিল, বন্দুক-কামান আসিল, সৈন্যসামন্ত আসিল, লড়াই বাধিল, যুদ্ধে হারিয়া দুর্বল অক্ষম রাজা নির্বাসিত হইলেন এবং তাঁহার রানীদের গায়ের গহনা বেচিয়া লড়াইয়ের খরচ আদায় হইল। অতঃপর, দেশের ও দশের কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে, সভ্যতা ও ন্যায়ধর্মের কল্যাণে ইংরাজ রাজশক্তি বিজিত দেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাহাদের অশেষবিধ ভালো করিতে কায়মনে লাগিয়া গেলেন। তাই ত আজ তথায় সতর্কতার অবধি নাই, তাই ত সেই বিজিত দেশের পুলিশ কর্মচারী তাহারই মত আর এক পরাধীন দেশের নিরীহ ব্যক্তিকে বারংবার ঘুম ভাঙ্গাইয়া নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিল তুমি ত সাহেব নও যে তোমাকে অপমান করিতে আমার বাধিবে? অপূর্ব মনে মনে কহিল, বটেই ত! বটেই ত! ইহার অধিক আমাকে সে কি দিবে? ইহার বড় আমিই বা

কোন্ মুখে তাহার কাছে দাবী করিব?

অরণ্যশিরে প্রভাতসূর্যের কনক আভা তখনও রঙ হারায় নাই, কিন্তু তাহার চোখে অত্যন্ত ম্লান ও কান্তিহীন ঠেকিল, সমুন্নত পর্বতমালা তাহার কাছে সামান্য এবং বৃক্ষশ্রেণীর যে বিপুলতা দেখিয়া সে ক্ষণেক পূর্বে বিস্ময়-মুগ্ধ হইয়াছিল তাহারাই তাহার দৃষ্টিতে সাধারণ ও নিতান্ত বিশেষত্ববর্জিত বলিয়া বোধ হইল। তাহার নদীমাতৃক, সমতল, শস্যশ্যামল বঙ্গ ভূমিকে মনে পড়িয়া দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল,—প্রবাসী পীড়িতচিত্ত তাহার বুকের মধ্যে আর্তনাদ করিয়া যেন বার বার করিয়া বলিতে লাগিল, ওরে দুর্ভাগা দেশের শক্তিহীন নরনারী! ওই অশেষ ঐশ্বর্যময়ী জন্মভূমির প্রতি তোদের অধিকার কিসের? যে ভার, যে গৌরব তোরা বহিতে পারিবি না তাহার প্রতি এই ব্যর্থ-লোভ তোদের কিসের জন্য? স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার আছে কেবল মনুষ্যত্বের, শুধু মানুষ বলিয়াই থাকে না ; এ কথা আজ কে অস্বীকার করিবে? ভাগবানও যে ইহা হরণ করিতে পারেন না! তোদের ওই-সব ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, পঙ্গু হাত-পাগুলাকেই কি তোরা মানুষ বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়া আছিস? ভুল, ভুল ; ইহার বড় আত্মঘাতী ভুল ত আর হইতেই পারে না। এমনি কত কি যে আপনাকে আপনি বলিতে বলিতে তাহার সময় কাটিতে লাগিল তাহার হিসাব ছিল না, অকস্মাৎ, ট্রেনের গতি মন্দীভূত হওয়ার তাহার চেতনা হইল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল গাড়ি স্টেশনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

আট

ছেলেবেলা হইতেই মেয়েদের প্রতি অপূর্বর শ্রদ্ধা ছিল না। বরঞ্চ, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। বৌদিদিরা ঠাট্টা-তামাশা করিলে সে মনে মনে রাগ করিত, ঘনিষ্ঠতা করিতে আসিলে দূরে সরিয়া যাইতে। মা ভিন্ন আর কাহারও সেবাযত্ন তাহার ভালই লাগিত না। কোন মেয়ে কলেজে পড়িয়া একজামিন পাস করিয়াছে শুনিলে সে খুশী হইত না এবং সেদিন যখন বিলাতে ইহারা কোমর বাঁধিয়া রাজনৈতিক অধিকারের জন্য লড়াই করিতেছিল খবরের কাগজে সেই-সকল কাহিনী পড়িয়া তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে থাকিত। তবে একটা জিনিস ছিল, তাহার স্বভাবতঃ কোমল ভদ্র-হৃদয়। এইখানে সে নরনারীর-নির্বিশেষে প্রাণিমাত্রকেই অত্যন্ত ভালবাসিত, কাহাকেও কোন কারণেই ব্যথা দিতে তাহার বাধিত। তাহার এই একটি দুর্বলতাই যে ভারতীকে অপরাধী জানিয়াও শেষ পর্যন্ত শাস্তি দিতে দেয় নাই এ সংবাদ তাহার অগোচর ছিল না। কিন্তু পুরুষের যৌবন-চিত্ততলে আরও যে অনেক প্রকারের দুর্বলতা একান্ত সংগোপনে বাস করে, সেই খবরটাই আজও তাহার কাছে পৌঁছে নাই। এই ক্রীশ্চান মেয়েটিকে কোনদিন কঠিন দণ্ড দেওয়া যে তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ইহা সত্য না হইতে পারে, কিন্তু নারীর প্রতি তাহার বিমুখতা সত্য বলিয়াই যে মন তাহার ভারতীকেও অনায়াসে চিরদিন দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিবে তাহাও তেমনিই সত্য না হইতে পারে। অথচ, আজ যে সেই নিষ্ঠুর মিথ্যাচারিণী রমণীর প্রতি তাহার বিরাগ ও বিদ্বেষের অবধি ছিল না এ কথাও ত তাহার অন্তর্যামী দেখিতেছিলেন।

দিন-পনর হইল সে ভামোয় আসিয়াছে। এখানকার কাজ তাহার একপ্রকার সমাধা হইয়াছে, কাল-পরশু তাহার মিক্‌থিলা রওনা হইবার কথা। সন্ধ্যার পরে আজ আফিস হইতে ফিরিয়া নিজের ঘরের বারান্দায় বসিয়া সে মনে মনে একটা অত্যন্ত জটিল সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত ছিল। নারীর স্বাধীনতার প্রসঙ্গে মন তাহার কোনকালেই সায় দিতে চাহিত না। ইহাতে মঙ্গ ল নাই, ইহা ভাল নয়—তাহার রুচি ও আজন্ম সংস্কার এ কথা অনুক্ষণ তাহার কানে কানে বলিত। অথচ, শাস্ত্রীয় অনুশাসনগুলার মধ্যেও যে ইহাদের প্রতি গভীর অবিচার নিহিত আছে এ সত্য তাহার ন্যায়নিষ্ঠ চিত্ত কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিত না। ইহাতে সে দুঃখ পাইত কিন্তু পথ পাইত না। অকস্মাৎ, আজ এই দ্বিধা তাহার যে কারণে একেবারে কাটিয়া গেল তাহা এইরূপ—

যে দ্বিতল ঘরটিতে সে বাসা লইয়াছে তাহার নীচের তলায় একটি ব্রহ্মদেশীয় ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। সকালে আফিসে যাইবার পূর্বে তাঁহার সংসারে এক বিষম অনর্থ ঘটে। তাঁহার চার কন্যা, সকলেই বিবাহিতা। কি একটা উৎসব উপলক্ষে জামাতারা সকলেই আজ উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভোজের সময় সম্ভ্রম ও ইজ্জত লইয়া প্রথমে মেয়েদের মধ্যে, এবং অনতিকাল পরেই বাবাজীবনদের মধ্যে লাঠালাঠি রক্তারক্তি বাধিয়া যায় ; অপূর্ব খবর লইতে গিয়া হতবুদ্ধি হইয়া শুনিল যে ইঁহাদের একজন মাদ্রাজের চুলিয়া মুসলমান, একজন চট্টগ্রামের বাঙালী-পর্তুগীজ, একজন এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সাহেব, এবং ছোট-জামাতাটি চীনা, কয়েক পুরুষ হইতে এই শহরেই বাস করিয়া চামড়ার কারবার করিতেছেন। এইরূপ পৃথিবীসুদ্ধ জাতির শ্বশুর হইবার গৌরব অন্যত্র দুর্লভ হইলেও এখানে অতিশয় সুলভ। তত্রাচ, প্রতিবারেই নাকি ভদ্রলোক সভয়ে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু মেয়েদের অপ্রতিহত স্বাধীনতা তাহাতে কান পর্যন্ত দেয় নাই। এক-একদিন এক-একটি কন্যাকে বাটীর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, আবার এক-একদিন করিয়া তাহারা ফিরিয়া আসিল, এবং সঙ্গে আসিল এই বিচিত্র জামাইয়ের দল। তাহাদের ভাষা আলাদা, ভাব আলাদা, ধর্ম আলাদা, মেজাজ আলাদা,—শিক্ষা সংস্কার কাহারও সহিত কাহারও এক নয়,—এই যে দেশের মধ্যে ভারতের হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের মত ধীরে ধীরে এক অতি কঠিন সমস্যার উদ্ভব হইতেছে ইহার মীমাংসা হইবে কি করিয়া? ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে, বিরক্তিতে সে মনে মনে লাফাইতে লাগিল, এবং মেয়েদের এই সামাজিক স্বাধীনতাকেই একশ' বার করিয়া বলিতে লাগিল, এ হইতেই পারে না,—এমন কিছুতেই চলিবে না। বর্মা নষ্ট হইতেছে, ইয়োরোপ উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে—সেই ধার-করা সভ্যতা আমাদের দেশেও আমদানি করিলে আমরা সমূলে মরিব। আমাদের সমাজ যাঁহারা গড়িয়াছিলেন নারীকে তাঁহারা চিনিয়াছিলেন, তাই ত এই সতর্ক বিধি-নিষেধ। ইহা কঠোর হউক, কিন্তু কল্যাণে পরিপূর্ণ। এ দুর্দিনে যদি না তাঁহাদের অসংশয়ে ধরিয়া থাকিতে পারি ত, মৃত্যু হইতে কেহই আমাদের বাঁচাইতে পারিবে না। এমনি ধারা কত কি সেই অন্ধকারে একাকী বসিয়া আপন মনে বলিয়া চলিতে লাগিল। কিন্তু হায় রে! এই সোজা কথাটা তাহার একবারও উদয় হইল না যে, মুক্তিমন্ত্রকে সে এ জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া কায়মনে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে, তাহারই আর এক মূর্তিকে সে দুই হাতে ঠেলিয়া মুক্তির সত্যকার দেবতাকেই অসম্মানে দূর করিয়া দিতেছে! মুক্তি কি তোমার এমনই ছোট্ট একটুখানি জিনিস? তাহাকে কি তোমার আরামে চোখ বুজিয়া স্নান করিবার চৌবাচ্চা স্থির করিয়া বসিয়া আছ? সে সমুদ্র। আছেই ত তাহাতে ভয়, আছেই ত তাহাতে উত্তাল তরঙ্গ, আছেই ত তাহাতে কুমির হাঙ্গর! তরী সেইখানেই ডোবে,—তবু সেইখানেই আছে জগতের প্রাণ, তারই মধ্যে আছে সকল শক্তি, সকল সম্পদ, সকল সার্থকতা। নিরাপদ পুকুর লইয়া কেবলমাত্র প্রাণধারণ করাটুকুই চলে, বাঁচা চলে না।

বাবুজী, আপনার খাবার তৈরি।

অপূর্ব চকিত হইয়া কহিল, রামশরণ, একটা আলো নিয়ে আয়। কাল সকালের গাড়িতেই আমরা মিক্‌থিলা যাবো। ম্যানেজারকে একটা খবর পাঠিয়ে দে।

আরদালি কহিল, কিন্তু আপনার যে পরশু যাবার কথা ছিল?

না, আর পরশু নয়, কালই,—একটা আলো দিয়ে যা, এই বলিয়া অপূর্ব এ সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল। সমাজের মধ্যে মেয়েদের স্বাধীনতার একটা নূতন দিক দেখিয়া মন তাহার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল ; কিন্তু আরও যে দিক আছে, যাহার বর্ণ ও আলো সমস্ত গগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে, এ দৃশ্য আজ তাহার মনে স্বপ্নেও উদয় হইল না।

পরদিন যথাসময়ে সে মিক্‌থিলার উদ্দেশে যাত্রা করিল। কিন্তু এখানে আসিয়া তাহার মন টিকিল না। দেশী ও বিলাতী পল্টনের ছাউনি আছে, বাঙালী অনেকগুলি সপরিবারে বাস করিতেছেন—খাসা শহর, নূতন লোকের পক্ষে দেখিয়া বেড়াইবার অনেক বস্তু আছে,

কিন্তু এ-সকল তাহার ভালই লাগিল না। মনটা রেঙ্গুনের জন্য কেবলই ছটফট করিতে লাগিল। ভামোয় থাকিতে রিডাইরেক্ট-করা মায়ের একখানা পত্র সে পাইয়াছিল, রামদাসেরও গোটা-দুই চিঠি তারপর আসিয়াছিল, কিন্তু সেও প্রায় দশ-বারোদিন পূর্বে। রামদাস জানাইয়াছিল তাহার ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বাসাবদল করিবার প্রয়োজন নাই, এবং সে নিজে গিয়া দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছে তেওয়ারীজী সুখে এবং শান্তিতে বাস করিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে কেমন আছে, তাহার সুখ-শান্তি বজায় আছে, কিংবা দুই-ই অন্তর্হিত হইয়াছে কোন খবরই তাহাকে দেওয়া হয় নাই। খুব সম্ভব সমস্তই ঠিক আছে, ব্যাঘাত কিছুই হয় নাই কিন্তু তবু একদিন সে ভামোর মতই হঠাৎ জিনিসপত্র বাঁধিয়া স্টেশনের জন্য গাড়ি ডাকিতে হুকুম করিয়া দিল। এই স্থানটাকে মনে রাখিবার মত কিছুই তাহার ঘটে নাই, যৎসামান্য কাজকর্মের মধ্যে বিশেষত্ব কিছুই ছিল না, কিন্তু ছাড়িয়া যাইবার মিনিট পনর পূর্বে স্টেশনে আসিয়া এমন একটা ব্যাপার ঘটিল যাহা আপাততঃ সামান্য ও সাধারণ বোধ হইলেও ভবিষ্যতে বহুদিন তাহাকে স্মরণ করিতে হইয়াছে। একজন মাতাল বাঙালীর ছেলেকে রেলের লোকে ট্রেন হইতে নামাইয়াছে। পরনে তাহার মলিন ও ছিন্ন হ্যাট-কোট প্রভৃতি বিলাতি পোশাক। সঙ্গে কেবল একটা ভাঙ্গা বেহালার বাক্স, না আছে বিছানা, না আছে কিছু। টিকিটের পয়সায় সে মদ কিনিয়া খাইয়াছে এইমাত্র তাহার অপরাধ। বাঙালীর ছেলে, পুলিশে লইয়া যায়,—অপূর্ব তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিল, আরও গোটা-পাঁচেক টাকা তাহার হাতে দিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতেছিল, হঠাৎ সে হাতজোড় করিয়া কহিল মশাই, আমার এই বেহালাখানা আপনি নিয়ে যান। বিক্রি করে টাকাটা আপনার কেটে নিয়ে বাকী আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। তাহার কণ্ঠস্বরের জড়িমা সত্ত্বেও ইহা বুঝা গেল সে সজ্ঞানেই কথা কহিতেছে।

অপূর্ব কহিল, কোথায় ফিরিয়ে দেব?

সে কহিল, আপনার ঠিকানা বলে দিন, আপনাকে আমি চিঠি লিখে জানাব।

অপূর্ব কহিল, তোমার বেহালা তোমার থাক বাপু, ও আমি বিক্রি করতে পারব না। আমার নাম অপূর্ব হালদার, রেঙ্গুনের বোথা কোম্পানিতে চাকরি করি, যদি কখনো তোমার সুবিধে হয় টাকা পাঠিয়ে দিয়ো।

সে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা মশাই, নমস্কার,—আমি নিশ্চয় পাঠিয়ে দেব। বার হবার পথ বুঝি ওই দিকে? বেশ বড় শহর, না? বোধ হয় সব জিনিসই পাওয়া যায়! বাস্তবিক মশায়, আপনার দয়া আমি কখনো ভুলব না। এই বলিয়া সে আর একটা নমস্কার করিয়া বেহালার বাক্স বগলে চাপিয়া চলিয়া গেল। তাহার চেহারাটা এইবার অপূর্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিল। বয়স বেশী নয় কিন্তু ঠিক কত বলা শক্ত। বোধ হয় সর্বপ্রকার নেশার মাহাত্ম্যে বছর-দশেকের ব্যবধান ঘুচিয়া গেছে। বর্ণ গৌর, কিন্তু রৌদ্রে পুড়িয়া তামাটে হইয়াছে; মাথার রুক্ষ লম্বা চুল কপালের নীচে ঝুলিতেছে, চোখের দৃষ্টি ভাসা-ভাসা, নাক খাঁড়ার মত সোজা এবং তীব্র। দেহ শীর্ণ, হাতের অঙুলগুলা দীর্ঘ এবং সরু—সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া উপবাস ও অত্যাচারের চিহ্ন আঁকা। সে চলিয়া গেলে অপূর্বর কেমন যেন একটা কষ্ট হইতে লাগিল। তাহাকে আর অধিক টাকা দেওয়া বৃথা, এমন কি অন্যায়—এ কথা সে বুঝিয়াছিল, কিন্তু আর কোন-কিছু একটা উপকার করা যদি সম্ভব হইত। কিন্তু, এ লইয়া চিন্তা করিবার আর সময় ছিল না, তাহাকে টিকিট কিনিয়া গাড়ির জন্য প্রস্তুত হইতে হইল।

পরদিন রেঙ্গুনে যখন সে পৌঁছিল তখন বেলা বারোটা। যেমন কড়া রৌদ্র, তেমনি গোমট গরম। তাহার উপর বিপদ এই হইয়াছিল যে তাড়াতাড়ি ও অসাবধানে তাহার খাবারের পাত্রটা মুসলমান কুলি ছুঁইয়া ফেলিয়াছিল। স্নান নাই, আহার নাই,—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লান্তিতে তাহার দেহ যেন টলিতে লাগিল। কোনমতে বাসায় পৌঁছিয়া স্নান করিয়া একবার শুইতে পাইলে যেন বাঁচে। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া হইয়া আসিলে জিনিসপত্র বোঝাই দিয়া বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে মিনিট-দশেক মাত্র লাগিল। কিন্তু উপরের দিকে চাহিয়া

তাহার ক্রোধের অবধি রহিল না। তেওয়ারীর কোন উৎকণ্ঠাই নাই, রাস্তার দিকে বারান্দার কবাটটা পর্যন্ত খোলে নাই, গাড়ির শব্দে একবার নামিয়াও আসিল না। দ্রুতপদে উঠিয়া গিয়া দ্বারের উপরে সজোরে করাঘাত করিয়া ডাকিল,—তেওয়ারী! ওরে ও তেওয়ারী! ক্ষণকাল পরে আস্তে, অত্যন্ত সাবধানে কবাট খুলিয়া গেল। ক্রুদ্ধ অপূর্ব ঘরের মধ্যে পা বাড়াইবে কি বিস্ময়ে অবাক ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সুমুখে দাঁড়াইয়া ভারতী। তাহার এ কি মূর্তি! পায়ে জুতা নাই, পরনে একখানি কালো রঙের শাড়ী, চুল শুকনো এলোমেলো, মুখের উপর শান্ত-গভীর বিষাদের ছায়া,—এ যেন কোন্ বহুদূরের তীর্থযাত্রী, রোদে পুড়িয়া, জলে ভিজিয়া, অনাহারে অনিদ্রায় রাত্রি-দিবা পথ চলিয়াছে—যে-কোন মুহূর্তেই পথের পরে পড়িয়া মরিতে পারে। ইহার প্রতি কেহ যে কোনদিন রাগ করিতে পারে অপূর্ব মনে করিতেই পারিল না। ভারতী মাথা নোয়াইয়া একটু নমস্কার করিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আপনি এসেছেন,—এবার তেওয়ারী বাঁচবে।

ভয়ে অপূর্বর স্বর জড়াইয়া গেল, কহিল, কি হয়েছে তার?

ভারতী তেমনিই মৃদুকণ্ঠে বলিল, এদিকে অনেকের বসন্ত হচ্চে, তারও হয়েচে। কিন্তু আপনি ত এখন এত পরিশ্রমের পরে এ ঘরে ঢুকতে পারেন না। উপরের ঘরে চলুন, ঐখানে বরঞ্চ স্নান করে একটু জিরিয়ে নীচে আসবেন। তা ছাড়া ও ঘুমোচ্চে, জাগলে আপনাকে খবর দেব।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, উপরের ঘরে?

ভারতী বলিল, হাঁ। ঘরটা এখনো আমাদেরই আছে, কিন্তু আমি চলে গেছি। বেশ পরিষ্কার করা আছে, কলে জল আছে, কেউ নেই, আপনার কষ্ট হবে না, চলুন। কিন্তু আপনার লোকজন কৈ? সঙ্গের জিনিসপত্রগুলো তারা ওইখানেই নিয়ে আসুক।

কিন্তু তাদের ত আমি স্টেশন থেকেই ছেড়ে দিয়েচি। তারাও ত আমারি মত ক্লান্ত হয়েছিল।

ভরতী কহিল, তা বটে, কিন্তু এখন কি কুলী পাওয়া যাবে? আচ্ছা, দেখি।

আপনাকে দেখতে হবে না, আমিই দেখচি। ওই ক'টা জিনিস আমি নিজেই আনতে পারবো, বলিয়া অপূর্ব নীচে যাইতেছিল, গাড়োয়ান মুখ বাড়াইয়া ভাড়া চাহিল। ভারতী তাহাকে ইশারায় উপরে ডাকিয়া কহিল, এখন ত লোক পাওয়া যাবে না, তুমি যদি একটু কষ্ট করে জিনিসগুলো তুলে দিয়ে যাও তোমাকে তার দাম দেব। তাহার স্নিগ্ধ কথায় খুশী হইয়া গাড়োয়ান জিনিস আনিতে গেল।

সমস্ত আসিয়া পড়িলে ভারতী পথের দিকের ঘরটায় মেঝের উপর পরিপাটি করিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া দিয়া কহিল, এইবার স্নান করে আসুন।

অপূর্ব কহিল, সমস্ত ব্যাপারটা আগে আমাকে খুলে বলুন।

ভারতী কলের ঘরটা দেখাইয়া দিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না, আগে স্নান করে আপনার সন্ধ্যে-আহ্নিকগুলো সেরে আসুন।

অপূর্ব জিদ করিল না। খানিক পরে সে স্নান প্রভৃতি সারিয়া আসিলে ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, আপনার এই গেলাসটা নিন, জানালার উপরে কাগজে মোড়া ওই চিনি আছে, নিয়ে আমার সঙ্গে কলের কাছে আসুন, কি করে শরবত তৈরি করতে হয় আমি শিখিয়ে দিই। চলুন।

অধিক বলার প্রয়োজন ছিল না, তৃষ্ণায় তাহার বুক ফাটিতেছিল, সে নির্দেশমত শরবত তৈরি করিয়া পান করিল, এবং একটু নেবুর রস হইলে আরও ভাল হইত তাহা নিজেই কহিল।

ভারতী বলিল, আপনাকে যে আরও একটা দুঃখ আমাকে দিতে হবে, বলিয়া সে মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

অপূর্বর সেই চুরির দিনের কথাবার্তা, কাজকর্মের ধরন-ধারণ মনে পড়িয়া নিজেরও

কথা কহা যেন সহজ হইয়া পড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, কি রকম দুঃখ?

ভারতী কহিল, নীচে থেকে আমি কয়লা এনে রেখেচি, টেলিগ্রাম পেয়ে সুমুখের বাড়ির উড়ে ছেলেটিকে দিয়ে আপনার সেই লোহার উনুনটি মাজিয়ে ধুইয়ে নিয়েচি,—চাল আছে, ডাল আছে, আলু, পটল, ঘি, তেল, নুন সমস্ত মজুত আছে,—পেতলের হাঁড়িটি এনে দিচ্চি আপনি শুধু একটু জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে চড়িয়ে দেবেন। এই বলিয়া সে অপূর্বর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব আন্দাজ করিয়া বলিল, সত্যি বলচি, কিচ্ছু শক্ত কাজ নয়। আমি সমস্ত দেখিয়ে দেব, আপনি শুধু চড়াবেন আর নামাবেন। আজকের মত এই কষ্টটি করুন, কাল অন্য ব্যবস্থা হবে।

তাহার কণ্ঠস্বরের ঐকান্তিক ব্যাকুলতা অপূর্বকে হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা মারিল। সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনার খাবার ব্যবস্থা কি-রকম হয়? কখন বাসায় যান?

ভারতী কহিল, বাসায় নাই গেলাম, কিন্তু আমাদের খাবার ভাবনা আছে নাকি? এই বলিয়া সে কথাটা উড়াইয়া দিয়া প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি আনিতে তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

ঘণ্টা-খানেক পরে অপূর্ব রাঁধিতে বসিলে সে ঘরের চৌকাটের বাহিরে দাঁড়াইয়া কহিল, এখানে দাঁড়ালে দোষ হয় না তা জানেন ত?

অপূর্ব কহিল, জানি, কারণ, হলে আপনি দাঁড়াতেন না। জীবনে সে এই প্রথম রাঁধিতে বসিয়াছে অপটু হস্তের সহস্র ত্রুটিতে মাঝে মাঝে ভারতীর ধৈর্যচ্যুতি হইতে লাগিল, কিন্তু রাঁধা ডাল বাটিতে ঢালিতে গিয়া যখন বাটি ছাড়া আর সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল, তখন সে আর সহিতে পারিল না। রাগ করিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, আপনাদের মত অকর্মা লোকগুলোকে কি ভগবান সৃষ্টি করেন শুধু আমাদের জব্দ করতে? খাবেন কি করে বলুন ত?

অপূর্ব নিজেই অপ্রতিভ হইয়াছিল, কহিল, এ যে হাঁড়ির ওদিক দিয়ে না পড়ে এদিক দিয়ে গড়িয়ে পড়বে কি করে জানব বলুন? আচ্ছা, ওপর থেকে একটু তুলে নেব?

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, নেবেন বৈ কি! নইলে আর বিচার থাকবে কি করে! নিন উঠুন, জল দিয়ে ও-সব ধুয়ে ফেলে দিয়ে এই আলু-পটলগুলো তেল আর জল দিয়ে সেদ্ধ করে ফেলুন। গুঁড়ো মশলা ওই শিশিটাতে আছে, নুন দেবার সময়ে আমি না হয় দেখিয়ে দেব,—তরকারি বলে ওই দিয়ে আজ আপনাকে খেতে হবে। ভাতের ফ্যান ত সব ভাতের মধ্যেই আছে, নেহাত মন্দ হবে না। আঃ—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার রান্না দেখার চেয়ে বরং নরকভোগ ভাল।

ইহার ঘণ্টা-দেড়েক পরে অপূর্বর আহার শেষ হইলে সে কৃতজ্ঞতার আবেগ দমন করিয়া শান্ত-মৃদুকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আমি যে কি বলব ভেবে পাইনে, কিন্তু এবার আপনি বাসায় যান। এখন থেকে আমিই দেখতে পারব, আর আপনাকে বোধ হয় এত দুঃখ ভোগ করতে হবে না।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিল, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলুন। এদিকে আরও দশজনের বসন্ত হচ্চে, তেওয়ারীরও হয়েচে—এ পর্যন্ত খুব সোজা। কিন্তু এ বাসা থেকে আপনাদের সবাই চলে গেলে এই নির্বান্ধব দেশে এবং ততোধিক বন্ধুহীন পুরীতে আপনি কি করে যে তার প্রাণ দিতে রয়ে গেলেন এইটেই আমি কোন মতে ভেবে পাইনে। জোসেফ সাহেবও কি আপত্তি করেন নি?

ভারতী কহিল, বাবা বেঁচে নেই, তিনি হাসপাতালেই মারা গেছেন।

মারা গেছেন? অপূর্ব অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া বলিল, আপনার কালো কাপড় দেখে এমনি কোন একটা ভয়ানক দুর্ঘটনা আমার পূর্বেই অনুমান করা উচিত ছিল।

ভারতী কহিল, তার চেয়েও বড় দুর্ঘটনা ঘটলো হঠাৎ মা যখন মারা গেলেন—

মা মারা গেছেন? অপূর্ব স্তব্ধ অসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। নিজের মায়ের কথা মনে পড়িয়া তাহার বুকের মধ্যে কি-এরকম করিতে লাগিল কখনো সে পূর্বে অনুভব করে নাই। ভারতী নিজেও জানালার বাহিরে মিনিট-দুই নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অশ্রু সংবরণ করিল। মুখ ঘুরাইতে গিয়া দেখিল অপূর্ব সজলচক্ষে তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। আবার তাহাকে জানালার বাহিরে চোখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল। কাহারো কাছেই অশ্রুপাত করিতে তাহার অত্যন্ত লজ্জা করিত। কিন্তু আপনাকে শান্ত করিয়া লইতেও তাহার বিলম্ব হইত না, মিনিট দুই-তিন পরে ধীরে ধীরে বলিল, তেওয়ারী বড় ভাল লোক। আমার মা অনেকদিন থেকেই শয্যাগত ছিলেন, যে-কোন সময়েই তাঁর মৃত্যু হতে পারে আমরা সবাই জানতুম। তেওয়ারী আমাদের অনেক করেছে। আমার চলে যাবার সময় সে কাঁদতে লাগলো, কিন্তু এত ভাড়া আমি কোথা থেকে দেব?

অপূর্ব নীরবে শুনিতে লাগিল। ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আপনার সেই চুরি ধরা পড়েচে,—টাকা, বোতাম পুলিশে জমা আছে আপনি খবর পেয়েছেন?

কৈ না!

হাঁ, ধরা পড়েচে। ওকে যারা সেদিন তামাশা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল তাদেরই দল। আরও কার কার চুরি করার পরে বোধ হয় ভাগাভাগি নিয়ে বনিবনাও না হওয়াতেই একজন সমস্ত বলে দিয়েছে। এক চেঠির দোকানে যা-কিছু জমা রেখেছিল, পুলিশ সমস্ত উদ্ধার করেচে। আমি একজন সাক্ষী, এইখানে সন্ধান নিয়ে তারা একদিন আমার কাছে উপস্থিত,—সেই খবরটা দিতে এসেই ত দেখি এই ব্যাপার। কবে মকদ্দমা ঠিক জানিনে, কিন্তু সমস্ত ফিরে পাওয়া যাবে শুনেচি।

এই শেষ-কথাটা হয়ত সে না বলিলেই পারিত ; কারণ লজ্জায় অপূর্বর মুখ শুধু আরক্তই হইল না, এই ব্যাপারে নিজের সেই-সকল ব্যক্ত ও অব্যক্ত ইঙ্গিতগুলা মনে করিয়া তাহার গায়ে কাঁটা দিল। কিন্তু ভারতী এ-সব লক্ষ্যও করিল না, বলিতে লাগিল, ভেতর থেকে দোর বন্ধ, কিন্তু হাজার ডাকাডাকিতেও কেউ সাড়া দিলে না। আমাদের উপরের ঘরের চাবিটা আমার কাছে ছিল, খুলে ভেতরে গেলাম। মেঝেতে আমার একটা প্রসিদ্ধ ফুটো আছে,—বলিয়া সে একটুখানি লজ্জার মৃদুহাসি গোপন করিয়া কহিল, তার মধ্যে দিয়ে আপনার ঘরের সমস্ত দেখা যায়, দেখি, সমস্ত জানালা বন্ধ, অন্ধকারে কে একজন আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে,—তেওয়ারী বলেই বোধ হল। সেই ফুটো দিয়ে চেঁচিয়ে এক শ' বার বললাম, তেওয়ারী, আমি, আমি ভারতী, কি হয়েছে দোর খোল। নীচে এসে আবার তেমনি ডাকাডাকি করতে লাগলাম, মিনিট-কুড়ি পরে তেওয়ারী হামাগুড়ি দিয়ে এসে কোনমতে দোর খুলে দিলে। তার চেহারা দেখে আমার বলবার কিছু আর রইল না। দিন-চারেক পূর্বে সুমুখের বাড়ির নীচের ঘর থেকে বসন্ত-রোগী জন-দুই তেলেগু কুলীকে পুলিশের লোকে হাসপাতালে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কান্না আর অনুনয়-বিনয় তেওয়ারী নিজের চোখে দেখেছে,—আমার পা-দুটো সে দু হাতে চেপে ধরে একেবারে হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বললে, মাইজী, আমাকে পেলেগ হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ো না তাহলে আমি আর বাঁচব না। কথাটা মিথ্যে নেহাত নয়, ফিরতে কাউকে বড় শোনা যায় না। সেই ভয়ে সে দোর-জানালা দিবারাত্রি বন্ধ করে পড়ে আছে,—পাড়ার কেউ ঘুণাক্ষরে জানলে আর রক্ষে নেই।

অপূর্ব অভিভূতের ন্যায় তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল, কহিল, আর সেই থেকে আপনি একলা দিনরাত আছেন,—আমাকে একটা খবর পাঠালেন না কেন? আমাদের আফিসের তলওয়ারকরবাবুকে ত জানেন, তাঁকে বলে পাঠালেন না কেন?

ভারতী কহিল, কে যাবে? লোক কৈ? ভেবেছিলাম, হয়ত খবর নিতে একদিন তিনি আসবেন, কিন্তু এলেন না। এ বিপদ যে ঘটেচে তিনিই-বা কি করে ভাববেন? তা ছাড়া

জানাজানি হয়ে যাবার ভয় আছে।

তা বটে। বলিয়া অপূর্ব একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, আপনার নিজের চেহারা কি হয়ে গেছে দেখেছেন?

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ এর চেয়ে আগে ঢের ভাল ছিল?

অপূর্বর মুখে সহসা এ কথার উত্তর যোগাইল না, কিন্তু তাহার দুই চোখের মুগ্ধদৃষ্টি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার গঙ্গাজল দিয়া যেন এই তরুণীর সর্বাঙ্গের সকল গ্লানি, সকল ক্লান্তি ধুইয়া মুছিয়া দিতে চাহিল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, মানুষে যা করে না, তা আপনি করেছেন, কিন্তু এবার আপনার ছুটি। তেওয়ারী শুধু আমার চাকর নয়, সে আমার বন্ধু, আমার আত্মীয়,—তার কোলে-পিঠে চড়ে আমি বড় হয়েচি। এখন থেকে তার রোগে আমিই সেবা করব,—কিন্তু তার জন্যে আপনাকে আমি পীড়িত হতে দিতে পারব না। এখনো আপনার স্নানাহার হয়নি, আপনি বাসায় যান। সে কি এখান থেকে বেশী দূরে?

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। বাসা আমার তেলের কারখানার পাশে, নদীর ধারে। আমি কাল আবার আসব। দুইজনে নীচে নামিয়া আসিল, তালা খুলিয়া উভয়ে ঘরে প্রবেশ করিল। তেওয়ারীর সাড়া নাই, ঘুম ভাঙ্গিলেও সে অধিকাংশ সময় অজ্ঞান আচ্ছন্নের মত পড়িয়া থাকে। অপূর্ব গিয়া তাহার বিছানার পাশে বসিল। এবং যে দুই-চারিটা অপরিষ্কার পাত্র তখনও মাজিয়া ধুইয়া রাখা হয় নাই, সেইগুলি হাতে লইয়া ভারতী স্নানের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার ইচ্ছা ছিল যাইবার পূর্বে রোগীর সম্বন্ধে গোটা-কয়েক প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়া এই দুর্দান্ত ভয়ানক রোগের মধ্যে আপনাকে সাবধানে রাখিবার অত্যাবশ্যকতা বার বার স্মরণ করাইয়া দিয়া যায়। হাতের কাজ শেষ করিয়া সে এই কথাগুলিই মনে মনে আবৃত্তি করিয়া এ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল অপূর্ব অচেতন তেওয়ারীর অতি-বিকৃত মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া যেন পাথরের মূর্তির মত বসিয়া আছে, তাহার নিজের মুখ একেবারে ছাইয়ের মত সাদা। বসন্ত রোগ সে জীবনে দেখে নাই, ইহার ভীষণতা তাহার কল্পনার অগম্য। ভারতী কাছে গিয়া দাঁড়াইতে সে মুখ তুলিয়া চাহিল। তাহার দুই চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল, এবং সেই চক্ষে পলক না পড়িতেই ঠিক ছেলেমানুষের মতই ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমি পারব না।

নয়

ভারতী ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শুধু কহিল, পারবেন না? তাই ত!

তাহার কণ্ঠস্বরে একটুখানি বিস্ময়ের আভাস ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, কিন্তু এই কি জবাব? এই কি সে তাহার কাছে আশা করিয়াছিল? হঠাৎ যেন মার খাইয়া অপূর্বর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল।

ভারতী কহিল, তাহলে একটা খবর দিয়ে ত ওকে হাসপাতালেই পাঠাতে হয়। তাহার কথার মধ্যে শ্লেষও ছিল না, ঝাঁজও ছিল না, কিন্তু লজ্জায় অপূর্বর মাথা হেঁট হইল। লজ্জা শুধু তাহার না-পারার জন্য নয়, যে পারে তাহাকেই পারিতে বলার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের মধ্যে লুকাইয়া আরও প্রচ্ছন্ন যে দাবী ছিল, ভারতীর শান্ত প্রত্যাখ্যানে সে যখন কঠিন তিরস্কারের আকারে ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে বাজিল, তখন আনতমুখে বসিয়া অত্যন্ত অনুশোচনার সহিত তাহাকে আর একবার মনে করিতে হইল, এই মেয়েটিকে সে যথার্থই চিনে নাই। দুঃখ দুশ্চিন্তা কোথাও কিছু ছিল না,—ছিল যেন কেবল কত দীপ, কত আলো জ্বালা ;—হঠাৎ কে যেন সমস্ত এক ফুঁয়ে নিবাইয়া দিয়া অসমাপ্ত নাটকের মাঝখানে যবনিকা টানিয়া দিল। ভয়ানক অন্ধকারে রহিল শুধু সে আর তাহার অপরিত্যাজ্য মরণোন্মুখ অচেতন তেওয়ারী।

ভরতী বলিল, বেলা থাকতে থাকতেই কিছু করা চাই। বলেন ত আমি যাবার পথে হাসপাতালে একটা টেলিফোঁ করে দিয়ে যেতে পারি। তারা গাড়ি এনে তুলে নিয়ে যাবে।

অপূর্ব তাহার আচ্ছন্ন ভাব জোর করিয়া কাটাইয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু

আপনি যে বললেন সেখানে গেলে কেউ বাঁচে না?

ভারতী কহিল, কেউ বাঁচে না এ কথা ত বলিনি।

অপূর্ব অত্যন্ত মলিনমুখে বলিল, তাহলে বেশী লোকেই ত মরে যায়?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, তা যায়। এই জন্যই জ্ঞান থাকতে কেউ সেখানে কিছুতে যেতে চায় না।

অপূর্ব চুপ করিয়া ক্ষণকাল বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, তেওয়ারীর কি কিচ্ছু জ্ঞান নেই?

ভারতী কহিল, কিছু আছে বৈ কি। সব সময়ে না থাকলেও মাঝে মাঝে সমস্তই টের পায়।

এই সময়ে তেওয়ারী সহসা কি-একপ্রকার আর্তনাদ করিয়া উঠিতে অপূর্ব এমনি চমকিয়া উঠিল যে, ভারতী তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাইল। সে কাছে আসিয়া রোগীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিল, কি চাই তেওয়ারী?

তেওয়ারী ঠোঁট নাড়িয়া যাহা বলিল অপূর্ব তাহার কিছুই বুঝিল না, কিন্তু ভারতী সাবধানে তাহাকে পাশ ফিরাইয়া দিয়া ঘটি হইতে একটুখানি জল তাহার মুখে দিয়া কানে কানে কহিল, তোমার বাবু এসেছেন যে!

প্রত্যুত্তরে তেওয়ারী অব্যক্ত ধ্বনি করিল, ডান হাতটা একবার তুলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নাড়িতে পারিল না। পরক্ষণেই দেখা গেল তাহার নিমীলিত চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে। অপূর্বর নিজের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি কোঁচার খুঁট দিয়া তাহা সে মুছিয়া ফেলিল, কিন্তু থামাইতে পারিল না,—বারে বারেই সেই দুটি আর্দ্র চক্ষু প্লাবিত করিয়া অজস্র ধারায় ঝরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন কেহ কোন কথা কহিল না। সমস্ত ঘরখানি দুঃখ ও শোকের ঘন-মেঘে যেন থমথম করিতে লাগিল। কথা কহিল প্রথমে ভারতী। সে একটুখানি সরিয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, কি আর করা যাবে, হাসপাতালেই পাঠিয়ে দিন।

অপূর্ব চোখের উপর হইতে তখনও আবরণ সরাইতে পারিল না, কিন্তু মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

ভারতী তেমনি আস্তে আস্তে কহিল, সেই ভাল। আমি এখন তাহলে চললুম। যদি সময় পাই কাল একবার আসবো।

তখনও অপূর্ব চোখ খুলিতে পারিল না, স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। যাইবার পূর্বে ভারতী বলিল, সবই আছে কেবল মোমবাতি ফুরিয়ে গেছে, আমি নীচে থেকে এক বাণ্ডিল কিনে দিয়ে যাচ্ছি, এই বলিয়া সে নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। মিনিট-কয়েক পরে বাতি লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখন কতকটা পরিমাণে বোধ হয় আপনাকে অপূর্ব সামলাইয়া লইতে পারিয়াছিল। চোখ মোছা শেষ হইয়াছে, কিন্তু ভেজা পাতার নীচে সে-দুটি রাঙ্গা হইয়া আছে। ভারতী ঘরে ঢুকিতেই সে আর একদিকে মুখ ফিরাইল। হাতের মোড়কটি কাছে রাখিয়া দিয়া কি যেন সে একবার বলিতে চাহিল, কিন্তু আর একজন যখন কথা না কহিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, তখন সেও আর প্রশ্ন না করিয়া পলকমাত্র নিঃশব্দে থাকিয়া প্রস্থানের জন্য দ্বার খুলিতেই, অপূর্ব অকস্মাৎ বলিয়া উঠিল, তেওয়ারী যদি জল খেতে চায়?

ভারতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, জল দেবেন।

অপূর্ব কহিল, আর যদি পাশ ফিরে শুতে চায়?

ভারতী বলিল, পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেবেন।

বলা ত সহজ! আমি শোব কোথায় শুনি? তাহার কণ্ঠস্বরে ক্রোধ চাপা রহিল না, কহিল, বিছানা ত রইল পড়ে ওপরের ঘরে!

ভারতী কি মনে করিল তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল না। একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া তেমনি শান্ত-মৃদুকণ্ঠে কহিল, আর একটা বিছানা ত আপনার খাটের উপরে আছে, তাতে ত অনায়াসে

শুতে পারবেন।

অপূর্ব কহিল, আপনি ত বলবেনই ও-কথা। আর আমার খাবার বন্দোবস্ত কি-রকম হবে?

ভারতী চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু এই অসঙ্গত ও অত্যন্ত খাপছাড়া প্রশ্নে গোপন হাসির আবেগে তাহার চোখের পাতা-দুটি যেন কাঁপিতে লাগিল। খানিক পরে পরম গাম্ভীর্যের সহিত কহিল, আপনার শোওয়া এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করার ভার কি আমার উপরে আছে?

তাই কি আমি বলচি?

এইমাত্র ত বললেন। এবং ভাল করে নয়, রাগ করে।

অপূর্ব ইহার আর উত্তর খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মলিন বিপন্ন-মুখের প্রতি চাহিয়া ভারতী ধীরে ধীরে কহিল, আপনার বলা উচিত ছিল দয়া করে আমার এই-সব বিলি-ব্যবস্থা আপনি করে দিন।

অপূর্ব কোন দিকে না চাহিয়া কহিল, তা বলা আর শক্ত কি?

ভারতী কহিল, বেশ ত, তাই বলুন না!

তাই ত বলচি, বলিয়া অপূর্ব মুখ ভারী করিয়া আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া রহিল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কখনো কি কারও রোগে সেবা করেন নি?

না।

আর কখনো বিদেশেও আসেন নি?

না, মা আমাকে কোথাও যেতে দেন না।

তবে, এবারে যে বড় আপনাকে ছেড়ে দিলেন?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। কেমন করিয়া এবং কি কারণে যে তাহার বিদেশে আসায় মা সম্মত হইয়াছিলেন এ কথা সে পরের কাছে বলিতে চাহিল না। ভারতী কহিল এতবড় চাকরি,—না ছেড়ে দিলেই বা চলবে কেন? কিন্তু তিনি সঙ্গে এলেন না কেন?

তাহার এই প্রকার তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশে অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আমার মাকে আপনি দেখেন নি, নইলে এ কথা বলতে পারতেন না। অনেক দুঃখেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু বিধবা মানুষ এই ম্লেচ্ছদেশে তিনি নিজে আসবেন কেমন করে?

ভারতী একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া বলিল, ম্লেচ্ছদের প্রতি আপনাদের ভয়ানক ঘৃণা। কিন্তু রোগ ত শুধু গরীবের জন্য সৃষ্টি হয়নি, আপনারও হতে পারতো। এখনো ত হতে পারে,—মা কি তাহলে আসবে না?

অপূর্বর মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, কহিল, এমন করে ভয়ে দেখালে আমি কি করে একলা থাকবো?

ভারতী কহিল, ভয় না দেখালেও আপনি একলা থাকতে পারবেন না। আপনি অত্যন্ত ভীতু মানুষ।

অপূর্ব প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইল না, চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করি আমি। আমার হাতে জল খেয়ে তেওয়ারীর ত জাত গেছে, ভাল হয়ে সে কি করবে?

অপূর্ব ইহার শাস্ত্রোক্ত বিধি জানিত না, একটু চিন্তা করিয়া কহিল, সে ত আর সজ্ঞানে খায়নি, মরণাপন্ন ব্যারামে খেয়েচে, না খেলে হয়ত মরে যেত। এতে বোধ হয় জাত যায় না, একটা প্রায়শ্চিত্ত করলেই হতে পারে।

ভারতী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল, হুঁ। তার খরচ বোধ হয় আপনাকেই দিতে হবে,—নইলে, আপনি বা তার হাতে খাবেন কি করে?

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া কহিল, আমিই দেব বৈ কি, নিশ্চয় দেব। ভগবান করুন সে শীঘ্র ভাল হয়ে উঠুক!

ভারতী বলিল, আর আমিই শুশ্রূষা করে তাকে ভাল করে তুলি, না?

তাহার শান্ত কঠিন কণ্ঠস্বর অপূর্ব লক্ষ্যই করিল না, কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উত্তর দিল, সে আপনার দয়া। তেওয়ারী বাঁচুক, কিন্তু আপনিই ত তার প্রাণ দিলেন।

ভারতী একটুখানি হাসিল। কহিল ম্লেচ্ছতে প্রাণ দিলে দোষ নেই, মুখে জল দিলেই তার প্রায়শ্চিত্ত চাই, না? এই বলিয়া সে পুনরায় একটু হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, এখন আমি চললাম। কাল যদি সময় পাই ত একবার দেখে যাবো। এই কথা বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইয়া হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আর যদি আসতে না পারি ত তেওয়ারী ভাল হলে তাকে বলবেন, আপনি না এসে পড়লে আমি যেতাম না, কিন্তু ম্লেচ্ছদেরও একটা সমাজ আছে, আপনার সঙ্গে একঘরে রাত্রি কাটালে তারাও ভাল বলে না। কাল সকালে আপনার পিয়ন এলে তলওয়ারকরবাবুকে খবর দেবেন। তিনি পাকা লোক, সমস্ত ব্যবস্থাই করে দিতে পারবেন। আচ্ছা, নমস্কার।

অপূর্ব কহিল, পাশ ফিরিয়ে দিলে ওর লাগবে না?

ভারতী বলিল, না।

রাত্রে যদি বিছানা বদলে দেবার দরকার হয়? কি করে দেব?

ভারতী কহিল, সাবধানে দেবেন। আমি মেয়েমানুষ হয়ে যদি পেরে থাকি আপনি পারবেন না।

অপূর্ব শঙ্কিতমুখে স্থির হইয়া রহিল। ভারতী যাইবার জন্য দ্বার খুলিতেই অপূর্ব সভয়ে বলিয়া উঠিল, আর যদি হঠাৎ বসে? যদি কাঁদে?

ভারতী এ-সকল প্রশ্নের আর কোন জবাব দিবার চেষ্টা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া সাবধানে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহার মৃদু পদশব্দ কাঠের সিঁড়ির উপরে যতক্ষণ শুনা গেল ততক্ষণ পর্যন্ত অপূর্ব কাঠের মূর্তির মত বসিয়া রহিল, কিন্তু শব্দ থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাহার চোখের উপরে কোথা হইতে একটা কালো জাল নামিয়া আসিয়া সমস্ত দেহ কি করিয়া যে উঠিল সে জীবেনে কখনো অনুভব করে নাই। ভয়ে ছুটিয়া গিয়া বারান্দার কবাট খুলিয়া নীচে চাহিয়া দেখিল ভারতী দ্রুতপদে রাস্তায় চলিয়াছে। মিস্ জোসেফ নামটা সে মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেই পারিল না, উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, ভারতী!

ভারতী মাথা তুলিয়া চাহিতে অপূর্ব দুই হাত জোড় করিয়া কহিল, একবার আসুন—মুখ দিয়া আর তাহার কথা বাহির হইল না। ভারতী দ্বিরুক্তি না করিয়া ফিরিল। মিনিট-দুই পরে দ্বার খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল অপূর্ব নাই, তেওয়ারী একাকী পড়িয়া আছে। আগাইয়া আসিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল বারান্দায় সে নাই—কোথাও নাই। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, স্নানের ঘরের কবাট খোলা। কিন্তু মিনিট পাঁচ-ছয় অপেক্ষা করিয়াও যখন কেহ আসিল না, তখন সে সন্দিগ্ধচিত্তে দরজার ভিতরে গলা বাড়াইয়া যাহা দেখিতে পাইল তাহাতে ভয়ের আর সীমা রহিল না। অপূর্ব মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া, দুপুরবেলা যাহা কিছু খাইয়াছিল সমস্ত বমি করিয়াছে, তাহার চোখ মুদিত এবং সর্বাঙ্গ ঘামে ভাসিয়া যাইতেছে। কাছে গিয়া ডাকিল, অপূর্ব বাবু!

প্রথম ডাকেই অপূর্ব চোখ মেলিয়া চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার চোখ বুজিয়া তেমনি স্থির হইয়া রহিল। ভারতী মুহূর্তকালমাত্র দ্বিধা করিল, তাহার পরেই সে অপূর্বর কাছে বসিয়া মাথায় হাত দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, উঠে বসতে হবে যে। মাথায় মুখে জল না দিলে ত শরীর শোধরাবে না অপূর্ববাবু!

অপূর্ব উঠিয়া বসিলে সে হাত ধরিয়া তাহাকে কলের কাছে আনিয়া জল খুলিয়া দিলে সে হাত-মুখ ধুইয়া ফেলিল। তখন ধীরে ধীরে তাহাকে তুলিয়া আনিয়া খাটের উপরে শোয়াইয়া দিয়া ভারতী গামছার অভাবে নিজের আঁচল দিয়া তাহার হাত ও পায়ের জল মুছাইয়া দিল এবং একটা হাতপাখা খুঁজিয়া আনিয়া বাতাস করিতে করিতে কহিল, এইবার একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আপনি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমি যাবো না।

অপূর্ব লজ্জিত মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু আপনার যে এখনো খাওয়া হয়নি।

ভারতী বলিল, খেতে আর আপনি দিলেন কৈ? আপনি ঘুমোন।

ঘুমিয়ে পড়লে ত আপনি চলে যাবেন না?

না, আপনার ঘুম না ভাঙ্গা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।

অপূর্ব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, আপনাকে মিস্ ভারতী বলে ডাকলে কি আপনি রাগ করবেন?

নিশ্চয় করব। অথচ শুধু ভারতী বলে ডাকলে করব না।

কিন্তু অন্য সকলের সামনে?

ভারতী একটু হাসিয়া কহিল, হলই বা অন্য সকলের সামনে। কিন্তু চুপ করে একটু ঘুমোন দিকি,—আমার ঢের কাজ আছে।

অপূর্ব বলিল, ঘুমোতে আমার ভয় করে আপনি পাছে ফাঁকি দিয়ে চলে যান।

কিন্তু জেগে থাকলেও যদি যাই, আপনি আটকাবেন কি করে?

অপূর্ব চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। ভারতী কহিল, আমাদের ম্লেচ্ছসমাজে কি সুনাম দুর্নাম বলে জিনিস নেই? আমাকে কি তার ভয় করে চলতে হয় না?

অপূর্বর বুদ্ধি ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিল না, প্রত্যুত্তরে সে একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করিয়া বসিল। কহিল, আমার মা এখানে নেই, আমি রোগে পড়ে গেলে তখন আপনি কি করবেন? তখন ত আপনাকেই থাকতে হবে!

ভারতী কহিল, আমাকেই থাকতে হবে? আপনার বন্ধু তলওয়ারকরবাবুদের খবর দিলে হবে না?

অপূর্ব সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, না, তা কিছুতেই হবে না। হয় আমার মা, না হয় আপনি,—একজনকে দেখতে না পেলে আমি কথখনো বাঁচব না। কাল যদি আমার বসন্ত হয়, এ কথা যেন আপনি কিছুতে ভুলে যাবেন না। তাহার অনুরোধের শেষ দিকটা কি যে একরকম শুনাইল, ভারতী হঠাৎ আপনাকে যেন বিস্মৃত হইয়া গেল। বিছানার একপ্রান্তে বসিয়া পড়িয়া সে অপূর্বর গায়ের উপর একটা হাত রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—না না, ভুলব না ভুলব না! এ কি কখনো আমি ভুলতে পারি? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়াই সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া চক্ষের পলকে উঠিয়া দাঁড়াইল। জোর করিয়া একটু হাসিয়া কহিল, কিন্তু ভাল হয়েও ত বিপদ কম ঘটবে না অপূর্ববাবু! ঘটা করে আবার ত প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কিন্তু ভয় নেই, তার দরকার হবে না। আচ্ছা, চুপ করে একটু ঘুমোন ; বাস্তবিক, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।

কি কাজ?

ভারতী কহিল, কি কাজ! খাওয়া ত দূরে থাক, সারাদিন স্নান পর্যন্ত করবার সময় পাইনি।

কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় স্নান করলে অসুখ করবে না?

ভারতী বলিল, করতেও পারে, অসম্ভব নয়। কিন্তু স্নানের ঘরে যে কাণ্ড করে রেখেছেন তা পরিষ্কার করার পরে না নেয়ে কি কারু উপায় আছে নাকি? তারপরে দুটো খেতেও হবে ত?

অপূর্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, কিন্তু সে-সব আমি সাফ করে ফেলবো,—আপনি যাবেন না। এই বলিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিতে যাইতেছিল। ভারতী রাগ করিয়া কহিল, আর বাহাদুরির দরকার নেই, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। কিন্তু এত বড় ঠুনকো জিনিসটিকে যে মা কোন্ প্রাণে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন আমি তাই শুধু ভাবি! সত্যি বলচি, উঠবেন না যেন। তিনি নেই,—কিন্তু এখানে আমার কথা না শুনলে ভারী অন্যায় হবে বলে দিচ্চি। এই বলিয়া সে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে শাসনের হুকুম জারি করিয়া দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

উদ্বিগ্ন, শ্রান্ত ও একান্ত নির্জীবের ন্যায় অপূর্ব কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল সে জানিতেও

পারে নাই, তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ভারতীর ডাকে। চোখ মুছিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া সম্মুখের ঘড়িতে চাহিয়া দেখিল রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেছে। ভারতী পাশে দাঁড়াইয়া। অপূর্বর প্রথম দৃষ্টি পড়িল তাহার চুলের আয়তন ও দীর্ঘতার প্রতি। সদ্য-স্নানসিক্ত বিপুল কেশভার ভিজিয়া যেমন নিবিড় কালো হইয়াছে, তেমনি ঝুলিয়া প্রায় মাটিতে পড়িয়াছে। স্নিগ্ধ সাবানের গন্ধে ঘরের সমস্ত রুদ্ধ বায়ু হঠাৎ যেন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। পরনে একখানি কালপাড়ের সুতার শাড়ী,—গায়ে জামা না থাকায় বাহুর অনেকখানি দেখা যাইতেছে। ভারতীর এ যেন আর এক নূতন মূর্তি, অপূর্ব পূর্বে কখনো দেখে নাই। তাহার মুখ দিয়া প্রথমেই বাহির হইল, এত ভিজে চুল শুকোবে কি করে?

ভারতী কহিল, শুকোবে না। কিন্তু সে জন্যে ভাবতে হবে না, আপনি আসুন দিকি আমার সঙ্গে।

তেওয়ারী কেমন আছে?

ভাল আছে। অন্ততঃ, আজ রাত্রির মত আপনাকে ভাবতে হবে না। আসুন।

তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্নানের ঘরে আসিয়া দেখিল ছোট একটি টুকরিতে কতকগুলি ফলমূল, একটা বঁটি, একটা থালা, একটা গেলাস—ভারতী দেখাইয়া কহিল, এর বেশী করা ত চলবে না। কলের জলে সমস্ত ধয়ে ফেলুন,—বঁটি, থালা, গেলাস সব। গেলাসে করে জল নিন, নিয়ে ও-ঘরে আসুন, আমি আসন পেতে রেখেছি।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এ-সকল আপনি কখন আনলেন?

ভারতী বলিল, আপনি ঘুমোলে। কাছেই একটা ফলের দোকান আছে, দূরে যেতে হয়নি। আর টুকরিটা ত আপনাদেরই। এই বলিয়া সে অন্যত্র চলিয়া গেল, শুধু সতর্ক করিয়া দিয়া গেল, বঁটি ধুইতে গিয়া যেন হাত না কাটে।

খানিক পরে আসনে বসিয়া অপূর্ব ফল কাটিতেছিল, এবং ভারতী অদূরে বসিয়া হাসিতেছিল। অপূর্ব কহিল, আপনি হাসুন ক্ষতি নেই। পুরুষ মানুষে বঁটিতে কাটতে পারে না সবাই জানে। কিন্তু আপনি আমার খাবার জন্যে যে যত্ন করেছেন সেজন্যে আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। মা ছাড়া এমন আর কেউ করতেন না।

তাহার শেষ কথাটা ভারতী কানেই তুলিল না। আগের কথার উত্তরে কহিল, হাসি কি সাধে অপূর্ববাবু! পুরুষ মানুষে বঁটিতে কাটতে পারে না সবাই জানে সত্যি, কিন্তু, তাই বলে এমনটি কি সবাই জানে? তেওয়ারী ভাল হয়ে গেলে মাকে আমি নিশ্চয় চিঠি লিখে দেব, হয় তিনি আসুন, না হয় ছেলেকে তাঁর ফিরিয়ে নিয়ে যান। এ মানুষকে বাইরে ছেড়ে রাখা চলবে না।

অপূর্ব কহিল, মা তাঁর ছেলেকে ভাল করেই জানেন। কিন্তু, দেখুন, আমি না হয়ে আমার দাদাদের কেউ হলে আপনার এত কথা আজ চলত না। আপনাকে দিয়েই তাঁরা সব কাজ করিয়ে নিতেন।

ভারতী বুঝিতে পারিল না। অপূর্ব বলিল, দাদারা ছোঁন না, খান না এমন জিনিসই নেই। মুরগি এবং হোটেলের ডিনার না হলে ত তাঁদের খাওয়াই হয় না।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া কহিল, বলেন কি?

অপূর্ব কহিল, ঠিক তাই। বাবা ত অর্ধেক ক্রীশ্চান ছিলেন বললেই হয়। মাকে কি এই নিয়ে কম দুঃখ পেতে হয়েছে।

ভারতী উৎসুক হইয়া কহিল, সত্যি নাকি? কিন্তু মা বুঝি ভয়ানক হিন্দু?

অপূর্ব বলিল, ভয়ানক আর কি, হিন্দুঘরের মেয়ের যথার্থ যা হওয়া উচিত, তাই। মায়ের কথা বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর করুণ এবং স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল, বলিল, বাড়িতে দুটি বউ, তবু মাকে আমার নিজে রেঁধে খেতে হয়। কিন্তু এমনি মা যে কখখনো কারু ওপর জোর করেন না, কখখনো কাউকে এর জন্যে অনুযোগ করেন না। বলেন, আমিও ত নিজের আচার-বিচার ত্যাগ করে আমার স্বামীর মতে মত দিতে পারিনি, এখন, ওরাও যদি আমার মতে সায় দিতে

না পারে ত নালিশ করা উচিত নয়। আমার বুদ্ধি এবং আমার সংস্কার মেনেই যে বউব্যাটাদের চলতে হবে তার কি মানে আছে?

ভারতী ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হইয়া কহিল, মা সেকেলে মানুষ কিন্তু ধৈর্য ত খুব বেশি।

অপূর্ব উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, ধৈর্য? মায়ের ধৈর্যের কি সীমা আছে নাকি? আপনি তাঁকে দেখেন নি, কিন্তু দেখলে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবেন বলে দিচ্চি।

ভারতী প্রসন্ন মৌনমুখে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, অপূর্ব ফলের খোসা ছাড়ানো বন্ধ রাখিয়া বলিতে লাগিল, ধরলে, সমস্ত জীবনই মা আমার দুঃখ পেয়ে আসছেন, এবং সমস্ত জীবনই স্বামী-পুত্রদের ম্লেচ্ছাচার বাড়ির মধ্যে নিঃশব্দে সহ্য করে আসছেন। তাঁর একটি মাত্র ভরসা আমি। অসুখে-বিসুখে কেবল আমার হাতেই দুটো হবিষ্য সিদ্ধ তিনি মুখে দেন।

ভারতী কহিল, এখন ত তাঁর কষ্ট হতে পারে।

অপূর্ব বলিল, পারেই ত। হয়ত হচ্চেও। তাইত আমাকে তিনি প্রথমে ছেড়ে দিতে চাননি। কিন্তু, আমিও ত চিরকাল ঘরে বসে থাকতে পারিনে! কেবল তাঁর একটি আশা আমার বউ এলে আর তাঁকে রেঁধে খেতে হবে না।

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, তাঁর সেই আশাটি কেন পূর্ণ করেই এলেন না? সেই ত উচিত ছিল!

অপূর্ব তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিয়া উঠিল—ছিলই ত। মেয়ে নিজে পছন্দ করে মা যখন সমস্ত ঠিক করছিলেন তখনি আমাকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল, সময় হল না। কিন্তু বলে এলাম, মা, যখনি চিঠি লিখবে তখনি ফিরে এসে তোমার আদেশ পালন করব।

ভারতী বলিল, তাই ত উচিত।

অপূর্ব মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়া কহিল, উচিত নয়? বারব্রত করবে, বিচার-আচার জানবে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে হবে,—মাকে কখনো দুঃখ দেবে না,—সেই ত আমি চাই। কাজ কি আমার গান-বাজনা-জানা কলেজে পড়া বিদুষী মেয়ে?

ভারতী বলিল, দরকার কি!

অপূর্ব নিজেই যে একদিন ইহার বিরোধী ছিল এবং বৌদিদির স্বপক্ষে লড়াই করিয়া মাকে রাগ করিয়া বলিয়াছিল—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ঘর হইতে যা হউক একটা মেয়ে ধরিয়া আনিয়া ল্যাঠা চুকাইয়া দিতে, সে-কথা আজ সে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইল। বলিতে লাগিল, দেখুন আপনি আমাদের জাতও নয়, সমাজেরও নয়, জলটুকু পর্যন্ত নেওয়া যায় না, ছোঁয়াছুঁয়ি হলে কাপড়খানা অবধি ছেড়ে ফেলতে হয় এত তফাত, তবু আপনি যা বোঝেন আমার দাদারা কিংবা বৌদিদিরা তা বুঝতে চান না। যার যা ধর্ম তাই ত তার মেনে চলা চাই? একবাড়ি লোকের মধ্যে থেকেও যে মা আমার একলা, এর চেয়ে দুর্ভাগ্য কি আর আছে? তাই ভগবানের কাছে আমি শুধু এই প্রার্থনা করি, আমার কোন আচরণে আমার মা যেন না কোনদিন ব্যথা পান। বলিতে বলিতে তাহার গলা ভারী হইয়া অশ্রুভারে দুই চক্ষু টলটল করিতে লাগিল।

এই সময়ে ঘুমন্ত তেওয়ারী কি একটা শব্দ করিতে ভারতী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চলিয়া গেল। অপূর্ব হাতের উলটা পিঠে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া পুনরায় ফল বানাইতে প্রবৃত্ত হইল। মাকে সে অতিশয় ভালবাসিত, এবং বাড়িতে থাকিতে সেই মাকে খুশী রাখিতে সে মাথার টিকি হইতে একাদশীর দিনে ভাতের বদলে লুচি খাওয়া অবধি সবই পালন করিয়া চলিত। বস্তুতঃ, ব্রাহ্মণ সন্তানের আচারভ্রষ্টতাকে সে নিন্দাই করিত, কিন্তু প্রবাসে আসিয়া আচার-বিচারের প্রতি তাহার এরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ বোধ হয় তাহার জননীও সন্দেহ করিতে পারিতেন না। আসল কথা এই যে, আজ তাহার দেহমন ভয়ে ও ভাবনায় নিরতিশয় বিকল হইয়াছিল, মাকে কাছে পাইবার একটা অন্ধ আকুলতায় ভিতরে ভিতরে তাহার কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছিল, সেখানে সমস্ত ভাবই যে পরিমাণ হারাইয়া বিকৃত আতিশয্যে রূপান্তরিত হইয়া উঠিতেছিল এ খবর

অন্তর্যামীর অগোচর রহিল না, কিন্তু ভারতীর বুকের মধ্যেটা অপমানের বেদনায় একেবারে টনটন করিতে লাগিল।

সে খানিক পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, অপূর্ব কোনমতে ফল-কাটা শেষ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কহিল, বসে আছেন, খাননি?

অপূর্ব বলিল, না, আপনার জন্য বসে আছি।

কিসের জন্য?

আপনি খাবেন না?

না। দরকার হলে আমার আলাদা আছে।

অপূর্ব ফলের থালাটা হাত দিয়া একটুখানি ঠেলিয়া দিয়া বলিল, বাঃ—তা কি কখন হয়? আপনি সারাদিন খাননি, আর—

তাহার কথাটা তখনও শেষ হয় নাই, একটা অত্যন্ত শুষ্ক চাপা কণ্ঠস্বরে জবাব আসিল, আঃ—আপনি ভারী জ্বালাতন করেন। ক্ষিদে থাকে খান, না হয় জানালা দিয়ে ফেলে দিন। এই বলিয়া সে মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল। বস্তুতঃ, মুহূর্তমাত্রই তাহার মুখের চেহারা অপূর্ব দেখিতে পাইয়াছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তকালেই তাহার বুকে মরণকাল পর্যন্ত ছাপ মারিয়া দিল। এ মুখ সে আর ভুলিল না। সেই আসার দিন হইতে অনেকবার দেখা হইয়াছে; বিবাদে, সৌহৃদ্যে, শত্রুতায়, বন্ধুত্বে, সম্পদে ও বিপদে কতবারই ত এই মেয়েটিকে সে দেখিয়াছে, কিন্তু, সে-দেখার সহিত এ-দেখার সাদৃশ্য নাই। এ যেন আর কেহ।

ভারতী চলিয়া গেল, ফলের পাত্র তেমনি পড়িয়া রহিল এবং তেমনি নির্বাক নিস্পন্দ কাঠের মত অপূর্ব বসিয়া রহিল। কিসে যে কি হইল সে যেন তাহার উপলব্ধির অতীত।

ঘণ্টা-খানেক পরে সে এ ঘরে আসিয়া দেখিল তেওয়ারীর শিয়রের কাছে একটা মাদুর পাতিয়া ভারতী বাহুতে মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে ফিরিয়া গিয়া তাহার খাটে শুইয়া পড়িল, এবং শ্রান্ত চক্ষু ঘুমে মুদিত হইতে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। এই ঘুম যখন ভাঙ্গিল তখন ভোর হইয়াছে।

ভারতী কহিল, আমি চললুম।

অপূর্ব ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, কিন্তু ভাল করিয়া চেতনা হইবার পূর্বেই দেখিল সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেছে।

দশ

শেষোক্ত ঘটনার পরে মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। তেওয়ারী আরোগ্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু গায়ে এখনও জোর পায় নাই। যে লোকটি সঙ্গে ভামোয় গিয়াছিল সেই রাঁধিতেছে। তেওয়ারীকে বাঁচাইবার জন্য প্রায় আফিসসুদ্ধ সকলেই অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছে, রামদাস নিজে কতদিন ত বাসায় পর্যন্ত যাইতে পারে নাই। শহরের একজন বড় ডাক্তার চিকিৎসা করিয়াছেন, তাঁহারই সুপারিশে তাহাকে বসন্ত-হাসপাতালে লইয়া যায় নাই। এই ব্রহ্মদেশটা তেওয়ারীর কোনদিনই ভাল লাগে নাই, অপূর্ব তাহাকে ছুটি দিয়াছে, স্থির হইয়াছে আর একটু সারিলেই সে বাড়ি চলিয়া যাইবে। আগামী সপ্তাহে বোধ হয় তাহা অসম্ভব হইবে না, তেওয়ারী নিজে এইরূপ আশা করে। ভারতী সেই যে গিয়াছে, কোনদিন খবর লইতেও আসে নাই। অথচ, এত বড় একটা আশ্চর্য ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে তাহার উল্লেখ পর্যন্ত হইত না। ইহাতে তেওয়ারীর বিশেষ অপরাধ ছিল না ; বরঞ্চ সে যেন ভয়ে ভয়েই থাকিত পাছে কেহ তাহার নাম করিয়া ফেলে। ভারতী শত্রুপক্ষীয়া, এখানে আসা অবধি তাহাদের অশেষ প্রকারে দুঃখ দিয়াছে, মিথ্যা সাক্ষ্যের জোরে অপূর্বকে জেল খাটাইবার চেষ্টা পর্যন্ত করিয়াছে ; মনিবের অবর্তমানে তাহাকেই ঘরে ডাকিয়া আনার কথায় সে লজ্জা ও সঙ্কোচ দুই অনুভব করিত। কিন্তু সে কবে এবং কি ভাবে চলিয়া গেছে তেওয়ারী জানে না। জানিবার জন্য ছটফট করিত,—তাহার উদ্বেগ ও আশঙ্কার অবধি

ছিল না, কিন্তু কি করিয়া যে জানা যায় কিছুতেই খুঁজিয়া পাইত না। কখনো ভাবিত ভারতী চালাক মেয়ে, অপূর্বর আসার সংবাদ পাইয়া সে নিজেই লুকাইয়া পলাইয়াছে ; কখনো ভাবিত অপূর্ব আসিয়া পড়িয়া হয়ত তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছে কিন্তু এই দুয়ের যাহাই কেন না ঘটিয়া থাক, ভারতী আপনি ইচ্ছা করিয়া যে এ বাটীতে আর তাহাকে দেখিতে আসিবে না সে বিষয়ে তেওয়ারী নিশ্চিন্ত ছিল। অপূর্ব নিজে কিছুই বলে না, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে তেওয়ারীর এই ভয়টাই সবচেয়ে বেশী করিত পাছে তাহারই জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা সকল কথা ব্যক্ত হইয়া পড়ে। ঝগড়া-বিবাদের কথা চুলায় যাক, সে যে তাহার হাতে জল খাইয়াছে, তাহার রাঁধা সাগু বার্লি খাইয়াছে,—হয়ত এমন ভয়ানক জাত গিয়াছে যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত নাই। তেওয়ারী স্থির করিয়া রাখিয়াছিল কোনমতে এখান হইতে কলিকাতায় গিয়া সে সোজা বাড়ি চলিয়া যাইবে। সেখানে গঙ্গাস্নান করিয়া, গোপনে গোবর প্রভৃতি খাইয়া, কোন একটা ছল-ছুতায় ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া দেহটাকে কাজচলাগোছের শুদ্ধ করিয়া লইবে। কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া কথাটাকে একবার মায়ের কানে তুলিয়া দিলে যে কিসে কি দাঁড়াইবে তাহার কিছুই বলা যায় না। হালদার বাড়ির চাকরি ত ঘুচিবেই, এমন কি তাহাদের গ্রামের সমাজ পর্যন্ত গিয়া টান ধরাও বিচিত্র নয়।

কিন্তু ইহাই তেওয়ারীর সবটুকু ছিল না। এই স্বার্থ ও ভয়ের দিক ছাড়া তাহার অন্তরের আর একটা দিক ছিল তাহা যেমন মধুর, তেমনি বেদনায় ভরা। অপূর্ব আফিসে চলিয়া গেলে দুপুরবেলায় সে প্রত্যহ একখানি বেতের মোড়া লইয়া বারান্দায় আসিয়া বসিত। দুর্বল দেহটিকে দেয়ালের গায়ে এলাইয়া দিয়া গলির যে অংশটি গিয়া বড় রাস্তায় মিলিয়াছে সেইখানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত। এই পথে ভারতীর কোন দিন প্রয়োজন হইবে না, ওই মোড় অতিক্রম করিবার বেলা, অভ্যাসবশতঃও একবার সে চাহিবে না এমন হইতেই পারে না। অপূর্ব ভামোয় চলিয়া গেলে এই মেয়েটির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। যেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ তাহার মা মরিয়া যায়, তখনও তেওয়ারীর খাওয়া হয় নাই, মেয়েটা কাঁদিয়া আসিয়া তাহার রুদ্ধ দ্বারে করাঘাত করে। দিন-দুই পূর্বে জোসেফ সাহেব মরিয়াছে, তাহার সে ভয় ছিল না, আসিয়া কবাট খুলিতেই ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া সে কি কান্না! কে বলিবে সে ম্লেচ্ছ, কে বলিবে সে ক্রীশ্চানের মেয়ে! তেওয়ারীর রাঁধা-ভাত হাঁড়িতেই রহিল, সারাদিন চিঠি লইয়া তাহাকে কোথায় না সেদিন ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল! পরদিন কফিন লইয়া যাইবার বেলা এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখের জল যেন তাহার আর থামিতেই চাহে না। এই সময় হইতেই ভারতীকে সে কখনো মা, কখনো বা দিদি বলিতে শুরু করিয়াছিল, এবং জোর করিয়া তাহাকে সে চার-পাঁচদিন রাঁধিতে দেয় নাই, নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিল। তারপরে যেদিন ভারতী জিনিসপত্র লইয়া স্থানান্তরে উঠিয়া গেল, সেদিন সন্ধ্যাবেলাটা তাহার যেমন আর কাটিবে না এমনি মনে হইয়াছিল। তাহার বসন্ত রোগে ভারতী কতখানি কি করিয়াছিল তাহা সে ভাল জানিতও না, ভাবিতও না। মনে হইলেই মনে হইত জাত যাইবার কথা। কিন্তু, এই সঙ্গেই আর একটা কথা সে সর্বদাই ভাবিবার চেষ্টা করিত। সকালবেলা স্নান করিয়া মস্ত ভিজা চুলের রাশি পিঠে মেলিয়া দিয়া সে একবার করিয়া তেওয়ারী তত্ত্ব লইতে আসিত। রান্নাঘরেও ঢুকিত না, কোন কিছু স্পর্শও করিত না, চৌকাটের বাহিরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিত, আজ কি-কি রাঁধলে দেখি তেওয়ারী।

দিদি, একটা আসন পেতে দিই।

না, আবার ত কাচতে হবে!

তেওয়ারী কহিত, বাঃ, আসন কি কখনো ছোঁয়া যায় নাকি?

ভারতী বলিত, যায় বৈ কি। তোমার বাবু ত ভাবেন আমি থাকার জন্যে সমস্ত বাড়িটাই ছোঁয়া গেছে। নিজের হলে বোধ হয় আগুন ধরিয়ে একে পুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিতেন। ঠিক না তেওয়ারী?

তেওয়ারী হাসিয়া কহিত, তোমার এক কথা দিদি! তুমি নিজে দেখতে পারো না বলে সবাইকে তাই ভাবো। কিন্তু আমার বাবাকে যদি একবার ভাল করে জানতে ত তুমিও বলতে এমন মানুষ সংসারে নেই।

ভারতী বলিত, নেই তা আমিও ত বলি। নইলে যে চুরি করা আটকালে, তাকেই গেলেন চোর বলে ধরিয়ে দিতে।

এই ব্যাপারে নিজের অপরাধ স্মরণ করিয়া তেওয়ারী মর্মাহত হইয়া পড়িত। কথাটাকে চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি কহিত, কিন্তু তুমিও ত কিছু কম করনি! সমস্ত মিথ্যে জেনেও ত বাবুর কুড়ি টাকা দণ্ড করালে, দিদি।

ভারতী অপ্রতিভ হইয়া বলিত, তেমনি দণ্ড ত নিজেই নিলাম তেওয়ারী, তোমার বাবুকে ত আর দিতে হল না।

দিতে হল না কি রকম? স্বচক্ষে দেখলাম যে দু'খানা নোট দিয়ে তবে তিনি বার হলেন।

আমি যে স্বচক্ষে দেখলাম তেওয়ারী, তুমি ঘরে ঢুকেই দুখানা নোট কুড়িয়ে পেয়ে তা বাবুর হাতে তুলে দিলে।

তেওয়ারীর হাতের খুন্তি হাতেই থাকিত,—ওঃ! তাই বটে।

কিন্তু ভাজাটা যে পুড়ে উঠল তেওয়ারী, ও যে আর মুখে দেওয়া চলবে না।

তেওয়ারী কড়াটা নামাইয়া লইয়া কহিত, বাবুকে কিন্তু এ কথা আমি বলে দেব দিদি।

ভারতী সহাস্যে জবাব দিত, দিলেই বা। তোমার বাবুকে কি আমি ভয় করি নাকি?

কিন্তু এতবড় আশ্চর্য কথাটা ছোটবাবুকে জানাইবার তেওয়ারীর আর সুযোগ মিলিল না। কবে এবং কেমন করিয়া যে মিলিবে ইহাও সে খুঁজিয়া পাইত না। একদিন আলস্য-বশতঃ সে বাসী হলুদ দিয়া তরকারী রাঁধিতে গিয়া ভারতীর কাছে বকুনি খাইয়াছিল। আর একদিন স্নান না করিয়াই রাঁধিয়াছিল বলিয়া ভারতী তাহার হাতে খায় নাই। তেওয়ারী রাগ করিয়া বলিয়াছিল তোমরা যে খ্রীষ্টান দিদি, তোমাদেরও এত বাচ-বিচার? এ যে দেখি আমাদের মা-ঠাকরুনকেও ছাড়িয়া গেলে!

ভারতী শুধু হাসিয়া চলিয়া গিয়াছিল, জবাব দেয় নাই। বস্তুতঃ রান্নার ব্যাপারে একা মা-ঠাকুরানী ছাড়া তাহার শুচিতায় কেহ প্রশ্ন করিতে পারে ইহাতে সে মনে মনে আহত হইয়াছিল, কিন্তু আচার-বিচার লইয়া এই ম্লেচ্ছ মেয়েটার কাছেও সে সতর্ক না হইয়া পারে নাই। তখন এ-সকল তাহার ভাল লাগে নাই, যাহা ভালও লাগিয়াছে তাহারও তেমন করিয়া মর্যাদা উপলব্ধি করে নাই, অথচ, এই সব চিন্তাই যেন এখন তাহাকে বিভোর করিয়া দিত। বর্মায় সে আর ফিরিবে না। যাইবার পূর্বে দেখা হইবার আর আশা নাই, দেখা করিবার হেতু নাই, যত কিছু সে জানে বলিবার লোক নাই,—দিনের পর দিন একই পথের প্রান্তে নিষ্ফল দৃষ্টি পাতিয়া একাকী চুপ করিয়া বসিয়া তাহার বুকের মধ্যেটা যেন আঁচড়াইতে থাকিত।

সেদিন আফিস হইতে ফিরিয়া অপূর্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, ভারতীর বাসাটা ঠিক কোন্ জায়গায় রে তেওয়ারী?

তেওয়ারী সংশয়তিক্তকণ্ঠে জবাব দিল, আমি কি গিয়ে দেখে এসেছি নাকি?

যাবার সময় তোকে বলেনি?

আমাকে বলতে যাবে কিসের জন্যে!

অপূর্ব কহিল, আমাকে বলেছিল বটে, কিন্তু জায়গাটা ঠিক মনে নেই। কাল একবার খুঁজে দেখতে হবে।

তেওয়ারীর মনটা দুলিতে লাগিল, হয়ত কি আবার একটা ফ্যাসাদ জুটিয়াছে, কিন্তু এ সাহস তাহার হইল না যে কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপূর্ব নিজেই ব্যক্ত করিয়া কহিল, সে চুরির জিনিসগুলো এখন পুলিশের লোকে দিতে চায়, কিন্তু ভারতীর একটা সই চাই।

তেওয়ারী আর একদিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল, অপূর্ব বলিতে লাগিল, সেদিন এই কথাই ত জানাতে এসে তোর অবস্থা দেখে আর ফিরতে পারলেন না। তিনি না দেখলে ত তুই কবে মরে ভূত হয়ে যেতিস তেওয়ারী আমার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা হতো না।

তেওয়ারী হাঁ না কিছুই কহিল না, শেষ কথাটা শুনিবার জন্য নিঃশব্দে কাঠের মত বসিয়া রহিল। অপূর্ব বলিল, এসে দেখি অন্ধকার ঘরে তুই আর তিনি। দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, কি যে ঘটবে তার ঠিক নেই, কোথায় খাওয়া কোথায় শোওয়া, দুদিন আগে নিজের বাপ-মা মরে গেছে,—কিন্তু কি শক্ত মেয়েমানুষ, তেওয়ারী, কিছুতে ভ্রূক্ষেপই নেই!

তেওয়ারী আর থাকিতে না পারিয়া বলিল, কবে গেলেন তিনি?

অপূর্ব কহিল, আমার আসার পরদিনই। ভোর না হতেই 'চললুম' বলে যেন একেবারে উবে গেলেন।

রাগ করে চলে গেলেন নাকি?

রাগ করে? অপূর্ব একটু ভাবিয়া কহিল, কি জানি, হতেও পারে। তাঁকে বোঝাই ত যায় না,—নইলে তোর উপর এত যত্ন, একবার খবর নিতেও ত এলেন না তুই ভাল হলি কি না!

এই কথা তেওয়ারীর ভাল লাগিল না। বলিল, তাঁর নিজেরই হয়ত অসুখ-বিসুখ কিছু করেচে।

নিজের অসুখ-বিসুখ! অপূর্ব চমকিয়া গেল। তাহার সম্বন্ধে অনেকদিন অনেক কথা মনে হইয়াছে, কিন্তু কোনদিন এ আশঙ্কা মনে আসে নাই। যাবার সময়ে সে হয়ত রাগ করিয়াই গিয়াছে, এবং এই রাগ করা লইয়াই মন তাহার যত কিছু কারণ খুঁজিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু অন্য সম্ভাবনাও যে থাকিতে পারে এদিক পানে ক্ষুব্ধ চিত্ত তাহার দৃষ্টিপাতই করে নাই। হঠাৎ অসুখের কথায় এ লইয়া যত আলোচনা সেরাত্রে হইয়াছিল সমস্ত একনিমিষে মনে পড়িয়া অপূর্ব বসন্ত ছাড়া আর কিছু ভাবিতেই পারিল না। তাহার নূতন বাসায় দেখিবার কেহ নাই, হয়ত হাসপাতালে লইয়া গেছে, হয়ত এতদিনে বাঁচিয়াও নাই, মনে মনে সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। একটা চেয়ারে বসিয়া আফিসের কলার নেকটাই ওয়েস্টকোট খুলিতে খুলিতে তাহাদের আলাপ শুরু হইয়াছিল, হাতের কাজ তাহার সেইখানেই বন্ধ হইয়া গেল, মুখে তাহার শব্দ রহিল না, সেই চেয়ারে মাটির পুতুলের মত বসিয়া এই একপ্রকারের অপরিচিত, অস্পষ্ট অনুভূতি যেন তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল যে সংসারে আর তাহার কোন কাজ করিবার নাই।

কিছুক্ষণ অবধি কেহই কথা কহিল না। এমনি একভাবে মিনিট কুড়ি-পঁচিশ কাটিয়া গেলেই যখন অপূর্ব নড়িবার চেষ্টা পর্যন্ত করিল না, তখন তেওয়ারী মনে মনে শুধু আশ্চর্য নয় উদ্বিগ্ন হইল। আস্তে আস্তে কহিল, ছোটবাবু, বাড়িওয়ালার লোক এসেছিল ; যদি তেতলার ঘরটাই নেওয়া হয় ত, এই মাসের মধ্যেই বদলানো চাই বলে গেল। আমার ভাবনা হয় পাছে কেউ আবার এসে পড়ে!

অপূর্ব মুখ তুলিয়া বলিল, কে আর আসচে!

তেওয়ারী কহিল, আজ মায়ের একখানা পোস্টকার্ড পেয়েচি। দরোয়ানকে দিয়ে তিনি লিখিয়েছেন।

কি লিখেছেন?

আমি ভাল হয়েচি বলে অনেক আহ্লাদ করেছেন। দরোয়ানের ভাই ছুটি নিয়ে দেশে যাচ্চে তার হাতে বিশ্বেশ্বরের নামে পাঁচ টাকার পূজো পাঠিয়েছেন।

অপূর্ব কহিল, ভালই ত। মা তোকে ছেলের মত ভালবাসেন।

তেওয়ারী শ্রদ্ধায় বিগলিত হইয়া কহিল, ছেলের বেশী। আমি চলে যাবো মার ইচ্ছে ছুটি নিয়ে আমার দুজনেই যাই। চারিদিকে অসুখ-বিসুখ—

অপূর্ব বলিল, অসুখ-বিশুখ কোথায় নেই? কলকাতায় হয় না? তুই বুঝি ভয় দেখিয়ে

নানা কথা লিখেছিলি?

আজ্ঞে না। তেওয়ারী ভাবিয়া রাখিয়াছিল আসল কথাটা সে রাত্রে আহারাদির পরে ধীরে-সুস্থে পাড়িবে। কিন্তু অপেক্ষা করা চলিল না। কহিল, কালীবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে ধরেছেন। বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছে মাঝের চোত্ মাসটা বাদ দিয়ে বোশেখের প্রথমেই শুভ কাজটা হয়ে যায়।

কালীবাবু অতিশয় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তাঁহার পরিবারে আচারপরায়ণতার খ্যাতি প্রসিদ্ধ। তাঁহারই কনিষ্ঠ কন্যাকে মাতাঠাকুরানী পছন্দ করিয়াছেন এ আভাস তাঁহার কয়েকখানা পত্রেই ছিল। তেওয়ারীর কথাটা অপূর্বর ভাল লাগিল না। কহিল, এত তাড়াতাড়ি কিসের? কালীবাবুর গৌরীদানের সবুর না সয়, তিনি ত আর কোথাও চেষ্টা করতে পারেন!

তেওয়ারী একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, তাড়াতাড়ি তাঁর কি মা'র, কি করে জানবো ছোটবাবু? লোকে হয়ত তাঁকে ভয় দেখায় বর্মা দেশটা তেমন ভাল নয়,—এখানে ছেলেরা বিগড়ে যায়।

অপূর্ব খামকা ভয়ানক জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, দ্যাখ তেওয়ারী, তুই আমার ওপর অত পণ্ডিতি করিস নে বলে দিচ্ছি। মাকে তুই রোজ-রোজ অত চিঠি লিখিস কিসের? আমি ছেলেমানুষ নই।

এই অকারণ-ক্রোধে তেওয়ারী প্রথমে বিস্মিত হইল, বিশেষতঃ রোগ হইতে উঠিয়া নানা কারণে তাহারও মেজাজ খুব ভাল ছিল না, সেও রাগিয়া বলিল, আসবার সময়ে মাকে এ কথা বলে আসতে পারেন নি? তাহ'লে ত বেঁচে যেতাম, জাতজন্ম খোয়াতে জাহাজে চড়তে হতো না।

অপূর্ব চোখ রাঙ্গাইয়া চট করিয়া কলার ও নেকটাই তুলিয়া লইয়া গলায় পরিতে লাগিল। তেওয়ারী বহুকাল হইতেই ইহার অর্থ জানিত। কহিল, তাহলে জলটল কিছু খাবেন না?

অপূর্ব তাহার প্রশ্নের জবাবে আলনা হইতে কোট লইয়া তাহাতে হাত গলাইতে গলাইতে দুমদুম করিয়া বাহির হইয়া গেল।

তেওয়ারী গরম হইয়া বলিল, কাল রবিবারে চাটগাঁ দিয়ে একটা জাহাজ যায়—আমি তাতেই বাড়ি যাব বলে রাখলাম। অপূর্ব সিঁড়ি হইতে কহিল, না যাস ত তোর দিব্যি রইল!—বলিয়া নীচে চলিয়া গেল।

মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে প্রভু ও ভৃত্যে কিসের জন্য যে এমন একটা রাগারাগি হইয়া গেল অনভিজ্ঞ কেহ উপস্থিত থাকিলে সে একেবারে আশ্চর্য হইয়া যাইত, সে ভাবিয়াও পাইত না যে, এমনি অর্থহীন আঘাতের পথ দিয়াই মানুষের ব্যথিত বিক্ষুব্ধ চিত্ত চিরদিন আপনাকে সহজের মধ্যে ফিরাইয়া আনিবার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

এগার

অপূর্বর যাইবার জায়গা একমাত্র ছিল তলওয়ারকরের বাটী। এখানে বাঙালীর অভাব নাই, কিন্তু আসিয়া পর্যন্ত এমন ঝড়-ঝাপটার মধ্যেই তাহার দিন কাটিয়াছে যে কাহারও সহিত পরিচয় করিবার আর ফুরসত পায় নাই। বাহির হইয়া আজও সে রেলওয়ে স্টেশনের দিকেই চলিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়িল আজ শনিবারে তাহার সস্ত্রীক থিয়েটারে যাইবার কথা। অতএব, পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ানো ব্যতীত অন্য কিছু করিবার যখন রহিল না এবং কোথায় যাইবে যখন ভাবিতেছে, তখন অকস্মাৎ ভারতীকে মনে পড়িয়া তাহার প্রতি গভীর অকৃতজ্ঞতা আজ তাহাকে তীক্ষ্ণ করিয়া বিঁধিল। তাহার আহত অপরাধী মন তাহারি কাছে যেন জবাবদিহি করিয়া বারবার বলিতে লাগিল, সে ভালই আছে তাহার কিছুই হয় নাই; নহিলে, এতবড় জীবন-মরণ সমস্যায় একটা খবর পর্যন্ত দিত না তাহা হইতেই পারে না, তবুও সে ওই জবাবদিহির বেশী আর অগ্রসর হইল না। তেলের কারখানার কাছাকাছি কোথাও তাহার নূতন বাসা ইহা সে ভুলে নাই, ইহাই খুঁজিয়া বাহির করিবার কল্পনায় মন তাহার নাচিয়া উঠিল, কিন্তু এমন করিয়া যে লোক আত্মগোপন করিয়া আছে এতকাল

পরে তাহার তত্ত্ব লইতে যাওয়ার লজ্জাও সে সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। হয়ত সে ইহা চাহে না, হয়ত সে তাহাকে দেখিয়া বিরক্ত হইবে, তাই চলিতে চলিতে আপনাকে আপনি সে একশত-বার করিয়া বলিতে লাগিল, পুলিশের লোকে তাহার সই চাহে, এতএব কাজের জন্যই সে আসিয়াছে ; সে কেমন আছে, কোথায় আছে এ-সকল অকারণ কৌতূহল তাহার নাই। এতদিন পরে এ অভিযোগ ভারতী কোন মতেই তাহার প্রতি আরোপ করিতে পারিবে না।

এ অঞ্চলে অপূর্ব আর কখনো আসে নাই। পূর্বমুখে প্রশস্ত রাস্তা সোজা গিয়াছে, অনেক দূর হাঁটিয়া ডান দিকে নদীর ধারে যে পথ, সেইখানে আসিয়া একজনকে সে জিজ্ঞাসা করিল, এদিকে সাহেব-মেমেরা কোথায় থাকে জানো? লোকটি প্রত্যুত্তরে আশেপাশের যে-সকল ছোট-বড় বাঙলো দেখাইয়া দিল তাহাদের আকৃতি, অবয়ব ও সাজসজ্জা দেখিয়াই অপূর্ব বুঝিল তাহার প্রশ্ন করা ভুল হইয়াছে। সংশোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অনেক বাঙালীরাও ত থাকে এখানে, কেউ কারিগর, কেউ মিস্ত্রী, তাদের মেয়েছেলেরা—

লোকটি কহিল, ঢের, ঢের। আমিই ত একজন মিস্ত্রী। আমার তাঁবেই ত পঞ্চাশ জন কারিগর—যা করব তাই! ছোট সাহেবকে বলে জবাব পর্যন্ত দিতে পারি। কাকে খোঁজেন?

অপূর্ব চিন্তা করিয়া কহিল, দেখো আমি যাকে খুঁজি,—আচ্ছা, যারা বাঙালী ক্রীশ্চান কিংবা—

লোকটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, বলছেন বাঙালী,—আবার খ্রীষ্টান কিরকম? খ্রীষ্টান হলে আবার বাঙালী থাকে নাকি? খ্রীষ্টান—খ্রীষ্টান। মোচলমান—মোচলমান! বস্, এই ত জানি মশায়!

অপূর্ব বলিল, আহা! বাঙলা দেশের লোক ত! বাংলা ভাষা বলে ত!

সে গরম হইয়া কহিল, ভাষা বললেই হল? যে জাত দিয়ে খ্রীষ্টান হয়ে গেল তাতে আর পদার্থ রইল কি মশায়? কোন বাঙালী তার সঙ্গে তার সঙ্গে আহার-ব্যবহার করুক একবার দেখি ত! ওই যে কোত্থেকে সব মেয়ে-মাস্টার এসেচে ছেলেপুলেদের পড়ায়—বস্! তা বলে কেউ কি তাদের সঙ্গে খাচ্চে, ন বসচে?

অপূর্ব কূল দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তিনি কোথায় থাকেন জানো?

সে কহিল, তা আর জানিনে! এই রাস্তায় সোজা গাঙের ধারে গিয়ে জিজ্ঞেসা করবেন নতুন ইস্কুল-ঘর কোথায়,—কচি ছেলেটা পর্যন্ত দেখিয়ে দেবে। ডাক্তারবাবু থাকেন কিনা! মানুষ নয়,—দেব্‌তা! মরা বাঁচাতে পারেন!—এই বলিয়া সে নিজের কাজে চলিয়া গেল। সেই পথে সোজা আসিয়া অপূর্ব লাল রঙের একখানি কাঠের বাড়ি দেখিতে পাইল। বাড়িটি দ্বিতল, একেবারে নদীর উপরে। তখন রাত্রি হইয়াছে, পথে লোক নাই—উপরের খোলা জানালা হইতে আলো আসিতেছে,—কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবার জন্য সে সেইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু মনের মধ্যে তাহার সন্দেহ রহিল না যে এইখানেই ভারতী থাকে, এবং ওই জানালাতেই তাহার দেখা মিলিবে।

মিনিট-পনেরো পরে জন দুই-তিন লোক বাহির হইয়া তাহাকে দেখিয়া সহসা যেন চকিত হইয়া উঠিল। একজন প্রশ্ন করিল, কে? কাকে চান?

তাহার সন্দিগ্ধ কণ্ঠস্বরে অপূর্ব সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, মিস জোসেফ বলে কোন স্ত্রীলোক থাকেন এখানে?

সে তৎক্ষণাৎ বলিল, থাকেন বৈ কি—আসুন।

অপূর্বর ঠিক যাইবার সঙ্কল্প ছিল না, কিন্তু দ্বিধা করিতেই লোকটি কহিল, আপনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন? কিন্তু তিনি ত ঘরেই আছেন,—আসুন। আমরা আপনাকে নিয়ে যাচ্চি, এই বলিয়া সে অগ্রসর হইল।।

তাহার ত্বরা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা গেল ইহারা তাহাকে যাচাই করিয়া লইতে চায়। অতএব দ্বার হইতে এখন না বলিয়া ফিরিতে চাহিলে সন্দেহ ইহাদের এমনিই বিশ্রী হইয়া

উঠিবে যে সে তাহা ভাবিতেই পারিল না। তাই চলুন বলিয়া সে লোকটির অনুসরণ করিয়া একমুহূর্ত পরেই এই কাঠের বাড়ির নীচেকার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারই এক পাশ দিয়া উপরে উঠিবার সিঁড়ি। ঘরটি হলের মত প্রশস্ত। ছাদ হইতে ঝুলানো একটা মস্ত আলো, গোটা-কয়েক টেবিল চেয়ার, একটা কালো বোর্ড এবং সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া নানা আকারের ও নানা রঙের ম্যাপ টাঙানো। ইহাই যে নূতন ইস্কুল-ঘর অপূর্ব তাহা দেখিয়াই চিনিল। তথায় চার-পাঁচজন স্ত্রীলোক ও পুরুষে মিলিয়া বোধ হয় একটা তর্কই করিতেছিল, সহসা একজন অপরিচিত লোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া চুপ করিল। অপূর্ব একবার মাত্র তাহাদের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া যে তাহাকে আনিয়াছিল তাহারই পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া গেল। ভারতী ঘরেই ছিল অপূর্বকে দেখিয়া তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কাছে আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসাইয়া কহিল, এতদিন আমার খোঁজ নেননি যে বড়?

অপূর্ব বলিল, আপনিও ত আমাদের খোঁজ নেননি! কিন্তু কথাটা যে জবাব হিসাবে ঠিক হইল না তাহা সে বলিয়াই বুঝিল। ভারতী শুধু একটু হাসিল, কহিল, তেওয়ারী বাড়ি যেতে চাচ্চে, যাক। না গেলে সে সারবে না।

অপূর্ব কহিল, অর্থাৎ আপনি যে আমাদের খবর নেন না এ অভিযোগ সত্য নয়।

ভারতী পুনশ্চ একটু হাসিয়া কহিল, কাল রবিবার, কাল কিছু আর হবে না, কিন্তু পরশু বারোটার মধ্যেই কোর্টে গিয়ে টাকা আর জিনিসগুলো আপনার ফিরিয়ে আনবেন। একটু দেখে শুনে নেবেন যেন ঠকায় না।

আপনার কিন্তু একটা সই চাই।

তা জানি।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, আপনার সঙ্গে তেওয়ারীর বোধ হয় দেখা হয়, না?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। কিন্তু আপনি যেন গিয়ে তার ওপর মিছে রাগ করবেন না।

অপূর্ব কহিল, মিছে না হোক সত্যি রাগ করা উচিত। আপনি তার প্রাণ দিয়েছেন এটুকু কৃতজ্ঞতা তার থাকা উচিত ছিল।

ভারতী বলিল, নিশ্চয়ই আছে। নইলে, সে ত আমাকে জেলে পাঠাবার একবার অন্ততঃ চেষ্টা করেও দেখতো।

অপূর্ব এ ইঙ্গিত বুঝিল। আনতমুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, আপনি আমার উপর ভয়ানক রাগ করে আছেন।

ভারতী বলিল, কখখনো না। সারাদিন ইস্কুলে ছেলেমেয়ে পড়িয়ে, ঘরে ফিরে আবার সমিতির সেক্রেটারির কাজে অসংখ্য চিঠিপত্র লিখে, বিছানায় শুতে-না-শুতেই ত ঘুমিয়ে পড়ি,—রাগ করবার সময় কোথায় আমার?

অপূর্ব কহিল, ওঃ—রাগ করবারও সময়টুকু নেই!

ভারতী বলিল, কৈ আর আছে? আপনি বরঞ্চ কোন দিন সকাল থেকে এসে দেখবেন সত্যি না মিছে!

অপূর্বর মুখ দিয়া অলক্ষিতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। কহিল, দেখবার আমার দরকার কি! একটুখানি থামিয়া কহিল, ইস্কুলে আপনাকে কত মাইনে দেয়?

ভারতী হাসি চাপিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, বেশ ত আপনি! মাইনের কথা বুঝি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে আছে? এতে তার অপমান হয় না?

অপূর্ব ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিল, অপমান করবার জন্যে ত আর বলিনি। চাকরিই যখন করছেন—

ভারতী কহিল, না করে কি শুকিয়ে মরতে বলেন?

অপূর্ব বলিল, এ যা চাকরি, এই ত শুকিয়ে মরা! তার চেয়ে বরঞ্চ আমাদের আফিসে একটা চাকরি আছে, মাইনে একশ' টাকা,—হয়ত দু-এক ঘণ্টার বেশী খাটতেও হবে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমাকে সেই চাকরি করতে বলেন?

অপূর্ব কহিল, দোষই বা কি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, আমি করব না। আপনি ত তার কর্তা, কাজে ভুলচুক হলেই লাঠি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াবেন।

অপূর্ব জবাব দিল না। সে মনে মনে বুঝিল ভারতী শুধু পরিহাস করিয়াছে, তথাপি তাহার সেই একটা দিনের আচরণের ইঙ্গিত করায় তাহার গা জ্বলিয়া গেল। কিছুক্ষণ হইতেই একটা তর্ক-বিতর্কের কলরোল নীচে হইতে শুনা যাইতেছিল, সহসা তাহা উদ্দাম হইয়া উঠিল। অপূর্ব ভাল মানুষটির মত জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের ইস্কুল বসলো বোধ হয়—ছেলেরা সব পড়ায় মন দিয়েছে।

ভারতী গম্ভীরমুখে কহিল, তাহলে হাঁকাহাঁকিটা কিছু কম হতো। তাদের শিক্ষকেরা বোধ করি বিষয় নির্বাচনে মন দিয়েছেন।

আপনি যাবেন না?

যাওয়া ত উচিত, কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যেতে যে মন সরে না। এই বলিয়া সে মুখ টিপিয়া হাসিল। কিন্তু অপূর্বর কান পর্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে আর একদিকে চোখ ফিরাইয়া পাশের দেয়ালের গায়ে সাজানো কাঁচা ঝাউপাতা দিয়া লেখা কয়েকটা অক্ষরের প্রতি সহসা দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিল, ওটা কি লেখা ওখানে?

ভারতী কহিল, পড়ুন না।

অপূর্ব ক্ষণকাল মনঃসংযোগ করিয়া বলিল, পথের-দাবী। তার মানে?

ভারতী কহিল, ওই আমাদের সমিতির নাম, ওই আমাদের মন্ত্র, ওই আমাদের সাধনা! আপনি আমাদের সভ্য হবেন?

অপূর্ব বলিল, আপনি নিজে একজন সভ্য নিশ্চয়ই, কিন্তু কি আমাদের করতে হবে?

ভারতী বলিল, আমরা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সর্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙ্গেচুরে চলবো। আমাদের পরে যারা আসবে তারা যেন নিরুপদ্রবে হাঁটতে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে?

অপূর্ব কহিল, আমারা পরাধীন জাতি, ইংরেজ নই, ফরাসী নই, আমেরিকান নই,—কোথায় পাবো আমরা অপ্রতিহত গতি? স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসবার আমাদের অধিকার নেই, অপমানিত হয়ে নালিশ করবার পথ নেই,—বলিতে বলিতে সেদিনের সমস্ত লাঞ্ছনা,—ফিরিঙ্গী ছোঁড়াদের বুটের আঘাত হইতে স্টেশন মাষ্টারের বাহির করিয়া দেওয়া অবধি সকল অপমান স্পষ্ট অনুভব করিয়া তাহার দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আমরা বসলে বেঞ্চ অপবিত্র হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়া কলুষিত হয়,—আমরা যেন মানুষ নই! আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রক্ত-মাংস গায়ে নেই! এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আছি আমি আপনাদের দলে।

ভারতী কহিল, আপনি কি মানুষের জ্বালা টের পান অপূর্ববাবু? সত্যিই কি মানুষের ছোঁয়ায় মানুষের আপত্তি করবার কিছু নেই, তার গায়ের বাতাসে আর একজনের ঘরের বাতাস অপবিত্র হয়ে ওঠে না?

অপূর্ব তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় নয়। মানুষের চামড়ার রঙ ত তার মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয়! কোন একটা বিশেষ দেশে জন্মানই ত তার অপরাধ হতে পারে না! মাপ করবেন আপনি, কিন্তু জোসেফ সাহেব ক্রীশ্চান বলেই ত শুধু আদালতে আমার কুড়ি টাকা দণ্ড হয়েছিল। ধর্মমতে ভিন্ন হলেই কি মানুষে হীন প্রতিপন্ন হবে? এ কোথাকার বিচার! এই বলচি আপনাকে আমি, এর জন্যেই এরা একদিন মরবে। এই যে মানুষকে অকারণে ছোট করে দেখা, এই যে ঘৃণা, এই যে বিদ্বেষ, এ অপরাধ ভগবান কখখনো ক্ষমা করবেন না।

বেদনা ও লাঞ্ছনার মত মানুষের সত্যবস্তুটিকে টানিয়া বাহিরে আনিতে ত দ্বিতীয় পদার্থ নাই, তাই সে সমস্ত ভুলিয়া অপমানকারীর বিরুদ্ধে অপমানিতের, পীড়কের বিরুদ্ধে পীড়িতের মর্মান্তিক অভিযোগে সহস্রমুখ হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী তাহার দৃপ্ত মুখের প্রতি চাহিয়া এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া ছিল, কিন্তু কথা তাহার শেষ হইতেই সে শুধু একটু মুচকিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইল। অপূর্ব চমকিয়া উঠিল, তাহার মুখের উপর কে যেন সজোরে মারিল। ভারতীর কোন প্রশ্নই এতক্ষণ সে খেয়াল করে নাই, কিন্তু সেগুলি অগ্নিরেখার মত তাহার মাথার মধ্যে দিয়া সশব্দে খেলিয়া গিয়া তাহাকে একেবারে বাক্যহীন করিয়া দিল।

মিনিট-খানেক পরে ভারতী পুনরায় যখন মুখ ফিরাইয়া চাহিল, তখন তাহার ওষ্ঠাধরে হাসির চিহ্নমাত্র ছিল না, কহিল, আজ শনিবারে আমাদের ইস্কুল বন্ধ, কিন্তু সমিতির কাজ হয়। চলুন না, নীচে গিয়ে আপনাকে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়ে পথের দাবীর সভ্য করে নিই।

তিনি বুঝি সভাপতি?

সভাপতি? না, তিনি আমাদের মূল-শিকড়। মাটির তলায় থাকেন, তাঁর কাজ চোখে দেখা যায় না।

শিকড়ের প্রতি অপূর্বর কিছুমাত্র কৌতূহল জন্মিল না। জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের সভ্যরা বোধ হয় সকলে ক্রীশ্চান?

ভারতী কহিল, না, আমি ছাড়া সকলেই হিন্দু।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, কিন্তু মেয়েদের গলা পাচ্ছি যে?

ভারতী কহিল, তাঁরাও হিন্দু।

অপূর্ব মুহূর্তকাল দ্বিধা করিয়া বলিল, কিন্তু তাঁরা বোধ হয় জাতিভেদ,—অর্থৎ কিনা, খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার বোধ করি করেন না?

ভারতী বলিল, না। তারপরে হাসিমুখে কহিল, কিন্তু কেউ যদি মেনে চলেন, তাঁর মুখেও আমরা কেউ খাবার জিনিস জোর করে গুঁজে দিইনে। মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তিকে আমরা অত্যন্ত সম্মান করে চলি। আপনার ভয় নেই।

অপূর্ব বলিল, ভয় আবার কিসের? কিন্তু,—আচ্ছা, আপনার মত শিক্ষিতা মহিলাও বোধ করি আপনাদের দলে আছেন?

আমার মত? এই বলিয়া সে হাসিয়া কহিল, আমাদের প্রেসিডেন্ট যিনি তাঁর নাম সুমিত্রা, তিনি একলা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন,—শুধু ডাক্তার ছাড়া তাঁর মত বিদুষী বোধ হয় এ-দেশে কেউ নেই।

অপূর্ব বিস্ময়াপন্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, আর ডাক্তর যাঁকে বলছেন, তিনি?

ডাক্তার? শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে ভারতীর দুই চক্ষু যেন সজল হইয়া উঠিল, কহিল, তাঁর কথা থাক অপূর্ববাবু। পরিচয় দিতে গেলেই হয়ত তাঁকে ছোট করে ফেলবো।

অপূর্ব আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দেশের প্রতি ভালবাসার নেশা তাহার রক্তের মধ্যে—এই দিক দিয়া পথের-দাবীর বিচিত্র নামটা তাহাকে টানিতে লাগিল। এই সঙ্গীহীন, বন্ধুহীন, বিদেশে এতগুলি অসাধারণ শিক্ষিত নর-নারীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা ও উদ্যম, তাহাদের ইতিহাস, তাহাদের রহস্যময় কর্মজীবনের অপরিজ্ঞাত পদ্ধতি ওই যে অদ্ভুত নামটাকে জড়াইয়া উঠিতে চহিতেছে তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ মিলনের লোভ সংবরণ করা কঠিন, কিন্তু তবুও কেমন যেন একপ্রকার বিজাতীয়, ধর্মবিহীন, অস্বাস্থ্যকর বাষ্প নীচে হইতে উঠিয়া তাহার মনটাকে ধীরে ধীরে গ্লানিতে ভরিয়া আনিতে লাগিল।

কলরব বাড়িয়া উঠিতেই ছিল, ভারতী কহিল, চলুন যাই।

অপূর্ব সায় দিয়া বলিল, চলুন—উভয়ে নীচে আসিলে ভারতী তাহাকে একটা বেতের সোফায় বসিতে দিয়া স্থানাভাবে তাহার পার্শ্বেই উপবেশন করিল।

এই আসনটা এমন সঙ্কীর্ণ যে এত লোকের সম্মুখে ভদ্রতা রক্ষা করিয়া দুজনের বসা চলে না। এরূপ অদ্ভুত আচরণ ভারতী কোনদিন করে নাই, অপূর্ব শুধু সঙ্কোচ নয়, অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতে লাগিল, কিন্তু এখানে এই-সকল ব্যাপারে ভ্রূক্ষেপ করিবারও যেন কাহারও অবসর নাই। সে আর একটা বস্তু লক্ষ্য করিল যে, তাহার মত অপরিচিত ব্যক্তিকে আসন গ্রহণ করিতে দেখিয়া প্রায় সকলেই চাহিয়া দেখিল, কিন্তু, যে বিতণ্ডা উদ্দামবেগে বহিতেছিল তাহাতে লেশমাত্র বাধা পড়িল না। কেবল, একটিমাত্র লোক যে পিছন ফিরিয়া কোণের টেবিলে বসিয়া লিখিতেছিল সে লিখিতেই রহিল, তাহার আগমন বোধ হয় জানিতেই পারিল না। অপূর্ব গণিয়া দেখিল ছয়জন রমণী এবং আটজন পুরুষে মিলিয়া এই ভীষণ আলোচনা চলিতেছে! ইহাদের সকলেই আচেনা, কেবল একটি ব্যক্তিকে অপূর্ব চক্ষের পলকে চিনিতে পারিল। বেশভূষার কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু এই মূর্তিকেই সে কিছুকাল পূর্বে মিক্‌থিলা রেলওয়ে স্টেশনে টিকিট না কেনার দায় হইতে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, এবং টাকাটা যতশীঘ্র সম্ভব ফিরাইয়া দিতে যিনি স্বেচ্ছায় প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। লোকটি চাহিয়া দেখিল, কিন্তু মদের নেশায় যাহার কাছে হাত পাতিয়া উপকার গ্রহণ করিয়াছিলেন, মদ না-খাওয়া অবস্থায় তাহাকে স্মরণ করিতে পারিলেন না। কিন্তু ইঁহার জন্য নয়, ভারতীকে মনে করিয়া তাহার বুকে এই ব্যথাটা অতিশয় বাজিল যে এরূপ সংসর্গে সে আসিয়া পড়িল কিরূপে?

সুমুখে কে একজন দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িতেই অপূর্বর কানের কাছে মুখ আনিয়া ভারতী চুপি চুপি কহিল, উনিই আমাদের প্রেসিডেন্ট, সুমিত্রা।

বলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপূর্ব দেখিয়াই চিনিল। কারণ, নারীকে দিয়াই যদি কোন সমিতি পরিচালনা করিতে হয়, এই ত সেই বটে! বয়স বোধ করি ত্রিশের কাছে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজরানী! বর্ণ কাঁচা সোনার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরনে এলো করিয়া মাথার চুল বাঁধা, হাতে গাছকয়েক করিয়া সোনার চুড়ি, ঘাড়ের কাছে সোনার হারের কিয়দংশ চিকচিক করিতেছে, কানে সবুজ পাথরের তৈরী দুলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত জ্বলিতেছে,—এই ত চাই!—ললাট, চিবুক, নাক, চোখ, ভ্রূ, ওষ্ঠাধর,—কোথাও যেন আর খুঁত নাই,—একি ভয়ানক আশ্চর্য রূপ! কালো বোর্ডের গায়ে একটা হাত রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, অপূর্বর চোখে আর পলক পড়িল না। সে আঁক কষিয়াই মানুষ হইয়াছে, কাব্যের সহিত পরিচয় তাহার অত্যন্ত বিরল, কিন্তু, কাব্য যাঁহারা লেখেন, কেন যে তাঁহারা এত-কিছু থাকিতে তরুণ লতিকার সঙ্গেই নারীদেহের তুলনা করেন তাহার জানিবার কিছু আর রহিল না। সম্মুখে একটি বিশ-বাইশ বছরের সাধারণ-গোছের মহিলা আনতমুখে বসিয়াছিলেন, ভাবে বোধ হয়, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই তর্কের ঝড় উঠিয়াছে; আবার তাঁহারই অনতিদূরে বসিয়া প্রৌঢ়-গোছের একজন ভদ্রলোক। তাঁহার পরনের কাটছাঁট পরিশুদ্ধ বিলাতি পোশাক দেখিয়া অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। খুব সম্ভব তিনিই প্রতিপক্ষ ; কি বলিতেছিলেন অপূর্ব ভাল শুনিতেও পায় নাই, মনোযোগও করে নাই, তাহার সমস্ত চিত্ত সুমিত্রার প্রতিই একেবারে একাগ্র হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে কি জানি কোন্ পরম বিস্ময় ঝরিয়া পড়িবে এই ছিল তাহার আশা। অনতিকাল পূর্বের ক্ষোভের হেতু তাহার মনেও ছিল না। সাহেবি পোশাক-পরা ভদ্রলোকটির প্রত্যুত্তরে এইবার তিনি কথা কহিলেন। এই ত! নারীর কণ্ঠস্বর ত একেই বলে! ইহার কণাটুকুও না বাদ যায়, অপূর্ব এমনি করিয়াই কান পাতিয়া রহিল। সুমিত্রা কহিলেন, মনোহরবাবু, আপনি ছেলেমানুষ উকিল নন, আপনার তর্ক অসংলগ্ন হয়ে পড়লে ত মীমাংসা করতে পারব না।

মনোহরবাবু উত্তর দিলেন, অসংলগ্ন তর্ক করা আমার পেশাও নয়।

সুমিত্রা হাসিমুখে কহিলেন, তাই ত আশা করি; বেশ, বক্তব্য আপনার ছোট করে আনলে এইরূপ দাঁড়ায়। আপনি নবতারার স্বামীর বন্ধু। তিনি জোর করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে চান না দেশের কাজ করতে চান, এতে অন্যায়

কিছু ত দেখিনে।

মনোহর বলিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য আছে ত? দেশের কাজ করব বললেই ত তার উত্তর হয় না।

সুমিত্রা কহিলেন, দেখুন মনোহরবাবু, নবতারা কোন্ কাজ করবেন, না করবেন, সে বিচার তাঁর উপর, কিন্তু তাঁর স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি যে কর্তব্য ছিল, তিনি তা কোনদিন করেন নি, এ কথা আপনারা সবাই জানেন! কর্তব্য ত কেবল একদিকে নয়!

মনোহর রাগিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকেও যে অসতী হয়ে যেতে হবে, সেও ত কোন যুক্তি হতে পারে না! এই বয়সে এই দলের মধ্যে থেকেও উনি সতীত্ব বজায় রেখে যে দেশের সেবা করতে পারবেন,—এ ত কোনমতেই জোর করে বলা চলে না!

সুমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়াই তখনি সহজ হইয়া গেল, বলিলেন, জোর করে কিছু বলাও উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখচি নবতারার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, সাহস আছে, এবং সবচেয়ে বড় যা, সেই ধর্মজ্ঞান আছে। দেশের সেবা করতে এইটুকুই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করি। তবে, আপনি যাকে সতীত্ব বলছেন, সে বজায় রাখবার ওঁর সুবিধে হবে কিনা সে উনিই জানেন।

মনোহর নবতারার আনত মুখের প্রতি একবার কটাক্ষে চাহিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, খাসা ধর্মজ্ঞান ত! দেশের কাজে এই শিক্ষাই বোধ হয় উনি দেশের মেয়েদের দিয়ে বেড়াবেন?

সুমিত্রা বলিলেন, ওঁর দায়িত্ববোধের প্রতি আমাদের বিশ্বাস আছে। ব্যক্তি-বিশেষের চরিত্র আলোচনা করা আমাদের নিয়ম নয়, কিন্তু যে স্বামীকে উনি ভালবাসতে পারেন নি, আর একটা বড় কাজের জন্য যাঁকে ত্যাগ করে আসা উনি অন্যায় মনে করেন নি, সেই শিক্ষাই যদি দেশের মেয়েদের উনি দিতে চান ত আমরা আপত্তি করব না।

মনোহর কহিলেন, আমাদের এই সীতা-সাবিত্রীর দেশে এমনি শিক্ষা উনি গৃহস্থ মেয়েদের দেবেন?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিলেন, দেওয়া ত উচিত। মেয়েদের কাছে শুধু অর্থহীন বুলি উচ্চারণ না করে নবতারা যদি বলেন যে, এই দেশে একদিন সীতা আত্মসম্মান রাখতে স্বামী ত্যাগ করে পাতালে গিয়েছিলেন, এবং রাজকন্যা সাবিত্রী দরিদ্র সত্যবানকে বিবাহের পূর্বে এত ভালবেসেছিলেন যে অত্যন্ত স্বল্পায়ু জেনেও তাঁকে বিবাহ করতে তাঁর বাধেনি,—এবং আমি নিজেও যে দুর্বৃত্ত স্বামীকে ভালবাসতে পারিনি তাকে পরিত্যাগ করে এসেছি অতএব, আমার মত অবস্থায় তোমরাও তাই করো,—এ শিক্ষায় ত দেশের মেয়েদের ভালই হবে মনোহরবাবু।

মনোহরের ওষ্ঠাধর ক্রোধে কাঁপিতে লগিল প্রথমটা ত তাঁহার মুখ দিয়া কথাই বাহির হইল না, তারপরে বলিয়া উঠিলেন, তাহলে দেশ উচ্ছন্ন যাবে। হঠাৎ হাতজোড় করিয়া কহিলেন, দোহাই আপনাদের, নিজেরা যা ইচ্ছে করুন, কিন্তু অপরকে এ শিক্ষা দেবেন না। ইউরোপের সভ্যতা আমদানি করে যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের মধ্যে তার প্রচার করে সমস্ত ভারতবর্ষটাকে আর রসাতলে পাঠাবেন না।

সুমিত্রার মুখের উপর বিরক্তি ও ক্লান্তি যেন একই সঙ্গে ফুটিয়া উঠিল, কহিলেন, রসাতল থেকে বাঁচাবার যদি কোন পথ থাকে ত এই। কিন্তু, ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কোন জ্ঞান নেই, সুতরাং এ নিয়ে তর্ক করলে শুধু সময় নষ্ট হবে। অনেক সময় গেছে,—আমাদের অন্য কাজ আছে।

মনোহরবাবু যথাসাধ্য ক্রোধ দমন করিয়া কহিলেন, সময় আমারও অপর্যাপ্ত নয়। নবতারা তাহলে যাবেন না?

নবতারা এতক্ষণ মুখ তুলিয়াও চহে নাই, সে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

মনোহর সুমিত্রাকে প্রশ্ন করিলেন, এঁর দায়িত্ব তাহলে আপনারাই নিলেন?

নবতারাই ইহার জবাব দিল, কহিল, আমার দায়িত্ব আমিই নিতে পারবো, আপনি চিন্তিত হবেন না।

মনোহর বক্রদৃষ্টিতে তাহার প্রতি চাহিয়া সুমিত্রাকেই পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, কহিলেন আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, স্বামিগৃহে বিবাহিত-জীবনের চেয়ে গৌরবের বস্তু নারীর আর কিছু আছে আপনি বলতে পারেন?

সুমিত্রা কহিলেন, অপরের যাই হোক, অন্ততঃ, নবতারার স্বামিগৃহে তার বিবাহিত জীবনকে আমি গৌরবের জীবন বলতে পারিনে।

এই উত্তরের পরে মনোহর আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। অত্যন্ত কটুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এইবার ঘরের বাইরে তার অসতী জীবনটাকে বোধ করি গৌরবের জীবন বলতে পারবেন?

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এত বড় কদর্য বিদ্রূপেও কাহারও মুখে কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না। সুমিত্রা শান্তস্বরে বলিলেন, মনোহরবাবু, আমাদের সমিতির মধ্যে সংযতভাবে কথা বলা নিয়ম।

আর এ নিয়ম যদি না মানতে পারি?

আপনাকে বার করে দেওয়া হবে।

মনোহরবাবু যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। জ্যা-মুক্ত শরের ন্যায় সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা চললুম! গুডবাই! এই বলিয়া দ্বারের কাছে আসিয়া তাঁহার উন্মত্ত ক্রোধ যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িল। হাত-পা ছুঁড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি সমস্ত খবর তোমাদের জানি। ইংরেজ রাজত্ব তোমরা ঘুচাবে? মনেও করো না! আমি চাষা নই, আমি অ্যাডভোকেট। কোথায় বিচার পেতে হয়, কোথায় তোমাদের হাতে শিকল পরাতে হয় ভালরকম জানি! আচ্ছা,—এই বলিয়া তিনি অন্ধকারে দ্রুতবেগে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

হঠাৎ কি যেন একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। উত্তেজনা কেহই প্রকাশ করিল না, কিন্তু সকলের মুখেই যেন কি-একপ্রকার ছায়া পড়িল। কেবল যে লোকটা কোণে বসিয়া লিখিতেছিল, সে একবার চোখ তুলিয়াও চাহিল না। অপূর্বর মনে হইল, হয় সে সম্পূর্ণ বধির, না হয়, একেবারে পাষাণের ন্যায় নিরাকুল, নির্বিকার। ভারতীর মুখের চেহারাটা সে দেখিতে চাহিল, কিন্তু সে যেন ইচ্ছা করিয়াই আর একদিকে ঘাড় ফিরাইয়া রহিল। মনোহর ব্যক্তিটি যেই হোন, রাগের মাথায় এই সমিতির বিরুদ্ধে যে-সকল কথা বলিয়া গেলেন তাহা অতিশয় সন্দেহজনক। এতগুলি আশ্চর্য নরনারী কোথা হইতে আসিয়াই বা এখানে সমিতি গঠন করিলেন, কি বা তাহার সত্যকার উদ্দেশ্য, হঠাৎ ভারতীই বা কি করিয়া ইহাদের সন্ধান পাইল? আর ওই যে লোকটি টিকিটের পরিবর্তে একদিন অনায়াসে মদ কিনিয়া খাইয়া তাহারই চোখের সম্মুখে ধরা পড়িয়াছিল,—আর সকলের বড় এই নবতারা!—স্বামী ত্যাগ করিয়া দেশের কাজ করিতে আসিয়াছে,—সতীত্ব-রক্ষার কথা ভাবিবার এখন যাহার সময় নাই,—অথচ এই লোকগুলা এত বড় অন্যায়কে শুধু সমর্থন নয়, প্রাণপণে প্রশ্রয় দিতেছে। এবং যিনি ইহাদের কর্ত্রী, স্ত্রীলোক হইয়াও তিনি প্রকাশ্য সভায় এতগুলি পুরুষের সমক্ষে সতীধর্মের প্রতি তাঁহার একান্ত অবজ্ঞা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিতে লজ্জাবোধটুকুও করিলেন না!

কিছুক্ষণ অবধি সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ হইয়া রহিল ; বাহিরে অন্ধকার, অপ্রশস্ত রাজপথ তেমনি জনহীন নীরব, কেমন যেন একপ্রকার উদ্বিগ্ন আশঙ্কায় অপূর্বর মনের ভিতরটা ভার হইয়া উঠিল।

হঠাৎ সুমিত্রার কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, অপূর্ববাবু!

অপূর্ব চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল।

সুমিত্রা কহিলেন, আপনি আমাদের চেনেন না, কিন্তু ভারতীর কাছ থেকে আমরা সবাই আপনাকে চিনি। শুনলাম আপনি আমাদের সমিতির মেম্বার হতে চান। সত্য?

অপূর্ব না বলিতে পারিল না, ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। যে লোকটি একমনে লিখিতেছিল সুমিত্রা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ডাক্তার, অপূর্ববাবুর নামটা লিখে নেবেন। অপূর্বকে হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কোন রকম চাঁদা নেই,—টাকাকড়ি দিতে হয় না এইটে আমাদের সমিতির বিশেষত্ব!

প্রত্যুত্তরে অপূর্ব নিজেও একটু হাসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। একটা মোটা বাঁধানো খাতায় যথার্থই তাহার নাম লেখা হইয়া গেল দেখিয়া মনে মনে সে অস্বস্তিতে ভরিয়া উঠিল এবং চুপ করিয়া থাকিতে আর না পারিয়া বলিয়া ফেলিল, কিন্তু কি উদ্দেশ্য, কি আমাকে করতে হবে কিছুই ত জানতে পারলাম না!

ভারতী আপনাকে জানান নি?

অপূর্ব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, কিছু জানিয়াছেন, কিন্তু একটা কথা আপনাকে আমি জিজ্ঞাসা করি, নবতারার আচরণ আপনারা কি সত্যই অন্যায় মনে করেন না?

সুমিত্রা কহিলেন, অন্ততঃ আমি করিনে। কারণ, দেশের বড় আমার কাছে কিছুই নেই।

অপূর্ব শ্রদ্ধাভরে কহিল, দেশকে আমিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। এবং দেশের সেবা করবার অধিকার স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সমান, কিন্তু এঁদের কর্মক্ষেত্রে ত এক নয় ; আমরা পুরুষে বাইরে এসে কাজ করব, কিন্তু নারী গৃহের মধ্যে, শুদ্ধান্তঃপুরে স্বামী-পুত্রের সেবার মধ্যে দিয়েই সার্থক হবেন। তাঁদের সত্যকার কল্যাণে দেশের যতবড় কাজ হবে বাইরে এসে পুরুষের সঙ্গে ভিড় করে দাঁড়ালে ত সে কাজ কিছুতেই হবে না।

সুমিত্রা হাসিলেন। অপূর্ব লক্ষ্য করিয়া দেখিল সকলেই যেন তাঁহার প্রতি চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসি গোপন করিল। সুমিত্রা কহিলেন, অপূর্ববাবু, এটা অনেক দিনের এবং অনেকের মুখের কথা তা আমরা অস্বীকার করিনে। কিন্তু আপনি ত জানেন কোন একটা কথা কেবলমাত্র বহুদিন ধরে বহু লোকে বলতে থাকলেই তা সত্য হয়ে ওঠে না। এ ফাঁকির কথা। যারা কোনদিন দেশের কাজ করেনি এ তাদের কথা, দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থ যাদের ঢের বড় এ তাদের কথা। এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। আপনি নিজে যখন কাজে লাগবেন, তখনই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন যে যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করা বলচেন সে যদি কখনো ঘটে, তখনি দেশের কাজ হবে, নইলে কেবলমাত্র পুরুষের ভিড়ে শুকনো বালির মত সমস্ত ঝরে ঝরে পড়বে, কোনদিন জমাট বাঁধবে না।

অপূর্ব মনে মনে লজ্জা পাইয়া কহিল, কিন্তু এতে কি দুর্নীতি বাড়বে না? চরিত্র কলুষিত হবার ভয় থাকবে না?

সুমিত্রা বলিলেন, ভয় কি ভিতরেই কম থাকে নাকি? অপূর্ববাবু, ওটা বাইরে আসার দোষ নয়, দোষ বিধাতার, যিনি নর-নারী সৃষ্টি করেছেন, তাদের মধ্যে অনুরাগের আকর্ষণ দিয়েছেন, তাঁর। অপূর্ববাবু, মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় রেখে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দিকে একবার চেয়ে দেখুন দিকি?

এই মন্তব্য শুনিয়া অপূর্ব খুশী হইতে পারিল না, বরঞ্চ, একটুখানি তীব্রতার সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, অন্য দেশের কথা অন্য দেশ ভাবুক, আমি নিজেদের কল্যাণ-চিন্তা করতে পারলেই যথেষ্ট মনে করব। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু এখানে একটা বস্তু আমি লক্ষ্য না করে পারিনি যে, বিবাহিত-জীবনের প্রতি আপনাদের আস্থা নেই, এমন কি নারীত্বের যা চরম উৎকর্ষ, সেই সতীত্ব ও পতিব্রতা-ধর্মকেও আপনারা অবহেলার চক্ষে দেখেন এর থেকে আসবে দেশের কল্যাণ?

সুমিত্রা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া সকৌতুক স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, অপূর্ববাবু, আপনি একটু রাগ করে বলচেন, নইলে ঠিক ও-ভাব ত আমি প্রকাশ করিনি। তবে আগাগোড়াই যে আপনি ভুল বুঝেছেন তাও নয়। যে সমাজে কেবলমাত্র পুত্রার্থেই ভার্যা গ্রহণের বিধি আছে, নারী হয়ে তাকে ত আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারিনে। আপনি সতীত্বের চরম উৎকর্ষের বড়াই করছিলেন, কিন্তু, এই যে-দেশে বিবাহের ব্যবস্থা, সে-

দেশে ও-বস্তু বড় হয় না, ছোটই হয়। সতীত্ব ত শুধু দেহেই পর্যবসিত নয়, অপূর্ববাবু, মনেরও ত দরকার? কায়মনে ভালবাসতে না পারলে ত ওর উচ্চস্তরে পৌঁছান যায় না? আপনি কি সত্যিই মনে করেন মন্ত্র পড়ে বিয়ে দিলেই যে-কোন বাঙালী মেয়ে যে-কোন বাঙালী পুরুষকে ভালবাসতে পারে? একি পুকুরের জল যে, যে-কোন পাত্রে ঢেলে মুখ বন্ধ করে দিলেই কাজ চলে যাবে?

অপূর্ব হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল, কিন্তু চিরকাল চলেও ত যাচ্ছে?

সুমিত্রা তাহার কথা শুনিয়া হাসিয়া মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তা যাচ্ছে। প্রাণাধিক স্বামী বলে পাঠ লিখতেও তার বাধে না, কর্তব্যবোধে শ্রদ্ধাভক্তি করতেও হয়ত তার আটকায় না। বস্তুতঃ, ঘরকন্নার কাজে এর বেশি তার প্রয়োজন হয় না! আপনি ত গল্প পড়েছেন, কোন্ এক ঋষিপুত্রে দুধের বদলে চালের গুঁড়োর জল খেয়েই আরামে দিন কাটতো। কিন্তু, আরাম যেমনই হোক, যা নয় তাকে তাই বলে গর্ব করা ত যায় না।

এই আলোচনা অপূর্বর অত্যন্ত বিশ্রী ঠেকিল, কিন্তু এবারেও সে জবাব দিতে না পারিয়া কহিল, আপনি কি বলতে চান এর অধিক কারও ভাগ্যেই জোটে না?

সুমিত্রা কহিলেন, না, তা আমি বলতেই পারিনে। কারণ, সংসারে দৈবাৎ বলেও একটা শব্দ আছে।

অপূর্ব কহিল, ওঃ—দৈবাৎ! কিন্তু কথা যদি আপনার সত্যও হয়, তবুও আমি বলি সমাজের মঙ্গলের জন্য, উত্তর-পুরুষের কল্যাণের জন্য আমাদের এই-ই ভাল।

সুমিত্রা তেমনি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন না অপূর্ববাবু, সমাজ এবং আপনার উত্তর-পুরুষ কোনটারই এতে শেষ পর্যন্ত কল্যাণ হবে না। সমাজ ও বংশের নাম করে ব্যক্তিকে একদিন বলি দেওয়া হতো, কিন্তু ফল তার ভাল হয়নি,—আজ তা অচল। ভালবাসার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন উত্তর-পুরুষের জন্য না হলে এমন ভয়ানক স্নেহের ব্যবস্থা তার মাঝখানে স্থান পেত না। এই ব্যর্থ বিবহিত-জীবনের মোহ নারীকে কাটাতেই হবে। তাকে বুঝাতেই হবে, এতে তার লজ্জাই আছে গৌরব নেই।

অপূর্ব ব্যাকুল হইয়া কহিল, কিন্তু ভেবে দেখুন আপনাদের এই সকল শিক্ষার আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত সমাজে অশান্তি এবং বিপ্লব এসেই উপস্থিত হবে।

সুমিত্রা বলিলেন হলই বা। অশান্তি এবং বিপ্লব মানেই ত অকল্যাণ নয় অপূর্ববাবু। যে রুগ্ন, জীর্ণ জরাগ্রস্ত সেই শুধু উৎকণ্ঠিত সতর্কতায় আপনাকে আগলে রাখ্‌তে চায় কোন দিক দিয়ে না তার গায়ে ধাক্কা লাগে। অনুক্ষণ এই ভয়েই সে কাঁটা হয়ে থাকে এতটুকু নাড়াচাড়াতেই তার প্রাণবায়ু চোখের পলকে বেরিয়ে যাবে। আর এমনি অবস্থাই যদি সমাজের হয়ে থাকে ত যাক না একটা হেস্তনেস্ত হয়ে। দুদিন আগে-পাছের জন্য কি-ই বা এমন ক্ষতি হবে?

এ কথার অপূর্ব আর জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল। সুমিত্রা নিজেও ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, ঋষিপুত্রের উপমা দিয়ে হয়ত আপনাকে আমি ব্যথা দিয়েছি। কিন্তু ব্যথা যে আপনার পাওনা ছিল, তার থেকে আপনাকে আমি বাঁচাতামই বা কি করে?

তাঁহার শেষের কথাটা অপূর্ব বুঝিতে পারিল না, কিন্তু বিরক্তির পাত্র তাহার পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাই প্রত্যুত্তরে বলিয়া ফেলিল, জগন্নাথের পথে দাঁড়িয়া ক্রীশ্চান মিশনারিরা যাত্রীদের অনেক ব্যথা দেয়। তবুও সেই ঠুঁটো জগন্নাথকে ত্যাগ করে কেউ হাতওয়ালা খ্রীষ্টকেও ভজে না। ঠুঁটো নিয়েই তাদের কাজ চলে যায়, এই আশ্চর্য!

সুমিত্রা রাগ করিলেন না, হাসিয়া বলিলেন, সংসারে আশ্চর্য আছে বলেই ত মানুষের বাঁচা অসম্ভব হয়ে ওঠে না অপূর্ববাবু। গাছের পাতার রঙ যে সবাই সবুজ দেখে না এ তারা জানেও না। তবু যে লোকে তাকে সবুজ বলে, সংসারে এই কি কম আশ্চর্য! সতীত্বের সত্যিকার মূল্য জানলে কি—

সুমিত্রা! যে লোকটি নিঃশব্দে এতক্ষণ লিখিতেছিল সে উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সঙ্গে

সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল।

অপূর্ব দেখিল, গিরীশ মহাপাত্র!

ভারতী তাহার কানে কানে বলিল, উনিই আমাদের ডাক্তার। উঠে দাঁড়ান।

কলের পুতুলের মত অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু ক্রুদ্ধ মনোহরের শেষ কথাগুলা তাহার চক্ষের নিমেষে মনে পড়িয়া সমস্ত দেহের রক্ত যেন হিম হইয়া গেল।

গিরীশ কাছে আসিয়া কহিলেন, আমাকে বোধ হয় আপনি ভুলে যাননি? আমাকে এঁরা সবাই ডাক্তার বলেন। এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

অপূর্ব হাসিতে পারিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে বলিল, আমার কাকাবাবুর খাতায় কি একটা ভয়ানক নাম লেখা আছে—

গিরীশ সহসা তাহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপিচুপি কহিলেন, সব্যসাচী ত? এই বলিয়া পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু রাত হয়ে গেছে অপূর্ববাবু, চলুন আপনাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি। পথটা তেমন ভাল নয়,—পাঠান ওয়ার্কমেন-গুলোর মদ খেলে আর যেন কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। চলুন। এই বলিয়া যেন একপ্রকার জোর করিয়াই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।

সুমিত্রাকে একটা নমস্কার করা হইল না, ভারতীকে একটা কথা বলা হইল না,—কিন্তু সবচেয়ে যে কথাটা তাহার বুকে ধাক্কা মারিল সে ওই বাঁধানো খাতাটা,—তাহার নাম যাহাতে লেখা রহিল।

বার

কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই অপূর্ব সৌজন্য প্রকাশ করিয়া কহিল, আপনার এই অসুস্থ দুর্ব্বল শরীর নিয়ে আর পথ হেঁটে কাজ নেই। এই ত সোজা রাস্তা বড় রাস্তায় গিয়ে পড়েচে,—আমি অনায়াসে যেতে পারবো।

ডাক্তার চলিতে চলিতেই একটু হাসিয়া বলিলেন, অনায়াসে এলেই কি অনায়াসে যেতে পারা যায় অপূর্ব্ববাবু? তখন সন্ধ্যাবেলা যে পথটা সোজাই ছিল এখন, এত রাত্রে জেরবাদীপাঠান আর বেকার কাফ্রিতে মিলে হয়ত তাকে রীতিমত বাঁকিয়ে রেখেচে। চলুন, আর দাঁড়াবেন না।

অপূর্ব ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়াও জিজ্ঞাসা করিল, কি করে এরা? মারামারি?

তাহার সঙ্গী পুনশ্চ হাসিয়া বলিলেন, করে বৈ কি! মদের খরচটা তারা পরের ঘাড়ে চাপাবার কাজে ও-অনুষ্ঠানটুকু বোধ করি ঠিক বাদ দিয়ে উঠতে পারে না। এই যেমন সোনার ঘড়িটা আপনার। অপরের পকেটে চালান যাবার সময়ে আপত্তি হবারই সম্ভাবনা। তার পরের ব্যাপারটাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। ঠিক না?

অপূর্ব সভয়ে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক বটে, কিন্তু এ যে আমার বাবার ঘড়ি!

ডাক্তার বলিলেন, এই ত তারা বুঝতে চায় না! কিন্তু, আজ না বুঝলে চলবে না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ, আজ এর বদলে কারুরই মদ খাবার সুবিধে হবে না।

অপূর্ব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিল, বরঞ্চ চলুন, আর কোন পথ দিয়ে ঘুরে যাওয়া যাক।

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অনেকটা মেয়েদের মত স্নিগ্ধ সকৌতুক হাসি। কহিলেন, ঘুরে? এই দুপুর রাতে? না না, তার আবশ্যক নেই, চলুন—এই বলিয়া সেই শীর্ণ হাতখানি দিয়া অপূর্বর ডান হাতটি টানিয়া লইয়া একটা চাপ দিতেই অপূর্বর অনেক দিনের জিম্‌নাস্টিক, অনেক ক্রিকেট-হকিখেলা হাতের ভিতরের হাড়গালা পর্য্যন্ত যেন মড়মড় করিয়া উঠিল।

অপূর্ব হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, চলুন, বুঝেচি। এই বলিয়া সে নিজেও একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, কাকাবাবু সেদিন আপনার কথাতেই রহস্য করে আমাকে বলেছিলেন,

সাধে কি বাবাজী মহাপুরুষের সংবর্ধনায় এত লোকজনের আয়োজন করতে হয়? আমাদের গুহ্য কেতাবে লেখা আছে, কৃপা করলে তিনি পাঁচ-সাত-দশজন পুলিশের ভবলীলা শুধু চড় মেরেই সাঙ্গ করে দিতে পারেন! কাকাবাবুর মুখের ভঙ্গীতে সেদিন আমরা খুব হেসেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্চে অত হাসা ঠিক সঙ্গত হয়নি—আপনি পারলেও বা পারতে পারেন।

ডাক্তারের মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, কহিলেন, কাকাবাবুর ওটা অতিশয়োক্তি। কিন্তু আমরা কে কে?

অপূর্ব কহিল, আমি এবং তাঁরই দু'চার জন কর্মচারী।

ওঃ—এঁরা! এই বলিয়া তিনি একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। অপূর্ব ইহার অর্থ বুঝিল, এবং কিছুক্ষণ অবধি কোন কথা যেন তাহার মুখে আসিল না। সোজা পথটা আজ সোজাই ছিল কারণ, যে জন্যই হউক, পথিকের টাকাকড়ি কাড়িয়া লইবার আজ কেহ তথায় উপস্থিত ছিল না। নির্জন গলিটা নিঃশব্দে পার হইয়া তাহারা বড় রাস্তায় কাছাকাছি পৌঁছিলে অপূর্ব সহসা বলিয়া উঠিল, এবারে বোধ হয় আমি নির্ভয়ে যেতে পারবো। ধন্যবাদ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার স্বল্পালোকিত সম্মুখের প্রশস্ত রাজপথের বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, পারবেন বোধ হয়।

অপূর্ব নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে গিয়া ভিতরের কৌতূহল কোনমতেই আর সংবরণ করিতে পারিল না, বলিয়া ফেলিল, আচ্ছা, সব্য—

না না, সব্য নয়, সব্য নয়,—ডাক্তারবাবু।

অপূর্ব ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমাদের সৌভাগ্য যে পথে কেউ ছিল না, কিন্তু ধরুন তারা দলে বেশী থাকলেও কি সত্য সত্যই কোন ভয় ছিল না?

ডাক্তার কহিলেন, দলে তারা দু'দশ জনের বেশী কোন দিনই থাকে না।

অপূর্ব বলিল, দু'দশ জন! অর্থাৎ দু'জন থাকলেও ভয় ছিল না, দশজন থাকলেও না?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, না।

বড় রাস্তার মোড়ের উপর আসিয়া অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, বাস্তবিকই কি আপনার পিস্তলের লক্ষ্য কিছুতেই ভুল হয় না?

ডাক্তার তেমনি সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, না। কিন্তু কেন বলুন ত? আমার সঙ্গে ত পিস্তল নেই।

অপূর্ব বলিল, ওটা না নিয়েই বেরিয়েছিলেন,—আশ্চর্য! অন্ধকার গভীর রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, সে জনহীন দীর্ঘপথের প্রতি চাহিয়া কহিল, পথে না আছে লোক, না আছে একটা পুলিশ ; আলো ত না থাকার মধ্যেই—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আমার বাসাটা প্রায় ক্রোশ খানেক হবে, না?

ডাক্তার বলিলেন, তা হবে বৈ কি।

অপূর্ব কহিল, আচ্ছা, নমস্কার, আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম। এই বলিয়া সে চলিতে উদ্যত হইয়া কহিল, আচ্ছা, এমন ত হতে পারে, সে ব্যাটারা আজ আর কোন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে?

ডাক্তার সায় দিয়া কহিলেন, বিচিত্র নয়।

অপূর্ব কহিল, নয়ই ত!—আচ্ছা, নমস্কার! কিন্তু মজা দেখেছেন, যেখানে আসল দরকার সেখানে পুলিশের ছায়াটি পর্যন্ত দেখবার জো নেই। এই হ'ল তাঁদের কর্তব্য-জ্ঞান আর এর জন্যই আমরা ট্যাক্স জুগিয়ে মরি। সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া উচিত, কি বলেন?

তাতে আর সন্দেহ কি! বলিয়া ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, চলুন, কথা কইতে কইতে আর খানিকটা আপনার সঙ্গে এগিয়ে যাই।

অপূর্ব লজ্জায় একেবারে ম্লান হইয়া গেল। একমুহূর্ত মাটির দিকে চাহিয়া আস্তে আস্তে

বলিল, আমি বড্ড ভীতু লোক ডাক্তারবাবু, আমার কিচ্ছু সাহস নেই। আর কেউ হলে অনায়াসে যেতে পারতো, এত রাত্রে আপনাকে কষ্ট দিত না।

তাহার এই বিনয়-নম্র নিরভিমান সত্য-কথায় ডাক্তার নিজের হাসির জন্য নিজেও যেন লজ্জা পাইলেন। সস্নেহে তাহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, সঙ্গে যাবার জন্যেই আমি এসেচি অপূর্ববাবু, নইলে প্রেসিডেন্ট আমাকে এ জিনিসটা হাতে গুঁজে দিতেন না। এই বলিয়া তিনি বাঁ হাতের মোটা কালো লাঠিটা দেখাইলেন।

অপূর্ব চকিত হইয়া কহিল, সুমিত্রা? তিনি কি আপনাকেও আদেশ করতে পারেন?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, পারেন বৈ কি।

অপূর্ব বলিল, কিন্তু তিনি ত অন্য লোকও সঙ্গে দিতে পারতেন?

ডাক্তার কহিলেন, তার মানে সবাইকে দল বেঁধে পাঠানো। তার চেয়ে এই ব্যবস্থাই সোজা হয়েছে অপূর্ববাবু।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল। ডাক্তার কহিলেন, সুমিত্রা আমাদের দলের কর্ত্রী, তাঁকে সকল দিক চেয়ে দেখে কাজ করতে হয়। যেখানে ছুরি-ছোরা খুন-জখম লেগেই আছে সেখানে যাকে তাকে ত পাঠানো যায় না। আমি উপস্থিত না থাকলে আজ আপনাকে থাকতে হতো,—তিনি কোনমতেই আসতে দিতেন না।

এই অন্ধকার জনহীন পথে ছুরি-ছোরার কথায় অপূর্বর সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া গেল। আস্তে আস্তে কহিল, কিন্তু এই পথেই যে আপনাকে একাকী ফিরতে হবে!

ডাক্তার বলিলেন, তা হবে।

অপূর্ব আর প্রশ্ন করিল না। তাহাদের নিভৃত আলাপের গুঞ্জনশব্দ পাছে অবাঞ্ছিত কাহাকেও আকৃষ্ট করিয়া আনে এ খেয়াল তাহার মনের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। সে তাহার চক্ষু কর্ণ ও মনকে একই কালে রাস্তার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে একান্ত নিবিষ্ট করিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপদে পথ চলিতে লাগিল। মিনিট-পনের এইভাবে চলিয়া শহরের প্রথম পুলিশ-স্টেশনটা ডানহাতে রাখিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব আবার কথা কহিল, বলিল, ডাক্তারবাবু, আমার বাসা ত বেশী দূরে নয়, আজ রাত্রিটা ওখানে থাকলে ক্ষতি কি?

ডাক্তার তাহার মনের কথা অনুমান করিয়া সহাস্যে কহিলেন, ক্ষতি ত অনেক জিনিসেই হয় না অপূর্ববাবু, কিন্তু বিনা প্রয়োজনেও কোনও কাজ করা আমাদের বারণ। শুধু কেবল প্রয়োজন নেই বলেই আমাকে ফিরে যেতে হবে।

আপনারা কি অপ্রয়োজনে জগতে কিছুই করেন না?

করা বারণ। আমি তাহলে বিদায় হই অপূর্ববাবু?

অপূর্ব কটাক্ষে পশ্চাতের সমস্ত অন্ধকার পথটার প্রতি চাহিয়া এই লোকটিকে একাকী ফিরিয়া যাইতে কল্পনা করিয়া আর একবার কণ্টকিত হইয়া উঠিল। কহিল, ডাক্তারবাবু, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করাও কি আপনাদের বারণ?

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, হঠাৎ এ কথা কেন?

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ অভিমানের সুরে বলিল, তা ছাড়া আর কি বলুন? আমি ভীতু লোক, দলবদ্ধ গুণ্ডাদের মধ্যে দিয়ে একলা যেতে পারিনে,—আমাকে নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে সেই বিপদের ভেতর দিয়ে আপনি যদি আজ একাকী ফিরে যান, আর কি আমি মুখ দেখাতে পারবো?

ডাক্তার চক্ষের নিমিষে তাহার দুই হাত সস্নেহে ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, আচ্ছা চলুন তবে আজ রাত্রির মত আপনার বাসাতে গিয়েই অতিথি হই গে। কিন্তু এ-সব হাঙ্গামা কি সহজে নিতে আছে ভাই?

কথাটা অপূর্ব ঠিক বুঝিল না, কিন্তু কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই হাতের মধ্যে কেমনতর একপ্রকার টান অনুভব করিয়া ফিরিয়া চাহিয়াই কহিল, আপনার জুতোয় বোধ করি লাগছে ডাক্তারবাবু, আপনি খোঁড়াচ্চেন!

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ও কিছু না। লোকালয়ে আমার পা-দুটো কেমন আপনিই

খুঁড়িয়ে চলে। গিরীশ মহাপাত্রের চলন মনে পড়ে?

অপূর্ব থমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল, আপনাকে যেতে হবে না, ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার তেমনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু আপনার মর্যাদা?

অপূর্ব বলিল, আপনার কাছে আবার মর্যাদা কি? পায়ের ধূলোর যোগ্যও ত নই। আপনি ছাড়া পৃথিবীতে কি আর কারও এতবড় সাহস আছে!

এই ডাক্তার-ব্যক্তিটির জীবন-ইতিহাসের সহিত অপূর্বর প্রত্যক্ষ পরিচয় কিছুই ছিল না। থাকিলে সে এই অত্যন্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার লইয়া এতখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জায় মরিয়া যাইত। সমুদ্রের কাছে গোষ্পদের ন্যায় এই পথটুকুতে একাকী হাঁটা এই লোকটির কাছে কি! পুলিশের লোকে যাহাকে সব্যসাচী বলিয়া জানে, দশ-বারোজন দুর্বৃত্তে মিলিয়া তাহার পথরোধ করিবে কি করিয়া?

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া হাসি গোপন করিয়া শেষে ভাল মানুষটির মত কহিলেন, আচ্ছা, তার চেয়ে চলুন না কেন দুজনেই আবার একসঙ্গে ফিরে যাই? আমাকে একলা যদি বা কেউ আক্রমণ করতে সাহস করে আপনি কাছে থাকলে ত সে সম্ভাবনা থাকবে না!

অপূর্ব অনিশ্চিতকণ্ঠে বলিল, আবার ফিরে যাবো?

ডাক্তার বলিলেন, দোষ কি? আমার একলা যাবার বিপদের শঙ্কাও থাকবে না।

থাকবো কোথায়?

আমার কাছে।

অফিস হইতে ফিরিয়া আজ অপূর্বর খাওয়া হয় নাই, তাহার অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হইতেছিল, একটু লজ্জিত হইয়া কহিল, দেখুন, আমার কিন্তু এখনো খাওয়া হয়নি,—আচ্ছা, তা না হয় আজ—

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, চলুন না, ভাগ্য পরীক্ষা করে আজ দেখাই যাক। কিন্তু একটা কথা, তেওয়ারী বেচারা বড় চিন্তিত হয়ে থাকবে।

তেওয়ারীর উল্লেখে অপূর্বর মনের মধ্যে হঠাৎ একটা হিংস্র প্রতিশোধের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল, রাগ করিয়া বলিল, মরুক গে ব্যাটা ভেবে,—চলুন যাই। এই বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই তাঁহাকে বাধা দিয়া সেই আলো-আঁধারের জনশূন্য-পথে উভয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে আবার ফিরিয়া চলিল। এবার কিন্তু ভয়ের কথা তাহার মনেই হইল না। পুলিশ থানা পার হইয়া সহসা একসময়ে সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি কি এ্যানার্কিস্ট?

ডাক্তার অন্ধকারে তাহার মুখের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার কাকাবাবু কি বলেন?

অপূর্ব কহিল, তিনি বলেন সব্যসাচী একজন ভয়ানক এ্যানার্কিস্ট।

আমি যে সব্যসাচী এ-সম্বন্ধে আপনার কোন সন্দেহ নেই?

না।

এ্যানার্কিস্ট বলতে আপনি কি বুঝেন?

অপূর্ব এ প্রশ্নের হঠাৎ জবাব দিতে পারিল না। একটু ভাবিয়া কহিল, অর্থাৎ কিনা রাজদ্রোহী—যিনি রাজার শত্রু।

ডাক্তার বলিলেন, আমাদের রাজা এদেশে থাকেন না, থাকেন বিলাতে। লোকে বলে অতিশয় ভদ্রলোক। আমি তাঁকে কখনো চোখে দেখিনি, তিনিও আমার কখনো লেশমাত্র ক্ষতি করেন নি। তাঁর প্রতি বৈরীভাব আসবে আমার কোথা থেকে অপূর্ববাবু।

অপূর্ব কহিল, যাদের আসে, তাদেরই বা কি করে আসে বলুন। তাদেরও ত তিনি কোন অনিষ্ট করেন নি!

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, তাই, আপনি যা বলছেন এদেশে তা নেই একেবারে মিছে কথা!

তাঁহার কণ্ঠস্বরের প্রবলতায় ও অস্বীকার করিবার তীব্রতায় অপূর্ব চমকিয়া গেল। অবিশ্বাস করিবার সাহস তাহার হইল না। অথচ, দেশে কিছু যে একটা আছেই, ছেলেবেলা তাহারও গায়ে যে ইহার আঁচ লাগিয়া গেছে, এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবা না থাকিলে কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া গড়াইতে পারিত, ইহা সে বড়-বয়সে পদে পদে অনুভব করিয়াছে। একটু ভাবিয়া কহিল, রাজা না হোন রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে যে একটা ষড়যন্ত্র ছিল এ কথা ত মিথ্যা নয় ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার অনেকক্ষণ কোন উত্তর দিলেন না, তারপরে ধীরে ধীরে বলিলেন, কর্মচারীরা রাজার ভৃত্য, মাইনে পায়, হুকুম পালন করে। একজন যায় আর একজন আসে। এটা সহজ এবং মোটা কথা। কিন্তু এই সহজকে এবং মোটাকে নিরর্থক সূক্ষ্ম করে মানুষে যখন দেখতে চায়, তখনই তার সবচেয়ে বড় ভুল হয়। সেইজন্যে তাদের আঘাত করাকেই রাজশক্তির মূলে আঘাত করা বলে আত্মবঞ্চনা করে। এতবড় মারাত্মক ব্যর্থতা আর নেই।

অপূর্ব একটু চুপ করিয়া কহিল, কিন্তু এই ব্যর্থ কাজ করবার লোক কি ভারতবর্ষে নেই?

ডাক্তার শান্তভাবে কহিলেন, হয়ত থাকতেও পারে।

কিন্তু অপূর্ব সহসা আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এঁরা সব আজকাল কোথায় থাকেন এবং কি করেন?

তাহার ঔৎসুক্য ও ব্যগ্রতায় ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিলেন।

অপূর্ব কহিল, হাসলেন যে?

ডাক্তার তেমনি হাসিমুখে বলিলেন, আপনার সেই কাকাবাবুটি উপস্থিত থাকলে কিন্তু বুঝতেন। আপনার বিশ্বাস আমি একজন এ্যানার্কিস্টদের পাণ্ডা। তার মুখ থেকে কি এর জবাব আশা করতে আছে অপূর্ববাবু?

নিজের বুদ্ধিহীনতার এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে অপূর্ব অপ্রতিভ হইল, মনে মনে একটু রাগও করিল, কহিল, আশা করা সম্পূর্ণই অনুচিত হতো আজ যদি না আমাকে দলভুক্ত করে নিতেন। মেম্বরদের এটুকু জানবার অধিকার আছে, এ বোধ করি আপনি অস্বীকার করেন না। এ ত ছেলেখেলা নয়, ভীষণ দায়িত্ব আছে যে!

আছেই ত। বলিয়া ডাক্তারবাবু হাসিলেন। এই সুমিষ্ট হাসি ও নিরাতঙ্ক সহজ উক্তি ঠিক ব্যঙ্গোক্তির মতই অপূর্বর কানে বাজিল। বিদ্রোহী দলের বাঁধানো খাতায় যাহার নাম লেখা হইল তাহার প্রশ্নের এই উত্তর? এর বেশি জানিবার তাহার প্রয়োজন নাই! মনে মনে ভীত ও ক্রুদ্ধ হইয়া এই লোকটিকে আজ সে ভুল বুঝিল, কিন্তু এই ভুল সংশোধন করিয়া পরবর্তীকালে বহুবারই তাহাকে দেখিতে হইয়াছে কোন অবস্থায় কোন কারণেই ইঁহার মুখের হাসি উদ্বেগে এবং গলার স্বর উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠে না।

নিঃশব্দ গাম্ভীর্য ডাক্তারের এই সামান্য সংক্ষিপ্ত জবাবটাকে সে প্রতিঘাত করিতে চাহিয়া নিরুত্তরে পথ চলিতে লাগিল, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারিল না,—ওই ছোট্ট কথাটুকুর নিদারুণ তীক্ষ্ণতা তীরের ফলাটুকুর মতই যেন তাহার বুকে বিঁধিতে লাগিল। তিক্তকণ্ঠে কহিল, দলের খাতায় তাড়াতাড়ি নাম লিখে নিলেই ত হয় না, তার ফলাফল বুঝিয়েও দিতে হয়।

কিন্তু সে কি তাঁরা দেননি?

অপূর্ব কহিল, কিছুই না। পথের-দাবী না পথের-দাবী! দাবীর বহর যে এত, তা কে জানতো? আর আপনিও ত ছিলেন, নাম লেখবার পূর্বে আপনারও ত জানা উচিত ছিল আমার যথার্থ মতামত কি!

ডাক্তার একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, মেয়েরা একটা ব্যাপার করেছেন, তাঁরাই জানেন কাকে মেম্বর করবেন এবং কাকে করবেন না। আমি হঠাৎ জুটে গেছি মাত্র। বাস্তবিকই আমি এঁদের সভার বিশেষ কিছু জানিনে অপূর্ববাবু!

অপূর্ব বুঝিল ইহাও পরিহাস। উৎকণ্ঠায় ও আশঙ্কায় সমস্ত জিনিসটাই তাহার অত্যন্ত

বিশ্রী লাগিতেছিল, আপনাকে সে আর সংবরণ করিতে পারিল না, জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, কেন ছলনা করচেন ডাক্তারবাবু, সুমিত্রাকেই প্রেসিডেন্ট করুন, আর যাকেই যা করুন, দল আপনার এবং আপনিই এর সব, তাতে লেশমাত্র সন্দেহ নেই। পুলিশের চোখে ধূলো দিতে পারবেন কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন।

তাহার কথা শুনিয়া এইবার এই শীর্ণদেহ রহস্যপ্রিয় লোকটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, আমার দল মানে এ্যানার্কিস্টের দল ত? আপনি মিথ্যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন অপূর্ববাবু, আপনার আগাগোড়া ভুল হয়েছে। তাদের হল জীবন-মৃত্যুর খেলা, তারা আপনার মত ভীতু লোককে দলে নেবে কেন? তারা কি পাগল?

অপূর্ব লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেল, কিন্তু তাহার বুকের উপর হইতে গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, পথের-দাবী নাম দিয়ে সুমিত্রা এই ছোট্ট দলটির প্রতিষ্ঠা করেচেন। জীবন-যাত্রায় মানুষের পথ চলবার অধিকার যে কত বড় এবং কত পবিত্র এই মস্ত সত্যটাই মানুষে যেন ভুলে গেছে। আপনারা, অর্থাৎ দলের সভ্য যাঁরা, তাঁরা নিজেদের সমস্ত জীবন দিয়ে এই কথাটাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান। সুমিত্রা অনুরোধ করলেন আমি যে কয়দিন এখানে আছি তাঁর দলটিকে যেন গড়ে দিয়ে যাই। আমি রাজী হয়েছি,—এ ছাড়া আপনাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই। আপনারা হলেন সমাজ-সংস্কারক, কিন্তু আমার সমাজ সংস্কারক করে বেড়াবার সময়ও নেই, ধৈর্যও নেই। হয়ত, কিছুদিন আছি, হয়ত, কালই চলে যেতে পারি; সারাজীবনে আর কখনো দেখাও না হতে পারে। বেঁচে আছি কি নেই, এটুকু খবরও হয়ত আপনাদের কানে পৌঁছবে·না।

কথাগুলি শান্ত, ধীর,—উচ্ছ্বাস বা আবেগের বাষ্পও নাই। এই ব্যক্তি যেই হউক, কিন্তু সব্যসাচীর যে বিবরণ অপূর্ব কাকাবাবুর মুখে শুনিয়াছে, সেই-সব দপ্‌ করিয়া মনে পড়িয়া তাহার বুকের কোথায় যেন খোঁচার মত বিঁধিল। কিন্তু তখনি মনে হইল, সে ত পাষাণ,—তাহার জন্য আবার বেদনাবোধ কি? ক্ষণকাল পরে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তারবাবু, সুমিত্রা কে? আপনি তাঁকে জানলেন কি করে?

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। উত্তর না পাইয়া অপূর্ব নিজেই বুঝিল এরূপ কৌতূহল সঙ্গত হয় নাই। এই অল্পকালের মধ্যেই সে এই রহস্যময় বিচিত্র সমাজের আচরণের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিতেছিল, তাই সে ভারতীর সম্বন্ধেও তাহার প্রবল কৌতূহলও সংবরণ করিয়া মৌন হইয়া রহিল।

মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, আপনার কল্যাণেই বোধ হয় রাস্তা আজ একেবারে নিরাপদ। এমন প্রায় ঘটে না, কিন্তু কি ভাবচেন বলুন ত?

অপূর্ব বলিল, ভাবচি ত অনেক-কিছু, কিন্তু সে যাক। আচ্ছা, আপনি বললেন মানুষের নির্বিঘ্নে পথ চলবার অধিকার। এই যেমন আমরা নির্বিঘ্নে পথ চলচি,—এমনি?

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, এমনিই কিছু একটা হবে বোধ হয়।

অপূর্ব কহিল, ওই মেয়েটি স্বামী পরিত্যাগ করে পথে-দাবীর সভ্য হতে এসেছেন, ওটাও ঠিক বুঝলাম না।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও যে ঠিক বুঝেছি তা বলতে পারিনে। ও-সব ব্যাপার সুমিত্রাই বোঝেন ভাল।

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, তাঁর বোধ হয় স্বামী নেই?

ডাক্তার চুপ করিয়া রহিলেন। অপূর্বকে লজ্জা ও ক্ষোভের সহিত পুনরায় স্মরণ করিতে হইল তাহার অহেতুক ঔৎসুক্যের তিনি জবাব দিবেন না। এবং এই কথা অলক্ষ্যে যাচাই করিতে সে সঙ্গীর মুখের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া কিন্তু একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। তাহার মনে হইল, এই আশ্চর্য মানুষটির অপরিজ্ঞাত জীবনের একটা নিভৃত দিক যেন সে হঠাৎ

দেখিতে পাইল। সে ঠিক কি—তাহার বলা কঠিন, কিন্তু এখন পর্যন্ত যাহা কিছু জানিয়াছে সে তাহার অতীত, যেন কোন্ বহুদূরাঞ্চলে তাঁহার চিন্তা সরিয়া গেছে, কাছাকাছি কোথাও আর নাই। অনতিদূরবর্তী ল্যাম্পপোস্ট হইতে কিছুক্ষণ হইতেই একটা ক্ষীণ আলোক ইঁহার মুখের উপরে পড়িয়াছিল, পাশ দিয়া যাইবার সময় অপূর্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল এই ভয়ঙ্কর-সতর্ক লোকটির চোখের উপরে একটা ঝাপসা জাল ভাসিয়া বেড়াইতেছে—এই মুহূর্তের জন্য যেন তিনি সমস্ত ভুলিয়া মনে মনে কি একটা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন।

অপূর্ব দ্বিতীয় প্রশ্ন করে নাই, নীরবে পথ চলিতেছিল, কিন্তু মিনিট-দু'য়ের বেশী হইবে না, অকস্মাৎ অকারণেই হাসিয়া উঠিয়া ডাক্তার বলিলেন, দেখুন অপূর্ববাবু আপনাকে আমি সত্যিই বলচি, মেয়েদের এই-সব প্রণয়ঘটিত মান-অভিমানের ব্যাপার আমি কিছুই বুঝিনে। বোঝবার চেষ্টা করতে গেলেও নিরর্থক ভারী সময় নষ্ট হয়। কোথায় পাই এত সময়?

অপূর্বর প্রশ্নের ইহা উত্তর নয়, সে চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, ভারী মুশকিল, এঁদের বাদ দিয়ে কাজও চলে না, নিলেও গণ্ডগোল বাধে।

এ মন্তব্যও অসংবদ্ধ। অপূর্ব নিরুত্তরেই রহিল।

কি হল? কথা কন না যে বড়?

অপূর্ব কহিল, কি বলব বলুন!

ডাক্তার কহিলেন, যা ইচ্ছে। দেখুন অপূর্ববাবু, এই ভারতীটি বড় ভাল মেয়ে। যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি কর্মঠ এবং তেমনি ভদ্র।

ইহাও বাজে। কিন্তু প্রত্যুত্তরে এ প্রশ্ন সে ইচ্ছা করিয়াই করিল না যে, আপনি তাহাকে কতদিন হইতে জানিলেন এবং কি করিয়া জানিলেন। শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু শ্রোতার যদি এদিকে কিছুমাত্র খেয়াল থাকিত ত অপূর্বর মুখ হইতে এই এক অক্ষরের জবাবে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যে বিমনা হইয়াই আলাপ করিতেছিলেন, অপূর্বকে তাহা আর নূতন করিয়া বুঝিতে হইল না। বক্তা বোধ করি তাঁহার শেষ-কথারই সূত্র ধরিয়া কহিলেন, আপনাদের প্রসঙ্গেই কথা কইতে তিনি আপনার সম্বন্ধে বলছিলেন, আপনি নাকি ভয়ানক হিন্দু,—একেবারে গোঁড়া। ভারতী বলছিলেন, এতবড় ভয়ঙ্কর হিঁদু বামুনেরও তিনি জাত মেরে দিয়েছেন।

অপূর্ব বলিল, তা হবে। এই একান্ত অন্যমনস্ক লোকটির সহিত তর্ক করিতে তাহার ইচ্ছাই হইল না। বড় রাস্তা প্রায় শেষ হইয়া আসিল, গলির মোড়ে সামনাসামনি আলো-দুইটা সম্মুখেই দেখা দিল, আর মিনিট-দশেকের মধ্যেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো যাইবে, এমনি সময়ে ডাক্তার তাঁহার ঘুমন্ত মনটাকে যেন অকস্মাৎ ঝাড়া দিয়া একেবারে সজাগ করিয়া দিলেন, কহিলেন, অপূর্ববাবু!

অপূর্ব তাঁহার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতায় নিজেও সচেতন হইয়া উঠিল, কহিল, বলুন।

ডাক্তার বলিলেন, এদেশে আমি থাকা পর্যন্ত কাজ নেই, কিন্তু চলে গেলে আপনি নিঃসঙ্কোচে সুমিত্রাকে সাহায্য করবেন। এমন মানুষ আপনি পৃথিবী ঘুরে বেড়ালেও কখনো পাবেন না। এঁর পথের-দাবী যেন অনাদরে অবহেলায় না মারা পড়ে। এতবড় একটা আইডিয়া কি কেবল এই ক'টি মেয়েমানুষে সার্থক করে তুলতে পারবে! আপনার একনিষ্ঠ সেবার একান্ত প্রয়োজন।

এই ব্যক্তির ধারণায় সে যে সত্যই এতবড় লোক অপূর্ব তাহা প্রত্যয় করিল না। কহিল, এতবড় একটা আইডিয়া তবে আপনিই বা ফেলে যেতে চাচ্চেন কেন?

ডাক্তার কহিলেন, অপূর্ববাবু, যেখানে ফেলে যাওয়াই মঙ্গল, সেখানে আঁকড়ে থাকাতেই অকল্যাণ। আমার সাহায্যে আপনাদের কাজ নেই,—আপনারা নিজেরাই এটা গড়ে তুলুন, হয়ত বা এর ভেতর দিয়েই দেশের সব চেয়ে বড় কাজ হবে।

অপূর্ব কহিল, নবতারার ব্যাপারটা ত আমি বিশ্বাস করতে পারিনে ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার বলিলেন, কিন্তু সুমিত্রাকে বিশ্বাস করবেন। বিশ্বাসের এতবড় উঁচু জায়গা আর

কোথাও পাবেন না, অপূর্ববাবু। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আপনাকে ত আমি পূর্বেই বলেচি, মেয়েদের ব্যাপার আমি বুঝতে পারিনে ; কিন্তু সুমিত্রা যখন বলেন, জীবনযাত্রায় মানবের পথ চলবার বাধাবন্ধহীন স্বাধীন অধিকার, তখন এ দাবীকে ত কোন যুক্তি দিয়েই ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে। শুধু ত মনোহরের নয়, বহুলোকের নির্দিষ্ট পথে চলায় নবতারার জীবনটা নির্বিঘ্ন হতো, এ আমি বুঝি, এবং যে পথটা সে নিজে বেছে নিলে সে পথটাও নিরাপদ নয়, কিন্তু নিজে বিপদের মাঝখানে ডুবে থেকে আমিই বা তাকে বিচার করবো কি দিয়ে বলুন? সুমিত্রা বলেন, এ জীবনটা নির্বিঘ্নে কাটাতে পারাটাই কি মানুষের চরম কল্যাণ? মানুষের চিন্তা এবং প্রবৃত্তিই তার কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্তু পরের নির্ধারিত চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে দিয়ে সে যখন তার নিজের স্বাধীন চিন্তার মুখ চেপে ধরে তখন তার চেয়ে বড় আত্মহত্যা মানুষের ত আর হতেই পারে না। এ কথার ত কোন জবাব আমি খুঁজে পাইনে অপূর্ববাবু।

অপূর্ব বলিল, কিন্তু সবাই যদি নিজের চিন্তার মত—

ডাক্তার বাধা দিয়া কহিলেন, অর্থাৎ সবাই যদি নিজের খেয়াল মত কাজ করতে চায়?—বলিয়াই একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, তাহলে কি কাণ্ড হয় আপনি সুমিত্রাকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন।

অপূর্ব তাহার প্রশ্নের ভুলটা বুঝিতে পারিয়া সলজ্জে সংশোধন করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সময় হইল না। ডাক্তার পুনশ্চ বাধা দিয়া কহিলেন, কিন্তু তর্ক আর চলবে না, অপূর্ববাবু, আমরা এসে পড়েচি। আর একদিন না হয় এ আলোচনার শেষ করা যাবে।

অপূর্ব সুমুখে চাহিয়া দেখিল, সেই লাল রঙের বিদ্যালয়-গৃহ, এবং তাহার দ্বিতলে ভারতীর ঘর হইতে তখনও আলো দেখা যাইতেছে।

ডাক্তার ডাকিলেন, ভারতী!

ভারতী জানালায় মুখ বাহির করিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল, বিজয়ের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে ডাক্তারবাবু? আপনাকে সে ডাকতে গিয়েছে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের প্রেসিডেন্টের আদেশ ত? কিন্তু কোন হুকুমই এত রাত্রে ও-পথে কাউকে পাঠাতে পারবে না। কিন্তু কাকে ফিরিয়ে এনেছি দেখেচ?

ভারতী ঠাওর করিয়া দেখিয়া অন্ধকারেও চিনিতে পারিল। কহিল, ভাল করেন নি। আপনি কিন্তু শীঘ্র যান, নরহরি মদ খেয়ে তার হৈমর মাথায় কুড়ুল মেরেচে,—বাঁচে কিনা সন্দেহ। সুমিত্রাদিদি সেখানেই গেছেন।

ডাক্তার কহিলেন, ভালই ত করেচে। মরে ত সে মরুক না। কিন্তু আমার অতিথি?

ভারতী বলিল, মেয়েদের প্রতি আপনার অসীম অনুগ্রহ। এটা কিন্তু হৈম না হয়ে নরহরি হলে আপনি এতক্ষণ উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তেন।

ডাক্তার কহিলেন, না হয় উর্ধ্বশ্বাসেই দৌড়চ্চি। কিন্তু অতিথি?

আমি যাচ্চি, বলিয়া ভারতী আলো হাতে পরক্ষণেই নীচে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল, কহিল, বাস্তবিক আর দেরী করবেন না ডাক্তারবাবু, যান। কিন্তু খ্রীষ্টানের আতিথ্য কি উনি স্বীকার করবেন?

ডাক্তার মনে মনে একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া কহিলেন, এঁকে ফেলে আমি যাই কি করে ভারতী? হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করনি কেন?

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, যা করতে হয় করুন গে ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি আর দেরি করবেন না। আমার অনেক অভ্যাস আছে, ওঁকে আমি সামলাতে পারবো। আপনি দয়া করে একটু শীঘ্র যান।

অপূর্ব এতক্ষণ চুপ করিয়াই ছিল। কিন্তু, তাহার জন্য একটা লোক মারা পড়িবে ইহা ত কোন মতেই হইতে পারে না। সে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু তাহার পূর্বেই ডাক্তার দ্রুতবেগে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

তের

নীচেকার ঘরের দরজা-জানলা ভারতী বন্ধ করিতে ব্যাপৃত রহিল, অপূর্ব সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া তাহার ঘরে প্রবেশ করিল, এবং ভাল-দেখিয়া একটা আরামকেদারা বাছিয়া লইয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আঃ! সে যে কতখানি শ্রান্ত হইয়াছিল তাহা উপলব্ধি করিল।

মিনিট-কয়েক পরে ভারতী উপরে আসিয়া হাতের আলোটা যখন তেপায়ার উপরে রাখিতেছে অপূর্ব তখন টের পাইল, কিন্তু সহসা তাহার এমন লজ্জা করিয়া উঠিল যে, এই ক্ষণকালের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়ার ন্যায় একটা অত্যন্ত অসম্ভব ভান করার অপেক্ষা আর কোন সঙ্গত ছলনাই তাহার মনে আসিল না। অথচ, ইহা নূতন নহে। ইতিপূর্বেও তাহারা একঘরে রাত্রিযাপন করিয়াছে, কিন্তু শরমের বাষ্পও তাহার অন্তরে উদয় হয় নাই। মনে মনে ইহারই কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার তেওয়ারীকে মনে পড়িল। সে তখন মরাণাপন্ন, তাহার জ্ঞান ছিল ন, সে যে না থাকার মধ্যেই তথাপি সেই উপলক্ষ্যটুকুকেই হেতু নির্দেশ করিতে পাইয়া অপূর্ব স্বস্তিবোধ করিল। ভারতী ঘরে ঢুকিয়া তাহার প্রতি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া যে-সকল হাতের কাজ তখন পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল করিতে লাগিল, তাহার কপট নিদ্রা ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল না, কিন্তু এই পুরাতন বাটীর সুপ্রাচীন দরজা-জানালা বন্ধ করার কাজে যে পরিমাণ শব্দ-সাড়া উত্থিত হইতে লাগিল, তাহা সত্যকার নিদ্রার পক্ষে যে একান্ত বিঘ্নকর তাহা নিজেই উপলব্ধি করিয়া অপূর্ব উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইয়া হাই তুলিয়া কহিল, উঃ—এই রাত্রে আবার ফিরে আসতে হলো!

ভারতী টানাটানি করিয়া একটা জানালা রুদ্ধ করিতেছিল, বলিল, যাবার সময় এ কথা বলে গেলেন না কেন? সরকার-মশায়কে দিয়ে আপনার খাবারটা একেবারে আনিয়ে রেখে দিতম!

কথা শুনিয়া অপূর্বর ঘুম-ভাঙ্গা গলার শব্দ একেবারে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল, কহিল, তার মানে? ফিরে আসবার কথা আমি জানতাম নাকি?

ভারতী লোহার ছিটকিনিটা চাপিয়া বন্ধ করিয়া দিয়া সহজকণ্ঠে জবাব দিল, আমারই ভুল হয়েছে। খাবার কথাটা তখনি তাঁকে বলে পাঠানো উচিত ছিল। এত রাত্তিরে আর হাঙ্গামা পোয়াতে হতো না। এতক্ষণ কোথায় দুজনে বসে কাটালেন?

অপূর্ব কহিল, তাঁকেই জিজ্ঞেসা করবেন। ক্রোশ-তিনেক পথ হাঁটার নাম বসে কাটানো কি না, আমি ঠিক জানিনে।

ভারতীর জানালা বন্ধ করার কাজ তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই, ছিটের পর্দাটা টানিয়া দিতেছিল, সেই কাজেই নিযুক্ত থাকিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, ইস্, গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন বলুন! হাঁটাই সার হল! এই বলিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিল, সন্ধ্যা-আহ্নিক করার বালাই এখনো আছে, না গেছে? থাকে ত কাপড় দিচ্চি ওগুলো সব ছেড়ে ফেলুন। এই বলিয়া সে অঞ্চলসুদ্ধ চাবির গোছা হাতে লইয়া একটা আলমারি খুলিতে খুলিতে কহিল, তেওয়ারী বেচারী ভেবে সারা হয়ে যাবে। আজ ত দেখচি আফিস থেকে একবার বাসায় যাবার সময় পাননি।

অপূর্ব রাগ চাপিয়া বলিল, অবশ্য আপনি এমন অনেক জিনিস দেখতে পান যা আমি পাইনে তা স্বীকার করচি, কিন্তু কাপড় বার করবার দরকার নেই। সন্ধ্যা-আহ্নিকের বালাই আমার যায়নি, এ জন্মে যাবেও তা মনে হয় না, কিন্তু আপনার দেওয়া কাপড়েও তাহার সুবিধে হবে না। থাক, কষ্ট করবেন না।

ভারতী কহিল, দেখুন আগে কি দিই—

অপূর্ব বলিল, আমি জানি তসর কিংবা গরদ। কিন্তু আমার প্রয়োজন নেই,—আপনি বার করবেন না।

সন্ধ্যা করবেন না?

না।

শোবেন কি পরে? আফিসের ওই কোট-পেন্টুলানসুদ্ধ নাকি?

হাঁ।

খাবেন না?

না।

সত্যি?

অপূর্বর কণ্ঠস্বরে বহুক্ষণ হইতেই তাহার সহজ সুর ছিল না, এবার সে স্পষ্টই রাগ করিয়া কহিল, আপনি কি তামাশা করচেন নাকি?

ভারতী মুখ তুলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল, বলিল, তামাশা ত আপনিই করচেন। আপনার সাধ্য আছে না খেয়ে উপোস করে থাকেন?

এই বলিয়া সে আলমারির মধ্য হইতে একখানি সুন্দর গরদের শাড়ী বাহির করিয়া কহিল, একেবারে নিভাঁজ পবিত্র। আমিও কোন দিন পরিনি। ওই ছোট ঘরটায় গিয়ে কাপড় ছেড়ে আসুন, নীচে কল আছে, আমি আলো দেখাচ্চি, হাত-মুখ ধুয়ে ওইখানেই মনে মনে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে নিন। নিরুপায়ে এ ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে,—ভয়ঙ্কর অপরাধ কিছু হবে না।

হঠাৎ তাহার গলার শব্দ ও কথা বলার ভঙ্গী এমন বদলাইয়া গেল যে অপূর্ব থতমত খাইয়া গেল। তাহার দপ করিয়া মনে পড়িল সেদিন ভোরবেলাতেও ঠিক যেন এমনি করিয়াই কথা কহিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। অপূর্ব হাত বাড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, দিন না কাপড়,—আমি নিজেই আলো নিয়ে নীচে যাচ্চি। আমি কিন্তু যার-তার হাতে ভাত খেতে পারব না তা বলে দিচ্চি।

ভারতী নরম হইয়া কহিল, সরকারমশায় যে ভাল বামুন। গরীব লোক, হোটেল করেছেন, কিন্তু অনাচারী নন। নিজে রাঁধেন, সবাই তাঁর হতে খায়,—কেউ আপত্তি করে না—আমাদের ডাক্তারবাবুর খাবার পর্যন্ত তাঁর কাছ থেকেই আসে।

তথাপি অপূর্বর কুণ্ঠা ঘুচিল না, বিরসমুখে কহিল, যা-তা খেতে আমার বড় ঘৃণা বোধ হয়।

ভারতী হাসিল, কহিল, যা-তা খেতে কি আমিই আপনাকে দিতে পারি? আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে দিয়ে সমস্ত গুছিয়ে আনবো,—তাহলে ত আর আপত্তি হবে না?—এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

অপূর্ব আর প্রতিবাদ করিল না, আলো এবং কাপড় লইয়া নীচে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া ভারতীর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সে হোটেলের অন্ন আহার করিতে অত্যন্ত সঙ্কোচ ও বিঘ্ন অনুভব করিতেছে।

কিছুক্ষণ পরে অপূর্ব যখন গরদের শাড়ী পরিয়া নীচের কাঠের বেঞ্চে বসিয়া আহ্নিকে নিযুক্ত, ভারতী দ্বার খুলিয়া একাকী অন্ধকারে বাহির হইয়া গেল, বলিয়া গেল, সরকারমশায়কে লইয়া ফিরিয়া আসিতে তাহার বিলম্ব হইবে না, ততক্ষণ সে যেন নীচেই থাকে। বস্তুতঃ ফিরিতে তাহার দেরি হইল না। সেই মাত্র অপূর্বর আহ্নিক শেষ হইয়াছে, ভারতী আলো হাতে করিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রবেশ করিল, সঙ্গে তাহার সরকারমশায়, হাতে তাঁহার খাবারের গ্লাস এবং আসন আনিয়াছে, সে ঘরের একটা কোণ ভারতীর নির্দেশমত জল ছিটাইয়া মুছিয়া লইয়া ঠাঁই করিয়া দিলে ব্রাহ্মণ অন্নপাত্র রক্ষা করিলেন। সকলে প্রস্থান করিলে ভারতী কবাট বন্ধ করিয়া দিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া যুক্তকরে সবিনয়ে নিবেদন করিল, এ ম্লেচ্ছের অন্ন নয়, সমস্ত খরচ ডাক্তারবাবুর। আপনি অসঙ্কোচে আতিথ্য স্বীকার করুন।

কিন্তু তাহার এই সকৌতুক পরিহাসটুকু অপূর্ব প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে জাতি মানে, যে-সে লোকের ছোঁয়া খায় না, হোটেলে প্রস্তুত অন্ন ভক্ষণে কিছুতেই

তাহার ক্ষতি হয় না,—কিন্তু তাই বলিয়া দামের পয়সাটা আজ ম্লেচ্ছ দিল কি অধ্যাপক ব্রাহ্মণ দিলেন এত গোঁড়ামিও তাহার ছিল না। বড়ভাইয়েরা তাহার শুদ্ধাচারিণী মাতাকে অনেক দুঃখ দিয়াছে, ভাল হউক মন্দ হউক সেই মায়ের আদেশ ও অন্তরের ইচ্ছাকে তাহার লঙ্ঘন করিতে অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হয়। এ কথা ভারতী যে একেবারে জানে না তাহাও নয়, অথচ, যখন-তখন তাহার এই আচার-নিষ্ঠাকেই লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সৃষ্টি করার চেষ্টায় মন তাহার উত্যক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কোন জবাব না দিয়া সে আসনে আসিয়া বসিল, এবং আচ্ছাদন খুলিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইল। ভারতী সাবধানে সর্বপ্রকার স্পর্শ বাঁচাইয়া দূরে ভূমিতলে বসিয়া ইহাই তদারক করিতে গিয়া মনে মনে কুণ্ঠিত ও অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ক্রীশ্চান বলিয়া হোটেলের রন্ধনশালায় প্রবেশ করিতে পারে নাই, এই গভীর রাত্রে, সকলের আহারান্তে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই যে কোনমতে সংগ্রহ করিয়া সরকারমশায় হাজির করিয়াছিলেন ভারতী তাহা ভাবিয়া দেখে নাই। ঘরে যথেষ্ট আলোক ছিল না, তথাপি আবরণ উন্মোচন করায় অন্ন-ব্যঞ্জনের যে মূর্তি প্রকাশিত হইল তাহাতে মুখে আর তাহার কথা রহিল না। অনেকদিন সে তাহাদের উপরের ঘর হইতে মেঝের ছিদ্রপথে এই লোকটির খাওয়ার ব্যাপার লুকাইয়া লক্ষ্য করিয়াছে, তেওয়ারীর ছোটখাটো সামান্য ত্রুটিতে এই খুঁতখুঁতে মানুষটির খাওয়া নষ্ট হইতে কতদিন ভারতী নিজের চোখে দেখিয়াছে, সে-ই যখন আজ নিঃশব্দ ম্লানমুখে এই কদন্ন ভোজনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কিছুতেই সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, থাক থাক, ও আর খেয়ে কাজ নেই,—এ আপনি খেতে পারবেন না।

অপূর্ব বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, খেতে পারব না? কেন?

ভারতী কেবলমাত্র মাথা নাড়িয়া জবাব দিল, না, পারবেন না।

অপূর্ব প্রতিবাদ করিয়া তেমনি মাথা নাড়িয়া কহিল, না, বেশ পারবো, এই বলিয়া সে ভাত ভাঙ্গিবার উদ্যোগ করিতেই ভারতী উঠিয়া একেবারে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল, আপনি পারলেও আমি পারব না। জোর করে খেয়ে অসুখ হলে এ বিদেশে আমাকেই ভুগে মরতে হবে। উঠুন।

অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, কি খাবো তাহলে? আজ আবার তলওয়ারকর পর্যন্ত আফিসে আসেন নি,—যা পারি এই দুটি না হয় খেয়ে নি? কি বলেন? এই বলিয়া সে এমন করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিল যে তাহার অপরিসীম ক্ষুধার কথা অপরের বুঝিতে আর লেশমাত্র বাকী রহিল না।

ভারতী ম্লানমুখে হাসিল ; কিন্তু মাথা নাড়িয়া বলিল, এ ছাই-পাঁশ আমি মরে গেলেও ত আপনাকে খেতে দিতে পারব না অপূর্ববাবু,—হাত ধুয়ে উপরে চলুন, আমি বরঞ্চ আর কোন ব্যবস্থা করচি।

অনুরোধ অথবা আদেশমত অপূর্ব শান্ত বালকের মত হাত ধুইয়া উপরে উঠিয়া আসিল। মিনিট-দশেকের মধ্যেই পুনরায় সেই সরকারমশায় এবং তাঁহার হোটেলের সহযোগীটি আসিয়া দেখা দিলেন। এবার ভাতের বদলে একজনের হাতে মুড়ির পাত্র এবং দুধের বাটি, অপরের হাতে সামান্য কিছু ফল ও জলের ঘটি ; আয়োজন দেখিয়া অপূর্ব মনে মনে খুশী হইল। এইটুকু সময়ে এতখানি সুব্যবস্থা সে কল্পনাও করে নাই। তাহারা চলিয়া গেলে অপূর্ব হৃষ্টচিত্তে আহারে মন দিল। দ্বারের বাহিরে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া ভারতী দেখিতেছিল, অপূর্ব কহিল, আপনি ঘরে এসে বসুন। কাঠের মেঝেতে দোষ ধরতে গেলে আর বর্মায় বাস করা চলে না।

ভারতী সেইখানে হইতেই সহাস্যে কহিল, বলেন কি? আপনার মত যে একবারে উদার হয়ে উঠল।

অপূর্ব কহিল, না, এতে সত্যই দোষ নেই। ডাক্তারবাবু বললেন, চলুন, ফিরে যাই—আমিও ফিরে এলাম। এখানে যে মাতালের কাণ্ডে খুনোখুনি ব্যাপার হয়ে আছে সে

কে জানতো?

জানলে কি করতেন?

জানলে? অর্থাৎ,—আমার জন্যে আপনাকে এত কষ্ট পেতে হবে জানলে আমি কখখনো ফিরে আসতে রাজী হতাম না।

ভারতী কহিল, খুব সম্ভব বটে। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম আপনি নিজেই ইচ্ছে করে ফিরে এসেছেন।

অপূর্বর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে মুখের গ্রাস গিলিয়া লইয়া সজোরে প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কখখনো না! নিশ্চয় না! কাল বরঞ্চ আপনি ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন!

ভারতী শান্তভাবে কহিল, এত জিজ্ঞাসা পড়ারই বা দরকার কি? আপনার কথাই কি আর বিশ্বাস করা যায় না!

তাহার কণ্ঠস্বরের কোমলতা সত্ত্বেও অপূর্বর গা জ্বলিয়া গেল। সে ফিরিয়া আসিতেই ভারতী যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া উত্তাপের সহিত বলিল, আমার মিথ্যে কথা বলা অভ্যাস নয়,—আপনি বিশ্বাস না করতে পারেন।

ভারতী কহিল, আমিই বা বিশ্বাস না করব কেন?

অপূর্ব বলিল, তা জানিনে। যার যেমন স্বভাব। এই বলিয়া সে মুখ নীচু করিয়া আহারে মন দিল।

ভারতী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, আপনি মিথ্যে রাগ করচেন। ডাক্তারের কথায় না এসে নিজের ইচ্ছেয় ফিরে এলেই বা দোষ কি, তাই শুধু আপনাকে আমি বলছিলাম। এই যে তখন আপনি নিজে খুঁজে খুঁজে আমার এখানে এলেন তাতেই কি কোন দোষ হয়েছে?

অপূর্ব খাবার হইতে মুখ তুলিল না, বলিল, বিকালবেলা সংবাদ নিতে আসা এবং দুপুররাত্রে বিনা কারণে ফিরে আসা ঠিক এক নয়।

ভারতী তৎক্ষণাৎ কহিল, নয়ই ত। তাইত আপনাকে জিজ্ঞেসা করছিলাম, একটু জানিয়ে গেলে ত এতখানি খাবার কষ্ট হতো না। সমস্তই ত ঠিক করে রাখা যেতে পারতো।

অপূর্ব নীরবে খাইতে লাগিল, উত্তর দিল না। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, ভারতী স্নিগ্ধ সকৌতুক দৃষ্টে তাহার প্রতি নিঃশব্দে চাহিয়া আছে। কহিল, দেখুন ত খাবার কত কষ্টই হল!

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, আজ আপনার যে কি হয়েছে জানিনে, খুব সোজা কথাও কিছুতে বুঝতে পারচেন না।

ভারতী বলিল, আর এমনও ত হতে পারে খুব সোজা নয় বলেই বুঝতে পারচি নে? বলিয়াই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

এই হাসি দেখিয়া সে নিজেও হাসিল, তাহার সন্দেহ হইল, হয়ত ভারতী এতক্ষণ তাহাকে শুধু মিথ্যা জ্বালাতন করিতেছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে পড়িল, এমনি ধারা সব ছোটখাটো ব্যাপার লইয়া এই খ্রীষ্টান মেয়েটি তাহাকে প্রথম হইতেই কেবল খোঁচা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, অথচ, ইহা বিদ্বেষ নয়, কারণ, যে-কোন বিপদের মধ্যে এতবড় নিঃসংশয় নির্ভরের স্থলও যে এই বিদেশে তাহার অন্য কোথাও নাই,—এ সত্যও ঠিক স্বতঃসিদ্ধের মতই হৃদয় তাহার চিরদিনের জন্য একেবারে স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

জলের গ্লাসটায় জল ফুরাইয়াছিল, শূন্য পাত্রটা অপূর্ব হাতে করিয়া তুলিতেই ভারতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, ঐ যাঃ—

আর জল নেই নাকি?

আছে বৈ কি! এই বলিয়া ভারতী রাগ করিয়া কহিল, অত নেশা করলে কি আর মানুষের কিছু মনে থাকে? খাবার জলের ঘটিটা শিবু নীচের টুলটার ওপর ভুলে রেখে এসেচে,—আমারও পোড়া কপাল চেয়ে দেখিনি। এখন আর ত উপায় নেই একেবারে

আঁচিয়ে উঠেই খাবেন, কি বলেন? কিন্তু রাগ করতে পাবেন না বলে রাখচি।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, এতে আর রাগ করবার কি আছে?

ভারতী আন্তরিক অনুতাপের সহিত বলিল, হয় বৈ কি। খাবার সময় তেষ্টার জল না পেলে ভারী একটা অতৃপ্তি বোধ হয়। মনে হয় যেন পেট ভরলো না। তাই বলে কিন্তু ফেলে রেখেও কিছু উঠলে চলবে না। আচ্ছা, যাবো চট করে শিবুকে ডেকে আনবো?

অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া হাসিয়া কহিল, এর জন্যে এই অন্ধকারে যাবেন ডেকে আনতে? আমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই মনে করেন?

তাহার খাওয়া শেষ হইয়াছিল, তথাপি সে জোর করিয়া আরও দুই-চারি গ্রাস মুখে পুরিয়া অবশেষে যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার নিজেরই কেমন যেন ভারী লজ্জা করিতে লাগিল। কহিল, বাস্তবিক বলচি আপনাকে, আমার কিছুমাত্র অসুবিধে হয়নি। আমি আঁচিয়ে উঠেই জল খাবো—আপনি মিথ্যে দুঃখ করবেন না।

ভারতী হাসিয়া জবাব দিল, দুঃখ করতে যাবো? কখখনো না। আমি জানি দুঃখ করবার আমার কিচ্ছু নেই। এই বলিয়া সে আলোটা তুলিয়া ধরিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল, আমি আলো দেখাচ্চি, যান আপনি নীচে থেকে মুখ ধুয়ে আসুন। জলের ঘটিটা সুমুখেই আছে,—যেন ভুলে আসবেন না।

অপূর্ব নীচে চলিয়া গেল। খানিক পরে মুখ-হাত ধুইয়া উপরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ভুক্তাবশেষ সরাইয়া উচ্ছিষ্ট স্থানটা ভারতী ইতিমধ্যেই পরিষ্কার করিয়াছে ; দুই-একটা চৌকি প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিয়া তাহার খাবার জায়গা করা হইয়াছিল, সেগুলা যথাস্থানে আনা হইয়াছে, এবং যে ইজিচেয়ারটায় সে ইতিপূর্বে বসিয়াছিল তাহারই এক পাশে ছোট টিপায়ার উপরে রেকাবিতে করিয়া সুপারি এলাচ প্রভৃতি মশলা রাখা হইয়াছে। ভারতীর হাত হইতে তোয়ালে লইয়া মুখ-হাত মুছিয়া মশলা মুখে দিয়া সে আরামকেদারায় বসিয়া পড়িল, এবং হেলানদিয়া তৃপ্তির গভীর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, আঃ—এতক্ষণে দেহে যেন প্রাণ এল। কি ভয়ঙ্কর ক্ষিদেই না পেয়েছিল!

তাহার চোখের সুমুখ হইতে আলোটা সরাইয়া ভারতী একপাশে রাখিতেছিল, সেই আলোতে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া বলিল, আপনার খুব সর্দি হয়েছে দেখছি যে!

ভারতী বাতিটা তাড়াতাড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল, কৈ, না।

না কেন! গলা ভারী, চোখ ফুলো-ফুলো, দিব্যি ঠাণ্ডা লেগেচে! এতক্ষণ খেয়ালই করিনি।

ভারতী জবাব দিল না। অপূর্ব কহিল, ঠাণ্ডা লাগার অপরাধ কি! এই রাত্তিরে যা ছুটোছুটি করতে হল!

ভারতী ইহারও উত্তর দিল না। অপূর্ব ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, ফিরে এসে নিরর্থক আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু কে জানতো বলুন, ডাক্তারবাবু ডেকে এনে শেষে আপনাকে বোঝা টানতে দিয়ে নিজে সরে পড়বেন! ভুগতে হল আপনাকে।

ভারতী জানালার কাছে পিছন ফিরিয়া কি একটা করিতেছিল, কহিল, তা ত হলই। কিন্তু ভগবান বোঝা টানতে দিলে আর নালিশ করতে যাবো কার বিরুদ্ধে বলুন?

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া কহিল, তার মানে?

ভারতী তেমনি কাজ করিতেই করিতেই বলিল, মানে কি ছাই আমিই জানি? কিন্তু দেখচি ত, বর্মায় আপনি পা দেওয়া পর্যন্ত বোঝা টেনে বেড়াচ্চি শুধু আমিই। বাবার সঙ্গে করলেন ঝগড়া, দণ্ড দিলাম আমি। ঘর পাহারা দিতে রেখে গেলেন তেওয়ারীকে, তার সেবা করে মলুম আমি। ডেকে আনলেন ডাক্তারবাবু, হাঙ্গামা পোহাতে হচ্চে আমাকে। ভয় হয়, সারা জীবনটা না শেষে আমাকেই আপনার বোঝা বয়ে কাটাতে হয়। কিন্তু রাত ত আর নেই, শোবেন কোথায় বলুন ত?

অপূর্ব বিস্মিত হইয়া বলিল, বাঃ, আমি তার জানি কি?

ভারতী কহিল, হোটেলে ডাক্তারবাবুর ঘরে আপনার বিছানা করতে বলে এসেচি, ব্যবস্থা বোধ হয় হয়েছে।

কে নিয়ে যাবে? আমি ত চিনিনে।

আমি নিয়ে যাচ্চি, চলুন, ডাকাডাকি করে তাদের তুলি গে।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। একটু সঙ্কোচের সহিত কহিল, কিন্তু আপনার বালিশ এবং বিছানার চাদরটা আমি নিয়ে যাবো। অন্ততঃ এ দুটো আমার চাই-ই, পরের বিছানায় আমি মরে গেলেও শুতে পারবো না। এই বলিয়া সে শয্যা হইতে তুলিতে যাইতেছিল, ভারতী বাধা দিল। এতক্ষণে তাহার মলিন গম্ভীর মুখ স্নিগ্ধ কোমল হাস্যে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু সে তাহা গোপন করিতে মুখ ফিরাইয়া আস্তে আস্তে বলিল, এও ত পরের বিছানা অপূর্ব বাবু, ঘৃণা বোধ না হওয়াই ত ভারী আশ্চর্য। কিন্তু তাই যদি হয়, আপনার হোটেলে শুতে যাবার প্রয়োজন কি, আপনি এই খাটেতেই শোন। এ কথাটা সে ইচ্ছা করিয়াই বলিল না যে, মাত্র ঘণ্টা-কয়েক পূর্বেই তাহার দেওয়া অশুচি বস্ত্রে ভগবানের উপাসনা করিতেও ঘৃণা বোধ হইয়াছিল।

অপূর্ব অধিকতর সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল, বলিল, কিন্তু আপনি কোথায় শোবেন? আপনার ত কষ্ট হবে!

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, একটুও না। আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই ছোট ঘরটায় যাহোক একটা কিছু পেতে নিয়ে আমি স্বচ্ছন্দে শুতে পারবো। শুধু কাঠের মেঝের উপরে হাতে মাথা রেখে তেওয়ারীর পাশে কত রাত্রি কাটাতে হয়েছে সে ত আপনি দেখতে পাননি?

অপূর্ব একমাস পূর্বের কথা স্মরণ করিয়া বলিল, একটা রাত্রি আমিও দেখতে পেয়েছি, একেবারে পাইনি তা নয়।

ভারতী হাসিমুখে বলিল, সে কথা আপনার মনে আছে? বেশ, তেমনি ধারাই না হয় আর একটা রাত্রি দেখতে পাবেন।

অপূর্ব ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া বলিল, তেওয়ারীর তখন ভয়ানক অসুখ,—কিন্তু এখন লোকে কি মনে করবে?

ভারতী জবাব দিল, কিছুই মনে করবে না। কারণ পরের কথা নিয়ে নিরর্থক মনে করবার মত ছোট মন এখানে কারও নেই।

অপূর্ব কহিল, নীচের বেঞ্চে বিছানা করেও ত আমি অনায়াসে শুতে পারি?

ভারতী বলিল, আপনি পারলেও আমি তা দেব না। কারণ, তার দরকার নেই। আমি আপনার অস্পৃশ্য, আপনার দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হতে পারে এ ভয় আমার নেই।

অপূর্ব আবেগের সহিত কহিল, আমার দ্বারা কখনো আপনার লেশমাত্র অনিষ্ট হতে পারে এ ভয় আমারও নেই। কিন্তু আপনাকে অস্পৃশ্য বললে আমার সবচেয়ে বেশী দুঃখ হয়। অস্পৃশ্য কথার মধ্যে ঘৃণার ভাব আছে, কিন্তু আপনাকে ত আমি ঘৃণা করিনে। আমাদের জাত আলাদা, আপনার ছোঁয়া আমি খেতে পারিনে, কিন্তু তার হেতু কি ঘৃণা? এত বড় মিছে কথা আর হতেই পারে না। বরঞ্চ, এর জন্যে আপনিই আমাকে মনে মনে ঘৃণা করেন। সেদিন ভোরবেলায় যখন আমাকে অকূল সমুদ্রে ফেলে রেখে চলে আসেন, তখনকার মুখের চেহারা আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, সে আমি জীবনে ভুলব না।

ভারতী বলিল, আমার আর যাই কেন না ভুলুন, সে অপরাধ ভুলবেন না!

কখনও না।

সে মুখে আমার কি ছিল? ঘৃণা?

নিশ্চয়।

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া হাসিল, তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, অর্থাৎ মানুষের মন বোঝবার বুদ্ধি আপনার ভয়ানক সূক্ষ্ম,—আছে কি নেই! কিন্তু, আর কাজ নেই আপনি

শোন। আমার রাত-জাগার অভ্যাস আছে, কিন্তু আপনি আর বেশী জেগে থাকলে আমারই হয়ত বিপদের অবধি থাকবে না। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের আর অবকাশ না দিয়ে র‍্যাকের উপর হইতে গোটা-দুই কম্বল পাড়িয়া লইয়া পাশের ছোট ঘরের ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অনতিকাল পরে ফিরিয়া আসিয়া মশারি ফেলিয়া চারিদিক ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিয়া ভারতী চলয়িা গেল, কিন্তু অপূর্বর নিমীলিত চোখের কোণে ঘুমের ছায়াপাতটুকুও হইল না। ঘরের এক কোণে আড়াল-করা আলোটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, বাহিরে গভীর অন্ধকার, রাত্রি, স্তব্ধ হইয়া আছে,—হয়ত, সে ছাড়া কোথাও কেহ জাগিয়া নাই, কখন যে ঘুম আসিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই, তবুও এই জাগরণের মধ্যে নিদ্রাবিহীনতার বিন্দু মাত্র অস্বস্তিও সে অনুভব করিল না। তাহার সকল দেহমন যেন বর্ণে বর্ণে উপলব্ধি করিতে লাগিল, এই ঘরে, এই শয্যায় এই নীরব নিশীথে ঠিক এমনি চুপ করিয়া শুইয়া থাকার মত সুন্দর বস্তু আর ত্রিভুবনে নাই। এমন একান্ত ভাবনাহীন নিশ্চিন্ত বিশ্রামের আনন্দ সে যেন আর কখনও পায় নাই,—তাহার এমনি মনে হইতে লাগিল।

সকালবেলায় তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ভারতীর ডাকে। চোখ মেলিয়াই দেখিল সম্মুখে তাহার পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া এই মেয়েটি, পুবের জানালা দিয়া প্রভাত-সূর্যের রাঙ্গা আলো তাহার সদ্যোস্নাত ভিজা চুলের উপরে, তাহার পরনের সাদা গরদের রাঙ্গা পাড়টুকুর উপরে, তাহার সুন্দর মুখখানির স্নিগ্ধ শ্যাম রঙের উপরে একেবারে যেন অপরূপ হইয়া অপূর্বর চোখে ঠেকিল।

ভারতী কহিল, উঠুন, আবার আফিসে যেতে হবে ত!

তা ত হবে, বলিয়া অপূর্ব শয্যাত্যাগ করিল। আপনার ত দেখচি স্নান পর্যন্ত সারা হয়ে গেছে।

ভারতী কহিল, আপনাকেও সমস্ত তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। কাল অতিথি-সৎকারে যথেষ্ট ত্রুটি হয়েছে, আজ আমাদের প্রেসিডেন্টের আদেশ, আপনাকে ভাল করে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়া হবে না।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, কালকের সেই মেয়েটি বেঁচেছে?

তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে,—বাঁচবে বলেই আশা।

মেয়েটিকে অপূর্ব চোখেও দেখে নাই, তথাপি তাহারই সুখবরে মন যেন তাহার পরম লাভ বলিয়া গণ্য করিল। আজ কাহারও কোন অকল্যাণ সে যেন সহিতেই পারিবে না তাহার এমনি জ্ঞান হইল।

সে স্নান-আহ্নিক সরিয়া কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন উপরে আসিল তখন বেলা প্রায় নয়টা। ইতিমধ্যে ঠাঁই করিয়া সরকারমশায় খাবার রাখিয়া গেছেন, অপূর্ব আসনে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কৈ, আপনাদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ত দেখা হল না! তাঁর অতিথি সৎকারের বুঝি এই রীতি?

ভারতী বলিল, আপনার যাবার আগে দেখা হবে বৈ কি। তাঁর আপনার সঙ্গে বোধ করি একটু কাজও আছে।

অপূর্ব কহিল, আর ডাক্তারবাবু? যিনি আমাকে ডেকে এনেছেন? এখনো বোধ হয় তিনি বিছানাতেই পড়ে? এই বলিয়া হাসিল।

ভারতী এ হাসিতে যোগ দিল না, কহিল, বিছানায় পড়বার তাঁর সময়ই হয়নি। এই ত হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেন। শোওয়া না-শোওয়া কোনটার কোন মূল্যই তাঁর কাছে নেই।

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, এতে তাঁর অসুখ করে না।?

ভারতী বলিল, কখনো দেখিনে ত। সুখ অসুখ দুই-ই বোধ হয় তাঁর কাছে হার মেনে পালিয়েছে। মানুষের সঙ্গেই তাঁর তুলনা হয় না।

অপূর্বর কাল রাত্রের অনেক কথাই স্মরণ হইল, মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, আপনারা সকলেই বোধ হয় তাঁকে অতিশয় ভক্তি করেন?

ভক্তি করি? ভক্তি ত অনেকেই অনেককে করে। বলিতে বলিতেই তাহার কণ্ঠস্বর অকস্মাৎ গাঢ় হইয়া উঠিল, কহিল, তিনি চলে গেলে মনে হয় পথের ধূলোয় পড়ে থাকি, তিনি বুকের উপর দিয়ে হেঁটে যান। মনে হয়, তবুও আশ মেটে না অপূর্ববাবু। বলিয়াই সে মুখ ফিরাইয়া চট করিয়া চোখের কোণ-দুটা মুছিয়া ফেলিল।

অপূর্ব আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, নতমুখে নিঃশব্দে আহার করিতে লাগিল। তাহার এই কথাটাই বার বার মনে হইতে লাগিল, সুমিত্রা ও ভারতীর মত এতবড় শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী নারী-হৃদয়ে যে মানুষ এতখানি উচ্চে সিংহাসন গড়িয়াছে, জানি না ভগবান তাহাকে কোন্ ধাতু দিয়া তৈরি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়েছেন! কোন্ অসাধারণ কার্য তাহাকে দিয়া তিনি সম্পন্ন করাইয়া লইবেন!

দূরে দরজার কাছে ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, অপূর্ব নিজেও বিশেষ কোন কথা কহিল না, অতঃপর খাওয়াটা তাহার একপ্রকার নিঃশব্দেই সমাধা হইল। অপ্রীতিকর কোন কিছুই ঘটে নাই, তথাপি যে প্রভাতটা আজ তাহার বড় মিষ্ট হইয়া শুরু হইয়াছিল, অকারণে কোথা হইতে যেন তাহার উপরে একটা ছায়া আসিয়া পড়িল।

আফিসের কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে কহিল, চলুন, ডাক্তারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে যাই।

চলুন, তিনি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

সরকার-মহাশয়ের জরাজীর্ণ হোটেল-বাড়ির একটা অত্যন্ত ভিতরের দিকের ঘরে ডাক্তারবাবুর বাসা। আলো নাই, বাতাস নাই, আশেপাশে নোংরা জল জমিয়া একটা দুর্গন্ধ উঠিতেছে, অতিশয় পুরাতন তক্তার মেঝে, পা দিতে ভয় হয় পাছে সমস্ত ভাঙ্গিয়া পড়ে, এমনি একটা কদর্য বিশ্রী ঘরে ভারতী যখন তাহাকে পথ দেখাইয়া আনিল তখন বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। ঘরে ঢুকিয়া অপূর্ব ক্ষণকাল ত ভাল দেখিতেই পাইল না।

ডাক্তারবাবু অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আসুন অপূর্ববাবু।

উঃ—কি ভীষণ ঘরই আপনি আবিষ্কার করেছেন ডাক্তারবাবু!

কিন্তু কি রকম সস্তা বলুন ত! মাসে দশ আনা ভাড়া।

অপূর্ব কহিল, বেশি, বেশি, ঢের বেশি। দশ পয়সা হওয়া উচিত।

ডাক্তার কহিলেন, আমার দুঃখী লোকেরা সব কিরকম থাকি আপনাদের চোখে দেখা উচিত। অনেকের কাছে এই আবার রাজপ্রাসাদ।

অপূর্ব কহিল, তা হলে প্রাসাদ থেকে ভগবান যেন আমাকে চিরদিন বঞ্চিত রাখেন! বাপ রে বাপ!

ডাক্তার বলিলেন, শুনলাম, কাল রাত্রে আপনার বড় কষ্ট হয়েছে অপূর্ববাবু আমাকে ক্ষমা করতে হবে।

অপূর্ব কহিল, ক্ষমা করব শুধু আপনি এ ঘর ছাড়লে। তার আগে নয়।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, বলিলেন, আচ্ছা, তাই হবে।

এতক্ষণ অপূর্ব নজর করে নাই হঠাৎ ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া দেখিতে পাইল, দেওয়ালের কাছে একটা মোড়ার উপরে বসিয়া সুমিত্রা। আপনি এখানে? আমাকে মাপ করবেন, আমি একেবারে দেখতে পাইনি।

সুমিত্রা কহিলেন, সে অপরাধ আপনার নয় অপূর্ববাবু, অন্ধকারের।

অপূর্বর বিস্ময়ের সীমা রহিল না তাঁহার গলা শুনিয়া। সে কণ্ঠস্বর যেমন করুণ, তেমনি বিষণ্ণ। কি একটা ঘটিয়াছে বলিয়া যেন তাহার ভয় করিতে লাগিল। ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া আস্তে আস্তে কহিল, ডাক্তারবাবু, এ আপনার আজ কি রকম পোশাক? কোথাও কি বার হচ্ছেন?

ডাক্তারের মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কোট, পরনে ঢিলা পায়জামা, পায়ে রাওলপিণ্ডির নাগ্‌রা, একটা চামড়ার ব্যাগে কি-কতকগুলা বাণ্ডিল বাঁধা। কহিলেন, আমি ত এখন চলতি অপূর্ববাবু, এঁরা সব রইলেন, আপনাকে দেখতে হবে। আপনাকে এর বেশী বলার আমি আবশ্যক মনে করিনে।

অপূর্ব অবাক হইয়া কহিল, হঠাৎ চলতি কি রকম? কোথায় চলতি?

এই ডাক্তার লোকটির কণ্ঠস্বরে ত কোন পরিবর্তন হয় না, তেমনি সহজ, শান্ত, স্বাভাবিক গলায় বলিলেন, আমাদের অভিধানে কি 'হঠাৎ' শব্দ থাকে অপূর্ববাবু? চলতি সম্প্রতি ভামোর পথে আরও কিছু উত্তরে। কিছু সাঁচ্চা জরির মাল আছে, সিপাইদের কাছে বেশ দামে বিক্রি হয়। এই বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

সুমিত্রা এতক্ষণ কথা কহে নাই, সহসা বলিয়া উঠিল, তাদের পেশোয়ার থেকে একেবারে ভামোয় সরিয়ে এনেচে, তুমি জানো তাদের ওপর এখন কিরকম কড়া নজর। তোমাকেও অনেকে চেনে, কখখনো ভেবো না সকলের চোখেই তুমি ধূলো দিতে পারবে। এখন কিছুদিন কি না গেলেই নয়? শেষের দিকে তাহার গলাটা যেন অদ্ভুত শুনাইল।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, তুমি ত জানো, না গেলেই নয়।

সুমিত্রা আর কথা কহিলেন না, কিন্তু অপূর্ব ব্যাপারটা একেবারে চক্ষের পলকে বুঝিতে পারিল। তাহার চোখ ও দুই কান গরম হইয়া সর্বাঙ্গ দিয়া যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কোনমতে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, ধরুন যদি তারা কেউ চিনতেই পারে? যদি ধরে ফেলে?

ডাক্তার কহিলেন, ধরে ফেললে বোধ হয় ফাঁসিই দেবে। কিন্তু দশটার ট্রেনের আর ত সময় নেই অপূর্ববাবু, আমি চললাম। এই বলিয়া তিনি স্ট্র্যাপে-বাঁধা মস্ত বোঝাটা অবলীলাক্রমে পিঠে ফেলিয়া চামড়ার ব্যাগটা হাতে তুলিয়া লইলেন।

ভারতী একটি কথাও কহে নাই, একটি কথাও কহিল না, শুধু পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল। সুমিত্রাও প্রণাম করিল, কিন্তু সে পায়ের কাছে নয়, একেবারে পায়ের উপরে। হঠাৎ মনে হইল সে বুঝি আর উঠিবে না, এমনি করিয়া পড়িয়াই থাকিবে—বোধ হয় মিনিট খানেক হইবে,—যখন সে নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন স্বল্পালোকিত সেই ক্ষুদ্র ঘরের মধ্যে তাহার আনত মুখের চেহারা দেখিতে পাওয়া গেল না।

ডাক্তার ঘরের বাহিরে আসিয়া অপূর্বর হাতখানি গতরাত্রির মত মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিলেন, চললাম অপূর্ববাবু,—আমি সব্যসাচী।

অপূর্বর মুখের ভিতরটা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, তাহার গলা দিয়া স্বর ফুটিল না, কিন্তু সে চক্ষের পলকে হাঁটু পাতিয়া তাঁহার পায়ের কাছে মেয়েদের মতই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। ডাক্তার মাথায় তাহার হাত দিলেন, আর একটা হাত ভারতীর মাথায় দিয়া অস্ফুটে কি বলিলেন শোনা গেল না, তাহার পরে একটু দ্রুতপদেই বাহির হইয়া গেলেন।

অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, ভারতীর পাশে সে একাকী দাঁড়াইয়া আছে, পিছনে সেই ভাঙ্গা ঘরের রুদ্ধদ্বারের অন্তরালে কর্তব্যকঠিন, অশেষ বুদ্ধিশালিনী, পথের-দাবীর ভয়লেশহীনা তেজস্বনী সভানেত্রী কি যে করিতে লাগিলেন তাহার কিছুই জানা গেল না।

চোদ্দ

ভারতী ও অপূর্ব দু'জনেই পিছনের বন্ধ দরজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, কিন্তু কেহই কোন কথা কহিল না। অপূর্ব কিছুই না বুঝিয়াও এটুকু বুঝিল যে, এমন করিয়া যে লোক নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী করিয়া রাখিল তাহার সম্বন্ধে কৌতূহলী হইতে নাই। উভয়ে নীরবে হোটেলের বাহিরে আসিতে ভারতী কহিল, চলুন অপূর্ববাবু, আমরা ঘরে যাই—

কিন্তু, আমার যে আবার আফিসের বেলা—

রবিবারেও আফিস?

রবিবার? তাই ত বটে! অপূর্ব খুশী হইয়া বলিল, এ কথা সকালে মনে হলে নাওয়া-খাওয়ার জন্যে আর ব্যস্ত হতে হতো না। আপনার এত জিনিস মনে থাকে, কিন্তু এটুকু

ভুলে গিয়েছিলেন।

ভারতী একটু হাসিয়া বলিল, তা হবে। কিন্তু, কাল রাত্রে আপনার না-খাওয়ার কথাটা ভুলিনি।

অপূর্ব হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আমার দেরি করবার জো নেই, তেওয়ারী-বেচারা হয়ত ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে।

ভারতী বলিল, যাচ্ছে না। তার কারণ, আপনি জাগবার পূর্বেই সে খবর পেয়েছে আপনি কুশলে আছেন।

সে জানে আমি আপনার কাছে আছি?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, জানে। ভোরবেলাতেই আমি লোক পাঠিয়ে দিয়েছে।

এই সংবাদ শুনিয়া অপূর্ব শুধু নিশ্চিন্ত নয় তাহার মনের উপর হইতে একটা সত্যকার বোঝা নামিয়া গেল। কাল রাত্রে ফিরিবার পথে, ফিরিয়া আসিয়া খাওয়া শোয়া সকল কাজে সকল কথার মধ্যে এই ভাবনাই বহুবার তাহাকে ধাক্কা মারিয়া গেছে, কি জানি, কাল সকালে তেওয়ারী ব্যাটা তাহার কথা বিশ্বাস করিবে কি না। এই বর্মাদেশের কতপ্রকার জনশ্রুতিই না প্রচলিত আছে,—হয়ত বাড়িতে মায়ের কাছে কি একটা লিখিয়া দিবে, না হয় ত, ফিরিয়া গিয়া গল্প করিবে,—পাকা কালির মত, কালি গেলেও যাহার দাগ মুছিবে না—এই তুচ্ছ বস্তুটাই ছোট্ট কাঁটার মত তাহার পায়ে প্রতি পদক্ষেপেই খচখচ করিতেছিল। এতক্ষণ পরে সে যেন নির্ভয়ে পা ফেলিয়া বাঁচিল। তেওয়ারী আর যাহাই করুক, ভারতীর মুখের কথা সে মরিয়া গেলেও অবিশ্বাস করিবে না। যে ছাড়পত্র ভারতী লিখিয়া দিয়াছে, তাহার চেয়ে নিষ্কলঙ্কতার বড় দলিল তেওয়ারীর কাছে আর নাই, অপূর্ব তাহা ভালই করিয়াই জানিত।

পুলকিতচিত্তে কহিল, আপনার সকল দিকে চোখ আছে। বাড়িতে বৌদিদিদেরও দেখেচি, অন্য-সব মেয়েদেরও দেখেচি, আমার মাকেও দেখেচি, কিন্তু এমন সর্বদিকে দৃষ্টি আমি কাউকে দেখিনি। বাস্তবিক বলচি, আপনি যে বাড়ির গৃহিণী হবেন সে বাড়ির লোকেরা চোখ বুজে দিন কাটিয়ে দেবে, কখনো কাউকে দুঃখ পেতে হবে না।

ভারতীর মুখের উপর দিয়া যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। অপূর্ব ইহার কিছুই দেখিল না, সে পিছনে আসিতেছিল, পিছনে হইতেই পুনরায় কহিল, এই বিদেশে আপনি না থাকলে আমার কি হতো বলুন ত! সমস্ত চুরি যেত, তেওয়ারী হয়ত ঘরেই মরে থাকতো,—বামুনের ছেলেকে মেথর-মুদ্দাফরাসে টানা-হেঁচড়া করত।—এই ভয়ানক সম্ভাবনায় তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া গেল। একটু থামিয়া কহিল, আমিই কি আর থাকতে পারতাম? চাকরি ছেড়ে দিয়ে হয়ত চলে যেতে হতো, তারপরে আবার যা-কে-তাই। সেই বউদিদিদের গঞ্জনা আর মায়ের চোখের জল। আপনিই ত সব। সমস্ত বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

ভারতী বলিল, অথচ, এসেই আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন।

অপূর্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সমস্ত ওই তেওয়ারী ব্যাটার দোষ। কিন্তু, মা এ-সব শুনলে আপনাকে যে কত আশীর্বাদ করবেন তা আপনি জানেন না।

ভারতী কহিল, কেমন করে জানবো? মা এলেই ত তবে তাঁর মুখ থেকে শুনতে পাবো!

অপূর্ব আশ্চর্য হইয়া বলিল, মা আসবেন বর্মায়? আপনি বলেন কি?

ভারতী জোর দিয়া কহিল, কেন আসবেন না,—কত লোকেরই ত মা নিত্য আসচেন! এখানে এলেই কি কারও জাত যেতে পারে নাকি?

অপূর্ব ঘরে ঢুকিয়া সেই আরামচৌকিটাতেই পুনরায় আসিয়া বসিল। পাশের জানালা দিয়া তাহার মুখে রোদ লাগিতেই ভারতী হাত বাড়াইয়া বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, বৌদিদিরা মাকে তেমন যত্ন করেন না, এবং আপনাকে চিরকাল যদি বিদেশে চাকরি করেই কাটাতে হয়, এ বয়সে তাঁর সেবা কে করবে বলুন ত?

অপূর্ব কহিল, মা বলেন ছোটবৌ এসে তাঁর সেবা করবে।

ভারতী বলিল, আর সে যদি সেবা না করে? আপনি থাকবেন বিদেশে, বড়জায়েদের

দেখে সে যদি তাঁদের মতই হয়ে দাঁড়ায়, মাকে যত্ন না করে কষ্ট দিতেই শুরু করে, কি করবেন বলুন ত?

অপূর্ব ভীত হইয়া কহিল, সে-রকম কখখনো হবে না। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশ থেকে এসে কিছুতেই মাকে দুঃখ দিতে পারবে না, আপনাকে আমি নিশ্চয় বলচি।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের বংশ? এই বলিয়া ভারতী মুচকিয়া শুধু একটু হাসিয়া কহিল, এখন থাক, যদি প্রয়োজন হয় ত সে গল্প আপনার কাছে অন্য একদিন করব। ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, কেবলমাত্র মায়ের সেবা করবার জন্যই যাকে বিবাহ করে আপনি ফেলে আসবেন, তাতে কি তার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হবে না?

অপূর্ব তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া স্বীকার করিয়া বলিল, তা হবে।

ভারতী কহিল, এবং সেই অবিচারের বদলে তার কাছ থেকে নিজে সুবিচার দাবী করবেন?

অপূর্ব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিল, কিন্তু এ ছাড়া আমার উপায় কি ভারতী?

ভারতী কহিল, উপায় না থাকতে পারে, কিন্তু এ অসম্ভব আপনি অতি-বড় নিষ্ঠাবানের ঘর থেকেও প্রত্যাশা করবেন না। এর ফল কখনো ভাল হবে না। আপনার নিষ্ঠুরতার বদলে যতই সে নিজের কর্তব্য পালন করবে, ততই তার কাছে আপনি ছোট হয়ে যাবেন। স্ত্রীর কাছে অশ্রদ্ধেয়, হীন হওয়ার চেয়ে বড় দুর্ভোগ সংসারে আর নেই অপূর্ববাবু!

কথাটা এতবড় সত্য যে অপূর্ব নিরুত্তর হইয়া রহিল, শাস্ত্রমতে স্ত্রী কর্তব্য কি, পতিব্রতা কাহাকে বলে, নিঃস্বার্থ শাশুড়ী-সেবার কতখানি মাহাত্ম্য, স্বামীর ইচ্ছামাত্র পালন করায় কিরূপ পুণ্য ইত্যাদি নানাবিধ উপাখ্যান বন্ধুমহলে আধুনিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করিবার কালে সে শাস্ত্রগ্রন্থাদি হইতে নজিরস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের স্তব্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু এই খ্রীষ্টান মেয়েটির সম্মুখে তাহার আভাসমাত্রও উচ্চারণ করিতে তাহার মুখ ফুটিল না। খানিক পরে সে কতকটা যেন আপনাকে আপনি বলিল, বাস্তবিক, আজকালকার দিনে এ রকম মেয়ে বোধ হয় কেউ নেই।

ভারতী হাসিল, কহিল, একেবারে কেউ নেই তা কেমন করে বলবেন? নিষ্ঠাবানের ঘরে না থাকলেও হয়ত, আর কোথাও কেউ থাকতে পারে যে আপনার জন্যে নিজেকে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিতে পারে, কিন্তু তাকে আপনারা খুঁজে পাবেন কোথায়?

অপূর্ব নিজের চিন্তাতেই ছিল, ভারতীর কথায় মন দেয় নাই, কহিল, সে ত বটেই। ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কবে বাড়ি যাবেন?

অপূর্ব অন্যমনস্কের মতই জবাব দিল, কি জানি, মা কবে চিঠি লিখে পাঠাবেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিতে লাগিল, বাবার সঙ্গে মতের অমিল নিয়ে মা আমার কোনদিন জীবনে সুখ ভোগ করেন নি। সেই মাকে একলা ফেলে রেখে আসতে আমার কিছুতে মন সরে না। কি জানি, এবারে গেলে আর ফিরে আসতে পারবো কি না। হঠাৎ ভারতীর মুখের প্রতি দৃষ্টি স্থির করিয়া কহিল, দেখুন, বাইরে থেকে দেখতে আমাদের সাংসারিক অবস্থা যতই সচ্ছল হোক ভিতরে কিন্তু বড় অনটন! শহরে অধিকাংশ গৃহস্থেরই এমনি দশা! বৌদিদিরা যে-কোন দিন আমাদের পৃথক করে দিতে পরেন। আমি ফিরে যদি না আসতে পারি ত আমাদের কষ্টের হয়ত সীমা থাকবে না।

ভারতী বলিল, আপনাকে আসতেই হবে।

মায়ের কাছে থেকে চিরদিন আলাদা হয়ে থাকবো?

তাঁকে রাজী করে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আমি নিশ্চয় জানি, তিনি আসবেন।

অপূর্ব হাসিয়া কহিল, কখখনো না। মাকে আপনি জানেন না। আচ্ছা, ধরুন যদি তিনি আসেন, তাঁকে দেখবে কে এখানে?

ভারতীও হাসিয়া কহিল, আমি দেখবো।

আপনি? আপনি ঘরে ঢুকলেই ত মা হাঁড়ি ফেলে দেবেন।

ভারতী জবাব দিল, কতবার দেবেন? আমি রোজ রোজ ঘরে ঢুকবো। দু'জনেই হাসিয়া উঠিল। ভারতী সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, আপনি নিজেও ত ওই হাঁড়ি-ফেলার দলে, কিন্তু হাঁড়ি ফেলে দিলেই যদি সব ল্যাঠা চুকে যেতো, পৃথিবীর সমস্যা তাহলে খুব সোজা হয়ে উঠতো। বিশ্বাস না হয় তেওয়ারীকে জিজ্ঞাসা করে দেখবেন।

অপূর্ব স্বীকার করিয়া কহিল, তা সত্যি। সে বেচারা হাঁড়ি ফেলবে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখ দিয়ে তার জলও পড়বে। আপনাকে সে এত ভক্তি করে যে, একটু জপালে হয়ত সে ক্রীশ্চান হতেও রাজী হয়ে পড়ে, বলা যায় না।

ভারতী কহিল, সংসারে কিছুই বলা যায় না। চাকরের কথাও না, মনিবের কথাও না। এই বলিয়া সে হাসি গোপন করিতে যখন মুখ নীচু করিল, তখন অপূর্বর নিজের মুখখানা একেবারে আরক্ত হইয়া উঠিল, কহিল সংসারে এটুকু কিন্তু স্বচ্ছন্দে বলা যেতে পারে যে চাকর ও মনিবের বুদ্ধির তারতম্য থাকতে পারে।

ভারতী মুখ তুলিয়া কহিল, আছেই ত। সেইজন্য তার রাজী হতে দেরি হতে পারে, কিন্তু আপনার হবে না। তাহার চোখের দৃষ্টি চাপা-হাসির বেগে একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, অপূর্ব পরিহাস বুঝিতে পারিয়া খুশী হইয়া কহিল, আচ্ছা তামাশা নয়, বাস্তবিক বলচি, আমি ধর্ম ত্যাগ করতে পারি এ আপনি ভাবতে পারেন?

ভারতী কহিল, পারি।

সত্যি পারেন?

সত্যিই পারি।

অপূর্ব কহিল, অথচ, সত্যিই আমি প্রাণ গেলেও পারিনে।

ভারতী বলিল, প্রাণ যাওয়া যে কি জিনিস সে ত আপনি জানেন না। তেওয়ারী জানে। কিন্তু, এ নিয়ে তর্ক করে আর কি হবে, আপনার মত অন্ধকারের মানুষকে আলোতে আনার চেয়ে ঢের বেশী জরুরী কাজ আমার এখনো বাকী। আপনি বরঞ্চ একটু ঘুমোন।

অপূর্ব বলিল, দিনের বেলায় আমি ঘুমুই নে। কিন্তু জরুরী কাজটা আবার আপনার কি?

ভারতী কহিল, আপনার বেগার খেটে বেড়ানোই আমার একমাত্র জরুরী কাজ নাকি? আমাকেও দুটি রেঁধে খেতে হয়। ঘুমুতে না পারেন আমার সঙ্গে নীচে চলুন। আমি কি কি রাঁধি, কেমন করে রাঁধি দেখবেন। হাতে যখন একদিন খেতেই হবে তখন একেবারে অনভিজ্ঞ থাকা ভাল নয়। এই বলিয়া সে সহসা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অপূর্ব কহিল, আমি মরে গেলেও আপনার হাতে খাবো না।

ভারতী বলিল, আমি বেঁচে থেকে খাবার কথাই বলচি। এই বলিয়া সে হাসিমুখে নীচে নামিয়া গেল।

অপূর্ব ডাকিয়া কহিল, আমি তাহলে এখন বাসায় যাই—তেওয়ারী-বেচারা ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে। এই বলিয়া সে কিয়ৎকাল জবাবের জন্য উৎকর্ণ হইয়া থাকিয়া অবশেষে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িল। হয়ত সে শুনিতে পায় নাই, হয়ত শুনিয়াও উত্তর দেয় নাই; কিন্তু ইহাই বড় সমস্যা নয়। বড় সমস্যা এই যে, তাহার অবিলম্বে বাসায় যাওয়া উচিত। কোন অজুহাতেই আর দেরি করা সাজে না। অথচ, ভিতর হইতে যাওয়ার তাগিদ যতই অনুভব করিতে লাগিল, ততই কিন্তু দেহ যেন তাহার অলস শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। শেষকালে সেই বড় চেয়ারের উপরেই মুখের উপর হাত চাপা দিয়া অপূর্ব ঘুমাইয়া পড়িল।

পনর

বেলা যে যায়! উঠুন!

অপূর্ব চোখ রগড়াইয়া উঠিয়া বসিল। দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিল, ইস। তিন-চার ঘণ্টার কম নয়! আমাকে তুলে দেননি কেন? বাঃ—মাথায় একটা বালিশ পর্যন্ত কখন

দিয়ে দিয়েছেন। এতে কি আর কারও ঘুম ভাঙ্গে!

ভারতী কহিল, ঘুম ভাঙ্গবার হলে তখনি ভাঙ্গতো। এটা না দিলে মাঝে থেকে ঘাড়ে শুধু একটা ব্যথা হতো। যান, মুখ-হাত ধুয়ে আসুন, সরকারমশায় জলখাবারের থালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর ঢের কাজ, একটু চটপট করে তাঁকে ছুটি দিন।

দ্বারের বাহিরে যে লোকটি দাঁড়াইয়া ছিল, মুখ বাড়াইয়া সে তাহার ত্বরা নিবেদন করিল।

নীচে হইতে হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া অপূর্ব খাবার খাইয়া সুপারি এলাচ প্রভৃতি মুখে দিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিল, এবার আমাকে ছুটি দিন, আমি বাসায় যাই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, সেটি হবে না। তেওয়ারীকে খবর দিয়েচি যে অফিসের ফেরত কাল বিকালে আপনি বাসায় যাবেন, এবং খবর নিয়েচি যে সে সুস্থদেহে, বহাল তবিয়তে ঘর আগলাচ্চে,—কোন চিন্তা নাই।

কিন্তু কেন?

ভারতী বলিল, কারণ সম্প্রতি আপনি আমাদের অভিভাবক। আজ সুমিত্রাদিদি অসুস্থ, নবতারা গেছেন অতুলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওপারে, আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আপনার প্রতি প্রেসিডেন্টের এই আদেশ। ওই ধুতি এনে রেখেচি, প'রে নিয়ে চলুন।

কোথায় যেতে হবে?

মজুরদের লাইনের ঘরের অর্থাৎ, বড় বড় কারখানার ক্রোরপতি মালিকেরা ওয়ার্কমেনদের জন্যে লাইনবন্দী যে-সব নরককুণ্ড তৈরি করে দিয়েছে সেইখানে। আজ রবিবারে ছুটির দিনেই সেখানে কাজ।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সেখানে কেন?

ভারতী উত্তর দিল, নইলে, পথের-দাবীর সত্যিকারের কাজ কি এই ঘরে হতে পারে? একটু হাসিয়া কহিল, আপনি এ সভার মাতব্বর সভ্য, সরজমিনে না গেলে ত কাজের ধারা বুঝতে পারবেন না, অপূর্ববাবু।

চলুন, বলিয়া অপূর্ব আফিসের পোশাক ছাড়িয়া মিনিট-পাঁচেকের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া লইল।

ভারতী আলমারি খুলিয়া কি একটা বস্তু লুকাইয়া তাহার জামার পকেটে রাখিতে অপূর্ব দেখিতে পাইয়া কহিল, ওটা আপনি কি নিলেন?

গাদা পিস্তল।

পিস্তল? পিস্তল কেন?

আত্মরক্ষার জন্যে।

ওর পাস আছে?

না।

অপূর্ব বলিল, পুলিশে যদি ধরে ত আত্মরক্ষা দু'জনেরই হবে। ক'বছর দেয়?

দেবে না,—চলুন!

অপূর্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুর্গা—শ্রীহরি। চলুন।

বড় রাস্তা ধরিয়া উত্তরে বর্মা ও চীনাপল্লী পার হইয়া বাজারের পাশ দিয়া দু'জনে প্রায় মাইল-খানেক পথ হাঁটিয়া একটা প্রকাণ্ড কারখানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বন্ধ-ফটকের কাটা-দরজার ফাঁক দিয়া গলির ভিতরে প্রবেশ করিল। ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ও-ধারে কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙ্গা কাঠ ও ভাঙ্গা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি। সুমুখ দিকে সারি সারি কয়েকটা জলের কল, এবং পিছন দিকে এমনি সারি সারি টিনের পায়খানা। গোড়াতে হয়ত দরজা ছিল, এখন খোলে ও চট-ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী-লাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মা, বাঙালী, উড়ে, হিন্দু, মুসলমান, স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজার-খানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে।

ভারতী কহিল, আজ কাজের দিন নয়, নইলে জলের কলেই দু-একটা রক্তারক্তি কাণ্ড দেখতে পেতেন।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ছুটির দিনের ভিড় দেখেই তা' অনুভব করতে পারছি।

এই জনতার সম্মুখেই একজন মাদ্রাজী স্ত্রীলোক পর্দা ঠেলিয়া পায়খানায় ঢুকিতেছিল, পর্দার অবস্থা দেখিয়া অপূর্ব লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিয়া বলিল, পথের-দাবী করতে হয় ত আর কোথাও শীঘ্র চলুন, এখানে আমি দাঁড়াতে পারব না।

ভারতী নিজেও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে শুধু একটুখানি হাসিল। অর্থাৎ মানুষের ধাপ হইতে নামাইয়া যাহাদের পশু করিয়া তোলা হইয়াছে তাহাদের আবার এ-সকল বালাই কেন?

কয়েকখানা ঘর পরে উভয়ে আসিয়া একজন বাঙালী মিস্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করিল। লোকটার বয়স হইয়াছে, কারখানায় পিতল ঢালাইয়ের কাজ করে, মদ খাইয়া কাঠের মেঝের উপর পড়িয়া অত্যন্ত মুখ খারাপ করিয়া কাহাকে গালি পাড়িতেছিল, ভারতী ডাকিয়া কহিল, মানিক, কার ওপরে রাগ করচ? সুশীলা কৈ? সে আজ দু'দিন পড়তে যায় না কেন?

মানিক কোনমতে হাতে-পায়ে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল, চোখ চাহিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, দিদিমণি! এস, বসো। সুশী কি করে তোমার ইস্কুলে যাবে বল? রাঁধাবাড়া বাসনমাজা মায় ছেলেটাকে সামলানো পর্যন্ত—বুক ফেটে যাচ্চে দিদিমণি, যোদো শালাকে আমি খুন না করি ত আমি কৈবর্ত থেকে খারিজ! বড়সাহেবকে এমনি দরখাস্ত দেব যে শালার চাকরি খেয়ে দেব।

ভারতী সহাস্যে কহিল, তা দিয়ো। আর বল ত না হয়, সুমিত্রাদিদিকে দিয়ে আমিই তোমার দরখাস্ত লিখে দেব। কিন্তু কাল আমাদের ফয়ার মাঠে মিটিং, তা মনে আছে ত?

এমন সময় বছর দশ-এগারোর একটি মেয়ে আসিয়া প্রবেশ করিল। সে অঞ্চলের ভিতর হইতে এক বোতল মদ বাহির করিয়া সাবধানে মেঝের উপর রাখিয়া কহিল, বাবা, ঘোড়া মার্কা মদ আর নেই, তাই টুপি মার্কা মদ নিয়ে এলুম। চারটে পয়সা বাকী রইল। দেখ বাবা, রাম আইয়া মাতাল হয়ে আমাকে কি বলছিল জানো?

প্রত্যুত্তরে তাহার পিতা রামিয়ার উদ্দেশে একটা কদর্য ভাষা উচ্চারণ করিল। ভারতী কহিল, ও-সব জায়গায় তুমি আর যেয়ো না। তোমার মা কোথায় সুশীলা?

মা? মা ত পরশু রাত্তিরে যদুকাকার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে লাইনের বাইরে ঘরভাড়া করেচে। মেয়েটা আরও কি বলিতেছিল, কিন্তু বাপ গর্জন করিয়া উঠিল,—করাচ্চি! এ বাবা বিয়ে-করা পরিবার, বেউশ্যে নয়! এই বলিয়া সে অনিশ্চিত কম্পিতহস্তে স্ক্রুর অভাবে ভাঙ্গা খুন্তির ডগা দিয়া নূতন বোতলের ছিপি খুলিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভারতী হঠাৎ তাহার অঞ্চলপ্রান্তে একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল, অপূর্বর মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেছে। কখনো সে ভারতীকে স্পর্শ করে নাই, কিন্তু এখন সে জ্ঞানই তাহার ছিল না। কহিল, চলুন এখান থেকে।

একটু দাঁড়ান।

না, এক মিনিট না। এই বলিয়া সে একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিল। ঘরের ভিতরে মানিক ছিপি বোতল ও খুন্তির বাঁট লইয়া বীরদর্পে গর্জাইতে লাগিল যে, খুন করিয়া ফাঁসি যাইতে হয় সে ভি আচ্ছা। সে দেশো গুণ্ডার ছেলে, সে জেল বা ফাঁসি কোনটাকেই ভয় করে না।

বাহিরে আসিয়া অপূর্ব যেন অগ্নিকাণ্ডের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল,—হারামজাদা, নচ্ছার, পাজী মাতাল! যেন পিশাচের নরককুণ্ড বানিয়ে রেখেচে। এখানে পা দিতে আপনার ঘৃণা বোধ হল না?

ভারতী তাহার মুখের পানে চাহিয়া আস্তে আস্তে বলিল, না। তার কারণ, এ নরককুণ্ড ত এরা বানায় নি। এরা শুধু তার প্রায়শ্চিত্ত করচে।

অপূর্ব কহিল, না এরা বানায় নি আমি বানিয়েচি। মেয়েটার কথা শুনলেন! ওর মা যেন কোন্ তীর্থযাত্রা করেছে! নির্লজ্জ বেহায়া শয়তান! আর কখখনো যদি এখানে আসবেন ত টের পাবেন বলে দিচ্চি।

ভারতী একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমি ম্লেচ্ছ ক্রীশ্চান, আমার এখানে আসতে দোষ কি?

অপূর্ব রাগ করিয়া বলিল, দোষ নেই? ক্রীশ্চানের জন্যে কি সৎ-অসৎ বস্তু নেই, নিজেদের সমাজের কাছে তাদের জবাবদিহি করতে হয় না?

ভারতী উত্তর দিল, কে আছে আমার যে জবাবদিহি করবো? কার মাথাব্যথা পড়েচে আমার জন্যে, আপনিই বলুন?

অপূর্ব সহসা কোন প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু বলিল, এ-সব আপনার চালাকি। আপনি ঘরে ফিরে চলুন।

আমাকে আরও পাঁচ জায়গায় যেতে হবে। আপনার ভাল না লাগে আপনি ফিরে যান।

ফিরে যান বললেই কি আপনাকে এখানে রেখে আমি যেতে পারি?

তাহলে সঙ্গে থাকুন। মানুষের প্রতি মানুষে কত অত্যাচার করচে চোখ মেলে দেখতে শিখুন। কেবল ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে, নিজে সাধু হয়ে থেকে ভেবেচেন পুণ্য সঞ্চয় করে একদিন স্বর্গে যাবেন? মনেও করবেন না। বলিতে বলিতে ভারতীর মুখের চেহারা কঠোর এবং গলার স্বর তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। এই মূর্তি ও কণ্ঠ অপূর্বর অত্যন্ত পরিচিত। ভারতী কহিল, ওই মেয়েটার মা এবং যদু যে অপরাধ করেছে সে শুধু ওদের দণ্ড দিয়েই শেষ হবে? আপনি তার কেউ নয়? কখখনো না! ডাক্তারবাবুকে না-জানা পর্যন্ত আমিও ঠিক এমনি করেই ভেবে এসেচি। কিন্তু আজ আমি নিশ্চয় জানি, এই নরককুণ্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে এই নরককুণ্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আপনার এই দুষ্কৃতির ঋণশোধ না করে পরিত্রাণ পান! আমরা নিজের গরজেই আসি অপূর্ববাবু, এই উপলব্ধিই আমাদের পথের-দাবীর সবচেয়ে বড় সাধনা। চলুন।

অপূর্ব নিরীহ ও নিঃস্পৃহের ন্যায় কহিল, চলুন। ভারতীর কথা কিন্তু সে বুঝিতেও পারিল না, বিশ্বাসও করিল না।

কিছু দূরে একটা সেগুন গাছ ছিল, ভারতী আঙুল দিয়া দেখাইয়া কহিল, ওই সামনে ক' ঘর বাঙালী থাকে,—চলুন।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, বাঙালী ভিন্ন অপর জাতের মধ্যে আপনারা কাজ করেন না?

ভারতী বলিল, করি। সকলকেই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর ত কেউ সকলের ভাষা জানে না, তিনি সুস্থ থাকলে এ কাজ তাঁরই, আমার নয়।

তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা জানেন?

জানেন।

আর ডাক্তারবাবু?

ভারতী হাসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে আপনার ভারী কৌতূহল। এ কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না কেন যে, পৃথিবীতে যা-কিছু জানা যায় তিনি জানেন, যা-কিছু পারা যায় তিনি পারেন। কে তার সব্যসাচী নাম রেখেছিল আমার কেউ জানিনে, কিন্তু তাঁর আসাধ্য তাঁর অজ্ঞাত সংসারে কিচ্ছু নেই। এই বলিয়া সে নিজের মনে চলিতেই লাগিল,কিন্তু তাহারই পিছনে সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া অপূর্বর মুখ দিয়া গভীর নিঃশ্বাস পড়িল। অকস্মাৎ এই কথাটা তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে এতবড় একটা প্রাণের কোনো মূল্য নাই, যে-কোন লোকের হাতে যে-কোন মুহূর্তে তাহা কুকুর-শিয়ালের মতই বিনষ্ট হইতে পারে! সমস্ত জগৎবিধানে এতবড় নিষ্ঠুর অবিচার আর কি আছে? ভগবান মঙ্গলময় এই যদি সত্য, এ তবে কাহার ও কোন্ পাপের দণ্ড?

উভয়ে একটা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। ভারতী ডাকিল, পাঁচকড়ি কেমন আছ আজ?

অন্ধকার কোণ হইতে সাড়া আসিল, আজ একটু ভাল। এই বলিয়া একজন বুড়াগোছের লোক ডান হাতটা উঁচু করিয়া সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার আগাগোড়া কি কতকগুলা প্রলেপ দেওয়া, কহিল, মা, মেয়েটা রক্ত-আমাশায় বোধ হয় বাঁচবে না, ছেলেটার আবার কাল থেকে বেহুঁশ জ্বর, এমন একটা পয়সা নেই যে এক ফোঁটা ওযুধ কিনে দি, কি এক বাটি সাগু-বার্লি রেঁধে খাওয়াই। তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া আসিল।

অপূর্বর মুখ দিয়া হঠাৎ বাহির হইয়া গেল, পয়সা নেই কেন?

এই অপরিচিত বাবুটিকে লোকটা কয়েক মুহূর্ত নীরবে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, পুলির শেকল পড়ে ডান হাতটাই জখম হয়ে গেছে, মাস-খানেক ধরে কাজে বার হতে পারিনি, পয়সা থাকবে কি করে বাবুমশায়?

অপূর্ব প্রশ্ন করিল, কারখানার ম্যানেজার এর ব্যবস্থা করেন না?

পাঁচকড়ি কপালে একবার বাম হাতটা স্পর্শ করিয়া কহিল, হায়! হায়! দিনমজুরদের আবার ব্যবস্থা! এতেই বলচে কাজ করতে না পার ত ঘর ছেড়ে দাও, আবার যখন ভাল হবে তখন এসো,—কাজ দেবো। এ অবস্থায় কোথায় যাই বলুন ত মশায়? ছোটসাহেবের হাতে পায়ে ধরে বড়জোড় আর হপ্তাখানেক থাকতে পাবো। বিশ বচ্ছর কাজ করছি মশায়, এরা এমনি নেমকহারাম!

কথা শুনিয়া অপূর্ব রাগে জ্বলিতে লাগিল। তাহার এমনি ইচ্ছা করিতে লাগিল ম্যানেজার লোকটাকে পায় ত কান ধরিয়া টানিয়া আনিয়া দেখায়, সুদিনে যাহারা লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়া দিয়াছে আজ দুর্দিনে তাহারা কি দুঃখই ভোগ করিতেছে! অপূর্বদের বাটীর কাছে গরুর গাড়ির আড্ডা, তাহার মনে পড়িল, এক জোড়া গরু সমস্ত জীবন ধরিয়া বোঝা টানিয়া অবশেষে বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িল লোকটা তাহাদের কসাইখানায় বিক্রি করিয়া দিয়াছিল। এই হৃদয়হীনতা নিবারণ করিবার উপায় নাই, লোকে করে না, কেহ করিতে চাহিলে সবাই তাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দেয়। সেই পথ দিয়া যখনই সে গিয়াছে তখনই এই কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিয়াছে। গরুর জন্য নয়, কিন্তু অর্থের পিপাসায় এই বর্বর নিষ্ঠুরতায় মানুষ আপনাকে আপনি কত ছোটই না প্রতিদিন করিয়া আনিতেছে! সহসা ভারতীর কথাটা স্মরণ করিয়া সে মনে মনে কহিল, ঠিক কথাই ত! কে কোথায় করিতেছে আমি ত করি না অথবা এমনিই ত হয়, এই ত চিরদিন হইয়া আসিতেছে—এই বলিয়াই ত এতবড় ক্রটির জবাবদিহি হয় না! গরু-ঘোড়া শুধু উপলক্ষ্য। এই হাত-ভাঙ্গা পাঁচকড়িটাও তাই। আপনাকে যে বাঁচাইতে পারে না তাহার হত্যায়, যে দুর্বল তাহার পীড়নে, যে নিরুপায় তাহার লজ্জাহীন বঞ্চনায় এই যে মানুষে আপনার হৃদয়বৃত্তির জীবন হরণ করিতেছে, সকলের এই যে আত্মহত্যার অহোরাত্রব্যাপী উৎসব চলিয়াছে, ইহার বাতি নিভিবে কবে? এই সর্বনাশা উন্মত্ততার পরিসমাপ্তি ঘটিবে কোন্ পথ দিয়া? মরণের আগে কি আর তাহার চেতনা ফিরিবে না!

ঘরের একধারে মলিন, শতচ্ছিন্ন শয্যায় ছেলেমেয়ে-দুটি মৃতকল্পের ন্যায় পড়িয়া ছিল, ভারতী কাছে গিয়া তাহাদের গায়ে হাত দিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। অপূর্ব ভয়ে সেখানে যাইতে পারিল না, কিন্তু দরিদ্র, পীড়িত শিশু-দুটির নিঃশব্দ বেদনা তাহার বুকের মধ্যে যেন মুগুরের ঘা মারিতে লাগিল। সে সেইখানে দাঁড়াইয়া উচ্ছ্বসিত আবেগে আপনাকে আপনি বলিতে লাগিল, লোকে বলে, এই ত দুনিয়া! এমনি ভাবেই ত সংসারের সকল কাজ চিরদিন হইয়া আসিয়াছে! কিন্তু এই কি যুক্তি! পৃথিবী কি শুধু অতীতেরই জন্য! মানুষ কি কেবল তাহার পুরাতন সংস্কার লইয়া অচল হইয়া থাকিবে! নূতন কিছু কি সে কল্পনা করিবে না! উন্নতি করা কি তাহার শেষ হইয়া গেছে! যাহা বিগত যাহা মৃত কেবল তাহারই ইচ্ছা, তাহারই বিধান মানুষের সকল ভবিষ্যৎ, সকল জীবন, সকল বড় হওয়ার দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া চিরকাল ধরিয়া প্রভুত্ব করিতে থাকিবে!

চলুন।

অপূর্ব চমকিয়া দেখিল, ভরতী। পাঁচকড়ি নীরবে, ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে উদ্দেশ করিয়া ভারতী স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, ভয় নেই তোমার, এরা সেরে উঠবে। কাল সকালেই আমি ডাক্তার, ওষুধ-পথ্য সব পাঠিয়ে দেব—

তাহার কথা শেষ না হইতেই অপূর্ব পকেটে হাত দিয়া টাকা বাহির করিতেছিল, সেই হাত ভারতী হাত বাড়াইয়া চাপিয়া ধরিয়া নিবারণ করিল। পাঁচকড়ির দৃষ্টি অন্যত্র ছিল, সে ইহা দেখিতে পাইল না, কিন্তু অপূর্বও ইহার হেতু বুঝিল না। ভারতী তখন নিজের জামার পকেট হইতে চার আনার পয়সা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, ছেলেদের চার পয়সার মিছরি, চার পয়সার সাগু, আর বাকী দু আনার চাল ডাল এনে তুমি এ বেলার মত খাও পাঁচকড়ি, কাল তোমার ব্যবস্থা করে দেব। আজ আমরা চললাম। এই বলিয়া অপূর্বকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া আসিল।

পথে আসিয়া অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আপনি ভারী কৃপণ। আমাকেও দিতে দিলেন না, নিজেও দিলেন না।

ভারতী কহিল, দিয়েই ত এলাম।

একে দিয়ে আসা বলে? তার এই দুঃসময়ে পাই-পয়সার হিসেব করে চার আনা মাত্র হাতে দেওয়া ত শুধু অপমান।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কত দিতে যাচ্ছিলেন?

অপূর্ব ঠিক কিছুই করে নাই, খুব সম্ভব হাতে যাহা উঠিত, তাই দিত। কিন্তু এখন ভাবিয়া বলিল, অন্ততঃ গোটা-পাঁচেক টাকা।

ভারতী জিভ কাটিয়া কহিল, ওরে বাপ রে! সর্বনাশ করেছিলেন আর কি। বাপ ত মদ খেয়ে সারারাত বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতো, কিন্তু ছেলেমেয়ে-দুটো মরে যেতো।

মদ খেতো!

খেতো না। হাতে টাকা পেলে মদ খায় না এমন অসাধারণ ব্যক্তি সংসারে কে আছে?

অপূর্ব ক্ষণকাল অভিভূতের ন্যায় স্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিল, আপনার সব কথায় তামাশা। রুগ্ন সন্তানের চিকিৎসার টাকায় বাপ মদ কিনে খাবে, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

ভারতী কহিল, সত্যি না হয় ত আপনি যে ঠাকুরের দিব্যি করতে বলবেন,—মা মনসা, ওলা বিবি—হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়াই কিন্তু আপনাকে তৎক্ষণাৎ সংযত করিয়া লইয়া বলিল, নইলে, দাতার হাত চেপে ধরে দুঃখীকে পেতে দেব না, সত্যি বলুন ত আমি কি এতই ছোট?

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, এদের মা নেই?

না।

কোথায় কোন আত্মীয়ও নেই বোধ করি?

ভারতী বলিল, থাকলেও কাজে লাগবে না। বছর দশ-বারো পূর্বে পাঁচকড়ি একবার দেশে যায়, কোন এক প্রতিবেশীর বিধবা মেয়েকে ভুলিয়ে সাগর পার করে নিয়ে আসে। ছেলে-মেয়ে দুটি তারই ; বছর-দুই হল, গলায় দড়ি দিয়ে সে ভবযন্ত্রণা এড়িয়েছে,—এই ত পাঁচকড়িদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

অপূর্ব নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, নরককুণ্ডই বটে!

ভারতী নিতান্ত সহজকণ্ঠে মাথা নাড়িয়া বলিল, তাতে আমার লেশমাত্র মতভেদ নাই। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, এরা সব ভাই-বোন। রক্তের সম্বন্ধ অস্বীকার করেই রেহাই মিলবে না অপূর্ববাবু, উপরে বসে যে ব্যক্তিটি সমস্ত দেখচেন, তিনি কড়ায়-গণ্ডায় এর কৈফিয়ত নিয়ে তবে ছেড়ে দেবেন।

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, এখন মনে হচ্ছে যেন একেবারে অসম্ভব নয়। ক্ষণকাল পূর্বে এই পাঁচকড়ির ঘরে মধ্যে দাঁড়াইয়া যে-সকল চিন্তা তাহার মনে হইয়াছিল, বিদ্যুদ্বেগে

সেই সমস্তই আর একবার তাহার মনের মধ্যে বহিয়া গেল। বলিল, আমিও যখন মানুষ তখন দায়িত্ব আছে বৈ কি।

ভারতী সায় দিল। বলিল, আগে আগে আমিও দেখতে পেতাম না,রাগ করে ঝগড়া করতাম। এই-সব অজ্ঞান, দুঃখী, দুর্বল-চিত্ত ভাই-বোনের ঘাড়ে অসহ্য পাপের বোঝা কে আহরহ চাপাচ্ছে এখন স্পষ্ট দেখতে পাই অপূর্ববাবু।

পাশের ঘরে একজন উড়িয়া মিস্ত্রী থাকে, তাহার পাশের ঘর হইতে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ হাসি ও উচ্চ কোলাহল আসিতেছিল, পাঁচকড়ির ঘরের ভিতর হইতেও অপূর্ব তাহা শুনিতে পাইয়াছিল। সেই ঘরে আসিয়া দুজনে উপস্থিত হইল। ভারতী ইহাদের পরিচিত, সকলে সমস্বরে তাহার অভ্যর্থনা করিল। একজন ছুটিয়া গিয়া একটা টুল ও একটা বেতের মোড়া আনিয়া উভয়কে বসিতে দিল। অনাবৃত কাঠের মেঝেতে বসিয়া ছয়-সাতজন পুরুষ ও আট-দশজন স্ত্রীলোকে মিলিয়া মদ খাইতেছিল। একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়াম ও একটা বাঁয়া মাঝখানে, নানা রঙের ও নানা আকারের খালি বোতল চতুর্দিকে গড়াইতেছে, একজন বুড়াগোছের স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া ঘুমাইতেছে,—তাহাকে বিবস্ত্রা বলিলেই হয়। ষাট হইতে পঁচিশ ছাব্বিশ পর্যন্ত সকল বয়সের স্ত্রী-পুরুষই বসিয়া গিয়াছে,—আজ রবিবার, পুরুষদের ছুটির দিন। পিঁয়াজ-রশুনের তরকারির সঙ্গে মিশিয়া সস্তা জারমান মদের অবর্ণনীয় গন্ধ অপূর্বর নাকে লাগিতে তাহার গা বমি-বমি করিয়া আসিল। একজন অল্পবয়সী স্ত্রীলোকের হাতে মদের গেলাস ছিল, সে বোধ হয় তখনও পাকা হইয়া উঠে নাই, হয়ত অল্পদিন পূর্বেই গৃহত্যাগ করিয়াছে, সে বাঁ হাতে সজোরে নিজের নাক টিপিয়া ধরিয়া গেলাসটা মুখে ঢলিয়া দিয়া তক্তার ফাঁক দিয়া অপর্যাপ্ত থুথু ফেলিতে লাগিল। একজন পুরুষ তাড়াতাড়ি তাহার মুখে খানিকটা তরকারি গুঁজিয়া দিল। বাঙালী মেয়ে-মানুষকে চোখের সুমুখে মদ খাইতে দেখিয়া অপূর্ব যেন একেবারে শীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু সে আড়চোখে চাহিয়া দেখিল, এতবড় ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্যেও ভারতীয় মুখের উপরে বিকৃতির চিহ্নমাত্র নাই। এ-সব তাহার সহিয়া গেছে। কিন্তু ক্ষণেক পরে গৃহস্বামীর ফরমাসে টুনি যখন গান ধরিল, এই যমুনা সেই যমুনা—এবং পাশের লোকটা হারমোনিয়াম টানিয়া লইয়া থামকা একটা চাবি টিপিয়া ধরিয়া প্রাণপণে বেলো করিতে শুরু করিল, তখন এত ভার ভাতরীর বোধ হয় সহিল না। সে ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, মিস্ত্রীমশাই, কাল আমাদের মিটিং—এ কথা বোধ হয় ভোলনি? যাওয়া কিন্তু চাই-ই।

চাই বৈ কি দিদিমণি! এই বলিয়া কালাচাঁদ একপাত্র মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

ভারতী কহিল, ছেলেবেলায় পড়েচ ত খড় পাকিয়ে দড়ি করলে হাতী বাঁধা যায়! এক না হলে তোমরা কখনো কিছু করতে পারবে না। কেবল তোমাদের ভালর জন্যেই সুমিত্রাদিদি কি পরিশ্রম করছেন বল ত!

এ কথায় সকলে একবাক্যে সায় দিল। ভারতী বলিতে লাগিল, তোমরা ছাড়া কি এতবড় কারখানা একদিন চলে? তোমরাই ত এর সত্যিকারের মালিক, এ ত সোজা কথা কালাচাঁদ, এ তোমরা না বুঝতে চাইলে হবে কেন?

সবাই বলিল, এ ঠিক কথা। তাহারা না চালাইলে সমস্ত অন্ধকার।

ভারতী কহিল, অথচ, তোমাদের কত কষ্ট একবার ভেবে দেখ দিকি। যখন-তখন বিনা দোষে সাহেবরা তোমাদের লাথি জুতো মেরে বার করে দেয়। এই পাশের ঘরেই দেখ কাজ করিতে গিয়ে পাঁচকড়ি হাত ভেঙ্গেচে বলে আজ সে খেতে পায় না, তার ছেলেমেয়ে-দুটো ওষুধপথ্যির অভাবে মারা যাচ্চে। ঘর থেকে পর্যন্ত বড়সাহেব তাকে দূর করে দিতে চায়! এই যে ক্রোর ক্রোর টাকা এরা লাভ করচে সে কাদের দৌলতে? আর তোমরা পাও কতটুকু? এই যে সেদিন শ্যামলালকে ছোটসাহেব ঠেলে ফেলে দিলে, আজও সে হাসপাতালে, এ তোমরা সহ্য করবে কেন? একবার সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে বলতো, এ নির্যাতন আমরা আর সইব না, কেমন তোমাদের গায়ে হাত দিতে সাহস করে

দেখি! কেবল একটিবার তোমাদের সত্যিকার জোরটুকু তোমরা চেয়ে দেখতে শেখো,—আর আমরা তোমাদের কাছে কিছুই চাইনে কালাচাঁদ!

একজন মাতাল এতক্ষণ হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, সে কহিল, বাব! পারিনে কি? এমন একটি বল্টু ঢিলে করে রেখে দিতে পারি, যে—কড়্ কড়্ কড়াৎ! ব্যস্! অর্দ্ধেক কারখানাই ফরসা!

ভারতী সভয়ে বলিয়া উঠিল, না না, দুলাল, ও-সব কাজ কখখনো করো না! ওতে তোমাদেরই সর্বনাশ। হয়ত, লোক মারা যাবে, হয়ত—না না, এ-সব কথা স্বপ্নেও ভাবতে যেয়ো না দুলাল। ওর চেয়ে ভয়ানক পাপ আর নেই!

লোকটা মাতালের হাসি হাসিয়া বলিল, নাঃ—তা কি আর জানিনে! ও শুধু কথার কথা বলচি আমরা পারিনে কি?

ভারতী বলিতে লাগিল, তেমাদের সৎপথে, সত্যিকার পথে দাঁড়ানো চাই—তাতেই তোমরা সমস্ত পাবে। ওদের কাছে বহু বহু টাকা পাওনা—তাই কেবল কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নিতে হবে।

মেয়ে-পুরুষে এই লইয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। ভারতী কহিল, সন্ধ্যা হয়, এখনো আর এক জায়গায় যেতে হবে। আমরা তবে এখন আসি, কিন্তু কালকের কথা যেন কিছুতেই না ভুল হয়। এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

এই কালাচাঁদের আড্ডার সমস্ত ব্যাপারই অপূর্বর অত্যন্ত বিশ্রী লাগিয়াছিল, কিন্তু শেষের দিকে যে-সব আলোচনা হইল তাহাতে তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। বাহিরে আসিয়াই ভয়ানক রাগ করিয়া কহিল, তুমি এ-সব কথা এদের বলতে গেলে কেন?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কি-সব কথা?

অপূর্ব বলিল, ওই ব্যাটা হারামজাদা মাতাল! দুলাল না কি নাম,—কি বললে শুনলে ত? ধর এ কথা যদি সাহেবদের কানে যায়?

কানে যাবে কি করে?

আরে, এরাই বলে দেবে। এরা কি যুধিষ্ঠির নাকি? মদের ঝোঁকে কখন কি কাণ্ড করে বসবে, তখন, তোমার নামেই দোষ হবে। হয়ত বলবে তুমিই শিখিয়ে দিয়েছ।

কিন্তু সে ত মিছে কথা!

অপূর্ব অধীর হইয়া বলিল, মিছে কথা! আরে ইংরেজ রাজত্বে মিছে কথায় কখনো কারো জেল হয়নি নাকি? রাজত্বটাই ত মিছের ওপর দাঁড়িয়ে।

ভারতী বলিল, আমারও না হয় জেল হবে।

অপূর্ব কহিল, তুমি ত বলে ফেললে, না হয় জেল হবে! না না, এ-সব হবে না। এখানে আসা তোমার আর কখখনো—কখখনো চলবে না।

কিছুদূরে একজনের কাছে প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দ্বারে তাহার তালা দেওয়া দেখিয়া উভয়েই সেই পথেই ফিরিল। কালাচাঁদের ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, সেই যমুনা প্রবাহিণী-র গান তখন থামিয়াছে, কিন্তু তৎপরিবর্তে মদ-মত্ত তর্ক একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে। একজন স্ত্রীলোক মাতাল হইয়া তাহার স্বামীর শোকে কান্না শুরু করিয়াছে আর একজন তাহাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিতেছে যে দেশের কথা বলিয়া আর লাভ নাই,—এইখানেই আবার তোর সব হবে, তুই বরঞ্চ মানত করিয়া পূর্ণিমায় পূর্ণিমায় সত্যনারায়ণের কথা দে। অনেকে এই বলিয়া ঝগড়া করিতেছেযে, এই ক্রীশ্চান মেয়েগুলা কারখানায় ধর্মঘট বাধাইয়া দিতে চায়। তাহা হইলে তাহাদের কষ্টের আর সীমা থাকিবে না, উহাদের লাইনের ঘরে আর আসতে দেওয়া উচিত নয়। কালাচাঁদ মিস্ত্রী বুঝাইয়া বলিতেছে যে সে বোকা ছেলে নয়। ইহাদের দৌড়টাই কেবল সে দেখিতেছে। একজন অতিসাবধানী মেয়েমানুষ পরামর্শ দিল যে, খোকাসাহেবকে এই বেলা সাবধান করিয়া দেওয়া ভাল।

সেখান হইতে ভারতীকে জোর করিয়া দূরে টানিয়া লইয়া গিয়া অপূর্ব তিক্তকণ্ঠে কহিল,

আর করবে এদের ভাল? নেমকহারাম! হারামজাদা! পাজী! নচ্ছার! উঃ—পাশের ঘরে দুটো অনাথ ছেলে-মেয়ে মরে, একজন কেউ চেয়ে দেখে না। নরক আর আছে কোথায়?

ভারতী মুখপানে চাহিয়া বলিল, হঠাৎ হ'ল কি আপনার?

অপূর্ব কহিল, আমার কিছুই হয়নি, আমি জানতাম। কিন্তু তুমি শুনলে কি না, তাই বল।

ভারতী বলিল, নূতন কিছুই নয়, এ-রকম ত আমরা রোজ শুনি।

অপূর্ব গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, এমনি শয়তানি? এমনি কৃতঘ্নতা? এদের চাও তুমি দলে আনতে—দলবদ্ধ করতে? এদের চাও তুমি ভাল?

ভারতীর কণ্ঠস্বরে কোন উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না। বরঞ্চ, সে একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া বলিল, এরা কারা অপূর্ববাবু? এরা ত আমারই। এই ছোট্ট কথাটুকু যখনি ভুলচেন, তখনি আপনার গোল বাধচে। আর ভাল? ভাল-করা বলে যদি সংসারে কোন কথা থাকে, তার যদি কোন অর্থ থাকে সে ত এইখানে। ভাল ত ডাক্তারবাবুর করা যায় না অপূর্ববাবু।

অপূর্ব এ কথার কোন জবাব দিল না।

দুজনে নিঃশব্দে ফটক পার হইয়া আবার সেই বর্মাপাড়ার ভিতর দিয়া বাজারের পথ ঘুরিয়া বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে, গৃহস্থের ঘরে আলো জ্বলিয়াছে, পথের দুধারে ছোট ছোট রাত-দোকান বসিয়া বেচাকেনা আরম্ভ হইয়াছে,—ইহার মধ্যে দিয়া ভারতী মাথার কাপড় কপালের নীচে পর্যন্ত টানিয়া দিয়া নিঃশব্দে দ্রুতবেগে পথ হাঁটিয়া চলিল। অবশেষে লোকালয় শেষ হইয়া যেখানে জলা ও মাঠ শুরু হইল, সেইখানে তেমাথায় আসিয়া সে পিছনে চাহিয়া কহিল, আপনি বাসায় যান ত শহরে যাবার এই ডান দিকের পথ।

অপূর্ব অন্যমনস্ক হইয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি বলেন?

ভারতী বলিল, এতক্ষণে আপনার মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে। যথাযোগ্য সম্ভাষণের ভাষা মনে পড়েছে।

তার মানে?

তার মানে রাগের মাথায় এতক্ষণ আপনি-তুমির ভেদাভেদ ছিল না। এখন ফিরে এল।

অপূর্ব অতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীকার করিয়া কহিল, আপনি রাগ করেন নি?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, একটু করলেই বা। চলুন।

আবার যাবো?

যাবেন না ত কি অন্ধকার পথে আমি একলা যাবো?

অপূর্ব আর দ্বিরুক্তি করিল না। আজ মনের মধ্যে তাহার অনেক বিষ, অনেক জ্বালা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। মাতালগুলার কথা সে কোনমতে ভুলিতে পারিতেছিল না। চলিতে চলিতে হঠাৎ কটুকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, এ-সব হল সুমিত্রার কাজ, আপনার ওখানে মোড়লি করতে যাবার দরকার কি? কে কোথায় কি করে বসবে, আর আপনাকে নিয়ে টানাটানি পড়বে!

ভারতী বলিল, পড়লই বা।

অপূর্ব বলিল, বা রে পড়লই বা! আসল কথা হচ্চে সর্দারি করাই আপনার স্বভাব। কিন্তু আরো ত ঢের জায়গা আছে।

একটা দেখিয়ে দিন না।

আমার বয়ে গেছে।

খানিকটা খুঁড়িয়া রাস্তার এই স্থানটা মেরামত হইতেছিল। যাইবার সময় দিনের বেলা কষ্ট হয় নাই, কিন্তু দুপাশের কৃষ্ণচূড়ার গাছের নীচে ভাঙ্গা পথটা অন্ধকারে একেবারে দুর্গম হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতী হাত বাড়াইয়া অপূর্বর বাঁ হাতটা শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, স্বভাব ত আমার যাবে না, অপূর্ববাবু, কিছু একটা করাই চাই। কিন্তু আপনার মত আনাড়ীর ওপরে মোড়লি করতে পাই ত আমি আর সমস্ত ছেড়ে দিতে পারি।

আপনার সঙ্গে কথায় পারবার জো নেই। এই বলিয়া সে সাবধানে ঠাহর করিয়া পথ চলিতে লাগিল।

ষোল

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সুমিত্রার নেতৃত্বে ফয়ার মাঠে যে সভা আহূত হইল তাহাতে লোকজন বেশী জমিল না, এবং বক্তৃতা দিতে যাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আসিয়া জুটিতে পারিলেন না। নানা কারণে সভার কার্য আরম্ভ করিতে বিলম্ব ঘটিল এবং আলোর বন্দোবস্ত না থাকায় সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইল। সুমিত্রার নিজের বক্তৃতা ভিন্ন বোধ করি এই সভায় উল্লেখযোগ্য কিছুই হইতে পাইল না। কিন্তু তাই বলিয়া পথের-দাবীর এই প্রথম উদ্যমটিকে ব্যর্থ বলিয়াও অভিহিত করা যায় না। কারণ মুখে চারিদিকের মজুরদের মধ্যেও যেমন ব্যাপারটা প্রচারিত হইয়া পড়িতে বাকী রহিল না, তেমনি কারখানার কর্তৃপক্ষদের কানেও কথাটা পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। যেমন করিয়া হউক, ইহাই সর্বত্র রাষ্ট্র হইয়া পড়িল যে, কে একজন বাঙালী স্ত্রীলোক সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া অবশেষে বর্মায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার যেমন রূপ তেমনি শক্তি। তাঁহাকে বাধা দেয় কার সাধ্য। কেমন করিয়া তিনি সাহেবদের কানে ধরিয়া মজুরদের সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা আদায় করিয়া লইবেন, এবং তাহাদের মজুরীর হার দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিবেন, নিজের মুখেই সে-সকল কথা তিনি প্রকাশ্যে বিবৃত করিয়াছেন। যাহার খবর না পাওয়ার জন্য সেদিন উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিজের মুখ হইতে সকল কথা শুনিতে পায় নাই তাহারা আগামী শনিবারে গিয়া যেন মাঠে উপস্থিত হয়।

বিশ-পঁচিশ ক্রোশের মধ্যে যতগুলা কল-কারখানা ছিল এই সংবাদ দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িল। সুমিত্রাকে কয়টা লোকেই বা চোখে দেখিয়াছে, কিন্তু তাঁহার রূপ ও শক্তির খ্যাতি অতিরঞ্জিত, এমন কি অমানুষিক হইয়াই যখন লোকের কানে গেল, তখন এই অশিক্ষিত মজুরদের মধ্যে সহসা যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। চিরদিন সংসারে অত্যাচারিত, পীড়িত, দুর্বল বলিয়া মানুষের সহজ অধিকার হইতে যাহারা সবলের দ্বারা প্রবঞ্চিত, নিজের উপরে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ যাহারা দুনিয়ায় খুঁজিয়া পায় না, দেবতা ও দৈবের প্রতি তাহাদেরই বিশ্বাস সব চেয়ে বেশী। সুমিত্রার সম্বন্ধে জনশ্রুতি তাহাদের কাছে কিছুই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না,—এটা প্রায় একপ্রকার স্থির হইয়া গেল যে, একটা রোজ কামাই করিয়া শনিবার দিন ফয়ার মাঠে হাজির হইতেই হইবে। তাঁহার কথা ও উপদেশের মধ্যে এমন পরশ-পাথর যদি-বা কিছু থাকে যাহা দিয়া দিনমজুরদের দুঃখের কপাল রাতারাতি একেবারে ভোজবাজির মত সৌভাগ্যের দীপ্তিতে রাঙ্গা হইয়া উঠিবে তা হইলে যেমন করিয়া হউক সে দুর্লভ বস্তু তাহাদের সংগ্রহ করিয়া আনিতেই হইবে।

সেদিন বৈকালের সভায় বক্তার অভাবে অপূর্বর মত আনাড়ীকেও সনির্বন্ধ উপরোধের তাড়নায় বাধ্য হইয়া দুই-চারিটা কথা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিতে হইয়াছিল। বলার অভ্যাস তাহার কোনকালে ছিল না, বলিয়াও ছিল সে অতিশয় বিশ্রী এবং এজন্য মনে মনে সে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়াই ছিল, কিন্তু আজ হঠাৎ খবর পাইল তাহাদের সেদিনকার বক্তৃতা বৃথা ত হয়ই নাই, বরঞ্চ ফল এতদূরে গড়াইয়াছে যে তাহাদের আগামী সভায় সমস্ত কল-কারখানার কাজ বন্ধ করিয়া কারিকরের দল উপস্থিত হইবার সঙ্কল্প করিয়াছে, তখন শ্লাঘায় ও আত্মপ্রসাদের আনন্দে বুকের মধ্যেটা তাহার ফুলিয়া উঠিল। সেদিন নিজের বক্তব্যকে সে পরিস্ফুট করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার ভয় ভাঙ্গিয়াছিল। বহুলোকের মাঝখানে উঠিয়া জনতাকে সম্বোধন করিয়া বলার মধ্যে যে নেশা আছে, সেদিন সে তাহার স্বাদ পাইয়াছিল, আজ আফিসে আসিয়াই সুমিত্রার চিঠির মধ্যে বহুবিধ প্রশংসার সঙ্গে আগামী সভার জন্যও পুনরায় বক্তার নিমন্ত্রণ পাইয়া সে উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। আফিসের কাজে মন দিতে পারিল না, এবং কি করিয়া আরও বিশদ, আরও সতেজ ও আরও সুন্দর

করিয়া বলা যায় তখন হইতে মনে মনে তাহার ইহারই মহলা চলিতে লাগিল। দুপুরবেলা টিফিন খাইতে বসিয়া আজ সে হঠাৎ রামদাসের কাছে এই কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। একদিন তাহার জন্য সে ভারতীকে অপমান করিয়াছিল, সেই অবধি তাহার লেশমাত্র সংস্রবের কথাও এই লোকটির কাছে বলিতে অপূর্বর অত্যন্ত লজ্জা করিত। আদালতে সেই জরিমানার দিন হইতে গণনার হিসাবে কত দিনই বা গত হইয়াছে! ইহার মধ্যে সেই দুর্দান্ত বর্বর সাহেবটা মরিয়াছে, তাহার বাঙালী স্ত্রী মরিয়াছে এবং তাহাদের সেই শয়তান ক্রীশ্চান মেয়েটাও ঘর ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেছে—এইটুকুই রামদাস জানিত। কিন্তু এই অবসরটুকুর মধ্যেই যে সেই ঘরছাড়া মেয়েটির সহিত নিঃশব্দ গোপনে তাহার বন্ধুর জীবনে কতবড় কাব্য ও কতবড় দুঃখের ইতিহাস দুঃসহ দ্রুতবেগে রচিত হইয়া উঠিতেছিল সে তাহার কোন খবরই পায় নাই। আজ পুলকের আতিশয্যে সকল কথাই যখন অপূর্ব ব্যক্ত করিয়া কহিতে লাগিল, তখন রামদাস তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ভারতী, সুমিত্রা, ডাক্তারবাবু, নবতারা, এমন কি সেই মাতালটার পর্যন্ত উল্লেখ করিয়া সে তাহাদের পথের-দাবীর কর্ম ও লক্ষ্য বিবৃত করিয়া সেদিনকার লাইনের ঘরে অভিযানের বিবরণ যখন একটি একটি করিয়া দিতে লাগিল তখন পর্যন্তও রামদাস একটা প্রশ্ন করিল না। একদিন দেশের জন্য এই লোকটি জেল খাটিয়াছে, বেত খাইয়াছে, হয়ত আরও কত-কি নির্যাতন ভোগ করিয়াছে, কেবল একটি দিন ছাড়া যাহার কোন বিবরণ কোনদিন সে রামদাসের কাছে শুনিতে পায় নাই, তথাপি তাহাকেই কল্পনায় বাড়াইয়া লইয়া অপূর্ব আফিসের মধ্যে বড় হইয়াও আপনাকে সর্বদাই ছোট না ভাবিয়া পারিত না। ক্ষুদ্রতা তাহার ছিল না, রামদাস তাহার বন্ধু—বন্ধুর প্রতি তাহার বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু বড় ও ছোটর ভাবটাও সে মন হইতে তাড়াইতে পারিত না। এমনি করিয়াই এই দুটি বন্ধুর ঘনিষ্ঠতার মাঝখানেও ব্যবধানে প্রাচীর গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ সুমিত্রার পত্রখানি সে রামদাসের চোখের সম্মুখে রাখিয়া দিয়া নিজেকে পথের-দাবীর একজন বিশিষ্ট সভ্য, এবং দেশের কাজে নিয়োজিত-প্রাণ বলিয়া আপনাকে ব্যক্ত করিয়া একদণ্ডেই যেন সে বন্ধুর সমকক্ষ হইয়া উঠিল।

চিঠিখানি ইংরাজিতে লিখা, তলওয়ারকর আদ্যোপান্ত বার-দুই তাহা নিঃশব্দে পাঠ করিয়া মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবুজী এ-সকল কথা আমাকে আপনি একদিনও বলেন নি কেন?

অপূর্ব কহিল, বললেও কি এখন আর আপনি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারতেন?

তলওয়ারকর বলিল, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করচেন? আমাকে ত আপনি যোগ দিতে ডাকেন নি।

তাহার কণ্ঠস্বরে একটা অভিমানের সুর অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াই অপূর্বর কানে বাজিল, সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, তার কারণ আছে রামদাসবাবু। আপনি ত জানেন, এ-সব কাজের কতবড় দায়িত্ব, কতবড় শঙ্কা। আপনি বিবাহ করেছেন, আপনার মেয়ে আছে, স্ত্রী আছেন, আপনি গৃহস্থ,—তাই আপনাকে এই ঝড়ের মধ্যে আর ডাকতে চাইনি।

তলওয়ারকর বিস্মিত হইয়া বলিল, গৃহস্থের কি দেশের সেবার অধিকার নেই? জন্মভূমি কি শুধু আপনাদের, আমাদের নয়?

অপূর্ব লজ্জা পাইয়া কহিল, সে ইঙ্গিত আমি করিনি তলওয়ারকর, আমি শুধু এই কথাই বলেছি যে আপনি বিবাহিত, আপনি গৃহস্থ। অন্যত্র আপনার অনেক দায়িত্ব, তাই এ বিদেশে এতবড় বিপদের মধ্যে যাওয়া বোধ করি আপনার ঠিক নয়।

তলওয়ারকর কহিল, বোধ হয়! তা হতে পারে। কিন্তু বিজিত, পরাধীন দেশের সেবা করার নামই ত বিপদ অপূর্ববাবু। তার যে আর কোন নাম নেই এ কথা আমি চিরদিন জানি। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিবাহটা ধর্ম, মাতৃভূমির সেবা তার চেয়ে বড় ধর্ম। এক ধর্ম আর এক ধর্মাচরণে বাধা দেবে এ যদি আমি একটা দিনও মনে করতাম বাবুজী, আমি কখনো বিবাহ করতাম না।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া অপূর্ব আর প্রতিবাদ করিল না, চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এই যুক্তিকে সে মনে মনে সমর্থন করিল না। একদিন স্বদেশের কাজে এই লোকটি বহু দুঃখ পাইয়াছে, আজও তাহার অন্তরের তেজ একেবারে নিবিয়া যায় নাই, সামান্য প্রসঙ্গেই সহসা তাহা স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব শ্রদ্ধায় বিগলিত হইল, কিন্তু তাহার অধিক আর কিছু সে সত্য সত্যই প্রত্যাশা করিল না। আহ্বান করিলেই সে যে স্ত্রী-পুত্রের মায়া কাটাইয়া, তাহাদের প্রতিপালনের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া পথের-দাবীর সভ্য হইতে ছুটিয়া যাইবে ইহা সে বিশ্বাসও করিলে না, ইচ্ছাও করিল না। স্বদেশ সেবার অধিকারের স্পর্ধা এই কয়দিনেই তাহার এতখানি উঁচু হইয়া গিয়াছিল। সহাসা এ প্রসঙ্গ সে বন্ধ করিয়া আগামী সভার হেতু ও উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বন্ধুর কাছে কিন্তু এখন সরলকণ্ঠেই ব্যক্ত করিল যে, সেই একটি দিন ভিন্ন জীবনে কখনো সে বক্তৃতা করে নাই ; সুমিত্রার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিবে না, কিন্তু একের কথা বহুজনকে শুনাইবার মত ভাষা বা অভিজ্ঞতা কোনটাই তাহার আয়ত্ত নয়।

তলওয়ারকর জিজ্ঞাসা করিল, কি করবেন তাহলে?

অপূর্ব বলিল, বক্তৃতা করার মত কেবল একটি দিনই জীবনে আমার কারখানা দেখবার সুযোগ ঘটেছে। তাদের কুলী-মজুরেরা যে অধিকাংশই পশুর জীবন যাপন করে এ আমি অসংশয়ে অনুভব করে এসেছি, কিন্তু কেন, কিসের জন্য তার ত কিছুই জানিনে।

রামদাস হাসিয়া কহিল, তবুও আপনাকে বলতে হবে? নাই-ই বললেন।

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, এতবড় মর্যাদা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন।

রামদাস নিজেই তখন বলিল, আমি কিন্তু এদের কথা কিছু জানি।

কেমন করে জানলেন?

বহুদিন এদের মধ্যে ছিলাম অপূর্ববাবু। আমার চাকরির সার্টিফিকেটগুলো একবার চেয়ে দেখলেই দেখতে পাবেন দেশে আমি কলকারখানা, কুলী-মজুর নিয়েই কাল কাটিয়েছি। যদি হুকুম করেন ত অনেক দুঃখের কাহিনীই আপনাকে শোনাতে পারি। বাস্তবিক, এদের না দেখলে যে দেশের সত্যকার ব্যথার জায়গাটাই বাদ পড়ে যায় বাবুজী।

অপূর্ব কহিল, সুমিত্রাও ঠিক এই কথাই বলেন।

রামদাস কহিল, না বলে ত উপায় নেই। এবং জানেন বলেই ত পথের-দাবীর কর্ত্রী তিনি। বাবুজী, আত্মত্যাগের উৎসই ঐখানে। দেশের সেবার বনেদ ওর পরে, ওর নাগাল না পেলে যে আপনার সকল উদ্যম, সকল ইচ্ছা মরুভূমির মত দুদিনে শুকিয়ে উঠবে!

কথাগুলো অপূর্ব এই নূতন শুনিল না, কিন্তু রামদাসের বুকের মধ্যে হইতে যেন তাহারা সশব্দে উঠিয়া আজ তাহার বুকের উপর তীক্ষ্ণ আঘাত করিল। রামদাস আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অকস্মাৎ পর্দা সরাইয়া সাহেব প্রবেশ করিতে দুজনেই চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সাহেব অপূর্বকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আমি চললাম। তোমার টেবিলের উপরে একটা চিঠি রেখে এসেচি, কালই তার জবাব দেওয়া প্রয়োজন, এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেলেন। উভয়েই ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল বেলা চারিটা বাজিয়া গেছে।

সতর

সাহেব চলিয়া গেলে আজ একটুখানি সকাল-সকাল আফিসের ছুটি দিয়া উভয়ে ফয়ার মাঠের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। পাঁচটায় মিটিং শুরু হইবার কথা, তাহার আর বিলম্ব নাই। এই দিকটায় গাড়ি মিলে না, সুতরাং একটু দ্রুত না গেলে সময়ে পৌঁছানো যাইবে কিনা সন্দেহ। পথের মধ্যে অপূর্ব কথাবার্তা প্রায় কিছুই বলিল না। তাহার জীবনের আজ একটা বিশেষ দিন। আশঙ্কা ও আনন্দের উত্তেজনায় তাহার মনের মধ্যে ঝড় বহিতেছিল। কারিকর ও কুলী-মজুরদের সম্বন্ধে কতক একখানা পুস্তক হইতে, এবং কতক রামদাসের

নিকট সে যোগাড় করিয়া লইয়াছিল, সেই-সমস্ত মনে মনে সাজাইয়া গুছাইয়া অপূর্ব নিঃশব্দে মহলা দিতে দিতে চলিতে লাগিল। ১৮৬৩ সালে বোম্বাইয়ের কোন্‌খানে সর্বপ্রথমে তুলার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তারপরে সেইগুলা বাড়িয়া বাড়িয়া আজ তাহাদের সংখ্যা কত দাঁড়াইয়াছে, তখন কুলি-মজুরদের কিরূপ শোচনীয় অবস্থা ছিল, কিরূপ দিনরাত্রি মেহন্নতে করিতে হইত, এবং এই লইয়া কবে বিলাতের তুলার কলের মালিকদের সহিত ভারতবর্ষীয় মালিকদের প্রথম বিবাদের সূত্রপাত হয়, এবং কারখানা-আইন কোন্ সনের কোন্ তারিখে কি কি বাধা অতিক্রম করিয়া পাস হইয়া এদেশে প্রথমে প্রচলিত হয় এবং শর্ত তাহাতে কি ছিল, এবং এখনই বা সেই আইন পরিবর্তিত হইয়া কিরূপে দাঁড়াইয়াছে, তখনকার ও এখনকার বিলাতের ও ভারতবর্ষের মজুরির হারে পার্থক্য কতখানি, ইহাদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার কল্পনা কবে এবং কে উদ্ভাবন করিয়াছিল, তাহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে, সে-দেশের ও এ-দেশের শ্রমিকগণের মধ্যে সুনীতি ও দুর্নীতির তুলনামূলক আলোচনা করিলে কি দেখা যায় এবং সংসারে লাভ-ক্ষতির পরিমাণ তাহাতে কোথায় নির্দিষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি সংগ্রহমালার কোথাও না খেই হারাইয়া যায় এই ভয়ে সে আপনাকে আপনি বার বার সতর্ক করিল। তাহার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ছিল, বক্তৃতার মাঝখানে হঠাৎ যে ভুলিয়া যাইবে না, অনেকগুলা একজামিন ভাল করিয়া পাস করার ফলে এ ভরসা তাহার ছিল। সুতরাং মুখ দিয়া তাহার এই-সকল নিরতিশয় সারগর্ভ বাক্যধারা কখনো বা উচ্চ-সপ্তকে, কখনো বা গম্ভীর খাদে, কখনো বা হুঙ্কার-শব্দে গর্জিয়া এক সময়ে যখন সমাপ্ত হইবে তখন বিপুল শ্রোতামণ্ডলীর করতালি-ধ্বনি হয়ত বা সহজে থামিতেই চাহিবে না। সুমিত্রার প্রসন্ন দৃষ্টি সে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। আর ভারতী! এইটুকু সময়ে এতখানি জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সে যে কি করিয়া আয়ত্ত করিল ইহারই আনন্দিত বিস্ময়ে মুখ তাহার সমুজ্জ্বল ও চোখের দৃষ্টি সজল হইয়া একমাত্র তাহরই মুখের পরে নিপতিত হইয়াছে, কল্পনায় প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইয়া অপূর্বর শিরার রক্ত সবেগে বহিতে লাগিল। তাহার দ্রুত পদক্ষেপের সমান তালে পা ফেলিয়া চলা তলওয়ারকরের পক্ষে আজ যেন দুরূহ হইয়া পড়িল। তাহারা মাঠে পৌঁছিয়া দেখিল তথায় তিল ধারণের স্থান নাই, লোক জমিয়াছে যে কত তাহার সংখ্যা হয় না। সেদিনকার বক্তা হিসাবে অপূর্বকে যাহারা চিনিতে পারিল তাহারা পথ ছাড়িয়া দিল, যাহারা চিনিত না তাহারও দেখাদেখি সরিয়া দাঁড়াইল। বিপুল জনতার মাঝখানে মাচা বাঁধা। ডাক্তার আজিও ফিরেন নাই, তাই শুধু তিনি ছাড়া পথের-দাবীর সকল সভ্যই উপনীত। বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া কোনমতে ভিড় ঠেলিয়া অপূর্ব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মাচার উপরে একখানা বেঞ্চ তখনও খালি ছিল, চোখের ইঙ্গিতে নির্দেশ করিয়া সুমিত্রা সেইখানে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। মাচার পুরোভাগে দাঁড়াইয়া পাঞ্জাবী একজন অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বক্তৃতা দিতেছিল, বোধ করি সে জবাব-পাওয়া মিস্ত্রী কিংবা এমনি কিছু একটা হইবে, অপূর্বদের অভ্যাগমে ক্ষণকালমাত্র বাধা পাইয়া পুনশ্চ দ্বিগুণ তেজে চীৎকার করিতে লাগিল। ভাল বক্তার কাছে জনতা যুক্তিতর্ক চাহে না, যাহা মন্দ তাহা কেন মন্দ এ খবরে তাহাদের আবশ্যক হয় না, শুধু মন্দ যে কত মন্দ অসংখ্য বিশেষণ যোগে ইহাই শুনিয়া তাহারা চরিতার্থ হইয়া যায়। পাঞ্জাবী মিস্ত্রীর প্রচণ্ড বলার মধ্যে বোধ করি এই গুণটাই পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় শ্রোতার দল যে কিরূপ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল তাহাদের মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝা যাইতেছিল। অকস্মাৎ কি যে একটা ভয়ানক বিঘ্ন ঘটিল। মাঠের কোন্ এক প্রান্ত হইতে অগণিত চাপাকণ্ঠে সত্রাস কলরব উঠিল, এবং পরক্ষণেই দেখা গেল বহু লোক ঠেলাঠেলি করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এবং তাহাকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পিষিয়া মাড়াইয়া প্রকাণ্ড বড় বড় ঘোড়ায় চড়িয়া বিশ-পঁচিশ জন গোরা পুলিশ কর্মচারী দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহাদের একহাতে লাগাম এবং অন্যহাতে চাবুক,—কোমরবন্ধে পিস্তল ঝুলিতেছে। তাহাদের কাঁধের লোহার জাল ঝকঝক করিতেছে, এবং রাঙ্গা মুখ ক্রোধে ও অস্তমান সূর্যকিরণে একেবারে সিঁদুরের

মত লাল হইয়া উঠিয়াছে। যে ব্যক্তি বক্তৃতা দিতেছিল তাহার বজ্রকণ্ঠ হঠাৎ কখন নীরব হইল, এবং মঞ্চ হইতে নীচের ভিড়ের মধ্যে চক্ষের পলকে সে যে কি করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল জানা গেল না।

সর্দার গোরা মঞ্চের ধারে ঘেঁষিয়া আসিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিল, মিটিং বন্ধ করিতে হইবে।

সুমিত্রা এখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তাহার উপবাসক্লিষ্ট মুখের পরে পাণ্ডুর ছায়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

সে কহিল, হুকুম।

কার হুকুম?

গবর্নমেন্টের।

কিসের জন্য?

স্ট্রাইক করার জন্য মজুরদের ক্ষ্যাপাইয়া তোলা নিষেধ।

সুমিত্র বলিল, বৃথা ক্ষেপিয়ে দিয়ে তামাশা দেখবার আমাদের সময় নেই। ইউরোপ প্রভৃতি দেশের মত এদের দলবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দেওয়াই এই মিটিং-এর উদ্দেশ্য।

সাহেব চমকিয়া কহিল, দলবদ্ধ করা? ফার্মের বিরুদ্ধে? সে ত এদেশে ভয়ানক বে-আইনি। তাতে নিশ্চয় শান্তিভঙ্গ হতে পারে।

সুমিত্রা কহিল, নিশ্চয় পারে বৈ কি! যে দেশে গভর্নমেন্ট মানেই ইংরাজ ব্যবসায়ী; এবং সমস্ত দেশের রক্ত শোষণের জন্যই যে দেশে এই বিরাট যন্ত্র খাড়া করা—

বক্তব্য তাহার শেষ হইতে পাইল না, গোরার রক্তচক্ষু আগুন হইয়া উঠিল। ধমক দিয়া বলিল, দ্বিতীয়বার এ কথা উচ্চারণ করলে আমি অ্যারেষ্ট করতে বাধ্য হব।

সুমিত্রার আচরণে এতটুকু চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না, শুধু ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া মুচকিয়া একটু হাসিল। কহিল, সাহেব, আমি অসুস্থ এবং অতিশয় দুর্বল। না হলে শুধু দ্বিতীয়বার কেন, এ কথা এক শ'বার চীৎকার করে এই লোকগুলিকে শুনিয়ে দিতাম। কিন্তু আজ আমার শক্তি নেই। এই বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

এই পীড়িত রমণীর সহজ শান্ত হাসিটুকুর কাছে সাহেব মনে মনে বোধ হয় লজ্জা পাইল, অল্‌রাইট্! আপনাকে সাবধান করে দিলাম। ঘড়ি খুলিয়া কহিল, মিটিং বন্ধ করবার আমার হুকুম আছে, কিন্তু ভেঙ্গে দেবার নেই। দশ মিনিট সময় দিলাম, দু'চার কথায় এদের শান্তভাবে যেতে বলে দিন। আর কখনো যেন এরূপ না হয়।

কিছুদিন হইতে প্রায় উপবাসেই সুমিত্রার দিন কাটিতেছিল। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও সে আজ সামান্য একটু জ্বর লইয়াই সভায় উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন শ্রান্তি ও অবসাদ তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া ধরিল। চৌকির পিঠে মাথা হেলান দিয়া সে অস্ফুটে ডাকিয়া কহিল, অপূর্ববাবু, দশ মিনিট মাত্র সময় আছে, —হয়ত তাও নেই। চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিন সঙ্ঘবদ্ধ না হলে এদের আর উপায় নেই। কারখানার মালিকেরা আজ আমাদের যে অপমান করলে মানুষ হলে এরা যেন তার শোধ নেয়। বলিতে বলিতে তাহার দুর্বার কণ্ঠ ভাঙ্গিয়া পড়িল, কিন্তু সভানেত্রীর এই আদেশ শুনিয়া অপূর্বর সমস্ত মুখ ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল। বিহ্বলনেত্রে সুমিত্রার প্রতি চাহিয়া কহিল, উত্তেজিত করা কি বে-আইনি হবে না?

সুমিত্রা বিস্মিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, পিস্তলের জোরে সভা ভেঙ্গে দেওয়াই কি আইন সঙ্গত? বৃথা রক্তপাত আমি চাইনে, কিন্তু এই কথাটা সকল শক্তি দিয়ে আপনি শুনিয়ে দিন আজকের অপমান শ্রমিকেরা যেন কিছুতে না ভোলে।

পথের-দাবীর অন্য চার-পাঁচজন পুরুষ সভ্য যাহারা মঞ্চের পরে আসীন ছিল, চেহারা দেখিয়াই মনে হয় তাহারা সামান্য এবং তুচ্ছ ব্যক্তি। হয়ত, কারিগর কিংবা এমনি কিছু হইবে। অপূর্ব নূতন হইলেও সমিতির শিক্ষিত এবং বিশিষ্ট সভ্য। এত বড় জনতাকে সম্বোধন করিবার ভার তাই তাহার প্রতি পড়িয়াছে। অপূর্ব শুষ্ককণ্ঠে কহিল, আমি ত হিন্দি ভাল

জানিনে।

সুমিত্রা কথা কহিতে পারিতেছিল না, তথাপি কহিল, যা জানেন তাতেই দু'কথা বলে দিন অপূর্ব্ববাবু সময় নষ্ট করবেন না।

অপূর্ব সকলের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। ভারতী মুখ ফিরাইয়া ছিল, তাহার অভিমত জানা গেল না, কিন্তু জানা গেল সর্দার-গোরার মনের ভাব। তাহার সহিত অত্যন্ত কাছে, অত্যন্ত স্পষ্ট এবং অত্যন্ত কঠিন চোখোচোখি হইল। বলিবার জন্য অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার ঠোঁট নড়িতে লাগিল, কিন্তু সেই দুটি কম্পিত ওষ্ঠাধর হইতে বাংলা ইংরাজি হিন্দি কোন ভাষাই ব্যক্ত হইল না। কেবল একান্ত পাণ্ডুর মুখের পরে ব্যক্ত যাহা হইল, তাহা আর যাহারই হউক পথের-দাবীর সভ্যদের জন্য নহে।

তলওয়ারকর উঠিয়া দাঁড়াইল। সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, আমি বাবুজীর বন্ধু। আমি হিন্দি জানি। আদেশ পাই ত ওঁর বক্তব্য আমি চেঁচিয়ে সকলকে শুনিয়ে দিই। ভারতী মুখ ফিরিইয়া চাহিল, সুমিত্রা বিস্মিত তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া স্থির হইয়া রহিল এবং এই দুটি নারীর উন্নত চোখের সম্মুখে লজ্জিত, অভিভূত বাক্যহীন অপূর্ব স্তব্ধ নতমুখে জড়বস্তুর মত বসিয়া পড়িল।

রামদাস ফিরিয়া দাঁড়াইল। এবং, তাহার দক্ষিণে বামে ও সম্মুখে বিক্ষুব্ধ, ভীত চঞ্চল জনসমষ্টিকে সম্বোধন করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ভাই সব! আমার অনেক কথা বলবার ছিল, কিন্তু এরা গায়ের জোরে আমাদের মুখ বন্ধ করেছে। এই বলিয়া সে আঙুল দিয়া সুমুখের পুলিশ সওয়ারগণকে দেখাইয়া বলিল, এই ডালকুত্তাদের যারা আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে, তারা তোমাদেরই কারখানার মালিকেরা। তারা কিছুতেই চায় না যে কেউ তোমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তোমাদের জানায়। তোমরা তাদের কল চালাবার, বোঝা বইবার জানোয়ার! অথচ, তোমরাও যে তাদেরি মত মানুষ, তেমনি পেট ভরে খাবার, তেমনি প্রাণ খুলে আনন্দ করবার জন্মগত অধিকার তোমরাও যে ভগবানের কাছ থেকে পেয়েচ, এই সত্যটাই এরা সকল শঠতা দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চায়। শুধু একবার যদি তোমাদের ঘুম ভাঙ্গে, কেবল একটিবার মাত্র যদি এই সত্য কথাটা বুঝতে পারো যে তোমরাও মানুষ, তোমরা যত দুঃখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও তবুও মানুষ, তোমাদের মানুষের দাবী কোন ওজুহাতে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, তা হলে, এই গোটাকতক কারখানার মালিক তোমাদের কাছে কতটুকু? এই সত্য কি তোমরা বুঝবে না? এ যে কেবল ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের আত্মরক্ষার লড়াই! এতে দেশ নেই, জাত নেই, ধর্ম মতবাদ নেই—হিন্দু নেই, মুসলমান নেই, —জৈন, শিখ কোন কিছুই নেই, --আছে শুধু ধনোন্মত্ত মালিক আর তার অশেষ প্রবঞ্চিত অভুক্ত শ্রমিক! তোমাদের গায়ের জোরকে তারা ভয় করে, তোমাদের শিক্ষার শক্তিকে তারা অত্যন্ত সংশয়ের চোখে দেখে, তোমাদের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষায় তাদের রক্ত শুকিয়ে যায়! অক্ষম, দুর্বল, মূর্খ, দুর্নীতিপরায়ণ তোমরাই যে তাদের বিলাস-ব্যসনের একমাত্র পাদপীঠ! তাই, মাত্র তোমাদের জীবনধারণটুকুর বেশী তিলার্ধ যে তারা স্বেচ্ছায় কোন দিন দেবে না—এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করা কি তোমাদের এতই কঠিন! আর সেই কথা মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করার অপরাধেই কি আজ এই গোরাগুলোর কাছে আমার লাঞ্ছনাই সার হবে! দরিদ্রের এই বাঁচিবার লড়াইয়ে তোমরা কি সকল শক্তি দিয়ে যোগ দিতে পারবে না?

সর্দার-গোরা এদেশে যেটুকু হিন্দি-ভাষা জ্ঞানলাভ করিয়াছিল তাহাতে বক্তৃতার মর্ম প্রায় কিছুই বুঝিল না, কিন্তু সমবেত শ্রোতৃবর্গের মুখে চোখে উত্তেজনার চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া নিজেও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহার রিস্টওয়াচের প্রতি বক্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল, আর পাঁচ মিনিট মাত্র সময় আছে, আপনি শেষ করুন।

তলওয়ারকর কহিল, শুধু পাঁচ মিনিট! তার বেশী এক মুহূর্তও নয়! তবুও এই অমূল্য ক'টি মিনিট আমি কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেব না। ভাই বঞ্চিতের দল! তোমাদের কাছে

আমার মিনতি—আমাদের তোমরা অবিশ্বাস করো না। শিক্ষিত বলে, ভদ্রবংশের বলে, কারখানায় দিনমজুরি করিনে বলে আমাদের সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে নিজেদের সর্বনাশ তোমরা নিজেরাই করো না। তোমাদের ঘুম ভাঙ্গাবার প্রথম শঙ্খধ্বনি সর্বদেশে সর্বকালে আমরাই করে এসেছি। আজ হয়ত না বুঝতেও পারো, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, এই পথের-দাবীর চেয়ে বড় বন্ধু এ-দেশে তোমাদের আর কেউ নেই। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক ও কঠিন হইয়া আসিতেছিল, তথাপি প্রাণপণে চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল, আমি বহুদিন তোমাদের মধ্যে কাজ করে এসেছি, আমাদের তোমরা চেনো না, কিন্তু আমি তোমাদের চিনি। যাদের তোমরা মনিব বলে জানো, একদিন আমি তাদেরই একজন ছিলাম। তারা কিছুতেই তোমাদের মানুষ হ'তে দেবে না। কেবল পশুর মত করে রেখেই তোমাদের মনুষ্যত্বের অধিকার তারা আটকে রাখতে পারে, আর কোন মতেই না—এই কথাটা আজ তোমাদের না বুঝলেই নয়। তোমরা অসাধু, তোমরা উচ্ছৃঙ্খল, তোমরা ইন্দ্রিয়াসক্ত—তাদের মুখ থেকে এই-সকল অপবাদই তোমরা চিরদিন শুনে এসেছ। তাই, যখনই তোমরা তোমাদের দাবী জানিয়েছ, তখনই তোমাদের সকল দুঃখ-কষ্টের মূলে তোমাদের অসংযত চরিত্রকেই দায়ী করে তারা তোমাদের সর্বপ্রকার উন্নতিকে নিবারিত করে এসেছে,—কেবল এই মিথ্যেই তোমাদের তারা অনুক্ষণ বুঝিয়ে এসেছে,—ভাল না হলে কারও উন্নতই কোন দিন হতে পারে না। কিন্তু, আজ আমি তোমাদের অসঙ্কোচে এবং একান্ত অকপটে জানাতে চাই ঐ উক্তি তাদের কখনই সম্পূর্ণ সত্য নয়। তোমাদের চরিত্রই শুধু তোমাদের অবস্থার জন্য দায়ী নয়; তোমাদের এই প্রবঞ্চিত হীন অবস্থাও তোমাদের চরিত্রের জন্য দায়ী। তাদের অসত্যকে আজ তোমাদের নির্ভয়ে প্রতিবাদ করতেই হবে। প্রবলকণ্ঠে তোমাদের ঘোষণা করতেই হবে কেবল টাকাই সবটুকু নয়। বলিতে বলিতে তাহার নীরস কণ্ঠ অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিল কহিল, বিনাশ্রমে সংসারে কিছুই উৎপন্ন হয় না—তাই, শ্রমিকও ঠিক তোমাদেরই মত মালিক,—ঠিক তোমাদের মতই সকল বস্তু, সকল কারখানার অধিকারী। এমনি সময়ে কে একজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সর্দার-গোরার কানে কানে কি একটা কথা বলিতেই তাহার রক্তচক্ষু জ্বলন্ত অঙ্গারের মত উগ্র হইয়া উঠিল। সে গর্জন করিয়া বলিল, স্টপ্‌! এ চলবে না। এতে শান্তি ভঙ্গ হবে।

অপূর্ব চমকিয়া উঠিল। রামদাসের জামার খুঁট ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল,—থামো, রামদাস থামো। এই নিঃসহায় নির্বান্ধব বিদেশে যে তোমার স্ত্রী আছে,—তোমার ছোট্ট একফোঁটা মেয়ে আছে!

রামদাস কর্ণপাতও করিল না। চীৎকার করিয়া কহিতে লাগিল—এরা অন্যায়কারী! এরা ভীরু! সত্যকে এরা কোনমতেই তোমাদের শুনতে দিতে চায় না! কিন্তু এরা জানে না সত্যকে গলা টিপে মারা যাবে না। সে চিরজীবী! সে অমর! গোরা ইহার অর্থ বুঝিল না। কিন্তু অকস্মাৎ সহস্র লোহার সর্বাঙ্গ হইতে ঠিকরিয়া আসিয়া যেন তীক্ষ্ণ উত্তাপের ঝাঁজ তাহার মুখে লাগিল। সে হুঙ্কার দিয়া উঠিল, এ চলবে না। এ রাজদ্রোহ!

চক্ষের পলকে পাঁচ-ছয়জন ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া রামদাসের দুই হাত ধরিয়া তাহাকে সবলে টানিয়া নীচে নামাইল। তাহার দীর্ঘদেহ ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ারের মাঝখানে এক মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল, কিন্তু তীক্ষ্ণ তীব্র কণ্ঠস্বর তাহার কিছুতেই চাপা পড়িল না, এই বিক্ষুব্ধ বিপুল জনতার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল, --ভাই সকল, কখনো হয়ত আর আমাকে দেখবে না, কিন্তু মানুষ হয়ে জন্মাবার মর্যাদা যদি না মনিবের পায়ে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে থাকো ত এতবড় উৎপীড়ন, এতবড় অপমান তোমরা সহ্য করো না!

কিন্তু কথা তাহার শেষ না হইতেই যেন দক্ষযজ্ঞ বাধিয়া গেল। ঘোড়া ছুটিল, চাবুক চলিল, এবং অবমানিত অভিভূত উত্রস্ত শ্রমিকের দল ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতে কে যে কাহার ঘাড়ে পড়িল এবং কে যে কাহার পদতলে গড়াইতে লাগিল তাহার ঠিকানা রহিল না।

জন-কয়েক দলিত পিষ্ট আহত লোক ছাড়া সমস্ত মাঠ জনশূন্য হইতে বিলম্ব ঘটিল না। কোনমতে খোঁড়াইতে খোঁড়াতেই যাহার তখনও চলিয়াছিল তাহাদেরই প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া সুমিত্রা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, এবং তাহারই অনতিদূরে বসিয়া অপূর্ব ও আর একজন নির্বাক নতমুখে তেমনি বিমূঢ়ের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল। যে ব্যক্তি গাড়ি ডাকিতে গিয়াছিল মিনিট-দশেক পরে গাড়ি লইয়া আসিলে সুমিত্রা নিঃশব্দে ভারতীর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে গিয়া তাহাতে উপবেশন করিলেন। নিজে হইতে কথা না কহিলে তাঁহার চিন্তার ব্যাঘাত করিতে কেহ তাঁহাকে ব্যর্থ প্রশ্ন করিত না। বিশেষতঃ, আজ তিনি অসুস্থ, শ্রান্ত ও উৎপীড়িত। ভারতী ফিরিয়া আসিয়া কহিল, চলুন।

অপূর্ব মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল কি যেন চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় আমাকে যেতে বলেন?

ভারতী কহিল, আমার বাড়িতে।

অপূর্ব কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিল। শেষে আস্তে আস্তে বলিল, আপনারা ত জানেন সমিতির আমি অযোগ্য। ওখানে আর ত আমার ঠাঁই হতে পারে না।

ভারতী প্রশ্ন করিল, তাহলে কোথায় এখন যাবেন? বাসায়?

বাসায়? একবার যেতে হবে,—এই বলিয়াই অপূর্বর চক্ষু সজল হইয়া আসিল, তাহা কোনমতে সংবরণ করিয়া বলিল, কিন্তু এই বিদেশে আর একটা জায়গায় যে কি করে যাব আমি ভেবে পাইনে ভারতী!

সুমিত্রা গাড়ির মধ্যে হইতে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন, তোমরা এস।

ভারতী পুনশ্চ কহিস, চলুন।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া বলিল, পথের-দাবীতে আর আমার স্থান নেই।

ভারতী হঠাৎ যেন তাহার হাত ধরিতে গেল, কিন্তু সামলাইয়া লইয়া একমুহূর্ত তাহার মুখের পরে দুই চক্ষের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া চুপি চুপি কহিল, পথের-দাবীতে স্থান নাও থাকতে পারে, কিন্তু আর একটা দাবী থেকে আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারে সংসারে এমন ত কিছুই নেই, অপূর্ববাবু!

গাড়ি হইতে সুমিত্রা পুনশ্চ অসহিষ্ণুকণ্ঠে প্রশ্ন করল, তোমাদের আসতে কি দেরি হবে ভারতী?

ভারতী হাত নাড়িয়া গাড়োয়ানকে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিয়া কাহল, আপনি যান, এটুকু আমরা হেঁটেই যাবো।

পথে চলিতে চলিতে অপূর্ব হঠাৎ বলিয়া উঠিল, তুমি আমার সঙ্গে চল ভারতী।

ভারতী কহিল, সঙ্গেই ত যাচ্ছি।

অপূর্ব বলিল, সে নয়। তলওয়ারকরের স্ত্রীর কাছে আমি কি করে যাবো, কি গিয়ে তাঁকে বলব, কি তাঁর উপায় করব আমি ত কোন মতেই ভেবে পাইনে। রামদাসকে এখানে সঙ্গে করে আনবার দুর্বুদ্ধি আমার কেন হল?

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। অপূর্ব কহিতে লাগিল, এই বিদেশে হঠাৎ কি সর্বনাশই হয়ে গেল। আমি ত কূলকিনার দেখতে পাইনে।

ভারতী কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিল না। উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলিবার পরে অপূর্ব উপায়হীন দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া সহসা গর্জিয়া উঠিল, আমার দোষ কি? বার-বার সাবধান করে দিলেও কেউ যদি গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলে তাকে বাঁচাবো আমি কি করে? আমি কি বলেছিলাম যা-তা বক্তৃতা দিতে! স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে, ঘর-সংসার আছে এ হুঁশ যার নেই—সে মরবে না তো মরবে কে? খাটুক আবার দু'বছর জেল!

ভারতী বলিল, আপনি কি তাঁর স্ত্রীর কাছে এখন যাবেন না?

অপূর্ব তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কাহল, যেতে হবে বৈ কি! কিন্তু, সাহেবকেই বা কাল কি জবাব দেব? তোমাকে কিন্তু বলে রাখছি ভারতী, সাহেব একটা কথা বললেই

আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

দিয়ে কি করবেন?

বাড়ি চলে যাবো। এদেশে মানুষ থাকে?

ভারতী বলিল, তাঁর উদ্ধারের চেষ্টাও করবেন না?

অপূর্ব থামিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল না একজন ভাল ব্যারিস্টারের কাছে যাই ভারতী। আমার প্রায় এক হাজার টাকা আছে,—এতে হবে না? আমার ঘড়িটড়িগুলো বিক্রি করলে হয়ত, আরও পাঁচ-ছ'শ টাকা হবে। চল না যাই।

ভারতী বলিল, কিন্তু তাঁর স্ত্রীর কাছে যাওয়া যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন অপূর্ববাবু! আমার সঙ্গে আর যাবেন না, এইখান থেকেই একটা গাড়ি নিয়ে স্টেশনে চলে যান। তাঁর কি চাই, কি অভাব, অন্ততঃ একটা খবর দেওয়াও যে বড় দরকার।

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কিন্তু তথাপি সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে লাগিল। ভারতী বলিল, এটুকু আমি একাই যেতে পারবো, আপনি ফিরুন।

জবাব দিতে বোধ হয় অপূর্বর বাধিতেছিল, কিন্তু ক্ষণেকমাত্র। তাহার পরেই কহিল, আমি একলা যেতে পারব না।

ভারতী বলিল, বাসা থেকে তেওয়ারীকে না হয় সঙ্গে নেবেন।

না, তুমি সঙ্গে চল।

আমার যে জরুরী কাজ আছে!

তা হোক, চল।

কিন্তু কেন আমাকে এত করে জড়াচ্চেন অপূর্ববাবু?

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল।

ভারতী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিল, কহিল, আচ্ছা, চলুন আমার সঙ্গে। নিজের কাজটুকু আগে সেরে নিই।

পথের মধ্যে ভারতী সহসা এক সময়ে কহিল, যে আপনাকে চাকরি করতে বিদেশে পাঠিয়েছে সে আপনাকে চেনে না। তিনি মা হলেও, না। তেওয়ারী দেশে যাচ্ছে, আমি নিজে গিয়ে উদ্যোগ করে তার সঙ্গে আপনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব।

অপূর্ব মৌন হইয়া রহিল। ভারতী বলিল, কৈ, উত্তর দিলেন না যে বড়?

অপূর্ব কহিল, উত্তর দেবার কিছু ত নেই। মা বেঁচে না থাকলে আমি সন্ন্যাসী হতুম।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া বলিল, সন্ন্যাসী? কিন্তু মা ত বেঁচে আছেন?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। দেশের পল্লীগ্রামে আমাদের একটা ছোট বাড়ি আছে, মাকে আমি সেইখানে নিয়ে যাবো।

তারপরে?

আমার যে এক হাজার টাকা আছে তাই দিয়ে একটা ছোট্ট মুদির দোকান খুলবো। আমাদের দুজনের চলে যাবে।

ভারতী কহিল, তা যেতে পারে। কিন্তু হঠাৎ এর দরকার হ'ল কিসে?

অপূর্ব বলিল, আজ আমি নিজেকে চিনতে পেরেছি। শুধু মা ছাড়া সংসারে আমার দাম নেই। ভগবান করুন এর বেশী যেন না আমি কারো কাছে কিছু চাই।

ভারতী পলকমাত্র তাহার মুখের পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মা আপনাকে বুঝি বড্ড ভালবাসেন?

অপূর্ব কহিল, হাঁ। চিরকাল মা'র দুঃখে-দুঃখেই কাটলো, কেবল ভয় হয় তা আর যেন না বাড়ে। আমার সকল কাজেকর্মে আমার আধখানা যেন মা হয়ে আমার আর আধখানাকে দিবারাত্র আঁকড়ে ধরে থাকে। এ থেকে আমি একমুহূর্ত ছাড়া পাইনে, ভারতী তাই আমি ভীতু, তাই আমি সকলের অশ্রদ্ধার পাত্র। এই বলিয়া তাহার মুখ দিয়া সহসা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল।

ইহার জবাব ভারতী দিল না, কেবল হাতখানি তাহার ধীরে ধীরে অপূর্বর হাতের মধ্যে ধরা দিয়া নীরবে পথ চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, অপূর্ব উদ্বিগ্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, রামদাসের পরিবারের কি উপায় করবে ভারতী? শুধু দাসী ছাড়া এদেশে তাদের দেশের লোক বোধ করি কেউ নেই। থাকলেই বা কেউ কি তাদের ভার নেবে?

ভারতী নিজেও কিছু ভাবিয়া পায় নাই, শুধু সাহস দিবার জন্যই কহিল, চলুন ত গিয়ে দেখি। উপায় একটা হবেই।

অপূর্ব বুঝিল ইহা ফাঁকা কথা। তাহার মন কোন সান্ত্বনাই মানিল না, কহিল, তোমাকে হয়ত সেখানে থাকতে হবে।

কিন্তু আমি ত ক্রীশ্চান, তাঁদের কি কাজেই বা লাগবো?

তা বটে। কথাটা নূতন করিয়া অপূর্বর বিঁধিল।

উভয়ে বাসায় আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেছে। এই রাত্রে কেমন করিয়া যে কি হইবে চিন্তা করিয়া মনে মনে তাহাদের ভয় ও উদ্বেগের সীমা ছিল না। নীচের ঘর খোলা ছিল, ভিতরে পা দিয়াই ভারতী দেখিতে পাইল ওদিকের খোলা জানালার ধারে ইজিচেয়ারে কে একজন শুইয়া আছে। সে মুখ তুলিয়া চহিতেই ভারতী চিনিতে পারিয়া উল্লাসে কলরব করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, কখন এলেন আপনি? সুমিত্রা-দিদির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

না।

অপূর্ব কহিল, ভয়ানক কাণ্ড হয়ে গেছে ডাক্তারবাবু, আমাদের একাউন্টেন্ট রামদাস তলওয়ারকরকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।

ভারতী বলিল, ইন্‌সিনে তাঁর বাসা। সেখানে স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে তাঁরা এখনো কিছুই জানেন না।

অপূর্ব বলিল, অত দূরে এই অন্ধকার রাতে—কি ভয়ানক বিপদই ঘটলো ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার হাই তুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া হাসিলেন, ভারতীকে কহিলেন, আমি বড় শ্রান্ত, আমাকে একটু চা তৈরি করে খাওয়াতে পারো ভাই?

ভারতী বলিল, পারি, কিন্তু আমাদের যে এখুনি বেরোতে হবে ডাক্তারবাবু।

কোথায়?

ইন্‌সিনে। তলওয়ারকরবাবুর বাসায়।

কোন প্রয়োজন নেই।

অপূর্ব সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল, প্রয়োজন নেই কিরকম ডাক্তারবাবু? তাঁর বিপন্ন পরিবারের ব্যবস্থা করা, অন্ততঃ একটা খোঁজখবর নেওয়া ত প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু সে ভার আমার ; আপনারা বড় জোর এই অন্ধকারে সারারাত্রি ধরে ইন্‌সিনে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে পারবেন,—শেষ পর্যন্ত হয়ত বাড়িটাও চিনে বার করতে পারবেন না। এই বলিয়া তিনি পুনরায় হাস্য করিয়া কহিলেন, তার চেয়ে বরঞ্চ আপনি বসুন, এবং ভারতী চা তৈরি করে আনুক। কিন্তু আপনার বুঝি চলে না? তা বেশ, হোটেলের বামুনঠাকুর পবিত্রভাবে কিছু খাবার তৈরি করে দিয়ে যাক, আহারাদি করে বিশ্রাম করুন।

ভারতী নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্লচিত্তে চা তৈরি করিতে উপরে যাইতেছিল, কিন্তু অপূর্ব কিছুই বিশ্বাস করিল না। ডাক্তারের সমস্ত কথাবার্তাই তাহার কাছে হেঁয়ালির মত ঠেকিয়া অতিশয় খারাপ বোধ হইল। ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে বলিল, এই রাত্রে কষ্ট করা থেকে তুমি হয়ত বেঁচে গেলে, কিন্তু আমার দায়িত্ব ঢের বেশী। যত রাত্রিই হক আমাকে সেখানে যেতেই হবে।

তাহার মন্তব্য শুনিয়া ভারতী থমকিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তখনই ডাক্তারের চোখের দিকে চাহিয়া আবার স্বচ্ছন্দমনে কাজে চলিয়া গেল।

ডাক্তারবাবু একখণ্ড মোমবাতি জ্বালাইয়া পকেট হইতে কয়েকখানা চিঠি বাহির করিয়া জবাব লিখিতে বসিলেন। মিনিট-দশেক নীরবে অপেক্ষা করিয়া অপূর্ব বিরক্ত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল, চিঠিগুলো কি অত্যন্ত জরুরী?

ডাক্তার মুখ না তুলিয়াই কহিলেন, হাঁ।

অপূর্ব বলিল, ওদিকের একটা ব্যবস্থা হওয়াও ত কম জরুরী নয়। আপনি কি তাঁর বাসায় কাউকে পাঠাবেন না?

ডাক্তার কহিলেন, এত রাত্রে? কাল সকালের পূর্বে বোধ হয় আর লোক পাওয়া যাবে না।

অপূর্ব বলিল, তাহলে তার জন্য আর আপনি চিন্তিত হবেন না, সকালে আমি নিজেই যেতে পারবো। ভারতীকে নিষেধ না করেল আমরা আজই যেতে পারতাম, এবং আমার মনে হয় সেইটেই সবচেয়ে ভাল হতো।

ডাক্তারের চিঠি লেখায় বাধা পড়িল না, কারণ তিনি মুখ তুলিবারও অবকাশ পাইলেন না, শুধু বলিলেন, আবশ্যক ছিল না।

অপূর্ব অন্তরের উষ্মা যথাসাধ্য চাপিয়া কহিল, আবশ্যকতার ধারণা এ ক্ষেত্রে আপনার এবং আমার এক নয়। আমার সে বন্ধু।

ভারতী চায়ের সরঞ্জাম লইয়া নীচে আসিল এবং পেয়ালা-দুই চা তৈরি করিয়া দিয়া কাছে বসিল। ডাক্তারের চিঠি লেখা এবং চা খাওয়া দুই কাজই একসঙ্গে চলিতে লাগিল। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে কাটিবার পরে সহসা ভারতী অভিমানের সুরে বলিয়া উঠিল, আপনি সদাই ব্যস্ত। দু'দণ্ড যে আপনার কাছে বসে কথা শুনেবো সে সময়টুকুও আমরা পাইনে।

ডাক্তারের অন্যমনস্ক কানের মধ্যে গিয়া রমণীর এই অভিমানের সুর বাজিল, তিনি চায়ের পেয়ালা হইতে মুখ সরাইয়া হাসিমুখে কহিলেন, করি কি ভাই, এই দুটোর ট্রেনেই আবার রওনা হতে হবে।

সংবাদ শুনিয়া ভারতী চকিত হইল, এবং অপূর্বর মনের সংশয় তাহার বন্ধুর সম্বন্ধে একেবারে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, একটা রাতও কি আপনি বিশ্রামের অবকাশ পাবেন না ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার চায়ের পেয়ালা নিঃশেষ করিয়া কহিলেন, আমার শুধু একটি দিনের অবসর আছে ভাই ভারতী, সে কিন্তু আজও আসেনি।

ভারতী বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সে কবে আসবে?

ডাক্তার ইহার উত্তর দিলেন না।

অপূর্বর মনের মধ্যে কেবল একটা কথা তোলপাড় করিতেছিল, সে তাহারই সূত্র ধরিয়া বলিল, সমিতির সভ্য না হয়েও রামদাস যে শাস্তি ভোগ করতে যাচ্চে তা অসাধারণ।

ডাক্তার কহিলেন, শাস্তি নাও হতে পারে।

অপূর্ব কহিল, না হয় ত সে তার ভাগ্য। কিন্তু যদি হয় সমস্ত অপরাধ আমার। আমিই তাকে এনেছিলাম।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু মুচকিয়া হাসিয়া চুপ করিলেন।

অপূর্ব কহিতে লাগিল, দেশের জন্য যে ব্যক্তি দু'বছর জেল খেটেচে, অসংখ্য বেতের দাগ যার পিঠ থেকে আজও মোছেনি, এই বিদেশে স্ত্রী-পুত্র যার শুধু তারই মুখ চেয়ে আছে, তার এতবড় সাহস অসামান্য! এর আর তুলনা নেই।

তাহার বন্ধুর প্রতি উচ্ছ্বসিত এই অকৃত্রিম প্রশংসা-বাক্যের মধ্যেও একটা গোপন আঘাত ছিল, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। ডাক্তার মুখ উজ্জ্বল করিয়া কহিলেন, তাতে আর সন্দেহ কি অপূর্ববাবু! পরাধীনতার আগুনে বুকের মধ্যে যার অহোরাত্র জ্বলে যাচ্চে এ

ছাড়া তার ত উপায় নেই! সাহেবের দোকানের বড় চাকরি বা ইন্‌সিনের বাসায় স্ত্রী-পুত্র-পরিবার কিছুই তাকে ঠেকাতে পারে না,—এই তার একটিমাত্র পথ।

দুশ্চিন্তা ও তীব্র সংশয়ে অপূর্বর বুদ্ধি ও জ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া না থাকিলে সে এত বড় ভুল করিতে পারিত না। ডাক্তারের উক্তিকে সে শ্লেষ কল্পনা করিয়া হঠাৎ যেন ক্ষেপিয়া গেল। কহিল, আপনি তাঁর মহত্ত্ব অনুভব না করতে পারেন, কিন্তু সাহেবের দোকানের চাকরি তলওয়ারকরের মত মানুষকে ছোট করে দিতে পারে না। আমাকে আপনি যত ইচ্ছে ব্যঙ্গ করুন, কিন্তু রামদাস কোন অংশেই আপনার ছোট নয়। এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, আমি নিশ্চিতই জানি। তাঁকে ত আমি ছোট বলিনি অপূর্ববাবু।

অপূর্ব কহিল, বলেছেন। তাঁকে এবং আমাকে আপনি পরিহাস করেছেন। কিন্তু আমি জানি জন্মভূমি তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। সে নির্ভীক! সে বীর! আপনার মত সে লুকিয়ে বেড়ায় না। আপনার মত পুলিশের ভয়ে ছদ্মবেশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে না! আপনি ত ভীরু।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে ভারতী অবাক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর সে সহিতে পারিল না। দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আপনি কাকে কি বলচেন অপূর্ববাবু? হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন কি?

অপূর্ব কহিল, না পাগল হইনি। উনি যেই হোন, রামদাস তলওয়ারকরের পদধূলির যোগ্য নন, এ কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলব। তার তেজ, তার বাগ্মিতা, তার নির্ভীকতাকে ইনি মনে মনে ঈর্ষা করেন। তাই তোমাকে যেতে দিলেন না, তাই আমাকে কৌশলে বাধা দিলেন।

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইল। আপনাকে অপরিসীম যত্নে সংযত করিয়া সহজকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আমি অপমান করতে পারব না, কিন্তু এখান থেকে আপনি যান অপূর্ববাবু। আপনাকে আমরা ভুল বুঝেছিলাম। ভয়ে যার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না সে উন্মাদের এখানে ঠাঁই নেই। আপনার কথাই সত্য, পথের-দাবীতে আপনার স্থান হবে না। এর পরে আর কোন ছলে, কোন দিন আমার বাসায় ঢোকবার চেষ্টা করবেন না।

অপূর্ব নিরুত্তরে উঠিয়া দাঁড়াতেই ডাক্তার তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, আর একটু বসুন অপূর্ববাবু, এই অন্ধকারে একলা যাবেন না। আমি স্টেশনে যাবার পথে আপনাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাবো।

অপূর্বর চেতনা ফিরিয়া আসিতেছিল, সে পুনরায় আধোমুখে বসিয়া পড়িল।

ভুক্তাবশিষ্ট বিস্কুটগুলি ডাক্তার পকেটে পুরিতেছিলেন দেখিয়া ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, ওকি হচ্চে আপনার?

রসদ সংগ্রহ করে রাখচি ভাই।

সত্য সত্যই আজ রাত্রে যাবেন নাকি?

নইলে কি মিথ্যামিথ্যিই অপূর্ববাবুকে ধরে রাখলাম? সবাই মিলে এমন অবিশ্বাস করলে আমি বাঁচি কি করে বল ত? এই বলিয়া তিনি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতে ভারতী অভিমান করিয়া কহিল, না, আজ আপনার যাওয়া হবে না, আপনি বড় ক্লান্ত। তা ছাড়া সুমিত্রাদিদি অসুস্থ, আপনি কেবলি কোথায় চলে যাবেন,—একটা কথা শুনতে পাইনে, একটা উপদেশ নিতে পাইনে, পথের-দাবী একলা আমি চালাই কি করে বলুন ত? আমিও তাহলে যেখানে খুশি চলে যাবো।

লেখা চিঠিগুলি ডাক্তার তাহার হাতে দিয়া হাসিয়া কহিলেন, একখানি তোমার, একখানি সুমিত্রার, অন্যখানি তোমাদের পথের-দাবীর। আমার উপদেশ বল, আদেশ বল, সবই এর মধ্যে পাবে।

চিঠিগুলি মুঠার মধ্যে লইয়া ভারতী মুখ মলিন করিয়া বলিল, এবার কি আপনি বেশী

দিনের জন্যে যাচ্চেন?

দেবা ন জানন্তি,—বলিয়া ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমাদের মুশকিল হয়েছে, না মুখ দেখে, না কথা শুনে আপনার মনের কথা জানবার জো আছে। ঠিক করে বলে যান কবে ফিরবেন?

ঐ যে বললাম, দেবা ন জানন্তি—

না তা হবে না, সত্যি করে বলুন কবে ফিরবেন?

এত তাগাদা কেন বল ত?

ভারতী কহিল, কি জানি এবার কেমন যেন ভয় করচে। মনে হচ্চে যেন সব ভেঙ্গে চুরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। বলিতে বলিতে সহসা তাহার চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তাহার মাথার উপর হাত রাখিয়া ডাক্তার রহস্যভরে কহিলেন, হবে না গো, হবে না,—সব ঠিক হয়ে যাবে। বলিয়াই হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কিন্তু এই মানুষটির সঙ্গে এমন মিছেমিছি ঝগড়া করলে কিন্তু সত্যিই কাঁদতে হবে তা' বলে রাখচি। অপূর্ব্ববাবু রাগ করেন বটে কিন্তু ভাল যাকে বাসেন তাকে ভালবাসতেও জানেন। মানুষের মধ্যে যে হৃদয়বস্তুটি আছে সে আমাদের সংসর্গে এখনো শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়নি। ফুটন্ত পদ্মটির মত ঠিক তাজা আছে।

ভারতী কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল কিন্তু অপূর্ব হঠাৎ মুখ তুলিতেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ বন্ধ হইয়া গেল।

এমনি সময়ে দ্বারের কাছে আসিয়া একখানা ঘোড়ার গাড়ি থামিল, এবং অনতিকাল মধ্যেই দুইজন লোক ভিতরে প্রবেশ করিল। একজনের পরিধানে আগাগোড়া সাহেবি পোশাক, ডাক্তার ভিন্ন বোধ করি সকলেরই অপরিচিত ; আর একজন রামদাস তলওয়ারকর। অপূর্বর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কলরব করিয়া সে বন্ধুকে সংবর্ধনা করিতে গেল না। রামদাস অগ্রসর হইয়া ডাক্তারের পদধূলি গ্রহণ করিল। অপূর্বর কাছে ইহা অদ্ভুত ঠেকিল। কিন্তু ডাক্তারের মুখের প্রতি সে শুধু নীরবে নেত্রপাত করিয়া নীরব হইয়াই রহিল।

ইংরাজি পোশাক-পরা লোকটি ইংরাজিতেই কথা কহিলেন, বলিলেন, জামিনের জন্যই এত বিলম্ব ঘটিল। কেস্ বোধ হয় গবর্নমেন্ট চালাবে না।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তার মানে গবর্নমেন্টকে তুমি আজও চেনোনি কৃষ্ণ আইয়ার।

এই কথায় রামদাস সহাস্যে যোগ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মাঠ থেকে থানা পর্যন্ত আপনাকে সকল সময়েই সঙ্গে দেখেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ কখন যে অন্তর্হিত হয়েছিলেন সেইটাই জানতে পারিনি!

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, অন্তর্ধানের গভীর কারণ ঘটেছিল রামদাসবাবু। এমন কি রাতারাতি এখান থেকেও অন্তর্হিত হ'তে হ'ল।

রামদাস কহিল, সেদিন রেলওয়ে স্টেশনে আপনাকে চিনতে পেরেছিলাম।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, জানি। কিন্তু সোজা বাসায় না গিয়ে এত রাত্রে এখানে কেন?

রামদাস কহিল, আপনাকে প্রণাম করতে। পুনার সেন্ট্রাল জেলে আমি যাবার পরেই আপনি চলে গেলেন। তখন সুযোগ পাইনি। নীলকান্ত যোশীর কি হ'ল জানেন? সে ত আপনার সঙ্গেই ছিল।

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ। ব্যারাকের পাঁচিল টপকাতে পারলে না বলে সিঙ্গাপুরে তার ফাঁসি হ'ল।

অপূর্বর কাছে এই সকল অচিন্তনীয়, অত্যদ্ভুত দুঃস্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। সে আর থাকিতে না পারিয়া অকস্মাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, ডাক্তারবাবু, আপনারও কি তাহলে ফাঁসি হতো?

ডাক্তার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। এই হাসি দেখিয়া অপূর্বর মাথার চুল পর্যন্ত শিহরিয়া উঠিল।

রামদাস উৎসুক হইয়া কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, একবার এই সিঙ্গাপুরেই আমাকে বছর-তিনেক আটক থাকতে হয়েছিল, কর্তৃপক্ষরা আমাকে চেনেন। তাই সোজা রাস্তাটা এড়িয়ে ব্যাঙ্ককের পথে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে টেভয়ে এসে পৌঁছুলাম। জোর কপাল! হঠাৎ বনের মধ্যে একটা হাতীর বাচ্চাও ভগবান পাইয়ে দিলেন। সেটা সঙ্গে থাকায় বরাবর ভারী সুবিধে হয়ে গেল। শেষে হাতীর বাচ্চা বিক্রি করে দিশি জাহাজে নারকেল চালানের সঙ্গে নিজেকে চালান দিয়ে মাসতিনেকের মধ্যে একেবারে আরাকানে এসে পাড়ি জমালাম। খাসা থাকা গিয়েছিল রামদাসবাবু, হঠাৎ থানার মধ্যে আজ এক পরম বন্ধুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা-সাক্ষাৎ। ভি. এ. চেলিয়া তাঁর নাম, বড্ড স্নেহ করেন আমাকে। বহুদিনের অদর্শনে খুঁজতে খুঁজতে একেবারে সিঙ্গাপুর থেকে বর্মা মুলুকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ভাবে বোধ হয় খোঁজ পেয়েছেন। তবে, ভিড়ের মধ্যে তেমন নজর দিতে পারেন নি, নইলে পৈতৃক গলাটার,—এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে গিয়া অকস্মাৎ অপূর্বর মুখের দিকে চাহিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিলেন,—ও কি অপূর্ববাবু? কি হ'ল আপনার?

অপূর্ব দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া আপনাকে সামলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাঁহার কথা শেষ না হইতেই সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সবেগে ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

আঠার

অপূর্বর এমন করিয়া বাহির হইয়া যাওয়াটা সকলকেই বিস্মিত করিল। ঘরে আলো বেশী ছিল না, কিন্তু তাহার অস্বাভাবিক মুখের ভাব ও অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর যেন অতিশয় বে-মানান দেখাইল। ব্যারিস্টার কৃষ্ণ আইয়ার ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে ডাক্তার? অত্যন্ত সেন্টিমেন্টাল! তাঁহার শেষ কথাটার উপরে স্পষ্ট একটা অভিযোগের খোঁচা ছিল। অর্থাৎ, এ-সকল লোক এখানে কেন?

ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন, কিন্তু তাড়াতাড়ি এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন তলওয়ারকর! কহিলেন, ইনি মিস্টার হালদার—অপূর্ব হালদার। এক আফিসে আমরা কাজ করি, আমার সুপিরিয়র অফিসর। একটু থামিয়া সশ্রদ্ধ স্নেহের সহিত বলিলেন, কিন্তু আমার একান্ত অন্তরঙ্গ,—আমার পরম বন্ধু। সেন্টিমেন্টাল? ই—য়েস্। ডাক্তারবাবু, আপনি বোধ করি হালদারের রেঙ্গুনের প্রথম অভিজ্ঞতার গল্প শোনেন নি? সে এক—

সহসা ভারতীর প্রতি চোখ পড়িতেই তিনি সলজ্জে থামিয়া গিয়া কহিলেন, সে যাই হোক, প্রথম পরিচয়ের দিন থেকেই কিন্তু আমরা বন্ধু,—বাস্তবিক পরম বন্ধু।

তলওয়ারকরের ব্যগ্রতায় ও বিশেষ করিয়া তাঁহার পরম বন্ধু শব্দটার পুনঃ পুনঃ প্রয়োগে সেন্টিমেন্টালিস্‌মের প্রতি খোঁচা দিতে ব্যারিস্টার সাহেব আর সাহস করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখের চেহারাটা যেন সন্দিগ্ধ এবং অপ্রসন্ন হইয়া রহিল।

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, সেন্টিমেন্ট জিনিসটা নিছক মন্দ নয় কৃষ্ণ আইয়ার। এবং সবাই তোমার মত শক্ত পাথর না হলেই চলবে না মনে করাও ঠিক নয়।

কৃষ্ণ আইয়ার খুশী হইলেন না, বলিলেন, তা আমি মনেও করিনে, কিন্তু এটুকু মনে করাও বোধ হয় দোষের নয় ডাক্তার, এই ঘরটা ছাড়াও তাঁদের চলে বেড়াবার যথেষ্ট প্রশস্ত জায়গা পৃথিবীতে খোলা আছে।

তলওয়ারকর মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন। যাঁহাকে তিনি পরম বন্ধু বলিয়া বারংবার অভিহিত করিতেছেন তাঁহাকে তাঁহারই সম্মুখে অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় নিজেকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কহিলেন, মিস্টার আইয়ার, অপূর্ববাবুকে আমি চিনি। আমাদের মন্ত্রে দীক্ষা তাঁর বেশী দিনের নয় সত্য, কিন্তু বন্ধুর অভাবিত মুক্তিতে সামান্য বিচলিত হওয়া আমাদের পক্ষেও মারাত্মক অপরাধ নয়। সংসারে চলে বেড়বার স্থান অপূর্ববাবুর যথেষ্টই আছে, এবং আশা করি এ ঘরেও স্থান তাঁর কোনোদিন সঙ্কীর্ণ হবে না।

কৃষ্ণ আইয়ার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়াইয়া আজ অপূর্বকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তিনি চুপ

করিয়া রহিলেন, কিন্তু ডাক্তার তাঁহার স্বাভাবিক শান্তির সহিত কহিলেন, নিশ্চয় হবে না তলওয়ারকর, নিশ্চয় হবে না। এই বলিয়া তিনি উপস্থিত সকলের মুখের প্রতি ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ভারতীকেই যেন বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়া হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু এই বন্ধুত্ব জিনিসটা সংসারে কতই না ক্ষণভঙ্গুর ভারতী! একদিন যার সম্বন্ধে মনে করাও যায় না, আর একদিন কতটুকু ছোট্ট কারণেই না তার সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে যায়! সেটাও দুনিয়ায় অস্বাভাবিক নয় তলওয়ারকর, তার জন্যেও প্রস্তুত থাকা ভাল। মানুষ বড় দুর্বল কৃষ্ণ আইয়ার, বড় দুর্বল! তখন এই সেন্টিমেন্টের দরকার হয় তার ধাক্কা সামলাতে।

এই-সকল কথার উত্তর দিবারও কিছু নাই, প্রতিবাদ করাও চলে না ; উভয়েই মৌন হইয়া রহিল, কিন্তু ভারতীর মুখ ম্লান হইয়া উঠিল। ডাক্তারের প্রতি তাহাদের অবিচলিত ও অসীম শ্রদ্ধা, অহেতুক একটি বাক্যও উচ্চারণ করা তাঁহার স্বভাব নয়, এ সত্য ভারতী ভাল করিয়াই জানে, কিন্তু কি এবং কাহাকে ইঙ্গিত করিয়া যে এ কথা তিনি কহিলেন, এবং ঠিক কি ইহার তাৎপর্য তাহা ধরিতে না পারিয়া মনের মধ্যেটা তাহার শুধু উদ্বেগ ও আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার সম্মুখের ঘড়ির দিকে চাহিয়া কহিলেন, আমার ত ক্রমশঃ যাবার সময় হ'য়ে এল ভারতী, আজ রাত্রের গাড়িতে আমি চললাম তলওয়ারকর।

কোথায় এবং কি জন্য, নিজে হইতে না বলিলে এরূপ অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশের বিধি ইহাদের নাই। একমুহূর্ত জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া থাকিয়া তলওয়ারকর প্রশ্ন করিল, আমার প্রতি আপনার কি আদেশ?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আদেশই বটে! কিন্তু একটা কথা। বর্মায় স্থানাভাব যদি হয়ও নিজের দেশে হবে না তা নিশ্চয়। শ্রমিকের দিকে একটু দৃষ্টি রেখো।

তলওয়ারকর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আচ্ছা। আবার কবে দেখা হবে?

ডাক্তার কহিলেন, নীলকান্ত যোশীর শিষ্য তুমি, এ আবার কি প্রশ্ন তলওয়ারকর?

তলওয়ারকর চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, আর দেরি করো না যাও,—বাসায় পৌঁছতে প্রায় ভোর হয়ে যাবে। প্র্যাক্‌টিস তা'হলে এখানেই স্থির ক'রলে কৃষ্ণ আইয়ার?

কৃষ্ণ আইয়ার মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন। ভাড়াটে গাড়ি বাহিরে অপেক্ষা করিয়া ছিল, দুজনে বাহির হইবার সময়ে তলওয়ারকর কেবল একবার কহিল, অন্ধকারে অপূর্ববাবু কোথায় চলে গেলেন একবার দেখা হ'ল না—

কিন্তু এ কথায় উত্তর দেওয়া বোধ করি কেহ প্রয়োজন মনে করিলেন না। কিছুক্ষণেই বাহিরে গাড়ির শব্দে বুঝা গেল তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তখন ডাক্তার বলিলেন, তোমার কি মনে হয় অপূর্ব বাসায় চলে গেছে?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না, খুব সম্ভব আশেপাশে কোথাও আছেন, একটু খুঁজে দেখলেই পাওয়া যাবে। আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা না ক'রে তিনি কখনো যাবেন না।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তা হ'লে দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই এ কাজটা তার সেরে নেওয়া আবশ্যক। তার বেশী ত আমি সময় দিতে পারবো না। ভাই!

না, এর মধ্যেই তিনি এসে পড়বেন, এই বলিয়া ভারতী শুধু যে কেবল উপস্থিত ডাক্তারের কথার একটা জবাব দিল তাই নয়, সে আপনাকে আপনি ভরসা দিল। একাকী এই অন্ধকারে অপূর্ব কিছুতেই যাইবে না, অতএব কোথাও নিকটেই আছে এ বিষয়ে সে যেমন নিশ্চিন্ত ছিল তাহাদের অশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধাভাজন এই অতিমানবের বিদায়ের পূর্বক্ষণে আর একবার সর্বান্তঃকরণে তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লওয়ারও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সে তেমনি নিঃসংশয় ছিল। নানাদিক দিয়া নানাকারণে আজ অপূর্ব বহু অপরাধ

জমা করিয়াছে, সময় থাকিতে তাহাকে দিয়াই সেগুলার ক্ষালন করিয়া না লইয়াই বা ভারতী বাঁচে কি করিয়া? কিন্তু সেই অমূল্য স্বল্পকালটুকু বৃথায় শেষ হইয়া আসিতে লাগিল,—অপূর্বর দেখা নাই! আঁধার দ্বারপথে ভারতীর চঞ্চল চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া আসিল এবং উৎকীর্ণ চিত্ত বাহিরে পরিচিত পদশব্দের প্রতীক্ষায় একেবারে অধীর হইয়া উঠিল। কোথাও সে হাতের কাছেই আছে, একবার ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া সে একমুহূর্তে খুঁজিয়া আনে, কিন্তু এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে আজ তাহার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইল। ডাক্তার তাঁহার স্ট্র্যাপ-বাঁধা বোঁচকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ভারতী দেয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল আর মিনিট পাঁচ-ছয়ের অধিক সময় নাই, কহিল, আপনি কি হেঁটেই যাবেন?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না। দুটো কুড়ি মিনিটে সদর রাস্তার উপর দিয়ে খুব সম্ভব একটা ঘোড়ার গাড়ি ফিরে যাবে, চলতি গাড়ি—গণ্ডা-ছয়েক পয়সা ভাড়া দিলেই স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

ভারতী বলিল, পয়সা না দিলেও দেবে। কিন্তু যাবার পূর্বে সুমিত্রাদিদিকে একবার দেখা দিয়ে যাবেন না? তিনি সত্যই পীড়িত।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত বলিনি তিনি অসুস্থ নন। কিন্তু ডাক্তার না দেখালেই বা সারবে কি করে?

ভারতী বলিল, কিন্তু তাই যদি হয় ত আপনার চেয়ে বড় ডাক্তারই বা পৃথিবীতে আছে কে?

ডাক্তার রহস্যভরে জবাব দিলেন, তাহলেই হয়েছে! দীর্ঘ অনভ্যাসে ও-বিদ্যে ত মন থেকে ধুয়ে মুছে গেছেই, তাছাড়া বসে বসে কারও চিকিৎসা করি সে সময়ই বা কৈ?

কথা তাঁহার শেষ না হইতেই ভারতী বলিয়া উঠিল, সময় কৈ! সময় কৈ! কেউ মরে গেলেও সময় হবে না।—এমননিই দেশের কাজ? দেখুন ডাক্তারবাবু, বিদ্যে মুছে যাবার মন ও নয় ; মুছে যদি সত্যিই কিছু গিয়ে থাকে ত সে দয়া-মায়া!

ডাক্তারের হাসিমুখ কেবল মুহূর্তের তরে গম্ভীর হইয়াই পুনরায় পূর্বশ্রী ধারণ করিল। কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভারতী সেই একমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। তাহাদের ঘনিষ্ঠতা বহুদূর পর্যন্ত গিয়াছে সত্য, কিন্তু এদিকে অঙ্গুলি-সঙ্কেত করিবার অধিকার আজও তাহার ছিল না। বস্তুতঃ, সুমিত্রা কে, ডাক্তারের সহিত তাহার কি সম্বন্ধে, এবং কবে কি করিয়া সে যে এই দলভুক্ত হইয়া পড়িল অদ্যাবধি ভারতী তাহার কিছুই জানিত না। তাহাদের সম্প্রদায়ে ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে কৌতূহলী হওয়া একান্ত নিষিদ্ধ। সুতরাং, অনুমান ভিন্ন সঠিক কিছুই জানিবার তাহার উপায় ছিল না। শুধু মেয়েমানুষ বলিয়াই সে সুমিত্রার মনোভাব উপলব্ধি করিয়াছিল। কিন্তু নিজের সেই অনুভূতিমাত্রটুকু ভিত্তি করিয়া অকস্মাৎ এতবড় ইঙ্গিত ব্যক্ত করিয়া ফেলিয়া সে শুধু সঙ্কুচিত নয়, ভয়ও পাইল। ভয় ডাক্তারকে নয়,—সুমিত্রাকে। এ কথা কোন মতেই তাঁহার কানে উঠিলে চলিবে না! তাঁহার অন্য পরিচয় জানা না থাকিলেও প্রথম হইতেই সেই নিস্তব্ধ তীক্ষ্ণ-বিদ্যা-বুদ্ধিশালিনী রমণীর দুর্ভেদ্য নিবিড়তার পরিচয় কাহারও অবিদিত ছিল না। তাঁহার স্বল্পভাষণে, তাঁহার প্রখর সৌন্দর্যের প্রতি পদক্ষেপে, তাঁহার অবহিত বাক্যালাপে, তাঁহার অচঞ্চল আচরণের গাম্ভীর্যে ও গভীরতায় এই দলের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার অপরিসীম দূরত্ব স্বতঃসিদ্ধের মতই যেন সকলে অনুভব করিত। এমন কি তাঁহার অসুস্থতা লইয়াও গায়ে পড়িয়া আলোচনা করিতেও কাহারো সাহস হইত না। কিন্তু একদিন সেই দুর্লঙ্ঘ কঠোরতা ভেদ করিয়া তাঁহার অত্যন্ত গোপন দুর্বলতা যেদিন অপূর্ব ও ভারতীর সম্মুখে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল, সেদিন একজনের বিদায়ের ক্ষণে সুমিত্রা নিজেকে সংবরণ করিতে পারে নাই, সেদিন হইতেই সে যেন সকলের হইতে আরও বহুদূরে আপনাকে আপনি সরাইয়া লইয়া গেছে। সেই দীর্ঘায়ত ব্যবধান অপরের অযাচিত সহানুভূতির আকর্ষণে সঙ্কুচিত হইবার আভাসমাত্রেই

যে তাহার সেই আত্মাশ্রয়ী অন্তর্গূঢ় বেদনা একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবে এই কথা নিঃসংশয়ে অনুভব করিয়া ভারতীর ক্ষুব্ধ চিত্ত শঙ্কায় পূর্ণ হইয়া যাইত।

ডাক্তার আরামকেদারায় ভাল করিয়া হেলান দিয়া শুইয়া সুদীর্ঘ পদদ্বয় সুমুখের টেবিলের উপর প্রসারিত করিয়া দিয়া সহসা মহা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ—

ভারতী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, শুলেন যে বড়?

ডাক্তার রাগ করিয়া বলিলেন, কেন, আমি কি ঘোড়া যে একটু শুলেই বেতো হয়ে যাবো? আমার ঘুম পাচ্চে,—তোমাদের মত আমি দাঁড়িয়ে ঘুমোতে পারিনে।

ভারতী বলিল, দাঁড়িয়ে ঘুমোতে আমরাও পারিনে। কিন্তু কেউ যদি এসে বলে আপনি দৌড়তে দৌড়তে ঘুমোতে পারেন, আমি তাতেও আশ্চর্য হইনে। আপনার ওই দেহটা দিয়ে সংসারে কি যে না হ'তে পারে তা কেউ জানে না। কিন্তু সময় হল যে ; এখনি না বেরুলে গাড়ি চলে যাবে যে!

যাক গে।

যাক গে কিরকম?

উঃ—ভয়ানক ঘুম পাচ্চে ভারতী, চোখ চাইতে পারচি নে। এই বলিয়া ডাক্তার দুই চক্ষু মুদিত করিলেন।

কথা শুনিয়া ভারতী পুলকিতচিত্তে অনুভব করিল, কেবল তাহারই অনুরোধে আজ তাঁহার যাওয়া স্থগিত রহিল। না হইলে শুধু ঘুম কেন বজ্রঘাতের দোহাই দিয়াও তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া যায় না। কহিল, আর ঘুমই যদি সত্যি পেয়ে থাকে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন না!

ডাক্তার চোখ মুদিয়াই প্রশ্ন করিলেন, তোমার নিজের উপায় হবে কি? অপূর্বর পথ চেয়ে সারারাত বসে কাটাবে?

ভারতী বলিল, আমার বয়ে গেছে। পাশের ছোট ঘরে বিছানা করে এখনি গিয়ে শুয়ে ঘুমবো।

ডাক্তার কহিলেন, রাগ করে শোওয়া যেতে পারে, কিন্তু রাগ করে ঘুমোনো যায় না। বিছানায় পড়ে ছটফট করার মত শাস্তি আর নেই। তার চেয়ে খুঁজে আনো গে,—আমি কারও কাছে প্রকাশ করব না।

ভরতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে লজ্জা ধরা পড়িল না। কারণ, ডাক্তার চোখ বুজিয়াই ছিলেন। তাঁহার নিমীলিত চোখের প্রতি চোখ রাখিয়া ভরতী মুহূর্ত-কয়েক মৌন থাকিয়া আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু বিছানায় পড়ে ছটফট করার মত শাস্তি আর নেই এ আপনি জানলেন কি করে?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, লোকে বলে তাই শুনি।

নিজে থেকে কিছুই জানেন না?

ডাক্তার চোখ মেলিয়া কহিলেন, আরে ভাই, আমাদের মত দুর্ভাগাদের শুতে বিছানাই, মেলে না, তায় আবার ছটফট করা! এতখানি বাবুয়ানার কি ফুরসত আছে? এই বলিয়া তিনি মুচকিয়া হাসিলেন।

ভারতী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, সবাই যে বলে আপনার দেহের মধ্যে রাগ নেই, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

ডাক্তার বলিলেন, সত্যি? কখনো না, কখনো না। লোকে মিথ্যে করে আমার বিরুদ্ধে গুজব রটায়,—তারা আমাকে দেখতে পারে না।

ভারতী হাসিয়া কহিল, কিংবা অত্যন্ত বেশী ভালবাসে বলেই হয়ত গুজব রটায়। তারা আরও বলে আপনার মান-অভিমান নেই, দয়া-মায়া নেই, বুকের ভেতরটা আগাগোড়া একেবারে পাষাণ দিয়ে গড়া।

ডাক্তার কহিলেন, এও অত্যন্ত ভালবাসার কথা। তারপর?

ভারতী কহিল, তারপর সেই পাষাণ-স্তূপের মধ্যে আছে শুধু একটি বস্তু,—জননী জন্মভূমি! তার আদি নেই, অন্ত নেই, ক্ষয় নেই, ব্যয় নেই,—তার ভয়ানক চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না বলেই আপনার কাছে-কাছে থাকতে পারি, নইলে,—বলিতে বলিতে সে অকস্মাৎ একমুহূর্ত থামিয়া কহিল, কিরকম জানেন ডাক্তারবাবু, সুমিত্রাদিদিকে নিয়ে আমি সেদিন বর্মা অয়েল কোম্পানির কারখানা ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম ; সেদিন তাদের নতুন বয়লারের পরীক্ষা হচ্ছিল। অনেক লোক ভিড় করে তামাশা দেখছিল। কালো পাহাড়ের মত একটা প্রকাণ্ড জড়পিণ্ড,—কিন্তু জড়পিণ্ডের বেশী সে আর কিছুই নয়। হঠাৎ তার একটা দরজা খুলে যেতে মনে হল যেন গর্ভেতে তার অগ্নির প্লাবন বয়ে যাচ্ছে। সেখানে এই পৃথিবীটাকেও তাল করে ফেলে দিলে যেন নিমিষে ভস্মসাৎ করে দেবে। শুনলাম সে একাই নাকি এই বিরাট কারখানা চালিয়ে দিতে পারে। দরজা বন্ধ হল, আবার সেই শান্ত জড়পিণ্ড, ভিতরের কোন প্রকাশই বাহিরে নেই। সুমিত্রাদিদির মুখ দিয়ে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি দিদি? সুমিত্রা বললেন, এই ভয়ানক যন্ত্রটাকে মনে রেখো ভারতী, তোমাদের ডাক্তারবাবুকে চিনতে পারবে। এই তাঁর সত্যিকার প্রতিমূর্তি। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ডাক্তার অন্যমনস্কের মত একটু খানি হাসিয়া কহিলেন, সবাই কি ভালই আমাকে বাসে! কিন্তু ঘুমে যে আর চোখ চাইতে পারিনে ভারতী, কিছু একটা কর! কিন্তু তার আগে সে লোকটা গেল কোথায় একবার খোঁজ করবে না?

আপনি কিন্তু কারও কাছে গল্প করতে পারবেন না।

না। কিন্তু আমাকে বুঝি লজ্জা করবার দরকার নেই?

ভারতী মাথা নাড়িয়া বলিল, না। মানুষের কাছেই শুধু মানুষের লজ্জা করে! এই বলিয়া সে হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে তুলিয়া লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

মিনিট দশ-পনেরো পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, অপূর্ববাবু চলে গেছেন।

ডাক্তার বিস্ময়ে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন, এই অন্ধকারে? একা?

তাই ত দেখছি।

আশ্চর্য।

ভারতী বলিল, আমার বিছানা করা আছে, শুতে চলুন।

তুমি?

আমি মেঝেতে একটা কম্বল-টম্বল কিছু পেতে নেব। চলুন।

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, তাই চল। লজ্জা-সঙ্কোচ মানুষে মানুষকেই করে,—আমি পাষাণ বৈ ত নয়।

উপরের ঘরে গিয়া ডাক্তার শয্যায় শয়ন করিলে ভারতী মশারি ফেলিয়া দিয়া সযত্নে চারিদিক গুঁজিয়া দিল, এবং তাহারই অনতিদূরে নীচে মেঝের উপর আপনার বিছানা পাতিল। ডাক্তার সেই দিকে চাহিয়া ক্ষুণ্ণকণ্ঠে কহিলেন, সকলে মিলে আমাকে এমন করে অগ্রাহ্য করলে আমার আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, আমরা সকলে মিলে আপনাকে মানুষের দল থেকে বার করে পাথরের দেবতা বানিয়ে রেখেচি।

তার মানে আমাকে ভয়ই নেই?

ভারতী অসঙ্কোচে জবাব দিল, একবিন্দু না। আপনার থেকে কারও লেশমাত্র অকল্যাণ ঘটতে পারে এ আমরা ভাবতেই পারিনে।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার হাসিয়া শুধু বলিলেন, আচ্ছা টের পাবে একদিন।

শয্যা গ্রহণ করিয়া ভারতী হঠাৎ প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কে আপনাকে সব্যসাচী নাম দিলে ডাক্তারবাবু? এ ত আপনার আসল নাম নয়। ডাক্তার হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, আসল

যাই হোক, নকল নামটি দিয়েছিলেন আমাদের পাঠশালার পণ্ডিতমশাই। তাঁর মস্ত উঁচু একটা আমগাছ ছিল, কেবল আমিই তার ঢিল মেরে আম পাড়তে পারতাম। একবার ছাত থেকে লাফাতে গিয়ে ডানহাতটা আমার মচকে গেল। ডাক্তার এসে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। সবাই আহা আহা করতে লাগলো, শুধু পণ্ডিতমশাই খুশী হয়ে বললেন, যাক, আম ক'টা আমার ঢিলের ঘা থেকে বাঁচলো। পাকলে দুটো-একটা হয়ত মুখে দিতেও পারবো।

ভারতী বলিল, বড্ড দুষ্টু ছিলেন ত!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, দুর্নাম একটু ছিল বটে। যাই হোক পরের দিন থেকেই আবার তেমনি আম পাড়ায় লেগে গেলাম, কিন্তু পণ্ডিতমশাই কি করে খবর পেয়ে সেদিন হাতেনাতে একেবারে ধরে ফেললেন। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, ঘাট হয়েছে বাবা সব্যসাচী, আমের আশা আর করিনে। ডানটা ভেঙ্গেচে, বাঁ-হাত চলছে, বাঁ-টা ভাঙ্গলে বোধ হয় পা-দুটো চলবে। থাক বাবা, আর কষ্ট করো না, যে ক'টা কাঁচা আম বাকী আছে লোক দিয়ে পাড়িয়ে দিচ্ছি।

ভারতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, পণ্ডিতমশায়ের অনেক দুঃখের দেওয়া নাম।

ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, হাঁ, আমার অনেক দুঃখের নাম। কিন্তু সেই থেকে আমার আসল নামটা লোকে যেন ভুলেই গেল।

ভারতী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা সকলে যে বলে দেশ আর আপনি, আপনি আর দেশ—এই দুই-ই আপনাতে একেবারে এক হয়ে গেছে,—এ কি করে হল?

ডাক্তার কহিলেন, সে-ও এক ছেলেবেলার ঘটনা ভারতী। এ জীবনে কত কি এলো, কত কি গেলো, কিন্তু সেদিনটা এ জীবনে একেবারে অক্ষয় হয়ে রইল। আমাদের গ্রামের প্রান্তে বৈষ্ণবদের একটা মঠ ছিল, একদিন রাত্রে সেখানে ডাকাত পড়লো। চেঁচাচেঁচি কান্না-কাটিতে গ্রামের বহুলোক চারিদিকে জমা হল, কিন্তু ডাকাতদের সঙ্গে একটা গাদা বন্দুক ছিল, তারা তাই ছুঁড়তে লাগলো দেখে কোন লোক তাদের কাছে ঘেঁষতে পারলে না। আমার জাটতুতো একজন বড়ভাই ছিলেন, তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং পরোপকারী, যাবার জন্যে তিনি ছটফট করতে লাগলেন, কিন্তু গেলে নিশ্চয় মৃত্যু জেনে সবাই তাঁকে ধরে রেখে দিলে। নিজেকে কোনমতে ছাড়াতে না পেরে তিনি সেইখান থেকে শুধু নিষ্ফল আস্ফালন, এবং ডাকাতদের গালাগালি দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন ফলই তাতে হল না, তারা ওই একটিমাত্র বন্দুকের জোরে দু'তিন শ লোকের সুমুখে মোহন্ত বাবাজীকে খুঁটিতে বেঁধে তিল তিল করে পুড়িয়ে মারলে। ভারতী, আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম, কিন্তু আজও তার কাকুতি-মিনতি, আজও তার মরণ-চীৎকার যেন মাঝে মাঝে কানে শুনতে পাই। উঃ—সে কি ভয়ানক বুক-ফাটা আর্তনাদ!

ভারতী নিরুদ্ধশ্বাসে কহিল, তার পর?

ডাক্তার কহিলেন, তারপর বাবাজীর জীবন-ভিক্ষার শেষ অনুনয় সমস্ত গ্রামের সম্মুখে ধীরে ধীরে সাঙ্গ হল, তাদের লুটপাটের কাজও নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে পরিসমাপ্ত হল,—চলে যাবার সময় সর্দার বড়দাদার উদ্দেশে পিতৃ উচ্চারণ করে শপথ করে গেল যে আজ তারা শ্রান্ত, কিন্তু মাস-খানেক পরে ফিরে এসে এর শোধ দেবে। বড়দা জেলার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে কেঁদে কেটে পড়লেন একটা বন্দুক চাই। কিন্তু পুলিশ বললে, না। বছর-দুই পূর্বে একজন অত্যন্ত অত্যাচারী পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্টরের কান মলে দেবার অপরাধে তাঁর দু'মাস জেল হয়েছিল। এবং এই অপরাধেই সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, কোন মতেই না। দাদা বললেন, সাহেব, আমরা কি তবে মারা যাবো? সাহেব হেসে বললেন, এত যার ভয় সে যেন ঘর-বাড়ি বেচে আমার জেলা থেকে অন্য জেলায় চলে যায়।

ভারতী উত্তেজনায় বিছানায় উঠিয়া বসিয়া কহিল, দিলে না? এতবড় সর্বনাশ আসন্ন

জেনেও দিলে না?

ডাক্তার কহিলেন, না। এবং কেবল তাই নয়, বড়দা ব্যাকুল হয়ে যখন তীর-ধনুক ও বর্শা তৈরি করালেন, পুলিশের লোক খবর পেয়ে সেগুলো পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেল।

কি হল তার পর?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। সেই মাসের মধ্যেই সর্দার তার প্রতিজ্ঞা পালন করলে। এবারে বোধ করি আরও একটা বেশী বন্দুক ছিল। বাড়ির আর সকলেই পালালেন, শুধু বড়দাকে কেউ নড়াতে পারলে না। কাজেই ডাকাতের গুলিতে প্রাণ দিলেন।

ভারতী রক্তহীন পাংশুমুখে বলিয়া উঠিল, প্রাণ দিলেন?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ। ঘণ্টা-চারেক সজ্ঞানে বেঁচে ছিলেন। গ্রামসুদ্ধ জড় হয়ে হৈচৈ করতে লাগলো, কেউ ডাকাতদের, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে গাল পাড়তে লাগলো, শুধু দাদাই কেবল চুপ করে রইলেন। পাড়া গাঁ, হাসপাতাল দশ-বার ক্রোশ দূরে, রাত্রিকাল, গ্রামের ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে এলে তাঁর হাতটা দাদা সরিয়ে দিয়ে কেবল বললেন, থাক, আমি বাঁচতে চাইনে। বলিতে বলিতে সেই পাষাণ দেবতার কণ্ঠস্বর হঠাৎ একটুখানি যেন কাঁপিয়া গেল। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, বড়দা আমাকে বড় ভালবাসতেন। কাঁদতে দেখে একটিবার মাত্র চোখ মেলে চাইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, ছিঃ! মেয়েদের মত এই-সব গরু ভেড়া ছাগলদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুই আর কাঁদিস নে শৈল। কিন্তু রাজত্ব করার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বলতে আর একটা প্রাণীও রাখেনি তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিস নে। এই ক'টা কথা, এর বেশি আর একটা কথাও তিনি বলেন নি। ঘৃণায় একটা উঃ আঃ পর্যন্ত তাঁর মুখ দিয়ে শেষ পর্যন্ত বার হল না, এই অভিশপ্ত পরাধীন দেশ চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে গেলেন। কেবল আমিই জানি ভারতী, কত মস্তবড় প্রাণ সেদিন বার হয়ে গেল।

ভারতী নীরবে স্থির হইয়া রহিল। কবে কোন্ পল্লী-অঞ্চলের এক দুর্ঘটনার কাহিনী। ডাকাতি উপলক্ষে গোটা-দুই অজ্ঞাত অখ্যাত লোকের প্রাণ গিয়াছে। এই ত! জগতের বড় বড় বিরোধের দুঃসহ দুঃখের পাশে ইহা কি-ই বা! অথচ এই পাষাণে কি গভীর ক্ষতই না করিয়াছে! তুলনা ও গণনার দিক দিয়া দুর্বলের দুঃখের ইতিহাসে এই হত্যার নিষ্ঠুরতা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। এই বাঙলা দেশেই ত নিত্য কত লোকে চোর-ডাকাতের হাতে মরিতেছে! কিন্তু একি শুধু তাই? ও পাথর কি এতটুকু আঘাতেই দীর্ণ হইয়াছে? ভারতী অলক্ষ্যে চাহিয়া দেখিল। এবং বিদ্যুৎশিখা অকস্মাৎ অন্ধকার চিরিয়া যেমন করিয়া অদৃশ্য বস্তু টানিয়া বাহির করে, ঠিক তেমনি করিয়া ওই পাথরের মুখের পরেই সে যেন সমস্ত অজ্ঞাত রহস্য চক্ষের পলকে প্রত্যক্ষ করিল। সে দেখিল, এই বেদনার ইতিহাসে মৃত্যু কিছুই নয়—মরণ উহাকে আঘাত করে নাই, কিন্তু মর্মভেদী আঘাত করিয়াছে ওই দুটো লোকের মৃত্যুর মধ্য দিয়া শৃঙ্খলিত পদানত সমস্ত ভারতীয়ের উপায়বিহীন অক্ষমতা! আপন ভাইয়ের আসন্ন হত্যা নিবারণ করিবার অধিকারটুকু হইতেও সে বঞ্চিত—অধিকার আছে শুধু চোখ মেলিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিবার। ভারতীর সহসা মনে হইল, সমস্ত জাতির এই সুদুঃসহ লাঞ্ছনা ও অপমানের গ্লানি ও পাষাণের মুখের পরে যেন নিবিড় নিচ্ছিদ্র কালি লেপিয়া দিয়াছে।

বেদনায় সমস্ত বুকের ভিতরটা ভারতীর আলোড়িত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা!

ডাক্তার সবিস্ময়ে ঘাড় তুলিয়া কহিলেন, দাদা বলে কি তুমি আমাকে ডাকচো?

ভরতী বলিল, হাঁ, তোমাকে। আচ্ছা, ইংরাজের সঙ্গে কি তোমার কখনো সন্ধি হতে পারে না?

না। আমার চেয়ে বড় শত্রু তাদের আর নেই।

ভারতী মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, কারও শত্রুতা, কারও অকল্যাণ তুমি কামনা করতে

পারো এ আমি ভাবতেও পারিনে দাদা।

ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, এ কথা তোমার মুখেই সাজে এবং এর জন্যে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, তুমি সুখী হও। এই বলিয়া তিনি পুনরায় একটুখানি হাসিলেন। কিন্তু, এ কথা ভারতী জানিত যে এ হাসির মূল্য নাই, হয়ত ইহা আর-কিছু—ইহার অর্থ নিরূপণ করিতে যাওয়া বৃথা। তাই সে মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার আস্তে আস্তে বলিলেন, এই কথাটা আমার তুমি চিরদিন মনে রেখ ভারতী, আমার দেশ গেছে বলেই আমি এদের শত্রু নই। একদিন মুসলমানের হাতেও এ দেশ গিয়েছিল। কিন্তু সমস্ত মনুষ্যত্বের এতবড় পরম শত্রু জগতে আর নেই। স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই এদের মজ্জাগত সংস্কার। এই এদের ব্যবসা, এই এদের মূলধন। যদি পারো দেশের নর-নারীকে শুধু এই সত্যটাই শিখিয়ে দিও।

নীচের ঘড়িতে টং-টং করিয়া চারিটা বাজিল। সম্মুখের খোলা জানালার বাহিরে রাত্রিশেষের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিল, সেইদিকে নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া ভারতী স্তব্ধ, স্থির হইয়া বসিয়া কত কি যে ভাবিতে লাগিল তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু একটা সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে এতবড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

উনিশ

কাল সারারাত্রি ভরতী ঘুমাইতে পায় নাই। দিনের বেলায় তাহার শরীর ও মন দুই-ই খারাপ ছিল, তাই ইচ্ছা করিয়াছিল, আজ একটু সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শয্যাগ্রহণ করিবে। এইজন্য সন্ধ্যার প্রাক্কালেই সে রাঁধাবাড়ায় মন দিয়াছিল। এমন সময়ে দলের একজন আসিয়া তাহার হাতে একখানা পত্র দিল। সুমিত্রার লেখা, তিনি একটি ছত্রে শুধু এই বলিয়া আহ্বান করিয়াছেন যে, যে-কোন অবস্থায়, যে-কোন কাজ ফেলিয়া রাখিয়াও সে যেন এই পত্রবাহকের সঙ্গে চলিয়া আসে।

সুমিত্রার আদেশ লঙ্ঘন করিবার জো নাই, কিন্তু ভারতী অত্যন্ত বিস্মিত হইল। জিজ্ঞাসা করিল, তাঁর কি হঠাৎ কোন অসুখ করেছে উত্তরে পত্রবাহক জনাইল, না। নীচে নামিয়া দেখিল দরজায় দাঁড়াইয়া তাহাদের অত্যন্ত সুপরিচিত ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ি, কিন্তু গাড়োয়ান বদল হইয়াছে। ইহাকে দেখিয়া মনে হয় না গাড়ি চালানো ইহার পেশা। তা ছাড়া গাড়ি কেন? সুমিত্রার বাসায় যাইতে ত মিনিট-তিনিকের অধিক সময় লাগে না। অধিকতর বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, ব্যাপার কি হীরা সিং? সুমিত্রা কোথায়?

এই হীরা সিং লোকটি তাহাদের পথের-দাবীর সভ্য না হইলেও অতিশয় বিশ্বাসী। জাতিতে পাঞ্জাবী শিখ, পূর্বে হংকঙে পুলিশে চাকরি করিত, এখন রেঙ্গুন টেলিগ্রাফ আফিসে পিয়নের কাজ করে। সে চুপি চুপি কহিল যে, মাইল চার-পাঁচ দূরে অত্যন্ত গোপন এবং অত্যন্ত জরুরী সভা বসিয়াছে, তাঁহার না যাইলেই নয়। ভারতী আর কোন প্রশ্ন না করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে গাড়ির সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া যাত্রা করিল। এবং হীরা সিং সরকারী পিয়নের পোশাকে সরকারী দু-চাকার গাড়িতে অন্য পথে প্রস্থান করিল। পথে ভারতীর অনেকবার মনে হইল সে গাড়ি ফিরাইয়া তাহার রিভলবার সঙ্গে লইয়া আসে, কিন্তু দেরি হইবার ভয়ে আর ফিরিতে পারিল না, অস্ত্রহীন অরক্ষিতভাবেই তাহাকে অনিশ্চিত স্থানের উদ্দেশে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইল। গাড়ি যে অত্যন্ত ঘুর-পথে চলিয়াছে তাহা ভিতরে থাকিয়াও ভারতী বুঝিল, এবং কিছুক্ষণেই পথের অসমতলতা ও অসংস্কৃত দুরবস্থা অনুভব করিয়া বুঝিতে পারিল তাহারা শহর ছাড়াইয়া গেছে, কিন্তু ঠিক কোথায় তাহা জানা কঠিন। সঙ্গে ঘড়ি ছিল না কিন্তু অনুমান রাত্রি দশটার কাছাকাছি গাড়ি গিয়া একটা বাগানে প্রবেশ করিয়া থামিল। হীরা সিং পূর্বেই পৌঁছিয়াছিল, সে গাড়ির দরজা খুলিয়া দিল। মাথার উপরে বড় বড় গাছ মিলিয়া অন্ধকার এমনি দুর্ভেদ্য করিয়াছে যে নিজের

হাত পর্যন্ত দেখা যায় না, নীচে দীর্ঘ ও অত্যন্ত ঘন ঘাসের মধ্যে পায়ে হাঁটা পথের একটা চিহ্নমাত্র আছে, এই ভয়ানক পথে হীরা সিং তাহার দু-চাকার গাড়ির ক্ষুদ্র লণ্ঠনের আলোকে পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতে লাগিল। পথে চলিতে ভারতীর সহস্রবার মনে হইতে লাগিল—সে ভাল করে নাই, ভাল করে নাই। এই ভীষণ স্থানে আসিয়া সে ভাল করে নাই। অনতিকাল পরে তাহারা একটা জীর্ণ ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া পৌঁছিল, অন্ধকারে তাহার আভাসমাত্র দেখিয়াই ভারতী বুঝিল ইহা বহুদিন-পরিত্যক্ত একটা চাউঙ্। কোন্ সুদূর অতীতে বৌদ্ধ-শ্রমণগণ এখানে বাস করিতেন সম্ভবতঃ, কোথাও একটা লোকালয় পর্যন্ত ইহার কাছাকাছি নাই।

এতবড় ভাঙ্গা বাড়ি, এতটুকু আলো নাই, মানুষ নাই, মানুষের চিহ্ন পর্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে—দরজা-জানালা চোরে চুরি করিয়া লইয়া গেছে,—সুমুখের ঘরে ঢুকিতেই বাদুড় ও চামচিকার ভয়ানক গন্ধে ভারতীর দম আটকাইয়া আসিল,—তাহারই মধ্যে দিয়া পথ, বোধ করি কত যে বিষধর সর্প তথায় আশ্রয় লইয়া আছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মস্ত হল-ঘরের এককোণে উপরে উঠিবার সিঁড়ি। কাঠের সিঁড়ির মাঝে মাঝে কাঠ নাই, এই দিয়া ভারতী হীরার হাত ধরিয়া দ্বিতলে উঠিয়া সুমুখের বারান্দা পার হইয়া এতক্ষণে এত দুঃখের পরে নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরের মধ্যে চাটাই পাতা, একধারে গোটা-দুই মোমবাতি জ্বলিতেছে, এবং তাহারই পার্শ্বে সভানেত্রীর আসনে বসিয়া সুমিত্রা। অপর প্রান্তে ডাক্তার বসিয়া ছিলেন, তিনিই সস্নেহ-কণ্ঠে ডাকিয়া কহিলেন, এস ভারতী, আমার কাছে এসে ব'স।

অজানা শঙ্কায় ভারতীর বুকের মধ্যে গুরগুর করিয়া উঠিল, মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু একটুখানি যেন দ্রুতপদেই সে কাছে গিয়া ডাক্তারের বুক ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার কাঁধের উপর বাঁ হাতখানি রাখিয়া যেন তিনি নিঃশব্দে তাহাকে ভরসা দিলেন। হীরা সিং ঘরে ঢুকিল না ; দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। ভারতী চাহিয়া দেখিল, যাহারা বসিয়া আছে পাঁচ-ছয়জনকে সে একেবারেই চেনে না। পরিচিতের মধ্যে ডাক্তার ও সুমিত্রা ব্যতীত রামদাস তলওয়ারকর ও কৃষ্ণ আইয়ার। একজন ভীষণাকৃতি লোককে সর্বাগ্রেই চোখে পড়ে—পরনে তাহার গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং মাথায় সুবৃহৎ পাগড়ি। মুখখানা বড় হাঁড়ির মত গোলাকার এবং দেহ গণ্ডারের মত স্থূল, মাংসল ও কর্কশ। ভাঁটার মত চোখের উপর ভ্রূর চিহ্নমাত্র নাই, কঠিন শলার মত গোঁফের রোম বোধ করি দূর হইতে গণিয়া বলা যায়, রঙ তামার মত, লোকটা যে অনার্য মোঙ্গল-জাতীয় দৃষ্টিপাতমাত্র তাহাতে সংশয় থাকে না। এই বীভৎস ভয়ানক লোকটার প্রতি ভারতী চোখ তুলিয়া চাহিতেই পারিল না। মিনিট-দুই সমস্ত ঘরটা একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল, তখন সুমিত্রা ডাকিয়া কহিলেন, ভারতী, তোমার মনের ভাব আমি জানি, তাই তোমাকে ডেকে এনে দুঃখ দেবার আমার ইচ্ছাই ছিল না, কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই হতে দিলেন না। অপূর্ববাবু কি করেছেন জানো?

ভারতীর নিভৃত হৃদয়ে এমনিই কি যেন একটা তাহাকে সারাদিন ধরিয়া বলিতেছিল। তাহার কণ্ঠ শুষ্ক ও মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, শুধু সে নীরবে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

সুমিত্রা কহিলেন, বোথা কোম্পানী রামদাসকে আজ ডিস্‌মিস্ করেছে। অপূর্বরও সেই দশা হতো শুধু পুলিশ কমিশনারের কাছে আমাদের সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করেই তাঁর চাকরিটা বেঁচেছে। মাইনে ত কম নয়, বোধ হয় পাঁচ শ।

রামদাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

সুমিত্রা কহিলেন, শুধু এই নয়। পথের-দাবী যে বিদ্রোহীর দল, এবং আমরা যে লুকিয়ে পিস্তল রিভলভার রাখি সে সংবাদও তিনি গোপন করেন নি। এর শাস্তি কি ভারতী?

সেই ভীষণাকৃতি লোকটা গর্জন করিয়া উঠিল, ডেথ্!

এতক্ষণে ভারতী নির্নিমেষ দুই চক্ষু তাহার মুখের প্রতি তুলিয়া স্থির হইয়া রহিল!

রামদাস কহিল, সব্যসাচীই যে ডাক্তার এ খবর তারা জানে। হোটেলের ঘরের মধ্যেই তাঁকে ধরা যেতে পারে অপূর্ববাবু এ কথা জানাতেও ত্রুটি করেন নি। এমন কি, আমি ইতিপূর্বে যে পোলিটিক্যাল অপরাধে বছর-দুই জেল খেটেছি,—তাও।

সুমিত্রা কহিলেন, ভারতী, ডাক্তার ধরা পড়লে তার ফল কি জানো? ফাঁসি। তা যদি না হয়, ট্রান্সপোর্টেশন্! জেন্টেলমেন্! এ অপরাধের কি শাস্তি আপনারা অনুমোদন করেন?

সকলে সমস্বরে কহিল, ডেথ্!

ভারতী তোমার কিছু বলবার আছে?

ভরতী কথা কহিতে পারিল না, শুধু মাথা নাড়িয়া জানাইল তাহার বলিবার কিছু নাই।

সেই ভয়ঙ্কর লোকটা এবার বাংলায় কথা কহিল। উচ্চারণ শুনিয়া বুঝা গেল সে চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগ। বলিল, এক্‌সিকিউশনের ভার আমি নিলাম। আমি কিন্তু গুলি-গোলা, ছুরি-ছোরা বুঝিনে। এই আমার গুলি এবং এই আমার গোলা! এই বলিয়া সে বাঘের মত দুই থাবা মুঠা করিয়া শূন্যে উত্থিত করিল।

কৃষ্ণ আইয়ার দ্বারের দিকে চাহিয়া হীরা সিংকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, বাগানের উত্তর কোণে একটা শুকনো কুয়া আছে—একটু বেশী মাটি চাপ দিয়ে কিছু শুকনো ডালপালা ফেলে দেওয়া চাই। গন্ধ না বার হয়।

হীরা সিং মাথা নাড়িয়া জানাইল যে, কোনরূপ ত্রুটি হইবে না।

তলওয়ারকর কহিল, বাবুজীকে তাঁর দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়ে দেওয়া হোক।

সমবেত জুরির সাহায্যে অপূর্বর অপরাধের বিচার মিনিট-পাঁচেকের মধ্যেই সমাধা হইয়া গেল। বিচারকের রায় যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি স্পষ্ট। না বুঝিবার মত জটিলতা কোথাও নাই। ভারতী সমস্তই শুনিল, কিন্তু তাহার কান ও বুদ্ধির মাঝখানে কোথায় একটা দুর্ভেদ্য প্রাকার দাঁড়াইয়া ছিল, বাহিরের বস্তু যেন কিছুতেই সেটা ভেদ করিয়া আর ভিতরে পৌঁছাইতে পারিতেছিল না। তাই, গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত যে-কেহ কথা কহিতেছিল তাহারই মুখের প্রতি ভারতী ব্যাকুল জিজ্ঞাসু চোখে নির্বোধের মত চাহিয়া দেখিতেছিল। এইটুকু মাত্র সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল, অপূর্ব গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, এবং এই লোকগুলি তাহাকে বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এদেশে জীবন তাহার সঙ্কটাপন্ন। কিন্তু এ সঙ্কট যে কিরূপ আসন্ন হইয়াছে, সে তাহার কিছুই বুঝে নাই। সুমিত্রার ইঙ্গিতে একজন উঠিয়া বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট-দুই পরে যে দৃশ্য ভারতীর চোখে পড়িল তাহা অতি-বড় দুঃস্বপ্নেরও অতীত। সেই লোকটা অপূর্বকে লইয়া ঘরে ঢুকিল। তাহার দুই হাত পিঠের দিকে শক্ত করিয়া দড়ি দিয়া বাঁধা, এবং কোমর হইতে মস্ত ভারী একখণ্ড পাথর ঝুলিতেছে। মুহূর্তের জন্য চৈতন্য হারাইয়া ভারতী ডাক্তারের দেহের উপর ঢলিয়া পড়িল। কিন্তু সকলের দৃষ্টি তখন অপূর্বর প্রতি নিবদ্ধ ছিল বলিয়াই শুধু একজন ভিন্ন এ খবর আর কেহ জানিতে পারিল না।

ভারতী এখানে আসিবার পূর্বেই অপূর্বর এজাহার লওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল। সে অস্বীকার কিছুই করে নাই। আফিসের বড়সাহেব ও পুলিশের বড়সাহেব, এই দুই সাহেবে মিলিয়া তাহার নিকট হইতে সমস্ত তথ্যই জানিয়া লইয়াছে তাহা সে বলিয়াছে, কিন্তু কিসের জন্য যে দলের এবং দেশের এতবড় শত্রুতা সাধন করিল, তাহা সে এখনও জানে না।

আজ বেলা বারোটার মধ্যেই রামদাস এ সংবাদ সুমিত্রার কর্ণগোচর করে। দণ্ড স্থির হইয়া যায়, এবং যে উপায়ে অপূর্বকে হস্তগত করা হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

আফিসের ছুটির পরে আজ অপূর্ব হাঁটিয়া বাসায় যাইতে সাহস করিবে না তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়া তাহাদের ভাড়াটে গাড়িখানা হীরার সাহায্যে আফিসের গেটের কাছে রাখা হয়। এই ফাঁদে অপূর্ব সহজেই পা দেয়। কিছুদূর আসিয়া গাড়োয়ান জানায় যে, মস্ত একটা রোলার ভাঙ্গিয়া গলির মোড় বন্ধ হইয়া আছে, ঘুরিয়া যাইতে হইবে। অপূর্ব স্বীকার করে।

ইহার পরেই বোধ হয় সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ঘণ্টা-খানেক পরে যখন চৈতন্য হয়, তখন হীরা সিং গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পিস্তল দেখাইয়া তাহাকে অনায়াসে এখানে লইয়া আসে।

সুমিত্রা ডাকিয়া কহিলেন, অপূর্ববাবু, আমরা আপনাকে ডেথ্ সেন্‌টেন্স দিলাম। আর কিছু আপনার বলার আছে?

অপূর্ব ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইল সে কিছুই বুঝে নাই।

ডাক্তার এতক্ষণ কোন কথাই প্রায় বলেন নাই, পিছনে চাহিয়া কহিলেন, হীরা, তোমার পিস্তলটা কৈ?

হীরা সিং ইঙ্গিতে সুমিত্রাকে দেখাইয়া দিল, ডাক্তার হাত বাড়াইয়া বলিলেন, পিস্তলটা দেখি সুমিত্রা!

সুমিত্রা বেল্ট হইতে খুলিয়া ডাক্তারের হাতে দিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, আর কারও কাছে পিস্তল কিংবা রিভলভার আছে?

আর কাহারও কাছে ছিল না তাহা সকলেই জানাইল। তখন সুমিত্রার পিস্তল নিজের পকেটের মধ্যে রাখিয়া ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, সুমিত্রা, তুমি বললে ডেথ্ সেন্‌টেন্স আমরা দিলাম। কিন্তু ভারতী ত দেয়নি!

সুমিত্রা একমুহূর্ত ভারতীর মুখের প্রতি চাহিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, ভারতী দিতে পারে না।

ডাক্তার বলিলেন, পারা উচিতও নয়। তাই না ভারতী?

ভারতী কথা কহিল না, এই কঠিনতম প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু উপুড় হইয়া পড়িয়া ডাক্তারের ক্রোড়ের মধ্যে মুখ লুকাইল।

ডাক্তার তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া কহিলেন, অপূর্ববাবু যা করে ফেলেছেন সে আর ফিরবে না—তার ফলাফল আমাদের নিতেই হবে। শাস্তি দিলেও হবে, না দিলেও হবে। কিন্তু আমি বলি তাতে কাজ নেই—ভারতী এঁর ভার নিন। এই দুর্বল মানুষটিকে একটু মজবুত করে গড়ে তুলুন। কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা কহিলেন, না।

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, না।

সেই কুদর্শন লোকটাই সর্বাপেক্ষা অধিক আস্ফালন করিল। সে তাহার থাবা-যুগল শূন্যে তুলিয়া ভারতীকে ইঙ্গিত করিয়াই কি একটা বলিয়া ফেলিল।

সুমিত্রা কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, আমরা সকলে একমত। এতবড় অন্যায় প্রশ্রয়ে আমাদের সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন, যদি যায় ত উপায় কি?

সুমিত্রার সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচ-সাতজন উঠিল, উপায় কি? দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, আমরা কিছুই মানবো না। আপনার একার কথায় কিছুই হতে পারবে না।

গর্জন থামিলে ডাক্তার উত্তর দিলেন। এবার তাঁহার কণ্ঠস্বর আশ্চর্য রকমের শান্ত ও মৃদু শুনাইল। তাহাতে উৎসাহ বা উত্তেজনার বাষ্পও ছিল না, বলিলেন, সুমিত্রা, বিদ্রোহে প্রশ্রয় দিয়ো না। তোমরা ত জানো, আমার একার মত তোমাদের এক শ' জনের চেয়েও বেশী কঠিন। সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকে সম্বোধন কারয়া কহিলেন, ব্রজেন্দ্র তোমার ঔদ্ধত্যের জন্য বাটাভিয়াতে একবার আমাকে তুমি শাস্তি দিতে বাধ্য করেছিলে। দ্বিতীয়বার বাধ্য করো না।

ভারতী মুখ তুলে নাই, তখনও তেমনি পড়িয়া ছিল। কিন্তু তাহার সর্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। পিঠের উপর স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া তেমনি সহজ গলায় কাহিলেন, ভয় নেই ভারতী , অপূর্বকে আমি অভয় দিলাম।

ভারতী মুখ তুলিল না, ভরসাও পাইল না। তাঁহার দক্ষিণ হস্তের সুদীর্ঘ সুর সরু সরু আঙুলগুলা নিজের মুঠার মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, কিন্তু ওঁরা ত অভয় দিলেন না।

ডাক্তার কহিলেন, সহজে দেবেও না। কিন্তু এ কথা ওরা বোঝে যে, আমি যাকে অভয় দিলাম তাকে স্পর্শ করা যায় না। একটু হাসিয়া বলিলেন, ভাল খেতে পাইনে ভারতী, আধপেটা খেয়েই প্রায় দিন কাটে,--তবুও ওরা জানে এই ক'টা সরু আঙুলের চাপে আজও ব্রজেন্দ্রের অতবড় বাঘের থাবা গুঁড়ো হয়ে যাবে! কি বল ব্রজেন্দ্র?

চট্টগ্রামী মগ মুখ কালো করিয়া নীরব হইয়া রহিল? ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূর্ব যেন না আর এখানে থাকে। ও দেশে যাক। অপূর্ব ট্রেটর নয়, স্বদেশকে ও সমস্ত হৃদয় দিয়েই ভালবাসে, কিন্তু অধিকাংশ,—থাক, স্বজাতির নিন্দা আর করব না,--কিন্তু বড় দুর্বল। ওকে মজবুত করবার ভার তোমাকে দিলাম সত্য, কিন্তু আমার ভরসা নেই ভারতী। বাড়ি ফিরে গিয়ে ওর আজকের কথা, তোমার কথা, কোনটা ভুলতেই বেশী সময় লাগবে না। যাক সে পরের কথা। আপাততঃ, আমরা সভানেত্রীকে অনুরোধ করতে পারি আজকের মত সভা ভঙ্গ করা হোক। এই বলিয়া তিনি সুমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

সুমিত্রা তাঁহাকে কখনো তুমি, কখনো আপনি বলিয়া সসম্মানে কথা কহিত, এখন সেইভাবেই কহিল, অধিকাংশের মত যেখানে ব্যক্তিবিশেষের গায়ের জোরে পরাভূত হয়, তাকে আর যাই বলুক সভা বলে না। কিন্তু এই নাটক অভিনয় করাবারই যদি আপনার সঙ্কল্প ছিল পূর্বাহ্নে জানান নি কেন?

ডাক্তার কহিলেন, না হলেই ছিল ভাল, কিন্তু অবস্থাবিশেষে নাটক যদি হয়েও থাকে সুমিত্রা, অভিনয়টা যে ভাল হয়েছে তা তোমাদের স্বীকার করতে হবে।

রামদাস কহিল, এরকম যে হতে পারে আমার ধারণা ছিল না।

ডাক্তার বলিলেন, বন্ধুত্ব জিনিসটা যে এমনি ক্ষণভঙ্গুর সে ধারণাই কি তোমার ছিল তলওয়ারকর? অথচ, এমন সত্যও জগতে দুর্লভ।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, বর্মার এ্যক্‌টিভিটি আমাদের উঠলো। এখন পালাতে হবে।

ডাক্তার বলিলেন, হবে। কিন্তু সময়মত স্থান ত্যাগ করা এবং এ্যাক্‌টিভিটি ত্যাগ করা এক বস্তু নয় আইয়ার। দীর্ঘকাল কোথাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে যদি না পাই, তার জন্যে নালিশ করা আমাদের সাজে না। এই বলিয়া তিনি ভারতীকে ইঙ্গিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কাহিলেন, হীরা সিং, অপূর্ববাবুর বাঁধন খুলে দাও, চল ভারতী, তোমাদের একটু নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে আসি।

হীরা সিং আদেশ পালন করিতে অগ্রসর হইলে সুমিত্রা কঠিনকণ্ঠে কহিলেন, অভিনয়ের শেষ অঙ্কে আনন্দে হাততালি দিতে ইচ্ছে করে, কিন্তু এ নতুন নয়। ছেলেবেলায় কোথায় একটা উপন্যাসে যেন পড়েছিলাম। কিন্তু একটুখানি যেন বাদ রইল। যুগল-মিলন আমাদের সম্মুখে হয়ে গেলে অভিনয়ে আর কোথাও খুঁত থাকতো না। কি বল ভারতী?

ভারতী লজ্জায় মরিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, লজ্জা পাবার এতে কিছুই নেই ভারতী। বরঞ্চ আমি কামনা করি অভিনয় সমাপ্ত করবার মালিক যিনি তিনি যেন একদিন কোথাও এর খুঁত না রাখেন। পকেট হইতে সুমিত্রার পিস্তলটা বাহির করিয়া তাহার কাছে রাখিয়া দিয়া বলিলেন, আমি এদের পৌঁছে দিতে চললাম, কিন্তু ভয় নেই, আমার কাছে আর একটা গাদা পিস্তল রইল। ব্রজেন্দ্রর প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া সহাস্যে কাহলেন, তোমরা ত সবাই তামাশা করে বলতে, অন্ধকারে আমি প্যাঁচার মত দেখতে পাই--আজ যেন কেউ সে কথা ভুলো না। এই বলিয়া তিনি একটা প্রচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত করিয়া ভারতী ও অপূর্বকে লইয়া বাহির হইতে উদ্যত হইলেন।

সুমিত্রা অকস্মাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিলেন, ফাঁসির দড়িটা কি নিজের হাতে গলায় না পরলেই হত না?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সামান্য একটা দড়িকে ভয় করলে চলবে কেন সুমিত্রা?

কোন একটা কার্যের পূর্বে এই মানুষটিকে মৃত্যুর ভয় দেখাইতে যাওয়া কত বড় বাহুল্য ব্যাপার তা স্মরণ করিয়া সুমিত্রা নিজেই লজ্জিত হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সমস্ত ত ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কিন্তু আবার কখন দেখা হবে?

ডাক্তার বলিলেন, প্রয়োজন হলেই হবে।

সে প্রয়োজন কি হয়নি?

হয়ে থাকলে নিশ্চয়ই দেখা হবে। এই বলিয়া তিনি অপূর্ব-ভারতীকে সঙ্গে করিয়া সাবধানে নীচে নামিয়া গেলেন।

যে গাড়ি ভারতীকে আনিয়াছিল তাহা অপেক্ষা করিতেছিল। সুনিদ্রা হইতে গাড়োয়ান প্রভুকে তুলিয়া ইহাতেই তিনজনে যাত্রা করিলেন। বহুক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ কারয়া এইবার ভারতী কথা কহিল। জিজ্ঞাসা কারল, দাদা, আমরা কোথায় যাচ্চি?

অপূর্ববাবুর বাসায়,—এই বলিয়া ডাক্তার গাড়ি হইতে মুখ বাড়াইয়া অন্ধকারে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিয়া লইয়া স্থির হইয়া বসিলেন। মাইল-দুই নিঃশব্দে চলার পরে গাড়ি থামাইয়া ডাক্তার নামিতে উদ্যত হইলে ভারতী আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা কারল, এখানে কেন?

ডাক্তার বলিলেন, এইবার ফিরি। ওঁরা অপেক্ষা করে আছেন, একটা বোঝাপড়া হওয়া ত চাই!

বোঝাপড়া? ভারতী আকুল হইয়া তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, সে কিছুতেই হতে পারবে না। তুমি সঙ্গে চল। কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়া সে সুমিত্রার মতই অপ্রতিভ হইল। কারণ, ইঁহার বলা মানেই স্থির করিয়া বলা। এবং সংসারের কোন ভয়ই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। তথাপি ভারতী হাত ছাড়িয়াও দিল না, ধীরে ধীরে কহিল,কিন্তু তোমাকে যে আমার বড় দরকার দাদা!

সে আমি জানি। অপূর্ববাবু, আপনি কি পরশু জাহাজে বাড়ি যেতে পারবেন না?

অপূর্ব কহিল, পারবো।

ভারতী হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা, এখনই আমাকে বাসায় যেতে হবে।

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিলেন, না। তোমার কাগজপত্র, তোমার পথের-দাবীর খাতা, তোমার পিস্তল-টোটা সমস্তই এতক্ষণে নবতারা সরিয়ে নিয়ে গেছে। ভোর নাগাদ খানা-তল্লাশী হবে,—আর্টিস্ট স্বয়ং সশরীরে,—তার ধেনো-মদের বোতল, আর তার সেই ভাঙ্গা বেহালাখানা—আপূর্ববাবু, আপনার সে বেহালাটার ওপর একটু দাবী আছে, না? এই বলিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, এ ছাড়া ভয়ানক কিছু আর পুলিশ সাহেবের হাতে পড়বে না। কাল নটা-দশটা আন্দাজ বাসায় ফিরে রাঁধাবাড়া খাওয়া-দাওয়া সেরে বোধ কার একটুখনি ঘুম দেবারও সময় পাবে ভারতী। রাত্রি দুটো-তিনটে নাগাদ দেখা পাবে--কিছু খাবার-দাবার রেখো।

ভারতী অবাক হইয়া রহিল। মনে মনে বলিল, এমন একান্ত সজাগ না হইলে কি এই মরণ-যজ্ঞে কেহ আসিতে চাহিত? মুখে কহিল, তোমার চোখে কিছু এড়ায় না, তুমি সকলের ভাল-মন্দই চিন্তা কর। সংসারে আমার আপনার কেউ নেই, তোমার পথের-দাবী থেকে আমাকে বিদায় দিও না দাদা।

অন্ধকারের মধ্যেই ডাক্তার বারংবার মাথা নাড়িয়া কহিলেন, ভগবানের কাজ থেকে বিদায় দেবার অধিকার কারও নেই, কিন্তু এর ধারা তোমাকে বদলে নিতে হবে।

ভারতী কহিল, তুমিই বদলে দিয়ো।

ডাক্তার এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, সহসা ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, ভারতী, আর আমার সময় নেই, আমি চললাম। এই বলিয়া অন্ধকার পথে মুহূর্তে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

কুড়ি

গাড়ি চলিবার উপক্রম করিতেই ভারতী অপূর্বর বাসার ঠিকানা বলিয়া দিতে মুখ বাড়াইয়া কহিল, দেখো গাড়োয়ান, ত্রিশ নম্বর—

তাহার কথা শেষ না হইতেই গাড়োয়ান বলিয়া উঠিল, আই নো—আই নো।

গাড়ির পরিসর ছোট বলিয়া দুজনে ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়াছিল, গাড়োয়ানের মুখের ইংরাজী কথায় অপূর্বর সমস্ত দেহ যে শিহরিয়া উঠিল ভারতী তাহা স্পষ্ট অনুভব করিল। ইহার পরে প্রায় ঘন্টা-খানেক ধরিয়া ঘড়র্‌-ঘড়র্‌, ছড়র্‌-ছড়র্‌ করিয়া ভাড়াটে গাড়ি চলিতেই লাগিল, কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন কথাই হইল না। অন্ধকার নিঃশব্দ নিশীথে গাড়ির চাকা ও পথের পাথরের সংঘর্ষে যে কঠোর শব্দ উঠিতে লাগিল, তাহাতে অপূর্বর সর্বাঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে কাঁটা দিয়া কেবলই ভয় হইতে লাগিল। পাড়ার কাহারও ঘুম ভাঙ্গিতে আর বাকী থাকিবে না, এবং শহরের সমস্ত পুলিশ ছুটিয়া আসিল বলিয়া। কিন্তু কোন দুর্ঘটনা ঘটিল না, গাড়ি আসিয়া বাসার দরজায় থামিল। ভারতী ভিতরে হইতে গাড়ির দরজা খুলিয়া দিয়া অপূর্বকে নামিতে ইঙ্গিত কারয়া নিজেও তাহার পিছনে পিছনে নামিয়া আসিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কত ভাড়া?

গাড়োয়ান একটুখানি হাসিয়া কহিল, নট্‌ এ পাই। পরক্ষণেই বার-দুই মাথা নাড়িয়া বলিল, গুড নাইট্‌ টু ইউ! এই বলিয়া গাড়ি হাঁকাইয়া দিয়া সোজা বাহির হইয়া গেল।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তেওয়ারী আছে ত?

আছে।

উপরে উঠিয়া দ্বারে করাঘাত করিয়া অপূর্ব তেওয়ারীর ঘুম ভাঙ্গাইল। কবাট খুলিয়া তেওয়ারী দীপালোকে প্রথমেই দেখিতে পাইল ভারতীকে। কাল অপূর্ব বাসায় ফিরিয়াছিল প্রায় ভোরবেলায়, আজ ফিরিয়াছে রাত্রি শেষ করিয়া। সঙ্গে আছে ভারতী। তাই বুঝিতে তেওয়ারীর বাকী কিছুই রহিল না; ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল এবং একটা কথাও না কহিয়া সে দ্রুতবেগে নিজের বিছানায় গিয়া চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। এই মেয়েটিকে তেওয়ারী ভলবাসিত। একদিন তাহাকে আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা কারয়াছিল বলিয়া খ্রীষ্টান হওয়া সত্ত্বেও মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু, কিছুদিন হইতে ব্যাপার যেরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহাতে অপূর্বর সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসম্ভব দুশ্চিন্তা তেওয়ারীর মনে উঠিতেছিল,—এমন কি জাতিনাশ পর্যন্তও। সেই সর্বনাশের প্রকট মূর্তি আজ যেন দেখিয়া কেবল অভ্যাসবশতঃই অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, দোর দিলিনি তেওয়ারী

তাহার মূর্ছাহত উদভ্রান্ত চিত্ত লক্ষ্য কিছুই করে নাই, কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছিল ভারতী। সে-ই তাড়াতাড়ি জবাব দিল, আমি বন্ধ করে দিচ্ছি।

অপূর্ব শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল, খাটের উপর শয্যা তেমনি গুটানো রহিয়াছে, পাতা হয় নাই। বস্তুতঃ, বারান্দায় বসিয়া পথ চাহিয়া থাকিতেই আজ তেওয়ারীর সমস্ত সন্ধ্যাটা গিয়াছে, বিছানা করার কথা মনেও পড়ে নাই। কিন্তু সে উত্তর দিবার পূর্বেই ভারতী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আপনি আরামকেদারাটায় একটুখানি বসুন, আমি এক মিনিটে সব ঠিক করে দিচ্চি।

চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া অপূর্ব পুনশ্চ ডাকিল, এক গেলাস জল দে তো তেওয়ারী।

তাহার পাশের টুলের উপরই খাবার জলের কুঁজা ও গেলাস ছিল, বিছানা পাতিতে পাতিতে তাহা দেখাইয়া দিয়া ভারতী বলিল, ঘুমন্ত মানুষকে আর কেন তুলবেন অবুর্ববাবু, আপনি নিজেই একটু ঢেলে নিন।

অপূর্ব হাত বাড়াইয়া কুঁজাটা তুলিতে পারিল না; তখন উঠিয়া আসিয়া কোন মতে জল গড়াইয়া লইয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পান করিয়া পুনরায় বসিতে যাইতেছিল, ভারতী মানা করিয়া কাহল, আর ওখানে না, একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়ুন।

অপূর্ব শান্ত বালকের ন্যায় নিঃশব্দে আসিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল। ভারতী মশারি

ফেলিয়া ধারগুলা ভাল করিয়া গুঁজিয়া দিতেছিল, অপূর্ব হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল তুমি কোথায় শোবে?

আমি? ভারতী কিছু আশ্চর্য হইল। কারণ, এরূপ নতুনও নয়, এবং এ ঘরের কোথায় কি আছে তাহাও তাহার অবিদিত নয়। এই অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু আরামচৌকিটা দেখাইয়া দিয়া বলিল, সকাল হতে আর ঘন্টা-দুই মাত্র দেরি আছে। ঘুমোন।

অপূর্ব হাত বাড়াইয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, না ওখানে নয়, তুমি আমার কাছে বস।

আপনার কাছে? বাস্তবিকই ভারতীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। অপূর্ব আর যাহাই হউক, এ-সকল ব্যাপারে কখনও আত্মবিস্মৃত হইত না। এমন কতদিন কত উপলক্ষেই ত তাহারা একঘরে রাত্রি যাপন করিয়াছে, কিন্তু মর্যদাহানিকর একটা কথা একটা ইঙ্গিতও কোন দিন তাহার আচরণে প্রকাশ পায় নাই

অপূর্ব কহিল, এই দেখ এরা আমার হাত ভেঙ্গে দিয়েচে। কেন তুমি এদের মধ্যে আমাকে টেনে আনলে? তাহার কথার শেষ দিকটা অকস্মাৎ কান্নায় রুদ্ধ হইয়া গেল। ভারতী মশারির একটা দিক তুলিয়া দিয়া তাহার কাছে বসিল, পরীক্ষা করিয়া দেখিল, বহুক্ষণ ধরিয়া শক্ত বাঁধনের ফলে হাতের স্থানে স্থানে কালশিরা পড়িয়া ফুলিয়া আছে। চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতেছিল, ভারতী আঁচল দিয়া তাহা মুছাইয়া লইয়া সাহস দিয়া বলিল, কিচ্ছু ভয় নেই, তোয়ালে ভিজিয়ে আমি ভাল করে জড়িয়ে দিচ্চি, দু-একদিনেই সমস্ত ভাল হয়ে যাবে। এই বলিয়া সে উঠিয়া গিয়া স্নানের ঘর হইতে একটা গামছা ভিজাইয়া আনিল, এবং সমস্ত নীচের হাতটা বাঁধিয়া দিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন, আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়া দিচ্চি। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অপূর্ব অশ্রুবিকৃতস্বরে বলিল, কাল জাহাজ থাকলে আমি কালই চলে যেতুম।

ভারতী কহিল, বেশ ত, পরশুই যাবেন। একটা দিনের মধ্যে আপনার কোন অমঙ্গল হবে না।

অপূর্ব ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিতে লাগিল, গুরুজনের কথা না শুনলেই এই-সব ঘটে। মা আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছিলেন।

মা বুঝি আপনাকে আসতে দিতে চাননি?

না, এক শ' বার মানা করেছিলেন, কিন্তু আমি শুনিনি। তার ফল হল যে, কতকগুলো ভয়ানক লোকের একেবারে চিরকালের জন্যে বিষদৃষ্টিতে পড়ে রইলুম। সে যা হবার হবে, দুর্গা দুর্গা বলে পরশু একবার জাহাজে উঠতে পারলে হয়। এই বলিয়া সে সহসা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু সেই সঙ্গে যে ইহা অপেক্ষাও শতগুণ গভীর নিঃশ্বাস আর একজনের হৃদয়ের মূল পর্যন্ত নিঃশব্দে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তাহা সে জানিতেও পারিল না। আর একটা দিনও যেন না অপূর্বর বিলম্ব ঘটে, দুর্গা দুর্গা বলিয়া একবার সে জাহাজে উঠিতে পারিলে হয়! বর্মায় আসা তাহার সর্বাংশেই বিফল হইয়াছে, বাড়ি গিয়া এ দেশের জন-কয়েকের বিষদৃষ্টির কথাই শুধু তাহার চিরদিন স্মরণে থাকিবে, কিন্তু সকল চক্ষুর অন্তরালে একজনের কুণ্ঠিত দৃষ্টির প্রতিবিন্দু হইতেই যে নীরবে অমৃত ঝরিয়াছে, একটা দিনও হয়ত সে কথা তাহার মনে পড়িবে না।

অপূর্ব কহিতে লাগিল, এ বাড়িতে পা দিয়েই তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল, কোর্টে জরিমানা পর্যন্ত হয়ে গেল যা জন্মে কখনো আমার হয়নি। এর থেকেই আমার চৈতন্য হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু হল না।

ভারতী চুপ করিয়া ছিল, চুপ করিয়াই রহিল। অপূর্ব নিজেও একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া তাহার দুরদৃষ্টের সূত্র ধরিয়া বলিল, তেওয়ারী আমাকে বার বার সাবধান করেছিল,—বাবু, ওরা এক জাত, আমরা এক জাত, এ-সব করবেন না। কিন্তু কপালে দুর্ভোগ থাকলে কে

খণ্ডাবে বল? চাকরি সেই গেল,—পাঁচ শ' টাকা মাইনে এ বয়সে কটা লোকে পায়? তাছাড়া এ হাত আমি লোকের সুমুখে বার করব কি করে?

ভারতী আস্তে আস্তে বলিল, ততদিনে হাতের দাগ ভাল হয়ে যাবে। ইহার বেশী কথা মুখ দিয়া তাহার বাহির হইল না। মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিল, সে হাত আর চলিতে চাহিল না, এবং এই অত্যন্ত সাধারণ তুচ্ছ লোকটাকে সে মনে মনে ভালবাসিয়াছে মনে করিয়া নিজের কাছেই যেন সে লজ্জায় মরিয়া গেল। এ কথা দলের অনেকেই জানিয়াছে আজ অপূর্বর প্রাণ বাঁচাইতে গিয়া তাহাদের কাছে অপরাধী এবং সুমিত্রার চক্ষে সে ছোট হইয়া গেছে, কিন্তু এই অতি তুচ্ছ মানুষটাকে হত্যা করিবার অসম্মান ও ক্ষুদ্রতা হইতে সে যে তাহাদের রক্ষা করিতে পারিয়াছে ইহাই মনে করিয়া এখন তাহার গর্ব বোধ হইল।

অপূর্ব বলিল, দাগ সহজে যাবে না। কেউ জিজ্ঞাসা করলে যে কি জবাব দেব জানিনে। কিন্তু শ্রোতার নিকট হইতে সায় না পাইয়া আপনিই কহিতে লাগিল, সকলে ভাববে কাজ চালাতে আমি পারলুম না। তাইত লোকে বলে বাঙালীর ছেলেরা বি. এ. এম. এ. পাশ করে বটে কিন্তু বড় চাকরি পেলে রাখতে পারে না। আমার কলেজের ছেলেরা আমাকে ছি ছি করতে থাকবে, আমি উত্তর দিতে পারব না।

যাহোক কিছু একটা বানিয়ে বলে দেবেন। আচ্ছা, আপনি ঘুমোন। এই বলিয়া ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

আর একটু মাথায় হাত বুলিয়ে দাও না ভারতী!

না, আমি বড় ক্লান্ত।

তবে থাক, থাক। রাতও আর নেই।

ভারতী পাশের ঘরে আসিয়া দেখিল, আলোটা তখনও মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে, এবং তেওয়ারী তেমনি চাদর মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। অদূরে ভাঙাগোছের একখানা ডেকচেয়ার পড়িয়া ছিল, তাহাতেই আসিয়া সে উপবেশন করিল। অপূর্বর ঘরে ভাল আরামচৌকি ছিল কিন্তু ওই লোকটিকে সুমুখে রাখিয়া একই ঘরের মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে আজ তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইল। ডেকচেয়ারটায় কোনমতে একটু হেলান দিয়া পড়িয়া মনের মধ্যে যে তাহার করিতে লাগিল তাহার সীমা নাই। ইতিপূর্বে এই ঘরের মধ্যেই সে একাধিক বার কঠিন ধাক্কা খাইয়াছে, কিন্তু আজিকার সহিত তাহার তুলনাই হয় না। ভারতীয় প্রথমেই মনে হইল, কি করিয়া এবং কাহার অপরিসীম করুণায় অপূর্ব সুনিশ্চিত ও প্রত্যাসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে আজ রক্ষা পাইল, অথচ রাত্রিটাও প্রভাত হইল না, এতবড় কথাটা সে ভুলিয়া গেল। তাহার পরম বন্ধু তলওয়ারকরের প্রতি, দলের প্রতি এবং বিশেষ করিয়া ওই ডাক্তার লোকটির প্রতি যে কি অপরিসীম অপরাধ করিয়াছে সে কথাই তাহার মনে নাই। সেখানে বড় চাকরি ও হাতের দাগটাই তাহার সমস্ত স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। সেইখানে বসিয়া হঠাৎ ভারতীর চোখে পড়িল, সুমুখের খোলা জানলার ফাঁক দিয়া ভোরের আলো দেখা দিয়াছে। সে মুহূর্তে উঠিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিল, এবং কদর্য, অস্বাভাবিক ও অপ্রত্যাশিত স্থানে মাতালের নেশা কাটিয়া গেলে সে যেমন করিয়া মুখ ঢাকিয়া পলায়ন করে, ঠিক তেমনি করিয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

একুশ

পরদিন অপরাহ্নবেলায় সকল কথা, সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করিয়া ভারতী পরিশেষে কহিল, অপূর্ববাবু যে মস্ত লোক এ ভুল আমি একদিনও করিনি, কিন্তু তিনি যে এত সামান্য, এত তুচ্ছ,—এ ধারণাও আমার ছিল না।

ভারতীর ঘরে খাটের উপর বসিয়া সব্যসাচী ডাক্তার একখানা বইয়ের পাতা উল্টাইতেছিলেন, তাহার প্রতি চাহিয়া গম্ভীরমুখে কহিলেন, কিন্তু আমি জানতাম। লোকটা এত তুচ্ছ না হলে কি এতবড় ভালবাসা তোমার এত তুচ্ছ কারণেই যায়? যাক, বাঁচা গেল ভাই, কাকে কি ভেবে মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছিলে বৈ ত নয়!

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জিনিষপত্র, বিশেষ করিয়া মেঝের উপরে ছড়ানো পুস্তকের রাশি চাহিয়া দেখিলেই বুঝা যায় এ ঘরে ইতিপূর্বে পুলিশ-তদন্ত হইয়া গেছে। সেইগুলা সব গুছাইতে গুছাইতে ভারতী কথা কহিতেছিল। সে হাতের কাজ বন্ধ করিয়া সবিস্ময়ে চোখ তুলিয়া বলিল, তুমি তামাশা করচ দাদা?

না।

নিশ্চয়।

ডাক্তার কহিলেন, আমার মত ভয়ানক লোক, যে বোমা-পিস্তল নিয়ে কেবল মানুষ খুন করে বেড়ায়, তার মুখে তামাশা?

ভারতী কহিল, আমি ত বলিনে তুমি মানুষ খুন করে বেড়াও! ও-কাজ তুমি পারোই না। কিন্তু তামাশা ছাড়া এ কি হতে পারে বলত? ঘন্টা দুই-তিনের মধ্যেই যে সব ভুলে গিয়ে মনে রাখলে শুধু হাতের দাগ আর পাঁচ শ' টাকার চাকরি, তার চেয়ে অধম, ক্ষুদ্র ব্যক্তি আর ত আমি দেখতে পাইনে। তুমি বলছিলে এ আমার মোহ। ভাল, তাই যদি হয়, তুমি আশীর্বাদ কর, এ মোহ আমার চিরদিনের মত কেটে যাক, আমি সমস্ত দেহ-মন দিয়ে তোমার দেশের কাজে লেগে যাই।

ডাক্তারের ওষ্ঠাধর চাপা হাসিতে বিকশিত হইয়া উঠিল, কহিলেন, তোমার মুখের ভাষাটা যে মোহ কাটার মতই তাতে আমার সন্দেহ নেই, কিন্তু মুশকিল এই যে কণ্ঠস্বরে তার আভাসটুকু পর্যন্ত নেই? তা সে যাই হোক, ভারতী, তোমাকে দিয়ে আমার দেশের কাজ কিন্তু এক তিলও হবে না। তার চেয়ে তোমার অপূর্ববাবুই ঢের ভল। দেনা-পাওনার চুল-চেরা বিচার করতে করতে বোঝাপড়া একদিন তোমাদের হয়ে যেতেও পারে। বরঞ্চ, তাই কর গে।

ভারতী কহিল, তার মানে দেশকে আমি ভালবাসতে পারব না?

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, অনেক পরীক্ষা না দিলে কিন্তু ঠিক করে কিছুই বলা যায় না ভাই।

ভারতী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহসা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, এই তোমাকে আজ বলে রাখলাম দাদা, সমসস্ত পরীক্ষাতেই আমি উত্তীর্ণ হতে পারবো। তোমার কাজের মধ্যে এত স্বার্থ, এত সংশয়, এতবড় ক্ষুদ্রতার স্থান নেই।

তাহার উত্তেজনায় ডাক্তার হাসিলেন, পরে ক্রীড়াচ্ছলে নিজের ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, হা আমার পোড়া কপাল! দেশ মানে কি বুঝে রেখেচ খানিকটা মস্তবড় মাটি, নদ-নদী আর পাহাড়? একটিমাত্র অপূর্বকে নিয়েই জীবনে ধিক্কার জন্মে গেল, বৈরাগী হতে চাও, আর সেখানে কেবল শত-সহস্র অপূর্বই নয়, তার দাদারাও বিচরণ করেন। আরে পরাধীন দেশের সব চেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হোলো কৃতঘ্নতা! যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখবে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রি করে দিতে চাইবে! মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মত বিঁধবে। শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতিই নেই, কেউ কাছে ডাকবে না, কেউ সাহায্য করতে আসবে না, বিষধর সাপের মত তোমাকে দেখে লোকে দূরে সরে যাবে। দেশকে ভালবাসার এই আমাদের পুরস্কার, ভারতী এর বেশী দাবী করবার কিছু যদি থাকে, ত সে শুধু পরলোকে। এতবড় ভয়ানক পরীক্ষা তুমি কিসের জন্যে দিতে যাবে, বোন? বরঞ্চ, আশীর্বাদ করি অপূর্বকে নিয়ে তুমি সুখী হও,—আমি নিশ্চয় জানি, তার সকল দ্বিধা, সকল সংস্কার ছাপিয়ে তোমার মূল্য একদিন তার চোখে পড়বেই পড়বে।

ভারতীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত নীরবে নতমুখে থাকিয়া প্রবল চেষ্টায় তাহা নিবারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পার না বলেই কোনমতে আমাকে বিদায় করে দিতে চাও দাদা?

তাহার এই একান্ত সরল নিঃসঙ্কোচ প্রশ্নের এমনি সোজা উত্তর বোধ হয় ডাক্তারের

মুখে আসিল না, হাসিয়া বলিলেন, তোমার মত লক্ষ্মী মেয়ের মায়া কি সহজে কেউ কাটাতে পারে বোন? কিন্তু, কাল স্বচক্ষেই ত দেখতে পেলে এর মধ্যে কত লুকোচুরি, কত হিংসে, কত মর্মান্তিক ক্রোধ জড়িয়ে রয়েছে। তোমার পানে চাইলেই মনে হয় এ-সবের জন্যে তুমি নও, এর মধ্যে টেনে এনে তোমাকে ভাল কাজ হয়নি। শুধু তোমার কাছে কাজ আদায়ের আমার একটা দিন আছে, যেদিন ছুটি নেবার আমার তলব এসে পৌঁছবে।

ভারতী এবার আর তাহার চোখের জল বারণ করিতে পারিল না। কিন্তু তখনই হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া কহিল, তুমিও আর এদের মধ্যে থেকো না দাদা।

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, এবার কিন্তু বড় বোকার মত কথা হয়ে গেল ভারতী।

ভারতী অপ্রতিভ হইল না, কহিল, তা জানি, কিন্তু এরা সবাই যে ভয়ঙ্কর নির্দয়।

আর আমি?

তুমিও ভারী নিষ্ঠুর।

সুমিত্রাকে কি রকম মনে হল ভারতী?

এই প্রশ্ন শুনিয়া ভারতীর মাথা হেঁট হইয়া গেল। লজ্জায় উত্তর দিতে সে পারিল না, কিন্তু উত্তরের জন্য তাগিদও আসিল না। কিছুক্ষণের জন্য উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। বেশীক্ষণ নয়, কিন্তু এইটুকু মাত্র মৌনতার অবকাশ-পথ দিয়া এই অত্যাশ্চর্য মানুষটির ততোধিক আশ্চর্য হৃদয়ের রহস্যাবৃত তলদেশে অকস্মাৎ বিদ্যুৎ চমকিয়া গেল।

কিন্তু পরক্ষণেই ডাক্তার সমস্ত ব্যাপারটাকে চাপা দিয়া ফেলিলেন। সহসা ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়িয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, অপূর্বকে তুমি বড় অবিচার করেছ ভারতী। এতবড় মারাত্মক কাণ্ড এর ভেতরে আছে সে বেচারা বোধ করি কল্পনাও করেনি। বাস্তবিক বলচি তোমাকে, এত ছোট, এত হীন সে কখনো নয়। চাকরি করতে বিদেশে এসেছে, বাড়িতে মা আছে, ভাই আছে, দেশে বন্ধু-বান্ধব আছে, সাংসারিক উন্নতি করে দশজনের একজন হবে এই তার আশা। লেখাপড়া শিখেচে, ভদ্রলোকের ছেলে পরাধীনতার লজ্জা সে অনুভব করে। আরো দশজন বাঙালীর ছেলের মত সত্য সত্যই সে স্বদেশের কল্যাণ প্রার্থনা করে। তাই তুমি বললে যখন পথের-দাবীর সভ্য হও, দেশের কাজ করো, সে বললে, বহুৎ আচ্ছা! তোমার কথা শুনলে যে তার কখনো মন্দ হবে না এইটুকুই কেবল সে নিঃসংশয়ে বোঝে। এই বিদেশে সকল আপদে-বিপদে তুমিই তার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সেই তুমিই যে হঠাৎ তাকে মরণের মধ্যে ঠেলে দেবে সে তার কি জানত, বল?

ভারতী অশ্রু গোপন করিতে মুখ নীচু করিয়া কহিল, কেন তুমি তাঁর জন্যে এত ওকালতি করচ দাদা, তিনি তার যোগ্য নন। যে-সব কথা তাঁর মুখ থেকে কাল শুনেচি, তারপরেও তাঁকে শ্রদ্ধা করা আর উচিত নয়।

ডাক্তার হসিয়া বলিলেন, অনুচিত কাজই না হয় জীবনে একটা করলে। এই বলিয়া একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিতে লাগিলেন, তুমি ত চোখে দেখনি, ভারতী, কিন্তু আমি দেখেচি। তারা যখন তাকে দড়ি দিয়ে বাঁধলে সে অবাক হয়ে রইল। তারা জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এই সমস্ত বলেছ? সে ঘাড় নেড়ে বললে, হাঁ। তারা বললে, এর শাস্তি—তোমাকে মরতে হবে। প্রত্যুত্তরে সে কেবল ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। আমি ত জানি তার বিহ্বল দৃষ্টি তখন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তাই ত তোমাকে আনতে পাঠিয়েছিলাম বোন। এখন যাই কেননা তোমাকে সে বলে থাক, ভারতী, এ ধাক্কা বোধ হয় আজও অপূর্ব কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ভারতী আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিল না, ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া কহিল, কেন আমাকে তুমি এই-সব শোনাচ্চ দাদা? তোমার চেয়ে কারও আশঙ্কা বেশী নয়, তাঁর আচরণে বেশী বিপদে তোমার চেয়ে কেউ পড়েনি। তবুও কেবল আমার মুখ চেয়ে তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে তুমি ঘরে-বাইরে শত্রু তৈরি করলে!

ইস্‌! তাই বৈ কি!

তবে কিসের জন্যে তাঁকে বাঁচাতে গেলে বলত?

বাঁচাতে গেলাম অপূর্বকে? আরে ছিঃ? আমি বাঁচাতে গেলাম ভগবানের এই অমূল্য সৃষ্টিটিকে। যে বস্তু তোমাদের মত এই দুটি সামান্য নর-নারীকে উপলক্ষ্য করে গড়ে উঠেছে তার কি দাম নেই নাকি যে, ব্রজেন্দ্রের মত বর্বরগুলোকে দেব তাই নষ্ট করে ফেলতে?--শুধু এই ভারতী, শুধু এই! নইলে মানুষের প্রাণের মূল্য আছে নাকি আমাদের কাছে? একটা কানাকড়িও না! এই বলিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, কি হাসো দাদা, তোমার হাসি দেখলে আমার গা জ্বলে যায়। আমার এমন ইচ্ছে করে যে তোমাকে আঁচল-চাপা দিয়ে কোন বনে-জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে চিরকাল লুকিয়ে রেখে দি। যারা ধরে তোমাকে ফাঁসি দেবে তারাই কি তোমার দাম জানে? তারা কি টের পাবে জগতের কি সর্বনাশ তারা করলে? নিজের দেশের লোকই তোমাকে খুনে, ডাকাত, রক্তপিপাসু,—কত কথাই না বলে! কিন্তু আমি ভাবি, বুকের মধ্যে এত স্নেহ, এত করুণা নিয়ে তুমি কেমন করে এর মধ্যে আছ!

এইবার ডাক্তার আর একদিকে চাহিয়া রহিলেন, সহসা জবাব দিতে পারিলেন না। তারপরে মুখ ফিরাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু এখন সেই স্বচ্ছন্দ সুন্দর হাসিটি মুখে ফুটিল না। কথা কহিলেন, কিন্তু সেই সহজ কণ্ঠস্বরে কোথা হইতে একটা অপরিচিত ভার চপিয়া আসিল, কহিলেন, নিষ্ঠুরতা দিয়ে কি কখনো,—আচ্ছা থাক সে কথা। তোমাকে একটা গল্প বলি। নীলকান্ত যোশী বলে একটি মারহাট্টা ছেলেকে তুমি দেখোনি, কিন্তু তোমাকে দেখে পর্যন্ত কেবলি আমার তাকেই মনে পড়ে। রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে যেতে দেখলে তার চোখ দিয়ে জল পড়তো। একদিন রাত্রে কলম্বোর একটা পার্কের মধ্যে আমরা দুজনে বেড়া ডিঙিয়ে আশ্রয় নিই। গাছতলার একটা বেঞ্চের উপরে শুতে গিয়ে দেখি আর একজন শুয়ে আছে। মানুষের সাড়া পেয়ে সে জল জল করতে লাগলো, চারিদিকে ভয়ানক দুর্গন্ধ বেরিয়েছে,—দেশলাই জ্বেলে তার মুখের পানে তাকিয়েই বোঝা গেল, কলেরা। নীলকান্ত তার শুশ্রূষার লেগে গেল। ফর্সা হয়ে আসে, বললাম, যোশী, লোকটা সন্ধ্যার অন্ধকারে যেমন করেই হোক পেয়াদাদের দৃষ্টি এড়িয়ে এই বাগানটায় রয়ে গেছে, কিন্তু সকালে তা হবে না। ওয়ারেন্টের আসামী আমরা,--এ ত মরবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যে যেতে হবে। চল, সরি! নীলকান্ত কাঁদতে লাগলো, বললে, এ অবস্থায় একে কি করে ফেলে যাবো ভাই,—তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি যাও, আমি থাকি। অনেক বুঝলাম, কিন্তু যোশীকে নড়াতে পারলাম না।

ভারতী সভয়ে কহিল, কি হল তার পরে?

ডাক্তার কহিলেন, লোকটা বিবেচক ছিল, ভোর হবার পূর্বেই চোখ বুজলে। তাই সে-যাত্রায় নীলকান্তকে নড়াতে পারলাম। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, সিঙ্গাপুরে যোশীর ফাঁসি হয়। পল্টনের সিপাইদের নাম বলে দিলে ফাঁসিটা তার মাপ হতো,---গবর্নমেন্ট থেকে অনেক প্রকার চেষ্টাই হয়েছিল, কিন্তু যোশী সেই যে ঘাড় নেড়ে বললে আমি জানিনে, তার আর বদল হল না। অতএব, রাজার আইনে তার ফাঁসি হল। অথচ, যাদের জন্য সে প্রাণ দিলে, তাদের সে ভাল করে চিনতও না। এখনও এই-সব ছেলে এদেশেই জন্মায় ভারতী, তা নইলে বাকী জীবনটা তোমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকতেই হয়ত রাজী হয়ে পড়তাম।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। ডাক্তার কহিলেন, নরহত্যা আমার ব্রত নয়, ভাই, তোমাকে সত্যই বলচি, ও আমি চাইনে।

চাইতে না পারো, কিন্তু প্রয়োজন হলে?

প্রয়োজন হলে? কিন্তু, ব্রজেন্দ্রের প্রয়োজন এবং সব্যসাচীর প্রয়োজন ত এক নয় ভারতী।

ভারতী বলিল, সে আমি জানি। আমি তোমার প্রয়োজনের কথাই জিজ্ঞাসা করচি দাদা।

প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। মনে হইল যেন উত্তর দিতে তিনি দ্বিধা বোধ করিতেছেন। তাহার পরে কতকটা যেন অন্যমনস্কের মত ধীরে ধীরে বলিলেন, কে জানে কবে আমার সেই পরম প্রয়োজনের দিন আসবে। কিন্তু, থাক, ভারতী, এ তুমি জানতে চেয়ো না। তার চেহারা তুমি কল্পনাতেও সইতে পারবে না, বোন।

ভারতী এ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, কহিল, এ ছাড়া কি আর পথ নেই?

না।

তাঁহার মুখের এই সংশয়লেশহীন অকুণ্ঠিত উত্তর শুনিয়া ভারতী হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর 'না' সে সত্যই সহ্য করিতে পারিল না। ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল এ ছাড়া আর পথ নেই , এমন কিন্তু হতেই পারে না দাদা।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, না, পথ আছে বৈ কি! আপনাকে ভোলাবার অনেক রাস্তা খোলা আছে, ভারতী, কিন্তু সত্যে পৌঁছাবার আর দ্বিতীয় পথ নেই।

ভারতী স্বীকার কারতে পারিল না। শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিল, দাদা, তুমি অশেষ জ্ঞানী। এই একটিমাত্র লক্ষ্য স্থির রেখে তুমি পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েচ, তোমার অভিজ্ঞতার অন্ত নেই। তোমার মত এতবড় মানুষ আমি আর কখনো দেখিনি। আমার মনে হয়, কেবল তোমার সেবা করেই আমি সমস্ত জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। তোমার সঙ্গে তর্ক সাজে না, কিন্তু বল, আমার অপরাধ নেবে না?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, কি বিপদ! অপরাধ নেব কিসের জন্যে?

ভারতী তেমনি স্নিগ্ধ সবিনয়ে কহিতে লাগিল, আমি ক্রীশ্চান, শিশুকাল থেকে ইংরাজকেই আত্মীয় জেনে, বন্ধু জেনে বড় হয়ে উঠেছি, আজ তাদের প্রতি মন ঘৃণায় পূর্ণ করে তুলতে আমার ভারী কষ্ট হয়। কিন্তু তুমি ছাড়া এ কথা আমি কারও সুমুখে বলতে পারিনে। অথচ, তোমাদের মতই আমি ভারতবর্ষের,—বাঙলা দেশের মেয়ে। আমাকে তুমি অবিশ্বাস করো না।

তাহার কথা শুনিয়া ডাক্তার আশ্চর্য হইলেন। সস্নেহে ডান হাতখানি তাহার মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, এ আশঙ্কা কেন ভারতী? তুমি ত জানো তোমাকে আমি কত স্নেহ, কত বিশ্বাস করি।

ভারতী বলিল, জানি। আর তুমিও কি আমার ঠিক এই কথাই জান না দাদা? তোমার ভয় নেই, ভয় তোমাকে দেখানো যায় না, শুধু সেইজন্যেই কেবল তোমাকে বলতে পারিনি, এ বাড়িতে আর তুমি এসো না। কিন্তু এও জানি, আজকে রাত্রির পরে আর কখনো,—না না, তা নয়, হয়ত, অনেকদিন আর দেখা হবে না। সেদিন যখন তুমি সমস্ত ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ করলে তখন প্রতিবাদ আমি করিনি, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নিরন্তর এই প্রার্থনাই করেচি, এতবড় বিদ্বেষ যেন না তোমার অন্তরের সমস্ত সত্য আচ্ছন্ন করে রাখে। দাদা, তবুও আমি তোমাদেরই।

ডাক্তার হাসিমুখে বলিলেন, হাঁ আমি জানি, তুমি আমাদেরই।

তা হলে এ পথ তুমি ছাড়।

ডাক্তার চমকিয়া উঠিলেন, কোন্ পথ?

বিপ্লবীদের এই নির্মম পথ।

কেন ছাড়তে বল?

ভারতী কহিল, তোমাকে মরতে দিতে আমি পারব না। সুমিত্রা পারে, কিন্তু আমি পারিনে। ভারতের মুক্তি আমরা চাই—অকপটে, অসঙ্কোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র চাই। মনুষ্য-জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই। ভগবানের এতবড় সত্যে উপস্থিত হবার এই নিষ্ঠুর পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই এ আমি কোন মতেই ভাবতে পারিনে। পৃথিবী ঘুরে তুমি শুধু

এই পথের খবরটাই জেনে এসেছে, সৃষ্টির দিন থেকে স্বাধীনতার তীর্থযাত্রী শত-সহস্র লোকের পায়ে পায়ে এই পথের চিহ্নটাই হয়ত তোমার চোখে স্পষ্ট হয়ে পড়েচে, কিন্তু বিশ্বমানবের একান্ত শুভবুদ্ধি, তার অনন্ত বুদ্ধির ধারা কি এমনিই নিঃশেষ হয়ে গেছে যে এই রক্তরেখা ছাড়া আর কোন পথের সন্ধানই কোন দিন তার চোখে পড়বে না? এমন বিধান কিছুতেই সত্য হতে পারে না। দাদা, মনুষ্যত্বের এতবড় পরিপূর্ণতা তুমি ছাড়া আর কোথাও আমি দেখিনি,—নিষ্ঠুরতার এই বারংবার চলা-পথে তুমি আর চলো না। দুয়ার হয়ত আজও রুদ্ধ আছে, তাই তুমি আমাদের জন্যে খুলে দাও—এ জগতের সবাইকে ভালবেসে আমরা তোমাকে অনুসরণ করে চলি।

ডাক্তার ম্লানমুখে একটুখানি হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর ভারতীর মাথার পরে হাত রাখিয়া বার-দুই ধীরে ধীরে চাপড়াইয়া কহিলেন, আমার আর সময় নেই ভাই, আমি চললাম।

কোন উত্তর দিয়ে গেলে না, দাদা?

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু কহিলেন, ভগবান যেন তোমার ভাল করেন।—এই বলিয়া আস্তে আস্তে বাহির হইয়া গেলেন।

বাইশ

জলপথে শত্রুপক্ষীয় জাহাজের গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে নদীর ধারে, শহরের শেষ প্রান্তে একটি ছোটরকমের মাটির কেল্লা আছে, এখানে সিপাহি-সান্ত্রী অধিক থাকে না, শুধু ব্যাটারি চালনা করিবার জন্য কিছু গোরা-গোলন্দাজ ব্যারাকে বাস করে। ইংরেজের এই নির্বিঘ্ন শান্তির দিনে বিশেষ কড়াকড়ি এখানে ছিল না। নিষেধ আছে, অন্যমনস্ক পথিক কেহ তাহার সীমানার মধ্যে গিয়া পড়িলে তাড়া করিয়াও আসে, কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ইহারই একধারে গাছপালার মধ্যে পাথরে বাঁধানো একটা ঘাটের মত আছে, হয়ত কোন উচ্চ রাজকর্মচারীর অগমন উপলক্ষে ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু এখন ইহার কাজও নাই, প্রয়োজনও নাই। ভারতী মাঝে মাঝে একাকী আসিয়া এখানে বসিত। কেল্লার রক্ষণাবেক্ষণের ভার যাহাদের প্রতি ছিল তাহাদের কেহ যে দেখে নাই তাহা নহে, সম্ভবতঃ স্ত্রীলোক বলিয়া, এবং ভদ্র স্ত্রীলোক বলিয়া, তাহারা আপত্তি করিত না। বোধ করি এইমাত্র সূর্যাস্ত হইয়া থাকিবে, কিন্তু অন্ধকার হইতে তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। নদীর কতক অংশে, এবং পরাপারবর্তী গাছপালার উপরে শেষ স্বর্ণাভা ছড়াইয়া পড়িয়াছে; দলে দলে পাখির সারি এদিক হইতে ওদিক উড়িয়া চলিয়াছে,—কাকের কালো দেহে, বকের সাদা পালকে, ঘুঘুর বিচিত্র পাণ্ডুর সর্বাঙ্গে আকাশের রাঙ্গা আলো মিশিয়া হঠাৎ যেন তাহাদিগকে কোন্ অজানা দেশের জীব করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের অবাধ স্বচ্ছন্দ গতি অনুসরণ করিয়া ভারতী নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিল। কি জানি, কোথায় ইহাদের বাসা, কিন্তু সে অলক্ষ্য আকর্ষণ কাহারও এড়াইয়া যাইবার জো নাই। এই কথা মনে করিয়া দুই চক্ষু তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া চাহিয়া দেখিল, দূর বৃক্ষশ্রেণীর সোনার দীপ্তি নিবিয়া আসিতেছে এবং মাথার উপরে গাছপালা নদীতে দীর্ঘতর ছায়াপাত করিয়া জল কালো করিয়া আনিয়াছে এবং তাহারই মধ্যে হইতে অন্ধকার যেন সুদীর্ঘ জিহ্বা মেলিয়া সম্মুখের সমস্ত আলোক নিঃশব্দে লেহন করিয়া লইতেছে।

সহসা নদীর ডানদিকের বাঁক হইতে একখানি ক্ষুদ্র শাম্পন নৌকা সুমুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌকায় মাঝি ভিন্ন অন্য আরোহী ছিল না। সে চট্টগ্রামী মুসলমান। ক্ষণকাল ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার চট্টগ্রামের দুর্বোধ্য মুসলমানী বাংলায় কহিল, আম্মা, ওপারে যাবে? একআনা পয়সা দিলেই পার করে দিই।

ভারতী হাত নাড়িয়া কহিল, না, ওপারে আমি যাবো না।

মাঝি বলিল, আচ্ছা দুটো পয়সা দাও, চল।

ভারতী কহিল, না বাপু তুমি যাও। বাড়ি আমার এপারে, ওপারে যাবার আমার দরকার

নেই।

মাঝি গেল না, একটু হাসিয়া কহিল, পয়সা না হয় নাই দেবে, চল তোমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। এই বলিয়া সে ঘাটের একধারে নৌকা ভিড়াইতে উদ্যত হইল। ভারতী ভয় পাইল। গাছপালার মধ্যে স্থানটা অন্ধকার এবং নির্জন। দীর্ঘদিন এদেশে থাকার জন্য ইহাদের ভাষা বলিতে না পারিলেও ভারতী বুঝিত। এবং ইহাও জানিত, চট্টগ্রামের এই মুসলমান মাঝি-সম্প্রদায় অতিশয় দুর্বৃত্ত। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, তুমি যাও বলচি এখান থেকে, নইলে পুলিশ ডাকবো।

তাহার উচ্চকণ্ঠ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে বোধ হয় চট্টগ্রামী মুসলমান এবার ভয় পাইয়া থামিল। ভারতী চাহিয়া দেখিল লোকটার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পার হইয়াছে, কিন্তু শখ যায় নাই। পরনে লতাপাতা-ফুল-কাটা লুঙ্গি, কিন্তু তেলে ও ময়লায় অত্যন্ত মলিন। গায়ে মূল্যবান মিলিটারি ফ্রক-কোট, জরির পাড়, কিন্তু যেমন নোংরা তেমনি জীর্ণ। বোধ হয় কোন পুরাতন জামা-কাপড়ের দোকান হইতে কেনা। মাথায় বেলদার ন্যাকড়ার টুপি, কপাল পর্যন্ত টানা। এই মূর্তির প্রতি রোষদৃপ্তচক্ষে চাহিয়া ভারতী কয়েক মুহূর্ত পরেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, চেহারা যাই হোক, কিন্তু গলার আওয়াজটাকে পর্যন্ত বদলে মুসলমান করে ফেলেচ।

মাঝি কহিল, যাবো, না পুলিশ ডাকবে?

ভারতী বলিল, পুলিশ ডেকে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়াই উচিৎ। অপূর্ববাবুর ইচ্ছেটা আর অপূর্ণ রাখি কেন।

মাঝি কহিল, তার কথাই বলচি! এসো জোয়ার আর বেশী নেই, এখনো কোশ-দুই যেতে হবে।

ভারতী নৌকায় উঠিলে, ঠেলিয়া দিয়া ডাক্তার পাকা মাঝির মতই দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। যেন দুইহাতে দুখানা দাঁড় টানাই তঁহার পেশা। কহিলেন, লামা জাহাজ চলে গেল দেখলে?

ভারতী কহিল, হাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, অপূর্ব এই দিকের ফাস্ট ক্লাস ডেকে দাঁড়িয়েছিল দেখতে পেলে?

ভারতী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

ডাক্তার কহিলেন, তার বাসায় কিংবা আফিসে আমার যাবার জো ছিল না। তাই জেটির একধারে শাম্পান বেঁধে আমি ওপরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হাত তুলে সেলাম করতেই—

ভারতী ব্যাকুল হইয়া কহিল, কার জন্যে কিসের জন্যে এতবড় কাজ তুমি করতে গেলে দাদা। প্রণটা কি তোমার একেবারেই ছেলেখেলা?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, একেবারেই না। আর গেলাম কিসের জন্যে? ঠিক সেই জন্যেই, যে জন্যে তুমি চুপটি করে এখানে একলা বসে আছো বোন।

ভারতী উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন কিছুতেই চাপিতে পারিল না। কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, কখখনো না। এখানে আমি এমনি এসেছি—প্রায় আসি। কারও জন্যে আমি কখখনো আসিনি। তোমাকে চিনতে পারলেন?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, না, একেবরেই না। এ বিদ্যে আমার খুব ভাল করেই শেখা,--এ দাঁড়ি-গোঁফ ধরা সহজ কর্ম নয়, কিন্তু আমার ভারী ইচ্ছে ছিল অপূর্ববাবু যেন আমাকে চিনতে পারেন। কিন্তু এত ব্যস্ত যে তার সময় ছিল কৈ?

ভরতী নীরবে চাহিয়া ছিল, সেই অত্যন্ত উৎসুক মুখের প্রতি চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য ডাক্তার নির্বাক হইয়া গেলেন।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তার পরে কি হল?

ডাক্তার বলিলেন, বিশেষ কিছুই না।

ভারতী চেষ্টা করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, বিশেষ কিছু যে হয়নি সে শুধু আমার ভাগ্য! চিনতে পারলেই তোমাকে ধরিয়ে দিতেন, আর সে অপমান এড়াবার জন্যে আমাকে

আত্মহত্যা করতে হতো। চাকরি যাক, কিন্তু প্রাণটা বাঁচলো! এই বলিয়া সে দূর পরপারে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া নিঃশ্বাস মোচন করিল।

ডাক্তার নীরবে নৌকা বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া ভারতী সহসা মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, কি ভাবচ দাদা?

বল ত দেখি?

বলব? তুমি ভাবচো এই ভারতী মেয়েটা আমার চেয়ে ঢের বেশী মানুষ চিনতে পারে। নিজের প্রাণ বাঁচাতে কোন শিক্ষিত লোকই যে এতবড় হীনতা স্বীকার করতে পারে,—লজ্জা নেই, কৃতজ্ঞতা নেই, মায়া-দয়া নেই,—খবর দিলে না, খবর নেবার এতটুকু চেষ্টা করলে না,—ভয়ের তাড়নায় একেবারে জন্তুর মত ছুটে পালিয়ে গেল, এ কথা আমি কল্পনা করতেও পারিনি, কিন্তু ভারতী একেবারে নিঃসংশয়ে জেনেছিল! ঠিক এই না? সত্যি বোলো?

ডাক্তার ঘাড় ফিরাইয়া নিরুত্তরে দাঁড় টানিয়া চলিতে লাগিলেন, কিছুই বলিলেন না।

আমার দিকে একবার চাও না, দাদা।

ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া চাহিতেই ভারতীর দুই ঠোঁট থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কহিল, মানুষ, হয়ে মনুষ্য-জন্মের কোথাও কোন বালাই নেই এমন কি করে হয় দাদা? এই বলিয়া সে দাঁত দিয়া জোর করিয়া তাহার ওষ্ঠাধরের কম্পন নিবারণ করিল, কিন্তু দুই চোখের কোণ বাহিয়া ঝরঝর করিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

ডাক্তার সায় দিলেন না, প্রতিবাদ করিলেন না, সান্ত্বনার একটি বাক্যও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কেবল পলকের জন্য যেন মনে হইল তাঁহার সুর্মাটানা চোখের দীপ্তি ঈষৎ স্তিমিত হইয়া আসিল।

ইরাবতীর এই ক্ষুদ্র শাখানদী অগভীর ও অপ্রশস্ত বলিয়া স্টীমার বা বড় নৌকা সচরাচর চলিত না। জেলেদের মাছ ধরার পানসি কিনারায় বাঁধা মাঝে মাঝে দেখা গেল, কিন্তু লেকজন ছিল না। মাথার উপরে তারা দেখা দিয়াছে, নদীর জল কালো হইয়া উঠিয়াছে, নির্জন ও পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতার মধ্যে ডাক্তারের সতর্কচালিত দাঁড়ের সামান্য একটুখানি শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দ কোথাও ছিল না। উভয় তীরের বৃক্ষশ্রেণী যেন সম্মুখে এক হইয়া মিশিয়াছে। তাহারই ঘনবিন্যস্ত শাখা-পল্লবের অন্ধকার-অভ্যন্তরে সজল দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভারতী নীরবে স্থির হইয়া বসিয়া ছিল। তাহাদের শাম্পান যে কোন্ ঠিকানায় চলিয়াছিল ভারতী জানিত না, জানিবার মত উৎসুক সচেতন মনের অবস্থাও তাহার ছিল না, কিন্তু সহসা প্রকাণ্ড একটা গাছের অন্তরালে গুল্ম-লতা-সমাচ্ছন্ন অতি সঙ্কীর্ণ খাদের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র তরী প্রবেশ করিল দেখিয়া সে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চো?

ডাক্তার কহিলেন, আমার বাসায়।

সেখানে আর কে থাকে?

কেউ না।

কখন আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে?

পৌঁছে দেব? আজ রাত্রির মধ্যে যদি না দিতে পারি কাল সকালে যেয়ো।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা সে হবে না। তুমি আমাকে যেখান থেকে এনেছ সেখানে ফিরে রেখে এস।

কিন্তু আমার যে অনেক কথা আছে ভারতী!

ভারতী ইহার জবাব দিল না, তেমনি মাথা নাড়িয়া আপত্তি জানাইয়া বলিল, না, তুমি আমাকে ফিরে রেখে এস।

কিন্তু কিসের জন্য ভারতী? আমাকে কি তোমার বিশ্বাস হয় না?

ভারতী অধোমুখে নিরুত্তর হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, এমন কত রাত্রি তুমি একাকী অপূর্বর সঙ্গে কাটিয়েছ, সে কি আমার চেয়েও তোমার বেশী বিশ্বাসের পাত্র?

ভারতী তেমনি নির্বাক হইয়াই রহিল, হাঁ না কোন কথাই কহিল না। খালের এই স্থানটা যেমন অন্ধকার তেমনি অপ্রশস্ত। দু'ধারের গাছের ডাল মাঝে মাঝে তাহার গায়ে আসিয়া ঠেকিতে লাগিল। এদিকে নদীতে ভাঁটার উলটা টান শুরু হইয়া গেছে,—ডাক্তার খোলের মধ্যে হইতে লণ্ঠন বাহির করিয়া জ্বালিয়া সম্মুখে রাখিলেন, এবং দাঁড় রাখিয়া দিয়া একটা সরু বাঁশহাতে লইয়া ঠেলিতে ঠেলিতে বলিলেন, আজ যেখানে তোমাকে নিয়ে যাচ্চি ভারতী, দুনিয়ার কেউ নেই সেখান থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারে। কিন্তু আমার মনের কথা বুঝতে বোধ হয় তোমার আর বাকী নেই? এই বলিয়া তিনি হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া যেন জোর করিয়া হাসিতে লাগিলেন। অন্ধকারে তাঁহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, কিন্তু তাঁহার হাসির স্বরে কে যেন অকস্মাৎ তাহার ভিতর হইতে তাহাকে ধিক্কার দিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া নিঃশঙ্ককণ্ঠে কহিল, তোমার মনের কথা বুঝতে পারি এত বুদ্ধি আমার নেই। কিন্তু, তোমার চরিত্রকে আমি চিনি। একলা থাকা আমার উচিত নয় বলেই ও-কথা বলেচি দাদা, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

ডাক্তার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া স্বাভাবিক শান্তকণ্ঠে কহিলেন, ভারতী, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কষ্ট হয়। তুমি আমার বোন, আমার দিদি, আমার মা,—এ বিশ্বাস নিজের পরে না থাকলে এ পথে আমি আসতাম না। কিন্তু তোমার মূল্য দিতে পারে এ সংসারে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এর শতাংশের এক অংশও অপূর্ব যদি কোনদিন বোঝে ত জীবনটা তার সার্থক হয়ে যাবে। দিদি, সংসারে মধ্যে তুমি ফিরে যাও,—আমাদের ভেতর আর তুমি থেকো না। কেবল তোমার কথাটাই বলবার জন্যে আজ অপূর্বর সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। আজ একটা কথাও না বলিয়া অপূর্ব চলিয়া গেছে। চাকরি করিতে বর্মায় আসিয়াছিল, মাঝে ক'টা দিনেরই বা পরিচয়!

সে ব্রাহ্মণের ছেলে, ধর্ম ও হিন্দু-আচারের প্রতি তাহার অগাধ নিষ্ঠা, তাহার দেশ আছে, সমাজ আছে, বাড়ি-ঘর, আত্মীয়-স্বজন কত কি! আর অস্পৃশ্য ক্রীশ্চনের মেয়ে ভারতী! দেশ নাই, গৃহ নাই, মা-বাপ নাই, আপনার বলিতে কোথাও কেহ নাই। এ পরিচয় যদি সাঙ্গ হইয়াই থাকে ত অভিযোগের কি-ই বা আছে! ভারতী তেমনি নিঃশব্দেই স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, কেবল অন্ধকারে দুই চক্ষু বাহিয়া তাহার অবিরল জল পড়িতে লাগিল।

অনতিদূরে গাছপালার মধ্যে হইতে সামান্য একটু আলো দেখা গেল। ডাক্তার দেখাইয়া কহিলেন, ওই আমার বাসা। এই বাঁকটা পেরোলেই তার দোরগোড়ায় গিয়ে উঠবো। খুব ফ্রি ছিলাম, কি-একরকম মায়ার জড়িয়ে গেলাম, ভারতী, তোমার জন্যেই আমার ভাবনা। কোন একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছ শুধু এইটুকুই যদি যাবার আগে দেখে যেতে পারতাম!

ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া ফেলিল। বলিল, আমি ত ভালই আছি, দাদা।

ডাক্তারের মুখ দিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। এ বস্তুটা এতই অসাধারণ যে, ভারতীর কানে গিয়া তাহা বিঁধিল। কহিলেন, কোথায় ভাল আছ ভাই? আমার লোক এসে বললে তুমি ঘরে নেই। ভাবলাম, জেটির উপরে কোথাও এক জায়গায় তোমাকে পাবো, পেলাম না বটে, কিন্তু তখনি নিশ্চয় মনে হল এই নদীর ধারে কোথাও-না-কোথাও দেখা তোমার মিলবেই! দুর্ভাগা তোমার আনন্দদই শুধু চুরি করে পালায় নি, ভারতী, তোমার সাহসটুকু পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়ে গেছে।

এ কথার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া ভারতী নীরব হইয়া রহিল। ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, সেদিন রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে আমাকে বিছানা ছেড়ে দিয়ে তুমি নীচে শুলে। হেসে বললে, দাদা, তুমি কি আবার মানুষ যে তোমাকে আমার লজ্জা বা ভয়? তুমি ঘুমোও। কিন্তু আজ আর সে সাহস নেই। বিশেষ নির্ভর করবার লোক অপূর্ব নয়, তবু সে কাছেই

ছিল বলে কালও হয়ত এ আশঙ্কা তোমার মনেও হতো না। আশ্চর্য এই যে তোমার মত মেয়েরাও নির্ভয় স্বাধীনতাকে তার মত একটা অক্ষম লোকেও না কত সহজেই ভেঙ্গে দিয়ে যেতে পারে।

ভারতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, কিন্তু উপায় কি দাদা?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, উপায় হয়ত নেই। কিন্তু আমি ভাবচি বোন, চরিত্রকে তোমার সন্দেহ করতে আজ কেউ কাছে নেই বলে, তোমার নিজের মনটাই যদি অহরহ তোমাকে সন্দেহ করে বেড়ায় তুমি বাঁচবে কি করে? এমন করে ত কারও প্রাণ বাঁচে না ভারতী।

এমন করিয়া ভারতী আপনাকে আপনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই। তাহার সময় ছিলই বা কৈ! তাহার শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না, কিন্তু সে নির্বাক হইয়া রহিল।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, আমি আর একটি মেয়েকে জানি, সে জাতে রুশ। কিন্তু তার কথা থাক। কবে তোমাদের আবার দেখা হবে আমি জানিনে, কিন্তু মনে হয় যেন একদিন হবে। বিধাতা করুন, হোক। তোমার ভালবাসার তুলনা নেই, সেখান থেকে আপূর্বকে কেউ সরাতে পারবে না, কিন্তু নিজেকে তার গ্রহণযোগ্য করে রাখবার আজ থেকে এই যে জীবনব্যাপী অতি-সতর্ক সাধনা শুরু হবে, তার প্রতিদিনের আসম্মানের গ্লানি মনুষ্যত্বকে যে তোমার একেবারে খর্ব করে দেবে ভারতী! হায় রে! এমন চির-শুদ্ধ হৃদয়ের মূল্য যেখানে নেই, সেখানে এমনি করেই বোঝাতে হয়! পদ্মফুল চিবিয়ে না খেয়ে যারা তৃপ্তি মানে না, দেহের শুদ্ধতা দিয়ে এমনি করেই কান মলে তার কাছে দাম আদায় হয়! হবেও হয়ত। কি জানি, কপালে বাঁচবার মিয়াদ ততদিন আমার আছে কি না, কিন্তু যদি থাকে দিদি, বোন বলে গর্ব করবার তখন আর সব্যসাচীর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে তাহলে কি করতে বল? তুমিই ত আমাকে বারংবার বলেছ সংসারের মধ্যে ফিরে যেতে।

কিন্তু মাথা হেঁট করে যেতে ত বলিনি।

ভারতী বলিল, কিন্তু মেয়েমানুষের উঁচু মাথা ত সবাই পছন্দ করে না দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তবে যেয়ো না।

ভারতী ম্লানমুখে হাসিয়া বলিল, সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো দাদা, যাওয়া আমার হবে না। সমস্ত পথ নিজের হাতে বন্ধ করে কেবল একটি পথ খুলে রেখেছিলাম, সেও আজ বন্ধ হয়ে গেছে এ তুমি নিজের চোখেই দেখে এসেছ। এখন, যে পথ আমাকে দেখিয়ে দেবে সেই পথেই চলবো; কেবল এইটুকু মিনতি আমার রেখো, তোমাদের ভয়ঙ্কর পথে আমাকে তুমি ডেকো না। ভাগবানের মত দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাবারও এত রাস্তা বেরিয়েছে, শুধু তোমার লক্ষ্যে পৌঁছবারই রক্তপাত ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নেই? আমার একান্ত মনের বিশ্বাস মানুষের বুদ্ধি একেবারে শেষ হয়ে যায়নি, কোথাও-না-কোথাও অন্য পথ আছেই আছে! এখন থেকে তারই সন্ধানে আমি পথে বার হবো। ভয়ানক দুঃখ যে কি সে রাত্রে আমি টের পেয়েছি, যেদিন তোমরা তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল।

ডাক্তার হাসিলেন, কহিলেন,এই আমার বাসা। এই বলিয়া ক্ষুদ্র নৌকা জোর করিয়া ডাঙ্গায় ঠেলিয়া দিয়া অবতরণ করিলেন, এবং লণ্ঠন হাতে তুলিয়া লইয়া পথ দেখাইয়া কহিলেন, জুতো খুলে নেবে এসো। পায়ে একটু কাদা লাগবে।

ভারতী নিঃশব্দে নামিয়া আসিল। গোটা-চারেক মোটা সেগুন কাঠের খুঁটির উপর পুরাতন ও প্রায় অব্যবহার্য তক্তা মারিয়া একটা বাড়ি খাড়া করা হইয়াছে। জোয়ারের জল সরিয়া গিয়া সমস্ত তলাটা একহাঁটু পাঁক পড়িয়াছে, লতাপাতা, গাছপালা পচার দুর্গন্ধে বাতাস পর্যন্ত ভারী হইয়া উঠিয়াছে, সুমুখের হাত-দুই পরিসর পথটুকু ছাড়া চারদিক কেয়া ও দেনো গাছের এমনি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঘেরিয়া আছে, যে শুধু ভিতরে যে মানুষ বাস করিতে পারে তাহা চোখে না দেখিলে কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু এই লোকটির কাছে সকলই সম্ভব। ভাঙ্গা কাঠের সিঁড়ি ও দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিতে একটি সাত-আট বছরের ছেলে

আসিয়া যখন দ্বার খুলিয়া দিল, তখন ভারতী বিস্ময়ে বাক্যহীন হইয়া রহিল। ভিতরে পা বাড়াইতেই দেখিতে পাইল মেঝের উপর চাটাই পাতিয়া শুইয়া একজন অল্পবয়স্কা বর্মা স্ত্রীলোক, তিন-চারটি ছেলেমেয়ে যে যেখানে পড়িয়া, ইহাদেরই একজন ঘরের মধ্যে বোধ হয় একটা অপকর্ম করিয়া রাখিয়াছে,—খুব সম্ভব অনাবশ্যক বোধেই তাহা পরিষ্কৃত হয় নাই—একটা দুঃসহ দুর্গন্ধে গৃহের বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে, মেঝের সর্বত্র ছড়ানো ভাত, মাছের কাঁটা এবং পিয়াজ-রসুনের খোলা, নিকটেই গোটা দুই-তিন কালি-মাখা ছোট-বড় মাটির হাঁড়ি, ছেলেগুলা হাত ডুবাইয়া খাবলাইয়া ভাত-তরকারি খাইয়াছে তাহা চাহিলেই বুঝা যায়; ইহারই পাশ দিয়া ভারতী ডাক্তারের পিছু পিছু আর একটা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথাও কোন আসবাবের বালাই নাই, মেঝের উপর চাটাই পাতা, একধারে একটা শতরঞ্চি গুটান ছিল, ডাক্তার স্বহস্তে ঝাড়িয়া তাহা পাতিয়া দিয়া ভারতীকে বসিতে দিলেন। ভারতী নিঃশব্দে উপবেশন করিয়া চাহিয়া দেখিল, সেই পরিচিত প্রকাণ্ড বোঁচকাটি ডাক্তারের একপাশে রহিয়াছে। অর্থাৎ, সত্য-সত্যই ইঁহার এই ঘরটিই বর্তমান বাসস্থান। ও-ঘর হইতে বর্মা স্ত্রীলোকটি কি একটা জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তার বর্মা ভাষাতেই তাহার জবাব দিলেন। অনতিকাল পরেই সেই ছেলেটা সানকিতে করিয়া দু চাঙর ভাত, পেয়ালায় ঝোল এবং পাতায় করিয়া খানিকটা মাছ পোড়া আনিয়া একধারে রাখিয়া দিয়া গেল। নৌকার লণ্ঠনটি ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন তাহারই আলোকে এই-সকল খাদ্যবস্তুর প্রতি চাহিবামাত্রই ভারতীর গা বমি-বমি করিয়া উঠিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমারও বোধ হয় ক্ষিদে দেয়েছে, কিন্তু এ-সব—

ভারতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, কিন্তু সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া জানাইল, না, না, কিছুতে না। সে ক্রীশ্চানের মেয়ে, জাতিভেদ মানে না, কিন্তু যেখান হইতে যেভাবে এই সকল আনীত হইল তাহা ত সে আসিবার পথেই চোখে দেখিয়া আসিয়াছে!

ডাক্তার কহিলেন, আমার কিন্তু ভারী ক্ষিদে পেয়েছে ভাই, আগে পেটটা ভরিয়ে নিই। এই বলিয়া তিনি হাত ধুইয়া স্মিতমুখে আহারে বসিয়া গেলেন। ভারতী চাহিয়া দেখিতেও পারিল না, ঘৃণায় ও অপরিসীম ব্যথায় মুখ ফিরাইয়া রহিল। তাহার বুকের ভিতর হইতে কান্না যেন সহস্রধারে ফাটিয়া পড়িতে চাহিল। হায় রে দেশ! হায় রে মুক্তির পিপাসা! জগতে কিছুই ইহার আর আপনার বলিয়া অবশিষ্ট রাখে নাই। এই গৃহ, এই খাদ্য, এই ঘৃণিত সংস্রব, এমনি করিয়া এই বন্য-পশুর জীবনযাপন, ক্ষণকালের জন্য মৃত্যুও ভরতীর কাছে অনেক সুসহ বলিয়া মনে হইল। সে হয়ত অনেকেই পারে, কিন্তু এই যে দেহ-মনের অবিশ্রাম নির্যাতন, আপনাকে আপনি স্বেচ্ছায় পলে পলে এই যে হত্যা করিয়া চলার দুঃসহ সহিষ্ণুতা, স্বর্গে-মর্তে কোথাও কি ইহার তুলনা আছে! অধীনতার বেদনা কি ইহাদের এ জীবনের আর সমস্ত বেদনাবোধই একেবারে ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে! কিছুই কোথাও বাকী নাই! তাহার অপূর্বকে মনে পড়িল। তাহার চাকরির শোক, তাহার বন্ধুমহলে হাতের কালশিরার লজ্জা,—ইহারাই ত মাতার সহস্রকোটি সন্তান! ইহারাই ত দেশের মেরুমজ্জা, খাইয়া-পরিয়া পাস করিয়া চাকরিতে কৃতকার্য হইয়া যাহাদের একটানা জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত পরম নিরাপদে কাটিতেছে! আর ওই যে লোকটি একান্ত তৃপ্তিতে নির্বিকারচিত্তে বসিয়া ভাত গিলিতেছে,—ভারতীর মুহূর্তের জন্য মনে হইল হিমাচলের কাছে সহস্রখণ্ড উপলের তিলার্ধ বেশী তাহারা নয়! আর তাহাদের একজনকে ভালবাসিয়া, তাহারই ঘরের গৃহিণীপনার বঞ্চিত দুঃখে আজ সে বুক ফাটিয়া মরিতেছে। অকস্মাৎ ভারতী জোর করিয়া বলিয়া উঠিল, দাদা, তোমার নির্দিষ্ট ওই রক্তারক্তির পথ কিছুতেই ভাল নয়। অতীতের যত নজিরই তুমি দাও,—যা অতীত, যা বিগত, সে-ই চিরদিন শুধু অনাগতের বুক চেপে তাকে নিয়ন্ত্রিত করবে, মানব-জীবনে এ বিধান কিছুতেই সত্য নয়! তোমার পথ নয়, কিন্তু তোমার এই সকল-বিসর্জন-দেওয়া দেশের সেবাই আমি আজ থেকে মাথায় তুলে নিলাম। অপূর্ববাবু সুখে থাকুন, তাঁর জন্যে আর আমি শোক করিনে, আমার বাঁচাবার মন্ত্র আজ

আমি চোখে দেখতে পেয়েছি।

ডাক্তার সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া ভাতের ডেলার মধ্যে হইতে অস্ফুটকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হল ভারতী?

তেইশ

হাত-মুখ ধুইয়া আসিয়া ডাক্তার তাঁহার বোঁচকার উপরে চাপিয়া বসিলেন। পূর্বোক্ত ছেলেটি মস্ত মোটা একটা বর্মা সেলাই টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকিল, এবং কয়ে মুহূর্ত ধরিয়া নাক-মুখ দিয়া অপর্যাপ্ত ধূম উদগিরণ করিয়া চুরুটটি ডাক্তারের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল। ভারতীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন অনুভব করিয়া ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, অমনি পেলে আমি সংসারে কিছুই বাদ দিতে ভালবাসি নে ভারতী। অপূর্বর কাকাবাবু আমাকে যখন রেঙ্গুনের জেটিতে প্রথম গ্রেপ্তার করেন, তখন পকেট থেকে আমার গাঁজার কলকে বার হয়ে পড়েছিল। নইলে, বোধ হয় ছুটি পেতাম না। এই বলিয়া তিনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

ভারতী এ ঘটনা শুনিয়াছিল, কহিল, সে আমি জানি, এবং হাজার ছুটি পেলেও যে ওটা তুমি খাও না তা-ও জানি। কিন্তু এ বাড়িটি কার দাদা?

আমার।

আর এই বর্মি মেয়েটি, এবং শিশুগুলি?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, না, ওঁরা আমার একটি মুসলমান বন্ধুর সম্পত্তি। আমারি মত ফাঁসিকাঠের আসামী, কিন্তু সে অন্য বাবদে। সম্প্রতি স্থানান্তরে গেছেন, পরিচয় ঘটবার সুযোগ হবে না।

ভারতী কহিল, পরিচয়ের জন্যে আমি ব্যাকুল নই; কিন্তু সর্বদিক থেকে তুমি যে স্বর্গপুরীতে এসে আশ্রয় নিয়েছ, তার থেকে আমাকে বাসায় রেখে এসো দাদা, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

ডাক্তার হাসিমুখে জবাব দিলেন, এ স্বর্গপুরী যে তোমার সইবে না, সে তোমাকে আনবার পূর্বেই আমি জানতাম। কিন্তু, তোমাকে বলবার আমার যত কথা ছিল, সে ত এই স্বর্গপুরী ছাড়া আর দ্বিতীয় স্থান নেই ভারতী। আজ তোমাকে একটুখনি কষ্ট পেতেই হবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি শীঘ্রই আর কোথাও যাবে?

ডাক্তার কহিলেন, হাঁ। উত্তর এবং পূর্বের দেশগুলো আর একবার ঘুরে আসতে হবে। ফিরতে হয়ত বছর-দুই লাগবে। কিন্তু, আজ তুমি নানারকমে এত ব্যথা পেয়েছ বোন, যে সকল কথা বলতে আমার লজ্জা হয়। কিন্তু আজকের রাত্রির পরে আর যে সহজে তোমাকে দেখা দিতে পারবো সে ভরসাও করিনে।

কথা শুনিয়া ভারতী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, কহিল, তুমি কি তাহলে কালই চলে যাচ্চো?

ডাক্তার মৌন হইয়া রহিলেন। ভারতী মনে মনে বুঝিল ইহার আর পরিবর্তন নাই। তারপরে এই রাত্রিটুকু অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এ দুনিয়ায় সে একেবারে একাকী। খোঁজ করিবারও কেহ থাকিবে না।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, হাঁটা-পথে আমাকে দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনের ভিতর দিয়ে এগোতে হবে। আর ও-পথে কর্মসূত্রে যদি না অ্যামেরিকায় গিয়ে পড়ি ত প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলো ঘুরে আবার এই দেশেতেই এসে আশ্রয় নেব। তারপরে আগুন যতদিন না জ্বলে, আমি এইখানেই রইলাম ভারতী। একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আর ফিরতে যদি না-ই পারি বোন, বোধ হয় খবর একটা পাবেই।

এই মানুষটির শান্তকণ্ঠের সহজ কথাগুলি কতই সামান্য, কিন্তু ইহার ভয়ঙ্কর চেহারা ভারতীর চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, হাঁটা-পথে চীনদেশে যাওয়া কত ভয়ানক সে আমি শুনেছি। কিন্তু তুমি মনে মনে হেসো না দাদা,

আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাইনি,--এতটুকু তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু, বেরিয়েই যদি যাও এইখানেই আবার কেন ফিরে আসতে চাও? তোমার নিজের জন্মভূমিতে কি তোমার কাজ নেই?

ডাক্তার কহিলেন, তাঁরই কাজের জন্যে আমি এদেশ ছেড়ে সহজে যাবো না। মেয়েরা এ দেশের স্বাধীন, স্বাধীনতার মর্ম তারা বুঝবে। তাদের আমার বড় প্রয়োজন। আগুন যদি কখনো এদেশে জ্বলছে দেখতে পাও, যেখানেই থাকো, ভারতী এই কথাটা আমার তখন স্মরণ করো, এ আগুন মেয়েরাই জ্বেলেচে। কথাটা আমার মনে থাকবে ত?

এই ইঙ্গিত ভারতী বুঝিল, কহিল, কিন্তু তোমার পথের পথিক ত আমি নই!

ডাক্তার কহিলেন, তা আমি জানি। কিন্তু পথ তোমার যাই কেন না হোক, বড়ভাইয়ের কথাটা স্মরণ করতে ত দোষ নেই,—তবু ত দাদাকে মাঝে মাঝে মনে পড়বে!

ভারতী কহিল, বড়ভাইকে মনে পড়বার আমার অনেক জিনিস আছে। কিন্তু এমনি করেই বুঝি তোমার বিপথে মানুষকে তুমি টেনে আনো দাদা? আমাকে কিন্তু তা পারবে না। এই বলিয়া সহসা সে উঠিয়া পড়িল, এবং গুটানো শতরঞ্চিটা ঝাড়িয়া পাতিয়া দিয়া বাঁশের আলনা হইতে কম্বল বালিশ প্রভৃতি পাড়িয়া লইয়া স্বহস্তে শয্যা রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, অপূর্ববাবুর জাহাজের চাকা আজ আমাকে যে পথের সন্ধান দিয়ে গেছে, এ জীবন সেই আমার একটিমাত্র পথ। আবার যেদিন দেখা হবে, এ কথা তুমিও সেদিন স্বীকার করবে।

ডাক্তার ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিলেন, হঠাৎ এ আবার কি শুরু করে দিলে ভারতী? ঐ ছেঁড়া কম্বলটুকু কি আমি নিজে পেতে নিতে পারতাম না? এর ত কোন দরকার ছিল না।

ভারতী কহিল, তোমার ছিল না বটে, কিন্তু আমার ছিল। যার জন্যে যখনই বিছানা পাতি দাদা, তোমার এই ছেঁড়া কম্বলটুকু আর কখনো ভুলব না। মেয়েমানুষের জীবনে এরও যদি না দরকার থাকে ত কিসের আছে বলে দিতে পারো?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, এর জবাব আমি দিতে পারলাম না, বোন, তোমার কাছে আমি হার মানছি। কিন্তু তুমি ছাড়া নিজের পরাজয় আমাকে কোনদিন কোন মেয়েমানুষের কাছেই স্বীকার করতে হয়নি?

ভারতী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রাদিদির কাছেও না?

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না।

শয্যা প্রস্তুত হইলে ডাক্তার তাঁহার বোঁচকার আসন ছাড়িয়া বিছানায় আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভারতী অদূরে মেঝের উপর বসিয়া ক্ষণকাল অধোমুখে নীরবে থাকিয়া কহিল, যাবার পূর্বে আর একটি কথা যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ছোটবোনের অপরাধ মাপ করবে?

করব।

তবে বল সুমিত্রাদিদি তোমার কে? কোথায় তাঁকে তুমি পেলে?

তাহার প্রশ্ন শুনিয়া ডাক্তার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পরে মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ও যে আমার কে এ জবাব সে নিজে না দিলে আর জানাবার উপায় নেই। কিন্তু, যেদিন ওকে চিনতাম না বললেও চলে, সেদিন নিজেই আমি স্ত্রী বলে ওর পরিচয় দিয়েছিলাম। সুমিত্রা নাম আমারই দেওয়া,—আজ সেইটেই বোধ করি ওর নজির।

ভারতী গভীর কৌতূহলে স্থির হইয়া চাহিয়া রহিল। ডাক্তার কহিলেন, শুনেচি, ওর মা ছিল নাকি ইহুদি মেয়ে, কিন্তু বাপ ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। প্রথমে সার্কাসের দলের সঙ্গে জাভায় যান, পরে সুরভায়া রেলওয়ে স্টেশনে চাকরি করতেন। যতদিন তিনি বেঁচে ছিলেন সুমিত্রা মিশনারিদের ইস্কুলে লেখাপড়া শিখতো, তিনি মারা যাবার পরে বছর পাঁচ-ছয়ের ইতিহাস আর তোমার শুনে কাজ নেই।

ভারতী মাথা নাড়িয়া কহিল, না দাদা, সে হবে না, তুমি সমস্ত বল।

ডাক্তার কহিলেন, আমিও সমস্ত জানিনে ভারতী, শুধু এইটুকু জানি যে, মা, মেয়ে, দুই মামা, একটি চীনে, এবং জন-দুই মাদ্রাজী মুসলমানে মিলে এঁরা জাভায় লুকানো আফিং গাঁজা আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা করতেন। তখনও কিছুই জানিনে কি করেন, শুধু দেখতে পেতাম বাটাভিয়া থেকে সুরভায়ার পথে রেলগাড়িতে সুমিত্রাকে প্রায়ই যাওয়া আসা করতে। অতিশয় সুশ্রী বলে অনেকের মত আমারও দৃষ্টি পড়েছিল। এই পর্যন্তই। কিন্তু, হঠাৎ একদিন পরিচয় হয়ে গেল তেগ স্টেশনের ওয়েটিং-রুমে। বাঙালীর মেয়ে বলে তখনই কেবল প্রথম খবর পেলাম।

ভারতী বলিল, সুন্দরী বলে আর সুমিত্রাদিদিকে ভুলতে পারলে না,—না দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, সে যাই হোক, একদিন জাভা ছেড়ে কোথায় চলে গেলাম ভারতী,—বোধ হয় ভুলেও গিয়েছিলাম,—কিন্তু বছর-খানেক পরে অকস্মাৎ বেঙ্কুলান শহরের জেঠিতে দেখা-সাক্ষাৎ। এক তোরঙ্গ আফিং চারিদিকে পুলিশ, আর তার মাঝে সুমিত্রা। আমাকে দেখে চোখে দিয়ে তার জল পড়তে লাগলো, এ সন্দেহ আর রইল না যে আমাকে তাকে বাঁচাতেই হবে। আফিংঙের সিন্দুকটাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে একেবারে স্ত্রী বলে তার পরিচয় দিলাম। এতটা সে ভাবেনি, সুমিত্রা চমকে গেল। সুমাত্রার ঘটনা বলে সুমিত্রা নামটাও আমারই দেওয়া। নইলে, তার সাবেক নাম ছিল—রোজ দাউদ। তখন বেঙ্কুলানের মামলা-মকদ্দমা পাদাঙ শহরে হতো, আমার একজন পরম বন্ধু ছিলেন পল ক্রুগার, তাঁর বাড়িতে সুমিত্রাকে নিয়ে এলাম। মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সুমিত্রাকে খালাস দিলেন বটে, কিন্তু, সুমিত্রা আর আমাকে খালাস দিতে চাইলে না।

ভারতী হাসিয়া কহিল, খালাস কোনদিন পাবেও না দাদা।

ডাক্তার কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ তাঁদের দলের লোক খবর পেয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগলো, বন্ধু ক্রুগারও দেখতে পেলাম সৌন্দর্যে চঞ্চল হয়ে উঠছেন, অতএব তাঁর জিম্মাতে রেখেই একদিন চুপি চুপি সুমাত্রা ছেড়ে সরে পড়লাম।

ভারতী আশ্চর্য হইয়া বলিল, এদের মাঝে তাঁকে একলা ফেলে রেখে? উঃ—তুমি কি নিষ্ঠুর দাদা!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ অনেকটা অপূর্বর মত। আবার বছর-খানেক কেটে গেল। তখন সেলিবিস দ্বীপের ম্যাকেসার শহরে একটি ছোট্ট অখ্যাত হোটেলে বাস করছিলাম, একদিন সন্ধ্যায় সময় ঘরে ঢুকে দেখি সুমিত্রা বসে। তার পরনে হিন্দু মেয়েদের মত তসরের শাড়ী আর এই প্রথম আজ আমাকে সে হিন্দু মেয়ের মতই হেঁট হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। বললে, আমি সমস্ত ছেড়ে চলে এসেছি, সমস্ত অতীত মুছে ফেলে দিয়েছি, আমাকে তোমার কাজে ভর্তি করে নাও, আমার চেয়ে বিশ্বস্ত অনুচর তুমি আর পাবে না।

ভরতী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া প্রশ্ন করিল, তার পরে?

ডাক্তার করিলেন, পরের ঘটনা শুধু এইটুকুই বলতে পারি ভারতী, সুমিত্রার বিরুদ্ধে নালিশ করবার আমি আজও কোন হেতু পাইনি। যে একুশ বছরের সংস্কার একদিনে মুছে ফেলে আসতে পারে, তাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু, বড় নিষ্ঠুর।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার কেহলই ইচ্ছা করিতে লাগিল জিজ্ঞাসা করে, হোক নিষ্ঠুর, কিন্তু, তাঁকে তুমি কতখানি ভালবাসো? কিন্তু, লজ্জায় এ কথা সে কিছুতেই মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। অথচ ওই আশ্চর্য রমণীর গোপন অন্তরের অনেক ইতিহাসেরই আজ সে সন্ধান পাইল। তাঁহার নির্মম মৌনতা, কঠোর ঔদাসীন্য—কিছুরই অর্থ বুঝিতে যেন আর তাহার বাকী রহিল না।

হঠাৎ একটা অতর্কিত দীর্ঘশ্বাস ডাক্তারের মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ায় মুহূর্তকালের জন্য যেন তিনি লজ্জায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু, ওই মুহূর্তের জন্যই। সুদীর্ঘ সাধনায় দেহ ও মনের প্রতিবিন্দুটির উপরেই অসামান্য অধিকার এতদিন তিনি বৃথায় অর্জন করেন নাই। পরক্ষণেই তাঁহার শান্তকণ্ঠ ও সহজ-হাস্যমুখ ফিরিয়া আসিল, বলিলেন, তারপরে

সুমিত্রাকে নিয়ে আমাকে ক্যান্টনে চলে আসতে হ'ল।

ভারতী হাসি গোপন করিয়া ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, চলে না-ই আসতে দাদা, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল বল? আমরা ত কেউ দিইনি!

ডাক্তার হাসিমুখে ক্ষণকাল নীরব হইয়া থাকিয়া বলিলেন, মাথার দিব্যি যে ছিল না তা নয়, কিন্তু ভেবেছিলাম সে কথা আর কেউ জানবে না, কিন্ত, তোমাদের দোষ এই যে শেষ পর্যন্ত না শুনলে আর কৌতূহল মেটে না। আবার না বললে এমন-সব কথা অনুমান করতে থাকবে যে তার চেয়ে বরঞ্চ বলাই ভাল।

ভারতী কহিল, আমিও ত তাই বলচি দাদা। এটুকু তুমি বলে ফেল।

ডাক্তার কহিলেন, ব্যাপারটা এই যে সুমিত্রা আমার হোটেলেই একটা দোতলা ঘর ভাড়া নিলে। আমি অনেক নিষেধ করলাম, কিন্তু, কিছুতেই শুনলে না। যখন বললাম, আমাকে তাহলে অন্যত্র যেতে হবে, তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। বললে, আমাকে আপনি আশ্রয় দিন। পরদিনই ব্যাপারটা বোঝা গেল। সেই দাউদের দল দেখা দিলেন। জন-দশেক লোক, একজন অর্ধেক আরবি অর্ধেক নিগ্রো, ছোটখাটো একটা হাতীর মত অনায়াসে সুমিত্রাকে স্ত্রী বলে দাবী করে বসলো।

ভারতী কহিল, আবার তোমারই সাক্ষাতে! তোমাদের দুজনের বোধ করি খুব ঝগড়া বেধে গেল?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ। সুমিত্রা অস্বীকার করে বারবার বলতে লাগলো সমস্ত মিথ্যা, সমস্তই একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র! অর্থাৎ, তারা তাকে চোরাই আফিং বেচার কাজে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। প্রশান্ত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপগুলোতেই এদের ঘাঁটি আছে,—এদের একটা প্রকাণ্ড দুর্বৃত্তের দল। এরা না পারে এমন কাজ নেই। বুঝলাম সুমিত্রা কেন আমার কাছ থেকে যেতে চায়নি, এবং তার চেয়েও বেশী বুঝলাম যে এ সমস্যার সহজে মীমাংসা হবে না। তাদের কিন্তু বিলম্ব সয় না, সদ্যসদ্যই একটা রফা করে সুমিত্রাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। বাধা দিলাম, পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেব ভয় দেখালাম, তারা চলে গেল, কিন্তু রীতিমত শাসিয়ে গেল যে তাদের হাত থেকে আজও কেউ নিস্তার পায়নি। কথাটা নেহাত তারা মিথ্যে বলে যায়নি।

ভারতী শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া কহিল, তার পরে?

ডাক্তার কহিলেন, রাত্রিটা সাবধান হয়ে রইলাম। তারা যে সদলবলে ফিরে এসে আক্রমণ করবে, তা জানতাম।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, তখনি তোমারা পালিয়ে গেলে না কেন? পুলিশে খবর দিলে না কেন? ডচ্ গবর্নমেন্টের পুলিশ-পাহারা বলে কি কিছু নেই নাকি?

ডাক্তার কহিলেন, না থাকার মধ্যেই। তা ছাড়া থানা-পুলিশ করা আমার নিজেরও খুব নিরাপদ নয়। যাই হোক, রাত্রিটা কিন্তু নিরাপদেই কাটলো। এখানে সমুদ্রের কিনারা বয়ে যাবার অনেক ব্যবসা-বাণিজ্যের নৌকা পাওয়া যায়, পরদিন সকালেই একটা ঠিক করে এলাম, কিন্তু সুমিত্রার হল জ্বল,—সে উঠতে পারলে না। অনেক রাত্রে দোর খোলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল, জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম হোটেলওয়ালা কপাট খুলে দিয়েচে, এবং জন দশ-বারো লোক বাড়িতে ঢুকচে। তাদের ইচ্ছে ছিল আমার দরজাটা কোনমতে আটকে রেখে তারা পাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে সুমিত্রার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

ভারতী নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া কহিল। তার পরে? তোমার পালালে কোথা দিয়ে?

ডাক্তার বলিলেন, তার আর সময় হল কৈ? কিন্তু তাদের আগেই আমি দোর খুলে উপরে যাবার সিঁড়িটা আটকে ফেললাম।

ভারতী পাংশুমুখে জিজ্ঞাসা করিল, একলা? তারপরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরের ঘটনাটা অন্ধকারে ঘটলো, সঠিক বিবরণ দিতে পারব না। তবে নিজেরটা জানি। একটা গুলি এসে বাঁ কাঁধে বিঁধলো, আর একটা লাগলো ঠিক

হাঁটুর নীচে। সকাল হলে পুলিশ এলো, পাহারা এলো, গাড়ি এলো, ডুলি এলো, জন-ছয়েক লোককে তুলে নিয়ে গেল,—হোটেলওয়ালা এজাহার দিলে—ডাকাত পড়েছিল। ইংরাজ রাজত্ব হলে কতদূর কি হত বলা যায় না, কিন্তু সেলিবিসের আইন-কানুন বোধ হয় আলাদা, লোকগুলোর নিশানদিহি যখন হল না, তখন পুঁতেটুঁতে ফেললে বোধ হয়।

বিবরণ শুনিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে ক্ষণকাল ভারতীর বাক্‌রোধ হইয়া রহিল, পরে শুষ্ক বিবর্ণমুখে অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, পুঁতেটুঁতে ফেললে কি? তোমার হাতে কি তবে এতগুলো মানুষ মারা গেল নাকি?

ডাক্তার কহিলেন, আমি উপলক্ষ মাত্র। নইলে নিজেদের হাতেই তারা মারা গেল ধরতে হবে।

আর ভারতী কথা কহিল না, শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ডাক্তার নিজেও কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, তারপরে কতক নৌকোয়, কতক ঘোড়ার গাড়িতে, কতক স্টীমারে মিনাডো শহরে এসে পৌঁছলাম, এবং সেখান থেকে নামধাম ভাঁড়িয়ে একটা চীনা জাহাজে চড়ে কোনমতে দুজনে ক্যান্টনে এসে উপস্থিত হলাম। কিন্তু আর বোধ হয় তোমার শুনতে ইচ্ছে করচে না? ঠিক না ভারতী? কেবলি মনে হচ্চে দাদার হাতেও মানুষের রক্ত মাখানো?

অন্যমনস্ক ভারতী তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, আমাকে বাসায় পৌঁছে দেবে না দাদা?

এখনি যাবে?

হাঁ, আমাকে তুমি দিয়ে এসো।

তবে চল। এই বলিয়া তিনি মেঝের একখানা তক্তা সরাইয়া কি একটা বস্তু লুকাইয়া পকেটে লইলেন। ভারতী বুঝিল তাহা গাদাপিস্তল। পিস্তল তাহারও আছে, এবং সুমিত্রার উপদেশমত সে-ও ইতিপূর্বে গোপনে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়াছে, কিন্তু, ইহা যে মানুষ মারিবার যন্ত্র, এ চৈতন্য আজ যেন তাহার প্রথম হইল। আর ঐ যেটা ডাক্তারের পকেটে রহিল, হয়ত, কত নরহত্যাই উহা করিয়াছে এই কথা মনে করিয়া তাহার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

নৌকায় উঠিয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, তুমি যাই কেন না কর, তুমি ছাড়া আমার আর পৃথিবীতে দ্বিতীয় আশ্রয় নেই। যতদিন না আমার মন ভাল হয় আমাকে তুমি ফেলে যেতে পারবে না দাদা। বল যাবে না!

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন, আচ্ছা তাই হবে বোন, তোমার কাছে ছুটি নিয়েই আমি যাবো।

চব্বিশ

নদীপথে সমস্তক্ষণ ভারতীর মন কত-কি ভাবনাই যে ভাবিতে লাগিল তাহার নির্দেশ নাই। অধিকাংশই এলোমেলো,—শুধু যে চিন্তাটা মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাকে সব চেয়ে বেশী ধাক্কা দিয়া গেল সে সুমিত্রার ইতিবৃত্ত। তাহার প্রথম যৌবনের দুর্ভাগ্যময় অপরূপ কাহিনী। সুমিত্রাকে বন্ধু বলিয়া ভাবিবার দুঃসাহস কোন মেয়ের পক্ষেই সহজ নয়, তাহাকে ভালবাসিতে ভারতী পারে নাই, কিন্তু সর্ব-বিষয়ে তাহার অসাধারণ শ্রেষ্ঠতার জন্য হৃদয়ের গভীর ভক্তি তাহাকে অর্পণ করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন যত অপরাধই অপূর্ব করিয়া থাক, নারী হইয়া অবলীলাক্রমে তাহাকে হত্যা করার আদেশ দেওয়ায় ভক্তি তাহার অপরিসীম ভয়ে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল,—বলির পশু রক্ত-মাখা খড়্গের সম্মুখে যেমন করিয়া অভিভূত হইয়া গিয়াছিল,—তেমনি। অপূর্বকে ভারতী যে কত ভালবাসিত সুমিত্রার তাহা অপরিজ্ঞাত ছিল না, ভালবাসা যে কি বস্তু সেও তাহার অবিদিত নয়, তথাপি আর একজনের প্রাণাধিকের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে নারী হইয়া নারীর তিলার্ধ বাধে নাই। বেদনার আগুনে বুকের ভিতরটা যখন তাহার এমনি করিয়া হুহু করিয়া জ্বলিতে থাকিত, তখন সে আপনাকে আপনি এই বলিয়া

বুঝাইত যে কর্তব্যের প্রতি এতবড় নির্মম নিষ্ঠা না থাকিলে পথের-দাবীর কর্ত্রী করিত তাহাকে কে? যাহাদের নিজের জীবনের মূল্য নাই, রাজদ্বারে রাজার আইনে যে-সকল প্রাণ বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে, তাহার নির্ভর করিত তবে কিসে? তাহার জন্ম, তাহার শিক্ষা, তাহার কৈশোর ও যৌবনের বিচিত্র ইতিহাস, তাহারা আসক্তির অনতিবর্তনীয় দৃঢ় সংসক্তি, তাহার কর্তব্যবোধ, তাহার পাষাণ-হৃদয় সকলের সঙ্গেই আজ ভারতী সঙ্গতি দেখিতে লাগল। নারী বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যে প্রচণ্ড অভিমান ভারতীর ছিল, আজ সে যেন আপনা-আপনিই একেবারে বাহুল্য হইয়া গেল। আর তাহাকে সে নিজের স্বজাতি বলিয়া ভাবিতেই পারিল না। আজ তাহার মনে হইল, স্নেহের দিক দিয়া, করুণার দিক দিয়া সুমিত্রার কাছে দাবী করিবার, ভিক্ষা জানাইবার মত পরিহাস পৃথিবীতে যেন আর দ্বিতীয় নাই।

নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিতেই একজন গাছের আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিল। ডাক্তারের হাত ধরিয়া ভারতী নীচের সিঁড়িতে পা দিতে যাইতেছিল, হঠাৎ লোকটার প্রতি চোখ পড়িতেই সে সভয়ে পা তুলিয়া লইল।

ডাক্তার মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, ও আমাদের হীরা সিং তোমাকে পৌঁছে দেবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া সিংজী, খবর সব ভালো?

হীরা সিং বলিল, সব্ আচ্ছা।

আমিও যেতে পারি নাকি?

হীরা কহিল, আপ্‌কো কঁহি যানা দুনিয়ামে কোই রোক সক্‌তা? এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

বুঝা গেল পুলিশের লোক ভারতীর বাসার প্রতি নজর রাখিয়াছে, ডাক্তারের যাওয়া নিরাপদ নয়।

ভারতী হাত ছাড়িল না, চুপি চুপি কহিল, আমি যাবো না দাদা।

কিন্তু তোমার ত পালিয়ে থাকবার দরকার নেই ভরতী।

ভারতী তেমনি আস্তে আস্তে বলিল, দরকার থাকলেও আমি পালাতে পারব না। কিন্তু এর সঙ্গে যাবো না।

ডাক্তার আপত্তির কারণ বুঝিলেন। অপূর্বর বিচারের দিন এই হীরা সিংই তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, কিন্তু তুমি ত জানো ভারতী পাড়াটা কত খারাপ, এত রাত্রে একলা যাওয়া ত তোমার চলে না। আর আমি যে—

ভারতী ব্যাকুলকণ্ঠে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না দাদা, তুমি আমাকে পৌঁছে দেবে, আমি ত এখনও পাগল হইনি যে—

এই বলিয়া সে অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই থামিয়া গেল। কিন্তু, এতরাত্রে ও-পাড়ায় একাকী যাওয়াও যে অসম্ভব, এ সত্যই বা তাহার চেয়ে বেশী কে জানিত? হাত ছাড়িয়া নৌকা হইতে নামিবার কিছুমাত্র লক্ষণ না দেখিয়া ডাক্তার স্নেহার্দ্রস্বরে আস্তে আস্তে বলিলেন, আমার ওখানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে তোমাকে আমার নিজেরই লজ্জা করে। কিন্তু যাবে দিদি আর এক জায়গায়? আমাদের কবির ওখানে? সে নদীর ঠিক আর-পারেই থাকে। যাবে?

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কবি কে দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, আমাদের ওস্তাদজী, বেহালা-বাজিয়ে,—

ভারতী খুশী হইয়া কহিল, তাঁকে কি ঘরে পাওয়া যাবে? আর মদ জুটে থাকে ত অজ্ঞান হয়েই হয়ত আছেন।

ডাক্তার কহিলেন, আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমার গলাশুনলেই তার নেশা কেটে যায়। তা ছাড়া কাছেই নবতারা থাকেন—হয়ত তোমাকে দুটো খাইয়ে দিতেও পারব।

ভারতী ব্যস্ত হইয়া বলিল, রক্ষে কর দাদা, এই শেষ-রাত্তিরে আর আমাকে খাওয়াবার চেষ্টা করো না, কিন্তু তাই চল যাই, সকাল হলেই আমরা ফিরে আসবো।

ডাক্তার পুনরায় নৌকা ভাসাইয়া দিলে হীরা সিং অন্ধকারে পুনরায় যেন মিলাইয়া

গেল। ভারতী কৌতূহলী প্রশ্ন করিল, দাদা, এই লোকটিকে পুলিশে এখনও সন্দেহ করেনি?

ডাক্তার কহিলেন, না। টেলিগ্রাফ আফিসের পিয়ন, মানুষের জরুরী তার বিলি করে বেড়ায়, তাই ওকে দিনরাত্তির কোন সময়ে কোনখানেই বেমানান দেখায় না।

সেইমাত্র জোয়ার শুরু হইয়াছে, খাঁড়ি হইতে বাহির হইয়া বড় নদীতে কতকটা উজাইয়া না গেলে ও-পারের যথাস্থানে নৌকা ভিড়ানো শক্ত, এইজন্য কিনারা ঘেঁষিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত সাবধানে লগি ঠেলিয়া যাওয়ার পরিশ্রম অনুভব করিয়া ভারতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, থাক গে, কাজ নেই দাদা আমাদের ওখানে গিয়ে। তার চেয়ে বরঞ্চ চল, তোমার বাড়িতেই ফিরে যাই। জোয়ারের টানে আধঘন্টাও লাগবে না।

ডাক্তার কহিলেন, কেবল সেজন্য নয়, ভারতী, ওর সঙ্গে দেখা করাও আমার বিশেষ প্রয়োজন।

প্রত্যুত্তরে ভারতী উপহাসভরে হাসিয়া বলিল, ওঁর সঙ্গে কোন মানুষের কোন প্রয়োজন থাকতে পারে এ ত আমার সহজে বিশ্বাস হয় না, দাদা।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমারা কেউ ওকে জানো না, ভারতী,ওর মত সত্যকার গুণী সহসা কোথাও তুমি পাবে না। ওই ভাঙ্গা বেহালাটি মাত্র পুঁজি করে ও যায়নি এমন জায়গা নেই। তাছাড়া ও ভারী পণ্ডিত। কোথায় কোন্ বইয়ে কি আছে ও ছাড়া জেনে নেবার আমার আর দ্বিতীয় লোক নেই। ওকে আমি যথার্থ ভালবাসি।

ভারতী মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া কহিল, তাহলে ওঁকে তুমি মদ ছাড়াবার চেষ্টা করো না কেন?

ডাক্তার কহিলেন, আমি কাউকে কোন-কিছু ছাড়াবারই ত চেষ্টা করিনে ভারতী। একটুখানি চুপ করিয়া বলিলেন, তাছাড়া ও কবি, ও গুণী, ওদের জাত আলাদা। ওদের ভাল-মন্দ ঠিক আমাদের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু তাই বলে দুনিয়ার ভাল-মন্দের বাঁধা আইনে ওকে মাপ করে চলে না। ওর গুণের ফল তারা সবাই মিলে ভোগ করে, শুধু দোষের শাস্তিটুকু সহ্য করে ও নিজে। তাই মাঝে মাঝে ও বেচারা যখন ভারী দুঃখ পায়, তখন, আর একটি লোক যে মনে মনে তার অংশ নেয়, সে আমি।

ভারতী কহিল, তুমি সকলের জন্যেই দুঃখ বোধ কর দাদা, তোমার মন মেয়েদের চেয়েও কোমল। কিন্তু, তোমার গুণীকে তুমি বিশ্বাস কর কি করে? উনি মাতল হয়ে ত সমস্তই বলে ফেলতে পারেন।

ডাক্তার কহিলেন। ওই জ্ঞানটুকুই ওর বাকী থাকে। আর একটা সুবিধা এই যে, ওর কথায় বিশেষ কেউ বিশ্বাসও করে না।

ভারতী কহিল, ওঁর নাম কি দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, অতুল, সুরেন, ধীরেন,—যখন যা মনে আসে। আসল নাম শশিপদ ভৌমিক।

আমার মনে হয় উনি নবতারার বড় বাধ্য।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, আমারও মনে হয়। এই বলিয়া তিনি পর-পারের জন্য নৌকার মুখ ফিরাইলেন। স্রোত ও দাঁড়ের প্রবল আকর্ষণে ক্ষুদ্র তরণী অত্যন্ত দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল, এবং দেখিতে দেখিতে এপারে আসিয়া ঠেকিল। চারিদিকেই সাহেব কোম্পানীর বড় বড় কাঠের ঝাড় স্তূপাকার করা, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে জোয়ারের জল ঢুকিয়া দূরবর্তী জাহাজের তীব্র আলোকে ঝিকঝিক করিতেছে, ইহারই একটা ফাঁকের মধ্যে ডিঙ্গি প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া ডাক্তার ভারতীর হাত ধরিয়া নামিয়া পড়িলেন। পিচ্ছিল কাঠের উপর দিয়া এই পথ অন্ধকার বনের মধ্যে যে কোথায় গিয়াছে তাহার নির্দেশ নাই। ভারতী সভয়ে জিজ্ঞাসা কহিল, দাদা, ও-পারের এমনি একটা ভয়ঙ্কর স্থান থেকে আর একটা তেমনি ভয়ানক জায়গায় নিয়ে এলে। বাঘ-ভালুকের মত এ ছাড়া কি তোমরা আর কোথাও থাকতে

জানো না? আর কিছু ভয় না কর সাপের ভয়টা ত করতে হয়?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, সাপ বিলাতথেকে আসেনি দিদি, তাদের ধর্মজ্ঞান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না।

মন্তব্য শুনিয়া ভারতীর আর এক দিনের কথা মনে পড়িল। সেদিনও তাঁহার এমনি সহাস্য কণ্ঠস্বরে ইউরোপের বিরুদ্ধে কি অপরিসীম ঘৃণাই প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি পুনশ্চ কহিলেন, আর বাঘ-ভালুক বোন? কতদিনই ভাবি, এই ভারতবর্ষে মানুষ না থেকে যদি কেবল বাঘ-ভালুক থাকতো! হয়ত, বিদেশ থেকে শিকার করতে এরা আসতো, কিন্তু এমন অহর্নিশি রক্তশোষণের জন্য কামড়ে পড়ে থাকত না।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল। সমস্ত জাতি-নির্বিশেষে কাহারও এতখানি বিদ্বেষ তাহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। বিশেষ করিয়া এই মানুষটির এতবড় বিশাল বক্ষতল হইতে যখন গরল উচ্ছলিয়া উঠিত, তখন দুই চক্ষু তাহার জলে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত। নিজের মনে প্রাণপণে বলিতে থাকিত, ইহা কখনও সত্য নয়, কিছুতে সত্য নয়। এমন হইতেই পারে না।

কিছুক্ষণ হইতে একটা অপূর্ব সুস্বর মাঝে মাঝে আসিয়া তাহাদের কানে লাগিতেছিল, সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার বলিলেন, ওস্তাদজী আমাদের জেগে আছেন এবং সজ্ঞানে আছেন,—এমন বেহালা তুমি কখনো শোননি ভারতী।

আরও কয়েক পা অগ্রসর হইয়া ভারতী স্তব্ধ হইয়া থামিল। কোথায় কোন্ অন্ধকারের বুক চিরিয়া কত কান্নাই যেন ভাসিয়া আসিতেছে। তাহার আদি অন্ত নাই, এ সংসারে তাহার তুলনা হয় না। মিনিট-দুয়ের জন্য ভারতীর যেন সংজ্ঞা রহিল না। ডাক্তার তাহার হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়া কহিলেন, চল।

ভারতী চকিত হইয়া রহিল, চল। আমি কখনো এমন ভাবিনি কখনো এমন শুনিনি।

ডাক্তার আস্তে বলিলেন, পৃথিবীতে আমার অগম্য ত স্থান নেই, এর চেয়ে ভাল আমিও কখনো শুনেচি মনে হয় না। একটু হাসিয়া কহিলেন, কিন্তু পাগলার হাতে পড়ে ঐ বেহালা বেচারার দুর্দশার অবধি নেই। আমিই বোধ হয় ওকে দশবার উদ্ধার করে দিয়েচি। এখনো শুনেচি অপূর্বর কাছে পাঁচ টাকায় বাঁধা আছে।

ভারতী কহিল, আছে। ওঁর নাম করে টাকাটা আমি তাঁকে পাঠিয়ে দেব।

গাছপালার আড়ালে একখানা দোতলা কাঠের বাড়ি। একতলাটা পাঁক, জোয়ারের জল এবং দেনো গাছে দখল করিয়াছে, সুমুখে একটা কাঠের সিঁড়ি এবং তাহারই সর্বোচ্চ ধাপে একটা তোরণের মত করিয়া তাহাতে মস্তবড় একটা রঙ্গীন চীনালণ্ঠন ঝুলিতেছে। ভিতরের আলোকে স্পষ্ট পড়া গেল তাহার গায়ে বড় কালো অক্ষরে ইংরাজিতে লেখা,—শশিতারা লজ্।

ভারতী বলিল, বাড়ির নাম রাখা হয়েছে শশিতারা শশী এবং নবতারার তারা এক ক'রে শশিতারা লজ্ হয়েছে।

ভারতী মুখ গম্ভীর হইল, কহিল, এ ভারী অন্যায়। এ-সব প্রশ্রয় দাও কি করে?

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, কহিলেন, তোমার দাদাটিকে তুমি কি সর্বশক্তিমান মনে কর? কে কার লজের নাম শশিতারা রাখবে, কে কার প্যালেসের নাম অপূর্ব-ভারতী রাখবে, সে আমি ঠেকাব কি করে?

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, না দাদা, এ-সব নোংরা কাণ্ড তুমি বারণ করে দাও। নইলে আমি ওঁর ঘরে যাবো না।

ডাক্তার কহিলেন, শুনেচি ওদের শীঘ্র বিয়ে হবে।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া বলিল, বিয়ে হবে কি করে, ওর যে স্বামী বেঁচে আছে?

ডাক্তার কহিলেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে মরতে কতক্ষণ দিদি? শুনেচি ব্যাটা মরেচে দিন-পনর হল।

ভারতী অতিশয় বিরক্তি সত্ত্বেও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, ও হয়ত মিছে কথা। তাছাড়া,

এক বছর অন্ততঃ ওদের ত থামতেই হবে, নইলে সে যে ভারী বিশ্রী দেখাবে!

তাহার উৎকণ্ঠা দেখিয়া ডাক্তার মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, বেশ, বলে দেখবো। তবে, থামলে বিশ্রী দেখাবে কি না-থামলে বিশ্রী দেখাবে সেইটেই চিন্তার কথা।

এই ইঙ্গিতের পরে ভারতী লজ্জায় নীরব হইয়া রহিল। সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে ডাক্তার চাপা-গলায় বলিতে লাগিলেন, পাগলাটার জন্যেই কষ্ট হয়, শুনেচি ঐ স্ত্রীলোকটিকে নাকি ও যথার্থই ভালবাসে। আর কাউকে যদি বাসত! সহসা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কেবল এইটুকু কামনা করি ওর ভালবাসার মধ্যে সত্য যদি থাকে ত সেই সত্যই যেন ওকে উদ্ধার করে দেয়।

ভারতী চমকিয়া উঠিল। এবং তেমনি চাপাকণ্ঠে সহসা প্রশ্ন করিয়া ফেলিল, সংসারে তা কি হয় দাদা?

ডাক্তার অন্ধকারেই একবার মুখ ফিরিয়া চাহিলেন। তাহার পরে নিঃশব্দপদে উঠিয়া গুণীর বন্ধ-দরজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ডাক শুনিয়া বেহালা থামিল। খানিক পরে ভিতর হইতে দ্বার খুলিয়া শশিপদ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তারকে সে সহজেই চিনিল, কিন্তু আঁধারে ঠাহর করিয়া ভারতীকে চিনিতে পারিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিল,—অ্যাঁ আপনি? ভারতী? আসুন, আমার ঘরে আসুন। এই বলিয়া সে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল। তাহার আনন্দ-দীপ্ত মুখের অকপট আবাহনে, তাহার অকৃত্রিম উচ্ছ্বসিত সমাদরে ভারতীর সমস্ত ক্রোধ জল হইয়া গেল। শশী বিছানার কোন এক নিভৃত স্থান হইতে বড় একটা খাম বাহির করিয়া ভারতীর হাতে দিয়া কহিল, খুলে পড়ুন। পরশু দশ হাজার টাকার ড্রাফ্‌টা আসছে,—নট্‌ এ পাই লেস্‌! বলতাম না? আমি জোচ্চোর! আমি মিথ্যাবাদী! আমি মাতাল! কেমন হল ত? দশ হাজার! নট্‌ এ পাই লেস্‌!

এই দশ হাজার টাকার ড্রাফট্‌ সম্বন্ধে একটা পুরাতন ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা প্রয়োজন। তাহার বন্ধু-বান্ধব, শত্রু-মিত্র, পরিচিত-অপরিচিত এমন কেহ ছিল না যে অচির ভবিষ্যতে একটা মোটা টাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা শশীর মুখ হইতে শুনে নাই। কেহ বড় বিশ্বাস করিত না, বরঞ্চ ঠাট্টা-তামাশাই করিত, কিন্তু ইহাই ছিল ওস্তাদজীর মূলধন। ইহারই উল্লেখ করিয়া সে একান্ত অসঙ্কোচে লোকের কাছে ধার চাহিত। এবং শীঘ্রই একদিন সুদে-আসলে পরিশোধ করিয়া দিবে তাহা শপথ করিয়া বলিত। এই অত্যন্ত অনিশ্চিত অর্থাগমের উপর তাহার কত আশা-ভরসাই না জড়াইয়া ছিল! বছর পাঁচ-সাত পূর্বে তাহার বিত্তশালী মাতামহ যখন মারা যান তখন সে মাসতুত ভায়েদের সঙ্গে সম্পত্তির একটা অংশ পাইয়াছিল। এতদিন এইটাই তাহাদের কাছে বিক্রি করিবার কথাবার্তা চলিতেছিল, মাসখানেক পূর্বে তাহা শেষ হইয়াছে। খামের মধ্যে কলিকাতার এক বড় এটর্নির চিঠি ছিল, টাকাটা দুই-এক দিনেই পাওয়া যাইবে তিনি লিখিয়া জানাইয়াছেন।

ভারতী চিঠি পড়িয়া শেষ করিলে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, বিশ হাজার টাকার না কথা ছিল, শশী?

শশী হাত নাড়িয়া বলিল, আহা, দশ হাজার টাকাই কি সোজা নাকি? তাছাড়া নিজের মাসতুত ভাই,—সম্পত্তি ত একরকম আপনার ঘরেই রইল, ডাক্তারবাবু, আর ঠিক সেই কথাই ত মেজদা লিখে জানিয়েছেন। কিরকম লিখেছেন একবার—এই বলিয়া মেজদার চিঠির জন্য উঠিবার উপক্রম করিতে ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, থাক থাক, মেজদার চিঠির জন্যে আমাদের কৌতূহল নেই। ভারতীকে বলিলেন, এইরকম একটা ক্ষ্যাপা মাসতুত ভাই আমাদের থাকলে—এই বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

শশী খুশী হইল না, সে প্রাণপণে প্রমাণ করিতে লাগিল যে, সম্পত্তিটা একপ্রকার বিক্রি না করিয়াই এতগুলা টাকা পাওয়া গেল, এবং সে কেবল তাহার মেজদার মত আদর্শ-পুরুষ সংসারে ছিল বলিয়া।

ভারতী মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, সে ঠিক কথা অতুলবাবু, মেজদাকে না দেখেই তাঁর দেবচরিত্র আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। ও আর সপ্রমাণ করবার প্রয়োজন নেই।

শশী তৎক্ষণাৎ কহিল, কাল কিন্তু আমাকে আর দশ'টা টাকা দিতে হবে। তাহলে সেদিনের দশ, কালকের দশ আর অপূর্ববাবুর দরুন সাড়ে আট টাকা,— পুরোপুরি ত্রিশ টাকাই পরশু-তরশু দিয়ে দেব। নিতে হবে, না বলতে পারবেন না কিন্তু।

ভারতী হাসিতে লাগিল। শশী কহিতে লাগিল, ড্রাফ্‌ট্‌টা এলেই ব্যাঙ্কে জমা করে দেব। মাতাল, জোচ্চোর, স্পেণ্ডথ্রিফ্‌ট্‌ যা মুখে এসেছে লোকে বলেছে, কিন্তু এবার দেখাবো। আসলে হাত পড়বে না, কেবল সুদের টাকাতেই সংসার চালিয়ে দেবো, বরঞ্চ বাঁচবে দেখবেন, পোস্ট-অফিসেও একটা অ্যাকাউন্ট খুল্‌তে হবে,—ঘরে কিছু রাখা চলবে না। চাই কি বছর-পাঁচেকের মধ্যে একটা বাড়ি কিনতেও পারবো। আর কিনতেই ত হবে,—সংসার ঘাড়ে পড়ল কিনা! সহজ নয়ত আজকালকার বাজারে!

ভারতীর মুখের দিকে চাহিয়া ডাক্তার হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু সে মুখ গম্ভীর করিয়া আর-একদিকে চাহিয়া রহিল।

শশী কহিল, মদ ছেড়ে দিয়েছি শুনেচেন বোধ হয়?

ডাক্তার কহিলেন, না।

এই লইয়া উভয়েই আলোচন দীর্ঘ হইতে পারিত, কিন্তু একজনের সকৌতুক প্রশ্নমালায় ও অপরের উৎসাহদীপ্ত উত্তর-দানের ঘটায় ভারতী বিপন্ন হইয়া উঠিল। সে কোনটাতেই যোগ দিতে পারিতেছে না দেখিয়া ডাক্তার অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া আসল কথা পাড়িলেন। কহিলেন, শশী, তুমি ত তাহলে এখান থেকে আর শীঘ্র নড়তে পারচ না।

শশী বলিল, নড়া? অসম্ভব।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, আমাদের তাহলে এখানে একটা স্থায়ী আড্ডা রইল।

শশী তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, সে কি করে হতে পারে? আপনাদের সঙ্গে ত আর আমি সম্বন্ধ রাখতে পারব না। লাইফ আমার রিস্ক করা যায় না।

ডাক্তার ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া হাসিমুখে বলিলেন, আমাদের ওস্তাদের আর যা দোষই থাক, চক্ষুলজ্জা আছে এ অপবাদ অতিবড় শত্রুতেও দেবে না। পারো যদি এই বিদ্যেটা ওর কাছে শিখে নাও ভারতী।

প্রত্যুত্তরে শশীর পক্ষ লইয়া ভারতী অত্যন্ত ভালমানুষের মত বলিল, কিন্তু মিথ্যে আশা দেওয়ার চেয়ে স্পষ্ট বলাই ত ভাল। আমি পারিনে, কিন্তু অতুলবাবুর কাছে ও বিদ্যে শিখে নিতে পারলে আজ ত আমার ছুটি হয়ে যেতো দাদা।

তাহার কন্ঠস্বরের শেষ দিকটা হঠাৎ যেন কেমন ভারী হইয়া গেল। শশী মনোনিবেশ করিল না, করিলেও হয়ত তাৎপর্য বোধ করিত না, কিন্তু ইহার নিহিত অর্থ যাঁহার, বুঝিবার তাঁহার বিলম্ব হইল না।

মিনিট-দুই সকলেই মৌন হইয়া রহিলেন। প্রথমে কথা কহিলেন ডাক্তার, বলিলেন, শশি, দিন-দুয়ের মধ্যে আমি যাচ্চি। হাঁটা-পথে চীনের মধ্যে দিয়ে প্যাসিফিকের সব আইল্যাণ্ডগুলোই আর একবার ঘুরব। বোধ হয় জাপান থেকে অ্যামেরিকাতেও যাবো। কবে ফিরবো জানিনে, ফিরবই কি না তাই বা কে জানে,—কিন্তু, হঠাৎ যদি কখনো ফিরি শশি, তোমার বাড়িতে বোধ হয় আমার স্থান হবে না?

শশী ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি নির্নিমেষচক্ষে চাহিয়া রহিল, তাহার পরে তাহার নিজের মুখ ও কণ্ঠস্বর আশ্চর্যরূপে পরিবর্তিত হইয়া গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হবে! আমার বাড়িতে আপনার স্থান চিরকাল হবে।

ডাক্তার কৌতুকভরে কহিলেন, সেকি কথা শশি, আমাকে স্থান দেওয়ার চেয়ে বড় বিপদ মানুষের আর আছে কি?

শশী মুহূর্ত চিন্তা না করিয়া বলিল, সে জানি, আমার জেল হবে। তা হোক গে। এই

বলিয়া সে চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, এমন বন্ধু আর নেই। ১৯১১ সালে জাপানের টোকিয়ো শহরে বোমা ফেলার জন্যে যখন কোটোকুর সমস্ত দলবলের প্রাণদণ্ড হল, ডাক্তার তখন তার খবরের কাগজের ইংলিশ সাবএডিটার। বাসার সুমুখের দিকটা পুলিশে ঘিরেচে, আমি কাঁদতে লাগলাম, উনি বললেন, মরলে চলবে না শশি, আমাদের পালাতে হবে। পিছনের জানালা থেকে দড়ি বেঁধে আমাকে নামিয়ে দিয়ে নিজেও নেমে পড়লেন,—ডাক্তারবাবু, উঃ—মনে আছে আপনার? এই বলিয়া সে বিগত স্মৃতির তাড়নায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, আছে বৈ কি।

শশী কহিল, থাকার ত কথা। কিন্তু আ-কিম সাহায্য না করলে সেবার ভবলীলা আমাদের সাঙ্গ হত ডাক্তারবাবু। সাংহাই বোটে আর পা দিতে হত না। উঃ—ঐ বেঁটে ব্যাটাদের মত বজ্জাত আর ভূ-ভারতে নেই। আমি ত আর সত্যিই আপনাদের বোমার দলে ছিলাম না—বাসায় থাকতাম, বেহালা শেখাতাম। কিন্তু সে কথা কি শুনতো? শয়তান ব্যাটাদের না আছে আইন, না আছে আদালত। ধরতে পারলেই আমাকে ঠিক জবাই করে ছাড়ত। আজ যে এই কথা কইচি, চলে ফিরে বেড়চ্চি সে কেবল ওঁরই কৃপায়। এই বলিয়া সে চোখের ইঙ্গিতে তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। কহিল, এমন বন্ধুও দুনিয়ায় নেই ভারতী, এমন দয়া-মায়াও সংসারে দেখিনি।

ভারতী চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কহিল, তোমার সমস্ত কাহিনী একদিন আমাদের গল্প করে শোনাও না দাদা। ভগবান তোমাকে এত বুদ্ধি দিয়েছিলেন, শুধু কি এই অমূল্য প্রাণটার দাম বোঝবার বুদ্ধিটুকুই দিতে ভুলে ছিলেন! সেই জাপানীদের দেশেই তুমি আবার যেতে চাও?

শশী কহিল, আমিও ঠিক সেই কথাই বলি ভারতী! বলি, অতবড় স্বার্থপর, লোভী, নীচাশয় জাতির কাছে কোন প্রত্যাশাই করবেন না। তারা কোনদিন আপনাকে কোন সাহায্যই করবে না।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, কোমরে সেই দড়ি-বাঁধার ঘটনাও শশী ভুললে না, জাপানীদের সে এ জীবনে মাপ করতেও পারলে না। কিন্তু এই তাদের সমস্তটুকু নয় ভারতী, এতবড় আশ্চর্য জাতও পৃথিবীতে আর নেই। শুধু আজকের কথা নয়, প্রথম দৃষ্টিতেই তারা সাদা-চামড়াকে চিনেছিল। আড়াই শ বৎসর আগে যে জাত আইন করতে পেরেছিল, চন্দ্র-সূর্য যতদিন বিদ্যমান থাকবে খ্রীষ্টান যেন না তাদের রাজ্যে ঢোকে, এবং সে যেন তার চরম শাস্তি ভোগ করে, সে জাত যাই কেন না করে থাক তারা আমার নমস্য!

বক্তার দুইচক্ষু একনিমিষেই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। সেই বজ্রগর্ভ ভয়ঙ্কর দৃষ্টির সম্মুখে শশী যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল। সে সভয়ে বারবার মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, সে ঠিক ! সে ঠিক!

ভারতীর মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না, তাহার বুকের মধ্যেটা যেন অভূতপূর্ব অব্যক্ত আবেগে থরথর করিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল আজ এই গভীর নিশীথে, আসন্ন বিদায়ের প্রাক্কালে একমুহূর্তের জন্য এই লোকটির সে স্বরূপ দেখিতে পাইল।

ডাক্তার নিজের বক্ষদেশে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া কহিলেন, কি বলছিলে ভারতী, এর মূল্য বোঝবার মত বুদ্ধি ভগবান আমাকে দেননি? মিছে কথা! শুনবে আমার সমস্ত ইতিহাস? ক্যান্টনের একটা গুপ্ত-সভার মধ্যে সুনিয়াৎ সেন্ আমাকে একবার বলেছিলেন—

ভারতী হঠাৎ ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, কারা যেন সিঁড়ি দিয়ে উঠচে—

ডাক্তার কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, পকেট হইতে ধীরে-সুস্থে পিস্তল বাহির করিয়া কহিলেন, এই অন্ধকারে আমাকে বাঁধতে পারে পৃথিবীতে কেউ নেই। এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের উপর উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

কেবল বিচলিত হইল না শশী। সে মুখ তুলিয়া কহিল, আজ নবতারাদের একববার

আসার কথা ছিল, বোধ হয়—

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিয়া কহিলেন, বোধ হয় নয়, তিনিই। অত্যন্ত লঘুপদ। কিন্তু, সঙ্গে তাঁর 'দের'টা আবার কারা?

শশী বলিল, আপনি জানেন না? আমাদের প্রেসিডেন্ট এসেছেন যে। বোধ হয়—

ভারতী অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে প্রেসিডেন্ট? সুমিত্রাদিদি?

শশী মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে দ্বার খুলিতে অগ্রসর হইল। ভারতী ডাক্তারের মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তাহার মনে হইল, এতক্ষণে যেন সে তাঁহার এখানে আসিবার হেতু বুঝিয়াছে। আজ রাত্রিটা বৃথায় যাইবে না, প্রত্যাসন্ন বিক্ষেপের মুখে পথের-দাবীর শেষ মীমাংসা আজ অনিবার্য। হয়ত আইয়ার আছে, তলওয়ারকর আছে, কি জানি হয়ত নিরাপদ বুঝিয়া ব্রজেন্দ্রও শহর ছাড়িয়া আসিয়া এই বনেই আশ্রয় লইয়াছে। ডাক্তার তাঁহার অভ্যাস ও প্রথামত পিস্তল গোপন করিলেন না, সেটা বাঁ হাতে তেমনি ধরাই রহিল। তাঁহার শান্ত মুখের উপর ভিতরের কোন কথাই পড়া গেল না সত্য,কিন্তু ভারতীর মুখ অধিকতর পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

পঁচিশ

একে একে ঘরের মধ্যে যাঁহারা প্রবেশ কহিলেন,তাঁহারা সকলেই সুপরিচিত। ডাক্তার মুখ তুলিয়া কহিলেন, এস। কিন্তু সেই মুখের ভাবেই ভারতীর মনে হইল, অন্ততঃ আজিকার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না।

সুমিত্রার খবর তিনি জানিতেন, কিন্তু ইতিমধ্যে সকলেই যে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া এপারে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে এ সংবাদ তাঁহার জানা ছিল না। ইহা কিছুতেই আকস্মিক ব্যাপার নহে, সুতরাং তাঁহার অজ্ঞাতসারে কোন একটা গূঢ় পরামর্শ যে হইয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। আগন্তুকের দল মেঝের উপরে আসিয়া নিঃশব্দে উপবেশন করিলেন, কাহারও আচরণে লেশমাত্র বিস্ময় বা চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইল না ; স্পষ্টই বুঝা গেল, ভারতীর সম্বন্ধে না হউক, ডাক্তারের আসার কথা তাঁহারা যেমন করিয়াই হউক আগে হইতেই জানিতে পারিয়াছিলেন। অপূর্বর ব্যাপার লইয়া দলের মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদ ঘটিবে এ আশঙ্কা ভারতীর ছিল, হয়ত আজই ইহার একটা কঠিন বুঝাপড়া হইয়া যাইবে, ইহাই মনে করিয়া ভারতীর বুকের ভিতরটায় যেন কাঁপুনি শুরু হইল।

সুমিত্রার মুখ শুষ্ক এবং বিষণ্ণ। ভারতীর সহিত সে কথা কহিল না, ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখিল না। ব্রজেন্দ্র তাহার গেরুয়া রঙের মস্ত পাগড়ি খুলিয়া হাতের মোটা লাঠিটা চাপা দিয়া পাশে রাখিল, এবং নিজের বিরাট বপু কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়া আরাম কহিয়া বসিল। তাহার গোলাকার চক্ষের হিংস্রদৃষ্টি একবার ভারতীর ও একবার ডাক্তারের মুখের পরে যেন পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রামদাস তলওয়ারকর নীরব ও স্থির, ব্যারিস্টার কৃষ্ণ আইয়ার সিগারেট ধরাইয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন, এবং সকলের হইতে দূরে গিয়া বসিল নবতারা। কিছুর সঙ্গেই যেন তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই, আজ ভারতীকে সে চিনিতেও পারিল না। মুখে কাহারও হাসি নাই, বাক্য নাই, সর্বনাশা ঝড়ের পূর্বাহ্নের মত এই নিশীথ সম্মিলন কিয়ৎকালের জন্য একান্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল।

সেদিনের ভয়ানক রাত্রির মত আজও ভারতী উঠিয়া আসিয়া ডাক্তারের অত্যন্ত সন্নিকটে ঘেঁষিয়া বসিল। ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের সবাইকে ভারতী ভয় করতে শুরু করেছে, শুধু ভয় নেই ওর আমাকে।

এইরূপ মন্তব্যের বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না, ভারতী ভিন্ন বোধ হয় কেহ দেখিতেও পাইল না যে সুমিত্রা চোখের ইঙ্গিতে ব্রজেন্দ্রকে নিষেধ করিতেছে। কিন্তু ফল হইল না। হয় সে ইহার অর্থ বুঝিল না, না হয় গ্রাহ্য করিল না। তাহার কর্কশ ভাঙ্গা-গলার স্বরে সকলকে চকিত করিয়া বলিয়া উঠিল, আপনার স্বেচ্ছাচারের আমরা নিন্দা করি এবং তীব্র প্রতিবাদ করি। অপূর্বকে যদি কখনো আমি পাই ত তার—

এই অসম্পূর্ণ পদ ডাক্তার নিজেই পূর্ণ করিয়া বলিলেন, তার প্রাণ নেবে। এই বলিয়া তিনি বিশেষ করিয়া সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা সবাই কি এই লোকটিকে সমর্থন কর? সুমিত্রা মুখ নীচু করিয়া রহিল, এবং অন্য কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। কয়েক মুহূর্ত স্থির থাকিয়া তিনি কহিতে লাগিলেন, ভাবে মনে হয় তোমরা সমর্থন কর। এবং ইতিমধ্যে তোমাদের আলোচনাও হয়ে গেছে—

ব্রজেন্দ্র কহিল, হাঁ হয়ে গেছে, এবং এর প্রতিবিধান হওয়া আবশ্যক মনে করি।

ডাক্তার তাহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমিও তাই মনে করি, কিন্তু তার পূর্বে একটা প্রয়োজনীয় কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, খুব সম্ভব অত্যন্ত ক্রোধের বশেই তোমাদের তা মনে ছিল না। আহমেদ দুরানী ছিল আমাদের সমস্ত উত্তর চীনের সেক্রেটারি, অমন নির্ভীক, কর্মদক্ষ লোক আমাদের দলে আর ছিল না। ১৯১০ সালে জাপান কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নেবার মাস-খানেক পরেই সে মাঞ্চুরিয়ার কোন্ একটা রেলওয়ে স্টেশনে ধরা পড়ে। সাংহাইয়ে তার ফাঁসি হয়। সুমিত্রা, দুরানীকে তুমি দেখেছিলে, না?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

ডাক্তার কহিলেন, আমি তখন ছিতায় ভাঙ্গা-দল পুনর্গঠনে ব্যস্ত, একটা খবর পর্যন্ত পেলাম না যে আমার একখানা হাত ভেঙ্গে গেল। অথচ তার বিপক্ষে আদালতে বিচারের তামাশা যখন পুরোদমে চলছিল তখন রক্ষা করা তাকে একবিন্দু কঠিন ছিল না। আমাদের অধিকাংশ লোক তখন ঐখানেই বাস করছিল। তবুও, এত বড় দুর্ঘটনা কেন ঘটলো জানো? ফয়জাবাদের মথুরা দুবে তখন অতি তুচ্ছ অবিচার কুবিচারের পুনঃ পুনঃ অভিযোগে দলের মন একেবারে বিষ করে তুলেছিল। দুরানীর মৃত্যুতে সবাই যেন পরিত্রাণ পেলে। আমি ফিরে আসার পরে ক্যানটনের মিটিঙে যখন সকল ব্যাপার জানা গেল তখন দুরানীও নেই, মথুরাও টাইফয়েড জ্বরে মরেছে। প্রতিকারের কিছুই আর ছিল না। কিন্তু ভবিষ্যতের ভয়ে সে-রাত্রের গুপ্ত-সভা অতিশয় কঠিন দুটো আইন পাশ করে। কৃষ্ণ আইয়ার, তুমি ত উপস্থিত ছিলে, তুমিই বল।

কৃষ্ণ আইয়ারের মুখ শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আপনি কাকে ইঙ্গিত করছেন আমি ত বুঝতে পারচি নে ডাক্তার।

ডাক্তার লেশমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া বলিলেন, ব্রজেন্দ্রকে। একটা আইন এই ছিল, আমার আড়ালে আমার কাজের আলোচনা চলবে না,—

ব্রজেন্দ্র বিদ্রূপের স্বরে প্রশ্ন করিল, আলোচনাও চলবে না?

ডাক্তার উত্তর দিলেন, না, আড়ালে চলবে না। কিন্তু চলে তা জানি। তার কারণ, সেদিনকার ক্যানটনের সভায় উপস্থিত যাঁরা ছিলেন, দুরানীর মৃত্যুতে তারা যতটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, আমি ততটা হইনি, সুতরাং এ বস্তু চলেও আসচে, আমিও অবহেলা করেই আসচি। কিন্তু দ্বিতীয়টা গুরুতর অপরাধ, ব্রজেন্দ্র।

ব্রজেন্দ্র তেমনি উপেক্ষাভরে কহিল, সেটা প্রকাশ করে বলুন।

ডাক্তার কহিলেন, প্রকাশ করেই বলচি। আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা মারাত্মক অপরাধ। দুরানীর মৃত্যুর পরে এ বিষয়ে সাবধান হওয়া দরকার।

ব্রজেন্দ্র কঠিন হইয়া উঠিল, বলিল, সাবধান হওয়া দরকার অপরেরও ঠিক এমনি থাকতে পারে। জগতে প্রয়োজন শুধু আপনারই একচেটে নয়। এই বলিয়া সে সকলের দিকেই চাহিল, কিন্তু সকলেই মৌন হইয়া রহিল, কেহই তাহার জবাব দিল না।

ডাক্তার নিজেও অনেকক্ষণ নির্বাক্ হইয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে বলিলেন, এর শাস্তি হচ্ছে চরম দণ্ড! ভেবেছিলাম যাবার পূর্বে আর কিছু করব না, কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমার আপনারই সবুর সইল না। পরের প্রাণ নিতে ত তুমি সদাই প্রস্তুত, কিন্তু নিজের বেলা কিরকম মনে হয়?

ব্রজেন্দ্রর মুখ কালো হইয়া উঠিল। মুহূর্তকাল সে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া দম্ভভরে কহিয়া উঠিল, আমি এনার্কিস্ট, আমি রেভোল্যিউশনারি, প্রাণ আমার কাছে কিছুই নয়,—

নিতেও পারি, দিতেও পারি।

ডাক্তার শান্তকণ্ঠে বলিলেন, তাহলে আজ রাত্রে সেটা দিতে হবে,—কিন্তু বেল্ট থেকে ওটা টেনে বার করবার সময় হবে না ব্রজেন্দ্র, আমার চোখ আছে,—তোমাকে আমি চিনি। এই বলিয়া তিনি পিস্তল-সমেত বা হাত তুলিয়া ধরিলেন ; ভারতী ব্যাকুল হইয়া সেই হাতটা তাঁহার চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেই তিনি ডান হাত দিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়াশুধু বলিলেন, ছি!

ঘরের মধ্যে চক্ষের নিমিষে যেন একটা বজ্রপাত ঘটিয়া গেল।

সুমিত্রার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল, বলিল, নিজেদের মধ্যে এ-সব কি বলুন ত?

তলওয়ারকর এতক্ষণ পর্য্যন্ত একটা কথাও কহে নাই, এখন সে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার দলের সকল নিয়ম আমি জানিনে। আপনার সঙ্গে মতভেদের শাস্তি কি এখানে মৃত্যু? অপূর্ব্ববাবু বেঁচে গেছেন এতে আমি মনে মনে খুশীই হয়েছি, কিন্তু আপনার অন্যায় তাতে কম হয়নি, এ সত্য বলতে আমি বাধ্য।

কৃষ্ণ আইয়ার ঘাড় নাড়িয়া ইহাতে সায় দিল। ব্রজেন্দ্রব কণ্ঠস্বরে আর উপহাসের স্পর্ধা ছিল না, কিন্তু সে অনেকের সহানুভূতিতে বল পাইয়া বলিল, একজনের প্রাণ যাওয়া যখন চাই, তখন আমারই নাহয় যাক। আমি প্রস্তুত।

সুমিত্রা বলিল, ট্রেটরের বদলে যদি একজন ট্রায়েড কম্‌রেডের রক্তেই তোমার প্রয়োজন, তখন আমিও ত দিতে পারি ডাক্তার!

ডাক্তার স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, এই উচ্ছ্বাসের সহসা কোন জবাব দিবার চেষ্টা করিলেন না। মিনিট-দুই পরে নিজের মনেই একটুখানি মুচকিয়া হাসিয়া কহিলেন, সে-সব বহুকালের কথা, তখন কোথায়ই বা তোমরা? এই ট্রায়েড কম্‌রেডটিকে তখন থেকেই আমি জানি। সে যাক। টোকিওর একটা হোটেলে বসে সুনিয়াৎ সেন্ একদিন বলেছিলেন, নৈরাশ্য সহ্য করার শক্তি যার যত কম সে যেন এ রাস্তা থেকে ততখানি দূরে দূরেই চলে। অতএব, এ আমার সইবে। কিন্তু ব্রজেন্দ্র, তোমাকে আমি মিথ্যে ভয় দেখাবার চেষ্টা করিনি। আমাকে অন্যত্র যেতে হচ্চে, কিন্তু ডিসিপ্লিন ভেঙ্গে গেলে ত আমার চলবে না। সুমিত্রাকে যদি তোমার দলেই পাও, আই উইশ ইউ গুড ল্যক। কিন্তু আমার পথ তুমি ছাড়। সুরাভায়ায় একবার এ্যাটেম্‌ট্ করেছ, পরশু আর একবার করেছ, কিন্তু এর পরে ইফ্ উই মিট—ইউ নো!

সুমিত্রা উদ্বেগ চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এ-সব কথার মানে? এ্যাটেম্‌ট্ করার অর্থ?

ডাক্তার এ প্রশ্ন কানেও তুলিলেন না, কহিলেন, কৃষ্ণ আইয়ার, আই অ্যাম সরি!

আইয়ার মুখ অবনত করিল, কিন্তু উত্তর দিল না। ডাক্তার পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিলেন, ভারতীর হাত ধরিয়া একটুখানি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, এইবার চল তোমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে আমি যাই। ওঠ।

ভারতী স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া ছিল, ইঙ্গিতমাত্র নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে সম্মুখে রাখিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, শুধু দ্বারের কাছে হইতে একবার সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, গুড্ নাইট!

এই বিদায়-বাণীর কেহ প্রত্যুত্তর দিল না, অভিভূতের ন্যায় সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। ভারতী নীচে নামিয়া গেলে, ডাক্তার উপরের দিকে চোখ রাখিয়া যখন ধীরে ধীরে নামিতে ছিলেন, অকস্মাৎ কবাট খুলিয়া শশী মুখ বাহির কহিয়া বলিল, কিন্তু আমার যে আপনাকে ভয়ানক প্রয়োজন ডাক্তার। এই বলিয়া সে দ্রুতপদে নামিয়া তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, রুদ্ধশ্বাসে কহিল, আমি ত মানুষের মধ্যেই নই ডাক্তারবাবু, কোনদিন আপনার কোন কাজে লাগবার শক্তিই আমার নেই, কিন্তু আপনার ঋণ আমি চিরদিন মনে করে রাখবো। এ আমি ভুলব না।

ডাক্তার সস্নেহে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিলেন, কে বলে তোমাকে মানুষ নয়, শশি? তুমি কবি, তুমি গুণী, তুমি সকল মানুষের বড়। আর আমার কাছে তোমার ঋণ যদি কিছু সত্যিই থাকে, সে ত না ভোলাই ভাল।

শশী বলিল, না, আমি ভুলব না। কিন্তু, যেখানেই থাকুন, যা-কিছু আমার আছে সমস্তই আপনার—এ কথা কিন্তু আপনিও ভুলতে পাবেন না।

উভয়ে ভারতীর কাছে আসিয়া পৌঁছিতে সে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি দাদা?

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, অসময়ে ওর ত কোন বিপদই ছিল না, কিন্তু হঠাৎ সময়টা ভাল হয়ে পড়াতেই ওর মহা চিন্তা হয়েছে, পাছে কৃতজ্ঞতার ঋণ আর মনে না থাকে। তাই ছুটে বলতে এসেছে, ওর যা-কিছু আছে সমস্তই আমার।

ভারতী বলিল, তাই নাকি শশিবাবু?

শশী চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার সকৌতুক স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, মনে থাকবে হে শশি, থাকবে। এ বস্তু জগতে এত সুলভ নয় যে কেউ সহজে ভোলে।

শশী কহিল, আপনি কবে যাবেন? তার আগে কি আর দেখা হবে না?

ডাক্তার বলিলেন, ধরে রাখো দেখা হবেই না। কিন্তু তুমি ত আমার বয়সে ছোট, আমি আশীর্বাদ করে যাচ্চি তুমি যেন সুখী হতে পারো।

শশী সবিনয়ে কহিল, আসচে শনিবারটা পর্যন্তও কি থাকতে পারেন না?

ভারতী কহিল, শনিবার যে ওঁদের বিয়ে।

ডাক্তার মুখ টিপিয়া হাসিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। সম্মুখে নদী, কাঠের মাড়ের পাশে ক্ষুদ্র তরণী শেষ-ভাঁটায় কাদার উপরে কাত হইয়া পড়িয়া আছে। সোজা করিয়া ভারতীকে সযত্নে তুলিয়া দিয়া তিনি নিজেও উঠিয়া বসিলেন। শশী বলিল, শনিবারটা আপনাকে থেকে যেতে হবে। জীবনে অনেক ভিক্ষে দিয়েছেন, এটিও আমাকে দিন। ভারতী, আপনাকেও সেদিন আসতে হবে।

ভারতী মৌন হইয়া রহিল। ডাক্তার বলিলেন, ও আসবে না শশি, কিন্তু আমি যদি থেকে যেতে পারি অন্ধকারে গা ঢেকে এসে তোমাদের একবার আশীর্বাদ করে যাবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্চি। আর যদি না আসি, নিশ্চয় জেনো সব্যসাচীর পক্ষেও তা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যেখানেই থাকি, সেদিন তোমার জন্যে এই প্রার্থনাই করব, বাকী দিনগুলো যেন তোমার সুখে কাটে। এই বলিয়া তিনি হাতের লগি দিয়া কাঠের স্তূপে সজোরে ঠ্যালা দিতেই ছোট নৌকা কাদার উপর দিয়া পিছলাইয়া নদীর জলে গিয়া পড়িল।

জোয়ার তখনও আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু ভাঁটার টানে ঢিমা পড়িয়া আসিয়াছে, সেই মন্দীভূত স্রোতে উচ্চ তীরভূমির অন্ধকার ছায়ার নীচে দিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র তরণী ধীরে ধীরে পিছাইয়া চলিতে লাগিল। ও-পারের জন্য পাড়ি দিতে তখনও বিলম্ব ছিল, ডাক্তার হাতের দাঁড় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিলেন।

শ্রান্ত ভারতী তঁহার ক্রোড়ের উপর কনুই রাখিয়া হেলান দিয়া বসিয়া বলিল, আজ একলা থাকলে আমি এমন কান্না কাঁদতাম যে নদীর জল বেড়ে যেতো। দাদা, ভবিষ্যতে সকলেরই সুখী হবার অধিকার আছে, নেই কি কেবল তোমার? শশীবাবু অতবড় বিশ্রী কাজ করতে উদ্যত, তাকেও তুমি মন খুলে আশীর্বাদ করে এলে—শুধু কেউ নেই পৃথিবীতে সুখী হও বলে তোমাকেই আশীর্বাদ করবার? তুমি গুরুজন হও আর যাই হও, তোমাকেও আজ আমি ঠিক ওই বলে আশীর্বাদ করব, যেন তুমিও ভবিষ্যতে সুখী হতে পারো।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, ছোটর আশীর্বাদ খাটে না। উলটো ফল হয়।

ভারতী বলিল, মিছে কথা। তা ছাড়া আমি শুধু ছোট নয়, আর একদিক দিয়ে তোমার বড়? যাবার আগে তুমি সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে সুমিত্রাদিদির সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়ে রেখে যেতে চাও। সে আমি হতে দেব না। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিতে লাগিল, তুমি বলবে সুমিত্রাকে ত তুমি ভালবাস না। নাই বাসলে। তোমাদের পুরুষমানুষের ভালবাসার

কতটুকু দাম দাদা, যা আজ আছে কাল নেই? অপূর্ববাবুও আমাকে ভালবাসতে পারেন নি, কিন্তু আমি ত পেরেছি। আমার পারাই যা-কিছু সব। বোলতার মধু সঞ্চয়ের শক্তি নেই বলে ঝগড়া করতে যাবো কার সঙ্গে? কিন্তু আজ তোমাকে বলচি দাদা, এই বিশ্ব-বিধানের প্রভু যদি কেউ থাকেন নারী-হৃদয়ের এত বড় প্রেমের ঋণ শুধতে তাঁকে আমার হাতে এনে অপূর্ববাবুকে সঁপে দিতে হবেই হবে। এই বলিয়া ভারতী কিছু একটা উত্তরের আশায় ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিল, দাদা, তুমি মনে মনে হাসচো?

কৈ, না!

নিশ্চয়। নইলে তুমি জবাব দিলে না কেন? এই বলিয়া সে অন্ধকারে যতদূর পারা যায় সব্যসাচীর মুখের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ডাক্তার হেঁট হইয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া এইবার হাসিলেন, বলিলেন, জবাব দেবার কিছু ছিল না ভারতী। তোমার বিশ্ববিধানের প্রভুটিকে যদি এই জবরদস্তিই মেনে চলতে হতো, তোমার সুমিত্রাদিদির কি হতো জানো? ব্রজেন্দ্রের হাতেই নিজেকে সর্বপ্রকারে সঁপে দিয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে হতো।

ভারতী বিশেষ চমকিত হইল না। আজিকার ব্যাপারের পরে এই সন্দেহই তাহার মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, ব্রজেন্দ্র কি তাঁকে তোমার চেয়ে, —আমি বলচি, এত বেশি ভালবাসেন?

ডাক্তার সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না। তারপর কহিলেন, বলা একটু কঠিন। এ যদি নিছক একটা আকর্ষণই হয় ত মানুষের সমাজে তার তুলনা হয় না। লজ্জা নেই, শরম নেই, সম্ভ্রম নেই, —হিতাহিতবোধলুপ্ত জানোয়ারের উন্মত্ত আবেগ যে চোখে না দেখেচে সে তার মনের পরিচয়ই পাবে না। ভারতী, তোমার দাদার এই হাত-দুটো বলে কোন বস্তু যদি সংসারে না থাকতো সুমিত্রার আত্মহত্যা ছাড়া বোধ হয় আর কোন পথ খোলা থাকত না। তোমার বিশ্ব-বিধানের প্রভুটিও এতদিন এদের খাতির না করে পারেন নি। এই বলিয়া তিনি ভারতীর আনত মাথার পরে সেই হাত-দুটি রাখিয়া ধীরে ধীরে চাপড়াইতে লাগিলেন।

এতক্ষণে ভারতী শঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, দাদা, এত জেনেও তুমি এঁরই হাতে সুমিত্রাকে ফেলে রেখে যেতে চাচ্চো? এতবড় নিষ্ঠুর তুমি হতে পারো, আমি ভাবতেই পারিনে।

ডাক্তার কহিলেন, তাই ত আজ যাবার আগে সমস্ত চুকিয়ে দিয়ে যেতে চেয়েছিলাম,—কিন্তু সুমিত্রাই ত হতে দিলে না।

ভারতী সভয়ে প্রশ্ন করিল, হতে দিলে না কিরকম? তুমি কি সত্যিই ব্রজেন্দ্রকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলে নাকি?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ, সত্যিই চেয়েছিলাম! ইতিমধ্যে পুলিশের লোকে যদি না তাকে জেলে পাঠায় ত ফিরে এসে আর একদিন আমাকেই এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

এতক্ষণ পর্যন্ত ভারতী তাঁহার ক্রোড়ের উপর হেলান দিয়া বসিয়া ছিল, এই কথার পরে উঠিয়া বসিয়া একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে যে অন্তরের মধ্যে একটা কঠিন আঘাত পাইল ডাক্তার তাহা বুঝিলেন, কিন্তু কোন কথা না কহিয়া পর-পারের জন্য প্রস্তুত হইয়া পার্শ্বে রক্ষিত দাঁড়-দুটা দুই হাতে টানিয়া লইলেন।

অনেকক্ষণ পরে ভারতী আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, আমি যদি তোমার সুমিত্রা হতাম এমনি করে কি আমাকেও ফেলে যেতে পারতে?

ডাক্তার হাসিলেন,বলিলেন, কিন্তু তুমি ত সুমিত্রা নও, তুমি ভারতী। তাই তোমাকে আমি ফেলে যাবো না, কাজের জন্যে রেখে যাবো।

ভারতী ব্যগ্র হইয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তোমাদের এই-সব খুনোখুনি রক্তারক্তির মধ্যে আমি আর নেই। তোমার গুপ্ত-সমিতির কাজ আমাকে দিয়ে আর হবে না।

ডাক্তার বলিলেন, তার মানে এঁদের মত তুমিও আমাকে ত্যাগ করে যেতে চাচ্চো?

এই উক্তি শুনিয়া ভারতী ক্ষোভে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এতবড় অন্যায় কথা তুমি আমাকে বলতে পারো দাদা? তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, কিন্তু, আমি নিজে থেকে তোমাকে ত্যাগ করে গেছি, এ কথা মনে হলে কি একটা দিনের জন্যেও বাঁচতে পারি তুমি ভাবো? আমি তোমারই কাজ করে যাবো, যতদিন না তুমি স্বেচ্ছায় আমাকে ছুটি দাও। একটুখানি থামিয়া কহিল, কিন্তু আমি ত জানি, মানুষ খুন করে বেড়ানোই তোমার আসল কাজ নয়, তোমার কাজ মানুষকে মানুষের মত করে বাঁচানো। তোমার সেই কাজেই আমি লেগে থাকবো, এবং সেই ভেবেই ত তোমাদের মধ্যে আমি এসেছিলাম।

ডাক্তার একমুহূর্তের জন্য দাঁড়-টানা বন্ধ রাখিয়া প্রশ্ন করিলেন, সে কাজটা আমার কি?

ভারতী বলিল, আমাদের পথের-দাবীর ত কোন প্রয়োজন ছিল না গুপ্ত-সমিতি হয়ে ওঠা! কারখানার মজুর-মিস্ত্রিদের অবস্থা ত আমি নিজের চোখেই দেখে এসেছি। তাদের পাপ, তাদের কু-শিক্ষা, তাদের পশুর মত অবস্থা,—এর একবিন্দু প্রতিকারও যদি সারাজীবনে করতে পারি, তার চেয়ে বড় সার্থকতা আমার আর কি হতে পারে? সত্যি বলো দাদা, একি তোমারই কাজ নয়?

ডাক্তার তখনই কোন জবাব দিলেন না, বহুক্ষণ নীরবে কত কি যেন চিন্তা করিয়া সহসা দাঁড়-দুটা জল হইতে তুলিয়া লইয়া ধারে ধীরে কহিলেন, কিন্তু তোমার এ কাজ নয় ভরতী, তোমার অন্য কর্তব্য আছে। এ কাজ সুমিত্রার,—তাই, তার পরেই আমি এ ভার ন্যস্ত করে রেখেচি।

তখন নদীতে ভাঁটা শেষ হইয়া মোহানায় জোয়ার আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু সাগরের স্ফীত জলবেগ এখনও এতদূরে আসিয়া পৌঁছে নাই,—সেই স্তব্ধপ্রায় নদীবক্ষে তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরণী মন্থর মন্দগতিতে ভাসিয়া চলিতে লাগিল, ডাক্তার তেমনি শান্ত মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তোমাকে বলাই ভাল ভারতী,জন-কতক কুলি-মজুরের ভাল করার জন্যে পথের-দাবী আমি সৃষ্টি করিনি। এর ঢের বড় লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের মুখে হয়ত একদিন এদের ভেড়া-ছাগলের মতই বলি দিতে হবে,—তার মধ্যে তুমি থেকো না বোন, সে তুমি পারবে না।

ভারতী চমকিয়া উঠিয়া কহিল, এ-সব তুমি কি বোলচ দাদা? মানুষকে বলি দেবে কি!

ডক্তার তেমনি শান্তস্বরে বলিলেন, মানুষ কোথায়? জানোয়ার বৈ ত নয়!

ভারতী ভীত হইয়া কহিল, মানুষের সম্বন্ধে তুমি ঠাট্টা করেও অমন কথা মুখে এনো না বলচি। সকল সময়ে সব কথা তোমার বোঝা যায় না—বুঝেতেও পারিনে, তা মানি ; কিন্তু তোমার মুখের কথার চেয়ে তোমাকে আমি ঢের বেশী বুঝি দাদা, মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না।

ডাক্তার বলিলেন, না ভারতী, মিথ্যে নয়, তোমাকে সত্যি ভয় দেখাবার চেষ্টা করচি, যেন আমার যাবার পরে আর তুমি কারখানার কুলি-মজুরদের ভাল-করার মধ্যে না থাকো। এমন করে এদের ভালো করা যায় না,—এদের ভালো-করা যায় শুধু বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে? এবং সেই বিপ্লবের পথে চালনা করার জন্যেই আমার পথের-দাবীর সৃষ্টি। বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়,—এই তার বর, এই তার অভিশাপ। একবার ইউরোপের দিকে চেয়ে দেখ। হংগেরিতে তাই হয়েছে, রুসিয়ায় বার বার এমনি ঘটেছে, ৪৮ সালের জুন মাসের বিপ্লব ফরাসীদের ইতিহাসে আজও অক্ষয় হয়ে আছে। কুলি-মজুরদের রক্তে সেদিন শহরের সমস্ত রাজপথ একেবারে রাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। এই ত সেদিনের জাপান,—সেদেশেও দিনমজুরের দুঃখের ইতিহাস একবিন্দু বিভিন্ন নয়। মানুষের চলবার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না ভারতী।

ভারতী শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, সে আমি জানিনে, কিন্তু ওই-সব ভয়ানক উৎপাত কি তুমি এদেশেও টেনে আনবে নাকি? যাদের একফোঁটা ভালো করবার জন্যে আমরা অহর্নিশি পরিশ্রম করচি, তাদেরি রক্ত দিয়ে কারখানার রাস্তায় নদী বহাতে চাও নাকি?

ডাক্তার অবলীলাক্রমে কহিলেন, নিশ্চয় চাই। মহামানবের মুক্তি-সাগরে মানবের

রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে সেই ত আমার স্বপ্ন। এতকালের পর্বতপ্রমাণ পাপ তবে ধুয়ে যাবে কিসে? আর সেই ধোয়ার কাজে তোমার দাদার দু ফোঁটা রক্তেরও যদি প্রয়োজন হয় ত আপত্তি করব না ভারতী।

ভারতী কহিল, ততটুকু তোমাকে আমি চিনি, দাদা। কিন্তু দেশের এই অশান্তি ঘটিয়ে তোলবার জন্যেই এতবড় ফাঁদ পেতে বসে আছো? এর চেয়ে বড় আদর্শ আর তোমার নেই?

ডাক্তার বলিলেন, আজও ত খুঁজে পাইনি বোন। অনেক ঘুরেছি, অনেক পড়েছি, অনেক ভেবেচি। কিন্তু তোমাকে ত আমি আগেও বলেছি, ভারতী, অশান্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যামন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের ওমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে,—ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না। তাইত হয়েছে, তাইত আজ দীন-দরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে! তবুও তাদেরই অট্টালিকা প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরি সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যদি আমরাও আজ অশান্তি বলে কাঁদতে থাকি ত পথ পাবো কোথায়? না ভারতী, সে হবে না ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক,—মানুষের চেয়ে বড় নয়,—আজ সে-সব আমাদের ভেঙ্গে ফেলতেই হবে। ধুলো ত উড়বেই, বালি ত ঝরবেই, ইঁট-পাথর খসে মানুষের মাথাতে ত পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।

ভরতী বলিল, তাও যদি হয়, দাদা, শান্তির পথ ছেড়ে দিয়ে আগে থেকেই অশান্তির পথে পা বাড়াবো কেন?

ডাক্তার বলিলেন, তার কারণ, শান্তির পথ ঐ সনাতন, পবিত্র ও সুপ্রাচীন সভ্যতার সংস্কার দিয়ে এঁটে বন্ধ করা আছে বলে। কেবল ঐ বিপ্লবের পথটাই আজও খোলা আছে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, আমরা যে সেদিন কারখানার কারিগরদের সঙ্ঘবদ্ধ করে নিরুপদ্রব ধর্মঘট করাবার আয়োজন করেছিলাম সেও কি তবে তাদের মঙ্গলের জন্যে নয়? তুমি চলে গেলে পথের-দাবীর সে প্রচেষ্টাও কি আমাদের বন্ধ করে দিতে হবে?

ডাক্তার বলিলেন, না। কিন্তু সে কর্তব্য তোমার নয়, সুমিত্রার। তোমার কাজ আলাদা। ভারতী ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপদ্রব-ধর্মঘট বলে কোথাও কিছু নেই। সংসারে কোন ধর্মঘটই কখনো সফল হয় না, যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে। শেষ পরীক্ষা তাকেই দিতে হয়।

ভারতী বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কাকে দিতে হয়? শ্রমিককে?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ! তুমি জানো না, কিন্তু সুমিত্রা ভাল করেই জানে যে ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন, কর্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী-পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে,—তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে,—তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবনধারণের আর সে পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থ-বল, সৈন্য-বল, অস্ত্র-বল সবই তার হাতে,—সে-ই ত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করে না,—তোমার ঐ সনাতন শান্তি ও পবিত্র শৃঙ্খলার জয়জয়কার হোক, সেদিন নিরস্ত্র নিরন্ন দরিদ্রের রক্তে নদী বহে যায়।

ভারতী রুদ্ধশ্বাসে কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তার পরে আবার একদিন সেই-সব পীড়িত, পরাভূত, ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকরীর দ্বারেই হাত পেতে দাঁড়ায়। ভিক্ষা পায়।

ভারতী কহিল, তার পরে?

ডাক্তার বলিলেন, তারও পরে? তার পরে আবার একদিন সে দলবদ্ধ হয়ে পূর্ব-অত্যাচারের প্রতিকারের আশায় ধর্মঘট করে বসে, তখন আবার সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরভিনয় হয়।

ভারতীর মন মুহূর্তকালের জন্য একেবারে নিরাশায় ভরিয়া গেল, ধীরে ধীরে কহিল, তবে এমন ধর্মঘটে লাভ কি দাদা?

ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি অন্ধকারেও জ্বলিয়া উঠিল, কহিলেন, লাভ? এই ত পরম লাভ ভারতী! এই ত আমার বিপ্লবের রাজপথ! বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপচে উছলে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয়? সেই ত আমার মূলধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না, ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই। সেই ত আমার অবলম্বন। যে মূর্খ এ কথা জানে না, শুধু মজুরির কম-বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্বনাশ করে, দেশেরও করে।

ভারতী সহসা কহিল, নৌকো বোধ হয় আমাদের অনেকখানি পেছিয়ে এসেছে দাদা।

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, সেদিকেও চোখে আছে দিদি, কোথায় যেতে হবে, তা ভুলিনি।

ভারতী কহিল, কেন যে এর মধ্যে থেকে আমাকে তুমি বিদায় দিতে চাও এতক্ষণে তা বুঝেচি। আমি ভারি দুর্বল। হয়ত, তাঁরি মতই দুর্বল। আমি কিছু নয়,—আজও তোমার সমস্ত ভরসা সেই সুমিত্রাদিদির পরেই। কিন্তু এ কথা আমি কিছুতে মানবো না যে, এ ছাড়া আর পথ নেই,—মানুষের সমস্ত খোঁজাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একজনের মঙ্গলের জন্য আর একজনের অমঙ্গল করতেই হবে,—এ আমি কোনমতেই চরম সত্য বলে নেব না,—তুমি বললেও না।

সে আমি জানি বোন।

ভারতী কহিল, কিন্তু তোমার কাজ ছেড়েই বা আমি যাই কি করে? থাকবো কি নিয়ে? ফিরে যদি আর না এসো আমি বাঁচবো কি করে?

সেও আমি জানি।

ভারতী বলিল, জান তুমি সব। তবে?

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। উত্তর না পাইয়া ভারতী ধীরে ধীরে বলিল, বিপ্লব, যে কি, কেন এর এত প্রয়োজন মনের মধ্যে আমি ধারণাই করতে পারিনে। তবু, তোমার মুখ থেকে যখন শুনি বুকের ভেতরটায় কেমন যেন কাঁদতে থাকে। মনে হয় মানুষের দুঃখের ইতিহাস তুমি কতই না চোখে দেখেচ। নইলে এমন করে তোমাকে পাগল করেছে কিসে? আচ্ছা, যাবার সময় কি আমাকে তুমি সঙ্গে নিতে পারো না দাদা?

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তুমি ক্ষেপেচ ভারতী?

ক্ষেপেচি। তাই হবে। একটুখানি থামিয়া বলিল, মনে হয় আমি যেন তোমার কাজের বাধা। তাই, যেন কোথায় আমাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে যাচ্চো। কিন্তু, আমি কি দেশের কোন ভাল কাজেই লাগতে পারিনে? এমন সুযোগ কি কোথাও কিছু নেই?

ডাক্তার বলিলেন, দেশে ভাল কাজ করার অসংখ্য অবকাশ আছে ভারতী, কিন্তু সুযোগ নিজে তৈরি করে নিতে হয়।

ভারতী আদর করিয়া বলিল, আমি পারিনে দাদা, তুমি তৈরি করে দিয়ে যাও।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন। তাঁহার হাসিমুখ সহসা যে গম্ভীর হইয়া উঠিল, অন্ধকারে ভারতী তাহা দেখিতে পাইল না। কহিলেন, দেশের মধ্যে ছোটবড় এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যারা দেশের ঢের ভাল কাজ করে। আর্তের সেবা, নরনারীর পুণ্যসঞ্চয়ে প্রবৃত্তি দান করা, লোকের জ্বর ও পেটের অসুখে ঔষধ যোগানো, জল-প্লাবনে সাহায্য

ও সান্ত্বনা দেওয়া—তাঁরাই তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবেন, ভারতী, কিন্তু আমি বিপ্লবী। আমার মায়া নেই, দয়া নেই, স্নেহ নেই—পাপ-পুণ্য আমার কাছে মিথ্যা পরিহাস। ওই-সব ভাল কাজ আমার কাছে ছেলেখেলা। ভারতের স্বাধীনতাই আমার একমাত্র লক্ষ, আমার একটিমাত্র সাধনা। এই আমার ভাল, এই আমার মন্দ,—এ ছাড়া এ জীবনে আর আমার কোথাও কিছু নাই। ভারতী, আমাকে আর তুমি টেনো না।

ভারতী অন্ধকারে একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া ছিল, রুদ্ধ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ছাব্বিশ

আজ শনিবার, শশী ও নবতারার বিবাহের দিন। শশীর সনির্বন্ধ প্রর্থনা এই ছিল যে, রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া কোন এক সময়ে যেন ডাক্তার ভারতীকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া আজ তাহাদের আশীর্বাদ করিয়া যান। পঞ্চমীর খণ্ডচন্দ্র সেইমাত্র গাছের আড়ালে ঢলিয়া পড়িয়াছে, ভারতী একখানা কালো র‍্যাপারে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাহার সেই জনশূন্য ঘাটের একধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার নৌকায় অপেক্ষা করিতে ছিলেন, ভারতী আরোহণ করিয়া বলিল, কত কি যে ভাবতে ভাবতে আসছিলাম তার ঠিকানা নেই। জানি, আমাকে না বলে তুমি কিছুতেই চলে যাবে না, তবু ত ভয় ঘোচে না। ক'দিনই বা, কিন্তু, মনে হচ্ছিল যেন কত যুগ তোমাকে দেখতে পাইনি, দাদা। আমি নিশ্চয় তোমার সঙ্গে চীনেদের দেশে চলে যাবো তা বলে রাখছি।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, আমিও বলে রাখচি তুমি নিশ্চয়ই ও-রকম কিছু করবার চেষ্টা করবে না। এই বলিয়া তিনি ভাঁটার টানে নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, এইটুকু ত, বেশ যাওয়া যাবে, কিন্তু বড় নদীতে পড়ে উলটো স্রোত ঠেলে পৌঁছতে আজ আমাদের ঢের দেরি হবে।

ভারতী কহিল, হলই বা। এমনি কি শুভকর্মে যোগ দিতে চলেছ যে গেলে ক্ষতি হবে? আমার ত যাবার ইচ্ছেই ছিল না,—শুধু তুমি যাচ্চো বলেই যাওয়া। কি বিশ্রী নোংরা কাণ্ড বলত!

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, শশীর নবতারার সঙ্গে বিয়ে অনেকের সংস্কারে বাধে, হয়ত বা দেশের আইনেও বাধে। কিন্তু সে দোষ ত শশীর নয়, আইন করা-না-করার জন্য দায়ী যারা, অপরাধ তাদের। আমার একমাত্র ক্ষোভ শশী আর কাউকে যদি ভালবাসতো ভরতী!

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, শশীবাবু না হয় আর কাউকে ভালবাসলেন, কিন্তু সে বাসবে কেন? ওর মত মানুষকে সজ্ঞানে কোন মেয়েমানুষ ভালবাসাতে পারে এ ত আমি ভাবতেই পারিনে। আচ্ছা তুমিই বল, পারে দাদা?

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন, বলিলেন, ওকে ভালবাসা শক্ত বৈ কি। তাই ত রয়ে গেলাম তাকে আশীর্বাদ করব বলে। মনে হল, সত্যকার শুভকামনার যদি কোন শক্তি থাকে শশী যেন তার ফল পায়।

তাঁহার কণ্ঠস্বরের আকস্মিক গভীরতায় ভারতী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শশীবাবুকে তুমি বাস্তবিক ভালোবাসো, না দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ।

কেন?

তোমাকেই বা কেন এত ভালবাসি তারই কি কারণ দিতে পারি দিদি? বোধ হয় এমনিই।

ভারতী আবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দাদা, তোমার কাছে কি তবে আমরা দুজনে এক? কিন্তু পরক্ষণেই সহাস্যে বলিল, তবু ত নিজের দামটা এতদিনে টের পেলাম। চল, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে এখন খুশী হয়ে তাদের আশীর্বাদ—না না, প্রণাম করে আসি গে।

ডাক্তারও হাসিলেন, বলিলেন, চল।

জোয়ারের আশায় নদীর এপারে কোথাও দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা নিরাপদ নহে, তাই ভাঁটা ঠেলিয়া কষ্ট করিয়াই চলিতে হইল। খাঁড়ির মুখে একখানা জাপানী জাহাজ কিছুদিন হইতে বাঁধা ছিল, সেই স্থানটা নিঃশব্দে পার হইয়া ভারতী কথা কহিল। বলিল, এই কয়দিন থেকে থেকে কেবলি মনে হতো, দাদা, সমুদ্রের যেমন তল নেই, তোমারও তেমনি তল নেই। স্নেহ বল, ভালবাসা বল, কিছুই তোমাতে ভর দিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে না। সবই যেন কোথায় তলিয়ে চলে যায়।

ডাক্তার বলিলেন, প্রথমতঃ, সমুদ্রের তল আছে, সুতরাং, উপমা তোমার এ ক্ষেত্রে অচল।

ভারতী কহিল, এই নিয়ে বোধ হয় তোমাকে এক শ' বার বললাম যে, তুমি ছাড়া দুনিয়ায় আমার আর আপনার কেউ নেই,—তুমি চলে গেলে আমি দাঁড়াবো কোথায়? কিন্তু এ কথা তোমার কানেই পৌঁছল না। আর পৌঁছবে কি করে দাদা, হৃদয় ত নেই। আমি ঠিক জানি একবার চোখের আড়াল হলে তুমি নিশ্চয় আমাকে ভুলে যাবে।

ডাক্তার বলিলেন, না। তোমাকে নিশ্চয় মনে থাকবে।

ভারতী প্রশ্ন করিল, কি আশ্রয় করে আমি সংসারে থাকবো?

ডাক্তার বলিলেন, ভাগ্যবতী মেয়েরা যা আশ্রয় করে থাকে। স্বামী, ছেলেপুলে, বিষয়-আশয়, ঘরদোর—

ভারতী রাগ করিয়া বলিল, আমি যে অপূর্ববাবুকে একান্তভাবেই ভালবেসেছিলাম এ সত্য তোমার কাছে গোপন করিনি ; তাঁকে পেলে একদিন যে আমার সমস্ত জীবন ধন্য হয়ে যেতো এ কথাও তুমি জানো,—তোমার কাছে কিছু লুকানোও যায় না,—কিন্তু তাই বলে আমাকে তুমি অপমান করবে কিসের জন্যে?

ডাক্তার আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, অপমান! অপমান ত তোমাকে আমি এতটুকু করিনি, ভারতী।

সহসা অশ্রু-আভাসে ভারতীর কণ্ঠ ভারী হইয়া উঠিল, কহিল, না, করনি বৈ কি! তুমি জানো কত শত-সহস্র বাধা, তুমি জানো তিনি আমাকে গ্রহণ করতেই পারেন না,—তবুও তুমি এই-সব বলবে!

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, এই ত মেয়েদের দোষ। তারা নিজেরা একদিন যা বলে, অপরে তাই আর একদিন উচ্চারণ করলেই তারা তেড়ে মারতে আসে। সেদিন সুমিত্রার কথায় বললে সে কাকে যেন একদিন পায়ের তলায় টেনে এনে ফেলবে, আর আজ আমি তারই পুনরাবৃত্তি করায় কান্নায় গলা তোমার বুঁজে এলো!

ভারতী চোখ মুছিয়া বলিল, না, তুমি কখখনো এ-সব কথা আমাকে বলতে পাবে না।

ডাক্তার কহিলেন, বেশ, বলব না। কিন্তু এ যাত্রা বেঁচে যদি ফিরে আসি বোন, এই আমারই পায়ের কাছে গলায় আঁচল দিয়ে স্বীকার করতে হবে,—দাদা, আমার কোটি কোটি অপরাধ হয়েছে,—নিশ্চয় তুমি হাত গুণতে জানো, নইলে সৌভাগ্যের এতবড় সত্যি কথা তখন বলেছিলে কি করে!

ভারতী ইহার উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া তিনি পুনশ্চ কথা কহিলেন। এবার কোথা দিয়া যেন কণ্ঠস্বরে তাঁহার অপরূপ সুর মিশিল, বলিলেন, সে-রাত্রে সুমিত্রার কথা যখন বলছিলে, ভারতী, আমি জবাব দিতে পারিনি। এ পথের পথিক নই আমি, তবু তোমার মুখের সুমিত্রার কাহিনীতে গায়ে আমার বার বার কাঁটা দিয়ে উঠেছিলো! দুনিয়া ঘুরে অনেক বস্তুরই হদিস পেয়েছি, পেলাম না শুধু এই নর-নারীর প্রেমের তত্ত্ব! দিদি অসম্ভব বলে শব্দটা বোধ হয় সংসারে কেবল এদেরই অভিধানে লেখে না।

এ কথায় ভারতী লেশমাত্র ঔৎসুক প্রাকশ করিল না। উদাস-নিস্পৃহ স্বরে বলিল, তোমার বাক্যই সত্য হোক, দাদা, ও শব্দটা তোমাদের অভিধান থেকে যেন মুছে যায়। সুমিত্রাদিদির অদৃষ্ট যেন একদিন প্রসন্ন হয়। একটুখানি থামিয়া বলিল, আমি অনেক ভেবে দেখেছি,

আমার নিজের কিন্তু ওতে আর আনন্দ নেই, ও আমি আর কামনাও করিনে। এই বলিয়া সে পুনরায় ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, অপূর্ববাবুকে আমি যথার্থই ভালবাসি! ভাল হোক, মন্দ হোক, তাঁকে আর আমি ভুলতে পারবো না। কিন্তু তাই বলে তাঁর স্ত্রী হয়ে তাঁর ঘর সংসারে না করতে পেলেই জীবন আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে কিসের জন্যে? এ আমার শোকের কথা নয় দাদা, তোমাকে অকপটে যথার্থই বলচি আমাকে তুমি শান্তমনে আশীর্বাদ করে পথ দেখিয়ে দিয়ে যাও,—তোমার মত আমিও পরের কাজেই এ জন্মটা আমার সার্থক করে তুলব। নাও না দাদা, তোমার নিরাশ্রয় ছোট বোনটিকে সাথী করে!

ডাক্তার নিঃশব্দে তরী বাহিয়া চলিলেন, এতবড় সনির্বন্ধ অনুরোধের উত্তর দিলেন না। অন্ধকারে তাঁহার মুখের চেহারা ভারতী দেখিতে পাইল না, সে এই নীরবতায় আশান্বিতা হইয়া উঠিল। এবার তাহার কণ্ঠস্বরে সস্নেহ-অনুনয়ের নিবিড় বেদনা যেন উপচিয়া পড়িল, বলিল, নেবে দাদা সঙ্গে? তুমি ছাড়া এ আঁধারে যে একফোঁটা আলোও আর কোথাও দেখতে পাইনে!

ডাক্তার ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন, অসম্ভব ভারতী। তোমার কথায় আজ আমার জোয়াকে মনে পড়ে ; তোমারই মত তার অমূল্য জীবন অকারণে নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই, কিন্তু মানবজীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য আর নেই এমন ভুলও আমার কোন দিন হয়নি। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই ত স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা? এর জন্যে তোমাকে আমি হত্যা করতে পারব না বোন, তোমার মধ্যে যে হৃদয় স্নেহে, প্রেমে, করুণায়, মাধুর্যে এমন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সে আমার প্রয়োজনকে অতিক্রম করে বহু উর্ধে চলে গেছে,—তার নাগাল আমি হাত বাড়িয়ে পাবো

ভারতী সর্বাঙ্গ পুলকে কন্টকিত হইয়া উঠিল। সব্যসাচীর গভীর অন্তরের একটা অপরূপ মূর্তি সে যেন সহসা চক্ষে দেখিতে পাইল। ভক্তি ও আনন্দে বিগলিত হইয়া কহিল, আমিও ত তাই ভাবি দাদা, তোমার অজানা সংসারে কি আছে! আর তাই যদি হলো, কি হেতু তুমি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে আছো? দেশে-বিদেশে গুপ্ত-সমিতি সৃষ্টি করে বেড়ানো তোমার কিসের জন্যে? মানবের চরম কল্যাণ ত কোন দিনই এর মধ্যে থেকে হতে পারবে না।

ডাক্তার বলিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু চরম কল্যাণের ভার আমরা বিধাতার হাতে ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদ্র মানবের সাধ্যের মধ্যে যে সামান্য কল্যাণ তারই চেষ্টাতে নিযুক্ত আছি। নিজের দেশের মধ্য স্বাধীনভাবে কথা কওয়া, স্বাধীনভাবে চলে-ফিরে বেড়ানোর অতি তুচ্ছ অধিকার,—এর অধিক সম্প্রতি আর আমরা কিছুই চাইনে, ভারতী।

ভারতী কহিল, সে ত সবাই চায়, দাদা। কিন্তু তার জন্যে নরহত্যার ষড়যন্ত্র কিসের জন্যে বল ত? কি তার প্রয়োজন? কিন্তু কথাটা উচ্চারণ করিয়া ফেলিয়া সে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। কারণ, এ অভিযোগ শুধু রূঢ় নয়, অসত্য!

তৎক্ষণাৎ অনুতপ্তচিত্তে কহিল, আমাকে মাপ কর দাদা, এ মিথ্যে আমি শুধু রাগের ওপরেই বলে ফেলেছি। আমাকে তুমি ফেলে চলে যাবে—এ যেন আমি ভাবতেই পারচি নে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, তা আমি জানি।

ইহার পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত আর কোন কথাবার্তা হইল না। এই সময়ে কিছুদিন হইতে 'স্বদেশী' আন্দোলন ভারতবর্ষব্যাপী হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তিভাজন নেতৃবৃন্দ দেশোদ্ধার-কল্পে আইন বাঁচাইয়া যে-সকল জ্বালাময়ী বক্তৃতা অবকাশ মত দিয়া বেড়াইতেছিলেন তাহারই সারাংশ সংবাদপত্র-স্তম্ভে মাঝে মাঝে পাঠ করিয়া ভারতী সশ্রদ্ধবিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠিত। বিগত রাত্রে এমনি ধারা কি একটা রোমাঞ্চকর রচনা খবরের কাগজে পাঠ করিয়া অবধি তাহার মনের মধ্যে উত্তেজনার তপ্ত বাতাস সারাদিন ধরিয়া আজ বহিয়া

ফিরিতেছিল। তাহাই স্মরণ করিয়া কহিল, আমি জানি ইংরাজ রাজত্বে তোমার স্থান নেই। কিন্তু সমস্ত দুনিয়াই ত তাদের নয়। সেখানে গিয়ে তোমরা ত সরল, প্রকাশ্যভাবেই তোমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করতে পারো।

প্রশ্ন করিয়া ভারতী উত্তরের আশায় কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, অন্ধকারে তোমার মুখ দেখতে পাচ্চিনে বটে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারচি মনে মনে তুমি হাসচো। কিন্তু, তুমি এবং তোমার বিভিন্ন দলগুলিই ত শুধু নয়, আরও যাঁরা দেশের কাজে,—তাঁরা প্রবীণ, বিজ্ঞ, রাজনীতিতে যাঁরা,—আচ্ছা দাদা, কালকের বাংলা খবরের কাগজটা—

বক্তব্য শেষ হইল না, ডাক্তার হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, রক্ষে কর ভারতী আমাদের সঙ্গে তুলনা করে পূজনীয়গণের অমর্যাদা করো না।

ভারতী কহিল, বরঞ্চ, তুমিই তাঁদের বিদ্রূপ করচ।

ডাক্তার সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, মোটে না। তাঁদের আমি ভক্তি করি, এবং তাঁদের দেশোদ্ধারের বক্তৃতা আমাদের চেয়ে সংসারে কেউ বেশী উপভোগ করে না।

ভারতী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, পথ তোমাদের এক না হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য ত একই।

ডাক্তার ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিলেন, এতক্ষণ হাসছিলাম সত্যি, এবার কিন্তু রাগ করব ভারতী। পথ আমাদের এক নয় এটা জানা কথা, কিন্তু লক্ষ্য যে আমাদের তার চেয়েও অধিক স্বতন্ত্র এ কি তুমিও এতদিন বোঝনি? পৃথিবীর বহুজাতিই স্বাধীন,—তার চেয়ে বড় গৌরব মানব-জন্মের আর নেই, সেই স্বাধীনতারদাবী করা, চেষ্টা করা ত ঢের দূরের কথা, তার কামনা করা, কল্পনা করাও ইংরাজের আইনে ভারতবাসীর রাজদ্রোহ। আমি সেই অপরাধেই অপরাধী! চিরদিন পরাধীন থাকাটাই এ দেশের আইন। সুতরাং, আইনের বাইরে এই-সব প্রবীণ পূজ্য ব্যক্তিরা ত কোন দিন কোন-কিছুই দাবী করেন না। চীনাদের দেশে মাঞ্চু রাজাদের মত এদেশেও যদি ইংরাজ আইন করে দিত—সবাইকে আড়াই হাত টিকি রাখতে হবে, তবে টিকির বিরুদ্ধে এঁরা কোনমতেই বে-আইনী প্রার্থনা করতেন না। এঁরা এই বলে আন্দোলন করতেন যে, আড়াই হাত আইনের দ্বারা দেশের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হয়েচে, এতে দেশের সর্বনাশ হয়ে যাবে, অতএব, একে সওয়া দু'হাত করে দেওয়া হোক! এই বলিয়া তিনি নিজের রসিকতার উৎফুল্ল হইয়া অকস্মাৎ অট্টহাস্যে নদীর অন্ধকার নীরবতা বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিলেন।

হাসি থামিলে ভারতী কহিল, তুমি যাই কেন না বল, তাঁরাও যে দেশের নমস্য ন'ন এ কথা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারব না। আমি সকলের কথাই বলচি নে, কিন্তু সত্য সত্যই যাঁরা রাষ্ট্রনীতিবিদ—যথার্থই যাঁরা দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাদের সকল শ্রমই ব্যর্থশ্রম, এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করা কঠিন। মত এবং পথ বিভিন্ন বলেই কাউকে ব্যঙ্গ করা সাজে না।

তাহার কণ্ঠস্বরের গাম্ভীর্য উপলব্ধি করিয়া ডাক্তার চুপ করিলেন। পিছন হইতে একটা স্টিম লঞ্চ যথেষ্ট শব্দ-সাড়া করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র তরণীকে রীতিমত দোল দিয়া বাহির হইয়া গেলে সব্যসাচী ধীরে ধীরে বলিলেন, ভারতী, তোমাকে ব্যথা দেওয়াও আমার উদ্দেশ্য নয়, তোমার নমস্যগণকে উপহাস করাও আমার অভিপ্রায় নয়। তাঁদের রাজনীতিবিদ্যায় পাণ্ডিত্য সম্বন্ধেও আমার ভক্তি কম নেই, কিন্তু কি জানো দিদি, গৃহস্থ গরুকে যখন খাটো করে বাঁধে, তখন তার সেই ছোট্ট দড়িটুকুর মধ্যে নীতি একটিমাত্রই থাকে। আমি সেইটুকু মাত্রই জানি। গরুর একান্ত নাগালের বাইরে খাদ্যবস্তুর প্রতি প্রাণপণে গলা এবং জিভ বাড়িয়ে লেহন করার চেষ্টায় মধ্যে অবৈধতা কিছুমাত্র নেই, এমন কি অত্যন্ত আইনসঙ্গত। উৎসাহ দেবার মত হৃদয় থাকলে দিতেও পারো, রাজার নিষেধ নেই, কিন্তু বৃষের এই আন্তরিক প্রবল উদ্যম বাইরে থেকে যারা দেখে, তাদের পক্ষে হাস্য সংবরণ করা কঠিন।

ভারতী হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, দাদা, তুমি ভারী দুষ্টু। বলিয়াই আপনাকে সংযত করিয়া কহিল, কিন্তু এ আমি ভেবে পাইনে, প্রাণ যার অহর্নিশি সরু সুতোয় ঝুলচে সে কি করে

হাসি-তামাশা করে পরের কথা নিয়ে।

ডাক্তার সহজকণ্ঠে বলিলেন, তার কারণ, এ সমস্যার মীমাংসা পূর্বেই হয়ে গেছে ভারতী, যেদিন বিপ্লবের কাজে যোগ দিয়েছি। আর আমার ভাববারও নেই, নালিশ করবারও নেই। আমি জানি, আমাকে হাতে পেয়েও যে রাজশক্তি ছেড়ে দেয়, হয় সে অক্ষম উন্মাদ, নয় তার ফাঁসি দেবার দড়িটুকু পর্যন্ত নেই।

ভারতী বলিল, তাইত আমি তোমার সঙ্গে থাকতে চাই দাদা। আমি উপস্থিত থাকতে তোমার প্রাণ নিতে পারে সংসারে এমন কেউ নেই। এ আমি কোনমতেই হতে দেব না। বলিতে বলিতেই গলা তাহার চক্ষের পলকে ভারী হইয়া আসিল।

ডাক্তার টের পাইলেন। নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, নৌকায় জোয়ার লেগেছে ভারতী পৌঁছতে আর আমাদের দেরি হবে না।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু কহিল, মরুক গে। কিছুই আমার ভাল লাগচে না। মিনিট-দুই পরে জিজ্ঞাসা করিল, এতবড় রাজশক্তিকে তোমরা গায়ের জোরে টলাতে পারো একি তুমি সত্যিই বিশ্বাস কর দাদা?

দ্বিধাহীন উত্তর আসিল, করি, এবং সমস্ত মন দিয়ে করি। এতবড় বিশ্বাস না থাকলে এতবড় ব্রত আমার অনেকদিন পূর্বেই ভেঙ্গে যেত।

ভারতী বলিল, তাই বোধ হয় ধীরে ধীরে তোমার কাজ থেকে আমাকে বার করে দিচ্ছ,—না দাদা?

ডাক্তার স্মিতহাস্যে বলিলেন, না, তা নয় ভারতী। কিন্তু, বিশ্বাসই ত শক্তি, বিশ্বাস না থাকলে সংশয়ে যে কর্তব্য তোমার পদে পদে ভারাতুর হয় উঠবে। সংসারে তোমার অন্য কাজ আছে বোন—কল্যাণকর, শান্তিময় পথ, যা তুমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস কর,—তাই তুমি কর গে।

অপরিসীম স্নেহবশেই যে এই লোকটি তাহার একান্ত বিপদসঙ্কুল বিপ্লব-পন্থা হইতে তাহাকে দূরে অপসারিত করিতে চাহিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করিয়া ভারতীর সজল চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল। অলক্ষ্যে, অন্ধকারে ধীরে ধীরে মুছিয়া বলিল, দাদা, আমার কথায় কিন্তু রাগ করতে পাবে না। এতবড় রাজশক্তি, কত সৈন্যবল, কত উপকরণ, যুদ্ধের কত বিচিত্র ভয়ানক আয়োজন, তার কাছে তোমার শক্তিপরীক্ষা করতে চাও কোন্ যুক্তিতে? প্রাণ দিতে চাও দাও গে—কিন্তু এতবড় পাগলামি আমি ত সংসারে আর দ্বিতীয় দেখতে পাইনে। তুমি বলবে, তবে কি দেশের উদ্ধার হবে না? প্রাণের ভয়ে সরে দাঁড়াবো? কিন্তু তা আমি বলিনে। তোমার কাছে থেকে, তোমার চরিত্র হতে জননী জন্মভূমি যে কি সে আমি চিনেছি। তাঁর পদতলে সর্বস্ব দিতে পারার চেয়ে বড় সার্থকতা মানুষের যে আর নেই তোমাকে দেখে এ কথা যদি না আজও শিখতে পেরে থাকি ত আমার চেয়ে অধম নারী জন্মে কেউ জন্মায় নি। কিন্তু নিছক আত্মহত্যা করেই কোন্ দেশ কবে স্বাধীন হয়েছে? কোন মতে তোমার ভারতী যে কেবল বেঁচে থাকতেই চায় এতবড় ভুল ধারণা করেও আমার সম্বন্ধে তুমি রেখো না দাদা।

ডাক্তার নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই ত!

তাইত কি?

তোমার সম্বন্ধে ভুলই হয়েছে বটে। এই বলিয়া ডাক্তার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া কহিলেন, বিপ্লব মানেই, ভারতী কাটাকাটি রক্তারক্তি নয়। বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন। সৈন্যবল, বিরাট যুদ্ধোপকরণ, এ সবই আমি জানি। কিন্তু শক্তি পরীক্ষা ত আমাদের লক্ষ্য নয়। আজ যারা শত্রু, কাল তারা বন্ধু হতেও ত পারে। নীলকান্ত শক্তি পরীক্ষা করতে যায়নি, তাদের মিত্র করতে গিয়েই প্রাণ দিয়েছিল। হায় রে নীলকান্ত! কেবা তার নাম জানে!

অন্ধকারেও ভারতী স্পষ্ট বুঝিতে পারিল দেশের বাহিরে, দেশের কাজে, যে ছেলেটি লোকচক্ষুর অগোচরে নিঃশব্দে প্রাণ দিয়েছে তাহাকে স্মরণ করিয়া এই নির্বিকার পরমসংযত

মানুষটির গভীর হৃদয় ক্ষণিকের জন্য আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। অকস্মাৎ যেন তিনি সোজা হইয়া উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, কি বলছিলে ভারতী, গোষ্পদ? তাই হবে হয়ত। কিন্তু যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জনপদ ভস্মসাৎ করে ফেলে, আয়তনে সে কতটুকু জানো? শহর যখন পোড়ে সে আপনার ইন্ধন আপনি সংগ্রহ করে দগ্ধ হয়। তার ছাই হবার উপকরণ তারই মধ্যে সঞ্চিত থাকে, বিশ্ববিধানের এ নিয়ম কোন রাজশক্তিই কোনদিন ব্যতায় করতে পারে না।

ভারতী বলিল, দাদা, তোমার কথা শুনলে গা কাঁপে। রাজশক্তিকে যে তুমি দগ্ধ করতে চাও, তার ইন্ধন ত আমাদেরই দেশের লোক। এতবড় লঙ্কাকাণ্ডের কল্পনায় কি তোমার মনে করুণাও জাগে না?

প্রত্যুত্তরে লেশমাত্র দ্বিধা নাই, ডাক্তার স্বচ্ছন্দে কহিলেন, না। প্রয়শ্চিত্ত কথাটা কি শুধু মুখেরই কথা? পূর্ব-পিতামহগণের যুগান্তসঞ্চিত পাপের অপরিমেয় স্তূপ নিঃশেষ হবে কিসে বলতে পারো? করুণার চেয়ে ন্যায়ধর্ম ঢের বড় বস্তু, ভারতী।

ভারতী ব্যথা পাইয়া বলিল, এ তোমার সেই পুরানো কথা দাদা। ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গে তুমি যে কত নিষ্ঠুর হতে পারো তা যেন আমি ভাবতেই পারিনে। রক্তপাত ছাড়া আর কিছু যেন মনে তোমার জাগতেই পায় না। রক্তপাতের জবাব যদি রক্তপাতই হয়, তা হলে তারও ত জবাব রক্তপাত? এবং তারও ত জবাবে এই একই রক্তপাত ছাড়া আর কিছু মেলে না। এ প্রশ্নোত্তর ত সেই আদিম কাল থেকে হয়ে আসচে। তবে কি মানবের সভ্যতা এর চেয়ে বড় উত্তর কোন দিন দিতে পারবে না? দেশ গেছে, কিন্তু তার চেয়েও যে বড় সেই মানুষ ত আজও আছে। মানুষে মানুষে কি হানাহানি না করে কোনমতেই পাশাপাশি বাস করতে পারে না?

ডাক্তার কহিলেন, ইংরাজের একজন বড় কবি বলেছেন, পশ্চিম ও পূর্ব কোনদিনই মিলতে মিশতে পারে না।

ভারতী রুষ্ট হইয়া কহিল, ছাই কবি। বলুক গে সে। তুমি পরম জ্ঞানী, তোমাকে অনেকবার জিজ্ঞেসা করেচি, আজও জিজ্ঞেসা করচি, হোক তারা পশ্চিমের, হোক তারা ইউরোপের মানুষ, দাদা, তবু ত মানুষ? মানুষের সঙ্গে মানুষে কি কিছুতেই বন্ধুত্ব করতে পারে না? দাদা, আমি ক্রীশ্চান, ইংরাজের কাছে আমি বহু ঋণী, তাদের অনেক সদ্‌গুণ আমি নিজের চোখে দেখেচি,—তাদের এত মন্দ ভাবতে আমার বুকে শূল বেঁধে। কিন্তু আমাকে তুমি ভুল বুঝো না দাদা, আমি বাঙালী ঘরেরই মেয়ে,—তোমারই বোন। বাঙলার মাটি, বাঙলার মানুষকে আমি প্রাণাধিক ভালবাসি। কে জানে, যে জীবন তুমি বেছে নিয়েছ, হয়ত আজই আমাদের শেষ দেখা। আজ আমাকে তুমি শান্তমনে এই জবাবটি দিয়ে যাও, যেন এরই দিকে চোখ রেখে আমি সারা জীবন মুখ তুলে সোজা চলে যেতে পারি। বলিতে বলিতে শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর কান্নার ভারে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ডাক্তার নীরবে তরী বাহিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া ভারতীর মনে হইল, বোধ হয় তিনি ইহার উত্তর দিতে চান না। সে হাত বাড়াইয়া নদীর জলে চোখ-মুখ ধুইয়া ফেলিল, অঞ্চল দিয়ে বার বার ভাল করিয়া মুছিয়া পুনরায় কি একটা প্রশ্ন করিতেছিল, ডাক্তার কথা কহিলেন। স্নিগ্ধ মৃদুকণ্ঠ, কোথাও লেশমাত্র উত্তেজনা বা বিদ্বেষের আভাস নাই,—যেন কাহার কথা কে বলিতেছে এমনি শান্ত সহজ। ভারতীর সেই প্রথম পরিচয়-দিনের স্কুলের নিরীহ নির্বোধ মাস্টার মহাশয়টিকে মনে পড়িল। অশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণ, ব্যাকরণও তেমনি, —ভারতী কষ্টে হাসি চাপিয়া আলাপ করিয়াছিল। পরে তাই লইয়া রাগ করিয়া সে ডাক্তারকে অনেক দিন অনেক তিরস্কার করিয়াছে। সেই, নিরুৎসুক নিঃস্পৃহকণ্ঠে কহিলেন, এক রকমের সাপ আছে, ভারতী, তারা সাপ খেয়েই জীবনধারণ করে। দেখেচ?

ভারতী বলিল, না দেখিনি, শুনেচি।

ডাক্তার বলিলেন, পশুশালায় আছে। এবার কলকাতায় গিয়ে অপূর্বকে হুকুম করো, সে

দেখিয়ে আনবে।

বার বার ঠাট্টা করো না দাদা, ভাল হবে না বলচি।

না, ভাল হবে না আমিও তাই বলচি। পাশাপাশি বাস করাটা ঠিক ঘটে ওঠে না বটে, কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠভাবে একজনের জঠরের মধ্যে আর একজন বেশ নিরাপদেই স্থান পায়! বিশ্বাস না হয় জু'র অধ্যক্ষকে জিজ্ঞেসা করে দেখো।

ভারতী চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার বলিলেন, তুমি তাদের সমধর্মাবলম্বী, তাদের কাছে অশেষ ঋণে ঋণী, তাদের অনেক সদ্‌গুণ চোখে দেখেচ,—দেখব তাদের বিশ্বগ্রাসী বিরাট ক্ষুধার পরিমাণ? এ দেশের মালিক তারা,—মালিকানার তারিখ মনে আছে ত? আজ ব্রিটিশ-সম্পদের তুলনা হয় না। কত জাহাজ, কত কল-কারখানা, কত শত-সহস্র ইমারত। মানুষ মারবার উপকরণ-আয়োজনের আর অন্তত নেই। তার সমস্ত অভাব, সর্বপ্রকার প্রয়োজন মিটিয়েও ইংরেজ ১৮১০ সাল থেকে সত্তর বছরের মধ্যে কেবল বাইরে দিয়েছিল ঋণ তিন হাজার কোটি টাকা! জানো এই বিরাট ঐশ্বর্যের উৎস কোথায়? আপনাকে তুমি বাঙলা দেশের মেয়ে বলছিলে, না? বাঙলার মাটি, বাঙলার জলবায়ু, বাঙলার মানুষ তোমার প্রাণাধিক প্রিয়, না? এই বাঙলার দশ লক্ষ নর-নারী প্রতি বৎসরে শুধু ম্যালেরিয়া জ্বরে মরে। এক-একটা যুদ্ধজাহাজের দাম জানো? এর একটার খরচে কেবল দশ লক্ষ মায়ের চোখের জল চিরদিনের তরে মোছানো যায়। ভেবেছ কখনো এ কথা? দেখেচ কখনো বুকের মধ্যে মায়ের মূর্তি? শিল্প গেল, বাণিজ্য গেল, ধর্ম গেল, জ্ঞান গেল,—নদীর বুক বুজে মরুভূমি হয়ে উঠছে, চাষা পেট পুরে খেতে পায় না, শিল্পী বিদেশীর দুয়ারে মজুরি করে,—দেশে জল নেই, অন্ন নেই, গৃহস্থের সর্বোত্তম সম্পদ সে গোধন নেই,—দুধের অভাবে শিশুদের শুকিয়ে মরতে দেখেচ ভারতী?

ভারতী চীৎকার করিয়া থামাইতে চাহিল, কিন্তু গলা দিয়া তাহার শুধু একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

সব্যসাচীর সেই ধীর সংযত কণ্ঠস্বর কোন্ একসময়ে অন্তর্হিত হইয়াছিল, বলিলেন, তুমি ক্রীশ্চান, মনে পড়ে একদিন কৌতূহলবশে উইরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার স্বরূপ জানতে চেয়েছিলে? সেদিন ব্যথা দেবার ভয়ে বলিনি, কিন্তু আজ তার উত্তর দেব। তোমাদের কেতাবে কি আছে জানিনে, শুনেচি ভাল কথা ঢের আছে, কিন্তু বহুদিন একসঙ্গে বসবাস করে এর সত্যকার চেহারা আর আমার এতটুকু অগোচর নেই। লজ্জাহীন উলঙ্গ স্বার্থ এবং পশু-শক্তির একান্ত প্রধান্যই এর মূলমন্ত্র। সভ্যতার নাম দিয়ে দুর্বল, অক্ষমের বিরুদ্ধে এতবড় মুষল মানুষের বুদ্ধি আর ইতিপূর্বে আবিষ্কার করেনি। পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখ, ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা থেকে কোন দুর্বল জাতিই আজ আর আত্মরক্ষা করতে পারেনি। দেশের মাটি, দেশের সম্পদ থেকে দেশের ছেলেরা বঞ্চিত হয়েছে কোন্ অপরাধে জানো ভারতী? একমাত্র শক্তিহীনতার অপরাধে। অথচ ন্যায়ধর্মই সকলের বড়, এবং বিজিতের অশেষ কল্যাণের জন্যেই এই অধীনতার শৃঙ্খল তার পায়ে পরিয়ে সেই পঙ্গুর সর্বপ্রকার দায়িত্ব বহন করাই ইউরোপীয় সভ্যতার চরম কর্তব্য,—এই পরম অসত্য লেখায়, বক্তৃতায়, মিশনারির ধর্মপ্রচারে, ছেলেদের পাঠ্যপুস্তকে অবিশ্রান্ত প্রচার করাই তোমাদের ক্রীশ্চান সভ্যতার রাজনীতি।

ভারতী মিশনারির হাতে মানুষ, অনেকের মহৎ-চরিত্র সে যথার্থই চোখে দেখিয়াছে; বিশেষতঃ তাহার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি এইরূপ অহেতুক আক্রমণে সে ব্যথা পাইয়া বলিল, দাদা, যে-জন্যই হোক তোমার শান্ত-বুদ্ধি আজ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। ক্রীশ্চান-ধর্ম প্রচার করতে যাঁরা এদেশে এসেছেন তাঁদের সম্বন্ধে তোমার চেয়ে আমি ঢের বেশী জানি। তাঁদের প্রতি তুমি আজ নিরপেক্ষ সুবিচার করতে পারছ না। ইউরোপীয় সভ্যতা কি তোমাদের কোন ভাল করেনি? সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন চড়কের সময়ে পিঠ-ফোঁড়া, সন্ন্যাসীদের খাঁড়ার

ওপর লাফানো, ডাকাতি, ঠগি, বর্গির হাঙ্গামা, গোঁড় ও খাসিয়াদের আষাঢ়ের নরবলি,—আর যে মনে পড়ছে না ভারতী—

ভারতী কথা কহিল না।

ডাক্তার বলিলেন, রসো, আরও দুটো স্মরণ হয়েছে। বাদশাদের আমলে গৃহস্থের বৌ-ঝি ঘরে রাখা যেত না,—নবাবেরা মেয়েদের পেট চিরে ছেলে-মেয়ে দেখত,—হায় রে হায়, এমনি করেই বিদেশীর লেখা ইতিহাস সামান্য এবং তুচ্ছ বস্তুকে বিপুল, বিরাট তৈরী করে দেশের প্রতি দেশের লোকের চিত্ত বিমুখ করে দিয়েছে। মনে আছে আমার ছেলেবেলায় স্কুলের পড়ার বইয়ে একবার পড়েছিলাম, বিলেতে বসে আমাদের কল্যাণ ভেবে ভেবেই কেবল রাজমন্ত্রীর চোখের নিদ্রা এবং মুখের অন্ন বিস্বাদ হয়ে গেছে। এই সত্য ছেলেদের কণ্ঠস্থ করতে হয়, এবং উদরান্নের দায়ে শিক্ষকদের কণ্ঠস্থ করাতে হয়। সভ্য রাজ্যতন্ত্রের এই রাজনীতি ভারতী। আজ অপূর্বকে দোষ দেওয়া বৃথা।

অপূর্বর লাঞ্ছনায় মনে মনে ভারতী লজ্জিত হইল, রুষ্ট হইল। কহিল, তুমি যা বলচ তা সত্য হতে পারে, হয়ত, কোথাও কেউ অতিভক্ত রাজকর্মচারী এমনিই করেছে, কিন্তু এতবড় সাম্রাজ্যের অসত্যই কখনো মূলনীতি হতে পারে না। এর ওপরে ভিত্তি করে এই বিপুল প্রতিষ্ঠান একটা দিনের তরেও স্থির থাকতে পারে না। তুমি বলবে কালের পরিমাণে এ ক'টা দিন? এমনি সাম্রাজ্য ত ইতিপূর্বেও ছিল সে কি চিরস্থায়ী হয়েছে? তোমার কথা যদি যথার্থ হয়, এও চিরস্থায়ী হবে না। কিন্তু, এই শৃঙ্খলাবদ্ধ, সুনিয়ন্ত্রিত রাজ্য,—যত নিন্দেই কর না কেন,—এর ঐক্য, এর শান্তি থেকে কি কোন শুভ লাভই হয়নি? প্রতীচ্যের সভ্যতার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কি কোন হেতুই পাওনি? স্বাধীনতা তোমরা ত বহুদিন হারিয়েছ, ইতিমধ্যে রাজশক্তির পরিবর্তন হয়েছে সত্য, কিন্তু তোমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ত হয়নি। ক্রীশ্চান বলে আমাকে তুমি উলটো বুঝো না দাদা, কিন্তু নিজেদের সমস্ত অপরাধ বিদেশীর মাথায় তুলে দিয়ে গ্লানি করাই যদি তোমার স্বদেশপ্রেমের আদর্শ হয়, সে আদর্শ তোমার হাত থেকেও আমি নিতে পারব না। এত বিদ্বেষ হৃদয়ের মধ্যে পুরে তুমি ইংরাজের ক্ষতি হয়ত করতেও পারো, কিন্তু তাতে ভারতবাসীর কল্যাণ হবে না এ সত্য নিশ্চয় জেনো।

তাহার সহসা উচ্ছ্বসিত তীক্ষ্ণস্বর নিস্তব্ধ নদীবক্ষে আহত হইয়া সব্যসাচীর কানে পশিয়া তাঁহাকে চমকিত করিয়া দিল। ভারতীর এই রূপ অপরিচিত, এ মনোভাব অপ্রত্যাশিত। তথাপি যে ধর্ম-বিশ্বাস ও সভ্যতার ঘনিষ্ঠ প্রভাবের মধ্যে সে বালিকা বয়স হইতে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই আঘাতে চঞ্চল ও অসহিষ্ণু হইয়া সে এই যে নির্ভীক প্রতিবাদ করিয়া বসিল, তাহা যত কঠিন ও প্রতিকূল হউক, সব্যসাচীর চক্ষে তাহাকে যেন নব-মর্যদা দান করিল।

তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ভারতী বলিল, কৈ জবাব দিলে না দাদা? এতবড় হিংসের আগুন বুকের মধ্যে জ্বালিয়ে তুমি আর যাই কর দেশের ভালো করতে পারবে না।

ডাক্তার কহিলেন, তোমাকে ত অনেকবার বলেছি দেশের ভালো যাঁরা করবেন তাঁরা চাঁদা তুলে দিকে দিকে অনাথ-আশ্রম, ব্রহ্মাচর্যাশ্রম, বেদান্ত-আশ্রম, দরিদ্র-ভাণ্ডার প্রভৃতি নানা হিতকর কার্য করছেন, মহৎ লোক তাঁরা, আমি তাঁদের ভক্তি করি,—কিন্তু, দেশের ভালো করার ভার আমি নিইনি, আমি স্বাধীন করার ভার নিয়েছি। একটুখানি থামিয়া বলিলেন, আমার বুকের আগুন নেভে শুধু দুটো জিনিস দিয়ে। এক নিজের চিতাভস্মে, আর নেভে যেদিন শুনবো ইউরোপের ধর্ম, সভ্যতা, নীতি, সমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবছে।

ভারতী স্তব্ধ হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, এই বিষকুম্ভের পরিপূর্ণ সওদা নিয়ে সমুদ্র পার হয়ে ইয়োরোপ যখন প্রথম বেসাতি করতে এসেছিল, তখন চিনতে পেরেছিল কেবল জাপান। তাই আজ তার এত সৌভাগ্য, তাই আজ সে ইউরোপের সমকক্ষ সম্ভ্রান্ত মিতা। কিন্তু চিনতে পারেনি ভারত, চিনতে পারেনি চীন। তখন স্পেনের রাজ্য পৃথিবীময়, ক্ষুদ্র জাপান স্পেনের এক নাবিককে জিজ্ঞাসা করে, এত রাজ্য হল তোমাদের কি করে? নাবিক বললে,

অতি সহজে, যে দেশ আত্মসাৎ করতে চাই, সেখানে নিয়ে যাই প্রথমে মাল হাতে পায়ে পড়ে ব্যবসার জন্যে দেশের রাজার কাছে চেয়ে নিই এক-ফোঁটা জমি। তার পরে আনি মিশনারি, তারা যত না করে ক্রীশ্চান, তার বেশী করে সেদেশের ধর্মকে গালিগালাজ। লোকে ক্ষেপে উঠে হঠাৎ ফেলে দু-একটাকে মেরে। তখন আসে আমাদের কামান-বন্দুক, আসে আমাদের সৈন্যসামন্ত। আমাদের সভ্য দেশের মানুষ-মারা কল যে অসভ্য দেশের চেয়ে কত শ্রেষ্ঠ তা অচিরে প্রমাণিত করে দিই! শুনে জাপান বললে, প্রভু! আপনারা তাহলে গা তুলুন, আপনাদের আর ব্যবসাতে কাজ নেই। এই বলে তাদের বিদায় দিয়ে নিজেদের দেশের মধ্যে আইন জারি করে দিলে,—চন্দ্র-সূর্য যত দিন উদয় হবে ক্রীশ্চান যেন না আর আমাদের দেশে পা দেয়। দিলে তার প্রাণদণ্ড।

তাহার ধর্ম ও ধর্মযাজকদের প্রতি এই তীক্ষ্ণ ইঙ্গিতে ভারতী বিষণ্ণ হইয়া বলিল এ কথা তোমার কাছে আমি পূর্বেও শুনেছি, কিন্তু যে জাপানীদের তুমি ভক্তি কর, তারা কি?

ডাক্তার কহিলেন, ভক্তি করি? মিছে কথা। ওদের আমি ঘৃণা করি। কোরিয়ানদের বার বার প্রতিশ্রুতি এবং অভয় দিয়েও বিনা দোষে, মিথ্যা অজুহাতে তাদের রাজাকে বন্দী করে ১৯১০ সালে যখন কোরিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে নিলে, তখন আমি সাংহাইয়ে। সে দিনের সে-সব অমানুষিক অত্যাচার ভোলবার নয়, ভারতী। আর অভয় কি শুধু একা জাপানই দিয়েছিল? ইয়োরোপও দিয়েছিল। শক্তিমানের বিরুদ্ধে ইংরাজ কথা কইলে না, বললে, অ্যাঙ্‌লো-জাপানী-সন্ধি-সূত্রে আমরা আবদ্ধ। এবং সেই কথাই আমেরিকা-যুক্তরাজ্যের সভাপতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বললেন, প্রতিশ্রুতি তা কি! যে অক্ষম, শক্তিহীন জাতি আত্মরক্ষা করতে পারে না তাদের রাজ্য যাবে না ত যাবে কাদের? ঠিকই হয়েছে! এখন আমরা যাবো তাদের উদ্ধার করতে? অসম্ভব! পাগলামি! এই বলিয়া সব্যসাচী একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিলেন, আমিও বলি ভারতী, —অসম্ভব, অসঙ্গত, পাগলামি। প্রবল দুর্বলের সম্পদ কেন ছিনিয়ে নেবে না, এ কথা যে সভ্য ইয়োরোপের নৈতিক-বুদ্ধি ভাবতেই পারে না।

ভারতী নির্বাক হইয়া রহিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, আঠারো শতাব্দের শেষের দিকে ব্রিটিশদূত লর্ড ম্যাকার্টনি এলেন চৈনিক দরবারে কিঞ্চিৎ ব্যবসার সুবিধে করে নিতে। মাঞ্চুরাজ শিন্‌লুঙ ছিলেন তখন সমস্ত চীনের সম্রাট, অত্যন্ত দয়ালু; দূতের বিনীত আবেদানে খুশী হয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, দেখ বাপু, আমাদের স্বর্গীয় সাম্রাজ্যে অভাব কিছুরই নেই, কিন্তু তুমি এসেছ অনেক দূর থেকে, অনেক দুঃখ সয়ে। আচ্ছা, ক্যান্টন শহরে ব্যবসা কর, স্থান দিচ্চি, তোমাদের ভাল হবে। রাজ-আশীর্বাদ নিষ্ফল হোলো না ভালই হোলো। পঞ্চাশ বছর পেরুল না, চীনের সঙ্গে ইংরাজের প্রথম যুদ্ধ বাধলো।

ভরতী বিস্মিত হইয়া কহিল, কেন দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, চীনেরই অন্যায়। বেয়াদপ হঠাৎ বলে বসলো আফিং খেয়ে চোখ-কান আমাদের বুজে গেল, বুদ্ধিশুদ্ধি আর নেই, দয়া করে ও-জিনিসটার আমদানি বন্ধ কর।

তারপরে?

তার পরের ইতিহাস খুব ছোট। বছর-দুয়ের মধ্যে পুনশ্চ আফিং খেতে রাজী হয়ে আরও পাঁচখানা বন্দরে শতকরা পাঁচ টাকা মাত্র শুল্কে বাণিজ্যের মঞ্জুরি-পরোয়ানা দিয়ে, এবং সর্বশেষে হংকং বন্দর দক্ষিণা প্রদান করে বেয়াল্লিশ সালে যজ্ঞ সমাধা হল। ঠিকই হয়েছে। এত সস্তায় আফিং পেয়েও যে মূর্খ খেতে আপত্তি করে তার এমনি প্রয়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত।

ভারতী বলিল, এ তোমার গল্প।

ডাক্তার কহিলেন, তা হোক, গল্পটা শুনতে ভালো। আর এই না দেখে ফ্রান্সের ফরাসী সভ্যতা বললে, আমার ত আফিং নেই, কিন্তু, খাসা মানুষ-মারা কল আছে। অতএব, যুদ্ধং দেহি হল যুদ্ধ। ফরাসী চীন-সাম্রাজ্যের আনাম প্রদেশটা কেড়ে নিলে। আর যুদ্ধের খরচা,

অধিকতর বাণিজ্যের সুবিধে, ট্রিটিপোর্ট ইত্যাদি ইত্যাদি—এ-সব তুচ্ছ কাহিনী থাক।

ভারতী কহিল, কিন্তু দাদা, তালি কি একহাতে বাজে? চীনের অন্যায় কি কিছু ছিল না?

ডাক্তার বলিলেন, থাকতে পারে। তবে তামাশা এই যে, ইউরোপীয় সভ্যতার অন্যায়-বোধটা অপরের ঘর-চড়াও হয়েই হয়, তাঁদের নিজেদের দেশের মধ্যে ঘটতে দেখা যায় না।

তারপরে?

বলচি। জার্মান সভ্যতা দেখলেন, বা রে বাঃ, এতো ভারী মজা! আমি যে ফাঁকে পড়ি। তিনি এক জাহাজ মিশনারি এনে লেলিয়ে দিলেন। ৯৭ সালে তাঁরা যখন তোমাদের প্রভু যিশুর মহিমা, শান্তি এবং ন্যায়ধর্ম প্রচারে ব্যাপৃত, তখন একদল চীনে ক্ষেপে উঠে পরম ধার্মিক জন-দুই প্রচারকের মুণ্ডু ফেললে কেটে। অন্যায়! চীনেরই অন্যায়। অতএব, গেল শ্যান্টঙ প্রদেশ জার্মানির উদর-বিবরে। তারপরে এল বক্সার-বিদ্রোহ। ইয়োরোপের সমস্ত সভ্যতা এক হয়ে তার যে প্রতিশোধ নিলে, হয়ত, কোথাও তার আর তুলনা নেই। তার অপরিমেয় খেসারতের ঋণ কতকালে যে চীনেরা শোধ দেবে তা যিশুখ্রীষ্টই জানেন। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ-সিংহ, জারের ভালুক, জাপানের সূর্যদেব,—কিন্তু আর না বোন, গলা আমার শুকিয়ে আসচে। দুঃখের তুলনায় একা আমরা ছাড়া বোধ হয় এদের আর সঙ্গী নেই। সম্রাট শিন্‌লুঙের নির্বাণ লাভ হোক, তাঁর আশীর্বাদের বহর আছে!

ভারতী মস্তবড় একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

ভারতী!

কি দাদা?

চুপচাপ যে?

তোমার গল্পের কথাটাই ভাবচি। আচ্ছা দাদা, এই জন্যেই কি চীনেদের দেশে তোমার কার্যক্ষেত্রে বেছে নিয়েছ? যারা শত অত্যাচারে জর্জরিত, তাদের উত্তেজিত করে তোলা কঠিন নয়, কিন্তু একটা কথা কি ভেবেচ? এই - সব নিরীহ, অজ্ঞান চাষাভূষোর দুঃখ এমনিই ত যথেষ্ট, তার ওপরে আবার কাটাকাটি রক্তারক্তি বাধিয়ে দিলে ত সে দুঃখের আর অবধি থাকবে না!

ডাক্তার কহিলেন, নিরীহ চাষাভূষোর জন্যে তোমার দুশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই ভারতী কোন দেশেই তারা স্বাধীনতার কাজে যোগ দেয় না। বরঞ্চ বাধা দেয়। তাদের উত্তেজিত করার মত পণ্ডশ্রমের সময় নেই আমার। আমার কারবার শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত, ভদ্র-সন্তানদের নিয়ে। কোনদিন যদি আমার কাজে যোগ দিতে চাও ভারতী, এ কথাটা ভুলো না। আইডিয়ার জন্যে প্রাণ দিতে পারার মত প্রাণ, শান্তিপ্রিয়, নির্বিরোধী, নিরীহ কৃষকের কাছে আশা করা বৃথা। তারা স্বাধীনতা চায় না, শান্তি চায়। যে শান্তি অক্ষম, অশক্তের, — সেই পঙ্গুর জড়ত্বই তাদের ঢের বেশী কামনার বস্তু।

ভারতী ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আমিও তাই চাই দাদা, আমাকে বরঞ্চ এই জড়ত্বের কাজেই তুমি নিযুক্ত করে দাও, তোমার পথের-দাবীর ষড়যন্ত্রের বাষ্পে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসচে।

সব্যসাচী হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা।

ভারতী থামিতে পারিল না, তেমনি ব্যগ্র উচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, ঐ একটা আচ্ছার বেশী আর কি তোমার কিছুই বলবার নেই দাদা?

কিন্তু আমরা যে এসে পড়েছি ভারতী, একটুখানি সাবধানে বসো দিদি, যেন আঘাত নালাগে—এই বলিয়া ডাক্তার ক্ষিপ্রহস্তে হাতের দাঁড় দিয়া ধাক্কা মারিয়া তাঁহার ছোট্ট নৌকাখানিকে অন্ধকার তীরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে নামাইতে নামাইতে বলিলেন, জলকাদা নেই বোন, কাঠ পাতা আছে, পা দাও।

অন্ধকারে অজানা ভূপৃষ্ঠে হঠাৎ পা ফেলিতে ভারতীর দ্বিধা হইল, কিন্তু পা দিয়া সে

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, দাদা, তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করার মত নির্বিঘ্ন স্বস্তি আর নেই!

কিন্তু অপর পক্ষ হইতে এ মন্তব্যের উত্তর আসিল না। উভয়ে অন্ধকারে কিছুদূর অগ্রসর হইলে ডাক্তার বিস্ময়ের কণ্ঠে কহিলেন, কিন্তু ব্যাপার কি বলত? এ কি বিয়েবাড়ি? না আছে আলো, না আছে চীৎকার, না শোনা যায় বেহালার সুর, — কোথাও গেল নাকি এরা?

আরও কিছুদূর আসিয়া চোখে পড়িল সিঁড়ির উপরের সেই চিত্র - বিচিত্র কাগজের লণ্ঠন। ভারতী আশ্বস্ত হইয়া কহিল, ঐ যে সেই চীনে - আলো। এর মধ্যেই খরচের হুঁশিয়ারিটা শশী-তারার দেখবার বস্তু, দাদা। এই বলিয়া সে হাসিল।

দু'জনে সিঁড়ি বাহিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিতেই খোলা দরজার সম্মুখে প্রথমেই চোখে পড়িল, — শশী মন দিয়া কি একখানা কাগজ পড়িতেছে। ভারতী আনন্দিত কলকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, শশীবাবু, এই যে আমরা এসে পড়েছি, — খাবার বন্দোবস্ত করুন, নবতারা কৈ? নবতারা! নবতারা!

শশী মুখ তুলিয়া চাহিল, কহিল, আসুন। নবতারা এখানে নেই।

ডাক্তার স্মিতমুখে কহিলেন, গৃহণীশূন্য গৃহ কিরকম কবি? ডাকো তাকে, আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাক, নইলে দাঁড়িয়ে থাকবো। হয়ত খাবোও না।

শশী বিষণ্নমুখে বলিল, নবতারা এখানে নেই ডাক্তার। তারা সব বেড়াতে গেছে।

সহসা তাহার মুখের চেহারায় ভীত হইয়া ভারতী প্রশ্ন করিল, কোথায় বেড়াতে গেলো? আজকের দিনে? কি চমৎকার বিবেচনা!

শশী বলিল, তারা বিয়ের পরে রেঙ্গুনে বেড়াতে গেছে। না না, আমার সঙ্গে নয়, — সেই যে আহমেদ, — ফর্সা মতন, — চমৎকার দেখতে, — কুট সাহেবের মিলের টাইম - কিপার,— দেখেছেন না? আজ দুপুরবেলা তারই সঙ্গে নবতারার বিয়ে হয়েছে। সমস্তই তাদের ঠিক ছিল — আমাকে বলেনি।

আগন্তুক দুইজনে বিস্ময়-বিস্ফারিতচক্ষে চাহিয়া রহিলেন, — বল কি শশি?

শশী উঠিয়া গিয়া ঘরের একটা নিভৃত স্থান হইতে একটা ন্যাকড়ার থলি আনিটা ডাক্তারের পায়ের কাছে রাখিয়া দিয়া কহিল, টাকা পেয়েছি ডাক্তার। নবতারাকে পাঁচ হাজার দেব বলেছিলাম, দিয়ে দিয়েছি। বাকী আছে সাড়ে চার হাজার, পঞ্চাশ টাকা আমি নিলাম, কিন্তু —

ডাক্তার কহিলেন, এই টাকা কি আমাকে দিচ্ছ?

শশী কহিল, হাঁ। আমার আর কি হবে? আপনি নিন। কাজে লাগবে।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তাকে কবে টাকা দিলেন?

শশী কহিল, কাল টাকা পেয়েই তাকে দিয়ে এসেছি।

নিলে?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ ! আমেদ ত মোটে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। তারা একটা বাড়ি কিনবে।

নিশ্চয়ই কিনবে! এই বলিয়া ডাক্তার সহাস্যে ফিরিয়া দেখিলেন, চোখে আঁচল দিয়া ভারতী বারান্দার একদিকে নিঃশব্দে সরিয়া যাইতেছে।

শশী কহিল, প্রেসিডেন্ট আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। তিনি সুরাবায়ায় চলে যাচ্চেন।

ডাক্তার বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, তবু প্রশ্ন করিলেন, কবে যাবেন?

শশী কহিল, বললেন ত শীঘ্রই। তাঁকে লোক এসেছে নিতে।

কথা ভারতীর কানে গেল, সে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সুমিত্রাদিদি কি সত্যিই চলে যাবেন বলেছেন শশীবাবু?

শশী বলিল, হাঁ সত্যি। তাঁর মায়ের খুড়োর অগাধ সম্পত্তি। সম্প্রতি মারা গেছেন,

ভালবাসতে পারে না। সেদিন আপনাকে আমি চিনিনি। আজ মনে হচ্চে অপূর্ববাবুকে যে ভালবেসেছিল সে আপনাকে পেলে ধন্য হয়ে যেতো। সবাই আপনাকে উপেক্ষা করে এসেছে, শুধু একটি লোক করেনি, সে এই ডাক্তার।

ডাক্তার অধোমুখে একটুকরা মাংস হইতে হাড় পৃথক করিবার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, মুখ তুলিবার অবকাশ পাইলেন না। ভারতী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, দাদা, মানুষকে চিনে নিতে তোমার ভুল হয় না, তাই সেদিন দুঃখ করে আমার কাছে বলেছিলে, শশী যদি আর কাউকে ভালবাসত! কিন্তু একটা দিনও কি তুমি আমাকে সাবধান করে বলে দিতে পারতে না, ভারতী, এতবড় ভুল তুমি করো না! পুরুষের দুই আদর্শ তোমরা দুজনে আমার সুমুখে বসে,—আজ আমার বিতৃষ্ণার আর অবধি নেই!

ডাক্তার মাংসখণ্ড মুখে পুরিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অপূর্ব কি বললে শশী?

জবাব দিল ভারতী। কহিল, মা পীড়িত। চিকিৎসার প্রয়োজন, অতএব, টাকা চাই। ফিরে এসে লুকিয়ে গোলামি করলে কেউ জানতে পারবে না। ভয় তলওয়ারকরকে, ভয় ব্রজেন্দ্রকে। কিন্তু, কাকা পুলিশ কর্মচারী,—সে ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে গেছে দাদা। তুমি আমিও বোধ হয় এখন আর বাদ যাবো না। ক্ষুদ্র! লোভী! সঙ্কীর্ণচিত্ত ভীরু! ছি!

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন, যথার্থ ভাল না বাসলে এমন প্রাণ খুলে যশোগান করা যায় না। কবি, এবার তোমার পালা। বাগ্‌দেবীকে স্মরণ করে তুমি এবার নবতারার গুণকীর্তন শুরু কর,—আমরা অবহিত হই!

ভারতী চকিত হইয়া কহিল, দাদা, তুমি আমাকে তিরস্কার করলে?

ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তাই হবে হয়ত।

অভিমানে, ব্যথায় ক্রোধে ভারতীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিল, তুমি কখখনো আমাকে বকতে পাবে না। ভেবেছ, সবাই শশীবাবুর মত মুখ বুজে সইতে পারে? তুমি কি জানো কি হয় মানুষের! উচ্ছ্বসিত বেদনায় কণ্ঠস্বর তাহার অবরুদ্ধ হইয়া আসিল কহিল, তিনি ফিরে এসেছেন, এবার আমাকে তুমি কোথাও সরিয়ে নিয়ে যাও দাদা,—আমি এ কোন্ দুর্ভাগার পায়ে আমার সমস্ত বিসর্জন দিয়ে বসে আছি! বলিতেই মেঝের উপর মাথা রাখিয়া ভারতী ছেলেমানুষের মত কাঁদিয়া ফেলিল।

ডাক্তার স্মিতমুখে নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নির্বিকার ভাব দেখিয়া মনে হয় না যে, এই-সকল প্রণয়-উচ্ছ্বাস তাঁহাকে লেশমাত্র বিচলিত করিয়াছে। মিনিট পাঁচ-সাত পরে ভারতী উঠিয়া পাশের ঘরে গিয়া চোখ-মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, আর তোমাদের কিছু দেব?

ডাক্তার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া বলিলেন, বামুনের ছেলে, কিছু ছাঁদা বেঁধে দাও, দিন-দুই যেন নিশ্চিন্ত হতে পারি।

ময়লা রুমালটা ফিরাইয়া দিয়া ভারতী খোঁজ করিয়া একখানা ধোয়া তোয়ালে বাহির করিল, এবং রকমারি খাদ্যবস্তুর একটি পুঁটলি বাঁধিয়া ডাক্তারের পাশে রাখিয়া দিয়া কহিল, এই ত হল বামুনের ছেলের ছাঁদা। আর ঐ টাকার ছোট্ট থলিটি?

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, ওটি হল বামুনের ছেলের ভোজন-দক্ষিণা।

ভারতী বলিল, অর্থাৎ তুচ্ছ বিবাহ-ব্যাপারটা ছাড়া আসল দরকারী কাজগুলো সমস্তই নির্বিঘ্নে সমাধা হল।

অকস্মাৎ, হাঃ হাঃ করিয়া আরম্ভ করিয়াই ডাক্তার সজোরে হাত দিয়া নিজের মুখ চাপিয়া ধরিয়া হাসি থামাইলেন, গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কি যে ভগবানের অভিশাপ, ভারতী, হাসতে গেলেই মুখ দিয়ে আমার অট্টহাসি ছাড়া আর কিছু বার হতেই চায় না। অট্টকান্না কাঁদবার জন্যে তোমাকে সঙ্গে না নিয়ে এলে আজ মুখ দেখানোই ভার হতো।

দাদা, আবার জ্বালাতন করচ?

জ্বালাতন করচি? আমি ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা করচি।

ভারতী রাগ করিয়া আর একদিকে মুখ ফিরাইল, জবাব দিল না।

শশী বরাবর চুপ করিয়াই ছিল, এতক্ষণে কথা কহিল। অকস্মাৎ অতিশয় গাম্ভীর্যের সহিত বলিল, আপনি যদি রাগ না করেন ত একটা কথা বলতে পারি। কেউ কেউ ভয়ানক সন্দেহ করে যে, আপনার সঙ্গেই একদিন ভারতীর বিবাহ হবে।

ডাক্তার মুহূর্তের জন্য চমকিত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া উল্লাসভরে বলিয়া উঠিলেন, বল কি হে শশী, তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক, এমন সুদিন কি কখনো এতবড় দুর্ভাগার অদৃষ্টে হবে? এ যে স্বপ্নের অতীত, কবি!

শশী কহিল, কিন্তু অনেকে ত তাই ভাবেন!

ডাক্তার কহিলেন, হায়! হায়! অনেকে না ভেবে যদি একটিমাত্র লোক একটি পলকের জন্যও ভাবতেন!

ভারতী হাসিয়া ফেলিল। মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, দুর্ভাগার ভাগ্য ত একটি পলকেই বদলাতে পারে দাদা! তুমি হুকুম করে যদি বল, ভারতী, কালই আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে, আমি তোমার দিব্যি করে বলচি, বলব না যে আর একটা দিন সবুর কর।

ডাক্তার কহিলেন, কিন্তু অপূর্ব বেচারা যে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে ফিরে এল, তার উপায়টা কি হবে?

ভারতী বলিল, তাঁর কনে-বৌ দেশে মজুদ আছে, তাঁর জন্যে তোমর দুশ্চিন্তার কারণ নেই। তিনি বুক ফেটে মারা যাবেন না।

ডাক্তার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে যাও, তোমার ভরসা ত কম নয় ভারতী!

ভারতী কহিল, তোমার হাতে পড়ব তার আর ভয়টা কিসের?

ডাক্তার শশীর প্রতি চাহিয়া বলিলেন, শুনে রেখো কবি! ভবিষ্যতে যদি অস্বীকার করে তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে।

ভারতী বলিল, কাউকে সাক্ষী দিতে হবে না দাদা, আমি তোমার নাম নিয়ে এতবড় শপথ কখনো অস্বীকার করব না। শুধু তুমি স্বীকার করলেই হয়।

ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা দেখে নেবো তখন।

দেখো। এই বলিয়া ভারতী হাসিয়া কহিল, দাদা, আমিই বা কি আর সুমিত্রাই বা কি,—স্বর্গের ইন্দ্রদেব যদি উর্বশী মেনকা রম্ভাকে ডেকে বলতেন, সেকালের মুনি-ঋষিদের বদলে তোমাদের একালের সব্যসাচীর তপস্যা ভঙ্গ করতে হবে, ত আমি নিশ্চয় বলচি দাদা, মুখে কালি মেখে তাঁদের ফিরে যেতে হতো। রক্ত-মাংসের হৃদয় জয় করা যায়, কিন্তু পাথরের সঙ্গে কি লড়াই চলে! পরাধীনতার আগুনে পুড়ে সমস্ত বুক তোমার একেবারে পাষাণ হয়ে গেছে।

ডাক্তার মুচকিয়া হাসিলেন। ভারতীর দুই চক্ষু শ্রদ্ধা ও স্নেহে অশ্রুসজল হইয়া উঠল, কহিল, এ বিশ্বাস না থাকলে কি এমন করে তোমাকে আত্মসমর্পণ করতে পারতাম? আমি ত নবতারা নই। আমি জানি, আমার মস্ত ভুল হয়ে গেছে,—কিন্তু এ জীবনে সংশোধনের পথও আর নেই। একদিনের জন্যেও যাঁকে মনে মনে—

ভারতীর চোখ দিয়া পুনরায় জল গড়াইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি হাত মুছিয়া ফেলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, দাদা, ফেরবার সময় হয়নি? ভাঁটার দেরি কত?

ডাক্তার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিলেন, এখনো দেরি আছে বোন। তাহার পরে ধীরে ধীরে ডান হাত বাড়াইয়া ভারতীর মাথার উপরে রাখিয়া কহিলেন, আশ্চর্য! এত দুর্দশাতেও এ অমূল্য রত্নটি আজও বাঙলার খোয়া যায়নি। থাক না নবতারা, তবু ত ভারতীও আমাদের আছে। শশী, সমস্ত পৃথিবীতে এর আর জোড়া মেলে না! এখানে সহস্র সব্যসাচীরও সাধ্য নেই তুচ্ছ অপূর্বকে আড়াল করে দাঁড়ায়! ভাল কথা শশী, মদের বোতল কৈ?

প্রশ্ন শুনিয়া শশী যেন কিছু লজ্জিত হইল, বলিল, কিনিনি ডাক্তার। ও আমি আর খাবো না।

ভারতী বলিল, তোমার মনে নেই দাদা, নবাতারা ওকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন?

শশী তাহারেই সায় দিয়া কহিল, সত্যিই নবতারার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মদ আর খাবো না। এ সত্য আমি ভাঙ্গবো না, ডাক্তার।

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, কিন্তু বাঁচবে কি করে শশী? মদ গেল, নবতারা গেল যথাসর্বস্ব-বিক্রি-করা টাকা গেল, একসঙ্গে এত সইবে কেন?

শশীর মুখের দিকে চাহিয়া ভারতী ব্যথা পাইল, তামাশা করা সহজ দাদা, কিন্তু সত্যি একবার ভেবে দেখ দিকি?

ডাক্তার বলিলেন, ভেবে দেখেই বলচি ভারতী। এই টাকাটার ওপরে যে শশীর কতখানি আশা-ভরসা ছিল তা আমার চেয়ে বেশী আর কেউ জানে না। ওর পরিচিত এমন একটা লোকও নেই যে, এ বিবরণ শোনেনি। তার পরে এলো নবতারা। ছ-সাত মাস ধরে সেই ছিল ওর ধ্যান-জ্ঞান। আর মদ? সে ত শশীর সুখ-দুঃখের একমাত্র সাথী। কাল সবই ছিল, আজ ওর জীবনের যা-কিছু আনন্দ, যা-কিছু সান্ত্বনা একদিনে একসঙ্গে চক্রান্ত করে যেন ওকে ত্যাগ করে গেল। তবু, কারও বিরুদ্ধে ওর বিদ্বেষ নেই, নালিশ নেই,—এমন কি আকাশের পানে চেয়ে একবার সজলচক্ষে বলতে পারলে না যে, ভগবান! আমি কারও মন্দ চাইনে, কিন্তু তুমি সত্যির যদি হও ত এর বিচার করো।

ভারতীর মুখ দিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, কহিল, তাই তোমার এত স্নেহ।

ডাক্তার বলিলেন, শুধু স্নেহ নয়, শ্রদ্ধা। শশী সাধু লোক, সমস্ত অন্তরখানি যেন গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ, নির্মল। ভারতী, আমি চলে গেলে, বোন, একে একটু দেখো। তোমার হাতেই শশীকে আমি দিয়ে গেলাম, ও দুঃখ পাবে, কিন্তু দুঃখ কখনো কাউকে দেবে না।

শশী লজ্জা ও কুণ্ঠায় আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার পরে কিছুক্ষণ পর্যন্ত বোধ করি কথার অভাবেই তিনজনেই নীরব হইয়া রহিলেন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু এখন থেকে কি করবে কবি? তোমার বাকী রইল ত কেবল ওই বেহালাখানি। আগের মত আবার দেশে দেশে বাজিয়ে বেড়াবে?

এবার শশী হাসিমুখেই বলিল, আপনার কাজে আমাকে ভর্তি করে নিন,—বাস্তবিকই আমি আর মদ খাবো না।

তাহার কথা এবং কথা বলার ভঙ্গী দেখিয়া ভারতী হাসিল। ডাক্তার নিজেও হাসিলেন, স্নেহার্দ্রকণ্ঠে কহিলেন, না, কবি, ওতে তোমার আর ভর্তি হয়ে কাজ নেই। তুমি আমার এই বোনটির কাছে থেকো, তাতেই আমার ঢের বড় কাজ হবে।

শশী মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া সঙ্কোচের সহিত কহিল, আগে আমি কবিতা লিখতে পারতাম ডাক্তার,—হয়ত এখনও পারি।

ডাক্তার খুশী হইয়া কহিলেন, তাও ত বটে। আর তাতেই যে আমার মস্ত কাজ হবে কবি।

শশী কহিল, আমি আবার আরম্ভ করব। চাষাভূষা কুলি-মজুরদের জন্যেই এবার শুধু লিখব।

কিন্তু তারা ত পড়তে জানে না কবি?

শশী কহিল, নাই জানলে, তবু তাদের জন্যেই আমি লিখবো।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, সেটা অস্বাভাবিক হবে, এবং অস্বাভিক জিনিষ টিকবে না। অশিক্ষিতের জন্যে অন্নসত্র খোলা যেতে পারে, কারণ, তাদের ক্ষুধা-বোধ আছে, কিন্তু সাহিত্য পরিবেষণ করা যাবে না। তাদের সুখ-দুঃখের বর্ণনা করার মানেই তাদের সাহিত্য নয়। কোনদিন যদি সম্ভব হয়, তাদের সাহিত্য তারাই করে নেবে,—নইলে, তোমার গলায় লাঙ্গলের গান লাঙ্গলধারীর গীতিকাব্য হয়ে উঠবে না। এ অসম্ভব প্রয়াস তুমি করো না

কবি।

শশী ঠিক বুঝিতে পারিল না, সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তবে আমি কি করব?

ডাক্তার বলিলেন, তুমি আমার বিপ্লবের গান করো। যেখানে জন্মেছ, যেখানে মানুষ হয়েছ, শুধু তাদেরই—সেই শিক্ষিত ভদ্র জাতের জন্যেই।

ভারতী বিস্মিত হইল, কহিল, দাদা, তুমিও জাত মানো? তোমার লক্ষ্যও সেই কেবল ভদ্র জাতের দিকে?

ডাক্তার বলিলেন, আমি ত বর্ণাশ্রমের কথা বলিনি, ভারতী, সেই জোর-করা জাতি-ভেদের ইঙ্গিত ত আমি করিনি! সে বৈষম্য আমার নেই,—কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিতে জাতিভেদ, সে ত আমি না মেনে পারিনে! এই ত সত্যকার জাতি,—এই ত ভগবানের হাতে গড়া সৃষ্টি! ক্রীশ্চান বলে কি তোমাকে ঠেলে রাখতে পেরেছি দিদি? তোমার মত আপনার জন আমার কে আছে?

ভারতী শ্রদ্ধা-বিগলিত-চক্ষে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, কিন্তু তোমার বিপ্লবের গান ত শশীবাবুর মুখে সাজবে না দাদ! তোমার বিদ্রোহের গান, তোমার গুপ্ত সমিতির—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন, না, আমার গুপ্ত সমিতির ভার আমার পরেই থাক বোন,—ও বোঝা বইবার মত জোর,—না না, সে থাক—সে শুধু আমার! এই বলিয়া তিনি ক্ষণকাল যেন আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। কহিলেন, তোমাকে ত বলেছি ভারতী, বিপ্লব মানেই শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়,—বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন! রাজনৈতীক বিপ্লব যা কিছু সনাতন, যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন,—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার—সমস্ত ভেঙ্গে-চুরে ধ্বংস হয়ে যাক,—আর কিছু না পারো, শশী, কেবল এই মহাসত্যই মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে দাও,—এর চেয়ে ভারতরে বড় শত্রু আর নেই—তারপরে থাক দেশের স্বাধীনতার বোঝা আমার এই মাথায়! কে?

শশী কান খাড়া করিয়া বলিল, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ যেন—

ডাক্তার চক্ষের পলকে পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া দিয়া নিঃশব্দ দ্রুতপদে অন্ধকার বারান্দায় বাহির হইয়া গেলেন, কিন্তু ক্ষণেক পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, ভারতী, সুমিত্রা আসছেন?

আটাশ

এই নিশীথ রাত্রে সুমিত্রার আগমন-সংবাদ যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অপ্রীতিকর। ভারতী কুণ্ঠিত ও ত্রস্ত হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরে সে প্রবেশ করিতে ডাক্তার সহজকণ্ঠে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, বসো। তুমি কি একলা এলে নাকি?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ। ভারতীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ভাল আছ ভারতী?

এই মিনিট-খানেক সময়ের মধ্যেই ভারতী কত কি যে ভাবিতেছিল তাহার সীমা নাই। সেদিনকার মত আজও যে সুমিত্রা তাহাকে গ্রাহ্য করিবে না ইহাই সে নিশ্চিত জানিত, কিন্তু শুধু এই কুশল প্রশ্নে নয়, তাঁহার কণ্ঠস্বরের স্নিগ্ধ কোমলতায় ভারতী সহসা যেন চাঁদ হাতে পাইল। অহেতুক কৃতজ্ঞতায় অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া বলিল, ভালো আছি দিদি। আপনি ভাল আছেন? আজ আর তাহাকে তুমি বলিয়া ডাকিতে ভারতীর সাহস হইল না।

হাঁ, আছি,—বলিয়া জবাব দিয়া সুমিত্রা একধারে উপবেশন করিল। কথোপকথান বেশী করা তাহার প্রকৃতি নয়,—একটা স্বাভাবিক ও শান্ত গাম্ভীর্যের দ্বারা চিরদিনই সে ব্যবধান রাখিয়া চলিত, আজও সে রীতির ব্যত্যয় হইল না। ইহা প্রচ্ছন্ন ক্রোধ বা বিরক্তির পরিচায়ক নহে তাহা জানিয়াও কিন্তু ভারতীর নিজে হইতে দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভরসা হইল না।

ডাক্তার কথা কহিলেন। বলিলেন, শশীর মুখে শুনলাম, তুমি প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়ে জাভাজ ফিরে যাচ্চ।

সুমিত্রা কহিল, হাঁ, আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক এসেছে!

কবে যাবে?

প্রথম স্টিমারেই-শনিবারে।

ডাক্তার একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, যাক, এবারে তাহলে তুমি বড়লোক হলে।

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, কহিল, হাঁ, সমস্ত পেলে তাই বটে!

ডাক্তার বলিলেন, পাবে। এটর্নির পরামর্শ ছাড়া কাজ করো না। আর, একটু সাবধানে থেকো। যাঁরা তোমাকে নিতে এসেছেন, তাঁরা পরিচিত লোক ত?

সুমিত্রা বলিল, হাঁ, বিশ্বাসী লোক, সকলকেই আমি চিনি।

তাহলে ত কথাই নেই, এই বলিয়া ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ শশী কথা কহিল ; বলিল, এ হল মন্দ নয় ডাক্তার। যে তিনজন বাঙালী মহিলাকে আপনি নিলেন—নবতারা গেলেন, স্বয়ং প্রেসিডেন্ট যেতে উদ্যত, শুধু ভারতী—

ডাক্তার সহাস্যে বলিলেন, তোমার দুশ্চিন্তার হেতু নেই, কবি, ভারতীও মহাজনের পন্থা অনুসরণ করবেন তা একপ্রকার স্থির হয়ে গেছে।

প্রত্যুত্তরে ভারতী শুধু ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু জবাব দিল না।

ডাক্তারের পরিহাসের মধ্যে যে ব্যথা আছে শশী ইহাই অনুমান করিয়া কহিল, আপনাকেও শীঘ্র চলে যেতে হচ্চে। তাহলেই দেখুন, আপনার পথের-দাবীর এ্যাক্টিভিটি বর্মায় অন্ততঃ শেষ হয়ে গেল। কে আর চালাবে! এই বলিয়া শশী গভীর নিঃশ্বাস মোচন করিল। তাহার এই দীর্ঘশ্বাস অকৃত্রিম এবং যথার্থই বেদনায় পূর্ণ, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, ডাক্তারের মুখের পরে ইহার লেশমাত্র প্রতিবিম্ব পড়িল না। তেমনি হাসিমুখে কহিলেন, ও কি কথা কবি? এতকাল এত দেখেশুনে শেষে তোমারই মুখে সব্যসাচীর এই সার্টিফিকেট! তিনজন মহিলা চলে যাবেন বলে পথের-দাবী শেষ হয়ে যাবে? মদ ছেড়ে দিয়ে কি এই হল নাকি? তার চেয়ে বরঞ্চ তুমি আবার ধরো।

কথাটা তামাশার মত শুনাইলেও যে তামাশা নয় তাহা বুঝিয়াও ভারতী ঠিকমত বুঝিতে পারিল না। কটাক্ষে চাহিয়া দেখিল, সুমিত্রা নতনেত্রে নিঃশব্দে বসিয়া আছে। তখন সে মুখ তুলিয়া ডাক্তারের মুখের প্রতি স্থির দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, দাদা, আমার ত আর বোঝবার জন্যে মদ ধরবার আবশ্যক নেই, কিন্তু তবু ত বুঝতে পারলাম না। নবতারা কিছুই নয়, আর আমি তার চেয়েও অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু সুমিত্রাদিদি—যাঁকে তুমি নিজে থেকে প্রেসিডেন্টের আসন দিয়েছ,—তিনি চলে গেলেও কি তোমার পথের-দাবীতে আঘাত লাগবে না? সত্যি কথা বলো দাদা, শুধুমাত্র কাউকে লাঞ্ছনা করবার জন্যেই রাগ করে যেন বলো না! এই বলিয়া সে চোখোচোখি হইবার নিঃসন্দিগ্ধ ভরসায় পলকমাত্র সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই চক্ষু অন্যত্র অপসারিত করিল। চোখে চোখে মিলিল না, সুমিত্রা সেই যে মুখ নীচু করিয়া বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনি নির্বাক নতমুখে মূর্তির মত বসিয়া রহিল।

ডাক্তার ক্ষণকাল মৌন হইয়া রহিলেন, তাহার পরে ধীরে ধীরে কহিলেন, আমি রাগ করে বলিনি ভারতী, সুমিত্রা অবহেলার বস্তু নয়। কিন্তু তুমি হয়ত জানো না, কিন্তু নিজে সুমিত্রা ভালরূপেই জানেন যে এ-সকল ব্যাপারে আমাদের ক্ষতির পরিমাণ গণনা করতে নেই। তা ছাড়া প্রাণ যাদের এমন অনিশ্চিত তাদের মূল্য স্থির হবে কি দিয়ে বল ত? মানুষ ত যাবেই। যত বড়ই হোক, কারও অভাবকেই যেন না আমরা সর্বনাশ বলে ভাবি, একজনের স্থান যেন জলস্রোতের মত আর একজন স্বচ্ছন্দে এবং অত্যন্ত অনায়াসেই পূর্ণ করে নিতে পারে এই শিক্ষাই ত আমাদের প্রথম শিক্ষা ভারতী!

ভারতী কহিল, কিন্তু এ ত আর সংসারে সত্যই ঘটে না! এই যেমন তুমি। তোমার অভাব কেউ কোনদিন পূর্ণ করতে পারে এ কথা ত আমি ভাবতেই পারিনে দাদা।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার চিন্তার ধারা স্বতন্ত্র, ভারতী। আর, এই যেদিন টের পেয়েছিলাম, সেই দিন থেকেই তোমাকে আর আমি দলের মধ্যে টানতে পারিনি। কেবলি মনে হয়েছে, জগতে তোমার অন্য কাজ আছে।

ভারতী বলিল, আর কেবলই আমার মনে হয়েছে আমাকে অযোগ্য জ্ঞানে তুমি দূরে সরিয়ে দিতে চাচ্চো। যদি আমার অন্য কাজ থাকে, আমি তারই জন্যে এখন থেকে সংসারে বার হবো, কিন্তু আমার প্রশ্নের ত জবাব হল না, দাদা। আসলে কথাটা তুচ্ছ। তোমার অভাব জলস্রোতের মতই পূর্ণ হতে পারে কি না? তুমি বলছ পারে,—আমি বলছি, পারে না। আমি জানি,পারে না, আমি জানি, মানুষ শুধু জলস্রোত নয়—তুমি ত নও-ই।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া সে পুনশ্চ কহিল, কেবল এই কথাটাই জানবার জন্যে তোমাকে আমি পীড়াপীড়ি করতাম না। কিন্তু যা নয়, যা নিজে জানো তুমি সত্য নয়, তাই দিয়ে আমাকে ভোলাতে চাও কেন?

ডাক্তার হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলেন না, উত্তরের জন্য ভারতী অপেক্ষাও করিল না। কহিল, এদেশে আর তোমার থাকা চলে না,—তুমিও যাবার জন্যে পা তুলে আছো। আবার তোমাকে ফিরে পাওয়া যে কত অনিশ্চিত এ কথা ভাবতেও বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে, তাই ও আমি ভাবিনে, তবুও এ সত্য ত প্রতিমুহূর্তেই অনুভব না করে পারিনে। এ ব্যথার সীমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও আমার বড় ব্যথা তোমাকে এমন করে পেয়েও পেলাম না! আজ আমার কত দিনের কত প্রশ্নই মনে হচ্চে দাদা, কিন্তু যখনি জিজ্ঞাসা করেছি তুমি সত্য বলেছ, মিথ্যা বলেছ, সত্যি-মিথ্যায় জড়িয়ে দিয়ে বলেছ,—কিন্তু কিছুতেই সত্য জানতে দাওনি। তোমার পথের-দাবীর সেক্রেটারি আমি, তবু যে তোমার কাজের পদ্ধতিতে আমার এতটুকু আস্থা ছিল না, এ কথা তোমাকে ত আমি একটা দিনও লুকোই নি। তুমি রাগ করোনি, অবিশ্বাস করোনি,—হাসিমুখে শুধু বারবার সরিয়ে দিতে চেয়েছ। অপূর্ববাবুর জীবন-দানের কথা আমি ভুলিনি। মনে হয়, আমার ছোট্ট জীবনের কল্যাণ কেবল তুমিই নির্দেশ করে দিতে পারো। দোহাই দাদা, যাবার পূর্বে আর নিজেকে গোপন করে যেয়ো না,—তোমার, আমার, সকলের যা পরম সত্য তাই আজ অকপটে প্রকাশ কর।

এই অদ্ভুত অনুনয়ের অর্থ না বুঝিয়া শশী ও সুমিত্রা উভয়েই বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, এবং তাহাদেরই উৎসুক চোখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভারতী নিজের ব্যাকুলতায় নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল। এই লজ্জা ডাক্তারের দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি সহাস্যে কহিলেন, সত্য, মিথ্যা এবং সত্য-মিথ্যায় জড়িয়ে ত সবাই বলে ভারতী, আমার আর বিশেষ দোষ হল কি? তা ছাড়া লজ্জা যদি পাবার থাকে ত সে আমার, কিন্তু লজ্জা পেলে যে তুমি!

ভারতী নতমুখে নীরব হইয়া রহিল। সুমিত্রা ইহার জবাব দিয়া কহিল, লজ্জা যদি তোমার না-ই থাকে ডাক্তার, কিন্তু মেয়েরা সত্যি কথাটাও মুখের উপর স্পষ্ট করে বলতে লজ্জা বোধ করে। কেউ কেউ বলতেই পারে না।

এই মন্তব্যটি যে কাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া কিসের জন্য বলা হইল তাহা বুঝিতে কাহারও বাকী রহিল না, কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও সম্মান তাঁহার প্রাপ্য, বোধ হয় তাহাই অপর সকলকেই নিরুত্তর করিয়া রাখিল। মিনিট দুই-তিন এমনি নিঃশব্দে কাটিলে ডাক্তার ভারতীকে পুনরায় লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, ভারতী, সুমিত্রা বলিলেন, আমার লজ্জা নেই, তুমি দোষ দিলে আমি সুবিধামত সত্য ও মিথ্যা দুই-ই বলি। আজও তেমনি কিছু বলেই এ প্রসঙ্গ শেষ করে দিতে পারতাম, যদি না এর সঙ্গে আমার পথের-দাবীর সম্বন্ধ থাকতো। এর ভাল-মন্দ দিয়েই আমার সত্য-মিথ্যা নির্ধারিত হয়। এই আমার নীতিশাস্ত্র, এই আমার অকপট মূর্তি!

ভারতী অবাক হইয়া কহিল, বল কি দাদা, এই তোমার নীতি, এই তোমার অকপট মূর্তি!

সুমিত্রা বলিয়া উঠিল, হাঁ, ঠিক এই! এই ওর যথার্থ স্বরূপ। দয়া নেই, মায়া নেই, ধর্ম নেই—এই পাষাণমূর্তি আমি চিনি ভারতী।

তাঁহার কথাগুলো যে ভারতী বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু সে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

ডাক্তার কহিলেন, তোমরা বল চরম সত্য, পরম সত্য;—এই অর্থহীন নিষ্ফল শব্দগুলো তোমাদের কাছে মহা মূল্যবান। মূর্খ ভোলাবার এতবড় যাদুমন্ত্র আর নেই। তোমরা ভাবো

মিথ্যাকেই বানাতে হয়, সত্য শাশ্বত, সনাতন, অপৌরুষেয়? মিছে কথা। মিথ্যার মতই একে মানবজাতি অহরহ সৃষ্টি করে চলে। শাশ্বত, সনাতন নয়,—এর জন্ম আছে, মৃত্যু আছে। আমি মিথ্যা বলিনে, আমি প্রয়োজনে সত্য সৃষ্টি করি।

এ পরিহাস নয়, সব্যসাচীর অন্তরের উক্তি। ভারতী যেন ফ্যাকাশে হইয়া গেল, অস্ফুট-স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, এই কি তোমার পথের-দাবীর নীতি?

ডাক্তার জবাব দিলেন, ভারতী, পথের-দাবী আমার তর্কশাস্ত্রের টোল নয়—এ আমার পথ চলার অধিকারের জোর! কে কবে কোন্ অজানা প্রয়োজনে নীতিবাক্য রচনা করে গেল পথের-দাবীর সেই হবে সত্য, আর এর তরে যার গলা ফাঁসির দড়িতে বাঁধা, তার হৃদয়ের ব্যাক হবে মিথ্যা? তোমার পরম সত্য কি আছে জানিনে, কিন্তু পরম মিথ্যা যদি কোথাও থাকে ত সে এই!

উত্তেজনায় সুমিত্রার চোখের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু এই ভয়ানক কথা শুনিয়া ভারতী শঙ্কায় ও সংশয়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

কবি!

আজ্ঞে।

শশীর কি ভক্তি দেখেছ? এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু এ হাসিতে কেহ যোগ দিল না। ডাক্তার দেয়ালের ঘড়ির প্রতি চাহিয়া কহিলেন, জোয়ার শেষ হতে আর দেরি নেই, আমার যাবার সময় হয়ে এল। তোমার তারাবিহীন শশী-তারা লজে আর আসায় সময় পাবো না।

শশী কহিল, কালই আমি এ বাসা ছেড়ে দেব।

কোথাও যাবে?

শশী কহিল, আপনার আদেশ মত ভারতীর কাছে গিয়ে থাকবো।

ডাক্তার সহাস্যে কহিলেন, দেখেচ ভারতী, শশী আমার আদেশ অমান্য করে না। ও বাসাটার নাম কি দেবে কবি? শশী-ভারতী লজ? বার-তিনেক ফসকাতে ত আমিই দেখলাম, এবার হয়ত লাগতেও পারে। ভারতী লোক ভাল। ওর শরীরে দয়া-মায়া আছে।

এত কষ্টেও ভারতী হাসিয়া ফেলিল। সুমিত্রা হাসিমুখে মাথা নত করিল।

ডাক্তার বলিলেন, তোমার টাকার থলিটি কিন্তু সঙ্গে নিলাম। ভারতীর কাছে রেখে যাবো, ও একটা বাড়ি কিনবে।

ভারতী বলিল, দাদা, কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়া কি তোমার থামবে না?

শশী বলিল, টাকা আপনি নিন ডাক্তার, আপনাকে আমি দিলাম। আমার দেশের বাড়ি-ঘর সর্বস্ব-বেচা টাকা যেন দেশের কাজেই লাগে।

ডাক্তার হাসিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। বলিলেন, টাকা আমার আছে, শশী, এখন আর দরকার নেই। তা ছাড়া, আর বোধ হয় টাকার অভাব হবে না। এই বলিয়া তিনি স্মিতমুখে সুমিত্রার প্রতি চাহিলেন।

সুমিত্রার দুই চক্ষে কৃতজ্ঞতা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মুখে সে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া এই কথাটাই ফুটিয়া বাহির হইল, সবই ত তোমার, কিন্তু সে কি তুমি ছোঁবে?

ডাক্তার দৃষ্টি অপসারিত করিয়া কয়েক মুহূর্তে স্তব্ধভাবে থাকিয়া ডাকিলেন, কবি!

বলুন।

ব্রাহ্মণ-ভোজনটা একটু আগাম সেরে নিলাম বলে তুমি দুঃখ করো না। কারণ, শুভক্ষণ যখন সত্যি এসে পৌঁছবে তখন দ্বিতীয়বার আর আমি ফুরসত পাবো না। কিন্তু সেদিন আসবে। নানাবিধ সুখাদ্যে পরিতৃপ্ত হয়ে আজ তোমাকে বর দিলাম, তুমি সুখী হবে। কিন্তু দুটি কাজ তুমি কখনো করো না। মদ খেয়ো না, আর রাজনীতিক বিপ্লবের মধ্যে যেয়ো না। তুমি কবি, তুমি দেশের বড় শিল্পী—রাজনীতির চেয়ে তুমি বড় এ কথা ভুলো না।

শশী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, আপনি যাতে আছেন, আমি তার মধ্যে থাকলে দোষ হবে,—আমি কি আপনার চেয়েও বড়?

ডাক্তার কহিলেন, বড় বৈ কি! তোমার পরিচয়ই ত জাতির সত্যকার পরিচয়। তোমরা ছাড়া এর ওজন হবে কি দিয়ে? একদিন এই স্বাধীনতা-পরাধীনতা-সমস্যার মীমাংসো হবেই,—এর দুঃখ-দৈন্যের কাহিনী সেদিন জনশ্রুতির অধিক মূল্য পাবে না, কিন্তু তোমার কাজের মূল্য নিরূপণ করবে কে? তুমিই ত দিয়ে যাবে দেশের সমস্ত বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ধারাকে মালার মত গেঁথে।

সুমিত্রা মৃদুহাস্যে বলিল, কবে গাঁথবেন সে উনিই জানেন, কিন্তু তুমি কথা গেঁথে গেঁথে যে মূল্য ওঁর এখনি বাড়িয়ে দিলে, ভারতী সামলাবে কি করে?

শুনিয়া সবাই হাসিল, ডাক্তার কহিলেন, শশী হবে আমাদের জাতীয় কবি। হিন্দুর নয় মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টানের নয়,—শুধু আমার বাঙলা দেশের কবি। সহস্র নদ-নদী-প্রবাহিত আমার বাঙলা দেশ, আমার সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাঠের পরে মাঠে-ভরা বাঙলা দেশ। মিথ্যা রোগের দুঃখ নেই, মিথ্যা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা নেই, বিদেশী শাসনের সুদুঃসহ অপমানের জ্বালা নেই, মনুষ্যত্বহীনতার লাঞ্ছনা নেই,—তুমি হবে শশী, তারই চারণ-কবি! পারবে না ভাই?

ভারতীর সর্বাঙ্গ কন্টকিত হইয়া উঠিল, শশী ভ্রাতৃ-সম্বোধনের মাধুর্যে বিগলিত হইয়া বলিল, ডাক্তার , চেষ্টা করলে আমি ইংরাজিতেও কবিতা লিখতে পারি। এমন কি—

ডাক্তার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, না না, ইংরাজি নয়, ইংরাজি নয়,—শুধু বাংলা, শুধু এই সাত কোটি লোকের মাতৃভাষা ! শশী, পৃথিবীর প্রায় সকল ভাষাই আমি জানি, কিন্তু সহস্রদলে বিকশিত এমন মধু দিয়ে ভরা ভাষা আর নেই! আমি অনেক সময়ে ভাবি ভারতী, এমন অমৃত এ দেশে কবে কে এনেছিল?

ভারতীর চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল, সে কহিল, আর আমি ভাবি দাদা, দেশকে এতখানি ভালবাসতে তোমাকে কে শিখিয়েছিল। কোথাও যেন এর আর সীমা নেই!

ইহারই প্রতিধ্বনি তুলিয়া শশী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, এই বিগত গৌরবের গানই হবে আমার গান, এই ভালবাসার সুরই হবে আমার সুর। নিজের দেশকে বাঙলা দেশের লোকে যেন আবার তেমনি করে ভালবাসতে পারে এই শিক্ষাই হবে আমার শিক্ষা দেওয়া।

ডাক্তার বিস্মিত চোখে মুহূর্তকাল শশীর প্রতি চাহিয়া সুমিত্রার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবশেষে উভয়েই হাসিলেন। কিন্তু এই হাসির মর্ম অপর দুইজনে উপলব্ধি না করিতে পারিয়া দুইজনেই অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। ডাক্তার কহিলেন, আবার তেমনি করে ভালবাসবে কি? তুমি যে ভালবাসার ইঙ্গিত করছ শশী, সে ভালবাসা বাঙালী কস্মিন-কালেও বাঙলাদেশকে বাসেনি। তার তিলার্ধ থাকলেও কি বাঙালী বিদেশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে এই সাত কোটি ভাই-বোনকে অবলীলাক্রমে পরের হাতে সঁপে দিতে পারতো? জননী জন্মভূমি ছিল শুধু কথার কথা! মুসলমান বাদশার পায়ের তলায় অঞ্জলি দেবার জন্যে হিন্দু মানসিংহ হিন্দু প্রতাপাদিত্যকে জানোয়ারের মত করে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল। আর তাকে রসদ যুগিয়ে পথ দেখিয়ে এনেছিল বাঙালী! বর্গীরা দেশ লুট করতে আসত, বাঙালী লড়াই করত না, মাথায় হাঁড়ি দিয়ে জলে বসে থাকতো। মুসলমান দস্যুরা মন্দির ধ্বংস করে দেবতাদের নাক-কান কেটে দিয়ে যেতো, বাঙালী ছুটে পালাত, ধর্মের জন্যে গলা দিতো না। সে বাঙালী আমাদের কেউ নয়, কবি, গৌরব করবার মত তাদের কিচ্ছু ছিল না। তাদের আমরা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে চলবো,—তাদের ধর্ম, তাদের অনুশাসন, তাদের ভীরুতা, তাদের দেশদ্রোহিতা, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি,—তাদের যা-কিছু সমস্ত। সেই ত হবে তোমার বিপ্লবের গান, সেই ত হবে তোমার সত্যকার দেশপ্রেম!

শশী বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিল, এই উক্তির মর্ম গ্রহণ করিতে পারিল না।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন, তাদের কাপুরুষতায় আমরা বিশ্বের কাছে হেয়, স্বার্থপরতার ভারে দায়গ্রস্ত, পঙ্গু। শুধু কি কেবল দেশ? যে ধর্ম তারা আপনারা মানতো না, যে দেবতাদের

পরে তাদের নিজেদের আস্থা ছিল না, তাদেরই দোহাই দিয়ে সমস্ত জাতির আপাদমস্তক যুক্তিহীন বিধি-নিষেধের সহস্র পাকে বেঁধে দিয়ে গেছে। এ অধীনতা অনেক দুঃখের মূলে।

শশী ধীরে ধীরে কহিল, এ-সব আপনি কি বলচেন?

ভারতীর ক্ষোভের অবধি রহিল না, বলিল, দাদা, আজ আমি ক্রীশ্চান, কিন্তু তাঁরা আমারও পূর্বপিতামহ। তাঁদের আর যা দোষ থাক, ধর্মবিশ্বাসে প্রবঞ্চনা ছিল,—এরকম অন্যায় কটূক্তি তুমি করো না।

সুমিত্রা চুপ করিয়াই শুনিতেছিল, এখন কথা কহিল। ভারতীর প্রতি চাহিয়া বলিল, কারও সম্বন্ধেই কটূক্তি করা অন্যায়, কিন্তু অশ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করাও অন্যায়, এমন কি তিনি পূর্বপিতামহ হলেও। এতে মিষ্টতা থাকতে পারে কিন্তু যুক্তি নেই ভারতী, যা কুসংস্কার তাকে পরিত্যাগ করতে শেখো।

ভারতী নির্বাক হইয়া রহিল। ডাক্তার শশীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, কোন বস্তু কেবলমাত্র প্রাচীনতার জোরেই সত্য হয়ে ওঠে না, কবি। পুরাতনের গুণগান করতে পারাই বড় গুণ নয়। তাছাড়া, আমরা বিপ্লবী, পুরাতনের মোহ আমাদের জন্যে নয়। আমাদের দৃষ্টি, আমাদের গতি, আমাদের লক্ষ্য শুধু সুমুখের দিকে। পুরাতনের ধ্বংস করেই ত শুধু আমাদের পথ করতে হয়! এর মধ্যে মায়া-মমতার অবকাশ কৈ? জীর্ণ, মৃত পথ জুড়ে থাকলে আমরা পথের-দাবীর পথ পাবো কোথায়?

ভারতী কহিল, আমি কেবল তর্কের জন্যেই তর্ক করছি নে, আমি সত্যই তোমার কাছ থেকে আমার জীবনের পথ খুঁজে বেড়াচ্চি। তুমি পুরাতনের শত্রু, কিন্তু কোন একটা সংস্কার বা রীতিনীতি কেবলমাত্র প্রাচীন হয়েছে বলেই কি তা নিষ্ফল, বৃথা এবং পরিত্যাজ্য হয়ে যাবে? মানুষে তাহলে অসংশয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে কার পরে দাদা?

ডাক্তার বলিলেন, এতখানি ভারসহ বস্তু দুনিয়ায় কি আছে তা জানিনে। তবে এ কথা জানি, ভারতী, বয়সের সঙ্গে একদিন সমস্ত জিনিসই প্রচীন, জীর্ণ এবং অকেজো, সুতরাং পরিত্যাজ্য হয়ে ওঠো। প্রত্যহ মানুষেই এগিয়ে যাবে, আর তার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সহস্র বর্ষের প্রচীন রীতিনীতি একই স্থানে অচল হয়ে থাকবে, এমন হলে হয়ত ভাল হয়, কিন্তু তা হয় না। শুধু একটা বিপদ হয়েচে এই যে, কেবলমাত্র বছরের সংখ্যা দিয়েই কোন একটা সংস্কারের প্রচীনতা নিরূপণ করা যায় না। না হলে তুমিও আজ আমাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে, দাদা, যা-কিছু পুরাতন, যা-কিছু জীর্ণ সমস্ত নির্বিচারে নির্মম হয়ে ধ্বংস করে ফেলো, আবার নূতন মানুষ, নূতন জগতের প্রতিষ্ঠা হোক।

ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, নিজে তুমি পারো?

কি পারি, বোন?

যা-কিছু প্রাচীন, যা-কিছু পবিত্র, সমস্ত নির্মম-চিত্তে ধ্বংস করে ফেলতে?

ডাক্তার বলিলেন, পারি। সেই ত আমাদের ব্রত। পুরাতন মানেই পবিত্র নয়, ভারতী। মানুষ সত্তর বছরের প্রচীন হয়েছে বলেই সে দশ বছরের শিশুর চেয়ে বেশী পবিত্র হয়ে ওঠে না। তোমার নিজের দিকেই চেয়ে দেখ, মানুষের অবিশ্রাম চলার পথে ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম ত সকল দিকেই মিথ্যে হয়ে গেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কেউ ত আর সে আশ্রম অবলম্বন করে নেই। থাকলে তাকে মরতে হবে। সে যুগের সে বন্ধন আজ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে। তবুও তাকেই পবিত্র মনে করে কে জানো, ভারতী? ব্রাহ্মণ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত শক্ত নয় বোন! যে সংস্কারের মোহে অপূর্ব আজ তোমার মত নারীকেও ফেলে দিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে বড় অসত্য আর আছে কি? আর শুধু কি অপূর্বর বর্ণাশ্রম? তোমার ক্রীশ্চান ধর্মও আজ তেমনি অসত্য হয়ে গেছে, ভারতী, এর প্রাচীন মোহ তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

ভারতী ভীত হইয়া বলিল, যে ধর্মকে ভালবাসি, বিশ্বাস করি, তাকেই তুমি ত্যাগ করতে

বল দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, বলি। কারণ সমস্ত ধর্মই মিথ্যা,—আদিম দিনের কুসংস্কার। বিশ্বমানবতার এতবড় পরম শত্রু আর নেই।

ভারতী বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বলিল, দাদা, যেখানেই থাকো, তোমাকে আমি চিরদিন ভালবাসবো, কিন্তু এই যদি তোমার সত্যকার মত হয়, আজ থেকে তোমার আমার পথ একেবারে বিভিন্ন। একটা দিনও আমি ভাবিনি, এতবড় পাপের পথই তোমার পথের-দাবীর পথ।

ডাক্তার মুচকিয়া একটুখানি হাসিলেন।

ভারতী কহিল, আমি নিশ্চয় জানি, তোমার এই দয়াহীন নিষ্ঠুর ধ্বংসে পথে কিছুতেই কল্যাণ নেই। আমার স্নেহের পথ, করুণার পথ, ধর্ম-বিশ্বাসের পথ,—সেই পথই আমার শ্রেয়ঃ, সেই পথই আমার সত্য।

তাই ত তোমাকে আমি টানতে চাইনি, ভারতী। তোমার সম্বন্ধে ভুল করেছিলেন সুমিত্রা, কিন্তু আমার ভুল একটা দিনও হয়নি। তোমার পথেই তুমি চল গে। স্নেহের আয়োজন, করুণার প্রতিষ্ঠান জগতে অনেক খুঁজে পাবে, পাবে না শুধু পথের-দাবী,—পাবে না শুধু—বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের দৃষ্টি পলকের জন্য জ্বলিয়াই যেন নিবিয়া গেল। এই সংযত, অচঞ্চল ভাষাই সবচেয়ে ভীষণ। তিনি মুখ তুলিয়া বলিলেন, তোমাকে ত বহুবার বলেছি, ভারতী, কল্যাণ আমার কাম্য নয়, আমার কাম্য স্বাধীনতা। প্রতাপ চিতোর যখন জনহীন অরণ্যে পরিণত করেছিলেন, তখন, সমস্ত মারবাড়ে তার চেয়ে অকল্যাণের মূর্তি আর কোথাও ছিল না—সে আজ কত শতাব্দের কথা,—তবু সেই অকল্যাণই আজও সহস্র কল্যণের চেয়ে বড় হয়ে আছে! কিন্তু থাক এ-সব নিষ্ফল তর্ক যা আমার ব্রত তার কাছে কিছুই আমার অসত্য, অকল্যণ নেই।

ভারতী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তর্ক এবং মতভেদ অনেকদিন ত অনেকবারই হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এমন ধারা নয়। আজ তাহার সমস্ত মন যেন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

ডাক্তার ঘড়ির দিকে চাহিলেন, তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পরে সেই স্নিগ্ধ, সহজ হাসিমুখে কহিলেন, কিন্তু এদিকে যে নদীতে ফের জোয়ার এসে পড়বার সময় হয়ে এল ভারতী, ওঠো!

ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল।

ডাক্তার খাবারের পুঁটুলি হাতে করিয়া উঠিলেন, কহিলেন, সুমিত্রা, ব্রজেন্দ্র কোথায়?

সুমিত্রা উত্তর দিল না, নতমুখে মৌন হইয়া রহিল।

তোমাকে কি পৌঁছে দিয়ে আসবো?

সুমিত্রা ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, না।

ডাক্তার কি একটা পুনরায় বলিতে গেলেন, কিন্তু আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া শুধু কহিলেন, আচ্ছা। ভারতীকে কহিলেন, আর দেরি করো না দিদি, এস। এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

সুমিত্রা তেমনি নতমুখে বসিয়া রহিল। ভারতী তাঁহাকে নিঃশব্দে নমস্কার করিয়া ডাক্তারের অনুসরণ করিল।

উনত্রিশ

স্বপ্ন-চালিতের ন্যায় ভারতী নৌকায় আসিয়া বসিল, এবং নদী-পথের সমস্তক্ষণ নির্বাক নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। রাত্রি বোধ হয় তৃতীয় প্রহর হইবে ; আকাশের অসংখ্য নক্ষত্রালোকে পৃথিবীর অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে, নৌকা আসিয়া সেই ঘাটে ভিড়িল। হাত ধরিয়া ভারতীকে নামাইয়া দিয়া সব্যসাচী নিজে নামিবার উপক্রম করিতে ভারতী বাধা দিয়া কহিল, আমাকে পৌঁছে দিতে হবে না দাদা, আমি আপনিই যেতে পারবো।

একলাটি ভয় করবে না?

করবে। কিন্তু তা বলে তোমাকে আসতে হবে না।

সব্যসাচী কহিলেন, এইটুকু বৈ ত নয়, চল না তোমাকে খপ করে পৌঁছে দিয়ে আসি, বোন! এই বলিয়া তিনি নীচে সিঁড়ির উপরে পা বাড়াইতেই ভারতী হাত জোড়া করিয়া কহিল, রক্ষে কর দাদা, তুমি সঙ্গে গিয়ে ভয় আমার হাজার গুণে বাড়িয়ে দিয়ো না। তুমি বাসায় যাও।

বাস্তবিক, সঙ্গে যাওয়া যে অত্যন্ত বিপজ্জনক তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই ডাক্তার আর জিদ করিলেন না, কিন্তু ভারতী চলিয়া গেলেও বহুক্ষণ পর্যন্ত সেই নদীকূলে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বাসায় আসিয়া ভারতী চাবি খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল, আলো জ্বালিয়া চারিদিক সাবধানে নিরীক্ষণ করিল, তাহার পরে কোনমতে একটা শয্যা পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল। দেহ অবশ, মন অবসন্ন, তন্দ্রাতুর দুই চক্ষু শ্রান্তিতে মুদিয়া রহিল, কিন্তু কিছুতেই ঘুমাইতে পারিল না। ঘুরিয়া ফিরিয়া সব্যসাচীর এই কথাই তাহার বারংবার মনে হইতে লাগিল যে, এই পরিবর্তনশীল জগতে সত্যোপলব্ধি বলিয়া কোন নিত্যবস্তু নাই। তাহার জন্ম আছে, মৃত্যু আছে,—যুগে যুগে কালে কালে মানবের প্রয়োজনে তাহাকে নূতন হইয়া আসিতে হয়। অতীতের সত্যকে বর্তমানে স্বীকার করিতেই হইবে এ বিশ্বাস ভ্রান্ত, এ ধারণা কুসংস্কার।

ভারতী মনে মনে বলিল, মানবের প্রয়োজনে, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার প্রয়োজনে নূতন সত্য সৃষ্টি করিয়া তোলাই ভারতবাসীর সব চেয়ে বড় সত্য। অর্থাৎ, ইহার কাছে কোন পন্থাই অসত্য নয় ; কোন উপায়, কোন অভিসন্ধিই হেয় নয়। এই যে কারখানার কদাচারী কুলি-মজুরদের সৎপথে আনিবার উদ্যম, এই যে তাহাদের সন্তানদের বিদ্যাশিক্ষা দিবার আয়োজন, এই যে তাহাদের নৈশ বিদ্যালয়,—ইহার সমস্ত লক্ষ্যই আর কিছু—এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করিয়া লইতে সব্যসাচীর কোন দ্বিধা, কোন লজ্জা নাই। পরাধীন দেশের মুক্তিযাত্রায় আবার পথের বাচবিচার কি? একদিন সব্যসাচী বলিয়াছিলেন, পরাধীন দেশে শাসক এবং শাসিতের নৈতিক বুদ্ধি যখন এক হইয়া দাঁড়ায় তাহার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর দেশের নাই, ভারতী! সেইদিন এ কথার তাৎপর্য সে বুঝিতে পারে নাই, আজ সে অর্থ তাহার কাছে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

ঘড়িতে তিনটা বাজিয়া গেল। ইহার, পরে কখন যে তাহার চৈতন্য নিদ্রায় ও তন্দ্রায় আবিষ্ট হইয়া পড়িল তাহার মনে নাই, কিন্তু মনে পড়িল নিদ্রার ঘোরে সে বারবার আবৃত্তি করিয়াছে, দাদা, অতিমানুষ তুমি, তোমার পরে ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ আমার চিরদিনই অচল হয়ে থাকবে, কিন্তু, তোমার এ বিচার-বুদ্ধি আমি কোনমতেই গ্রহণ করতে পারব না। জগদীশ্বর করুন, তোমার হাত দিয়েই যেন তিনি স্বদেশের মুক্তি দান করেন, কিন্তু, অন্যায়কে কখনও ন্যায়ের মূর্তি দিয়ে দাঁড় করিয়ো না। তুমি পরম পণ্ডিত, তোমার বুদ্ধির সীমা নেই, তর্কে তোমাকে এঁটে ওঠা যায় না,—তুমি সব পারো। বিদেশীর হাতে পরাধীনের লাঞ্ছনা যে কত, দুঃখের সমুদ্রে কত যে আমাদের প্রয়োজন, দেশের মেয়ে হয়ে সে কি আমি জানিনে দাদা? কিন্তু তাই বলে প্রয়োজনকেই যদি সকলের শীর্ষে স্থান দিয়ে দুর্বলচিত্ত মানবের কাছে অধর্মকেই ধর্ম বলে সৃষ্টি কর, এ দুঃখের আর কখনো তুমি অন্ত পাবে না।

পরদিন ভারতীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন বেলা হইয়াছে। ছেলেরা দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকাডাকি করিতেছে, সে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া নীচে আসিয়া কবাট খুলিতেই জন-কয়েক ছাত্র ও ছাত্রী বই-শ্লেট লইয়া ভিতরে ঢুকিল। তাহাদের বসিতে বলিয়া ভারতী কাপড় ছাড়িতে উপরে যাইতেছিল, হোটেলের মালিক সরকার ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, অপূর্ববাবু তোমাকে কাল রাত থেকে খুঁজছেন দিদি।

ভারতী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে এসেছিলেন?

ঠাকুরমহাশয় কহিল, হাঁ। আজও সকাল থেকে বসে আছেন, গিয়ে পাঠিয়ে দি গে?

ভারতীর মুখ পলকের জন্য শুষ্ক হইয়া উঠিল, কহিল, আমাকে তাঁর কি দরকার?

ব্রাহ্মণ বলিল, সে ত জানিনে দিদি। বোধ হয় তাঁর মায়ের অসুখের সম্বন্ধেই কিছু বলতে চান।

ভারতী হঠাৎ রুষ্ট হইয়া উঠিল, বলিল, কোথায় তাঁর মায়ের কি অসুখ হয়েছে তার আমি কি করব?

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইল। অপূর্ববাবুকে সে ভাল করিয়াই চিনিত, তিনি পদস্থ ব্যক্তি, আগেকার দিনে এই গৃহে তাঁহার যত্ন এবং সমাদরের ত্রুটি ছিল না, সময়ে ও অসময়ে তাহার অনেক মালমশলা হোটেল হইতে তাহাকেই যোগাইয়া দিতে হইয়াছে। আজ অকস্মাৎ এই উত্তাপের সে হেতু বুঝিল না। কহিল, আমি ত সে-সব কিছু জানিনে দিদি, গিয়ে তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে যাইতে উদ্যত হইতেই ভারতী ডাকিয়া বলিল, সকালে আমার অনেক কাজ, ছেলে-মেয়েরা এসেছে তাদের পড়া বলে দিতে হবে, বলে দাও গে দেখা করবার এখন সময় হবে না।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল, তবে দুপুরে কি বৈকালে আসতে বলে দেব?

ভারতী কহিল, না, আমার সময় নেই। এই বলিয়া এ প্রস্তাব এইখানেই বন্ধ করিয়া দিয়া দ্রুতপদে উপরে চলিয়া গেল।

স্নান সারিয়া প্রস্তুত হইয়া যখন সে ঘন্টা-খানেক পরে নীচে নামিয়া আসিল, তখন ছেলে-মেয়েতে ঘর ভরিয়া গিয়াছে ও তাহাদের বিদ্যালাভের ঐকান্তিক উদ্যমে সমস্ত পাড়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। পূর্বে দু'বেলাই পাঠশালা বসিত, এখন লোকের অভাবে নৈশ বিদ্যালয়টা প্রায় বন্ধ হইয়াই গিয়াছে ; সুমিত্রা নাই, ডাক্তার আত্মগোপন করিয়াছেন, নবতারা অন্যত্র গিয়াছে, শুধু নিজের বাসা বলিয়া সকালবেলাটার কাজ ভারতী চালাইয়া লইতেছিল। প্রাত্যহিক নিয়মে আজও সে পড়াইতে বসিল, কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। পড়া দেওয়া এবং লওয়া আজ শুধু নিষ্ফল নয়, তাহার আত্মবঞ্চনা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তবুও কোনমতে এমনি করিয়া ঘন্টা-দুই কাটিলে পড়ুয়ারা যখন গৃহে চলিয়া গেল, তখন কি করিয়া যে সে আজিকার সমস্ত দিন কাটাইবে তাহা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। আর সকল ভাবনার মাঝে মাঝে আসিয়া অবিশ্রাম বাধা দিয়া যাইতে লাগিল অপূর্বর চিন্তা। তাহাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যে অশোভনতা যতই থাক, তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া যে ঢের মন্দ হইত এ বিষয়ে ভারতীর সন্দেহ ছিল না। কোন একটা অজুহাতে দেখা করিয়া সে পূর্বেকার অস্বাভাবিক সম্বন্ধটাকে আরও বিকৃত করিয়া তুলিতে চায়, না হইলে মায়ের অসুখ যদি, তবে সে এখানে বসিয়া করিতেছে কি? মা তাহার, ভারতীর নয়। তাঁহারই সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদে শয্যাপার্শ্বে ফিরিয়া যাওয়া যে পুত্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য তাহা কি পরের সহিত বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে? তাহার মনে পড়িল রোগের সম্বন্ধে অপূর্বর নিদারুণ ভয়। তাহার কোমলচিত্ত বাহিরে হইতে ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া যত ছটফটই করুক, রুগ্নের সেবা করিবার তাহার না আছে শক্তি, না আছে সাহস। এ ভার তাহার প্রতি ন্যস্ত করার মত সর্বনাশ আর নাই। এ সমস্তই ভারতী জানিত,—সে ইহাও জানিত জননীকে অপূর্ব কতখানি ভালবাসে। মায়ের জন্য করিতে পারে না পৃথিবীতে এমন তাহার কিছু নাই। তাঁহারই কাছে না যাইতে পারার দুঃখ অপূর্বর কত, ইহাই কল্পনা করিয়া একদিকে যেমন তাহার করুণার উদয় হইল, অন্যদিকে এই অসহ্য ভীরুতার ক্রোধে তাহার সর্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। ভারতী মনে মনে বলিল, শুশ্রূষা করিতে পারে না বলিয়াই কি পীড়িতা মায়ের কাছে গিয়া কোন লাভ নাই। এই উপদেশ আমার কাছে অপূর্ব প্রত্যাশা করে নাকি?

এমনি করিয়া এই দিক দিয়াই তাহার চিন্তার ধারা অবিশ্রাম প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাতার অসুখের সম্বন্ধে অপূর্বর আর কিছু যে জিজ্ঞাস্য থাকিতে পারে, এ ছাড়া অন্য কিছু যে ঘটিতে পারে যাহা তাহার প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করিয়াছে, ইহার আভাস পর্যন্ত তাহার

মাথায় প্রবেশ করিল না।

ক্ষুধার লেশমাত্র ছিল না বলিয়া আজ ভারতী রাঁধিবার চেষ্টা করিল না। বেলা যখন তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে, একখানা ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া তাহার দ্বারে লাগিল। ভারতী উপরের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্ময় ও শঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। মোটঘাট গাড়ির ছাদে চাপাইয়া শশী আসিয়া উপস্থিত। গতরাত্রের হাসি-তামাশাকে জগতে যে কোন মানুষই এমন বাস্তবে পরিণত করিয়া তুলিতে পরে, ভারতী বোধ হয় তাহা কল্পনা করিতেও পারিত না। কিন্তু ইহার কাছে অভাবনীয় কিছু নাই। রহস্য একেবারে মূর্তিমান সত্যরূপে সশরীরে আসিয়া হাজির হইল।

ভারতী দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গিয়া কহিল, একি ব্যাপার শশীবাবু? শশী স্মিতমুখে কহিল, বাসা তুলে দিয়ে এলাম। এবং তৎক্ষণাৎ গাড়োয়ানকে হুকুম করিয়া দিল, সমান সব কুছ উপরমে লে যাও—

ভারতী বিরক্তি দমন করিয়া কহিল, উপরে জায়গা কোথায় শশীবাবু?

শশী কহিল, আচ্ছা বেশ, তাহলে নীচের ঘরেই রাখুক।

ভারতী বলিল, নীচের ঘরে পাঠশালা, সেখানেও সুবিধে হবে না।

শশী চিন্তিত হইয়া উঠিল। ভারতী তাহাকে ভরসা দিয়া কহিল, এক কাজ করা যাক শশিবাবু। হোটেল ডাক্তারের ঘরটা ত আজও খালি পড়ে আছে, আপনি সেখানেই বেশ থাকবেন। খাওয়া-দাওয়ারও কষ্ট হবে না, চলুন।

কিন্তু ঘরের ভাড়া লাগবে ত?

ভারতী হাসিয়া ফেলিল, কহিল, না, তাও লাগবে না, ছ মাসের ভাড়া দাদা দিয়ে গেছেন। ঠাকুরের হোটেলের মধ্যে কবিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতী যখন ফিরিয়া আসিল তখন রাত্রি হইয়াছে। আজ সকল দিক দিয়া তাহার শ্রান্তি ও চিন্তার আর অবধি ছিল না, পাছে শশী কিংবা আর কেহ আসিয়া তাহার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতায় বিঘ্ন ঘটায় এই আশঙ্কায় সে নীচের ও উপরের সমস্ত দরজা-জানালা রুদ্ধ করিয়া দিয়া নিজের শোবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

অভ্যাসমত পরদিন প্রত্যূষে যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন অনাহারের দুর্বলতায় সমস্ত শরীর এমনি অবসন্ন যে শয্যাত্যাগ করিতেও ক্লেশ বোধ হইল। তৃষ্ণায় বুকের মধ্যেটা শুকাইয়া মরুভূমি হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং দেহ-ধারণের এ দিকটায় অবহেলা করিলে আর চলিবে না, তাহা সে বুঝিল।

খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিয়াও যে ভারতী খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সত্যই বাচবিচার করিয়া চলিত, এ কথা বলিলে তাহার প্রতি অবিচার করা হয়। তথাপি, মনে হয় সে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত হইতেও পারে নাই। যে ব্যক্তিকে তাহার জননী বিবাহ করিয়াছিলেন, সে অত্যন্ত অনাচারী ছিল, তাহার সহিত একত্রে বসিয়াই ভারতীকে ভোজন করিতে হইত তাই বলিয়া বূর্বেকার দিনের অখাদ্য-বস্তু কোনদিনও তাহার খাদ্য হইয়া উঠে নাই। ছোঁছোঁয়ির বিড়ম্বনা তাহার ছিল না, কিন্তু যেখানে-সেখানে যাহার-তাহার হাতে খাইতেও তাহার অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হইত। মায়ের মৃত্যুর পরে হইতে সে খরচের দোহাই দিয়া বরাবর নিজে রাঁধিয়াই খাইত। শুধু অসুস্থ হইয়া পড়িলে, বা কাজের ভিড়ে অতিশয় ক্লান্তি বা একান্ত সময়াভাব ঘটিলেই, কদাচিৎ কখনও ঠাকুর-মহাশয়ের হোটেল হইতে সাগু বার্লি বা রুটি আনাইয়া খাইত। বিছানা হইতে উঠিয়া সে হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রস্তুত হইল, কিন্তু রান্না করিয়া লইবার মত জোর বা প্রবৃত্তি আজ তাহার ছিল না, তাই হোটেল হইতে রুটি ও কিছু তরকারি তৈরি করিয়া দিবার জন্য ঠাকুর-মহাশয়কে খবর পাঠাইল। সোমবারে তাহাদের পাঠশালা বন্ধ থাকিত বলিয়া আজ এ দিকের পরিশ্রম তাহার ছিল না।

অনেক বেলায় ঝি খাবারের থালা হাতে করিয়া আনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল, বড্ড বেলা হয়ে গেল দিদিমনি—

ভারতী তাহার নিজের থালা ও বাটি আনিয়া টেবিলের উপরে রাখিল। হিন্দু হোটেলের শুচিতা রক্ষা করিয়া ঝি দূর হইতে সেই পাত্রে রুটি ও তরকারি এবং বাটিতে ডাল ঢালিয়া দিতে দিতে কহিল, নাও বসো, যা পারো দুটো মুখে দাও।

ভারতী তাহার মুখের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিল, কিছু বলিল না। ঝির বক্তব্য তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিতে লাগিল, ওখান থেকে ফিরে এসে শুনি তোমার অসুখ। একলা হাতে তখন থেকে ধড়ফড় করে মরচি দিদিমণি, কিন্তু এমন কেউ নেই যে দুখানা রুটি বেলে দেয়। আর দেরি করো না দিদি, বসো।

ভারতী মৃদুকণ্ঠে কহিল, তুমি যাও ঝি, আমি বসচি।

ঝি কহিল, যাই। চাকরটা ত সঙ্গে গেল, একলা সমস্ত ধোয়া মাজা,—যাহোক, ফিরে এসে কুড়িটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বাবু কেঁদে ফেলে বললেন, ঝি, শেষ সময়ে তুমি যা করলে মার মেয়ে কাছে থাকলে এমন করতে পারতো না। তিনিও যত কাঁদেন আমিও তত কাঁদি, দিদিমণি! আহা, কি কষ্ট! বিদেশ-বিভুঁই, কেউ নেই আপনার লোক কাছে,—সুমুদ্দুর পথ, টেলিগ্রাফ করলেই ত আর বউ-ব্যাটা উড়ে আসতে পারে না—তাদেরই বা দোষ কি?

ভারতীর বুকের ভিতরটা উদ্বেগ ও অজানা আশঙ্কায় হিম হইয়া উঠিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া শুধু স্থির হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ঝি বলিতে লাগিল, ঠাকুরমশাই ডেকে বললেন, বাবুর মায়ের বড় ব্যামো, তোমাকে যেতে হবে ক্ষান্ত! আমি আর না বলতে পারলুম না। একে নিমোনিয়া রুগী, তাতে ধর্ম্মশালার ভিড়, জানালা-কবাট সব ভাঙ্গা, একটাও বন্ধ হয় না—কি আতন্তর! মারা গেলেন বেলা পাঁচটার সময়, কিন্তু মেসের বাবুদের সব খবর দিতে, ডাকতে হাঁকতে, মড়া উঠলো সেই দুটো-আড়াইটে রেতে। ফিরে আসতে তাঁদের বেলা হল,—একলাটি সমস্ত ধোয়া মোছা—

এইবার ভারতীর বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, অপূর্ব্ববাবুর মা মারা গেলেন বুঝি?

ঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হাঁ দিদিমণি, তাঁর বর্মায় যেন মাটি কেনা ছিল। সেই যে কথায় কি বলে, না ভাড়া করে যায় সেখানে—এ ঠিক তাই। অপূর্ব্ববাবুও এখান থেকে বেরিয়েছেন, তিনিও ব্যাটার সঙ্গে ঝগড়া করে সেখানে জাহাজে উঠেছেন, সঙ্গে কেবল একজন চাকর। জাহাজেই জ্বর, ধর্ম্মশালায় নেমে একেবারে অজ্ঞান অচৈতন্য। বাড়িতে পা দিয়েই বাবু ফিরতি জাহাজে ফিরে এসে দেখেন মা যায়-যায়। গেলেনও তাই,—কিন্তু দাঁড়িয়ে এক দণ্ড কথা কবার জো নেই দিদিমণি, এখনি সবাই আবার বার হবে। আসবো তখন সন্ধ্যাবেলায়,—এই বলিয়া সে গল্প করার প্রলোভন সংবরণ করিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রুটির থালা তেমনি পড়িয়া রহিল, প্রথমে দুই চক্ষু তাহার ঝাপসা হইয়া উঠিল, তাহার পরে বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা গণ্ড বাহিয়া ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। অপূর্ব্বর মাকে সে দেখেও নাই, এবং স্বামী-পুত্র লইয়া এ জীবনে তিনি অনেক দুঃখ পাইয়াছেন—এ ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে সে বিশেষ কিছু জানিতও না, কিন্তু কতদিন নিজের নিরালা ঘরের মধ্যে সে রাত্রি জাগিয়া এই বর্ষীয়সী বিধবা রমণীর সম্বন্ধে কত কল্পনাই না করিয়াছে! সুখের মাঝে নয়, দুঃখের দিনে কখনো যদি দেখা হয়, যখন সে ছাড়া আর কেহ তাঁহার কাছে নাই, তখন ক্রীশ্চান বলিয়া কেমন করিয়া তাহাকে তিনি দূরে সরাইয়া দিতে পারেন—এ কথা জানিবার তাহার ভারী সাধ ছিল। বড় সাধ ছিল দুর্দ্দিনের সেই অগ্নিপরীক্ষায় আপন-পর সমস্যার সে শেষ সমাধান করিয়া লইবে। ধর্ম্মমতভেদই এ জগতে মানুষের চরম বিচ্ছেদ কি না, এই সত্য যাচাই করিবার সেই পরম দুঃসময়ই ভাগ্যে তাহার আসিয়াছিল, কিন্তু সে গ্রহণ করিতে পারে নাই। এ রহস্য এ জীবনে অমীমাংসিতই রহিয়া গেল!

আর, অপূর্ব্ব! সে যে আজ কত বড় নিঃসহায়, কতখানি একা, ভারতীর অপেক্ষা তাহা কে বেশী জানে? হয়ত, মাতার একান্ত মনের আশীর্ব্বাদই তাহাকে কবচের মত অদ্যাবধি

রক্ষা করিয়া আসিতেছিল, আজ তাহা অন্তর্হিত হইল। ভারতী মনে মনে বলিল, এ-সকল তাহার আকাশকুসুম, তাহার নিগূঢ় হৃদয়ের স্বপ্ন-রচনা বৈ আর কিছু নয়, তবু যে সেই স্বপ্ন তাহার নির্দেশহীন ভবিষ্যতের কতখানি স্নিগ্ধ-শ্যাম-শোভায় অপরূপ করিয়া রাখিত সে ছাড়া এ কথাই বা আরকে জানে? কে জানে তাহার চেয়ে বেশী, ঘরে-বাহিরে অপূর্ব আজ কিরূপ নিরুপায়, কতখানি সঙ্গিহীন!

এই প্রবাসভূমে হয়ত অপূর্বর কর্ম নাই, হয়ত আত্মীয়-স্বজন তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, ভীরু লোভী নীচাশয় বলিয়া বন্ধুজনমধ্যে সে নিন্দিত,—আর সকল দুঃখের বড় দুঃখ মা আজ তাহার লোকান্তরিত। ভারতীর মনে হইল, পরিচিত কাহারও কাছে অপূর্ব লজ্জায় যাইতে পারে নাই বলিয়াই বোধ হয় সকল লজ্জা বিসর্জন দিয়া সে বারবার তাহারই কাছে ছুটিয়া আসিয়াছিল। উদ্যমের পটুতা, ব্যবস্থার শৃঙ্খলা, কার্যের তৎপরতা কিছুই তাহার নাই, অথচ, অতিথিশালার অসহ্য জনতা ও কোলাহল, এবং সর্ববিধ অভাব ও অসুবিধার মধ্যে সেই মায়ের মৃত্যু যখন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে, তখন একাকী কি করিয়া যে তাহার মুহূর্তগুলি কাটিয়াছে এই কথা কল্পনা করিয়া চোখের জল তাহার যেন থামিতে চাহিল না। চোখ মুছিতে মুছিতে যে কথা তাহার বহুবার মনে হইয়াছে, সেই কথাই স্মরণ হইল, যেন সকল দুঃখের সূত্রপাত অপূর্বর তাহার সহিত পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম লইয়াছে। না হইলে, পিতা ও অগ্রজের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিকূলে যখন সে মাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া শতেক দুঃখ সহিয়াছে তখন স্বার্থবুদ্ধি তাহাকে সত্যপথ-ভ্রষ্ট করে নাই কেন? দুর্বলতা তখন ছিল কোথায়? স্বধর্মাচরণে আস্থা ও প্রগাঢ় নিষ্ঠা,—সমস্তই যাহার মায়ের মুখ চাহিয়া ; সে কি সত্যই এমনি ক্ষুদ্রাশয়? তাহার পূজা-অর্চনা ; তাহার গঙ্গাস্নান, তাহার টিকি রাখা,—তাহার সকল কার্য, সকল অনুষ্ঠান—হোক না ভ্রান্ত,হোক না মিথ্যা, তবু ত সে সকল বিদ্রূপ, সকল আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া অটল হইয়া ছিল! এ কি অপূর্বর অস্থির-চিত্ততার এত বড়ই নিদর্শন? আজ তবে সেই লোক বর্মায় আসিয়া এমন হইয়া গেল কিরূপে? এবং এতকাল এতখানি দুর্বলতা তাহার লুকানো ছিল কোন্‌খানে? সব্যসাচীর কাছে উত্তর জানিতে গিয়া কতদিন এই প্রশ্নই তাহার মুখে বাধিয়া গিয়াছে। শুধু ত কৌতূহলবশেই নয়, হৃদয়ের ব্যথার মধ্যে দিয়াই সে কতবার ভাবিয়াছে, এ সংসারে যাহা কিছু জানা যায় দাদা ত সমস্তই জানেন, তবে এ সমস্যারও উচ্ছেদ তিনিই করিয়া দিবেন। কেবল সঙ্কোচ ও শরমেই সে অপূর্বর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে পারে নাই।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা নূতন প্রশ্ন তাহার মনে আসিল। কর্মদোষে যখন সবাই অপূর্বর প্রতি বিরূপ, তখনও শুদ্ধমাত্র যে লোকটির সহানুভীতি হইতে সে বঞ্চিত হয় নাই,—সে সব্যসাচী। কিন্তু, কিসের জন্য? শুধু কি কেবল ভগিনী বলিয়া তাহারই সমবেদনায়? তাঁহার স্নেহ পাইবার মত নিজস্ব কি অপূর্বর কিছুই ছিল না? সত্য সত্যই কি ভারতী এত ক্ষুদ্রেই এত বৃহৎ ভালবাসা সমর্পণ করিয়া বসিয়াছে! সে দুর্দিনে সতর্ক করিবার মত পুঁজি কি কিছুই তাহার ছিল না? হৃদয় কি তাহার এমনি কাঙাল, এমনি দেউলিয়া হইয়াই ছিল!

এমনি করিয়া একভাবে বসিয়া ঘন্টা-দুই সময় যখন কোথা দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, ঝি ফিরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন হোটেলের জরুরী কাজের মধ্যে সমস্ত আলোচনা নিঃশেষ করিয়া যাইবার তাহার অবসর ছিল না, এখন একটুখানি ছুটি পাইয়াছে। অপূর্ব ও ভারতীর মাঝখানে যে একটি রহস্যময় মধুর সম্বন্ধ আছে তাহা আভাসে-ইঙ্গিতে অনেকেই জানিত, ঝিরও অবিদিত ছিল না। তবে, সহসা এমন কি ঘটিল যাহাতে অপূর্বর এতবড় বিপদের দিনেও ভারতী তাহার ছায়া-স্পর্শ করিল না? স্ত্রীলোক হইয়া এতবড় সংবাদটা না জানা পর্যন্ত ক্লান্তর মুখে অন্ন-জল রুচিতেছিল না। তাই সে কোন একটা অছিলায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে অবাক হইল, পরে কহিল, কিছুই ত ছোঁওনি দেখচি।

ভারতী লজ্জা পাইয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, না!

ঝি মাথা নাড়িয়া, কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া কহিল, খাওয়া যায় না, দিদিমণি, যে কাণ্ড

চোখে দেখে এলুম। বিশ্বাস না হয় গিয়ে দেখবে চল, ভাতের থালা আমার যেমন তেমনি পড়ে রয়েছে,—মুখ দিয়েছি কি না দিয়েছি।

ইহার অবাঞ্ছিত সমবেদনায় ভারতীর সঙ্কোচের অবধি রহিল না। জোর করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, কাউকে দিয়ে একখানা গাড়ি ডাকিয়ে দাও না ঝি।

যাবে বুঝি?

হাঁ, একবার দেখি গিয়ে কি হল।

ক্ষান্ত বলিল, আজ সকালে ঠাকুরমশায়কে কি সাধ্যি-সাধনা। আমি শুনে বলি সে কি কথা! মানুষের আপদে-বিপদে করব না ত আর করব কবে? হাতের কাজ পড়ে রইল, যেমন ছিলুম, তেমনি বেরিয়ে পড়লুম। ভাগ্যি তবু—

সেই-সমস্ত পুনরাবৃত্তির আশঙ্কায় ভারতী ব্যস্ত হইয়া উঠিল। বাধা দিয়া কহিল, তুমি অসময়ে যা করেছ তার তুলনা নেই। কিন্তু, আর দেরি কর না ঝি, গাড়ি একখানা আনিয়ে দাও। আমার যেতে হলে একটু বেলাবেলি যাওয়াই ভাল। ঘরের কাজকর্ম ততক্ষণ সেরে রাখি।

ঝি লোক মন্দ নয়। সে গাড়ি ডাকিতে গেল, এবং দুঃসময়ে সাহায্য করিবার আগ্রহে এমন কথাও জানাইল যে , ঘরের কাজকর্ম আজ না হয় সে-ই করিয়া দিবে। এমন কি খাবার জিনিসগুলো যখন ছোঁয়া যায় নাই, তখন তাহাও পরিষ্কার করিয়া দিতে তাহার বাধা নাই। শেষে কাপড় ছাড়িয়া গঙ্গাজল মাথায় দিলেই চলিবে। বিদেশ-বিভুঁয়ে এমন করিতেই হয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিনিট-পনেরো পরে গাড়ি আসিয়া পৌঁছিলে ভারতী সঙ্গে কিছু টাকা লইয়া ঘরে-দ্বারে তালা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পান্থশালায় আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখনও বেলা আছে। দ্বিতলের একখানা উত্তর ধারের ঘর দেখাইয়া দিয়া হিন্দুস্থানী দরোয়ান জানাইয়া দিল যে, বাঙালী বাবু ভিতরেই আছেন ; এবং বাঙালী রমণীর কাছে বাংলা ভাষাতেই প্রকাশ করিয়া জানাইল যে, যেহেতু তিন দিনের বেশী থাকার রুল নাই, অথচ ছয় দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তখন ম্যানিজর্ সাবের লুটীশ হইলে তাহার নোক্‌রিতে বহুত গোলমাল হইয়া যাইবে।

ভারতী ইঙ্গিত বুঝিল। অঞ্চল খুলিয়া গুটি-দুই টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া তাহারই নির্দেশমত উপরের ঘরে আসিয়া দেখিল, সমস্ত মেঝেটা তখনও জলে থৈথৈ করিতেছে, জিনিসপত্র চারিদিকে ছড়ানো, এবং তাহারই একধারে একখানা কম্বলের উপরে অপূর্ব উপুড় হইয়া পড়িয়া। নূতন উত্তরীয় বস্ত্রখানা মুখের উপর চাপা দেওয়া,—সে জাগিয়া আছে কিংবা ঘুমাইতেছে তাহা বুঝা গেল না। ভারতী শুনিয়াছিল সঙ্গে চাকর আসিয়াছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও সে ছিল না, কারণ, অপরিচিত তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া কেহ নিষেধ করিল না। মিনিট পাঁচ-ছয় স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া ভারতী ধীরে ধীরে ডাকিল, অপূর্ববাবু!

অপূর্ব উঠিয়া বসিয়া তাহার মুখের প্রতি একবার চাহিল, তারপরে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দ স্থিরভাবে থাকিয়া চোখ তুলিয়া সোজা হইয়া বসিল। সদ্য-মাতৃ-বিয়োগের সীমাহীন বেদনা তাহার মুখের উপরে জমাট হইয়া বসিয়াছে, কিন্তু আবেগের চাঞ্চল্য নাই,—শোকাচ্ছন্ন গভীর দৃষ্টির সম্মুখে এ পৃথিবীর সমস্ত কিছুই যেন তাহার একেবারে মিথ্যা হইয়া গেছে। মাতার পক্ষপুটচ্ছায়াবাসী যে অপূর্বকে একদিন সে চিনিয়াছিল, এ সে মানুষ নয়। আজ তাহাকে মুখোমুখি দেখিয়া ভারতী বিস্ময়ে এমনি অবাক হইয়া রহিল যে, কোন্ কথা বলিবে, কি বলিয়া ডাকিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু ইহার মীমাংসা করিয়া দিল অপূর্ব নিজে। সে-ই কথা কহিল, বলিল, এখানে বসবার কিছু নেই, ভারতী, সমস্তই ভিজে, তুমি বরঞ্চ ঐ তোরঙ্গটার উপরে বস।

ভারতী উত্তর দিল না, কবাটের চৌকাঠ ধরিয়া নতনেত্রে যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি

স্থির হইয়া রহিল। তাহার পরে বহুক্ষণ অবধি দুজনের কেহই কোন কথা কহিতে পারিল না।

হিন্দুস্থানী চাকরটা তেল কিনিতে দোকানে গিয়াছিল, সে ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে বিস্মিত হইল, পরে হারিকেন লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল।

অপূর্ব কহিল, ভারতী, বস।

ভারতী বলিল, বেলা নেই, বসলে সন্ধ্যে হয়ে যাবে যে।

এখখুনি যাবে? একটুও বসতে পারবে না?

ভারতী ধীরে ধীরে গিয়া সেই তোরঙ্গটার উপরে বসিয়া একমুহূর্তে মৌন থাকিয়া বলিল, মা যে এখানে এসেছিলেন আমি জানতাম না। তাঁকে দেখিনি, কিন্তু বুকের ভেতরটা আমার পুড়ে যাচ্চে। এ নিয়ে তুমি আমাকে আর দুঃখ দিয়ো না। বলিতে বলিতে চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল।

অপূর্ব স্তব্ধ হইয়া রহিল। ভারতী অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, সময় হয়েছিল, মা স্বর্গে গেছেন। প্রথমে মনে হয়েছিল, এ জন্মে তোমাকে আর আমি মুখ দেখাতে পারবো না, কিন্তু এমন করে তোমাকে ফেলে রেখেই বা আমি থাকবো কি করে? সঙ্গে গাড়ি আছে, ওঠো, আমার বাসায় চল। আবার তাহার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল।

ভারতীর ভয় ছিল অপূর্ব হয়ত শেষ পর্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কিন্তু তাহার শুষ্ক চক্ষে জলের আভাস পর্যন্ত দেখা দিল না, শান্তস্বরে কহিল, অশৌচের অনেক হাঙ্গামা ভারতী, ওখানে সুবিধে হবে না। তাছাড়া এই শনিবারের স্টিমারেই আমি বাড়ি ফিরে যাবো।

ভারতী বলিল, শনিবারের এখনো চার দিন দেরি। মায়ের মৃত্যুর পরে হাঙ্গামা যে একটু থাকে সে আমি জানি, কিন্তু সইতে পারবো না আমি, আর পারবে এই অতিথিশালার লোকে? চল।

অপূর্ব মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

ভারতী কহিল, না বললেই যদি এই অবস্থায় ফেলে রেখে তোমাকে যেতে পারতাম, আমি আসতাম না, অপূর্ববাবু। এই বলিয়া সে একমুহূর্তে নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, এতদিনের পরে তোমাকে ঢেকে বলবার, লজ্জা করে বলবার আর আমার কিছুই নেই। মায়ের শেষ কাজ বাকী—শনিবারের জাহাজে তোমাকে বাড়ি ফিরে যেতেই হবে এবং পরে যে কি হবে সেও আমি জানি। তোমার কোন ব্যবস্থাতেই আমি বাধা দেব না, কিন্তু এ সময়ে এ কটা দিনও যদি তোমাকে চোখের ওপর না রাখতে পারি, ত তোমারই দিব্যি করে বলচি, বাসায় ফিরে গিয়ে আজ আমি বিষ খেয়ে মরবো। মায়ের শোক তাতে বাড়বে বৈ কমবে না, অপূর্ববাবু।

অপূর্ব অধোমুখে মিনিট-দুই চুপ করিয়া রহিল, তাহার পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চাকরটাকে তাহলে ডাকো, জিনিসপত্রগুলো সব বেঁধে ফেলুক।

জিনিসপত্র সামান্যই ছিল, গুছাইয়া বাঁধিয়া গাড়িতে তুলিতে আধ-ঘন্টার অধিক সময় লাগিল না। পথের মধ্যে ভারতী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা আসতে পারলেন না?

অপূর্ব কহিল, না, তাঁর ছুটি হলো না।

এখানকার চাকরি কি ছেড়ে দিয়েছ?

হাঁ, সে একরকম ছেড়েই দেওয়া।

মা'র কাজকর্ম চুকে গেলে কি এখন বাড়িতেই থাকবে?

অপূর্ব কহিল, না। মা নেই, প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা দিনও ও-বাড়িতে আমি থাকতে পারবো না। শুনিয়া ভারতীর মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

ত্রিশ

পরিত্যক্ত, পতনোম্মুখ, ঘন-বনাচ্ছন্ন যে জীর্ণ মঠের মধ্যে একদিন অপূর্বর অপরাধের বিচার হইয়াছিল, আজ আবার সেই কক্ষেই পথের-দাবী আহূত হইয়াছে। সেদিনের সেই

অবরুদ্ধ গৃহতলে যে দুর্জয় ক্রোধ ও নির্মম প্রতিহিংসার অগ্নি দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়াছিল, আজ তাহার স্ফুলিঙ্গমাত্র নাই। সে বাদী নাই, প্রতিবাদী নাই, কাহারো বিরুদ্ধে কাহারো নালিশ নাই, আজ শঙ্কা ও নৈরাশ্যের দুঃসহ বেদনায় সমস্ত সভা নিষ্প্রভ, বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ। ভারতীর চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু,—সুমিত্রা অধোমুখে নীরব, স্থির। তলওয়ারকর ধরা পড়িয়াছে; রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষতদেহে সে জেলের হাসপাতালে,—আজও তাহার ভাল করিয়া জ্ঞান হয় নাই। তাহার স্ত্রী শিশুকন্যা লইয়া পথে পথে ঘুরিয়া অনেক দুঃখে কাল সন্ধ্যায় কে একজন মারহাট্টি ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় পাইয়াছে। সুমিত্রা সন্ধান লইয়া তাহার পিতৃগৃহে আজ তার করিয়াছে কিন্তু এখনও জবাব আসে নাই।

ভারতী ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, তলওয়ারকর-বাবুর কি হবে দাদা?

ডাক্তার কহিলেন, হাসপাতাল থেকে যদি বেঁচে ওঠে, জেল খাটবে।

ভারতী মনে মনে শিহরিয়া উঠিল, বলিল, না বাঁচতেও ত পারেন?

ডাক্তার কহিলেন, অন্ততঃ অসম্ভব নয়। তারপরে সুদীর্ঘ কারাবাস।

ভারতী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছোট্টমেয়ে,—তাদের কি হবে?

সুমিত্রা এ কথার জবাব দিয়া কহিল, হয়ত দেশ থেকে তাঁর বাপ এসে নিয়ে যাবেন।

ভারতী বলিল, হয়ত! ধরুন, যদি কেউ না আসেন? যদি কেউ না থাকে?

ডাক্তার হাসিলেন, বলিলেন, বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে মানুষ অকস্মাৎ মারা গেলে তার নিরুপায় বিধবার যে দশা হয়, এদেরও তাই হবে। একটুখানি থামিয়া কহিলেন, আমরা গৃহী নই, আমাদের ধনসম্পদ নেই, বিদেশীর আইনে নিজের জন্মভূমিতেও আমাদের মাথা রাখবার ঠাঁই নেই,—বন্য পশুর মত আমরা বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াই,—সংসারীর দুঃখ মোচন করবার ত আমাদের শক্তি নেই ভারতী।

ভারতী ব্যথিত হইয়া কহিল, তোমাদের নেই, কিন্তু যাঁদের এ-সব আছে,—আমাদের এই দেশের লোকে কি এঁদের দুঃখ দূর করতে পারে না দাদা?

ডাক্তার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু করবে কেন দিদি? তারা ত এ কাজ করতে আমাদের বলে না! বরঞ্চ আমরা তাদের স্বস্তির বাধা, আরামের অন্তরায়,—আমাদের তারা সোনার চক্ষে দেখে না। ইংরাজ যখন দম্ভভরে প্রচার করে, ভারতীবর্ষীয়েরা স্বাধীনতা চায় না, পরাধীনতাই কামনা করে, তখন ত তারা নেহাত মিথ্যে বলে না! আর যুগ-যুগান্তের অন্ধকারের মধ্যে বসে দু চোখের দৃষ্টি যাদের বন্ধ হয়ে গেছে তাদের বিরুদ্ধেই বা হাহুতাশ করবার কি আছে ভারতী!

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া কহিলেন, বিদেশী রাজার জেলের মধ্যে যদি আজ তলওয়ারকরকে মরতেই হয়, পরলোকে দাঁড়িয়ে স্ত্রী-কন্যাকে পথে পথে ভিক্ষে করতে দেখে চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়বে, কিন্তু নিশ্চয় জেনো, দেশের লোকের বিরুদ্ধে সে ভগবানের কাছেও কখনো একটা নালিশ জানাবে না। আমি তাকে চিনি, লজ্জায় তার মুখ ফুটবে না।

ভারতী অস্ফুটে কহিল, উঃ!

কৃষ্ণ আইয়ার বাংলা বলিতে পারিত না, কিন্তু মাঝে মাঝে বুঝিতে ; সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু কহিল, ইয়েস, ট্রু!

ডাক্তার বলিলেন, হাঁ, এই ত সত্য! এই ত বিপ্লবীর চরম শিক্ষা! কান্না কার তরে? নালিশ কার কাছে? দাদার যদি ফাঁসি হয়েছে শোনো, জেনো, বিদেশীর হুকুমে সে ফাঁসি তার দেশের লোকেই তার গলায় বেঁধে দিয়েছে! দেবেই ত! কসাইখানা থেকে গরুর মাংস গরুতেই ত বয়ে নিয়ে আসে! তার আবার নালিশ কিসের বোন?

ভারতী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, দাদা, এই ত তোমাদের পরিণাম!

ডাক্তারের চোখ জ্বলিয়া উঠিল, কহিলেন, একি তুচ্ছ পরিণাম ভারতী? জানি, দেশের

লোকে এর দাম বুঝবে না, হয়ত উপহাসও করবে, কিন্তু যাকে এই ঋণ একদিন কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে, হাসি তার মুখে কিন্তু সহজে যোগাবে না। এই বলিয়া সহসা নিজেই হাসিয়া কহিলেন, ভারতী, নিজে ক্রীশ্চান হয়ে তুমি তোমার ধর্মের গোড়ার কথাটাই ভুলে গেলে? যিশুখ্রীষ্টের রক্তপাত কি সংসারে ব্যর্থই হয়েছে ভাবো?

সকলেই স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, ডাক্তার পুনশ্চ কহিলেন, তোমরা ত জানো বৃথা নরহত্যার আমি কোনদিন পক্ষপাতী নই, ও আমি সর্বন্তঃকরণে ঘৃণা করি। নিজের হাতে আমি একটা পিঁপড়ে মারতেও পারিনে। কিন্তু প্রয়োজন হলে,—কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা সায় দিয়া বলিল, সে আমি জানি, নিজের চোখেই ত আমি বার-দুই দেখেচি।

ডাক্তার কহিলেন, দূর থেকে এসে যারা জন্মভূমি আমার অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল,—সমস্ত যে কেড়ে নিলে তারই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আর রইল না আমার? এ ধর্মবুদ্ধি তুমি কোথায় পেলে ভারতী? ছি!

কিন্তু আজ ভারতী অভিভূত হইল না, সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িতে কহিল, না দাদা, আজকে আমাকে তুমি কিছুতেই লজ্জা দিতে পারবে না। এ-সব পুরানো কথা,—হিংসার পথে যারাই প্রবৃত্তি দেয়, তারাই এমনি করে বলে। এই শেষ কথা নয়, জগতে এর চেয়েও ঢের বড় কথা আছে।

ডাক্তার কহিলেন, কি আছে বল শুনি?

ভারতী উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিল, আমি জানিনে, কিন্তু তুমি জানো। যে বিদ্বেষ তোমার সত্যবুদ্ধিকে এমন একান্তভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, একবার তাকে ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে এসো, তোমার জ্ঞান, তোমার প্রতিভার কাছে পরাস্ত মানবে না এমন সমস্যা পৃথিবীতে নেই। জোরের বিরুদ্ধে জোর, হিংসার বদলে হিংসা, অত্যাচারের পরিবর্তে অত্যাচার এ তো বর্বরতার দিন থেকেই চলে আসচে। এর চেয়ে মহৎ কিছু কি বলা যায় না?

কে বলবে?

ভারতী অকুণ্ঠিতস্বরে কহিল, তুমি।

ঐটি আমাকে মাপ করতে হবে ভাই। সাহেবের বুটের তলায় চিত হয়ে শুয়ে শান্তির বাণী আমার মুখ দিয়ে ঠিক বার হবে না,—হয়ত আটকাবে। বরঞ্চ ও ভার শশীকে দাও, তোমার খাতিরে ও পারবে। এই বলিয়া ডাক্তার হাসিলেন।

ভারতী ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, তুমি ঠাট্টা করলে বটে, কিন্তু যাঁদের পরে তোমার এত বিদ্বেষ, সেই ইংরেজ মিশনারিদেরই অনেকের কাছে বলে দেখেচি তাঁরা সত্যই আনন্দলাভ করেন।

ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, অত্যন্ত স্বাভাবিক ভারতী। সুন্দরবনের মধ্যে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে শান্তির বাণী প্রচার করলে বাঘ-ভালুকের খুশী হবারই কথা। তাঁরা সাধু ব্যক্তি।

ভারতী এই বিদ্রূপে কান দিল না, কহিতে লাগিল, আজ ভারতের যত দুর্ভাগ্যই আসুক, চিরদিন এমন ছিল না। একদিন ভারতবাসী সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। সেদিন হিংসা বিদ্বেষ নয়, ধর্ম এবং শান্তিমন্ত্রই এই ভারতবর্ষ থেকে দিকে দিকে প্রচারিত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস সেদিন আবার আমাদের ফিরে আসবে।

বহুক্ষণ হইতেই ভারতীর বাক্যে শশীর কবি-চিত্ত শ্রদ্ধায় ও অনুরাগে বিগলিত হইয়া আসিতেছিল। সে গদগদকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ভারতীকে আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি ডাক্তার। আমারও বিশ্বাস সে সভ্যতা ভারতে ফিরে আসবেই আসবে।

ডাক্তার উভয়ের মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, তোমরা ভারতের কোন্ যুগের সভ্যতার ইঙ্গিত করচ আমি জানিনে, কিন্তু সভ্যতার একটা সীমা আছে। ধর্ম, অহিংসা এবং শান্তির নেশায় তাকে অতিক্রম করে গেলে মরণ আসে। কোন দেবতাই তাকে রক্ষা করতে পারে না। ভারতবর্ষ হূনদের কাছে কবে পরাজয় স্বীকার করেছিল জানো? যখন তারা ভারতবাসী

শিশুদের মশালের মত করে জ্বালাতে আরম্ভ করেছিল, নারীর পিঠের চামড়া দিয়ে লড়াইয়ের বাজনা তৈরি করতে শুরু করেছিল। সে অভাবিত নৃশংসতার জবাব ভারতবাসী দিতে শেখেনি। তার ফল কি হল? দেশ গেল, রাজ্য গেল, দেবমন্দির ধ্বংস বিধ্বস্ত হয়ে গেল,—সে অক্ষমতার শাস্তি আজও আমাদের ফুরোয় নি।

ভারতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি কবির শ্লোক প্রায় আবৃত্তি করে বল, গিয়াছে দেশ দুঃখ কি, আবার তোরা মানুষ হ। কিন্তু দেশ ফিরে পাবার মত মানুষ হওয়া কাকে বলে শুনি? ভেবেচ, মানুষ হবার পথ তোমার অবারিত? মুক্ত? ভেবেচ, দেশের দরিদ্র নারায়ণের সেবা আর ম্যালেরিয়ার কুইনিন জুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে? বলে না। মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্যাদা-বোধকেই মানুষ হওয় বলে। মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে।

মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিলেন, তোমার বিশেষ অপরাধ নেই ভারতী। ওদের আবহাওয়ার মধ্যেই তুমি প্রতিপালিত, তাই তোমার মনে হয় ইউরোপের ক্রীশ্চান সভ্যতার চেয়ে বড় সভ্যতা আর নেই। অথচ, এতবড় মিছে কথাও আর নেই। সভ্যতার অর্থ কি শুধু মানুষ-মারার কল তৈরি করা? দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না,—অতএব আত্মারক্ষার ছলে এর নিত্য-নূতন সৃষ্টিরও আর বিরাম নেই। কিন্তু সভ্যতার যদি কোন তাৎপর্য থাকে ত সে এই যে, অক্ষম ও দুর্বলের ন্যায্য অধিকার যেন প্রবলের গায়ের জোরে পরাভূত না হয়। কোথাও দেখেচ এদের এই নীতি, এই ন্যায়ের গৌরব দিতে? একদিন তোমাকে বলেছিলাম পৃথিবীর মানচিত্রের দিকে চেয়ে দেখতে। স্মরণ আছে সে কথা? মনে আছে আমার মুখে চীনদেশের বক্সার বিদ্রোহের গল্প? সুসভ্য ইউরোপিয়ান পাওয়ারের দল ঘর-চড়াও হয়ে তাদের যে প্রতিহিংসা দিলে, কোথাও লাগে তার কাছে চেঙ্গিস খাঁ ও নাদির শার বীভৎসতার কাহিনী? সূর্যের কাছে দীপের মত সে অকিঞ্চিৎকর। হেতু যত তুচ্ছ এবং যত অন্যায়ই হোক, লড়াইয়ের ছুতো পেলে এদের আর কিছুই বাধে না। বৃদ্ধ, শিশু, নারী,—সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই—যে পাপের সীমা হয় না, ভারতী, সেই বিষাক্ত বাষ্পের নরহত্যাতেও নৈতিক বুদ্ধি এদের বাধা দেয় না। উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়োজনে যে-কোন উপায়, যে কিছু পথই এদের সুপবিত্র। কেবল নীতির বাধা, ধর্মের নিষেধ কি শুধু নির্বাসিত পদদলিত আমারই বেলায়?

ভারতী নিরুত্তরে বসিয়া রহিল। এই-সকল অভিযোগের প্রতিবাদের সে কি জানে? যে নির্ম্ম, একান্ত দৃঢ়চিত্ত, শঙ্কাহীন, ক্ষমাহীন বিপ্লবী, জ্ঞান, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের যাহার অন্ত নাই, পরাধীনতার অনির্বাণ অগ্নিতে যাহার সমস্ত দেহমন অহর্নিশি শিখার মত জ্বলিতেছে, যুক্তি দিয়া তাহাকে পরাস্ত করিবার সে কোথায় কি খুঁজিয়া পাইবে? জবাব নাই, ভাষা তাহার মূক হইয়া রহিল, কিন্তু তাহার কলুষহীন নারী-হৃদয় অন্ধ করুণায় নিঃশব্দে মাথা খুঁড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুমিত্রা অনেকদিন হইতেই এই-সকল বাদ-প্রতিবাদে যোগ দেওয়া বন্ধ করিয়াছিল, আজিও সে অধোমুখে স্তব্ধ হইয়া রহিল, শুধু অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল কৃষ্ণ আইয়ার। আলোচনার বহু অংশই সে বুঝিতে পারিতেছিল না, এই নীরবতার মাঝখানে সে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হবার আর বিলম্ব কত?

ডাক্তার কহিলেন, কোন বিলম্বই নেই। সুমিত্রা, তোমার জাভায় ফিরে যাওয়াই স্থির?

হাঁ।

কবে?

বোধ হয় এই বুধবারে। গত শনিবারে পারিনি।

পথের-দাবীর সংস্পর্শ তুমি ত্যাগ করলে?

সুমিত্রা মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার শুধু একটুখানি হাসিলেন। তারপরে পকেট হইতে কয়েকখানা

টেলিগ্রামের কাগজ বাহির করিয়া সুমিত্রার হাতে দিয়া বলিলেন, পড়ে দেখ। হীরা সিং কাল রাতে দিয়ে গেছে।

আইয়ার ঝুঁকিয়া পড়িল, ভারতী প্রজ্বলিত মোমবাতিটা তুলিয়া ধরিল। সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম, ভাষা ইংরাজি, অর্থও স্পষ্ট, কিন্তু সুমিত্রার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। মিনিট দুই-তিন পরে সে মুখ তুলিয়া কহিল, কোডের সমস্ত কথা আমার মনে নেই। আমাদের সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লব এবং ক্রুগার তার পাঠিয়েছে, এ ছাড়া আর কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ডাক্তার বলিলেন, ক্রুগার ওয়্যার করেছে ক্যানটন থেকে। সাংহাইয়ের জ্যামেকা ক্লব ভোররাত্রে পুলিশ ঘেরাও করে,—তিনজন পুলিশ আর আমাদের বিনোদ মারা গেছে। দুই ভাই মহতপ ও সূর্যসিংহ একসঙ্গে ধরা পড়েছে। অযোধ্যা হংকঙে,—দুর্গা, সুরেশ পেনাঙে,—সিঙ্গাপুরের জ্যামেকা ক্লবের জন্যে পুলিশ সমস্ত শহর তোলপাড় করে বেড়াচ্চে। মোট সুসংবাদটা এই!

খবর শুনিয়া কৃষ্ণ আইয়ার পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া শুধু বাহির হইল, ড্যন!

ডাক্তার কহিলেন, ওরা দু'ভাই যে রেজিমেন্ট ছেড়ে কবে, এবং কেন সাংহাইয়ে এলো জানিনে। সুমিত্রা, ব্রজেন্দ্র বাস্তবিক কোথায় জানো কি?

প্রশ্ন শুনিয়া সুমিত্রা পাথর হইয়া গেল।

জানো?

প্রথমে তাহার গলা দিয়া কিছুতেই স্বর ফুটিল না, তাহার পরে ঘাড় নাড়িয়া কেবল বলিল, না।

কৃষ্ণ আইয়ার কহিল, সে এ কাজ করতে পারে আমার বিশ্বাস হয় না।

ডাক্তার হাঁ-না কিছুই বলিলেন না,—নিঃশব্দে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন।

শশী কহিল, ব্রজেন্দ্র জানে আপনি হাঁটাপথে বর্মা থেকে বেরিয়ে গেছেন।

ডাক্তার এ কথারও উত্তর দিলেন না, তেমনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

মুখে শব্দ নাই, বাক্য নাই, মূর্তির মত সকলে নিঃশব্দে বসিয়া। সম্মুখে টেলিগ্রাফের সেই কাগজগুলা পড়িয়া। বাতি পুড়িয়া নিঃশেষ হইতেছিল, শশী আর একটা জ্বালিয়া মেঝের উপর বসাইয়া দিল। মিনিট-দশেক এইভাবে কাটিবার পরে, প্রথম চেতনার লক্ষণ দেখা দিল আইয়ারের দেহে। সে পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া বাতির আগুনে ধরাইয়া লইয়া ধূঁয়ার সঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিল, নাউ ফিনিশ্‌ড্!

ডাক্তার তাহার মুখের প্রতি চাহিলেন। প্রত্যুত্তরে সে সিগারেটে পুনশ্চ একটা বড় টান দিয়া শুধু ধূম উদ্‌গীর্ণ করিল। শশী মদ খাইত, কিন্তু তামাকের ধূঁয়া সহ্য করিতে পারিত না। এখন সে খামকা একটা চুরুট ধরাইয়া ঘন ঘন টানিয়া ঘর অন্ধকার করিয়া তুলিল।

আইয়ার কহিল, ওয়ার্স্ট লাক। উই মস্‌ট স্টপ্‌!

শশী কহিল, আমি আগেই জানতাম। কিছুই হবে না, শুধু—

ডাক্তার সহসা প্রশ্ন করিলেন, তুমি কবে যাবে বললে? বুধবারে?

সুমিত্রা মুখ তুলিয়া চাহিল না, মাথা নাড়িয়া কহিল, হাঁ।

শশী পুনরায় বলিল, এতবড় পৃথিবী-জোড়া শক্তিমান রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবের চেষ্টা করা শুধু নিষ্ফল নয়, পাগলামি। আমি ত বরাবরই বলে এসেছি ডাক্তার, শেষ পর্যন্ত কেউ থাকবে না।

আইয়ার কি বুঝিল সেই জানে, মুখ দিয়া অপর্যাপ্ত ধূম নিষ্কাশন করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, ট্রু।

ডাক্তার সহসা উঠিয়ায় দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজকের মত সভা আমাদের শেষ হল।

সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া দাড়াইল, সকলেই অভিমত ব্যক্ত করিল, করিল না শুধু ভারতী। সে নীরবে ডাক্তারের পাশে আসিয়া তাঁহার ডান হাতটি নিজের হাতের মধ্যে

টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, দাদা, আমাকে না বলে কোথাও চলে যাবে না বল।

ডাক্তার মুখে কিছুই বলিলেন না, শুধু তাঁহার বজ্রকঠিন মুঠার মধ্যে যে ক্ষুদ্র কোমল হাতখানি ধরা ছিল তাহাতে একটুখানি চাপ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

একত্রিশ

পরদিন প্রভাত হইতেই আকাশে ধীরে ধীরে মেঘ জমা হইতেছিল, রাত্রে ফোঁটা-কয়েক জলও পড়িয়াছিল, কিন্তু আজ মধ্যাহ্নকাল হইতে বৃষ্টি এবং বাতাস চাপিয়া আসিল। কাল ভারতী সুমিত্রাকে যাইতে দেয় নাই, কথা ছিল, আজ খাওয়া-দাওয়ার পরে সে বিদায় লইয়া বাসায় যাইবে। কিন্তু এমন দুর্যোগ শুরু হইল যে, বাহিরে পা বাড়ানো শক্ত, নদী পার হওয়া ত দূরের কথা। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে ঝড় ও জল উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। শশী হিন্দুহোটেলে থাকে, দুপুরবেলা বেড়াইতে আসিয়াছিলে, এখনও ফিরিতে পারে নাই। বেলা কখন শেষ হইল, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল জানাও গেল না। ভারতীর উপরের ঘরে জানাল-কবাট বন্ধ করিয়া আলো জ্বালিয়া বৈঠক বসিয়াছে। সুমিত্রা আপাদমস্তক চাপা দিয়া আরামকেদারায় শুইয়া, শশী খাটের উপরে উবু হইয়া বসিয়া, নীচে কম্বলের শয্যায় অপূর্ব, এবং তাহারই জলযোগের আয়োজনে মেঝের উপরে বঁটি পাতিয়া বসিয়া ভারতী ফল ছাড়াইতেছে। অনতিদূরে একধারে স্টোভের উপরে মুগের ডালের খিচুড়ি টগবগ করিয়া ফুটিতেছে।

অপূর্ব বলিয়াছিল সংসারে তাহার আর রুচি নাই, সন্ন্যাসই তাহার একমাত্র শ্রেয়ঃ। শশী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারে নাই, সে যুক্তি-সহযোগে খণ্ডন করিয়া বুঝাইতেছিল যে, এরূপ অভিসন্ধি ভাল নহে, কারণ, সন্ন্যাসের মধ্যে আর মজা নাই ; বরঞ্চ, বরিশাল কলেজে প্রফেসারির আবেদন যদি মঞ্জুর হয় ত গ্রহণ করাই কর্তব্য।

অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু কথা কহিল না। ভারতী সমস্তই জানিত, তাই সে-ই ইহার জবাব দিয়া বলিল, জীবনে মজা করে বেড়নো ছাড়া কি মানুষের আর বড় উদ্দেশ্য থাকতে পারে না, শশিবাবু? পৃথিবীতে সকলের চোখের দৃষ্টিই এক নয়।

তাহার কথা বলার ধরনে শশী অপ্রতিভ হইল। ভারতী পুনশ্চ কহিল, ওঁর মনের অবস্থা এখন ভাল নয়, এ সময়ে ওঁর ভবিষ্যৎ কর্তব্য নিয়ে আলোচনা করা শুধু নিষ্ফল নয়, অবিহিত। তার চেয়ে বরঞ্চ আমাদের নিজেদের—

আমার মনে ছিল না ভারতী।

শশীর মনে না থাকা কিছুই বিচিত্র নয়। ইতিমধ্যে অপূর্বর আরও একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে, যাহা ভারতী ব্যতীত অপরে জানিত না। সাংসারিক হিসাবে তাহার ফল ও পরিণাম মাতৃবিয়োগের অপেক্ষা বিশেষ কম নহে। জননীর মৃত্যুসংবাদ অপূর্বর দাদা বিনোদবাবু দুঃখ করিয়া তার করিয়াছেন, কিন্তু ইহার অধিক আর কিছু নহে। মা রাগ করিয়া, সম্ভবতঃ, অত্যন্ত অপমানিত হইয়াই অবশেষে গঙ্গাবিহীন, ম্লেচ্ছদেশ বর্মায় আপনাকে নির্বাসিত করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া অপূর্ব দুঃখে, ক্ষোভে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল। যে দুইদিন কলিকাতায় ছিল, বাটীতে খায় নাই, শোয় নাই এবং ফিরিবার মুখে রীতিমত কলহ করিয়াই আসিয়াছিল। তথাপি, এতবড় ভয়ানক দুর্ঘটনায় সকলের কনিষ্ঠ হইয়া তাহার নিঃসন্দিগ্ধ ভরসা ছিল, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য কেহ না কেহ আসিবেই আসিবে। তেওয়ারী থাকিলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু সে-ও নাই, ছুটি লইয়া দেশে গিয়াছে।

বাঙালী পুরোহিত এখানেও আছে, আজই সকালে অপূর্ব ভারতীকে ডাকিয়া কহিয়াছিল, সে কলিকাতায় যাইবে না, যেমন করিয়া পারে মাতৃশ্রাদ্ধ এখানেই সম্পন্ন করিবে।

মাতার আকস্মিক আগমনের হেতু যে ছেলেদের প্রতি দুর্জয় মান-অভিমান,—এ খবর অপূর্ব জানিয়া আসিয়াছিল, শুধু, কতখানি যে ক্রীশ্চান-কন্যা ভারতীর কাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিল ইহাই জানে নাই। সাংঘাতিক পীড়িতা অচৈতন্যপ্রায় জননীর বলিবার অবকাশ ঘটিল না, এবং বিনোদবাবু রাগ করিয়া বলিলেন না।

সহসা মুখের আবরণ সরাইয়া সুমিত্রা উঠিয়া বসিল, কহিল, নীচেকার দরজা খুলে কে যেন ঢুকলো, ভারতী।

বাতাস ও বারিপাতের অবিশ্রান্ত ঝরঝর শব্দের মাঝখান আর কিছুই শুনিতে পাওয়া কঠিন। শঙ্কায় সকলেই চকিত হইয়া উঠিল, ভারতী একমুহূর্ত কান খাড়া করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, কেউ নয়। অপূর্ববাবুর চাকরটা শুধু নীচে বসে আছে। কিন্তু পরক্ষণেই সে সিঁড়িতে পরিচিত পদশব্দে আনন্দ-কলরোলে চীৎকার করিয়া উঠিল, আরে, এ যে দাদা! এক হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার, এক লক্ষ ওয়েলকম্! হাতের ফল এবং বঁটি ফেলিয়া সিঁড়ির মুখে ছুটিয়া গিয়া বলিল, এক ক্রোর দশ ক্রোর বিশ ক্রোর হাজার হাজার ক্রোর গুড্ ইভ্‌নিং দাদা, শিগ্‌গির এসো!

সব্যসাচী ঘরে ঢুকিয়া পিঠের প্রকাণ্ড বোঁচকা নামাইতে নামাইতে সহাস্যে কহিলেন গুড্ ইভ্‌নিং! গুড্ ইভ্‌নিং।

ভারতী তাঁহার দুই হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, এই দেখ দাদা, তোমার জন্যে খিচুড়ি রাঁধছি। ওভারকোটটা আগে খোলো। ইঃ—জুতোটুতো সব ভিজে গেছে, দাঁড়াও আগে আমি খুলে দি। এই বলিয়া সে আগে কোট খুলিবে, না হেঁট হইয়া বুটের ফিতা খুলিবে ঠিক করিতে পারিল না। চেয়ারের কাছে টানিয়া আনিয়া জোর করিয়া বসাইয়া দিয়া বলিল, আমি জুতো খুলে দি। আচ্ছা, এই বৃষ্টিতে একটা গাড়ি করে আসতে নেই? হাঁ দাদা, ও-বেলা কি খেয়েছিলে? পেট ভরেছিল? ভালো কথা। ঠাকুরমশায়ের হোটেলে আজ মাংস রান্না হয়েছে আমি খবর পেয়েছি, আনবো দাদা, ছুটে গিয়ে এক বাটি? খাবে? সত্যি বল!

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, আরে, এ আমাকে আজ পাগল করে দেবে নাকি!

ভারতী জুতা খুলিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া মাথায় তাঁহার হাত দিয়া বলিল, যা ভেবেচি ঠিক তাই। ঠিক যেন নেয়ে উঠেচে এমনি ভিজে। এই বলিয়া সে আলনা হইতে তাড়াতাড়ি তোয়ালে আনিতে গেল।

মিনিট-খানেকের মধ্যে ছেলেমানুষের মত এমনি কাণ্ড করিল যে, শশী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আপনাকে যেন ভারতী দু'-দশ বচ্ছর পরে দেখতে পেয়েছেন।

ডাক্তার কহিলেন, তার চেয়েও বেশী। এই বলিয়া ভারতীর হাত হইতে তোয়ালে টানিয়া লইয়া কহিলেন, ওর আদরের জ্বালায় আমার প্রাণটা গেল।

প্রাণ গেল? তবে, থাকো বসে। এই বলিয়া ভারতী কৃত্রিম অভিমান ভরে তাহার ফল ছাড়াইতে ফিরিয়া গিয়া বঁটি লইয়া বসিল। তাহার বন্ধু, সখা সহোদরের অধিক আত্মীয় আজিকার এই দুর্যোগের মধ্যে তাঁহার অপ্রত্যাশিত, অভাবিত আগমনে স্নেহে, শ্রদ্ধায়, গর্বে ও স্বার্থহীন নিষ্পাপ প্রীতিতে তাহার হৃদয় উপচিয়া পড়িয়াছে,—আপনাকে সে সংবরণ করিবে কি দিয়া? আতিশয্য যদি হইয়াই থাকে তাহাকে বাধা দিবে কিসে? সুমিত্রা নিঃশব্দে দেখিতেছিল, নীরবে রহিল, কিন্তু ঘৃণা ও নিগূঢ় ঈর্ষায় রচিত যে দুর্ভেদ্য যবনিকা এতদিন তাহার চোখের দৃষ্টিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অকস্মাৎ অপসারিত হইয়া যতদূর দেখা যায় শুধু অনাবিল সৌহৃদ্যের স্বচ্ছ স্রোতস্বতীই সে এই দুটি নর-নারীর মাঝখানে প্রবাহিত দেখিতে পাইল। মুহূর্তের জন্যও কখনো যে তথায় কলুষ স্পর্শ করিয়াছে, মনে করিতে আজ তাহার মাথা হেঁট হইল। গোপন করিয়া করিবার, লজ্জা করিয়া করিবার ভারতীর কিছুই ছিল না বলিয়াই সে এমন লজ্জাহীনার মত সব্যসাচীর আপনার হইয়া উঠিতে পারিয়াছিল, এ কথা আজ সুমিত্রা বুঝিল।

এতক্ষণ মানুষটিকে লইয়াই ভারতী ব্যস্ত ছিল, এখন বোঁচকাটির প্রতি তাহার লক্ষ্য পড়িল। উদ্বিগ্ন শঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আচ্ছা, এই ঝড়জলের মধ্যে সহচরটিকে সঙ্গে এনেছ কেন বলত? কোথাও চলে যাচ্চো না ত? মিথ্যে বলে ঠকাতে পারবে না তা বলে রাখছি, দাদা।

ডাক্তার হাসিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার মুখের চেহারায় নিজের মুখে আর হাসি

আসিল না, তথাপি তামাশার ভঙ্গীতে লঘু করিয়া কহিলেন, যাবো না ত কি রামদাসের মত ধরা পড়ব নাকি?

শশী মাথা নাড়িয়া বলিল, ঠিক তাই।

ভারতী রাগ করিয়া কহিল, ঠিক তাই! আপনি কি জানেন শশীবাবু যে মতামত দিচ্চেন!

বাঃ জানিনে?

কিচ্ছু জানেন না।

ডাক্তার হাসিমুখে কহিলেন, ঝগড়া করলে খিচুড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। আচ্ছা অপূর্ব্ববাবু কালকের জাহাজে না গেলে ত আপনি সময়মত পৌঁছতে পারবেন না।

অপূর্ব গম্ভীর হইয়া বলিল, মায়ের শ্রাদ্ধ আমি এখানেই করব ডাক্তার।

এখানে? হেতু?

অপূর্ব মৌন হইয়া রহিল, ভারতীও জবাব দিল না।

ডাক্তার মনে মনে বুঝিলেন কি একটা ঘটিয়াছে যাহা প্রকাশ করিবার নয়। কহিলেন, বেশ, বেশ। তাহলে ফিরে যাবারই বা দরকার কি? চাকরিটা আপনার আছে না?

অপূর্ব ইহারও উত্তর দিল না। শশী কহিল, অপূর্ব্ববাবু সন্ন্যাস নেবেন।

ডাক্তার হাসিয়া ফেলিলেন, সন্ন্যাস? এ আবার কি কথা!

তাঁহার হাসিতে অপূর্ব ক্ষুণ্ণ হইল। কহিল, সংসারে যার রুচি নেই, জীবন বিস্বাদ হয়ে গেছে, এ ছাড়া তার আর পথ কি আছে, ডাক্তার?

ডাক্তার কহিলেন, এ-সব বড় বড় আধ্যাত্মিক ব্যাপার, অপূর্ব্ববাবু, এর মধ্যে অনধিকারচর্চা করতে আমাকে আর প্রলুব্ধ করবেন না, তার চেয়ে বরঞ্চ শশীর মত নিন, ও জানে শোনে। ইস্কুলে ফেল হয়ে একবার ও বছর-খানেক ধরে এক সাধু-বাবার চেলাগিরি করেছিল।

শশী সংশোধন করিয়া বলিল, দেড় বছরের ওপর। প্রায় দু বছর।

সুমিত্রা ও ভারতী হাসিতে লাগিল। অপূর্বর গাম্ভীর্য ইহাতে টলিল না, সে কহিল, মায়ের মৃত্যুর জন্যে আমার নিজেকেই যেন অপরাধী মনে হয়, ডাক্তার। সেদিন থেকে আমি নিরন্তর এই কথাই ভেবে আসচি। যথার্থই সংসারে আমার প্রয়োজন নেই, এ আমার কাছে তিক্ত হয়ে এসেছে।

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বোধ হয় তাহার হৃদয়ে সত্যকার ব্যথা উপলব্ধি করিলেন, সস্নেহ-মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, মানুষের এই দিকটা কখনো আমার ভেবে দেখবার আবশ্যক হয়নি অপূর্ব্ববাবু, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে মনে হয়, হয়ত, এ ভুল হবে। তিক্ততার মধ্যে দিয়ে সংসার ছেড়ে শুধু হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া জীবনই যাপন করা চলে, কিন্তু বৈরাগ্য-সাধনা হয় না। করুণার মধ্যে দিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে না গেলে কি—কিন্তু, ঠিক ত জানিনে—

ভারতী অকস্মাৎ যেন এক নূতন জ্ঞান লাভ করিল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তুমি ঠিক জানো দাদা, তোমার মুখ দিয়ে কখনো বেঠিক কিছু বার হয় না,—হতে পারে না। এই সত্য।

ডাক্তার বলিলেন, মনে ত তাই হয়। মা মারা গেলেন। কেন এসেছিলেন, কিসের জন্যে আপনি যেতে চান না কিছুই আমি জানিনে, জানবার কৌতূহলও নেই, কিন্তু কারও আচরণে তিক্ততাই যদি পেয়ে থাকেন, সমস্ত অনাগত কালের তাই শুধু সত্য হল, আর অমৃত যদি কোথাও লাভ হয়ে থাকে, জীবনে তার কোন দাম দেবেন না?

অপূর্ব কহিতে গেল, সংসারে দাদা যদি—

ডাক্তার বলিলেন, সংসারে অপূর্বর দাদা বিনোদবাবুই আছেন, ভারতীর দাদা সব্যসাচী কি নেই? সে গৃহে যদি স্থান আপনার নাও থাকে, কলকাতার সেই ছোট্ট বাড়িটুকুই কি বামনের বিশ্বব্যাপী পদতলের ন্যায় পৃথিবীতে কোথাও আপনার আর ঠাঁই রাখেনি? অপূর্ব্ববাবু, হৃদয়াবেগ দুর্মূল্য বস্তু, কিন্তু চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করতে দিলে এতবড় শত্রু আর

মানুষের নেই।

অপূর্ব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু ধর্মসাধনা বা আত্মার মুক্তির কামনায় আমি সংসার ত্যাগ করতে চাইনি ডাক্তার, যদি করি, পরার্থেই করব। আমাকে আপনাদের বিশ্বাস করা কঠিন, না করলেও দোষ দেবার নেই, কিন্তু একদিন যে অপূর্বকে আপনারা জানতেন, মায়ের মৃত্যুর পরে সে অপূর্ব আমি আর নেই।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলেন, তোমার এ কথাটা যেন সত্য হয় অপূর্ব।

অপূর্ব গাঢ়কণ্ঠে বলিল, এখন থেকে আমি দেশের কাজে, দশের কাজে, দীন-দরিদ্রের কাজেই আত্মনিয়োগ করব। এই বলিয়া সে ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিতে লাগিল, কলকাতায় আমার বাড়ি, শহরেই আমি মানুষ, কিন্তু শহরের সঙ্গে আর আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধ রইল না। এখন থেকে পল্লীসেবাই হবে আমার একমাত্র ব্রত। একদিন কৃষিপ্রধান ভারতের পল্লীই ছিল প্রাণ, পল্লীই ছিল তার অস্থি-মজ্জা-শোণিত। আজ সে ধ্বংসোন্মুখ। ভদ্রজাতি তাদের ত্যাগ করে শহরে এসেছে, সেখান থেকে তাদের অহর্নিশি শাসন করে, এবং শোষণ করে। এ ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ-বন্ধন তারা রাখেনি। না রাখুক, কিন্তু চিরদিন যারা এঁদের মুখের অন্ন এবং পরনের বস্ত্র যুগিয়ে দেয়, সেই কৃষককুল আজ নিরন্ন, নিরক্ষর এবং নিরুপায় হয়ে মৃত্যুপথে দ্রুতবেগে চলেছে। এখন থেকে আমি তাদের কল্যাণেই আত্মনিয়োগ করব, এবং ভারতীও আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন। গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে, আবশ্যক হলে কুটীরে কুটীরে গিয়ে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করবার ভার উনি নেবেন। আমার সন্ন্যাস দেশের জন্যে, নিজের জন্যে নয় ডাক্তার।

ডাক্তার বলিলেন, সাধু প্রস্তাব।

তাঁহার মুখ হইতে কেবল এই দুটি কথাই কেহ প্রত্যাশা করে নাই। ভারতী ম্লান হইয়া কহিল, আর একদিক দিয়ে ধরলে, এ ত তোমারই কাজ দাদা। এই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষক বড় হয়ে না উঠলে ত কোন কিছুই হবে না।

ডাক্তার কহিলেন, আমি ত প্রতিবাদ করিনি ভারতী।

কিন্তু তোমার উৎসাহও ত নেই দাদা!

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন, দরিদ্র কৃষকের ভালো করতে চাও, তোমাদের আমি আশীর্বাদ করি। কিন্তু আমার কাজে সাহায্য করচ মনে করবার প্রয়োজন নেই। চাষারা রাজা হোক, কিন্তু সাহায্য তাদের কাছ থেকে আমি আশা করি নে।

অপূর্বর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কারও ভালো করতে হবে বলে আর কারও গায়ে কালি ছড়াতে হবে, তার মানে নেই অপূর্ববাবু। এদের দুঃখ-দৈন্যের মূলে শিক্ষিত ভদ্রজাতি নয়, সে মূল বার করতে হলে তোমাকে আর একদিকে খুঁড়ে দেখতে হবে।

অপূর্ব কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। কহিল, কিন্তু এই কি সকলে আজ বলে না?

বলুক? যা ভুল তা তেত্রিশ কোটি লোকে মিলে বললেও ভুল। বরঞ্চ এই শিক্ষিত ভদ্রজাতির চেয়ে লাঞ্ছিত, অবমানিত, দুর্দশাগ্রস্ত সমাজ বাঙলা দেশে আর নেই। তার উপরে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে তাদের ভরাডুবি করাতে চাও কেন? পরদেশের সকল যুক্তি এবং সকল সমস্যাই কি নিজের দেশে খাটে ভেবেচ? বাইরের অনাচার যখন পলে পলে সর্বনাশ নিয়ে আসচে, তখন আবার অন্তর্বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে চাও কিসের জন্যে? অসন্তোষে দেশ ভরে গেল,—স্নেহের বাঁধন, শ্রদ্ধার বাঁধন চূর্ণ হয়ে এলো কিসের জন্যে জানো? তোমাদের দু-দশ জনের দোষে,—শিক্ষিতের বিরুদ্ধে শিক্ষিতের অভিযানে। শশী, একদিন তোমাকে আমি এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলাম মনে আছে? নিজেদের বিপক্ষে নিজেদের দুর্নাম ঘোষণার মধ্যে একটা নিরপেক্ষ স্পষ্টবাদিতার দম্ভ আছে, একপ্রকার সস্তা খ্যাতিও মুখে মুখে প্রচারিত হয়, কিন্তু এ শুধু ভুল নয়, মিথ্যা। মঙ্গল তাদের তোমরা কর গে, কিন্তু অপরের কলঙ্ক রটনা করে নয়, একের প্রতিকূলে অপরকে উত্তেজিত করে

নয়,—বিশ্বের গাছে তাদের হাস্যাস্পদ করে নয়! সুদূর-ভবিষ্যতে হয়ত সে একদিন এসে পৌঁছবে, কিন্তু আজও তার বিলম্ব আছে।

সকলেই নীরব হইয়া রহিল, শুধু ভারতী ধীরে ধীরে কহিল, কিছু মনে করো না দাদা, কিন্তু বরাবরই আমি দেখে এসেছি পল্লীর প্রতি তোমার সহানুভূতি কম, তোমার দৃষ্টি শুধু শহরের উপরে। কৃষকদের প্রতি তুমি সদয় নও, তোমার দু চক্ষু আছে কেবল কারখানার কুলি-মজুর কারিগরদের দিকে। তাই তোমার পথের-দাবী খুলেছিলে এদেরই মাঝখানে আর হৃদয় বলে যদি কোন বালাই তোমার থাকে, সে শুধু ছেয়ে পড়ে আছে মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত, ভদ্র-জাতি নিয়ে। এরাই তোমার আশা-ভরসা, এরাই তোমার আপনার জন। বল, এ কি মিথ্যা কথা?

ডাক্তার বলিলেন, মিথ্যে নয় বোন, অত্যন্ত সত্য। কতবার ত বলেছি তোমাকে, 'পথেরদাবী' চাষা-হিতকারিণী প্রতিষ্ঠান নয়, এ আমার স্বাধীনতা অর্জনের অস্ত্র। শ্রমিক এবং কৃষক এক নয় ভারতী। তাই, পাবে আমাকে কুলি-মজুর-কারিকরের মাঝখানে, কারখানার ব্যারেকে, কিন্তু পাবে না খুঁজে পাড়াগাঁয়ে চাষার কুটীরে। কিন্তু কথায় কথায় শ্রেষ্ঠ কর্তব্যটি যেন ভুলে যেয়ো না দিদি। এই বলিয়া স্টোভের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, দেশোদ্ধার দু-দিন দেরি হলে সইবে, কিন্তু তৈরি খিচুড়ি পুড়ে গেলে সইবে না।

ভারতী ছুটিয়া গিয়া হাঁড়ির ঢাকা খুলিয়া পরীক্ষা করিয়া হাসিমুখে কহিল, ভয় নেই দাদা, বাদল রাতের খিচুড়িভোগ তোমার মারা যাবে না।

কিন্তু বিলম্ব কত?

ভারতী বলিল, মিনিট পনেরো-কুড়ি। কিন্তু তাড়া কিসের বলত?

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন,আজ যে তোমাদের কাছে আমি বিদায় নিতে এলাম।

কথা যেমনই হউক, তাঁহার হাসিমুখের দিকে চাহিয়া কেহই তাহা বিশ্বাস করিল না। বাহিরে ঝড়-জলের বিরাম নাই, ভারতী ক্ষণিকের জন্য জানালা খুলিয়া নিরীক্ষণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, বাপ রে বাপ! পৃথিবী বোধ হয় ওলটপালট হয়ে যাবে। বিদায় নেবারই সময় বটে, দাদা! চোখের পলকে তাহার অন্য কথা মনে পড়িল, কহিল, আজ কিন্তু তোমাকে ওই ছোট্ট ঘরটিতে শুতে হবে। নিজের হাতে আমি চমৎকার করে বিছানা করে দেব, কেমন? এই বলিয়া সে হৃদয়ের নিগূঢ় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া রান্নার কাজে লাগিল। ডাক্তারের নিকট হইতে যে কোন উত্তরই আসিল না তাহা লক্ষ্যও করিল না।

যথাসময়ে আহার্য প্রস্তুত হইলে, ডাক্তার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, সে হবে না ভারতী, পরিবেষণের অছিলায় তুমি বাকী থাকলে চলবে না। আজ আমরা সকলে একসঙ্গে খেতে বসব।

ভারতী সম্মত হইয়া বলিল, তাই হবে দাদা, চারজনে আমরা গোল হয়ে খেতে বসব।

ডাক্তার কহিলেন, গোল হয়ে খেতেপারি, কিন্তু বুভুক্ষু অপূর্ববাবু না নজর দিয়ে আমাদের হজমে গোল বাধান। সেটা ওঁকে বল।

অপূর্ব হাসিল, ভারতীও হাসিমুখে কহিল, সে ভয় আমাদের থাকতে পারে, কিন্তু তোমার হজমে গোল বাধাবে কে দাদা? ও আগুনে পাহাড়-পর্বত গুঁড়িয়ে দিলেও ত ভস্ম হয়ে যাবে। যে খাওয়া খেতে দেখেছি! এই বলিয়া ভারতী আর এক দিনের খাওয়া স্মরণ করিয়া মনে মনে যেন শিহরিয়া উঠিল।

ভোজন-পর্ব আরম্ভ হইল। অন্ন-ব্যঞ্জনের সুখ্যাতিতে এবং লঘু হাস্য-পরিহাসে ঘরের আবহাওয়া যেন মুহূর্তের মধ্যে পরিবর্তিত হইয়া গেল। খাওয়া যখন পূর্ণ উদ্যমে চলিতেছে, সহসা রসভঙ্গ করিয়া ফেলিল অপূর্ব। সে কহিল, দিন-দুই পূর্বে খবরের কাগজে সুসংবাদ পড়েছিলাম, ডাক্তার। যদি সত্য হয় আপনার বিপ্লবের প্রয়াস একেবারে নিরর্থক হয়ে যাবে। ভারত গবর্নমেন্ট তাঁদের শাসনযন্ত্রের আমূল সংস্কার করতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

শশী চক্ষের পলকে রায় দিল, মিছে কথা! ছল!

ভারতী ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয়, কিন্তু অকৃত্রিম উদ্বেগের সহিত কহিল, ছলনা নাও ত হতে পারে শশীবাবু। যাঁরা নেতা, যাঁরা এই অর্ধশতাব্দকাল ধরে,—না দাদা, তুমি হাসতে পারবে না বলচি!—তাঁদের প্রাণপণ আন্দোলনের কি কোন ফল নেই ভাবো? বিদেশী শাসক হলেও ত তাঁরা মানুষ, ধর্মজ্ঞান এবং নৈতিক বুদ্ধি ফিরে আসা ত একেবারে অসম্ভব নয়!

শশী তেমনি অসঙ্কোচে অভিমত প্রকাশ করিল, অসম্ভব! মিছে কথা! ধাপ্পাবাজি!

অপূর্ব কহিল, অনেকে এই সন্দেহই করেন সত্য।

ভারতী বলিল, সন্দেহ তাঁদের মিথ্যে। ভগবান কি নেই নাকি? এবং পরক্ষণেই অপরিসীম আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল, শাসন-পদ্ধতির পরিবর্তন, অত্যাচার-অনাচারের সংস্কার,—এ-সব যদি সত্যই হয়, তোমার বিপ্লবের আয়োজন, বিদ্রোহের সৃষ্টি—তখন ত একেবারেই অর্থহীন হয়ে যাবে দাদা!

শশী কহিল, নিশ্চয়!

অপূর্ব কহিল, নিঃসন্দেহ!

ভারতী তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কহিল, দাদা, তখন এই ভয়ঙ্কর মূর্তি ছেড়ে আবার শান্তমূর্তি নেবে বল?

ডাক্তার দেওয়ালের ঘড়ির দিকে চাহিয়া মনে মনে হিসাব করিয়া কতকটা যেন নিজেকেই কহিলেন, বেশী দেরি নেই আর। তাহার পরে ভারতীকে উদ্দেশ করিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়া বলিলেন, ভারতী, এ আমার ভয়ঙ্কর কিংবা শান্তমূর্তি আমি আপনিই জানিনে, শুধু জানি, এ জীবনে এ রূপ আমার আর পরিবর্তন হবার নয়। আর তোমার নমস্য নেতাদের,—ভয় নেই দিদি, আজ তাঁদের নিয়ে আমোদ করবার আমার সময়ও নেই, অবস্থাও নয়। বিদেশী শাসনের সংস্কার যে কি, প্রাণপণ আন্দোলনের ফলে কি তাঁরা চান, তার কতটুকু আসল, কতটুকু মেকী,—কি পেলে শশীর ধাপ্পাবাজি হয় না, এবং নমস্যগণের কান্না থামে, তার কিছুই আমি জানিনে। বিদেশী গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে চোখ রাঙ্গিয়ে যখন তাঁরা চরম বাণী প্রচার করে বলেন, আমরা আর ঘুমিয়ে নেই, আমরা জেগেছি। আমাদের আত্মসম্মানে ভয়ানক আঘাত লেগেছে। হয় আমাদের কথা শোন, নইলে বন্দেমাতরমের দিব্যি করে বলছি তোমাদের অধীনে আমরা স্বাধীন হবই হব। দেখি, কার সাধ্য বাধা দেয়!—এ যে কি প্রার্থনা, এবং কি এর স্বরূপ সে আমরা বুদ্ধির অতীত। শুধু জানি, তাঁদের এই চাওয়া এবং পাওয়ার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নেই।

এটুখানি থামিয়া বলিলেন, সংস্কার মানে মেরামত,—উচ্ছেদ নয়। গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা ; যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল বোধ হয় তারই নাম শাসন-সংস্কার। একটা দিনের জন্যও এ ফাঁকি আমি চাইনি, একটা দিনের জন্যও বলিনি কারাগারের পরিসর আমার আর একটুখানি বাড়িয়ে দিয়ে আমাকে ধন্য কর। ভারতী, আমার কামনায়, আমার তপস্যায় আত্মবঞ্চনার অবসর নেই। এ তপস্যা সাঙ্গ হবার শুধু দুটিমাত্র পথ খোলা আছে,—এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বধীনতা।

তাঁহার এই কথাগুলির মধ্যে নূতন কিছুই ছিল না, তথাপি, মৃত্যু ও এই ভয়াবহ সঙ্কল্পের পুনরুল্লেখে ভারতীর বুকের মধ্যে অশ্রু আলোড়িত হইয়া দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। কহিল, কিন্তু, একে একে সবাই যে তোমাকে ছেড়ে দূরে সরে গেল?

ডাক্তার বলিলেন, যাবেই ত। আমার দেবতা যে ফাঁকি সইতে পারেন না বোন।

ভারতীর মুখে আসিল, সংসারে সবাই ফাঁকি নয় দাদা, হৃদয় পাথর না হয়ে গেলে তা টের পেতে। কিন্তু এ কথা আজ সে উচ্চারণ করিল না।

আহার শেষ হইলে ডাক্তার হাতমুখ ধুইয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। কেহই লক্ষ্য করিল না যে, তাঁহার চোখের দৃষ্টি কিসের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ হইয়া

উঠিতেছে। এবং একটা কান যে বহুক্ষণ হইতেই সদর দরজায় সজাগ হইয়া ছিল তাহা কেহই জানিত না। পথের ধারে কি একটা শব্দ হইল, তাহা আর কেহ গ্রাহ্য করিল না, কিন্তু ডাক্তার সচকিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নীচে অপূর্ব্ববাবুর চাকর আছে না? জেগে আছে? ওহে হনুমন্ত, দোরটা একবার খুলে দাও।

কোথায় কাহার কিরূপ শয্যা প্রস্তুত হইবে তাহাই ভারতী সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, সবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া কহিল, কাকে দাদা? কে এসেছেন?

ডাক্তার বলিলেন, হীরা সিং। তার আসার আশায় পথ চেয়ে আছি। বল কবি, কতকটা কাব্যের মত শোনাল না? এই বলিয়া তিনি হাসিলেন।

ভারতী বলিল, এই দুর্যোগে তোমার একার কাব্যের জ্বলাতেই আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে আছি। আবার ভগ্নদূত কিসের জন্যে?

শশী কহিল, ভগ্নদূত তুচ্ছ নয় ভারতী, সে না হলে অতবড় মেঘনাদবধ কাব্য রচনাই হতো না।

দেখি, ইনি কোন্ কাব্য রচনা করেন। এই বলিয়া ভারতী উঁকি মারিয়া দেখিল, অপূর্ব্বর ভৃত্য বাহিরের কবাট খুলিতে যে ব্যক্তি প্রবেশ করিল সে সত্যই হীরা সিং। ক্ষণেক পরে আগন্তুক উপরে আসিয়া সকলকে অভিবাদন করিল, এবং হাতজোড়া করিয়া সব্যসাচীকে প্রণাম করিল। পরনে তাহার সেই অতি সুপরিচিত সরকারী উর্দি, সরকারী চাপরাশ, সরকারী মুরাঠা, কোমরে টেলিগ্রাফ পিয়নের চামড়ার ব্যাগ,—এ সমস্তই ভিজিয়া ভারী হইয়া উঠিয়াছে। বিপুল দাড়ি-গোঁফ বাহিয়া জল ঝরিতেছে,—বাঁ হাত দিয়া নিংড়াইয়া বোধ হয় নিজেকে কিঞ্চিৎ হালকা করিবার চেষ্টা করিল, এবং ফাঁক দিয়া অস্ফুটধ্বনি শুনা গেল, রেডি।

ডাক্তার লাফাইয়া উঠিলেন, থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ সরদারজী! কখন?

নাউ। এই বলিয়া সে সকলকে পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া নীচে যাইতেছিল, কিন্তু সকলেই সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি হয়েছে সরদারজী? কি নাউ?

অথচ, সবাই জানিত এই মানুষটির গলায় ছুরি দিলে রক্ত ছুটিবে কিন্তু বিনা-হুকুমে কথা ফুটিবে না। সুতরাং, উত্তরের পরিবর্তে তাহার ঘনকৃষ্ণ শ্মশ্রুগুম্ফ ভেদ করিয়া গুটিকয়েক দাঁত ছাড়া আর যখন কিছু বাহির হইল না, তখন বিস্ময়াপন্ন কেহই হইল না। সবাই জানিত ইহার নিন্দা-খ্যাতি, মান-অপমান, শত্রু-মিত্র নাই ; দেশের কাজে সব্যসাচীকে সে সর্দার মানিয়া এ জীবনের সমস্ত ভাল-মন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ বিসর্জন দিয়া কঠোর সৈনিকবৃত্তি মাথায় তুলিয়া লইয়াছে। আর তাহার তর্ক নাই, আলোচনা নাই, সময়-অসময়ের হিসাব নাই, কিছু একটা কঠিন কাজের ভার ছিল, কর্তব্য পালন করিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। ইঁহাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করিয়া ডাক্তার নিজে যাহা বলিলেন, তাহা সংক্ষেপে এইরূপ—

ক্ষতি এবং অনিষ্ট কত যে হইয়াছে দূর হইতে নিরূপণ করা শক্ত। সম্ভবতঃ, যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু যতই হউক, দুটা কাজ তাঁহাকে করিতেই হইবে। তাঁহাদের জ্যামেকা ক্লবের যে অংশটা সিঙ্গাপুরে আছে তাহাকে বাঁচাইতেই হইবে, এবং যেখানে হউক, এবং যেমন করিয়া হউক ব্রজেন্দ্রকে তাঁহার খুঁজিয়া বহির করিতেই হইবে। নদীর দক্ষিণে সিরিয়মের সন্নিকটে একখানা চীনা জাহাজ মাল বোঝাই করিয়া দেশে চলিয়াছে, কাল অতি প্রত্যূষেই তাহা ছাড়িয়া যাইবে, ইহাতেই কোনমতে একটা স্থান পাওয়া গিয়াছে। সেই সংবাদই হীরা সিং এইমাত্র দিয়া গেল।

শুনিয়া সুমিত্রার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। খুব সম্ভব, ব্রজেন্দ্র এখন সিঙ্গাপুরে। এবং, যে ব্যক্তি তাহার সন্ধানে চলিল, তাহার দৃষ্টি হইতে স্বর্গে-মর্ত্যে কোথাও তাহার পরিত্রাণ নাই। তখন বিশ্বাসঘাতকতার শেষ-বিচারের সময় আসিবে। ইহার দণ্ড যে কি তাহা দলের মধ্যে কাহারও অবিদিত নহে, সুমিত্রাও জানে। ব্রজেন্দ্র তাহার কিছুই নহে, এবং অপরাধ যদি সে করিয়াই থাকে শাস্তি তাহার হউক, কিন্তু যে কারণে সুমিত্রা অকস্মাৎ এমন হইয়া

গেল, তাহা ব্রজেন্দ্রর দণ্ডের কথা স্মরণ করিয়া নহে, তাহা এই যে, ব্রজেন্দ্র পতঙ্গ নহে। সে আত্মরক্ষা জানে। শুধু তাহার পকেটের সুগুপ্ত পিস্তল নহে, তাহার মত ধূর্ত, কৌশলী ও একান্ত সতর্ক ব্যক্তি সংসারে বিরল। তাহার মস্ত ভুল এই হইয়াছে যে, ডাক্তার হাঁটা-পথে বর্মা ত্যাগ করিয়া গেছেন এই কথা সে যাবার পূর্বে নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়া গেছে। এখন কোন মতে যদি সে ডাক্তারের খোঁজ পায় ত বধ করিবার যতকিছু অস্ত্র তাহার তূণে আছে প্রয়োগ করিতে মুহূর্তের দ্বিধাও করিবে না। বস্তুতঃ, জীবন-মরণ সমস্যায় অপরের বলিবারই বা কি আছে!

কিছুই নাই। শুধু হীরা সিংহের শান্ত মৃদু দুটি শব্দ 'নাউ' এবং 'রেডি' তাহাদের সকলের কানের মধ্যেই সহস্রগুণ ভীষণ হইয়া সহস্র দিক আঘাত-প্রতিঘাত করিয়া ফিরিতে লাগিল। ভারতীর মনে পড়িল তাহাদের মৌলমিনের বাটীতে একদিন জন্মতিথি উৎসবের পরিপূর্ণ আনন্দের মাঝখানে অতিথি এবং সর্বোত্তম বন্ধু রেভারেন্ড লরেন্স আহারের টেবিলে হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছিলেন। আজিও ঠিক তেমনি অকস্মাৎ হীরা সিং ঘরে ঢুকিয়া মৃত্যুদূতের ন্যায় একমুহূর্তে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ শশী কথা বলিয়া উঠিল। মুখ দিয়া ফোঁস করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্চে ডাক্তার।

কথাটা সাদা এবং নিতান্তই মোটা কথা। কিন্তু সকলের বুকের উপরে যেন মুগুরের ঘা মারিল।

ডাক্তার হাসিলেন। শশী কহিল, হাসুন আর যাই করুন, সত্যি কথা। আপনি কাছে নেই মনে হলে সমস্ত যেন ব্ল্যাঙ্ক,—ফাঁকা, ঝাপসা হয়ে আসে। কিন্তু আপনার প্রত্যেকটি হুকুম আমি মেনে চলবো।

যথা?

যথা, মদ খাবো না, পলিটিক্সে মিশবো না, ভারতীর কাছে থাকবো এবং কবিতা লিখবো।

ডাক্তার ভারতীর মুখের দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু দেখিতে পাইলেন না। তখন রহস্যভরে প্রশ্ন করিলেন, চাষাড়ে কবিতা লিখবে না কবি?

শশী কহিল, না। তাদের কাব্য তারা লিখতে পারে লিখুক, আমি লিখচি নে। আপনার সে কথা আমি অনেক ভেবে দেখেচি। এবং, এ উপদেশও কখনো ভুলব না যে, আইডিয়ার জন্য সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারে শুধু শিক্ষিত ভদ্র-সন্তান, অশিক্ষিত কৃষকে পারে না আমি হব তাদেরই কবি।

ডাক্তার বলিলেন, তাই হয়ো। কিন্তু এইটেই শেষ-কথা নয় কবি, মানবের গতি এইখানেই নিশ্চল হয়ে থাকবে না। কৃষকের দিনও একদিন আসবে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ-অকল্যাণের ভার সমর্পণ করতে হবে।

শশী কহিল, আসুক সেদিন। তখন, স্বচ্ছন্দ শান্তচিত্তে সব দায়িত্ব তাদের হাতেই তুলে দিয়ে আমরা ছুটি নেব। কিন্তু আজ না। আজ আত্মবলিদানের গুরুভার তারা বইতে পারবে না।

ডাক্তার উঠিয়া আসিয়া তাহার কাঁধের উপর ডান হাত রাখিয় চুপ করিয়া রহিলেন, কিছুই বলিলেন না।

অপূর্ব এতক্ষণ নিঃশব্দে স্থির হইয়া শুনিতেছিল, ইঁহাদের কোন আলোচনাতেই কথা কহে নাই। কিন্তু শশীর শেষের দিকের মন্তব্য তাহার ভারী খারাপ ঠেকিল। যে কৃষকের মঙ্গলোদ্দেশে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প সে স্থির করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে এই-সকল অভিমতে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিল, মদ খাওয়া খারাপ, বেশ, উনি ছেড়ে দিন; কাব্যচর্চা ভালো, তাই করুন; কিন্তু কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষককুল কি এমনি তুচ্ছ, এতই অবহেলার বস্তু? এবং, এরাই যদি বড় হয়ে না ওঠে, আপনাদের বিপ্লবই বা করবে কে? এবং, করবেই বা কেন? আর পলিটিক্স! যথার্থ বলচি ডাক্তার, কৃষকের কল্যাণে সন্ন্যাসব্রত যদি

আমি না নিতাম, আজ স্বদেশের রাজনীতিই হতো আমার জীবনের একমাত্র কর্তব্য।

ডাক্তার ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সহসা, প্রসন্ন স্নিগ্ধোজ্জ্বল হাস্যে তাহার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কহিলেন, আমি কায়মনে প্রর্থনা করি তোমার সদুদ্দেশ্য যেন সফল হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রও তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নয়। দেশের ও দশের কল্যাণে বৈরাগ্যই যদি গ্রহণ করে থাকো, কারও সঙ্গেই তোমার বিরোধ বাধবে না। আমি শুধু এই কথাই বলি, অপূর্ববাবু, সকলে কিন্তু সকল কাজের যোগ্য হয় না।

অপূর্ব স্বীকার করিয়া বলিল, আমার চেয়ে এ শিক্ষা আর কার বেশী হয়েছে ডাক্তার? আপনি দয়া না করলে বহুদিন পূর্বেই ত এই ভ্রমের চরম দণ্ড আমার হয়ে যেতো। এই বলিয়া পূর্বস্মৃতির আঘাতে তাহার সর্বদেহ কন্টকিত হইয়া উঠিল।

শশী এ ঘটনা জানিত না, জানানো কেহ আবশ্যক বিবেচনাও করে নাই। অপূর্বর কথাটাকে সে প্রচলিত বিনয় ও শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শনের অতিরিক্ত কিছুই মনে করিল না। কহিল, ভ্রম ত করে অনেকেই, কিন্তু দণ্ডভোগ করে চলে যে নিজের জন্মভূমি। আমি ভাবি, ডাক্তার, আপনার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কে আছে? কার এতখানি জ্ঞান? জাতি ও দেশ নির্বিশেষে কার এতখানি রাষ্ট্রতন্ত্রের অভিজ্ঞতা? কার এত ব্যথা? অথচ, কিছুই কাজে এলো না। চায়নার আয়োজন নষ্ট হয়ে গেল, পিনাঙের গেল, বর্মার কিছুই রইল না, সিঙ্গাপুরেরও যাবে নিশ্চয়ই,—এক কথায়, আপনার এতকালের সমস্ত চেষ্টাই ধ্বংস হবার উপক্রম হয়েছে। শুধু প্রাণটাই বাকী, সেও কোন্ দিন যায়!

ডাক্তার মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিলেন। শশী কহিল, হাসুন আর যাই করুন, এ আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

ডাক্তার তেমনি হাসিমুখে প্রশ্ন করিলেন, দিব্যচক্ষে আর কিছু দেখতে পাও না কবি?

শশী বলিল, তাও পাই। তাইত আপনাকে দেখলেই মনে হয়, নিরুপদ্রব, শান্তিময় পথে যদি আমাদের সত্যকার পথের-দাবী সূচ্যগ্র মাত্রও খোলা থাকতো!

অপূর্ব বলিয়া উঠিল, বাঃ। একই সঙ্গে একেবারে দুই উলটো কথা।

সুমিত্রা হাসি গোপন করিতে মুখ ফিরাইল, ডাক্তার নিজেও হাসিয়া বলিলেন, তার কারণ, ওঁর মধ্যে দুটো সত্তা আছে অপূর্ববাবু। একজন শশী, আর একজন কবি। এইজন্যই একের মুখের কথা অপরের মনের কথায় গিয়ে ধাক্কা দিয়ে এমন বেসুরার সৃষ্টি করে। একটু থামিয়া বলিলেন, বহু মানবের মধ্যেই এমনি আর একজন নিভৃতে বাস করে। সহজে তাকে ধরা যায় না। তাই, মানুষের কথার ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব-মাত্রই তার কঠোর বিচার করলে অবিচারের সম্ভাবনাই থাকে বেশী। অপূর্ববাবু, আমি তোমাকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু পারেন নি সুমিত্রা। ভারতী, জীবনযাত্রায় মাঝখানে যদি এমনি আঘাত কখনো পাও দিদি, পরলোকগত দাদার এই কথাটি তখন যেন ভুলো না। কিন্তু, এইবার আমি উঠি। ঘাটে আমার নৌকা বাঁধা আছে, ভাঁটার মুখে অনেকখানি দাঁড় না টানলে আর ভোর-রাত্রে জাহাজ ধরতে পারব না।

ভারতী শঙ্কায় আকুল হইয়া উঠিল, কহিল, এই ভয়ঙ্কর নদীতে? এই ভীষণ ঝড়ের রাত্রে?

তাহার ব্যাকুল-কন্ঠস্বরে সুমিত্রার আত্মসংযমের কঠিন বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে পাংশুমুখে প্রশ্ন করিল, সত্যি সত্যিই কি তুমি সিঙ্গাপুরে নামবে নাকি? এ কাজ তুমি কখখনো করো না ডাক্তার, সেখানকার পুলিশে তোমাকে ভাল করেই চেনে। এবার তাদের হাত থেকে তুমি কিছুতেই—

কথা তাহার শেষ হইল না, উত্তর আসিল, তারা কি এখানেই আমাকে চেনে না সুমিত্রা?

কিন্তু এই লইয়া তর্ক করিয়া ফল নাই, যুক্তি দেখাইবার অবসর নাই,—হয়ত-বা, প্রশ্নটা সুমিত্রা শুনেও নাই ; যে কথা বাহিরে আসিবার ব্যাকুলতায় এতদিন মাথা কুটিয়া মরিতেছিল তাহাই অন্ধবেগে নিষ্ক্রান্ত হইয়া আসিল,—কেবল একটিবার ডাক্তার, শুধু এইবারটির মত

আমার উপরে নির্ভর করে দেখ, তোমাকে আমি সুরবায়ায় নিয়ে যেতে পারি কি না! তারপরে টাকায় কি না হয় বল!

ডাক্তার হেঁট হইয়া জুতায় ফিতা বাঁধিতেছিলেন, বাঁধা শেষ করিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন, টাকায় অনেক কাজ হয় সুমিত্রা, তার অপচয় করতে নেই।

সকলেই বুঝিল, এ আলোচনা বৃথা। উপায়হীন বেদনায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া সুমিত্রা অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, ভারতী কহিল, আমাকে অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে চললে দাদা, অথচ, বার বার বলতে আমাকে,—আর শুধু আমাকে কেন আমাদের মত বয়সের যেখানে যত মেয়ে আছে তাদের প্রতি তোমার বড় লোভ, সকলকেই তুমি অত্যন্ত ভালোবাসো, সে কি এই?

ডাক্তার সায় দিয়া বলিলেন, সত্যই ভালবাসি, ভারতী। মেয়েদের পরে যে আমার কত লোভ, কত ভরসা, সে কথা নিজে তোমাদের জানাবার সুযোগ হল না, কিন্তু পারো যদি দাদার হয়ে এই কথাটা তদের জানিয়ে দিয়ো বোন।

ভারতী সহসা কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, জানাবো এই যে, আমাদের শুধু তুমি বলি দিতে চাও।

ডাক্তার মুহূর্তকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন, বেশ, তাই বলো। বাঙলা দেশের একটি মেয়েও যদি তার অর্থ বোঝে, আমি তাতেই ধন্য হব। এই বলিয়া তাঁহার সুবৃহৎ বোঁচকাটা কাঁধে তুলিয়া লইলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে সকলেই নীচে নামিয়া আসিল। ভারতী শেষ-চেষ্টা করিয়া কহিল, দেশের আয়োজন যার নিষ্ফল হয়ে যায় বিদেশের আয়োজনে তার কি হয় দাদা? যারা অন্তরঙ্গ সুহৃৎ একে একে সবাই ছেড়ে গেল, এখন যে তুমি একেবারে নিঃসঙ্গ,—একেবারে একা!

ডাক্তার স্বীকার করিয়া কহিলেন, ঠিক তাই। কিন্তু, একাই আরম্ভ করেছিলাম ভারতী। আর বিদেশ? কিন্তু, ভগবান এইটুকু দয়া করেছেন মানুষের মর্জিমত ছোট-বড় প্রাচীরের বেড় তুলে তাঁর পৃথিবীকে আর সহস্র কারাকক্ষে পৃথক করে রাখবার তিনি জো রাখেন নি! উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে যতদূর দৃষ্টি যায় বিধাতার রাজপথ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একে রুদ্ধ করে রাখবার চক্রান্ত মানুষের হাতের নাগাল ডিঙ্গিয়ে গেছে! এখন একপ্রান্তের অগ্ন্যুৎপাত অপর প্রান্তে স্ফুলিঙ্গ উড়িয়ে আনবেই আনবে ভারতী সে তাণ্ডব দেশ-বিদেশের গণ্ডী মানবে না।

কিন্তু, এদিকে যে রুদ্রের সত্যকার তাণ্ডব ঘরের বাহিরে তখন কি উন্মাদ-মূর্তিই ধারণ করিয়াছিল ভিতর হইতে তাহা কেহই উপলব্ধি করে নাই। বিদ্যুতে, ঝঞ্ঝায়, প্লাবনে ও বজ্রাঘাতে সে যেন একেবারে প্রলয় শুরু হইয়া গিয়ছিল। এবং, ডাক্তার অর্গল মুক্ত করিতেই এক ঝলক সুতীক্ষ্ণ বৃষ্টির ছাট ভিতরে ঢুকিয়া সকলকে ভিজাইয়া, আলো নিবাইয়া সমস্ত ওলটপালট করিয়া ঘর ও বাহির চক্ষের পলকে অন্ধকারে একাকার করিয়া দিল।

ডাক্তার ডাকিলেন, সরদারজী!

বাহিরে হইতে সাড়া আসিল, ইয়েস্ ডক্টর, রেডি।

সকলে চমকিত হইল। এই দুঃসহ বায়ু ও মুষলধার বৃষ্টি মাথায় পাতিয়া কেহ যে এই সূচীভেদ্য আঁধারে দাঁড়াইয়া নিশ্চল-নিঃশব্দ প্রহরায় নিযুক্ত থাকিতে পারে এ কথা যেন সহসা কেহ ভাবিতেই পারিল না।

ডাক্তার রহস্যভরে কহিলেন, তাহলে আসি এখন! এই বলিয়া বাহিরে পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপূর্ব ব্যগ্র-ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, একদিন যে আমি প্রাণ পেয়েছিলাম এ কথা চিরদিন মনে রাখবো, ডাক্তার।

অন্ধকার হইতে জবাব আসিল, তুচ্ছ পাওয়ার ব্যাপারটাকেই কেবল বড় করে দেখলে অপূর্ববাবু, যে দিলে তাকে মনে রাখলে না?

অপূর্ব চীৎকার করিয়া কহিল, মনে? এ জীবনে ভুলব না। এ ঋণ মরণ পর্যন্ত আমি—

দূরে আঁধারের মধ্যে হইতে প্রত্যুত্তরে আসিল, তাই যেন হয়। প্রার্থনা করি সত্যকার দাতাকে যেন একদিন তুমি চিনতে পারো, অপূর্ববাবু! সেদিন সব্যসাচীর ঋণ—

কথার শেষটা আর শুনা গেল না, অস্ফুটধ্বনি বায়ুবেগে শূন্যে ভাসিয়া গেল। তাহার পরে ক্ষণকালের জন্য যেন কাহারও সংজ্ঞা রহিল না! অচেতন জড়মূর্তির ন্যায় কয়েক মুহূর্ত নিশ্চল থাকিয়া ভারতী অকস্মাৎ চকিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে উপরে উঠিয়া আসিতেই সবাই তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিল। সে ক্ষিপ্রহস্তে জানালা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যতদূর দৃষ্টি যায় নিষ্পলক চক্ষু-দুটি অন্ধকারে একাগ্র করিয়া পাথরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। এমন কতক্ষণ কাটিল। সহসা ভীষণ শব্দে হয়ত কাছে কোথাও বাজ পড়িল এবং তাহারই সুতীব্র বিদ্যুৎ-শিখা পরকের জন্যই আকাশ ও ধরাতল উদ্ভাসিত করিয়া একবার শেষ দেখা দেখাইয়া দিল।

এই ভয়ানক দুর্যোগে বাটীর বাহিরে আসিয়া ইঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার মত উন্মাদ বোধ হয় পুলিশের মধ্যে কেহ ছিল না, তথাপি রাজপথ এড়াইয়া উভয়ে মাঠের দক্ষিণ-প্রান্ত ঘুরিয়া ধীরে ধীরে চলিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝোপ-ঝাড় ও কাঁটাগাছের বেড়া ; এই সূচীভেদ্য আঁধারে পিচ্ছিল পথহীন পথে বিপুল বোঝার ভারে একজন আনতদেহে সাবধানে অগ্রসর হইয়াছে, এবং অপরে বিরাট পাগড়ির নীচে প্রচণ্ড বারিপাত হইতে যথাসম্ভব নিজের মাথাটা বাঁচাইটা তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে।

নিমিষ মাত্র। নিমিষমাত্র পরেই সমস্ত বিলুপ্ত করিয়া দিয়া রহিল শুধু নিবিড় অন্ধকার।

হঠাৎ গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিয়া উঠিল, দুর্দিনের বন্ধু! নমস্কার সরদারজী।

সঙ্গে সঙ্গে অপূর্বও তাহার দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া তাঁহারই উদ্দেশে নিঃশব্দে নমস্কার করিল। তাহার মনের মধ্যে হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল।

ভারতী তেমনি পাষাণমূর্তির অন্ধকারে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শশীর কথাও যেমন তাহার কানে গেল, না তেমনি জানিতেও পারল না ঠিক তাহারই মত আর একজন নারীর দুই চক্ষু প্লাবিয়া তখন এমনি অশ্রুপ্রবাহই বহিয়া যাইতেছিল।

Pathagar.Net

বিপ্রদাস

এক

বলরামপুর গ্রামের রথতলায় চাষাভুষাদের একটা বৈঠক হইয়া গেল। নিকটবর্তী রেলওয়ে লাইনের কুলি গ্যাং রবিবারের ছুটির ফাঁকে যোগদান করিয়া সভার মর্যাদা বৃদ্ধি করিল এবং কলিকাতা হইতে জনকয়েক নামকরা বক্তা আসিয়া আধুনিক কালের অসাম্য ও অমৈত্রীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করিলেন। অসংখ্য প্রস্তাব গৃহীত হইল ও পরে শোভাযাত্রায় বন্দেমাতরম্ ধ্বনিসহযোগে গ্রাম পরিক্রমণপূর্বক সেদিনের মত সম্মিলনীর কার্য সমাধা হইল।

বলরামপুর সমৃদ্ধ গ্রাম। ছোট-বড় অনেকগুলি তালুকদার ও সম্পন্ন গৃহস্থের বাস। একপ্রান্তে মুসলমান কৃষকপল্লী ও তাহারই অদূরে ঘর-কয়েক বাগদী ও দুলেদের বসতি। ভাগীরথীর একটি শাখা বহুকাল পূর্বে মজিয়া অর্ধবৃত্তাকারে ক্রোশেক বিস্তৃত বিলের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহারই তীরে তাহাদের কুটির। এই গ্রামের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী ব্যক্তি যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায়। জমিজমা তালুক-তেজারতি প্রভৃতিতে তাঁহার সম্পত্তি ও সম্পদ প্রচুর বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না। তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখের পথে এই শোভাযাত্রা যখন রক্ত-পতাকায় লিখিত নানাবিধ 'বাণী' ও বিপুল চীৎকারে কৃষক-মজুরের জয়-জয়কার হাঁকিয়া অতিক্রম করিতেছিল, তখন দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘাকৃতি বলিষ্ঠ-গঠন যুবক নীচের সমস্ত দৃশ্য নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছিল। অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্বেলিত কোলাহল যেন একমুহূর্তে নিবিয়া গেল। পুরোবর্তী নেতৃস্থানীয় জন দুই-তিন ব্যক্তি চমকিয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া বহু লোকের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া উপরের দিকে মুখ তুলিতেই তিনি থামের আড়ালে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

অনেকেই চাপা মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিল, বিপ্রদাসবাবু!

কে বিপ্রদাস? গাঁয়ের জমিদার বুঝি?

কে একজন কহিল, হাঁ।

নেতারা শহরের লোক, কাহাকেও বড়-একটা গ্রাহ্য করেন না ; উপেক্ষাভরে কহিলেন, ওঃ এই! এবং পরক্ষণেই উচ্চ-চীৎকারে মাথার উপরে হাত ঘুরাইয়া সমস্বরে হাঁকিলেন, বল, 'ভারত মাতার জয়!' বল, 'কৃষাণ-মজুরের জয়!' বল, 'বন্দেমাতরম্!'

বিশেষ ফল হইল না। অনেকেই চুপ করিয়া রহিল, অথবা মনে মনে বলিল এবং যে দুই-চারিজন সাড়া দিল তাহাদেরও ক্ষীণকণ্ঠ বেশী ঊর্ধ্বে উঠিল না—বিপ্রদাসের বারান্দা ডিঙাইয়া তাঁহার কানে পৌঁছিল কিনা বুঝা গেল না। নেতারা নিজেদের অপমানিত জ্ঞান করিলেন, বিরক্ত হইয়া কহিলেন, এই একটা সামান্য গ্রাম্য জমিদার তাকেই এত ভয়! ওরাই ত আমাদের পরম শত্রু,—আমাদের গায়ের রক্ত অহরহ শুষে খাচ্চে। আমাদের আসল অভিযান ত ওদেরই বিরুদ্ধে! ওরা যে—

প্রদীপ্ত বাগ্মিতায় সহসা বাধা পড়িল। বহু শাণিত শর তখনও তাঁহাদের তূণে সঞ্চিত ছিল, কিন্তু প্রয়োগ করায় বিঘ্ন ঘটিল। কে একজন ভিড়ের মধ্য হইতে আস্তে বলিল, ওঁর দাদা!

কার?

একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবক নিশান লইয়া সকলের অগ্রে চলিয়াছিল, সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, উনি আমারই বড়ভাই। অথচ এই ছেলেটিরই আগ্রহ, উদ্যম ও অর্থব্যয়ে আজিকার অনুষ্ঠান সফল হইতে পারিয়াছিল।

ওঃ—আপনার! আপনিও বুঝি এখানকার জমিদার?

ছেলেটি সলজ্জ নতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

দুই

বিপ্রদাস নিজের বসিবার ঘরে ছোট ভাইকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, কালকের আয়োজনটা মন্দ হয়নি। অনেকটা চমক লাগবার মত। War cry-গুলোও বেশ বাছা বাছা, ঝাঁজ আছে তা মানতেই হবে।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বিপ্রদাস প্রশ্ন করিলেন, শোভাযাত্রাটা কি বিশেষ করে আমারই উদ্দেশে আমার নাকের ডগা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হল? ভয় পাব বলে?

দ্বিজদাস শান্তস্বরে জবাব দিল, শুধু আপনার জন্যেই নয়। শোভাযাত্রা যে পথ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হোক, ভয় যাদের পাবার তারা ত পাবেই দাদা!

বিপ্রদাস মুচকিয়া হাসিলেন। সে একেবারে অবজ্ঞা ভরা। বলিলেন, তোমার দাদা ঠিক সে জাতের মানুষ নয়, এ খবর তোমার শোভাযাত্রীরা অনেকেই জানত। নইলে তাদের জয়ধ্বনি শোনবার জন্যে আমাকে বারান্দায় উঠে গিয়ে কান পেতে দাঁড়াতে হত না। ঘরে বসেই শোনা যেত। তোমাদের রকমারি নিশান আর বড় বড় বক্তৃতাকে ভয় আমি করিনে। বেশ বুঝি, ঝকঝকে বাঁধান দাঁত দিয়ে মানুষকে শুধু খিঁচোনোই যায়, তাতে কামড়ানোর কাজ চলে না।

যে কারণে কাল বহু লোকেরই কণ্ঠরোধ হইয়াছিল তাহা গোপন ছিল না। এবং ইহারই ইঙ্গিতে দ্বিজদাস মনে মনে গভীর লজ্জা বোধ করিল। সে স্বভাবতঃ শান্তপ্রকৃতির মানুষ এবং দাদাকে অত্যন্ত মান্য করিত বলিয়া হয়ত আর কোন প্রসঙ্গে চুপ করিয়াই থাকিত, কিন্তু যা লইয়া তিনি খোঁচা দিলেন সে সহ্য কঠিন। তথাপি মৃদুকণ্ঠেই বলিল, দাদা, বাঁধানো দাঁত দিয়ে যেটুকু হয় তার বেশী যে হয় না এ কথা আমরা জানি, শুধু আপনারাই জানেন না যে সংসারে সত্যিকার দাঁতওয়ালা লোকও আছে, কামড়াবার দিন এলে তাদের অভাব হয় না।

জবাবটা অপ্রত্যাশিত। বিপ্রদাস আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—বটে!

দ্বিজদাস প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সভয়ে থামিয়া গেল। ভয় বিপ্রদাসকে নহে, অকস্মাৎ দ্বারের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তোরা দরজায় পর্দা টাঙিয়ে রাখিস কেন বল ত? ছোঁয়াছুঁয়ি না করে যে ঘরে ঢুকবো তার জো নেই। ঘর-সংসার বিলিতী ফ্যাশনে ভরে গেল।

দ্বিজদাস ব্যস্ত হইয়া পর্দাটা টানিয়া দিল, এবং বিপ্রদাস চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একজন প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা ভিতরে প্রবেশ করিলেন। বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু রূপের অবধি নাই। একটু কৃশ, মুখের পরে বৈধব্যের কঠোরতার ছাপ পড়িয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়। ছোটছেলের দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া বড় ছেলেকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, হাঁ রে বিপিন, শুনচি নাকি একাদশী নিয়ে এ মাসে পাঁজিতে গোল বেধেছে? এমন ত কখনও হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, হওয়া ত উচিত নয় মা।

তুই স্মৃতিরত্নমশাইকে একবার ডেকে পাঠা। তাঁর মতটা কি শুনি!

বিপ্রদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা পাঠাচ্চি। কিন্তু তাঁর মতামতে কি হবে মা, তোমার কানে একবার যখন খবর পৌঁছেচে, তখন ও-দুটো দিনের একটা দিনও তুমি জলস্পর্শ করবে না তা জানি।

মা হাসিলেন, বলিলেন, মিথ্যে উপোস করে মরা কি কারও শখ রে? কিন্তু উপায়

কি? এ করলে পুণ্যি নেই, না করলে অনন্ত নরক। হাঁ রে, বৌমা বলছিলেন, খবরের কাগজে লিখেছে কে একজন মস্ত পণ্ডিত কলকাতায় নাকি চমৎকার ভাগবত ব্যাখ্যা করচেন। একবার খোঁজ নে দিকি, কি হলে এ বাড়িতে তিনি পায়ের ধূলো দিতে পারেন?

তোমার হুকুম হলেই নিতে পারি মা।

কেন, আমার হুকুমেরই বা দরকার কি। তোদের শুনতে কি ইচ্ছে যায় না? সেই যে কবে কথকতা হয়ে গেল—

বিপ্রদাস সহাস্যে বাধা দিয়া কহিল, সে ত এখনো তিন মাসও হয়নি মা!

মা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, মোটে তিন মাস? কিন্তু তিন মাসই কি কম সময়? তা সে যাই হোক বাবা, এবার কিন্তু না বললে চলবে না। আমার দু মামীই চিঠি লিখেচেন। কৈলাসনাথ, মানস-সরোবর দর্শনে একবার আমি যাবই যাব।

বিপ্রদাস হাতজোড় করিয়া কহিল, দোহাই মা, ও আদেশটি তুমি করো না। তোমার দুই ছেলের একজন সঙ্গে না গেলে মামীদের জিম্মায় তোমাকে তিব্বতে পাঠাতে পারব না। আর সব ক্ষতিই সইবে, কিন্তু মাকে হারান আমার সইবে না।

মায়ের দুই চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল, বলিলেন, ভয় নেই রে, কৈলাসের পথে মরণ হবে তেমন পুণ্যি তোর মায়ের নেই। আমি আবার ফিরে আসব। কিন্তু ছেলের মধ্যে তুই ত আমার সঙ্গে যেতে পারবি নে বিপিন, তোর পরেই এত বড় সংসারের সব ভার, আর পিছনে যে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে তাকে নিয়ে আমি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজী নই। বামুনের ছেলে হয়ে সন্ধ্যে-আহ্নিক ত অনেকদিনই ছেড়েচে, শুনতে পাই কলকাতায় খাদ্যাখাদ্যেরও নাকি বিচার করে না। এর ওপর কাল কি করেচে শুনেছিস?

বিপ্রদাস ভালমানুষের মত মুখ করিয়া কহিল, কি আবার করলে? কৈ শুনিনি ত কিছু।

মা বলিলেন, নিশ্চয় শুনেছিস। তোর চক্ষুকে ফাঁকি দেবে এত বুদ্ধি ও-ছোঁড়ার ঘটে নেই। কিন্তু এর একটা প্রতিকার কর। ও আমারই খাবে পরবে, আর আমারই টাকায় কলকাতা থেকে লোক এনে আমার প্রজা বিগড়োবার ফন্দি আঁটবে? ওর কলকাতার খরচা তুই বন্ধ কর।

বিপ্রদাস আশ্চর্য হইয়া বলিল, সে কি কথা মা, পড়ার খরচ বন্ধ করে দেব? ও পড়বে না?

মা বলিলেন, দরকার কি? আমার শ্বশুরের ইস্কুলের ছাত্ররা যখন দল বেঁধে এসে বললে, বিদেশী লেখাপড়ায় দেশের সর্বনাশ হল, তখন তাদের তুই তেড়ে মারতে গেলি। আর তোর নিজের ছোটভাই ঠিক ঐ কথাই বলে বেড়ায় তার কি কোন প্রতিবিধান করবি নে? এ তোর কেমন বিবেচনা?

বিপ্রদাস হাসিমুখে কহিল, তার কারণ আছে মা। ইস্কুলের ক্লাসে প্রমোশন না পেয়ে ও নালিশ করলে আমার সয় না, কিন্তু দ্বিজুর মত এম. এ. পাস করে বিলিতী শিক্ষাকে যত খুশি গাল দিয়ে বেড়াক আমার গায়ে লাগে না।

মা বলিলেন, কিন্তু এটা? আমার টাকায় আমার প্রজা ক্ষ্যাপানো?

দ্বিজদাস এতক্ষণ নিঃশব্দে ছিল, একটা কথারও জবাব দেয় নাই। এবার উত্তর দিল, কহিল, কালকের সভা-সমিতির জন্যে তোমাদের এস্টেটের একটা পয়সাও আমি অপব্যয় করিনি।

মা ঘরে ঢুকিয়া পর্যন্ত একবারও পিছনে তাকান নাই, এখনও চাহিলেন না। বিপ্রদাসকেই প্রশ্ন করিলেন, তা হলে হতভাগাকে জিজ্ঞেস কর ত টাকা পেলে কোথায়? রোজগার করচে?

ঠিক এমনি সময়ে পর্দার বাহিরে টুংটাং করিয়া একটুখানি চুড়ির শব্দ হইল। বিপ্রদাস কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, ঐ ত তার জবাব মা! নিজের ঘরের বৌ যদি টাকা যোগায়, কে আটকাবে বল দিকি?

মায়ের মনে পড়িল। কহিলেন ও তাই বটে! সতীর কাজ এই! বড়মানুষের মেয়ে বাপের জমিদারি থেকে বছরে যে ছ' হাজার টাকা পায়, সে আমার খেয়াল ছিল না। তিনিই গুণধর দেওরকে টাকা যোগাচ্ছেন! একটুখানি স্থির থাকিয়া কহিলেন, তোর সম্বন্ধ করতে বেয়াইমশাই নিজে যখন এলেন তখন কর্তাকে আমি বলেছিলুম, রায়বাড়ির মেয়ে ঘরে এনে কাজ নেই। ওদের বংশেরই ত অনাথ রায় বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করেছিল। ওরা পারে না কি? ওদের অসাধ্য সংসারে কি আছে?

বিপ্রদাস তেমনি হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। সে জানিত সতীর অদৃষ্টে এ খোঁটা আর যাবার নয়। তাহার বাপের বাড়ির সম্পর্কে কে এক অনাথ রায় বাঙালী-মেম বিবাহ করিয়াছিল, এ কথা মা আর ভুলিতে পারিলেন না।

সকলেই চুপ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি পুনশ্চ বলিলেন, আচ্ছা থাক। বাবা কৈলাসনাথ এবার টেনেছেন, তাঁকে দর্শন করে ফিরে আসি, তার পরে এর বিহিত করব। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, কি রে দ্বিজু, মাকে নিয়ে পারবি যেতে? উনি ঝোঁক যখন ধরেছেন তখন থামানো যাবে বলে ভরসা হয় না।

দ্বিজদাস তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করিয়া কহিল, আপনি তো জানেন, ঠাকুর-দেবতায় আমার বিশ্বাস নেই। তা ছাড়া আমার সঙ্গে উনি বৈকুণ্ঠে যেতেও নারাজ, এ ত তাঁর নিজের মুখ থেকেই শুনলেন।

বিপ্রদাস বিরক্ত হইয়া কহিলেন, হাঁ রে পণ্ডিত, শুনলাম। তুই যেতে পারবি কি না তাই বল।

আমার এখন মরবার ফুরসুত নেই। এই বলিয়া দ্বিজদাস অন্য প্রশ্নের পূর্বেই ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিপ্রদাস নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তাই বটে। এমনি দেশের কাজ যে মাকেও মানা চলে না।

এইখানে মায়ের একটুখানি পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। বিপ্রদাসের ইনি বিমাতা। তাঁহার জননীর মৃত্যুর বৎসর-কাল পরেই যজ্ঞেশ্বর দয়াময়ীকে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিয়াছিলেন এবং সেইদিন হইতে ইঁহার হাতেই সে মানুষ। ইনি যে জননী নহেন এ সংবাদ বিপ্রদাস যথেষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত জানিতেও পারে নাই।

তিন

এ বাড়িতে দ্বিজদাস সবচেয়ে বেশী খাতির করিত বৌদিদিকে। তাহার সর্ববিধ বাজে খরচের টাকাও আসিত তাঁহারই বাক্স হইতে। সতী শুধু সম্পর্ক-হিসাবেই তাহার বড় ছিল না, বয়সের হিসাবেও মাস-কয়েকের বড় ছিল। তাই অধিকাংশ সময়েই তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত। এই লইয়া ছেলেবেলায় দ্বিজু মায়ের কাছে কত যে নালিশ জানাইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

মাত্র এগারো বছর বয়সে সতী বধূরূপে এই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া তাহার আদরের সীমা ছিল না। শাশুড়ী হাসিয়া বলিতেন, সত্যি নাকি? কিন্তু এ ত তোমার বড় অন্যায় বৌমা, দেওরের নাম ধরে ডাকা!

সতী বলিত, অন্যায় কেন, আমি যে ওর চেয়ে বয়সে অনেক বড়।

অনেক বড়? কত বড় মা?

আমি জন্মেচি বোশেখ মাসে, ও জন্মেচে ভাদ্র মাসে।

মা সহাস্যে কহিতেন, ভাদ্র মাসেই ত বটে মা, আমারই মনে ছিল না। এর পরেও আর যদি কখনো ও নালিশ করতে আসে ওর কান মলে দেব।

আদালতে হারিয়া দ্বিজু রাগ করিয়া চলিয়া গেলে বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া

শাশুড়ী সস্নেহে বলিতেন, ও ছেলেমানুষ কিনা তাই বোঝে না। ঠাকুরপো বললে ভারী খুশী হয়! মাঝে মাঝে ডেকো, কেমন মা?

সতী রাজী হইয়া ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিয়াছিল, আচ্ছা মা, মাঝে মাঝে তাই বলে ডাকবো।

সেদিন যে ছিল বালিকা, আজ সে এত বড় বাড়ির গৃহিণী। বিধবা হওয়ার পর হইতে শাশুড়ী ত থাকেন নিজের জপ-তপ এবং ধর্মকর্ম লইয়া, তথাপি তাঁহার সেদিনের সেই উপদেশটুকু পরবর্তীকালে সতীর অনেক দিন অনেক কাজে লাগিয়াছে। যেমন আজ।

পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরে প্রায় পনর-ষোল দিন অতীত হইয়াছে, সকালবেলা সতী দেবরের পড়িবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে ডাকিল, ভাই ঠাকুরপো—

দ্বিজদাস হাত তুলিয়া থামাইয়া দিয়া বলিল, থাক বৌদি, আর খোশামোদের আবশ্যক নেই, আমি করব।

কি করবে শুনি?

তুমি যা হুকুম করবে তাই। কিন্তু দাদার এ ভারী অন্যায়।

অন্যায়টা কিসের হল বলো ত?

দ্বিজদাস তেমনি রাগ করিয়াই কহিল, আমি জানি। এই মাত্র দাদার ঘরের সুমুখ দিয়ে এসেচি। ভেতরে তিনি, মা এবং তোমার ষড়যন্ত্র যা হচ্ছিল আমার কানে গেছে। তাঁদের সাহস নেই আমাকে বলেন, তাই তোমাকে ধরেছেন কাজ আদায়ের জন্যে। কত বড় অন্যায় বল ত!

সতী হাসিমুখে কহিল, অন্যায় ত নয় ঠাকুরপো। তাঁরা বেশ জানেন যে তাঁরা বলা মাত্রই জবাব আসবে, আমার মরবার ফুরসত নেই—কিন্তু বৌদিদি হুকুম করলে দ্বিজুর সাধ্য নেই যে না বলে।

দ্বিজদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, এইখানেই হয়েছে আমার মুশকিল, আর এইখানেই পেয়েচেন ওঁরা জোর। কিন্তু কি করতে হবে?

সতী বলিল, মা কৈলাস-দর্শনে যাবেনই, আর তোমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে।

দ্বিজদাস কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দু-তিন মাসের কমে হবে না। কাজের কত ক্ষতি হবে ভেবে দেখেচো বৌদি?

সতী স্বীকার করিয়া বলিল, ক্ষতি কিছু হবেই। কিন্তু একটা নতুন জায়গাও দেখা হবে। নিজের তরফ থেকে একে নিছক লোকসান বলা চলে না। লক্ষ্মী ভাইটি, পরে যেন আর আপত্তি করো না।

দ্বিজদাস কহিল, তুমি যখন আদেশ করেছ, তখন আপত্তি আর করব না, সঙ্গে যাব। কিন্তু মা অনায়াসে সেদিন দাদাকে বলেছিলেন, আমার কলকাতার পড়ার খরচ বন্ধ করে দিতে।

সতী সহাস্যে বলিল, ওটা রাগের কথা ভাই। কিন্তু হুকুম যিনি দিলেন, তিনি মা ছাড়া আর কেউ নয়। এ কথাটাও তোমার ভুললে চলবে না।

দ্বিজদাস উত্তর দিল, ভুলিনি বৌদি। কিন্তু সেদিন থেকে আমিও কি স্থির করেচি জান? আমি একলা মানুষ, বিয়ে করবার আমার কখনো সময়ও হবে না, সুযোগও ঘটবে না। সুতরাং খরচ সামান্য। আবশ্যক হলে বরঞ্চ ছেলে পড়িয়ে খাব, কিন্তু এদের এস্টেট থেকে একটা পয়সাও কোনদিন চাইব না।

সতী পুনরায় হাসিয়া কহিল, চাইবার দরকার হবে না ঠাকুরপো, আপনি এসে হাজির হবে। আর তাও যদি না আসে তোমার ছেলে পড়াবার প্রয়োজন হবে না। অন্ততঃ, আমি বেঁচে থাকতে ত নয়। সে ভার আমার রইল।

এ বিশ্বাস দ্বিজুরও মনের মধ্যে স্বতঃসিদ্ধের ন্যায় ছিল, পলকের জন্য তাহার চোখের

পাতা ভারী হইয়া উঠিল, কিন্তু সে ভাবটা তাড়াতাড়ি কাটাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা কবে যাত্রা করবেন স্থির করেছেন? যবেই করুন, শেষকালে আমাকেই সঙ্গে যেতে হল! অথচ মা সেদিন স্পষ্ট করেই বলেছিলেন যে আমার মত ম্লেচ্ছাচারীকে নিয়ে তিনি বৈকুণ্ঠে যেতেও রাজী নন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস না বৌদি?

সতী এ অনুযোগের জবাব দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজু বলিল, সে যাই হোক, তোমার আদেশ অমান্য করব না বৌদি,—তাঁদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলো।

সতী হাসিল, কহিল, আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁরা নিশ্চিন্তই আছেন। ঘর থেকে বার হওয়া মাত্র তোমার দাদার কথা কানে গেল, তিনি জোর গলায় মাকে বলছিলেন, এবার নির্ভয়ে যাত্রার আয়োজন কর গে মা, যাঁকে দৌত্যকর্মে নিযুক্ত করা গেল তাঁর সুমুখে ভায়ার তর্ক চলবে না। ঘাড় হেঁট করে স্বীকার করবে, তুমি দেখে নিয়ো।

শুনিয়া দ্বিজদাস ক্রোধে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, অস্বীকার করতে পারব না জেনেই যদি তাঁরা এ ফন্দি এঁটে থাকেন যে মেয়েদের এই অর্থহীন খেয়াল চরিতার্থ করার বাহন আমাকেই হতে হবে, তা হলে আমার পক্ষ থেকে তুমি দাদাকে এই কথাটা বলো বৌদি যে, তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত।

সতী কহিল, বলে লাভ নেই ঠাকুরপো, জমিদার হয়ে যারা প্রজার রক্ত শুষে খায়, এই তাদের নীতি। নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য এদের কোন লজ্জাবোধ নেই। সম্পত্তির অর্ধেক মালিক হয়েও যখন তুমি এদের এস্টেট থেকে টাকা নিতে সঙ্কোচ বোধ কর, তখন একদিকে আমি যেমন দুঃখ পাই, তেমনি আর একদিকে মন খুশীতে ভরে ওঠে। তোমার নাম করে আমি মাকে আশ্বাস দিয়েছি যে, তাঁর যাওয়ার বিঘ্ন হবে না, সঙ্গে তুমি যাবে। তীর্থ থেকে ভালয় ভালয় ফিরে এসো ঠাকুরপো, যত লোকসানই তোমার হোক, আমি সবটুকু তার পূর্ণ করে দেব।

দ্বিজদাস নিঃশব্দে চৌকি হইতে উঠিয়া বৌদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ফিরিয়া গিয়া বসিল।

সতী বলিল, এতক্ষণ পরের উমেদারি করেই ত সমস্ত কাটল, এখন নিজের অনুরোধ একটা আছে।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, তোমার নিজের? ঐটি কিন্তু পারব না বৌদি।

সতী নিজেও হাসিল, বলিল, আশ্চর্য নয় ঠাকুরপো। ভয় হয় পাছে শুনে না বলে বসো।

বেশ ত, বলেই দেখো না।

সতী কহিল, আমার এক ম্লেচ্ছ খুড়ো আছেন,—আপনার নয়, বাবার খুড়তুত ভাই,—তিনি বিলাত গিয়েছিলেন। তখন এ খবরটা এঁদের কানে এসে পৌঁছলে এ বাড়িতে আমার ঢোকাই ঘটত না। মার মুখে এ কথা শুনেছ বোধ হয়?

বহু বার। এমন কি গড়পড়তা দিনে একবার করে হিসাব করে নিলে এই পনর-ষোল বছরে অন্ততঃ সংখ্যায় হাজার পাঁচ-ছয় হবে।

সতী হাসিয়া কহিল, আমারও আন্দাজ তাই। কাকা থাকেন বোম্বায়ে। তাঁর একটি মেয়ে ঐখানেই লেখাপড়া করে। আসচে বছরে সে বিলাত যাবে পড়া শেষ করতে। তোমাকে গিয়ে তাকে আনতে হবে।

কোথায়? বোম্বাই থেকে?

হাঁ। সে লিখেচে, সে একলাই আসতে পারে, কিন্তু এতটা দূর একাকী আসতে বলতে আমার সাহস হয় না।

তাঁকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই?

না, কাকা ছুটি পাবেন না।

দ্বিজদাস হঠাৎ রাজী হইতে পারিল না, ভাবিতে লাগিল। সতী বলিতে লাগিল, আমার বিয়ে যখন হয় তখন সে সাত-আট বছরের বালিকা। তার পরে একটিবার মাত্র দেখা হয় কলকাতায়, তখন সে সবে ম্যাট্রিক পাস করে আই. এ. পড়তে শুরু করেছে,—সে ত কত বছর হয়ে গেল। তাকে আমি ভারী ভালবাসি ঠাকুরপো, যদি কষ্ট করে গিয়ে একবার এনে দাও। আনবার জন্যে সে আমাকে প্রায় চিঠি লেখে কিন্তু সুযোগ আর হয় না।

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এখনোই বা সুযোগ হল কিসে? মা কি রাজী হয়েছেন?

সতী এ প্রশ্নের সহসা উত্তর দিতে পারিল না। এবং পারিল না বলিয়াই একটি সত্যকার ব্যাকুলতা তাহার মুখে প্রকাশ পাইল। একটুখানি থামিয়া কহিল, মাকে বলেছি। এখনো ঠিক মত দেননি বটে, কিন্তু নিজের তীর্থযাত্রা নিয়ে এমনি মেতে আছেন যে, আশা হয় আপত্তি করবেন না। তা ছাড়া নিজে যখন থাকবেন না তখন এই দু-তিন মাস সে অনায়াসে আমার কাছে থাকতে পারবে।

দ্বিজদাস মনে মনে বুঝিল, শাশুড়ীর হুকুম না পাইলেও এই সুযোগে সে প্রবাসী বোনটিকে একবার কাছে আনাইতে চায়। প্রশ্ন করিল, তোমার কাকারা কি ব্রাহ্ম-সমাজের?

সতী বলিল, না। কিন্তু হিন্দু-সমাজও তাদের আপনার বলে নেয় না। ওরা ঠিক যে কোথায় আছে নিজেরাও বোধ করি জানে না। এমনিভাবেই দিন কেটে যাচ্চে।

এ অবস্থা অনেকেরই। দ্বিজু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, যেতে আমার আপত্তি নেই বৌদি, কিন্তু আমি বলি, মা থাকতে তাকে তুমি এখানে এনো না। মাকে ত জানই, হয়ত খাওয়া-ছোঁয়া নিয়ে এমন কাণ্ড করবেন যে, বোনকে নিয়ে তোমার লজ্জার সীমা থাকবে না। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা চলে গেলে তাঁকে আনার ব্যবস্থা করো—সব দিকেই ভাল হবে।

ইহা যে সুপরামর্শ তাহা সতী নিজেও জানিত, কিন্তু সে যখন নিজে চিঠি লিখিয়া আসিবার প্রার্থনা জানাইয়াছে, তখন কি করিয়া যে একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় নিষেধ করিয়া চিঠির উত্তর দিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ইহার সঙ্কোচ এবং দুঃখই কি কম? কহিল, নিজের বোন বলে বলচি নে ঠাকুরপো, কিন্তু সেবার মাস-খানেক তাকে কলকাতায় অত্যন্ত নিকটে পেয়ে নিশ্চয় বুঝেছি যে, রূপে-গুণে তেমন মেয়ে সংসারে দুর্লভ। বাইরে থেকে তাদের আচার-ব্যবহার যেমনই দেখাক, মা যদি তাকে দুটো দিনও কাছে কাছে দেখতে পান ত ম্লেচ্ছ মেয়েদের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা বদলে যাবে। কখনো তাকে অশ্রদ্ধা করতে পারবেন না।

দ্বিজদাস বলিল, কিন্তু এই দুটো দিনই যে মাকে দেখানো শক্ত বৌদি। তিনি দেখতেই চাইবেন না। ইহাও সত্য।

সতী কহিল, কিন্তু তার রূপটাও ত চোখে পড়বে? চোখ বুজে ত মা এটা অস্বীকার করতে পারবেন না! সেও ত একটা পরিচয়।

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী কহিল, আমার নিশ্চয় বিশ্বাস বন্দনাকে পৃথিবীতে কেউ অবহেলা করতে পারে না। যাও না।

দ্বিজদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা! নামটা যে শুনেচি মনে হয় বৌদি। কোথায় যেন দেখেচি, আচ্ছা দাঁড়াও, খবরের কাগজে কি—একটা ছবিও যেন—

কথাটা শেষ হইল না, ঝি সশব্দে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বৌমা, তুমি এখানে? তোমার কে এক কাকা তাঁর মেয়ে নিয়ে বোম্বাই থেকে এসে উপস্থিত হয়েছে। বাইরে কেউ নেই, বড়বাবুও না। সরকারমশাই তাঁদের নীচের ঘরে বসিয়েছেন।

ঘটনাটা অভাবনীয়। আঁা—বলিস কি রে? বলিতে বলিতে সতী ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পিছনে গেল দ্বিজদাস।

চার

নিখুঁত সাহেবী-পরিচ্ছদে ভূষিত একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়াছিলেন, এবং একটি কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ে তাঁহারই পাশে দাঁড়াইয়া দেয়ালে টাঙানো মস্ত একখানি জগদ্ধাত্রী দেবীর ছবি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিতেছিল। তাহারও পরনে যাহা ছিল তাহা নিছক মেমসাহেবের মত না হউক, বাঙালীর মেয়ে বলিয়াও হঠাৎ মনে হয় না। বিশেষতঃ গায়ের রঙটা যেন সাদার ধার ঘেঁষিয়া আছে—এমনি ফরসা। দেহের গঠন ও মুখের শ্রী অনিন্দ্যসুন্দর। দেবরের কাছে সতী এইমাত্র যে গর্ব করিয়া বলিতেছিল তার রূপটা ত শাশুড়ীর চোখে পড়িবে,—চোখ বুজিয়া ত এটা তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না, বস্তুতঃ এ কথা সত্য। ভগিনীর হইয়া এ রূপ লইয়া অহঙ্কার করা চলে।

ঘরে ঢুকিয়া সতী গড় হইয়া প্রণাম করিল, বলিল, সেজকাকা, মেয়ের বাড়িতে এতকাল পরে পায়ের ধূলো পড়ল?

ভদ্রলোক উঠিয়া দাঁড়াইয়া সতীর মাথায় হাত দিলেন, সহাস্যে কহিলেন, হ্যাঁ রে বুড়ি পড়ল! কবে, কোন্ কালে কাকাকে নেমন্তন্ন করে খবর পাঠিয়েছিলি যে অস্বীকার করেছিলাম? কখনো বলেচিস আসতে? নিজে যখন যেচে এলাম তখন মস্ত ভণিতা করে বলা হচ্ছে পায়ের ধূলো পড়ল? দ্বিজদাসের প্রতি চোখ পড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কে?

সতী পিছনে চাহিয়া দেখিয়া কহিল, উটি আমার দেওর—দ্বিজু।

দ্বিজদাস দূর হইতে নমস্কার করিল। বন্দনা দিদিকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, ওঃ—ইনিই সেই? যাঁর জ্বালায় জমিদারি বুঝি যায়-যায়। আমাকে চিঠিতে লিখেছিলে। বংশ ছাড়া, গোত্র-ছাড়া, ভয়ঙ্কর স্বদেশী?

অমন কথা তোকে আবার কবে লিখলুম?

এই ত সেদিন। এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

সতী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, ও-সব লিখিনি, তোর মনে নেই।

দ্বিজদাস এতক্ষণ পর্যন্ত কি একপ্রকার সঙ্কোচের বশে যেন আড়ষ্ট হইয়াছিল। অনাত্মীয়, অপরিচিত যুবতী স্ত্রীলোকের সম্মুখে কি করা উচিত, কি বলিলে ভাল দেখায়, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না। ইতিপূর্বে কখনো সুযোগও ঘটে নাই, প্রয়োজনও হয় নাই,—কিন্তু এই নবাগত তরুণীর আশ্চর্য স্বচ্ছন্দতায় সে যেন একটা নূতন শিক্ষা লাভ আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করিল। মেয়েদেরও যে শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন এ কথা সে বুদ্ধি দিয়া চিরদিনই স্বীকার করিত এবং মা ও দাদার সহিত তর্ক বাধিলে সে এই যুক্তিই দিত যে, স্ত্রীলোক হইলেও তাহারা মানুষ, সুতরাং শিক্ষা ও স্বাধীনতায় তাহাদের দাবী আছে। মূর্খ করিয়া তাহাদের ঘরে বন্ধ করিয়া রাখা অন্যায়। কিন্তু আজ এই অতিথি মেয়েটির আকস্মিক পরিচয়ে সে চক্ষের পলকে প্রথম উপলব্ধি করিল যে, ঐ-সব মামুলী দাবী দাওয়ার যুক্তির চেয়েও ঢের বড় কথা এই যে, পুরুষের চরম ও পরম প্রয়োজনেই রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রয়োজন। তাহাকে বঞ্চিত করিয়া পুরুষে কতখানি যে নিজেকে বঞ্চিত করিতেছে এ সত্য এত বড় স্পষ্ট করিয়া ইতিপূর্বে সে কখনো দেখে নাই। মেয়েটিকে উদ্দেশ করিয়া হাসিমুখে কহিল, আপনার কথাই ঠিক, বৌদি ভুলে গেছেন। কিন্তু এ নিয়ে বাদানুবাদ করে লাভ নেই। এই বলিয়াই সে ছদ্মগাম্ভীর্যে মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, বৌদি, তোমার জোরেই আমার সমস্ত জোর, আর তোমারই চিঠিতেই এই কথা? বেশ, আমাকে তোমরা ত্যাগ কর, আর আমিও আমার সমস্ত অধিকার পরিত্যাগ করচি। তোমাদের জমিদারি অক্ষয় হয়ে থাক, তুমি একটিবার মুখ ফুটে আদেশ কর, আজই উকিল ডেকে সমস্ত লেখা-পড়া করে দিচ্চি। ইনিই সাক্ষী থাকুন, দেখ আমি পারি কি না?

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিলেন, তোর দেওর ভয়ঙ্কর স্বদেশী নাকি সতী?

সতী বলিল, হাঁ, ভয়ঙ্কর।

তুই বললেই লেখাপড়া করে জমিদারির অংশ ছেড়ে দিতে চায়?

সতী ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, ও স্বচ্ছন্দে পারে। ওর অসাধ্য কাজ নেই।

বন্দনা কৌতূহল দমন করিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, সত্যি বলচেন? চিরকালের জন্য বাস্তবিক সমস্ত ত্যাগ করতে পারেন?

দ্বিজদাস তাহার মুখের প্রতি ক্ষণকাল দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, সত্যিই পারি। ওতে আমার একতিল লোভ নেই। দেশের পনের-আনা লোক একবেলা পেট ভরে খেতে পায় না—উদয়াস্ত পরিশ্রম করেও না—আর বিনা পরিশ্রমে আমার বরাদ্দ পোলাও কালিয়া—ও পাপের অন্ন আমার মুখে রোচে না, গলায় আটকাতে চায়। ও বিষয় আমার গেলেই ভাল। তখন দেশের পাঁচজনের মত খেটে খেয়ে বাঁচি। জোটে মঙ্গল, না জোটে তাদের সঙ্গে উপোস করে মরতে পারলে বরঞ্চ একদিন হয়ত স্বর্গে যেতেও পারব, কিন্তু এ পথে কোন কালে সে আশা নেই।

বন্দনা নিষ্পলকচক্ষে চাহিয়া শুনিতেছিল, কথা শেষ হইলে আর কোন কথা কহিল না,—শুধু মুখ দিয়া তাহার একটা নিশ্বাস পড়িল।

সতীর হঠাৎ যেন চমক ভাঙ্গিল। ঠাকুরপোর এ-ছাড়া যেন আর কথা নেই। বলে বলে এমনি মুখস্থ হয়ে গেছে। কহিল, পুরনো বক্তৃতা পরে দিও ঠাকুরপো ঢের সময় পাবে। সেজকাকাবাবুর হয়ত এখনও হাতমুখ ধোয়াও সারা হয়নি। বন্দনা, চল্ ভাই ওপরে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়বি।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, জামাই-বাবাজীকে দেখচি নে ত?

সতী কহিল, তিনি সকালেই কি একটা জরুরী কাজে বেরিয়েচেন, ফিরতে বোধ করি দেরি হবে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি, তোমার শাশুড়ীকে ত দেখতে পেলুম না? বাড়িতেই আছেন?

সতী কহিল, এখনো আছেন, কিন্তু শীঘ্রই কৈলাস মানস-সরোবরে তীর্থযাত্রা করবেন। সমস্ত সকালটা পুজো-আহ্নিক নিয়েই থাকেন আর একটু বেলা হলেই তাঁকে দেখতে পাবে। বন্দনা প্রশ্ন করিল, তিনি খুব বেশী ধর্মকর্ম নিয়েই থাকেন, না?

সতী বলিল, হাঁ।

বিধবা হবার পরে শুনেচি ঘর-সংসার কিছুই দেখেন না, সত্যি?

সত্যি বৈ কি। সব আমাকেই দেখতে শুনতে হয়।

বন্দনা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, উনি তোমার সৎশাশুড়ী না মেজদি?

সতী হাসিয়া কহিল, চোখে ত দেখিনি বোন, লোকে হয়ত মিথ্যে কথা বলে।

দ্বিজদাস উত্তর দিয়া বলিল, মিথ্যেই বলে। কারণ, সৎশাশুড়ী মানে দাদার সৎমা ত? মিছে কথা। সৎমা বটে, দাদার নয়, আমার। সে যাক, স্নানাদি সেরে নিয়ে সে আলোচনা পরে হবে,—এখন ওপরে চলুন। আচ্ছা, আমি দেখি গে—বৌদি, আর দেরি করো না, এঁদের নিয়ে এস। এই বলিয়া সে আয়োজনের তত্ত্বাবধান করিতে চলিয়া যাইতেছিল, এমনি সময় মাকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

খুব সম্ভব দয়াময়ী খবর পাইয়া আহ্নিকের মাঝখানেই পূজার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। বয়স বেশী নয় বলিয়া তিনি বৈধব্যের পরেও সচরাচর অনাত্মীয় পুরুষদের সম্মুখে বাহির হইতেন না, অন্তরালে থাকিয়াই কথা কহিতেন, কিন্তু আজ একেবারে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মাথার কাপড় কপালের উপর পর্যন্ত টানিয়া দেওয়া,—কিন্তু মুখের সবখানিই দেখা যাইতেছে।

আমার সেজকাকাবাবু, মা। আর এইটি আমার বোন বন্দনা। এই বলিয়া সতী কাছে

আসিয়া হঠাৎ শাশুড়ীকে প্রণাম করিল। এমন অকারণে প্রণাম করা প্রথাও নয়, কেহ করেও না। দয়াময়ী মনে মনে হয়তো একটু আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু সে উঠিয়া দঁড়াইতে সস্নেহে সযত্নে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া অঙ্গুলির প্রান্তভাগ চুম্বন করিয়া আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু বন্দনার প্রতি তাঁহার চোখের দৃষ্টি রুক্ষ হইয়া উঠিল। দিদির দেখাদেখি সেও কাছে আসিয়া প্রণাম করিল, কিন্তু তিনি স্পর্শ করিলেন না, বরঞ্চ বোধ হয় স্পর্শ বাঁচাইতেই এক-পা পিছাইয়া গিয়া শুধু অস্ফুটে বলিলেন, বেঁচে থাক।

কহিলেন, বেইমশাই, নমস্কার। ছেলে মেয়ের ভাগ্য যে হঠাৎ আপনার পায়ের ধূলো পড়ল।

ভদ্রলোক প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিলেন, নানা কারণে সময় পাইনে বেন্‌ঠাকরুন, কিন্তু না বলে কয়ে এমন হঠাৎ এসে পড়ার দোষ মার্জনা করবেন। এবারে যখন আসব যথাসময়ে একটা খবর দিয়েই আসব।

দয়াময়ী এ-সব কথার উত্তর দিলেন না, শুধু বলিলেন, পুজো-আহ্নিক এখনো সারা হয়নি বেইমশাই, আবার দেখা হবে। বৌমা, এঁদের ওপরে নিয়ে যাও, খাওয়া-দাওয়ার যেন কষ্ট না হয়। বিপিন এলে আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দিয়ো। এই বলিয়া তিনি আর কোন দিকে না চাহিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বাহ্যতঃ, প্রচলিত সৌজন্যের বিশেষ কিছু যে ত্রুটি হইল তাহা নয়, কিন্তু ভিতরের দিক দিয়া সকলেরই মনে হইল জ্যোৎস্নার মাঝামাঝি একখণ্ড কালো মেঘ নির্মল আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভাসিয়া গেল।

পাঁচ

বন্দনা স্নানাদি সারিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, পিতা ইতিপূর্বেই প্রস্তুত হইয়া লইয়াছেন। একখানা জমকালোগোছের আরামকেদারায় বসিয়া চোখে চশমা দিয়া সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করিয়াছেন। পাশের ছোট টেবিলের উপর একরাশ খবরের কাগজ এবং কাছে দাঁড়াইয়া দ্বিজদাস সেইগুলির তারিখ মিলাইয়া গুছাইয়া দিতেছে। ট্রেনের মধ্যে ও কাজের ভিড়ে কয়েকদিনের কাগজ দেখিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। কন্যাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চোখ তুলিয়া কহিলেন, মা, আমরা দুটোর গাড়িতেই কলকাতা যাব স্থির করলাম। দিদির বাড়িতে দিন-কতক যদি তোমার থাকবার ইচ্ছে হয় ত ফেরবার পথে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আমি সোজা বোম্বাই চলে যাব। কি বল?

কলকাতায় তোমার ক'দিন দেরি হবে বাবা?

পাঁচ-সাত দিন—দিন-আষ্টেক,—তার বেশী নয়।

কিন্তু তার পরে আমাকে বোম্বায়ে নিয়ে যাবে কে?

সে ব্যবস্থা একটা অনায়াসে হতে পারবে। এই বলিয়া তিনি একটু ভাবিয়া কহিলেন, তা বেশ, ইচ্ছে হয় এই ক'টা দিন তুমি সতীর কাছে থাক, ফেরবার পথে আমিই সঙ্গে করে নিয়ে যাব, কেমন?

বন্দনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা মেজদিকে জিজ্ঞাসা করে দেখি।

দ্বিজদাস কহিল বৌদি রান্নাঘরে ঢুকেছেন, হয়ত দেরি হবে। হাতের বান্ডিলটা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনাকে কি দেব?

খবরের কাগজ? ও আমি পড়িনে।

কাগজ পড়েন না?

না। ও আমার ধৈর্য থাকে না। সন্ধ্যাবেলা বাবার মুখে গল্প শুনি তাতেই আমার ক্ষিধে মিটে।

আশ্চর্য! আমি ভেবেছিলাম আপনি নিশ্চয়ই খুব বেশী পড়েন।

বন্দনা বলিল, আমার সম্বন্ধে কিছুই না জেনে আর ভাবেন কেন? ভারী অন্যায়।

দ্বিজু অপ্রতিভ হইয়া উঠিতেছিল বন্দনা হাসিয়া কহিল, আপনারা কে কতটা দেশোদ্ধার করলেন, এবং ইংরেজ তাতে রেগে গিয়ে কতখানি চোখ রাঙ্গালে তার কিছুতেই আমার কৌতূহল নেই। আছে বাবার। ঐ দেখুন না, একেবারে খবরের তলায় তলিয়ে গেছেন,—বাহ্যজ্ঞান নেই।

সাহেবের কানে বোধ করি শুধু মেয়ের 'বাবা' কথাটাই প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু চোখ তুলিবার সময় পাইলেন না, বলিলেন, একটু সবুর কর—বলছি—ঠিক এই জবাবটাই আমি খুঁজছিলাম।

মেয়ে মুচকিয়া হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কহিল, তুমি খুঁজে খুঁজে সারাদিন পড় বাবা, আমার একটুও তাড়াতাড়ি নেই। দ্বিজদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মেজদির মুখে শুনেচি আপনার মস্ত লাইব্রেরি আছে, বরঞ্চ সেইখানে চলুন, দেখি গে আপনার কত বই জমেছে।

চলুন।

লাইব্রেরি ঘরটা তেতলায়। মস্ত চওড়া সিঁড়ি, উঠিতে উঠিতে দ্বিজদাস কহিল, লাইব্রেরি বেশ বড়ই বটে, কিন্তু আমার নয়, দাদার। আমি শুধু কোথায় কি বই বেরুলো সন্ধান নিই এবং হুকুম মত কিনে এনে দিই।

কিন্তু পড়েন ত আপনি?

সে কিছুই নয়। পড়েন যাঁর লাইব্রেরি তিনি স্বয়ং। আশ্চর্য শক্তি এবং তেমনি অদ্ভুত মেধা তাঁর।

কে? দাদা!

হ্যাঁ। ইউনিভারসিটির ছাপছোপ বিশেষ-কিছু তাঁর গায়ে লাগেনি সত্যি, কিন্তু মনে হয় এত বড় বিরাট পাণ্ডিত্য এদেশে কম লোকেরই আছে। হয়ত নেই। আপনার ভগিনীপতি তিনি, কখন দেখেন নি তাঁকে?

না। কিরকম দেখতে?

ঠিক আমার উলটো। যেমন দিন আর রাত। আমি কালো, তাঁর বর্ণ সোনার মত। গায়ের জোর তাঁর এ অঞ্চলে বিখ্যাত। লাঠি, তলোয়ার, বন্দুকে এদিকে তাঁর জোড়া নেই। একা মা ছাড়া তাঁর মুখের পানে চেয়ে কথা কইতেও কেউ সাহস করে না।

বন্দনা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার মেজদিও না?

দ্বিজদাস বলিল, না, আপনার মেজদিও না।

ভয়ানক বদরাগী বুঝি?

না, তাও না। ইংরেজীতে যে অ্যারিস্টোক্র্যাট বলে একটা কথা আছে, আমার দাদা বোধ করি কোন জন্মে তাদেরই রাজা ছিলেন। অন্ততঃ আমার ধারণা তাই। বদরাগী কি না জিজ্ঞাসা করছিলেন? কোনরকম রাগারাগি করবার তাঁর অবকাশই হয় না।

বন্দনা কহিল, দাদার ওপর আপনার ভয়ানক ভক্তি? না?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে বলিল, ও কথার জবাব যদি কখনো সম্ভব হয় আপনাকে আর একদিন দেব।

বন্দনা সবিস্ময়ে কহিল, তার মানে?

দ্বিজদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল, মানে যদি এখনই বলি, আর একদিন জবাব দেবার প্রয়োজনই হবে না। আজ থাক।

মস্ত লাইব্রেরি। যেমন মূল্যবান আলমারি টেবিল চেয়ার প্রভৃতি আসবাব, তেমনি সুশৃঙ্খলায় পরিপাটি করিয়া সাজান। পল্লীগ্রামে এত বড় একটা বিরাট কাণ্ড দেখিয়া বন্দনা আশ্চর্য হইয়া গেল। বোম্বাই শহরে এ বস্তুর অভাব নাই, সে তুলনায় এ হয়ত তেমন কিছু নয়, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাস করিয়া কোন একজনের নিছক নিজের জন্য এত অধিক সঞ্চয় সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। জিজ্ঞাসা করিল, বাস্তবিক এত বই দাদা পড়েন নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, পড়েন এবং পড়েছেন। আলমারি বন্ধ নয়, কোন একটা বই খুলে দেখুন না, তাঁর পড়ার চিহ্ন হয়ত চোখে পড়বে।

এত সময় পান কখন? দিন-রাত শুধু এই-ই করেন নাকি?

দ্বিজু ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। অন্ততঃ আমি ত জানিনে। তা ছাড়া আমাদের বিষয়-সম্পত্তি ভীষণ কিছু একটা না হলেও নিতান্ত কমও নয় তার কোথায় কি আছে এবং হচ্চে সমস্ত দাদার চোখের ওপর। কেবল আজ বলে নয়, বাবা বেঁচে থাকতেও এই ব্যবস্থাই বরাবর আছে। সময় পাবার রহস্য আমিও ঠিক খুঁজে পাইনে, আপনার মত আমার বিস্ময়ও কম নয়, তবে শুধু এই ভাবি যে জগতে মাঝে মাঝে দু-একজন জন্মায় তারা সাধারণ মানুষের হিসাবের বাইরে। দাদা সেই জাতীয় জীব। আমাদের মত হয়ত এঁদের কষ্ট করে পড়তেও হয় না, ছাপার অক্ষর চোখের মধ্যে দিয়ে আপনিই গিয়ে মগজে ছাপ মেরে দেয়। কিন্তু দাদার কথা এখন থাক। আপনি তাঁকে এখনো চোখে দেখেন নি, আমার মুখে এক তরফা আলোচনা অতিশয়োক্তি মনে হতে পারে।

কিন্তু আমার শুনতে খুব ভালই লাগচে।

কিন্তু কেবল ভাল-লাগাটাই ত সব নয়। পৃথিবীতে আমরাও অত্যন্ত সাধারণ আরও দশজন ত আছি। একটি মাত্র অসাধারণ ব্যক্তিই যদি সমস্ত জায়গা জুড়ে বসে, আমরা যাই কোথা? ভগবান মুখটা ত কেবল পরের স্তব গাইতেই দেননি?

বন্দনা সহাস্যে কহিল, অর্থাৎ দাদাকে ছেড়ে এখন ছোটভাইয়ের একটু স্তব গাইতে চান ;—এই ত?

দ্বিজুও হাসিল, কহিল, চাই ত বটে, কিন্তু সুযোগ পাই কোথায়? যারা পরিচিত তারা কান দেবে না, অচেনার কাছেই একটু গুণগুণ করা চলে। কিন্তু সাহস পাইনে, ভয় হয় অভ্যাসের অভাবে নিজের স্তব নিজের মুখে হয়ত বেধে বেধে যাবে।

বন্দনা বলিল, না যেতেও পারে, চেষ্টা করে দেখুন। আমার বিশ্বাস পুরুষেরা এ বিদ্যায় আজন্মসিদ্ধ। আর দেরি করবেন না, আরম্ভ করুন।

দ্বিজু মাথা নাড়িয়া কহিল, না, পেরে উঠব না। তার চেয়ে বরঞ্চ নিরিবিলি বসে দু-চারখানা বই দেখুন, আমি বৌদিকে পাঠিয়ে দিচ্চি। এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই বন্দনা জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, বেশ ত আপনি! না, একলা ফেলে আমাকে যাবেন না। বই আমি অনেক পড়েচি, তার দরকার নেই। আপনি গল্প করুন আমি শুনি।

কিসের গল্প?

আপনার নিজের।

তা হলে একটু সবুর করুন, আমি এক্ষুনি নীচে গিয়ে ঢের ভাল বক্তা পাঠিয়ে দিচ্চি।

বন্দনা বলিল, পাঠাবেন মেজদিকে ত? তার দরকার নেই। তাঁর বলবার যা-কিছু ছিল চিঠিতেই শেষ হয়ে গেছে। সেগুলো সত্যি কিনা এখন তাই শুনতে চাই।

দ্বিজদাস বলিল, না, সত্যি নয়। অন্ততঃ বারো-আনা মিথ্যে। আচ্ছা, আপনি নাকি শীঘ্রই বিলেতে যাচ্চেন?

বন্দনা বুঝিল, এই লোকটি নিজের প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে চায় না এবং জিদ করার মত ঘনিষ্ঠতা অশোভন হইবে। কহিল, বাবার ইচ্ছে তাই। ইস্কুলের বিদ্যেটা তিনি সেখানে গিয়েই শেষ করতে বলেন। আপনিও কেন চলুন না?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নিজের আপত্তি নেই, কিন্তু টাকা পাব কোথায়? সেখানে ছেলে পড়িয়েও চলবে না, এবং এত ভার বৌদির ওপরেও চাপাতে পারব না। এ আশা বৃথা।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল। কহিল, দ্বিজুবাবু, এ আপনার রাগের কথা। নইলে যে অর্থ আপনাদের আছে তাতে শুধু নিজে নয়, ইচ্ছে করলে এ গ্রামের অর্ধেক লোককে সঙ্গে নিয়ে যেন পারেন। বেশ, সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্চি, আপনি যাবার জন্য প্রস্তুত হোন।

দ্বিজু কহিল, সে ব্যবস্থা হবার নয়। টাকা প্রচুর আছে সত্যি, কিন্তু সে-সব দাদার, আমার নয়। আমি দয়ার ওপর আছি বললেও অত্যুক্তি হয় না।

বন্দনা পুনরায় হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, অত্যুক্তি যে কি এবং কোনটা, সে আমিও বুঝি। কিন্তু এও রাগের কথা। মেজদির চিঠিতে একবার শুনেছিলাম যে, যে সম্পত্তি আপনি নিজে অর্জন করেন নি সে নিতে আপনি অনিচ্ছুক। এ কথা কি ঠিক নয়?

দ্বিজদাস বলিল, যদি ঠিকও হয়, সে মানুষের ধর্মবুদ্ধির কথা, রাগের নয়। কিন্তু এ-ই সমস্ত কারণ নয়।

সমস্ত কারণটা কি শুনতে পাইনে?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমি স্বভাবতঃ এত কৌতূহলী নই এবং আমার এই আগ্রহ যে সৃষ্টিছাড়া আতিশয্য সে বোধ আমারও আছে, কিন্তু বোধ থাকলেই সংসারের সব প্রয়োজন মেটে না—অভাব হাঁ করে চেয়ে থাকে। আপনার কথা আমি এত বেশী শুনেচি যে, আপনি প্রথম যখন ঘরে ঢুকলেন অপরিচিত বলে আপনাকে মনেই হ'ল না, যেন কতবার দেখেচি এমনি সহজে চিনতে পারলুম। মেজদিকে এত কথা বলতে পেরেচেন, আর আমাকে পারেন না? আর কিছু না হোক, তার মত আমিও ত একজন আত্মীয়।

কথা শুনিয়া দ্বিজু অবাক হইয়া গেল। এবং অকস্মাৎ সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়িয়া তাহার সঙ্কোচ ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সম্পূর্ণ অচেনা বয়স্থা কন্যার সহিত নির্জনে এইভাবে আলাপ করার ইতিহাস এই প্রথম, দেয়ালে ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল একঘণ্টারও উপর কাটিয়া গেছে, ইতিমধ্যে নীচে কেহ যদি তাহাদের খুঁজিয়া থাকে এ বাটীতে তাহার জবাব যে কি, সে ভাবিয়া পাইল না। হয়ত দাদা বাড়ি ফিরিয়াছেন, হয়ত মায়ের আহ্নিক সারা হইয়াছে,—হঠাৎ সমস্ত দেহ-মন তাহার ব্যাকুল হইয়া যেন একমুহূর্তে সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া গেল, কিন্তু কিছুই করিতে না পারিয়া তেমনি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

কৈ, বললেন না? বলুন?

দ্বিজুর চমক ভাঙ্গিল। কহিল, যদি বলি, আপনাকেই প্রথম বলব। বৌদিকেও আজও বলিনি।

সে বোঝাপড়া তিনি করবেন। আমি কিন্তু না শুনে,—

বলা যে উচিত নয় এ-সম্বন্ধে দ্বিজুর সংশয় ছিল না, কিন্তু অনুরোধ উপেক্ষা করারও তাহার শক্তি রহিল না।

হতবুদ্ধির মত মিনিট-খানেক চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বাবা আমাকে বস্তুতঃ কিছুই দিয়ে যাননি।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল,—ইস! মিছে কথা। এ হতেই পারে না।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু মাথা নাড়িয়া শুধু জানাইল,—পারে।

কিন্তু তার কারণ?

বাবার বোধ হয় ধারণা জন্মেছিল, আমাকে দিলে সম্পত্তি তাঁর নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ ধারণার কোন সত্যিকার হেতু ছিল?

ছিল। আমাকে বাঁচাবার জন্যে একবার তাঁর বহু টাকা নষ্ট হয়ে গেছে।

বন্দনার মনে পড়িল এই ধরনের একটা ইঙ্গিত একবার সতীর চিঠির মধ্যে ছিল। জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উইল করে গেছেন?

দ্বিজদাস কহিল, এ শুধু দাদাই জানেন। তিনি বলেন,—না।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, তবু রক্ষে। আমি ভেবেচি বুঝি তিনি সত্যিই উইল করে আপনাকে বঞ্চিত করে গেছেন।

দ্বিজদাস কহিল, তাঁর নিজের ইচ্ছের অভাব ছিল না, কিন্তু মনে হয় দাদা করতে দেননি।

দাদা করতে দেননি? আশ্চর্য!

দ্বিজু হাসিয়া বলিল, দাদাকে জানলে আর আশ্চর্য মনে হবে না। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, ঘরে তখনো চাকরে আলো দিয়ে যায়নি, আমি পাশের ঘরে একটা বই খুঁজছিলাম, হঠাৎ বাবার কথা কানে গেল। দাদা বললেন, না। বাবা জিদ করতে লাগলেন, না কেন বিপ্রদাস? আমার পিতা-পিতামহকালের সম্পত্তি আমি নষ্ট হতে দিতে পারব না। পরলোকে থেকেও আমি শান্তি পাব না। তবুও দাদা জবাব দিলেন, না, সে কোনমতেই হতে পারে না। বাবা বললেন, তবুও তোমারি হাতে আমি সমস্ত রেখে গেলাম। যদি ভাল মনে কর দিয়ো যদি তা না মনে করতে পার, তাকে দিয়ো না। এর পরেও বাবা দু-তিন বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কথা আর কেউ জানে?

কেউ না। শুধু আমি জানি লুকিয়ে শুনেছিলাম বলে।

বন্দনা বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অস্ফুটে কহিল, সত্যই আপনার দাদা অসাধারণ মানুষ।

দ্বিজদাস শান্তভাবে শুধু বলিল, হাঁ। কিন্তু এখন আমি নীচে যাই, আমার অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। আপনি বসে বসে বই পড়ুন যতক্ষণ না ডাক পড়ে।

বন্দনা হাসিয়া কহিল, এখন বই পড়বার রুচি নেই, চলুন আমিও যাই। অন্ততঃ আট-দশদিন ত এখানে আছি,—বই পড়বার অনেক সময় পাব।

দ্বিজদাস চলিতে উদ্যত হইয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার বাবার সঙ্গে আজ কলকাতা যাবেন না?

না। তাঁর ফেরবার পথে বোম্বায়ে চলে যাব।

দ্বিজদাস কহিল, বরঞ্চ আমি বলি তাঁর ফেরবার পথেই আপনি কিছুদিন এখানে থেকে যাবেন।

বন্দনা কহিল, প্রথমে সেই ইচ্ছেই ছিল, কিন্তু এখন দেখচি তাতে ঢের অসুবিধে। আমাকে পৌঁছে দেবার কেউ নেই। কিন্তু আপনি যদি রাজী হন, আপনার পরামর্শই শুনি।

কিন্তু আমি ত তখন থাকব না। এই সোমবারে মাকে নিয়ে কৈলাস তীর্থে যাত্রা করব।

বন্দনার দুই চক্ষু আনন্দে ও উৎসাহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—কৈলাস? কৈলাসে যাবেন? শুনেচি সে নাকি এক পরমাশ্চর্য বস্তু। সঙ্গে আপনাদের আর কে কে যাবেন?

ঠিক জানিনে, বোধহয় আরও কেউ কেউ যাবেন।

আমাকে সঙ্গে নেবেন?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা ক্ষুণ্ণ অভিমানের কণ্ঠে জোর করিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, আর এই জন্যেই বুঝি ঠিক সেই সময়ে আমাকে এখানে এসে থাকবার সুপরামর্শ দিচ্চেন?

দ্বিজদাস তাঁহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া শান্তভাবে কহিল, সত্যিই এই জন্যে পরামর্শ দিয়েছি। বৌদি এত কথা লিখেচেন, কেবল এই খবরটিই দেননি যে আমাদের এটা কতবড় গোঁড়া হিন্দুর বাড়ি? এর আচার-বিচারের কঠোরতার কোন আভাস চিঠিতে পাননি?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

না? আশ্চর্য। একটুখানি থামিয়া দ্বিজদাস বলিল, একা আমি ছাড়া আপনার ছোঁয়া জল পর্যন্ত খাবার লোক এ বাড়িতে কেউ নেই।

কিন্তু দাদা?

না।

মেজদি?

না, তিনিও না। আমরা চলে গেলে তবুও হয়ত দুদিন এখানে থাকতে পারেন, কিন্তু মা থাকতে একটা দিনও আপনার এ বাড়িতে থাকা চলে না।

বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল—সত্যি বলচেন?

সত্যিই বলচি।

ঠিক এমনি সময়ে নীচের সিঁড়ি হইতে সতীর ডাক শোনা গেল,—ঠাকুরপো! বন্দনা! তোমরা দুটিতে করচ কি?

যাচ্চি বৌদি,—সাড়া দিয়া দ্বিজদাস দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল, বন্দনা পাংশুমুখে চাপাকণ্ঠে শুধু কহিল, এত কথা আমি কিছুই জানতুম না। ধন্যবাদ।

ছয়

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল পিতা হৃষ্টচিত্তে আহারে বসিয়াছেন। সেই বসিবার ঘরের মধ্যেই একখানি ছোট টেবিলের উপর রূপার থালায় করিয়া খাবার দেওয়া হইয়াছে। একজন দীর্ঘাকৃতি অতিশয় সুশ্রী ব্যক্তি অদূরে দাঁড়াইয়া আছেন,—তাঁহার দেহের শক্তিমান গঠন ও অত্যন্ত ফরসা রং দেখিয়াই বন্দনা চিনিল যে ইনিই বিপ্রদাস। সতী সঙ্গেই আসিতেছিল, কিন্তু সে প্রবেশ করিল না, দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া প্রণাম করিতে ইঙ্গিত করিয়া জানাইল যে, হাঁ ইনিই।

বাঙালীর মেয়েকে ইহা শিখাইবার কথা নহে এবং ইতিপূর্বে মাকে যেমন সে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়াছিল বড়ভগিনীপতিকেও তাহাই করিত কিন্তু হঠাৎ কেমন যেন তাহার সমস্ত মন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। ইঁহার অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধির বিবরণ দ্বিজদাসের মুখে না শুনিলে হয়ত এই প্রচলিত শিষ্টাচার লঙ্ঘন করিবার কথা তাহার মনেও উঠিত না, কিন্তু এই পরিচয়ই তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিল। দিদির মর্যাদা রক্ষা করিয়া সে হাত তুলিয়া একটা নমস্কার করিল বটে, কিন্তু তাহার উপেক্ষাটাই তাহাতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিল, কথা কহিল সে পিতার সঙ্গেই, বলিল, তুমি একলা খেতে বসেচ, আমাকে ডেকে পাঠাও নি কেন?

সাহেব মুখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন, আমার যে গাড়ির সময় হ'লো মা, কিন্তু তোমার ত তাড়াতাড়ি নেই। বলিলেন,—আমি চলে গেলে তোমরা ধীরে-সুস্থে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে।

সতী আড়াল হইতে ঘাড় নাড়িয়া ইহার অনুমোদন করিল। বন্দনা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল মেজদি, এতগুলো দামী রূপোর বাসন নষ্ট করলে কেন, বাবাকে এনামেল কিংবা চিনেমাটির বাসনে খেতে দিলেই ত হত?

সাহেবের চিবানো বন্ধ হইল। অত্যন্ত সরল-প্রকৃতির মানুষ তিনি, কন্যার কথার তাৎপর্য কিছুই বুঝিলেন না, ব্যস্ত এবং লজ্জিত হইয়া উঠিলেন—যেন দোষটা তাঁহার নিজেরই—তাইত, তাইত—এ আমি লক্ষ্য করিনি,—সতী কোথা গেলে—আমাকে ডিসে খেতে দিলেই হত—এঃ—

বিপ্রদাসের মুখ ক্রোধে কঠোর ও গম্ভীর হইয়া উঠিল। এতাবৎ এত বড় অপমান করিতে তাহাকে কেহ সাহস করে নাই, এই নবাগত কুটুম্ব মেয়েটি তাহাকে যেমন করিল। বাসন নষ্ট হইবার দুশ্চিন্তা একটা ছলনা মাত্র। আসলে ইহা তাহাদের আচারনিষ্ঠ পরিবারের প্রতি নির্লজ্জ ব্যঙ্গ, এবং খুব সম্ভব তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া। এ দুরভিসন্ধি কে তাহার মাথায় আনিয়া দিল বিপ্রদাস ভাবিয়া পাইল না, কিন্তু যেই দিক, এই ভাল মানুষ বৃদ্ধ ব্যক্তিটিকে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করার কদর্যতায় তাহার বিরক্তির অবধি রহিল না। কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির কাছে শোনোনি যে, এ গোঁড়া হিন্দুর বাড়ি? এখানে এনামেল বল, চিনেমাটিই বল কিছুই ঢোকবার জো নেই—শোনোনি?

বন্দনা কহিল, কিন্তু দামী পাত্রগুলো ত নষ্ট হয়ে গেল?

সাহেব ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিন্তু শুনেচি ঘি মাখিয়ে একটুখানি পুড়িয়ে নিলেই—

বিপ্রদাস এ কথায় কান দিল না, যেমন বলিতেছিল তেমনি বন্দনাকেই লক্ষ্য করিয়া কহিল, এ বাড়িতে রূপোর বাসনের অভাব নেই, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে লাগে না। তোমার বাবা সম্বন্ধে আমার গুরুজন, এ বাড়িতে অত্যন্ত সম্মানিত অতিথি, রূপোর বাসনের যত দামই হোক, তাঁর মর্যাদার কাছে একেবারেই তুচ্ছ,—তোমাদের আসার উপলক্ষে কতকগুলো যদি নষ্ট হয়েই যায়,—যাক না। এই বলিয়া একটু মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, তোমার দিদির মত তোমারও যদি কোন গোঁড়াদের বাড়িতে বিয়ে হয়, তোমার বাবা এলে তাঁকে মাটির সরাতে খেতে দিয়ো, ফেলা গেলে কারও গায়ে লাগবে না। কি বল বন্দনা?

ইস, তাই বৈ কি! বাবার জন্যে আমি সোনার পাত্র গড়িয়ে রেখে দেব।

বিপ্রদাস হাসিমুখে উত্তর দিল, সে তুমি পারবে না। যে পারে সে বাপের সম্বন্ধে অমন কথা মুখে আনতেও পারে না। এমন কি অপরকে অপমান করার জন্যেও না। তোমার বাবাকে তুমি যত ভালবাস, আর একজন তার কাকাকে বোধ করি তার চেয়েও বেশী ভালবাসে।

শুনিয়া সাহেবের মনের উপর হইতে যে একটা ভার নামিয়া গেল তাই নয়, সমস্ত অন্তর খুশীতে ভরিয়া গেল। বলিলেন, তোমার এই কথাটা বাবা ভারী সত্যি। দাদা যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন সতী খুবই ছোট, বিদেশে চাকুরি নিয়ে থাকি, সর্বদা বাড়ি আসা ঘটে না, আর এলেও সমাজের শাসনে একলাটি থাকতে হয়, কিন্তু সতী ফাঁক পেলেই আমার কাছে ছুটে আসত,—

বন্দনা তাড়াতাড়ি বাধা দিল,—ও-সব কথা থাক না বাবা—

না, না, আমার যে সমস্তই মনে আছে,—মিথ্যে ত নয়। একদিন আমার সঙ্গে একপাতে খেতেই বসে গেল—তার মা ত এই দেখে—

আঃ বাবা, তুমি যে কি বল তার ঠিকানা নেই। কবে আবার মেজদি তোমার সঙ্গে,—তোমার কিচ্ছু মনে নেই।

সাহেব মুখ তুলিয়া প্রতিবাদ করিলেন—বাঃ মনে আছে বৈ কি। আর পাছে এই নিয়ে একটা গোলমাল হয়, তাই তোমার মা সেদিন কিরকম ভয়ে ভয়ে—

বন্দনা বলিল, বাবা, আজ তুমি নিশ্চয় গাড়ি ফেল করবে। ক'টা বেজেচে জান?

সাহেব ব্যস্ত হইয়া পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিলেন, সময় দেখিয়া নিরুদ্বেগের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুই এমন ভয় লাগিয়ে দিস যে চমকে উঠতে হয়। এখনো ঢের দেরি—অনায়াসে গাড়ি ধরা যাবে।

বিপ্রদাস সহাস্যে সায় দিয়া বলিল, হাঁ গাড়ির এখনো ঢের দেরি। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আহার করুন, আমি নিজে স্টেশনে গিয়ে আপনাকে তুলে দিয়ে আসব। এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বারের আড়াল হইতে সতী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতেই বন্দনা অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি, বাবা কি কাণ্ড করলেন শুনেচ?

সতী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ।

বন্দনা বলিল, তোমার শাশুড়ীর কানে গেলে হয়ত তোমাকে দুঃখ পেতে হবে। না মেজদি?

সতী কহিল, হয় হবে। এখন থাক, কাকা শুনতে পাবেন।

কিন্তু তোমার স্বামী—তিনিও যে নিজের কানেই সমস্ত শুনে গেলেন, এ অপরাধের মার্জনা বোধ করি তাঁর কাছেও নেই?

সতী হাসিল, কহিল, অপরাধ যদি সত্যিই হয়ে থাকে আমিই বা মার্জনা চাইব কেন? সে বিচার আমি তাঁর পরেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। যদি থাক, নিজের চোখেই দেখতে পাবে। কাকা, তোমাকে আর কি এনে দেব বল?

সাহেব মুখ তুলিয়া কহিলেন, যথেষ্ট যথেষ্ট—আমার খাওয়া হয়ে গেছে মা, আর কিছুই চাইনে। এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

ক্রমশঃ স্টেশনে যাত্রা করিবার সময় হইয়া আসিল ; নীচে গাড়িবারান্দায় মোটর অপেক্ষা করিতেছে, বিছানা ব্যাগ প্রভৃতি আর একখানা গাড়িতে চাপানো হইয়াছে, সাহেব নিকটে দাঁড়াইয়া বিপ্রদাসের সহিত কথা কহিতেছেন, এমনি সময়ে বন্দনা কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, বাবা, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

পিতা বিস্মিত হইলেন—এই রোদে স্টেশনে গিয়ে লাভ কি মা?

বন্দনা বলিল, শুধু স্টেশনে নয়, কলকাতায় যাব। যখন বোম্বায়ে যাবে, আমি তোমার সঙ্গেই চলে যাব।

বিপ্রদাস অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, সে কি কথা! তুমি দিন-কতক থাকবে বলেই ত জানি।

বন্দনা উত্তরে শুধু কহিল, না।

কিন্তু তোমার ত এখনো খাওয়া হয়নি?

না, দরকার নেই। কলকাতায় পৌঁছে খাব।

তুমি চলে যাচ্ছ তোমার মেজদি শুনেছেন?

বন্দনা কহিল, ঠিক জানিনে, আমি চলে গেলেই শুনতে পাবেন।

বিপ্রদাস বলিলেন, তুমি না খেয়ে অমন করে চলে গেলে সে ভারী কষ্ট পাবে।

বন্দনা মুখ তুলিয়া বলিল, কষ্ট কিসের? আমাকে ত তিনি নেমন্তন্ন করে আনেন নি যে না খেয়ে চলে গেলে তাঁর আয়োজন নষ্ট হবে। তিনি নির্বোধ নন, বুঝবেন। এই বলিয়া সে আর কথা না বাড়াইয়া দ্রুতপদে গাড়িতে গিয়া বসিল।

সাহেব মনে মনে বুঝিলেন কি একটা হইয়াছে। না হইলে হঠাৎ অকারণে কোন-কিছু করিয়া ফেলিবার মেয়ে সে নয়। শুধু বলিলেন, আমিও জানতাম ও দিন-কয়েক সতীর কাছেই থাকবে। কিন্তু একবার যখন গাড়িতে গিয়ে উঠেচে তখন আর নামবে না।

বিপ্রদাস জবাব দিলেন না, নিঃশব্দে তাঁহার পিছনে পিছনে গিয়া মোটরে উঠিলেন। গাড়ি ছাড়িয়া দিল। অকস্মাৎ উপরের দিকে চাহিতেই বন্দনা দেখিতে পাইল তেতলার লাইব্রেরি-ঘরের খোলা-জানালার গরাদে ধরিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। চোখা-চোখি হইতেই সে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

সাত

স্টেশনে পৌঁছিয়া খবর পাওয়া গেল, কোথায় কি একটা আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য ট্রেনের আজ বহু বিলম্ব,—বোধ করি বা একঘণ্টারও বেশী লেট হইবে। পরিচিত স্টেশন মাষ্টারটিও হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় একজন মাদ্রাজী রিলিভিং হ্যান্ড কাল হইতে কাজ করিতেছিল, সে সঠিক সংবাদ কিছু দিতে পারিল না, শুধু অনুমান করিল যে, দেরি একঘণ্টাও হইতে পারে, দুঘণ্টাও হইতে পারে বিপ্রদাস সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, কলকাতায় পৌঁছতে রাত্রি হয়ে যাবে, আজ কি না গেলেই চলে না?

কেন চলবে না? আমার ত—

বন্দনা বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, না বাবা, সে হয় না। একবার বেরিয়ে এসে আর ফিরে যাওয়া চলে না।

বিপ্রদাস অনুনয়ের সুরে কহিল, কেন চলবে না বন্দনা? বিশেষতঃ তুমি না খেয়ে এসেচ, সারাদিন কি উপোস করেই কাটাবে?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমার ক্ষিদে নেই। ফিরে গেলেও আমি খেতে পারব না।

সাহেব মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন, কহিলেন, এদের শিক্ষাদীক্ষাই আলাদা। একবার জিদ

ধরলে আর টলান যায় না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল, আর অনুরোধ করিল না।

স্টেশনটি বড় না হইলেও একটি ছোটগোছের ওয়েটিং রুম ছিল। সেখানে গিয়া দেখা গেল, একজন ছোকরা বয়সের বাঙালী-সাহেব ও তাঁহার স্ত্রী ঘরখানি পূর্বাহ্ণেই দখলে আনিয়াছেন। সাহেব সম্ভবতঃ ব্যারিস্টার কিংবা ডাক্তার কিংবা বিলাতী পাশকরা প্রফেসারও হইতে পারেন। এ অঞ্চলে কোথায় আসিয়াছিলেন, সে একটা রহস্য। আরামকেদারার দুই হাতলে পদদ্বয় দীর্ঘপ্রসারিত করিয়া অর্ধসুপ্ত। আকস্মিক জনসমাগমে মাত্র চক্ষুরুন্মীলন করিলেন—ভদ্রতা-প্রকাশের উদ্যম ইহার অধিক অগ্রসর হইল না। কিন্তু মহিলাটি চেয়ার ছাড়িয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হয়ত মেমসাহেব হইয়া উঠিতে তখনও পারেন নাই, কিন্তু উঁচু গোড়ালির জুতা ও পোশাক-পরিচ্ছদের ঘটা দেখিয়া মনে হয়, এ-বিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি হইতেছে না।

ঘরের মধ্যে আর একখানা আরামচৌকি ছিল, বন্দনা পিতাকে তাহাতে বসাইয়া দিয়া নিজে একখানি বেঞ্চি অধিকার করিয়া বসিল এবং অত্যন্ত সমাদরে বিপ্রদাসকে আহ্বান করিয়া বলিল, জামাইবাবু, মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন, আমার কাছে এসে বসুন। বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, আপনার জাত যাবে না।

শুনিয়া বন্দনার পিতা অল্প একটুখানি হাসিলেন, কহিলেন, বিপ্রদাসের ছোঁয়াছুঁয়ির বাচ-বিচার কি খুব বেশী নাকি?

বিপ্রদাস নিজেও হাসিল, বলিল, বাচ-বিচার আছে, কিন্তু কি হলে খুব বেশী হয়, না জানলে এ প্রশ্নের জবাব দিই কি করে?

বৃদ্ধ কহিলেন, এই ধর বন্দনা যা বললে?

বিপ্রদাস কহিল, উনি না খেয়ে ভয়ানক রেগে আছেন। মেয়েরা রাগের মাথায় যা বলে তা নিয়ে আলোচনা হয় না।

বন্দনা বলিল, আমি রেগে নেই,—একটুও রেগে নেই।

বিপ্রদাস কহিল, আছ, এবং খুব বেশী রকমই রেগে আছ, নইলে আজ তুমি কলকাতায় না গিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে। তা ছাড়া তোমার আপনিই মনে পড়ত যে, এইমাত্র আমরা এক গাড়িতেই এলাম, জাত গিয়ে থাকলে আগেই গেছে, বেঞ্চিতে বসার কথাটা শুধু তোমার ছল মাত্র।

বন্দনা বলিল, হোক ছল, কিন্তু সত্যি বলুন ত মুখুয্যেমশাই আমাদের ছোঁয়াছুঁচি করার জন্যে ফিরে গিয়ে আপনাকে আবার স্নান করতে হবে কিনা?

চল না, বাড়ি ফিরে গিয়ে নিজের চোখে দেখবে?

না। জানেন আপনি, মাকে প্রণাম করতে গেলে তিনি ছোঁবার ভয়ে দূরে সরে গিয়েছিলেন? বলিতে বলিতেই তাহার মুখ ক্রোধে ও লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস ইহা লক্ষ্য করিল। উত্তরে শুধু শান্তভাবে বলিল, কথাটা মিথ্যে নয়, অথচ সত্যিও নয়। এর আসল কারণ তাঁর কাছে না থাকলে তুমি বুঝতে পারবে না। কিন্তু সে সম্ভাবনা ত নেই।

না, নেই।

এই তীব্র অস্বীকারের হেতু এতক্ষণে বিপ্রদাসের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মনে মনে তাহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। ক্ষোভ নানা কারণে। বিমাতার সম্বন্ধে কথাটা আংশিক সত্য মাত্র এবং সে নিজেও যেন ইহাতে কতকটা জড়াইয়া গেছে। অথচ, বুঝাইয়া বলিবার সুযোগও নাই, সময়ও নাই। অন্যপক্ষে, ধীরচিত্তে বুঝিবার মত মনোবৃত্তিও বন্দনার একান্ত অভাব। সুতরাং চুপ করিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় ছিল না,—বিপ্রদাস একেবারেই নীরব হইয়া রহিল।

ছোকরা সাহেব পা নীচে নামাইয়া হাই তুলিয়া বসিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনিই জমিদার বিপ্রদাসবাবু না?

হাঁ।

আপনার নাম শুনেচি। পাশের গাঁয়ে আমার স্ত্রীর মামার বাড়ি, বেঙ্গলে যখন আসাই হল তখন ওঁর ইচ্ছে একবার দেখা করে যান। তাই আসা। আমি পাঞ্জাবে প্র্যাকটিস করি।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল, লোকটি তাহারই সমবয়সী—এক আধ বছরের এদিক ওদিক হইতে পারে, তার বেশী নয়।

সাহেব কহিতে লাগিল, কালই আপনার কথা হচ্ছিল। লোকে বলে আপনি ভয়ানক—অর্থাৎ কিনা খুব কড়া জমিদার। অবশ্য দু-চারজন বামুন-পণ্ডিতে গোঁড়া হিঁদু বলে বেশ তারিফও করলে। এখন দেখচি নেহাত কথাটা মিথ্যে নয়।

অপরিচিতের এই অযাচিত আলোচনায় বন্দনা ও তাহার পিতা উভয়েই আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু বিপ্রদাস কোন উত্তর দিল না। বোধ হয় সে এমনিই অন্যমনস্ক ছিল, যে সকল কথা তাহার কানে যায় নাই।

তিনি পুনশ্চ বলিতে লাগিলেন, আমার লেকচারে আমি প্রায়ই বলে থাকি যে, চাই রিয়েল সলিড্ শিক্ষা—ফাঁকিবাজি, ধাপ্পাবাজি নয়। আপনার উচিত একবার ইয়োরোপ ঘুরে আসা। সেখানকার আবহাওয়া, সেখানকার ফ্রি এয়ার ব্রিদ ক'রে না এলে মনের মধ্যে freedom আসে না,—কুসংস্কার থেকে মন মুক্ত হতে চায় না। আমি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর সে দেশে ছিলাম।

বন্দনার পিতা শেষ কথাটায় খুশী হইয়া কহিলেন, এ কথা সত্যি।

উৎসাহ পাইয়া তিনি গরম হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, এই ডিমোক্র্যাসির যুগে সবাই সমান, কেউ কারো ছোট নয়, এবং চাই প্রত্যেকেরই নিজের অধিকার জোর করে assert করা,—consequence তার যা-ই কেন না হোক। আমার টাকা থাকলে আপনার জমিদারির প্রত্যেক প্রজাকে আমি নিজের খরচে ইয়োরোপ ঘুরিয়ে আনতাম। নিজের right কাকে বলে, এ কথা তারা তখন নিজেরাই বুঝত।

বন্দনার বোধ করি ভারী খারাপ লাগিল, সে আস্তে আস্তে কহিল, জামাইবাবু তাঁর প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন এ-খবর আপনাকে কে দিলে? আশা করি আপনার মামাশ্বশুরের ওপর কোন জুলুম হয়নি?

ও—উনি বুঝি আপনার ভগিনীপতি? Thanks, না, তিনি কোন অভিযোগ করেন নি। নিজের স্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া সহাস্যে কহিলেন, তোমার বোনেরা যদি এইরকম হত! আপনি বোধ করি বিলেত ঘুরে এসেছেন? যাননি? যান, যান। Freedom, শাহস, শক্তি কাকে বলে, সে দেশের মেয়েরা সত্যি কি, একবার স্বচক্ষে দেখে আসুন। আমি next time যাবার সময় ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাব স্থির করেচি।

কেহ কোন কথা কহিবার পূর্বেই স্টেশনের সেই রিলিভিং হ্যান্ডটি মুখ বাড়াইয়া জানাইল যে ট্রেন distance signal পার হইয়াছে, আসিয়া পড়িল বলিয়া।

সকলে ব্যস্ত হইয়া প্লাটফর্মে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গাড়ি দাঁড়াইলে দেখা গেল ছুটির বাজারে যাত্রী-সংখ্যার সীমা নাই। কোথাও তিল ধারণের জায়গা পাওয়া কঠিন। মাত্র একখানি ফার্স্ট ক্লাস ও আর একখানি সেকেন্ড ক্লাস। সেকেন্ড ক্লাস ভরতি করিয়া একদল ফিরিঙ্গী রেলওয়ে-সারভ্যান্ট কলিকাতায় কি একটা খেলার উপলক্ষে চলিয়াছে, এবং বোধ হয় তাহাদেরই কয়েকজন স্থানাভাবে ফার্স্ট ক্লাসে চড়িয়া বসিয়াছে। অপর্যাপ্ত মদ ও বিয়ার খাইয়া লোকগুলার চেহারাও যেমন ভয়ঙ্কর ব্যবহারও তেমনি বেপরোয়া। গাড়ির দরজা আটকাইয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—go— যাও—যাও!

স্টেশনমাস্টার আসিল, গার্ডসাহেব আসিল, তাহারা গ্রাহ্যই করিল না।

ছোকরা সাহেব কহিলেন, উপায়?

বন্দনা ভয়ে ভয়ে কহিল, চলুন, আজ বাড়ি ফিরে যাই।

বিপ্রদাস বলিল, না।

না ত কি? না হয় রাত্রির ট্রেনে—

ছোকরা সাহেব বলিলেন, সে ছাড়া আর উপায় কি? কষ্ট হবে, তা হোক।

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। গাড়িতে চার-পাঁচজন আছে, আর চার-পাঁচজনের জায়গা হওয়া চাই।

বন্দনার পিতা ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, চাই ত জানি, কিন্তু ওরা সব মাতাল যে!

বিপ্রদাসের সমস্ত দেহ যেন কঠিন লোহার মত ঋজু হইয়া উঠিল, কহিল, সে ওদের শখ,—আমাদের অপরাধ নয়। উঠুন, আমি সঙ্গে যাব। এবং পরক্ষণেই গাড়ির হাতল ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। বন্দনার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া কহিল, এসো। ছোকরা সাহেবকে ডাকিয়া কহিল, right assert করবেন ত স্ত্রী নিয়ে উঠে পড়ুন। অত্যাচারী জমিদার সঙ্গে থাকতে ভয় নেই।

মাতাল সাহেবগুলা এই লোকটির মুখের পানে একমুহূর্ত চাহিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে গিয়া ও-দিকের বেঞ্চে বসিয়া পড়িল।

আট

গণ্ডগোল শুনিয়া পাশের কামরার সহযাত্রী সাহেবরা প্লাটফর্মে নামিয়া দাঁড়াইল, এবং রুক্ষকণ্ঠে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, What's up'? ভাবটা এই যে, সঙ্গীদের হইয়া তাহারা বিক্রম দেখাইতে প্রস্তুত।

বিপ্রদাস অদূরবর্তী গার্ডকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া কহিল, এই লোকগুলা খুব সম্ভব ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার নয়, তোমার ডিউটি এদের সরিয়ে দেওয়া।

সে বেচারাও সাহেব, কিন্তু অত্যন্ত কাল-সাহেব। সুতরাং ডিউটি যাই হউক, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অনেকেই তামাশা দেখিতেছিল, সেই মাদ্রাজী রিলিভিং হ্যাণ্ডটিও দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে হাত নাড়িয়া নিকটে ডাকিয়া বিপ্রদাস পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়া কহিল, আমার নাম আমার চাকরদের কাছে পাবে। তোমার কর্তাদের কাছে একটা তার করে দাও যে এই মাতাল ফিরিঙ্গীর দল জোর করে ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে, নামতে চায় না আর এ-খবরটাও তাদের জানিয়ো যে গাড়ির গার্ড দাঁড়িয়ে মজা দেখলে, কিন্তু কোন সাহায্য করলে না।

গার্ড নিজের বিপদ বুঝিল। সাহসে ভর করিয়া সরিয়া আসিয়া বলিল, Don't you see they are big people? তোমরা রেলওয়ে সারভ্যান্ট, রেলের পাশে যাচ্ছ—be careful!

কথাটা মাতালের পক্ষেও উপেক্ষণীয় নয়। অতএব তাহারা নামিয়া পাশের কামরায় গেল, কিন্তু ঠিক অহিংস মেজাজে গেল না। চাপাগলায় যাহা বলিয়া গেল তাহাতে মন বেশ নিশ্চিন্ত হয় না। সে যা হোক, পাঞ্জাবের ব্যারিস্টারসাহেব গার্ডকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, আপনি না থাকলে আজ হয়ত আমাদের যাওয়াই ঘটত না।

ও—নো! এ আমার ডিউটি।

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল। বিপ্রদাস নামিবার উপক্রম করিয়া কহিল, আর বোধ হয় আমার সঙ্গে যাবার প্রয়োজন নেই। ওরা আর কিছু করবে না।

ব্যারিস্টার বলিলেন, সাহস করবে না। চাকরির ভয় আছে ত!

বন্দনা দরজা আগলাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, না, সে হবে না। চাকরির ভয়টাই চরম guarantee নয়—সঙ্গে আপনাকে যেতেই হবে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, পুরুষ হলে বুঝতে এর চেয়ে বড় guarantee সংসারে নেই। কিন্তু আমি যে কিছু খেয়ে আসিনি।

খেয়ে আমিও ত আসিনি।

সে তোমার শখ। কিন্তু একটু পরেই আসবে হোটেলওয়ালা বড় স্টেশন, সেখানে ইচ্ছে হলেই খেতে পারবে।

বন্দনা কহিল, কিন্তু সে ইচ্ছে হবে না। উপোস করতে আমিও পারি।

বিপ্রদাস বলিল, পেরে কোন পক্ষেরই লাভ নেই,—আমি নেবে যাই। ব্যারিস্টার সাহেবকে কহিল, আপনি সঙ্গে রইলেন একটু দেখবেন। যদি আবশ্যক হয় ত—

বন্দনা কহিল, চেন টেনে গাড়ি থামাবেন? সে আমিও পারব এই বলিয়া সে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বাড়ির চাকরদের বলিয়া দিল, তোমরা মাকে গিয়ে ব'লো যে, উনি সঙ্গে গেলেন। কাল কিংবা পরশু ফিরবেন।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

বন্দনা কাছে আসিয়া বসিল, কহিল, আচ্ছা মুখুয্যেমশাই, আপনি ত একগুঁয়ে কম নয়!

কেন?

আপনি যে জোর করে আমাদের গাড়িতে তুললেন, কিন্তু ওরা ছিল মাতাল, যদি নেবে না গিয়ে একটা মারামারি বাধিয়ে দিত?

বিপ্রদাস কহিল, তা হলে ওদের চাকরি যেত।

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমাদের কি যেত? দেহের অস্থিপঞ্জর। সেটা চাকরির চেয়ে তুচ্ছ বস্তু নয়।

বিপ্রদাস ও বন্দনা উভয়েই হাসিতে লাগিল, অন্য মহিলাটিও হঠাৎ একটুখানি হাসিয়া ঘাড় ফিরাইল, শুধু তাঁহার স্বামী পাঞ্জাবের নবীন ব্যারিস্টার মুখ গম্ভীর করিয়া রহিলেন।

বন্দনার পিতা এতক্ষণ বিশেষ মনোযোগ করেন নাই, আলোচনার শেষের দিকটা কানে যাইতেই সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, না না, তামাশার কথা নয়, এ ব্যাপার ট্রেনে প্রায়ই ঘটে, খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায়। তাই ত জোর-জবরদস্তির আমার ইচ্ছেই ছিল না,—রাত্রের ট্রেনে গেলেই সব দিকে সুবিধে হ'ত।

বন্দনা কহিল, রাত্রের ট্রেনেও যদি মাতাল সাহেব থাকত বাবা?

পিতা কহিলেন, তা কি আর সত্যিই হয় রে? তা হলে ত ভদ্রলোকদের যাতায়াতই বন্ধ করতে হয়। এই বলিয়া তিনি একটা মোটা চুরুট ধরাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, মুখুয্যেমশাই, ভদ্রলোকের সংজ্ঞা নিয়ে যেন বাবাকে জেরা করবেন না।

বিপ্রদাস হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না। সে আমি বুঝেচি।

আচ্ছা মুখুয্যেমশাই, ছেলেবেলা গড়ের মাঠে সাহেবদের সঙ্গে কখনো মারামারি করেছেন? সত্যি বলবেন।

না, সে সৌভাগ্য কখনো ঘটেনি।

বন্দনা কহিল, লোকে বলে, দেশের লোকের কাছে আপনি একটা terror। শুনি, বাড়ির সবাই আপনাকে বাঘের মত ভয় করে। সত্যি?

কিন্তু শুনলে কার কাছে?

বন্দনা গলা খাটো করিয়া বলিল, মেজদির কাছে।

কি বলেন তিনি?

বলেন, ভয়ে গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়।

কিরকম জল! মাতাল সাহেব দেখলে আমাদের যেমন হয়,—তেমনি?

বন্দনা সহাস্যে মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ, অনেকটা ঐরকম।

বিপ্রদাস কহিল, ওটা দরকার। নইলে মেয়েদের শাসনে রাখা যায় না। তোমার বিয়ে হলে বিদ্যেটা ভায়াকে শিখিয়ে দিয়ে আসব।

বন্দনা কহিল, দেবেন। কিন্তু সব বিদ্যে সকলের বেলায় খাটে না এও জানবেন। মেজদি বরাবরই ভালমানুষ, কিন্তু আমি হলে আমাকেই সকলের ভয় করে চলতে হত।

বিপ্রদাস বলিল, অর্থাৎ ভয়ে বাড়িসুদ্ধ লোকের গায়ের রক্ত জল হয়ে যেত। খুব আশ্চর্যি নয়। কারণ, একটা বেলার মধ্যেই নমুনা যা দেখিয়ে এসেচ তাতে বিশ্বাস করতেই প্রবৃত্তি হয়। অন্ততঃ, মা সহজে ভুলতে পারবেন না।

বন্দনা মনে মনে একটুখানি উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কহিল, আপনার মা কি করেছেন জানেন? আমি প্রণাম করতে গেলুম,—তিনি পেছিয়ে সরে গেলেন।

বিপ্রদাস কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কহিল, আমার মায়ের ঐটুকুমাত্রই দেখে এলে, আর কিছু দেখবার সুযোগ পেলে না। পেলে বুঝতে এই নিয়ে রাগ করে না খেয়ে আসার মত ভুল কিছু নেই।

বন্দনা বলিল, মানুষের আত্মসম্ভ্রম বলে ত একটা জিনিস আছে।

বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, আত্মসম্ভ্রমের ধারণা পেলে কোথা থেকে? ইস্কুল কলেজের মোটা মোটা বই পড়ে ত? কিন্তু মা ত ইংরিজী জানেন না, বইও পড়েন নি। তাঁর জানার সঙ্গে তোমার ধারণা মিলবে কি করে?

বন্দনা বলিল, কিন্তু আমি শুধু নিজের ধারণা নিয়েই চলতে পারি।

বিপ্রদাস কহিল, পারলে অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়, যেমন আজ তোমার হয়েছে। বিদেশের বই থেকে যা শিখেচ তাকেই একান্ত বলে মেনে নিয়েচ বলেই এমনি চলে আসতে পারলে। নইলে পারতে না। গুরুজনকে অকারণে অসম্মান করতে বাধত। আত্মমর্যাদা আর আত্ম-অভিমানের তফাত বুঝতে।

বন্দনা তফাত না বুঝুক, এটা বুঝিল যে তাহার আজিকার আচরণটা বিপ্রদাসের অন্তরে লাগিয়াছে। তাহার জন্য নয়, মায়ের অসম্মানের জন্য।

মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া থাকিয়া বন্দনা হঠাৎ প্রশ্ন করিল, মায়ের মত আপনি নিজেও খুব গোঁড়া হিন্দু, না?

বিপ্রদাস কহিল, হাঁ।

তেমনি ছোঁয়াছুঁয়ির বাচ-বিচার করে চলেন?

চলি।

প্রণাম করতে গেলে তাঁর মতই দূরে সরে যান?

যাই। সময়-অসময়ের হিসেব আমাদের মেনে চলতে হয়।

আমার মেজদিদিকেও বোধ করি এমনি অন্ধ বানিয়ে তুলেছেন?

সে তোমার দিদিকেই জিজ্ঞেস করো। তবে, পারিবারিক নিয়ম তাঁকেও মেনে চলতে হয়।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, অর্থাৎ বাঘের ভয় না করে কারও চলবার জো নেই।

বিপ্রদাসও হাসিয়া বলিল, না, জো নেই। যেমন দিনের গাড়িতে বাঘের ভয় থাকলে মানুষকে রাত্রের গাড়িতে যেতে হয়। ওটা প্রাণধর্মের স্বাভাবিক নিয়ম।

বন্দনা বলিল, দিদি মেয়েমানুষ, সহজেই দুর্বল, তাঁর ওপর সব নিয়মই খাটান যায়, কিন্তু দ্বিজুবাবুও ত শুনি পারিবারিক নিয়ম মেনে চলেন না, সে সম্বন্ধে বাঘমশায়ের অভিমতটা কি?

প্রশ্নটা খোঁচা দিবার জন্যই বন্দনা করিয়াছিল এবং বিদ্ধ করিবে বলিয়াই সে আশা করিয়াছিল, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের পরে কোন চিহ্নই প্রকাশ পাইল না ; তেমনই হাসিয়া বলিল, এ-সকল গূঢ় তথ্য অধিকারী ব্যতিরেকে প্রকাশ করা নিষেধ।

দ্বিজুবাবু নিজে জানতে পাবেন ত?

বিপ্রদাস ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সময় হলেই পাবে। সে জানে রক্তমাংসে বাঘের পক্ষপাতিত্ব নেই।

মুহূর্তকালের জন্য বন্দনার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। ইহার পরে সে যে কি প্রশ্ন করিবে ভাবিয়া পাইল না।

এই পরিবর্তন বিপ্রদাসের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে এড়াইল না।

পিতা ডাকিলেন, বুড়ি, আমাকে একটু জল দাও ত মা।

বন্দনা উঠিয়া গিয়া পিতাকে কুঁজা হইতে জল দিয়া ফিরিয়া আসিয়া বসিল। পুনশ্চ দ্বিজদাসের কথা পাড়িতে তাহার ভয় করিল। অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কহিল, মেজদির শাশুড়ীর জন্যে নয়, কিন্তু আমার না খেয়ে আসায় মেজদি যদি দুঃখ পেয়ে থাকেন ত আমিও দুঃখ পাব। আমি সেই কথাই এখন ভাবচি।

বিপ্রদাস কহিল, মেজদি কষ্ট পাবেন সেইটে হ'লো বড়, আর আমার মা যে লজ্জা পাবেন, বেদনাবোধ করবেন সেটা হ'লো তুচ্ছ। তার মানে, মানুষে আসল জিনিসটি না জানলে কত উলটো চিন্তাই না করে।

বন্দনা কহিল, একে উলটো চিন্তা বলচেন কেন? বরঞ্চ এই ত স্বাভাবিক।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। তাহার ক্ষুণ্ণ মুখের চেহারা বন্দনার চোখে পড়িল।

বাহিরে অন্ধকার করিয়া আসিতেছিল, কিছুই দেখা যায় না, তথাপি জানালার বাহিরে চাহিয়া বন্দনা বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অন্যদিন এই সময়ে ট্রেন হাওড়ায় পৌঁছায়, কিন্তু আজ এখনো দু-তিন ঘণ্টা দেরি। সে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, বিপ্রদাস পকেট হইতে একটা ছোট খাতা বাহির করিয়া কি-সব লিখিয়া যাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মুখুয্যেমশাই একটা কথার জবাব দেবেন?

কি কথা?

আপনি বলছিলেন আমাদের আত্মসম্ভ্রমবোধ শুধু ইস্কুল-কলেজের বই-পড়া ধারণা। কিন্তু আপনার মা ত ইস্কুল-কলেজে পড়েন নি, তাঁর ধারণা কোথাকার শিক্ষা?

বিপ্রদাস বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না।

বন্দনা কহিল, তাঁহার সম্বন্ধে কৌতূহল আমি মন থেকে সরাতে পারচি নে। তিনি গুরুজন, আমি অস্বীকার করিনে, কিন্তু সংসারে সেই কথাটাই কি সকল কথার বড়?

বিপ্রদাস পূর্ববৎ স্থির হইয়া রহিল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আজ আমরা ছিলুম তাঁর বাড়িতে অনাহূত অতিথি। এ ত আমার বই-পড়া বিদেশের শিক্ষা নয়? তবুও এ-সব কিছুই নয়,—শুধু বয়সে ছোট বলেই কি আমারই অপমানটা আপনারা অগ্রাহ্য করবেন?

এখনও বিপ্রদাস কিছুই বলিল না,—তেমনি নীরবে রহিল।

বন্দনা কহিল, তবুও তাঁর কাছে আমি ক্ষমা চাইচি। আমার আচরণের জন্যে দিদি যেন না দুঃখ পান। একটু থামিয়া বলিল, আমার বাপ-মা বিলেত গিয়েছিলেন বলে মেমসাহেব ছাড়া তাঁকে আর কিছু তিনি ভাবতেই পারেন না। শুনেচি, এই জন্যেই নাকি আজও মেজদির গঞ্জনার পরিসমাপ্তি ঘটেনি। তাঁর ধারণার সঙ্গে আমার ধারণা মিলবে না, তবু তাঁকে বলবেন, আমি যাই হই, অপমানটা অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। দিদির শাশুড়ী করলেও না। বলিতে বলিতে তাহার চোখের কোণে জল আসিয়া পড়িল।

বিপ্রদাস ধীরে ধীরে বলিল, কিন্তু তিনি ত তোমাকে অপমান করেন নি!

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, নিশ্চয় করেছেন।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না, কয়েক মুহূর্ত নীরবে থাকিয়া কহিল, না, অপমান তোমাকে মা করেন নি। কিন্তু তিনি নিজে ছাড়া এ কথা তোমাকে কেউ বোঝাতে পারবে

না। তর্ক করে নয়, তাঁর কাছে থেকে এ কথা বুঝতে হবে।

বন্দনা জানালার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, একদিন বাবার সঙ্গে মার ঝগড়া হয়। কারণটা তুচ্ছ, কিন্তু হয়ে দাঁড়াল মস্ত বড়। তোমাকে সকল কথা বলা চলে না, কিন্তু সেই দিন বুঝেছিলাম আমার এই লেখাপড়া-না-জানা মায়ের আত্মমর্যাদাবোধ কত গভীর।

বন্দনা সহসা ফিরিয়া দেখিল, অপরিসীম মাতৃগর্বে বিপ্রদাসের সমস্ত মুখ যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে কিছুই না বলিয়া আবার জানালার বাহিরেই চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস বলিতে লাগিল, অনেকদিন পরে কি একটা কথার সূত্রে একদিন এই কথাই মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—মা, এত বড় আত্মমর্যাদাবোধ তুমি পেয়েছিলে কোথায়?

বন্দনা মুখ না ফিরাইয়াই কহিল, কি বললেন তিনি?

বিপ্রদাস কহিল, জান বোধ হয় মায়ের আমি আপন ছেলে নই। তাঁর নিজের দুটি ছেলেমেয়ে আছে—দ্বিজু আর কল্যাণী। মা বললেন, তোদের তিনটিকে একসঙ্গে এক বিছানায় যিনি মানুষ করে তোলবার ভার দিয়েছিলেন, তিনিই এ বিদ্যে আমাকে দান করেছিলেন বাবা, অন্য কেউ নয়। সেই দিন থেকেই জানি মায়ের এই গভীর আত্মসম্মান-বোধই কাউকে একটা দিনের জন্যে জানতে দেয়নি, তিনি আমার জননী নন, বিমাতা। বুঝতে পার এর অর্থ?

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পুনরায় সে বলিতে লাগিল, অভিবাদনের উত্তরে কে কতটুকু হাত তুললে, কতটুকু সরে দাঁড়াল, নমস্কারের প্রতি-নমস্কারে কে কতখানি মাথা নোয়ালে, এই নিয়ে মর্যাদার লড়াই সকল দেশেই আছে, অহঙ্কারের নেশার খোরাক তোমাদের পাঠ্য পুস্তকের পাতায় পাতায় পাবে, কিন্তু মা না হয়েও পরের ছেলের মা হয়ে যেদিন মা আমাদের বৃহৎ পরিবারে প্রবেশ করলেন, সেদিন আশ্রিত আত্মীয়-পরিজনদের গলায় গলায় বিষের থলি যেন উপচে উঠল। কিন্তু যে বস্তু দিয়ে তিনি সমস্ত বিষ অমৃত করে তুললেন, সে গৃহকর্ত্রীর অভিমান নয়, সে গৃহিণীপনার জবরদস্তি নয়, সে মায়ের স্বকীয় মর্যাদা। সে এত উঁচু যে তাকে কেউ লঙ্ঘন করতে পারলে না। কিন্তু এ তত্ত্ব আছে শুধু আমাদের দেশে। বিদেশীরা এ খবর ত জানে না, তারা খবরের কাগজের খবর দেখে বলে এদের দাসী, বলে অন্তঃপুরে শেকল-পরা বাঁদী। বাইরে থেকে হয়ত তাই দেখায়—দোষ তাদের দিইনে, কিন্তু বাড়ির দাসদাসীরও সেবার নীচে অন্নপূর্ণার রাজ্যেশ্বরী মূর্তি তাদের যদিও বা না চোখে পড়ে, তোমাদেরও কি পড়বে না?

বন্দনা অভিভূত-চক্ষে বিপ্রদাসের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

ব্যারিস্টারসাহেব অকস্মাৎ জোর গলায় বলিয়া উঠিলেন, ট্রেন এতক্ষণে হাওড়া প্লাটফর্মে ইন্ করলে।

বন্দনার পিতার বোধ করি তন্দ্রা আসিয়াছিল, চমকিয়া চাহিয়া কহিলেন, বাঁচা গেল।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে চুপি চুপি বলিল, আমার কলকাতায় নামতে আর যেন ভাল লাগচে না, মুখুয্যেমশাই। ইচ্ছে হচ্ছে আপনার মার কাছে ফিরে যাই। গিয়ে বলি, মা, আমি ভাল করিনি, আমাকে মার্জনা করুন।

বিপ্রদাস শুধু হাসিল, কিছু বলিল না।

স্টেশনে নামিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাবেন?

রায়সাহেব বলিলেন, গ্র্যান্ড হোটেলেই ত বরাবর উঠি, তাদের তার করেও দিয়েছি—ঐখানেই উঠব।

এই লোকটির সুমুখে গ্র্যান্ড হোটেলের কথায় বন্দনার কেমন যেন আজ লজ্জা করিতে লাগিল।

পাঞ্জাবের ব্যারিস্টারসাহেব গাড়ির অত্যন্ত লেট হওয়ার প্রতি নিরতিশয় ক্রোধ প্রকাশ

করিয়া বার বার জানাইতে লাগিলেন তাঁহাকে বি. এন. লাইনে যাইতে হইবে,—অতএব ওয়েটিং রুম ব্যতীত আজ আর গত্যন্তর নাই।

বিপ্রদাস নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আছে, রায়সাহেব নিজেও একটুখানি যেন লজ্জিত হইয়াই কহিলেন, কিন্তু বিপ্রদাস, তুমি—তুমিও বোধ হয় আমাদের সঙ্গে—

গ্র্যান্ড হোটেলে? বলিয়াই বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, আমার জন্যে চিন্তা নেই। বৌবাজারে দ্বিজুর একটা বাড়ি আছে, প্রায়ই আসতে হয়, লোকজন সবই আছে—আচ্ছা, আজ সেইখানেই কেন সকলে চলুন না?

বন্দনা পুলকিত হইয়া উঠিল—চলুন, সবাই সেইখানেই যাব। তাহার মাথার উপর হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল। আনন্দের প্রাবল্যে অপর দুই সহযাত্রীকে সে-ই সাদরে আহ্বান করিয়া সবাই মিলিয়া মোটরে গিয়া উঠিল।

নয়

বন্দনা সকালে উঠিয়া দেখিল এই বাড়িটার সম্বন্ধে সে যাহা ভাবিয়াছিল তাহা নয়। মনে করিয়াছিল পুরুষমানুষের বাসাবাড়ি, হয়ত ঘরের কোণে কোণে জঞ্জাল, সিঁড়ির গায়ে থুথু, পানের পিচের দাগ, ভাঙ্গাচোরা আসবাবপত্র, ময়লা বিছানা, কড়ি-বরগায় ঝুল, মাকড়সার জাল—এমনি সব অগোছাল বিশৃঙ্খল ব্যাপার। কাল রাত্রে সামান্য আলোকে স্বল্পকালের মধ্যে দেখাও কিছু হয় নাই, কিন্তু আজ তাহার সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্নতায় সত্যই আশ্চর্য হইল। মস্ত বাড়ি, অনেক ঘর, অনেক বারান্দা, সমস্ত পরিষ্কার ঝকঝক করিতেছে। দ্বারের বাহিরে একজন মধ্যবয়সী বিধবা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল, দেখিতে ভদ্রঘরের মেয়ের মত, সে গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিতেই বন্দনা সঙ্কোচে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সে বলিল, দিদি, আপনার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি, চলুন, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিই। আমি এ বাড়ির দাসী।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, বাবা উঠেছেন?

না, কাল শুতে দেরি হয়েছে, হয়ত উঠতেও দেরি হবে?

আমাদের সঙ্গে আর দুজন যাঁরা এসেচেন তাঁরা?

না, তাঁরাও ওঠেন নি।

তোমাদের বড়বাবু? তিনিও ঘুমুচ্চেন?

দাসী হাসিয়া বলিল, না, তিনি গঙ্গাস্নান, পুজো-আহ্নিক সেরে কাছারি-ঘরে গেছেন। খবর পাঠাব কি?

বন্দনা বলিল, না, তার দরকার নেই।

স্নানের ঘরটা একটু দূরে, ছোট একটা বারান্দা পার হইয়া যাইতে হয়। বন্দনা যাইতে যাইতে কহিল, তোমাদের এখানে বাথরুম শোবার ঘরের কাছে থাকবার জো নেই, না?

দাসী কহিল, না। মা মাঝে মাঝে কালী-দর্শনের জন্যে কলকাতায় এলে এ-বাড়িতেই থাকেন কিনা, তাই, ও-সব হবার জো নেই।

বন্দনা মনে মনে বলিল, এখানেও সেই প্রবল-প্রতাপ মা। আচার-অনাচারের কঠিন শাসন। সে ফিরিয়া গিয়া কাপড় জামা গামছা প্রভৃতি লইয়া আসিল, কহিল, এখানে দু-চারদিন যদি থাকতে হয়, তোমাকে কি বলে ডাকব? এখানে তুমি ছাড়া আর বোধ হয় কোন দাসী নেই?

সে বলিল, আছে, কিন্তু তার অনেক কাজ। ওপরে আসবার সময় পায় না। যা দরকার হয় আমাকেই আদেশ করবেন, দিদি, আমার নাম অন্নদা। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক, হয়ত অনেক দোষ-ত্রুটি হবে।

তাহার বিনয়বাক্যে বন্দনা মনে মনে খুশী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় তোমার বাড়ি অন্নদা? তোমার কে কে আছে?

অন্নদা বলিল, বাড়ি আমার এঁদের গ্রামেই—বলরামপুরে। একটি ছেলে, তাকে এঁরাই লেখাপড়া শিখিয়ে কাজ দিয়েছেন, বৌ নিয়ে সে দেশেই থাকে। ভালই আছে দিদি।

বন্দনা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, তবে নিজে তুমি এখনো চাকরি কর কেন, বৌ-ব্যাটা নিয়ে বাড়িতে থাকলেই ত পার?

অন্নদা কহিল, ইচ্ছে ত হয় দিদি, কিন্তু পেরে উঠিনে। দুঃখের দিনে বাবুদের কথা দিয়েছিলুম নিজের ছেলে যদি মানুষ হয়, পরের ছেলেদের মানুষ করার ভার নেব। সেই ভারটা ঘাড় থেকে নামাতে পারিনে। দেশের অনেকগুলি ছেলে এই বিদেশে লেখাপড়া করে। আমি না দেখলে তাদের দেখবার কেউ নেই।

তারা বুঝি এই বাড়িতেই থাকে?

হাঁ, এই বাড়িতে থেকেই কলেজে পড়ে। কিন্তু আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি বাইরেই আছি, ডাকলেই সাড়া পাবেন।

বন্দনা বাথরুমে ঢুকিয়া দেখিল ভিতরে নানাবিধ ব্যবস্থা। পাশাপাশি গোটা-তিনেক ঘর, স্পর্শদোষ বাঁচানোর যতপ্রকার ফন্দি-ফিকির মানুষের বুদ্ধিতে আসিতে পারে তাহার কোন ত্রুটি ঘটে নাই। বুঝিল এসব মায়ের ব্যবহারের জন্য। পাথরের মেঝে, পাথরের জলচৌকি, একদিকে গোটা-তিনেক প্রকাণ্ড তাঁবার হাঁড়া, বোধ হয় গঙ্গাজল রাখার জন্য,—নিত্য মাজা-ঘষায় ঝকঝক করিতেছে—তিনি কবে আসিয়াছিলেন এবং আবার কবে আসিবেন নিশ্চিত কেহ জানে না, তথাপি অবহেলার চিহ্নমাত্র কোথাও চোখে পড়িবার জো নাই। যেন এখানেই বাস করিয়া আছেন এমনি সযত্ন-সতর্ক ব্যবস্থা। এ যে কেবল হুকুম করিয়া, শাসন চালাইয়াই হয় না, তাহার চেয়েও বড় কিছু-একটা সমস্ত নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, এ কথা বন্দনা চাহিবামাত্রই অনুভব করিল। এবং এই মা, এই স্ত্রীলোকটি যে এ-সংসারে সর্বসাধারণের কতখানি ঊর্ধ্বে অবস্থিত এই কথাটা সে বহুক্ষণ পর্যন্ত নিজের মনে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। গল্পে, প্রবন্ধে, পুস্তকে ভারতীয় নারীজাতির বহু দুঃখের কাহিনী সে পড়িয়াছে, তাহাদের হীনতার লজ্জায় নিজে নারী হইয়া সে মর্মে মরিয়া গেছে—ইহা মিথ্যাও নয়,—কিন্তু এই ঘরের মধ্যে আজ একাকী দাঁড়াইয়া সে-সকল সত্য বলিয়া মানিয়া লইতেও তাহার বাধিল।

বাহিরে আসিতে অন্নদা হাসিমুখে কহিল, বড্ড দেরি হয়ে গেল যে দিদি, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক, ওঁরা সব নীচে খাবার ঘরে অপেক্ষা করে আছেন। চলুন।

তোমাদের বড়বাবু কাছারি-ঘর থেকে বেরিয়েছেন?

হাঁ, তিনিও নীচে আছেন।

আমাদের সঙ্গে বোধকরি খাবেন না?

অন্নদা সহাস্যে কহিল, খেলেও ত সেই দুপুরের পরে দিদি। আজ আবার তাও নেই। একাদশী, সন্ধ্যার পরে বোধ হয় কিছু ফলমূল খাবেন।

বন্দনা কি করিয়া যেন বুঝিয়াছিল এ গৃহে এই স্ত্রীলোকটি ঠিক দাসী জাতীয় নয়। কহিল, তিনি ত আর বামুনের ঘরের বিধবা নয়, একাদশীর উপোস করবেন কোন্ দুঃখে? কাল গাড়িতে একাদশী না হোক দশমীর উপবাস ত এমনিই হয়ে গেছে।

অন্নদা বলিল, তা হোক, উপোস ওঁর গায়ে লাগে না। মা বলেন, আর জন্মে তপস্যা করে বিপিন এ জন্মে উপোস-সিদ্ধির বর পেয়েছে। ওঁর খাওয়া দেখলে অবাক হতে হয়।

বন্দনা নীচে আসিয়া দেখিল, তাহাদের অভ্যস্ত চা রুটি ডিম প্রভৃতি টেবিলে সুসজ্জিত, এবং পিতা ও সস্ত্রীক পাঞ্জাবের ব্যারিস্টার ক্ষুধায় চঞ্চল। অধৈর্য তাহাদের প্রায় শেষ সীমায় উপনীত, মুহূর্তে খবরের কাগজ ফেলিয়া দিয়া সাহেব অনুযোগের কণ্ঠে কহিলেন, ইঃ—এত দেরি মা, সকালবেলাটায় আর ত কোন কাজ হবে না দেখচি।

বিপ্রদাস অদূরে বসিয়াছিল ; বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মুখুয্যেমশাই, আপনি খাবেন না?

বিপ্রদাস কথাটা বুঝিল, হাসিয়া কহিল, চা আমি খাইনে, খাই শুধু ডাল-ভাত। তার

সময় এ নয়—আমার জন্যে চিন্তা নেই, তুমি বসে যাও।

বন্দনা ইহার উত্তর দিল না, পিতা এবং অতিথি দুজনকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আমার অপরাধ হয়ে গেছে। বলে পাঠান উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। খাবার ইচ্ছে আমার নেই, কিন্তু আপনারা আর অপেক্ষা করবেন না—আরম্ভ করে দিন। আমি বরঞ্চ আপনাদের চা তৈরি করে দিই। এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ কাজে লাগিয়া গেল।

সকলেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চাকরটা একধারে দাঁড়াইয়াছিল, সে কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। পিতা উদ্বেগের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, অসুখ করেনি ত মা? সস্ত্রীক ব্যারিস্টার সাহেব কি যে বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

বন্দনা চা তৈরি করিতে করিতে কহিল, না বাবা, অসুখ করেনি, শুধু খেতে ইচ্ছে করচে না।

তা হলে কাজ নেই। কাল বেশী রাত্রের খাওয়াটা বোধ করি তেমন হজম হয়নি। তা ছাড়া দিনের বেলা পিত্তি পড়ে গেল কিনা।

তাই বোধ হয় হবে। বেলা হলে মুখুয্যেমশায়ের সঙ্গে বসে ডাল-ভাত খাব, এ-বাড়িতে সে হয়ত হজম করতে পারব।

কথাটায় আর কেহ তেমন খেয়াল করিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের মুখের উপর দিয়া যেন একটা কাল ছায়া মুহূর্তের জন্য ভাসিয়া গেল।

চাকরটা কি ভাবিয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, আজ একাদশী ; ও-বেলায় দুটো ফলমূল ছাড়া আর ত কিছু খান না।

বন্দনা এইমাত্র এ কথা শুনিয়া আসিয়াছিল, তথাপি বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিল, শুধু ফলমূল? বেশ হালকা খাওয়া। সে-ই বোধ হয় খুব ভাল হবে। না, মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু কেহ যে তাহাকে স্বচ্ছন্দে উপহাস করিতে পারে আজ এই প্রথম জানিয়া মনে মনে সে যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। এবং তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দনাও বোধ করি ইহা অনুভব করিল।

কাজকর্ম সারিয়া বন্দনা পিতার সহিত যখন বাসায় ফিরিয়া আসিল তখন অপরাহ্ন বেলা। সস্ত্রীক ব্যারিস্টারসাহেব যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠের ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি কলিকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তুসকল পরিদর্শন করিয়া তখনও ফিরেন নাই। রাত্রের গাড়িতে তাঁহাদের যাইবার কথা, কিন্তু প্রোগ্রাম বদল করিয়া যাত্রাটা আপাততঃ তাঁহারা বাতিল করিয়াছেন।

রায়সাহেব কাপড় ছাড়িতে তাঁহার ঘরে চলিয়া গেলেন, বন্দনার নিজের ঘরের সম্মুখে দেখা হইল অন্নদার সঙ্গে। সে হাসিমুখে আনুযোগের সুরে বলিল, দিদি, সারাদিন ত না খেয়ে কাটল,—আপনার ফলমূল সমস্ত আনিয়ে রেখেচি, একটু শিগগির করে মুখহাত ধুয়ে নিন, আমি ততক্ষণ সব তৈরি করে ফেলি। কি বলেন?

কিন্তু বড়বাবু—মুখুয্যেমশাই? তিনি কৈ?

অন্নদা কহিল, তাঁর জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই দিদি ; এ-সব তাঁর রোজকার ব্যাপার। খাওয়ার চেয়ে না-খাওয়াটাই তাঁর নিয়ম।

কিন্তু কৈ তিনি?

তিনি গেছেন দক্ষিণেশ্বরে কালীদর্শন করতে। এখুনি আসবেন।

বন্দনা কহিল, সেই ভাল, তিনি এলেই হবে। কিন্তু বাকী সকলে? তাঁদের কি ব্যবস্থা হলো? চল ত অন্নদা, তোমাদের রান্নাঘরটা একবার দেখে আসি।

অন্নদা কহিল, চলুন, কিন্তু এ-বেলায় তাঁদের ব্যবস্থা ত রান্নাঘরে হয়নি দিদি, ব্যবস্থা হয়েছে হোটেলে—খাবার সেখান থেকেই আসবে।

বন্দনা আশ্চর্য হইয়া গেল—সে কি কথা? এ পরামর্শ তোমাদের দিলে কে?

বড়বাবু নিজেই হুকুম দিয়ে গেছেন।

কিন্তু সে-সব অখাদ্য-কুখাদ্য তাঁরা খাবেন কোথায়? এই বাড়িতে? তোমাদের মা শুনলে বলবেন কি?

অন্নদা অপ্রতিভ হইয়া উঠিল, কহিল, না, তিনি শুনতে পাবেন না। নীচের একটা ঘরে সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাসনপত্র হোটেলওয়ালারাই নিয়ে আসবে, কোন অসুবিধে হবে না।

বন্দনা বলিল, হুকুম ত দিয়ে গেলেন, কিন্তু তামিল করবে কে? তাঁর কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে পার?

সে আর বেশী কথা কি দিদি, চলুন নিয়ে যাচ্চি।

চল।

মুখুয্যেদের একটা বড় রকমের তেজারতি কারবার কলিকাতায় চলে। নীচের তলায় গোটা-চারেক ঘর লইয়া অফিস ; কেরানী, গোমস্তা, সরকার, পেয়াদা, ম্যানেজার প্রভৃতি ব্যবসায়ের যাবতীয় লোকজন সেখানে কাজ করে, বন্দনা প্রবেশ করিতেই সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। বয়স ও পদমর্যাদার লক্ষণে ম্যানেজার ব্যক্তিটিকে সহজে চিনিতে পারিয়া সে ইঙ্গিতে তাঁহাকে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া কহিল, হোটেলে হুকুম দিয়ে এসেছিলেন কি আপনি নিজে?

ম্যানেজার ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলে কহিল, আর একবার যান তাদের বারণ করে দিয়ে আসুন।

ম্যানেজার বিস্মিত হইল, ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, বড়বাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত—

বন্দনা কহিল, তখন হয়ত আর বারণ করবার সময় থাকবে না। মুখুয্যেমশাই রাগ করলে আমার ওপর করবেন। আপনার ভয় নেই। যান দেরি করবেন না। এই বলিয়াই সে ফিরিতে উদ্যত হইল, উত্তরের অপেক্ষাও করিল না।

হতবুদ্ধি ম্যানেজার ভাবিল, মন্দ নয়। বিপ্রদাসের হুকুম অমান্য করা কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলাও চলে, কিন্তু এই অপরিচিত মেয়েটির সুনিশ্চিত, নিঃসংশয় শাসন অবহেলা করাও কম কঠিন নয়। প্রায় তেমনি অসম্ভব। ক্ষণকাল বিমূঢ়ের ন্যায় স্তব্ধ থাকিয়া দ্বিধার স্বরে কহিল আজ্ঞে, যাই তা হলে—নিষেধ করে আসি? কিছু আগাম দেওয়া হয়ে গেছে—

তা হোক, আপনি দেরি করবেন না। এই বলিয়া সে ফিরিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাস খবর শুনিল। খুশী হইবে কি রাগ করিবে হঠাৎ ভাবিয়া পাইল না। রান্নাঘরে আসিয়া দেখিল, আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, বন্দনা ছোট একটা টুল পাতিয়া পাচক-ব্রাহ্মণকে লইয়া ব্যস্ত, উঠিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম বিনয়ের কণ্ঠে কহিল, রাগের মাথায় ম্যানেজারবাবুকে বরখাস্ত করে আসেন নি ত মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস কহিল, মুখুয্যেমশাই যে এমন বদরাগী এ খবর তোমায় দিলে কে?

বন্দনা বলিল, লোকে বলে বাঘের গন্ধ এক যোজন দূর থেকে পাওয়া যায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল,—কিন্তু অতিথিদের উপায় হবে কি? এঁদের সকলের যে রাত্রে ডিনার করা অভ্যেস—তার কি বল ত?

বন্দনা কহিল, যাঁর না হলে নয় তাঁকে লোক দিয়ে হোটেলে পাঠিয়ে দিন। বিলের টাকা আমি দেব।

তামাশা নয় বন্দনা, এ হয়ত ঠিক ভাল হল না।

ভাল হতো বুঝি ঐ-সব জিনিস এ-বাড়িতে বয়ে আনলে? মা শুনলে কি বলতেন বলুন ত?

বিপ্রদাস এ কথা যে ভাবে নাই তাহা নহে, কিন্তু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই, কহিল, তিনি জানতে পারতেন না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া বলিল, পারতেন। আমি চিঠি লিখে দিতুম।

কেন?

কেন? কখনো যা করেন নি, দুদিনের এই ক'টা বাইরের লোকের জন্যে কিসের জন্যে তা করতে যাবেন? কখ্খন না।

শুনিয়া বিপ্রদাস শুধু যে খুশী হইল তাই নয়, বিস্ময়াপন্ন হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু তুমি যে কাল থেকে কিছুই খাওনি বন্দনা! রাগ কি পড়বে না? তাহার কণ্ঠস্বরে এবার একটু স্নেহের সুর লাগিল।

বন্দনা মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, রাগিয়ে দিয়েছিলেন কেন? কিন্তু শুনুন, আপনার খাবার ফলমূল, সব আনানো আছে, ততক্ষণ সন্ধ্যে-আহ্নিক আপনি সেরে নিন, আমি গিয়ে তৈরি করে দেব। কিন্তু আর কেউ যদি দেয়, আমি আজও খাব না তা বলে দিচ্চি।

আচ্ছা, এস,—বলিয়া বিপ্রদাস উপরে চলিয়া গেল।

প্রায় ঘণ্টা-খানেক পরে বন্দনা ফলমূল মিষ্টান্নের সাদা পাথরের থালা হাতে লইয়া বিপ্রদাসের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্নদার হাতে আসন ও জলের গ্লাস। জল-হাতে সমস্তটা সে সযত্নে মুছিয়া ঠাঁই করিয়া দিল।

বিপ্রদাস বন্দনার পানে চাহিয়া সবিস্ময়ে কহিল, তুমি কি আবার এখন স্নান করলে নাকি?

আপনি খেতে বসুন, বলিয়া সে পাত্রটা নামাইয়া রাখিল।

দশ

বিপ্রদাস আসনে বসিয়া পুনরায় সেই প্রশ্নই করিল, সত্যিই আবার স্নান করে এলে নাকি? অসুখ করবে যে?

তা করুক। কিন্তু হাতে না-খাবার ছলছুতা আবিষ্কার করতে আপনাকে দেব না এই আমার পণ। স্পষ্ট করে বলতে হবে, তোমার ছোঁয়া খাব না, তুমি ম্লেচ্ছ-ঘরের মেয়ে।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, বইয়ে পড়নি যে দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না?

বন্দনা বলিল, পড়েচি, কিন্তু আপনি দুরাত্মাও নন, ভয়ানকও নন—আমাদেরই মত দোষে-গুণে জড়ান মানুষ। তা না হলে সত্যই আজ ও-বেচারাদের ডিনার বন্ধ করতে যেতুম না।

কিন্তু সত্যি কারণটা কি?

সত্যি কারণটাই আপনাকে বলেচি। আপনাদের পরিবারে ওটা চলে না। না দেশের বাড়িতে, না এখানে। কিসের তরে ও-কাজ করতে যাবেন?

কিন্তু জান ত, সবাই ওঁরা বিলেত-ফেরত—এমনি খাওয়াতেই ওঁরা অভ্যস্ত।

বন্দনা কহিল, অভ্যাস যাই হোক, তবুও বাঙ্গালী। বাঙ্গালী-অতিথি ডিনার খেতে না পেয়ে মারা গেছে কোথাও এমন নজির নেই। সুতরাং, এ অজুহাত অগ্রাহ্য। ওটা আপনার বাজে কথা।

বিপ্রদাস কহিল, তবে কাজের কথাটা কি শুনি?

বন্দনা বলিল, সে আমি ঠিক জানিনে। কিন্তু বোধ হয় যা আপনি মুখে বলেন তার সবটুকু ভেতরে মানেন না। নইলে মাকে লুকিয়ে এ ব্যবস্থা করতে কিছুতেই রাজী হতেন না। লোকে আপনাকে মিথ্যে অত ভয় করে। যাঁকে করা দরকার সে আপনি নয়, আপনার মা।

শুনিয়া বিপ্রদাস কিছুমাত্র রাগ করিল না, বরঞ্চ বলিল, তুমি দুজনকেই চিনেছ। কিন্তু ব্যাপারটা যে মাকে লুকিয়ে হচ্ছিল এ খবর তুমি শুনলে কার কাছে?

বন্দনা নাম করিল না, শুধু কহিল, আমি জিজ্ঞেসা করে জেনে নিয়েচি। সে এতবড় দুর্ঘটনা যে, মেজদি আমাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবেন না, চিরদিন অভিসম্পাত করে

বলবেন, বন্দনার জন্যেই এমন হল। তাই কিছুতেই এ কাজ করতে আপনাকে আমি দিতে পারিনে।

বিপ্রদাস কহিল, তুমি পরম আত্মীয়, কুটুম্বের মধ্যে সকলের বড়। এ তোমার যোগ্য কথা। কিন্তু লুকোচুরি না করে তোমার হাতে আমার খাওয়া চলে কিনা এ কথা সে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করেছিলে? বরঞ্চ জেনে এস গিয়ে, ততক্ষণ আমি অপেক্ষা করে রইলুম, এই বলিয়া সে হাসিয়া খাবারের থালাটা একটুখানি ঠেলিয়া দিল।

বন্দনার মুখ প্রথম লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, পরে সামলাইয়া লইয়া কহিল, না, এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা করতে আমি যেতে পারব না, আপনার খেয়ে কাজ নেই।

বিপ্রদাস বলিল, কিন্তু মুশকিল এই যে, নিজের বাড়িতে তোমাকে উপবাসী রাখতেও ত পারিনে, এই বলিয়া সে আহারে প্রবৃত্ত হইল।

বন্দনা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এর পরে কি করবেন?

বাড়ি ফিরে গিয়ে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করব, এই বলিয়া সে হাসিল। কিন্তু তাহার হাসি সত্ত্বেও ইহা সত্য না পরিহাস বন্দনা নিশ্চিত বুঝিতে না পারিয়া পুনরায় স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া একটা হবেই, কিন্তু তোমার বোনের শাস্তি থেকে যে পরিত্রাণ পাব এটা তার চেয়েও বড়। বলিয়া পুনশ্চ সহাস্যে কহিল, বিশ্বাস হল না? আচ্ছা আগে বিয়ে হোক, তখন মুখুয্যেমশায়ের কথাটা বুঝবে, এই বলিয়া সে খাবারের পাত্রটা নিঃশেষ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

এদিকে ডিনার বাতিল হইল বটে, কিন্তু অন্যান্য রুচিকর আহার্যের আয়োজনে অবহেলা ছিল না। সুতরাং পরিতৃপ্তির দিক দিয়া কোথাও ত্রুটি ঘটিল না। কিন্তু সর্বকার্য সমাধা করার পরে বিছানায় শুইয়া বন্দনা ভাবিতেছিল, তাহার সম্বন্ধে বিপ্রদাসের আচরণ অপ্রত্যাশিতও নয়, হয়ত অন্যায়ও নয়, এবং আপনার জন হইয়াও যেজন্য এতকাল ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয় ছিল না তাহাও এতদিনের প্রাচীন কাহিনী যে নূতন করিয়া আঘাত বোধ করা শুধু বাহুল্য নয় বিড়ম্বনা। প্রণাম করিতে গেলে বিপ্রদাসের মা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রতিবাদে বন্দনা না খাইয়া রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। শিক্ষাবিহীন নারীর উদ্ধত ধর্মবোধ তাহাকে আঘাত করে নাই তাহা নয়, তথাপি এই মূঢ়তাকেও একদিন বিস্মৃত হওয়া সহজ, কিন্তু বিপ্রদাস যাহা করিল তাহার প্রতিবাদে কি করা যে উচিত বন্দনা খুঁজিয়া পাইল না। হাতের ছোঁয়া ফলমূল-মিষ্টান্ন সে খাইয়াছে সত্য, কিন্তু স্বেচ্ছায় নয়, দায়ে পড়িয়া। পাছে বলরামপুরের কদর্য কাণ্ড এখানেও ঘটে এই ভয়ে। এ যেন পাগলের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে। কিন্তু এই অনাচার বিপ্রদাসের লাগিয়াছে, বাড়ি ফিরিয়া সে প্রায়শ্চিত্ত করিবে এই কথাটা কেমন করিয়া যেন নিশ্চয় অনুমান করিয়া বন্দনার চোখে ঘুম রহিল না। অথচ, একথাও বহুবার ভাবিল ব্যাপারটা এত গুরুতর কিসের? তাহাদের চলার পথ ত এক নয়,—সংসারে উভয়ের জন্যই প্রশস্ত স্থান যথেষ্ট রহিয়াছে। দৈবাৎ সংঘর্ষ যদি একদিন বাধিরাই থাকে বাধিলই বা। এ প্রশ্নের মুখোমুখী হইবার ডাক এ-জীবনে তাহাকে কে দিতেছে? এমন করিয়া সে আপনাকে আপনি শান্ত করিবার অনেক চেষ্টাই করিল, কিন্তু তথাপি এই মানুষটির নিঃশব্দ অবজ্ঞা কোনমতে মন হইতে দূর করিতে পারিল না।

ভাবিতে ভাবিতে কখন এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু অসুস্থ বাধাগ্রস্ত নিদ্রা অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া গেল। তখনও ভোর হয় নাই, অসমাপ্ত নিদ্রার অবসন্ন জড়িমা দুই চোখ আচ্ছন্ন করিয়া আছে, কিন্তু বিছানাতেও থাকিতে পারিল না, বাহিরে আসিয়া বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিল কালো-আকাশ নিশান্তের অন্ধকারে গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। দূরে বড় রাস্তায় কচিৎ-কদাচিৎ গাড়ির শব্দ অস্ফুটে শোনা যায়, লোক-চলাচলের তখনও অনেক বিলম্ব, সমস্ত বাড়িটাই একান্ত নীরব; সহসা চোখে পড়িল দ্বিতলে

মায়ের পূজার ঘরে আলো জ্বলিতেছে, এবং তাহারই একটা সূক্ষ্ম রেখা রুদ্ধ জানালার ফাঁক দিয়া সম্মুখের থামে আসিয়া পড়িয়াছে। একবার মনে করিল চাকরেরা হয়ত আলোটা নিবাইতে ভুলিয়াছে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল হয়ত এ বিপ্রদাস,—পূজায় বসিয়াছে।

কৌতূহল অদম্য হইয়া উঠিল। বুঝিল, হঠাৎ দেখা হইয়া গেলে লজ্জা রাখিবার ঠাঁই রহিবে না, এই রাত্রে ঘর ছাড়িয়া নীচে আসার কোন কারণই দেওয়া যাইবে না, কিন্তু আগ্রহ সংবরণ করিতে পারিল না।

ধ্যানের কথা বন্দনা পুস্তকে পড়িয়াছে, ছবিতে দেখিয়াছে, কিন্তু ইহার পূর্বে কখনো চোখে দেখে নাই। নিঃশব্দ রাত্রির নিঃসঙ্গ অন্ধকারে সেই দৃশ্যই আজ তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। বিপ্রদাসের দুই চোখ মুদ্রিত, তাহার বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহ আসনের পরে স্তব্ধ হইয়া আছে, উপরের বাতির আলোটা তাহার মুখে, কপালে প্রতিফলিত হইয়া পড়িয়াছে—বিশেষ কিছুই নয়, হয়ত আর কোন সময়ে দেখিলে বন্দনার হাসিই পাইত, কিন্তু তন্দ্রাজড়িত চক্ষে এ মূর্তি আজ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া দিল। এইভাবে কতক্ষণ সে যে দাঁড়াইয়াছিল তাহার হুঁশ নাই, কিন্তু হঠাৎ যখন চৈতন্য হইল তখন পূর্বের আকাশ ফরসা হইয়া গেছে, এবং ভৃত্যের দল ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিল বলিয়া। ভাগ্য ভাল যে, ইতিমধ্যে জাগিয়া উঠিয়া কেহ তাহার সম্মুখে আসিয়া পড়ে নাই। আর সে অপেক্ষা করিল না, ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িতেই গভীর নিদ্রামগ্ন হইতে তাহার মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।

দ্বারে করাঘাত করিয়া অন্নদা ডাকিল, দিদি, বড্ড বেলা হয়ে গেল যে, উঠবেন না?

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া বাইরে আসিয়া দাঁড়াইল, বাস্তবিকই বেলা হইয়াছে, লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, এঁরা বোধ হয় আজও অপেক্ষা করে আছেন? একটু সকালে আমাকে তুলে দিলে না কেন? স্নান করে তৈরি হয়ে নিতে ত এক ঘণ্টার আগে পেরে উঠব না অন্নদা।

তাহার বিপন্ন মুখের পানে চাহিয়া অন্নদা হাসিয়া বলিল, ভয় নেই দিদি, আজ আর ওঁরা সবুর করতে পারেন নি,—শেষ করে নিয়েছেন—এখন যতক্ষণ খুশি স্নান করুন গে কেউ পেছু ডাকবে না।

শুনিয়া বন্দনা যেন বাঁচিয়া গেল। সেও হাসিমুখে কহিল, তোমাদের অনেক জিনিসই পছন্দ করিনে সত্যি, কিন্তু এটা করি। সকলের দল বেঁধে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে যে গেলবার পালা নেই এ মস্ত স্বস্তি।

অন্নদা বলিল, কিন্তু সকালে কি আপনার ক্ষিদে পায় না দিদি?

বন্দনা কহিল, একদিনও না। অথচ ছেলেবেলা থেকে নিত্যই খেয়ে আসচি। আচ্ছা যাই, আর দেরি করব না।—এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে নীচে বিপ্রদাসের সহিত তাহার দেখা হইল। সে কাছারি-ঘর হইতে কাজ সারিয়া বাহির হইতেছিল। বন্দনা নমস্কার করিল।

চা খাওয়া হলো?

হাঁ।

ওঁরা অপেক্ষা করতে পারলেন না, কিন্তু তোমারই—

বন্দনা থামাইয়া দিয়া কহিল, সেজন্যে ত অনুযোগ করিনি মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, মেজাজের বাহাদুরি আছে তা অস্বীকার করব না, কিন্তু দু বোনের মধ্যে প্রভেদটি যেন চন্দ্র-সূর্যির মত। শুনলাম নাকি শীঘ্রই যাচ্ছ বিলেতে শিক্ষাটা পাকা করে নিতে। যাও, ফিরে এসে একটা খবর দিয়ো, গিয়ে একবার মূর্তিটা দেখে আসব।

শুনিয়া বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, কিন্তু জবাব দিল না।

বিপ্রদাস কহিল, সে দেশে শুনেচি বেলা বারোটা পর্যন্ত লোককে ঘুমুতে হয়। কঠিন সাধনা। তোমাকে কিন্তু কষ্ট করে সাধতে হবে না, এদেশ থেকেই আয়ত্ত হয়ে রইল।

বন্দনা এবারও হাসিল, কিন্তু তেমনিই চুপ করিয়া বিপ্রদাসের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। নিতান্তই সাধাসিধে সাধারণ ভদ্র চেহারা। হাস্য-পরিহাসে স্নেহশীল, তাহাদেরই একজন। অথচ কাল রাত্রির নীরবতায়, নির্জন গৃহের মধ্যে স্তব্ধ-মৌন এই মূর্তিটিকে কি যে রহস্যাবৃত মনে হইয়াছিল এই দিবালোকে সেই কথা স্মরণ করিয়া তাহার কৌতুকের সীমা রহিল না।

মুখুয্যেমশাই, এঁরা কোথায়? কাউকে ত দেখচি নে?

বিপ্রদাস কহিল, তার মানে তাঁরা নেই। অর্থাৎ শ্বশুরমশাই এবং সস্ত্রীক ব্যারিস্টার মশাই—তিনজনেই গেছেন হাওড়ায় রেলওয়ে স্টেশনে—গাড়ি রিজার্ভ করতে।

বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, সস্ত্রীক ব্যারিস্টারমশাই করতে পারেন, কিন্তু বাবা করতে যাবেন কেন? তাঁর ছুটি শেষ হতে এখনো ত আট-দশ দিন বাকী আছে। তা ছাড়া আমাকে না বলে?

বিপ্রদাস কহিল, বলবার সময় পাননি, বোধ করি ফিরে এসেই বলবেন। সকালে বোম্বাইয়ের অফিস থেকে জরুরী তার এসেচে—মুখের ভাব দেখে সন্দেহ রইল না যে না গেলেই নয়।

কিন্তু আমি? এত শিগগির আমি যেতে যাব কেন?

বিপ্রদাসও সেই সুরে সুর মিলাইয়া কহিল, নিশ্চয়ই, যেতে যাবে কেন? আমিও ত ঠিক তাই বলি।

বন্দনা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসু-মুখে চাহিয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, বোনটিকে একটা তার করে দাও না,—দেওরটিকে সঙ্গে করে এসে পড়ুন। তোমাদের মিলবেও ভাল, অতিথি-সৎকারের দায় থেকে আমিও অব্যাহতি পেয়ে বাঁচব।

বন্দনা সভয়ে ব্যগ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, সে কি সম্ভব হতে পারে মুখুয্যেমশাই? মা কি কখনো এ প্রস্তাবে রাজী হবেন? আমাকে তিনি ত দেখতে পারেন না।

বিপ্রদাস কহিল, একবার চেষ্টা করেই দেখো না। বলত তার করার একটা ফরম পাঠিয়ে দিই,—কি বল?

বন্দনা উৎসুক-চক্ষে ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া শেষে কি ভাবিয়া বলিল, থাক গে মুখুয্যেমশাই, এ আমি পারব না।

তবে থাক।

আমি বরঞ্চ বাবার সঙ্গে না হয় চলেই যাই।

সেই ভাল, এই বলিয়া বিপ্রদাস চলিয়া গেল।

খাবার টেবিলের উপর পিতার টেলিগ্রামটা পড়িয়াছিল, বন্দনা খুলিয়া দেখিল সত্যই বোম্বাই অফিসের তার। অত্যন্ত জরুরী,—বিলম্ব করিবার জো নাই।

বন্দনা ঘরে গিয়া আরেকবার তোরঙ্গ গুছাইতে প্রবৃত্ত হইল।

বাবা তখনও ফিরেন নাই, ঘণ্টা-কয়েক পরে অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া কহিল, আপনার নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে দিদি, এই নিন!

আমার টেলিগ্রাম? সবিস্ময়ে হাতে লইয়া বন্দনা খুলিয়া দেখিল বলরামপুর হইতে মা তাহাকেই তার করিয়াছেন। সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন পিতার সহিত সে যেন কোনমতে ফিরিয়া না যায়। বৌমা দ্বিজুকে লইয়া রাত্রের গাড়িতে যাত্রা করিতেছে।

এগার

রাত্রের গাড়িতে আসিতেছে মেজদি এবং সঙ্গে আসিতেছেন দ্বিজদাস। বন্দনার আনন্দ ধরে না। সেদিন দিদির শ্বশুরবাড়িতে নিজের আচরণের জন্য সে মনে মনে বড় লজ্জিত ছিল, অথচ প্রতিকারের উপায় পাইতেছিল না। আজ অত্যন্ত অনিচ্ছাতেও তাহাকে পিতার

সঙ্গে বোম্বাইয়ে ফিরিয়া যাইতে হইত, অকস্মাৎ অভাবিত পথে এ সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। টেলিগ্রামের কাগজখানা বন্দনা অনেকবার নাড়াচাড়া করিল, অন্নদাকে পড়িয়া শুনাইল এবং উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিয়া রহিল পিতার জন্য—এই ছোট্ট কাগজখানি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিতে। বিপ্রদাস বাড়িতে নাই, খোঁজ লইয়া জানিল কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি বাহিরে গেছেন। এ ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে জানাইবার কিছুই নাই, তবু একবার বলিতেই হইবে। অথচ এই বলার ভাষাটা সে মনে মনে আলোচনা করিতে গিয়া দেখিল কোন কথাই তাহার মনঃপূত হয় না। আনন্দ-প্রকাশের সহজ রাস্তাটা যেন কখন বন্ধ হইয়া গেছে। বহুনিন্দিত জমিদার-জাতীয় এই কড়া ও গোঁড়া লোকটিকে তাহার শুরু হইতেই খারাপ লাগিয়াছিল, এখনো তিনি যথেষ্টই দুর্বোধ্য, তথাপি ধীরে ধীরে তাহার মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল। সে দেখিতেছিল এই মানুষটির আচরণ পরিমিত, কথা স্বল্প, ব্যবহার ভদ্র ও মিষ্ট, তবু কেমন একটা ব্যবধান তাঁহার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ প্রতি মুহূর্তেই অনুভব করা যায়। সকলের মাঝখানে থাকিয়াও সে সকলের হইতে দূরে বাস করে। আশ্রিত পরিজন, দাসী-চাকর, কর্মচারিবর্গ সকলে ইহাকে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে, কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশী করে ভয়। তাহাদের ভাবটা যেন এইরূপ—বড়বাবু অন্নদাতা, বড়বাবু রক্ষাকর্তা, বড়বাবু দুর্দিনের অবলম্বন, কিন্তু বড়বাবু কাহারও আত্মীয় নয়। পিতৃবিয়োগে তাঁহাকে দায় জানান যায়, কিন্তু পুত্রের বিবাহ-উৎসবে আহারের নিমন্ত্রণ করা চলে না। এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধটুকু তাহারা ভাবিতে পারে না।

কাল বন্দনা রান্নাঘরের দাসীটিকে সরল ও কিঞ্চিৎ নির্বোধ পাইয়া কথায় কথায় ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতেছিল, কিন্তু অনেক জেরা করিয়াও কেবল এইটুকুই বাহির করিতে পারিল যে, সে ইহার হেতু জানে না, শুধু সকলেই ভয় করে বলিয়া সে-ও করে। এবং অপরকে প্রশ্ন করিলেও বোধ করি এই উত্তরই মিলিত। মুখুয্যেপরিবারে এ যেন এক সংক্রামক ব্যাধি। সেদিন ট্রেনের মধ্যে দৈবাৎ সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটুকু অবলম্বন করিয়া বিপ্রদাসের বলিষ্ঠ প্রকৃতি বন্দনার কাছে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়াছে। গাড়ির মধ্যে সেদিন কাছে বসিয়া হাস্য-পরিহাসের কত কথাই হইয়া গেল, কিন্তু আজ মনেই হয় না সেই মানুষটিই এ-বাড়ির বড়বাবু।

হঠাৎ নীচে হইতে একটা গোলমাল উঠিল, কে একজন ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল তাহার পিতা রায়সাহেব স্টেশন হইতে ফিরিয়াছেন খোঁড়া হইয়া। বন্দনা জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল পাঞ্জাবের ব্যারিস্টার ও তদীয় পত্নী দুইজনে দুই বগল ধরিয়া সাহেবকে গাড়ি হইতে নীচে নামাইতেছেন। তাঁহার এক পায়ের জুতা-মোজা খোলা ও তাহাতে খান দুই-তিন ভিজা রুমাল জড়ানো। প্ল্যাটফর্মে ভিড়ের হুড়ামুড়িতে কে নাকি তাঁহার পায়ের উপর ভারী কাঠের বাক্স ফেলিয়া দিয়াছে। লোকজনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উপরে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল,—দারোয়ান ছুটিল ডাক্তার ডাকিতে,—ডাক্তার আসিয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়া ঔষধ দিল,—বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু কিছুদিনের জন্য তাঁহার চলা-হাঁটা বন্ধ হইল।

পরদিন বিকালে সতী আসিয়া পৌঁছিল, বন্দনা কলরবে অভ্যর্থনা করিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল মোটর হইতে অবতরণ করিতেছে শুধু মেজদি নয়, সঙ্গে আছেন শাশুড়ী—দয়াময়ী। উচ্ছ্বসিত আনন্দকলরোল নিবিয়া গেল, বন্দনা আড়ষ্টভাবে কোনমতে একটা প্রণাম সারিয়া লইয়া একধারে সরিয়া দাঁড়াইতেছিল ; কিন্তু দয়াময়ী কাছে আসিয়া আজ তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল আছ ত মা?

বন্দনা মাথা নাড়িয়া সায় দিল,—ভাল আছি। মা, হঠাৎ আপনি এসে পড়লেন যে?

দয়াময়ী বলিলেন, না এসে কি করি বল ত? আমার একটি পাগলী মেয়ে রাগ করে না খেয়ে চলে এসেচে, তাকে শান্ত করে বাড়ি ফিরিয়ে না নিয়ে গেলে নিজে শান্তি পাই কৈ মা?

বন্দনা কুণ্ঠিত হাস্যে কহিল, কি করে জানলেন আমি রাগ করে এসেচি?

দয়াময়ী বলিলেন, আগে ছেলেমেয়ে হোক, আমার মত তাদের মানুষ করে বড় করে তোল, তখন আপনিই বুঝবে মেয়ে রাগ করলে কি করে মায়ে জানতে পারে।

কথাগুলি তিনি এমন মিষ্টি করিয়া বলিলেন যে বন্দনা আর কোন জবাব না দিয়া হেঁট হইয়া এবার তাঁহার পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, বাবা বড় অসুস্থ মা।

অসুস্থ? কি হয়েচে তাঁর?

পায়ে আঘাত লেগে কাল থেকে শয্যাগত, উঠতে পারেন না। এই বলিয়া সে দুর্ঘটনার হেতু বিবৃত করিল।

দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন,—চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয়নি ত? চল ত কোন্ ঘরে তোমার বাবা আছেন আমাকে নিয়ে যাবে। আগে তাঁকে দেখে আসি গে, তারপরে অন্য কাজ। এই বলিয়া তিনি সতীকে সঙ্গে করিয়া বন্দনার পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া রায়সাহেবের ঘরে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার পায়ের বেদনা বিশেষ ছিল না, ইঁহাদের দেখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া নমস্কার করিলেন। দয়াময়ী হাত তুলিয়া প্রতিনমস্কার করিয়া সহাস্যে কহিলেন, বেইমশাই, পা ভাঙলো কি করে, কোথায় ঢুকেছিলেন?

সতী ও বন্দনা উভয়েই অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, রায়সাহেব নিরীহ মানুষ, প্রতিবাদের সুরে বুঝাইতে লাগিলেন যে, কোথাও ঢুকিবার জন্য নয়, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে বিনাদোষে এই দুর্গতি ঘটিয়াছে।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, যা হবার হয়েচে, এখন থাকুন দিন-কতক মেয়েদের জিম্মায় ঘরে বন্ধ। পাছে একটা মেয়েতে শাসন করে না উঠতে পারে তাই আর একটিকে টেনে আনলুম বেয়াই। দুজনে পালা করে দিন-কতক সেবা করুক।

রায়সাহেব তাহাই বিশ্বাস করিলেন এবং এই অনুগ্রহ ও সহানুভূতির জন্য বহু ধন্যবাদ দিলেন।

আবার দেখা হবে,—যাই এখন হাত-পা ধুই গে, এই বলিয়া বিদায় লইয়া দয়াময়ী নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় মোটরে আসিয়া পৌঁছিল দ্বিজদাস ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র—বাসুদেব। মেজদির ছেলেকে বন্দনা সেদিন দেখিতে পায় নাই। সে ছিল পাঠশালায় এবং তাহার ছুটির পূর্বেই বন্দনা বাড়ি হইতে চলিয়া আসিয়াছিল। পিতামহীকে ছাড়িয়া বাসু থাকে না, তাই সঙ্গে আসিয়াছে এবং তাঁহারি সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

কাকা পরিচয় করাইয়া দিলে বাসুদেব প্রণাম করিল। বন্দনার পায়ে জুতা দেখিয়া সে মনে মনে বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। আট-নয় বছরের ছেলে কিন্তু জানে সব।

বন্দনা সস্নেহে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে চিনতে পারলে না বাসু?

পেরেচি মাসীমা।

কিন্তু তুমি ত ছিলে তখন পাঁচ-ছ' বছরের ছেলে—মনে থাকবার ত কথা নয় বাবা?

তবু মনে আছে মাসীমা, তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলুম। আমাদের বাড়ি থেকে তুমি রাগ করে চলে গেলে, আমি ফিরে গিয়ে তোমাকে দেখতে পেলুম না।

রাগ করে চলে যাবার কথা তুমি কার কাছে শুনলে?

কাকাবাবু বলছিলেন ঠাকুরমাকে।

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাগ করার কথা আপনিই বা জানলেন কি করে?

দ্বিজদাস কহিল, শুধু আমিই নয়, বাড়ির সবাই জানে। তা ছাড়া আপনি লুকোবার

ত বিশেষ চেষ্টা করেন নি।

বন্দনা বলিল, সবাই আমার রাগ করাটাই জানে, তার কারণটা কি জানে?

দ্বিজদাস বলিল, সবাই না জানুক আমি জানি। রায়সাহেবকে একলা টেবিলে খেতে দেওয়া হয়েছিল বলে।

বন্দনা বলিল, কারণটা যদি তাই-ই হয়, আমার রাগ করাটা আপনি উচিত বিবেচনা করেন?

দ্বিজদাস কহিল, করি। যদিচ তাঁদেরও আর কোন উপায় ছিল না।

আপনি আমার বাবার সঙ্গে বসে খেতে পারেন?

পারি। কিন্তু দাদা বারণ করলে পারিনে।

পারেন না? কিন্তু আপনাকে বারণ করার অধিকার দাদার আছে মনে করেন?

দ্বিজদাস বলিল, সে তাঁর ব্যাপার, আমার নয়। আমার পক্ষে দাদার অবাধ্য হওয়া আমি অনুচিত মনে করি।

বন্দনা কহিল, যা কর্তব্য বলে বোঝেন তা করার কি আপনার সাহস নেই?

দ্বিজদাস ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, দেখুন এ ঠিক সাহস অ-সাহসের বিষয় নয়। স্বভাবতঃ আমি ভীতু লোক নই, কিন্তু দাদার প্রকাশ্য নিষেধ অবজ্ঞা করার কথা আমি ভাবতে পারিনে। ছেলেবেলায় বাবার অনেক কথা আমি শুনিনি, দণ্ডও পাইনি তা নয়, কিন্তু আমার দাদা অন্য প্রকৃতির মানুষ। তাঁকে কেউ কখন উপেক্ষা করে না।

উপেক্ষা করলে কি হয়?

কি হয় আমি জানিনে, কিন্তু আমাদের পরিবারে এ প্রশ্ন আজও ওঠেনি।

বন্দনা কহিল, মেজদির চিঠিতে জানি দেশের জন্যে আপনি অনেক কিছু করেন যা দাদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সে-সব করেন কি করে?

দ্বিজদাস কহিল, তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও তাঁর নিষেধের বিরুদ্ধে নয়। তা হলে পারতুম না।

বন্দনা মিনিট দুই-তিন নীরবে থাকিয়া কহিল, দিদির চিঠি থেকে আপনাকে যা ভেবেছিলুম তা আপনি নয়। এখন তাঁকে ভরসা দিতে পারব, তাঁদের ভয় নেই। আপনার স্বদেশ-সেবার অভিনয়ে মুখুয্যেবংশের বিপুল সম্পদের এক কণাও কোনদিন লোকসান হবে না। দিদি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।

দ্বিজদাস হাসিয়া বলিল, দিদির লোকসান হয় এই কি আপনি চান?

বন্দনা বিব্রত হইয়া কহিল, বাঃ—তা কেন চাইব। আমি চাই তাঁদের ভয় ঘুচুক, তাঁরা নির্ভয় হোন।

দ্বিজদাস কহিল, আপনার চিন্তা নেই, তাঁরা নির্ভয়েই আছেন। অন্ততঃ দাদার সম্বন্ধে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি, ভয় বলে কোন বস্তু তিনি আজও জানেন না। ও তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, তার মানে ভয় জিনিসটা সবটুকু বাড়ির সকলে মিলে আপনারাই ভাগ করে নিয়েচেন, তাঁর ভাগে আর কিছুই পড়েনি—এই ত!

শুনিয়া দ্বিজদাসও হাসিল, কহিল, অনেকটা তাই বটে। তবে আপনাকেও বঞ্চিত করা হবে না, সামান্য যা অবশিষ্ট আছে সেটুকু আপনিও পাবেন। তিন-চারদিন একসঙ্গে আছেন এখনও তাঁকে চিনতে পারেন নি?

বন্দনা কহিল, না। আপনার কাছ থেকে তাঁকে চিনতে শিখব আশা করে আছি।

দ্বিজদাস কহিল, তা হলে প্রথম পাঠ নিন। ঐ জুতোজোড়াটি খুলে ফেলুন।

চাকর আসিয়া বলিল, মা আপনাদের ওপরে ডাকচেন।

চলিতে চলিতে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ মা এসেছেন কেন?

দ্বিজদাস বলিল, প্রথম, কৈলাস-যাত্রা সম্বন্ধে মামীদের সঙ্গে পরামর্শ করা ; দ্বিতীয়, আপনাকে বলরামপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। দেখবেন যেন না বলে বসবেন না।

বন্দনা বলিল, আচ্ছা, তাই হবে।

দ্বিজদাস কহিল, মার সামনে আপনাকে মিস রায় বলা চলবে না। আপনি আমার বয়সে ছোট—বৌদিদির ছোট বোন—অতএব নাম ধরেই ডাকব। যেন রাগ করে আবার একটা কাণ্ড বাধাবেন না।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, না, রাগ করব কেন? আপনি আমার নাম ধরেই ডাকবেন। কিন্তু আপনাকে ডাকবো কি বলে?

দ্বিজদাস বলিল, আমাকে দ্বিজুবাবু বলেই ডাকবেন। কিন্তু দাদাকে মুখুয্যেমশাই বলা মানাবে না। তাঁকে সবাই বলে বড়দাদাবাবু,—আপনাকেও ডাকতে হবে বড়দাদা বলে। এই হ'ল আপনার দ্বিতীয় পাঠ।

কেন?

দ্বিজদাস বলিল, তর্ক করলে শেখা যায় না, মেনে নিতে হয়। পাঠ মুখস্থ হলে এর কারণ প্রকাশ করব,—কিন্তু এখন নয়।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই কিন্তু নিজে আশ্চর্য হবেন।

দ্বিজদাস বলিল, হলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু মা বৌদিদি এঁরা বড় খুশী হবেন। এটা সত্যিই দরকার।

আচ্ছা, তাই হবে।

সিঁড়ির একধারে জুতা খুলিয়া রাখিয়া বন্দনা দয়াময়ীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। পিছনে গেল দ্বিজদাস ও বাসুদেব। তিনি তোরঙ্গ খুলিয়া কি একটা করিতেছিলেন এবং কাছে দাঁড়াইয়া অন্নদা বোধ করি গৃহস্থলীর বিবরণ দিতেছিল। দয়াময়ী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া সহজ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার গা ধোয়া, কাপড় ছাড়া হয়েছে মা?

হাঁ মা, হয়েছে।

তা হলে একবার রান্নাঘরে যাও মা। এতগুলি লোকের কি ব্যবস্থা বামুনঠাকুর করচে জানিনে—আমিও আহ্নিকটা সেরে নিয়েই যাচ্ছি।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, তিনি সেদিকে দৃষ্টিপাতও করিলেন না, বলিলেন, দ্বিজুর শরীরটা ভালো নেই, সকালেও ও কিছু খেয়ে আসেনি। ওর খাবারটা যেন একটু শিগগির হয় মা। এই বলিয়া তিনি অন্নদাকে সঙ্গে করিয়া পূজার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন, বন্দনার উত্তরের জন্য অপেক্ষাও করিলেন না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি অসুখ করল?

দ্বিজদাস কহিল, সামান্য একটু জ্বরের মত।

কি খাবেন এ বেলা?

দ্বিজদাস কহিল, সাগু বার্লি ছাড়া যা দেবেন তাই।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, রান্নাঘরে যাব, শেষকালে কোন গোলযোগ ঘটবে না ত?

দ্বিজদাস বলিল, না। অন্নদাদিদি সেই পরিচয়ই বোধ হয় আপনার দিয়েছেন। ওঁর কথা মা কখন ঠেলতে পারেন না—ভারী ভালবাসেন। ম্লেচ্ছ অপবাদটা বোধ করি আপনার কাটল।

বন্দনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, খুব আশ্চর্যের কথা।

দ্বিজদাস স্বীকার করিয়া বলিল, হাঁ। ইতিমধ্যে আপনি কি করেছেন, অন্নদাদিদি কি কথা মাকে বলেছেন জানিনে কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি আপনার চেয়েও ঢের বেশী আমি নিজে। কিন্তু আর দেরি করবেন না, যান, খাবার ব্যবস্থা করুন গে। আবার দেখা হবে। এই বলিয়া

দুইজনেই মায়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বার

কৈলাস তীর্থযাত্রায় পথের দুর্গমতার বিবরণ শুনিয়া মামীরা পিছাইয়াছেন, দয়াময়ীর নিজেরও বিশেষ উৎসাহ দেখা যায় না, তথাপি তাঁহার কলিকাতায় কাটিল পাঁচ-ছয়দিন দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট ও গঙ্গাস্নান করিয়া। কাজের লোকের হাতেই কাজের ভার পড়ে, এ বাটীর প্রায় সমস্ত দায়িত্বই আসিয়া ঠেকিয়াছে বন্দনার কাছে। সতী কিছুই করে না, সকল ব্যাপারে বোনকে দেয় আগাইয়া, নিজে বেড়ায় শাশুড়ীর সঙ্গে ঘুরিয়া। তবু কোথাও বাহির হইতে হইলে তাহাকে ডাক দিয়া বলে, বন্দনা, আয় না ভাই আমাদের সঙ্গে। তুই সঙ্গে থাকলে কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেসা করতে হয় না।

বিপ্রদাসেরও আজ কাল করিয়া বাড়ি যাওয়া ঘটে নাই, মা কেবলি বাধা দিয়া বলেন, বিপিন চলিয়া গেলে তাঁহাকে বাড়ি লইয়া যাইবে কে? সেদিন সন্ধ্যায় তিনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখিয়া ফিরিয়া আসিলেন, বিপ্রদাসকে ডাকাইয়া আনিয়া উত্তেজনার সহিত বলিতে লাগিলেন, বিপিন, তুই যাই বলিস, বাবা, লেখাপড়া জানা মেয়েদের ধরনই আলাদা।

বিপ্রদাস বুঝিল, এ বন্দনার কথা। জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে মা?

দয়াময়ী বলিলেন, কি হয়েছে? আজ মস্ত একটা লালমুখো সার্জেন এসে আমাদের গাড়ি আটকালে। ভাগ্যে মেয়েটা সঙ্গে ছিল, ইংরিজিতে কি দু'কথা বুঝিয়ে বললে, সাহেব তক্ষনি গাড়ি ছেড়ে দিলে। নইলে কি হ'ত বল ত? হয়ত সহজে ছাড়ত না, নয়ত থানায় পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেত—কি বিভ্রাটই ঘটত! তোর নতুন পাঞ্জাবী ড্রাইভারটা যেন জন্তু।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, কি করেছিলে তোমরা—ধাক্কা লাগিয়েছিলে?

বন্দনা আসিয়া দাঁড়াইল। দয়ামযী ঘাড় নাড়িয়া সায় দিয়া উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে কহিলেন, তোমার কথা বিপিনকে তাই বলছিলুম মা, লেখাপড়া জানা মেয়েদের ধরনই আলাদা! তুমি সঙ্গে না থাকলে সবাই আজ কি বিপদেই পড়তুম। কিন্তু সমস্ত দোষ সেই মেমবেটির। চালাতে জানে না তবু চালাবে। জানে না—তবু বাহাদুরি করবে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, লেখাপড়া জানা মেয়েদের ধরনই ঐ রকম মা। মেমসাহেব নিশ্চয়ই লেখাপড়া জানে।

মা ও বন্দনা দুজনেই হাসিলেন। বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই, সেটা মেমসাহেবের দোষ, লেখাপড়ার নয়। মা, আমি রান্নাঘরটা একবার ঘুরে আসি গে। কাল দ্বিজুবাবুর আটার রুটি ঠাকুর শক্ত করে ফেলেছিল, তাঁর খাবার সুবিধে হয়নি। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দয়াময়ী স্নেহের চক্ষে সেই দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, সকল দিকে দৃষ্টি আছে। কেবল লেখাপড়াই নয় বিপিন, মেয়েটা জানে না এমন কাজ নেই। আর তেমনি মিষ্টি কথা। ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি—সংসারের কিচ্ছুটি চেয়ে দেখতে হয় না।

বিপ্রদাস কহিল, ম্লেচ্ছ বলে আর ঘেন্না কর না ত মা?

দয়ামযী বলিলেন, তোর এক কথা! ম্লেচ্ছ হতে যাবে কিসের জন্যে,—ওর মা একবার বিলেত গিয়েছিল বলেই লোকে মেমসাহেব বলে দুর্নাম রটালে। নইলে আমাদের মতই বাঙালী ঘরের মেয়ে। বন্দনা জুতো পরে—তা পরলেই বা! বিদেশে অমন সবাই পরে। লোকজনের সামনে বার হয়—তাতেই বা দোষ কি? বোম্বায়ে ত আর ঘোমটা দেওয়া নেই—ছেলেবেলা থেকে যা শিখেচে তাই করে। আমার যেমন বৌমা তেমনি ও। বাপের সঙ্গে চলে যাবে বলচে—শুনলে মন কেমন করে বাবা।

বিপ্রদাস কহিল, মন কেমন করলে চলবে কেন মা? বন্দনা থাকতে আসেনি,—দুদিন পরে ওকে যেতে ত হবেই।

দয়ামযী কহিলেন, যাবে সত্যি, কিন্তু ছেড়ে দিতে মন চায় না,—ইচ্ছে করে চিরকাল ধরে রেখে দিই।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, সে ত আর সত্যিই হবার জো নেই মা—পরের মেয়েকে অত জড়িও না। দুদিনের জন্যে এসেছে সেই ভালো। এই বলিয়া সে কিছু অন্যমনস্কের মত বাহিরে চলিয়া গেল।

কথাটা দয়াময়ীর বেশ মনঃপূত হইল না। কিন্তু সে ক্ষণকালের ব্যাপার মাত্র। বলরামপুরে ফিরিবার কেহ নাম করেন না, তাঁহাদের দিনগুলো কাটিতে লাগিল যেন উৎসবের মত—হাসিয়া গল্প করিয়া এবং চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া। সকলের সঙ্গেই হাস্য-পরিহাসে এতটা হালকা হইতে দয়াময়ীকে ইতিপূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই,—তাঁহার অন্তরে কোথায় যেন একটা আনন্দের উৎস নিরন্তর প্রবাহিত হইতেছিল, তাঁহার বয়স ও প্রকৃতিসিদ্ধ গাম্ভীর্যকে সেই স্রোতে মাঝে মাঝে যেন ভাসাইয়া দিতে চায়। সতীর সঙ্গে আভাসে-ইঙ্গিতে প্রায়ই কি কথা হয়, তাহার অর্থ শুধু শাশুড়ী-বধূই বুঝে, আরও একজন হয়ত কিছু-একটা অনুমান করে সে অন্নদা। সস্ত্রীক পাঞ্জাবের ব্যারিস্টারসাহেব এতদিন থাকিয়া কাল বাড়ি গেছেন, তাঁহাদের উভয়ের নামই বসন্ত, এই লইয়া দয়াময়ী যাইবার সময়ে কৌতুক করিয়াছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইয়াছেন যে, কর্মস্থলে ফিরিবার পূর্বে আবার দেখা দিয়া যাইতে হইবে। হয় কলিকাতায়, নয় বলরামপুরে। রায়সাহেবের পা ভাল হইয়াছে, আগামী সপ্তাহে তিনি বোম্বাই যাত্রা করিবেন, দয়াময়ী নিজে দরবার করিয়া বন্দনার কিছুদিনের ছুটি মঞ্জুর করাইয়া লইয়াছেন, সে যে বোম্বায়ের পরিবর্তে বলরামপুরে গিয়া অন্ততঃ আরও একটা মাস দিদির কাছে অবস্থান করিবে এ ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে।

মুখুয্যেদের মামলা-মকদ্দমা হাইকোর্টে লাগিয়াই থাকে, একটা বড়রকম মামলার তারিখ নিকটবর্তী হইতেছিল, তাই বিপ্রদাস স্থির করিল আর বাড়ি না গিয়া এই দিনটা পার করিয়া দিয়া সকলকে লইয়া দেশে ফিরিবে। নানা কাজে তাহাকে সর্বদাই বাহিরে থাকিতে হয়, আজ ছিল রবিবার, দয়াময়ী আসিয়া হাসিমুখে বলিলেন, একটা মজার কথা শুনেচিস বিপিন?

বিপ্রদাস আদালতের কাগজ দেখিতেছিল, চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, কি কথা মা?

দয়াময়ী বলিলেন, দ্বিজুদের কি-একটা হাঙ্গামার মিটিং ছিল আজ, পুলিশে হতে দেবে না, আর ওরা করবেই। লাঠালাঠি মাথা ফাটাফাটি হ'তই, শুনে ভয়ে মরি—

সে গেছে নাকি?

না। সেই কথাই ত তোকে বলতে এলুম। কারও মানা শুনবে না, এমন কি ওর বৌদিদির কথা পর্যন্তও না, শেষে শুনতে হ'ল বন্দনার কথা।

খবরটা যত মজারই হোক মায়ের সুপরিচিত মর্যাদায় কোথায় যেন একটু ঘা দিল। বিপ্রদাস মনে মনে বিস্মিত হইয়াও মুখে শুধু বলিল, সত্যি নাকি?

দয়াময়ী হাসিয়া জবাব দিলেন, তাই ত হ'ল দেখলুম। কবে নাকি ওদের শর্ত হয়েছিল এখানে একজন জুতো পরবে না, চাল-চলনে এ বাড়ির নিয়ম লঙ্ঘন করবে না, আর তার বদলে অন্যজনকে তার অনুরোধ মেনে চলতে হবে। বন্দনা ওর ঘরে ঢুকে শুধু বললে, দ্বিজুবাবু, শর্ত মনে আছে ত? আপনি কিছুতে আজ যেতে পাবেন না। দ্বিজু স্বীকার করে বললে বেশ তাই হবে, যাব না। শুনে আমার ভাবনা ঘুচল বিপিন। কি করে আসবে, কি ফ্যাসাদ বাধবে—কর্তা বেঁচে নেই, কি ভয়ে ভয়েই যে ওকে নিয়ে থাকি তা বলতে পারিনে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। মা বলিতে লাগিলেন, আগে তবু ওর ইস্কুল-কলেজ, পড়াশুনা, একজামিন-পাস করা ছিল, এখন সে বালাই ঘুচেছে, হাতে কাজ না থাকলে বাইরের কোন ঝঞ্ঝাট যে কখন ঘরে টেনে আনবে তা কেউ বলতে পারে না। ভাবি, শেষ পর্যন্ত এত বড় বংশের ও একটা কলঙ্ক হয়ে না দাঁড়ায়।

বিপ্রদাস হাসিয়া ঘাড় নাড়িল, কহিল, না, মা সে ভয় ক'র না, দ্বিজু কলঙ্কের কাজ কখনো করবে না।

মা বলিলেন, ধর যদি হঠাৎ একটা জেল হয়েই যায়? সে আশঙ্কা কি নেই?

বিপ্রদাস কহিল, আশঙ্কা আছে মানি, কিন্তু জেলের মধ্যে ত কলঙ্ক নেই মা, কলঙ্ক আছে কাজের মধ্যে। তেমন কাজ সে কোনদিন করবে না। ধর যদি আমারি কখন জেল হয়,—হতেও ত পারে, তখন কি আমার জন্যে তুমি লজ্জা পাবে মা? বলবে কি বিপিন আমার বংশের কলঙ্ক?

কথাটা দয়াময়ীকে শূল-বিদ্ধ করিল। কি জানি কোন নিহিত ইঙ্গিত নাই ত? এই ছেলেটিকে বুকে করিয়া এতবড় করিয়াছেন, বেশ জানিতেন, সত্যের জন্য, ধর্মের জন্য বিপ্রদাস পারে না এমন কাজ নাই। কোন বিপদ, কোন ফলাফলই সে গ্রাহ্য করে না অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে। যখন তাহার মাত্র আঠারো বৎসর বয়স তখন একটি মুসলমান-পরিবারের পক্ষ লইয়া সে একাকী এমন কাণ্ড করিয়াছিল যে কি করিয়া প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারিল তাহা আজও দয়াময়ীর সমস্যার ব্যাপার। বন্দনার মুখে সেদিনকার ট্রেনের ঘটনা শুনিয়া তিনি শঙ্কায় একেবারে নির্বাক হইয়া গিয়াছিলেন। দ্বিজুর জন্য তাঁহার উদ্বেগ আছে সত্য, কিন্তু অন্তরের ঢের বেশী ভয় আছে তাঁহার এই বড় ছেলেটির জন্য। মনে মনে ঠিক এই কথাই ভাবিতেছিলেন। বিপ্রদাস কহিল, কেমন মা, কলঙ্কের দুর্ভাবনা গেল ত? জেল হঠাৎ একদিন আমারও হয়ে যেতে পারে যে!

দয়াময়ী অকস্মাৎ ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, বালাই ষাট! ও-সব অলুক্ষণে কথা তুই বলিস নে বাবা। তার পরেই কহিলেন, জেল হবে তোর আমি বেঁচে থাকতে? এতদিন ঠাকুর-দেবতাকে ডেকেচি তবে কেন? এত সম্পত্তি রয়েচে কিসের জন্যে? তার আগে সর্বস্ব বেচে ফেলব, তবু এ ঘটতে দেব না, বিপিন।

বিপ্রদাস হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইল, দয়াময়ী সহসা তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া কহিলেন, দ্বিজুর যা হয় তা হোক গে, কিন্তু তুই আমার চোখের আড়াল হলে আমি গঙ্গায় ডুবে মরব বিপিন। এ সইতে আমি পারব না, তা জেনে রাখিস। বলিতে বলিতে কয়েক ফোঁটা জল তাঁহার চোখ দিয়া গড়াইয়া পড়িল।

মা, এ বেলা কি—, বলিতে বলিতে বন্দনা ঘরে ঢুকিল। দয়াময়ী তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিলেন, বন্দনার বিস্মিত মুখে প্রতি চাহিয়া সহাস্যে কহিলেন, ছেলেটাকে অনেকদিন বুকে করিনি তাই একটু সাধ হ'ল নিতে।

বন্দনা কহিল, বুড়ো ছেলে—আমি কিন্তু সকলকে বলে দেব।

দয়াময়ী প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, তা দিও কিন্তু বুড়ো কথাটি মুখে এনো না মা। এই ত সেদিনের কথা, বিয়ের কনে উঠানে এসে দাঁড়িয়েচি, আমার পিসশাশুড়ী তখনও বেঁচে, বিপিনকে আমার কোলে ফেলে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার বড়ছেলে বৌমা। কাজকর্মের ভিড়ে অনেকক্ষণ কিছু খেতে পায়নি—আগে খাইয়ে ওকে ঘুম পাড়াও গে, তার পরে হবে অন্য কাজ। তিনি বোধ হয় দেখতে চাইলেন আমি পারি কিনা—কি জানি পেরেচি কিনা! এই বলিয়া তিনি আবার হাসিলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি তখন কি করলেন মা?

দয়াময়ী বলিলেন, ঘোমটার ভেতর থেকে চেয়ে দেখি একতাল সোনা দিয়ে গড়া জ্যান্ত পুতুল, বড় বড় চোখ মেলে আশ্চর্য হয়ে আমার পানে তাকিয়ে আছে। বুকে করে নিয়ে দিলুম ছুট। আচার-অনুষ্ঠান তখন অনেক বাকী, সবাই হৈচৈ করে উঠলো, আমি কিন্তু কান দিলুম না। কোথায় ঘর, কোথায় দোর চিনিনে—যে দাসীটি সঙ্গে দৌড়ে এসেছিল সে ঘর দেখিয়ে দিলে, তাকেই বললুম, আন ত ঝি আমার খোকার দুধের বাটি, ওকে না খাইয়ে আমি এক পা নড়ব না। সেদিন পাড়া-প্রতিবেশী মেয়েরা কেউ বললে বেহায়া, কেউ বললে আরো কত কি, আমি কিন্তু গ্রাহ্যই করলুম না। মনে মনে বললুম, বলুক গে ওরা। যে রত্ন কোলে পেলুম তাকে ত আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আমার সেই

ছেলেকে তুমি বল কিনা বুড়ো!

ত্রিশ বৎসর পূর্বের ঘটনা স্মরণ করিতে অশ্রুজলে ও হাসিতে মিশিয়া মুখখানি তাঁহার বন্দনার চোখে অপূর্ব হইয়া দেখা দিল, অকৃত্রিম স্নেহের সুগভীর তাৎপর্য এমন করিয়া উপলব্ধি করার সৌভাগ্য তাহার আর কখন ঘটে নাই। অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া সে আপনাকে সামলাইয়া লইল, হাসিয়া বলিল, মা, আপনার দুটি ছেলের কোন্‌টিকে বেশী ভালবাসেন সত্যি করে বলুন ত?

শুনিয়া দয়াময়ী হাসিলেন, বলিলেন, অসম্ভব সত্যি হলেও বলতে নেই মা, শাস্ত্রে নিষেধ আছে।

বন্দনা বাহিরের লোক, সবেমাত্র পরিচয় হইয়াছে, ইহার সম্মুখে এই-সকল পূর্বকথার আলোচনায় বিপ্রদাস অস্বস্তিবোধ করিতেছিল, কহিল, বললেও তুমি বুঝবে না বন্দনা, তোমার কলেজের ইংরিজি পুঁথির মধ্যে এ-সব তত্ত্ব নেই ; তার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করতে গিয়ে মায়ের কথা তোমার ভারী অদ্ভুত ঠেকবে। এ আলোচনা থাক।

শুনিয়া বন্দনা খুশী হইল না, কহিল, ইংরিজি পুঁথি আপনিও ত কম পড়েন নি মুখুয্যেমশাই, আপনিই বা তবে বোঝেন কি করে?

বিপ্রদাস বলিল, কে বললে মাকে আমরা বুঝি বন্দনা,—বুঝিনে। এ-সব তত্ত্ব শুধু আমার এই মায়ের পুঁথিতেই লেখা আছে—তার ভাষা আলাদা, অক্ষর আলাদা, ব্যাকরণ আলাদা। সে কেবল উনি নিজেই বোঝেন—আর কেউ না। হাঁ মা, যা বলতে এসেছিল সে ত এখনও বললে না?

বন্দনা বুঝিল এ ইঙ্গিত তাহাকে। কহিল, মা, এ-বেলার রান্নার কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করিতে এসেছিলুম—আমি যাই, কিন্তু আপনিও একটু শীঘ্র করে আসুন। সব ভুলে গিয়ে আবার যেন ছেলে কোলে করে বসে থাকবেন না। এই বলিয়া বিপ্রদাসকে সে একটু কটাক্ষ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে দয়াময়ীর মুখের পরে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়িল, ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিধার কণ্ঠে কহিলেন, বিপিন তুই ত খুব ধার্মিক, জানিস ত বাবা, মাকে কখনও ঠকাতে নেই!

বিপ্রদাস বলিল, দোহাই মা, অমন করে তুমি ভূমিকা ক'র না। কি জিজ্ঞাসা করবে কর।

দয়ামযী কহিলেন, তুই হঠাৎ আজ ও-কথা বললি কেন যে তোরও জেল হতে পারে? কৈলাসে যাবার সঙ্কল্প এখনও ত্যাগ করিনি বটে, কিন্তু আর ত আমি এক পাও নড়তে পারব না বিপিন।

বিপ্রদাস হাসিয়া ফেলিল, কহিল, কৈলাসে পাঠাতে আমিও ব্যস্ত নই মা, কিন্তু সে দোষ আমার ঘাড়ে শেষকালে যেন চাপিও না। ওটা শুধু একটা দৃষ্টান্ত,—দ্বিজুর কথায় তোমাকে বোঝাতে চেয়েছিলুম যে কেবল জেলে যাবার জন্যই কারও বংশে কলঙ্ক পড়ে না।

দয়াময়ী মাথা নাড়িলেন—ওতে আমি ভুলব না বিপিন। এলোমেলো কথা বলার লোক তুই নয়—হয় কি করেচিস, নয় কি-একটা করার মতলবে আছিস। আমাকে সত্যি করে বল।

বিপ্রদাস কহিল, তোমাকে সত্যি করেই বলচি আমি কিছুই করিনি। কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে কত রকমের মতলব আনাগোনা করে তার কি কোন সঠিক নির্দেশ দেওয়া চলে মা?

দয়াময়ী পূর্বের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, না, তাও না। নইলে তোকে দেখলেই কেন আজকাল আমার এমন মন-কেমন করে? তোকে মানুষ করেচি, আমি বেঁচে থাকতেই

শেষকালে এতবড় নেমকহারামি করবি বাবা? বলিতে বলিতেই তাঁহার দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বিপ্রদাস বিপন্ন হইয়া বলিল, অমঙ্গল কল্পনা করে যদি তুমি মিথ্যে ভয় পাও মা, আমি তার কি প্রতিকার করতে পারি বল? তুমি ত জান তোমার অমতে কখন একটা কাজও আমি করিনে।

দয়াময়ী কহিলেন, কর না সত্যি, কিন্তু কাল দ্বিজুকে ডেকে পাঠিয়ে কেন বলেচ কাজকর্ম সমস্ত বুঝে নিতে?

বড় হল, আমাকে সাহায্য করবে না?

দয়াময়ী রাগ করিয়া বলিলেন, ওর কতটুকু শক্তি? আমাকে ভোলাস নে বিপিন তুই আজ এত ক্লান্ত যে তোর প্রয়োজন হল ওর সাহায্য নেবার? কি তোর মনে আছে আমাকে খুলে বল?

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল, এ কথা বলিল না যে, তিনি নিজেই এইমাত্র দ্বিজদাসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে তাহাকে বলিতেছিলেন। কিন্তু ইহারই আভাস পাওয়া গেল দয়াময়ীর পরবর্তী কথায়। বলিতে লাগিলেন, আমাদের এ পুণ্যের সংসার, ধর্মের পরিবার, এখানে অনাচার সয় না। আমাদের বাড়ি নিয়মের কড়াকড়িতে বাঁধা। তোর বিয়ে দিয়েছিলুম আমি সতেরো বছর বয়সে,—সে তোর মত নিয়ে নয়,—আমাদের সাধ হয়েছিল বলে। কিন্তু দ্বিজু বলে, সে বিয়ে করবে না। ও এম. এ. পাস করেছে, ওর ভাল-মন্দ বোঝবার শক্তি হয়েছে, ওর ওপর কারও জোর খাটবে না। সে যদি সংসারী না হয় তাকে আমার বিশ্বাস নেই, আমার শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তিতে সে যেন হাত দিতে না আসে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজু কবে বললে সে বিয়ে করবে না?

প্রায়ই ত বলে। বলে, বিয়ে করবার লোক অনেক আছে, তারা করুক। ও করবে শুধু দেশের কাজ। তোরা ভাবিস এখানে এসে পর্যন্ত আমি দিনরাত ঘুরে বেড়াই,—খুব মনের সুখে আছি। কিন্তু সুখে আমি নেই। এর ওপর তুই দিলি আজ জেলের দৃষ্টান্ত—যেন আমাকে বোঝাবার আর কোন দৃষ্টান্তই তোর হাতে ছিল না। একদিন কিন্তু টের পাবি বিপিন।

বিপ্রদাস কহিল, ওর বৌদিদিকে হুকুম করতে বল না মা?

তার কথাও সে শুনবে না।

শুনবে মা, শুনবে। সময় হলেই শুনবে। একটু হাসিয়া কহিল, আর যদি আমাকে আদেশ কর ত তার পাত্রীর সন্ধান করতে পারি।

বন্দনা আসিয়া ঘরে ঢুকিল, অনুযোগের সুরে কহিল, কৈ এলেন না ত? আমি কতক্ষণ ধরে বসে আছি মা!

চল মা, যাচ্ছি।

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের অক্ষয়বাবুর সেই মেয়েটিকে তোমার মনে আছে মা? এখন সে বড় হয়েচে। মেয়েটি যেমন রূপে তেমনি গুণে। আমাদেরই স্ব-ঘর, বল ত গিয়ে দেখে আসি, কথাবার্তা বলি। আমার বিশ্বাস দ্বিজুর অপছন্দ হবে না।

না না, সে এখন থাক,—বলিয়া দয়াময়ী পলকের জন্য একবার বন্দনার মুখের পানে চাহিয়া দেখিলেন, বলিলেন, সতীর ইচ্ছে, না—না বিপিন, বৌমাকে জিজ্ঞেসা না করে সে-সব কিছু করে কাজ নেই।

বন্দনা কথা কহিল। সুন্দর শান্ত চোখে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, তাতে দোষ কি মা? এই ত কলকাতায়, চলুন না দিদিকে নিয়ে আমরা গিয়ে দেখে আসি গে।

শুনিয়া দয়াময়ী বিব্রত হইয়া পড়িলেন, কি যে জবাব দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না।

বিপ্রদাস কহিল, এ উত্তম প্রস্তাব মা। অক্ষয়বাবু স্বধর্মনিষ্ঠ পণ্ডিত ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতের অধ্যাপক। মেয়েকে ইস্কুল-কলেজ থেকে পাস করান নি বটে, কিন্তু যত্ন করে শিখিয়েছেন

অনেক। একদিন তাঁদের ওখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিল, সেদিন মেয়েটিকে জিজ্ঞেসা করেছিলুম আমি অনেক কথা। মনে হয়েছিল, বাপ সাধ করে মেয়ের নামটি যে রেখেছিলেন মৈত্রেয়ী তা অসার্থক হয়নি। যাও না মা, গিয়ে একবার তাকে দেখে আসবে—তোমার বড়বৌ অন্ততঃ মনে মনে স্বীকার করবেন তিনি ছাড়াও সংসারে রূপসী মেয়ে আছে।

মা হাসিতে চাহিলেন, কিন্তু হাসি আসিল না, মুখে কথাও যোগাইল না,—বন্দনা পুনশ্চ অনুরোধ করিল, চলুন না মা, আমরা গিয়ে একবার মৈত্রেয়ীকে দেখে আসি গে? বেশী দূর ত নয়।

দয়াময়ী চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখের পরে এখন সে লাবণ্য আর নাই, যেন ছায়ায় ঢাকা দিয়াছে। এইবার, এতক্ষণে তিনি জবাব খুঁজিয়া পাইলেন, কহিলেন, না মা, দূর বেশী নয় জানি, কিন্তু সে সময়ও আমার নেই। চল আমরা যাই,—এ বেলায় কি রান্না হবে দেখি গে। এই বলিয়া তিনি তাহার হাত ধরিয়া ঘর হইতে বাহিরে গেলেন।

তের

সন্ধ্যা-বন্দনা সারিয়া বিপ্রদাস সেইমাত্র নিজের লাইব্রেরিঘরে আসিয়া বসিয়াছে; সকালের ডাকে যে-সকল দলিলপত্র বাড়ি হইতে আসিয়াছে সেগুলা দেখা প্রয়োজন, এমনি সময়ে মা আসিয়া প্রবেশ করিলেন,—হাঁ রে, বিপিন, তুই কি বাড়িয়েই বলতে পারিস!

বিপ্রদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—কিসের মা?

অক্ষয়বাবুর মেয়ে মৈত্রেয়ীকে আমরা যে দেখে এলুম।

মেয়েটি কি মন্দ?

দয়ামরী একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন, না মন্দ বলিনে,—সচরাচর এমন মেয়ে চোখে পড়ে না সে সত্যি,—কিন্তু তাই বলে আমার বৌমার সঙ্গে তার তুলনা করলি? বৌমার কথা যাক, কিন্তু রূপে বন্দনার কাছেই কি সে দাঁড়াতে পারে?

বিপ্রদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, তবে বুঝি তোমরা আর কাউকে দেখে এসেচ। সে মৈত্রেয়ী নয়।

দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, তাই বটে। আমাদের সঙ্গে তার কত কথা হলো, কি যত্ন করেই না সে বৌমাদের খাওয়ালে—তার পরে কত বই, কত লেখাপড়ার কথাবার্তা বন্দনার সঙ্গে তার হলো, আর তুই বলিস আমরা আর কাকে দেখে এসেচি!

বিপ্রদাস বলিল, বন্দনার সব প্রশ্নের সে হয়ত জবাব দিতে পারেনি, কিন্তু মা, লেখাপড়ায় বন্দনা ইস্কুল-কলেজে কত বই পড়ে কতগুলো পরীক্ষা পাস করেচে, আর তার শুধু বাপের কাছে ঘরে বসে শেখা। এই যেমন আমার সঙ্গে তোমার ছোটছেলের তফাত।

শুনিয়া দয়াময়ীর দুই চোখ কৌতুকে নাচিয়া উঠিল,—চুপ কর বিপিন, চুপ কর। দ্বিজু ও-ঘরে আছে, শুনতে পেলে লজ্জায় বাড়ি ছেড়ে পালাবে। একটু থামিয়া বলিলেন, তোর মা মুখ্যু বলে কি এতই মুখ্যু যে কলেজের পাস করাকেই চতুর্বর্গ্য ভাববে? তা নয় রে, বরঞ্চ ছোট্ট ছোট্ট কথায় মিষ্টি করে সে বন্দনার সকল কথারই জবাব দিয়েছে। গাড়িতে আসতে মেয়েটির কত প্রশংসাই বন্দনা করলে। কিন্তু আমি বলি আমাদের গেরস্ত-ঘরে দরকার কি বাপু অত লেখাপড়ায়? আমার একটি বৌ যেমন হয়েছে আর একটি তেমনি হলেই আমার চলে যাবে। নইলে বিদ্যের গুমরে সে যে মনে মনে গুরুজনদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে সে হবে না।

বিপ্রদাস বুঝিল জেরার জবাবটা মায়ের এলোমেলো হইয়া যাইতেছে, হাসিয়া কহিল, সে ভয় করো না মা। বিদ্যে যাদের কম, গুমর হয় তাদেরই বেশি। ও বাপের কাছে যদি সত্যি সত্যিই কিছু শিখে থাকে আচার-আচরণে সকলের নীচু হয়েই থাকবে তুমি দেখ।

যুক্তিটা মা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, বলিলেন, এ কথা তোর সত্যি, কিন্তু আগে

থেকে জানব কি করে বল? তা ছাড়া, আমাদের পাড়াগাঁয়ে বিদ্যের কমবেশি কেউ যাচাই করতে আসে না, কিন্তু বৌ দেখতে এসে সকলে যে নাক তুলে বলবে বুড়ো-মাগীর কি চোখ ছিল না যে অমন বৌয়ের পাশে এই বৌ এনে দাঁড় করালে! এ আমার সইবে না বাবা।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে ত একটা জবাব দিতে হবে মা! সেদিন তাঁকে ভরসা দিয়েছিলুম, আমার মায়ের বোধ হয় অমত হবে না।

শুনিয়া দয়াময়ী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, ও-কথা না বললেই ভাল হত বিপিন। তা সে যাই হোক, বৌমার কি ইচ্ছে আগে শুনি, তার পরে তাঁকে বললেই হবে।

বিপ্রদাস কহিল, অক্ষয়বাবু আমাদের নিতান্ত পর নয়। এতদিন পরিচয় ছিল না বলেই তা প্রকাশ পায়নি। কিন্তু আত্মীয়তার জন্যেও বলিনে, কিন্তু তোমার আর-এক ছেলের যখন বিয়ে দিয়েছিলে, নিজের ইচ্ছাতেই দিয়েছিলে, অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করতে যাওনি। আর এর বেলাতেই কি যত মত-জানাজানির দরকার হল মা?

তর্কে হারিয়া হাসিমুখে বলিলেন, কিন্তু এখন যে বুড়ো হয়েছি বাবা, আর কতকাল বাঁচব বল ত? কিন্তু চিরকাল যাকে নিয়ে ঘর করতে হবে তার মত না নিয়ে কি বিয়ে দিতে পারি? না না, দুদিন আমাদের তুই ভাবতে সময় দে। এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। বাহিরে আসিয়া দয়াময়ী নিজের ঘরের দিকে না গিয়া বেহাইয়ের ঘরের উদ্দেশে চলিলেন। এই কয় দিনের ঘনিষ্ঠতায় বন্দনার পিতার কাছে তাঁহার অনেকটা সঙ্কোচ কাটিয়া গিয়াছিল,—প্রায়ই নিজে আসিয়া তাঁহার তত্ত্ব লইয়া যাইতেন—এদিকে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, আহ্নিকে বসিলে শীঘ্র উঠিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন,—কেমন আছেন—

কথাটা সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। ঘরের অপর প্রান্তে বসিয়া একটি সুদর্শন যুবক বন্দনার সহিত মৃদুকণ্ঠে গল্প করিতেছিল, নিখুঁত সাহেবি পোশাকের এই অপরিচিত লোকটির সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়ায় দয়াময়ী সলজ্জে পিছাইয়া যাইবার উপক্রমেই রায়সাহেব বলিয়া উঠিলেন, কোথায় পালাচ্চেন বেয়ান, ও যে আমাদের সুধীর। ওকে লজ্জা কিসের? ও ত বিপ্রদাস দ্বিজদাসের মতই আপনার ছেলে। আমার অসুখের খবর পেয়ে মাদ্রাজ থেকে দেখতে এসেচে। সুধীর, ইনি বন্দনার দিদির শাশুড়ী—বিপ্রদাসের মা, এঁকে প্রণাম কর।

সুধীরের প্রণাম করার হয়ত অভ্যাস নাই, ও-পোশাকে করাও কঠিন, সে কাছে আসিয়া মাথা নোয়াইয়া কোনমতে আদেশ পালন করিল।

এই ছেলেটির সহিত দয়াময়ীর সন্তান-সম্বন্ধ যে কি সূত্রে হইল ইহাই বুঝাইবার জন্য রায়সাহেব বলিতে লাগিলেন, ওর বাপ আর আমি একসঙ্গে বিলেতে পড়েছিলুম বেয়ান, তখন থেকেই আমরা পরম বন্ধু। সুধীর নিজেও বিলেতে অনেকগুলো পাস করে মাদ্রাজের শিক্ষাবিভাগে ভাল চাকরি পেয়েছে। কথা আছে ওদের বিয়ের পরে কিছুদিনের ছুটি নিয়ে ও বন্দনাকে সঙ্গে নিয়ে আবার বিলেতে যাবে, সেখানে ইচ্ছে হয় বন্দনা কলেজে ভর্তি হবে, না হয় শুধু দেশ দেখেই দুজনে ফিরে আসবে। দ্যাখো সুধীর, তোমরা যদি এই আগস্ট সেপ্টেম্বরেই যাওয়া স্থির করতে পার আমিও না হয় মাস-তিনেকের ছুটি নিয়ে একবার ঘুরে আসি। কি বলিস রে বুড়ি, ভাল হয় না?

বন্দনা সেখান হইতে আস্তে আস্তে বলিল, কেন হবে না বাবা, তুমি সঙ্গে থাকলে ত ভালই হয়।

রায়সাহেব উৎসাহ-ভরে কহিলেন, তাতে আরও একটা সুবিধে এই হবে যে তোদের বিয়ের পরেও মাস-খানেক সময় পাওয়া যাবে, কোনরকম তাড়াহুড়ো করতে হবে না। বুঝলে না সুধীর, সুবিধেটা?

ইহাতে সুধীর ও বন্দনা উভয়েই মাথা নাড়িয়া সায় দিল। দয়াময়ী এতক্ষণে বুঝিলেন

এই ছেলেটি রায়সাহেবের ভাবী জামাতা। অতএব, তাঁহারও পুত্র-স্থানীয়। বুকের ভিতরটায় হঠাৎ একবার তোলপাড় করিয়া উঠিল, কিন্তু তিনি বিপ্রদাসের মা, বলরামপুরের বহুখ্যাত মুখুয্যে-পরিবারের কর্ত্রী, মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুধীর, তোমাদের বাড়ি কোথায় বাবা?

সুধীর কহিল, এখন বোম্বায়ে। কিন্তু বাবার মুখে শুনেচি আগে ছিল দুর্গাপুরে কিন্তু বর্তমানে সেখানে বোধ করি আমাদের আর কিছু নেই।

কোন্ দুর্গাপুর সুধীর? বর্ধমান জেলার?

সুধীর বলিল, হাঁ, বাবার মুখে তাই শুনেচি। কালনার কাছে কোন্ একটি ছোট্ট গ্রাম, এখন নাকি সে দেশ ম্যালেরিয়ায় ধ্বংস হয়ে গেছে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, তোমার বাবার নামটি কি?

সুধীর বলিল, আমার বাবার নাম শ্রীরামচন্দ্র বসু।

দয়াময়ী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতামহের নাম কি ছিল হরিহর বসু?

প্রশ্ন শুনিয়া রায়সাহেব পর্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বলিলেন, আপনি কি ওদের জানেন নাকি?

হাঁ, জানি। দুর্গাপুরে আমার মামার বাড়ি। ছেলেবেলায় দিদিমার কাছে মানুষ হয়েছি বলে ও-গ্রামের প্রায় সকলকেই চিনি। ওঁদের বাড়ি ছিল আমাদের পাড়ায়। কিন্তু এখন আর কথা কইবার সময় নেই সুধীর, আমার আহ্নিকের দেরি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছু না খেয়েও যেন তুমি চলে যেও না,—আমি এখনি সমস্ত ঠিক করে দিতে বলচি।

সুধীর সহাস্যে কহিল, তার আর বাকি নেই,—বিপ্রদাসবাবু আগেই সে কাজ সমাধা করে দিয়েছেন।

দিয়েছে? আচ্ছা, তা হলে এখন আমি আসি, এই বলিয়া দয়াময়ী বাহির হইয়া গেলেন। বন্দনার প্রতি একবারও চাহিলেন না, একটা কথাও বলিলেন না।

পরদিন সকালে স্নান-আহ্নিক সারিয়া বিপ্রদাস প্রতিদিনের অভ্যাসমত মায়ের পদধূলির জন্য আজও তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া দেখিল তাঁহার জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতেছে।

এ কি মা, কোথাও যাবে নাকি?

দয়াময়ী বলিলেন, তোকে খুঁজে পেলুম না, তাই দত্তমশায়কে জিজ্ঞেসা করে জানলুম সাড়ে-নটার গাড়িতে বার হতে পারলে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি পৌঁছতে পারব। কিন্তু পরশু তোর মকদ্দমার দিন, তুই ত সঙ্গে যেতে পারবি নে, দ্বিজুকে বলে দে, ও আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।

বিপ্রদাস চাহিয়া দেখিল মায়ের দুই চোখ রাঙ্গা, মুখ শুষ্ক, দেখিলে মনে হয় সারারাত্রি তাঁহার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় বহিয়া গেছে।

বিপ্রদাস সভয়ে প্রশ্ন করিল, হঠাৎ কি কোন দরকার পড়েচে মা?

মা বলিলেন, দুদিনের জন্যে এসে আট-দশদিন কেটে গেল, ওদিকে ঠাকুর-সেবার কি হচ্চে জানিনে, পাঁচ-ছটি গরুর প্রসব হবার সময় হয়েচে দেখে এসেচি, তাদের কি হল খবর পাইনি; বাসুর পাঠশালা কামাই হচ্চে—আর ত দেরি করা চলে না বিপিন।

এ-সকল ব্যাপার দয়াময়ীর কাছে তুচ্ছ নয় সত্য, কিন্তু আসল কারণটা যে তিনি প্রকাশ করিলেন না বিপ্রদাস তাহা বুঝিয়াই বলিল, তবু কি আজই না গেলে নয় মা?

না বাবা, তুই আমাকে বাধা দিসনে। দ্বিজুকে সঙ্গে যেতে বলে দে, না হয় আর কেউ আমাদের পৌঁছে দিয়ে আসুক।

তাই হবে মা, বলিয়া বিপ্রদাস পায়ের ধূলা লইয়া বাহির হইয়া গেল। নিজের শোবার ঘরে আসিয়া দেখিল, সতী অত্যন্ত ব্যস্ত এবং কাছে বসিয়া অন্নদা সন্দেশের হাঁড়ি, ফলমূল

ও ছেলের দুধের ঘটি গুছাইয়া ঝুড়িতে তুলিতেছে।

সতী মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বিপ্রদাস বলিল, অন্নদাদিদি, ব্যাপার কি জান?

না দাদা, কিছুই জানিনে। সকালেই মা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলে দিলেন ছেলে বৌয়ের গাড়িতে খাবার কষ্ট না হয়, তিনি ন'টার ট্রেনে বাড়ি যাবেন।

বিপ্রদাস সতীকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সেও মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে কিছুই জানে না।

শুনিয়া বিপ্রদাস স্তব্ধ হইয়া রহিল। অন্নদা না জানিতেও পারে, কিন্তু বৌ জানে না শাশুড়ীর কথা এমন বিস্ময় কি আছে? কয়েক মুহূর্ত নীরবে দাঁড়াইয়া সে নীচে চলিয়া গেল, উদ্বেগের সহিত ইহাই ভাবিতে ভাবিতে গেল, এ-সকল মায়ের একান্ত স্বভাব-বিরুদ্ধ। কি জানি কোন গভীর দুঃখ তাঁহার এই বিপর্যস্ত আচরণের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিল যাহা কাহারো কাছেই তিনি প্রকাশ করিলেন না।

দয়াময়ী যাত্রা করিয়া যখন নীচে নামিলেন, তখনও ট্রেনের অনেক সময় বাকী, কিন্তু কিছুতেই আজ তাঁহার বিলম্ব সহে না, কোনমতে বাহির হইতে পারিলেই বাঁচেন। সম্মুখে মোটর প্রস্তুত, আর একটায় জিনিসপত্র চাপাইয়া চাকরেরা উঠিয়া বসিয়াছে, ব্যাগ-হাতে বিপ্রদাসকে আসিতে দেখিয়া তিনি বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, দ্বিজু কৈ?

বিপ্রদাস কহিল, সে যাবে না, আমিই তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসব।

কেন, যেতে রাজী হল না বুঝি?

বিপ্রদাস সবিনয়ে কহিল, তাকে এমন কথা তোমার বলা উচিত নয় মা। তুমি হুকুম করলে সে সত্যিই কবে অবাধ্য হয়েছে বল ত?

তবে হল কি? গেল না কেন?

আমিই যেতে বলিনি মা, এই বলিয়া বিপ্রদাস একটু হাসিয়া কহিল, যে জন্যে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে পড়েচ তোমার সেই ঠাকুর, তোমার গরুর পাল,—তাদের সত্যিই কি অবস্থা ঘটল নিজের চোখে দেখব বলেই সঙ্গে যাচ্চি। অন্য কিছুই নয় মা।

আর কোন সময়ে দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া হয়ত কত কথাই ছেলেকে বলিতেন, কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিলেন।

অন্নদা বন্দনাকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে এইমাত্র স্নান করিয়া পিতার ঘরে যাইতেছিল, অন্নদার আহ্বানে দ্রুতপদে নীচে আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া রহিল। দয়াময়ী কহিলেন, আজ আমরা বাড়ি যাচ্চি বন্দনা!

বাড়ি? সেখানে কি হয়েচে মা?

না, হয়নি কিছু। কিন্তু দুদিনের জন্যে এসে দশ-বারো দিন দেরি হয়ে গেল, আর বাড়ি ছেড়ে থাকা চলে না। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হলো না—তখনো তিনি ওঠেন নি—আমার ত্রুটি যেন বেহাই মার্জনা করেন। দ্বিজু রইল, অন্নদা রইল, তুমিও দেখো যেন তাঁর অযত্ন না হয়। এসো বৌমা, আর দেরি করো না, এই বলিয়া তিনি গাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সতী পিছনে ছিল, সে কাছে আসিয়া বোনের হাত ধরিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া,—আমরা চললুম ভাই—আর কিছু তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না, চোখ মুছিতে মুছিতে গাড়িতে তাহার শাশুড়ীর পাশে গিয়া বসিল।

বন্দনা স্তব্ধ-বিস্ময়ে নির্বাক দাঁড়াইয়া,—যেন পাথরের মূর্তি, অকস্মাৎ এ কি হইল!

বাসু আসিয়া যখন তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া বলিল, আমি যাচ্চি মাসীমা,—তখনই তাহার চৈতন্য হইল, তাহারও এখনো কাহাকেও প্রণাম করা হয় নাই। তাড়াতাড়ি বাসুর কপালে একটা চুমা দিয়া সে গাড়ির দরজার কাছে আসিয়া হাত বাড়াইয়া দয়াময়ী ও মেজদির পায়ের ধূলা লইল। সতী নীরবে তাহার চিবুক স্পর্শ করিল, মা অস্ফুটে

আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন, বুঝা গেল না। মোটর ছাড়িয়া দিল।

অন্নদা কহিল, চল দিদি, আমরা ওপরে যাই।

তাহার স্নেহের কণ্ঠস্বরে বন্দনা লজ্জা পাইল, ক্ষণকালের বিহ্বলতা সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া বলিল, তুমি যাও অন্নদা, আমি রান্নাঘরের কাজগুলো সেরে নিয়ে যাচ্চি। এই বলিয়া সেই দিকে চলিয়া গেল।

কাল বিকালেও কথা হইয়াছিল রায়সাহেব বোম্বাই রওনা হইলে সকলে একত্রে বলরামপুর যাত্রা করিবেন। কিন্তু আজ তাহার উল্লেখ পর্যন্ত নয়, সুদূর ভবিষ্যতে কোন একদিনের মৌখিক আহ্বান পর্যন্ত নয়।

ঘণ্টা-খানেক পরে নিজের হাতে চায়ের সরঞ্জাম লইয়া বন্দনা পিতার ঘরে গেলে তিনি অত্যন্ত আক্ষেপ-সহকারে বলিয়া উঠিলেন, বেহানরা চলে গেলেন, সকালে উঠতে পারিনি মা, ছি ছি, কি না-জানি আমাকে তাঁরা মনে করে গেলেন!

বন্দনা বলিল, বাবা, আমরা কবে বোম্বায়ে যাব?

বাবা বলিলেন, তোমার যে বলরামপুরে যাবার কথা ছিল মা, গেলে না কেন?

মেয়ে বলিল, তোমাকে একলা ফেলে রেখে কি করে যাব বাবা, তুমি যে আজও ভাল হতে পারনি।

ভাল ত হয়েছি মা। বেহানকে কথা দেওয়া হয়েছে তুমি যাবে, না হয়, যাবার পথে আমি তোমাকে বলরামপুরে নাবিয়ে দিয়ে যাব। কি বল মা?

না বাবা, সে হবে না। তোমাকে এতটা পথ একলা যেতে আমি দিতে পারব না।

কন্যার কথা শুনিয়া পিতা পুলকিতচিত্তে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, দূর বুড়ি! দেখা হলে বেয়ান তোরে ঠাট্টা করে বলবে, বুড়ো বাপটাকে মেয়েটা চোখের আড়াল করতে পারে না। ছি—ছি—

তুমি খাও বাবা, আমি আসচি, এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল।

চোদ্দ

সন্ধ্যা উত্তীর্ণপ্রায়, বন্দনা আসিয়া দ্বিজদাসের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, একবার আসতে পারি দ্বিজবাবু? ভিতর হইতে সাড়া আসিল, পার। একবার নয়, শত সহস্র অসংখ্য বার পার।

বন্দনা দরজার পাল্লা-দুটা শেষপ্রান্ত পর্যন্ত ঠেলিয়া দিয়া প্রবেশ করিল এবং ঘরের সব কয়টা আলো জ্বালিয়া দিয়া খোলা দরজার সম্মুখে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল।

দ্বিজদাস হাতের বইটা একপাশে উপুড় করিয়া রাখিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, কি হুকুম?

কি পড়ছিলেন?

ভূতের গল্প।

অতিথি বড়, না, ভূতের গল্প বড়?

ভূতের গল্প বড়।

বন্দনা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, সকল সময়েই তামাশা ভাল নয়। আমরা যে আপনার বাড়িতে অতিথি এ জ্ঞান আপনার আছে?

দ্বিজদাস কহিল, তোমরা যে দাদার বাড়িতে অতিথি এ জ্ঞান আমার পূর্ণমাত্রায় আছে। এবং বাড়িঅলা আদেশ দিয়ে গেছেন তোমাদের যত্নের যেন ত্রুটি না হয়। ত্রুটি নিশ্চয় হত না, কিন্তু এই ভূতের গল্পটায় আত্মবিস্মৃত হয়ে কর্তব্যে কিঞ্চিৎ শৈথিল্য ঘটেছে। অতএব অতিথির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

সমস্ত দিনটা আমার কত কষ্টে কেটেছে জানেন?

নিশ্চয় জানি।

নিশ্চয় জানেন, অথচ, প্রতিকারের কি কোন উপায় করেছেন?

দ্বিজদাস কহিল, না করার প্রথম কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি। দ্বিতীয় কারণ, এ প্রতিকার আমার সাধ্যাতীত।

কেন?

সে আমার বলা উচিত নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা এবং মেজদি এমন হঠাৎ বাড়ি চলে গেলেন কেন?

মেজদি গেলেন প্রবলপরাক্রান্ত শাশুড়ীর হুকুম বলে। নইলে তিনি নির্দোষ।

কিন্তু মা গেলেন কেন?

মা-ই জানেন।

আপনি জানেন না?

দ্বিজদাস কহিল, একেবারেই জানিনে বললে মিথ্যা বলা হবে। কারণ, বৌদি কিঞ্চিৎ অনুমান করেছেন এবং আমি তার যৎসামান্য একটু অংশ লাভ করেচি।

বন্দনা বলিল, সেই যৎসামান্য অংশটুকুই আমাকে আপনার বলতে হবে।

দ্বিজদাস এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, তবেই বিপদে ফেললে বন্দনা। এ কথা কি তোমার না শুনলেই চলে না?

না, সে হবে না, আপনাকে বলতেই হবে।

না-ই বা শুনলে?

বন্দনা বলিল, দেখুন দ্বিজবাবু আমাদের শর্ত হয়েছিল, এ বাড়িতে আপনার সমস্ত কথা আমি শুনব এবং আপনিও আমার সমস্ত কথা শুনবেন। আপনি জানেন আপনার একটি আদেশও আমি লঙ্ঘন করিনি। বলিতে গিয়া তাহার চোখে জল আসিতেছিল আর একদিকে চাহিয়া তাহা কোনমতে সামলাইয়া লইল।

দ্বিজদাস ব্যথিত হইয়া বলিল, নিতান্ত অর্থহীন ব্যাপার তাই বলার আমার ইচ্ছে ছিল না। মা তোমার পরেই রাগ করে চলে গেছেন বটে, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নেই। সমস্ত দোষ মার নিজের। বৌদিদিরও কিঞ্চিৎ আছে, কারণ প্রত্যক্ষে না হলেও পরোক্ষে চক্রান্তে যোগ দিয়েছিলেন বলেই আমার সন্দেহ। কিন্তু সবচেয়ে নিরপরাধ বেচারা দ্বিজদাস নিজে।

বন্দনা অধীর হইয়া উঠিল,—বলুন না শিগগির চক্রান্তটা কিসের?

দ্বিজদাস বলিল, চক্রান্ত শব্দটা বোধ হয় সঙ্গত নয়। কিন্তু মা করেছিলেন মনে মনে স্বর্ণলঙ্কা-ভাগ। কিন্তু হিসেবের ভুলে ভাগ্যে পড়ল যখন শূন্য তখন সমস্ত সংসারের উপর গেলেন চটে, চটাও ঠিক নয়, অনেকটা আশাভঙ্গের ক্ষুব্ধ অভিমান।

বন্দনা নীরবে চাহিয়া রহিল, দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, জানো নিশ্চয়ই যে একদিন তোমার প্রতি ছিল তাঁর যত বড় বিতৃষ্ণা আর একদিন জন্মালো তাঁর তেমনি গভীর স্নেহ। রূপে, গুণে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, কাজকর্মে, দয়া-মায়ায় একা বৌদি ছাড়া মার কাছে কেউ তোমার আর জোড়া রইলো না। তোমাকে ম্লেচ্ছ বলে সাধ্য কার? তখনি মা কোমর বেঁধে প্রমাণ করতে বসতেন এতবড় নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মণ-তনয়া সমস্ত ভারতবর্ষ হাতড়ালে খুঁজে মিলবে না। এই বলিয়া দ্বিজদাস নিজের রসিকতার আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

এ হাসি বন্দনার অত্যন্ত খারাপ লাগিলেও সে নিজেও হাসিয়া ফেলিল।

দ্বিজদাস বলিল, হাসচ কি বন্দনা, আসলে সেই ত হয়েছে সকলের বিপদ।

বন্দনা কহিল, এতে বিপদ হবে কিসের জন্যে?

দ্বিজদাস বলিল, তবে অবধানপূর্বক শ্রবণ কর। দয়াময়ীর দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ। জ্যেষ্ঠের প্রতি যেমন অগাধ আশা ও ভরসা, কনিষ্ঠের প্রতি তেমনি অপরিসীম সন্দেহ

ও ভয়। তাঁর ধারণা অপদার্থতায় পৃথিবীতে কনিষ্ঠের সমকক্ষ নেই। কিন্তু মা ত! গর্ভে ধারণ করে সন্তানকে সহজে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না,—অতএব মনে মনে পুত্রের সদ্গতির উপায় নির্ধারণ করলেন তোমার স্কন্ধে তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে সংসার-মরুভূমি নির্ভয়ে উত্তীর্ণ করে দেবেন। কিন্তু বিধাতা বিরূপ, অকস্মাৎ কাল সন্ধ্যায় আবিষ্কৃত হ'ল বন্দনার স্কন্ধদেশে স্থান নাই, ছোট সে তরী—অর্থাৎ কিনা দয়াময়ীর সকল সঙ্কল্প, সকল স্বপ্নজাল ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে কে এক সুধীরচন্দ্র তথায় পূর্বাহ্ণেই সমারূঢ়, তাঁকে নড়ায় সাধ্য কার! এই বলিয়া সে আর এক দফা উচ্চহাস্যে ঘর ভরিয়া দিল।

বন্দনা কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এ-রকম বিকট হাসির কারণটা আপনার কি? মা অপদস্থ হয়েছেন তাই, না আপনি নিজে অব্যাহতি পেলেন তারই আনন্দোচ্ছ্বাস? কোন্‌টা?

দ্বিজদাস স্মিতমুখে বলিল, যদিচ এর কোনটাই নয়, তথাপি কবুল করতে বাধা নেই যে অকস্মাৎ,পদস্খলনে মা-জননীর এই ধরাশায়িনী মূর্তিতে দর্শক হিসেবে আমি কিঞ্চিৎ অনাবিল আনন্দ-রস উপভোগ করেচি। তবে, ক্ষতি তাঁর বিশেষ হবে না যদি এর থেকে তিনি অন্ততঃ এটুকু শিক্ষা লাভ করে থাকেন যে, সংসারে বুদ্ধি পদার্থটা তাঁরই নিজস্ব নয়, ওতে অপরেরও দাবী থাকতে পারে। কারণ, আমাকে না হোক দাদাকেও মা যদি তাঁর ষড়যন্ত্রের আভাস দিতেন, আর কিছু না ঘটুক, এ কর্মভোগ থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দিতে পারা যেত। দাদা এবং আমি উভয়েই জানতুম তুমি অন্যের বাগ্‌দত্তা বধূ, পরস্পর প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ, অতএব এ ব্যবস্থার অন্যথা ঘটা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কার কাছে কবে শুনলেন?

দ্বিজদাস বলিল, তোমার বাবার কাছে। এখানে আমাদের আসার দিনই রায়সাহেব তোমাদের ভালবাসা, বাগ্‌দান ও আশু বিবাহের মনোজ্ঞ আলোচনায় আমাদের দু ভায়ের দু জোড়া কানেই সুধাবর্ষণ করেছিলেন। না না, রাগ করো না বন্দনা, সাদাসিধে নিরীহ মানুষ, চিত্তের প্রফুল্লতায় সুসংবাদ আত্মীয়স্বজনের কাছে চেপে রাখবার প্রয়োজনই মনে করেন নি।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিল, এই জন্যেই কি মুখুয্যেমশাই মৈত্রেয়ীকে দেখতে আমাদের পাঠিয়েছিলেন?

দ্বিজদাস বলিল, সে ঠিক জানিনে। কারণ, দাদার সমস্ত মনের কথা দেবতাদেরও অজ্ঞাত। শুধু এটুকু জানি তাঁর মতে মৈত্রেয়ী দেবী সর্বগুণান্বিতা কন্যা। বলরামপুরের ধনী ও মহামাননীয় মুখুয্যে-পরিবরের অযোগ্যা নয়।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী দেবী সম্বন্ধে আপনার অভিমতটা কি?

দ্বিজদাস বলিল, এ বাড়িতে ও প্রশ্ন অবৈধ। আমি তৃতীয় পক্ষ। প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ, অর্থাৎ মা ও দাদা যে-কোন নারীর গলদেশে আমাকে বন্ধন করে দেবেন, তাঁরই কণ্ঠলগ্ন হয়ে আমি পরমানন্দে ঝুলতে থাকব। এই এ গৃহের সনাতন রীতি, এর পরিবর্তন নেই।

তাহার বলার ভঙ্গীতে বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আর ধরুন, মৈত্রেয়ীর পরিবর্তে বন্দনার গলদেশেই যদি তাঁরা আপনাকে বেঁধে দেন?

দ্বিজদাস ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল, হায় বন্দনা, সে আশা বৃথা! দুষ্ট রাহু পূর্ণচন্দ্র ভক্ষণ করেছে, কোথাকার সুধীরচন্দ্র লাফ মেরে এসে প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দিলে, দ্বিজদাসের স্বর্ণলঙ্কা চোখের সম্মুখে ভস্মীভূত হয়ে গেল। এ প্রসঙ্গ বন্ধ করো কল্যাণি, অভাগার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে।

তাহার নাটকীয় উক্তিতে বন্দনা আর একবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, সোনার লঙ্কার সবটা ত পোড়েনি দ্বিজুবাবু, অশোক-কাননটা রক্ষে পেয়েছিল। হৃদয় বিদীর্ণ না হতেও পারে।

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, সে আশ্বাস বৃথা। শ্রীরামচন্দ্রের বরাতের জোর ছিল, কিন্তু আমি সর্ববাদিসম্মত হতভাগ্য দ্বিজদাস। আমার দগ্ধ অদৃষ্টে সমস্ত আশাই পুড়ে ছাই হয়ে গেছে,—কিছুই অবশিষ্ট নেই।

না যায়নি।

কি যায়নি?

বন্দনা জোর দিয়া বলিল, কিছুই যায়নি। দ্বিজদাস হতভাগ্য বলে বন্দনা হতভাগিনী নয়। আমার অদৃষ্টকে পুড়িয়ে ছাই করে এ সাধ্য সুধীরের নেই। সংসারে কারও নেই মায়েরও না, আপনার দাদারও না।

তাহার শান্ত-দৃঢ় কণ্ঠস্বরে দ্বিজদাস অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

চুপ করে রইলেন যে? আমার মনের কথা আপনি টের পাননি, আজ কি এই ছলনা করতে চান?

না, ছলনা করতে চাইনে বন্দনা, অনুমান করেছিলুম তা মানি। কিন্তু সন্দেহও ছিল প্রচুর।

বন্দনা কহিল, সে সন্দেহ যেন আজ থেকে যায়। ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু সন্দেহ আমার ত ছিল না। সেই প্রথম দিন থেকেই না। বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এলুম, একলা উপরের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে হাত তুলে ইঙ্গিতে আমাকে বিদায় দিলেন, মাত্র একটি বেলার পরিচয়, তবু কি অর্থ তার আমার কাছে এতটুকু অস্পষ্ট ছিল ভাবেন?

দ্বিজদাস চুপ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া বন্দনা বলিল, গেল সন্দেহ?

দ্বিজদাস বলিল, বোধ হয় আর একটু তাড়া দিলেই যাবে। কিন্তু ভাবচি আমার সংশয় নিরসনের এই পদ্ধতিই কি চিরকাল চালাবে?

বন্দনা বলিল, চিরকালের ব্যবস্থা আগে ত আসুক। কিন্তু সমস্ত জেনেও যে তাচ্ছিল্যের অভিনয় করে, তাকে বোঝাবার আমার আর কোন পথ নেই।

কিন্তু সে আমি নয়, মা। তাঁকে বোঝাবে কি করে?

বন্দনা বলিল, মা আপনি বুঝবেন। আমাকে তিনি মেয়ের মতো ভালবাসেন। আজ হঠাৎ যত চঞ্চল হয়েই চলে যান, যা জেনে গেছেন সে যে সত্যি নয় এ কথা মাকেই যদি না বোঝাতে পারি, আমি কিসের আশা করি বলুন ত! আমার কোন ভাবনা নেই দ্বিজুবাবু একদিন না একদিন সমস্ত কথা তাঁকে আমি বোঝাবই বোঝাব। বলিতে গিয়া শেষের দিকে হঠাৎ তাহার গলা ভাঙ্গিয়া দুই চোখ জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সত্য ও মিথ্যার দ্বিধা দ্বিজদাসের ঘুচিয়াও ঘুচিতেছিল না, কিন্তু এই চোখের জল ও কণ্ঠস্বরের নিগূঢ় পরিবর্তনে তাহার সকল সংশয় মুছিল,—এ ত শুধুই পরিহাস নয়! বিস্ময় ও ব্যথায় আলোড়িত হইয়া সে বলিয়া উঠিল, এ কি বন্দনা, তুমি কাঁদচ যে?

প্রত্যুত্তরে বন্দনা কথা কহিল না, কেবল অশ্রু মুছিয়া আর একদিকে চাহিয়া রহিল।

দ্বিজদাস নিজেও বহুক্ষণ নীরবে থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, সুধীর ত তোমার কাছে কোনও দোষ করেনি বন্দনা।

বন্দনা মুখ ফিরিয়া চাহিল না, শুধু বলিল, দোষের বিচার কিসের জন্যে বলুন ত? আমি কি তাঁর অপরাধের প্রতিশোধ নিতে বসেচি?

দ্বিজদাস এ কথার জবাব খুঁজিয়া পাইল না, বুঝিল, প্রশ্নটা একেবারে নিরর্থক হইয়াছে। আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কিন্তু সুধীর তোমাদের আপন সমাজের—অথচ শিক্ষায়, সংস্কারে, অভ্যাসে, আচরণে মুখুয্যেদের সঙ্গে তোমাদের কোথাও মিল হবে না। তবে কিসের জন্য এদের কারাগারে এসে চিরকালের জন্যে তুমি ঢুকতে যাবে বন্দনা? আমার জন্যে? আজ হয়ত বুঝবে না, কিন্তু একদিন যদি এ ভুল ধরা পড়ে তখন পরিতাপের অবধি থাকবে না। আমাকে তুমি কিভাবে বুঝেচ জানিনে, কিন্তু বৌদি, মা, দাদা, আমাদের

ঠাকুর, আমাদের অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন, আমি এঁদেরই একজন। আমাকে আলাদা করে ত তুমি কোনদিনই পাবে না। দীর্ঘকাল এ কি তোমার সইবে?

বন্দনা বলিল, না সইলে মানুষের মরার পথ ত চিরকাল খোলা থাকে দ্বিজুবাবু, কোন কয়েদখানাই তা বন্ধ করতে পারে না। কিন্তু আমাকেও আপনি কি বুঝেচেন জানিনে, কিন্তু আমার শাশুড়ী, আমার জা, আমার ভাশুর, আমাদের ঠাকুর, অতিথিশালা, আমাদের আত্মীয়-স্বজন-সমাজ এর থেকে আলাদা করে আমার স্বামীকে আমি একদিনও পেতে চাইনে। তিনি সকলের সঙ্গে এক হয়েই যেন আমার থাকেন।

দ্বিজদাস বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল, এ-সব ধারণা ত তোমাদের নয়, এ তুমি কার কাছে শিখলে বন্দনা?

বন্দনা কহিল, কেউ আমাকে শেখায় নি দ্বিজুবাবু, কিন্তু মার কাছে থেকে, মুখুয্যে মাশাইকে দেখে এ-সব আমার আপনিই মনে হয়েছে। এ বাড়িতে সকল ব্যাপারে সকলের বড় মা, তার পরে মুখুয্যেমশাই, তার পরে দিদি, তার পরে আপনি, এখানে অন্নদারও একটা বিশেষ স্থান আছে। এ বাড়িতে জায়গা যদি কখনো পাই এঁদের ছোট হয়েই পাবো, কিন্তু সে আমার একটুও অসঙ্গত মনে হবে না।

শুনিয়া দ্বিজদাসের যেমন ভাল লাগিল তেমনি মন ব্যথায় ভরিয়া গেল। কিন্তু বন্দনার মনের কথা এমন করিয়া জানিয়া লওয়া অন্যায়,—এ আলোচনা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। জোর করিয়া নিজেকে সে কঠিন করিয়া বলিল, কিন্তু মাকে আমাদের এই-সব কথা জানিয়ে কোন লাভ নেই। তিনি তোমাকে মেয়ের মতো ভালবাসেন এ আমি জানি, তাই তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল তুমি হবে এ বাড়ির ছোটবৌ, তোমাদের দুই বোনের হাতে তাঁর দুই ছেলেকে সঁপে দিয়ে যাবেন তিনি কৈলাসে, ফিরতে যদি আর না পারেন, সেই দুর্গম পথেই যদি আসে পরকালের ডাক, এই কথাটা মনে নিয়ে তখন নিশ্চিন্ত-নির্ভয়ে যাত্রা করতে পারবেন। তাঁর বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব হস্তান্তরে আর কোন দিকে ফাঁক নেই। কিন্তু সে হবার আর জো নেই, তাঁর মতে বাগ্‌দান মানেই সম্প্রদান। ভালোবেসে যাকে সম্মতি দিয়েচো সে-ই তোমার স্বামী। বিয়ের মন্ত্র পড়া হয়নি বলে তাঁকে ত্যাগ করতেও তুমি পার, কিন্তু সেই শূন্য-আসন জুড়ে দয়াময়ীর ছেলে গিয়ে বসতে পারবে না।

শুনিয়া বেদনায় বন্দনার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, জিজ্ঞাসা করিল, মা কি এই-সব বলে গেছেন দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস কহিল, অন্ততঃ বলা অসম্ভব মনে করিনে বন্দনা। বৌদি বলছিলেন, মায়ের সবচেয়ে বেজেচে এই ব্যথাটা যে সুধীর আমাদের জাত নয়,—আসলে তোমরা জাত মানো না। এতবড় বিভেদ যে, কিছু দিয়েই এ ফাঁক ভরানো যাবে না।

আপনিও কি এই কথাই বলেন?

আমি ত তৃতীয় পক্ষ বন্দনা, আমার বলায় কি আসে যায়!

রায়সাহেবের আহারের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছিল, বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইবার পূর্বে কহিল, বাবার ছুটি শেষ হয়েচে, কাল তিনি চলে যাবেন। আমিও কি তাঁর সঙ্গে চলে যাবো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস কহিল, এ-ও কি আমার বলবার বন্দনা? যদি যাও আমাকে তুমি ভুল বুঝে যেও না। তুমি যাবার পরে তোমার হয়ে মাকে তোমার সমস্ত কথা জানাবো, লজ্জা করবো না। তারপরে রইল আমাদের আজকের সন্ধ্যাবেলাকার স্মৃতি, আর রইল আমাদের বন্দে মাতরমের মন্ত্র।

বন্দনা ইহার কোন উত্তর দিল না, নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পনর

নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বন্দনার অত্যন্ত গ্লানি বোধ হইতে লাগিল। সে কি নেশা

করিয়াছে যে, নির্লজ্জ উপযাচিকার ন্যায় আপন হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করিয়া সমস্ত আত্মমর্যাদার জলাঞ্জলি দিয়া আসিল? অথচ দ্বিজদাস পুরুষ হইয়াও যেমন রহস্যাবৃত ছিল তেমনি রহিল। তাহার মুখের ভাবে না ছিল অগ্রাহ্য, না ছিল উল্লাস, সে না দিল আশা, না দিল সান্ত্বনা, বরঞ্চ পরিহাসচ্ছলে এই কথাটাই বার বার করিয়া জানাইল যে সে তৃতীয় পক্ষ! তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছা এ বাড়িতে অবান্তর বিষয়। শুধু কি এই! মার নাম করিয়া বলিল, বাগ্‌দান মানেই সম্প্রদান ; বলিল, নিরাপরাধ সুধীরের শূন্য আসনে গিয়া দয়াময়ীর ছেলে বসিবে না। কিন্তু অপমানের পাত্র ইহাতেও পূর্ণ হইল না, তাহার চোখে জল দেখিয়া সে অবশেষে দয়ার্দ্র-চিত্তে মাত্র এইটুকু কথা দিয়াছে যে বন্দনার এই বেহায়াপনার কাহিনী মায়ের কাছে সে উল্লেখ করিবে।

আবার এইখানেই কি শেষ! দ্বিজদাসের কথার উত্তরে সে যাচিয়া বলিয়াছিল, এই পরিবারের যেখানে যে-কেহ আছে, সকলের ছোট হইয়াই সে আসিতে চায়। আর সে ভাবিতে পারিল না, সেইখানে স্তব্ধভাবে বসিয়া তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, প্রকৃত সে অত্যন্ত ছোট হইয়া গেছে—এত ছোট যে আত্মঘাতী হইলেও এ হীনতার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

বাহিরে হইতে কে আসিয়া জানাইল রায়সাহেব তাহাকে ডাকিতেছেন। উঠিয়া সে পিতার ঘরে গেল, সেখানে তাঁহাকে বারংবার জিদ করিয়া সম্মত করাইল, কালই তাহাদের বোম্বায়ে রওনা হইতে হইবে। অথচ, কথা ছিল বিপ্রদাস ফিরিয়া আসিলে রাত্রের ট্রেনে তাঁহারা যাত্রা করিবেন। হঠাৎ এইভাবে চলিয়া যাওয়াটা যে ভালো হইবে না ইহাতে সাহেবের সন্দেহ ছিল না,—ছুটিও ছিল, স্বচ্ছন্দে থাকাও চলিত, তথাপি কন্যার প্রস্তাবে তাঁহাকে রাজী হইতে হইল।

বিছানায় শুইয়া বন্দনার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, তার পরে এক সময়ে সে ঘুমাইয়া পড়িল। সকালে উঠিয়া সে নিজের এবং বাপের জিনিসপত্র সমস্ত গুছাইয়া ফেলিল, ফোন করিয়া গাড়ি রিজার্ভ করিল এবং বোম্বায়ে তার করিয়া দিল। সন্ধ্যায় ট্রেন, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার বিলম্ব সহে না।

বেলা তখন ন'টা বাজিয়াছে, অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল,—এ কি কাণ্ড?

বন্দনা ময়লা কাপড়গুলা ভাঁজ করিয়া একটা তোরঙ্গে তুলিতেছিল, কহিল, আজ আমরা যাবো।

সে তো আজ নয় দিদিমণি। যাবার কথা যে কাল।

না, আজই যাওয়া হবে। এই কথা বলিয়া সে কাজ করিতেই লাগিল, মুখ তুলিল না।

অন্নদা একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি উঠুন, আমি গুছিয়ে দিচ্চি। আপনার কষ্ট হচ্চে!

কষ্ট দেখবার দরকার নেই, নিজের কাজে যাও তুমি। এ বাড়ির সমস্ত লোকের প্রতি যেন তাহার ঘৃণা ধরিয়া গেছে।

হেতু না জানিলেও একটা যে রাগারাগির পালা চলিতেছে অন্নদা তাহা জানিত। হঠাৎ মা কাল বাড়ি চলিয়া গেলেন, আজ বন্দনাও তেমনি হঠাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত। কিন্তু রাগের বদলে রাগ করা অন্নদার প্রকৃতি নয়, সে যেমন সহিষ্ণু তেমনি ভদ্র, কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, আমার দোষ হয়ে গেছে দিদিমণি, আজ সময়ে আমি উঠতে পারিনি।

বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, আমি ত তার কৈফিয়ত চাইনি অন্নদা, দরকার হয় তোমার মনিবকে দিও। দ্বিজুবাবু তাঁর ঘরেই আছেন, তাঁকে বলো গে। এই বলিয়া সে পুনরায় কাজে মন দিল। বন্দনা পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া একটুখানি বেশী আদরেই প্রতিপালিত। সহ্য করার শক্তিটা তাহার কম। কিন্তু তাই বলিয়া কটু কথা বলার কুশিক্ষাও

তাহার হয় নাই এবং হয়ত এতবড় কঠোর বাক্যও সে জীবনে কাহাকেও বলে নাই। তাই বলিয়া ফেলিয়াই সে মনে মনে লজ্জা বোধ করিতেছিল, এমনি সময়ে অন্নদাই সলজ্জ মৃদু কণ্ঠে কহিতে লাগিল, ডাক্তাররা চলে গেলেন, ফরসা হয়েছে দেখে ভাবলুম আর শোবো না, শুইনিও, কিন্তু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসতে কি করে চোখ জড়িয়ে এলো, কোথা দিয়ে বেলা হয়ে গেল টের পেলুম না। মনিবের কথা বলচেন দিদিমণি, কিন্তু আপনিও কি আমার মনিব নয়? বলুন ত, এ অপরাধ আর কখনও কি আমার হয়েছে? উঠুন আমি গুছিয়ে দিই।

শেষের দিকে কথাগুলো বোধ হয় বন্দনার কানে যায় নাই, অন্নদার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, ডাক্তাররা চলে গেলেন মানে?

অন্নদা কহিল, কাল রাত্তিরে দ্বিজুর ভারী অসুখ গেছে। এখানে এসে পর্যন্তই ওর শরীর খারাপ, কিন্তু গ্রাহ্য করে না। কাল মা'দের নিয়ে বাড়ি যাবার কথায় আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললে, মা যেন না জানতে পারেন, কিন্তু দাদাকে বলে আমার যাওয়াটি মাপ করে দাও অনুদিদি, আজ যেন আমি উঠতে পারচি নে এমনি দুর্বল।

ওকে মানুষ করেছি, ওর সব কথা আমার সঙ্গে। ভয় পেয়ে বললুম, সে কি কথা? শরীর খারাপ ত লুকোচ্চো কেন? ওর স্বভাবই হলো হেসে উড়িয়ে দেওয়া, তা সে যত গুরুতরই হোক। তেমনি একটুখানি হেসে বললে, তুমি ওদের বিদেয় করো না দিদি, তার পরে আপনি চাঙ্গা হয়ে উঠবো। ভাবলুম, মার সঙ্গে ওর বনে না, কোথাও সঙ্গে যেতে চায় না, এ বুঝি তারই একটা ফন্দি। তাই কিছু আর বললুম না। বড়দাদাবাবু ওঁদের নিয়ে চলে গেলেন। তার পরে সমস্ত দিনটা ও শুয়ে কাটালে, কিছু খেলে না। দুপুরবেলা গিয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, দ্বিজু, কেমন আছ? বললে, ভাল আছি। কিন্তু ওর চেহারা দেখে তা মনে হলো না। ডাক্তার আনাতে চাইলুম, দ্বিজু কিছুতে দিলে না, বললে, কেন মিছে দাদার অর্থদণ্ড করাবে দিদি, তোমার অপব্যয়ের কথা শুনলে গিন্নী রাগ করবেন। মায়ের উপর এ অভিমান ওর আর গেল না। সমস্ত দিন খেলে না, বিছানায় শুয়ে কাটালে, বিকেলে গিয়ে জিজ্ঞেসা করলুম, দ্বিজু, শরীর যদি সত্যিই খারাপ নেই তবে সমস্ত দিন শুয়ে কাটাচ্ছোই বা কেন? ও তেমনি হেসে বললে, অনুদিদি, শাস্ত্রে লেখা আছে শুয়ে থাকার মত পুণ্য কাজ জগতে নেই, এতে কৈবল্য মেলে। একটু পারত্রিক মঙ্গলের চেষ্টায় আছি। তোমার ভয় নেই। সব তাতেই ওর তামাশা, কথায় পারবার জো নেই, রাগ করে চলে এলুম কিন্তু ভয় ঘুচলো না। ও একখানা বই টেনে পড়তে শুরু করে দিলে।

অন্নদা একটু থামিয়া বলিতে লাগিল, রাত্রি বোধ করি তখন বারোটা, আমার দোরে ঘা পড়ল। কে রে? বাইরে থেকে জবাব এলো, অনুদিদি আমি। দোর খোলো। এত রাত্রে দ্বিজু ডাকে কেন, ব্যস্ত হয়ে দোর খুলে বেরিয়ে এলুম,—দ্বিজুর এ কি মূর্তি! চোখ কোটরে ঢুকেছে, গলা ভাঙ্গা, শরীর কাঁপচে,—কিন্তু তবু হাসি। বললে, দিদি, মানুষ করেছিলে তাই তোমার ঘুম ভাঙ্গালুম। যদি চোখ বুজতেই হয় তোমার কোলেই মাথা রেখে বুজবো। এই বলিয়া অন্নদা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। তাহার কান্না যেন থামিতে চাহে না এমনি ভিতরের অদম্য আবেগ। আপনাকে সামলাইতে তাহার অনেকক্ষণ লাগিল, তারপরে কহিল, বুকে করে তাকে ঘরে নিয়ে গেলুম, কিন্তু যেমন কাট বমি তেমনি পেটের যন্ত্রণা—মনে হলো রাত্ত বুঝি আর পোহাবে না, কখন নিশ্বাসটুকু বা বন্ধ হয়ে যায়। ডাক্তারদের খবর দেওয়া হলো, তাঁরা সব এসে পড়লেন, ফুঁড়ে ওষুধ দিলেন, গরম জলের তাপ-সেঁক চলতে লাগলো—চাকররা সব জেগে বসে—ভোরবেলায় দ্বিজু ঘুমিয়ে পড়লো। ডাক্তাররা বললে আর ভয় নেই। কিন্তু কিভাবে যে রাতটা কেটেছে দিদিমণি, ভাবলে মনে হয় বুঝি দুঃস্বপ্ন দেখেচি—ও-সব কিছুই হয়নি! এই বলিয়া অন্নদা আবার আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা আস্তে আস্তে বলিল, আমি কিছুই জানতে পারিনি, আমাকে তুললে না কেন অন্নদা?

অন্নদা কহিল, সকালে ঐ একটা অশান্তি গেলো, আর তোমাকে ব্যস্ত করলুম না দিদিমণি। নইলে দ্বিজু বলেছিল।

বন্দনা এ প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিল, কহিল, দ্বিজুবাবু এখন কেমন আছেন?

অন্নদা কহিল, ভালো আছে, ঘুমোচ্ছে। ডাক্তাররা বলে গেছেন, হয়ত সন্ধ্যার আগে আর ঘুম ভাঙবে না। বড়বাবু এসে পড়লে বাঁচি দিদি।

তাঁকে কি খবর দেওয়া হয়েছে?

না। দত্তমশাই বললেন তার আবশ্যক নেই, তিনি আপনিই আসবেন।

ও-ঘরে লোক আছে ত?

হাঁ দিদিমণি, দু'জন বসে আছে।

ডাক্তার আবার কখন আসবেন?

সন্ধ্যার আগেই আসবেন। বলে গেছেন আর ভয় নেই।

চিকিৎসকেরা অভয় দিয়ে গেছেন বন্দনার এইটুকুই সান্ত্বনা। এছাড়া তাহার কি-ই বা করিবার আছে!

বন্দনা গিয়া পিতাকে দ্বিজদাসের পীড়ার সংবাদ দিল, কিন্তু বেশি বলিল না।

তিনি সেইটুকু শুনিয়াই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—কৈ আমি ত কিছুই জানতে পারিনি?

না, আমাদের ঘুম ভাঙ্গানো কেউ উচিত মনে করেনি।

কিন্তু সেটা ত ভালো হয়নি!

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল, তিনি ক্ষণেক পরে নিজেই বলিলেন, টিকিট কিনতে পাঠান হয়েছে, গাড়ি রিজার্ভ হয়ে গেছে, আমাদের যাওয়ায় ত দেখচি একটু বিঘ্ন ঘটল।

বন্দনা বলিল, কেন বিঘ্ন হবে বাবা, আমরা থেকেই বা তাঁদের কি উপকার করবো?

না, উপকার নয়, কিন্তু তবু—

না বাবা, এমনি করে কেবলি দেরি হয়ে যাচ্চে, আর তুমি মত বদলিয়ো না। এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া আসিল।

বেলা পড়িয়া আসিতেছে, বন্দনার ঘরে ঢুকিয়া অন্নদা মেঝের উপর বসিল। তাঁহাদের যাত্রা করিতে তখনও ঘণ্টা-দুয়েক দেরি। বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজুবাবু ভাল আছেন?

হাঁ দিদি, ভাল আছে, ঘুমুচ্চে।

বন্দনা কহিল, আমাদের যাবার সময়ে কারও সঙ্গে দেখা হলো না। একজনের তখনো হয়ত ঘুম ভাঙবে না, আর একজন যখন বাড়ি এসে পৌঁছবেন তখন আমরা অনেক দূর চলে গেছি।

অন্নদা সায় দিয়া বলিল, হাঁ বড়দাদাবাবু আসবেন প্রায় নটা রাত্তিরে। একটু পরে কহিল তিনি এসে পড়লে সবাই বাঁচি। সকলের ভয় ঘোচে।

কিন্তু ভয় ত কিছু নেই অন্নদা!

অন্নদা বলিল, নেই সত্যি, কিন্তু বড়দাদাবাবুর বাড়িতে থাকাই আলাদা জিনিস দিদি। তখন কারও আর কোন দায়িত্ব নেই, সব তাঁর। যেমন বুদ্ধি, তেমনি বিবেচনা, তেমনি সাহস, আর তেমনি গাম্ভীর্য! সকলের মনে হয় যেন বটগাছের ছায়ায় বসে আছি।

সেই পুরাতন কথা, সেই বিশেষণের ঘটা। মনিবের সম্বন্ধে এ যেন ইহাদের মজ্জাগত হইয়াছে। অন্য সময়ে হইলে বন্দনা খোঁটা দিতে ছাড়িত না, কিন্তু এখন চুপ করিয়া রহিল।

অন্নদা বলিতে লাগিল, আর এই দ্বিজু! দুই ভায়ে যেন পৃথিবীর এ-পিঠ ও-পিঠ।

বন্দনা আশ্চর্য হইয়া কহিল, কেন?

অন্নদা বলিল, তা বৈ কি দিদি। না আছে দায়িত্ববোধ, না আছে ঝঞ্ঝাট, না আছে গাম্ভীর্য।

বৌদি বলেন, ও হচ্চে শরতের মেঘ, না আছে বিদ্যুৎ, না আছে জল। উড়ে উড়ে বেড়ায়, ব্যাপার যত গুরুতর হোক, হেসে খেলে ও কাটাবেই কাটাবে। না গৃহী না বৈরিগী, কত খাতক যে ওর কাছে 'বুঝিয়া পাইলাম' লিখিয়ে নিয়ে পরিত্রাণ পেয়েছে তার হিসেব নেই।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই রাগ করেন না?

করেন না? খুব করেন। বিশেষ মা। কিন্তু ওকে পাওয়া যাবে কোথায়? কিছুদিনের মতো এমন নিরুদ্দেশ হয় যে বৌদি কান্নাকাটি শুরু করে দেন, তখন সবাই মিলে খুঁজে ধরে আনে। কিন্তু এমন করেও ত চিরদিন কাটতে পারে না দিদি, ওরও বিয়ে হবে, ছেলে পুলে হবে, তখন যে এ ব্যবস্থায় একেবারে দেউলে হতে হবে!

বন্দনা কহিল, এ কথা তোমরা ওঁকে বলো না কেন?

অন্নদা কহিল, ঢের বলা হয়েছে, কিন্তু ও কান দেয় না। বলে, তোমাদের ভাবনা কেন? দেউলেই যদি হই বৌদিদি ত আর দেউলে হবে না, তখন সকলে মিলে ওঁর ঘাড়ে গিয়ে চাপবো।

বন্দনা হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, মেজদি কি বলেন?

অন্নদা কহিল, দেওরের উপর তাঁর আদরের শেষ নেই। বলেন, আমরা খাবো আর দ্বিজু উপোস করবে নাকি? আমার পাঁচ শ টাকা আয় ত আর কেউ ঘুচোতে পারবে না, আমাদের গরিবী-চালে তাতেই চলে যাবে। বড়বাবু তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে সুখে থাকুন আমরা চাইতে যাবো না।

শুনিয়া বন্দনার কি যে ভালো লাগিল তাহার সীমা নাই। যে বলিয়াছে সে তাহারই বোন। অথচ যে সমাজে, যে আবহাওয়ার মধ্যে সে নিজে মানুষ, সেখানে এ কথা কেহ বলে না, হয়ত ভাবিতেও পারে না। বলার কখনো প্রয়োজন হয় কিনা তাই বা কে জানে।

কিন্তু অন্নদা যাহা বলিতেছিল সে যেন পুরাকালের একটা গল্প। ইহারা একান্নবর্তী পরিবার, কেবল বাহিরের আকৃতিতে নয় ভিতরের প্রকৃতিতে। অন্নদা এখানে শুধু দাসী নয় দ্বিজদাসের সে দিদি। কেবল মৌখিক নয়, আজও সকল কথা তাহার ইহারই কাছে। এই অন্নদার বাবা এই পরিবারের কর্মে গত হইয়াছে, তাহার ছেলে এখানে মানুষ হইয়া এখানেই কাজ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেছে। অন্নদার অভাব নাই, তবু মায়া কাটাইয়া তাহার যাইবার জো নাই। এই সমৃদ্ধ বৃহৎ পরিবারে অনুবিদ্ধ এমন কতজনের পুরুষানুক্রমের ইতিহাস মিলে। দয়াময়ীর অবাধ্য সন্তান দ্বিজদাসও কাল বলিয়াছিল, তাহার মা, দাদা, বৌদি, তাহাদের গৃহদেবতা, অতিথিশালা সমস্ত লইয়াই সে,—তাহাদের হইতে পৃথক করিয়া বন্দনার কোনদিন তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা নাই। তখন বন্দনা অস্বীকার করে নাই বটে, তবু আজই এ কথার যথার্থ তাৎপর্য বুঝিল।

কথা শেষ হয় নাই, অনেক কিছু জানিবার আগ্রহ তাহার প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু বাধা পড়িল। চাকর আসিয়া জানাইল রায়সাহেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ছ'টা বাজিয়াছে। যাত্রা করিবার সময় একঘণ্টার বেশি নাই। প্রস্তুত হইবার জন্য বন্দনাকে উঠিতে হইল।

যথাসময়ে রায়সাহেব নীচে নামিলেন, নামিতে নামিতে মেয়ের নাম ধরিয়া একটা হাঁক দিলেন, বন্দনার কানে আসিয়া তাহা পৌঁছিল। অন্যায় যতবড় হইক, অনিচ্ছা যত কঠিন হউক যাইতেই হইবে। বারংবার জিদ করিয়া সে ব্যবস্থা নিজে ঘটাইয়াছে তাহার পরিবর্তন চলিবে না। ঘর হইতে যখন বাহির হইল এই কথাই সর্বাগ্রে মনে হইল, ভবিষ্যতে যতদূর দৃষ্টি যায় কোনদিন কোন ছলেই এখানে ফিরিয়া আসার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু তাহার অনেক সুখের স্বপ্ন দিয়া এই ঘরখানি যে পূর্ণ হইয়া রহিল তাহা কোনকালে ভুলিতে পারিবে না। সোজা পথ ছাড়িয়া দ্বিজদাসের পাশের বারান্দা ঘুরিয়া নামিবার সময়ে সে ঘরের মধ্যে একবার চোখ ফিরাইল। কিন্তু যে জানালাটা খোলা ছিল তাহা দিয়া দ্বিজদাসকে দেখা গেল না।

মোটরের কাছে দাঁড়াইয়া দত্তমশাই, রায়সাহেব তাঁহাকে ডাকিয়া ভৃত্যদের দেবার জন্য অনেকগুলা টাকা হাতে দিলেন এবং হঠাৎ যাবার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করিয়া দ্বিজদাসের খবরটা তাঁহাকে অতি শীঘ্র জানাইবার অনুরোধ করিলেন।

গাড়িতে উঠিবার পূর্বে বন্দনা অন্নদাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া বলিল, দ্বিজবাবুর তুমি দিদি—তাঁকে মানুষ করেছ,—এই আংটিটি তোমার বৌমাকে দিও অনুদিদি, সে যেন পরে, এই বলিয়া হাতের আংটি খুলিয়া তাহার হাতে দিয়াই বাবার পাশে গিয়া বসিল।

মোটর ছাড়িয়া দিল। এখানে-ওখানে দাঁড়াইয়া কয়েকজন ভৃত্য ও দত্তমশাই নমস্কার করিল।

বন্দনা নিজের অজ্ঞাতসারেই উপর চোখ তুলিল, কিন্তু আজ সেখানে আর একদিনের মত সকলের অগোচরে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দ সংকেতে বিদায় দিতে দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া নাই। আজ সে পীড়িত,—আজ সে নিদ্রায় অচেতন।

ষোল

দয়াময়ীর আচরণে বন্দনার প্রতি সে প্রচ্ছন্ন লাঞ্ছনা ও অব্যক্ত গঞ্জনা ছিল সতীকে তাহা গভীরভাবে বিঁধিয়াছিল। কিন্তু শাশুড়ীকে কিছু বলা সহজ নয়, তাই সে একখানি চিঠি লিখিয়া বোনের হাতে দিবার জন্য স্বামীকে ঘরে ডাকিয়া পাঠাইল। দুপুরের ট্রেনে বিপ্রদাস কলিকাতায় ফিরিবে। এমন সময় দয়াময়ী আসিয়া প্রবেশ করিলেন। এরূপ তিনি কখন করেন না,—ছেলে এবং বৌ উভয়েই বিস্মিত হইল—সতী মাথায় আঁচল টানিয়া দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, শাশুড়ী নিষেধ করিয়া কহিলেন, না বৌমা, যেও না। তোমার অসাক্ষাতে তোমার বোনের নিন্দে করবো না, একটু দাঁড়াও। বিপিন, জানিস তুই, কেন এত ব্যস্ত হয়ে আমি বাড়ি চলে এলুম?

বিপ্রদাস বলিল, ঠিক জানিনে মা, কিন্তু কোথায় কি-একটা গোলযোগ ঘটেছে এইটুকুই আন্দাজ করেচি।

মা কহিলেন, গোলযোগ ঘটেনি কিন্তু ঘটতে পারত। এর থেকে মা দুর্গা আমাকে রক্ষে করেছেন। কাল বেহাই-মশাই বোম্বায়ে চলে যাবেন, কথা ছিল তার পরে বন্দনা এসে কিছুদিন থাকবে ওর মেজদিদির কাছে। কিন্তু মেয়েটার মাথায় যদি এতটুকু বুদ্ধি থাকে ত এখানে সে আর আসতে চাইবে না, বাপের সঙ্গে সোজা বোম্বায়ে চলে যাবে। যদি না যায় যেতে বলে দিস। বৌমা, মনে দুঃখ করো না মা, অমন বোনকে বনবাসে দেওয়া চলে, কিন্তু ঘরে এনে তোলা চলে না।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে চাহিয়া রহিল, তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই। দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমার পোড়াকপাল যে ওকে ভালবাসতে গিয়েছিলুম, মনে করেছিলুম ও আমাদেরই একজন। ওর চালচলনে গলদ আছে,—ভেবেছিলুম, সে-সব ইস্কুল-কলেজে পড়ার ফল,—চাঁদের গায়ে উড়ো মেঘের মত, বাতাস লাগলে উড়ে যাবে—থাকবে না। হাজার হোক সতীর বোন ত বটে! কিন্তু ও বর বেছে নিলে কায়েতের ঘর থেকে, কে জানত বিপিন, বামুনের বংশে জন্মে ওরা এত অধঃপাতে গেছে।

বিপ্রদাস কহিল, ও—এই কথা! কিন্তু ওরা যে জাত মানে না এ খবর তুমি ত শুনেছিলে মা?

দয়াময়ী বলিলেন, শুনেছিলুম, কিন্তু চোখে দেখিনি, বোধ হয় মনে বুঝতেও পারিনি। রূপকথার গল্পের মতো। কিন্তু চোখে দেখলে যে কারো পরে কারো এত বেতেষ্টা জন্মায় তা সত্যিই জানতুম না বাবা। বলিতে বলিতে ঘৃণায় যেন তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, কহিলেন, মরুক গে। যা ইচ্ছে হয় করুক, কে আর আমার ও—কিন্তু আমার বাড়িতে আর না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া আছে দেখিয়া বলিলেন, কৈ জবাব দিলিনে যে বিপিন?

জবাব ত তুমি চাওনি মা! হুকুম দিলে বন্দনা যেন না আসে,—তাই হবে।

তাহার কথা শুনিয়া দয়াময়ী দ্বিধায় পড়িলেন, হুকুমটা কি অন্যায় দিচ্ছি তোর মনে হয়?

হয় বৈ কি মা! বন্দনা অন্যায় কিছু করেনি, সামাজিক আচার-ব্যবহারে আমাদের সঙ্গে তাদের মেলে না, তারা জাত মানে না, এ কথা জেনেই তাকে তুমি আসার আহ্বান করেছিলে, ভালোও বেসেছিলে। তোমার মনে হয়ত আশা ছিল তারা মুখেই বলে কাজ করে না,—এইখানেই তোমার হয়েচে ভুল, আঘাতও পেয়েচো এই জন্যে।

দয়াময়ী বলিলেন, সে হয়ত সত্যি, কিন্তু ওর বিয়ের ব্যাপারটা শুনলে তোরই কি ঘেন্না হয় না বিপিন? তুই বলিস কি বল ত!

বিপ্রদাস স্মিতমুখে কহিল, তার বিয়ে এখনো হয়নি, কিন্তু হলেও আমার রাগ করা উচিত নয় মা। বরঞ্চ এই ভেবে শ্রদ্ধাই করবো যে ওদের বিশ্বাস সত্য কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেলে, ওরা ঠকালে না কাউকে। কিন্তু কলকাতায় অনেককে দেখেচি যারা বাক্যের আড়ম্বরে মানে না কিছুই, জাতিভেদ বিশ্বাসও করে না, গালও দেয় প্রচুর, কিন্তু কাজের বেলাতেই গা ঢাকা দেয়,—আর তাদের খুঁজে মেলে না। তাদেরই অশ্রদ্ধা করি আমি সবচেয়ে বেশি। রাগ করো না মা, তোমার দ্বিজুটি হলো এই জাতের।

শুনিয়া দয়াময়ী মনে মনে যে অখুশী হইলেন তা নয়। দ্বিজুর সম্বন্ধে বলিলেন, ওটা ঐ রকম ফাঁকিবাজ। কিন্তু, আচ্ছা বিপিন, বন্দনাকে যদি তুই ঘৃণাই করিস নে, তবে তার ছোঁয়া কিছু খাসনে কেন? ওকে রান্নাঘরে পাঠাতুম বলে তুই সে-ঘরে খাওয়াই ছেড়ে দিলি, খেতে লাগলি আমার ঘরে। আর কেউ না বুঝুক, আমিও বুঝতে পারিনি ভাবিস?

বিপ্রদাস বলিল, তুমি বুঝবে না ত মা হয়েছিলে কেন? কিন্তু আমি যে সত্যিই জাত মানি মা, আমি ত তার ছোঁয়া খেতে পারিনে। যেদিন মানবো না সেদিন প্রকাশ্যেই তার হাতে খাবো, একটুও লুকোচুরি করবো না!

দয়াময়ী বলিলেন, তুই জানিস নে বিপিন, কি করে আমি তার কাছ থেকে এইটি ঢেকে বেড়াতুম। মেয়েটা এখানে আসুক না আসুক, দেখিস যেন একথা কখনো সে টের না পায়। তার ভারী লাগবে। তোকে সে বড় ভক্তি করে। তাঁহার শেষের কথাগুলি যেন সহসা স্নেহ রসে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, আমাকে সে ভক্তি করে কিনা জানিনে মা, কিন্তু তার ছোঁয়া যে খাইনে এ সে জানে।

অমন অভিমানী মেয়ে এ জেনেও তোকে অত ভক্তি করতো? তার মানে?

ভক্তি করার কথা তোমারই জানো মা, কিন্তু আমি জানি সে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী,—তোমাদের সমস্ত ঢাকাঢাকিই সেখানে নিষ্ফল হয়েছে।

দয়াময়ী ক্ষণকাল নীরবে কি ভাবিলেন, তার পরে বলিলেন, তাই বুঝি সে অতো পীড়াপীড়ি করতো?

কিসের পীড়াপীড়ি মা?

দয়াময়ী বলিতে লাগিলেন, আমি বিধবা মানুষ, আমার ভাতে-ভাত হলেই চলে, কিন্তু সে তা কিছুতে দেবে না। মার্কেট থেকে নানা নতুন তরকারি আনাবে, নিজে কুটে বেছে দেবে, বামুনপিসীকে দিয়ে দশখানা তারকারি জোর করে রাঁধিয়ে নিয়ে তবে ছাড়বে। ও জানতো সামনে এসে যার দেওয়া চলে না তাকে পরের হাত দিয়ে ঘুষ পাঠাতে হয়। কেন খেয়েও কি বুঝতে পারিস নি বিপিন, অমন রান্না পিসী তার বাপের জন্মেও রাঁধতে জানে না?

বিপ্রদাস সহাস্যে উত্তর দিল, না মা, অত লক্ষ্য করিনি। শুধু মাঝে মাঝে সন্দেহ হতো তোমার অতিথিদের সে-রান্নাঘরের বিপুল আয়োজনের টুকরা-টাকরা হয়ত আমাদের এ-রান্নাঘরেও ছিটকে এসে পড়েছে। কিন্তু সে যে দৈবকৃত নয় একজনের ইচ্ছাকৃত, এ খবর

আনন্দের। কিন্তু তোমার শেষ আদেশ জানিয়ে দাও মা। ট্রেনের সময় হয়ে এলো, আমাকে এখনি ছুটতে হবে,—তার নিমন্ত্রণ তুমি রাখলে, না প্রত্যাহার করলে তাই বলো।

দয়াময়ী সতীকে উদ্দেশ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলো বৌমা?

ছেলেবেলায় সতী শাশুড়ীর সম্মুখে স্বামীর সহিত কথা কহিত, কিন্তু এখন আর বলে না। প্রায়ই পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়, নয় নিরুত্তরে থাকে। কিন্তু আজ কথা কহিল, আস্তে আস্তে বলিল, থাক গে মা, এখানে তার আর এসে কাজ নেই।

জবাব শুনিয়া শাশুড়ী খুশী হইতে পারিলেন না। তাঁহার অভিলাষ ছিল অন্য প্রকার, অথচ নিজের মুখে প্রকাশ করাও চলে না। বলিলেন, বড়মানুষের মেয়ের অভিমান হলো বুঝি?

না মা, অভিমান নয়, কিন্তু যা করে আমরা চলে এসেচি তার পরে আর তাকে এখানে ডাকা চলে না।

কেন চলবে না বৌমা, একটা অন্যায় যদি হয়েই থাকে তার কি আর সংশোধন নেই?

নেই বলিনে, কিন্তু দরকার কি? আগেও অনেকবার সে আসতে চেয়েছে, কিন্তু কখনো আমরা রাজী হতে পারিনি, এখনো সমস্ত বাধা তেমনি আছে। সে ঢুকতো বলে উনি রান্নাঘরের সম্পর্ক ছেড়েছিলেন, কাজ কি তাকে এখানে এনে?

বিপ্রদাস কহিল, সে নালিশ তার, তোমার নয়। বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল, কহিল, তবু বন্দনা আমাকে প্রচণ্ড ভক্তি করে, স্বয়ং মা তার সাক্ষী।

সতী মুখ তুলিয়া চাহিল, বোধ হয় হঠাৎ ভুলিয়া গেল, শাশুড়ী আছেন, বলিল, শুধু মা কেন আমিও তার সাক্ষী। মেয়েরা ভক্তি যখন করে তখন নালিশ আর করে না। দেব-দেবতাও কম পীড়ন করেন না, তবু পূজো বন্ধ করে না, বলে—দুঃখ দিয়েছেন তিনি ভালোর জন্যেই। শাশুড়ীকে বলিল, তোমাকেও বন্দনা কম ভক্তি করেনি মা, কম ভালোবাসে নি। তোমার ধারণা তোমার ঘরে সে খাবার আয়োজন করে দিত কেবল ওঁর জন্যে? তা নয়, করত সে তোমাদের দু'জনের জন্যেই,—তোমাদের দু'জনকেই ভালোবেসে। তার পরে দিয়েছিলে তুমি রান্নাঘরের ভার—সকলকে খেতে দেবার কাজ, কিন্তু তোমাকে অবহেলা করে সে আর সকলকে পোলাও-কালিয়া খাওয়াতে পারত না মা, ভাতে-ভাত সবাইকে গিলতে হতো। কিন্তু আর কেন তাকে টানাটানি করা? আমরা যা চেয়েছিলুম সে আশা ঘুচেছে—সে আর ফিরবে না মা। এই বলিয়া সতী দ্রুত প্রস্থান করিল।

দারুণ বিস্ময়ে উভয়েই হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন। সতীর স্বভাবে এরূপ উক্তি, এরূপ আচরণ এমনি সৃষ্টিছাড়া যে ভাবাই যায় না সে প্রকৃতিস্থ আছে। বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি মা?

দয়াময়ী কহিলেন, জানিনে ত বাবা।

কিসের জন্যে বন্দনাকে তোমরা চেয়েছিলে মা? কিসের আশা ঘুচলো?

দয়াময়ী মনে মনে লজ্জায় মরিয়া গেলেন, কিছুতে মুখে আনিতে পারিলেন না, কি তাঁর সঙ্কল্প ছিল। শুধু বলিলেন, সে-সব কথা আর একদিন হবে বিপিন, আজ না।

মা, অক্ষয়বাবুর মেয়ের সম্বন্ধে কি কিছু স্থির করলে? তাঁদের ত একটা জবাব দেওয়া চাই।

আমার আপত্তি নেই বিপিন, তোদের মত হলেই হবে। দ্বিজুকেও জিজ্ঞাসা করিস সে কি বলে। এই বলিয়া তিনিও ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। বিপ্রদাস সংশয়ে পড়িল। স্পষ্ট বিশেষ হইল না, কিন্তু স্পষ্ট করিয়া লইবারও সময় আর ছিল না।

বিপ্রদাস কলিকাতায় আসিয়া দেখিল বাড়ি খালি। বন্দনা ও তাহার পিতা ঘণ্টা-কয়েক পূর্বে চলিয়া গেছেন। এ সংশয় যে তাহার একেবারে ছিল না তা নয়, কিন্তু এতটা আশঙ্কা করে নাই। অন্নদা কারণ জানে না, শুধু এইটুকু জানে যে যাবার ইচ্ছা রায়সাহেবের তেমন

ছিল না, কেবল কন্যাই জিদ করিয়া পিতাকে টানিয়া লইয়া গেছে। বন্দনার পরে দাবী কিছুই নাই, থাকার দায়িত্বও তাহার নয়, এখানে সে অতিথি মাত্র, তবু সে যে দেখা না করিয়া পীড়িত দ্বিজদাসকে অচেতন ফেলিয়া রাখিয়া অকারণ ব্যস্ততায় চলিয়া গেছে,—মনে করিতে তাহার ক্লেশ বোধ হইল। অনেকটা রাগের মতো—নির্দয়, নিষ্ঠুর বলিয়া যেন শাস্তি দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রকাশ করা তাহার প্রকৃতি নয়, সে ভাব তাহার মনের মধ্যেই রহিয়া গেল।

দিন-চারেক পরে বিপ্রদাস হাইকোর্ট হইতে ফিরিল প্রবল জ্বর লইয়া। হয়ত ম্যালেরিয়া, হয়ত বা আর কিছু। চোখ রাঙ্গা, মাথার যন্ত্রণা অত্যন্ত বেশি, অন্নদা কাছে আসিলে বলিল, অনুদি, অসুখ ত কখন হয় না, বহুকাল জ্বরাসুর দৈত্যটাকে ফাঁকি দিয়ে এসেচি, এবার বুঝি বা সে সুদে-আসলে উসুল করে। মনে হচ্চে কিছু ভোগাবে, সহজে নিষ্কৃতি দেবে না।

অবস্থা দেখিয়া অন্নদা চিন্তিত হইল, কিন্তু নির্ভয়ের সুরে সাহস দিয়া বলিল, না দাদা, তোমার পুণ্যের দেহ, এতে দৈত্য-দানার বিক্রম চলবে না, তুমি দু'দিনেই ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়ে দিই—আমি তাচ্ছিল্য করতে পারবো না।

তাই দাও দিদি, বলিয়া বিপ্রদাস শয্যা গ্রহণ করিল।

অন্নদা বিপদে পড়িল। ওদিকে হঠাৎ বাসুদেবের অসুখের সংবাদে কাল দ্বিজদাস বাড়ি গেছে, দত্তমশাই শহরে নাই—মনিবের কাজে তিনিও ঢাকায়। একাকী কি করিবে ভাবিয়া না পাইয়া সকালে আসিয়া বলিল, বিপিন, একটা কথা বলব ভাই রাগ করবে না ত?

তোমার কথায় কখনো রাগ করেচি অনুদি?

অন্নদা পাশে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, প্রাণ দিয়ে রোগের সেবা করতেই পারি, কিন্তু মুখ্যু মেয়েমানুষ জানিনে ত কিছু, বাড়িতেও খবর পাঠাতে পারচিনে, ছেলের অসুখ—ফেলে রেখে বৌ আসবে কি করে—কিন্তু বন্দনাদিদিকে একটা খবর দিলে হয় না?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, বোম্বাই কি এ-পাড়া ও-পাড়া দিদি, যে, খবর পেয়ে সে দেখতে আসবে। হয়ত তার নুন আনতেই এদিকের পান্তা ফুরিয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

অন্নদা জিভ কাটিয়া বলিল, বালাই ষাট, এমন কথা মুখে আনতে নেই ভাই। বন্দনাদিদি কলকাতায় আছে, এখনো তার বোম্বায়ে যাওয়া হয়নি।

বন্দনা কলকাতায় আছে?

হাঁ, তার মাসীর বাড়িতে বালিগঞ্জে। মেসো পাঞ্জাবের বড় ডাক্তার, মেয়ের বিয়ে দিতে দেশে এসেছেন। হঠাৎ হাওড়ার ইস্টিশানে দেখা, তাঁরাও নাবচেন গাড়ি থেকে, এঁরাও যাচ্ছেন বোম্বায়ে। মাসী জোর করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, বললেন, দৈবাৎ যখন পাওয়া গেল তখন মেয়ের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তিনি কিছুতে ছেড়ে দেবেন না। শুধু একদিন আটকে রেখে ওর বাপকে তারা যেতে দিলে।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, মাসীটি কি চেনা?

হাঁ, আপনার বড়মাসী। দূরে দূরে থাকে। সর্বদা দেখাশুনো হয় না, সত্যি, কিন্তু আপন লোক বটে।

তুমি এত কথা জানলে কি করে অনুদি?

কাল এসেছিলেন তাঁরা বেড়াতে, দ্বিজুর খবর নিতে। দুপুরবেলায় ওপরের বারান্দায় বসে নাতির জন্যে কাঁথা সেলাই করচি, দেখি বাইরের উঠানে দু-গাড়ি লোক এসে উপস্থিত। মেয়ে-পুরুষে অনেকগুলি। কে এঁরা? উঁকি মেরে দেখি আমাদের বন্দনাদিদি। কিন্তু সাজ-সজ্জায় এমনি বদলেছে যে হঠাৎ চেনা যায় না, যেন সে মেয়ে নয়। কি করি, কোথায় বসাই,—ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। খানিক পরে দিদি এলেন ওপরে, সকলের খবর নিলেন, খবর

দিলেন,—তাঁর নিজের মুখেই শুনতে পেলুম অন্ততঃ মাসখানেক কলকাতায় থাকা হবে। বললেন, বেশ আছি। থিয়েটার, সিনেমা, চড়িভাতি, বাগান-বাড়ি—আমাদের শেষ নেই। নিত্য নতুন ঘটা।

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বাসুর অসুখের খবর তাকে দিয়েছিলে?

হাঁ, দিলুম বৈ কি। শুনে বললেন, ও কিছু না,—সেরে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, তাকে খবর দিয়ে কি হবে অনুদি, আমিও সেরে যাবো। সে কটা দিন তুমি একলা পারবে না আমাকে দেখতে?

অন্নদা জোর করিয়া কহিল, পারবো বৈ কি ভাই, কিন্তু তবু মনে হয় একবার জানানো উচিত, নইলে বউ হয়ত দুঃখ করবে। হাজার হোক বোন ত?

ঠিকানা জানো?

আমাদের শোফার জানে। ওদের পৌঁছে দিয়ে এসেছিল।

বিপ্রদাস অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আচ্ছা দাও একটা খবর। কিন্তু অতো আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে কি সে আসতে পারে? মনে ত হয় না দিদি।

অন্নদা বলিল, মনে আমারও বড়ো হয় না ভাই। তার সাজগোজের কথাই কেবল চোখে পড়ে। তবুও একবার বলে পাঠাই।

বিপ্রদাস নিরুৎসুক ক্লান্তকণ্ঠে শুধু বলিল, পাঠাও দিদি, তাই যখন তোমার ইচ্ছে।

সতের

হঠাৎ বড়মাসীর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে বন্দনার যখন দেখা হইয়া গেল, তখন বোম্বাই যাওয়া বন্ধ করিয়া তাহাকে বাড়ি ফিরাইয়া আনা মাসীর কষ্টসাধ্য হইল না। তিনি মেয়ের বিবাহ-উপলক্ষে স্বামীর কর্মস্থল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে দেশে আসিতেছিলেন। মাসীর প্রস্তাবে রাজী হওয়ার আসল কারণটা ছাড়া আরও একটা হেতু ছিল এখানে তাহা প্রকাশ করা প্রয়োজন। বন্দনার ছেলেবেলা হইতে এতকাল সুদূর প্রবাসেই দিন কাটিয়াছে, তাহার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই সেদিকের, অথচ, যে সমাজের অন্তর্গত সে, তাহার বৃহত্তর অংশটাই আছে কলিকাতায় ইহার সহিত আজও তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই। সামান্য পরিচয় যেটুকু সে শুধু খবরের কাগজ, মাসিকপত্র ও সাধারণ সাহিত্যের গল্প-উপন্যাসের সহযোগে। কলিকাতায় সর্বদা আনাগোনা যাহাদের, তাহাদের মুখে মুখে অনেক তথ্য মাঝে মাঝে তাহার কানে আসে—অ্যানিটা চ্যাটার্জি এম. এ., বিনীতা ব্যানার্জি বি. এ., অনসূয়া, চিত্রলেখা, প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি বহু জমকালো নাম ও চমকানো কাহিনী—বিংশ শতাব্দের অত্যাধুনিক মনোভাব ও রোমাঞ্চকর জীবনযাত্রার বিবরণ—কিন্তু ইহার কতকটা যে যথার্থ ও কতটা যে বানানো দূরে হইতে নিঃসংশয়ে অনুমান করা ছিল তাহার পক্ষে কঠিন। তাই আপন সমাজের কোন চিত্রটা ছিল তাহার মনের মধ্যে অতিরঞ্জিত ঘোরালো, কোনটা বা ছিল অস্বাভাবিক রকমের ফিকা, এই ছবিগুলিই প্রত্যক্ষ পরিচয়ে স্পষ্ট ও সত্য করিয়া লইবার সুযোগ মাসীমার মেয়ে প্রকৃতির বিবাহ উপলক্ষে যখন মিলিল তখন বন্দনা উপেক্ষা করিতে পারিল না, সহজেই সম্মত হইয়া তাঁহার বালিগঞ্জের গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। আপন দলের বহুজনের সঙ্গে তাঁহাদের জানাশুনা, বিশেষতঃ প্রকৃতি এখানকার স্কুল-কলেজে পড়িয়াই বি. এ. পাস করিয়াছে, তাহার নিজের বন্ধু ও বান্ধবীর সংখ্যাও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। আসিয়া পর্যন্ত এই দলের মাঝখানেই বন্দনার এই কয়দিন কাটিল। পিতা অনাথ রায় বোম্বায়ে ফিরিয়া গেলেন, কিন্তু সুধীর রহিল কলিকাতায়। আসন্ন-বিবাহের আনন্দোৎসব নিত্যই চলিয়াছে, সেদিন বেলঘরের একটা বাগানে পিকনিক সারিয়া সদলবলে বাড়ি ফিরিবার পথেই সে দ্বিজ দাসের সংবাদ লইতে এ বাড়িতে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। এই খবরটাই অন্নদা সেদিন বিপ্রদাসকে দিয়াছিল।

মাসীর বাড়িতে দলের লোকের আসা-যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া, সলা-পরামর্শের কামাই নাই

আজও ছিল অনেকের চায়ের নিমন্ত্রণ। অতিথিগণ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, উপরের ঘরে মহাসমারোহে চলিয়াছে চা-খাওয়া। এমন সময়ে বিপ্রদাসের প্রকাণ্ড মোটর আসিয়া গেটের মধ্যে প্রবেশ করিল। ভৃত্যের দল অবহিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শোফার দরজা খুলিয়া দিতে যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি অবতরণ করিল তাহার পোশাকের সামান্যতায় ও স্বল্পতায় সকলে বিস্মিত ও বিব্রত হইয়া পড়িল। মোটরের সঙ্গে মানুষটির সামঞ্জস্য নাই। অন্নদার পরনে ছিল সাদা থান, তেমনি একটা সাদা মোটা চাদর গায়ে জড়ানো, পা খালি, হাত খালি, মাথার আঁচলটা কপালের অর্ধেকটা চাপা দিয়াছে—সে নিজেও যেন সলজ্জ সঙ্কোচে কিছু জড়সড়ো। ভৃত্য বেহারাদের চাপকান-পাগড়ির সাজসজ্জায় বুঝা কঠিন কে কোন্ দেশের, তথাপি সম্মুখের লোকটাকে বাঙালী আন্দাজ করিয়া অন্নদা জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনাদিদি বাড়ি আছেন?

সে বাঙালীই বটে, কহিল, হাঁ আছেন। তাঁরা উপরে চা খাচ্চেন, আপনি ভেতরে এসে বসুন।

না, আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে একটু খবর দিতে পারবে না?

পারবো। কি বলতে হবে?

বলো গে বিপ্রদাসবাবুর বাড়ি থেকে অন্নদা এসেছে।

বেহারা চলিয়া গেল, অনতিবিলম্বে বন্দনা নীচে আসিয়া অন্নদার হাত ধরিয়া ঘরে আনিয়া বসাইল। এমন সে কখনও করে নাই, ভুলিয়া গেল সামাজিক পর্যায়ে এই বিধবা তাহার কাছে অনেক ছোট—ও-বাড়ির দাসী মাত্র। অকারণে তাহার চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিল, অনুদি, তুমি যে আমার খবর নিতে আসবে এ আমি মনে করিনি। ভেবেছিলুম আমাকে তোমরা ভুলে গেছো।

ভুলবো কেন দিদি, ভুলিনি। বড়বাবু আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন বলতে—

না অনুদি, আমাকে আপনি বলে ডাকলে আর আমি জবাব দেবো না।

অন্নদা আপত্তি করিল না, শুধু হাসিয়া বলিল, ওদের মানুষ করেচি বলেই 'তুমি' বলে ডাকি, নইলে ও-বাড়ির আমি দাসী বৈ ত নয়।

বন্দনা বলিল, তা হোক। কিন্তু মুখুয্যেমশাই ত এসেছেন পাঁচ-ছ'দিন হল কলকাতায় নিজে বুঝি একবার আসতে পারতেন না? তিনি ত জানেন আমি বোম্বায়ে যাইনি।

হাঁ, আমার মুখে এ খবর তিনি শুনেছেন। কিন্তু জানো ত দিদি তাঁর কত কাজ! এতটুকু সময় ছিল না।

এ কথা শুনিয়া বন্দনা খুশী হইল না, বলিল, কাজ সকলেরই আছে অনুদি। আমরা গিয়েছিলুম বলেই ভদ্রতা-রক্ষার ছলনায় তোমাকে তিনি পাঠিয়েছেন, নইলে মনেও করতেন না। তাঁকে বলো গিয়ে আমার মাসীমার তাঁদের মতো ঐশ্বর্য নেই বটে, তবু একবার আমার খোঁজ নিতে এ-বাড়িতে পা দিলে তাঁর জাত যেতো না। মর্যাদারও লাঘব হতো না।

এ-সকল অনুযোগের উত্তর অন্নদার দিবার নয়। সে ও-বাটীতে যাইবার অনুরোধ করিতে গেল, কিন্তু শুনিবার ধৈর্য বন্দনার নাই, অন্নদার অসম্পূর্ণ কথার মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, না অনুদি, সে হবে না। কোথাও যাবার আমার সময় নেই। কাল বাদে পরশু আমার বোনের বিয়ে।

পরশু?

হাঁ পরশু।

এ সময় অসুখের সংবাদ দেওয়া উচিত কি না অন্নদা ভাবিতেছিল, কিন্তু সে তখনি প্রশ্ন করিয়া উঠিল, আমাকে যাবার হুকুমটা দিল কে? ছোটবাবু ত নেই জানি, বড়বাবু বোধ করি? কিন্তু তাঁকে বলো গিয়ে হুকুম চালিয়ে তাঁর অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। আমি খাতক নই, তাঁর জমিদারির আমলাও নই। আমাকে অনুরোধ করতে হয় নিজে এসে। মেজদি ভাল আছেন?

হাঁ আছেন।

আর সকলে?

অন্নদা বলিল, খবর এসেছে ছেলের অসুখ।

কার অসুখ,—বাসুর? কি হয়েছে তার?

সে আমি ঠিক জানিনে দিদি।

বন্দনা চিন্তিতমুখে বলিল, ছেলের অসুখ তবু নিজে না গিয়ে মুখুয্যেমশাই এখানে বসে আছেন যে বড়ো? মামলা-মকদ্দমা আর টাকাকড়ির টানটাই কি হলো তাঁর এত বেশি অনুদি? একটা হিতাহিত বোধ থাকা উচিত।

অন্নদা বলিল, টাকার টান নয় দিদি, আজ দুদিন থেকে তিনি নিজেও শয্যাগত। ছেলের অসুখে সেখনে তারা বিব্রত, খবর দেওয়াও যায় না, অথচ এখানে দত্তমশাই পর্যন্ত নেই—তিনি গেছেন ঢাকায়, একা আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ কিছুই বুঝিনে, ভয় হয় অসুখটা পাছে শক্ত হয়ে ওঠে। বিপিনের কখনো কিছু হয় না বলেই ভাবনা। বিয়েটা চুকে গেলে একবার পারবে না যেতে দিদি?

শঙ্কায় বন্দনার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল,—ডাক্তার এসেছেন? কি বলেন তিনি?

বললেন, ভয় নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে অন্য ডাক্তার ডাকতেও বলে গেলেন। অন্নদার চোখে জলে ভরিয়া গেল, বন্দনার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, এ দু'টো দিন যেমন করে হোক কাটাবো, কিন্তু বিয়ে চুকে গেলেও যাবে না? আমাদের ওপর রাগ করেই থাকবে? তোমাদের কোথায় কি ঘটেছে আমার জানবার কথা নয়, জানিও নে, কিন্তু এ জানি আর যে-ই দোষ করে থাক বিপিন কখনো করেনি। তাকে না জানলে হয়ত ভুল হয়, কিন্তু জানলে এ ভুল হবে না দিদি।

বন্দনা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, চলো আমি যাচ্ছি।

এখুনি যাবে?

হ্যাঁ, এখুনি বৈ কি।

বাড়িতে বলে যাবে না? এঁরা ভাববেন যে।

বলতে গেলে দেরি হবে অনুদি, তুমি এসো। এই বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া মোটরে গিয়া বসিল। বেহারাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকিয়া বলিয়া দিল, মাসীমাকে জানাইতে সে মেজদির বাড়িতে চলিল, সেখানে বিপ্রদাসবাবুর অসুখ।

বন্দনা আসিয়া যখন বিপ্রদাসের ঘরে প্রবেশ করিল তখন বেলা গেছে কিন্তু আলো জ্বালার সময় হয় নাই। বিপ্রদাস বালিশগুলা জড়ো করিয়া দেওয়ালে হেলান্ দিয়া বিছানায় বসিয়া, মুখ দেখিয়া মনে হয় না যে অসুখ গুরুতর। মনের মধ্যে স্বস্তি বোধ করিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই নমস্কার করি। মেজদি উপস্থিত থাকলে রাগ করতেন, বলতেন গুরুজনের পায়ের ধূলো নিয়েই প্রণাম করতে। কিন্তু ছুঁতে ভয় করে পাছে ছোঁয়া যান!

বিপ্রদাস কিছুই না বলিয়া শুধু একটু হাসিল। বন্দনা বলিল, ডেকে পাঠিয়েছেন কেন,—সেবা করতে? অনুদি বলছিলো, ওষুধ খাওয়াবার সময় হয়েছে। কিন্তু একি ব্যাপার! ডাক্তারি ওষুধের শিশি যে? কবরেজের বড়ি কৈ? ডাক্তার ডাকার বুদ্ধি দিলে কে আপনাকে?

বিপ্রদাস কহিল, আমাদের চলতি ভাষায় ডেঁপো বলে একটা কথা আছে তার মানে জানো বন্দনা?

বন্দনা বলিল, জানি মশাই জানি। মানুষ হয়ে যারা মানুষকে ঘেন্না করে, ছোঁয় না তাদের বলে। তাদের চেয়ে বড় ডেঁপো সংসারে আর কেউ আছে নাকি?

বিপ্রদাস বলিল, আছে। যাদের সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবার ধৈর্য নেই, অকারণে নির্দোষীকে হুল ফুটিয়ে যারা বাহাদুরি করে তারা। তাদের দলের মস্তবড় পাণ্ডা তুমি নিজে।

অকারণে কোন্ নির্দোষী ব্যক্তিটিকে হুল ফুটিয়েছি আপনি বলে দিন ত শুনি?

আমাকে বলে দিতে হবে না বন্দনা, সময় এলে নিজেই টের পাবে।

আচ্ছা, সেই দিনের প্রতীক্ষা করে রইলুম, এই বলিয়া বন্দনা খাটের কাছে একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল, বলিল, এখন বলুন নিজে কেমন আছেন?

ভালো আছি, কিন্তু জ্বরটা রয়েছে। রাত্রে আর একটু বাড়বে বলে মনে হয়।

কিন্তু আমাকে ডেকে পাঠলেন কেন? আমাকে আপনার কিসের দরকার?

দরকার আমার নয়, অনুদিদির, সে-ই ভয় পেয়েচে। তার মুখে শুনলুম, পরশু তোমার বোনের বিয়ে, চুকে গেলে একদিন এসো। আমার জবানি তোমার মেজদি কিছু খবর পাঠিয়েছেন সেগুলো তোমাকে শোনাবো।

আজ পারেন না?

না, আজ নয়।

বন্দনা মিনিট-দুই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল, তার পরে কহিল, মুখুয্যেমশাই অসুখ আপনার বেশি নয়, দু'দিনেই সেরে উঠবেন। আমি জানি আমাকে প্রয়োজন নেই, তবুও আপনার সেবার ভান করেই আমি থাকবো, সেখানে ফিরে যাবো না। আমার তোরঙ্গটা আনতে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি, আপনি আপত্তি করতে পারবেন না।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, কিসের আপত্তি বন্দনা, তোমার থাকার? কিন্তু বোনেরও বিয়ে যে!

বিয়ে ত আমার সঙ্গে নয়—আমি না গেলেও বোনের বিয়ে আটকাবে না।

সত্যি থাকবে না বিয়েতে?

না।

কিন্তু এরই জন্যে যে কলকাতায় রয়ে গেলে?

বন্দনা কহিল, যাচ্ছিলুম বোম্বায়ে, স্টেশন থেকে ফিরে এলুম, কিন্তু ঠিক এই জন্যেই নয়। দূরে থাকি, আপন সমাজের প্রায় কাউকে চিনিনে, মুখে মুখে কত কথা শুনি, গল্প, উপন্যাসে কত কি পড়ি, তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে পারিনে—মনে হয় বুঝি বা আমরা সমাজছাড়া এক-ঘরে! মাসীমা ডাকলেন, ভাবলুম প্রকৃতির বিয়ের উপলক্ষে দৈবাৎ সে সুযোগ মিললো, এমন আর পাবো না। তাই ফিরে এলুম মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, কিন্তু এই বিয়েটাই যে বাকী এখনো। দলের লোকদের চেনবার সুযোগ পেলে কৈ?

সুযোগ পুরো পাইনি সত্যি, কিন্তু যতটা পেয়েচি সে-ই আমার যথেষ্ট।

নিজের সঙ্গে এঁদের কতখানি মিললো বন্দনা? শুনতে পারি কি?

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল, বলিল, আপনি সেরে উঠুন তার পরে বিস্তারিত করে শোনাবো।

চাকরে আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। শিয়রের জানালাটা বন্ধ করিয়া বন্দনা ঔষধ খাওয়াইল, কহিল, আর বসে নয়, এবার আপনাকে শুতে হবে। এই বলিয়া এলোমেলো বিছানাটা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া বালিশগুলো ঠিক করিয়া দিল, বিপ্রদাস শুইয়া পড়িলে পা হইতে বুক পর্যন্ত চাদর দিয়া ঢাকিয়া দিয়া বলিল, সেরে উঠে নিজেকে শুদ্ধশুচি করে তুলতে না জানি কত গোবর-গঙ্গাজলই না আপনার লাগবে!

বিপ্রদাস দুই হাত প্রসারিত করিয়া বলিল, এত। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, সেবাযত্ন করতেও একটু জানো দেখচি।

জানি একটু? না মুখুয্যেমশাই, এ চলবে না। আমাদের সম্বন্ধে আপনাকে আরো একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে।

অর্থাৎ—

অর্থাৎ আমাদের নিন্দেই যদি করেন সজ্ঞানে করতে হবে। এমনধারা চোখ বুজে যা-তা বলতে আমি দেবো না। বিপ্রদাসের মুখে পরিহাসের চাপা হাসি, কহিল, এই আমাদেরটা

কারা বন্দনা? কাদের সম্বন্ধে আরও একটু খোঁজ-খবর নিতে হবে? যাদের থেকে এইমাত্র পালিয়ে এলে তাদের?

কে বললে আমি পালিয়ে এলুম?

আমি বলচি।

জানলেন কি করে?

জানলুম তোমার মুখ দেখে।

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার চোখে কিছুই এড়ায় না। কথাটা যে কতখানি সত্যি আমি বিশ্বাস করিনি। আপনার অসুখ আমি চাইনে, কিন্তু এ আমাকে সত্যিই উদ্ধার করেছে। সত্যিই পালিয়ে এসে আমি বেঁচে গেছি। যে ক'টা দিন আপনি অসুস্থ আমি আপনার কাছেই থাকবো, তার পরে সোজা বাবার কাছে চলে যাবো—মাসীর বাড়িতে আর ফিরবো না। দূর থেকে যাদের দেখতে চেয়েছিলুম তাদের দেখা পেয়ে গেছি, এমন ইচ্ছে আর নেই যে একটা দিনের জন্যেও ওদের মধ্যে গিয়ে কাটিয়ে আসি।

বিপ্রদাস নীরবে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, ওদের শুধু শাড়ী গাড়ি আর মিথ্যে ভালোবাসার গল্প। কোথায় নৈনি আর কোথায় মুসৌরির হোটেল আমি জানিও নে, কিন্তু ওদের মুখে মুখে তার কি-বে নোংরা চাপা ইঙ্গিত,—শুনতে শুনতে ইচ্ছে হতো, কোথাও যেন ছুটে পালিয়ে যাই। আজ এই ঘরের মধ্যে বসে মনে হচ্ছে যেন এই ক'টা দিন অবিশ্রাম এলোমেলো ধূলোবালির ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে আমার দিনরাত কেটেছে। এর ভেতর ওরা বাঁচে কি করে মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস বলিল, সে রহস্য আমার জানার কথা নয়। মরুভূমির মধ্যে কবরগুলো যেমন টিকে থাকে বোধ করি তেমনি করে।

বন্দনা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দুঃখের জীবন। ওদের না আছে শান্তি, না আছে কোন ধর্মের বালাই। কিছু বিশ্বাস করে না, কেবলি করে তর্ক। একটু থামিয়া বলিল, খবরের কাগজ পড়ে, ওরা জানে অনেক। পৃথিবীর কোথায় কি নিত্য ঘটচে কিছুই ওদের অজানা নয়। কিন্তু আমি ত ও-সব পড়তে পারিনে, তাই অর্ধেক কথা বুঝতেই পারতুম না। শুনতে শুনতে যখন অরুচি ধরে যেতো তখন আর কোথাও সরে গিয়ে নিশ্বেস ফেলে বাঁচতুম। কিন্তু তাদের ত ক্লান্তি নেই, তারা বকতে বকতে সবাই যেন মেতে উঠতো।

কিন্তু তোমার বাবা কাছে থাকলে সুবিধে হত বন্দনা। খবরের কাগজের সব খবর তাঁকে জিজ্ঞেসা করলেই টের পেতে—ওদের কাছে ঠকতে হতো না।

বন্দনা হাসিমুখে সায় দিয়া বলিল, হাঁ, বাবার সে বাতিক আছে। সমস্ত খবর খুঁটিয়ে না পড়ে তাঁর তৃপ্তি নেই। কিন্তু আমাদের মেয়েদের তাতে দরকার কি বলুন ত? কি হবে জেনে পৃথিবীর কোথায় কি দিনরাত ঘটচে!

এ কথা তোমার মেজদির মুখে শোভা পায় বন্দনা, তোমার মুখে নয়। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

বন্দনা বলিল, তারা কি আমার মেজদির চেয়ে বেশী জানে মনে করেছেন? একটুও না। শূন্য কলসী বলেই মুখ দিয়ে তাদের এত আওয়াজ বার হয়। তাদের আর কিছু না জেনে থাকি এ খবরটা জেনে নিয়েচি মুখুয্যেমশাই।

কিন্তু জ্ঞান ত চাই।

না চাইনে! জ্ঞানের আস্ফালনে মুখের মধু তাদের বিষ হয়ে উঠচে। জানে তারা আমার মেজদির মতো সবাইকে ভালবাসতে? জানে না। পারে তারা মেজদির মতো ভক্তি করতে? পারে না। ওদের বন্ধুই কি কেউ আছে? মনে হয় কেউ নেই এমনি পরস্পরের বিদ্বেষ। তাদের অভাবটাই কি কম? বাইরের জাঁকজমকে বোঝাই যাবে না ভেতরটা ওদের এত

ফোঁপরা। কিসের জন্যে ওদের নিয়ে এত মাতামাতি? সমস্ত ভেতরটা যে একেবারে ঘুণে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, হয়েছে কি বন্দনা, এত রাগ কিসের? কেউ টাকা ঠকিয়ে নেয়নি ত?

না, ঠকিয়ে নেয়নি, ধার নিয়েছে।

কত?

বেশি না চার-পাঁচ শ'।

তাদের নাম জানো ত?

জানতুম কিন্তু ভুলে গেছি। এই বলিয়া বন্দনা হসিয়া ফেলিল, কহিল, ছি ছি, এত অল্প পরিচয়েও যে কেউ কারও কাছে টাকা চাইতে পারে আমি ভাবতেও পারিনে। বলতে মুখে বাধে না, লজ্জার ছায়া এতটুকু চোখে পড়ে না, এ যেন তাদের প্রতিদিনের ব্যাপার। এ কি করে সম্ভব হয় মুখুয্যেমশায়?

বিপ্রদাসের মুখ গম্ভীর হইল, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া কহিল, তোমার মনটাকে তারা বড় বিষিয়ে দিয়েছে বন্দনা, কিন্তু সবাই এমনি নয়, ঐ মাসীমার দলটাই তেমাদের সমস্ত দল নয়। যারা বাইরে রয়ে গেল খুঁজলে হয়ত তাদেরও একদিন দেখা পাবে।

বন্দনা বলিল, পাই ভালোই। তখন ধারণা আমার সংশোধন করবো, কিন্তু যাদের দেখতে গেলুম তারা সবাই শিক্ষিত, সবাই পদস্থ লোকের আত্মীয়। গল্প-উপন্যাসের রঙ-করা ভাষায় সজ্জিত হয়ে এরা দূরে থেকে আমার চোখে কি আশ্চর্য অপরূপ হয়েই না দেখা দিত। মনে গর্বের সীমা ছিল না, ভাবতুম আমাদের মেয়েদের পেছিয়ে পড়ার দুর্নাম এবার ঘুচলো। আমার সেই ভুল এবার ভেঙ্গেচে মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, ভুল কিসের? এঁরা যে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন এ ত মিথ্যে নয়।

শুনিয়া বন্দনা হাসিল, বলিল, না মিথ্যে হবে কেন, সত্যিই। তবু আমার সান্ত্বনা এই যে সংখ্যায় এঁরা অত্যন্ত স্বল্প,—এঁদেরই গড়ের মাঠের মনুমেন্টের ডগায় ঠেলে তুলে হট্টগোল বাধানো যেমন নিষ্ফল তেমনি হাস্যকর।

বিপ্রদাস বলিল, এ হচ্চে তোমার আর এক ধরনের গোঁড়ামি। স্বধর্মত্যাগের বিপদ আছে বন্দনা,—সাবধান।

বন্দনা এ কথায় কান দিল না, বলিতে লাগিল এই নগণ্য দলের বাইরে রয়েছে বাঙলার প্রকাণ্ড নারীসমাজ। এদের আমি আজও দেখিনি, বাইরে থেকে বোধ করি দেখাও মেলে না, তবু মনে হয় বাতাসের মতো এরাই আছে বাঙালীর নিশ্বাসে মিশে। জানি, এদের মধ্যে আছে ছোট, আছে বড়—বড়র দৃষ্টান্ত রয়েছে আমার মেজদিতে, তাঁর শাশুড়ীতে,—এবার কলকাতায় আসা আমার সার্থক হলো মুখুয্যেমশাই। আপনি হাসচেন যে?

ভাবছি, টাকার শোকটা মানুষকে কি রকম বক্তা করে তোলে। এ দোষটা আমারও আছে কিনা।

কোন টাকার শোক—সেই পাঁচশ'-র?

তাই ত মনে হচ্চে।

বন্দনা হসিয়া বলিল, টাকার জন্যে আর ভাবনা নেই। আপনাকে সেবা করার মজুরী হিসাবে ডবল আদায় করে ছাড়বো। আপনি না দেন মায়ের কাছে আদায় হবে।

অন্নদা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আটটা বাজে, বিপিনের খাবার সময় হলো।

বন্দনা ব্যস্ত হইয়া বলিল, চলো অনুদি যাচ্ছি। কেমন, যাই মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, যাও কিন্তু সেবার ত্রুটি হলে মজুরী কাটা যাবে।

ত্রুটি হবে না মশাই, হবে না। বলিয়া সেও হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল।

আঠার

বন্দনা বলিল, খাবার হয়ে গেছে নিয়ে আসি?

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তোমার কেবলি চেষ্টা হচ্চে আমার জাত মারার। কিন্তু সন্ধে-আহ্নিক এখনো করিনি, আগে তার উদ্যোগ করিয়ে দাও।

আমি নিজে করে দেবো মুখুয্যেমশাই?

নইলে কে আর আছে এখানে যে করে দেবে? কিন্তু মার পুজোর ঘরে যেতে পারবো না—গায়ে জোর নেই,—এই ঘরে করে দিতে হবে। আগে দেখবো কেমন আয়োজন করো, খুঁত ধরবার কিছু থাকে কিনা, তখন বুঝে দেখবো খাবার তুমি আনবে, না আমাদের বামুনঠাকুর আনবে।

শুনিয়া বন্দনা পুলকে ভরিয়া গেল, বলিল, আমি এই শর্তেই রাজী। কিন্তু একজামিনে পাস যদি হই তখন কিন্তু মিথ্যে ছলনায় ফেল করাতে পারবেন না। কথা দিন।

দিলুম কথা। কিন্তু আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে কি তোমার এত লাভ?

তা আমি বলবো না, এই বলিয়া বন্দনা দ্রুত প্রস্থান করিল।

মিনিট-দশেকের মধ্যে সে স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া একটি জলপূর্ণ ঘটি লইয়া প্রবেশ করিল। ঘরের যে দিকটায় খোলা জানালা দিয়া পূবের রোদ আসিয়া পড়িয়াছে সেই স্থানটি জল দিয়া ভাল করিয়া মার্জনা করিয়া নিজের আঁচল দিয়া মুছিয়া লইল, পূজার ঘর হইতে আসন কোশাকুশি প্রভৃতি আনিয়া সাজাইল, ধূপদানি আনিয়া ধূপ জ্বালাইল, তারপরে বিপ্রদাসের ধুতি গামছা এবং হাত-মুখ ধোবার পাত্র আনিয়া কাছে রাখিয়া দিয়া বলিল, আজ সময় নেই ফুল তুলে এনে মালা গেঁথে দেবার, নইলে দিতুম, কাল এ ত্রুটি হবে না। কিন্তু আধ-ঘণ্টা সময় দিলুম, এর বেশি নয়। এখন বেজেছে ন'টা—ঠিক সাড়ে ন'টায় আবার আসবো। এর মধ্যে আপনাকে কেউ বিরক্ত করবে না, আমি চললুম। এই বলিয়া সে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

বিপ্রদাস কোন কথা না বলিয়া শুধু চাহিয়া রহিল। আধ-ঘণ্টা পরে বন্দনা যখন ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যাবন্দনা সমাপ্ত করিয়া বিপ্রদাস একটা আরামচৌকিতে হেলান দিয়া বসিয়াছে।

পাস না ফেল মুখুয্যেমশাই?

পাস ফার্স্ট ডিভিসনে। আমার মাকেও হার মানিয়েছ। কার সাধ্য বলে তোমাকে ম্লেচ্ছ, ম্লেচ্ছদের ইস্কুল-কলেজে পড়ে বি. এ. পাস করেচ।

এবার তা হলে খাবার আনি?

আনো। কিন্তু তার আগে এগুলো রেখে এসো গে, বলিয়া বিপ্রদাস কোশাকুশি প্রভৃতি দেখাইয়া দিল।

এ আর আমাকে বলে দিতে হবে না মশাই জানি, বলিয়া পূজার পাত্রগুলি সে হাতে তুলিয়া লইয়াছে এমন সময়ে ঘরের বাহিরে বারান্দায় অনেকগুলি উঁচুগোড়ালি জুতার খুট্ খুট শব্দ একসঙ্গে কানে আসিয়া পৌঁছিল, এবং পরক্ষণে অন্নদা দ্বারের কাছে মুখ বাড়াইয়া বলিল, বন্দনাদিদি, তোমার মামীমা—

মাসী এবং আরও দুই-তিনটি অল্পবয়সী মেয়ে একেবারে ভিতরে আসিয়া পড়িলেন, বিপ্রদাস দাঁড়াইয়া উঠিয়া অভ্যর্থনা করিল, আসুন।

মাসী বলিলেন, নীচে থেকেই খবর পেলুম বিপ্রদাসবাবু ভালো আছেন—

বিপ্রদাস কহিল, হাঁ, আমি ভাল আছি।

আগন্তুক মেয়েরা বন্দনাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, ভিজা চুলে গরদের শাড়ী ভিজিয়াছে ; এলো কালো চুলের রাশি পিঠের পরে

ছড়ানো, দুই হাতে পূজোর জিনিসপত্র, তাহার এ মূর্তি তাহাদের শুধু অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত নয় অভাবনীয়। বন্দনা বলিল, আপনারা দোর ছেড়ে একটু সরে দাঁড়ান, এগুলি রেখে আসি গে।

একটি মেয়ে বলিল, ছোঁয়া যাবে বুঝি?

হাঁ, বলিয়া বন্দনা চলিয়া গেল।

ক্ষণেক পরে সে সেই বেশেই ফিরিয়া আসিয়া বিপ্রদাসের চেয়ারের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। মাসী বলিলেন, আমাদের না জানিয়ে তুমি চলে এলে সেজন্যে রাগ করিনে, কিন্তু আজ তোমার বোনের বিয়ে—তোমাকে যেতে হবে।

মেয়ে দুটি বলিল, আমরা আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি।

বন্দনা বলিল, না মাসীমা, আমার যাওয়া হবে না।

সে কি কথা বন্দনা! না গেলে প্রকৃতি কত দুঃখ করবে জানো?

জানি, তবু আমি যেতে পারবো না।

শুনিয়া মাসী বিস্ময় ও ক্ষোভে অধীর হইয়া বলিলেন, কিন্তু এই জন্যেই তোমার বোম্বায়ে যাওয়া হল না,—এই জন্যেই তোমার বাবা আমার কাছে তোমাকে রেখে গেলেন। তিনি শুনলে কি বলবেন বলো ত?

সেই মেয়েটি বলিল, তা ছাড়া সুধীরবাবু—মিস্টার ডাটা—ভারী রাগ করেছেন। আপনার চলে আসাটা তিনি মোটে পছন্দ করেন নি।

বন্দনা তাহার দিকে চাহিল, কিন্তু জবাব দিল মাসীকে, বলিল, আমি না গেলে প্রকৃতির বিয়ে আটকাবে না, কিন্তু গেলে মুখুয্যেমশায়ের সেবার ত্রুটি হবে। ওঁকে দেখবার এখানে কেউ নেই।

কিন্তু উনি ত ভাল হয়ে গেছেন। তোমাকে যেতে বলা ওঁর উচিত। এই বলিয়া মাসী বিপ্রদাসের দিকে চাহিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক কথা। আমার যেতে বলাও উচিত, বন্দনার যাওয়াও উচিত। বরঞ্চ না গেলেই অন্যায় হবে।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া কহিল, না—অন্যায় হবে আমি মনে করিনে। বেশ আপনি বলচেন যেতে, আমি যাবো। কিন্তু রাত্রেই আসবো, সেখানে থাকতে পারবো না। এ অনুমতি মাসীমাকে দিতে হবে।

একটা রাতও থাকতে পারবে না?

না।

আচ্ছা তাই হবে, বলিয়া মাসী মনে মনে রাগ করিয়া দলবল লইয়া প্রস্থান করিলেন।

বিপ্রদাস বলিল, দেখলে ত তোমার মাসীমা রাগ করে চলে গেলেন। কিন্তু হঠাৎ এ খেয়াল হলো কেন?

বন্দনা বলিল, রাগ করে গেলেন জানি, কিন্তু শুধু খেয়ালের বশেই যেতে চাইচি নে তা নয়। ওদের যা-কিছু সমস্তর উপরেই আমার বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। তাই ওখানে আর যেতে চাইনে মুখুয্যেমশাই।

এটা একটু বাড়াবাড়ি বন্দনা।

সত্যিই বাড়াবাড়ি কিনা বলা শক্ত। আমি সর্বদাই নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করি, অথচ বেশ বুঝতে পারি ওদের মধ্যে গিয়ে আমার না থাকে সুখ, না থাকে স্বস্তি। একবার বোম্বায়ের একটা কাপড়ের কলের কারখানা দেখতে গিয়েছিলুম, কেবলি আমার সেই কথা মনে হতে থাকে,—তার কত কল কত চাকা আশেপাশে সামনে পিছনে অবিশ্রাম ঘুরচে—একটু অসাবধান হলেই যেন ঘাড়-মুড় গুঁজড়ে তার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলবে। ও-সব দেখতে যে ভাল লাগে না তা নয়, তবু মনে হয় বেরুতে পারলে বাঁচি। কিন্তু আর দেরি করবো

না, আপনার খাবার আনি গে, বলিয়া বাহির হইতে গিয়াই চোখ পড়িল দ্বারের সম্মুখে পায়ের ধূলা, জুতোর দাগ ; থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, খাবার আনা হল না মুখুয্যেমশাই, একটু সবুর করতে হবে। চাকর দিয়ে এগুলো আগে ধুইয়ে ফেলি, এই বলিয়া সে ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, বিপ্রদাস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, এত খুঁটিনাটি তুমি শিখলে কার কাছে বন্দনা?

শুনিয়া বন্দনা নিজেও আশ্চর্য হইল, বলিল, কে শেখালে আমার মনে নেই মুখুয্যেমশাই, বলিয়া একটু চুপ করিয়া কহিল, বোধ হয় কেউ শেখায় নি। আমার আপনিই মনে হচ্চে, আপনাকে সেবা করার এ-সব অপরিহার্য অঙ্গ, না করলেই ত্রুটি হবে। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বিকালের দিকে অভ্যস্ত এবং যথোচিত সাজসজ্জা করিয়া বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরের খোলা দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, চললুম বোনের বিয়ে দেখতে। মাসী ছাড়লেন না বলেই যেতে হচ্চে।

বিপ্রদাস কহিল, আশীর্বাদ করি তুমিও যেন শীঘ্র এই অত্যাচারের শোধ নিতে পারো। তখন ঐ মাসীকে পাঞ্জাব থেকে হিঁচড়ে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেও।

মাসীর ওপর রাগ নেই, কিন্তু আপনাকে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবো। ভয় নেই গাড়ি ভাড়া আমরাই দেবো, আপনার নিজের লাগবে না। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া কহিল, ফিরতে আমার রাত হবে, কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থা করে গেলুম, অন্যথা হলে এসে রাগ করবো।

করবে বৈ কি! না করলেই সকলে আশ্চর্য হবে। ভাববে, শরীর ভালো নেই, বিয়েবাড়িতে খেয়ে বোধ হয় অসুখ করেছে।

বন্দনা হাসিমুখে মাথা নাড়িয়া বলিল, হয়েছে আমার গুণ-ব্যাখ্যা করা ; কিন্তু সে কথা যাক, আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে নীচে যাবেন না যেন। অনুদি এই ঘরেই সব এনে দেবে। তার আধ-ঘণ্টা পরেই ঠাকুর দিয়ে যাবে খাবার, এক ঘণ্টা পরে ঝড়ু ওষুধ দিয়ে আলো নিবিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে যাবে। এই হুকুম সকলকে দিয়ে গেলুম। বুঝলেন?

হাঁ বুঝেছি।

তবে চললুম।

যাও। কিন্তু চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে বন্দনা, এ কথা স্বীকার করবোই। কারণ, যে পোশাকটা পরেছো এইটেই হ'লো তোমার স্বাভাবিক, যেটা এখানে পরে থাকো সেটা কৃত্রিম।

সে কি কথা মুখুয্যেমশাই,—ওরা বলে মেয়েদের জুতো-পরা আপনি দেখতে পারেন না?

ওরা ভুল বলে, যেমন বলে তোমার হাতে আমি খেতে পারিনে।

বন্দনা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল, ভুল হবে কেন মুখুয্যেমশাই, আমার হাতে খেতে সত্যিই ত আপনার আপত্তি ছিল।

বিপ্রদাস বলিল, আপত্তি ছিল, কিন্তু আপত্তিটা সত্যিকারের হলে সে আজও থাকতো, যেতো না।

কথাটা বন্দনা বুঝিল না, কিন্তু বিপ্রদাসের উক্তি অসত্য বলিয়া মনে করাও কঠিন, বলিল, দ্বিজুবাবু একদিন বলেছিলেন দাদার মনের কথা কেউ জানতে পারে না, যেটা শুধু বাইরের তাই কেবল লোকে টের পায় ; কিন্তু যা অন্তরের তা অন্তরেই চাপা থাকে,—মুখুয্যেমশাই এ কি সত্যি?

উত্তরে বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিল, তারপরে বলিল, বন্দনা, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। যদি সত্যিই থাকতে সেখানে ইচ্ছা না হয় থেকো না—চলে এসো।

চলেই আসবো মুখুয্যেমশাই, থাকতে সেখানে পারবো না। এই বলিয়া বন্দনা আর বিলম্ব না করিয়া নীচে নামিয়া গেল।

পরদিন সকালে দেখা হইলে বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, বোনের বিয়ে নির্বিঘ্নে সমাধা হলো?

হাঁ হলো—বিঘ্ন কিছু ঘটেনি।

নিজের জিদই বজায় রইলো, মাসীর অনুরোধ রাখলে না? কত রাত্রে ফিরলে?

রাত্র তখন তিনটে। মাসীর কথা রাখা চলল না, রাত্রেই ফিরতে হলো। একটুখানি থামিয়া বোধ হয় বন্দনা ভাবিয়া লইল বলা উচিত কিনা, তার পরেই সে বলিতে লাগিল, মাত্র কয়েক ঘণ্টা ছিলুম কিন্তু কাজ করে এসেচি অনেক। এক বছরে যা করতে পারিনি মিনিট পাঁচ-ছয়েই তা হয়ে গেল। সুধীরের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে এলুম।

বিপ্রদাস আশ্চর্য হইয়া বলিল, বলো কি!

হাঁ, তাই। কিন্তু ওকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে আসিনি। আজ সকালে যে মেয়েটিকে দেখেছিলেন তার নাম হেম। হেমনলিনী রায়। ওর জিম্মাতেই সুধীরকে দিয়ে এলুম। আবার আমার সেই বোম্বায়ের কলের কথাই মনে পড়ে, তার মতো ওদের ওখানেও ভালবাসার টানা-পোড়েনে দেখতে দেখতে মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠে! আবার ভাঙ্গেও তেমনি।

বিপ্রদাস তেমনি বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—ব্যাপারটা হলো কি? সুধীরের সঙ্গে হঠাৎ শেষ করে আসার মানে?

বন্দনা কহিল শেষ করার মানে শেষ করা। কিন্তু তাই বলে ওখানে হঠাৎ বলেও কিছু নেই। ওদের তাল অসম্ভব দ্রুত বলেই বাইরে থেকে 'হঠাৎ' বলে ভ্রম হয়, কিন্তু আসলে তা নয়। সুধীর আমাকে ডেকে বললে আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। বললুম, কি অন্যায় হয়েছে সুধীর? সে বললে, কাউকে না বলে—অর্থাৎ তাকে না জানিয়ে—অকস্মাৎ এ বাড়িতে চলে আসা আমার খুব গর্হিত কাজ হয়েছে। বিশেষতঃ, সেখানে বিপ্রদাসবাবু ছাড়া আর কেউ নেই যখন। বললুম, সেখানে অন্নদাদিদি আছে। সুধীর বললে, কিন্তু সে দাসী ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বললুম, ও বাড়িতে তাঁকে দিদি বলে সবাই ডাকে। শুনে সেই হেম মেয়েটি মুখ টিপে একটু হেসে বললে, পাড়াগাঁয়ে ও-রকম ডাকার রীতি আছে শুনেচি, তাতে দাসী-চাকরের অহঙ্কার বাড়ে, আর কিছু বাড়ে না। তারা নিজেরাও বড় হয়ে ওঠে না। সুধীর বললে, এঁদের কাছে তুমি বলেচো যে এখানে থাকতে পারবে না, রাত্রেই ফিরে যাবে ; কিন্তু সে-বাড়িতে তোমার একলা থাকাটা আমরা কেউ পছন্দ করিনে। তোমার বাবা শুনলেই বা কি বলবেন? বললুম, বাবা কি বলবেন সে ভাবনা তোমার নয়, আমার। কিন্তু আরও যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁদের মধ্যে কি তুমি নিজেও আছ? হেম বলিলে, নিশ্চয়ই আছেন! সকলকে ছাড়া ত উনি নয়। এই মেয়েটার গায়েপড়া মন্তব্যর উত্তর দিতে ইচ্ছে হল না; তাই সুধীরকে বললুম, তোমার এ কথার জবাবে আমিও বলতে পারতুম যে অনর্থক ছুটি নিয়ে তোমার কলকাতায় থাকাটা আমিও পছন্দ করিনে, কিন্তু সে কথা আমি বলব না। তুমি যে নোংরা ইঙ্গিত করলে তা ইতর-সমাজেই চলে, কিন্তু তোমাদের বড়-দলেও সে যে সমান সচল এ আমি জানতুম না, কিন্তু আর আমার সময় নেই, গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, আমি চললুম। সেই মেয়েটা বলে উঠলো, যা অশোভন, যা অনুচিত তার আলোচনা ছোট-বড় সকল দলেই চলে জানবেন। বললুম, আপনারা যত খুশি আলোচনা চালান আপত্তি নেই। আমি উঠলুম। সুধীর হঠাৎ কেমন ধারা যেন হয়ে গেল,—মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল,—নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, তোমার মাসীমাকেও জানিয়ে যাবে না? বললুম, তাঁকে জানানোই আছে বিয়ে হয়ে গেলেই আমি চলে যাবো যত রাতই হোক। সুধীর বললে, কাল তোমার সঙ্গে কি একবার দেখা হতে পারবে? বললুম, না। সে বললে, পরশু? বললুম, পরশুও না।

তার পরের দিন?

না, তার পরের দিনও নয়।

কবে তোমার সময় হবে?

সময় আমার হবে না।

কিন্তু আমার যে একটা বিশেষ জরুরী কথা আলোচনা করবার আছে?

তোমার হয়ত আছে কিন্তু আমার নেই। এই বলে উঠে পড়লুম।

সুধীর আমাকে যে চেনে না, তা নয়, সঙ্গে এগিয়ে আসতে সাহস করলে না, সেইখানেই স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি গাড়িতে এসে বসলুম।

বিপ্রদাস ঈষৎ হাসিয়া কহিল, এর মানে কি শেষ করে দেওয়া বন্দনা? একটুখানি কলহ। সন্দেহ যদি থাকে দেখা হলে তোমার মেজদিকে জিজ্ঞেসা করে নিও।

বন্দনা হাসিল না, গম্ভীর হইয়া বলিল, কাউকে জিজ্ঞেসা করার প্রয়োজন নেই মুখুয্যেমশাই, আমি জানি আমাদের শেষ হয়ে গেছে, এ আর ফিরবে না।

তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া বিপ্রদাস হতবুদ্ধি হইয়া রহিল,—বলো কি বন্দনা, এত বড় জিনিস কি কখনও এত অল্পেই শেষ হতে পারে? সুধীরের আঘাতটাই একবার ভেবে দেখো দিকি।

বন্দনা বলিল, ভেবে দেখেছি মুখুয্যেমশাই। এ আঘাত সামলাতে সুধীরের বেশী দিন লাগবে না, আমি জানি ঐ হেম মেয়েটি তাকে পথ দেখিয়ে দেবে। কিন্তু আমি নিজের কথা ভাবছিলুম। শুধু যে গাড়িতে বসেই ভেবেছি তা নয়, কাল বিছানায় শুয়ে সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। অস্বস্তি বোধ করেচি সত্যি, কিন্তু কষ্ট আমি পাইনি।

কষ্ট পাবে রাগ পড়ে গেলে। তখন এই সুধীরের জন্যেই আবার পথ চেয়ে থাকবে, এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

এ হাসিতেও বন্দনা যোগ দিল না, শান্তভাবে বলিল, রাগ আমার নেই। কেবল এই অনুতাপ হয় যে, চলে আসার সময়ে যদি কঠিন কথা আমার মুখ দিয়ে বার না হতো। দেখিয়ে এলুম যেন দোষ তাঁর,—জানিয়ে এলুম যেন মর্মাহত হয়ে আমি বিদায় নিলুম। কিন্তু তা ত সত্যি নয়,—এই মিথ্যে আচরণের জন্যেই শুধু লজ্জা বোধ করি মুখুয্যেমশাই, আর কিছুর জন্যে নয়। তাহার কথার শেষের দিকে চোখ যেন সজল হইয়া আসিল।

বিপ্রদাসের মনের বিস্ময় বহুগুণে বাড়িয়া গেল, এ যে ছলনা নয় এতক্ষণে সে বুঝিল। বলিল, সুধীরকে তুমি কি সত্যিই আর ভালবাসো না?

না।

একদিন ত বাসতে? এত সহজে এ ভালবাসা গেল কি করে?

এত সহজে গেল বলেই এত সহজে এর উত্তর পেলুম। নইলে আপনার কাছে মিথ্যে বলতে হত। এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চাইলেন কোন দিন সুধীরকে ভালোবেসেছিলুম কি না! সেদিন ভাবতুম সত্যিই ভালোবাসি। কিন্তু তার পরেই আর একজন পড়লো চোখে—সুধীর গেল মিলিয়ে। এখন দেখি সেও গেছে মিলিয়ে। শুনে হয়ত আপনার ঘৃণা হবে, মনে হবে এমন তরল মন ত দেখিনি। আমি জানি মেয়েদের এ লজ্জার কথা,—কোন মেয়েই এ স্বীকার করতে চায় না—এ যেন তাদের চরিত্রকেই কলুষিত করে দেয়। হয়ত আমিও কারো কাছে মানতে পারতুম না, কিন্তু কেন জানিনে, আপনার কাছে কোন কথা বলতেই আমার লজ্জা করে না।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, হয়ত এই আমার স্বভাব, হয়ত এ আমার বয়সের স্বধর্ম, অন্তর শূন্য থাকতে চায় না, হাতড়ে বেড়ায় চারিদিকে। কিংবা, এমনিই হয়ত সকল মেয়েরেই প্রকৃতি, ভালোবাসার পাত্র যে কে সমস্ত জীবনে খুঁজেই পায় না। এই বলিয়া স্থির হইয়া মনে মনে কি যেন ভাবিতে লাগিল, তার পরেই বলিয়া উঠিল,—কিংবা হয়ত খুঁজে পাবার জিনিস নয় মুখুয্যেমশাই—ওটা মরীচিকা।

বিপ্রদাস তেমনিই মৌন হইয়া রহিল। বন্দনার যেন মনের আগল খুলিয়া গেছে, বলিতে

লাগিল, এই সুধীরের সঙ্গেই এক বছর পূর্বে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছিল, শুধু তার মায়ের অসুখ বলেই হতে পারেনি। কাল ঘরে ফিরে এসে ভাবছিলুম বিয়ে যদি সেদিন হয়ে যেতো, আজ কি মন আমার এমনি করেই তাকে ঠেলে ফেলে দিতো? মনকে শাসনে রাখতুম কি দিয়ে? ধর্মবুদ্ধি দিয়ে? সংস্কার দিয়ে? কিন্তু অবাধ্য মন শাসন মানতে যদি না চাইতো কি হতো তখন? যাদের মধ্যে এই কটা দিন কাটিয়ে এলুম ঠিক কি তাদের মতন? এমনি ষড়যন্ত্র আর লুকোচুরিতে মন পরিপূর্ণ করে শুকনো হাসি মুখে টেনে টেনে লোক ভুলিয়ে বেড়াতুম? এমনি পরস্পরের নিন্দে করে, হিংসে করে, শত্রুতা করে? কিন্তু আপনি কথা কইচেন না কেন মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মনের মধ্যে যে ঝড় বইচে তার ভয়ানক বেগের সঙ্গে আমি চলতে পারবো কেন বন্দনা, কাজেই চুপ করে আছি।

বন্দনা বলিল, না সে হবে না, এমন করে এড়িয়ে যেতে আপনাকে আমি দেবো না। জবাব দিন।

কিন্তু শান্ত না হলে জবাব দিয়ে লাভ কি? তোমার আজকের অবস্থা যে স্বাভাবিক নয় এ কথা তুমি বুঝতে পারবে কেন?

কেন পারবো না মুখুয্যেমশাই, বুদ্ধি ত আমার যায়নি।

যায়নি কিন্তু ঘুলিয়ে আছে। এখন থাক। সন্ধ্যের পরে সমস্ত কাজকর্ম সেরে আমার কাছে এসে যখন স্থির হয়ে বসবে তখন বলবো। পারি তখনি এর জবাব দেবো।

তবে সেই ভালো, এখন আমারও যে সময় নেই—এই বলিয়া বন্দনা বাহির হইয়া গেল। বস্তুতঃ, তাহার কাজের অবধি নাই। সকালে ছুটি লইয়া অন্নদা কালীঘাটে গেছে, সে কাজগুলাও আজ তাহারই কাঁধে পড়িয়াছে। কত চাকর-বাকর, কত ছেলে এখানে থাকিয়া স্কুল কলেজে পড়ে,—তাহাদের কত রকমের প্রয়োজন। কাজের ভিড়ে তাহার মনেও পড়িল না সে সারারাত্রি ঘুমায় নাই, সে আজ ভারী ক্লান্ত।

সন্ধ্যার পরে বিপ্রদাসের রাত্রির খাওয়া সাঙ্গ হইল, নীচের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া বন্দনা তাহার শয্যার কাছে আসিয়া একটা চৌকি টানিয়া বসিল, বলিল, মুখুয্যেমশাই, একটা কথার সত্যি জবাব দেবেন?

বিপ্রদাস বলিল, সচরাচর তাই ত দিয়ে থাকি। প্রশ্নটা কি?

বন্দনা বলিল, মেজদিদিকে আপনি কি সত্যিই ভালবাসেন? ছেলেবেলায় আপনাদের বিয়ে হয়েছে—সে কতদিনের কথা—কখনো কি এর অন্যথা ঘটেনি?

বিপ্রদাস অবাক হইয়া গেল। এমন কথা যে কাহারও মনে আসিতে পারে সে কল্পনাও করে নাই। কিন্তু আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, তোমার মেজদিদিকেই বরঞ্চ এ প্রশ্ন জিজ্ঞেসা করো।

বন্দনা বলিল, তিনি জানবেন কি করে? আপনার আসল মনের কথা ত শুনেচি কেউ জানতে পারে না। না বলতে চান বলবেন না, আমি একরকম করে বুঝে নেবো, কিন্তু বললে সত্যি কথাই আপনাকে বলতে হবে।

সত্যি কথাই বলবো, কিন্তু আমাকে কি তোমার সন্দেহ হয়?

হয়। আপনি অনেক বড় মানুষ, কিন্তু তবুও মানুষ। মনে হয় কোথায় যেন আপনি ভারী একলা, সেখানে আপনার কেউ সঙ্গী নেই। এ কথা কি সত্যি নয়?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিল না, বলিল, স্ত্রীকে ভালবাসা যে আমার ধর্ম বন্দনা।

বন্দনা বলিল, ধর্ম যতদূর প্রসারিত ততদূর আপনি খাঁটি, কিন্তু তার চেয়েও বড় কি সংসারে কিছু নেই?

দেখতে ত পাইনে বন্দনা।

বন্দনা বলিল, আমি দেখতে পাই মুখুয্যেমশাই। বলবো সে কথা?

বিপ্রদাসের মুখ সহসা যেন পাণ্ডুর হইয়া উঠিল,—বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ মুখে যেন রক্তের লেশ নাই, দুই হাত সম্মুখে বাড়াইয়া বলিল, না, একটি কথাও নয় বন্দনা। আজ তোমার ঘরে যাও,—কাল হোক, পরশু হোক,—আবার যখন প্রকৃতিস্থ হয়ে আলোচনার বুদ্ধি ফিরে পাবে তখন এর জবাব দেবো। কিংবা হয়তো আপনিই তখন বুঝবে, ঐ যারা তোমার মাসীর বাড়িতে বুদ্ধিকে তোমার আচ্ছন্ন করেছে তারাই সব নয়। ধর্ম যাদের কাছে অত্যাজ্য তারাও আছে, জগতে তারাও বাস করে। না না, আর তর্ক নয়,—তুমি যাও।

বন্দনা বুঝিল, এ আদেশ অবহেলার নয়। এই হয়ত সেই বস্তু যাহাকে বাড়িসুদ্ধ সকলে ভয় করে। বন্দনা নিঃশব্দে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

উনিশ

পরদিন বিকালের দিকে বন্দনা আসিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, আবার চললুম মাসীমার বাড়িতে। এবার আর ঘণ্টা-কয়েকের জন্যে নয়, এবার যতদিন না মাসী আমাকে বোম্বায়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারেন ততদিন।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আরজেন্ট টেলিগ্রামে এসেছে বাবার হুকুম। কালই সকালবেলা মাসী গাড়ি পাঠাবেন আমাকে নিতে।

বিপ্রদাস কহিল, অর্থাৎ বোঝা গেল তোমার মাসীর প্রতিশোধ নেবার অধ্যবসায় এবং বুদ্ধি আছে। এ বোধ হয় তাঁরই প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব। কৈ দেখি কাগজটা?

না, সে আপনাকে দেখাতে পারবো না।

শুনিয়া বিপ্রদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তারপর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ভগবান যে কারো দর্প রাখেন না এ তারই নমুনা। এতদিন ধারণা ছিল আমাকে জড়ানো যায় না, কিন্তু দেখচি যায়। অন্ততঃ, তেমন লোকও আছে। তোমার মাসীর মাথায় এ ফন্দিও খেলেছে। দাও না পড়ে দেখি অভিযোগটা কতখানি গুরুতর, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

এবার বন্দনা কাগজখানা তাঁহার হাতে দিল। রায়সাহেবের সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম,—সমস্তটা আগাগোড়া পড়িয়া সেটা ফিরাইয়া দিয়া বিপ্রদাস বলিল, মোটের ওপর তোমার বাবা অসঙ্গত কিছুই লেখেন নি। নিঃস্বার্থ পরোপকারের বিপদ আছে, অসুস্থ আত্মীয়কে সেবা করতে আসাটাও সংসারে সহজ কাজ নয়।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আমাকে কি আপনি মাসীর বাড়িতেই ফিরে যেতে বলেন?

সেই ত তোমার বাবার আদেশ বন্দনা। এ তো বলরামপুরের মুখুয্যেবাড়ি নয়—হুকুম দেওয়ার কর্তা এ ক্ষেত্রে তোমার মুখুয্যেমশাই নয়,—মাসী আবার আদেশটা দিয়েচেন বাপের মুখ দিয়ে, অতএব মান্য করতেই হবে।

বন্দনা বলিল, এ হলো আপনার মামুলি বচন। বাবা জানেন না কিছুই, তবু সেই আদেশ, ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, শুনতে হবে? মাসীর বাড়িটি যে কি সে ত আপনি জানেন।

বিপ্রদাস কহিল, জানিনে, কিন্তু তোমার মুখে শুনেচি সে ভালো জায়গা নয়। আমি সুস্থ থাকলে নিজে গিয়ে তোমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতুম, কিন্তু সে শক্তি নেই।

এই অবস্থায় আপনাকে ফেলে চলে যাবো? যে মাসীকে চিনিনে তাঁর জিদটাই বড় হবে?

কিন্তু উপায় কি?

উপায় এই যে আমি যাবো না।

তবে থাকো। বাবাকে একটা তার করে দাও। কিন্তু মাসী নিতে এলে কি তাঁকে বলবে?

বন্দনা কহিল, যেতে পারবো না, শুধু এই কথাই বলবো। তার বেশি নয়।

বিপ্রদাস বলিল, তোমার মাসী কিন্তু এতেই নিরস্ত হবেন না। এবার হয়ত বাড়িতে আমার মাকে টেলিগ্রাম করবেন।

এ সম্ভাবনা বন্দনার মনে আসে নাই, শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, বলিল, আপনি ঠিকই বলছেন মুখুয্যেমশাই, হয়ত কাজটা শেষ হয়েই গেছে—খবর দিতে মাসীর বাকী নেই, কিন্তু কেন জানেন?

বিপ্রদাস কহিল, জানা ত সম্ভব নয়, তবে এটুকু আন্দাজ করা যেতে পারে যে এতখানি উদ্যম তাঁর নিঃস্বার্থ নয়, তোমার একান্ত কল্যাণের জন্যেও নয় ; হয়ত কি একটা তাঁদের মনের মধ্যে আছে!

বন্দনা বলিল, কি আছে আমি জানি। ভাইপো এসেছেন ব্যারিস্টারি পাস করে,—মাসী দিয়েচেন আমাদের আলাপ-পরিচয় করিয়ে। দৃঢ় বিশ্বাস সে-ই আমার যোগ্য বর! কারণ বাবার আমি এক মেয়ে, যে সম্পত্তি তিনি রেখে যাবেন, তার আয়ে উপার্জন না করলেও ভাইপোর অনায়াসে চলে যাবে।

বিপ্রদাস বলিল, ভাইপোর কল্যাণ-চিন্তা করা পিসীর পক্ষ থেকে দোষের নয়। ছেলেটি দেখতে কেমন?

ভালো।

আমার মতো হবে?

বন্দনা হাসিয়া বলিল, এটি হলো আপনার অহঙ্কারের কথা। মনে বেশ জানেন এত রূপ সংসারে আর নেই। কিন্তু সে তুলনা করতে গেলে সংসারে সব মেয়েকেই যে আইবুড়ো থাকতে হয় মুখুয্যেমশাই। কেবল আপনার পানে চেয়েই তাদের দিন কাটাতে হয়। তবু বলবো দেখতে অশোককে ভালই, খুঁতখুত করা অন্ততঃ আমার সাজে না!

তা হলে পছন্দ হয়েছে বলো?

যদি হয়েও থাকে, সে পছন্দর কেউ দোষ দেবে না বলতে পারি। এই বলিয়া বন্দনা হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল, পাঁচটা বাজলো, আপনার বার্লি খাবার সময় হয়েছে—যাই আনি গে। ইতিমধ্যে অশোকের কথাটা আর একটু ভেবে রাখুন, বলিয়া সে চলিয়া গেল। মিনিট-পাঁচেক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল তাহার হাতে রূপার বাটিতে বার্লি—বরফের ভিতর রাখিয়া ঠাণ্ডা করা—নেবুর রস নিঙড়াইয়া দিয়া কহিল, এর সবটুকু খেতে হবে, ফেলে রাখলে চলবে না। সেবার ত্রুটি দেখিয়ে কেউ যে আমার কৈফিয়ত চাইবে সে আমি হতে দেবো না।

বিপ্রদাস বলিল, জুলুমের বিদ্যেটি যোল আনায় শিক্ষে করে নিয়েচ, কারো কাছে ঠকতে হবে না দেখছি।

বন্দনা বলিল, না। কেউ জিজ্ঞেসা করলে বলবো, মুখুয্যেমশায়ের ওপর হাত পাকিয়ে পাকা হয়ে গেছি।

খাওয়া শেষ হইলে উচ্ছিষ্ট পাত্রটা হাতে করিয়া বন্দনা চলিয়া যাইতেছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার একটি কথার জবাব দেবেন মুখুয্যেমশাই?

কি কথা বন্দনা?

সংসারে সকলের চেয়ে আপনাকে কে বেশী ভালোবাসে বলতে পারেন?

পারি।

বলুন ত কি নাম তার?

তার নাম বন্দনা দেবী।

শুনিয়া বন্দনা চক্ষের পলকে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু মিনিট-পনেরো পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বিছানার কাছে একটা চৌকি টানিয়া বসিল। বিপ্রদাস হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, অমন করে ছুটে পালিয়ে গেলে কেন বলো ত?

বন্দনা প্রথমে জবাব দিতে পারিল না। তারপরে ধীরে ধীরে বলিল, কথাটা হঠাৎ কেমন সইতে পারলুম না মুখুয্যেমশাই। মনে হল যেন আমার কি একটা বিশ্রী চুরি আপনার কাছে

ধরা পড়ে গেছে।

তাই এখনো মুখ তুলে চাইতে পারছো না?

তা কেন পারবো না, বলিয়া জোর করিয়া মুখ তুলিয়া বন্দনা হাসিতে গেল, কিন্তু সলজ্জ শরমে সমস্ত মুখখানি তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিল, পরে আত্মসংবরণ করিতে করিতে বলিল, কি করে আপনি এ কথা জানলেন বলুন ত?

বিপ্রদাস কহিল, এ প্রশ্ন একেবারে বাহুল্য বন্দনা। এতই কি পাষাণ আমি যে এটুকুও বুঝতে পারিনি? তা ছাড়া সন্দেহ যদিও কখনো থাকে, আজ তোমার পানে চেয়ে আর ত আমার নেই।

বন্দনা আবার মুখ নীচু করিল।

বিপ্রদাস বলিল, কিন্তু তাই বলে ও চলবে না বন্দনা, মুখ তুলে তোমাকে চাইতে হবে। লজ্জা পাবার তুমি কিছুই করোনি, আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই। চাও, মুখ তোলো, শোন আমার কথা।

এ সেই আদেশ। বন্দনা মুখ তুলিয়া চাহিল, ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বলিল, আপনি বোধ হয় আমার উপর খুব রাগ করেছেন, না মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস স্মিতমুখে কহিল, কিছুমাত্র না। একি রাগ করার কথা? শুধু আমার মনের আশা এইটুকু যে, এ ভুল তোমার নিজের কাছেই একদিন ধরা পড়বে। কেবল সেইদিনই এর প্রতিকার হবে।

কিন্তু ধরা যদি কখনো না পড়ে? একে ভুল বলেই যদি কোনদিন টের না পাই?

পাবেই। এর থেকে যে সংসারে কত অনর্থের সূত্রপাত হয় এ যদি না বুঝতে পারো ত আমিও বুঝবো আমাকে তুমি ভালোবাসো নি। সুধীরকে ভালোবাসার মতো এ-ও তোমার একটা খেয়াল—মনের মধ্যে কাউকে টেনে এনে শুধু আপনাকে ভোলানো। তার বেশি নয়।

বন্দনার মুখ মুহূর্তে ম্লান হইয়া উঠিল, অত্যন্ত ব্যথিত-কণ্ঠে বলিল, সুধীরের সঙ্গে তুলনা করবেন না মুখুয্যেমশাই, এ আমি সইতে পারিনে। কিন্তু এর থেকে সংসারে যে অনর্থের সূত্রপাত হয়, আপনার এ কথা মানবো। মানবো যে, এ অমঙ্গল টেনে আনে, কিন্তু তাই বলে মিথ্যে বলে স্বীকার করবো না। মিথ্যেই যদি হতো এতটুকু ভালোবাসাই কি আপনার পেতুম? পাইনি কি আমি?

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বিপ্রদাস কথাগুলি শুনিতেছিল, জিজ্ঞাসা শেষ করিয়া বন্দনা মুখ তুলিতেই সে চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, পেয়েচো বৈ কি বন্দনা, তুমি অনেকখানি পেয়েছ। নইলে তোমার হাতে আমি খেতুম কি করে? তোমার রাত্রিদিনের সেবা নিতে পারতুম আমি কিসের জোরে? কিন্তু তাই বলে কি গ্লানির মধ্যে অধর্মের মধ্যে নিজে নেমে দাঁড়াবো, তোমাকে টেনে নামাবো? যারা আমার পানে চেয়ে চিরদিন বিশ্বাসে মাথা উঁচু করে আছে সমস্ত ভেঙ্গেচুরে তাদের হেঁট করে দেবো? এই কি তুমি বলো?

বন্দনা দৃপ্তস্বরে কহিল, তা'হলে আপনিও স্বীকার করুন আজ ছাড়তে যা পারেন না সে শুধু এই দম্ভটাকে। বলুন সত্য করে ওদের কাছে এই বড় হয়ে থাকার মোহকেই আপনি বড় বলে জেনেছেন। নইলে কিসের গ্লানি মুখুয্যেমশাই,—কাকে মানতে যাবো আমরা অধর্ম বলে? মানুষের মনগড়া একটা ব্যবস্থা—মানুষেই যাকে বার বার মেনেছে, বার বার ভেঙ্গেছে— তাকেই? আপনি পারলেও আমি এ পারবো না।

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, তুমি না পারলেও আমি পারবো, আর তাতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। ইংরেজি বই অনেক পড়েচো বন্দনা, মাসীর বাড়িতে আলোচনাও অনেক শুনেচো, সে-সব ভুলতে সময় লাগবে দেখচি।

বন্দনা কহিল, আপনি আমাকে তামাশা করচেন, আমি কিন্তু একটুও তামাশা করিনি

মুখুয্যেমশাই, যা বলেচি সমস্তই সত্যি বলেচি।

তা বুঝেচি। কিন্তু এ পাগলামি মাথায় এনে দিলে কে?

আপনি।

বলো কি? এ অধর্ম-বুদ্ধি দিলুম তোমাকে অবশেষে নিজে আমিই?

হাঁ, আপনিই দিয়েচেন। হয়তো না জেনে কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ নয়।

এইবার বিপ্রদাস নির্বাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিতে লাগিল, যাকে অধর্ম বলে নিন্দে করলেন তাকে ত আমি মানিনে,—আমি জানি, ধর্ম বলে স্বীকার করেছেন যা একমনে সে শুধু আপনার সংস্কার। অত্যন্ত দৃঢ় সংস্কার, তবু সে তার বড়ো নয়।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিল, বলিল, হয়তো এ কথা তোমার সত্যি বন্দনা, এ আমার সংস্কার,—সুদৃঢ় সংস্কার, কিন্তু মানুষের ধর্ম যখন এই সংস্কারের রূপ ধরে বন্দনা, তখনি সে হয় যথার্থ, তখনি হয় সে সহজ। জীবনের কর্তব্যে আর তখন ঠোকাঠুকি বাধে না, তকে মানতে গিয়ে নিজের সঙ্গে লড়াই করে মরতে হয় না। তখন বুদ্ধি হয়ে আসে শান্ত, অবাধ জলস্রোতের মতো সে সহজে বয়ে যায়। বুঝি একেই বলেছিলুম সেদিন এ হলো বিপ্রদাসের অত্যাজ্য ধর্ম—এর আর পরিবর্তন নেই।

কোনদিনই কি এর পরিবর্তন নেই। মুখুয্যেমশাই?

তাইত আজও জানি বন্দনা। আজও ভাবতে পারিনে এ-জীবনে এর পরিবর্তন আছে।

এতক্ষণে বন্দনার দুই চোখ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল, বিপ্রদাস সযত্নে তাহার হাতখানি টানিয়া লইয়া বলিল, কিন্তু পরিবর্তনেরই বা দরকার কিসের? ভালো তোমাকে বেসেচি,—রইলো তোমার সে ভালোবাসা আমার মনের মধ্যে,—এখন থেকে সে দেবে আমাকে দুঃখে সান্ত্বনা, দুর্বলতায় বল, ভার যখন আর একাকী বইতে পারবো না তখন দেবো তোমাকে ডাক। সে-ও রইলো আজ থেকে তোমার জন্যে তোলা। আসবে ত তখন?

বন্দনা বাঁ হাত দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, আসবো যদি আসার শক্তি থাকে,—পথ যদি থাকে তখনও খোলা, নইলে পারবো না ত আসতে মুখুয্যেমশাই।

কথাটা শুনিয়া বিপ্রদাস যেন চমকিয়া গেল, বলিল, বটেই ত! বটেই ত! আসার পথ থাকে যদি খোলা,—চিরদিনের তরে যদি বন্ধ হয়ে সে না যায়। তখন এসো কিন্তু। অভিমানে মুখ ফিরিয়ে থেকো না।

বন্দনা চোখের জল আবার মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, আমার একটি ভিক্ষে রইলো মুখুয্যেমশাই, আমার কথা যেন কাউকে বলবেন না।

না, বলবো না। বলার লোক যে আমার নেই সে ত তুমি নিজেই জানতে পেরেচো।

হাঁ পেরেচি।

দুইজনে কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল।

বিপ্রদাস কহিল, এই বিপুল সংসারে আমি যে এতখানি একা এ কথা তুমি কি করে বুঝেছিলে বন্দনা?

বন্দনা বলিল, কি জানি কি করে বুঝেছিলুম। আপনাদের বাড়ি থেকে রাগ করে চলে এলুম, আপনি এলেন সঙ্গে। গাড়িতে সেই মাতাল সাহেবগুলোর কথা মনে পড়ে? ব্যাপারটা বিশেষ কিছু নয়—তবু মনে হলো যাদের আমরা চারপাশে দেখি তাদের দলের আপনিই নয়,—একাকী কোন ভার কাঁধে নিতেই আপনার বাধে না। এই কথাই বলেছিলেন সেদিন দ্বিজুবাবু,—মিলিয়ে দেখলুম কারও কাছে কিছুই আপনি প্রত্যাশা করেন না। রাত্রে বিছানায় শুয়ে কেবলি আপনাকে মনে পড়ে—কিছুতে ঘুমোতে পারলুম না। শেষরাত্রে উঠে দেখি নীচে পুজোর ঘরে আলো জ্বলছে, আপনি বসেছেন ধ্যানে। একদৃষ্টে চেয়ে চেয়ে ভোর হয়ে এলো, পাছে চাকররা কেউ দেখতে পায় ভয়ে ভয়ে পালিয়ে এলুম আমার ঘরে। আপনার সে মূর্তি আর ভুলতে পারলুম না মুখুয্যেমশাই, আমি চোখ বুজলেই দেখতে

পাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, দেখেছিলে নাকি আমাকে পুজো করতে?

বন্দনা বলিল, পুজো করতে ত আপনার মাকেও দেখেচি, কিন্তু সে ও নয়। সে আলাদা। আপনি কিসের ধ্যান করেন মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস পুনরায় হাসিয়া বলিল, সে জেনে তোমার কি হবে? তুমি ত তা করবে না!

না করবো না। তবু জানতে ইচ্ছে করে।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। বন্দনা কহিতে লাগিল, আমার সেইদিনই প্রথম মনে হয় সকলের মধ্যে থেকে আপনি আলাদা, আপনি একা। যেখানে উঠলে আপনার সঙ্গী হওয়া যায় সে উঁচুতে ওরা কেউ উঠতে পারেন না। আর একটা কথা জিজ্ঞেসা করবো মুখুয্যেমশাই? বলবেন?

কি কথা বন্দনা?

মেয়েদের ভালোবাসায় বোধ হয় আর আপনার প্রয়োজন নেই—না?

এ প্রশ্নের মানে?

মানে জানিনে—এমনি জিজ্ঞেসা করচি। এ বোধ হয় আর আপনি কামনা করেন না,—আপনার কাছে একেবারে তুচ্ছ হয়ে গেছে।—সত্যি কিনা বলুন।

বিপ্রদাস উত্তর দিল না, শুধু হাসিমুখে চাহিয়া রহিল।

নীচের প্রাঙ্গণে সহসা গাড়ির শব্দ শোনা গেল, আর পাওয়া গেল দ্বিজদাসের কণ্ঠস্বর। এবং, পরক্ষণেই দ্বারের কাছে আসিয়া অন্নদা ডাকিয়া বলিল, দ্বিজু এলো বিপিন।

একলা নাকি? না, আর কেউ সঙ্গে এলো?

না, একাই ত দেখচি। আর কেউ নেই।

শুনিয়া বন্দনা ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, যাই মুখুয্যেমশাই, দেখি গে তাঁর খাবার যোগাড় ঠিক আছে কিনা। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সকালে দ্বিজু আসিয়া যখন বিপ্রদাসের পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল তখন ঘরের একধরে বসিয়া বন্দনা পূজার সজ্জা প্রস্তুত করিতেছিল, দ্বিজদাস বলিল, এই পঞ্চমীতে মায়ের পুকুর-প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ ব্যাপার দাদা!

মায়ের কাজে ত বৃহৎ ব্যাপারই হয় দ্বিজু, এতে ভাবনার কি আছে? বলিয়া বিপ্রদাস হাসিল।

দ্বিজদাস কহিল, তা হয়। এবার সঙ্গে মিলেছে বাসুর ভালো হওয়ার মানতপূজো—সেও একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ। অধ্যাপক বিদায়ের ফর্দ তৈরি হচ্ছে,—কুটুম্ব-সজ্জন অতিথি অভ্যাগতের যে সংক্ষিপ্ত তালিকা বৌদিদির মুখে মুখে পেলুম তাতে আশঙ্কা হয় এবার আপনার অর্থে ওরা কিঞ্চিৎ গভীর খাবোল মারবে। সময় থাকতে সতর্ক হোন।

বন্দনা মুখ তুলিল না, কিন্তু সামলাইতে না পারিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। বিপ্রদাস কৃপণ, এ দুর্নাম একা মা ছাড়া প্রচার করিবার সুযোগ পাইলে কেহ ছাড়ে না। বিপ্রদাস নিজেও এ হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, এবার কিন্তু তোর পালা। এবার খরচ হবে তোর।

আমার? কোন আপত্তি নেই যদি থাকে। কিন্তু তাতে ব্যবস্থার কিছু অদল-বদল করতে হবে। বিদায় যারা পাবে তারা টোলের পণ্ডিত-সমাজ নয়, বরঞ্চ টোলের দোর বন্ধ করে যাদের বাইরে ঠেলে রাখা হয়েছে,—তারা।

বিপ্রদাস তেমনই হাসিয়া কহিল, টোলের ওপর তোর রাগ কিসের? লোকের মুখে মুখে এদের শুধু নিন্দে শুনলি, নিজে কখনও চোখে দেখলি নে। ওদের দলভুক্ত বলে হয়ত আমি পর্যন্ত তোর আমলে ভাত পাবো না।

দ্বিজদাস কাছে আসিয়া আর একবার পায়ের ধূলা লইল, কহিল, ঐ কথাটা বলবেন না। আপনি দু দলেরই বইরে, অথচ তৃতীয় স্থানটা যে কি তাও আমি জানিনে। শুধু এইটুকু

জেনে রেখেচি আমার দাদা আমাদের বিচারের বাইরে।

বিপ্রদাস কথাটাকে চাপা দিল। জিজ্ঞাসা করিল, আমার অসুখের কথা মা শোনেন নি ত?

না। সে বরঞ্চ ছিল ভালো, পুকুর-প্রতিষ্ঠার হাঙ্গামা বন্ধ হতো।

আত্মীয়দের আনবার ব্যবস্থা হয়েছে?

হচ্চে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—সকলকেই। সকন্যা অক্ষয়বাবুর আমন্ত্রণ-লিপি গেছে, মায়ের বিশ্বাস বৃহৎ ব্যাপারে মৈত্রেয়ীর অগ্নিপরীক্ষা হয়ে যাবে। আমার ওপর ভার পড়েছে তাঁদের নিয়ে যাবার।

মা আর কাউকে নিয়ে যাবার কথা বলে দেননি?

হাঁ, অনুদিকেও নিয়ে যেতে হবে। কলেজের ছেলেরা যদি কেউ যেতে চায় তারাও।

তোর বউদিদির কোন ফরমাস নেই?

না।

নীচে আবার মোটরের শব্দ পাওয়া গেল। হর্নের চেনা আওয়াজ কানে আসিতেই বন্দনা জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, মাসীমার গাড়ি। আমি দেখি গে মুখুয্যেমশাই। আপনি সন্ধ্যে-আহ্নিক সেরে নিন—দেরি হয়ে যাচ্চে। বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমিও যাই মুখ-হাত ধুইগে। ঘণ্টা-খানেক পরে আসবো, বলিয়া দ্বিজদাসও চলিয়া গেল। বিপ্রদাসের পূজা-আহ্নিক সমাপ্ত হইল, আজ খাবার ফলমূল দিয়া গেল অন্নদা। মাসীর বাড়ি হইতে যে মেয়েটি নিতে আসিয়াছে বন্দনা ব্যস্ত আছে তাহাকে লইয়া। এ খবর সে-ই দিল।

দ্বিজদাস যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল। হাতে তাহার বিরাট ফর্দ, কলিকাতার অর্ধেক জিনিস কিনিয়া গাড়ি বোঝাই করিয়া চালান দিতে হইবে। দুই ভাইয়ে এই লইয়া যখন ভয়ানক ব্যস্ত তখন দরজার বাহির হইতে প্রার্থনা আসিল, মুখুয্যেমশাই, আসতে পারি কি? পায়ে কিন্তু আমার জুতো রয়েছে।

জুতো? তা হোক, এসো।

বন্দনা ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। যে-বেশে বলরামপুরে তাহাকে প্রথম দেখা গিয়েছিল এ সেই বেশ। বিপ্রদাস অত্যন্ত বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, কোথাও যাচ্চো নাকি বন্দনা?

হাঁ, মাসীমার বাড়িতে।

কখন ফিরবে?

ফেরবার কথা ত জানিনে মুখুয্যেমশাই। এই বলিয়া হেঁট হইয়া সে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল, কিন্তু অন্যদিনের মতো পায়ে হাত দিয়া স্পর্শ করিল না। মুখ তুলিল না, শুধু কপালে হাত ঠেকাইয়া দ্বিজদাসকেও নমস্কার করিল, তাহার পরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কুড়ি

দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, বন্দনা হঠাৎ চলে গেলেন কেন? আমার এসে পড়াটাই কি কারণ নাকি?

বিপ্রদাস বলিল, না। ওঁর বাবা টেলিগ্রাম করেছেন মাসীর বাড়িতে গিয়ে থাকতে যতদিন না বোম্বায়ে ফিরে যাওয়া ঘটে।

কিন্তু হঠাৎ মাসী বেরুলো কোথা থেকে? বন্দনা আমার সঙ্গে ত প্রায় কথাই কইলেন না, সর্বক্ষণ আড়ালে রইলেন, তার পর সকাল না হতে হতেই দেখচি সরে পড়লেন। একটা নমস্কার করে গেলেন সত্যি কিন্তু সেও মুখ ফিরিয়ে। আমার বিরুদ্ধে হলো কি তাঁর?

প্রশ্নের জবাবটা বিপ্রদাস এড়াইয়া গেল এবং মাসীর ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানাইয়া কহিল, আমার অসুখে ভয় পেয়ে এই মাসীর বাড়ি থেকেই অনুদি ওকে ডেকে এনেছিলেন আমার শুশ্রূষা করতে। যথেষ্ট করেচে। ওর কাছে তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

দ্বিজদাস কহিল, উচিত নয় বলিনে কিন্তু আপনাকে সেবা করতে পাওয়াটাও ত একটা ভাগ্য। সে মূল্যটা যদি উনিও অনুভব করতে পেরে থাকেন ত কৃতজ্ঞতা ওঁর কাছেও আমাদের পাওনা আছে।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, তুই ভারী নরাধম।

দ্বিজদাস বলিল, নরাধম কিন্তু নির্বোধ নই। আমার কথা থাক। কিন্তু এই সেবা করার কথাটা মায়ের কানে গেলে উনি চিরকাল আমাদের মাকেই কিনে রাখবেন। সেই কি সোজা সম্পদ?

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিল, কহিল, মাকে এতকাল পরে তুই চিনতে পেরেছিস বল?

দ্বিজদাস বলিল, যদি পেরেও থাকি সে শুধু আপনিই জানুন। আমি মায়ের কুপুত্র আমি কুলাঙ্গার, তাঁর কাছে এই পরিচয়ই থাক। একে আর নাড়িয়ে কাজ নেই দাদা।

কিন্তু কেন? মা তোকে বিশ্বাস করতে পারেন, তোকে ভাল বলে ভাবতে পারেন, এ কি তুই সত্যিই চাসনে? এ অভিমানে লাভ কি বলতো?

লাভ কি জানিনে কিন্তু লোভ বিশেষ নেই। আমি আপনার পেয়েছি স্নেহ, পেয়েছি বৌদিদির ভালবাসা, এই আমার সাত রাজার ধন, সাতজন্ম দু'হাতে বিলিয়েও শেষ করতে পারবো না, কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই তাহার চোখ-মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল। হৃদয়ের এই-সকল আবেগ-উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে সে চিরদিন পরাঙ্মুখ,—চিরদিন নিঃস্পৃহতার আবরণে ঢাকা দিয়া বেড়ানোই তাহার প্রকৃতি,—মুহূর্তে নিজেকে সামলাইয়া ফেলিয়া বলিল, কিন্তু এ-সব আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যেটা প্রয়োজন সে হচ্চে এই যে, আমার চোখে বন্দনার চলে যাওয়ার ভাবটা দেখালো যেন রাগের মতো। এর মানেটা বলে দিন।

মানেটা বোধ হয় এই যে তুই যখন এসে পড়েছিস তখন ওর আর দরকার নেই। এখন থেকে সেবা-শুশ্রূষার ভার তোর উপর। এই বলিয়া বিপ্রদাস হাসিতে লাগিল।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি ঠাট্টা করচেন বটে, কিন্তু আমি বলচি, এই-সব ইংরেজিনবিশ মেয়েগুলো এই দম্ভতেই একদিন মরবে। আপনাকে রোগে সেবা করবার দিন যেন না কখনও আসে, কিন্তু এলে প্রমাণ হতে দেরি হবে না যে দাদার সেবার দ্বিজুকে হারানো দশটা বন্দনার সাধ্যে কুলোবে না, এ কথা তাকে জানিয়ে দেবেন।

স্নেহহাস্যে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আচ্ছা জানাবো, কিন্তু বিশ্বাস করবে কিনা জানিনে। তবে, সে পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে নেই,—আছে শুধু একজনের কাছে,—সে মা। বোঝাপড়া তোদের একটা হওয়া দরকার—বুঝলি রে দ্বিজু?

দ্বিজদাস বলিল, না দাদা, বুঝলাম না। কিন্তু মা যখন, তখন বেঁচে থাকলে বোঝাপড়া একদিন হবেই, কিন্তু এখুনি প্রয়োজনটা কিসের এলো এইটেই ভেবে পাচ্ছিনে। এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিল, আমার কপালে সবই হল উলটো। বাবা জন্ম দিলেন, কিন্তু দিয়ে গেলেন না কানাকড়ির সম্পত্তি—সে দিলেন আপনি। মা গর্ভে ধারণ করলেন কিন্তু পালন করলেন অন্নদাদিদি, আর সমস্ত ভার বয়ে মানুষ করে তুললেন বৌদিদি,—দুজনেই পরের ঘর থেকে এসে। পিতা স্বর্গঃ, পিতা ধর্মঃ এবং মাতা স্বর্গাদপি গরীয়সী—এই শ্লোক আউড়ে মনকে আর কত চাঙ্গা রাখবো দাদা, আপনিই বলুন?

বিপ্রদাস কহিল, মায়ের মামলা নিয়ে আর ওকালতি করবো না, সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি, কিন্তু বাবার সম্বন্ধে যে ধারণা তোর আছে সে ভুল। অর্ধেক বিষয়ের সত্যিই তুই মালিক।

দ্বিজদাস বলিল, হতে পারে সত্যি, কিন্তু বাবার মৃত্যুর পরে ঘরে দোর দিয়ে তাঁর উইলখানা কি আপনি পুড়িয়ে ফেলেন নি?

কে বললে তোকে?

এতকাল যিনি আমাকে সকল দিক দিয়ে রক্ষে করে এসেছেন এ তাঁর মুখেই শোনা।

তা হতে পারে, কিন্তু তোর বৌদিদি ত সে উইল পড়ে দেখেন নি। এমন ত হতে পারে, বাবা তোকেই সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাগ করে আমি তা পুড়িয়েছি। অসম্ভব ত নয়।

শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে দ্বিজদাস প্রথমটা খুব হাসিয়া লইয়া কহিল, দাদা, আপনি যে কখনো মিথ্যে বলেন না? দ্বাপরে যুধিষ্ঠিরের মিথ্যেটা নোট করে গিয়েছিলেন বেদব্যাস, আর কলিতে আপনারটা নোট করে রাখবে দ্বিজদাস। দুই-ই হবে সমান। যা হোক, এটা বোঝা গেল, বিপাকে পড়লে সবই সম্ভব হয়। আর পাপ বাড়াবেন না, বলুন এখন থেকে কি আমাকে করতে হবে।

আমাদের কারবার বিষয়-আশয় সমস্ত দেখতে হবে।

কিন্তু কেন? কিসের জন্যে এত ভার আমি বইতে যাবো আমাকে বুঝিয়ে দিন। আপনি একা পারচেন না নাকি? অসম্ভব। আমি নিষ্কর্মা অপদার্থ হয়ে যাচ্চি? না যাচ্চিনে। তবু মা জিজ্ঞেসা করলে তাঁকে জানিয়ে দেবেন পদার্থের আমার দরকার নেই, অপদার্থ হয়েই আমি দিন কাটিয়ে দেবো, তাঁকে ভাবতে হবে না। আপনি থাকতে টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তির বোঝা আমি বইব না। শেষে কি আপনার মতো ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠবো নাকি? লোকে বলবে, ওর শিরের মধ্যে দিয়ে রক্ত বয় না, বয় শুধু টাকার স্রোত। কিন্তু বলিতে বলিতেই লক্ষ্য করিল বিপ্রদাস অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছে, তাহার কথায় কান নাই। এমন সচরাচর হয় না,—এ স্বভাব বিপ্রদাসের নয়, একটু বিস্মিত হইয়া বলিল, দাদা, সত্যিই কি চান আমি বিষয়কর্ম দেখি, যা আমার চিরদিনের স্বপ্ন সেই স্বদেশসেবায় জলাঞ্জলি দিই?

বিপ্রদাস তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, জলাঞ্জলি দিবি এমন কথা ত তোকে কোনদিনই বলিনে দ্বিজু। যা তোর স্বপ্ন সে তোর থাক,—চিরদিন থাক—তবু বলি সংসারের ভার তুই নে।

কিন্তু কেন বলুন? কারণ না জানলে আমি কিছুতেই এ কথা মানবো না।

বিপ্রদাস একমুহূর্ত মৌন থাকিয়া বলিল, এর কারণ ত খুবই স্পষ্ট দ্বিজু। আজ আমি আছি, কিন্তু এমন ত ঘটতে পারে আর আমি নেই।

দ্বিজদাস জোর দিয়া বলিয়া উঠিল, না, ঘটতে পারে না। আপনি নেই,—কোথাও নেই এ আমি ভাবতে পারিনে।

তাহার বিশ্বাসের প্রবলতা বিপ্রদাসকে আঘাত করিল, কিন্তু হাসিয়া বলিল, সংসারে সবই ঘটে রে, এমন কি অসম্ভবও। এই কথাটা ভাবতে যারা ভয় পায় তারা নিজেদের ঠকায়। আবার এমনও হতে পারে আমি ক্লান্ত, আমার ছুটির দরকার,—তবু দিবিনে তুই?

না দাদা, পারবো না দিতে। তার চেয়ে ঢের সহজ আপনার আদেশ পালন করা। বলুন, কবে থেকে আমাকে কি করতে হবে।

আজ থেকে এ সংসারের সব ভার নিতে হবে।

আজ থেকেই? এতই তাড়াতাড়ি? বেশ তাই হবে। আপনার অবাধ্য হবো না। এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু শুনিতে পাইল দাদার কথা—তোকে বলতে হবে না রে, আমি জানি আমার অবাধ্য তুই নয়।

দ্বিজদাসের কাজ শুরু হইয়া গেল। সে অলস, অকর্মণ্য, উদাসীন এই ছিল সকলের চিরদিনের অভিযোগ। কিন্তু দাদার আদেশে মায়ের ব্রত-প্রতিষ্ঠার সুবৃহৎ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার সর্বপ্রকার দায়িত্ব আসিয়া পড়িল যখন একাকী তাহার পরে, তখন এ দুর্নাম অপ্রমাণ করিতে তাহার অধিক সময় লাগিল না। এই অনভ্যস্ত গুরুভার সে যে এত স্বচ্ছন্দে বহন করিবে এতখানি আশা বিপ্রদাস করে নাই, কিন্তু তাহার নিরলস, সুশৃঙ্খল কর্মপটুতায় সে যেন একেবারে বিস্মিত হইয়া গেল। যাহা কিনিয়া পাঠাইবার তাহা গাড়ি বোঝাই করিয়া দ্বিজদাস বাড়ি পাঠাইল, যাহা লইবার তাহা সঙ্গে রাখিল, আত্মীয় কুটুম্বগণকে একত্র করিয়া

যথাযোগ্য সমাদরে রওনা করিয়া দিল, এখানকার সকল কার্য সমাধা করিয়া আজ গৃহে ফিরিবার দিন সে দাদার শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতে তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল সেখানে বসিয়া বন্দনা। সেই যাবার দিন হইতে আর সে আসে নাই, তাহার কথা কাজের ভিড়ে দ্বিজদাস ভুলিয়াছিল—আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইয়া মনে মনে সে আশ্চর্য হইল, কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ না করিয়া শুধু একটা মামুলি নমস্কারে শিষ্টাচার সারিয়া লইয়া বলিল, দাদা, আজ রাত্রির গাড়িতে আমি বাড়ি যাচ্চি, সঙ্গে যাচ্চেন অক্ষয়বাবু, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা মৈত্রেয়ী। আপনার কলেজের ছাত্ররা বোধ করি কাল-পরশু যাবে,—তাদের ভাড়া দিয়ে গেলুম। অনুদিকে কি আপনিই সঙ্গে নিয়ে যাবেন? কিন্তু দিন তিন-চারের বেশী বিলম্ব করবেন না যেন!

আমাকে কি যেতেই হবে?

হাঁ। না যান ত একজোড়া খড়ম কিনে দিন, নিয়ে গিয়ে ভরতের মতো সিংহাসনে বসাবো।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ফাজিলের অগ্রগণ্য হয়েচিস তুই। কিন্তু আশ্চর্য করলি অক্ষয়বাবুর কথায়। তিনি যাবেন কি করে? তাঁর ত ছুটি নেই—কাজ কামাই হবে যে?

দ্বিজদাস বলিল, তা হবে ; কিন্তু লোকসান নেই—ওদিকে তার চেয়েও ঢের বড় কাজ হবে বড়ঘরে মেয়ে দিতে পারাটা। টাকাওয়ালা জামাই ভবিষ্যতের অনেক ভরসা,—কলেজের বাঁধা মাইনের অনেক বেশি।

বিপ্রদাস রাগিয়া বলিল, তোর কথাগুলো যেমন রূঢ় তেমনি কর্কশ। মানুষের সম্মান রেখে কথা কইতে জানিস নে?

দ্বিজদাস বলিল, জানি কিনা বৌদিদিকে জিজ্ঞেসা করে দেখবেন। সৌজন্যের বাজে অপব্যয় করিনে শুধু এই আমার দোষ।

শুনিয়া বিপ্রদাস না হাসিয়া পারিল না, বলিল, তোর একটি সাক্ষী শুধু বৌদিদি। যেমন মাতালের সাক্ষী শুঁড়ি।

দ্বিজদাস কহিল, তা হোক, কিন্তু আপনার কথাটাও ঠিক মধুমাখা হচ্চে না দাদা। কারণ আমিও মাতাল নই, তিনিও মদের যোগান দেন না। দেন অমৃত, দেন গোপনে বহু লোকের অন্ন যা অনেক বড়লোক পারে না।

বিপ্রদাস কহিল, তাদের পেরেও কাজ নেই। আদর দিয়ে দেওরকে জন্তু করে তোলা ছাড়া বড়লোকদের অন্য কাজ আছে।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়া হাসিতে লাগিল, দ্বিজদাস সেটা লক্ষ্য করিয়া বলিল, এ নিয়ে আর তর্ক করবো না দাদা। বৌদিদি আপনার নেই,—বাঙালীর সংসারে তাঁর স্নেহ যে কি সে আপনি কোনদিন জানেন না। অন্ধকে আলো বোঝানোর চেষ্টায় ফল নেই। একটু হাসিয়া বলিল, বন্দনা আড়ালে হাসচেন, কিন্তু মাসীর বাড়ির বদলে দিন-কতক আমাদের বাড়িতে কাটিয়ে এলে হয়ত আমার কথাটা বুঝতেন। কিন্তু থাক গে এ-সব আলোচনা। আপনি কবে বাড়ি যাচ্ছেন বলুন?

আমি বড় ক্লান্ত দ্বিজু, মাকে বুঝিয়ে বলতে পারবি নে?

বিপ্রদাসের এমন নির্জীব নিস্পৃহ কণ্ঠস্বর সে কখনো শোনে নাই, চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, ক্ষীণ হাসিটুকু তখনো ওষ্ঠপ্রান্তে লাগিয়া আছে—কিন্তু এ যেন তাহার দাদা নয়, আর কেহ—বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, অসুখ কি এখনো সারেনি দাদা?

না, সেরে গেছে।

তবু মায়ের কাজে বাড়ি যেতে পারলেন না এ কথা মাকে বোঝাবো কি করে? ভয় পেয়ে তিনি চলে আসবেন, তাঁর সমস্ত আয়োজন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

বিপ্রদাস ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিল, তুই আমাকে কবে যেতে বলিস?

দ্বিজদাস বলিল আজ, কাল, পরশু—যবে হোক। আমাকে অনুমতি দিন আমি নিজে এসে আপনাকে নিয়ে যাবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া কহিল, বেশ তাই হবে। আমি নিজেই যেতে পারবো, তোকে ফিরে আসতে হবে না।

দ্বিজদাস চলিয়া গেলে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এটা কি হলো মুখুয্যেমশাই, বাড়ি যেতে আপত্তি করলেন কিসের জন্যে?

বিপ্রদাস কহিল, কারণটা ত নিজের কানেই শুনলে?

শুনলুম, কিন্তু ও জবাব পরের জন্যে, আমার জন্যে নয়। বলুন কিসের জন্যে বাড়ি যেতে চান না। আপনাকে বলতেই হবে।

আমি ক্লান্ত।

না।

না কেন? ক্লান্তিতে সকলেরই দাবী আছে, নেই কি শুধু আমার?

আপনারও আছে, কিন্তু সে দাবী সত্যিকার হলে সকলের আগে বুঝতে পারতুম আমি। আর সকলের চোখকেই ঠকাতে পারবেন, পারবেন না ঠকাতে শুধু আমার চোখকে। যাবার সময় মেজদিকে চিঠি লিখে যাবো, আপনার রোগ ধরবার কখনো দরকার হলে যেন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান।

মেজদি নিজে পারবেন না রোগ ধরতে, তুমি দেবে ধরে!—এ কথা শুনলে কিন্তু তিনি খুশী হবেন না।

বন্দনা বলিল, খুশী হবেন না সত্যি, কিন্তু কৃতজ্ঞ হবেন। আমার মেজদি হলেন সে-যুগের মানুষ, স্বামী তাঁকে খুঁজে বেছে নিতে হয়নি, ভগবান দিয়েছিলেন আশীর্বাদের মতো অঞ্জলি পূর্ণ করে। তখন থেকে সুস্থ সবল মানুষটিকে নিয়েই তাঁর কারবার। কিন্তু সে মানুষেরও যে হঠাৎ একদিন মন ভাঙ্গতে পারে এ খবর তিনি জানবেন কি করে?

বিপ্রদাস কথা না কহিয়া শুধু একটুখানি হাসিল।

বন্দনা বলিল, আপনি হাসলেন যে বড়ো?

বিপ্রদাস বলিল, হাসি আপনি আসে বন্দনা। স্বামী খুঁজে-বেছে নেবার অভিযানে আজ পর্যন্ত যাদের তুমি দেখতে পেয়েছো, তাদের বাইরে যে কেউ আছে এ তোমরা ভাবতে পারো না। সংসারে সাধারণ নিয়মটাই শুধু মানো, স্বীকার করতে চাও না তার ব্যতিক্রমটাকে। অথচ এই ব্যতিক্রমটার জোরেই টিকে আছে ধর্ম, টিকে আছে পুণ্য, আছে কাব্য-সাহিত্য, আছে অবিচলিত শ্রদ্ধা-বিশ্বাস। এ না থাকলে পৃথিবীটা যেতো একেবারে মরুভূমি হয়ে। এই সত্যটাই আজও জানো না।

বন্দনা বিদ্রূপের সুরে বলিল, এই ব্যতিক্রমটা বুঝি আপনি নিজে মুখুয্যেমশাই? কিন্তু সেদিন যে বললেন আমাকেও আপনি ভালবাসেন?

সে আজও বলি। কিন্তু ভালবাসার একটিমাত্র পথই তোমাদের চোখে পড়ে আর সব থাকে বন্ধ, তাই সেদিনের কথাগুলো আমার তুমি বুঝতে পারনি। একবার দেখে এসো গে দ্বিজু আর তার বৌদিদিকে। দৃষ্টি অন্ধ না হোলে দেখতে পাবে কি করে শ্রদ্ধা গিয়ে মিশেচে ভালবাসার সঙ্গে। রহস্য-কৌতুকে, আদরে-আহ্লাদে, নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় সে শুধু তার বৌদিদি নয়, সে তার বন্ধু, সে তার মা। সেই সম্বন্ধ ত তোমার-আমারও,—ঠিক তেমনি করেই কেন আমাকে তুমি নিতে পারলে না বন্দনা!

তাহার কণ্ঠস্বরের মধ্যে ছিল গভীর স্নেহের সঙ্গে মিশিয়া তিরস্কারের সুর, বন্দনাকে তাহা কঠিন আঘাত করিল। কিছুক্ষণ নীরবে অধোমুখে থাকিয়া সহসা চোখ তুলিয়া বলিল, আপনাকে আমি ভুল বুঝেছিলুম মুখুয্যেমশাই। আমার মেজদিদিকে যদি আপনি সত্যই ভালবাসতেন, দুঃখ আমার ছিল না ; কিন্তু তা আপনি বাসেন না। আপনি পালন করেন

শুধু ধর্ম, মেনে চলেন শুধু কর্তব্য। কঠিন আপনার প্রকৃতি, কাউকে ভালোবাসতে জানে না। যত ঢেকেই রাখুন এ সত্য একদিন প্রকাশ পাবেই।

ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আজ আমারও ভুল ভাঙলো। শূন্যের মধ্যে হাত বাড়িয়ে মানুষ খুঁজতে আর না যাই, আজ আমাকে এই আশীর্বাদ আপনি করুন।

বিপ্রদাস সহাস্যে হাত বাড়াইয়া বলিল, করলুম তোমাকে সেই আশীর্বাদ। আজ থেকে মানুষ খোঁজা যেন তোমার শেষ হয়, যে তোমার চিরদিনের তাকে যেন তিনিই তোমাকে দান করেন।

কথাটাকে অপমানকর পরিহাস মনে করিয়া বন্দনা রাগিয়া বলিল, আপনি ভুল করচেন মুখুয্যেমশাই, মানুষ খুঁজে বেড়ানোই আমার পেশা নয়। তারা আলাদা। কিন্তু হঠাৎ আজ কেন এসেচি এখনো সেই কথাটা আপনাকে বলা হয়নি। এদিক দিয়ে সত্যিই আমার একটা মস্ত ভুল ভেঙ্গে গেছে। এখানে আপনাদের সংস্রবে এসে ভেবেছিলুম এই-সব আচার-বিচার বুঝি সত্যিই ভালো, খাওয়া-ছোঁয়ার নিয়ম মেনে চলা, ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, পূজোর সাজ গোছ করা—আরও কত কি খুঁটিনাটি,—মনে করতুম এ-সব বুঝি সত্যিই মানুষকে পবিত্র করে তোলে, কিন্তু এবার মাসীমার বাড়িতে গিয়ে এ মূঢ়তা ঘুচেছে। দিন-কয়েক কি পাগলামিই না করেছিলুম মুখুয্যেমশাই, যেন সত্যিই এ-সব বিশ্বাস করি, যেন আমাদের শিক্ষায় সংস্কারে সত্যিই কোথাও এর থেকে প্রভেদ নেই। এই বলিয়া সে জোর করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিয়াছিল কথাটা হয়ত বিপ্রদাসকে ভারী আঘাত করবে, কিন্তু দেখিতে পাইল একেবারেই না। তাহার ছদ্মহাসিতে সে প্রসন্নহাসি যোগ করিয়া বলিল, আমি জানতুম বন্দনা। তোমার কি মনে নেই আমি সতর্ক করে একদিন তোমাকে বলেছিলুম এ-সব তোমার জন্যে নয়, এ-সব করতে তুমি যেয়ো না। সেই মূঢ়তা ঘুচেছে জেনে আমি খুশীই হলুম। মনে করেছিলে শুনে বুঝি বড় কষ্ট পাবো, কিন্তু তা নয়। যার যা স্বাভাবিক নয় তা না করলে আমি দুঃখ বোধ করিনে। তোমার ত মনে আছে আমি কিসের ধ্যান করি তুমি জানতে চাইলে আমি চুপ করে ছিলুম। বলতে বাধা ছিল বলে নয়, অকারণ বলে। কিন্তু এ-সব কথাবার্তা এখন থাক। তোমার বোম্বায়ে ফিরে যাবার কি কোন দিন স্থির হলো?

অভিমানে বন্দনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, বিপ্রদাসের প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলিল, না।

সেদিন তোমার মাসীর ভাইপো অশোকের কথা বলেছিলে। বলেছিলে ছেলেটিকে তোমার ভালই লেগেছে। এ কয়দিনে তার সম্বন্ধে আর কিছু কি জানতে পারলে?

না।

তোমাদের বিয়েই যদি হয় আমি আশীর্বাদ করবো, কিন্তু মাসীর তাড়ায় যেন কিছু করে বসো না। তাঁর তাগাদাকে একটু সামলে চলো।

বন্দনার চোখে জল আসিয়া পড়িল, কিন্তু মুখ নীচু করিয়া সামলাইয়া বলিল, আচ্ছা।

বিপ্রদাস বলিল, আমি পরশু বাড়ি যাব। দু-তিন দিনের বেশি থাকতে পারবো না। ফিরে আসার পরেও যদি কলিকাতায় থাকো একবার এসো।

বন্দনা মুখ নীচু করিয়াই ছিল, মাথা নাড়িয়া কি একটা জবাব দিল তাহার স্পষ্ট অর্থ বুঝা গেল না।

বিপ্রদাস কহিল, শুনলে ত আমার ছুটি মঞ্জুর হলো এখন থেকে সব ভার দ্বিজুর। সংসারের ঘানিতে বাবা আমাকে ছেলেবেলাতেই জুড়ে দিয়েছিলেন, কখনো অবকাশ পাইনি কোথাও যাবার। আজ মনে হচ্চে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচবো।

এবার বন্দনা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সত্যিই কি নিশ্বাস ফেলার এতই দরকার হয়েছে মুখুয্যেমশাই? সত্যিই কি আজ আপনি এত শ্রান্ত?

বিপ্রদাস এ প্রশ্নের উত্তরটা এড়াইয়া গেল, বলিল, ভালো কথা বন্দনা, আমার অসুখে

তোমার সেবার উল্লেখ করে বলছিলুম, তোমার কাছে তাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এর অর্ধেক তারা কেউ পারতো না। দ্বিজু কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেও তোমাকে বলতে বলেচে, যদি সে সময় কখনো আসে, দাদার সেবায় তার সমকক্ষ হওয়া দশটা বন্দনারও সাধ্যে কুলোবে না।

বন্দনা বলিল, তাঁকেও বলবেন শর্ত আমি স্বীকার করে নিলুম। কিন্তু পরীক্ষার দিন যদি কখনো আসে তখন যেন তাঁর দেখা মেলে।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিল, দেখা মিলবে বন্দনা, সে পিছোবার লোক নয়। তাকে তুমি জানো না।

জানি মুখুয্যেমশাই। ভালো করেই জানি, আপনার কাজে তাঁর প্রতিযোগিতা করা সত্যিই বন্দনার শক্তিতে কুলোবে না।

ভ্রাতৃগর্বে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, জানো বন্দনা, দ্বিজু আমার সাধু লোক।

আপনার চেয়েও নাকি?

হাঁ, আমার চেয়েও। এই বলিয়া বিপ্রদাস একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কিন্তু সে বলছিল তুমি নাকি তার উপর রাগ করে আছো। কথা কওনি কেন?

কথা কইবার দরকার হয়নি মুখুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তবেই ত দেখচি তুমি সত্যই রাগ করে আছো। কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে বলি বন্দনা, দ্বিজুর ব্যবহারটা রুক্ষ, কথাগুলোও সর্বদা বড় মোলায়েম হয় না, কিন্তু তার এই কর্কশ আবরণটা ঘুচিয়ে যদি কখনো তার দেখা পাও, দেখবে এমন মধুর লোক আর নেই। কথাটা আমার বিশ্বাস করো, এমন নির্ভর করবার মানুষও তুমি সহজে খুঁজে পাবে না।

বন্দনা আর একদিকে চাহিয়া রহিল, উত্তর দিল না। হঠাৎ এক সময়ে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে মুখুয্যেমশাই, আমি যাই। যদি থাকতে পারি আপনি ফিরে এলে দেখা করবো। যদি না পারি এই আমার শেষ নমস্কার রইলো। এই বলিয়া হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সে দ্রুত প্রস্থান করিল। একটা কথা বলারও সে বিপ্রদাসকে অবকাশ দিল না।

বারান্দা পার হইয়া সিঁড়ির মুখে আসিয়া সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, দ্বিজদাস দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, এ আবার কি?

একটা মিনতি আছে। দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আপনাকে আমাদের দেশের বাড়িতে একবার যেতে হবে।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে? এর হেতু?

দ্বিজদাস কহিল, বলবো বলেই দাঁড়িয়ে আছি। একদিন বিনা আহ্বানেই আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছিলেন, আজ আবার সেই দয়া আপনাকে করতে হবে।

বন্দনা একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিল, তারপরে বলিল, কিন্তু আমাকে যাবার নিমন্ত্রণ করচে কে? মা, দাদা, না আপনি নিজে?

আমি নিজেই করচি।

কিন্তু আপনি ত ও-বাড়িতে তৃতীয় পক্ষ, ডাকবার আপনার অধিকার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আর কোন অধিকার না থাক আমার বাঁচবার অধিকার আছে। সেই অধিকারে এই আবেদন উপস্থিত করলুম। বলুন মঞ্জুর করলেন? একান্ত প্রয়োজন না হলে কোন প্রার্থনাই আমি কারো কাছে করিনে।

বন্দনা বহুক্ষণ পর্যন্ত অন্যদিকে চাহিয়া রহিল, তার পরে বলিল, আচ্ছা, তাই যাবো,

কিন্তু আমার মান-অপমানের ভার রইলো আপনার উপর।

দ্বিজদাস সকৃতজ্ঞ-কণ্ঠে কহিল, আমার সাধ্য সামান্য, তবু নিলুম সেই ভার।

বন্দনা বলিল, বিপদের সময়ে এ কথা ভুলবেন না যেন।

না, ভুলবো না।

একুশ

অনেকদিনের পরে বিপ্রদাস নীচের অফিসঘরে আসিয়া বসিয়াছে। সম্মুখে টেবিলের পরে কাগজপত্রের স্তূপ—কতদিনের কত কাজ বাকী। দেহ ক্লান্ত, কিন্তু দ্বিজুর ভরসায় ফেলিয়া রাখাও আর চলে না। একটা খেরো-বাঁধানো মোটা খাতা টানিয়া লইয়া সে পাতা উলটাইতেছিল, বাহিরে মোটরের বাঁশী কানে গেল এবং অনতিবিলম্বে পূবের খোলা দরজা দিয়া বন্দনা প্রবেশ করিল। আজ একা নয়, সঙ্গে একটি অপরিচিত যুবক, পরনে ধুতি পাঞ্জাবি, পায়ে ফুলকাটা কটকি চটি এবং কাঁধ হইতে তির্যক ভঙ্গিতে জড়ানো মোটা সাদা চাদর। বয়স ত্রিশের নীচে, দেহের গঠন আর একটু দীর্ঘচ্ছন্দের হইলে অনয়াসে সুপুরুষ বলা চলিত। বিপ্রদাস অভ্যর্থনা করিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বন্দনা কহিল, মুখুয্যেমশাই, ইনিই মিস্টার চাউড্রি—বার-এ্যাট-ল। কিন্তু এখানে অশোকবাবু বলে ডাকলেও অফেন্স নিতে পারবেন না এই শর্তে আলাপ করিয়ে দিতে রাজী হয়ে সঙ্গে এনেচি। আলাপ হবে, কিন্তু তার আগে আপন কর্তব্যটা সেরে নিই—এই বলিয়া সে আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, পায়ের ধুলোটা কিন্তু এঁর সুমুখে নিতে পারলুম না পাছে মনে করে বসেন ওঁদের সমাজের আমি কলঙ্ক। কিন্তু তাই বলে যেন অভিমানভরে আপনিও ভেবে নেবেন না নতুন কায়দাটা আমার মাসীর কাছে শেখা। তাঁর পরে আপনার প্রসন্নতার বহরটা আমার পরিমাপ করা কি না!

বিপ্রদাস কহিল, তোমার মাসীমার কাছে এইভাবেই আমার গুণগান করো নাকি? নবাগত যুবকটির প্রতি ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, বন্দনার মুখে আপনার কথা এত বেশি শুনেচি যে অসুস্থ না থাকলে আমি নিজেই যেতুম আলাপ করতে। দেখেই মনে হলো চেহারাটা পর্যন্ত চেনা, যেন কতবার দেখেচি। ভালোই হলো অযথা বিলম্ব না করে উনি নিজেই সঙ্গে করে আনলেন।

ভদ্রলোক প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে চাহিল, কিন্তু তাহার পূর্বেই বন্দনা শাসনের ভঙ্গীতে তর্জনী তুলিয়া কহিল, মুখুয্যেমশাই, অত্যুক্তি অতিশয়োক্তিকে ছাড়িয়ে প্রায় মিথ্যার কোঠায় এলো, এবার থামুন নইলে হাঙ্গামা করবো।

ইহার অর্থ?

ইহার অর্থ এই হয় যে আমাদের অতি-সাধারণদের মত সত্যি-মিথ্যে যা খুশি বানিয়ে বলা আপনারও চলে। আপনি মোটেই অসাধারণ ব্যক্তি নয়,—ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মনুষ্য।

বিপ্রদাস কহিল, না। সকলকে জিজ্ঞেসা করো, তারা এইবাক্যে সাক্ষ্য দেবে তোমার অনুমান অশ্রদ্ধেয়, অগ্রাহ্য।

বন্দনা বলিল, এবার তাদের কাছেই আপনাকে নিয়ে গিয়ে বাইরের ঐ সিংহচর্মটি দু'হাতে ছিঁড়ে ফেলে দেবো, তখন আসল মূর্তিটি তারা দেখতে পাবে,—তাদের ভয় ভাঙবে। আমাকে আশীর্বাদ করে বলবে তুমি রাজরানী হও।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, আশীর্বাদে আপত্তি নেই, এমন কি নিজে করতেও প্রস্তুত, কিন্তু আশীর্বাদ ত তোমরা চাও না, বলো কুসংস্কার, বলো ও শুধু কথার কথা।

বন্দনা পুনরায় আঙুল তুলিয়া বলিল, ফের খোঁচা দেবার চেষ্টা? কে বলেছে গুরুজনদের আশীর্বাদ আমরা চাইনে,—কে বলেচে কুসংস্কার? এবার কিন্তু সত্যই রাগ হচ্চে মুকুয্যেমশাই।

বিপ্রদাস গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যই রাগ হচ্চে নাকি? তবে থাক এ-সব গোলমেলে কথা। কিন্তু হঠাৎ সকালবেলাতেই আবির্ভাব কেন? কোন কাজ আছে নাকি?

বন্দনা কহিল, অনেক। প্রথম আপনার কৈফিয়ত নেওয়া। কেন আমার বিনা হুকুমে নীচে নেমে কাজ শুরু করেছেন?

করিনি, করবার সঙ্কল্প করেছিলুম মাত্র। এই রইলো—বলিয়া সেই মোটা খাতাটা বিপ্রদাস দূরে ঠেলিয়া দিল।

বন্দনা প্রসন্নমুকে কহিল, কৈফিয়ত satisfactory; অবাধ্যতা মার্জনা করা গেল। ভবিষ্যতে এমনি অনুগত থাকলেই আমার কাজ চলে যাবে। এবার শুনুন মন দিয়ে ততক্ষণ এঁর সঙ্গে বসে গল্প করুন—মুখুয্যেদের ঐশ্বর্যের বিবরণ, প্রজা-শাসনের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনী—যা খুশি। আমি ওপরে যাচ্ছি অনুদিকে নিয়ে সমস্ত গুছিয়ে নিতে। কাল সকালের ট্রেনে আমরা বলরামপুর যাত্রা করবো, দিনে দিনে যাবো—ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকবে না। মিস্টার চাউড্রির ইচ্ছে সঙ্গে যান,—বড়ঘরের বড়রকমের যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়া-কলাপ দীয়তাং ভুজ্যতাং ঘটা-পটা কখনো চোখে দেখেন নি,—আর কোথা থেকেই বা দেখবেন—

বিপ্রদাস জিজ্ঞাসা করিল, তুমি নিজে নিশ্চয়ই অনেক দেখেচো—

বন্দনা কহিল, এ প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভদ্ররুচি-বিগর্হিত। উনি দেখেন নি এই কথাই হচ্ছিলো। তা শুনুন। ওঁকে অনুমতি দিয়েছি সঙ্গে যাবার, তাতে এত খুশী হয়েচেন যে তার পরে আমাকে সঙ্গে করে বোম্বাই পর্যন্ত পৌঁছে দিতে সম্মত হয়েচেন।

বিপ্রদাস মুখ অতিশয় গম্ভীর করিয়া কহিল, বলো কি? এতখানি ত্যাগ স্বীকার আমাদের সমাজে মেলে না, এ শুধু তোমাদের মধ্যেই পাওয়া যায়। শুনে বিস্ময় লাগচে।

বন্দনা বলিল, লাগবার কথাই যে। জপ-তপও আছে, ষোল-আনা হিংসেও আছে। এই বলিয়া সে চোখের দৃষ্টিতে এক ঝলক বিদ্যুৎ ছড়াইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, বিপ্রদাস তাহাকে ডাকিয়া কহিল, এ যেন কথামালার সেই কুকুরের ভূষি আগলানোর গল্প। খাবেও না, আর ষাঁড়ের দল এসে যে মনের সাধে চিবোবে তাও দেবে না। মানুষ বাঁচে কি করে বলো ত?

বন্দনা দ্বার-প্রান্তে থমকিয়া দাঁড়াইয়া কৃত্রিম রোষে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল, বলিল, ঠিক আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ কিচ্ছু তফাত নেই। লোকগুলো কেবল মিথ্যে ভয় করে মরে।

তুমি গিয়ে এবার তাদের ভয় ভেঙ্গে দিয়ে এসো।

তাই তো যাচ্চি। এবং ভূষির সঙ্গে একজনের উপমা দেবার দুর্বুদ্ধিরও শোধ নিয়ে আসবো—এই বলিয়া বন্দনা দীপ্ত কটাক্ষে পুনরায় তড়িৎ-বৃষ্টি করিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বিপ্রদাস কহিল, মিস্টার—

অশোক সবিনয়ে বাধা দিল,—না না, চলবে না। ওটাকে বাদ দিতে বাধবে না বলেই ধুতি-চাদর এবং চটি জুতো পরে এসেচি বিপ্রদাসবাবু। উনিও ভরসা দিয়েছিলেন যে—

বিপ্রদাস মনে মনে খুশী হইয়া বলিল, ভালোই হ'লো অশোকবাবু, সম্বোধনটা সহজ দাঁড়ালো। পাড়াগাঁয়ের মানুষ, মনেও থাকে না, অভ্যাসও নেই, এবার স্বচ্ছন্দে আলাপ জমাতে পারবো। শুনলুম আমাদের পল্লীগ্রামের বাড়িতে যেতে চেয়েছেন, সত্যিই যদি যান ত কৃতার্থ হবো। আমাদের সংসারের কর্ত্রী আমার মা, তাঁর পক্ষ থেকে আপনাকে আমি সসম্মানে আমন্ত্রণ করচি।

বিপ্রদাসের বিনয়-বচনে অশোক পুলকিতচিত্তে বলিল, নিশ্চয় যাবো—নিশ্চয় যাবো। কত দরিদ্র অনাথ আতুর আসবে নিমন্ত্রণ রাখতে, কত অধ্যাপক পণ্ডিত উপস্থিত হবেন বিদায় গ্রহণ করতে—আনন্দোৎসবে কত খাওয়া-দাওয়া কত আসা-যাওয়া, কত বিচিত্র

আয়োজন—

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, সমস্ত বাড়ানো কথা অশোকবাবু, বন্দনা শুধু রহস্য করেছে।

রহস্য করে তার লাভ কি বিপ্রদাসবাবু?

একটা লাভ আমাদের অপ্রতিভ করা। বলরামপুরের মুখুয্যেদের ওপর সে মনে মনে চটা। দ্বিতীয় লাভ আপনাকে সে কোন ছলে বোম্বায়ে টেনে নিয়ে যেতে চায়।

অশোক বলিল, প্রয়োজন হলে বোম্বাই পর্যন্ত আমাকে সঙ্গে যেতে হবে এ কথা আছে, কিন্তু মুখুয্যেদের পরে সে চটা, আপনাদের সে লজ্জিত করতে চায় এমন হতেই পারে না। কালও বলরামপুরে যাবার স্থির ছিল না, কিন্তু আপনাদের কথা নিয়েই ওর মাসীর সঙ্গে হয়ে গেল ঝগড়া। মাসী বললেন, বিপ্রদাসের মা সর্বসাধারণের হিতার্থে যদি জলাশয় খনন করিয়ে থাকেন ত তাঁর প্রশংসা করি, কিন্তু ঘটা করে প্রতিষ্ঠা করার কোন অর্থ নেই,—ওটা কুসংস্কার। কুসংস্কারে যোগ দেওয়া আমি অন্যায় মনে করি। বন্দনা বললেন,—ওঁরা বড়লোক, বড়লোকের কাজেকর্মে ঘটা ত হয়েই থাকে মাসীমা। তাতে আশ্চর্যের কি আছে? আমার পিসীমা বললেন, বড়লোকের অপব্যয়ে আশ্চর্যের কিছু নেই মানি, কিন্তু ও-ত কেবল ও-ই নয়, ও-টা কুসংস্কার। তোমার যাওয়াতেই আমার আপত্তি। বন্দনা বললেন, আমি কিন্তু কুসংস্কার মনে করিনে মাসীমা। বরঞ্চ, এই মনে করি যে, যা জানিনে, জানার কখনো চেষ্টা করিনি, তাকে সরাসরি বিচার করতে যাওয়াই কুসংস্কার। ওর জবাব শুনে পিসীমা রাগে জ্বলে গেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবার অনুমতি নিয়েছো?

বন্দনা উত্তর দিলেন, বাবা বারণ করবেন না আমি জানি। দিদির স্বামী অসুস্থ, তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে আমার ওপর।

ভার দিলে কে শুনি? তিনি নিজেই বোধ হয়? প্রশ্ন শুনে বন্দনা যেন অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। আমার মনে হলো তাঁর মাথায় দ্রুত রক্ত চড়ে যাচ্ছে, এবার হঠাৎ কি একটা বলে ফেলবেন, কিন্তু, সে-সব কিছুই করলেন না, শুধু আস্তে আস্তে বললেন, যে যা খুশি জিজ্ঞেসা করলেই যে আমাকে জবাব দিতে হবে ছেলেবেলা থেকে এ শিক্ষা আমার হয়নি মাসীমা। পরশু সকালে মুখুয্যেমশাইকে নিয়ে আমি বলরামপুরে যাবো এর বেশি তোমাকে বলতে পারবো না।

পিসীমা রাগ করে উঠে গেলেন। আমি বললুম, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন? আমার ভারী ইচ্ছে করে ঐ-সব আচার-অনুষ্ঠান চোখে দেখি। বন্দনা বললেন, কিন্তু সে-সব যে কুসংস্কার অশোকবাবু। চোখে দেখলেও যে আপনাদের জাত যায়। বললুম, যদি আপনার না যায় ত আমারও যাবে না। আর যদি যায় ত দুজনের এক সঙ্গেই জাত যাক, আমার কোন ক্ষতি নেই।

বন্দনা বললেন, আপনি ত বিশ্বাস করেন না, সে-সব চোখে দেখলে যে মনে মনে হাসবেন।

বললুম, আপনিই কি বিশ্বাস করেন নাকি? তিনি বললেন, না করিনে, কিন্তু মুখুয্যে মশাই করেন। আমি কেবল আশা করি তাঁর বিশ্বাসই যেন একদিন আমারও সত্যি বিশ্বাস হয়ে ওঠে। বিপ্রদাসবাবু, আপনাকে বন্দনা মনে মনে পুজো করে, এত ভক্তি সে জগতে কাউকে করে না।

খবরটা অজানা নয়, নূতনও নয়, তথাপি অপরের মুখে শুনিয়া তাহার নিজের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

ক্ষণের পরে প্রশ্ন করিল, আপনাদের যে বিবাহের প্রস্তাব হয়েছিল সে কি স্থির হয়ে গেছে? বন্দনা সম্মতি দিয়েছেন?

না। কিন্তু অসম্মতিও জানান নি।

এটা আশার কথা অশোকবাবু। চুপ করে থাকাটা অনেক ক্ষেত্রেই সম্মতির চিহ্ন।

অশোক সকৃতজ্ঞ-চক্ষে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, নাও হতে পারে। অন্ততঃ, নিজে আমি এখনো তাই মনে করি। একটু থামিয়া কহিল, মুশকিল হয়েছে এই যে আমি গরীব, কিন্তু বন্দনা ধনবতী। ধনে আমার লোভ নেই তা নয়, কিন্তু পিসীমার মতো ঐটেই আমার একমাত্র লক্ষ্য নয়। এ কথা বোঝাবো কি করে যে, পিসীমার সঙ্গে আমি চক্রান্ত করিনি।

এই লোকটির প্রতি মনে মনে বিপ্রদাসের একটা অবহেলার ভাব ছিল, তাহার বাক্যের সরলতায় এই ভাবটা একটু কমিল। সদয়কণ্ঠে কহিল, পিসীর ষড়যন্ত্রে আপনি যে যোগ দেননি সত্যি হলে এ কথা বন্দনা একদিন বুঝবেই, তখন প্রসন্ন হতেও তার বিলম্ব হবে না, ধনের পরিমাণ নিয়েও তখন বাধা ঘটবে না।

অশোক উৎসুক-কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, এ কি আপনি নিশ্চয় জানেন বিপ্রদাসবাবু?

ইহার জবাব দিতে গিয়া বিপ্রদাস দ্বিধায় পড়িল, একটু ভাবিয়া বলিল, ওর যতটুকু জানি তাই ত মনে হয়।

অশোক কহিল, আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, ওঁর নিজের প্রসন্নতার চেয়েও আমার ঢের বেশি প্রয়োজন আপনার প্রসন্নতায়। সে যেদিন পাবো, আমার না-পাবার কিছু থাকবে না।

বিপ্রদাস সহাস্যে কহিল, আমার প্রসন্ন দৃষ্টি দিয়ে ও স্বামী নির্বাচন করবে এমন অদ্ভুত ইঙ্গিত আপনাকে দিলে কে—বন্দনা নিজে? যদি দিয়ে থাকে ত নিছক পরিহাস করেছে এই কথাই কেবল বলতে পারি অশোকবাবু!

না পরিহাস নয়, এ সত্য।

কে বললে?

অশোক একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া কহিল, এ-সব মুখ দিয়ে বলার বস্তু নয় বিপ্রদাসবাবু। সেদিন মাসীমার সঙ্গে ঝগড়া করে বন্দনা আমার ঘরে এসে ঢুকলেন—এমন কখনো করেন না—একটা চৌকি টেনে নিয়ে বসে বললেন, আমাকে বোম্বায়ে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। বললুম, যখনি হুকুম করবেন তখনি প্রস্তুত। বললেন, যাচ্চি বলরামপুরে, সময় হলে তার পরে জানাবো। বললুম, তাই জানাবেন, কিন্তু মাসীকে অমন চটিয়ে দিলেন কেন? তাঁদের ঐ-সব পুজো-পাঠ, হোম-জপ, ঠাকুর-দেব্‌তা সত্যিই ত আর বিশ্বাস করেন না, তবু বললেন, বিশ্বাস করতে পেলে বেঁচে যাই। কেন বললেন ও কথা? বন্দনা বললেন, মিথ্যে বলিনি অশোকবাবু, ওঁদের মতো সত্য বিশ্বাসে ঐ-সব যদি কখনো গ্রহণ করতে পারি আমি ধন্য হয়ে যাব। মুখুয্যেমশায়ের অসুখে সেবা করেছিলুম, তাঁর কাছে একদিন বিশ্বাসের বর চেয়ে নেবো। তার পরে শুরু হলো আপনার কথা। এত শ্রদ্ধা যে কেউ কাউকে করে, কারো শুভ-কামনায় কেউ যে এমন অনুক্ষণ মগ্ন থাকতে পারে এর আগে কখনো কল্পনাও করিনি। কথায় কথায় তিনি একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করলেন। তখন আপনি অসুস্থ, আপনার পুজো-আহ্নিকের আয়োজন তিনিই করেন। সেদিন বেলা হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি আসতে কি একটা পায়ে ঠেকলো, যতই নিজেকে বোঝাতে চাইলেন ও কিছু নয়, ওতে পুজোর ব্যাঘাত হবে না, ততই কিন্তু মন অবুঝ হয়ে উঠতে লাগলো পাছে কোথা দিয়েও আপনার কাজে ত্রুটি স্পর্শ করে। তাই আবার স্নান করে এসে সমস্ত আয়োজন তাঁকে নূতন করে করতে হলো। আপনি কিন্তু সেদিন বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, বন্দনা, সকালে যদি তোমার ঘুম না ভাঙ্গে ত অন্নদাদিদিকে দিও পুজোর সাজ করতে। মনে পড়ে বিপ্রদাসবাবু?

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, পড়ে।

অশোক বলিতে লাগিল, এমনি কতদিনের কত ছোটখাটো বিষয় গল্প করে বলতে বলতে সেদিন রাত্রি অনেক হয়ে গেল, শেষে বললেন, মাসী তাঁদের কুসংস্কারের খোঁটা দিলেন, আমি নিজেও একদিন দিয়েছি অশোকবাবু—কিন্তু আজ কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ বুঝতে

আমার গোল বাধে। খাওয়ার বিচার ত কোন দিন করিনি, আজন্মের বিশ্বাস এতে দোষ নেই, কিন্তু এখন যেন বাধা ঠেকে। বুদ্ধি দিয়ে লজ্জা পাই, লোকের কাছে লুকোতে চাই, কিন্তু যখনই মনে হয় এ-সব উনি ভালোবাসেন না, তখনি মন যেন ওর থেকে মুখ ফিরিয়ে বসে।

শুনিতে শুনিতে বিপ্রদাসের মুখ পাংশু হইয়া আসিল, জোর করিয়া হাসির চেষ্টা করিয়া বলিল, বন্দনা বুঝি এখন খাওয়া-ছোঁয়ার বিচার আরম্ভ করেছে? কিন্তু সেদিন যে এসে দম্ভ করে বলে গেল মাসীর বাড়িতে গিয়ে ও আপন সমাজ, আপন সহজ বুদ্ধি ফিরে পেয়েছে, মুখুয্যেদের বাড়ির সহস্র প্রকারের কৃত্রিমতা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে বেঁচে গেছে।

অশোক সবিস্ময়ে কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু বিঘ্ন ঘটিল। পর্দা সরাইয়া বন্দনা প্রবেশ করিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই, সমস্ত গুছিয়ে রেখে এলুম। কাল সকাল সাড়ে-ন'টার গাড়ি।? পুজো-টুজো বাজে কাজগুলো ওর মধ্যে সেরে রাখবেন। এত বিড়ম্বনাও ভগবান আপনার কপালে লিখেছিলেন।

বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, তাই হবে বোধ হয়।

বোধ হয় নয় নিশ্চয়। ভাবি এগুলো কেউ আপনার ঘুচোতে পারতো। তা শুনুন। কালকের সকালের খাবার ব্যবস্থাও করে গেলুম, আমি নিজে এসে খাওয়াবো, তার পরে কাপড়-চোপড় পরাবো, তার পরে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে যাবো। রোগা মানুষ কিনা—তাই। চলুন অশোকবাবু, এবার আমরা যাই। পায়ের ধুলো কিন্তু আর নেবো না মুখুয্যেমশাই, ওটা কুসংস্কার। ভদ্রসমাজে অচল। এই বলিয়া সে হাসিয়া হাত-দুটা মাথায় ঠেকাইয়া বাহির হইয়া গেল।

বাইশ

পরদিন সকালেই সকলে বলরামপুরের উদ্দেশে যাত্রা করিল। বাটীর কাছাকাছি আসিতে দেখা গেল দ্বিজদাস প্রায় রাজসূয়-যজ্ঞের ব্যাপার করিয়াছে। সম্মুখের মাঠে সারি সারি চালাঘর—কতক তৈরি হইয়াছে—কতক হইতেছে—ইতিমধ্যেই আহূত ও অনাহূতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, এখনো কত লোক যে আসিবে তাহার নির্দেশ পাওয়া কঠিন।

বিপ্রদাসকে দেখিয়া মা চমকিয়া গেলেন,—এ কি দেহ হয়েছে বাবা, একেবারে যে আধখানা হয়ে গেছিস।

বিপ্রদাস পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, আর ভয় নেই মা, এবার সেরে উঠতে দেরি হবে না।

কিন্তু কলকাতায় ফিরে যেতেও আর দেবো না, তা যত কাজই তোর থাক। এখন থেকে নিজের চোখে চোখে রাখবো।

বিপ্রদাস হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা তাঁহাকে প্রণাম করিলে দয়াময়ী আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, এসো মা, এসো—বেঁচে থাকো।

কিন্তু কণ্ঠস্বরে তাঁহার উৎসাহ ছিল না, বুঝা গেল এ শুধু সাধারণ শিষ্টাচার, তার বেশি নয়। তাহাকে আসার নিমন্ত্রণ করা হয় নাই, সে স্বেচ্ছায় আসিয়াছে, মা এইটুকুই জানিলেন। তিনি মৈত্রেয়ীর কথা পাড়িলেন। মেয়েটির গুণের সীমা নাই, দয়াময়ীর দুঃখ এই যে এক-মুখে তাহার ফর্দ রচিয়া দাখিল করা সম্ভবপর নয়। বলিলেন, বাপ শেখায় নি এমন বিষয় নেই, মেয়েটা জানে না এমন কাজ নেই। বৌমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্চে না,—তাই ও একাই সমস্ত ভার যেন মাথায় তুলে নিয়েছে। ভাগ্যে ওকে আনা হয়েছিল বিপিন, নইলে কি যে হোতো আমার ভাবলে ভয় করে।

বিপ্রদাস বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, বলো কি মা!

দয়াময়ী কহিলেন, সত্যি বাবা। মেয়েটার কাজকর্ম দেখে মনে হয় কর্তা যে বোঝা

আমার ঘাড়ে ফেলে রেখে চলে গেছেন তার আর ভাবনা নেই। বৌমা ওকে সঙ্গী পেলে সকল ভার স্বচ্ছন্দে বইতে পারবেন, কোথাও ত্রুটি ঘটবে না। এ বছর ত আর হলো না, কিন্তু বেঁচে যদি থাকি আসচে বারে নিশ্চিন্ত মনে কৈলাস-দর্শনে আমি যাবোই যাবো।

বিপ্রদাস নীরব হইয়া রহিল। দয়াময়ীর কথা হয়ত মিথ্যা নয়, মৈত্রেয়ী হয়ত এমনি প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু যশোগানেরও মাত্রা আছে, স্থান-কাল আছে। তাঁহার লক্ষ্য যাই হোক, উপলক্ষ্যটাও কিন্তু চাপা রহিল না। একটা অকরুণ অসহিষ্ণু ক্ষুদ্রতা তাঁহার সুপরিচিত মর্যাদায় গিয়া যেন রূঢ় আঘাত করিল। হঠাৎ ছেলের মুখের পানে চাহিয়া দয়াময়ী নিজের এই ভুলটাই বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তখনি কি করিয়া যে প্রতিকার করিবেন তাহাও খুঁজিয়া পাইলেন না। দ্বিজদাস কাজের ভীড়ে অন্যত্র আবদ্ধ ছিল, খবর পাইয়া আসিয়া পৌঁছিল।

বিপ্রদাস কহিল, কি ভীষণ কাণ্ড করেছিস দ্বিজু, সামলাবি কি করে?

দ্বিজদাস বলিল, ভার ত আপনি নিজে নেননি দাদা, দিয়েছেন আমার ওপর। আপনার ভয়টা কিসের?

বন্দনা ইহার জবাব দিল, বলিল, ওঁর ভাবনা খরচের সব টাকাটা যদি প্রজাদের ঘাড়ে উসুল না হয় ত তবিলে হাত পড়বে। এতে ভয় হবে না দ্বিজুবাবু?

সকলেই হাসিয়া উঠিল, এবং এই রহস্যটুকুর মধ্যে দিয়া মায়ের মনোভারটা যেন কমিয়া গেল, স্মিতমুখে কৃত্রিম রুষ্টস্বরে বলিলেন, ওকে জ্বালাতন করতে তুমিও কি ঠিক তোমার বোনের মতই হবে বন্দনা। ও আমার পরম ধার্মিক ছেলে, সবাই মিলে ওকে মিথ্যে খোঁটা দিলে আমার সয় না।

বন্দনা কহিল, খোঁটা মিথ্যে হলে গায়ে লাগে না মা, তাতে রাগ করা উচিত নয়।

মা বলিলেন, রাগ ত করে না,—ও শুনে হাসে।

বন্দনা বলিল, তারও কারণ আছে মা। মুখুয্যেমশাই জানেন পেটে খেলে পিঠে সইতে হয়, রাগারাগি করা মূর্খতা। ঠিক না মুখুয্যেমশাই?

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ঠিক বৈ কি। মূর্খের কথায় রাগারাগি করা নিষেধ, শাস্ত্রে তার অন্য ব্যবস্থা আছে।

বন্দনা কহিল, মেজদি কিন্তু আমার চেয়ে মুখ্যু মুখুয্যেমশাই। বোধ হয় আপনার শাস্ত্রের এই ব্যবস্থার জোরেই সবাই আপনাকে এত ভক্তি করে। এই বলিয়া সে হাসিয়া মুখ ফিরাইল। দ্বিজদাস হাসি চাপিতে অন্যত্র চাহিয়া রহিল এবং দয়াময়ী নিজেও হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, বন্দনা মেয়েটা বড় দুষ্টু, ওর সঙ্গে কারো কথায় পারবার জো নেই।

একটু থামিয়া একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, কিন্তু দেখো মা, কর্তাদের আমলে প্রজাদের ওপর এ-রকম যে একেবারেই হত না তা বলিনে, কিন্তু তোমাকে ত বলেছি, বিপিন আমার পরম ধার্মিক ছেলে, যা অন্যায়, যা ওর যথার্থ প্রাপ্য নয়, সে ও কিছুতে নিতে পারে না। কিন্তু ভয় আমার দ্বিজুকে ও পারে।

বিপ্রদাস প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এ তোমার অন্যায় কথা মা। দ্বিজু করবে প্রজাপীড়ন। প্রজার পক্ষ নিয়ে ও আমাদের বিরুদ্ধেই একবার তাদের খাজনা দিতে নিষেধ করেছিল সে-কথা কি তোমার মনে নেই?

মা বললেন, মনে আছে বলেই ত বলছি। যে ন্যায্য দেনা দিতে বারণ করে, অন্যায় আদায় সে-ই পারে বিপিন, অপরে পারে না। দয়া-মায়া ওর আছে,—একটু বেশী পরিমাণের আছে মানি,—কিন্তু তবু দেখতে পাবি একদিন, ওর হাতেই প্রজারা দুঃখ পাবে ঢের বেশি।

না মা, পারে না তুমি দেখো।

দয়াময়ী কহিলেন, ভরসা কেবল তুই আছিস বলে। নইলে এমন কেউ চাই যে ওকে ঠিক পথে চালিয়ে যেতে পারবে। নইলে ও নিজেও একদিন ডুববে, পরকেও ডোবাবে।

দ্বিজদাস এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, এবার কথা কহিল, বলিল, তোমার শেষের কথাটা

ঠিক হল না মা। নিজে ডুববো সে হয়ত একদিন সত্যি হবে কিন্তু পরকে ডোবাবো না এ তুমি নিশ্চয় জেনো।

মা বলিলেন, এর এটাও সুখের নয় দ্বিজু, ওটাও আনন্দের নয়। আসলে তোকে চালাবার একজন লোক থাকা চাই।

দ্বিজদাস কহিল, সেই কথাটাই স্পষ্ট করে বলো যে সকলের ভাবনা ঘুচুক। আমাকে চালাবার কেউ একজন দরকার। কিন্তু সে যোগাড় ত তুমি প্রায় করে এনেছো মা।

মা বলিলেন, যদি সত্যিই করে এনে থাকি সে তোর ভাগ্যি বলে জানিস।

তর্ক-বিতর্কের মূল তাৎপর্যটা এবার সকলের কাছেই সুস্পষ্ট হইয়া পড়িল।

মা বলিতে লাগিলেন, এত বড় যে কাণ্ড করে তুললি কারো কথা শুনলি নে, বললি দাদার হুকুম ; কিন্তু দাদা কি বলেছিল অশ্বমেধ করতে? এখন সামলায় কে বলতো? ভাগ্যে মৈত্রেয়ী এসেছিল সেই তো শুধু ভরসা।

দ্বিজদাস বলিল, কাজটা আগে হয়ে যাক মা, তার পরে যাকে খুশি সনন্দ দিও, আমি আপত্তি করবো না, কিন্তু এখুনি তার তাড়াতাড়ি কি!

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তখন সনন্দ সই করবে কে দ্বিজুবাবু, তৃতীয় পক্ষ নয় ত?

দ্বিজদাস কহিল, না, তৃতীয় পক্ষর সাধ্য কি! আজও মহাপরাক্রান্ত প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ যে তেমনিই বিদ্যমান। বলিতে দুইজনেই হাসিয়া ফেলিল।

বিপ্রদাস ও মা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিলেন কিন্তু অর্থ বুঝিলেন না।

অন্নদা আসিয়া বলিল, বন্দনাদিদি, বড়বাবুর ওষুধগুলো যে কাল গুছিয়ে তুললে সেই কাগজের বাক্সটা ত দেখতে পাচ্চিনে—হারালো না ত?

না, হারায় নি অনুদি, কলকাতার বাড়িতেই রয়ে গেছে।

দয়াময়ী ভয় পাইয়া বলিলেন, উপায় কি হবে বন্দনা, এত বড় ভুল হয়ে গেল।

বন্দনা কহিল, ভুল হয়নি মা, আসবার সময়ে সেগুলো ইচ্ছে করেই ফেলে এলুম।

ইচ্ছে করে ফেলে এলে? তার মানে?

ভাবলুম, ওষুধ অনেক খেয়েছেন, আর না। তখন মা কাছে ছিলেন না তাই ওষুধের দরকার হয়েছিল, এখন বিনা ওষুধেই সেরে উঠবেন, একটুও দেরি হবে না।

কথাগুলি দয়াময়ীর অত্যন্ত ভাল লাগিল, তথাপি বলিলেন, কিন্তু ভালো করোনি মা। পাড়াগাঁ জায়গা, ডাক্তার-বদ্যি তেমন মেলে না, দরকার হলে—

অন্নদা বলিল, দরকার আর হবে না মা। হলে উনি নিশ্চয় আনতেন, কখনো ফেলে আসতেন না। বন্দনাদিদি ডাক্তার-বদ্যির চেয়েও বেশী জানে।

দয়াময়ী প্রশংসমান চক্ষে নীরবে চাহিয়া রহিলেন, বন্দনা কহিল, অনুদির বাড়িয়ে বলা স্বভাব মা, নইলে সত্যিই আমি কিছু জানিনে। যা একটু শিখেচি সে শুধু মুখুয্যেমশায়ের সেবা করে।

অন্নদা বলিল, সে যে কি সেবা মা, সে শুধু আমি জানি। হঠাৎ একদিন কি বিপদেই পড়ে গেলুম। বাড়িতে কেউ নেই, বাসুর অসুখের তার পেয়ে দ্বিজু চলে এসেছে এখানে, দত্তমশাই গেছেন ঢাকায়, বিপিনের হল জ্বর। প্রথম দুটো দিন কোনমতে কাটলো, কিন্তু তার পরের দিন জ্বর গেল ভয়ানক বেড়ে। ডাক্তার ডেকে পাঠালুম, সে ওষুধ দিলে কিন্তু ভয় দেখালে চতুর্গুণ। মুখ্যু মেয়েমানুষ, কি যে করি, তোমাদেরও খবর দিতে পারিনে, বিপিন করলে মানা,—আকুল হয়ে ছুটে গেলুম বন্দনার কাছে, ওঁর মাসীর বাড়িতে। কেঁদে বললুম, দিদি, রাগ করে থেকো না, এসো। তোমার মুখুয্যেমশাইয়ের বড় অসুখ। বন্দনাদিদি যেমন ছিলেন তেমনি এসে আমার গাড়িতে উঠলেন, মাসীকে বলবারও সময় পেলেন না। বাড়ি এসে বিপিনের ভার নিলেন। দিনরাতে একটি ঘণ্টাও সে কটা দিন উনি জিরোতে পাননি। কেবল ওষুধ খাওয়ানোই ত নয়, সকালে পুজোর সাজ থেকে আরম্ভ করে রাত্তিরে

মশারি ফেলে শুইয়ে আসা পর্যন্ত যা-কিছু সমস্ত। এখন বন্দনাদিদি যদি ওষুধ দিতে আর না চায় মা, অন্যথা করে কাজ নেই, ওতেই বিপিন সুস্থ হয়ে উঠিবে।

বিপ্রদাস তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, সত্যিই সুস্থ হয়ে উঠবো মা, তোমরা ওকে আর বাধা দিও না, ওর সুবুদ্ধি হোক, আমাকে ওষুধ গেলানো বন্ধ করুক। আমি কায়মনে আশীর্বাদ করবো, বন্দনা রাজরানী হোক।

দয়াময়ী নীরবে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া যেন স্নেহ ও মমতা উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

ঝি আসিয়া কহিল, মা, বৌদিদি বলচেন কলকাতা থেকে যে-সব জিনিসপত্র এখন এলো কোন্ ঘরে তুলবেন?

দয়াময়ী জবাব দিবার পূর্বেই বন্দনা বলিল, মা, আমি আপনার ম্লেচ্ছ মেয়ে বলে আপনার এতবড় কাজে কি কোন ভারই পাবো না, কেবল চুপ করে বসে থাকবো? এমন কত জিনিস ত আছে যা আমি ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না।

দয়াময়ী তাহার হাত ধরিয়া একেবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিলেন, আঁচল হইতে একটা চাবির গোছা খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, চুপ করে তোমাকে বসে থাকতেই বা দেব কেন মা? এই দিলুম তোমাকে আমার আপন ভাঁড়ারের চাবি, যা বৌমা ছাড়া আর কাউকে দিতে পারিনে। আজ থেকে এ ভার রইলো তোমার।

কি আছে মা এ ভাঁড়ারে?

এ চাবির গুচ্ছ অত্যন্ত পরিচিত, দ্বিজদাস কটাক্ষে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আছে যা ছোঁয়াছুঁয়ির নাগালের বাইরে, আছে সোনা-রূপো, টাকাকড়ি, চেলি-গরদের জোড়। যা অতি বড় ধার্মিক ব্যক্তিরও মাথায় তুলে নিতে আপত্তি হবে না তুমি ছুঁলেও।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কি করতে হবে মা আমাকে?

দয়াময়ী বলিলেন, অধ্যাপক-বিদায়, অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মানরক্ষা, আত্মীয়স্বজন গণের পাথেয়র ব্যবস্থা,—আর ঐ সঙ্গে রাখবে এই ছেলেটাকে একটু কড়া শাসনে। এই বলিয়া তিনি দ্বিজদাসকে দেখাইয়া কহিলেন, আমি হিসেব বুঝিনে বলে ও ঠকিয়ে যে আমাকে কত টাকা নিয়ে অপব্যয় করচে তার ঠিকানা নেই মা। এইটি তোমাকে বন্ধ করতে হবে।

দ্বিজদাস বলিল, দাদার সামনে এমন কথা তুমি ব'লো না মা। উনি ভাববেন সত্যিই বা। খরচের খাতায় রীতিমত ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্চে, মিলিয়ে দেখলেই দেখতে পাবে।

দয়াময়ী বলিলেন, মেলাবো কোন্‌টা? ব্যয়ের হিসেব লেখা হচ্ছে মানি, কিন্তু অপব্যয়ের হিসেব কে লিখচে বল ত? আমি সেই কথাই বন্দনাকে জানাচ্ছিলুম।

বন্দনা বলিল, জেনেই বা কি করবো মা? ওঁর টাকা উনি অপব্যয় করলে আমি আটকাবো কি করে?

দয়াময়ী কহিলেন, সে আমি জানিনে। তুমি ভার নিতে চেয়েছিলে, আমি ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম ; কিন্তু একটা কথা বলি বন্দনা, তোমাকেও একদিন সংসার করতে হবে, তখন অপব্যয় বাঁচানোর দায় এসে যদি হাতে ঠেকে জানিনে বলেই ত নিস্তার পাবে না!

বন্দনা দ্বিজদাসের প্রতি চাহিয়া কহিল, শুনলেন ত মায়ের হুকুম?

দ্বিজদাস কহিল, শুনলুম বৈ কি! কিন্তু দাদা দিয়েছেন আমার ওপর খরচ করার ভার, মা দিলেন তোমাকে খরচ না-করার ভার। সুতরাং, খণ্ডযুদ্ধ বাধবেই, তখন দোষ দিলে চলবে না।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে বলিল, দোষ দেবার দরকার হবে না দ্বিজুবাবু, ঝগড়া আমাদের হবে না। আপনার টাকা নিয়ে আপনার সঙ্গেই মক-ফাইট শুরু করবার ছেলে মানুষি আমার গেছে। বাঙলা দেশে এসে সে শিক্ষা আমার হয়েছে। ঝগড়ার আগে মায়ের

দেওয়া ভার মার হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে আমি সরে যাবো।

দয়াময়ী ঠিক না বুঝিলেও বুঝিলেন, এ অভিমান স্বাভাবিক। ব্যথিতকণ্ঠে কহিলেন, ভার আমি ফিরে নেবো না মা, তোমাকেই এ বইতে হবে। কিন্তু এখানে আর নয়, ভেতরে চলো, তোমার কাজ তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিই গে। এই বলিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া গেলেন।

সেদিন বন্দনা এ-বাড়িতে ঘণ্টা-কয়েক মাত্র ছিল, কোথায় কি আছে দেখিবার সুযোগ পায় নাই, আজ দেখিল মহলের পরে মহলের যেন শেষ নাই। আশ্রিত আত্মীয়ের সংখ্যা কম নয়, বউ-ঝি নাতি-পুতি লইয়া প্রত্যেকের এক-একটি সংসার। ওদিকটায় আছে কাছারি-বাড়ি ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যবস্থা ; কিন্তু এ অংশে আছে ঠাকুরবাড়ি, রান্নাবাড়ি, দয়াময়ীর বিরাট গোশালা এবং উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বাগান ও পুষ্করিণী। দ্বিতলের পূবের ঘরগুলো দয়াময়ীর, তাহারই একটার সম্মুখে বন্দনাকে আনিয়া তিনি বলিলেন, মা, এই ঘরটি তোমার, এরই সব ভার রইলো তোমার উপর।

ও-ধারের বারান্দায় বসিয়া সতী ও মৈত্রেয়ী কি কতকগুলা দ্রব্য মনঃসংযোগে পরীক্ষা করিতেছিল, দয়াময়ীর কণ্ঠস্বরে মুখ তুলিয়া চাহিল, এবং বন্দনাকে দেখিতে পাইয়া দুজনেই কাজ ফেলিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে যে সত্যই আসিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই। দিদির পায়ের ধূলা লইয়া বন্দনা মৈত্রেয়ীকে নমস্কার করিল। মা বলিলেন, আমার এই ম্লেচ্ছ মেয়েটিও কোন একটা কাজের ভার চায় বৌমা, চুপ করে বসে থাকতে ও নারাজ। তোমাদের দিয়েছি নানা কাজ, ওকে দিলুম আমার এই ভাঁড়ারের চাবি।

মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিল, এ ভাঁড়ারে কি আছে মা?

আছে এমন সব জিনিস যা ম্লেচ্ছ-মেয়েতে ছুঁলেও ছোঁয়া যায় না। এই বলিয়া দয়াময়ী সকৌতুকে হাসিয়া বন্দনাকে দিয়া ঘর খুলাইয়া সকলে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মেঝের উপর থরে থরে সাজানো রূপার বাসন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মর্যাদা দিতে হইবে। কলিকাতা হইতে ভাঙ্গাইয়া টাকাসিকি প্রভৃতি আনানো হইয়াছে, থলিগুলা স্তূপাকার করিয়া এক স্থানে রাখা ; গরদ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্ত্রসকল বস্তাবন্দী হইয়া এখানে পড়িয়া, খুলিয়া দেখার অবসর ঘটে নাই,—এ-সকল ব্যতীত দয়াময়ীর আলমারী সিন্দুকও এই ঘরে। হাত দিয়া দেখাইয়া হাসিয়া বলিলেন, বন্দনা, ওর মধ্যেই রয়েচে আমার যথাসর্বস্ব, আর ওর পরেই দ্বিজুর আছে সবচেয়ে লোভ। ওইখানেই পাহারা দিতে হবে মা তোমাকে সবচেয়ে বেশি। আমার মতো তোমাকেও যেন ফাঁকি দিতে ও না পারে।

বন্দনার বিপন্ন-মুখের পানে চাহিয়া সতী ভগিনীর হইয়া বলিল, এতবড় কাজের ভার দেওয়া কি ওকে চলবে মা? অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার।—তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্বেই দয়াময়ী বলিলেন, অনেক টাকাকড়ির ব্যাপার বলেই ওর হাতে চাবি দিলুম বৌমা। নইলে দ্বিজু আমাকে দেউলে করে দেবে।

কিন্তু ও যে বাইরে থেকে এসেছে মা?

সতীর এ কথাটাও শেষ হইল না, দয়াময়ী হাসিয়া বলিলেন, বাইরে থেকে একদিন তুমিও এসেছিলে, আর তারও অনেক আগে এমনি বাইরে থেকেই আমাকে আসতে হয়েছিল। ওটা আপত্তি নয় বৌমা। কিন্তু আর আমার সময় নেই, আমি চললুম। এই বলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বন্দনা বলিল, তোমাদের বাড়িতে এসে এ কি জালে জড়িয়ে পড়লুম মেজদি! আমি যে নিশ্বাস ফেলবার সময় পাব না।

তাই ত মনে হচ্ছে, বলিয়া সতী শুধু একটু হাসিল।

তেইশ

সংসারে বিপদ যে কোথায় থাকে এবং কোন্ পথে কখন যে আত্মপ্রকাশ করে ভাবিলে

বিস্মিত হইতে হয়। কাজের মাঝখানে কল্যাণী আসিয়া কাঁদিয়া বলিল, মা, উনি বলছেন ওঁর সঙ্গে আমাকে এখুনি বাড়ি চলে যেতে। ট্রেনের সময় নেই—স্টেশনে বসে থাকবেন সে-ও ভালো, তবু এ-বাড়িতে আর একদণ্ড না।

পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার শাস্ত্রীয় ক্রিয়া এইমাত্র চুকিয়াছে, এইমাত্র দয়াময়ী মণ্ডপ হইতে বাটীতে আসিয়া পা দিয়াছেন। ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, মেয়ের কথাটা ভালো বুঝিতেই পারিলেন না, হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, কে বলচে তোমাকে যেতে—শশধর? কেন?

বড়দা ওঁকে ভয়ানক অপমান করেছেন—ঘর থেকে বার করে দিয়েছেন, এই বলিয়া কল্যাণী উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিতে লাগিল।

চারিদিকে লোকজন, কোথাও খাওয়ানোর আয়োজন, কোথাও গানের আসর, কোথাও ভিখারীদের বাদ-বিতণ্ডা, কোথাও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের শাস্ত্র-বিচার—অগণিত মানুষের অপরিমেয় কোলাহল,—উহারই মাঝেখানে অকস্মাৎ এই ব্যাপার।

সতী ও মৈত্রেয়ী উপস্থিত হইল, বন্দনা ভাঁড়ারে চাবি দিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, আত্মীয়-কুটুম্বিনীগণের অনেকেই কৌতূহলী হইয়া উঠিল, শশধর আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মা, আমরা চললুম। আসতে আদেশ করেছিলেন, আমরা এসেছিলুম কিন্তু থাকতে পারলুম না।

কেন বাবা?

বিপ্রদাসবাবু তাঁর ঘর থেকে আমাকে বার করে দিয়েছেন।

তার কারণ?

কারণ বোধ করি এই যে তিনি বড়লোক। অহঙ্কারে চোখ-কানে দেখতে শুনতে পান না। ভেবেচেন নিজের বাড়িতে ডেকে এনে অপমান করা সহজ ; কিন্তু ছেলেকে একটু বুঝিয়ে দেবেন আমার বাবাও জমিদারি রেখে গেছেন, সে-ও নিতান্ত ছোট নয়। আমাকেও ভিক্ষে করে বেড়াতে হয় না।

দয়াময়ী ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, বিপিনকে আমি ডেকে পাঠাচ্ছি বাবা, কি হয়েছে জিজ্ঞেসা করি। আমার কাজ এখনো শেষ হলো না, ব্রাহ্মণ-ভোজন বাকী, বোষ্টম-ভিক্ষুকদের বিদায় করা হয়নি, তার আগেই যদি তোমরা রাগ করে চলে যাও শশধর, যে পুকুর এইমাত্র প্রতিষ্ঠা করলুম তাতেই ডুব দিয়ে মরবো তোমরা নিশ্চয় জেনো। বলিতে বলিতে তাঁহার দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল।

শাশুড়ীর চোখের জলে বিশেষ ফল হইল না। ভদ্রসন্তান হইয়াও শশধরের আকৃতি ও প্রকৃতি কোনটাই ঠিক ভদ্রোচিত নয়। কাছে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইতে মন সঙ্কোচ বোধ করে। তাহার বিপুল দেহ ও বিপুলতর মুখমণ্ডল ক্রুদ্ধ বিড়ালের মত ফুলিতে লাগিল, বলিল, থাকতে পারি যদি বিপ্রদাসবাবু এখানে এসে সকলের সুমুখে হাতজোড় করে আমার ক্ষমা চান। নইলে নয়।

প্রস্তাবটা এতবড় অভাবিত যে শুনিয়া সকলে যেন বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। বিপ্রদাস ক্ষমা চাহিবে হাতজোড় করিয়া! এবং সকলের সম্মুখে! কয়েক মুহূর্ত সকলেই নির্বাক সহসা পাংশুমুখে একান্ত অনুনয়ের কণ্ঠে সতী বলিয়া উঠিল, ঠাকুরজামাই, এখন নয় ভাই। কাজকর্ম চুকুক, রাত্তিরে মা নিশ্চয় এর একটা বিহিত করবেন। তোমাকে অপমান করা কি কখনো হতে পারে? অন্যায় করে থাকলে তিনি নিশ্চয় ক্ষমা চাইবেন।

বন্দনার চোখের কোণ-দুটা ঈষৎ স্ফুরিত হইয়া উঠিল, কিন্তু শান্তকণ্ঠে কহিল, তিনি অন্যায় ত কখনো করেন না মেজদি!

সতী তাড়া দিয়া উঠিল, তুই থাম বন্দনা। অন্যায় সবাই করে।

বন্দনা বলিল, না, তিনি করেন না।

শুনিয়া মৈত্রেয়ী যেন জ্বলিয়া গেল, তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, কি করে জানলেন? সেখানে ত আপনি ছিলেন না। উনি কি তবে বানিয়ে বলচেন?

বন্দনা ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বানিয়ে বলার কথা আমি বলিনি। আমি শুধু বলেচি মুখুয্যেমশাই অন্যায় করেন না।

মৈত্রেয়ী প্রত্যুত্তরে তেমনি বক্র-বিদ্রূপে কহিল, অন্যায় সবাই করে। কেউ ভগবান নয়। উনি বাবাকেও অসম্মান করতে ছাড়েন নি।

বন্দনা বলিল, তা হলে শশধরবাবুর মত তাঁরও চলে যাওয়া উচিত ছিল, থাকা উচিত ছিল না।

মৈত্রেয়ী তীক্ষ্ণতর স্বরে জবাব দিল, সে কৈফিয়ত আপনার কাছে দেবার নয়, মীমাংসা হবে দ্বিজুবাবুর সঙ্গে, যিনি আহ্বান করে এনেছেন।

সতী সরোষে তিরস্কার করিল, তোর পায়ে পড়ি বন্দনা, তুই যা এখান থেকে, নিজের কাজে যা।

শশধর দয়াময়ীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, আমি কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের দরবার করতে আসিনি মা, এসেছি জানতে আপনার ছেলে জোড়হাতে আমার ক্ষমা চাইবেন কি না? নইলে চললুম—এক মিনিটও থাকবো না। আপনার মেয়ে আমার সঙ্গে যেতে পারেন, না-ও পারেন, কিন্তু তার পরে শ্বশুরবাড়ির নাম যেন না আর মুখে আনেন। এইখানে আজই তার শেষ হয় যেন!

এ কি সর্বনেশে কথা! শশধরের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়—মেয়ে-জামাইকে বাড়ি আনিয়া এ কি ভয়ঙ্কর বিপদ! সুমুখে দাঁড়াইয়া কল্যাণী কাঁদিতেই লাগিল, পরামর্শ দিবার লোক নাই, ভাবিবার সময় নাই, ত্রাসে লজ্জায় ও গভীর অপমানে দয়াময়ীর কর্তব্য-বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তিনি কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া সভয়ে বলিলেন, তুমি একটু থাম বাবা, আমি বিপিনকে ডেকে পাঠাচ্ছি। আমি জানি কোথায় তোমার মস্ত ভুল আছে, কিন্তু এই এক-বাড়ি লোকের মধ্যে এ কলঙ্ক প্রকাশ পেলে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে বাছা।

শশধর কহিল, বেশ, আমি দাঁড়িয়ে আছি, তাঁকে ডাকান। বিপ্রদাসবাবু মিথ্যে করেই বলুন এ কাজ তিনি করেন নি।

মিথ্যে কথা সে বলে না শশধর, এই বলিয়া দয়াময়ী বিপ্রদাসকে ডাকাইতে পাঠাইলেন। মিনিট-পাঁচেক পরে বিপ্রদাস আসিয়া দাঁড়াইল। তেমনি শান্ত, গম্ভীর ও আত্মসমাহিত। শুধু চোখের দৃষ্টিতে একটা উদাস ক্লান্ত ছায়া—তাহার অন্তরালে কি কথা যে প্রচ্ছন্ন আছে। বলা কঠিন।

দয়াময়ী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন, তোর নামে কি কথা শশধর বলে বিপিন। বলে, তুই নাকি ওকে ঘর থেকে বার করে দিয়েচিস। এ কি কখন সত্যি হতে পারে?

বিপ্রদাস বলিল, সত্যি বৈ কি মা!

ঘর থেকে সত্যি বার করে দিয়েছিস আমার জামাইকে? আমার এই কাজের বাড়িতে?

হাঁ, সত্যিই বার করে দিয়েছি। বলেচি আর যেন না কখনো ও আমার ঘরে ঢোকে।

শুনিয়া দয়াময়ী বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণে এই অভিভূত ভাবটা কাটিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন?

সে তোমার না শোনাই ভালো মা।

সতী স্থির থাকিতে পারিল না, ব্যাকুল হইয়া নিবেদন করিল, আমরা কেউ শুনতে চাইনে, কিন্তু ঠাকুরজামাই কল্যাণীকে নিয়ে এক্ষুনি চলে যেতে চাচ্চেন, এই এক-বাড়ি লোকের মধ্যে ভেবে দেখো সে কত বড় কেলেঙ্কারী,—ওঁকে বলো তোমার হঠাৎ অন্যায় হয়ে গেছে,—বলো ওঁদের থাকতে।

বিপ্রদাস স্ত্রীর মুখের প্রতি একমুহূর্ত দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, হঠাৎ অন্যায় আমার হয় না, সতী।

হয়, হয়, হঠাৎ একটা অন্যায় সকলেরি হয়। বল না ওঁদের থাকতে।

বিপ্রদাস মাথা নাড়িয়া কহিল, না, অন্যায় আমার হয়নি।

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনের মাঝে দয়াময়ী স্তব্ধ হইয়া ছিলেন, সহসা কে যেন তাঁহাকে নাড়া দিয়া সচেতন করিয়া দিল, তীব্রকণ্ঠে কহিলেন, ন্যায়-অন্যায়ের ঝগড়া থাক। মেয়ে জামাই আমার চিরকালের মত পর হয়ে যাবে এ আমি সইবো না। শশধরের কাছে তুমি ক্ষমা চাও বিপিন।

সে হয় না মা, সে অসম্ভব।

সম্ভব অসম্ভব আমি জানিনে। ক্ষমা তোমাকে চাইতেই হবে।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে স্থির হইয়া রহিল। দয়াময়ী মনে মনে বুঝিলেন এ অসম্ভবকে আর সম্ভব করা যাইবে না,—ক্রোধের সীমা রহিল না বলিলেন, বাড়ি তোমার একার নয় বিপিন। কাউকে তাড়াবার অধিকার কর্তা তোমাকে দিয়ে যাননি, ওরা এ বাড়িতে থাকবে।

বিপ্রদাস কহিল, দেখো মা, আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে যদি তুমি এ আদেশ দিতে আমি চুপ করেই থাকতাম, কিন্তু এখন আর পারিনে। শশধর থাকলে এ বাড়ি ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। আর ফেরাতে পারবে না। কোন্‌টা চাও, বল?

জীবনে এমন ভয়ানক প্রশ্নের উত্তর দিতে কোনদিন কেহ তাঁহাকে ডাকে নাই, এতবড় দুর্ভেদ্য সমস্যার সম্মুখীন হইতেও কেহ বলে নাই। একদিকে মেয়ে-জামাই, আর একদিকে দাঁড়াইয়া তাঁহার বিপিন। যে শিশুকে বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, যে সকল আত্মীয়ের বড় আত্মীয়, দুঃখের সান্ত্বনা, বিপদের আশ্রয়—যে ছেলে তাঁর প্রাণাধিক প্রিয়। এ অমর্যাদা তাহাকে মৃত্যু দিবে কিন্তু সঙ্কল্পচ্যুত করিবে না। বুঝিলেন সর্বনাশের অতলস্পর্শ গহ্বর তাঁর পায়ের নীচে, এ ভুলের প্রতিবিধান নাই, প্রত্যাবর্তনের পথ নাই—পরিণাম ইহা দৈবের মতই অমোঘ, নির্মম ও অনন্যগতি। তথাপি নিজেকে শাসন করিতে পারিলেন না, অদম্য ক্রোধ ও অভিমানের বাত্যায় তাঁহাকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিল, কটুকণ্ঠে বলিলেন, এ তোমার অন্যায় জিদ বিপিন। তোমার জন্যে মেয়ে-জামাইকে জন্মের মত পর করে দেব এ হয় না বাছা। তোমার যা ইচ্ছে কর গে। শশধর, এস তোমরা আমার সঙ্গে—ওর কথায় কান দেবার দরকার নেই। বাড়ি ওর একার নয়। এই বলিয়া তিনি কল্যাণী ও শশধরকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের পিছনে পিছনে গেল মৈত্রেয়ী, যেন ইঁহাদেরই সে আপন লোক।

মনে হইয়াছিল সতী বুঝি এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে। কিন্তু তাহার অচঞ্চল দৃঢ়তায় বন্দনা ও বিপ্রদাস উভয়েই বিস্মিত হইল। তাহার চোখে জল নাই কিন্তু মুখ অতিশয় পাণ্ডুর বলিল, ঠাকুরজামাই কি করেচেন আমরা জানিনে, কিন্তু অকারণে তুমিও যে এতবড় কাণ্ড করোনি, তা নিশ্চয় জানি। ভেবো না, মনে মনে তোমাকে আমি এতটুকু দোষও কোন দিন দেব।

বিপ্রদাস চুপ করিয়া রহিল। সতী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি আজই চলে যাবে?

না, কাল যাবো।

আর আসবে না এ বাড়িতে?

মনে ত হয় না।

আমি? বাসু?

যেতে তোমাদেরও হবে। কাল না পার অন্য কোন দিন।

না, অন্য দিন নয়, আমরাও কালই যাবো। এই বলিয়া সতী বন্দনাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুই কি করবি বন্দনা, কালই যাবি?

বন্দনা বলিল, না। আমি ত ঝগড়া করিনি মেজদি, যে দল পাকিয়ে কালই যেতে হবে।

সতী বলিল, ঝগড়া আমিও করিনি বন্দনা, উনিও না কিন্তু যেখানে ওঁর জায়গা হয় না সেখানে আমারও না। একটা দিনও না। তোর বিয়ে হলে এ কথা বুঝতিস।

বন্দনা বলিল, বিয়ে না হয়েও বুঝি মেজদি, স্বামীর জায়গা না হলে স্ত্রীরও হয় না। কিন্তু ভুল ত হয়,—না বুঝে তাকেই স্বীকার করা স্ত্রীর কর্তব্য, তোমার এ কথা আমি মানব না।

শাশুড়ীর প্রতি সতীর অভিমানের সীমা ছিল না, বলিল, স্বামী থাকলে মানতিস। বলিয়াই অশ্রু চাপিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বন্দনা কহিল, এ কি করলেন মুখুয্যেমশাই?

না করে উপায় ছিল না বন্দনা।

কিন্তু মায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ এ যে ভাবতে পারা যায় না।

বিপ্রদাস বলিল, যায় না সত্যি, কিন্তু নতুন প্রশ্ন এসে যখন পথ আগলায় তখন নতুন সমাধানের কথা ভাবতেই হয়। এড়িয়ে চলবার ফাঁক থাকে না। তোমার মেজদি আমার সঙ্গে যাবেই—বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু তুমি? আরও দু-চার দিন কি থাকবে মনে করেছো?

বন্দনা বলিল, কতদিন থাকতে হবে আমি জানিনে। কিন্তু নতুন প্রশ্ন আপনার যতই আসুক আমি কিন্তু সেই পুরনো পথেই তার উত্তর খুঁজে ফিরবো—যে পথ প্রথম দিনটিতে আমার চোখে পড়েছিল, যেদিন হঠাৎ এসে এ বাড়িতে দাঁড়িয়েছিলুম,—যার তুলনা কোথাও দেখিনি, যা আমার মনের ধারা দিয়েছে চিরকালের মতো বদলে।

বিপ্রদাস ইহার উত্তর দিল না, শুধু ওষ্ঠপ্রান্তে তাহার একটুখানি ম্লান হাসির আভাস দেখা দিল। সে হাসি যেমন বেদনার তেমনি নিরাশার। কহিল, আমি বাইরে চললুম বন্দনা, আবার দেখা হবে।

অশ্রুবাষ্পে বন্দনার চোখ ভরিয়া উঠিয়াছে ; বলিল, দেখা যদি হয় তখন শুধু দূর থেকে আপনাকে প্রণাম করবো। কঠোর আপনার প্রকৃতি, কঠিন মন,—না আছে স্নেহ, না আছে ক্ষমা। তখন বলতে যদি না পারি, সুযোগ যদি না হয় এখুনি বলে রাখি মুখুয্যে মশাই, যাদের নিয়ে চলে আমাদের ঘরকন্না, হাসিকান্না, মান-অভিমান তাদের নিয়েই যেন চলতে পারি, তাদেরই যেন আপনার বলে এ জীবনে ভাবতে শিখি। আলেয়ার আলোর পিছনে আর যেন না পথ হারাই। একটু থামিয়া বলিল, দূরে থেকে যখনি আপনাকে মনে পড়বে তখনি একান্তমনে এই মন্ত্র জপ করবো—তিনি নির্মল, তিনি নিষ্পাপ, তিনি মহৎ। মনের পাষাণফলকে তাঁর লেশমাত্র দাগ পড়ে না। জগতে তিনি একক, কারো আপন তিনি নয়,—সংসারে কেউ তাঁর আপন হতে পারে না। এই বলিয়া দুচোখে আঁচল চাপিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সেদিন কাজকর্ম চুকিল অনেক রাত্রে। এ গৃহের সুশৃঙ্খলিত ধারায় কোথাও কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। বাহির হইতে কেহ জানিতেও পারিল না সেই শৃঙ্খলের সবচেয়ে বড় গ্রন্থিই আজ চূর্ণ হইয়া গেল। প্রভাত হইতে অধিক বিলম্ব নাই, কর্মক্লান্ত বৃহৎ ভবন একান্ত নীরব,—যে যেখানে স্থান পাইয়াছে নিদ্রামগ্ন,—ভাঁড়ারের গুরু দায়িত্ব সমাপন করিয়া বন্দনা শ্রান্তপদে নিজের ঘরে যাইতেছিল, চোখে পড়িল ওদিকের বারান্দার পাশে দ্বিজদাসের ঘরে আলো জ্বলিতেছে। দ্বিধা জাগিল এমন সময়ে যাওয়া উচিত কিনা, কাহারো চোখে পড়িলে সুবিচার সে করিবে না, নিন্দা হয়ত শতমুখে বিস্তারলাভ করিবে, কিন্তু থামিতে পারিল না, যে উদ্বেগ তাহাকে সারাদিন চঞ্চল ও অশান্ত করিয়া রাখিয়াছে সে তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। রুদ্ধদ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিল, দ্বিজুবাবু এখনো জেগে আছেন?

ভিতর হইতে সাড়া আসিল, আছি। কিন্তু এমন সময়ে আপনি যে?

আসতে পারি?

স্বচ্ছন্দে।

বন্দনা দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল রাশীকৃত কাগজপত্র লইয়া দ্বিজদাস বিছানায় বসিয়া। জিজ্ঞাসা করিল, আজকের হিসেব বুঝি! কিন্তু হিসেব ত পালাবে না দ্বিজুবাবু, এত রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে যে।

দ্বিজদাস বলিল, হলে বাঁচতুম, এগুলো, চোখে দেখতে হতো না।

খরচ অনেক হয়ে গেছে বুঝি? দাদার কাছে গুরুতর কৈফিয়ত দিতে হবে?

দ্বিজদাস কাগজগুলো একধারে ঠেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল, চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। শ্রীগুরুর কৃপায় সেদিন আর এখন আমার নেই বন্দনা দেবী, যে দাদার কাছে কৈফিয়ত দেবো। এখন উলটে কৈফিয়ত চাইবো আমি। বলবো, লাও শিগগির হিসেব—জলদি লাও রূপেয়া—কোথায় কি করেছো বলো।

বন্দনা অবাক হইয়া বলিল, ব্যাপার কি?

দ্বিজদাস মুষ্টিবদ্ধ দুই হাত মাথার উপরে তুলিয়া কহিল, ব্যাপার অতীব ভীষণ। মা দয়াময়ী আমাকে দয়া করুন, ভগ্নীপতি শশধর আমার সহায় হোন—সাবধান বিপ্রদাস! তোমাকে এবার আমি ধনেপ্রাণে বধ করবো। আমাদের হাতে আর তোমার নিস্তার নেই।

বন্দনার চিত্ত উদ্দাম হইয়া উঠিল, তবু সে না হাসিয়া পারিল না, বলিল, সব তাতেই হাসি-তামাশা? আপনি কি একমুহূর্ত সিরিয়াস হতে জানেন না দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস বলিল, জানিনে? তবে আনো শশধরকে, আনো—না, তারা থাক। দেখবে, হাসি-তামাশা পালাবে চক্ষের নিমিষে সাহারায়, গাম্ভীর্যে মুখমণ্ডল হয়ে উঠবে বুনো ওলের মত ভয়াবহ। পরীক্ষা করুন।

বন্দনা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল, কহিল, আপনি তা হলে শুনেছেন সব?

সব নয়, যৎকিঞ্চিৎ। সব জানেন দাদা, কিন্তু সে গহন অরণ্য। আর জানে শশধর। সে বলবে বটে, কিন্তু সমস্ত মিথ্যে করে বানিয়ে বলবে।

বন্দনা ব্যাকুল-কণ্ঠে বলিল, যা জানেন আমাকে বলতে পারেন না। দ্বিজুবাবু? আমি সত্যি বড় ভয় পেয়েছি।

দ্বিজদাস কহিল, ভয় পাওয়া বৃথা। দাদার সঙ্কল্প টলবে না,—তাঁকে আমরা হারালুম।

দীপালোকে দেখা গেল এইবার অশ্রুতলে দু'চক্ষু তাহার টলটল করিতেছে, ঘাড় ফিরাইয়া কোনমতে মুছিয়া ফেলিয়া আবার সে সোজা হইয়া বসিল।

বন্দনা গাঢ়স্বরে কহিল, বিচ্ছেদ এত সহজেই আসবে দ্বিজুবাবু, সত্যিই ঠেকান যাবে না?

দ্বিজদাস মাথা নাড়িয়া বলিল, না। ও-বস্তু যখন আসে তখন এমনি অবাধে এমনি দ্রুতই আসে, বারণ কিছুতে মানে না। যার কাঁদবার সে কাঁদে, কিন্তু শেষ ঐখানে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিল, আপনি জানতে চাইছিলেন হেতু। বিস্তারিত জানিনে, কিন্তু যতটুকু জানি সে শুধু আপনাকেই বলবো, আর সাহায্য যদি কখনো চাইতে হয়, যেখানেই থাকুন সে কেবল আপনার কাছেই চাইব।

কেবল আমার কাছেই কেন?

তার কারণ হাত যদি পাততেই হয় মহতের দ্বারে পাতাই শাস্ত্রের বিধান।

কিন্তু মহৎ কি আর কেউ নেই?

হয়ত আছে, কিন্তু ঠিকানা জানিনে। দাদার কথা তুলবো না, কিন্তু চিরদিন হাত পাতার অভ্যাস ছিল বৌদিদির কাছে, কিন্তু সে পথ বন্ধ হলো। আপনি তার বোন, আমার দাবী তার থেকে।

কিন্তু মা?

দ্বিজদাস বলিল, রথ যখন দ্রুত চলে মা তার অসাধারণ সারথি, কিন্তু চাকা যখন কাদায় বসে মা তখন নিরুপায়। নেমে এসে ঠেলতে তিনি পারেন না। সে দুর্দিনে যাব আপনার কাছে। দেবেন না ভিক্ষে?

ভিক্ষের বিষয় না জেনে বলবো কি করে দ্বিজুবাবু?

সে নিজেও জানিনে বন্দনা, সহজে চাইতেও যাব না। যখন কোথাও মিলবে না, যাব শুধু তখনি।

বন্দনা বহুক্ষণ অধোমুখে থাকিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, যা জানতে চেয়েছিলুম বলবেন না?

দ্বিজদাস বলিল, সমস্ত জানিনে, যা জানি তাও হয়ত অভ্রান্ত নয়। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে দাদা আজ সর্বস্বান্ত। সমস্ত গেছে।

বন্দনা চমকিয়া উঠিল—মুখুয্যেমশাই সর্বস্বান্ত? কি করে এমন হলো দ্বিজুবাবু?

দ্বিজদাস বলিল, খুব সহজেই এবং সে ঐ শশধরের ষড়যন্ত্রে। সাহা-চৌধুরী কোম্পানি হঠাৎ যেদিন দেউলে হলো দাদারও সর্বস্ব ডুবল সেই গহ্বরে। অথচ, এ শুধু বাইরের ঘটনা,—যেটুকু চোখে দেখতে পাওয়া গেল। ভিতরে গোপন রইলো অন্য ইতিহাস।

বন্দনা ব্যাকুল হইয়া কহিল, ইতিহাস থাক দ্বিজুবাবু, শুধু ঘটনার কথাই বলুন। বলুন সর্বস্ব যাওয়া সত্যি কিনা।

হাঁ, সত্যি। ওখানে কোন ভুল নেই।

কিন্তু মেজদি? বাসু? তাদেরও কিছু রইলো না নাকি?

না। রইলো শুধু বৌদির বাপের বাড়ির আয়। সামান্য ঐ ক'টা টাকা।

কিন্তু সে ত মুখুয্যেমশাই ছোঁবেন না দ্বিজুবাবু।

না। তার চেয়ে উপোসের ওপর দাদার বেশী ভরসা। যে ক'টা দিন চলে।

উভয়েই নির্বাক হইয়া রহিল। মিনিট-কয়েক পরে বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি? আপনার নিজের কি হলো?

দ্বিজদাস বলিল, পরম নির্ভয়ে ও নিরাপদে আছি। দাদা আপনি ডুবলেন কিন্তু আমাকে রাখলেন ভাসিয়ে। জলকণাটি পর্যন্ত লাগাতে দিলেন না গায়ে। বললেন, এ অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে? হলো মায়ের সুবুদ্ধি, দাদার সাধুতা এবং আমার নিজের শুভ-গ্রহের কল্যাণে। গল্পটা বলি শুনুন। এই শশধর ছিল দাদার বাল্যবন্ধু, সহপাঠী। দু'জনের ভালোবাসার অন্ত নেই। বড় হয়ে দাদা এর সঙ্গে দিলেন কল্যাণীর বিয়ে। এই ঘটকালিই দাদার জীবনের অক্ষয় কীর্তি। শোনা গেল, শশধরের বাপের মস্ত জমিদারি, বিপুল অর্থ ও বিরাট কারবার। অতবড় বিত্তশালী ব্যক্তি পাবনা অঞ্চলে কেউ নেই। বছর-চারেক গেল, হঠাৎ একদিন শশধর এসে জানালে জমিদারি, ঐশ্বর্য, কারবার অতলে তলাতে আর বিলম্ব নেই,—রক্ষা করতে হবে। মা বললেন, রক্ষা করাই উচিত, কিন্তু দ্বিজু আমার নাবালক, তার টাকায় ত হাত দিতে পারা যাবে না বাবা। সে বললে, বছর ঘুরবে না মা, শোধ হয়ে যাবে। মা বললেন, আশীর্বাদ করি তাই যেন হয়, কিন্তু নাবালকের সম্পত্তি, কর্তার একান্ত নিষেধ।

কল্যাণী কেঁদে এসে দাদার পায়ে গিয়ে পড়লো। বললে, দাদা বিয়ে দিয়েছিলে তুমিই, আজ ছেলেমেয়ে নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবো দেখবে তুমি চোখে? মা পারেন, কিন্তু তুমি? যেখানে ওঁর ধর্ম, যেখানে ওঁর বিবেক ও বৈরাগ্য, যেখানে উনি আমাদের সকলের বড়, কল্যাণী সেইখানে দিলে আঘাত। দাদা অভয় দিয়ে বললেন, তুই বাড়ি যা বোন, যা করতে পারি আমি করবো। সেই অভয়-মন্ত্র জপতে জপতে কল্যাণী বাড়ি ফিরে গেল। তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বন্দনা। কিন্তু চেয়ে দেখুন ভোর হয়েছে, এই বলিয়া খোলা জানালার দিকে সে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল।

বন্দনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু ঐ কাগজগুলো আপনার কি?

দ্বিজদাস বলিল, আমার নির্ভয়ে থাকার দলিল। আসবার সময়ে দাদা সঙ্গে এনেছিলেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি আপনিও কি আমাদের আজই ফেলে চলে যাবেন?

ঠিক জানিনে দ্বিজুবাবু। কিন্তু আর সময় নেই আমি চললুম। আবার দেখা হবে। এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

চব্বিশ

মেজদিদিকে জোর করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া বন্দনা তাহার পায়ে আলতা পরাইয়া দিতেছিল। এই মঙ্গলাচারটুকু অন্নদা তাহাকে শিখাইয়া দিয়া নিজে আত্মগোপন করিয়াছে। তাহার চোখ রাঙ্গা, অবিরত অশ্রুবর্ষণে চোখের পাতা ফুলিয়াছে—বন্দনার প্রশ্নের উত্তরে সে সংক্ষেপে বলিয়াছিল, বৌকে মুখ দেখাতে আমি পারবো না।

তুমি পারবে না কেন অনুদি, তোমার লজ্জা কিসের?

আমার লজ্জা এই জন্যে যে, এর আগে মরিনি কেন? শুধু দ্বিজুকেই ত মানুষ করিনি বন্দনাদিদি, বিপিনকেও করেছিলুম। ওর মা যখন মারা গেল কার হাতে দিয়েছিল তার দু'মাসের ছেলেকে? আমার হাতে। সেদিন কোথায় ছিলেন দয়াময়ী? কোথায় ছিল তাঁর মেয়ে-জামাই? বলিতে বলিতে সে মুখে আঁচল চাপিয়া দ্রুতপদে অন্যত্র সরিয়া গেল। মেঝেয় বসিয়া নিজের জানুর উপর দিদির পা-দুটি রাখিয়া বন্দনার আলতা পরানো যেন আর শেষ হইতে চাহে না।

টপ করিয়া একফোঁটা তপ্ত অশ্রু সতীর পায়ের উপর পড়িল। হেঁট হইয়াও সে বন্দনার মুখ দেখিতে পাইল না। কিন্তু হাত বাড়াইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া বলিল, তুই কেন কাঁদচিস বল ত বন্দনা?

বন্দনা তেমনি নতমুখে বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠে কহিল, কাঁদচে ত সবাই মেজদি। আমিই ত একা নয়।

সবাই কাঁদছে বলে তোকেও কাঁদতে হবে, এত লেখাপড়া শিখে এই বুঝি তোর যুক্তি হলো?

দিদির কথা শুনিয়া বন্দনা মুহূর্তের জন্য মুখ তুলিয়া চাহিল, বলিল, যুক্তি দেখিয়ে কাঁদতে হবে নইলে মানুষে কাঁদবে না, তোমার যুক্তিটা বুঝি এই মেজদি?

সতী হাত দিয়া তাহার মাথাটা নাড়িয়া দিয়া সস্নেহে কহিল, তর্কবাগীশের সঙ্গে তর্কে পারবার জো নেই। তা বলিনি রে, তা আমি বলিনি। ওরা ভেবেছে আমার সব বুঝি গেলো তাই ওদের কান্না, কিন্তু সত্যি ত তা নয়। আমার এক দিকে রয়েছেন স্বামী, অন্য দিকে ছেলে,—সংসারে কোন ক্ষতিই আমার হয়নি ভাই, আমার জন্যে তুই শোক করিস নে। দুঃখ আমার নেই।

বন্দনা বলিল, দুঃখ যেন তোমার না-ই থাকে মেজদি। কিন্তু তোমার দুঃখটাই সংসারে সব নয়। তোমার কতখানি গেলো সে তুমি জানো, কিন্তু কেঁদে কেঁদে যারা চোখ অন্ধ করলে তাদের লোকসান কে পুরোবে বলো ত?

একটু থামিয়া বলিল, মুখুয্যেমশাই পুরুষমানুষ, যা খুশি উনি বলুন, কিন্তু যাবার ক্ষণে আজ শুকনো চোখে যেন তুমি বিদায় নিও না দিদি। সে ওদের বড় বিঁধবে।

কাদের বিঁধবে রে বন্দনা?

কাদের? জানো না তুমি তাদের? তোমার ন'বছর বয়সে এসেছিলে এই পরের বাড়িতে, সেই বাড়িকে বছরের পর বছর ধরে তোমায় আপনার করে দিলে যারা, আজকের একটা ধাক্কাতেই তাদের ভুলে গেলে মেজদি? তোমার শাশুড়ী, তোমার দেওর, তোমার সংসারের দাস-দাসী, আশ্রিত-পরিজন, ঠাকুরবাড়ি, অতিথিশালা, গুরু-পুরুত—এদের অভাব পূর্ণ হবে শুধু স্বামী-পুত্র দিয়ে? আর কেউ নেই জীবনে—শুধু এই?

বন্দনা বলিতে লাগিল, এ কাদের মুখের কথা জানো মেজদি, যে সমাজে আমরা মানুষ

হয়েছি তাদের। তুমি ভেবেছো স্বামীভক্তির এই শেষ কথা? স্ত্রীর এর বড়ো ভাববার কিছু নেই? এ তোমার ভুল। কলকাতায় চলো আমার মাসীর বাড়িতে, দেখবে এ কথা সেখানে পুরনো হয়ে আছে,—এর বেশি তারা ভাবেও না, করেও না। অথচ,—কথার মাঝখানে সে থামিয়া গেল। তাহার হঠাৎ মনে হইল কে যেন পিছনে দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া দেখিল দ্বিজদাস। কখন যে সে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে উভয়ের কেহই টের পায় নাই। লজ্জা পাইয়া বন্দনা কি যেন বলিতে গেল, দ্বিজদাস থামাইয়া দিয়া কহিল, ভয় নেই, মাসীকেও চিনিনে তাঁর দলের কাউকেও জানিনে,—আপনার কথা তাঁদের কাছে প্রকাশ পাবে না। কিন্তু আসলে আপনার ভুল হচ্চে। পৃথিবীতে জন্তু-জানোয়ারের দল আছে, তাদের আচরণ ফরমূলায় বাঁধা যায়, কিন্তু মানুষের দল নেই। একজোটে এমন গড়পড়তা বিচার তাদের চলে না। সকাল থেকে আজ এই কথাটাই ভাবছিলুম। মাসীর দল থেকে টেনে এনে অনায়াসে আপনাকে দাদার দলে ভর্তি করা যায়, আবার দয়াময়ীর দল থেকে বার করে স্বচ্ছন্দে ঐ মৈত্রেয়ীকে আপনার মাসীর দলে চালান করা চলে। বাজি রেখে বলতে পারি কোথাও একতিল বিভ্রাট বাধবে না। বাঃ রে মানুষের মন! বাঃ রে তার প্রকৃতি!

সতী আশ্চর্য হইয়া কহিল, এ কথার মানে ঠাকুরপো?

দ্বিজদাস ততোধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, তোমার কাছেও মানে? দ্বিজুর কাজ দ্বিজুর কথার মানেই যদি থাকবে বৌদি, এতকাল দয়াময়ী-বিপ্রদাসের দরবারে না গিয়ে তোমার কাছেই তার সব আরজি পেশ হতো কেন? মানে বোঝার গরজ তোমার নেই বলেই ত? আজ যাবার দিনেও সেইটুকু থাক বৌদি, ঠিক-বেঠিকের চুলচেরা বিচারে কাজ নেই এই বলিয়া সুমুখে আসিয়া সে তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। এমন সে করে না। পায়ের কাঁচা আলতার রঙ তাহার কপালে লাগিয়াছে, সতী ব্যস্ত হইয়া আঁচলে মুছাইয়া দিতে গেল, সে ঘাড় নাড়িয়া মাথা সরাইয়া বলিল, দাগ আপনিই মুছে যাবে বৌদি, একটা দিন থাকে থাক। কথাটা কিছুই নয়, দ্বিজু হাসিয়াই বলিল, কিন্তু শুনিয়া বন্দনার দু'চোখ জলে ভরিয়া গেল। লুকাইতে গিয়া সে আর মুখ তুলিতে পারিল না।

দ্বিজদাস বলিল, আমি এসেছিলুম তাগাদা দিতে। সময় হয়ে আসছে, দাদা ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। জিনিসপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাসুকে জামা-কাপড় পরিয়ে গাড়িতে বসিয়ে দিয়েছি, মাঙ্গলিকের আয়োজন কে করে দিলে জানিনে, কিন্তু তাও হাতের কাছে পেয়ে গেলুম। ভয় হয়েছিল অনুদি হয়ত ডুবে মরেছেন, কিন্তু সন্দেহ হচ্চে কোথাও বেঁচেই আছেন। নইলে ওগুলো এলো কি করে? কিন্তু খুঁজে পাওয়া যখন তাঁকে যাবে না তখন খুঁজেও কাজ নেই। ওদিকে দয়াময়ীর মহল অর্গলবদ্ধ। সঙ্কট-উত্তরণের যে পন্থা তিনি অবলম্বন করেছেন তাতে করবার কিছু নেই। তবে শ্রীমতী মৈত্রেয়ীকে বলে যেতে পারো যথাসময়ে মা'র কানে তা পৌঁছবে। কিন্তু আমি বলি প্রয়োজন নেই। এবার তুমি একটু তৎপর হয়ে গাড়িতে গিয়ে বসবে চলো বৌদি, তোমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে এসো আমি নিস্তার পাই, একটু কাজে মন দিতে পারি।

সতী ম্লান হাসিয়া কহিল, আমাকে বিদায় করতে ঠাকুরপোর ভারী তাড়া।

আমার কাজ পড়ে রয়েছে যে।

কি কাজ শুনি?

এর আগে কখনো ত শুনতে চাওনি বৌদি। যখন যা চেয়েছি জিজ্ঞাসা না করেই চিরকাল দিয়ে এসেছ। এ তোমার শোনার যোগ্য নয়।

সতী এবং বন্দনা উভয়েই ক্ষণকাল নীরবে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তার পরে সতী বলিল, তুমি যাও ঠাকুরপো, আর আমার দেরি হবে না। বন্দনাকে কহিল, তুইও এখানে দেরি করিস নে বোন,—যত শীঘ্র পারিস বোম্বায়ে ফিরে যা। কলকাতায় যাবার দরকার নেই, কাকা সেখানে একলা রয়েছেন মনে রাখিস।

বন্দনা দ্বিজুর মতো পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল, বলিল, না মেজদি, মাসীর বাড়িতে আর না। সেদিকের পাঠ উঠিয়ে দিয়েই বেরিয়েছিলুম এ কখনো ভুলব না। এই বলিয়া সে আঁচলে অশ্রু মুছিয়া কহিল, হয়ত কালই বোম্বায়ে ফিরবো, কিন্তু তুমিও যাবার আগে এই ভরসা দিয়ে যাও মেজদি, আবার যেন শীঘ্র তোমাদের দেখতে পাই।

সতী মনে মনে কি আশীর্বাদ করিল সে-ই জানে, হাত বাড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিল, হাসিমুখে বলিল, সে ত তোর নিজের হাতে বন্দনা। কাকাকে বলিস বিয়ের নেমন্তন্নপত্র দিতে, যেখানে থাকি গিয়ে হাজির হবোই। একটুখানি থামিয়া বোধ হয় মনে মনে চিন্তা করিল বলা উচিত কিনা, তার পরে বলিল, ভারী সাধ ছিল এ-বাড়িতে তুই পড়বি। ঠাকুরপোর হাতে তোকে সঁপে দিয়ে তোর হাতে সংসারের ভার বাসুর ভার সব তুলে দিয়ে মায়ের সঙ্গে কৈলাসদর্শনে যাবো, ফিরতে না পারি না-ই পারলুম,—কিন্তু, মানুষ ভাবে এক হয় আর। এই বলিয়া সে চুপ করিল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় কহিল, এ বাড়িতে আমি যা পেয়েছিলুম জগতে কেউ তা পায় না। আবার সবচেয়ে বেশী করে পেয়েছিলুম আমার শাশুড়ীকে। কিন্তু তাঁর সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটলো সবচেয়ে বেশি। যাবার আগে প্রণাম করতে পেলুম না, দোর বন্ধ, চৌকাটের ধুলো মাথায় তুলে নিয়ে বললুম, মা, এই কাঠের ওপরে তোমার পায়ে ধুলো লেগে আছে এই আমার—কথা শেষ করিতে পারিল না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া। এইবার সে ভাঙ্গিয়া পড়িল, তাহার দু'চোখ বাহিয়া দরদর ধারে অশ্রু নামিয়া আসিল। মিনিট দুই-তিন গেল সামলাইতে, আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, আর পেলুম না খুঁজে আমার অনুদিকে। সে আমার মায়েরও বড় বন্দনা। আমরা চলে গেলে তাকে বলিস ত রে, আমি রাগ করে গেছি। আবার দু'চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া আসিল, আবার আঁচলে মুছিয়া ফেলিল। একটা বিড়াল পুষিয়াছিল, নাম নিমু। কাজকর্মের বাড়িতে সেটা যে কোথায় গিয়াছে ঠিকানা নাই। সকাল হইতে কয়েকবার মনে পড়িয়াছে, এখনও তাহাকে মনে পড়িল। বলিল, নিমুটা যে কোথায় ডুব মারলে দেখে যেতে পেলুম না। অনুদিকে বলিস ত বন্দনা। অথচ, একটু পূর্বেই জোর করিয়া বলিয়াছিল, তাহার এক দিকে রহিলেন স্বামী, অন্য দিকে সন্তান,—সংসারে কোন ক্ষতিই তাহার হয় নাই! কথাটা কত বড়ই না মিথ্যা!

বৌদি করচো কি? বাহির হইতে দ্বিজদাসের আর একদফা তাগাদা আসিল।

যাচ্চি ভাই, হয়েছে—বলিয়া সতী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

স্টেশন হইতে দ্বিজদাস যখন একাকী ফিরিয়া আসিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঘরে ঘরে তেমনি আলো জ্বলিয়াছে, তেমনিভাবেই লোকজন আপন-আপন কাজে ব্যস্ত, এই বৃহৎ পরিবারে কোথায় কি বিপ্লব ঘটিয়াছে কেহ জানেও না। বাহিরের মহলে উপরে বিপ্রদাসের বসিবার ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ,—ও দিকটা অন্ধকার। এমন কত দিনই আলো জ্বলে না, বিপ্রদাস থাকেন কলিকাতায়, অভাবনীয় কিছুই নয়। সিঁড়ির বাঁ দিকের ঘরটায় থাকে অশোক, জানালা দিয়া চোখে পড়িল ইজি-চেয়ারে পা ছড়াইয়া বাতির আলোকে সে নিবিষ্টচিত্তে কি একখানা বই পড়িতেছে। কলেজ কামাই করিয়া অক্ষয়বাবু আজও আছেন, তাঁর ঘরটা শেষের দিকে, তিনি ঘরে আছেন কিংবা বায়ু-সেবনে বহির্গত হইয়াছেন জানা গেল না। মোটর হইতে প্রাঙ্গণে পা দিয়াই দ্বিজদাসের চোখে পড়িয়াছিল ত্রিতলের লাইব্রেরিঘরটা। সন্ধ্যার পরে ঐ ঘরটা প্রায় থাকে অন্ধকার, আজ কিন্তু খোলা জানালা দিয়া আলো আসিতেছে। তাহার সন্দেহ রহিল না এখানে আছে বন্দনা। বই পড়িতে নয়, চোখ মুছিতে। লোকের সংস্রব হইতে আত্মরক্ষা করিতে সে এই নির্জনে আশ্রয় লইয়াছে। আজ রাত্রিটা কোনমতে কাটাইয়া সে কাল চলিয়া যাইবে সুদূর বোম্বাই অঞ্চলে—যেখানে মানুষ হইয়া সে এত বড় হইয়াছে—যেখানে আছে তাহার পিতা, আত্মীয়-স্বজন, তাহার কত

দিনের কত বন্ধু এবং বান্ধবী। কোনদিন কোন ছলে কখনো যে এ গ্রামে তাহার আবার আসা সম্ভব ভাবাও যায় না আসুক কিন্তু এ বাড়ি সে সহজে ভুলিবে না। বিচিত্র এ দুনিয়া,—কত অদ্ভুত অভাবিত ব্যাপারই না এখানে নিমিষে ঘটে। একটা একটা করিয়া সেই প্রথম দিন হইতে আজ পর্যন্ত সকল কথাই দ্বিজুর মনে পড়িল। সেই হঠাৎ আসা আবার তেমনি হঠাৎ রাগ করিয়া যাওয়া। ঘরের মধ্যে শুধু ঘণ্টা-খানেকের আলাপ-আলোচনা। সেদিন বন্দনা সহাস্যে বলিয়াছিল, শুধু চোখের পরিচয়টাই নেই দ্বিজুবাবু, নইলে দেওরের গুণাগুণ লিখে পাঠাতে মেজদি কখনো আলস্য করেন নি। আমি সমস্ত জানি, আপনার সম্বন্ধে আমার কিছু অজানা নেই। যতদিন যত জ্বালিয়েছেন বাড়িসুদ্ধ লোককে তার সমস্ত খবর পৌঁচেছে আমার কাছে। দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আমরা কেউ কারুকে চিনিনে, তবু আপনার কাছে আমার দুর্নাম প্রচার করার সার্থকতা ছিল কি? বন্দনা হাসিয়া জবাব দিয়াছিল, বোধ করি আসলে মেজদি আপনাকে দেখতে পারতেন না,—এ তারই প্রতিশোধ।

তার পরে দুজনেই হাসিয়া কথাটাকে পরিহাসে রূপান্তরিত করিয়াছিল। কিন্তু সেদিন উভয়ের কেহই ভাবে নাই এ ছিল সতীর দ্বিজুর প্রতি বন্দনার চিত্ত আকর্ষণের কৌশল। যদি কখনো বোনটিকে কাছে আনা যায়, যদি কখনো তাহার হাতে দিয়া অশান্ত দেবরটিকে শাসন মানানো চলে। কিন্তু সে ঘটিল না, তাহার গোপন বাসনা গোপনেই রহিয়া গেল,—আজও দুজনের কেহই সে-সব চিঠির অর্থ খুঁজিয়া পাইল না।

দ্বিজদাস সোজা উপরে উঠিয়া গেল। পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বন্দনার কোলের উপর বই খোলা, কিন্তু সে জানালার বাহিরে চাহিয়া স্থির হইয়া আছে। একটা ছত্রও পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ, বুঝিয়াও শুধু কথা আরম্ভ করিবার জন্যই সে প্রশ্ন করিল, কি বই পড়ছিলেন?

বন্দনা বই মুড়িয়া টেবিলে রাখিল, দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ফিরতে এত দেরি হলো যে? কলকাতায় গাড়ি ত গেছে কোন্ কালে।

দ্বিজদাস বলিল, দেরি হোক তবু ত ফিরেচি। না ফিরলেও ত পারতুম।

বন্দনা বলিল, অনায়াসে।

দ্বিজদাস একমুহূর্ত নীরব থাকিয়া বলিল, ঠিক এই কথাটাই আমার প্রথমে মনে হয়েছিল। গাড়ি ছেড়ে দিলে, জানালায় গলা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাসু হাত নাড়তে লাগলো ক্রমশঃ তার ছোট হাতখানি গেল বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে। প্রথমে মনে হলো গেলেই হতো ওদের সঙ্গে—

বন্দনা কহিল, আপনি বাসুকে ভারী ভালবাসেন, না?

দ্বিজদাস একটু ভাবিয়া বলিল, দেখুন জবাব দেবো কি, এ-সব জিনিসের আমি বোধ হয় স্বরূপই জানিনে। প্রকৃতিটা এত রুক্ষ, এমন নীরস যে, দু'দণ্ডেই সমস্ত উবে গিয়ে শুকনো বালি আবার তেমনি ধূধূ করে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে চোখে একবার জল এলো কিন্তু তখনি আবার আপনিই শুকলো,—বাষ্পের চিহ্নও রইলো না।

বন্দনা কহিল, এ একপ্রকার ভগবানের আশীর্বাদ।

দ্বিজদাস বলিতে লাগিল, কি জানি, হতেও পারে। অথচ, এই বাসুর ভয়েই মা কাল থেকে ঘরে দোর দিয়ে আছেন। নইলে দাদার জন্যেও না, বৌদিদির জন্যেও না। মা ভাবেন বাসুকে বুঝি তিনি মানুষ করেছেন, কিন্তু হিসেব করলে দেখতে পাবেন ওর বয়সের অর্ধেক কাল কেটেছে ওঁর তীর্থবাসে। তখন কার কাছে থাকতো ও? আমার কাছে। টাইফয়েড জ্বরে কে জেগেছে ষাট দিন? আমি। আজ যাবার সময় কে দিলে সাজিয়ে? আমি। ওঁর জামা-কাপড় থাকে আলমারিতে, ওর বই-শ্লেটের জায়গা হলো আমার টেবিল, ওর শোবার বিছানা আমার খাটে। মা টানাটানি করে নিয়ে যান—কিন্তু কত রাতে ঘুম ভেঙ্গে ও পালিয়ে এসেছে আমার ঘরে।

বন্দনা নির্নিমেষে চাহিয়াছিল, বলিল, তবু ত চোখের জল শুকিয়ে যেতে এক মুহূর্তের বেশি লাগে না।

দ্বিজদাস কহিল, না। এই আমার স্বভাব। ওকে নিয়ে আমার ভাবনা শুধু এই যে সে পড়বে গিয়ে তার বাপ-মায়ের হাতে। আপনি বলবেন, জগতে এই ত স্বাভাবিক, এতে ভয়ের কি আছে? কিন্তু স্বাভাবিক বলেই বিপদ হয়েছে এই যে, এত বড় উলটো কথাটা মানুষকে আমি বোঝাবো কি করে!

বন্দনা এ কথা বলিল না যে, বুঝাইবার প্রয়োজনই বা কি! অন্যপক্ষে বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে এত বড় অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাও তাহার কঠিন, বিশেষতঃ বিপ্রদাসের বিরুদ্ধে। কিন্তু কোন তর্ক না করিয়া সে নীরব হইয়াই রহিল।

পরক্ষণে বক্তব্য স্পষ্টতর করিতে দ্বিজদাস নিজেই কহিল, একটা সান্ত্বনা বৌদি রইলেন কাছে, নইলে দাদার হাতে দিয়ে আমার তিলার্ধ শান্তি থাকতো না।

বন্দনা কহিল, আপনি ত নির্বিকার, বাসুর ভালোমন্দ নিয়ে আপনার মাথাব্যথা কিসের? যা হয় তা হোক না।

শুনিয়া দ্বিজদসের মুখের উপর সুতীক্ষ্ণ বেদনার ছায়া পড়িল, কিন্তু সে মৌন হইয়া রহিল।

বন্দনা কহিল, দাদার প্রতি গভীর বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার কথা একদিন আপনার নিজের মুখে শুনেছিলুম। সে-ও কি ওই চোখের জলের মতো এক নিমিষে শুকিয়ে গেল? কিংবা যে লোক নিজের দোষে সর্বস্বান্ত হয় তাকে বিশ্বাস করা চলে না এই কি অবশেষে বলতে চান?

দ্বিজদাস বিস্ময় ও ব্যথায় অভিভূত চক্ষে ক্ষণকাল তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পরে দুই হাত এক করিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, না, সে আমি বলিনি। আমি বলছিলুম তৃষ্ণার জলের জন্যে মানুষে সমুদ্রের কাছে গিয়ে যেন হাত না পাতে। কিন্তু দাদার সম্বন্ধে আর আলোচনা নয়, বাইরের লোকে তা বুঝবে না।

এ কথায় বন্দনা অন্তরে অত্যন্ত আহত হইল, কিন্তু প্রতিবাদেরও কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দ্বিজদাস একেবারে অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি কালই বোম্বায়ে যাবেন?

বন্দনা বলিল, হাঁ।

অশোকবাবুই নিয়ে যাবেন?

হাঁ, তিনিই।

দ্বিজদাস বলিল, বোম্বাই-মেল এখান থেকে বেশী রাতে যায়, কাল আপনাদের আমি স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসবো। কিন্তু দিনের বেলায় থাকতে পারবো না, একটু কাজ আছে।

বাবাকে একটা তার করে দেবেন।

আচ্ছা।

মিনিট-দুই নীরব থাকিয়া, ইতস্ততঃ করিয়া দ্বিজদাস কহিল, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেসা করবো প্রায় ভাবি, কিন্তু নানা কারণে দিন বয়ে যায়, জিজ্ঞেসা করা আর হয় না। কাল চলে যাবেন, সময় আর পাবো না। যদি রাগ না করেন বলি।

বলুন।

দেরি হইতে লাগিল।

বন্দনা কহিল, রাগ করবো না, আপনি নির্ভয়ে বলুন।

দ্বিজদাস বলিল, কলকাতার বাড়ি থেকে মা একদিন রাগ করে বৌদিদিকে নিয়ে হঠাৎ চলে এলেন আপনার মনে পড়ে?

পড়ে।

কারণ না জেনে আপনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। মন খুব খারাপ ছিল, আমার ঘরে এসে সেদিন একটা কথা বলেছিলেন যে আমাকে আপনার ভাল লাগে। মনে পড়ে?

পড়ে। কিন্তু খুব লজ্জার সঙ্গেই মনে পড়ে।

সে কথার মূল্য কিছু নেই?

না।

দ্বিজদাস ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, আমিও তাই ভাবি। ওর মূল্য কিছু নেই।

একটু পরে কহিল, বৌদি বলেছিলেন আপনার মাসীর ইচ্ছে অশোকের সঙ্গে আপনার বিবাহ হয়। সে কি স্থির হয়ে গেছে?

বন্দনা বলিল, এ আমাদের পারিবারিক কথা। বাইরের লোকের সঙ্গে এ আলোচনা চলে না।

দ্বিজদাস বলিল, আলোচনা ত নয়, শুধু একটা খবর।

বন্দনা তিক্তকণ্ঠে কহিল, আপনার সঙ্গে এমন কোন আত্মীয়-সম্বন্ধ নেই যাতে এ প্রশ্ন আপনি করতে পারেন। দ্বিজুবাবু, আপনি শিক্ষিত লোক, এ কৌতূহল আপনার লজ্জাকর।

শুনিয়া দ্বিজদাস সত্যই লজ্জা পাইল, তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। বলিল, আমার ভুল হয়েছে বন্দনা! স্বভাবতঃ আমি কৌতূহলী নই, পরের কথা জানবার লোভ আমার খুব কম। কিন্তু কি করে জানিনে আমার মনে হতো যে-কথা সংসারে কাউকে বলতে পারিনে আপনাকে পারি। যে বিপদে কাউকে ডাকা চলে না, আপনাকে চলে। আপনি—

তাহার কথার মাঝখানেই বন্দনা হাসিয়া বলিল, কিন্তু এই যে বললেন দাদার আলোচনা বাইরের লোকের সঙ্গে করতে আপনি চান না। আমি ত পর, একেবারে বাইরের লোক।

দ্বিজদাস কহিল, তাই যদি হয়, তবু আপনিই বা কেন তাঁর সম্বন্ধে আমাকে অশ্রদ্ধার খোঁটা দিলেন? জানেন না কি হচ্চে আমার? দীপালোকে স্পষ্ট দেখা গেল তাহার চোখের কোণ-দু'টো অশ্রুবাষ্পে ছলছল করিয়া আসিয়াছে।

মৈত্রেয়ী ঘরে ঢুকিল। বলিল, দ্বিজবাবু, আপনি কখন বাড়ি এলেন আমরা ত কেউ জানতে পারিনি?

দ্বিজদাস ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল, জানবার খুব দরকার হয়েছিল নাকি?

মৈত্রেয়ী কহিল, বেশ কথা। আপনি কাল খাননি, আজ খাননি,—এ আর কেউ না জানুক আমি জানি। চলুন মার ঘরে।

কিন্তু মার দরজা ত বন্ধ।

মৈত্রেয়ী বলিল, বন্ধই ছিল, কিন্তু আমি ছাড়িনি। মাথা খোঁড়াখুঁড়ি করে দোর খুলিয়েছিলাম, তাঁকে স্নান করিয়েছি, আহ্নিক করিয়েছি, জোর করে দুটো ফল মুখে গুঁজে দিয়ে খাইয়ে তবে ছেড়েচি। বলছিলেন দ্বিজু না খেলে খাবেন না। বললাম, সে হবে না মা, আপনার এ আদেশ আমি মানতে পারবো না। কিন্তু তখন থেকে সবাই আমরা আপনার পথ চেয়ে আছি। চলুন, আপনার খাবার রেখে এসেছি মার ঘরে।

দ্বিজদাস অবাক হইয়া রহিল। ইহার এত কথা সে পূর্বে শোনে নাই। বলিল, চলুন।

মৈত্রেয়ী বন্দনাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, আপনিও আসুন। মা আপনাকে ডাকছেন। এই বলিয়া সে দ্বিজদাসকে একপ্রকার গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল। সকলের পিছনে গেল বন্দনা।

নিজের ঘরের মধ্যে দয়াময়ী ছিলেন বিছানায় শুইয়া। অনুজ্জ্বল দীপালোকে তাঁহার শোকাচ্ছন্ন মুখের প্রতি চাহিলে ক্লেশ বোধ হয়। পরিস্ফীত দুই চক্ষু আরক্ত, সদ্যস্নাত আর্দ্র কেশগুলি আলুথালু বিপর্যস্ত। শিয়রে বসিয়া কল্যাণী হাত বুলাইয়া দিতেছিল, অন্য দিকে একটা চেয়ারে শশধর, দূরে আর একটা চেয়ারে বসিয়া অক্ষয়বাবু। দ্বিজদাস ঘরে

ঢুকিতেই দয়াময়ী মুখ ফিরিয়া শুইলেন এবং পরক্ষণেই একটা অস্ফুট ক্রন্দনের অবরুদ্ধ আক্ষেপে তাঁহার সর্বদেহ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বন্দনা নীরবে ধীরে ধীরে গিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল, এতবড় ব্যথার দৃশ্য বোধ করি সে কখনো কল্পনা করিতেও পারিত না। বহুক্ষণ পর্যন্ত সকলেই নির্বাক, এই স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমে কথা কহিল শশধর। বলিল, কাল থেকে শুনচি না খেয়েই আছো,—যা হোক দু'টো মুখে দাও।

দ্বিজদাস বলিল, হাঁ।

মেঝের উপর ঠাঁই করিয়া মৈত্রেয়ী সযত্নে খাবার গুছাইয়া দিতেছিল, সেইদিকে চাহিয়া শশধর পুনশ্চ কহিল, তোমার ফিরতে এত দেরি হল যে! তাঁরা গেলেন ত সেই আড়াইটার গাড়িতে?

হাঁ।

শশধর একটুখানি হাসির ভান করিয়া বলিল, অথচ কলকাতার বাড়িটা ত শুনেচি তোমার।

দ্বিজদাস কহিল, আমার বাড়িতে দাদার প্রবেশ নিষেধ নাকি?

শশধর কহিল, তা বলিনি। বরঞ্চ তিনিই যেন এই ভাবটা দেখিয়ে গেলেন। এ বাড়ি ছেড়েও ত তাঁর যাবার দরকার ছিল না, একটা মিটমাট করে নিলেই ত পারতেন।

দ্বিজদাস বলিল, মিটমাটের পথ যদি খোলা ছিল আপনি করে নিলেন না কেন?

আমি করে নেবো? শশধর অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, এ কিরকম প্রস্তাব? আমাকে অপমান করলেন তিনি আর মিটমাট করবো আমি? মন্দ যুক্তি নয়! এই বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। হাসি থামিলে দ্বিজদাস বলিল, যুক্তি মন্দ দিইনি শশধর বাবু। মেয়েরা কথায় বলে পর্বতের আড়ালে থাকা। দাদা ছিলেন সেই পর্বত, আপনি ছিলেন তাঁর আড়ালে। এখন মুখোমুখি দাঁড়ালুম আমি আর আপনি। মান-অপমানের পালা সাঙ্গ হয়ে ত যায়নি,—মাত্র শুরু হলো।

তার মানে?

মানে এই যে, আমি আপনার বাল্যবন্ধু বিপ্রদাস নই,—আমি দ্বিজদাস।

শশধরের মুখের হাসি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল, ভয়ানক গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, তোমার কথার অর্থ কি বেশ খুলে বল দিকি?

দাদার বন্ধু বলিয়া শশধর 'তুমি' বলিয়া ডাকিলেও দ্বিজদাস তাহাকে 'আপনি' বলিয়াই সম্বোধন করিত, বলিল, আপনার এ কথা মানি যে অর্থ আজ স্পষ্ট হওয়াই ভালো। আমার দাদা সেই জাতের মানুষ যারা সত্যরক্ষার জন্যে সর্বস্বান্ত হয়, আশ্রিতের জন্যে গায়ের মাংস কেটে দেয়, ওদের আদর্শ বলে কি এক অদ্ভুত বস্তু আছে যার জন্যে পারে না এমন কাজ নেই,—ওরা একধরনের পাগল—তাই এই দুর্দশা। কিন্তু আমি নিত্যন্ত সাধারণ মানুষ, আপনার সঙ্গে বেশী প্রভেদ নেই। ঠিক আপনার মতই আমার হিংসে আছে, ঘৃণা আছে, প্রতিশোধ নেবার শয়তানি বুদ্ধি আছে, সুতরাং দাদাকে ঠকিয়ে থাকলে আপনাকেও ঠকাবো, তাঁর নাম জাল করে থাকলে স্বচ্ছন্দে আপনাকে জেলে পাঠাবো,—অন্ততঃ চেষ্টার ত্রুটি হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না দু পক্ষই একদিন পথের ভিখিরি হয়ে দাঁড়াই। বিজ্ঞজনের মুখে শুনি এমনিই নাকি এর পরিণতি। তাই হোক।

শশধর উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, মা, শুনচেন আপনার দ্বিজুর কথা? ওর যা মুখে আসে বলতে ওকে বারণ করে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, মাকে নালিশ জানিয়ে লাভ নেই শশধরবাবু। উনি জানেন আমি বিপিন নই,—মাতৃবাক্য দ্বিজুর বেদবাক্য নয়। দ্বিজু তাল ঠুকে স্পর্ধার অভিনয় করে না এ কথা মা বোঝেন।

কাহারো মুখে কথা নাই, উভয়ের অকস্মাৎ এইরূপ বাদ-প্রতিবাদ যেন সম্পূর্ণ অভাবিত।

বিস্ময়ে ও ভয়ে সকলেই স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। শশধর বুঝিল ইহা পরিহাস নয়,—অতিশয় কঠোর সঙ্কল্প। উত্তর দিতে গিয়া আর তাহার কণ্ঠস্বরে পূর্বের প্রবলতা ছিল না, তথাপি জোর দিয়াই বলিয়া উঠিল, এই শেষ। এখানে আর আমি জলগ্রহণ পর্যন্ত করবো না।

দ্বিজদাস বলিল, কি করে করছিলেন এতক্ষণ এই ত আশ্চর্য শশধরবাবু।

কল্যাণী কাঁদিয়া বলিল, ছোড়দা, অবশেষে তুমিই কি আমাদের মারতে চাও? মায়ের পেটের ভাই তুমি, তুমিই করবে আমাদের সর্বনাশ?

দ্বিজদাস বলিল, তুই ভাবিস চোখের জল ফেলে বার বার এড়ানো যায় সর্বনাশ? কোথাও বিচার হবে না, তোদেরই হবে বারংবার জিত? দাদা নেই বটে, তবুও খেতে যখন পাবিনে আসিস আমার কাছে, তখন তোর কান্না শুনবো,—এখন নয়।

দয়াময়ী নিঃশব্দে অনেক সহিয়াছিলেন আর পারিলেন না, চীৎকার করিয়া উঠিলেন, দ্বিজু, তুই যা এখানে থেকে। এমনি করে গালিগালাজ করতে কি বিপিন তোরে শিখিয়ে দিয়ে গেল?

কে শিখিয়ে দিয়ে গেল বলচো? বিপিন?

হাঁ, সে-ই। নিশ্চয় সে।

দ্বিজদাসের ওষ্ঠাধর মুহূর্তের জন্য কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, বলিল, আমি যাচ্চি। কিন্তু মা, নিজেকে অনেক ছোট করেচো, আর ছোট করো না। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

নিজের ঘরে আসিয়া দ্বিজদাস চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, ঘণ্টা-দুই পরে মৈত্রেয়ী আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহার হাতে খাবারের পাত্র, বলিল, খাবার সব নতুন করে তৈরি করে নিয়ে এলুম, খেতে বসুন। এই ঘরেই ঠাঁই করে দিই।

এ আপনাকে কে বলে দিলে?

কেউ না। কাল থেকে আপনি খাননি সে কি আমি জানিনে?

এত লোকের মধ্যে আপনার জানার প্রয়োজন?

মৈত্রেয়ী মাথা হেঁট করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। জবাব না পাইয়া দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা, ঐখানে রেখে যান। এখন ক্ষিদে নেই, যদি হয় পরে খাবো।

মৈত্রেয়ী ঘরের একধারে আসন পাতিয়া, খাবার রাখিয়া সমস্ত সযত্নে ঢাকা দিয়া চলিয়া গেল। পীড়াপীড়ি করিল না, বলিল না যে ঠাণ্ডা হইয়া গেলে খাওয়ার অসুবিধা ঘটিবে।

রাত্রি বোধ করি তখন বারোটা বাজিয়াছে, দ্বিজদাস চেয়ার ছাড়িয়া উঠিল। সামান্য কিছু খাইয়া শুইয়া পড়িবে এই মনে করিয়া হাতমুখ ধুইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল দ্বারের বাহিরে কে-একজন বসিয়া আছে। বারান্দার স্বল্প আলোকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে?

আমি মৈত্রেয়ী।

দ্বিজদাসের বিস্ময়ের সীমা নাই, কহিল, এত রাতে আপনি এখানে কেন?

খেতে বসে যদি কিছু দরকার হয় তাই বসে আছি।

এ আপনার ভারী অন্যায়। একে ত প্রয়োজন নেই, আর যদিই বা হয় বাড়িতে আর কি কেউ নেই?

মৈত্রেয়ী মৃদুকণ্ঠে বলিল, ক'দিনের নিরন্তর পরিশ্রমে সকলেই ক্লান্ত। কেউ জেগে নেই, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

দ্বিজদাস বলিল, আপনি নিজেও ত কম খাটেন নি, তবে ঘুমোলেন না কেন?

মৈত্রেয়ী উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

দ্বিজদাসের অপেক্ষাকৃত রুক্ষ স্বর এবার অনেকটা নরম হইয়া আসিল, বলিল, এভাবে বসে থাকাটা বিশ্রী দেখতে। আপনি ভেতরে এসে বসুন, যতক্ষণ খাই তদারক করুন। এই বলিয়া সে মুখহাত ধুইতে জলের ঘরে চলিয়া গেল।

ইতিপূর্বে মৈত্রেয়ীর সহিত দ্বিজদাস কম কথাই কহিয়াছে। প্রয়োজনও হয় না, ইচ্ছাও করে নাই। এখন আলাপটা কিভাবে চালাইবে ভাবিতে ভাবিতে ফিরিয়া আসিয়া দেখে, না আছে খাবারের পাত্র, না আছে মৈত্রেয়ী নিজে। ব্যাপারটা ইতিমধ্যে কি ঘটিল অনুমান করিবার পূর্বেই কিন্তু সে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, ঢাকা খুলে দেখি সমস্ত শুকিয়ে শক্ত হয়ে উঠেছে, তাই আবার আনতে গিয়েছিলুম। বসুন।

দ্বিজদাস কহিল, ধুঁয়া উঠছে দেখচি। এতরাত্রে ও-সব আবার পেলেন কোথায়?

মৈত্রেয়ী বলিল, ঠিক করে রেখে এসেছিলুম। যখনি বললেন খেতে দেরি হবে তখনি জানি এ-সব না রাখলে হয়ত খাওয়াই হবে না।

দ্বিজদাস ভোজনে বসিয়া প্রথমে রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়া জানিল ইহার কতকগুলি মৈত্রেয়ীর স্বহস্তের তৈরী। সেগুলি বারংবার অনুরোধ করিয়া সে দ্বিজদাসকে বেশী করিয়া খাওয়াইল। এ বিদ্যায় সে ব্যুৎপন্ন,—জানে কি করিয়া খাওয়াইতে হয়।

দ্বিজদাস হাসিয়া কহিল, বেশি খেলে অসুখ করবে যে।

না, করবে না। কাল থেকে উপোস করে আছেন, একে বেশি খাওয়া বলে না।

কিন্তু আমিই ত কেবল না খেয়ে নেই, এ বাড়িতে বোধ করি অনেকেই আছেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, অনেকের কথা জানিনে, কিন্তু মাকে যে কি করে দুটো খাওয়াতে পেরেচি সে শুধু আমিই জানি। আমি না থাকলে কতদিন যে তিনি দোর বন্ধ করে অনাহারে থাকতেন আমার ভাবলে ভয় হয়। কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলবেন না, শুনলে বড় লজ্জা করে। আমি কত ছোট।

দ্বিজদাস কহিল, সেই ভালো, তোমাকে আর 'আপনি' বলবো না। কিন্তু তুমি অন্নদা-দিদির খবর নিয়েছিলে?

মৈত্রেয়ী কহিল, তার আবার কি হলো? সেও কি না খেয়ে আছে নাকি?

এতক্ষণ মৈত্রেয়ীর কথাগুলি তাহার বেশ লাগিতেছিল, একটা প্রসন্নতার বাতাস এই দুঃখের মধ্যেও যেন তাহার মনটাকে মাঝে মাঝে স্পর্শ করিয়া যাইতেছিল, কিন্তু এই শেষ কথাটায় চিত্ত তাহার মুহূর্তে বিরূপ হইয়া উঠিল, কহিল, অনুদির সম্বন্ধে এভাবে কথা বলতে নেই। হয়ত শুনেচো সে আমাদের দাসী, কিন্তু এ বাড়িতে তাঁর চেয়ে বড় আমার কেউ নেই। আমাদের মানুষ করেচেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, তা শুনেচি। কিন্তু কত বাড়িতেই ত পুরনো দাস-দাসী ছেলেপুলে মানুষ করে। তাতে নতুন কি আছে? আচ্ছা, আপনার খাওয়া হয়ে গেলে তাঁর খবর নেবো।

দ্বিজদাস নিরুত্তরে ক্ষণকাল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ মনে হইল, সত্যই ত, এমন কত পরিবারেই ঘটিয়া থাকে, যে ভিতরের কথা জানে না, তাহার কাছে শুধু বাহিরের ঘটনায় একান্ত বিস্ময়কর ইহাতে কি আছে! কঠোর বিচার হালকা হইয়া আসিল, কহিল, অনুদি না খেয়ে থাকলেও এত রাত্রে আর খাবেন না। তাঁর জন্যে আজকে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

আবার কয়েক মিনিট নিঃশব্দে কাটিলে দ্বিজদাস জিজ্ঞাসা করিল, মৈত্রেয়ী, পরকে এমন সেবা করতে শিখলে তুমি কার কাছে? তোমার মার কাছে কি?

মৈত্রেয়ী বলিল, না, আমার দিদির কাছে। তাঁর মতো স্বামীকে যত্ন করতে আমি কাউকে দেখিনি।

দ্বিজদাস হাসিয়া বলিল, স্বামী কি পর? আমি পরকে যত্ন করার কথা জিজ্ঞেসা করেছিলুম।

ওঃ—পর? বলিয়াই মৈত্রেয়ী হাসিয়া সলজ্জে মুখ নীচু করিল।

দ্বিজদাস বলিল, আচ্ছা, বলো তোমার দিদির কথা।

মৈত্রেয়ী বলিল, দিদি কিন্তু বেঁচে নেই। তিন বছর হলো একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে

রেখে মারা গেছেন। চৌধুরীমশাই কিন্তু একটা বছরও অপেক্ষা করলেন না, আবার বিয়ে করলেন। কত বড় অন্যায় বলুন ত!

দ্বিজদাস বলিল, পুরুষমানুষে তাই করে। ওরা অন্যায় মানে না।

আপনিও কি তাই করবেন নাকি?

আগে একটাই ত করি, তার পরে অন্যটার কথা ভাববো।

মৈত্রেয়ী বলিল, এমন করে বললে ত চলবে না। তখন আপনার বৌদিদি ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নেই। মাকে দেখবে কে?

দ্বিজদাস বলিল, কে দেখবে জানিনে মৈত্রেয়ী, হয়ত মেয়ে-জামাই দেখবে, হয়ত আর কেউ এসে তাঁর ভার নেবে,—সংসারে কত অসম্ভবই যে সম্ভব হয় কেউ নির্দেশ করতে পারে না। আমাদের কথা থাক, তোমার নিজের কথা বলো।

কিন্তু আমার নিজের কথা ত কিছু নেই।

কিছুই নেই? একেবারে কিচ্ছু নেই?

মৈত্রেয়ী প্রথমে একটু জড়সড় হইয়া পড়িল, তার পরে একটু হাসিয়া বলিল,—ও আমি বুঝেচি। আপনি চৌধুরীমশায়ের কথা কারো কাছে শুনেছেন বুঝি? ছি ছি, কি নির্লজ্জ মানুষ, দিদি মরতে প্রস্তাব করে পাঠালেন আমাকে বিয়ে করবেন।

তার পরে?

মৈত্রেয়ী বলিল, চৌধুরীমশায়ের অনেক টাকা, বাবা-মা দুজনেই রাজী হয়ে গেলেন, বললেন, আর কিছু না হোক লীলার ছেলে-মেয়েগুলো মানুষ হবে। যেন সংসারে আমার আর কিছু কাজ নেই দিদির ছেলে মানুষ করা ছাড়া। বললুম, ও কথা তোমরা মুখে আনলে আমি গলায় দড়ি দেবো।

কেন, এত আপত্তি তোমার কিসের?

আপত্তি হবে না? জগতে এতবড় অশান্তি আর কিছু আছে নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, এ কথা তোমার সত্যি নয়। জগতে সকল ক্ষেত্রেই অশান্তি আসে না মৈত্রেয়ী। আমার মা দাদাকে মানুষ করেছিলেন।

মৈত্রেয়ী বলিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ফল হলো কি? আজকের মত দুঃখের ব্যাপার এ বাড়িতে আর কখনো এসেছে কি?

দ্বিজদাস স্তব্ধ হইয়া রহিল। ইহার কথা মিথ্যা নয়, কিন্তু সত্যও কিছুতে নয়। মিনিট দুই-তিন অভিভূতের মত বসিয়া অকস্মাৎ যেন তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল, বলিল, মৈত্রেয়ী, প্রতিবাদ আমি করবো না। এ পরিবারে মহাদুঃখ এলো সত্যি, তবু জানি, তোমার এ কথা সাধারণ মেয়েদের অতি তুচ্ছ সাংসারিক হিসেবের চেয়ে বড় নয়। বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল।

পরদিন সমস্ত দুপুরবেলা সে বাড়ি ছিল না, কি কাজে কোথায় গিয়াছিল সে-ই জানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে নিঃশব্দে বাড়ি ফিরিয়া সোজা গিয়া দাঁড়াইল বন্দনার গৃহের সম্মুখে, ডাকিল, আসতে পারি?

কে, দ্বিজুবাবু? আসুন।

দ্বিজুদাস ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বন্দনার বাক্স গুছানো শেষ হইয়াছে, যাত্রার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। কহিল, সত্যিই চললেন তাহলে? একটা দিনও বেশি রাখা গেল না?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বন্দনার ইচ্ছা হইল না বলে, তবু বলিতেই হইল,—যেতেই ত হবে, একটা দিন বেশি রেখে আমাকে লাভ কি বলুন?

দ্বিজদাস বলিল, লাভের কথা ত ভাবিনি, শুধু ভেবেচি সবাই গেল—এতবড় বাড়িতে বন্ধু কেউ আর রইলো না।

বন্দনা কহিল, পুরনো বন্ধু যায়, নতুন বন্ধু আসে, এমনিই জগৎ দ্বিজুবাবু। সেই আশায় ধৈর্য ধরে থাকতে হয়,—চঞ্চল হলে চলে না।

দ্বিজদাস উত্তর দিল না, চুপ করিয়া রহিল।

বন্দনা বলিল, সময় বেশী নেই, কাজের কথা দুটো বলে নিই। শুনেছেন বোধ হয় শশধরবাবু কল্যাণীকে নিয়ে চলে গেছেন?

না শুনিনি, কিন্তু অনুমান করেছিলুম।

যাবার পূর্বে একফোঁটা জল পর্যন্ত তাঁদের খাওয়াতে পারা গেল না। দু'জনে এসে মাকে প্রণাম করে বললেন, আমরা চললুম। মা বললেন, এসো। তার পরে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। এই বলিয়া বন্দনা নীরব হইল। যে কারণে তাহার যাওয়া, যে-সকল কথা মায়ের সম্মুখে দ্বিজু গত রাত্রে বলিয়াছিল, তাহার উল্লেখমাত্র করিল না।

কয়েক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, মা ভারী ভেঙ্গে পড়েছেন। দেখলে মায়া হয়,—লজ্জায় কারো কাছে যেন মুখ দেখাতে পারেন না। মৈত্রেয়ী ওঁর যে সেবা করছে বোধ হয় আপন মেয়েতে তা পারে না। মা সুস্থ হয়ে যদি ওঠেন সে শুধু ওর যত্নে। মেয়েটি বেশ ভাল, কিছুদিন ওকে ধরে রাখার চেষ্টা করবেন এই আমার অনুরোধ।

তাই হবে।

দ্বিজুবাবু যাবার আগে আর একটি অনুরোধ করে যাবো?

করুন।

আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

কেন?

বন্দনা বলিল, এই বৃহৎ পরিবার নইলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। আপনাদের অনেক ক্ষতি হলো জানি কিন্তু যা রইলো সেও অনেক। আপনাদের কত দান, কত সৎকাজ, কত আশ্রিত পরিজন, কত দীন-দরিদ্রের অবলম্বন আপনারা,—আর সে কি শুধু আজ? কত দীর্ঘকাল ধরে এই ধারা বয়ে চলেচে আপনাদের পরিবারে—কোনদিন বাধা পায়নি, সে কি এখন বন্ধ হবে? দাদার ভুলে যা গেলো সে ছিল বাহুল্য, সে ছিল প্রয়োজনের অতিরিক্ত। যাক সে। যা রেখে গেলেন শান্তমনে তাকেই যথেষ্ট বলে নিন। সেই অবশিষ্ট আপনার অক্ষয় অজস্র হোক, প্রতিদিনের প্রয়োজনে ভগবান অভাব না রাখুন, আজ বিদায় নেবার পূর্বে তাঁর কাছে এই প্রার্থনা জানাই।

দ্বিজদাসের চোখের জল আসিয়া পড়িল।

বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনার বাবা অখণ্ড ভরসায় দাদার ওপর সর্বস্ব রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা রইলো না। পিতার কাছে অপরাধী হয়ে রইলেন। কিন্তু সেই ত্রুটি যদি দৈন্য এনে তাঁদের পুণ্য কর্ম বাধাগ্রস্ত করে, কোনদিন মুখুয্যেমশাই নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারবেন না। এই অশান্তি থেকে তাঁকে আপনার বাঁচাতে হবে।

দ্বিজদাস অশ্রু সংবরণ করিয়া বলিল, দাদার কথা এমন করে কেউ ভাবেনি বন্দনা, আমিও না। এ কি আশ্চর্য!

ভাগ্য ভালো যে, বাতিদানের ছায়ার আড়ালে সে বন্দনার মুখের চেহারা দেখিতে পাইল না। বলিল, দাদার জন্যে সকল দুঃখই নিতে পারি, কিন্তু তাঁর কাজের বোঝা বইবো কি করে—সাহস পাইনে যে! সেই-সব দেখতেই আজ বেরিয়েছিলুম। তাঁর ইস্কুল, পাঠশালা, টোল, মুসলমান ছেলেদের জন্যে মক্‌তব্—আর সেই কি দু-একটা? অনেকগুলো। প্রজাদের জল-নিকাশের একটা খাল কাটা হচ্চে, বহুদিন ধরে তার টাকা যোগাতে হবে। কাগজপত্রের সঙ্গে একটা দীর্ঘ তালিকা পেয়েছি—শুধু দানের অঙ্ক। তারা চাইতে এলে কি যে বলব, জানিনে।

বন্দনা কহিল, বলবেন তারা পাবে। তাদের দিতেই হবে। কিন্তু জিজ্ঞেস করি, এতকাল

তিনি কিছুই কি কাউকে জানান নি?

না।

এর কারণ?

দ্বিজদাস বলিল, সুকৃতি গোপন করার উদ্দেশ্যে নয়। কিন্তু জানাবেন কাকে? সংসারে তাঁর বন্ধু কেউ ত ছিল না। দুঃখ যখন এসেছে একাকী বহন করেছেন, আনন্দ যখন এসেছে তাকেও উপভোগ করেছেন একা। কিংবা, জানিয়ে থাকবেন হয়ত তাঁর ঐ একটি মাত্র বন্ধুকে—এই বলিয়া সে উপরের দিকে চাহিয়া কহিল, কিন্তু সে খবর আত্মীয়-স্বজন জানবে কি করে? জানেন শুধু তিনি আর তাঁর ঐ অন্তর্যামী।

বন্দনা কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল, আচ্ছা দ্বিজুবাবু, আপনার কি মনে হয় মুখুয্যেমশাই কাউকে কোনদিন ভালোবাসেন নি? কোন মানুষকেই না?

দ্বিজদাস বলিল, না, সে তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। মানুষের সংসারে এতবড় নিঃসঙ্গ একলা মানুষ আর নেই। তার পরে বহুক্ষণ অবধি উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

বন্দনা জোর করিয়া একটা ভার যেন ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল, বলিল, তা হোক গে দ্বিজুবাবু। তাঁর সমস্ত কাজ আপনাকে তুলে নিতে হবে,—একটিও ফেলতে পারবেন না।

কিন্তু আমি ত দাদা নই, একলা পারবো কেন বন্দনা?

একলা ত নয়, দু'জন নেবেন। তাই ত বলেছি আপনাকে বিয়ে করতে হবে।

কিন্তু ভালো না বাসলে আমি বিয়ে করবো কি করে?

বন্দনা আশ্চর্য হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল, এ কি বলছেন দ্বিজুবাবু? এ কথা ত আমাদের সমাজে শুধু আমরাই বলে থাকি। কিন্তু আপনাদের পরিবারে কে কবে ভালোবেসে বিয়ে করেছে যে আপনার না হলে নয়! এ ছলনা ছেড়ে দিন।

দ্বিজদাস বলিল, এ বিধি আমাদের বাড়ির নয় বটে, কিন্তু সেই নজিরই কি চিরদিন মানতে হবে? তাতেই সুখী হবো এ বিশ্বাস আর নেই।

বন্দনা বলিল, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তর্ক চলে না, সুখের জামিন দিতেও পারবো না, কারণ সে ধন যাঁর হাতে তাঁর ঠিকানা জানিনে। অদ্ভুত তাঁর বিচারপদ্ধতি,—তত্ত্ব-অন্বেষণ বৃথা। কিন্তু বিয়ের আগে নয়ন-মন-রঞ্জন পূর্বরাগের খেলা দেখলুম অনেক, আবার একদিন সে অনুরাগ দৌড় দিলে যে কোন্ গহনে, সে প্রহসনও দেখতে পেলুম অনেক। আমি বলি ও-ফাঁদে পা দিয়ে কাজ নেই দ্বিজুবাবু, সোনার মায়ামৃগ যে বনে চরে বেড়াচ্চে বেড়াক, এ বাড়িতে সমাদরে আহ্বান করে এনে কাজ নেই।

দ্বিজদাস মৃদু হাসিয়া কহিল, তার মানে সুধীরবাবু দিয়েছে আপনার মন ভয়ানক বিগড়ে।

বন্দনা হাসিয়া বলিল, হাঁ। কিন্তু মনের তখনও যেটুকু বাকী ছিল বিগড়ে দিলেন আপনি, আবার তার পরে এলেন অশোক! এখন পোড়া অদৃষ্টে উনি টিকে থাকলে বাঁচি।

উনিটি কে? অশোক? তাঁকে আপনার ভয়টা কিসের?

ভয়টা এই যে তিনিও হঠাৎ ভালোবাসতে শুরু করেছেন।

কেউ ভালবাসার ধার দিয়েও যাবে না এই বুঝি আপনার সঙ্কল্প?

হাঁ, এই আমার প্রতিজ্ঞা। বিয়ে যদি কখনো করি, মস্ত সুখের আশায় যেন মস্ত বিড়ম্বনায় না পা দিই। তাই অশোকবাবুকে কাল সতর্ক করে দিয়েছি, আমাকে ভালোবাসলেই আমি ছুটে পালাবো।

শুনে তিনি কি বললেন?

বললেন না কিছুই, শুধু দু'চোখ মেলে চেয়ে রইলেন। দেখে বড় দুঃখ হলো দ্বিজুবাবু!

দুঃখ যদি সত্যিই হয়ে থাকে ত আজো আশা আছে। কিন্তু জানবেন এ-সব শুধু মাসীর বাড়ির ঘোরতর প্রতিক্রিয়া,—শুধু সাময়িক।

বন্দনা বলিল, অসম্ভব নয়, হতেও পারে। কিন্তু শিখলুম অনেক। ভাবি, ভাগ্যে এসেছিলুম

কলকাতায়, নইলে কত জিনিস ত অজানা থেকে যেতো।

দ্বিজদাস কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, বেশী সময় আর নেই, এবার শেষ উপদেশ আমাকে দিয়ে যান কি আমাকে করতে হবে।

বন্দনা পরিহাসের ভঙ্গীতে মাথাটা বার-কয়েক নাড়িয়া বলিল, উপদেশ চাই? সত্যিই চাই নাকি?

দ্বিজদাস বলিল, হাঁ। সত্যিই চাই। আমি দাদা নই, আমার বন্ধুর প্রয়োজন, উপদেশের প্রয়োজন। বিবাহ করতে আমাকে বলে গেলেন, আমি তাই করবো। কিন্তু ভালোবাসা না পাই, বন্ধুত্ব না পেলে যত ভার দিয়ে গেলেন, আমি বইবো কি করে?

দ্বিজুর মুখে পরিহাসের আভাস মাত্র নাই, এ কণ্ঠস্বর বন্দনাকে বিচলিত করিল, কহিল, ভয় নেই দ্বিজুবাবু, বন্ধু আসবে, সত্যিকার প্রয়োজনে ভগবান তাকে আপনার দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে যাবেন, এ বিশ্বাস রাখবেন।

প্রত্যুত্তরে দ্বিজু কি একটা বলিতে গেল কিন্তু বাধা পড়িল। বাহির হইতে মৈত্রেয়ীর সাড়া পাওয়া গেল,—দ্বিজুবাবু, আছেন এ ঘরে? মা আপনাকে একবার ডাকচেন।

দ্বিজু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, বারোটায় গাড়ি, সাড়ে এগারোটায় বার হতে হবে। ঠিক সময়ে এসে ডাক দেবো। মনে থাকে যেন। এই বলিয়া সে ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল।

পঁচিশ

বন্দনার নির্বিঘ্নে বোম্বাই পৌঁছান-সংবাদের উত্তরে দিনকয়েক পরে দ্বিজদাসের নিকট হইতে জবাব আসিয়াছিল যে, সে নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় যথাসময়ে চিঠি লিখিতে পারে নাই। বন্দনা নিজের চোখে যেমন দেখিয়া গেছে সমস্ত তেমনি চলিতেছে। বিশেষ করিয়া জানাইবার কিছু নাই। মৈত্রেয়ীর পিতা কলিকাতায় ফিরিয়া গেছেন, কিন্তু সে নিজে এখনও এ বাড়িতেই আছে। মায়ের সেবা-যত্নে তাহার ত্রুটি ধরিবার কিছু নাই, সংসারের ভারও তাহারি উপরে পড়িয়াছে, ভালোই চালাইতেছে। বাড়ির সকলেই তাহার প্রতি খুশী। দ্বিজদাসের নিজের পক্ষ হইতেও আজিও অভিযোগের কারণ ঘটে নাই। পরিশেষে, বন্দনা ও তাহার পিতার শুভকামনা করিয়া ও যথাবিধি নমস্কারাদি জানাইয়া সে পত্র সমাপ্ত করিয়াছে।

ইহার পরে তিন মাসেরও অধিক সময় কাটিয়াছে, কিন্তু কোন পক্ষ হইতেই আর পত্রাদির আদান-প্রদান হয় নাই। বিপ্রদাসের, মেজদিদির, বাসুর সংবাদ জানিতে মাঝে মাঝে বন্দনার মন উতলা হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু জানিবার উপায় খুঁজিয়া পায় নাই। নিজে হইতে তাঁহারা আজও খবর দেন নাই,—কোথায় আছেন, কেমন আছেন, সমস্তই অপরিজ্ঞাত। ইহারই সুপারিশ করিতে দ্বিজদাসকে অনুরোধ করিয়া চিঠি লিখিবার লজ্জা এত বড় যে, শত ইচ্ছা সত্ত্বেও একাজ তাহার কাছে অসাধ্য ঠেকিয়াছে। এখন বলরামপুরের স্মৃতির তীক্ষ্ণতা ও বেদনার তীব্রতা দুই-ই অনেক লঘু হইয়া গেছে, কিন্তু সেখান হইতে চলিয়া আসার পরে সে প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু দিনের পর দিন ধরিয়া ব্যথাতুর বিক্ষুব্ধ চিত্ততল ধীরে ধীরে যতই শান্ত হইয়া আসিয়াছে ততই উপলব্ধি করিয়াছে তাহাদের সম্বন্ধ কোন সত্যকার সম্বন্ধ নহে। একত্রবাসের সেই দুঃখে-সুখে ভরা অনির্বচনীয় দিনগুলি বিচিত্র ঘনিষ্ঠতায় মনের মধ্যে যতই কেননা নিবিড়তার মোহ সঞ্চার করিয়া থাক আয়ু তার ক্ষণস্থায়ী। এ কথা বুঝিতে তাহার বাকী নাই যে, এই আচারনিষ্ঠ প্রাচীনপন্থী মুখুয্যে-পরিবারের কাছে সে আবশ্যকও নয়, আপনারও নয়। উভয় পক্ষের শিক্ষা সংস্কার ও সামাজিক পরিবেষ্টনে যে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যেমন সত্য, তেমনি কঠিন।

ইতিমধ্যে স্বামীর কর্মস্থল পাঞ্জাব হইতে মাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শরীর ভালো নয়। পাঞ্জাবের চেয়ে বোম্বায়ের জল-বাতাস ভালো এ বুদ্ধি তাঁহাকে কোন্ ডাক্তার দিয়াছে সে তিনিই জানেন। কিন্তু আসিয়াছেন স্বাস্থ্যের অজুহাতে। বোম্বাই আসিবার পূর্বে বন্দনা

দেখা করিয়া আসে নাই, এ অভিযোগ তাঁহার মনের মধ্যে ছিল, কিন্তু বোনঝির মেজাজের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন তাহাতে ভগিনীপতি রে-সাহেবের দরবারে প্রকাশ্য নালিশ রুজু করিবার সাহস ছিল না, তথাপি খাবার টেবিলে বসিয়া কথাটা তিনি ইঙ্গিতে পাড়িলেন। বলিলেন, মিস্টার রে, এটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কিনা জানিনে, কিন্তু আমি অনেক দেখেছি বাপ-মায়ের এক ছেলে কিংবা এক মেয়ে এমনি একগুঁয়ে হয়ে ওঠে যে তাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যায় না।

সাহেব তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন, এবং দেখা গেল দৃষ্টান্ত তাঁহার হাতের কাছেই মজুত আছে। সানন্দে তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এই যেমন আমার বুড়ী। একবার না বললে হাঁ বলায় সাধ্য কার? ওর ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি—

বন্দনা কহিল, তাই বুঝি তোমার অবাধ্য মেয়েকে ভালোবাস না বাবা?

সাহেব সজোরে প্রতিবাদ করিলেন, তুমি আমার অবাধ্য মেয়ে? কোনদিন না। কেউ বলতে পারে না।

বন্দনা হাসিয়া ফেলিল,—এইমাত্র যে তুমিই বললে বাবা।

আমি? কখনো না।

শুনিয়া মাসী পর্যন্ত না হাসিয়া পারিল না।

বন্দনা প্রশ্ন করিল, আচ্ছা বাবা, তোমার মতো আমার মা-ও কি আমাকে দেখতে পারতেন না?

সাহেব বলিলেন, তোমার মা? এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কতবার ঝগড়া হয়েছে। ছেলেবেলায় তুমি একবার আমার ঘড়ি ভেঙ্গেছিল। তোমার মা রাগ করে কান মলে দিলেন, তুমি কাঁদতে কাঁদতে পালিয়ে এলে আমার কাছে। আমি বুকে তুলে নিলাম। সেদিন তোমার মার সঙ্গে আমি সারাদিন কথা কইনি। বলিতে বলিতে তিনি পূর্বস্মৃতির আবেগে উঠিয়া আসিয়া মেয়ের মাথাটি বুকের কাছে টানিয়া লইয়া ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিলেন।

বন্দনা বলিল, ছেলেবেলার মতো এখন কেন ভালবাস না বাবা?

সাহেব মাসীকে আবেদন করিলেন,—শুনলেন মিসেস ঘোষাল, বুড়ীর কথা?

বন্দনা কহিল, কেন তবে যখন-তখন বলো আমার বিয়ে দিয়ে ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে ফেলতে চাও? আমি বুঝি তোমার চোখের বালি?

শুনচেন মিসেস ঘোষাল, মেয়েটার কথা?

মাসী বলিলেন, সত্যি বন্দনা। মেয়ে বড় হলে বাপ-মায়ের কি যে বিষম দুশ্চিন্তা নিজের মেয়ে হলে একদিন বুঝবে।

আমি বুঝতে চাইনে মাসীমা।

কিন্তু পিতার কর্তব্য রয়েছে যে মা। বাপ-মা ত চিরজীবী নয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ না ভাবলে তাঁদের অপরাধ হয়। কেন যে তোমার বাবা মনের মধ্যে শান্তি পান না, সে শুধু যারা নিজেরা বাপ-মা তারাই জানে। তোমার বোন প্রকৃতির যতদিন না আমি বিয়ে দিতে পেরেছি ততদিন খেতে পারিনি, ঘুমোতে পারিনি। কত রাত্রি যে জেগে কেটেছে সে তুমি বুঝবে না, কিন্তু তোমার বাবা বুঝবেন। তোমার মা বেঁচে থাকলে আজ তাঁরও আমার দশাই হতো।

রে-সাহেব মাথা নাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, খুব সত্যি মিসেস ঘোষাল।

মাসী তাঁহাকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, আজ ওর মা বেঁচে থাকলে বন্দনার জন্যে আপনাকে তিনি অস্থির করে তুলতেন। আমি নিজের কি কম করেছি ওঁকে। এখন মনে করলেও লজ্জা হয়।

সাহেব সায় দিয়া বলিলেন, দোষ নেই আপনার। ঠিক এমনিই হয় যে।

মাসী বলিতে লাগিলেন, তাই ত জানি। কেবলি ভাবনা হয় নিজেদের বয়স

বাড়চে,—মানুষের বেঁচে থাকার ত স্থিরতা নেই—বেঁচে থাকতে মেয়েটার যদি না কোন উপায় করে যেতে পারি হঠাৎ কিছু একটা ঘটলে কি হবে। ভয়ে উনি ত একরকম শুকিয়ে উঠেছিলেন।

বন্দনা আর সহিতে পারিল না, চাহিয়া দেখিল তাহার বাবার মুখও শুকাইয়া উঠিয়াছে, খাওয়া বন্ধ হইয়াছে, বলিল, তুমি মেসোমশাইকে অকারণে নানা ভয় দেখিয়েচো মাসীমা, আবার আমার বাবাকেও দেখাচ্চো। কি এমন হয়েছে বলো ত? বাবা এখনো অনেকদিন বাঁচবেন। তাঁর মেয়ের জন্যে যা ভালো, করে যাবার ঢের সময় পাবেন। তুমি মিথ্যে ভাবনা বাড়িয়ে দিও না বাবার।

মাসী দমিবার পাত্রী নহেন। বিশেষতঃ রে-সাহেব তাঁহাকে সমর্থন করিয়া বলিলেন, তোমার মাসীমা ঠিক কথাই বলেছেন বন্দনা। সত্যিই ত আমার শরীর ভালো নয়, সত্যিই ত এ দেহকে বেশী বিশ্বাস করা চলে না। উনি আত্মীয়, সময় থাকতে উনি যদি সতর্ক না করেন কে করবে বলো ত? এই বলিয়া তিনি উভয়ের প্রতিই চাহিলেন। মাসী কটাক্ষে চাহিয়া দেখিলেন বন্দনার মুখ ছায়াচ্ছন্ন হইয়াছে, অপ্রতিভকণ্ঠে ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, এ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত মিস্টার রে। আপনার এক শ' বছর পরমায়ু হোক আমরা সবাই প্রার্থনা করি, আমি শুধু বলতে চেয়েছিলুম—

সাহেব বাধা দিলেন,—না, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। সত্যিই স্বাস্থ্য আমার ভালো না। সময়ে সাবধান না হওয়া, কর্তব্যে অবহেলা করা আমার পক্ষে সত্যিই অন্যায়।

বন্দনা গূঢ় ক্রোধ দমন করিয়া বলিল, আজ বাবার খাওয়া হবে না মাসীমা।

মাসী বলিলেন, থাক এ-সব আলোচনা মিস্টার রে। আপনার খাওয়া না হলে আমি ভারী কষ্ট পাবো।

সাহেবের আহারে রুচি চলিয়া গিয়াছিল, তথাপি জোর করিয়া তিনি এক টুকরা মাংস কাটিয়া মুখে পুরিলেন। অতঃপর খাওয়ার কার্য কিছুক্ষণ ধরিয়া নীরবেই চলিল।

সাহেব প্রশ্ন করিলেন, জামাইয়ের প্র্যাক্‌টিস্ কিরকম হচ্চে মিসেস ঘোষাল?

মাসী জবাব দিলেন, এই ত আরম্ভ করেছেন। শুনতে পাই মন্দ না।

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিলে তিনি মুখের গ্রাসটা গিলিয়া লইয়া কহিলেন, প্র্যাকটিস যাই হোক মিস্টার রে, আমি এইটেই খুব বড় মনে করিনে। আমি বলি তার চেয়েও ঢের বড় মানুষের চরিত্র। সে নির্মল না হলে কোন মেয়েই কোনদিন যথার্থ সুখী হতে পারে না।

তাতে আর সন্দেহ আছে কি!

মাসী বলিতে লাগিলেন, আমার মুশকিল হয়েছে আমার বাপের বাড়ির শিক্ষা সংস্কার, তাঁদের দৃষ্টান্ত আমার মনে গাঁথা। তার থেকে একতিল কোথাও কম দেখলে আর সইতে পারিনে। আমার অশোককে দেখলে সেই নৈতিক আবহাওয়ার কথা মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যার মধ্যে আমি মানুষ। আমার বাবা, আমার দাদা—এই অশোকও হয়েছে ঠিক তাঁদের মতো। তেমনি সরল, তেমনি উদার, তেমনি চরিত্রবান।

রে-সাহেব সম্পূর্ণ মানিয়া লইলেন, বলিলেন, আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছে মিসেস ঘোষাল। ছেলেটি অতি সৎ। ছ-সাত দিন এখানে ছিল, তার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। এই বলিয়া তিনি কন্যাকে সাক্ষ্য মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলিস বুড়ী, অশোককে আমাদের কি ভালই লেগেছিল। যেদিন চলে গেল আমার ত সমস্ত দিন মন খারাপ হয়ে রইলো।

বন্দনা স্বীকার করিয়া কহিল, হাঁ বাবা, চমৎকার মানুষ। যেমন বিনয়ী তেমনি ভদ্র। আমার ত কোন অনুরোধে কখনো না বলেন নি। আমাকে বোম্বায়ে তিনি না পৌঁছে দিলে আমার বিপদ হতো।

মাসী বলিলেন, আর একটা জিনিস বোধ হয় লক্ষ্য করেছো বন্দনা, ওর স্নবরি নেই। যেটি আজকালকার দিনের দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয় যে আমাদের মধ্যে অনেকেরই দেখতে পাওয়া যায়।

বন্দনা সহাস্যে কহিল, তোমার বাড়িতে কোন স্নবের দেখা ত কোনদিন পাইনি মাসীমা।

মাসী হাসিয়া বলিলেন, পেয়েছো বৈ কি মা। অতি বুদ্ধিমতী, তোমাকে ঠকাবে তারা কি করে?

শুনিয়া রে-সাহেবও হাসিলেন, কথাটি তাহার ভারী ভালো লাগিল। বলিলেন, এত বুদ্ধি সচরাচর মেলে না মিসেস ঘোষাল। বাপের মুখে এ কথা গর্বের মতো শুনতে, কিন্তু না বলেও পারিনে।

বন্দনা বলিল, এ প্রসঙ্গ তুমি বন্ধ করো মাসীমা, নইলে বাবাকে সামলানো যাবে না। তুমি এক-মেয়ের দোষগুলোই দেখেছো কিন্তু দেখোনি যে এক-মেয়ের বাপেদের মতো দাম্ভিক লোকও পৃথিবীতে কম। আমার বাবার ধারণা ওঁর মেয়ের মতো মেয়ে সংসারে আর দ্বিতীয় নেই।

মাসী বলিলেন, সে ধারণার আমিও বড় অংশীদার বন্দনা। শাস্তি পেতে হলে আমারও পাওয়া উচিত।

পিতার মুখে অনির্বচনীয় পরিতৃপ্তির মৃদু হাসি, কহিলেন, আমি দাম্ভিক কিনা জানিনে, কিন্তু জানি কন্যা-রত্নে আমি সত্যিই সৌভাগ্যবান। এমন মেয়ে কম বাপেই পায়।

বন্দনা বলিল, বাবা, কৈ আজ ত তুমি একটিও সন্দেশ খেলে না? ভালো হয়নি বুঝি?

সাহেব প্লেট হইতে আধখানা সন্দেশ ভাঙ্গিয়া লইয়া মুখে দিলেন, বলিলেন, সমস্ত বুড়ীর নিজের হাতের তৈরি। এবার কলকাতা থেকে ফিরে পর্যন্ত ও সমস্ত খাওয়া বদলে দিয়েছে। ডালনা, সুক্ত, মাছের ঝোল, দই, সন্দেশ আরও কত কি। কার কাছে শুনে এসেছে জানিনে, কিন্তু বাড়িতে মাংস প্রায় আনতেই দেয় না। বলে বাবার ওতে অসুখ করে। দেখুন মিসেস ঘোষাল, এই-সব বাঙলা খাওয়া খেয়ে মনে হয় যেন বুড়ো বয়সে আছি ভালো। বেশ যেন একটু ক্ষিদে বোধ করি।

বন্দনা বলিল, মাসীমার অভ্যেস নেই, হয়ত কষ্ট হয়।

মাসী এই গূঢ় বিদ্রূপ লক্ষ্য করিলেন না, কহিলেন, না না, কষ্ট হবে কেন, এ আমার ভালোই লাগে। শুধু আবহাওয়ার চেঞ্জই ত নয়, খাবার চেঞ্জও বড় দরকার। তাই বোধ করি শরীর আমার এত শীঘ্র ভালো হয়ে গেল।

ভালো হয়েছে, না মাসীমা?

নিশ্চয় হয়েছে। কোন সন্দেহ নেই।

তা হলে আর কিছুদিন থাকো। আরও ভালো হোক।

কিন্তু বেশীদিন থাকবার যে জো নেই বন্দনা। অশোক লিখেচে এ মাসের শেষেই সে পাঞ্জাবে চেঞ্জের জন্যে আসবে। তার আগে আমার ত ফিরে যাওয়া চাই।

ভোজন-পর্ব সমাধা হইয়াছিল, সাহেব উঠি-উঠি করিতেছিলেন,—মাসী মনে মনে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। প্রস্তাব উত্থাপনের সপক্ষে যে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া আনিয়াছেন, তাহা চক্ষুলজ্জায় ভ্রষ্ট হইতে দিলে ফিরাইয়া আনা হয়ত দুরূহ হইবে। সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া বলিলেন, মিস্টার রে, একটা কথা ছিল, যদি সময় না—

সাহেব তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, না না, সময় আছে বৈ কি। বলুন কি কথা?

মাসী বলিলেন, আমি শুনেছি বন্দনার অমত নেই। অশোক অর্থশালী নয় সত্যি, কিন্তু সুশিক্ষা ও চরিত্রবলে struggle করে একদিন ও উঠবেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আপনি যদি ওকে আপনার মেয়ের অযোগ্য বিবেচনা না করেন ত—

সাহেব আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, কিন্তু সে কি করে হতে পারে মিসেসে ঘোষাল? অশোক

আপনার ভাইপো, সম্পর্কে সেও ত বন্দনার মামাতো ভাই।

মাসী বলিলেন, শুধু নামে, নইলে বহু দূরের সম্বন্ধ। আমার দিদিমা এবং বন্দনার মায়ের দিদিমা দুজনে বোন ছিলেন, সেই সম্পর্কেই বন্দনার আমি মাসী। এ বিবাহ নিষিদ্ধ হতে পারে না মিষ্টার রে।

সাহেব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, বোধ হয় মনে মনে কি একটা হিসাব করিলেন, তারপরে বলিলেন, অশোককে যতটুকু আমি নিজে দেখেছি এবং যতটুকু বন্দনার মুখে শুনেছি তাতে অযোগ্য মনে করিনে। মেয়ের বিয়ে একদিন আমাকে দিতেই হবে, কিন্তু তার নিজের অভিমত ত জানা দরকার।

মাসী স্নেহের কণ্ঠে উৎসাহ দিয়া কহিলেন, লজ্জা করো না মা, বল তোমার বাবাকে কি তোমার ইচ্ছে।

বন্দনার মুখ পলকের জন্য রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণে সুস্পষ্ট স্বরে বলিল, আমার ইচ্ছেকে আমি বিসর্জন দিয়েছি মাসীমা। সে খোঁজ করার দরকার নেই।

সাহেব সভয়ে কহিলেন, এর মানে?

বন্দনা বলিল, মানে ঠিক তোমাদের আমি বুঝিয়ে বলতে পারবো না বাবা। কিন্তু তাই বলে ভেবো না যেন আমি বাধা দিচ্চি। একটু থামিয়া কহিল, আমার সতীদিদির বিয়ে হয়েছিল তাঁর ন'বছর বয়সে। বাপ-মা যাঁর হাতে তাঁকে সমর্পণ করলেন মেজদি তাঁকেই নিলেন, নিজের বুদ্ধিতে বেছে নেননি। তবু, ভাগ্যে যাঁকে পেলেন সে স্বামী জগতে দুর্লভ। আমি সেই ভাগ্যকেই বিশ্বাস করবো বাবা। বিপ্রদাসবাবু সাধুপুরুষ, আসবার আগে আমাকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন যেখানে আমার কল্যাণ ভগবান সেখানেই আমাকে দেবেন। তাঁর সেই কথা কখনো মিথ্যে হবে না। তুমি আমাকে যা আদেশ করবে আমি তাই পালন করবো। মনের মধ্যে কোন সংশয়, কোন ভয় রাখবো না।

সাহেব বিস্ময়ে স্থির হইয়া তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

মাসী বলিলেন, বিয়ের সময় তোমার মেজদি ছিলেন বালিকা, তাই তার মতামতের প্রশ্নই ওঠেনি। কিন্তু তুমি তা নও, বড় হয়েছো, নিজের ভাল-মন্দের দায়িত্ব তোমার নিজের, এমন চোখ বুজে ভাগ্যের খেলা ত তোমার সাজে না বন্দনা।

সাজে কিনা জানিনে মাসীমা, কিন্তু তাঁর মতো তেমনি করেই ভাগ্যকে আমি প্রসন্নমনে মেনে নেবো।

কিন্তু এমন উদাসীনের মতো কথা বললে তোমার বাবা মনস্থির করবেন কি করে?

যেমন করে ওঁর দাদা করেছিলেন সতীদিদির সম্বন্ধে, যেমন করে ওঁর সকল পূর্ব-পুরুষরাই দিয়েছিলেন তাঁদের ছেলে-মেয়ের বিবাহ, আমার সম্বন্ধেও বাবা তেমনি করেই মনঃস্থির করুন।

তুমি নিজে কিছুই দেখবে না, কিছুই ভাববে না?

ভাবা-ভাবি, দেখা-দেখি অনেক দেখলুম মাসীমা। আর না। এখন নির্ভর করবো বাবার আশীর্বাদে আর সেই ভাগ্যের পরে যার শেষ কেউ আজও দেখতে পায়নি।

মাসী হতাশ হইয়া একটুখানি তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, ভাগ্যকে আমরাও মানি, কিন্তু তোমার সমাজ, শিক্ষা, সংস্কার সব ডুবিয়ে দিয়ে মুখুয্যেদের এই ক'দিনের সংস্রব যে তোমাকে এতখানি আচ্ছন্ন করবে তা ভাবিনি। তোমার কথা শুনলে মনে হয় না যে তুমি আমাদের সেই বন্দনা। যেন একেবারে আমাদের থেকে পর হয়ে গেছো।

বন্দনা বলিল, না মাসীমা, আমি পর হয়ে যাইনি। তাঁদের আপনার করতে আমার কাউকে পর করতে হবে না এ কথা নিশ্চয় জেনে এসেছি। আমাকে নিয়ে তোমরা কোন শঙ্কা করো না।

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহলে অশোককে আসতে একটা টেলিগ্রাম করে দিই?

দাও। আমার কোন আপত্তি নেই। এই বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মিস্টার রে, আপনার নাম করেই তবে টেলিগ্রামটা পাঠাই—বলিয়া মাসী মুখ তুলিয়া সবিস্ময়ে দেখিলেন সাহেবের দুই চোখ অকস্মাৎ বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ খুঁজিয়া পাইলেন না এবং সাহেব ধীরে ধীরে যখন বলিলেন, টেলিগ্রাম আজ থাক মিসেস ঘোষাল, তখনও হেতু বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, থাকবে কেন মিস্টার রে, বন্দনা ত সম্মতি দিয়ে গেলো।

না না, আজ থাক, বলিয়া তিনি নির্বাক হইয়া রহিলেন। এই নীরবতা এবং ঐ অশ্রুজল মাসীকে ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করিল। একজন প্রবীণ পদস্থ লোকের এইরূপ সেন্টিমেন্টালিটি তাঁহার অসহ্য। কিন্তু জিদ করিতেও সাহস করিলেন না। মিনিট-দুই চুপ করিয়া থাকিয়া সাহেব বলিলেন, ওর বাপের ভাবনা আমি ভেবেচি, কিন্তু ওর মা নেই, তাঁর ভাবনাও আমাকেই ভাবতে হবে মিসেস ঘোষাল। একটু সময় চাই।

মাসী মনে মনে বলিলেন, আর একটা স্টুপিড সেন্টিমেন্টালিটি। সাহেব অনুমান করিলেন কিনা জানি না, কিন্তু এবার জোর করিয়া একটু ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মুশকিল হয়েছে ওর কথা আমরা কেউ ভালো বুঝতে পারিনে। শুধু আজ নয়, বাঙলা থেকে আসা পর্যন্তই মনে হয় ঠিক যেন ওকে বুঝতে পারিনে। ও সম্মতি দিলে বটে, কিন্তু সে—ও, না ওর নতুন রিলিজন ভেবেই পেলুম না।

নতুন রিলিজন? মানে?

মানে আমিও জানিনে। কিন্তু বেশ দেখতে পাই বাঙলা থেকে ও কি যেন একটা সঙ্গে করে এনেছে, সে রাত্রি-দিন থাকে ওকে ঘিরে। ওর খাওয়া গেছে বদলে, কথা গেছে বদলে, ওর চলা-ফেরা পর্যন্ত মনে হয় যেন আগেকার মতো নেই। ভোরবেলায় স্নান করে আমার ঘরে গিয়ে পায়ের ধুলো মাথায় নেয়। বলি, বুড়ী, আগে ত তুই এ-সব করতিস নে?

তখন জানতুম না বাবা। এখন তোমার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে দিন আরম্ভ করি, বেশ বুঝতে পারি সে আমাকে সমস্ত দিন সমস্ত কাজে রক্ষে করে চলে। বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু পুনরায় অশ্রুসজল হইয়া উঠিল।

মাসী মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, এ-সব নতুন ধাঁচা শিখে এসেছে ও মুখুয্যেদের বাড়িতে। জানেন ত তাঁরা কিরকম গোঁড়া? কিন্তু একে রিলিজন বলে না, বলে কুসংস্কার। ও পুজোটুজো করে নাকি?

সাহেব বলিলেন, জানিনে করে কিনা। হয়ত করেন না। কুসংস্কার বলে আমারও মনে হয়েছে, নিষেধ করতেও গেছি, কিন্তু বুড়ী আগেকার মতো আর ত তর্ক করে না, শুধু চুপ করে চেয়ে থাকে। আমারও মুখ যায় বন্ধ হয়ে—কিছুই বলতে পারিনে।

মাসী বলিলেন, এ আপনার দুর্বলতা। কিন্তু নিশ্চিত জানবেন একে রিলিজন বলে না, বলে শুধু সুপারস্টিশন। একে প্রশ্রয় দেওয়া অন্যায়! অপরাধ!

সাহেব দ্বিধাভরে আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই হবে বোধ হয়। রিলিজন কথাটা মুখেই বলি, কখনো নিজেও চর্চা করিনি, এর নেচার কি তা-ও জানিনে, শুধু মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবি মেয়েটাকে এমন আগাগোড়া বদলে দিলে কিসে? সে হাসি নেই, আনন্দের চঞ্চলতা নেই, বর্ষাদিনের ফুটন্ত ফুলের মতো পাপড়িগুলি যেন জলে ভিজে। কখনো ডেকে বলি, বুড়ী, আমাকে লুকোস নে মা, তোর ভেতরে ভেতরে কোন অসুখ করেনি ত? অমনি হেসে মাথা দুলিয়ে বলে, না বাবা, আমি ভালো আছি, আমার কোন অসুখ নেই। হাসিমুখে ঘরের কাজে চলে যায়, আমার কিন্তু বুকের পাঁজর ভেঙ্গে পড়তে চায় মিসেস ঘোষাল। ঐ একটি মেয়ে, মা নেই, নিজের হাতে মানুষ করে এতবড়টি করেছি,—সর্বস্ব দিয়েও যদি আমার সেই বন্দনাকে আবার তেমনি ফিরে পাই—

মাসী জোর দিয়া বলিলেন, পাবেন। আমি কথা দিচ্চি পাবেন। এ শুধু একটা সাময়িক অবসাদ, ধর্মের ঝোঁক হলেও হতে পারে, কিন্তু অত্যন্ত অসার। সেবল ওঁদের সংসর্গে আসার ক্ষণিক বিকার। বিবাহ দিন, সমস্ত দুদিনে সেরে যাবে। চিরদিনের শিক্ষাই মানুষের থাকে মিস্টার রে, দু দিনের বাতিক দু দিনেই ফুরোয়।

সাহেব আশ্বস্ত হইলেন, তথাপি সন্দেহ ঘুচিল না। বলিলেন, ও কোথায় কার কাছে কি প্রেরণা পেলে জানিনে, কিন্তু শুনেচি সে যদি আসে সত্যিকার মানুষ থেকে কিছুতে সে ঘোচে না। মানুষের চিরদিনের অভ্যাস দেয় একমুহূর্তে বদলে। নেশা গিয়ে মেশে রক্তের ধারায়, সমস্ত জীবনে তার আর ঘোর কাটে না। সেই আমার ভয় মিসেস ঘোষাল।

প্রত্যুত্তরে মাসী একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিলেন, বলিলেন, বাজে বাজে। আমি অনেক দেখেছি মিস্টার রে—দুদিন পরে আর কিছুই থাকে না। আবার যাকে তাই হয়। কিন্তু বাড়তে দেওয়াও চলবে না,—আজই অশোককে একটা তার করে দিন—সে এসে পড়ুক।

আজই দেবেন?

হাঁ, আজই। এবং আপনার নামেই।

সাহেব মৃদুকণ্ঠে সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, যা ভালো হয় করুন। আমি জানি অশোক ভালো ছেলে। চরিত্রবান, সৎ—তা নইলে ওকে সঙ্গে নিয়ে বন্দনা কিছুতে আসতে রাজী হতো না।

মাসী এই কথাটাকেই আর একবার ফাঁপাইয়া ফুলাইয়া বলিতে গেলেন, কিন্তু বাধা পড়িল। বন্দনা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, বাবা, আজ হাজি-সাহেবের মেয়েরা আমাকে চায়ের নেমন্তন্ন করেছে। দুপুরবেলা যাবো,—বিকালে আফিসের ফেরত আমাকে বাড়ি নিয়ে এসো।

মাসী প্রশ্ন করিলেন, তাঁদের বাড়িতে তুমি ত কিছু খাবে না বন্দনা?

না মাসীমা।

কেন?

আমার ইচ্ছে করে না। বাবা, তুমি ভুলে যাবে না ত?

না মা, তোমাকে আনতে ভুলে যাবো এমন কখন হয়? এই বলিয়া সাহেব একটু হাসিলেন। বলিলেন, অশোক আসচেন। তাঁকে আজ একটা তার করে দেবো।

বেশ ত বাবা, দাও না।

মাসী বলিলেন, আমিই জোর করে তাকে আনচি। দেখো, এলে যেন না অসম্মান হয়।

তোমার ভয় নেই মাসীমা, আমরা কারো অসম্মান করিনে। অশোকবাবু নিজেই জানেন।

মেয়ের কথা শুনিয়া সাহেব প্রসন্নমুখে বলিলেন, আফিসের পথে আজই তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবো বুড়ী। আজ শুক্রবার, সোমবারেই সে এসে পৌঁছতে পারবে যদি না কোন ব্যাঘাত ঘটে।

দরোয়ান ডাক লইয়া হাজির হইল। অসংখ্য সংবাদপত্র নানা স্থানের। চিঠিপত্রও কম নয়। কিছুদিন হইতে ডাকের প্রতি বন্দনার ঔৎসুক্য ছিল না। সে জানিত প্রতিদিন আশা করিয়া অপেক্ষা করা বৃথা। তাহাকে মনে করিয়া চিঠি লিখিবার কেহ নাই। চলিয়া যাইতেছিল, সাহেব ডাকিয়া বলিলেন, এই যে তোমার নামের দু-খানা। আপনারও একখানা রয়েছে মিসেস ঘোষাল।

নিজের চেয়েও পরের চিঠিতে মাসীর কৌতূহল বেশি। মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিলেন, এক খানা ত দেখচি অশোকের হাতের লেখা। ওটা কার?

এই অকারণ প্রশ্নের উত্তর বন্দনা দিল না, চিঠি-দুটা হাতে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

সাহেব মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন, অশোকের সঙ্গে দেখচি চিঠিপত্র চলে। তার করে দিই, সে আসুক। ছেলেটি সত্যিই ভালো। তাকে বিশ্বাস না করলে বন্দনা কখনো চিঠি

লিখত না।

প্রত্যুত্তরে মাসীও সগর্বে একটু হাসিলেন। অর্থাৎ জানি আমি অনেক কিছুই।

বিকালে আফিসের পথে হাজি-সাহেবের বাড়ি ঘুরিয়া রে-সাহেব একাকী ফিরিয়া আসিলেন। বন্দনা সেখানে যায় নাই। মাসী সুমুখেই ছিলেন, মুখ ভার করিয়া বলিলেন, বন্দনা চিঠি নিয়ে সেই যে নিজের ঘরে ঢুকেছে আর বার হয়নি।

সাহেব উদ্বিগ্নমুখে প্রশ্ন করিলেন, খায়নি?

না। সকালে সেই যে দুটো ফল খেয়েছিল আর কিছু না।

সাহেব দ্রুতপদে কন্যার ঘরের দরজায় গিয়া ঘা দিলেন,—বুড়ী!

বন্দনা কবাট খুলিয়া দিল। তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া পিতা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন,—কি হয়েছে রে?

বন্দনা কহিল, বাবা, আজ রাত্রের গাড়িতে আমি বলরামপুরে যাবো।

বলরামপুরে? কেন?

দ্বিজদাসবাবু একখানা চিঠি লিখেছেন,—পড়বে বাবা?

তুই পড় মা, আমি শুনি, বলিয়া সাহেব চৌকি টানিয়া লইয়া বসিলেন। বন্দনা তাঁহাকে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া যে চিঠিখানা পড়িয়া শুনাইল তাহা এই—

সুচরিতাসু।

আপনার যাবার দিনটি মনে পড়ে। উঠানে গাড়ি দাঁড়িয়ে, বললেন, মাঝে মাঝে খবর দিতে। বললুম, কুঁড়ে মানুষ আমি, চিঠিপত্র লেখা সহজে আসেও না, ভালো লিখতেও জানিনে। এ ভার বরঞ্চ আর কাউকে দিয়ে যান।

শুনে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপরে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলেন, দ্বিতীয় অনুরোধ করলেন না। হয়ত ভাবলেন অসৌজন্য যাকে এমন সময়েও একটা ভালো কথা মুখে আনতে দেয় না তাকে আর বলবার কি আছে!

আমি এমনিই বটে। তবু আশা ছিল লিখতেই যদি হয় যেন এমন কিছু লিখতে পারি যা খবরের চেয়ে বড়। লেখা যেন অনায়াসে আমার সকল অপরাধের মার্জনা চেয়ে নিতে পারে।

মনে ভাবতুম মানুষের জন্যে কি শুধু অভাবিত দুঃখই আছে, অভাবিত সুখ কি জগতে নেই?

দাদার ইষ্টদেবতা শুধু চোখ বুজেই থাকবেন, চেয়ে কখনো দেখবেন না? অঘটন যা ঘটল সেই হবে চিরস্থায়ী, তাকে টলাবার শক্তি কোথাও নেই?

দেখা গেল নেই,—সে শক্তি কোথাও নেই। না টললেন ভগবান, না টললো তাঁর ভক্ত। নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা আজও তেমনি ঊর্ধ্বমুখে জ্বলচে, জ্যোতিঃর কণামাত্র অপচয়ও ঘটেনি।

এ প্রসঙ্গ কেন তাই বলি। তিন দিন হলো দাদা বাড়ি ফিরে এসেছেন। সকালে যখন গাড়ি থেকে নামলেন তাঁর পিছনে নামলো বাসু। খালি পা, গলায় উত্তরীয়। গাড়ি ফিরে চলে গেলো আর কেউ নামল না। সকালের রোদে ছাদে দাঁড়িয়েছিলুম, চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবী হয়ে এলো অন্ধকার,—ঠিক অমাবস্যা রাত্রির মতো। বোধ করি মিনিট-দুই হবে, তার পরে আবার সব দেখতে পেলুম, আবার সব স্পষ্ট হয়ে এলো। এমন যে হয় এর আগে আমি জানতুম না।

নীচে নেমে এলুম, দাদা বললেন, তোর বৌদি কাল সকালে মারা গেছেন দ্বিজু। হাতে টাকাকড়ি বিশেষ নেই, সামান্যভাবে তাঁর শ্রাদ্ধের আয়োজন করে দে। মা কোথায়?

ঢাকায়। তাঁর মেয়ের বাড়িতে।

ঢাকায়? একটু চুপ করে থেকে বললেন, কি জানি, আসতে হয়ত পারবেন না, কিন্তু

মাতৃদায় জানিয়ে বাসু তাঁকে চিঠি দেয় যেন।

বললুম, দেবে বৈ কি।

বাসু ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে বুকে মুখ লুকালো। তার পরে কেঁদে উঠলো। সে কান্নারও যেমন ভাষা নেই, চিঠিতে সে প্রকাশ করারও তেমনি ভাষা নেই। শিকারের জন্তু মরার আগে তার শেষ নালিশ রেখে যায় যে ভাষায় অনেকটা তেমনি। তাকে কোলে নিয়ে ছুটে পালিয়ে এলুম নিজের ঘরে। সে তেমনি করেই কাঁদতে লাগলো বুকে মুখ রেখে। মনে মনে বললুম, ওরে বাসু, লোকসানের দিক দিয়ে তুই যে বেশী হারালি তা নয়, আর একজনের ক্ষতির মাত্রা তোকেও ছাপিয়ে গেল। তবু তোকে বোঝবার লোক পাবি, কিন্তু সে পাবে না। শুধু একটা আশা বন্দনা যদি বোঝেন।

এমন কতক্ষণ গেল। শেষে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললুম, ভয় নেই রে, মা না থাক, বাপ না থাক কিন্তু রইলুম আমি। ঋণ তাঁদের শোধ দিতে পারবো না, কিন্তু অস্বীকার করবো না কখনো। আজ সবচেয়ে ব্যথা সবচেয়ে ক্ষতির দিনে এই রইলো তোর কাকার শপথ।

কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়াবো না, কথার আছেই বা কি। ছেলেবেলায় বাবা বলতেন, গোঁয়ার, মা বলতেন চুয়াড়, কতবার রাগ করেছেন দাদা,—অনাদরে অবহেলায় কতদিন এ বাড়ি হয়ে উঠেছে বিষ, তখন বৌদিদি এসেছেন কাছে, বলেছেন ঠাকুরপো, কি চাই বলো ত ভাই? রাগ করে জবাব দিয়েছি, কিছুই চাইনে বৌদি, আমি চলে যাবো এখান থেকে।

কবে গো?

আজই।

শুধু হেসে বলেছেন, হুকুম নেই যাবার। খাও ত দেখি আমার অবাধ্য হয়ে।

আর যাওয়া হয়নি। কিন্তু সেই যাবার দিন যখন সত্যি এলো তখন তিনিই গেলেন চলে। ভাবি, কেবল আমার জন্যেই হুকুম? তাঁকে হুকুম করবার কি কেউ ছিল না জগতে?

দাদাকে জিজ্ঞাসা করলুম, কি করে ঘটলো? বললেন, কলকাতাতেই শরীর খারাপ হলো—বোধ হয় মনে মনে খুবই ভাবতো—নিয়ে গেলাম পশ্চিমে। কিন্তু সুবিধে কোথাও হলো না। শেষে হরিদ্বারে পড়লেন জ্বরে, নিয়ে চলে এলাম কাশীতে। সেখানেই মারা গেলেন। ব্যস্!

জিজ্ঞাসা করলুম, চিকিৎসা হয়েছিল দাদা?

বললেন, যথাসম্ভব হয়েছিল।

কিন্তু এই যথাটুকু যে কতটুকু সে দাদা নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না।

ইচ্ছে হলো বলি, আমাকে এত বড় শাস্তি দিলেন কেন? কি করেছিলুম আমি? কিন্তু তাঁর মুখের পানে চেয়ে এ প্রশ্ন আর আমার মুখে এলো না।

জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি কাউকে কিছু বলে যাননি দাদা?

বলিলেন, হাঁ। মৃত্যুর ঘণ্টা-দশেক পূর্ব পর্যন্ত চেতনা ছিল, জিজ্ঞেসা করলুম, সতী, মাকে কিছু বলবে?

বললে, না।

আমাকে?

না।

দ্বিজুকে?

হাঁ। তাকে আমার আশীর্বাদ দিও। বলো সব রইলো।

ছুটে পালিয়ে এলুম বৌদিদির শূন্য ঘরে। ছবি তোলাতে তাঁর ভারী লজ্জা ছিল, শুধু ছিল একখানি লুকনো তাঁর আলমারির আড়ালে। আমারি তোলা ছবি। সুমুখে দাঁড়িয়ে বললুম,

ধন্য হয়ে গেছি বৌদি, বুঝেচি তোমার হুকুম। এত শীঘ্র চলে যাবে ভাবিনি, কিন্তু কোথাও যদি থাক দেখতে পাবে তোমার আদেশ অবহেলা করিনি। শুধু এই শক্তি দিও, তোমার শোকে কারো কাছে আমার চোখের জল যেন না পড়ে। কিন্তু আজ এই পর্যন্তই থাক তাঁর কথা।

এবার আমি। যাবার সময় অনুরোধ করেছিলেন বিবাহ করতে। কারণ, এত ভার একলা বইতে পারব না—সঙ্গীর দরকার। সেই সঙ্গী হবে মৈত্রেয়ী এই ছিল আপনার মনে। আপত্তি করিনি, ভেবেছিলুম সংসারে পনেরো-আনা আনন্দই যদি ঘুচলো এক-আনার জন্যে আর টানাটানি করবো না। কিন্তু সে-ও আর হয় না,—বৌদিদির মৃত্যু এনে দিলে অলঙ্ঘ্য বাধা। বাধা কিসের? মৈত্রেয়ী ভার নিতে পারে, পারে না সে বোঝা বইতে। এটা জানতে পেরেছি। কিন্তু আমার এবার সেই বোঝাই হলো ভারী। তবু বলব বিপদের দিনে সে আমাদের অনেক করেছে, তার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সময় যদি আসে তার ঋণ ভুলবো না।

কাল অনেক রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে বাসু উঠলো কেঁদে। তাকে ঘুম পাড়িয়ে গেলুম দাদার ঘরে। দেখি তখনো জেগে বসে বই পড়চেন। কি বই দাদা? দাদা বই মুড়ে রেখে হেসে বললেন, কি করতে এসেছিস বল? তাঁর পানে চেয়ে যা বলতে এসেছিলুম বলা হলো না। ভাবলুম ঘুমের ঘোরে বাসু কেঁদেছে, তাতে বিপ্রদাসের কি? অন্য কথা মনে এলো, বললুম, শ্রাদ্ধের পরে আপনি কোথা থাকবেন দাদা? কলকাতায়?

বললেন, না রে, যাব তীর্থভ্রমণে।

ফিরবেন কবে?

দাদা আবার একটু হেসে বললেন, ফিরবো না।

স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দেহ রইলো না যে এ সঙ্কল্প টলবে না। দাদা সংসার ত্যাগ করলেন।

কিন্তু অনুনয়-বিনয় কাঁদা-কাটা কার কাছে? এই নিষ্ঠুর সন্ন্যাসীর কাছে? তার চেয়ে অপমান আছে?

কিন্তু বাসু?

দাদা বললেন, হিমালয়ের কাছে একটা আশ্রমের খোঁজ পেয়েছি। তারা ছোট ছেলেদের ভার নেয়। শিক্ষা দেয় তারাই।

তাদের হাতে তুলে দেবেন ওকে? আর আমি করলুম মানুষ? তারপর দুই হাতে কান চেপে পালিয়ে এলুম ঘর থেকে। তিনি কি জবাব দিলেন শুনিনি।

বাসুর পাশে বসে সমস্ত রাত ভেবেচি। কোথায় যে এর কূল কিছুতে খুঁজে পাইনি। মনে পড়ল আপনাকে। বলে গিয়েছিলেন, বন্ধুর যখন হবে সত্যিকার প্রয়োজন তখন ভগবান আপনি পৌঁছে দেবেন তাকে দোরগোড়ায়। বলেছিলেন এ কথা বিশ্বাস করতে। কে বন্ধু, কবে সে আসবে জানিনে, তবু বিশ্বাস করে আছি আমার এই একান্ত প্রয়োজনে একদিন সে আসবেই।

দ্বিজদাস

পড়াশেষ হইলে দেখা গেল সাহেবের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। রুমাল বাহির করিয়া মুছিয়া, বলিলেন, আজই যাও মা, আমি বাধা দেব না। দরোয়ান আর তোমার বুড়ো হিমুও সঙ্গে যাক।

বন্দনা হেঁট হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, বলিল, যাবার উদ্যোগ করি গে বাবা, আমি উঠি।

ছাব্বিশ

ম্যানেজার বিরাজ দত্ত মোটর লইয়া স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। বন্দনাকে সসম্মানে ট্রেন হইতে নামাইয়া গাড়িতে আনিয়া বসাইলেন।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, মা আজও বাড়ি এসে পৌঁছন নি দত্তমশাই?

না দিদি।

মৈত্রেয়ী?

না, তাঁকে ত কেউ আনতে যায়নি।

বাসু ভাল আছে?

আছে।

মুখুয্যেমশাই? দ্বিজুবাবু?

বড়বাবু ভাল আছেন, কিন্তু ছোটবাবুকে দেখলে তেমন ভালো বোধ হয় না।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, জ্বর-টর হয়নি ত?

দত্ত বলিলেন, ঠিক জানিনে দিদি। কিন্তু সমস্ত কাজকর্ম করেই ত বেড়াচ্চেন।

বন্দনা কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিল, দত্তমশাই, আমার মনে হয় মা হয়ত এ দুঃখের মধ্যে আর আসবেন না। কিন্তু দুঃখ যতই হোক, শ্রাদ্ধের আয়োজন ত করতে হবে। কিছু হচ্চে কি?

হচ্চে বৈ কি দিদি। কর্তাবাবুর শ্রাদ্ধে যেমন হয়েছিল প্রায় তেমনি ব্যবস্থাই হচ্চে।

কথাটা ভাল বুঝিতে না পারিয়া বন্দনা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, কার মত বলচেন, মুখুয্যেমশায়ের পিতৃশ্রাদ্ধের মত? তেমনি বড় আয়োজন?

দত্ত বলিলেন, হাঁ, প্রায় তেমনিই। গেলেই দেখতে পাবেন। বড়বাবু ডেকে বললেন, দ্বিজু, পাগলামি করিস নে, সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। ছোটবাবু বললেন, মাত্রা আছে জানি, কিন্তু মাত্রাবোধ ত সকলের এক নয় দাদা। বড়বাবু হেসে বললেন, কিন্তু তুই যে সকলের সকল মাত্রাই ডিঙিয়ে যাচ্চিস দ্বিজু। ছোটবাবু বললেন, তাহলে আপনাদের কাছে মিনতি এই একটিবারের জন্যে আমাকে ক্ষমা করুন। আমি মাত্রা লঙ্ঘন করতে পারবো, কিন্তু বৌদিদির মর্যাদা লঙ্ঘন করতে পারবো না।

এর পরে আর কেউ কথা কয়নি, এখন আপনি যদি কিছু করতে পারেন। খরচ বিশ-পঁচিশ হাজারের কমে যাবে না।

খরচ কি সব ছোটবাবুর?

হাঁ, তাই ত।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, এ কি তাঁর পক্ষে খুব বেশী মনে হয় দত্তমশাই?

বিরাজ দত্ত বলিলেন, খুব বেশী না হলেও সম্প্রতি গেলও যে অনেক দিদি। এখন সামলে চলার প্রয়োজন। এর উপর নতুন বিপদ আসতেই বা কতক্ষণ?

আবার নতুন বিপদ কিসের?

দত্ত ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আপনি কি শোনেন নি জামাইবাবুর সঙ্গে মামলা বেধেছে? এ-সব বস্তুর পরিণাম ত জানেন, ফলাফল বলতে কেউ পারে না।

তবে নিষেধ করেন নি কেন?

নিষেধ? এ ত বড়বাবু নয় দিদি যে নিষেধ মানবেন। এঁকে নিষেধ করতে শুধু একজনই ছিলেন তিনি এখন স্বর্গে। এই বলিয়া বিরাজ দত্ত নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

বন্দনা আর কোন প্রশ্ন করিল না। বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল সুমুখের মাঠের একদিকে কাঠ কাটিয়া স্তূপাকার করা হইয়াছে। যে-সকল চালাঘর দয়াময়ীর ব্রতোপলক্ষে সেদিন তৈরি হইয়াছিল, সেগুলো মেরামত হইতেছে, বাহির প্রাঙ্গণে বিরাট মণ্ডপ নির্মিত হইতেছে, তথায় বহু লোকে বহুবিধ কাজে নিযুক্ত। বিরাজ দত্ত অত্যুক্তি করে নাই বন্দনা তাহা বুঝিল।

গাড়ি হইতে নামিয়া সে সোজা উপরে গিয়া উঠিল। প্রথমেই গেল দ্বিজদাসের ঘরে। একটা মোটা বালিশে হেলান দিয়া সে বিছানায় শুইয়া ছিল, পর্দা সরানোর শব্দে চোখ মেলিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, বন্ধু আপনি এলো আমার ঘরের দোরগোড়ায়।

বন্দনা বলিল, হাঁ এলোই ত! কিন্তু এমন সময়ে শুয়ে কেন?

দ্বিজদাস বলিল, চোখ বুজে তোমাকেই ধ্যান করছিলুম আর মনে মনে বলছিলুম, বন্দনা, দুঃখের সীমা নেই আমার। দেহে নেই বল, মনে নেই ভরসা, বোধ করি ঠেলতে আর পারব না, নৌকো মাঝখানেই ডুববে। ও-পারে পৌঁছনো আর ঘটবে না।

বন্দনা বলিল, ঘটতেই হবে। তোমাকে ছুটি দিয়ে এইবার নৌকো বাহিবার ভার নেবো আমি।

তাই নাও। রাগ করে আর চলে যেও না।

বন্দনা কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল, তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে দুজনের চোখ দিয়াই জল পড়িতে লাগিল। এমনভাবে প্রণাম করা তাহার এই প্রথম। বলিল, তোমার চোখেও জল আসে এ আমি জানতুম না।

দ্বিজদাস বলিল, আমিও না। বোধ করি তার আসার পথটা এতকাল বন্ধ ছিল। প্রথম খুললো যেদিন মৈত্রেয়ীকে ডেকে এনে এ সংসারের ভার দিতে বলে তুমি চলে গেলে। আড়ালে চোখ মুছে ফেলে মনে মনে বললুম, আঘাত যে স্বচ্ছন্দে করতে পারে তার কাছে কখনো ভিক্ষে চাইবো না। কিন্তু সে পণ আমার রইলো না। বৌদিদি গেলেন স্বর্গে, শশধরের সঙ্গে মামলা বাধতে মা চলে গেলেন মেয়ের বাড়িতে, দাদা জানালেন সংসার-ত্যাগের সঙ্কল্প, এক মিনিটের ভূমিকম্পে যেন সমস্ত হয়ে গেল ধূলিসাৎ। এ-ও সয়েছিল, কিন্তু শুনলুম যখন বাড়ি ছেড়ে বাসু যাবে কোন্ একটা অজানা আশ্রমে, সে আর সইলো না। একবার ভাবলুম যা-কিছু আছে কল্যাণীর ছেলেদের দিয়ে আমিও যাবো আর একদিকে, তখন হঠাৎ মনে পড়লো তোমার যাবার আগের শেষ কথাটা—বলেছিলে বিশ্বাস করতে, বলেছিলে আমার একান্ত প্রয়োজনে বন্ধু আপনি আসবে আমার দোরগোড়ায়। ভাবলুম, এই ত আমার শেষ প্রয়োজন, আর প্রয়োজন হবে কবে? তাই লিখলুম তোমাকে চিঠি। সন্দেহ আসতে চায় মনে, জোর করে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বলি—আসবেই বন্ধু। নইলে মিথ্যে হবে তার কথা, মিথ্যে হয়ে যাবে বৌদিদির শেষের আশীর্বাদ। যে বোঝা তিনি ফেলে গেলেন সে বোঝা বইবো আমি কোন্ জোরে! বলিতে বলিতে দু'ফোঁটা অশ্রু আবার গড়াইয়া পড়িল।

বন্দনা কহিল, সবাই বলে তুমি বড় অবাধ্য। একা বৌদির ছাড়া আর কারো কথা কখনো শোননি।

দ্বিজদাস বলিল, এই তোমার ভয়? কিন্তু কেন যে শুনিনি বৌদি বেঁচে থাকলে এর জবাব দিতেন। এই বলিয়া সে নিজের চোখ মুছিয়া ফেলিল।

বন্দনা চুপ করিয়া কয়েক মুহূর্ত তাহার প্রতি চাহিয়া বলিল, জবাব পেয়েছি তোমার, আর আমার শঙ্কা নেই। এই বলিয়া সে দ্বিজদাসের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল, কেবল তোমার চারপাশেই যে ভূমিকম্প হয়েছে তাই নয়, আমার মধ্যেও এমনি প্রবল ভূমিকম্প হয়ে গেছে। যা ভূমিসাৎ হবার তা ধুলোয় লুটিয়েছে, যা ভাঙবার নয়, টলবার নয়, সেই অটলকেই আজ ফিরে পেলুম। এবার যাই দাদার কাছে। যাবার দিনে আমাকে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, বন্দনা, যে তোমার আপন, আশীর্বাদ যেন তাকেই একদিন তোমার হাতে এনে দেয়। সাধুর বাক্য আমি অবিশ্বাস করিনি, নিশ্চয় জেনেছিলুম এ কথা তাঁর সত্য হবেই। শুধু ভাবিনি, সে আশীর্বাদ এমন দুঃখের ভেতর দিয়ে সেই আপনজনকে এনে দেবে। যাই গিয়ে তাঁকে প্রণাম করি গে।

দ্বিজু, বন্দনা এসেচে না? এই বলিয়া সাড়া দিয়া অন্নদা আসিয়া প্রবেশ করিল।

এসেচি অনুদি, বলিয়া বন্দনা ফিরিয়া চহিল। অন্নদার গভীর শোকাচ্ছন্ন মুখের প্রতি চাহিয়া বন্দনা চমকিয়া উঠিল, কাছে গিয়া তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া অস্ফুটে কহিল, তোমার ও-মূর্তি আমি ভাবতেও পারিনি অনুদি। তার পরেই হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। ধীরে ধীরে বহুক্ষণ পর্যন্ত তাহার পিঠের উপর হাত

বুলাইয়া মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, হঠাৎ আর চলে যেও না দিদি, দিন-কতক থাকো। আর তোমাকে কি বলবো আমি।

বন্দনা কথা কহিল না, বুকের উপর তেমনি মুখ লুকাইয়া মাথা নাড়িয়া শুধু সায় দিল। এমনিভাবে আবার বহুক্ষণ গেল। তার পরে মুখ তুলিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাসু কোথায় অনুদি?

চাকররা তাকে পুকুরে স্নান করাতে নিয়ে গেছে।

তাকে বেঁধে দেয় কে?

অন্নদা কহিল, দ্বিজু। ওরা দুজনে একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে শোয়। বলিতে বলিতে আবার তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, মুছিয়া কহিল, মা ত শুধু বাসুর মরেনি, ওরও মরেছে। আবার চোখ মুছিয়া বলিল, সবাই বলে অকালে অসময়ে বাড়ির বৌ মরেছে, ছেলে মানুষের শ্রাদ্ধে এত ঘটা কেন? ওরে সবাই করে মানা,—বাহুল্য দেখে তাদের গা যায় জ্বলে, ভাবে, এ যে বাড়াবাড়ি! জানে না ত সে ছিল ওর আর এক জন্মের মা। কোন ছলে সে মর্যাদায় ঘা লাগলে ও সইবে কি করে?

দ্বিজদাস বন্দনাকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া কহিল, আর ভয় নেই অনুদি, বন্দনা এসেছেন, এবার সমস্ত বোঝা ওঁর মাথায় ফেলে দিয়ে আমি আড়াল হয়ে যাবো।

অন্নদা বলিল, পরের মেয়ে এত বোঝা বইবে কেন ভাই?

পরের মেয়েরাই ত বোঝা বয় অনুদি। ওঁকে ডেকে এনে বলেছি, এত দুঃখের ভার বইতে আমি পারবো না, এর ওপর বাসু যদি যায় ত, রইলো তোমাদের বলরামপুরের মুখুয্যেবাড়ি, রইলো তাদের সাতপুরুষের অভিমান, শশধরের ছেলেদের ডেকে এনে সংসারে আমি ইস্তফা দেবো। দাদাই শুধু পারে তাই নয়, দ্বিজুও পারে। সন্ন্যাস নিতে পারবো না বটে, ও আমি বুঝিনে—কিন্তু টাকাকড়ির বোঝা অনায়াসে ফেলে দিয়ে যাবো।

অন্নদা বন্দনার হাত-দুটি ধরিয়া কহিল, পারবে না দিদি বিপিনের মত করতে? পারবে না বাসুকে বাড়িতে রাখতে?

পারবো অনুদি।

আর এই যে বাধলো সর্বনেশে মামলা জামাইবাবুর সঙ্গে, পারবে না থামাতে?

হাঁ, এ-ও পারবো অনুদি। ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, উনি কোনদিন আমার অবাধ্য হবেন না, এই শর্তেই এ বাড়ির ছোটবৌ হতে রাজী হয়েছি অনুদি। কথাটা অন্নদা ভাল বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। বন্দনা বলিল, যা গেছে সে ত গেছেই। এর উপর কি মাকেও হারাতে হবে? মকদ্দমা না থামালে তাঁকে ফিরিয়ে আনবো আমি কি করে?

দ্বিজদাস বালিশের তলা হইতে চাবির গোছাটা বাহির করিয়া বন্দনার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া কহিল, এই নাও। অবাধ্য হবো না সেই শর্তই তোমার কাছে আজ করলুম।

বন্দনা চাবির গুচ্ছ তুলিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল।

এইবার অন্নদা ইহার তাৎপর্য বুঝিল। বন্দনাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল, তাহার দুই চোখ বাহিয়া শুধু বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বন্দনা বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বলিল, বড়দা, এলুম।

এই নূতন সম্বোধন বিপ্রদাসের কানে ঠেকিল। কিন্তু এ লইয়া কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুনেছিলুম তুমি আসচো, তোমার বাবার তার পাওয়া গিয়েছিল। পথে কষ্ট হয়নি ত?

না।

সঙ্গে কে এল?

আমাদের দারোয়ান আর আমার বুড়ো চাকর হিমু।

বাবা ভালো আছেন?

হাঁ।

বিপ্রদাস একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, দ্বিজু কি পাগলামি করচে দেখলে?

বন্দনা কহিল, আপনি শ্রাদ্ধের কথা বলচেন ত? কিন্তু পাগলামি হবে কেন? আয়োজন এত বড়ই ত চাই। এ নইলে তাঁর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হতো যে!

কিন্তু সামলাতে পারবে কেন বন্দনা?

উনি না পারলেও আমি পারবো বড়দা।

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিলেন, সে শক্তি তোমার আছে মানি, কিন্তু মেজাজ বিগড়ালেই মুশকিল। হঠাৎ রাগ করে চলে না গেলে বাঁচি।

বন্দনা বলিল, সেদিন এসেছিলুম পরের মত, মাথায় কোন ভার ছিল না। কিন্তু আজ এসেছি এ বাড়ির ছোটবউ হয়ে। রাগিয়ে দিলে রাগ করতেও পারি, কিন্তু আর চলে যাবো কেমন করে? সে পথ বন্ধ হয়ে গেল যে! এই বলিয়া সে চাবির গোছা দেখাইয়া কহিল, এই দেখুন এ বাড়ির সব আলমারি-সিন্দুকের চাবি। আপনি তুলে নিয়ে আঁচলে বেঁধেচি।

আনন্দ ও বিস্ময়ে বিপ্রদাস নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন। বন্দনা বলিতে লাগিল, আপনাকে আমার লজ্জা করে বলবার, গোপন করে বলবার কিচ্ছু নেই। ভগবানের কাছে যেমন মানুষের নেই লুকোবার ঠিক তেমনি। মনে পড়ে কি আপনাদের আশীর্বাদ? যাবার দিনে আমাকে বলেছিলেন, যে তোমার যথার্থ আপন তাকেই তুমি পাবে একদিন। সেদিন থেকে গেছে আমার চঞ্চলতা, শান্তমনে কেবল এই কথাই ভেবেচি, যিনি জিতেন্দ্রিয়, যিনি আজন্ম শুদ্ধ সত্যবাদী সাধু, তাঁর আশীর্বাদে আর আমার ভয় নেই। যিনি আমার স্বামী তাঁকে আমি পাবোই। দুই চক্ষু তাহার অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিপ্রদাস কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া নীরবে আশীর্বাদ করিলেন, এবং আজ এই প্রথম দিন বন্দনা তাঁহার পায়ের উপর বহুক্ষণ ধরিয়া মাথা পাতিয়া নমস্কার করিল। উঠিয়া দাঁড়াইলে বিপ্রদাস কহিলেন, আজ যাকে তুমি পেলে বন্দনা, তার চেয়ে দুর্লভ ধন আর নেই। এ কথাটা আমার চিরদিন মনে রেখো।

বন্দনা কহিল, রাখবো বড়দা। একদিনও ভুলবো না।

একটু থামিয়া কহিল, একদিন অসুখে আপনার সেবা করেছিলুম আপনি পুরস্কার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন নিইনি,—মনে পড়ে সে কথা?

পড়ে।

আজ সেই পুরস্কার চাই। বাসুকে আমি নিলুম।

বিপ্রদাস হাসিমুখে বলিলেন, নাও।

তাকে শেখাবো আমাকে মা বলে ডাকতে।

তাই করো। ওর মা এবং বাপ দু'জনকেই আজ রেখে গেলাম তোমার মধ্যে। আর রেখে গেলাম এই মুখুয্যেবাড়ির বৃহৎ মর্যাদাকে তোমার হাতে।

বন্দনা ক্ষণকাল মাথা হেঁট করিয়া এই ভার যেন নীরবে গ্রহণ করিল, তারপরে কহিল, আর একটি প্রার্থনা। নিজেকে চিনতে না পেরে একদিন আপনার কাছে অপরাধ করেছিলুম। ভুল ভেঙ্গেচে, আজ তার মার্জনা চাই।

মার্জনা অনেকদিন করেছি বন্দনা। আমি জানতাম তোমার অন্তর যাকে একান্তমনে চেয়েছে একদিন তাকে তুমি চিনবেই। তাই, আমার কাছে তোমার কোন লজ্জা নেই।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিতেছিল, জোর করিয়া নিবারণ করিয়া বলিল, আরও একটি ভিক্ষে। আমাদের সংসারে কি একদিনও থাকবেন না আর? অভিমানে, সঙ্কোচে কোনদিন মন পূর্ণ করে আপনাকে যত্ন করতে পাইনি, কিন্তু সে বাধা ত ঘুচলো ; আর ত আমার লজ্জা নেই—কিছুদিন থাকুন না আমার কাছে? দু'দিন পুজো করি। এই বলিয়া

সে সজল চক্ষে চাহিয়া রহিল, তাহার আকুল কণ্ঠস্বর যেন অন্তর ভেদ করিয়া বাহিরে আসিল।

বিপ্রদাস হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

বন্দনা বলিল, ওই হাসিমুখের মৌনতাকেই আমি সবচেয়ে ভয় করি বড়দা। কি কঠোর আপনার মন, একে না পারা যায় গলাতে, না পারা যায় টলাতে। দেবেন না উত্তর?

বিপ্রদাস এবার হাসিয়া ফেলিলেন। যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি সুন্দর, তেমনি নির্মল। তাঁহাকে এমন করিয়া হাসিতে বন্দনা যেন এই প্রথম দেখিল। বলিল, উত্তর পেলুম, আর আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু মনকে শান্ত করি কি করে বলে দিন। এ যে কেবলি কেঁদে উঠতে চায়।

বিপ্রদাস বলিলেন, মন আপনি শান্ত হবে বন্দনা, যেদিন নিঃসংশয়ে বুঝবে তোমার দাদা দুঃখের মাঝে ঝাঁপ দিতে গৃহত্যাগ করেনি। কিন্তু তার আগে নয়।

কিন্তু এ বুঝবো আমি কেমন করে?

শুধু আমাকে বিশ্বাস করে। জানো ত দিদি, আমি মিছে কথা বলিনে।

বন্দনা চুপ করিয়া রহিল। মিনিট-দুই পরে গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তাই হবে। আজ থেকে প্রাণপণে বোঝাবো নিজেকে, বড়দা, সত্যি কথাই বলে গেছেন, সত্যবাদী তিনি, মিছে কথায় ভুলিয়ে চলে যাননি। যেখানে আছে মানুষের চরম শ্রেয়ঃ, সেই তীর্থেই তিনি যাত্রা করেছেন।

বিপ্রদাস কহিলেন, হাঁ। তোমার মনকে বুঝিয়ে বোলো যা সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সত্য, সবচেয়ে মধুর, বড়দা সেই পথের সন্ধানে বার হয়েছেন। তাঁকে বাধা দিতে নেই, তাঁকে ভ্রান্ত বলতে নেই, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

বন্দনার চোখে আবার জল আসিয়া পড়িল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, তাই হবে, তাই হবে। এ জীবনে আর যদি কখনো দেখা না পাই, তবু বলবো তিনি ভ্রান্ত নন, তাঁর তরে শোক করা অপরাধ।

পর্দার ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া বিরাজ দত্ত বলিলেন, দিদি, একটা জরুরী কথা আছে,—একবার আসতে হবে যে।

যাই বিরাজবাবু। বড়দা আসি এখন, বলিয়া বন্দনা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সতীর শ্রাদ্ধের কাজ ঘটা করিয়া শেষ হইল। ভিক্ষুক কাঙালী সতীসাধ্বীর জয়গান করিয়া গৃহে ফিরিল, সকলেই বলিল, মুখুয্যেবাড়ির কাজ এমনি করেই হয়, এর ছোট বড় নেই।

সকালে স্নান সারিয়া বন্দনা প্রণাম করিতে বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকিয়া বিস্ময়ে থমকিয়া দাঁড়াইল—তাঁহার পাশে বসিয়া দয়াময়ী। ভোরের ট্রেনে বাড়ি ফিরিয়াছেন, এখনো কেহ জানে না। মায়ের মূর্তি দেখিয়া বন্দনার বুকে আঘাত লাগিল। সোনার বর্ণ কালি হইয়াছে, মাথার ছোট ছোট চুলগুলি রুক্ষ, ধূলিমাখা, চোখ বসিয়াছে, কপালে রেখা পড়িয়াছে—দুঃখ-শোকের এমন ব্যথার ছবি বন্দনা কখনো দেখে নাই। তাহার মনে পড়িল সেদিনের সেই ঐশ্বর্যবতী সর্বময়-কর্ত্রী বিপ্রদাসের মাকে। ক'টা দিনই বা! আজ সমস্ত মহিমা যেন তাঁহার পথের ধূলায়। কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, কখন এলেন মা, আমি জানিতে পারিনি ত।

দয়াময়ী তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন, বলিলেন, আমার আসায় খবর কিসের জন্যে বন্দনা? তখন আসতো বিপ্রদাসের মা, তাই দেশের ছেলে-বুড়ো সবাই টের পেতো। বিপিন, কাজ ত চুকে গেছে বাবা, চল না মায়ে-পোয়ে আজই বেরিয়ে পড়ি।

শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, তোমার ভয় নেই মা, মায়ে-পোয়ের যাত্রার বিঘ্ন ঘটবে না,—কিন্তু আজই হয় না। বন্দনার বাবা আসছেন কাল, তোমার ছোটবৌয়ের হাতে সংসার

বুঝিয়ে না দিয়ে যাবে কেমন করে?

দয়াময়ী অনেকক্ষণ মৌন থাকিয়া বলিলেন, তাই হোক বিপিন। সহ্য হবে না আমার, এমন মিথ্যে আর মুখে আনবো না। কিন্তু ক'টা দিন আর বাকী?

কেবল সাতটা দিন মা। আবার আজকের দিনেই আমরা যাত্রা শুরু করবো।

বন্দনা কহিল, মা, বাড়ির ভেতর আপনার ঘরে চলুন।

দয়াময়ী মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিলেন—তোমার এই কথাটি রাখতে পারবো না মা। যে ক'টা দিন থাকবো, এইখানেই থাকবো, আবার যাবার দিন এলে এই বাইরের ঘর থেকেই দুজনে বার হয়ে যাবো। ভেতরে যা-কিছু রইলো সে-সব তোমার রইলো মা।

বন্দনা পীড়াপীড়ি করিল না, শুধু আবার একবার তাঁহার পদধূলি লইয়া নতমুখে বাহির হইয়া গেল।

বিপ্রদাসের পত্র পাইয়া রে-সাহেব এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া বলরামপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মেয়েকে দ্বিজুর হাতে অর্পণ করিয়া আবার কর্মস্থলে ফিরিয়া গেলেন।

এ বিবাহে নহবৎ বাজিল না, বরযাত্রী কন্যাযাত্রীর বিবাদ বাধিল না, মেয়েরা উলু দিল অস্ফুটে, শাঁক বাজিল চাপা সুরে,—বাসরগৃহ রহিল স্তব্ধ, মৌন।

নিরালা কক্ষে দ্বিজদাসের বিষণ্ণ মুখের পানে চাহিয়া বন্দনা প্রশ্ন করিল, কি ভাবচো বলতো?

দ্বিজদাস বলিল, ভাবচি তোমার কথা, ভাবচি আমার চেয়ে তুমি অনেক বড়।

কেন?

নইলে পারতে না। সর্বনাশ বাঁচাতে কি দুঃখের পথ হেঁটেই না তুমি আমার কাছে এলে।

বন্দনা জিজ্ঞাসা করিল, তুমি আসতে না?

না।

বন্দনা বলিল, মিছে কথা। কিন্তু আমি কি ভাবছিলুম জানো? তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিতে দিতে ভাবছিলুম, আমি এমন-কি সুকৃতি করেছিলুম যাতে তোমার মত স্বামী পেলুম। পেলুম বাসুকে, মাকে, বড়দাকে। আর পেলুম এই বৃহৎ পরিবারের বিপুল ভার। কিন্তু যে সমাজের মেয়ে আমি, তার প্রাপ্য কতটুকু জানো?

দ্বিজদাস কহিল, না।

বন্দনা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। কহিল, কিন্তু আজ নয়। নিজের পরম সৌভাগ্যের দিনে অন্যের দৈন্যকে কটাক্ষ করবো না। অপরাধ হবে।

হবে না, তুমি বলো।

বন্দনা মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল, কহিল, আজ তুমি ক্লান্ত, একটু ঘুমোও তোমার মাথায় আমি হাত বুলিয়ে দিই।

মিনিট-দুই পরে বলিল, আমার মেজদির কথা মনে পড়ে। সেদিন বড়দার সঙ্গে তখনি চলে যেতে চাইলেন দেখে বললুম, তুমি ত ঝগড়া করোনি মেজদি, তুমি কেন যাবে? মেজদি বললেন, যেখানে স্বামীর স্থান হয় না, সেখানে স্ত্রীরও না। একটা দিনের জন্যেও না। তোর স্বামী থাকলে এ কথা বুঝতিস। সেদিন হয়ত ঠিক এ কথা বুঝিনি, কিন্তু আজ বুঝচি তুমি না থাকলে আমি একটা দিনও সেখানে থাকতে পারিনে।

একটু থামিয়া বলিল, এই ত মাত্র ঘণ্টা-কয়েক আগে, পুরুতের সঙ্গে গোটা-কয়েক শব্দ উচ্চারণ করে গেলুম, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন আমার দেহের প্রতি রক্তকণাটি পর্যন্ত বদলে গেছে।

দ্বিজদাস চোখ মেলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিল। তাহার হাতখানি নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিল। কোন কথা কহিল না।

রবিবার ঘুরিয়া আসিল। বিপ্রদাস ও দয়াময়ীর যাবার দিন আজ। তীর্থভ্রমণ দয়াময়ীর একদিন সমাপ্ত হইবে, সেদিন সংসারের আকর্ষণ হয়ত এই গৃহেই আবার তাঁহাকে টানিয়া আনিবে : কিন্তু যাত্রা শেষ হইবে না আর বিপ্রদাসের, আর ফিরাইয়া আনিবে না তাঁহাকে এ গৃহে। এ কথা শুনিয়াছে অনেকে। কেহ বিশ্বাস করিয়াছে, কেহ করে নাই।

প্রাঙ্গণে মোটর দাঁড়াইয়া। কাছে দূরে বাটীর সকলেই উপস্থিত। মেয়েরা দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া চোখ মুছিতেছে, বিপ্রদাস উঠিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দ্বিজুকে দেখচি নে কেন?

কে একজন বলিল, তিনি বাড়ি নেই, কি-একটা কাজে বাইরে গেছেন। শুনিয়া বিপ্রদাস হাসিয়া বলিলেন, পালিয়েছে। সেটা শুধু মুখেই গোঁয়ার, নইলে ভীতুর অগ্রগণ্য।

বন্দনার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল বাসু। বলিল, তুমি আবার কবে আসবে বাবা? একটু শিগগির করে এসো।

বিপ্রদাস হাসিয়া তাহার মাথায় একবার হাত বুলাইয়া দিলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না।

বন্দনা শাশুড়ীর পায়ের ধুলা লইল। তিনি বলিলেন, বাসু রইলো ছোট-বৌমা। আর রইলেন মন্দিরে তোমার শ্বশুরকুলের রাধাগোবিন্দজী। ফিরে কখনো এলে তোমার কাছ থেকে এঁদের নেবো। এই বলিয়া তিনি আঁচলে চোখ মুছিলেন।

বন্দনা দূর হইতে বিপ্রদাসকে প্রণাম করিল। তার পরে কাছে আসিয়া সজলচক্ষে বাষ্প রুদ্ধ স্বরে কহিল, কলকাতায় পুজোর ঘরে যে-মূর্তি একদিন আপনার লুকিয়ে দেখেছিলুম, আজ আবার সেই মূর্তিই আমার চোখে পড়লো, বড়দা। আর আমার শোক নেই, ঠিকানা আপনার নাই বা পেলুম, জানি, মনের মধ্যে যেদিন ডাক দেবো আসতেই হবে আপনাকে। যতই না না বলুন, এ কথা কোনমতেই মিথ্যে হবে না।

বিপ্রদাস শুধু একটু হাসিলেন। যেমন করিয়া ছেলের উত্তর এড়াইয়া গেলেন তেমনি করিয়া বন্দনারও।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

Pathagar.Net